













# ভারতবর্ষ

শ্রীকীর্ত্তনাপথ যুগোপাধ্যায় গ্রন্থ-এ

মুদ্রীপত্র

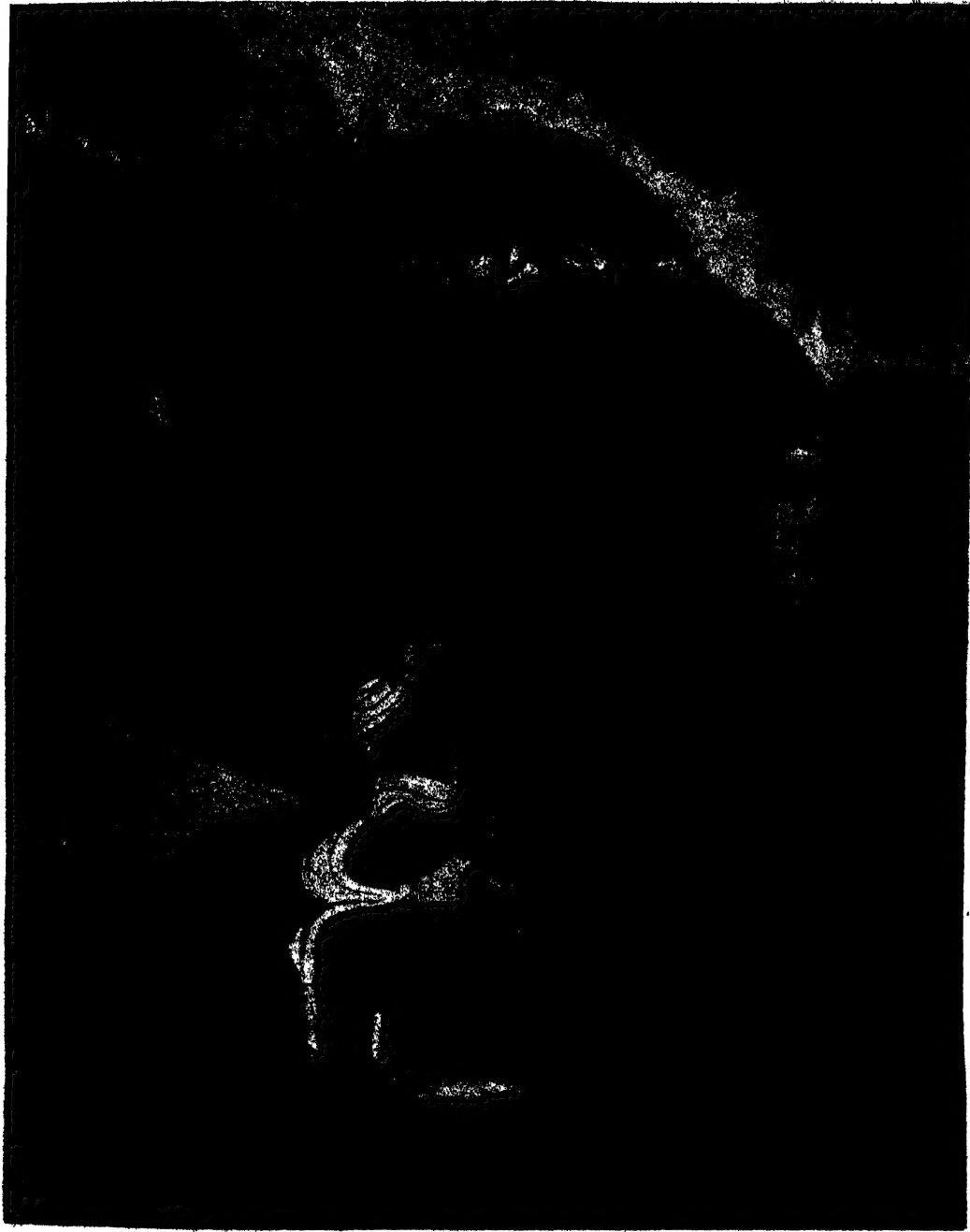
ষট্টিত্রিংশ বর্ষ—প্রথম খণ্ড ; আঘাট—অগ্রহায়ণ ১৩৫৭

লেখ-সূচী—বর্ণানুক্রমিক

দ্রষ্টব্য ( কবিতা )—শ্রীকীর্ত্তনাপথ চট্টোপাধ্যায়	...	২৮৩	চণ্ডী ( কবিতা )—শ্রীহাসিনী দেবী	...	৪০১
চন্দন ( কবিতা )—শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা	...	২৮	চাহিদা ( গল্প )—শ্রীজ্যোতির্ধর সেনগুপ্ত	...	১১১
র ( প্রবন্ধ )—শ্রীগোপালদাস চৌধুরী	...	১০৪	অনন্ত ( গল্প )—শ্রীপৃথ্বীশঙ্কর চট্টোপাধ্যায়	...	২৭১
শ্রী এই নামে কবিতা )—শ্রীজ্যোতীব সাত্তাল	...	৪০০	অনন্তের দৃশ্য ( আলোচনা )—শ্রীহরীকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়	...	১২৭
দ্বাদশ ও দ্বিবিংশ শতাব্দীর ( প্রবন্ধ কাহিনী )—			অর্ধ বার্ষিক ( প্রবন্ধ )—শ্রীহরীকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়	...	২৭৭
শ্রীকীর্ত্তনাপথ যুগোপাধ্যায়	১১২, ২০০, ২৮১, ৪০০, ৪৮৪		জাতীয় সঙ্গীত ( সঙ্গীতালোচনা )—শ্রীদিলীপকুমার রায়	...	২৯৮
দ্বাদশ কবিতা ( কবিতা )—শ্রীকীর্ত্তনাপথ যুগোপাধ্যায়	৪০৪		অধ্যাপকের পথে ( প্রবন্ধ কাহিনী )—নরেন্দ্র বৈদ্য	...	১৩
দ্বিতীয়-দ্বিতীয় ( প্রবন্ধ )—শ্রীকীর্ত্তনাপথ যুগোপাধ্যায়	...	১	তীর্থ ( কবিতা )—শ্রীকীর্ত্তনাপথ যুগোপাধ্যায়	...	১১১
দ্বিতীয় ( কবিতা )—শ্রীকীর্ত্তনাপথ যুগোপাধ্যায়	...	১৮৬	তোমার প্রণাম ( কবিতা )—বিলম্বলাল চট্টোপাধ্যায়	...	৪০৭
দ্বিতীয় ( কবিতা )—শ্রীকীর্ত্তনাপথ যুগোপাধ্যায়	...	১৮১	অন্তের পরিণাম ( কবিতা )—শ্রীকীর্ত্তনাপথ যুগোপাধ্যায়	...	২১৫
দ্বিতীয় পাঠ ( কবিতা )—শ্রীকীর্ত্তনাপথ যুগোপাধ্যায়	...	৪০৮	ইউটি বটগাছের কথা ( নব্বা )—বনেন্দ্র লিখিত	...	৩৬
বি টলটল ( কবিতা )—শ্রীকীর্ত্তনাপথ যুগোপাধ্যায়	...	২১৮	হুইট বটগাছের কথা ( প্রবন্ধ )—শ্রীকীর্ত্তনাপথ যুগোপাধ্যায়	২১৬, ৪০২	
কট কাহিনী ( গল্প )—শ্রীকীর্ত্তনাপথ যুগোপাধ্যায়	...	২৪	হুইট ( প্রবন্ধ )—শ্রীকীর্ত্তনাপথ যুগোপাধ্যায়	...	৪৭৩
দ্বি ও কবিতা ( প্রবন্ধ )—শ্রীকীর্ত্তনাপথ যুগোপাধ্যায়	...	৪৭৭	দেবী পূজা ( কবিতা )—শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা	...	৩৪৭
বি তারতল রায়-গুণাকরের লক্ষ্যহান ( প্রবন্ধ )—			দেব বিদ্যে—শ্রীহরেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ	...	৪০৬
শ্রীগোপালচন্দ্র রায়	...	৩৬২	দ্বাদশ ( উপভাস )—		
লিখিত ও সেরতলীতে বৈজ্ঞানিক ট্রেন ( প্রবন্ধ )—			তারাকান্ত যুগোপাধ্যায়	৪২, ১৪৫, ২৩৫, ৩০৭, ৩৫৭ ৪১৭	
শ্রীকীর্ত্তনাপথ যুগোপাধ্যায়	...	৪০০	বিলম্বলাল রায় ( আলোচনা )—		
লিখিত ( গল্প )—শ্রীহরেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ	৩২২, ৩৬৬		শ্রীকীর্ত্তনাপথ যুগোপাধ্যায়	...	৪২
লিখিত ( উপভাস )—			অব প্রকাশিত পুস্তকাবলী—	৮৮, ১৭৬, ২৬৪, ৩৫২, ৪৫৬, ৪৫২	
শ্রীকীর্ত্তনাপথ যুগোপাধ্যায়	২, ১০৮, ১৮২, ৩২০, ৩৬৫, ৪৬৫		নিজস্ব মনের পরিচয় ( প্রবন্ধ )—শ্রীকীর্ত্তনাপথ যুগোপাধ্যায়	...	৪৩৩
গীর্জনাদেবী রসময় মিত্র ( কবিতা আলোচনা )—			পশ্চিম বাংলার আখের চাষ ( প্রবন্ধ )—		
অধ্যাপক শ্রীকীর্ত্তনাপথ যুগোপাধ্যায়	...	৩৮৭	শ্রীকীর্ত্তনাপথ যুগোপাধ্যায়	...	৪৮২
শ্রীকীর্ত্তনাপথ যুগোপাধ্যায়	...	৩৭৭	পালকশীল মনপাল ও গোকিন্দলাল ( ঐতিহাসিক প্রবন্ধ )—		
শ্রীকীর্ত্তনাপথ যুগোপাধ্যায়	...	৪০৪	উত্তর শ্রীকীর্ত্তনাপথ যুগোপাধ্যায়	...	৪৩
শ্রীকীর্ত্তনাপথ যুগোপাধ্যায়	...	৪০০	পূজার চিঠি ( কবিতা )—সুখারী সেনগুপ্ত	...	৪২১
কর্ত্তার ব্যাধির প্রতিকার ও জাতীয়করণ ( প্রবন্ধ )—			পূর্বের বিশিষ্টাচারে মত ( আলোচনা )—		
অধ্যাপক শ্রীকীর্ত্তনাপথ যুগোপাধ্যায়	...	৪০১	শ্রীকীর্ত্তনাপথ যুগোপাধ্যায়	...	৪১৩
কারিকা-প্রসঙ্গ ( আলোচনা )—শ্রীকীর্ত্তনাপথ যুগোপাধ্যায়	...	৩০৪	পূর্বের আশ্রয় প্রার্থী মনতা ( প্রবন্ধ )—		
কারিকার কৃষ্ণ ( প্রবন্ধ )—কাকুর গুপ্ত	...	১২০	শ্রীকীর্ত্তনাপথ যুগোপাধ্যায়	...	৪৩
কোলা-ধূলা—শ্রীকীর্ত্তনাপথ যুগোপাধ্যায়	৮৫, ১৭৩, ২৫২, ৪৫১, ৩৪৮, ৪৫৬		পূর্ব আশ্রয় প্রার্থী ( প্রবন্ধ কাহিনী )—		
কোলা ( কবিতা )—বিশ্বনাথ চট্টোপাধ্যায়	...	৪১২	কাকুরী রাক্তক	...	৪০৮
কোলাবিশিষ্ট ( আলোচনা )—রাজেশ্বর মিত্র	...	৪০৪	প্রভাতী তার ( কবিতা )—শ্রীকীর্ত্তনাপথ যুগোপাধ্যায়	...	৪৩৪
কোলা সত্যাবের আশ্রয় ( প্রবন্ধ )—শ্রীকীর্ত্তনাপথ যুগোপাধ্যায়	...	৪৩	জাতো শক্তি-সংঘাত ( প্রবন্ধ )—অনুল কৃত	...	৪৩১
কোলাবিশিষ্ট এক আশ্রয় ( প্রবন্ধ )—আশা দেবী	...	৪০১	কাকুরী রাক্তক ( প্রবন্ধ )—শ্রীকীর্ত্তনাপথ যুগোপাধ্যায়	...	৪০৩



ভারতবর্ষ



শিল্পী—শ্রীতাপনকুমার দত্ত

শকুন্তলায় অভিলাষ

ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্



শিক্ষকটিকে ভাইরেস্তি অ্যাকসন

শুক্লগতে দাস্ত। নাগিয়া গিয়াছে। দাবীর কথা—“মারকে লোপা জ্ঞান ভাণ্ডার”—



০৫.০১

০৫.০১

০৫.০১, ০৫.০১ আশ্বিন-১৩৫৭

১৩৫৭, ১২ ক্রীষ্ট

Ottarpura Jai Krishna Public Library.

Accon, No. ৩৬৭৬ Date ১৬.১২.৭৬

প্রথম খণ্ড

অষ্টত্রিংশ বর্ষ

প্রথম সংখ্যা

## আস্তিক্য-বুদ্ধি

শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত

মানব-প্রকৃতির মূলে পরিলক্ষিত হয় দারুণ অতৃপ্তি। অতি ল বিচারেও বোঝা যায়, এ অতৃপ্ত চিত্তের বৈধ ভাবের অনিবার্য পরিণাম। মানুষ বিরুদ্ধ-ধর্মী। অথচ আত্ম-স্ব-অগতে মানবের সম্মত অপরূপ।

মানুষের কতকগুলি বৃত্তি পশুর সঙ্গে সমান। কিন্তু সে বৃত্তির ভোগে বা সাক্ষ্যে তার তৃপ্তি নাই। অতি উপদেশ জ্ঞান তার আহ্বানের বৃত্তিকে তুষ্ট করে, কিন্তু পূর্ণ নবকে সোয়াস্তি দেয় না। বরং তার কণিক তৃপ্তি জ্ঞান-বৃত্তির দমনে। কারণ ভোগ ও বেদনার অহতৃপ্তি তে। দেহের প্রভাব মনের উপর অজস্র। অথচ নসিক ও আধ্যাত্মিক স্ব্থের সন্ধান পাওয়া যায় প্রবৃত্তি-নের কৃতিত্বে। শাসনে বিজয়-স্ব্থের অহতৃপ্তি। পশু-উচরিতার্থেও মানুষ স্ব্থ পায, কিন্তু তাতে পরিতৃপ্ত না।

বাহিরের প্রবৃত্তির গোপন গহনে মানুষের প্রবৃত্তির আর একটা ক্ষেত্র আছে। তার ভাবের প্রেরণা সে বোঝে, কিন্তু তার পূর্ণ পরিচয় মানব পায় না। সেই পরিচয় না-পাওয়া তার অতৃপ্তির মূল হেতু। বিশাল বিশ্ব তার সংসার, এ অস্পষ্ট ধারণা শিশু হ'তে অতি জ্ঞানীর চেতনার পটভূমি। মোমাছি ফুলের রঙে আকৃষ্ট হয় তার অন্তরের মধু-পানের আকাঙ্ক্ষায়। মধুহীন পুষ্পে সে কমনীয়তা দেখে না। সকল ফুলের মাধুরী পতনকে আকর্ষণ করে না। ফুলের আকর্ষণের ভূমি মানুষের চিত্ত। সে জানে না সেখান কা অতৃপ্তি বিস্তারিত—যার নিরাকরণের জন্য মানব-প্রকৃতি তার আপনাকে পরের মাঝে প্রসার করতে। কতক পদার্থ, কতক অবস্থা তাকে টানে। আবার অনেক পদার্থ, বহু-ভাব, নানা পরিস্থিতি তাকে দূর করে। যা প্রের মানুষ তার সন্ধানী, অপ্রিয়ের উপর সে বিদ্রিষ্ট। মানুষের



জীবন-যাত্রা শুরু হলেই, এই ইচ্ছা ও বেগের দ্বন্দ্ব তাকে মোহিত করে। প্রিয় বা অপ্রিয়ের ধারণা অবশ্য প্রত্যেকের বিভিন্ন।

আজ বাকে মাহুষ প্রিয় ভাবে, তাকে পেলেই কি সে তুষ্ট হয়? সে এক আকাঙ্ক্ষার সীমানায় পৌঁছে, আবার পরিখার বাহিরে মনোরম ভূমির সম্বন্ধে চঞ্চল হয়। ভাবে যে আরো আছে তার প্রিয়তর। তখন আবার তার যাত্রা হয় শুরু। ভাবে বাতাস উঠুক-তুফান ছুটুক কিরবে নাকো আর। কিন্তু অজানা দেশে যাত্রার শেষে বধা পূর্বং তথা পরম্।

মাহুষের এক প্রকৃতি তাকে ক্ষুদ্র আশিষের মধ্যে ঘিরে রাখে, আর এক প্রকৃতি সে আশিষকে অতিক্রম করে। সে প্রকৃতি শাস্তি, চায়, অথচ অশান্ত। কারণ মানবের সুখ অল্প নয়, ভূমায়। তাই সে অহরহ—প্রদার চায়, বাড়তে চায়, নিজের মধ্যে পূর্ণতা চায়।

মাহুষ চিরদিনের যাত্রী, অনাগরিক। সে পথের মাঝে বাসা বাঁধে। ক্ষুদ্র প্রয়োজন সিদ্ধ হ'লে আবার আয়োজন করে পথ-চলার। মানবের প্ররুতিগুণা ক্রমে ক্রমে লক্ষ্য হারায়। ভ্রাম্যমান পরিভ্রান্ত কণিক বিশ্রাম করে। কিন্তু ক্রান্তিকে ফিরিয়ে পাবার জন্তই যেন সে আবার ছোট্টে নতুন কুলের সন্ধানে। অদূরে জেগে ওঠে কুল—শান্তির ছায়া-শীতল। বিপুল পরিভ্রমের প্রেরণা আসে—হৃদয়ে আশা, মনে শেষের স্বপ্ন, প্রাণে আশ্রয়ের লোভ। পথে নানা তরঙ্গ এসে নাচার, কোনোটি অল্পকূল, কেহবা প্রতিকূল। ঝগা ওঠে, আবার হুটু বায় বয়। আকাশ-প্রাণিত হয় বিভিন্ন সঙ্গীতের সুরে। কেহ বলে—কেহো কেহো। কেহ গায়—এগিয়ে যাও, শীঘ্র পাবে চির-শান্তি, চির-জ্যোৎস্না-প্রাণিত দেশ যাত্রার শেষে বিরাজিত। কিন্তু কূলে পৌঁছে বোঝে—পথের কষ্ট পণ্ড্রম। কোথায় শান্তি? কোথায় তৃপ্তির অমৃত-রস? ধুঁ ধুঁ করছে বালু-বেলা। অটহাস্ত করছে প্রতি বালু-কণা। ভ্রান্ত পথিক আবার অদূরে দেখে মরীচিকা। আবার সেই পথে ছোট্টে।

আমরা মনের গোপনে শান্তির আহ্বান শুনি, কিন্তু চারিদিকে দেখি চিরন্তন সংগ্রাম। আমাদের এক ধর্ম চায় শান্তি, অস্ত্র স্বভাব চায় বৈরিভা—বিশ্ব-বিজয়ের

প্রেরণায়। জীবনের বে পথে চলি, যেদিকে তাকাই, সচল জগতের বে প্রক্রিয়া পর্যালোচনা করি, তারই মাঝে দেখি প্রতিযোগিতা—একের উচ্ছেদে, অন্নের হাটি, পুষ্টি ও তৃষ্টি। সংহারের তেরী বাঁধন হেঁড়ে, আবার নতুন বাঁধনের হয় রচনা।

কিন্তু অবিরত আশ্বাসের মাঝে একটা সত্যের উপলব্ধি হয়—বিশ্বের কোনো অংশ, অস্ত্র বিভাগ হতে বিচ্ছিন্ন নয়। চাঁদ ওঠে, সাগরে জোয়ার আসে। বাতাস বয়—তুফানে পাতা ঝরে নতুন পল্লবকে স্থান দেবার জন্ত। পাখী গাছের ডাল ভাঙে নিজের গৃহ রচনার তাগিদে। তার পরিণামে তরু হয় শুষ্ক-শাখার আবর্জনামুক্ত। বৃক্ষ প্রসারের সুবিধা পায়। বিশ্ব একটা প্রকাণ্ড পরিবার। পাখীর সুখ ভোজনে এবং পিয়া-মিলন-আশার সঙ্গীতে। ক্ষুদ্র মাহুষও নিজের মধ্যে আবদ্ধ। কিন্তু তার মাঝে এক বৃহৎ মাহুষ আছে, যার অতৃপ্তি সনাতন, বিশ্ব-বিজয়ের দুর্ভাষা ছুঁসিহ। এক অদম্য শক্তির সে অধিকারী। একে গীতা বলেছেন—পৌরুষং নৃষু। সেই মন্তব্য এক অজানাকে জানবার সাধনায় ব্যস্ত। অথচ, সে কথা সে স্পষ্ট বোঝেনা।

এই পৌরুষ বিশ্বের মূল-স্বত্রের সন্ধানী। তার জন্ত জানে ও অজানে, অন্তরের এক শক্তির তাড়নায়, মাহুষ সমাই পরিশ্রম করছে। যে দুর্বল সে পদে পদে পথ-চলার ভ্রান্তিতে, নিরাশার কুহেলিকায় আবৃত হ'য়ে—পথ হারায়—বিশ্রাম চায়—সংগ্রামের পরিশ্রম এড়াতে চায়। কিন্তু উত্তমহান কর্মহীন থাকতে পারে না। বোঝে—আলস্যে শান্তি নাই। নিরাশার ব্যক্তির ইন্দ্রিয়-গ্রাস-ভ্রমার নিবৃত্তি হ'লেও তার রসের প্রতি অতুরাগ লোপ পায় না। গীতার শিক্ষা, সে রসের নিবৃত্তি হ'তে পারে পরমের সাক্ষাতে। অলসও মনের মধ্যে পান শোনে—আরাম হ'তে ছিন্ন ক'রে, সেই গভীরে লওগো মোরে অশান্তির অন্তরে বেধা শান্তি স্তমহান।

একই লোক কতু হয় কুরাশী-পরিবৃত, কতু হয় কর্মরত, কতু বোঝে দিব্যজ্ঞানের রশ্মি উদ্ভাসিত করছে তার অন্তস্তল। আলোর সন্ধান, কর্মের প্রেরণা এবং মোহের আবরণ—এই ত্রিধারার সংসারের শ্রোতবতী পুষ্টি।

তাই আমাদের পথচারিতার বিশেষত্ব এই যে আমরা জোয়ার ভাঁটার বিপরীত শ্রোতে অব্যবহ-চিন্ত কণ্ঠধারের

হাতের নৌকার মত। রাত্রে পথ-হারা পাছের মত প্রান্তরের একই স্থলে ঘুমে ফিরে পৌছাই। অর্থ-সংগ্রহ করে দেখি, অর্থে শান্তি নাই। ধনে শান্তি। পরে দেখি যশ আহরণের চরম পরিণাম নিরাশা। তবু চাই নুতন ধন, নিত্য নবীন যশ। বহুশেষ মাঝে দেখি কুটিলতা, দারুণ স্বার্থের সংঘর্ষণ। এক বন্ধু শত্রু হয়, আবার অন্তের মিত্রতা করি। এ রীতি চলে সর্বদিন সর্ব বিষয়ে।

কিন্তু শিশুকাল হতে চিরকাল মানুষ একটা তত্ত্ব কুটিয়ে তোলে জীবনে। এ প্রকাণ্ড বিশ্বে বিচ্ছিন্ন হয়ে একেলা থাকবার তার তিলার্ক স্থান নাই। \* দলের মধ্যে নিজেকে প্রসার না করার অনিবার্য পরিণাম উচ্ছেদ। ইচ্ছা ও ঘেব উভয়েরই মূলে আছে জানবার বাসনা, প্রসারের ইচ্ছা। শত্রুর পূর্বতাকে ঘেব করি। কিন্তু তাকে জানবার বাসনা অদম্য। সেই বাসনার ফলে হয়, শত্রু শক্তির অংশের প্রতি প্রেম, বাকীটুকুর প্রতি ঘেব ও হিংসা। বাঘকে সহজে মানুষ ঘৃণা করেছে নৃশংসতার জন্য, কিন্তু তার বিক্রমের প্রেমে চিত্তকে প্রফুল্ল করেছে। আদর্শ নরকে বলেছে শাদুল-বিক্রম, নর-শাদুল।

জড়বাদী বলবে এই প্রেমের প্রসার মানুষের পক্ষে ছিল অত্যাশঙ্কক নিজের আত্মরক্ষার তাগিদে। শাস্ত্র বলে, তার এ প্রসারণ-প্রবৃত্তি এলো যে মূল থেকে, তারই শক্তির প্রকাশ এই প্রেম। নিশিদিন মানুষকে টানছে পূর্বতার প্রেরণা। তারই ফলে সে বুঝেছে যে তার সত্য অস্তিত্ব থাকবে না বিশ্বের অন্ত্র অংশের সঙ্গে মিতালী না করলে। পরের শক্তি তার শক্তির পুরক, যদিও এ সত্য ভুললে নিজের শক্তির বিলোপ অবধি সম্ভব। পাথর কঠিন কঠোর। কিন্তু সে গৃহরূপে মাতৃ-স্নেহে আশ্রয় দিয়েছে আদিম বনচারী নরনারীকে, বাঘ, ভল্লুক, সর্প ও গৃধের অভিযান হতে। মানুষকে মানুষের সঙ্গে মিতালী করতে হয়েছে, আততায়ীর আক্রমণ প্রতিরোধ করবার মানসে। ব্যক্তি অভিরুচি, ক্ষুদ্র আশিষ্টের কণিক তৃপ্তির বেড়া জাল আদিম যুগ হতে নর-জাতির নিমূলের হেতু হ'ত। আদি কালের দীর্ঘ-দন্ত শাদুল, প্রকাণ্ড গভীর বা অতিকায় সরীসৃপের সাথে যোঝবার উপযোগী কোনো অস্ত্রে তৃপ্ত করেননি বিধাতা আদিম মানবকে। সত্যের আলীদানে মানব-জাতি আত্মরক্ষার রণে বিজয়লাভ করেছে। দল

বীধার বাসনা তার সংস্কার। বিশ্বের মধ্যে নিজেকে প্রসার করবার ইচ্ছা তার গহন চিত্তের সম্পদ।

একদিকে পূর্ণতা লাভের প্রেরণা, অন্যদিকে বা ক্ষণ-ভঙ্গুর, বা নয় সনাতন, বা গতকাল ছিল না আগামী দিনেও থাকবে না তার পিছনে দৌড়ানো—এই বৈধ-তাব, এই বিরোধ-ধর্ম জীবের সহজ সংস্কার। আজ মানুষ উন্নত হ'য়েছে। সে প্রকৃতির মাঝে নিজের স্থান পেয়েছে এবং প্রকৃতির বহু রহস্য নিজস্ব করেছে, তবু আরো জানবার, আরো পাবার, আরো প্রসারের আহ্বান তার হৃদয়ের উৎস মুখ হতে সদাই উদ্গত। সে আহ্বান যেমন শিশু ও বনচারী শোনে, তেমনি মহাযোগী মহাজানী শোনে।

সে আহ্বান নির্দেশ করে এক প্রচণ্ড অনাদি অনন্ত শক্তিকে। কী সে শক্তি—আমার সাথে যার অবিচ্ছিন্ন সম্পর্ক বিত্তমান? আর কী সে সম্পর্ক? আদিম বনচারী প্রকৃতির রক্ত মূর্তিতে ভয় পায়, শান্ত মূর্তিতে শান্তি পায়। অথচ বোঝে তারা একই বিরাট শক্তির বিভিন্ন বিকাশ। অতি বুদ্ধিমানও বিশ্বে বিরাট শক্তির সন্ধান পায়, কিন্তু তাকে বলে অন্ধশক্তি। তার স্বরূপ জানবার ঔৎসুক্য সাধারণ। সবারই মনে প্রশ্ন ওঠে—“কে সে? জানিনি কে। চিনি নাই তারে, শুধু এইটুকু জানি, তারি লাগি রাত্রি অন্ধকারে চলেছে মানব যাত্রী যুগ হতে যুগান্তর পানে, বড় ঝড় বজ্রপাতে, আলায়ে ধরিয়া সাবধানে অন্তর প্রদীপধানি।”

অন্তর প্রদীপ সবারই জলে ওঠে। কে জালায়, কেন জলে—এই সমস্তার সমাধানে দেশে দেশে, যুগে যুগে, কালে কালে প্রচার করেছেন বাণী—সাধু সন্ত ব্রহ্মা ও অবতার।

এ দেশের কৃষ্টি বীরের মত এ সমস্তার সম্মুখীন হয়েছে বহুকাল। ঋষিরা বিভিন্ন উপনিষদে, এই বিরুদ্ধ স্বভাবের বর্ণে কারণ নির্দেশ করেছেন। জগতের এই দ্বন্দ্ব ও মিলন, সূখের পর দুঃখ, দুঃখের পর সূখ, বিষয়-বিশেষ প্রকৃতি জেনেও সদা সেই হলহল পানের তৃষা এবং বা কণিক তার চাকচিক্যে মুগ্ধ হয়ে পরকণে নিরাশার কবাবাত সঙ্করবার প্রবৃত্তিকে আর্ধ্যশাস্ত্র নাম দিয়েছেন—মায়ী। এ মায়ী প্রকৃতির উপাধি, কারণ প্রকৃতি ত্রিগুণময়ী।

শ্রীমঙ্গাগবলগাতা সকল উপনিষদের সার। উপনিষদ গাভী, দোঁধা গোপাল-নন্দন, পার্থ বৎস, সুধী মহান গীতামৃত হৃৎকের ভোক্তা।

গীতায় মাছুবের প্রকৃত স্বভাব, তার আচরণ, সংস্কার, স্মৃতি এবং অন্তর বাহিরের নিত্য সংগ্রাম উপেক্ষিত বা লাহিত হয়নি। এ শাস্ত্রে জীবনের সাধারণ গতি ও সহজ সমস্তার বর্ণনা আমাদের অন্তরের তারে ঝঙ্কার দেয়। তাই গীতা পাঠে তৃপ্তি। সাধারণ পঞ্চ-প্রদর্শকের মতো শ্রীকৃষ্ণ মাত্র বীজমন্ত্র বা তপস্তার উপায় নির্ধারণ করে ক্ষান্ত হননি। বৈরাগ্য-সাধন তাঁর শিক্ষা নয়। বিফলতা মাছুষকে বিকল করে, বিদ্রোহী করে। গীতা তেমন সমস্তার কারণ নির্ণয় করেছেন। আত্ম-জ্ঞানই অব্যয় তত্ত্ব-জ্ঞান। আশাবাদ জীবের রহস্য। হুরন্ত নিরাশা ও ব্যর্থতার ঝঞ্ঝার অভিযান হ'তে কি প্রকারে আশা প্রদীপকে সদা প্রজ্জ্বলিত রাখা যায়, শ্রীকৃষ্ণের শ্রীমুখে তার রহস্য অতি স্পষ্ট ভাষায় বিষদ-ভাবে বর্ণিত হয়েছে। কর্মই জীবের জীবন। কর্ম অনিবার্য। কর্মের পটভূমিতে যে উদ্দেশ্য নিহিত, সৃষ্টি-তত্ত্ব তার সন্ধান। সৃষ্টি-তত্ত্বের আলোচনায় স্রষ্টার পরিচয়। সে পরিচয় বোধগম্য হ'লে বুঝতে পারা যায়—কেন আত্মিক্য বুদ্ধি সকল মাছুষের সহজ সংস্কার। সকল স্তরের, সকল শ্রেণীর মাছুষের হৃদয়ে স্বভাবতঃ আত্মিক্য-বুদ্ধি বিद्यমান। তার অনিবার্য পরিণতি ভাঙে।

মাছুষকে নাস্তিক হতে হয় এই সহজাত মনোবৃত্তির সঙ্গে সংগ্রাম করে, তার ভক্তির উৎস-মুখ বন্ধ করতে হয়—তর্ক এবং তথাকথিত বিচার সিদ্ধান্তের বোঝা চাপিয়ে।

এই সহজ আত্মিক্য-বুদ্ধির সংকেপে হেতু নির্দেশ করেছেন শ্রীকৃষ্ণ। তিনি বলেছেন—অর্জুন, ঈশ্বর সর্বভূতের হৃদ্যে বাস করেন। সর্বভূত মায়ায় বশে যজ্ঞাক্রমের মত পরিভ্রমণ করে।

তিনি অস্তিত্ব বলেছেন—

“আমি সকলের হৃদয়ে সন্নিবিষ্ট। সৃষ্টি বিসৃষ্টি, জ্ঞান ও অজ্ঞান সবই আমি হ'তে। চারি বেদের অমূল্যলীনে ফলে আমিই জাতব্য, আমিই বেদ-কর্তা এবং বেদ-বেত্তা।”

শ্রীচৈতন্য-ভাগবত বলেছেন—

পরব্রহ্ম নিত্য শুদ্ধ অখণ্ড অব্যয়

পরিপূর্ণ হই বৈসে সবার হৃদয়।

হৃদয় প্রাণের বৈধ-ভাবের ছুটি হেতুই জীবের সৃষ্টি-রহস্যে বিद्यমান। আমরা অনিত্যের পিছনে ছুটি মায়ায় বশে অখণ্ড অন্তরে স্বর শুনি নিজের মাঝে তাঁকে খুঁজে বা করবার। আমাদের সম্প্রসারণের অদম্য স্মৃতির হেতু—হৃদ্যে ঈশ্বরের অস্তিত্ব।

সম্প্রসারণের বাহন প্রেম। সে প্রেম নানারূপে প্রকটিত হয়। সে প্রেম সহজেই শিশুদের প্রাণে বিद्यমান। মেহের প্রতিমা দেখে সে জননীকে। তার সহজ মাতৃ-ভক্তি পরা-ভক্তির ছায়া। বহির্জগতের মাধুরী মহত্ব এবং কঠোরতা অজ্ঞ বনচারীর মাথা নত করে অজ্ঞান লুকায়িত শক্তির পাদপীটে। এ ভক্তি সহজ—সহজাত আত্মিক্য-বুদ্ধির পরিণতি।

দৈবী মায়া হুরতিক্রম্য। শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন—যাঁর আমাকে পান, তাঁরা মায়া অতিক্রম করেন। এই মায়া অতিক্রম করলে পুনর্জন্ম দুঃখ হতে পরিত্রাণ।

আমাদের অন্তরে যে আত্মিক্য-বুদ্ধি বিद्यমান, অখণ্ড মোহে ঢাকা সেই আবরণ উন্মোচন করলে স্রষ্টার বিরাট সৃষ্টির রহস্য উন্মোচন হয়। প্রাণে গুঞ্জরিত উঠে—

তোমার অসীমে প্রাণ-মন লয়ে বতদূরে আমি বাই  
কোথাও ছুঁখ কোথাও মৃত্যু কোথা বিচ্ছেদ নাই।



# বিশ্বের বিখ্যাত পত্রাবলী

অধ্যাপক ডাঃ শ্রীনাথনলাল রায় চৌধুরী শাস্ত্রী

নির্বাসনের পূর্বে টুটকীর পত্র

পত্র পরিচয় :—

লেনিন, টুটকী, স্টালিন রাশিয়ার ত্রয়ী; জারতন্ত্র বিজয়ী।

তার রূপ বিশ্ববের ইতিহাসে লিখেছেন—“বিশ্ব আমার জননী, আমি বিশ্ববের সন্তান।”

১৯১৬ সাল—প্রথম বিশ্বযুদ্ধ দ্বিতীয় পর্যায়ে এসেছে। ইংলণ্ড, ফ্রান্স এবং রাশিয়া জার্মান সাম্রাজ্য ধ্বংসের জন্য সমবেত। বদেশ, স্বাধীনতা, জাতির নামে বিভিন্ন ঐক্য ও ঐতিহ্য সত্ত্বেও শত্রু জার্মানীর বিরুদ্ধে তারা যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত।

প্রায় অর্ধশতাব্দী ধরে রাশিয়ার লেনিন, জার্মানীর কার্লমার্ক্সের ভাববর্তন করে বিশ্বব্যাপী এক সমাজতন্ত্র গঠনের দাবী জানিয়ে অগ্রসর ছিল। তার শিষ্ট টুটকী ও স্টালিন সমস্ত পৃথিবীব্যাপী আন্দোলন রিচালিত করে চলেছেন। তাঁদের আধাতের প্রথম লক্ষ্য ছিল রাশিয়ার গরতন্ত্র। বর্তমান পৃথিবীর প্রত্যেক সাম্রাজ্যের ভিত্তিই ধনিকের ধনতন্ত্র। রাই সাম্রাজ্যের নামে জাতিরতার নামে শ্রমিক আন্দোলনের ঠিকোড় করছিল। কারণ সমাজতান্ত্রিক যুদ্ধের বিরোধিতা করেছেন। নেক দেশেই বহু সমাজতান্ত্রিক নেতা দেশরক্ষার জন্য যুদ্ধে যোগ দিলেন, কারণ, দেশ বিপন্ন। তাদের মধ্যে অন্ততম ছিলেন করাসী সমাজতন্ত্রী জুলে গুরেদা। তিনি পূর্বে লেনিনদলের করাসী শাখার খ্যাত লেখক ও নেতা টুটকীর সহকারী ছিলেন। যুদ্ধের সময় জুলে দা করাসী রাষ্ট্রদ্রোহী পদ গ্রহণ করেছিলেন। তিনি রাষ্ট্রের প্রয়োজনে যুদ্ধের প্রয়োজনে তার প্রাক্তন সমাজতন্ত্রী বন্ধু টুটকীকে করাসীদেপ থেকে বিতাড়িত করেছেন। টুটকী সম্পাদিত “নাশে স্লোভা”—“আমাদের বঁচী” সংবাদপত্র করাসী দেশ থেকে নির্বাসিত করলেন। নির্বাসনের ক্রমবৃদ্ধিতে টুটকী লিখলেন এই অপকল্প পত্র।

প্রত্যাশ্বাদ :—

রাষ্ট্রদ্রোহী জুলে গুরেদা,

আমি করাসীদেশ ত্যাগ করে যাচ্ছি, অবশ্য আমার সঙ্গে আপনার রোজিত পুনিশবাহিনী রয়েছে। তারা আপনার অধীনে দেশের স্বাধীনতা রক্ষা করেছে, সেই স্বাধীনতা রক্ষার দায়িত্ব আপনার হস্তে ত আছে। আমার করাসী দেশ ত্যাগের পূর্বে আপনাকে আমার সন্তান জানিয়ে দাব। অবশ্য আমার কথাগুলি আপনার কোন রোজনে আসবে না, হয়ত বা ভবিষ্যতে আপনার বিরুদ্ধে প্রয়োজিত ত পারে। আমাকে করাসী দেশ থেকে নির্বাসিত করা হয়েছে; আপনার সহকারী যুদ্ধযন্ত্রী আমাকে নির্বাসিত করেছেন। আমি

রাশিয়ার সংবাদপত্র “নাশে স্লোভার” (আমাদের পৃথিবী) সম্পাদক ছিলাম; তিনি সেই পত্রিকার প্রচার করাসী দেশে বন্ধ করেছেন। অবশ্য তার জন্য কোন কারণ প্রদর্শন করা প্রয়োজন মনে করেন নি। এই পত্রিকাখানি বিপন্ন হই বৎসর বাবত যুদ্ধযন্ত্রীর হস্তে কত অত্যাচার সহ করেছে, তা’ আপনার অজ্ঞাত নয়।

অবশ্য আমার নির্বাসনের কারণ সবচেয়ে কোন তথ্যই আমার অজ্ঞাত নাই, সে কথা আর্বি গোপন করব না। একজন আন্তর্জাতিক সমাজতন্ত্রীর বিরুদ্ধে দমনাত্মক ব্যবস্থা করার প্রয়োজন আপনার ছিল, কারণ আমি সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের পক্ষ সমর্থন করিনি, অথবা আমি সে যুদ্ধে বেচ্ছায় কোন সহায়তা করিনি।

কিন্তু মজার ব্যাপারটা হচ্ছে এই যে, নির্বাসন হয়েছে আমার, এবং আমাকে নিয়ে হয়েছে আলোচনা, অথচ নির্বাসনের কারণ আমাকে না জানিয়ে মসিবে’ ত্রিয়ার’ রাষ্ট্রসভার সভ্য এবং সাংবাদিকদের নিকট তথ্যটি প্রকাশ করেছেন।

গত আগষ্ট মাসে মাস’ই-এর অদূরে একদল বিজোহী রূপ সৈন্ত তাদের কর্ণেলকে হত্যা করেছিল। অনুসন্ধানের ফলে জানা গেল যে, এই হত্যাকাণ্ডে জড়িত সৈন্তদের কাছে আমার সম্পাদিত “নাশে স্লোভা” সংবাদপত্রটি আবিষ্কৃত হয়েছে। মসিবে’ ত্রিয়ার’ এই আবিষ্কারের সংবাদ করেকজন রাষ্ট্রসভার সভ্যের নিকট বলেছেন এবং তারা এই হুসংবাদটি রাশিয়ার ধনতান্ত্রিক সংবাদপত্রের নিকট সাংলংকারে প্রেরণ করেছেন।

একথা সত্য যে, মসিবে’ ত্রিয়ার’ “নাশে স্লোভা”কে এই হত্যাকাণ্ডের জন্য দায়ী করতে সাহস করেন নি, কারণ “নাশে স্লোভা” পত্রিকার প্রত্যেকটি সংবাদ তার অনুমতি নিয়ে প্রকাশিত হয়েছে। তবে মসিবে’ ত্রিয়ার’ মনোভাব অনেকটা এইরূপ :—রাশিয়ার সৈন্তদল করাসী দেশে অবস্থান কালে “নাশে স্লোভা”র মতন সমাজতান্ত্রিক সংবাদপত্র জনসাধারণকে উত্তেজিত করে তুলবে; সুতরাং ঐ পত্রের সম্পাদক-বঙলীকে গণতান্ত্রিক করাসী দেশ থেকে বিতাড়িত করা প্রয়োজন। যে সমাজতান্ত্রিক সংবাদপত্র সাম্রাজ্যবাদের সাহায্যে কাল্পনিক এবং বিখ্যা সংবাদ প্রচার করতে অস্বীকার করে, সে হয়ত রাশিয়ার সৈন্তদের মনকে স্বাধীন চিন্তা করতে শেখাতে পারে। সৈন্তদের পক্ষে স্বাধীন চিন্তা করা রাষ্ট্রের পক্ষে মঙ্গলজনক নয়।

হৃদ্যপ্যের বিষয় এই যে, মসিবে’ ত্রিয়ার’ ব্যাখ্যার মধ্যে বিপরীতার্থক কথা রয়েছে; একবৎসর পূর্বেই করাসীমন্ত্রী হার্ভে রাশিয়ার আজ্ঞা-প্রার্থীদের বিষয়ে প্রচার করেছিলেন যে, যদি তাদের নির্বাসিত করা হয় তবে করাসী জনসাধারণ সেই সিদ্ধান্ত বিনাশ্রদ্ধিভাবে গ্রীকার করে

নেবে। হুতরাং কর্ণেল হত্যার সঙ্গে কি এই নির্কাসনের বিশেষ সম্বন্ধ আছে? অধ্যাপক ডুর্কহাইম বলেছিলেন যে “নাশে রোজা” ও তার সম্পাদকের নির্কাসন আসর।

রাশিয়ার কর্ণেলের হত্যা এবং অধ্যাপক ডুর্কহাইমের বিবৃতির মধ্যে একটি মিলন আছে। আমাদের সম্পাদকমণ্ডলী এই ঘটনার বিষয় অনুসন্ধান করে প্রমাণ পেয়েছেন যে, রাশিয়ার সৈন্তগণকে গুলুগর এই কার্যে প্ররোচিত করেছিল। ফরাসী রাষ্ট্র সাধারণভাবে রাশিয়ান আশ্রয়ার্থী সৈন্তদের আতিথেয় বশিত করে দেশ থেকে তাড়িয়ে দিতে পারে না, হুতরাং তাদের বিতাড়িত করতে হলে একটা বিশেষ কারণ দেখাতে হবে। যে সৈন্তদল তাদের সেনাপত্রিক হত্যা করতে পারে, তাদের উপস্থিতি যুদ্ধনিরত ফরাসীদের পক্ষে বিপজ্জনক। রাশিয়ান আশ্রয়ার্থী সৈন্তদল ফরাসীদেশে অবস্থিত অতিথি। অবশ্য এই প্ররোচক গুলুগর রাশিয়ার জারেরই নিহৃত লোক।

জুলে গুয়েনা, আপনি ফরাসী সাধারণতন্ত্রের মন্ত্রী। আপনি ইচ্ছা করলে এই বিবরণের জন্ত একটা অনুসন্ধান সমিতি নিযুক্ত করতে পারেন। তবে আমার বিশ্বাস এবং বোধহয় আপনারও বিশ্বাস, অনুসন্ধানের ফলে কোন কাজ হবে না। কারণ রাশিয়ান জার ও ফরাসী রাষ্ট্রের মধ্যে সাম্রাজ্যবাদী ঐক্য রয়েছে।

এই যুদ্ধের প্রথমভাগে অবশ্য আপনার বন্ধু “সেমবত” ফরাসী-মন্ত্রী রূপে রাশিয়ান বিপ্লববাদীদের সঙ্গে রাশিয়ান জারের একটা বোঝাপড়ার চেষ্টা করেছিলেন এবং সেই উদ্দেশ্যে বিপ্লবীদের অনেক প্রলোভনও দেখিয়েছিলেন।

বিগত ছাত্রিণ মাস ধরে রাশিয়া, ইংলণ্ড, ফ্রান্স যুদ্ধের হযোগে একত্র কাজ করেছে। ইংলণ্ড, ফ্রান্স ও রাশিয়ার শাসনতন্ত্রকে একটু উপাশ্রয়বাপন করতে চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু ফল বিপরীত হয়েছে। কারণ রাশিয়ান জারতন্ত্রই ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের শাসনতন্ত্রকে জার-ভাবাপন্ন করে তুলেছে। এই দুই দেশেই পুলিশ এবং সৈন্তদেরই অবাধ রাজত্ব।

লয়েড জর্জ এবং মসিরে’ ত্রিরা’ বর্তমান যুদ্ধ পরিচালনা করছেন। মনে পড়ে জুলে গুয়েনা, আপনি আপনার প্রথম জীবনে এই দুই জনের সম্বন্ধে কি অভিমত প্রকাশ করেছিলেন? এই দুইটা প্রাণী বর্তমান যুদ্ধ পরিচালনা করছেন। এই দুইজনই যুদ্ধের ভালমন্দ নীতি-নীতি, ব্যক্তি ও সমস্ত সংঘাত নির্ধারণ করছেন। রুশ-জার্মানসন্ধান টুরমার রাশিয়ার প্রাচীনপন্থীদের প্রতিফলন রাষ্ট্রপতি পরিচালনা করছেন। ইংলিশ লয়েড জর্জ, ফরাসী মসিরে’ ত্রিরা’ এবং রাশিয়ান টুরমারের অপূর্ণ মিলন—ত্রিহুতির সমন্বয়। অবশ্য ফরাসী মন্ত্রী জুলে গুয়েনা এই তিনজনের অসুপ্রেরণার অসুপ্রাণিত। আপনি কি মনে করেন যে কোন বর্ষা সমাজতন্ত্রীবাণী আপনার ও আপনার কর্ত্তের বিরোধিতা না করে থাকতে পারে? আপনি ফরাসীদেশের সমাজ-তন্ত্রীদের বিরুদ্ধে জেদে দিচ্ছেন। তারা আজ ধনতান্ত্রিকদের সঙ্গে মিলিয়ে ধনিক সমাজের জয়যাত্রা গান গেয়ে চলেছে। অথচ ৯ জন্মভূমি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ফরাসীদেশে নৃতন বাসভূমি রচনা করেছে

জুলে গুয়েনা একদিন ধনতন্ত্রীদের কি ভীষণ বিরুদ্ধাচরণ করেছিলেন! মনে পড়ে অতীত দিনের অনেক কথা।

এই বিগত দুই বৎসরের যুদ্ধে মানুষকে কত দুঃখ, দুর্দশা, অন্ডার, অত্যাচার, কত রক্তপাত সহ্য করতে হয়েছে। রাষ্ট্র প্রজার সম্পত্তি লুণ্ঠন করেছে; প্রজার নিকট সহস্র অপরাধ করেছে, অবশ্য আমরা ভবিষ্যৎবাণী করেছিলাম যে এই যুদ্ধ এই রকমই হবে। জুলে গুয়েনা, আপনি ফরাসী জনসাধারণকে অবশ্য একটা গর্বের কথা বলতে পারেন যে, ফরাসীজাতি জার্মান উইলিয়াম কাইজার এবং অস্ট্রিয়ান ফ্রান্সিস জোসেফের মতন অপরাধী নয়; জার নিকোলাস এবং মসিরে’ পয়কার আন্তর্জাতিক যুদ্ধ নীতিগুলি জার্মানী অস্ট্রিয়ার মতন নির্দমনভাবে পদমলিত করেন নি।

ফরাসীদেশে একটা নতুন শ্রমিকদল গড়ে উঠেছে; যুদ্ধের উদ্ভাবনার ভিতর দিয়ে তাদের জাগরণ এসেছে; এই ‘বিপ্লবাব্যাপী যুদ্ধের সম্বন্ধে মসিরে’ পয়কার এবং ত্রিরা’ যা’ বলতে চান তার বেনী ফরাসী জনগণ জানতে পারে না। আপনি জুলে গুয়েনা, আপনি না একদিন এই দরিদ্র জনগণের নেতা ছিলেন! আর আজ আপনি ত্রিরা’র পদতলে নিজের মস্তককে বিসর্জন দিয়েছেন। আপনি প্রাণী-সংগ্রামের অন্তরালে যা’ কিছু লিখেছিলেন, তা’ আজ সাম্রাজ্যের চরণে উৎসর্গ করেছেন।

ফরাসী সমাজতন্ত্রপ্রাণের গৌরবময় ইতিহাস কি আপনি বিশ্বাস করেন? শক্তিশালী বাহিনী যুদ্ধের জন্ত বাহ রচনা করে গেছেন কত বীর এই আদর্শের জন্ত আত্মত্যাগ করে গেছেন, কিন্তু আ! তাদের কি অধঃপতন!

যে ফরাসীদেশ সেটসাইমন, ফুরিয়ে, ব্র্যাক, কমিউনে, জুরে বাবিল্লু সমাজতন্ত্রকে গড়ে তুলেছিলেন—তাদের মধ্যে জুলে গুয়েনাও আছেন। তাদেরই একজন আলবার্ট টমাস রাশিয়ার রোমান সম্রাটদের সঙ্গে কনসতান্টিনোপল অধিকার করার ষড়যন্ত্র করছেন তাদেরই একজন সেমবাত ফরাসী সভ্যতার ধ্বংসস্তম্ভের উপরে তাঁর তরল ধনতান্ত্রিক সভ্যতার প্রামোদকানন রচনা করেছেন। ফরাসী দেশের সমাজতন্ত্রী সম্ভান জুলে গুয়েনা আজ মসিরে’ ত্রিরা’ বিপ্লবশক্তির চক্রনেমিরেণা অনুপ্রাণিত করে চলেছেন।

শাসক সম্প্রদায় এই নির্দম যুদ্ধের অবসরে ফরাসী জনগণের শে রক্তবিন্দু শোষণ করে নিয়েছে। তারা কি আজ এই অত্যাচার কি প্রতিবাদে অবনত হস্তকে গ্রহণ করে নেবে? আপনি ভুল করছে—প্রতিবাদ আরম্ভ হয়ে গেছে। সামরিক বিধান সম্বন্ধে যুগে জাতীয়তার উজ্জ্বল সম্বন্ধে, সকল ফরাসী সভ্যদের মধ্যেই বিজ্রোহ বীজ অংকুরিত হয়েছে।

আপনি “নাশে রোজা” সংবাদপত্রের কর্ত্তরোধ করেছেন, কিং এই সংবাদপত্রবাণী ফরাসী সমাজতন্ত্রের আবেষ্টনীর মধ্যেই পরিবর্তিত হয়েছে। ‘নাশে রোজা’ রাশিয়াতে লক্ষ্যবস্তু করেছে সভ্য, কিন্তু তা

পনি তার কঠোর করলেও সে করাসী আন্তর্জাতিক সমাজতন্ত্রীদের  
একশ করছে অবশ্য অত্যন্ত অসম্পূর্ণ ও প্রচুরভাবে। আমরা  
বাহ্যিক প্রবাসী" রূপে বিরুদ্ধবাদীদের সঙ্গে আমাদের ভাগ্য একত্রে  
খিত করেছি। তবুও আমরা গর্বিত যে আমরাই করাসী রাষ্ট্রের  
ঐশ্বর্য আখ্যাত সহ করেছি—অবশ্য সে আখ্যাত জুলে গুয়েদার হাত  
কেই এসেছে।

আমরা জার্মানদের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন বলে অভিযুক্ত হয়েছি।  
পনিও একদিন এই অপরাধে অভিযুক্ত হয়েছিলেন। আপনাদের  
অভিযুক্ত হয়েছিলেন প্রেহানভ। আজ আপনাদের কি দুর্ভাগ্য।  
আপনাদের স্বাক্ষরিত, আপনার মুদ্রিত আদেশপত্র দেশরক্ষার অন্তরালে  
সমাজতন্ত্রীদের অভিযুক্ত করছে, তাদের কারাগারে আবদ্ধ করছে।

আমি শুনলাব, জার্মানিতে আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হয়েছে  
বং আমার রচিত "যুদ্ধ ও আন্তর্জাতিকতা" নামক প্রবন্ধের জন্য আমাকে  
শ্রুতি দেওয়া হয়েছে। জার্মান রাষ্ট্র বলছে, টুটস্কী জার্মান-হোহী।

আপনারা এ বিষয় নিঃসন্দেহ থাকতে পারেন যে আমরা সমাজতন্ত্রী  
প্রবন্ধাবলিগণ প্রতিক্রিয়াশীল জার্মানিজাতির পক্ষে ভীষণতম শত্রু।  
ত ভাষণ যে আপনাদের সমবেত সমস্ত শক্তি অপেক্ষা আমরা  
জার্মানিজাতির পক্ষে অধিকতর ভয়াবহ। আপনাদের মিত্রশক্তির  
ক্ষমতার পক্ষেও রয়েছে প্রতিযোগিতার প্রতিদ্বন্দ্বী মনোবৃত্তি; আপনাদের  
রত বার্ষিক প্রয়োজনে বন্ধুত্বপূর্ণে আবদ্ধ হতে পারেন। কিন্তু আমরা  
জার্মান শাসকসম্প্রদায়কে অন্তরের সঙ্গে ঘৃণা করি। শাসকশ্রেণীর  
বিরুদ্ধে আমাদের—বিরোধীত্ব ঘৃণার কখনো নিবৃত্তি হবে না।

আজকের শত্রু আগামীকাল আবার সাম্রাজ্যবাদের প্রয়োজনে বন্ধু  
য়ে যেতে পারে। যদি জার্মান সাম্রাজ্য ধ্বংসের নীতি গ্রহণ করে,  
বে হয়ত দশ বৎসর পরে ইংলণ্ড, ফ্রান্স এবং রাশিয়া বন্ধুত্বপূর্ণে  
হলে যাবে। হয়ত একজন নতুন পরাকার জন্মাবেন যিনি কাইজার  
ইলিয়াসের সঙ্গে তারবার্তা প্রেরণ করে অভিনন্দন বিনিময় করবেন।  
এত আর একজন লয়েড জর্জ ধর্মযাজকের ভাষণ মনোজ্ঞার মতন  
শ্রুতপন আফালন করে রাশিয়াকে অভিসম্পাত করবেন; হয়ত বা  
রাসী রাজপুত্র আলবার্ট টমাদের মতন জার্মান রাজপুত্রপুত্রিকার হস্ত  
থেকে বন্ধুত্বের আরকচিহ্নরূপে বেতপত্রও গ্রহণ করবেন। এই তো  
জান্নীতির সহজ কথা।

আর আমরা যেমন আছি তেমন থাকবো। জার্মান শাসকদের  
প্রতিজ্ঞা শত্রু আমরা। কারণ আমরা রাশিয়ান জারতন্ত্রকে যেমন  
ণা করি, তেমনি ঘৃণা করি করাসী ধর্ষিতত্বকে—তার চেয়ে বেশী  
ণা করি প্রতিক্রিয়াশীল জার্মানিকে। আপনি এবং আপনার  
রচিত সংবাদপত্রগুলি জার্মান সাম্রাজ্যবাদীদের শত্রুর প্রতি এসম  
বং তাদের প্রাণসার পক্ষপুষ। আমরাও জার্মান সাম্রাজ্যবাদীদের  
শত্রু। হুতরাং আমরাও তাদের সমপর্যায়ে দাঁড়িয়ে আছি। আমাদের  
দে তাদের বোণপুত্র রয়েছে। সম্ভবতঃ আপনারা ধারণা করেন  
ব, আমরা সংখ্যার অত্যন্ত অল্প; আপনার পুলিশের ধারণা আমাদের

সংখ্যা সবচেয়ে বার্ষিক নয়। পুলিশ তাদের ভৃত্যের দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে  
বিশ্রোহের অন্তরাচার উৎসের সম্মান পায় না। তারা বুঝতে পারে  
না যে, হুংগের আশ্রয় থেকে যে ফুলিফ বেরিয়ে আসে তাই পরে  
বিশ্রোহ-বহিরূপে বিস্তার লাভ করে। করাসী দেশের এতোক অমিকের  
কুটীরে, এতোক কুম্বের ঘরে, এতি বিশপীর একোঠে, বুদ্ধব্রজের  
এতোকটি পরিখা থেকে হুংগের অনল জ্বলে উঠছে।

জুলে গুয়েদা! আপনি করাসী নারী সমাজতন্ত্রীদের নারিক  
সুইজা হুম্বনকে কারারুদ্ধ করেছেন, কারণ তিনি বুদ্ধের প্রতিবাদ  
করেছেন। তার ফলে করাসী নারীদের মধ্যে হতাশা হ্রাস হয়েছে  
কি? করাসী পুলিশ বুদ্ধের নামে কত করাসী সম্মানকে কারারুদ্ধ  
করেছে তার ইয়ত্তা আছে কি? বুদ্ধের পরে করাসী নারী তার স্বামী  
কিরে পাবে কি? স্বামী তার পুত্র কির পাবে কি? সম্মান তার  
স্নেহময় পিতার ক্রোড় কির পাবে কি? আজ বারা করাসী  
জাতিকে প্রতারিত করেছে, প্রতারিত করাসী জাতি তাদের কখনো  
বিশ্বাস করবে কি?

বন্ধু জুলে গুয়েদা—আপনি আপনার সাময়িক চক্রবান পরিত্যাগ  
করুন। ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্র আপনাকে যে কারার অবরুদ্ধ করেছে তা  
পরিত্যাগ করুন। একবার আপনার চতুর্দিকে দৃষ্টিপাত করুন। হয়ত  
ভাগ্য আপনার প্রতি এসম হতে পারে। আপনার জীর্ণ কারাগৃহের  
বাহিরে দাঁড়িয়ে শুনুন—মনাগত যুগের ঘটনাবলির শব্দ গর্জন। ঐ  
সেই ধ্বনির অক্ষুট আর্দ্রনাভ, আমরা তাকে সাদর সম্ভাষণ জানাচ্ছি।  
আমরা তাদের অভিনন্দনের জন্য প্রস্তুত হচ্ছি। যদি প্রমিক জনগণ  
প্রতিশোধের জন্য বদ্ধপরিকর হয়, আমাদের সম্ভাষ্যাত্মী প্রতিশোধ গ্রহণ  
করে, তবে করাসী ধনতন্ত্রের অবস্থা কল্পনা করতে পারেন কি? সে  
দিন করাসী দেশে জুলে গুয়েদার স্থান হবে না, আপনার কর্তৃত্ব সেদিন  
নিশ্চয় হয়ে যাবে।

আপনার আদেশে আমি নির্বাসিত হয়ে করাসী দেশ ত্যাগ করে  
যাচ্ছি। আমার বিশ্বাস আছে শেষ পর্যন্ত আমরা জয়ী হব। আপনাকে  
আমি অতিক্রম করে ফরাসী দরিদ্র জনগণকে অভিনন্দন জানাচ্ছি।  
তারা যে আজ নিজদের ভবিষ্যৎ সম্পক্ষে আগ্রহী, আপনাকে উপেক্ষা  
করে, আপনার বিরোধিতা সহ্যও সমাজতন্ত্রী করাসীদেশ দীর্ঘজীবী  
হউক।" ইতি—  
লিয়োঁ টুটস্কী,—

পত্র পরিণাম :—

লিওন টুটস্কীর জন্ম ১৮৭৭ সালে, ২১ বৎসর বয়সে ১৮৯৮ সালে  
টুটস্কী বিরোধীত্ব কার্যের জন্য সাইবেরিয়া প্রান্তরে নির্বাসিত হন।  
১৯০৫ সালে টুটস্কী রাশিয়াতে প্রত্যাবর্তন করেন এবং সেটপটার্স-  
বার্গের সোভিয়েট দলের সভাপতি নিযুক্ত হন। তিনিই প্রথম "চিরন্তন  
বিশ্ব" (Permanent Revolution) পরিচালনা করেন কারণ  
তার মতে একটা রাজ দেশে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা হলেই সমাজতন্ত্রের  
সফলতা হবে না, বিশ্বব্যাপী সমাজতন্ত্র স্থাপিত না হলে এই আদর্শের

কোন হুলা নাই। ট্রট্‌স্কী আবার কারারুদ্ধ হলেন। আবার পলায়ন করলেন—এবার ভিয়েনার। সেই সময় থেকে তিনি অবিভ্রান্ত ভাবে বিশ্লবাস্তব কর্ণে নিজকে নিরোজিত করলেন—তিনি আদর্শ প্রচার করেছেন, পত্রিকা সম্পাদন করেছেন, ১৯১৭ সালের বিজ্ঞান পরিচালনা করেছেন, লেনিনের সহযোগিতা করেছেন, আবার নির্বাসিত হয়েছেন, তাঁর জীবনের সঙ্গে রাশিয়ার বিজ্ঞান অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত, তিনি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা দিয়ে “রুশ বিজ্ঞানের ইতিহাস” রচনা করলেন। যে ঘটনা তিনি হুট করেছেন—সেই ঘটনার ইতিহাস তিনি রচনা করেছেন। হুতরাং ব্যক্তিগত স্পর্শ সেই ইতিহাস হয়ে উঠেছে জীবন্ত, এই ইতিহাসের মধ্যে পাই—“অতীতের সঙ্গে ভবিষ্যতের তীব্র সংঘাতের গভীর গর্ভন।”

১৯২৩ সালে লেনিনের মৃত্যুর পর ১৯২৭ সালে ট্রট্‌স্কীকে স্ট্যালিন দল থেকে বহিস্কৃত করলেন। তার পর তাঁকে তুর্কীস্থানে নির্বাসিত করা হল।

অতীতের পরিবর্তে ১৯১৩ সালের করাশী বিবেচনা ১৯২২ সালে পরিবর্তিত হয়ে ট্রট্‌স্কী পুনরায় করাশীদেশে বাস করবার অধিকার পেলেন। তিনি প্যারিসের উপকণ্ঠে বাস করতে আরম্ভ করলেন। কিন্তু বুদ্ধিমান স্ট্যালিন করাশী সরকারের নিকট অভিযোগ করলেন—ট্রট্‌স্কী কিরভের হত্যাকাণ্ডের জন্ত দারী। ট্রট্‌স্কী স্ট্যালিনের শত্রু, ট্রট্‌স্কী অভিযোগ করলেন, “স্ট্যালিন রাশিয়ার বিজ্ঞানের বিরুদ্ধে বিরোধিতা করেছেন, স্ট্যালিন বিশ্বাসঘাতক।” এই আঘাত প্রতিবাদের পর ট্রট্‌স্কী পুনরায় চললেন বাবারের মতন। পৃথিবীর কোথাও তাঁর আশ্রয় নেই, পরে ১৯৩৬ সালে তিনি সাময়িকভাবে আশ্রয় পেলেন নরওয়ে দেশে। এক বৎসর পরে ১৯৩৭ সালে মেক্সিকোতে বিশ্রাম-আবাস স্থাপন করলেন। তিন বৎসর পরে হেক্স মারসড্‌ তাঁকে হত্যা করল। ট্রট্‌স্কীর বিশ্বাস, এই হত্যার মূলে রয়েছে স্ট্যালিনের প্রচুর হস্ত। ট্রট্‌স্কীর সর্বশেষ বাণী ছিল—“আমাদের বন্ধুদের বলুন, আমি চতুর্থ আন্তর্জাতিক এর সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ। এগিয়ে চলুন।”

## রহস্যময়ী

### শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়

বল দেখি দেখা হোল কত দিন পরে ?  
কত দিন ? মনে হয় যেন যুগান্তরে  
ছিলে তুমি একান্ত নিকট মোর।  
কখন না জানি কেন কাটিয়া বন্ধন-ডোর  
চলে গেলে কোথায় না জানি ;  
দুঃসহ দিনের তিক্ত জীবনের মানি  
বহিয়া এগাম একা।  
অনেকের সাথে মোর পথে হোল দেখা,  
দেখিছ নিকটে মোর ; অশান্ত চিত্তের অন্তরালে  
তুমি যেন পা বাড়ালে  
অতি সন্তপণে ;  
তাই বুঝি মনের দর্পণে  
পড়েছে তোমার ছায়া বারবার সচকিয়া মোরে।  
তাই কি স্বপ্ন ঘোরে  
ডেকেছি তোমারে বারেরবার  
মুগিয়া রেখেছি দ্বার—

আশা ছিল যদি কোনও দিন  
শোভাসুন্দর আরাম বিহীন  
আমার এ শূন্য ঘরে ফিরে আস নিতান্ত খেয়ালে,  
দাপ-নির্বাপনের আগে ছায়া তব পড়িবে দেয়ালে।  
সেদিকে চাহিয়া মোর পরিজ্ঞাত আঁখি  
তোমা পানে উন্মীলিত থাকি  
আশা ভ'রে হবে কম্পমান,  
পলকে পলক হ'বে যেন শতবর্ষের সমান।  
ছায়া যদি ক'রা হ'বে কিরিয়া পাঁড়ার  
সে মুহূর্ত্তে মন যদি আপনা হারার  
তবুও ত আমার সম্মুখে  
পরিচিত সে স্বপ্নের মুখে  
দীপ শিখা দিবে তার আলো  
ভাল ক'রে দেখে লব কী বাধুর্ঘ্য আমারে তুলালো,  
তুলালো সংসার মোর তুলাইল আমার তুবন  
নয়নে প্রচ্ছন্ন তব কী সে রহস্ত-প্রসবণ।





নবম পরিচ্ছেদ

রাজপুরীতে

রপুরীর প্রাকার-বেঠানীর মধ্যে অনেকগুলি প্রাসাদ  
হে; কোনটি সভাগৃহ, কোনটি কোষাগার, কোনটি  
শান্তন; একথা পূর্বে বলা হইয়াছে। রাজকন্যা বে  
সাদে বাস করেন তাহা অবরোধ; তাহার পাশে রাজার  
পৃথক ভবন। উভয় প্রাসাদের মধ্যে অলিম্বে  
দ্বাগ; উভয় প্রাসাদ ত্রিভূজক।

রাজপ্রাসাদের নিম্নতলে এক পাশের কয়েকটি কক্ষ  
সমিধাতা হর্ষের বাসস্থান। রাজ বৈভবের তুলনায়  
অপকৃষ্ট হইলেও সাধারণ মাহুদের পক্ষে ঐশ্বর্ষের  
সম। কক্ষকী লক্ষণ চিত্রককে এইখানে আনিয়া  
ধিষ্ঠিত করিল।

চিত্রক আস্তে আস্তে আসন পরিগ্রহ করিতে না  
রিতে কক্ষকীর ইচ্ছিতে কয়েকটা অস্বরাভূতি সম্বাহক  
সিয়া তাহাকে ধরিয়া ফেলিল এবং তাহাকে প্রায় উল্ল  
রিয়া সর্বদে সবেগে তৈল মর্দন করিতে আরম্ভ করিয়া  
ল।

অন্তঃপর চিত্রক শীতল জলে স্নান করিয়া নববস্ত্র পরিধান  
রিল; অঙ্গে চন্দন প্রলেপ দিয়া আহারে বসিল। প্রচুর  
ষ্টক পৌলিক মোদক পরমায়ের আয়োজন, তত্পরি  
ক্ষুধীর সত্বনয় নির্বন্ধ। চিত্রক আকর্ষিত হইয়া ভোজন  
রিল।

তারপর শরতের মেঘশ্রবণ শব্দায় শবন। হুইজন  
হাশিত আসিয়া অতি আরামদায়ক ভাবে হস্তপদ টিপিয়া  
িতে লাগিল। এই আলতস্থ হুইজিতক উপভোগ  
রিতে করিতে, পুরুষ ভাগ্যের বিভিন্ন ভূজক-পতির কথা  
জ্ঞা করিতে করিতে চিত্রক ঘুসাইয়া পড়িল।

ওদিকে সচিব চতুরানন ভট্ট মগধের লিপি পাঠ

# কালের মন্দিরা

শ্রী শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

করিয়াছিলেন। তাঁহার আশঙ্কা মিথ্যা হয় নাই, রাষ্ট্র-  
নৈতিক শিষ্টাচার লঙ্ঘন না করিয়া বতথানি রূঢ়তা প্রকাশ  
করা বাইতে পারে ততথানি রূঢ়তার সহিত লিপিতে  
বিটকরাজ্যের উপর নির্দেশ প্রেরিত হইয়াছে—বিটকরাজ  
অচিরাত্ মগধের সার্বভৌমত্ব স্বীকার করিয়া বক্সী রাজত্ব  
অর্পণ করুন; নচেৎ হুগহরিণকেশরী সম্রাট ক্রন্দগুপ্ত স্বয়ং  
সম্মুখে গান্ধার অভিযুখে বাইতেছেন, ইত্যাদি।

পত্র পাঠ করিয়া চতুর ভট্ট দীর্ঘকাল গভীর চিন্তায়  
মগ্ন রহিলেন; তারপর অল্প সচিবদের ডাকিয়া মন্ত্রণায়  
বসিলেন। শ্রেনপক্ষীর সহিত চটকের প্রতিস্পর্ধিতা সম্ভব  
নয়; চটকের পক্ষে হিতকরও নয়। কিন্তু রাজনীতির  
ক্ষেত্রে বাহুবলই সর্বশ্রেষ্ঠ, কূটনীতিও আছে। ক্রন্দগুপ্ত  
নূতন হুগ অভিযান প্রতিরোধ করিবার জন্য গান্ধারে  
আসিতেছেন; ঘোর যুদ্ধ বাধিবে; দীর্ঘকাল ধরিয়া যুদ্ধ  
চলিবে; শেষ পর্যন্ত ফলাফল কিরূপ দাঁড়াইবে কিছুই বলা  
যায় না। সুতরাং অবিলম্বে মগধের বশতা স্বীকার না  
করিয়া ছলছুতা দ্বারা যদি কালহরণ করা যায়, হয়তো  
অন্তে সফল ফলিতে পারে। একদিকে হুগ, অন্য দিকে  
ক্রন্দগুপ্ত; এ অবস্থায় যথাসাধ্য নিরপেক্ষতা অবলম্বনই  
যুক্তি।

সচিবগণ একমত হইয়া মনস্থ করিলেন, পত্রের উত্তর  
দানে যথাসম্ভব বিলম্ব করা হোক; দূতটাকে বলা বাক,  
মহারাজ কপোতকূটে বতদিন না কিরেন ততদিন পত্রের  
উত্তর দান সম্ভব নয়। ইতিমধ্যে মহারাজ রোষ্টিকে সব  
কথা জানাইয়া বার্তা প্রেরণ করা আবশ্যক। তিনি এখন  
চন্দনহুর্গেই থাকুন, রাজধানীতে কিরিবার কোনও তাড়া  
নাই। কিন্তু এত বড় গুরুতর সংবাদ তাঁহার গোচর করা  
সর্বাগ্রে কর্তব্য।

এইরূপ মনোনীত হইলে পর দ্রুতগতি তুরঙ্গপৃষ্ঠে  
চন্দন হুর্গে বার্তাবহ প্রেরিত হইল।



ময়গৃহে বধন এই সকল রাজকাৰ্য চলিতেছিল, কুমারী রত্না তখন নিজ ভবনে ছিলেন। আজ নানা কারণে তাঁহার মন কিছু উদ্ভ্রান্ত হইয়াছিল। প্রথমেই স্বপ্ন দেখিতে দেখিতে আগরণ; তারপর চোর বাটতি ব্যাপারের অক্লান্ত পরিসমাপ্তি। মগধের দূত...মগধ...বিশ্ববিক্রম পটিলপুত্র নগর...দিগ্বিজয়ী বীর স্বল্পশুভ...দূত নিজের কী নাম বলিয়াছিল? চিত্রকবর্মা! চিত্রক... চিত্র ব্যাঘ্র...ব্যাঘ্রের সহিত কোথাও যেন সাদৃশ্য আছে...চোখের দৃষ্টি বড় নির্ভীক...

সর্বশেষে সুরগোপার মাতার উদ্ধার। সুরগোপার মাতা প্রাক্তন রাজপুত্রের ধাত্রী ছিল, কুমারী রত্না তাহা জানিতেন। অভাগিনীর এই দুর্দশা হইয়াছিল? সকলের অজ্ঞাতে পচিশ বৎসর বন্দিনী ছিল! কেমন করিয়া বাঁচিয়া ছিল; কে তাহাকে আহার দিত? পুথার দুয়দুয়ের কথা ভাবিয়া রত্নার ঘন ঘন নিশ্বাস পড়িল। উঃ, পচিশ বৎসর পূর্বে হুণেরা কি বর্বরতাই না করিয়াছিল। রত্না হুণ-দুহিতা, তবু—

সুরগোপা মাতাকে উদ্ধার করিয়া কাদিতে কাদিতে গৃহে লইয়া গিয়াছিল। সুরগোপা বড় কান্না কাদিয়াছিল, শ্রবণ করিয়া রত্নার চোখেও জল আসিল। তাঁহার ইচ্ছা হইল সুরগোপার গৃহে গিয়া তাহাকে দেখিয়া আসেন। সুরগোপার গৃহে তিনি বহুবার গিয়াছেন, যখন ইচ্ছা করিয়াছেন। কিন্তু আজ বাইতে তাঁহার সঙ্কোচ বোধ হইল। প্রিয়সখি সুরগোপা মৃতকন্না মাতাকে পাইয়া তুমুল ক্রন্দনাবেগের আবর্তে নিমজ্জিত হইয়াছে, এখন রত্না তাহার কাছে বাইলে সে বিভ্রান্ত হইবে, বিভ্রত হইবে—

মধ্যাহ্ন অতীত হইবার পর রত্না গ্রহাচার্যকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। গ্রহাচার্য আসিলেন; স্বপ্ন-কথা শুনিয়া তিনি প্রশংসনীয় আঁক কবিলেন, দিকনির্ঘ্ন করিলেন, লগ্ন নির্ধারণ করিলেন। তারপর ফলাদেশ করিলেন,— ‘কল্যাণি, তোমার জীবনের এক মহা সন্ধিক্ষণ উপস্থিত। কিন্তু শঙ্কিত হইও না; অন্তে ফল শুভ হইবে। এক দিগ্নাগ-সদৃশ মহা-ভেজস্বী পুরুষের সহিত তোমার পরিচয় বাটবে; এই পুরুষসিংহ তোমার প্রতি প্রসন্ন হইবেন। তোমার বিবাহের কালও আসন্ন। শুভমস্ত।’ গ্রহবিপ্রের

ভাবে গতিক দেখিয়া মনে হইল তিনি সব কথা শুলিয়া বলিলেন না, কিছু চাপিয়া গেলেন।

তিনি বিদায় হইলে রত্না দীর্ঘকাল করলম্ব কপোলে বসিয়া রহিলেন; শেষে নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া ভাবিলেন— নিয়তির বিধান যখন অখণ্ডনীয় তখন চিন্তা করিয়া লাভ কি?

ক্রমে অপরাহ্ন হইল।

ওদিকে চিত্রক দীর্ঘ দিবানিত্যের পর আগিয়া উঠিয়াছে শরীর বেশ স্বচ্ছন্দ; গত কয়েকদিনের নানা ক্লেশজনিত মানি আর নাই। তাহার মনেরও শরীরের অল্পপায়ে প্রফুল্ল হওয়া উচিত ছিল; কিন্তু চিত্রক অল্পভব করিল তাহার মনপ্রফুল্ল না হইয়া বরং ক্রমশ উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিতেছে

রাজপুত্রীর আদর আপ্যায়নে সে অভ্যস্ত নয় উপরন্তু কণ্ঠকী লম্বণ যেন একটু অধিক পরিচা করিতেছে। সে দণ্ডে দণ্ডে আসিয়া চিত্রকের স্নান স্নানোদ্যের সন্দেশ লইতেছে; তদুপরি তাহার কয়েকটি অল্পচর সর্বদাই চিত্রককে বেঁঠন করিয়া আছে। কে ব্যজন করিতেছে, কেহ শীতল তরু বা ফলাগ্নরস আনি সন্মুখে ধরিতেছে, কেহ বা তাশুল দিতেছে। বহুর্ভে জগৎ সে একাকী থাকিতে পাইতেছে না। তাহা সন্দেহ হইল, এই সাড়ম্বর আপ্যায়নের অন্তরালে অদৃশ্য জাল তাহাকে ঘিরিয়া রহিয়াছে। সে মনে মনে অতি হইয়া উঠিল। হঠতাবশে রাজকুমারী রত্নার নিমন্ত্রণ গ্রহ না করিলেই বোধ হয় ভাল হইত।

সন্ধ্যার প্রাক্কালে চিত্রক মনে মনে একটি সঙ্কল্প দি করিয়া গাত্রোথান করিল। উত্তরীয় স্বন্ধে লইতেই এ কিস্কর ঘোড়হস্তে আসিয়া সন্মুখে দাঁড়াইল—‘কি প্রয়োজন আদেশ করণ আৰ্হ-আপবেহু।’

চিত্রক বলিল—‘বহির্ভাগে পরিভ্রমণ করিবার ইচ্ছা করিয়াছি। বায়ু সেবনের প্রয়োজন।’

কিস্কর পশ্চাৎপদ হইয়া অন্তহিত হইল।

চিত্রক রাজভবনের বাহিরে পদার্পণ করিয়াছে, কোন্ হইতে কণ্ঠকী আসিয়া হাসিমুখে তাহার সহিত যোগ দিল ‘সায়ংকালে বায়ু সেবনের ইচ্ছা হইয়াছে? ভাল ভাল চলুন আপনাকে রাজপুত্রী দেখাই।’ বলিয়া লম্বণ কণ্ঠব লম্বণ ভ্রাতার মতই তাহার সহগামী হইল।

ইজনে পুরতুমির বজ্রভঙ্গ বিচরণ করিতে লাগিল।

বুকিল পুরীর বাহিরে বাইবার চোঁটা বুঝা, সে পুর-  
বাহিরে বাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে কঙ্কু-  
বাধা দিবে না, কিন্তু নিজে সঙ্গে থাকিবে। হুতরাং  
র বাইবার আগ্রহ প্রকাশ না করাই ভাল।

বক্তৃত পুরতুমির স্থানে স্থানে বুক-বাটিকা, লতা-মণ্ডপ।  
বেশী নাই; যাহারা আছে তাহারা অধিকাংশই সমস্ত  
তার কিবা রক্ষা, দুই চারিজন উত্তানপালও আছে।

সকলে নিজ নিজ কার্যে নিযুক্ত।

তত্তত ভ্রমণ করিতে করিতে চিত্রক অস্থতব করিল,  
ছাড়াও অস্ত্র কেহ তাহার উপর লক্ষ্য রাখিয়াছে,  
অলক্ষ্যে থাকিয়া তাহাকে অহুসরণ করিতেছে।  
চকিতে কয়েকবার ষাড় ফিরাইয়া দেখিল, কিন্তু  
মন্ডালোকে বিশেষ কিছু ঠাহর করিতে  
না।

তারপর এক বুক-বাটিকার নিকটে চিত্রক তাহার অদৃশ্য  
গকারীকে মুখোমুখি দেখিতে পাইল। এক বুকের  
ল হইতে একঘোড়া ভয়ঙ্কর চক্ষু তাহার দিকে চাহিয়া  
, হিংসাবিকৃত মুখে জলন্ত ছুটা চক্ষু। চিত্রক চমকিয়া

—‘ও কে?’ সঙ্গে সঙ্গে মূর্তি ছায়ার স্তায়  
গেল।

কঙ্কু বলিল—‘ও গুহ। আপনাকে নতুন মাঘুয  
রা বোধ হয় কোতুলী হইয়াছে।

চিত্রকের গত রাত্রের কথা মনে পড়িল: হাঁ, সেই

কিন্তু গত রাত্রে গুহর চোখে এমন তীব্র দৃষ্টি ছিল  
চিত্রক কঙ্কুকে প্রশ্ন করিলে কঙ্কু সংক্ষেপে  
। গুহর বৃত্তান্ত বলিল। তখন চিত্রক, অন্ধরূপে পৃথার  
যে কাহিনী শুনিয়াছিল তাহার সহিত মিলাইয়া প্রকৃত  
অনেকটা অহুমান করিয়া লইল। গুহই পৃথাকে হরণ  
। কুটরকে লুকাইয়া রাখিয়াছিল, ইচ্ছা ছিল যুদ্ধ শেষ  
কিরিয়া আসিয়া তাহাকে দখল করিবে, কিন্তু মৃত্যুকে  
ত পাইয়া তাহার মূর্তি ভ্রংশ হয়। তবু সে সব কথা  
নাই; কোন অর্ধ-বিত্রাস্ত বৃত্তির দ্বারা পরিচালিত  
গোপনে পৃথাকে খাতি দিয়া যাইত। শতাব্দীর  
ধরিয়া সে এই কাজ করিয়াছে! আশ্চর্য মস্তিষ্কের  
, আশ্চর্য জীবের সহজাত সংস্কার!

ক্রমে দিবাভাগে দুহিয়া গিয়া চাঁদের আলো হুটিয়া  
উঠিল। রাজপুরীর ভবনে ভবনে দীপমালা জলিল।

প্রমোদের এই সন্ধিক্ষণে চারিদিকে চাহিয়া চিত্রকের  
মনে হইল সে এই নির্বাক পুরীতে একান্ত একাকী,  
নিভান্ত অসহায়। কাল বন্দী হইবার পর অন্ধকার  
কারাকূশের মধ্যে তাহার যে অবস্থা হইয়াছিল, আজ  
রাজপুরীর দীপোজ্জ্বলিত প্রাঙ্গণে সে অবস্থার কিছুমাত্র  
পরিবর্তন হয় নাই।

সহসা তাহার অন্তর অসহ্য অধীরতায় ছটকট করিয়া  
উঠিল; সে যেন জল হইতে তীরে নিক্ষিপ্ত মীন। কিন্তু  
সে তাহার মনের অবস্থা সর্বত্র গোপন করিয়া  
কঙ্কু সমভিব্যাহারে নিজ বাসভবনের দিকে ফিরিয়া  
চলিল।

\* \* \*

রাজির মধ্য বামে রাজপুরীর আলোকমালা নির্বাণিত  
হইয়াছিল; শুক্লা চতুর্দশীর চন্দ্র পশ্চিমদিকে চলিয়া  
পড়িয়াছিল। মাঝে মাঝে লঘু মেঘখণ্ড আসিয়া স্বচ্ছ  
আবরণে চন্দ্রকে ঢাকিয়া দিতেছিল।

রাজভবন সুপ্ত; কোথাও শব্দ নাই। চিত্রক আপন  
শয়নকক্ষে শয্যায় লম্বমান ছিল, ধীরে ধীরে উঠিয়া বসিল।  
সে ঘুমায় নাই, কেবল চক্ষু মুদ্রিত করিয়া শয্যায়  
পড়িয়াছিল।

ঘরের এক কোণে স্তিমিত বর্তিকা অস্পষ্ট আলোক  
বিকীর্ণ করিতেছিল; মুক্ত বাতায়ন পথে যুদ্ধ বায়ুর সহিত  
জ্যোৎস্নার প্রতিভাস কক্ষে প্রবেশ করিতেছে। চিত্রক  
নিঃশব্দে পালক হইতে নামিয়া বাতায়নের সম্মুখে গিয়া  
দাঁড়াইল। কোথাও জনমানব নাই; চন্দ্রকালিণ্ড পুরী  
নিথর দাঁড়াইয়া আছে।

চন্দ্রবিধ স্বচ্ছ মেঘে ঢাকা পড়িল; বহির্দৃশ্য আবছায়া  
হইয়া গেল। চিত্রক তখন বাতায়ন হইতে সরিয়া আসিয়া  
দ্বার পথে উকি মারিল। দ্বারের বাহিরে একটা কিঙ্কর  
বসিয়া বসিয়া ঘুমাইতেছে; অস্ত্র কেহ নাই। চিত্রক  
নিঃশব্দে ফিরিয়া আসিল। প্রাচীর গাত্রে তাহার সর্বোপ  
অসি ঝুলিতেছিল, সে তাহা কোমরে বাঁধিল।

তারপর লঘু পদে বাতায়ন লম্বন করিয়া সে পুর-  
তুমিতে উত্তীর্ণ হইল। দীর্ঘনিশ্বাস টানিয়া তাবিল, একটা

বাধা উত্তীর্ণ হইয়াছি, আর একটা বাকি—পুরপ্রাকার। ইহা পার হইলেই মুক্তি।

অদূরে একটি লতা মণ্ডপের অন্তরাল হইতে দুইটি তীক্ষ্ণ চক্ষু যে তাহাকে লক্ষ্য করিতেছে তাহা সে জানিতে পারিল না।

চক্ষের মুখে আবার মেঘের আচ্ছাদন পড়িল। এই ক্ষুব্ধোপে চিত্রক স্থিরিত পদে প্রাকারের দিকে চলিল। প্রাকারের ভিতর দিকে স্থানে স্থানে প্রাকারশীর্ষে উঠিবার সজীর্ণ সোপান আছে, তাহা সে সাবংকালে লক্ষ্য করিয়াছিল।

প্রাকারশীর্ষে উঠিয়া চিত্রক বাহিরের দিকে উকি মারিল। প্রাকার বহির্ভূমি হইতে প্রায় পঞ্চদশ হস্ত উচ্চ; তাহার মন্ডপ পাবাণ-গাছ বাহিয়া নামিবার বা উঠিবার কোনও উপায় নাই। এক উপায়, বজ্রাঙ্গ-বলী পবনপুত্রকে স্বরণ করিয়া নিয়ে লাফাইয়া পড়া; কিন্তু তাহাতে যদি বা প্রাণ বাঁচে, হস্ত পদ রক্ষা পাইবে না; অস্থি ভাঙিবে। তখন পলারনৈর চেষ্টা হস্তকর গ্রহণে পরিণত হইবে।

তবে এখন কী কর্তব্য? আবার চুপি-চুপি গিয়া শয্যার গুইয়া থাকা? না, আরও চেষ্টা করিতে হইবে। বাহির হইবার একমাত্র পথ তোরণ দ্বার। তোরণ দ্বারে প্রতীহার আছে—তাহার চোখে ধূলা দিয়া বাহির হওয়া কি সম্ভব? কে বলিতে পারে, প্রতীহার হয়তো ঘুমাইয়া পড়িয়াছে।—

চিত্রক প্রাকারের উপর দিয়া তোরণ দ্বারের অভিমুখে চলিল। সাবধানে চলিতে চলিতে তাহার মনে হইল পশ্চাতে কেহ আসিতেছে। সে চকিতে ফিরিয়া চাহিল, কিন্তু কাহাকেও দেখিতে পাইল না।

তোরণ তন্তুর কাছে পৌছিয়া চিত্রক সন্তর্পণে নিরে দুটি প্রেরণ করিল; দেখিল প্রতীহার দ্বারের পৌছ কবাটে পৃষ্ঠ ঝাঝিয়া পদব্রজ প্রসারণ পূর্বক ভূমিতে বসিয়া আছে, তাহার চিবুক বকের উপর নত হইয়া পড়িয়াছে, তলটি জাহ্নব উপর স্থাপিত। প্রতীহার যে নিজস্ব উপভোগ করিতেছে তাহাতে সন্দেহ নাই।

তাহাকে দেখিতে দেখিতে চিত্রকের নাসাপুট স্প্রুতি হইতে লাগিল, ললাটের ঢাকা ধীরে ধীরে রক্তবর্ণ ধারণ

করিল। মেঘের দায়ুশেলী কঠিন করিয়া সে কণকাল চিন্তা করিল তারপর নিঃশব্দে কোব হইতে তরবারি বাহির করিল। ইহাই এখন একমাত্র উপায়। তোরণ দ্বারের গায়ে যে ক্ষুদ্র কবাট আছে তাহা খুলিয়া সে বাহির হইবার চেষ্টা করিবে। প্রতীহারকে না জাগাইয়া যদি বাহির হইতে পারে ভাল, আর যদি প্রতীহার জাগিয়া ওঠে, তখন—

নিকটেই শীর্ণ সোপানশ্রেণী; চিত্রক নীচে নামিল। তোরণতন্তুর গা ঘেঁষিয়া অতি সতর্ক পদসঞ্চারে নিদ্রিত প্রতীহারের দিকে অগ্রসর হইল। এতক্ষণে সে প্রতীহারের মুখ দেখিতে পাইল; দেখিল গত রাত্রির সেই প্রতীহার।

ওষ্ঠাধর দৃঢ়বদ্ধ করিয়া চিত্রক আর এক পদ অগ্রসর হইল। কিন্তু আর তাহাকে অগ্রসর হইতে হইল না। এই সময় পশ্চাতে একটা গভীর গর্জনধ্বনি হইল; সঙ্গে সঙ্গে ভল্লকের মতো একটা জীব তাহার স্বন্ধে লাফাইয়া পড়িয়া ছুই বজ্রবাহ দিয়া তাহার কণ্ঠ চাপিয়া ধরিল।

অতর্কিত আক্রমণে চিত্রক সমুদ্র দিকে পড়িয়া গেল। আক্রমকও সঙ্গে সঙ্গে পড়িল, কিন্তু তাহার বাহুবন্ধন রূপ হইল না। চিত্রকের শ্বাস রোধ হইবার উপক্রম হইল। শত্রু পৃষ্ঠের উপর—চিত্রক তাহাকে দেখিতে পাইল না। অন্ধভাবে মাটিতে পড়িয়া সে অদৃশ্য আততায়ীর সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিল; তাহার মুষ্টি হইতে তরবারি পড়িয়া গেল। ছুই হাতে প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াও কিন্তু সে আততায়ীর নাগপাশ হইতে নিজ কণ্ঠ মুক্ত করিতে পারিল না।

এদিকে প্রতীহার আচম্বিতে ঘুম ভাঙিয়া দেখিল তাহার সমুখে গজ-কচ্ছপের যুদ্ধ বাধিয়া গিয়াছে। কিছু না বুঝিয়াই সে লাফাইয়া উঠিল এবং কটি হইতে একটা তুরী বাহির করিয়া তাহাতে সুরকার দিতে লাগিল। তুরীর তারধ্বনিতে চারিদিক সচকিত হইয়া উঠিল।

চিত্রকের অবস্থা ততক্ষণে শোচনীয় হইয়া উঠিয়াছে; তাহার সংজ্ঞা লুপ্ত হইয়া আসিতেছে। কণ্ঠ মুক্ত করিবার চেষ্টা বৃথা। অন্ধভাবে চিত্রক মাটিতে হাত রাখিল; তরবারিটা তাহার হাতে ঠেকিল। সোহাগ্রস্তভাবে তরবারি মুষ্টিতে গুইয়া চিত্রক কোনও ক্রমে জাহ্নব উপর

উঠিল, তারপর তরবারি পিছন দিকে ফিরাইল; আততায়ী  
বেখানে তাহার পৃষ্ঠের উপর জড়াইয়া ধরিয়াছে সেইখানে  
তরবারির অগ্রভাগ রাখিয়া ছুই হাতে আকর্ষণ করিল।  
তরবারি ধীরে ধীরে আততায়ীর পঞ্জর মধ্যে প্রবেশ  
করিল।

কিছুক্ষণ আততায়ী তদবস্থ রহিল; তারপর তাহার  
বাহুবন্ধন সহসা শিথিল হইল। সে চিত্রকের পৃষ্ঠ হইতে  
গড়াইয়া মাটিতে পড়িয়া গেল।

হুস্‌হুস্‌ ভরিয়া শ্বাসগ্রহণপূর্বক চিত্রক টলিতে  
টলিতে উঠিয়া দাঁড়াইল। ইতিমধ্যে ত্রীধ্বনিতে আকৃষ্ট  
হইয়া কয়েকজন পুরবাসী ভৃত্য ছুটিয়া আসিয়াছিল এবং  
বণাদির দ্বারা চিত্রককে প্রহার করিতে উত্তত হইয়াছিল;  
কিন্তু চিত্রক উঠিয়া দাঁড়াইলে তাহার মুখ দেখিয়া তাহারা  
নিরস্ত হইল।

তোষণ প্রতীহার ভর অগ্রবর্তী করিয়া কাছে আসিয়া  
মহা বিশ্বয়ে বলিয়া উঠিল—‘আরে এ কি! এ যে কাল  
রাত্রির চোর—না না—মগধের দূত মহাশয়! এত রাত্রে  
এখানে কি করিতেছেন? ওটা কে?’

চিত্রক বন বন নিবাস ফেলিতে ফেলিতে বলিল—  
‘আনি না। আমাকে পিছন হইতে আচম্বিতে আক্রমণ  
করিয়াছিল—’

আততায়ীর অসিবিদ্ধ দেহটা অধোমুখ হইয়া পড়িয়া  
ছিল, একজন গিয়া তাহাকে উল্টাইয়া দিল। তখন  
চক্রালোকে তাহার মুখ দেখিয়া সকলে স্তব্ধ হইয়া গেল—  
গুহ।

গুহ বরিয়াছে; তাহার দেহটা শিথিল জড়পিণ্ডে  
পরিণত হইয়াছে।

প্রতীহার বিশ্বয়-সংহত কণ্ঠে বলিল—‘কি আশ্চর্য—  
গুহ। গুহ আপনাকে আক্রমণ করিয়াছিল! কিন্তু সে  
বড় নিরীহ—কখনও কাহাকেও আক্রমণ করে নাই।  
আজ সহসা আপনাকে আক্রমণ করিল কেন?’

চিত্রক উত্তর দিল না, একদৃষ্টে গুহর মৃত-মুখের পানে  
চাহিয়া রহিল। গুহর মুখ শান্ত; যেন দীর্ঘ আগরণের পর  
সে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। এই মাছুষটাই কণেক পূর্বে হিংস্র  
অক্ষের দ্বায় তাহার লক্ঠনালী চাপিয়া মারিবার উপক্রম  
করিয়াছিল তাহা বুঝিবার উপায় নাই। এই খর্বকৃত্ত  
দেহে এমন পাশবিক শক্তি ছিল তাহাও অস্বপ্নমান করা  
যায় না।

প্রতীহার তদিকে প্রশ্ন করিয়া চলিয়াছে—‘কিন্তু গুহ  
আপনার প্রতি এমন মারাত্মক আক্রমণ করিল কেন?  
সে অবশ্য পাগল ছিল, কিন্তু কাহাকেও অকারণে আক্রমণ  
করা—’

চিত্রক বলিল—‘অকারণ নয়। আমার প্রতি তাহার  
বিষেবের কারণ বুঝিয়াছি। পৃথার মুক্তি। গুহ ভাবিয়া-  
ছিল, আমিই তাহার গুপ্তধন চুরি করিয়াছি।’

গুহর পাশে নতজাহু হইয়া চিত্রক ধীরে ধীরে তাহার  
পঞ্জর হইতে তরবারি বাহির করিয়া লইল। মৃত্যুর পরপারে  
গুহ আবার তাহার লুপ্ত স্বতি কিরিয়া পাইয়াছে কিনা  
কে জানে!

(ক্রমশঃ)



# রাশিকল

## জ্যোতি বাচস্পতি

### অশ্বিনাশি

আপনার জন্মরাশি যদি মেঘ হয়, অর্থাৎ যে সময়ে চন্দ্র আকাশে মেঘ-নক্ষত্রপুঞ্জ ছিলেন, সেই সময়ে যদি আপনার জন্ম হ'য়ে থাকে, তাহলে এই রকম বল হবে—

### প্রকৃতি

আপনি ভাবপ্রবণ প্রকৃতির লোক, কিন্তু আপনার ভাবের মধ্যে সঙ্গীততা ও তীক্ষ্ণতা বড়টা আছে, এসাত্ত্ব বা পঙ্কীয়তা ভুতটা নেই। আপনি সকল ব্যাপারেই চান তীক্ষ্ণ অনুভূতি ও উত্তেজনা, কাজেই আপনার মধ্যে অধীরতা ও চাকল্য কম-বেশী প্রকাশ পায়। আপনার মধ্যে আত্ম সচেতনতা খুব বেশী এবং আপনি কম-বেশী স্পর্শকাতর। আপনার ইন্দ্রিয়জ অনুভূতিগুলিও সাধারণতঃ বেশ তীক্ষ্ণ। কাজেই অতি সামান্য কারণেই আপনি যেমন উৎক্লেশ হ'য়ে ওঠেন, তেমনি সামান্য কারণেই মুহূর্তমান হ'য়ে পড়েন। কোন ভাবই আপনার মধ্যে স্থায়ী লাভ করতে পারে না।

নিজের দিকে আপনার বেশ খর দৃষ্টি আছে, সেইজন্য কোন কিছু আপনার বিরুদ্ধে গেলে, আপনি অধীর ও ষিটখিটে হয়ে ওঠেন। অনেক সময় সহজেই রেগে যান, কিন্তু আপনাকে শান্ত করাও শক্ত নয়, অল্প চেষ্টাতেই আপনি এসন্ন হ'য়ে ওঠেন।

আপনি স্বাধীনতা-প্রিয় ও উচ্চাভিলাষী এবং আপনার সংগঠন শক্তি খুব বেশী না থাকলেও, নিজের পরিবেশের মধ্যে কর্তৃত্ব করতে চান। কিন্তু কর্তৃত্ব পেলেও অধীরতা ও চাকল্যের জন্য তা প্রায়ই হারা হয় না। আপনি নিজের মতে কাজ করতে ভালবাসেন, অপরের সঙ্গে পরামর্শ করলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রে সে পরামর্শ উপেক্ষা বা অগ্রাহ করেন। এমন কি সে পরামর্শের বিপরীত আচরণও করতে পারেন।

আপনার উপর আপনার আবেষ্টনের অথবা বংশ ও পরিবারের প্রভাব খুব বেশী অভিযুক্ত হওয়া সম্ভব। পারিবারিক আবেষ্টন খুব ভাল না হ'লে নৈতিক অবনতির আশঙ্কা আছে। সঙ্গ নির্বাচনেও আপনার সতর্ক থাকি উচিত। অসৎ সঙ্গ পড়লে সঙ্গীদের প্রশংসা পাবার জন্য, অথবা তাদের উপর নেতৃত্বের লোভে দুর্গতি আচরণ করা আপনার পক্ষে অসম্ভব নয়।

### অর্থভোগ্য

আর্থিক ব্যাপারে আপনার কম বেশী চিন্তা থাকিবে। অনেক সময় পায়-ব্যয়ের সামঞ্জস্য রাখা কঠিন হবে। এক সময় আপনি হঠাৎ ভাব্য ব্যয়েও বিমূঢ় হবেন, আবার আর এক সময় অথবা ব্যয়ে মুক্ত হ'য়ে উঠবেন। অর্থ উপার্জনের ব্যাপারেও অনেক ক্ষেত্রে আপনাকে

বাধ্য হ'য়ে কৌশল বা গোপনীয়তার আশ্রয় নিতে হবে। কোন আত্মীয়ের জন্য আপনার অথবা অর্থ ব্যয় হ'তে পারে, কিন্তু মেহশীলা আত্মীয়ের কাছ থেকে আপনি সাহায্যও পেতে পারেন। টাকা খাটানোর ব্যাপারে আপনার বিশেষ সাবধান হওয়া উচিত। অনেক সময় অপাত্রে বর্ণদান ক'রে অথবা বেয়াড়া ব্যাপারে টাকা লম্বী করে বিশেষ ঝগড়ার আশঙ্কা আছে। আর্থিক অবস্থা শেষ পর্যন্ত মোটের উপর সচ্ছল হ'লেও, আর্থিক ব্যাপারে কম-বেশী ওঠাপড়া আপনার বরাবরই চলবে।

### কর্মজীবন

আপনার সেই সকল কাজ ভাল লাগবে—যাতে কর্মের ধারা বা পরিবেশের ঘন ঘন পরিবর্তন আছে। একেবারে ধরাবাধা কাজ আপনার প্রিয় নয়। আপনি সেই সব কাজের দিকে আকৃষ্ট হবেন যার মধ্যে খানিকটা অনিশ্চয়তা আছে অথবা যাতে সাহসিকতার পরিচয় দিতে হয়। সুতরাং সৈনিকের কাজ, চিকিৎসকের বৃত্তি, রসায়ন শিল্প, পুর্তকার্য, খাড়ুর ব্যবসা, রাজনৈতিক কার্যকলাপ প্রভৃতির যে কোনটিতে হোক আপনি কৃতিত্ব দেখাতে পারেন। আপনার মন নক্ষত্র যদি অধীন হয়, তা'হলে রাজনৈতিক কাজ, ইঞ্জিনিয়ারিং, বৈজ্ঞানিকের কাজ ইত্যাদি আপনার ভাল লাগবে। যদি ভরলী নক্ষত্র হয় তা'হলে যে সব কাজে বিপদের আশঙ্কা আছে সেই সব কাজের দিকে আপনার ঝোঁক থাকবে। আপনি মাঝে মাঝে পরিবর্তন চান, কাজেই একই ভাবে, একই স্থানে, একই কাজে লেগে থাকা আপনার কচিকর হবে না। কর্মক্ষেত্রে আপনি প্রাধান্য লাভ করতে পারেন কিন্তু কর্মের ব্যাপারে বহু শক্ততা ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলে আপনাকে অগ্রসর হ'তে হবে। উন্নতি হ'লেও সে উন্নতি বজায় রাখার জন্য আপনাকে নজরমত লড়াই করতে হবে, না হলে কিরে অবনতিও হ'তে পারে। বাইরের শত্রুর দ্বারা মিথ্যা অপবাদ বা নিষাধপ্রচারও হ'বেই, অনেক সময় আপনার পারিবারিক আবেষ্টনও আপনার উন্নতির বিরূপ হ'তে পারে। শত্রুর সঙ্গে বিবাদে অনেক সময় এত শক্তি ও সর্বস্বের অপব্যয় হবে যে আপনার অনেক কর্তব্য কাজও সেজন্য অবহেলিত হ'তে পারে। সুতরাং শক্ততা আপনি বহু এড়াতে পারবেন তবুই আপনার পক্ষে মজল। আপনার যদি কৃত্তিকা জন্মনক্ষত্র হয় তা'হলে এ বিষয়ে বিশেষ সতর্কতা আবশ্যিক, মজুতা কর্ণে পূর্ণ উন্নতি কখনই সম্ভব হবে না।

### পারিবারিক

আত্মীয়-স্বত্বের সঙ্গে আপনার মোটের উপর সৌহার্দ্য থাকাই সম্ভব। আপনার মধ্যে আত্মজাত্যের একটা গর্ভ থাকতে পারে

অন্ততঃ পারিবারিক প্রতিষ্ঠা ও বংশবর্ধনার দিকে আপনার তীব্র দৃষ্টি থাকলে এবং সর্বত্র আপনার ধারণা অনুসারে পরিবারস্থ সকলের আচরণ নিয়ন্ত্রিত করতে না পারলে আপনি অবতিবোধ করবেন। যেহেতু ঐতির ব্যাপারে আপনার আবেগ খুব প্রবল হবে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে তা সহজ জ্ঞানের সীমা অতিক্রম করে যেতে পারে। সম্ভাব্য উপরই হোক বা অপর কোন ঐতির পাত্রের উপরই হোক আপনার এই ঐতি অনেক সময় তাঁদের পক্ষে পীড়াদায়ক বা ক্ষতিকর হতে পারে। সুতরাং এ বিষয়ে আপনার সংবত হওয়া আবশ্যিক। আনন্দ-প্রমোদের জন্য ও সন্তানাদির জন্য আপনার অনেক সময় অপব্যয় হতে পারে; বার জন্ম পরে অনুশোচনা করতে হবে। সন্তানাদির বিবাহের জন্য আপনার কোন রকম চিন্তা হতে পারে এবং কোন সম্ভাব্যের দূরদেশে অথবা দুর্গম প্রদেশে বিবাহ হওয়াও অসম্ভব নয়।

#### • বিবাহ

বিবাহের ব্যাপারে কিছু বাধা বিদ্যমান হ'লেও আপনার দাম্পত্য জীবন মোটের উপর মন্দ নয়। স্ত্রী (অথবা স্বামী) নম্র ও নিরীহ প্রকৃতির হওয়াই সম্ভব এবং তিনি আপনার অঙ্গুগত হবেন। আপনার ভাব-প্রবণতার জন্য মধ্যে মধ্যে তাঁর সঙ্গে অকোণল হ'লেও গুরুতর কোন মনোমালিন্য না হওয়াই সম্ভব। আপনার স্ত্রী (অথবা স্বামী) দেহ একটু দুর্বল হতে পারে। যদি এরকম কারো সঙ্গে আপনার বিবাহ হয় বীর জয়দাস বৈশাখ, ভাত্র, কার্তিক অথবা পৌষ কিংবা বীর জয়তিথি কৃক পক্ষের তৃতীয়া বা শুক্লপক্ষের দশমী, তাহলে আপনার সঙ্গে তাঁর বিশেষ সম্ভাব্য হবে।

#### বন্ধুত্ব

আপনার বন্ধুর সংখ্যা বেহুয়াই সম্ভব। কিন্তু বন্ধুত্বের ব্যাপারে আপনাকে কম বেশী অশান্তিভোগ করতে হবে। অনেক সময় বন্ধুর জন্য আপনার নিজের কোনরকম বিপদ বা বিজ্ঞাট উপস্থিত হতে পারে; অথবা বন্ধুর কোনরকম বিপদ বা স্বজ্ঞাটে আপনার মানসিক শান্তি ব্যাহত হতে পারে। বন্ধুর জন্য কোনরকম পারিবারিক স্বজ্ঞাট উপস্থিত হওয়াও বিচিত্র নয়। আপনি সাধারণতঃ আকৃষ্ট হবেন সেই সব ব্যক্তির দিকে যাদের জয়দাস বৈশাখ, ভাত্র, অথবা পৌষ এবং বীর জয়তিথি কৃক পক্ষের তৃতীয়া অথবা শুক্লপক্ষের দশমী।

#### আস্থ্য

আপনার মধ্যে বংশগত ব্যাধির প্রবণতা থাকতে পারে এবং কোন রকম আশাতমক অথবা মনোকষ্ট আপনার বাহ্যহানির কারণ হতে পারে। আপনি খাওয়া দাওয়ার ব্যাপারে সাধারণতঃ তীব্র ও রুক্ষ ভিনবি পদ্ধতি করেন, সেইজন্য যাবতের দিকেও আপনার একটা আকর্ষণ আসতে পারে। কিন্তু তা সফল পরিহার করা উচিত। কেন না আপনার বাহ্যের পক্ষে যে কোন মাদক বিশেষ অনিষ্টকারী; এমন কি চা, তামাক, কফি, প্রভৃতিরও অপরিমিত ব্যবহার আপনার বাহ্যের ক্ষতের সৃষ্টি করতে পারে। একেবারে গুরুভোগেরও আপনার

বাহ্যের পক্ষে ভাল নয়। বারে বারে অল্প পরিমাণে খাওয়াই আপনার পক্ষে ভাল। তরল খাবার চেয়ে শুক ও ভর্তিত খাওয়াই আপনার উপযোগী বেশী। আহাৰ বিহারে সংযম এবং শান্ত পরিবেশ বাহ্য ভাল রাখার জন্য আপনার পক্ষে একান্ত আবশ্যিক।

#### অভ্যাস ব্যাপার

আপনার মধ্যে জয় ও হান পরিবর্তনের ইচ্ছা থাকবে বটে, কিন্তু অনেক সময় যে উদ্দেশ্য নিয়ে আপনি জয় বা হান পরিবর্তন করবেন কার্যক্ষেত্রে তা সফল হবে না। প্রবাসে বা জয়নের সময় কোনরকম বিপদ আপদ সন্ধ্যাও সতর্ক থাকে উচিত। বিদেশে শত্রুর দ্বারা বিপদ হওয়ারও আশঙ্কা আছে।

কোন গুরুবিজ্ঞা অথবা আধ্যাত্মিক সাধনার দিকে আপনার ঝোঁক আসতে পারে কিন্তু তাতে বিপদের আশঙ্কা আছে। বিশেষ করে আপনার যদি জন্ম নক্ষত্র ভরগী অথবা কৃত্তিকা হয় তাহলে গুরুসাধনা একেবারে বর্জনীয় এবং ভক্তিমার্গে কিছু আনন্দ পেতে পারেন।

বাতে নিজের দেশের, সমাজের বা সম্প্রদায়ের স্বার্থ জড়িত আছে বলে আপনি মনে করেন, তার উপর আপনার একটা বিশেষ সম্ভাব্য থাকে সম্ভব এবং তারজন্য অনেক সময় আপনি আত্মত্যাগ এবং অর্থব্যয় করতেও কৃত্তিত হবেন না। কিন্তু সে ক্ষেত্রেও আপনার কতৃৎ পাওয়া চাই, নতুবা নিরুৎসাহ হয়ে আপনি সে সম্ভাব্য উদাসীন হয়ে উঠতে পারেন।

#### স্মরণীয় ঘটনা

আপনার ৪, ১৬, ২৮, ৪০, ৫২ এই সকল বর্ষে নিজের বাহ্যের ব্যাপারে অথবা পরিবার মধ্যে কারো কোনরকম দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। ১০, ১২, ২২, ৩৪, ৪৬, ৫৮ এই সকল বর্ষগুলিতে কোনরকম অভিজ্ঞতা হতে পারে।

#### বর্ণ

হালকা লাল রং বা হলদে আভ্যাক্ত লাল রং আপনার বিশেষ উপযোগী। বিশেষ করে গেরুরা রং, টাপাকুলের রং অথবা সোনালী রং আপনার বিশেষ সৌভাগ্য বর্ধক হওয়া উচিত। ঘোর লাল রং ব্যবহার না করাই ভাল, কেননা তাতে উত্তেজনা বৃদ্ধি হতে পারে। অল্প অল্প ব্যবহার সাধারণতঃ বেশী চক্চকে বা জ্বল জ্বলে রং বর্জন করা উচিত। কেননা তা অনেক সময় অবশ্যিক হতে পারে এবং উপসর্গ বাড়িয়ে তুলতে পারে।

#### রত্ন

আপনার ধারণের উপযোগী রত্ন সোনাপাথর (Gold Stone) এ্যাম্বার (Amber) হলদে পাথর প্রভৃতি।

যে সকল ব্যক্তির ব্যক্তি এই রাশিতে জন্মেছেন তাঁদের জনকদেরকে নাম—হরপতি শিবাজী, চিত্তহলতান, জেনারেল পর্জন, রামা বিদ্যাক্ষ দেখ। মহামহোপাধ্যায় মহেশচন্দ্র ভট্টাচার্য, কবিদাস গঙ্গাধর দাস, জাস্টিস সারদাচরণ মিত্র প্রভৃতি।



# তথাগতের মতে নরেন্দ্র দেব

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

শালনা থেকে ফিরে এসে আর আমাদের রাজগীরে থাকতে ভাল লাগছিল না। অতীত ভারতের ইতিহাস যেন ইন্ডিতে আহ্বান করছিল—বেরিগে পড়ো—যদি দেখতে চাও বৌদ্ধমূলের অগণিত বিলুপ্ত ঐশ্বর্য, যদি ভগবান তথাগতের পদাঙ্ক অনুসরণ ক'রে ফিরতে চাও পরিভ্রাজকের মতো—তবে চলো—লুধিয়ানা—পাটলিপুত্র—বৌদ্ধগরা—সারনাথ—সাঁচী, প্রাচীন—কুশীনগর—কপিলাবস্ত—কৌশাধী—

কিন্তু মুকিল হয়ে পড়লো আমাদের রাজগীরে পোষ্ট অফিস থেকে বখাসমত টাকা না পাওয়ায়। কলকাতার একটি প্রসিদ্ধ ব্যাঙ্ক রেজেন্টারী ও ইনসিয়ার ক'রে আমাদের প্রয়োজনমত টাকা পাঠিয়েছেন বলে আমাদের জামিয়েছেন, কিন্তু রাজগীর পোষ্ট অফিসে কেউ না থাকার ইনসিয়ার বিলি হয় নি। ডাকঘরে গিয়ে খবর নিয়ে জানা গেল রেজেন্টারী ও ইনসিয়ার করা 'চিঠি' একখানি আমার নামে এসেছে ঠিক, কিন্তু, সে খানি বিলি করবার মালিক যিনি সেই পোষ্টমাষ্টার মশাই গত একসপ্তাহকাল ডাকঘরে অনুপস্থিত। শোনা গেল তিনি দিন দুই তিনের ছুটা নিয়ে কি একটা বিভাগীর পরীক্ষা দিতে পাটনা গেছেন। কাজেই পোষ্ট অফিসে কেবল চিঠি বিলি ছাড়া আর সব কাজ বন্ধ আছে। মণিঅর্ডার করা বা নেওয়া দুইই চলছে না, টেলিগ্রামও বন্ধ, রেজিষ্ট্রেশন এবং ইনসিয়ার কিছুই হবার উপায় নেই, পাখারও উপায় নেই! বিদেশে প্রবাসে ব্যাধি গিয়ে পড়েছে তাদের পক্ষে এ একটা গুরুতর অবস্থার অভিজ্ঞতা!

পরলা ডিসেম্বর আমরা "সপ্তপর্নী" ছেড়ে চলে আসবো—বাড়ীর মালিক অর্থাৎ আমাদের বেরান ঠাকুরপের সঙ্গে এই রকমই কথা ছিল। কিন্তু, কথা রাখা গেল না। প্রজ্ঞের নিরুপমা দেবীর জ্যেষ্ঠা পুত্রবধূ আমাদের ভাগিনেরী কল্যাণীয়া শ্রীমতী কমলকে পত্র লিখে সমস্ত অবস্থা জানিয়ে ১৫ই ডিসেম্বর পর্বন্ত সপ্তপর্নীতে থাকার বেরান বাড়িরে সেওয়া গেল।

রোজই একাধিকবার ডাকঘরে যাই—পোষ্টমাষ্টার কিরছেন কিনা খবর নিতে। দেখি রীতিমত 'শড়ী' জমে গেছে সেখানে। কত লোক যে মণিঅর্ডার ইনসিয়ার রেজিষ্ট্রেশন আর টেলিগ্রামের জন্য বর্ণা বিচ্ছেদ তার সংখ্যা হয় না। আপাততঃ পোষ্টকার্ড এবং ডাকটিকিটও নিঃশেষ হয়ে গেছে। চিঠিপত্রের আদান প্রদানও বন্ধ হবার উপক্রম। বর্তমান মুখে পৃথিবীর কোণও সভ্যতাবেশের সরকারী ডাকঘরের যে এরকম অবস্থা দিগের পর দিন চলতে পারে এ আমাদের ধারণাই ছিল না। ভারতবর্ষ আজকাল বেশ, এখানে সবই সম্ভব। বাবীন

ভারতের কংগ্রেস সরকার এখন বিহার প্রদেশের শাসনকর্তা। এঁদের শাসন পরিচালনার ক্ষেত্রে একটি বিশিষ্ট তীর্থহাসের ডাকঘর যে এখনভাবে ভেঙে পড়তে পারে একথা ভাবলেও লজ্জা ও কষ্ট বোধ হয়। আর একসপ্তাহকাল ধরে এই পোষ্টমাষ্টার-হীন-ডাকঘর কংগ্রেস সরকারের শাসন পরিচালনার অব্যোধ্যতা জনসাধারণের কাছে সপ্রমাণিত করে দিতে লাগলো।

ইতিমধ্যে কলকাতা থেকে লোক মারকৎ আমাদের হাতে কিছু টাকা এসে গেল। আমরা তখন শ্রীমাকৃষ্ণ সেবাজীর স্বামী কৃপামন্যজীকে এবং তাঁর অবর্তমানে সরকারী ডাক্তার শ্রীযুক্ত ডি, এন, দাসকে, পৃথকভাবে এক একখানি 'অধিকার পত্র' দিয়ে পাটলিপুত্র সম্বর্ধনে রওনা হয়ে গেলুম। এই 'অধিকার পত্র' স্বামীজীকে এবং তাঁর অবর্তমানে ডাক্তারবাবুকে আমাদের ব্যবহার্য চিঠিপত্র, প্যাকট, পার্সেল, ইনসিয়ার ও রেজেন্টারী করা কতায়, বুকপোষ্ট, মণিঅর্ডার এবং টেলিগ্রাম পর্বন্ত বিলি করবার জন্য ডাকঘরকে নির্দেশ দিয়ে এলুম।

আমাদের প্রবাসের বন্ধু মার্টিন রেলের কর্মচারী শ্রীযুক্ত বিনয় নন্দী মহাশয় আমাদের পাটনা ব্যতীর সমস্ত ব্যবস্থা ক'রে দিলেন এবং নিজে আমাদের সঙ্গী হয়ে পাটনা পর্বন্ত এলেন। তিনি সঙ্গে না এলে আমরা কখনই সেদিন বক্তিমারপুর ষ্টেশন থেকে 'বেনারস-এক্সপ্রেস' ধরে পাটনা যেতে পারতুম না। কারণ মার্টিনের রেল সময় রক্ষা সম্বন্ধে মোটেই নির্ভরযোগ্য নয়। অধিকাংশ দিনই তিনি করেসপন্ডিং ট্রেনখানি ছেড়ে ব্যাবার পর হাঁপাতে হাঁপাতে বক্তিমারপুরে গিয়ে হাজির হন। যাত্রীদের আরই পরবর্তী গাড়ী ধরবার জন্য ষ্টেশনে অপেক্ষা করতে হয়।

আমরা ৫ই ডিসেম্বর রাজগীরের বাড়ী চাবীবন্ধ ক'রে চাবীগুলি রিজিষ্টার্ড ও ইনসিয়ার পাস'লে নিরুপমা দেবীর কাছে পাঠাবার ব্যবস্থা ক'রে পাটনা রওনা হয়েছিলাম। বক্তিমারপুর ষ্টেশনে নেমে দেখি করেসপন্ডিং ট্রেন ছাড়বার ঘণ্টা পড়ে গেছে। সমস্ত মালপত্র স্ট্রের মাধ্যম ভুলে ছুটতে ছুটতে গিয়ে দেখি ষ্টেশনে ঢোকবার গেট বন্ধ। লোকে লোকারণ্য সেখানে! প্যাসেঞ্জার ও ট্রেন ষ্ট্রাকের সঙ্গে তখন ভীষণ মারামারি চলছে। রেল পুলিশ বে-পরোয়া লাঠি চালনা ক'রেও কীপ্ত জনতাকে শান্ত করতে পারছে না।

একটি 'ওভারব্রীজ' পার হয়ে ষ্টেশনে যেতে হয়। বিনয়বাবু সঙ্গে থাকার এবং 'ওভারব্রীজ' পার হবার সময় না থাকার আমরা তাড়াতাড়ি হবে বলে লাইন অতিক্রম ক'রে ষ্টেশনে এসেছিলাম, কিন্তু দালাদালাল চলছে বলে প্রবেশ করতে পারলুম না। বিনয়বাবু কুলিদের

সঙ্গে নিয়ে আমাদের ট্রেন কেমসিয়ারের দ্বার দিয়ে দিয়ে অগ্রসর হ'তে ব'লে সেই ভীড়ের মধ্যে অগ্ন্যুৎপন্ন হ'য়ে গেলেন। অগ্ন্যুৎপন্ন পরেই দেখা গেল তিনি রেলওয়ে ট্রাকের একজন লোক সঙ্গে নিয়ে ছুটে আসছেন। স্টাটিকের মাথাবানি কেমসিয়ারের গারে একটি বিশেষ 'একেশ-দ্বার' ছিল। তার সম্মান রেলওয়ে কর্তারাই জানতেন। বিনয়বাবুর সঙ্গে রেলকর্মচারীটি সেই দরজার চাবীটি নিয়ে এসেছিলেন। আমরা এঁদের সাহায্যে কোনও রকমে গলদঘর্ষণ হয়ে ট্রেনে উঠলুম। "বে বে গাড়ীতে বারগা পাও কিছু কিছু মাল নিয়ে উঠে পোড়ো" এই ছিল বিনয়বাবুর আদেশ, কারণ বেনারস এক্সপ্রেস প্রায়ই ভর্তি হয়ে আসে, তাছাড়া ট্রেনের সময়ও উত্তীর্ণপ্রায়! কম ভীড়ের গাড়ী খুঁজে দেখে সকলের একগাড়ীতে থাকার অবকাশ নেই তখন। কুলিরা স্বপাক্ষণ বে বে গাড়ীতে পারল মাল কেলে দিলে। আমরাও বিনয়বাবুর উপদেশ মতে বে বে গাড়ীটা সামনে পেলাম উঠে পড়লুম। আমাদের সঙ্গে ভৃত্য ও পরিচারিকা রামচন্দ্র ও বিনোদিনী তৃতীয় শ্রেণীর টিকিট ছিল। কিন্তু, সে কান্ডালিতে প্রবেশ ক'রে কার সাধ্য! বিনয়বাবু তাদের বে ক্রাশে খুঁজী তুলে দিলেন। আমি ও বুঝী সেকেন্ড ক্রাশ টিকিট থাকে সবে ইন্টার ক্রাশে উঠে পড়লুম। বিনি আমাদের কামরায় এল। মেয়েদের বিনয়বাবু কাষ্ট ক্রাশে তুলে দিলেন। রামচন্দ্র কোথায় গেল তার কোনও উদ্দেশ্য পাওয়া গেল না। জিনিসগুলো সব উঠলো কিনা বিনয়বাবু তার তদারক ক'রে—কুলি মিটিয়ে বখন আমাদের গাড়ীতে এসে উঠলেন গাড়ীও তখন চলতে আরম্ভ করেছে। সমস্ত ব্যাপারটা লিপিতে বতটা সময় গেল তার শত্যাংশের একাংশ সময়ের মধ্যে আমরা ছুটোছুটি করে ট্রেন ধরেছিলুম। এ ট্রেন ধরতে না পারলে আমাদের বড় কষ্ট পেতে হ'ত। শুধু আমাদের কেন, পাটনার আমাদের নবপরিচিত বন্ধু শশাঙ্কমোহনকে খবর দেওয়া হয়েছিল স্টেশনে আসবার জন্য, কারণ, তারই সনির্বন্ধ আগ্রহে ও অনুরোধে এবং সাদর আহ্বানে আমরা পাটনার দু'একদিনের জন্য তারই আতিথ্য গ্রহণ করতে বাজিলাম। স্মরণ্য এ ট্রেনে না যেতে পারলে আমরা সেদিন আর পাটনা পৌঁছতে পারতাম না। ব্যাঙ্কের বড়সাহেব শশাঙ্কমোহনেরও স্টেশনে ছুটে আসা-বাওয়ার সময় নষ্ট হ'ত এবং শ্রীমতী মনোজ্যোৎস্না বেচারার অতিথি পরিচর্যার আয়োজনও পও হ'য়ে যেত।

বাইহোক, বক্তারপুত্র থেকে পাটনা বাবার পথে মাঝের একটা স্টেশনে—কি নাম মনে নেই—হ্যাঁ, 'ছাপ্রা' বোধহয়; অনেক লোক বেবে গেল। শুনলুম ছুট' পরবের জন্য ভারী ধুম হয় 'নাকি এখানে। বিনয়বাবু এই স্থানে আমাদের হুড়িয়ে-পড়া মালপত্র ও লোকজনদের একত্র করে কেললেন। রামচন্দ্রকে আবিষ্কার করা গেল একখানি দেড়া-মাঙলের গাড়ীতে। জলের কুঁজো ও বেলাস ছিল তারই হেপাজতে। তুফান নবনীতা জলপানের জন্য উত্থিত করে তুলছিল আমাদের। রামচন্দ্রকে কুঁজো বেলাস নবন পাওয়া যেতে আমরা বেন হীক জেড়ে বাঁচলুম। শ্রীমতী তার ভাঙার থেকে বেঁচে সন্ধান বার করে দিলেন। তুফান ও

শিপাসাত হয়েছিল সবলেই। বাত ও পানির পেয়ে অনেকটা বাতস্থ হওয়া গেল।

বক্তারপুত্র থেকে পাটনা মাত্র ৫০ মাইল পথ, মনে হচ্ছিল বেবে এ পথের আর শেষ নেই। চলেছি ত চলেছি। ছাপ্রাশে বিহারের বিভিন্ন পরিবেশ। গ্রাম, শহর, শতক্ষেত্র, গোচারণভূমি, কত কি পার হ'য়ে চলেছি কিন্তু দৃষ্টি নেই সেদিকে। কারণ মন হ'য়ে উঠেছে তখন পাটলিপুত্রের জন্য ব্যাকুল। চব্বের সঙ্গে যদি মনের বোপ না থাকে তবে আমাদের দৃষ্টি হয়ে বার শূন্য। (vacant) চোখ চেরেও আমরা তখন কিছু দেখতে পাইনি, অর্থাৎ পরিদৃশ্যমান বস্তু নিচর তখন আমাদের মনের উপর কোনও ছাপ কেলতে পারে না তাই তাদের রূপও আমাদের কাছে ধরা পড়ে না।



নবনীতার কুহুর—'হুই'

বেলা পাঁচটায় বেনারস এক্সপ্রেস আমাদের পাটনার দামিগে দিলে। 'পাটনা সিটি' নয়—নতুন শহর-পাটনার। স্বপাক্ষর মালপত্র সহ আমরা ঠাকুর চাকর ও কুহুর নিয়ে পাটনা স্টেশনে নেমে এখার থেকে ওখার পর্যন্ত খুঁজে শশাঙ্ক ভারার কোন পাড়াই পেলাম না। অগত্যা, বিনয়বাবু বললেন—চলুন পাটনার অভিট এসে আমি যে হোটেলের থাকি সেখানে নিয়ে বাই—বুঝ তাল হোটেল, বাঙালীর হোটেল—বিহার অকলে এ হোটেল "শিপুবাবুর হোটেল" নামে বিখ্যাত।

আমরা সকলেই এ প্রত্যয়ে সম্মত হয়ে ছ'খানি কিটন ও একখানি বন্ধ গাড়ীতে মালপত্র স্বী চাকর ও নিজেরা উঠে পাটনার রাজপথে পা বাড়ালুম।

"সবুর! সবুর!" কে একজন হীকে উঠলেন পথ থেকে। উকি মেরে দেখি শশাঙ্ক ভারা বহু সাইকেল চালিয়ে গাড়ীর পিছু পিছু ছুটে আসছেন। গাড়ী থামানো হল। শশাঙ্ক এসে বললেন—"আপনারা যে কোন পথ দিয়ে স্টেশন থেকে এলেন—আমি কোথাও খুঁজে



শুধু না আগবাদের। ভাবলুম—হয়ত নির্দিষ্ট দিনে রাজপুত্র থেকে  
খেরতে পারেননি, অথবা করেসপনডিং ট্রেণটি মিস করেছেন।' বাই  
দ্রুত পাশাপাশি অভিযোগে জানা গেল যে আমাদের সঙ্গে  
সকলকার যে 'গোল্ডেন ককার 'প্যানিয়েল' কুকুরটি ছিল—বার নাম  
'বুই'—সেই 'বুই'র নিশানা থেকে একজন টিকিট ডেকার মারক

তিনি আমাদের আগমন সংবাদ পেয়ে—পিছু পিছু ছুটে এসে  
থয়েছেন।

এইভাবে পথ থেকে পাকড়াও করে শশাক তারা আমাদের নিয়ে  
এসে তুললেন ইউনাইটেড্‌ ইন্ডাস্ট্রিয়াল ব্যাঙ্কের প্রথম বাড়ীর ঘিকলের  
উপর—তার নিজের কোঠাগারে। (কবিতাঃ)

## বিচার

### শ্রীনগেন্দ্রবিহারী বসু

গ্রামের মধ্যে কালীনাথ একজন সজ্জতিপন্ন লোক। গ্রামে  
ছুইখানা দোকান, মোটা রকমের চাব, তা ছাড়া ভেজারতি  
কারবারও ছিল। একদিন সকালবেলায় অনেক টাকা  
সঙ্গে লইয়া কালীনাথ গুপ্তা কিনিতে বাহিরে যাইতেছিল।  
গরুর গাড়ী প্রস্তুত, এমন সময় স্ত্রী আসিয়া বলিল—আজ  
তোমার বাঙরা হবঁ না। ভোর রাতে আমি একটা  
কুশপ দেখেছি।

কালীনাথ জিজ্ঞাসা করিল—কি স্বপ্ন দেখেছ ?

স্ত্রী বলিল—বলতে নেই, বরেন কুশপ কলে যায়।

কালীনাথ হাসিল—তবে আর কি। বল নি তো, স্বপ্ন  
আর কলবে না।

স্ত্রী প্রায় কাঁদিয়া বলিল—আমার মাথা খাও, এবার  
বাঙরা বন্ধ কর।

কালীনাথ স্ত্রীর মাথায় হাত রাখিয়া বলিল—স্বপ্নের কি  
কোন মানে আছে, ও চিরদিনই মিথ্যে। ও সব বাজে  
জিনিষে মন দিলে আমাদের ব্যবসা চলে না। তা ছাড়া  
ভগবানের নাম নিয়ে বেরিয়েছি। তোমাকে আমি বলছি  
কোন বিপদ হবে না—নিরাপদে বাড়ী ফিরে আসবো।

স্ত্রীকে নানারূপ বুঝাইয়া, ছেলে ছুটিকে কোলে করিয়া  
ভাদের গালে মুখে চুমু খাইয়া সে রওনা হইয়া গেল।  
বাইবার সময় গাড়ী হইতে মুখ বাহির করিয়া বলিল—ভয়  
নেই, ফিরে আসবো, নানারূপকে ডেকো, সাবধানে থেকে।

পথে এক বণিকের সঙ্গে দেখা হইল। সেও  
সুগুণা কিনিতে বাহির হইয়াছিল। সন্ধ্যাকালে ছুইজনে  
খাতিডাকার এক হোটেলে আশ্রয় লইল।

গ্রীষ্মকাল। প্রখর রৌদ্রে সেদিন কালীনাথ খুব কষ্ট  
পাইয়াছিল। তাই ভোরের ঠাণ্ডায় পথ চলিবে ঠিক করিয়া  
অতি প্রত্যুষে হোটেল হইতে বাহির হইল। ঘরের দুয়ার  
খুলিতেই নজরে পড়িল কপাট ভেজান, খিল খোলা  
রহিয়াছে। প্রথমে চমকিয়া উঠিল—এ কি? শুইবার  
সময় সে নিজেই তো খিল বন্ধ করিয়া শুইয়াছিল।  
জিনিসপত্র পরীক্ষা করিয়া দেখিল কাপড়-চোপড়, টাকার  
খোলে সব ঠিক আছে। মনে করিল, সঙ্গী বণিক হয়তো  
বাহিরে গিয়াছিলেন, খিল বন্ধ করিতে হয়তো ভুলিয়া গিয়া  
থাকিবেন। বণিক তখনও মশারীর ভিতর ঘুমাইতে-  
ছিলেন, তাঁহাকে জাগান বুঝা মনে করিয়া "হুর্গা হুর্গা"  
বলিতে বলিতে সে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

সেদিনও মধ্যাহ্নে আকাশ হইতে বেন অগ্নি বৃষ্টি  
হইতেছিল। কালীনাথ ও তাহার গাড়োয়ান তৃষ্ণাতুর  
হইয়া পড়িয়াছিল। গরু দুটি চলিতে পারিতেছিল না।  
নাক মুখ দিয়া ফেনা গড়াইয়া পড়িতেছিল। তৃতীয় প্রহরে  
পথের ধারে এক বৃক্ষ ছায়ায় তাহারা আশ্রয় লইল।

গাছের তলায় ঘাসের উপর গামছা বিছাইয়া কালীনাথ  
শুইয়া পড়িয়াছিল, গরু দুটি ভিজা ছানি খাইতেছিল,  
গাড়োয়ান রাধিবার আয়োজন করিতেছিল, এমন সময়  
সদলবলে পুলিশের দারোগা আসিয়া উপস্থিত হইল।  
কালীনাথের নাম, নিবাস প্রভৃতি জানিয়া লইয়া দারোগা  
জিজ্ঞাসা করিল—বাড়ী হ'তে কবে বের হয়েছ ?

কালীনাথ—গতকাল, সকাল বেলায়।

দারোগা—কোথায় বাবে।

কালীনাথ—সহরে, সওদা কিনতে।

দারোগা—রাতে শান্তিভাণ্ডার ছিলে?

কালীনাথ—আজ্ঞা হাঁ।

দারোগা—আর কেউ ছিল তোমার ঘরে?

কালীনাথ—ছিল, আর এক বণিক। তাঁর সঙ্গে কালাই পথে আমার দেখা হয়। কিন্তু এত কথা আমার জিজ্ঞাসা করছেন কেন?

দারোগা—সে যাত্রা গেছে। রাতে কেউ তার গলার ছুরি বসিয়ে তাকে খুন করেছে।

চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া কালীনাথ বলিয়া উঠিল—খুন? খুন করেছে?

দারোগা—সন্দের কাগজপত্র দেখে জানা গেছে তার কাছে অনেক টাকা ছিল। খুন করে চোর সব নিয়ে গেছে। তুমি ছাড়া সেই ঘরে আর কেউ ছিল না।

কালীনাথ—না, আর কেউ ছিল না, আমরা দুজনাই শুধু শুয়েছিলাম।

দারোগা কালীনাথের খানাতল্লাসি করিলেন। একটা থলিয়ার অনেক টাকা পাওয়া গেল, বিছানার স্থানে স্থানে রক্তের দাগ দেখা গেল, বালিশের তলা হইতে রক্তমাখা ছোরা বাহির হইল। কালীনাথ কাঁপিতে লাগিল।

দারোগা জিজ্ঞাসা করিল—খাঁকার করছ?

কালীনাথ জানাইল, টাকাটা তাহার নিজের, আর কোন কথা বলিতে পারিল না।

দারোগা বলিতে লাগিল—দুজনাই বণিক, দুজনাই সওদা কিনিতে বাহির হইয়াছিল, দুজনার কাছেই টাকা ছিল। শোবার সময় নিশ্চরই দুয়ার বন্ধ করে শুয়েছিলে। কেন, ঠিক কিনা?

কালীনাথ—ঠিক। আমি নিজেই দুয়ার বন্ধ করেছিলাম।

দারোগা—চারিদিকের অবস্থা দেখিয়ে দিচ্ছে তুমিই খুন করেছে।

কালীনাথ—না বাবু, এর কিছুই আমি জানি না।

দারোগা রক্তমাখা ছোরাখানা কালীনাথের চোখের সম্মুখে ধরিয়া বলিতে লাগিল—এই দেখ সেই ছোরা, এখনও রক্ত লেগে আছে। তোমার বিছানাতেই পাওয়া গেছে। এর পরও তুমি এর কিছুই জান না! তুমি ছাড়া করে যে আর কেউই ছিল না!

কালীনাথ—নারায়ণ জানেন, এর কিছুই আমি জানিনে।

দারোগা—ও-কথা সবাই বলে কালীনাথ।

তাহলে আদালতেই প্রমাণ দাখিল হবে।

কালীনাথকে সিপাহিরা বাঁধিয়া লইয়া ফেলিল। কালীনাথ সম্বন্ধে তাহার নিজ গ্রামেও অল্পসন্ধান করা হইল। সেখানে তাহাকে সকলেই ভাল বলিয়া জানিত। তাহার বিছানার রক্তমাখা ছোরা পাওয়া গিয়াছে শুনিয়া প্রতিবেশীরা বিস্মিত হইল, তাবিল—অসম্ভব কি—মাছুবের তো মন?

কালীনাথের জী কামিয়া চোখ মুখ ফুলাইল, মেজাজে মাথা কুটিয়া রক্ত বাহির করিল। ছোট ছোট দুইটি ছেলে, একটি এখনও মাতৃদুগ্ধ খায়, তাহাদের লইয়া লজ্জা সরম ত্যাগ করিয়া সদরে আসিল এবং বহু চেষ্টা করিয়া, অনেক টাকা খরচ করিয়া কালীনাথের সঙ্গে দেখা করিবার অহুমতি পাইল।

কালীনাথ হামতে, খুঁনে আসামী, হাতে হাতকড়া, পায়ে বেড়ি, একটি কুঠুরিতে একখানি কবলের উপর পড়িয়াছিল। চোখ দুটি কোটরে বসিয়া গিয়াছে, মাথার কালো চুল অনেক শাদা হইয়াছে, নিটোল কপালে দাগ বসিয়াছে, গালের মাংস ফুলিয়া পড়িয়াছে, এই কয় দিনেই সে যেন জীবনের দশ বছরের পথ আগাইয়া গিয়াছে। দেখিয়া অভাগিনী জী সহিতে পারিল না, আছাড় খাইয়া স্বামীর পায়ে মাথা ঝুঁজিয়া কতক্ষণ কামিয়া লইল। তার পর উঠিয়া নিজের চক্ষু মুছিয়া আঁচল দিয়া স্বামীর চোখ মুছাইয়া দিল। বলিল—বেশীক্ষণ থাকতে পাব না। বতরপ আছি দুটো কথা কও। কেঁদো না।

জড়িতস্বরে কালীনাথ বলিল—তোমার স্বপ্নই কলে গেল দেখছি

জী বলিল—না, না, কলবে না, কখনো কলবে না। তুমিই তো বলেছ স্বপ্ন মিথ্যে, তোমার কথা তো কখনো মিছে হয় না। এ বিপদ নারায়ণের পরীক্ষা, তিনিই সব কাটিয়ে দেবেন।

কালীনাথ চোখের জল হাত দিয়া মুছিয়া কেঁদিল। জীর হাত ধরিয়া বলিতে লাগিল—বণিক, শোন। আমি আর সে এক ঘরেই শুয়েছিলাম। শোবার সময় ডিডর

হতে আমিই ছোঁয়ার বন্ধ করেছিলাম, বরং আর কেউ ছিল না। সেই রাতে সে খুন হ'লো, রক্তমাখা ছোঁয়ার আঁটার বিছানায় পাওয়া গেল। কে বিশ্বাস করবে আমি মারি নি ?

শ্রী বলিল—বিশ্বাস ? আমি জানি তুমি করেনি, তোমাকে দিয়ে এ কাজ হয় নি, হ'তে পারে না। যে মাহব খেতে বসে ভাতের খালা ভিথিরিকে তুলে দেয়, ভাতারখানায় গিয়ে নিজের গা কেটে রক্ত দিয়ে অচেনা পরকে বাঁচায়, আর নিজে রক্তশূন্য হয়ে ছ মাস বিছানায় পড়ে থাকে, তাকে দিয়ে এ কাজ হয় না। নারায়ণ সব দেখেছেন তোমাকে তিনি নষ্ট করবেন না। যদি নারায়ণ আমার তক্তি থাকে, তোমার পায়ে মতি থাকে, তবে আজ জোর গলায় তোমায় বলছি, তোমার মুক্তি হুকুম হবেই হবে। আজ ধীরে তোমায় জেলে রেখেছেন তাঁরাই একদিন নির্দোষ জেনে তোমায় মুক্তি দেবেন। তবে তবে শরীর তো একেবারে মাটি করে ফেলছ, এমন করে আর দেহপাত করো না, আমি যে আর সহ্যেতে পারি না। হে ভগবান, হে নারায়ণ—ওগো শুধু তাঁকে ডাকো, তিনিই তোমায় মুক্তি দেবেন।

কালীনাথ দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বলিল—হাঁ মণিকা, এখন বাঁচাতে পারেন তিনিই। সত্যিই তিনি অসহায়ের সহায়, কিন্তু তাঁকে ডাকতে পারছি কই ! যখনই ডাকতে চাই, তিনি কেমন যেন বুক হতে খশে পড়ে যান। তাঁর আয়গায় তুমি, তোমায় ঐ ছেলে ছুটি বুক আমার জুড়ে বশে। কেবল মনে হয় তোমাদের নিয়ে বিভোর হ'য়ে বশে থাকি। তোমাদের কি হবে, তুমি অসহায় শ্রীলোক, ছেলে দুটিকে নিয়ে কোথায় পাড়াবে। কেবল এই সব কথাই-তাবি, মন এত চুর্কল, এত অস্থির—নারায়ণ ! নারায়ণ !—

সিপাহি আসিয়া বলিল—মাইজি বড়ি হো চুকা, আব্ব বানে হোণা।

মণিকা স্বামীর পায়ে হাত রাখিয়া বলিল—চলুম। আমাদের জন্ত তেবো না। যখন আমাদের সময় ছিল, তখন আমাদের নারায়ণের পায়ে ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত ছিলাম। এখনও তাই করে। আমাদের, তোমার ছেলে দুটিকে, তোমাকে তাঁরাই পায়ে ছেড়ে দাও। তিনিই সব দেখছেন। হে নারায়ণ, হে ভগবান !

বতকণ দেখা গেল কালীনাথ জানালা দিয়া শ্রী পূজকে দেখিল। তাহারা অদৃষ্ট হইলে মাটিতে লুটাইয়া পড়িয়া কাদিতে কাদিতে বলিল—হে হরি, ওদের তুমি দেখো।

শ্রী গৃহে আসিয়া বুকের রক্ত দিয়া গ্রামের আত্মীয়া দেবীর পূজা দিল। তিন দিন উপবাসী থাকিয়া গৃহ-দেবতা নারায়ণের পায়ে তুলসি দিল। নিজের অলঙ্কার, জমি, ধান, পুকুর, বাগান প্রভৃতির প্রায় সমস্ত বেচিয়া স্বামীকে রক্ষা করিতে অর্থ ব্যয় করিল। বলিয়ার টাকা তাহার যে নিজের সে কথা প্রমাণ হইল, কিন্তু কালীনাথ খালাস হইল না। তাহার প্রাণদণ্ড হইল না বটে, চৌদ্দ বছরের জন্ত কারাদণ্ডের আদেশ হইল।

২

ইহার পর দীর্ঘ পাঁচ বৎসর চলিয়া গিয়াছে। কালীনাথের চুল দাড়ি আর একটিও কাল নাই। তাহার দেহ সন্মুখ দিকে ছুইয়া পড়িয়াছে। সে ধীরে ধীরে হাঁটে, অল্প কথা কয়, কখনও হাসে না, জেলের কাজ করিয়া অবসর পাইলেই ভগবানের নাম করে। রাজি প্রত্যাহতে গলা ছাড়িয়া ভগবানের নাম গায়। বুঝা বয়সে সে সুগায়ক ছিল, দীর্ঘ কারাবাসে তাহার সব গেলেও গলার মিষ্টমুহুর তিলমাত্র নষ্ট হয় নাই। জেলখানার লোক জন্মের শাস্ত উবার তাহার অল্পমাখা গান শুনিয়া তক্তিতরে মাটিতে মাথা নোয়াইত, কত পাণ-তাপ দত্ত স্বর গলিয়া চক্ষু পাখে উৎস বহিত। জেলের কর্মচারিরা তাহার ব্যবহারে তাহাকে ভালবাসিত, কয়েদিরা শ্রদ্ধা করিত, কেহ ডাকিত “দাদা ভাই”, কেহ বলিত “সন্ন্যাসী”। জেলের মধ্যে সে সন্ন্যাসী কয়েদী বলিয়া পরিচিত হইয়াছিল।

একদিন একদল নূতন কয়েদি সেই জেলে বদলি হইয়া আসিল। রাজিতে নূতন পুরাতন কয়েদিদের মধ্যে গল্প শুদ্ধ চলিতেছিল। কোথায় বাড়ী, কাহার কি অপরাধ, আরও কত কিছু। একজন বলিল—তাহার তেজারক্তি কারবার ছিল, গ্রামের একজন খালা বাসন বন্ধক রাখিয়া টাকা ধার নিয়াছিল। কয়েকদিন পরে দারোগা আসিয়া সেই বাসন ধরিল। সেই বাসন নাকি চোরা বাসন। যে বন্ধক রাখিয়াছিল সে একেবারে অস্বীকার করিল; তার টাকাও গেল; বাসনও গেল, উপরন্তু বিনা দোবে তাকে জেলে দিল। আর একজন বলিল—ও রকম হয়

সাই। এই সেবার শান্তি-ভাষার হোটেলে একজনকে খুন করে নিয়ে গেল পুরোপুরি একটি হাজার টাকা। বে খুন করলে তার পাস্তাটি গেলে না, আবারের গায়ের এক গো-ঘোচারা, বিন্দু বিসর্গ কিছু জানে না—তাকে ধরে নিয়ে জেল দিয়ে দিলে চোদ্দ বছর। একেই বলে “উদ্যোগ সিদ্ধি বুদ্যোগ বাড়ি।”

পাশের ঘরে বসিয়া কালীনাথ সব শুনিতেছিল। শান্তি-ভাষার কথা শুনিয়া তাহার সমস্ত শরীরে কাঁটা দিয়া উঠিল। দুই ঘরের মধ্যে কাঠের ছয়ার, তাল বন্ধ। কপাট টেলিয়া ধরিলে সামান্য একটু কাক হয়। কালীনাথ সেই কাক দিয়া দেখিল তাহারই গ্রামের রজনী পাল। না ভুল হয় নাই, বাহিরের বিজলী বাতির উজ্জ্বল আলো ঘরের মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছে—রজনী পালই বটে। কি করিয়া জানিল যে, খুনের দ্বারে বাহার জেল হইয়াছে সে “নির্দোষী, গোবেচার, বিন্দু বিসর্গ কিছু জানে না।” কি করিয়া জানিল—পুরোপুরি এক হাজার টাকা! তবে কি রজনী? কালীনাথের বৃকের ভিতরে সমুদ্রের ঢেউ বেন বৃকের হাড়-গুলি ভাঙিয়া কেলিতে লাগিল।

প্রাণ কত কথা তাহার মনে পড়িল। এক পাঠশালার ছজনে পড়িয়াছে, এক সঙ্গে খেলা করিয়াছে, দুজনের কত বন্ধুত্ব, কত ভালবাসা! রজনীর বিবাহে সে কত আনন্দ করিয়াছে, তাহার নিজের বিবাহে রজনী নাচিয়া কুঁদিয়া হাসিয়া হাসাইয়া সকলকে পাগল করিয়া দিয়াছে। তারপর যৌবনে রজনী কুসংসর্গে পড়িল। যখন তাহার সর্ব্বশক্তি বিক্রি হইয়া যায়, তখন সে নিজে টাকা দিয়া তাহার বসতবাড়ী রক্ষা করিয়াছিল। রোগে পড়িয়া রজনীর জীবন বাঁচিবার আশা ছিল না, টাকার অভাবে চিকিৎসা হয় না জানিয়া সে অকাতরে টাকা খরচ করিয়া বন্ধু-পত্নীর প্রাণ রক্ষা করিয়াছিল। তাহার প্রথম ধোকার অন্নপ্রাসনে রজনী ধোকাকে রূপার বালা দিয়া আশীর্বাদ করিয়াছিল; তাহার জী জেলে যখন তাহাকে দেখিতে আসিয়াছিল, তখনও ধোকার হাতে সেই বালা ছিল; সেই রজনী! তাহার সুখ দুঃখের সাথী, বাল্যবন্ধু রজনী।

পরদিন রজনীর সঙ্গে কালীনাথের দেখা হইল। রজনী চিনিতে পারিল না, কালীনাথের দিকে চাহিয়া রহিল।

কালীনাথ বলিল—চিন্তে পারছো না? আমি কালীনাথ। শান্তিভাষার খুনের দ্বারে জেল খাটছি।

রজনী বলিল—কালীনাথ? কি বললেই গেছ তাই, সত্যিই আমি চিন্তে পারি নি?

কালীনাথ—কিন্তু তোমার এ প্রশ্ন কেন?

রজনী—আর বল কেন তাই। ঘোড়া চুরিতে জেল হয়েছে এক বছর। কিন্তু সত্যিই চুরি আমি করি নি। হাট হ’তে বাড়ী বাছিলাম। ঘোড়াটা মাঠে চরছিল। কাল বৈশাখী—পশ্চিমে মেঘ উঠেছিল। তাই ঘোড়াটার চড়ে বসেছিলাম তাড়াতাড়ি বাড়ী বাবার সঙ্গে। বাড়ী গিয়েই ঘোড়া আমি ছেড়ে দিতাম। বার ঘোড়া পথেই সে ধরে কলেছিল। আমার কথা হাকিম বিশ্বাস করলেন না, এক বছরের জেল দিয়ে দিলেন।

কালীনাথ—কতদিন বাড়ী ছাড়া ভূমি?

রজনী—তা প্রায় চার মাস। দুই বাড়ীরই সব ভাল দেখে এসেছি। বৌদি ভাল আছেন। ছেলে দুটি খুলে যায়—ভালই আছে।

কালীনাথের বুক কাটিয়া দীর্ঘনিশ্বাস বাহির হইল। মনে হইল কে বেন বর্ণা দিয়া তাহার বৃকে ধোঁচাইতেছে। তাহার জী, ছেলে দুটি!—কত দিন দেখে নাই! কি দোবে সে সব হারাইল। ভগবান তাহাকে সব দিয়া ছিলেন, কেন আবার কাড়িয়া লইলেন। অমন জী—রূপে লক্ষী, গুণে সরস্বতী! ছেলে দুটি নন্দকান্তি, হাসিতে জ্যোৎস্না ফুটিত, কান্নায় মুক্তা ঝরিত। তাহার এখন খুলে যায়! কত বড় হইয়াছে। তাহাদের সে কতটুকু দেখিয়া আসিয়াছিল? তাহাদের বৃকে ধরিতা, মুখে চুখ খাইয়া সে কি সুখ! আর কি তাহাদের দেখিতে পাইবে, আর কি সেখানে কিরিয়া বাইবে!

কালীনাথের দিন আর কাটে না। বছরিন কান্নাবাসে তাহার অতি কষ্টের দিনগুলি কালের নিয়মে অনেকটা সহিয়া গিয়াছিল। কিন্তু রজনীর সহিত দেখা হইবার পর হইতে মনে একটুকুও স্বস্তি ছিল না। তাহার ঘর সংসার, তাহার জী পুত্র, তাহার পুত্র-তরু মাছ, গোলা-ভরা ধান, তাহার গর বাছুর চাষ, আরও কত কিছু দিবারাজি তাহার বৃকে ভোলপাড় করিয়া বৃকটাকে বেন ভাঙিয়া চুরিয়া কেলিত, এক যুদ্ধের ভয় সে শান্তি পাইত না। জেলের

কাজ করিতে করিতে কাজ কেলিয়া একদিকে চাহিয়া থাকিত, পাঠ্যারামার আসিয়া বলিত—‘কেয়া হয় সন্ন্যাসী ভাই, বোঝার হয়?’ খাইতে বসিয়া খাইতে খাইতে তাতে হাত রাখিয়া চূপ করিয়া বসিয়া থাকিত, সন্ন্যাসী কয়েদিয়া বলিত—‘সন্ন্যাসী দাদা, খাচ্ছনা বে?’ দিনের পর দিন, সে এমনি অস্থির হইয়াই কাটায়। দিনের বেলা ঐ সব চিন্তা, রাজিতে ঐ সবের স্বপ্ন দেখা!

এক রাত্রে, বোধ হয় কোন স্বপ্ন দেখিয়াই সে ধড়মড় করিয়া বিছানা হইতে উঠিয়া বসিল। সমস্ত শরীর বামে একবারে ভিজিয়া গিয়াছে, মাথা চিন্ চিন্ করিতেছে। মাথা টিপিয়া ধরিয়া সে ঘরের একটা জানালার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। বীর নৈশ বাতাসে দেহ মন যেন জুড়াইয়া যাইতে লাগিল। গভীর রাত্রি, বিশ্বব্যাপী অন্ধকার, উপরে নক্ষত্ররাজির ক্ষীণ দীপ্তিতে যেন এক অপূর্ণ সৌন্দর্য্য ছুটিয়া উঠিয়াছিল—অচ্ছ, দিগ্ধ, মাধুর্য্যময়, বারবার দেখিতে ইচ্ছা করে। দেখিতে দেখিতে কালীনাথের শান্তিভাষার কথা মনে হইল। সে দিন হোটেলের বিছানার পড়িয়া বাহিরের দিকে খোলা জানলা দিয়া সে এমনি করিয়া চাহিয়াছিল। সে রাত্রি এমনি চলল লাভণ্যে ভরা, এমনি তারকাখচিত আকাশ, এমনি করিয়া জোনাকি জ্বলিতেছিল, এমনি আশ্চর্য্যবাহী বাতাস বহিতেছিল। আর সেই রাতে সেই বশিকণ নিশ্চিত মনে ঘুমাইতেছিল। আহা নিরপরাধ সেট বশিক—উঃ কি নিষ্ঠুর! যুমন্ত মায়কে খুন! পুরাপুরি একটি হাজার টাকার কি লাভ হইল, রজনী! কই সেই টাকা তোমার জেল হইতে রক্ষা করিতে পারে নাই তো। আহা সেই বশিক, ভাষার স্ত্রী, পুত্র, কস্তা—কোথায় হয় তো তাসিয়া গিয়াছে! তাহাদের কান্নার আকাশ বিদীর্ণ হইয়াছে—মায়ের কাঁদিয়াছে, পুতপকী কাঁদিয়াছে, বাতাস পাগলের মত ছুটিয়া বেড়াইয়াছে!—ও কি? পাশের বে ঘরে রজনী থাকিত সেই ঘর হইতে কেমন একটা শব্দ আসিতেছিল। কে যেন সন্তর্পণে বা মারিয়া কিছু ভাজিতেছিল। ছই ঘরের মধ্যে বে ভালাবদ্ধ ছয়রা তাহা তৈলিতেই একটু কঁক হইল। ঘরের আলোতে কালীনাথ দেখিল একজন লোক অন্ধ দিয়া ঘরের দেয়াল ভাঙিতেছে। ছয়রা তৈলার শব্দ হইয়াছে—লোকটা—অন্ধ কেলিয়া

কালীনাথের নিকট আসিয়া দাঁড়াইল। সে রজনী; কালীনাথ বলিয়া উঠিল—তুমি?

রজনী বলিল—হাঁ ভাই, আমি।

কালীনাথের মুখ দিয়া আর কোন কথা বাহির হইল না।

রজনী বলিতে লাগিল—জেল আর আমি সইতে পারছি না কালীনাথ, তাই পালাবার চেষ্টা করছিলাম।

কালীনাথ—পালাবার? জেল হ’তে? ধরা পড়বে বে; রজনী—না ভাই, সে তত্ত্ব আমার নেই। আমাদের পাহারার একজন সিপাহীকে বশ করিয়েছি। এই জেদে বধন আসি সঙ্গে লুকিয়ে কিছু টাকা এনেছিলাম—এদে শো টাকার একখানা নোট। সেই টাকা দিয়ে সিপাহীকে বশ করেছিলাম। প্রথম ঠিক হয়েছিল সে আমাদের ঘরের ছয়রের তাল খুলে আমাকে বের করে দেবে। কিন্তু চাবি থাকে জমাদারের কাছে। সিপাহি কিছুতেই সেই চাবি চুরি করতে পারে নি। অগত্যা দেয়াল ভাঙা ছাড়া আর উপায় রইল না।

কালীনাথ নির্ঝাঁক। রজনীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। রজনী বলিতে লাগিল—সিপাহি দেয়াল ভাঙিবার বস্ত্রপাতি আমাকে দিয়েছিল; সেই সঙ্গে একটা ওষু দিয়েছিল। সেই ওষু নাকে দিয়ে আমার ঘরের সজিদে অজান করে রেখেছি। ভোরের আগে তাদের ঘুম ভাঙবে না। যদি দেয়াল ভাঙতে পারতাম তবে সিপাহি ওষু ছয়র দিয়ে আমাকে জেলের বাইরে বের করে দিত। কিন্তু কিছুই হলো না। দেয়াল ভারি শক্ত, যেন ইটের নয়, লোহা দিয়ে তৈরি। পুরো দু ঘণ্টা পরিশ্রম করেও তিনখানি ইটের বেশী খসাতে পারি নি। তার উপর জীবণ গরম, যেমে নেয়ে উঠেছি। হাত একেবারে অবশ হয়ে পড়েছিল; একটু জিরিয়ে নিয়ে বেই কাজ আরম্ভ করেছি অমনি তুমি জেগে উঠে দেখে কলেছ। বাক, তুমি দেখেছ তাতে আমার বিশেষ ক্ষতি নেই, কিন্তু দেয়াল ভাঙা ব্যর্থ আর হয় না, বাইরে যেন করসা হয়ে আসছে।

কালীনাথ বলিল—তাই মনে হয়। প্রভাতী তারা যেন আমি দেখেছি। কিন্তু ভোর হ’লেই তো সব দেখে কলেবে।

রজনী—দেখুক, আমার ভয় কি। আমাদের এই  
সে পাঁচ জন করেছি, কে করেছে ঠিক কি? চার জন  
সপাই, এক এক জন পর পর পাহারা দেয়, কার পাহারার  
সময় ঘটনা ঠিক হবে না। দেখবার মধ্যে একমাত্র তুমি।  
তোমাকে দিয়ে আমার কোন অনিষ্ট হবে না। তুমি  
নিশ্চয়ই কিছু বলবে না?

কালীনাথ—কিন্তু ওরা যদি আমার জিজ্ঞাসা করে?

রজনী—বলবে কিছু জানি নে। তুমি ভিন্ন ঘরে থাক,  
তোমার কি?

কালী—ছি ছি, ও যে মিছে কথা হবে তাই।

রজনী কালীনাথকে চিনি। সে কিছুকণ কালীনাথের  
দিকে চাহিয়া রহিল, তার পর কানিয়া ফেলিল। বলিল—  
কালীনাথ, তুমি ছুরোরের ওপারে, আমি এপারে, নইলে  
তোমার পারে ধরতাম। জীবনে তুমি আমার অনেক  
উপকার করেছ, অনেক বিপদে বাঁচিয়েছ। এবারও  
আমার বাঁচাও। তুমি সাক্ষী মিলে ওরা আমার আত্ম  
রাখবে না, কোড়া মেরে গায়ের ছাল তুলে নেবে। জেল  
থেকে পালাবার চেষ্টা করার যে শক্তি, তা আমি আর এক  
জলে দেখেছি। সে আমি সহিতে পারবো না। আমি  
মরে যাব। ছেলে, মেয়ে, বউ—তাদের আর দেখতে পাব  
না। তোমার পারে পড়ি আমার বাঁচাও, ছেলে-মেয়েদের  
আমায় দেখতে দাও। তাদের না দেখে আমি আর  
থাকতে পারছিলাম না, তাই পালাতে চেয়েছিলাম।  
আমার বুক আশ্রয় জলছিল। তারা যে কি করছে,  
তাদের যে কি হচ্ছে কিছুই জানি না—তাদের কিছুই  
দিয়ে আসতে পারি নি। আমার এমন কিছুই নেই  
কালীনাথ যে তারা ধার।

অন্ত কেহ হইলে রজনীর কথার উত্তর দিতে পারিত।  
বলিতে পারিত কালীনাথের নিজের কথা, তার আপন স্ত্রী  
পুত্রের কথা, কিন্তু কালীনাথের মুখ দিয়া বাহির হওয়া তো  
দূরের কথা, এমত তাহার মনেও আসিল না। রজনীর  
চোখে জল দেখিয়া তাহার চোখেও জল দেখা দিল।

( ৩ )

সকাল কোন্‌তেই ভয়ঙ্কর আওয়াজ হইল। করেদী কিংবা  
সিপাহীদের নিকট হইতে কোনই সন্ধান পাওয়া গেল না।

রজনীর ঘর হইতে দেওয়াল ভাঙিবার আওয়াজ ও ফোরোকরদের  
একটি শিশি পাওয়া গেল। ইহাতে সন্দেহ হইল ঘরের  
সমস্ত করেদী বড়বড় লিগ্ন নাও থাকিতে পারে—কেহ কেহ  
হয় তো ঐবধ প্রয়োগে অজ্ঞান হইয়াছিল। সকলেই বধর  
কিছু জানে না বলিয়া প্রকাশ করিল তখন ডাক পড়িল  
পাশের ঘরের কালীনাথকে। জেলের সাহেব জিজ্ঞাসা  
করিলেন—তোমার পাশের ঘরের করেদীরা গভ রাতে  
দেওয়াল ভেঙ্গে পালাবার চেষ্টা করেছিল, সে সবকে তুমি  
কিছু জান?

কালীনাথ—জানি হজুর। আমি ছুরোরের কাঁক দিয়ে  
দেখেছিলাম, মাত্র একজন দেওয়াল কাটছিল, অন্য সব  
নিদ্রোঁষ, তারা ঘুমুচ্ছিল।

রজনীর মুখ সাধা হইয়া গেল।

সাহেব—এক জন? কি নাম তার?

কালী—হজুর, নাম বলতে পারবো না।

সাহেব—নাম জান না, বেশ, সনাক্ত কর।

কালী—না হজুর, নাম জানি, বলবো না।।

সাহেব—কি? বলবে না?

কালীনাথ চুপ করিয়া রহিল।

সাহেব বলিলেন—না বললে তোমার জীবন শাস্তি  
দেব। কোড়ার ঘায়ে দেহের চামড়া থাকবে না।

কালীনাথ তবুও চুপ করিয়া রহিল।

সাহেব বলিতে লাগিলেন—সন্ন্যাসী, বহুদিন তুমি এই  
জলে আছ। তোমার ব্যবহারে কোনদিন কোন খুঁত  
ধরা যায় নি। তোমার সৎ চরিত্রের জন্য তোমার দীর্ঘ  
সেবা কালের মধ্যে দেড় বছর রেহাই দেওয়া হয়েছে—  
তুমি এখন যদি সব জেনেও অপরাধীর নাম না কর, তবে  
তোমার চৌদ্দ বছরের একটি দিনও রেহাই পাবে না।  
তার উপর তোমাকে জীবন শাস্তি দেওয়া হবে।

কালীনাথ বলিল—হজুরের মরজী।

সাহেব পাঁচ দিয়া নিজের ওঠ চাপিয়া ধরিলেন—কপাল  
ক্লান্ত করিয়া বলিলেন—খুন তুমি ঠিকই করেছিলে।  
কাসি হওয়াই উচিত ছিল। তোমার বাইরেটা দেখে  
সন্দেহ হ'তো হয়তো তুমি দোষী নও, বিচারে তুল হলে  
থাকবে। এখন দেখছি তা নয়, আমাদেরই তুল, তুমি  
ঠিকই দোষী। এতদিন তোমার চরিত্রের যে বাইরেটা



দেখেছি সেটা বাইরেরই জিনিস, তিতরে তুমি যা ছিলে  
 রয়ে গেছ। আমি তোমায় শেষ কথা বলছি কালীনাথ—  
 পাঁচ মিনিট তোমায় সময় দিলাম। এখনও যদি বল  
 কোন শান্তি পাবে না। তোমার রেহাইয়ের দেড় বছরের  
 একটি দিনও কাটা যাবে না, কোনও শান্তি হবে না”—  
 বলিয়া সাহেব বাড়ি দেখিতে লাগিলেন। পাঁচ মিনিট গত  
 হইলে বলিলেন—বাস্। সময় পার হ'য়ে গেছে। গত  
 রাতে যে ঘটনা হ'য়ে গেছে সেটা জেলখানার খুব বড়  
 অপরাধ। তুমি সব বন্দে অপরাধীকে শাস্তি দিতে  
 পারতেন। নাম প্রকাশ না করার তার শাস্তি হ'লো না।  
 প্রকারান্তরে অপরাধীকে তুমি সাহায্যই করলে। এই  
 অপরাধে আমি তোমাকে দশ কোড়ার হুকুম দিলাম।  
 \* কোড়া এক প্রকার বেতের চাবুক। পাঁচ গাছা  
 লক্কে পাঁচ বেত ঝাঁটার মত এক সঙ্গে বাঁধা থাকে।  
 একটি আঘাতে পাঁচটি আঘাত হয়।

সেদিন সকল কয়েদির সম্মুখে কালীনাথের নয় দেহে  
 কোড়া মারিয়া সাহেবের আদেশ প্রতিপালিত হইল।  
 বেড়াবাতে জর্জরিত হইয়া কালীনাথ অচেতনের মত অসাড়  
 হইয়া পড়িয়া রহিল।

কালীনাথ জেলের হাসপাতালে। পরদিন বিকালের  
 দিকে রজনী নিঃশব্দে কালীনাথের বিছানার পাশে  
 আসিয়া দাঁড়াইল।

কালীনাথ জিজ্ঞাসা করিল—কেন এসেছ রজনী?

রজনী ধীরে ধীরে রোগীর শয্যা পাশে বলিল—  
 বলি—আজ তোমাকে একটা খবর দিতে এসেছি।  
 শাস্তিভাঙ্গার কে খুন করেছিল জান?

কালীনাথ—জানি। তুমি।

রজনী চমকিয়া উঠিল—আমি? এ তো কেউ জানে  
 না—তোমায় কে বলে?

কালীনাথ—তুমি। একদিন রাতে তুমি আর কয়জন  
 কর্মচারীর সঙ্গে গল্প শুভব করছিলে। শাস্তিভাঙ্গা খবর  
 লক্ষ্যে উঠেছিল। আমি আমার ঘর হ'তে সব শুনছিলাম।  
 তোমার কথাতেই বুঝেছিলাম, তুমিই খুন করে তার টাকা  
 দুইয়ে পাগিরেছিলে।

রজনী—এও তুমি জেনেছ। এ সব জেনেও আমার

কালীনাথ—কি ভাই।

রজনী একটু চুপ করিয়া বসিয়া বলিল—সে রাতে এক  
 অজানাকে খুন করেছিলাম, তোমাকে করি নি। বন্ধ  
 বলে যে করি নি তা'মনে করো না।

কালীনাথ কোন কথা কহিল না।

রজনী বলিতে লাগিল—যে মাছব মাছবকে খুন করে  
 তার আবার বন্ধ অবস্থ কি। সেই বণিককে খুন করে  
 তোমার গলায় বসাবো বলে ছুরি উচিরেছিলাম। সেই  
 সময় বাইরে কার পায়ের শব্দ হ'লো, তুমিও একটু নড়ে  
 উঠলে, ভয়ে আমার প্রাণ কেঁপে উঠলো, তোমাকে আর  
 খুন করা হলো না। ছোরাখানা তোমার বিছানায় রেখে  
 পাগিয়ে এলাম। কেন রেখে এলাম জান? তোমাকে  
 জড়াবার জন্য। তোমার বিছানায় রক্তের দাগ থাকবে,  
 রক্তমাখা ছোরা তোমার বালিশের নীচে পাওয়া যাবে,  
 তোমাকে নিয়ে টানাটানি পড়ে যাবে, অন্য কোন দিকে  
 কারুর নজর থাকবে না। আমি নিশ্চিত—জানি আমার  
 উপর সন্দেহ আসতে পারে না। শুনলে কালীনাথ কেমন  
 তোমার বন্ধ, কেমন বন্ধুর সঙ্গে আজ তুমি হাসপাতালে  
 মরতে বসেছ। রজনী কাঁদিয়া কেলিল।

কালীনাথ ধীরে ধীরে রজনীর গায়ে হাত দিল, বলিল  
 —এ সব কথা আর কেন ভাই।

চক্ষু মুছিয়া রজনী বলিল—ভাই বলছি। শোন। আমি  
 সব ঠিক করেছি। কাল ওরা যখন তোমায় বেত মারছিল,  
 বেতের ঘায়ে গা চিরে যখন মাংস উঠে বাচ্ছিল, গা বয়ে  
 রক্ত পড়ছিল—তখন আমি দেখেছি, তোমার মুখ একটুও  
 বিকৃত হয় নি, কি একটা হৃদয় অস্পষ্ট হাসি তোমার  
 মুখে ফুটে উঠেছিল। এমন আর কখনও দেখি নি। কি  
 সে শান্তি! কি ভীষণ! কি নিষ্ঠুর!—এমন শান্তির মাঝে  
 মুখের এমন ভাব আর কখনো দেখি নি। সেই থেকে  
 মাধায় আমার আশ্রয় জন্মেছে। আমি সব ঠিক করেছি।  
 বণিক তো শেষ হয়েই গেছে, কোথায় বাঁকী, কোথায় ঘর,  
 কে তার আছে, জানি না। তবু তুমি আছে। তোমার  
 হৃদয় জীবনটা আমিই নষ্ট করে দিয়েছি। তুমি নির্দোষ,  
 তুমি মাছব নও, তুমি দেবতা; তবুও তুমি জেল খাটছ।  
 জেলে আর তোমায় আমি রাখতে দেবো না, আমি সব

রজনী কিরিয়া পাঁড়াইরা বলিল—আর নয়। আমার  
কথা শেব হরহে, আমি কমান অযোগ্য, তাই তোমার  
কাছে কমা চাই নি। শান্তিই আমাকে নিতে হবে, তাই

রজনী তাহার সমস্ত অপরাধ স্বীকার করিয়াছিল।  
কয়েকদিন পর কালীনাথের মুক্তির আদেশও আসিয়াছিল।  
কিন্তু তাহার পূর্বেই কালীনাথ এপারের সমস্ত বন্ধন হইতে  
মুক্ত হইয়া ওপারে চলিয়া গিয়াছে।

১৯৪৯-৫০ সালের কলিকাতা চিত্র প্রদর্শনী

এবারে সংগ্রহ পূর্বাপেক্ষা জের, কিন্তু মিথিল ভারত নামের মধ্যাঙ্গ  
অকুর রাখতে অক্ষম; প্রবর্তন পদ্ধতি পূর্বাপেক্ষা উন্নত। তবে এ

পড়াহুগুপ্তক বিশেষ পরিবর্তন চোখে পড়ে না। এর পাশ্চাত্য পদ্ধতিতে  
আঁকা ৩৩ নং প্রদর্শন “মিলন” আর একখানি জলরঙা ছবি বিজয়ীর  
শ্রেষ্ঠত্বের সম্মান পেয়েছেন, মহারাজা বাহাদুর তাঁর কাষেধর সিংহ-  
বর্ষণমক পেয়ে। ২৮২ নং প্রদর্শন এই বিভাগে দ্বিতীয় সম্মান লাভ  
করেছেন—শিল্পী ইন্দ্র হুগের, শ্রীযুক্ত এন, সি, ঘোষ-রোপ্য পদক পেয়ে।  
এই বিভাগে আরও করেজন শিল্পীর কাজ উল্লেখযোগ্য, তাদের মধ্যে  
শির-কালোহান বুকের স্ফটিকন রমণীর। শিল্পীকে ২৫০ টাকার একটি  
বিশেষ পুরস্কার দিয়ে সম্মান দেওয়া হয়েছে—২০৪ নং প্রদর্শন ব্যাকপাশ



১৮৮৩ খ্রিঃ ১৯৩০ খ্রিঃ  
 ১৯৩০ খ্রিঃ ১৯৩০ খ্রিঃ

শিল্পী বাবন দত্তের ডেজাইন বিভাগে তার আবদুল হানিম গজদারী



প্রদর্শন "হাট" চিত্রে (প্রতিলিপি নং ২)। দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছেন, জে, পি, গাঙ্গুলী-রৌপ্য পদক পেয়ে শিল্পী শাম্ভু মহাবীর— ১৯৬ নং প্রদর্শন "ঘোড়-ঘোড়" চিত্রে। এই বিভাগের প্রদর্শন সংখ্যা স্তম্ভাধিক। কয়েকজন প্রখ্যাতনামা শিল্পীও এ বিভাগে যোগদান করে প্রদর্শনীর মর্যাদা রক্ষা করতে চেষ্টা করেছেন, তন্মধ্যে স্থানীয় শিল্পী জে, পি, গাঙ্গুলী মহাবীর, শিল্পী রমেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, শিল্পী এল, এম, সেন। এঁর কাজের বৈশিষ্ট্য সহজেই পরিলক্ষিত হয়, অসমান ভিত্তিতে তৈলচিত্র অঙ্কন পদ্ধতি এঁরই সাধনাপ্রসূত; অপরাপর চিত্রে থেকে খাত্তা বজাব রেখেছে। শিল্পী রমেন চক্রবর্তীর তৈল চিত্র জয়দ্রাঘী হয়নি। ৩৯২ নং প্রদর্শন, শিল্পী বসন্তকুমার গাঙ্গুলী মহাবীরের "তিনটি

২৩১ নং চিত্রের শিল্পী গোপাল ঘোষের আঁকা চিত্রগুলির মধ্যে তাঁর নিজস্ব ধারা পরিষ্কৃত। চিত্রের মধ্যে তুলির ব্যবহারপদ্ধতি ৩ বর্ষবিভাসের বলিষ্ঠ ইঙ্গিত অনবদ্যার্থ্য। এঁর আঁকা ২১৩ নং প্রদর্শন "কালিঙ্গের ভূটরা রমণী" (প্রতিলিপি নং ৩) চিত্রখানি সত্যিই দর্শককে আনন্দদান



প্রতিলিপি—৪

করার ক্ষমতা রাখে। শিল্পী দয়রন্তী চোলায় আঁকা ৩৯৭ নং প্রদর্শন "প্রসাধন" (প্রতিলিপি নং ৪) চিত্রখানির আলোছায়ার সমন্বয় অতি সহজে আমাদের চোখে ধরা দেয়। শিল্পী ডরেনা মেরীর আঁকা ৪৫নং প্রদর্শন 'গ্রামের মেয়ে' (প্রতিলিপি নং ৫) চিত্রখানি মহিলা বিভাগে



প্রতিলিপি—৩

ফুল" ছবিখানি তিন ভয়ীর প্রতিষ্ঠুতি। তৈল চিত্রের বর্ণবিভাসের আভিজাত্য পরিষ্কৃত, এঁর সম পর্যায় আসে এমন চিত্র একখানিও প্রদর্শিত হয়নি এ বৎসর। স্থানান্তরে বিশেষ আলোচনা সম্ভব হলোনা। শিল্পী সত্যীন্দ্র সিংহ মহাবীরের তৈলচিত্রে রামায়ণের ছ'একখানি চিত্র ও ফুলস্কন্ধের চিত্রখানি মনোরম। শিল্পী পাণিকরের "তবঙ্গী মাতা" ৩৯৮ নং প্রদর্শন তৈলচিত্রখানি অপূর্ণ। শিল্পী এ, এ, আলমিল করের "চার বোন" ২৮৫ নং প্রদর্শন ছবিখানির বিবরণ-বস্ত ও বর্ণ বিভাস প্রশংসনীয়। ক্যালকাটা গুপ্তএর কাজগুলির মধ্যে শিল্পী রতন মৈত্রের "প্রাকভোজন" ২৮৬ নং প্রদর্শন, ছবিখানিও প্রশংসনীয়। শিল্পী ট্রেলা গ্রাউন্ডের কাজগুলি পূর্ব আকর্ষণীয় হয়নি। বিবরণ নিম্নলিখিত হয়নি।



প্রতিলিপি—৫

বিশেষ সম্মান পেয়েছে ও শ্রীতেজেশ বড়াল রৌপ্যপদক লাভ করেছেন। শিল্পী কিশোরী রায়ের ১৪৩ নং প্রদর্শন শিল্পাচার্য দেবী প্রসাদের প্রতিমূর্তি তৈল চিত্রখানি আকারে ছোট হলেও কৃতিত্বের দিকে দৃষ্টি দেয়।

প্রাচ্য বিভাগে প্রদর্শন সংখ্যা পূর্ব বর্ষের নয় এবং ক্রিয়াকর্মও প্রকাশ

পারেনি কোনও খানাতেরই। চিত্রগুলি আরই মাহুলী ধরনের। শিল্পী এস. বি. পালিনকরকে তাঁর ৩৬৯ নং প্রদর্শন “আমার প্রতিবেশী” চিত্রে জুনার প্রত্যাশারাম ঠাকুর স্বর্ণপদক দিয়ে শ্রেষ্ঠ সম্মান দেওয়া হয়েছে। দ্বিতীয় সম্মান শ্রীবরদা উকিল রৌপ্যপদক পেয়েছেন শিল্পী অভিতকুমার



প্রতিলিপি—৬

ভগত তাঁর ১৪৪ নং প্রদর্শনে। শিল্পী পূর্ণচন্দ্র চক্রবর্তীর খাম কয়েক চিত্র প্রদর্শিত হয়েছে কিন্তু সজীবতা প্রকাশ পারনি একটিতেও। শিল্পী কমলারঞ্জন ঠাকুরের প্রদর্শনগুলি মনোরম। এই বিভাগে এঁর ৪৪৯নং



প্রতিলিপি—৩

প্রদর্শন “ভগবান বুদ্ধ ও সূর্যাতা” চিত্রখানি ২৫০ টাকার লোটাস ট্রাষ্ট বিশেষ পুরস্কার পেয়েছে। এ ছাড়া এই বিভাগে আর কোনও উল্লেখযোগ্য প্রদর্শন দেখে পড়েনা।

ভারত বিভাগ আরও কিছুটা সংগ্রহ—ভারতীয় শিল্পীদের পূর্বপৌরব

বিস্তৃত হতে হয় এই বিভাগের প্রদর্শন দেখে। মাত্র দু-একজন শিল্পী এই বিভাগের সম্মান রক্ষা করেছেন। গত কয়েক বৎসর বঙ্গ দেখা যাচ্ছে, এই বিভাগে ক্রমশই দুর্বল হয়ে পড়ছে। গত বৎসর লক্ষ্য থেকে একটি প্রদর্শন পাঠিয়ে প্রদর্শনীকে সাক্ষাৎকৃত করতে চেষ্টা করেছিলেন। কয়েকজন শিল্পী, এ বৎসর তাঁরা যে কোনও কারণেই হোক সহযোগিতা করেনি। প্রদর্শনীর বিশেষ ভরসা কলকাতার আর্ট স্কুলের উপর; কিন্তু দুঃখের বিষয় কলকাতা আর্ট স্কুলের এই বিভাগের বহুদিন যাবৎ দুর্বল হয়ে আছে, সেখান থেকে আর বিশেষ কিছু করা আমাদের পক্ষে বাড়ুলতা। শিল্পী মহীল পালের প্রদর্শিত ৫নং প্রদর্শন



প্রতিলিপি—৭

“শিল্পীগুরু অবনীন্দ্রনাথের প্রতিমূর্তি” (প্রতিলিপি ৬) একমাত্র প্রদর্শন—বার মধ্যে নুতনও আছে, যে কাজখানিকে কেন্দ্র করে অনেক কিছুই বলা যায়। কাজখানি রসিকদের মধ্যে আনন্দদান করবে সন্দেহ নাই। এটিকে শ্রীকানাইলাল জেঠিয়া স্বর্ণপদক দিয়ে এই বিভাগের শ্রেষ্ঠ সম্মান দেওয়া হয়েছে। এই বিভাগের আর একখানি প্রাণবন্ত প্রদর্শন ২নং “চুখন” (প্রতিলিপি নং ৭) একখানি কাঠকলক থেকে শিল্পী এটিকে খুঁজে বার করেছেন। শিল্পী ধনরাজ ভগবৎ এঁরই ১নং প্রদর্শনখানিকে রায়বাহাদুর, আর, এন, মুখার্জী রৌপ্যপদক দিয়ে সম্মানিত করা

য়েছে। এই বিভাগের বিভিন্ন পুরস্কার রান্না বিবেচনায় নিয়ে সাতজন  
হাজার রৌপ্যপদক পেরেছেন শিল্পী বিভাগের মহাশয় তাঁর “এক” ১৭২



প্রতিলিপি—৮

একদশে। “অক্ষয় বিভাগের বিকল্পক” একজন ১৭২, “হুই বোন” (প্রতিলিপি নং ৮) রত্ন, কাঠ খোদাই চিত্রে বিশেষ  
পুরস্কার নরেন্দ্রনাথ মুখার্জী স্বর্ণপদক পেরেছেন শিল্পী হরেন দাস। কাঠ  
খোদাই চিত্র হিসাবে হবিট অগুরু, এর মৌলিকত্ব অবদানকার্য। শিল্পী  
অনিয়া মুখার্জীর ২৭ নং প্রদর্শন “সুভারতা হুমারী দল” (প্রতিলিপি  
নং ৯) রত্ন কাঠ খোদাই ছাংগা, এটিও হুমার অগরীপ নিয়ে স্বর্ণপদক  
পেরে সম্মানিত হয়েছে।

শিল্পী অনিলকুমার ভট্টাচার্য তাঁর ১৭২ নং প্রদর্শন “আলোর তলে”  
প্যাটাল চিত্রে ২৫০ টাকার ইউনিয়ন রত্ন পেরে সম্মানিত হয়েছে।

শিল্পী গিরীশ মণ্ডলকে তাঁর ২৬৩ নং প্রদর্শনে “হুগো পুকা” চিত্রে  
১২৫ টাকা লোটার ট্রাষ্ট পুরস্কার দিয়ে সম্মানিত করা হয়েছে।

পরিশেষে মন্তব্য হিসাবে শিল্পী ও শিল্প-রসগিণীপাঠকের তরফ থেকে  
হু’ একটি বক্তব্য হরত প্রদর্শনী কর্তৃপক্ষের অগ্রিম সাপরে তবু বলতে  
বাধ্য হচ্ছি, প্রেক্ষাপ্রদর্শন হিসাবে সর্বশ্রেষ্ঠ সম্মান যে চিত্রখানিকে দেওয়া  
হয়েছে, কর্তৃপক্ষের বিচারক গোষ্ঠী কি তার চেয়ে ভাল প্রদর্শন এবারের  
চিত্র প্রদর্শনীতে খুঁজে পাননি? না দেখেও চোখ বন্ধ করে বলেছিলেন,  
বিশেষ শিল্পীর প্রতি দরদর দেখানর অহুঃপ্রণয়? শিল্পী চকল কর,  
শিল্পী কালোয়ালকুমার, তরুণ শিল্পী রঞ্জনকামরান মন্ডল, শিল্পী গোপাল বোম,  
এঁদের চিত্রগুলি কি তখনও টাঙান হয়নি। তৈল চিত্রের প্রেক্ষাপ্রদর্শন  
প্রদর্শনী কর্তৃপক্ষের তরফে লজ্জাই প্রকাশ পায়। এখন জরসাধারণের  
বিচার চকু-উদ্বীলিত হয়েছে, হবি দেখতে তারা শিখেছে। সর্বশেষ বক্তব্য  
প্রদর্শনী থেকে বেরিয়ে আসার পর আর একখানি প্রদর্শনও মনে রেখা-  
পাত করে থাকে না।

## অভিনন্দন

শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা

নাই পেলে তাহাদের স্থখ্যাতি, সম্মান,  
বীরত্বের আফালন কথা মাজে শেষ,  
চক্রে আলো লেগে আছে বপ্তের আবেশ,  
স্বাধীনতা মনে তাবে ঔনার্থ্যের দান।

স্বাধিকার-প্রমত্তের নাহি হেথা স্থান,  
উজ্জ্বল বসি দেয় তারা সবারে নির্দেশ,  
আদরা হরিজ, রিত, আদরাই দেশ,

হৃদয়ে নেহুয়ে করি তোমাতে আস্থান।

বে পারে করিতে ত্যাগ সে-ই শুধু পায়।  
জীবনে আচ্ছন্ন করে দারুণ বিবাদ,  
বদেহ আকাশ কালো অন্ধ তমসার,  
কে জাগাবে? কে বুচাবে এই অবসার?  
নির্ভীক, তোমার পানে লারা লেশ চার,  
ভাষা জননীর কলি লভিলে প্রসার।



(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

তমলুক মহকুমা ও তৎপার্বত্য অঞ্চলের নেতৃত্ব ২৭শে সেপ্টেম্বর তারিখে এক শুণ্ড বৈঠকে সমবেত হইলেন এবং সিদ্ধান্ত করিলেন যে থানা, আদালত-গৃহ প্রভৃতি সরকারী ভবনসমূহ দখল করিয়া তাহার উপর জাতীয় পতাকা উত্তোলন করিতে হইবে। হাজার হাজার বেচ্ছাসেবক লইয়া গঠিত বিদ্রোহবাহিনী ইহার পরদিনই কর্তৃত্বপূর্ণ হইয়া উঠিল। বড় বড় গাছ কাটিয়া রাস্তার উপর কেলিয়া, সেতু ধ্বংস করিয়া এবং টেলিগ্রাফ-টেলিফোনের তার কাটিয়া দিয়া পোষ্টগুলি উল্লভাইয়া কেলিয়া তমলুকের সহিত বহির্বিগতের যোগাযোগ রহিত করা হইল। লাঠি চার্জ ও গুলিবর্ষণ অগ্রাহ্য করিয়া দিন দুয়ের মধ্যেই তিন-চারটি থানা অধিকার করিয়া সেগুলির উপর উত্তোলিত করা হইল জাতীয় পতাকা। পাঁচটি বড় বড় শোভাযাত্রা ২৯শে তারিখে পরিকল্পনা অনুযায়ী বিভিন্ন দিক হইতে মহকুমাসহর তমলুকের দিকে অগ্রসর হইল। জনতা থানার নিকটবর্তী হইলে পুলিশ তাহাদের উপর নির্দয়ভাবে লাঠি চালাইতে থাকিলেও সফলত্ব জনতা তাহাতেও নিকৃত না হইয়া অগ্রসর হইতে লাগিল। তখন শোভাযাত্রীদিগের উপর পুলিশ ও মিলিটারি হুক করিল গুলিবর্ষণ। ইহাতে কিছু লোক চলিয়া গেল বটে, কিন্তু বাহারা শোভাযাত্রা পরিচালনা করিতেছিলেন, তাহারা পিছু না হট্টয়া অগ্রসর হইতেই লাগিলেন। গুলিতে বহুলোক হতাহত হইল। রাস্তায় বেরাকে সাংঘাতিকভাবে আহত অবস্থায় প্রেস্তার করিয়া থানার লইয়া বাওয়া হইল। সংজাহীন অবস্থায় তিনি থানার পড়িয়া রহিলেন। বহুক্ষণ পরে যখন তাহার সামান্য জ্ঞান করিয়া আসিল, তখন তিনি চলিতে চলিতে রক্তাক্ত কলেবরে কোনও মতে থানার বাহিরের দিকের দরজার নিকট পর্যন্ত অগ্রসর হইয়া গেলেন। সেখান হইতেই তিনি তাহার অপর সঙ্গীদিগকে ডাকিবার ভঙ্গীতে চীৎকার করিয়া বলিলেন,— “এই যে আমি থানার এসেছি—থানা দখল হয়েছে।” কথাগুলি বলিবার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি পড়িয়া যান এবং অবিলম্বে মৃত্যুমুখে পতিত হন।

এই সকল শোভাযাত্রার একটিতে ছিলেন ৭৩ বৎসর বয়স্ক মাতঙ্গিনী হাজরা। ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামের ইতিহাসে তাহার অভিনব লাত্মবিসর্জন এক অপূর্ণ মহিমার সমুদ্র। তমলুক মহকুমাসহরের থানার দিকে উত্তর দিক হইতে যে শোভাযাত্রাটি অগ্রসর হইতেছিল—তিনি ছিলেন তাহারই মধ্যে। সৈন্তগণের প্রবল গুলিবর্ষণের মুখে শোভাযাত্রীগণ সাময়িকভাবে পশ্চাদপসরণে বাধ্য হয়। সেই সময় লক্ষ্মীনারায়ণ দাস নামক জনৈক বালক অগ্রসর হইয়া একজন সৈন্তের নিকট হইতে তাহার রাইফেল কাড়িয়া লইলে নির্দয়ভাবে তাহাকে হার কড়া হয়। মাতঙ্গিনী হাজরা তখন ত্রিধ্বংসপ্রাপ্ত পতাকা হাতে ইয়া সৈন্তদের অত্যাচারে প্রবেশ করেন এবং তাহাদিগকে নিবৃত্ত

করিবার প্রয়াস পান। তাহার অটুট দৃঢ়তা ও সাহস দর্শনে সৈন্তগণ কিছুক্ষণের জন্য যেন হতমুগ্ধ হইয়া পড়ে এবং পিছু হট্টয়া যান, কিন্তু পরক্ষণেই তাহার প্রতি তাহার গুলিবর্ষণ করে। যে হস্তে মাতঙ্গিনী জাতীয় পতাকাটি ধারণ করিয়াছিলেন, তাহা গুলির দ্বারা সাংঘাতিকভাবে আহত হয়। মাতঙ্গিনী তথাপি পতাকাটি দৃঢ়ভাবে ধরিয়া থাকিয়া সৈন্তগণকে অনুরোধ করিতে লাগিলেন বাহাতে ভারতীয় হইয়া তাহার ভারতীয়গণের উপর গুলিবর্ষণ না করে এবং চাকুরী ত্যাগ করিয়া তাহারও স্বাধীনতার সংগ্রামে যোগদান করে। ইতিমধ্যে নিকশিত আর একটি গুলি আসিয়া তাহার লমট ভেদ করিয়া যায় এবং ভূপতিত হইয়া তিনি তৎক্ষণাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হন। তাহার মৃত্যুর পক্ষত দেখা যায় যে পতাকাটি তিনি দৃঢ় হস্তে পূর্বেরই মত ধারণ করিয়া আছেন। তাহার রক্তে চারিদিক দ্রাবিত হইতে লাগিল। একজন সৈন্ত ছুটয়া গিয়া লাধি মারিয়া পতাকাটি কেলিয়া দিল। দেখা গেল যে মাতঙ্গিনীর আশে-পাশে লক্ষ্মীনারায়ণ দাস প্রভৃতি আরও কয়েকজনের মৃতদেহও পড়িয়া আছে। ইহার পর সৈন্তগণ সন্ন্যাস হান্দি পাছায়া দিয়া রাখে এবং আহতগণের মধ্যে বাহারা যত্নপর আর্ন্তর্য্য করিতেছিল, তাহাদেরও শুশ্রূষা করিতে কাহাকেও নিকটে বাইতে দেয় না।

দুর্দৈব জনসাধারণ কিন্তু কিছুতেই শায়েস্তা হইল না। সকল বাণবির অতিক্রম করিয়া তাহারা কাঁধ চালাইতে লাগিল। মেদিনীপুরে আন্দোলনটা প্রবল হইল কাঁধ এবং তমলুক মহকুমাত্তই। থানা, পুলিশ-কাড়ি, ডাকঘর, ইউনিয়ন বোর্ড অফিস, মন্দের ঘোঁকান প্রভৃতি জনসাধারণ আগুন দিয়া পুড়াইয়া দিল, টেলিগ্রাফ-টেলিফোন লাইন ধ্বংস করিয়া দেওয়া হইল, কোন কোন সরকারী কর্মচারীকে লোকে প্রেস্তারও করিল। এই সময় ১৯ই অক্টোবর মেদিনীপুরের উপর দিয়া যে প্রচণ্ড ঝড়। প্রবাহিত হইয়া যায় এবং তাহার সহিত যে বজ্রার প্রাবল ঘটে, তাহাতেও—প্রাকৃতিক দুর্যোগ এবং সরকারী অত্যাচারের মধ্যেও মেদিনীপুরবাসীদের মনোবল ভালিয়া পড়ে নাই। অবস্থা শেষ পর্যন্ত এমন স্তরে গিয়া পৌঁছাইল যে কোন কোন অঞ্চলে বৃষ্টি-শাসন-কর্তৃব্য একেবারেই ভালিয়া পড়িল। ১৯৪২ সালের ১৭ই ডিসেম্বর প্রতিষ্ঠিত হইল তাম্রলিপ্ত জাতীয় সরকার। উক্ত সরকারের অন্য একজন সর্কাধিনায়ক নিবৃত্ত হইলেন এবং তাহাকে বিভিন্ন বিষয়ে সাহায্য করিবার জন্য কয়েকজন সঙ্গীও নিবৃত্ত হইলেন। এই সরকারের অধীনে বিভিন্ন থানা-এলাকার আরও কতকগুলি অধীন শাসন-কেন্দ্র গঠিত হয়। পূর্বে গঠিত বিদ্রোহবাহিনী এই সরকারের নিয়মিত সেনাবাহিনীতে পরিণত হয়। বিচারকার্য, শান্তি-শৃংখলা রক্ষা ইত্যাদি সমূহ বিষয়ই হস্তশৃংখলার সহিত পরিচালিত হইতে থাকে। আর্ন্ত ও হুঃহুঃ ব্যক্তিগত

শান্ত, বর ও উৎসর্গ বিতরণ করিয়া জাতীয় সরকার জনগণের প্রভুত্ব লেখা করেন।

এই আন্দোলন রমনকরে বৃটিশ গভর্নমেন্টও ব্যাপকভাবে রমননীতি প্রচাৰিত থাকেন। নানা স্থানে সৈন্তগণের ছাউনি পড়ে। পুলিশ ও মিলিটারির রাজস্ব হ্রাস হইয়া যায়। গুলি চালনা বেন সাধারণ ব্যাপার হইয়া পড়ায় এবং বিভিন্ন স্থানে যে কত লোক হতাহত হয়, তাহার ইয়ত্তা নাই। গুণাগুণকে উৎসাহ দিয়া সৈন্তগণ তাহাদের সহিত এক-যোগে লুটপাট চালায়, লোকের ঘর-বাড়ীতে আশ্রয় দিয়া পুড়াইয়া দেয়। এইভাবে লক্ষ লক্ষ টাকার সম্পত্তি নষ্ট করিয়া দেওয়া হয়। পাইকারী দ্রব্যাদি আদায় করা হয় বহু স্থানে। প্রয়োজন হইলে বিমান হইতেও পর্যবেক্ষণ কার্য চালায় হয়। আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা কেহই এই পীড়ন হইতে রেহাই পায় নাই। সৈন্তগণ বহু স্থানে বহু নারীকে ধর্ষণ করে। মেদিনীপুরে অসুস্থিত নারীকীর অত্যাচার বৃটিশ গভর্নমেন্টের মুখে চূর্ণকালি সেপিয়া দিল।

আগষ্ট-বিদ্রোহ ভারতের সকল প্রদেশেই শুরু হয় এবং উহার ঢেউ গিয়া আসামেও পৌঁছায়। আসামের সকল কংগ্রেস নেতাকেই গ্রেপ্তার করা হয়। শোভাবাজী প্রভৃতির উপর পুলিশ বেপরোয়া লাঠি চালাইতে থাকে। দারং জেলার অন্তর্গত গোপুর থানা-ভবনে জাতীয় পতাকা উত্তোলিত করিবার উদ্দেশ্যে ২০শে সেপ্টেম্বর একদল লোক অগ্রসর হইলে পুলিশ তাহাদের উপর গুলি চালায়। ইহার ফলে বহু লোক আহত এবং কনকলতা নারী জনৈকা মহিলা নিহত হন। কনকলতার হস্ত হইতে জাতীয় পতাকাটি লইয়া অপর একজন থানার দিকে অগ্রসর হইলে পুলিশ তাঁহাকেও গুলি করে। প্রবল গুলি বর্ষণকে অগ্রাহ্য করিয়া শেষ পর্যন্ত কয়েকজন গিন্না থানার উপর জাতীয় পতাকা উত্তোলন করিতে সক্ষম হন।

উক্ত দিবসেই ঢেকাইজুলি থানা অভিমুখেও একদল শোভাবাজী অগ্রসর হন। কুলেশ্বরী নারী একটি অন্ন বরফা বালিকা ও আরও জন কুড়ি লোক সেখানে গুলিতে প্রাণ হারায়। একজন যুবক সকল বিপদ অগ্রাহ্য করিয়া অগ্রসর হইয়া থানার উপর জাতীয় পতাকা উড়াইয়া দেন—কিন্তু পুলিশের গুলিতে তিনিও সেখানেই প্রাণ হারান।

আসাম প্রদেশের চতুর্দিকেই পুলিশের ও মিলিটারির অত্যাচার চলিতে থাকে—বহু নর-নারী গুলিবিদ্ধ হইয়া নিহত হয়। এই সকল অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জাপানের জন্ত তেজপুর সহরের ঘরখানে এক জনসভা অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা হয়। পুলিশ ও সৈন্তগণ উক্ত সভা আক্রমণ করিয়া যথেষ্টভাবে লাঠি ও গুলি চালায়। ইহার ফলে বহু লোক আহত হয়। শত অত্যাচার সহ্য করিয়াও আসাম প্রদেশের অধিবাসিগণ আগষ্ট-বিদ্রোহে উল্লসিতভাবে অংশ গ্রহণ করেন। আসামেও রেলের লাইন ভুলিয়া কোলা হয়, সরকারী ভবনসমূহ আক্রমণ ও ধ্বংস করা হয় এবং সৈন্ত-নিবাস ও বিমান ঘাঁটি প্রভৃতি নষ্ট করিয়া বৃটিশ গভর্নমেন্টের হৃদয় প্রচেষ্টার বিষ হৃদয়ের চেষ্টা করা হয়।

যেহা এই প্রদেশের সাতারা জেলার আন্দোলন বেশ ব্যাপক আকার

গ্রহণ করে? উক্ত অঞ্চলে গ্রাম্য প্রলোভনিত কাছারি হইতে শাসন-কর্তৃত্ব পরিচালিত হয়। তথাকার জনসাধারণ অহিংস থাকিয়া শান্তিপূর্ণ উপায়ে কাছারিজুলিতে সত্যগ্রহ পরিচালিত করিতে সক্ষম করেন। তদনুযায়ী ২৪শে আগষ্ট তারিখে বহু লোক কন্নানগ্রামের কাছারিতে গিয়া সত্যগ্রহে আরম্ভ করিলে উহা বন্ধ হইল। বার এবং সত্যগ্রহীরা তথায় জাতীয় পতাকা উত্তোলন করে। সরকারী কর্মচারিগণকে অনুরোধ করা হয় যে তাঁহারা বেন আপনাদিগকে জনগণের সেবক বলিয়া মনে করেন। নেতৃহীন একজন সত্যগ্রহীকে সেখানে গ্রেপ্তার করা হয়। যাহা হউক, এইভাবে আরও কয়েকটি কাছারিতেও সত্যগ্রহের কাজ নির্বিঘ্নেই সম্পন্ন হয়।

কিন্তু ভান্সন নামক গ্রামের কাছারিতে একদল লোক সত্যগ্রহ করিতে বাইলে কর্তৃপক্ষ চরম ব্যবস্থা অবলম্বন করিলেন। সহস্রাধিক লোক লইয়া গঠিত শোভাবাজী বহন কাছারির অভিমুখে অগ্রসর হইতেছিল, তখন পুলিশ তাহাদের উপর গুলি চালাইতে লাগিল। উপস্থাপি কয়েকটি গুলির আঘাত পাইয়া সত্যগ্রহীদের নেতা পতাকা হস্তে শেব শয্যা গ্রহণ করিলেন এবং আরও কয়েকজন হতাহত হইল। নিহতদের মধ্যে দুইটি বালকও ছিল। পুলিশ মৃতদেহগুলিতে পদাঘাত করে।

ইহার পর পুলিশ ব্যাপকভাবে উক্ত অঞ্চলে তন্নানী চালায়, বহু লোককে গ্রেপ্তার করে এবং লোকের উপর অত্যাচার চালাইতে থাকে; কিন্তু তথাপি ইসলামপুর গ্রামের কাছারিতে পুনরায় সত্যগ্রহ করিবার পরিকল্পনা করা হয়। সেখানে সত্যগ্রহ করিতে গেলেও পুলিশ গুলি চালায় এবং বহু লোক হতাহত হয়। দলের কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করা হয়।

কয়েকজন নেতা আত্মগোপন করিয়া থাকিয়া সাতারার আন্দোলন পরিচালনা করিতেছিলেন। ১৯৪২ সালের শেষ দিক হইতে সাতারার আন্দোলন অস্ত পথ ধরিল। গ্রাম্য কাছারি, রেল ষ্টেশন, ডাক-বাংলো ইত্যাদিতে আশ্রয় ধরাইয়া সেগুলি পোড়ান হইতে লাগিল এবং সমগ্র সাতারা জেলার যোগাযোগ ব্যবস্থা ধ্বংস করা হইল। কয়েক স্থানে মালগাড়ীকে লাইনচ্যুত করা হইল। এইরূপ কার্যকলাপ সাতারা জেলার ১৯৪৩ সালের মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত চলে।

পুলিশ ও মিলিটারির অত্যাচার হইতে আতঙ্কিত করিয়া আন্দোলন পরিচালিত করিবার জন্ত শত শত কর্মীকে তথ্য আত্মগোপন করিয়া থাকিতে হইয়াছিল। পুলিশ বহু চেষ্টা করিয়াও তাহাদিগকে খুঁজিয়া বাহির করিতে পারে নাই। এই সকল আত্মগোপনকারী কর্মীকে খুঁজিয়া বাহির করিবার জন্ত গভর্নমেন্ট গুণ্ডা এবং চুইপ্রভৃতির বহু লোককে চর নিযুক্ত করেন। যাহারা বেশবুখ নামক কুখ্যাত একজন গুণ্ডা এই সকল চরের অস্তত্য ছিল একদিন একজন কংগ্রেস কর্মীর অধিবশে একদল পুলিশসহ সে তাঁহা বাটতে যায় এবং উক্ত কংগ্রেস কর্মীর পত্নীকে কয়েকটি অস্ত্রী ক

বিস্তারিত অপমানিত করে। এইভাবে শুভ্র ও গুপ্তচরদের উৎপাতে সেখানকার ভক্ত অধিবাসীদের বসবাস দুঃসাহ্য হইয়া উঠে। ক্রমিগণ তখন এই শুভ্র-উৎপাত দমনের জন্য বহুপরিকর হন। উপরোক্ত ঘটনার দিনকয়েক পরেই একদিন বাবুয়াও দেশদুখ-এর স্তব্ধতায় গভীর ঘায়ে পড়িয়া থাকিতে দেখা যায়। তাহার হাত ও পা দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলা হইয়াছিল।

সাতারা জেলার নানা স্থানে বহু টাকা পাইকারী জরিমানা ধাৰ্য করা হয় এবং তাহা আদায় করা হইতে থাকে পাশ্চাত্য পীড়নের দ্বারা। প্রীলোকগণকে বৈরাগ্য, জনগণকে গুলি করিয়া বধুচ্ছ হত্যা সাতারা জেলার নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার হইয়া পড়িয়া। এই অত্যাচার-উৎপীড়নের মধ্যেও সাতারার অধিবাসিগণ অটুট স্বকীয় লইয়া জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠিত করে। এই সরকার পরম যোগ্যতার সহিত কিছুদিন সাতারার শাসন-ব্যবস্থা পরিচালিত করেন।

বিহারেও আগষ্ট-আন্দোলন পূর্ণ মাত্রায় চলিতে থাকে। ১১ই আগষ্ট সরকারী ভবনসমূহে জাতীয় পতাকা উত্তোলিত করিবার জন্য পাটনার ছাত্রগণ স্কুল-কলেজ ত্যাগ করিয়া রাস্তায় সমবেত হইয়া এবং পাটনা হাইকোর্টের দিকে অগ্রসর হইতে থাকে। সেখানে উপস্থিত হইয়া তাহার হাইকোর্টের উপর হইতে ব্রিটিশ পতাকা নামাইয়া জাতীয় পতাকা উত্তোলন করিবার দাবী জানায়। প্রধান বিচারপতি অশ্রীতিকর অবস্থা এড়াইবার জন্য তাহার এক কর্মচারীকে দিয়া ছাত্রদের অনুপ্রাণিত রক্ষা করেন। অতঃপর ছাত্রগণ বিহার প্রদেশের আইন-পরিবর্তন ভবনে পতাকা উড়াইবার জন্য সেখানে গিয়া উপস্থিত হয়। একদল ছাত্র যখন জাতীয় পতাকা লইয়া পরিবর্তন-ভবনের উপর উঠিতে আরম্ভ করে, তখন পুলিশ গুলি চালায় এবং তাহার ফলে গাত জন নিহত হয়।

ইহার পর জনগণ ক্ষিপ্ত হইয়া উঠে এবং নানাস্থানে অবস্থা আরও ভয়ঙ্কর হইয়া উঠে। ১২ই আগষ্ট হাজার হাজার লোকের এক বিরাট বিক্ষুব্ধ জনতা পাটনার বিভিন্ন স্থানের টেলিগ্রাফ-টেলিফোন সংযোগ ধ্বংস করিয়া ফেলে। বাঁকিপুর জেলার সমুখে উপস্থিত হইয়া এই জনতা ব্রিটিশ-বিরোধী নানাবিধ প্রচারণা দিতে থাকে এবং পুলিশের সহিত তাহাদের কয়েকঘণ্টাব্যাপী এক খণ্ডযুদ্ধ হয়। নানাস্থানে ভাঙবদল প্রভৃতি সরকারী ভবন আগুন ধরাইয়া পোড়াইয়া দেওয়া হয়। পুলিশ ও মিলিটারির গুলিবর্ষণে বিহার প্রদেশে বহুলোকের মৃত্যু ঘটে। আন্দোলন তথাপি চলিতেই থাকে। বহু স্থানে ব্রিটিশ-শাসন ভাঙিয়া পড়ায় জনগণই আপনাদের গণরাজ প্রতিষ্ঠিত করে।

পাটনা সহরের কর্তৃক সৈন্তগণের হস্তেই তুলিয়া দেওয়া হয়। পরিচর-পত্র ব্যতিরেকে সাক্ষ্য-আইন বলবৎ থাকার প্রাকালে লোক চলাচল নিষিদ্ধ হয়। সহরের বহু সম্মানার্থ ব্যক্তিকেও বন্দীশিবিরে আটক করিয়া শাস্তি দেওয়া হয়, অথবা প্রয়োজনমত তাঁহাদিগকে বধ করা হইয়াছে। রাজ্যের অজ্ঞান পরিচারক করিতে। ঘটনার কোনও

প্রকৃত বিবরণ একশি না করিয়া রাজ সরকারী বিবৃতি মুদ্রিত করিবার নির্দেশ দেওয়ার ফলে সংবাদ-পত্রগুলি সরকারী বিবরণে হাণ্ডিতেও অব্যাহত রহে।

বিহার প্রদেশের অন্যান্য অঞ্চলেও উৎপীড়নের দ্বারা বহু টাকা পাইকারী জরিমানা আদায় করা হয়। বহুলোককে অত্যাচারের ভয়ে স্থানে স্থানে বর-বাড়ী ছাড়িয়া পলাইয়া বাইতেও হয়। সার্বভৌম সৈন্তদের হস্তে নিগৃহীত ও লাহিতা হন। আগষ্ট-আন্দোলন উপলক্ষে বিহার প্রদেশে ছয় শতাধিক লোক গুলিতে প্রাণ হারায়। জনসাধারণ তৎসঙ্গেও সরকারের নিকট নতি প্রার্থনা করে নাই।

যুক্তপ্রদেশে এই আন্দোলন দমনকল্পে বরবাড়ী জালাইয়া মুটপাট চালায় হয়, মহিলাদিগকে পথে ছাড়িয়া দেওয়া হয় বিবরণ করিয়া। বালিয়া ও বাইরিয়ার গুলি চালাইয়া পুলিশ যথাক্রমে ৪০ ও ২০ জনকে নিহত করে।

আগষ্ট-বিদ্রোহ ভারতের অন্যান্য অঞ্চলেও তীব্র আকার ধারণ করে এবং ব্রিটিশ গভর্ণমেন্ট অসামুখিক অত্যাচার-উৎপীড়নের দ্বারা তাঁহা দমন করিতে চেষ্টা করেন। বিদ্রোহীদের বিদ্রোহের সম্যক দমন-কল্পে ইতিহাস আজিও রচিত হয় নাই। সংবাদ প্রকাশের পথে বিঘ্ন সৃষ্টি করিয়া কর্তৃপক্ষ ইহার বিবৃতি ও প্রকৃততা রোধের জন্য প্রচেষ্টা করিয়াছিলেন। এমন অপূর্ণ গণ-অভ্যুত্থান পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল।

ব্রুটনের দুচ্ছকালীন প্রধান মন্ত্রী মিঃ চার্লিস ইংলওর পার্লামেন্টে মহাসভাকে আশ্বাস দিয়া সদন্তে সন্মত করাইয়া দিয়াছিলেন যে, দুচ্ছ উপলক্ষে বহুসংখ্যক ইংরাজ সৈন্ত ভারতে অবস্থান করিতেছে, স্তব্ধতা কংগ্রেস-নেতৃবৃন্দের প্রেরণার এবং আগষ্ট-আন্দোলনের জন্য ইংরাজজাতির চিত্তিত হইবার কোনও কারণ নাই, অর্থাৎ কিনা প্রয়োজন হইলে ঐ বহুসংখ্যক সৈন্ত অশান্ত ভারতবাসীদিগকে শাসিতা করিতে পারিবে। বাহা ইউক, বিষয়্যাপী বিতান মহাযুদ্ধ চলিতেই লাগিল—আর ভারতে চলিতে লাগিল শাসনতান্ত্রিক অচল অবস্থা। এদিকে বাধীনতা-সংগ্রামের অক্লান্ত যোদ্ধা হতাবল্ল গোপনে ভারত ত্যাগ করিয়া গিয়া দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার আন্দোলন-হিন্দু কৌশলের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন এবং তাহার সঙ্গীদ্বারকক্ষে আলাদা-হিন্দু-কৌশল ভারতের পূর্ব সীমান্তে আঘাত হানিতে থাকে। বাহা ইউক, শেখ পর্যন্ত আমেরিকার সাহায্যে মিত্রপক্ষই জরাজীর্ণ করিয়া এবং অন্ধ-শক্তির অন্তর্ভুক্ত দেশগুলি একে একে পরাজয় বরণ করিতে লাগিলেন। ১৯৪৫ সালে মহাযুদ্ধের সমাপ্তি ঘটিল।

ইংলওর জর হইল—কিন্তু শক্তি, আন্তর্জাতিক মর্যাদা এক অর্থনৈতিক বিকল দ্বারা তাহার অবস্থা পরাজিত দেশগুলি অপেক্ষা বিশেষ উৎকৃষ্ট হইল না। মহাযুদ্ধবিধ্বস্ত পৃথিবীতে তাহার পূর্বস্বত্বতা বজায় রাখা আর সম্ভব হইল না। চতুর্দিকে অশান্তি সৃষ্টি হইতে লাগিল—পৃথিবীর হৃদয়প্রান্তে অবস্থিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দেশগুলিতে পর্যন্ত দেখা দিল বর্ণাশ্রমবর্ণ। দুই সাতায়াবাব তাহার শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিবার



উপক্রম করিতে লাগিল। দুইকালে মিঃ চার্লিস ব্রুটিনজাতিকে জাহাজের দিরাছিলেন যে, ব্রুটিন-সাম্রাজ্যকে দেউলিয়া করিয়া দিবার জন্য তিনি লন্ডনের প্রধান মন্ত্রি গ্রহণ করেন নাই। দুইশেষে কিন্তু তাঁহাদের অসিদ্ধাস্থেও ব্রুটিন-সাম্রাজ্য দেউলিয়া হইয়া গেল।

ইতিমধ্যে ১৯৪৪ সালে কারাগারে থাকা অবস্থাতেই যে সালে মহাত্মা গান্ধী অনশন শুরু করেন এবং তখন তাঁহাকে মুক্তি দেওয়া হয়। তেল হইতে মুক্তিলাভের পর তিনি মুন্সলিম লীগের সভাপতি জম্মত মহম্মদ আলি জিন্নার সহিত সাম্প্রদায়িক সমস্যার সমাধান উদ্দেশ্যে করেকদিনব্যাপী আলোচনা চালাইলেন, কিন্তু তাহা সফল হইল না।

১৯৪৫ সালের নির্বাচনে ইংলণ্ডের পার্লামেন্টে প্রমিষ্টকল্প বিপুল সংখ্যায় একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করেন এবং ভারতীয় সমস্যার সমাধানকল্পে তাঁহাদের মধ্যে খামিকটা আন্তরিকতা দেখা যায়। ঐ বছরের ১৫ই জুন কংগ্রেস নেতৃবৃন্দকে মুক্তি দেওয়া হয় এবং বড়লাট লর্ড ওয়াভেল ব্রুটিন গভর্নমেন্টের অনুমোদনক্রমে ভারতীয় সমস্যার সমাধান সম্বন্ধে আলোচনার জন্য ঐ সময় সিমলার এক নেতৃ-সম্মেলন আহ্বান করেন। কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি সম্মেলনে যোগদান করিতে সিস্থা করেন।

কংগ্রেস ও লীগ নেতৃবৃন্দ এবং অন্যান্য আরও করেকজন নেতা লইয়া বড়লাটের সভাপতিত্বে ২৫শে জুন হইতে সিমলার বৈঠক শুরু হইল; কিন্তু বৈঠক শেষ পর্যন্ত ফলপ্রসূ হইল না—কতকগুলি মৌলিক বিষয়ে লীগ ও কংগ্রেস-নেতৃবৃন্দের মতানৈক্যের ফলে ১৪ই জুলাই বৈঠক জারিলা গেল। এক কথার বলিতে গেলে, সিমলা-সম্মেলনে ভেটো প্রয়োগের ক্ষমতা রহিল সংখ্যাগুরু সম্মেলনের প্রতিনিধি-প্রতিনিধি মুন্সলিম লীগের হাতে।

কিন্তু বৈঠক জারিলা বাওরাতেই সমস্যার সমাধান হইল না। সমগ্র ভারতে এমন এক পরিস্থিতির উদ্ভব হইতেছিল, যাহাতে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছিল যে অবস্থা আরওর বাহিরে চলিয়া যাইবার উপক্রম করিতেছে। রাজনৈতিক চেতনাসম্পন্ন কোটি কোটি লোকের অসহযোগিতা ও বিরুদ্ধ মনোভাব লাভ করিয়া একটা বিরাট দেশকে কেবলমাত্র সৈন্ত সাহায্যে শাসন করিতে গেলে যে বিপুল ব্যয় বহন করিতে হয়, তাহা লঙ্ঘান করিবার শক্তি মহাত্মাবিশিষ্ট ব্রুটিনের ছিল না। সমগ্র আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিই তিরদিনের মত সাম্রাজ্যবাদের মৃত্যু-সমর নির্দেশ করিতেছিল। অধীন ভারত অপেক্ষা বরং-শাসিত বস্তুতাবাপন খাণীন ভারত যে পরোক্ষে ব্রুটিনের শক্তি জোগাইতে পারে, তাহা ইংলণ্ডের বিরুদ্ধ প্রমিষ্ট নেতৃবৃন্দ ক্রমশঃ উপলব্ধি করিলেন। খেচ্ছার চুক্তির দ্বারা ক্ষমতা হস্তান্তর করিলে ভারতে ব্রুটিনের বাণিজ্য ও ব্যবসায়

খার্বও বজার খাণার সভাবনা, হুতরাং ভারতীয় সমস্ত লইয়া তাঁহারা যথেষ্ট মাথা ঘামাইতে লাগিলেন।

ইতিমধ্যে সাম্রাজ্যবাদ তাহার মরা কানড় দিতে কহর করিল না। আজাদ-হিন্দ-কৌজের যে সকল সৈন্ত ও সেনাধ্যক্ষ দক্ষিণ-পূর্বাশিয়ার আজমসমর্পণে বাধ্য হইয়াছিলেন অথবা হুত হইয়াছিলেন, তাঁহাদের করেক-জনকে করেক নকার দিল্লীর লাল কেল্লার সামরিক আদালতে অভিযুক্ত করিয়া ১৯৪৫ সালের শেষ দিক হইতে দুজাপরাধী হিসাবে তাঁহাদের বিচার শুরু হইল। আজাদ-হিন্দ-কৌজের গৌরবজনক কার্যকলাপের বিবর ভারতবাসীগণ হুচ্ছের সমাপ্তির পর বিশেষভাবে জানিতে পারেন এবং তাহার ফলে তাঁহারা এই সময় যথেষ্ট অনুপ্রাণিতও হন। নেতাজীর জিন্ন সহকর্মীগণের এই ভাবে বিচার-ব্যবস্থা হওরার ভারতের জনমত অতিশর ক্ষুব্ধ হইয়া উঠে এবং চতুর্দিক হইতে ইহার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জ্ঞাপন করা হয়। ব্রুটিন গভর্নমেন্ট এবং উক্তপন্থ সামরিক কর্তারা কিন্তু তাঁহাদের জিন্ন ত্যাগ করিলেন না—নীতির দোহাই দিয়া বিচার-কার্য চালাইয়া যাইতে লাগিলেন। কংগ্রেসের পক্ষ হইতে আজাদ-হিন্দ-কৌজের অভিযুক্ত সেনাধ্যক্ষগণের পক্ষ সমর্থনের জন্য একটি কমিটি গঠিত হয় এবং পণ্ডিত অওহরলাল নেহেরু, ভুলাতাই দেশাই, সার তেজবাহাদুর সঞ্জ, জনাব আসক আলি ও ডাঃ কৈলাসনাথ কাটকু অভিযুক্ত ব্যক্তিগণের পক্ষ সমর্থন করিতে থাকেন।

দিল্লীর লাল কেল্লার সামরিক আদালতে বিচার-প্রহসন চলিতে লাগিল। কাহারও কাহারও গুস্তর দণ্ডবিধান করিয়া পরে আবার সেই দণ্ড মকুয করা হইল—কাহারও কাহারও দণ্ড বজায় রাখা হইল। সমগ্র ভারতে নানা স্থানে এই ভাবে আজাদ হিন্দ-কৌজের সেনানীযুন্দের বিচার এবং তাঁহাদের প্রতি প্রমত্ত দণ্ডের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জ্ঞাপন করিয়া বিরুদ্ধ প্রদর্শন করা হয়। এই উপলক্ষে কোথাও কোথাও গুলিও চলিল এবং কেহ কেহ আহত ও নিহত হইলেন। সমগ্র ভারত আবার যেন ঢকল হইয়া উঠিল।

কিন্তু আবার দিতে গিয়া ব্রুটিন গভর্নমেন্টও এক প্রমত্ত আবার পাইলেন। সেই আবার হইল ১৯৪৬ সালের কেক্রমারি মাসে সংঘটিত নৌ-বিস্ফোহ। (আগামীবারে সমাপ্য)

বার্জ-হত্যা প্রমদে গত চৈত্র সংখ্যা ভারতবর্ষ-এ অববধানতা বশতঃ একটু ভুল বিষয় প্রকাশিত হইয়াছে। আমরা জানিতে পারিয়াছি যে বাসিন্দাজীবন ঘোষ মহাশয়ের কোনও পুত্রই পুলিশের নিকট খাঁকারোক্তি প্রদান করেন নাই বা রাজসাক্ষীও হন নাই। রাজসাক্ষী হইয়াছিলেন অপর এক ব্যক্তি। উক্ত বিষয় অববধানতাবশতঃ প্রকাশিত হওরার আমরা দুঃখিত।—লেখক





# সুইজারল্যান্ড

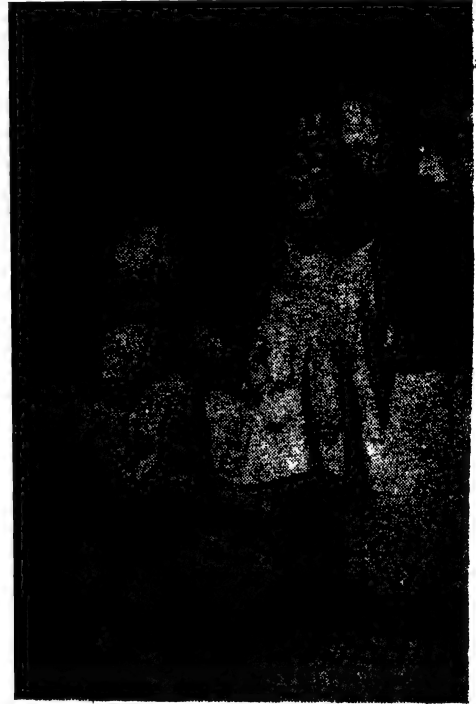
## শ্রীচিহ্নিতা দেবী

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

ছুটির দিন ফুরিয়ে এল। এখন চলছি ইন্টারলকেনে। সেখান থেকে 'ব্রুজটি'র বিশাল ভুবারকে আরোহণ করব—আর তারপর? —কি রে ভেতে হবে—সহাদেশ থেকে লণ্ডনে, আর লণ্ডন থেকে রেলকাতার। রাজ্য উঠেছে খোঁপার কাঁটার মত বেঁকে। পাল দিয়ে হুহ করে ছুটে যায় গাড়ী, আর বেসব গাড়ীতে G. B. মার্কা তাবের ভিতর থেকে একটা উল্লাসধ্বনির সঙ্গে রুমাল উড়তে দেখা যায়। সমপথযাত্রীদের পরস্পরের প্রতি এই সৌম্য-বীকৃতি বেশ লাগে। 'জুলিয়ান,' 'ওবরজ' আর্ট, সাস' তিনটা পাস পার হতে হবে। আহা কেন যে এগুলোকে পাস বলা হয়। চমৎকার চণ্ডা রাত্তার পাশে কলকর পরে নাব আছে লেখা। হরত কোনকালে দুই দুরধিগম্য শিখরচূড়ার মাঝে ছোট একটু সরপথের চিহ্ন ছিল। আজও সেই পথ সেই দুরকালের মনের স্মৃতি বহন করে আসছে। আলসের এই শ্রেণী সাত হাজার ফুটের বেশী উঁচু নয়—তবু বরক-বরা বাসের রঙে কেন্দ্র একটা বৃত পাণ্ডুরতা। গাছগুলিতে কিত্ত বনস্তের ছোঁয়া লেগেছে। এর উপরের স্তরের আলস বৃক্ষহীন চিরতুহিনাবৃত। অদ্ভুত এই ছোট বেশী—বেন পুরোপুরি একটা ছোট ইরোরোপ। ইরোরোপের প্রধান তিনটা ভাষাই এখানে চলে—ফ্রেন্স, জার্মান, ইটালীয়ান। ইরোরোপে বতরকম আবহাওয়া সত্য, সব এখানে আছে। এদেশের 'লাগো' প্রকৃতি আরগার মধ্যসাগরতীরসমত চিরবসন্তকাল। সেখানে ভুট্টা আর গবের ক্ষেত, পান গাছের সারি আর চেইনাটেব হারা, আর আঙুরলতার ফুল। আবার ম' দশ হাজার ফুট উপরে, জলহীন, বৃক্ষহীন, অলস্ত ভুবার মরু। আর এই তিন হাজার থেকে ৬৭ হাজার ফুটের মধ্যে, মত পাইনগাছের বেলা, গ্রীষ্ম ও বলন্তকালে সবুজ বাসের সমারোহ। এইখানেই বৈশ্বকোণ গ্রাম ও শহর,—মত চার্বীনের বাস। আভাব ও পোরালের উপরতলার তাবের মোটা মোটা কাঠের ফুটুর লতাফুল দিয়ে ঢাকা। কাঠের খুঁটিগুলোতে ঝুলছে অর্কিড, কিংবা জিরেবিরাদের গুল্ম। এখানকার মেয়েরা ছোট ছোট তাঁতে কত গণসের কবল, রেশমের নক্সাকাটা চাবর, থক্কের মত মোটামুড়োর বেককতার তৈরী করে। আর তার ওপরে করে অসংখ্যরকম ছুঁচের কাঁচ। সে কাজগুলির সঙ্গে আমাদের দিলী হাতের কাজের আশ্চর্য মিল, যেমন কক্ষা অথবা পল্লভতার মত লতা। দুদার্থে একটা বোকাদের কাঁচের আনলার, সুমহিল একটা চাবর। তাড়াতাড়ি ছুটে যেমার সে লোকনে, কী আশ্চর্য ভারতের সুসর শির এতদূরে রঙানি মর?—উত্তর এল—না'আ' সুইজারের হাতের তৈরী এই চাবর।

ইন্টারলকেন হচ্ছে জার্মানিকা ও ইংল্যান্ডের পোষা আরগা। কোন

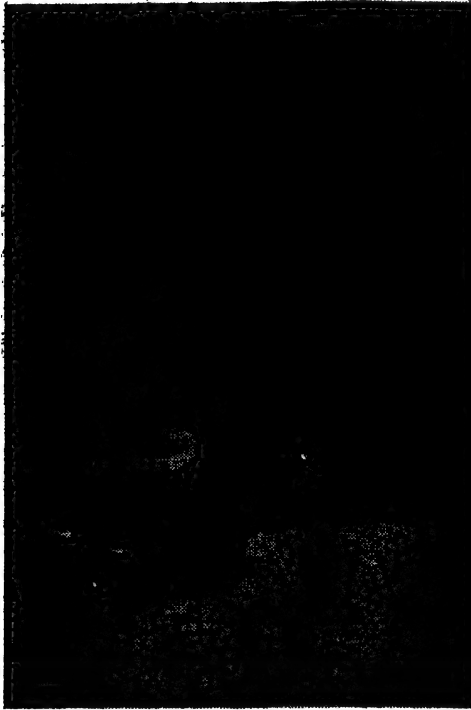
হোটেল তিলধারণের স্থান নেই—ভাগ্যে আমাদের আগে থেকে আরগা ঠিক করা ছিল। হোটেল ছুকে নাম শুনে বদিত মূখ তকিয়ে আসে, তবু এ একেবারে বুজোঁরা ব্যাপার, বাক্য বলে। ট্যুরিটদের আড্ডা তাই, আরগাটা অসংখ্য ছোট ছোট দোকানে ভর্তি। আর কি হৃদয় সব খেলনা, কাঠের কত ছোট খাট জিনিষ, কান্নারের মত নক্সাকাটা, আর তার সঙ্গে বিলিভী মিল্লীর বাস্তবিক বুদ্ধি মিলেছে। ছোট একটা চাববাড়ী, আমলা আঁকা, কাগজের রঙীণ ফুল ঝুলছে।



সুইজারল্যান্ডের হেলেন-মেয়ে

পাশেই একটা বোতাম দীপলে বাড়ীর ছাদটা ঝুলে গেল, ওমা! একটা বাস—তাতে চকোলেট ভর্তি—আর ভেতর থেকে মিষ্ট একটা স্বর জলভরধ্বের মত বাজছে। আর সব বাড়ীতেই একটা করে 'হুহ' বড়ি আছে—খুকুকে সবাই ডেকে নিয়ে বার তাবের ঘরে, দেখ আমাদের বড়ি তোহার লাব ঘরে থাকে। কত অজস্ররকম বড়ি, আর তাতে কত বিভিন্ন কলকৌশল। কোন বড়িতে কোকিল এসে কুহুখানি করে থক্টা বাজিয়ে যায়, কোনটার টুপিমাথার হাঁস এসে ড্রাস বাজিয়ে যায়। খুকু তো বড়ির কেরামতি দেখে একেবারে 'ব'! খুকুর

যাবারও সেই দশা এদের বৈজ্ঞানিক কেরামতি দেখে। সমস্ত দেশ থেকে কয়লার ট্রেন তুলে দিয়েছে,—সর্বত্র ইলেকট্রিক। পাহাড়ের গা বেয়ে একেবারে সোজা এরা ট্রেনটাকে তুলে দেয় অনেক সময়। গাশাপাশি ছোটো লাইন পাতা থাকে—লিকটের নিম্নে ছোটো ট্রেন পরস্পরের ভারে ওঠানামা করে। বৈজ্ঞানিক বুদ্ধিতে এরা ইমোরোপের কোন জাতের চেয়ে কম নয়। হাসপাতালগুলির ব্যবস্থা আধুনিকতম। অর্থাৎ সস্ত্রীর সঙ্গে সরস্বতীর মিলনসাধনের উপভোগ্য এরা রত। জ্ঞানলোকের দ্বারা খননকর করে। সাম্রাজ্যবিস্তারের স্বপ্ন এরা কখনো দেখেনি, তাই এতকাল ধরে শান্তিতে আছে। শোনা গেল সপ্তদশ শতাব্দীতে এদের শেষ গৃহযুদ্ধ হয়।—ওই যে যুদ্ধের ঝড় ইমোরোপের বৃকের উপর ছবার প্রলয়ভাঙবে বলে গেল, এদেশের গায়ে আঁচড়টা



হুড়ঙ্গ পথে

লাগল না। এরা ছিল রেডক্রসের ভার নিয়ে। দুপক্ষের আহতদেরই সেবা করেছে। লীগ অবনেশনের সম্মিলন বসত এখানেই জেনিটার। যুদ্ধে শক্তিকর না করে সবটা শক্তি প্রয়োগ করেছে দেশটাকে গড়ে তুলতে। সেইজন্মে দেশের প্রভূত অংশ কলসাধারণের অসুপবৃত্ত হলও এরা নানানিকে নিজেদের বিকশিত করে, দেশের ঐশ্বর্য আহরণ করে। বিদ্যুৎ এদের বাঁধ চাকর। আবার তা সবেও ছোটোখাটের মিত্তত হুটীরে, মেয়ের হাতে চলছে তাঁত, কাঠের টুকরোর ফুলপাতা একে পিঙ্গী পড়ছে খেলনা। এখানে কোকাসে বাজারে সর্বত্র ইংলণ্ডের মত চড়া রঙের প্লাষ্টিকের লম্বারোহ দেখলাম না। সাবেক কালের কাঠের

খেলনার ভয়ঙ্কর পরিচর আছে। বিদ্যুৎকে খাটানো অসংখ্য কাজে। এ জন্মে যে শক্তির প্রয়োজন, মহাদেব তাঁর জটা থেকে অল্পের স্বর্ণাধারার অবিজ্ঞান সে শক্তি এদের প্রতি বর্ষণ করছেন। প্রকৃতির জলরাশিকে বাঁধ বেঁধে এরা সঞ্চয় করে রেখেছে শক্তির ভাণ্ডার। বেশীর ভাগ কারখানাই জলের ধারে তৈরী। কিন্তু এমন পরিষ্কার পরিপাটি ধোঁয়া বর্জিত হুঠান হাঁচের তৈরী বে, প্রকৃতির পরে মানুষের হাতের ছাপ পড়েছে বোঝা গেলেও সৌন্দর্যের হানি হয় না। লম্বা বারান্দার এককোণে বেতের কোঁচে হেলান দিয়ে ভাবছি এই অকৃত হৃদয় দেশটার কথা, ইমোরোপের ভূবর্গ বাক্যে ফলে, হঠাৎ চমকে উঠি গলার ধরে—“কমা কর মাধব, প্রসারিত হাতে মাথা নত করে বাউ করেন, হোটেল কর্তৃপক্ষের কেউ একজন,—“কাল ভোর সাতটার ট্রেন তোমাদের যন্ত্রপাতি নিয়ে যাবে। ৩০টার সময়ে তোমাদের ব্রেকফাস্ট, আর প্যাকেটে করে কিছু লাঞ্চ পাঠিয়ে দেওয়া হবে। তাহলে এখন ঘুমতে বাওরাই সঙ্গত—কাল উঠতে হবে ভোরে।

হু তিনবার ক্ষুদ্রতর ট্রেন বদল করে করে তুমার চুড়ার পাদমূলে বধন পৌঁছলাম, বেলা দশটা বেজে গেছে। বরকের উপর দিয়ে লাইন নিতে পারেনা, তাই নীচে হুড়ঙ্গ খুঁড়েছে। সাড়ে চার মাইল দীর্ঘ এই হুড়ঙ্গ পথে ট্রেন চলেছে বিদ্রোহে। মাঝে মাঝে মোটা কীচের কেবিন হোসের মতন গোল জানলা। কীচের ভিতর দিয়ে বাইরের আলো এসে পড়েছে একটু আধটু।” একটা বারগার ট্রেন খামালে আমাদের দেখবার জন্মে। অবাঁক কাণ্ড। অন্ধকারের ফুটোর মধ্যে দিয়ে আলোদীনের ঐশ্বর্য ত্রিকমিক করে উঠল। রোদ পড়ে জলছে রূপোর পাহাড়। বাইরে অলস্ত সাদা, ভিতরে অন্ধকার কালো। টানেল এসে শেষ হয় ছোট একটা পাতাল ট্রেনে। পাতালের ওপরে আছে বরকের স্বর্গ, আর তারো উপরে আছে ইমোরোপের ধ্যানমন্দির ছোট একটা রেস্তোঁরা।

আশ্চর্য—রূপ,—এমন যে দেখা যায় ভাবতে পারি নি। হিমালয়ের তুমার চুড়া দেখা হয়ত ভাগ্যে ঘটে উঠবে না—তার অনুজকে তো দেখে নিলাম। যেদিকে তাকাও খুঁ খুঁ করছে সাদা—স্বর্ণা নেই, হ্রদ নেই, সবুজের লেশমাত্র নেই—যতদূর তাকাও কোথাও জন বসতির চিহ্নমাত্র নেই।—শুধু তরঙ্গারিত বরকের সরস্বতী। পাহাড়ের মাথাগুলি ঢেকে ঢেকে গা বেয়ে নেমে নদীর আকারে দূরে মিলিয়েছে। তবু কঠিন স্তম্ভের মত এই ৫০০ ফিট গভীর জমাট নদীকেই বলে মেশিরার। বরকের উপরে কাঠের টুল গর্ত করে চুকিয়ে বসে পিকনিক চললো—কুড়ুরের গাড়ী চড়ে বেড়ানোও চলছে। অকৃত এই ইমোরোপীর জাত—কখনো চূপ করে থাকতে জানে না।

মহামৌনের মাঝখানে ঝাড়িয়েও সমানে চলছে হো হো। হোটেলের আরামককে যেমন ব্যবহার চলে এখানেও কি তার একটু ব্যতিক্রম হবে না। ওই যে শুভ তুমার চুড়ার বিরাক্টের নির্ঝাঁক ইমিড—একি এতই অর্থহীন এদের কাছে—এত ব্যর্থ? আমাদের সমস্ত শরীর এদের কাছে থেকে দূরে রাখার জন্মে উন্মুখ হয়ে উঠল। গাইডকে ইসারা করে এগিয়ে চলি—একটু দূরে নিয়ে চল আর একটু—ওই নিবেধের দড়ির গতি

পেরিয়ে আর একটু হু—বেখাও থেকে ওদের কলকোলাহল কানে আসবে না—তততীর গভীর ব্যঙ্গনা আমার সর্বদা ঘিরে ধরবে—ঐ শুধু। “বেঙনা বেঙনা না” শব্দ টেঁচিয়ে ওঠে—উন্নতিত কলরবে লবাই এল এগিয়ে।—উপদেশ দেবার এমন হুগোল ছাড়ে কে। সকলের লম্বকত পরামর্শ আমার কানের মধ্যে স্টেটের উপর ছুরির আঁচড়ের মত কর্কশ হুয়ে বাজতে থাকে। এই উটেটা বিপত্তি দেখে খমকে দাঁড়ালাম। আমার অসহায় বিপন্ন মুখ দেখে গাইডের মনে দয়া হোল। সে অনেক লোককে নিয়ে এসেছে—দৈবাৎ তার মধ্যে ভাবপ্রবণ লোকও ছিল—সে বললে,—“তার চেয়ে চল তুমি অবজারভেটরীর উপরে গিয়ে বসবে—সেখানে থেকে আরো ভাল দেখতে পাবে। এখানে আর এগোনো, বাকি বলে বিপজ্জনক। কারণ একে তো আগে থেকে পথ ঠিক করা হয়নি, তার আবার বিকল হয়ে আসছে। শুধানে বাবার সময় হচ্ছে সকাল ৯টা ১০টার মধ্যে। আর তোমার পোষাকও উপযুক্ত নয়। এখানে মাঝে মাঝে কাটল ধরে, হঠাৎ তার মধ্যে পড়ে গেলে অনন্ত কবর।” “আজ্ঞা এই পেশিয়ার নাকি সেরে সেরে যায়—এ চলে?”—“হী চলে বই কী। অতি ধীর-অবোধ একটা চলা, দেখে বোঝা যায় না, তবু এ বাজার বিরাম নেই। একটু একটু করে চিরকাল ধরে চলে।—একটা অভূত গল্প শোন, গাইড বলে,—“গত শতাব্দীর প্রথম দিকে একমল লোক আদম্ একপীড়িণনে আসে।” সবাই ঘনীভূত হয়ে দাঁড়ায় গাইডের চারপাশে।—“চীনে সাধারণ উপরে ভূখো কালির আঁচড়ের মত, ভূতনাথের পাশে তাঁর প্রেতসন্ন্যাসের মত আমার দাঁড়িয়ে গল্প শুনি। “সেই দলে একই গায়ের পথপ্রদর্শক ছিল জন কয়েক,” গাইড বলে, “পাইক পুঁতে পুঁতে, দড়ি দিয়ে নিজেদের বেঁধে বেঁধে তারা এগোচ্ছিল—হঠাৎ ভীষণ, স্বর্জন করে ছুঁকি হয়ে গেল পারের নীচের হিমরাশি—উর্ধ্বে উৎক্ষিপ্ত হোল তার ভিতর থেকে বড় বড় বরফের খণ্ড, নিমেষের মধ্যে তিনটা গাইড তলিয়ে গেল। তাঁদের অভ্যবস্থা পেশিয়ারের এই শাস্তি ঠাট্টার উত্তর দিতে নেমে গেল সেই কাটল পথে কোমরে দড়ি ও মুখে গ্যাসের থলি বেঁধে, কাটল একে বেকে চিড় খেয়ে খেয়ে নেমে গেছে কোন গভীর পাতালপুরীতে। ৩০০ ফুট গিয়েও যখন কিছু পাওয়া গেল না, সে ফিরে এল পরাজিত হয়ে। বৈজ্ঞানিক তখন বিচার করে বলেন, পেশিয়ারের চলা যদি সত্য হয় তবে ৪০ বছর পরে পাহাড়ের নীচে এ ফিরিয়ে নেবে চোরাই মাল। ষ্ট্রিক একচল্লিশ বছর পরে হঠাৎ একদিন দেখা গেল, সেখানে পড়ে আছে তিনটা নরকপাল, কয়েকগুচ্ছ কাল ও সোনালী চুল, কয়েক টুকরো জামা কাপড় ও একটা নিটোল শুভ হাত। বহু এল সন্ধান করতে, হোটেলের বহু ক্রীতি ভরে যে হাতে কতবার ক্রমবর্ধন করেছে হঠাৎ সেই একটি পরিপুষ্ট বিচ্ছিন্ন হাত দেখে কথা সরল না মুখে। পৃথিবী বাকি ভুলে গেছে, বরফ তার হিমশীতল বুকে তাকে তেমনি নবীন করে রেখেছে। বহু বহু একবার তার লোলচর্ম মুকিত হাতের দিকে আর একবার বৃত্তাকার সেই যৌবন হঠাৎ হাতের দিকে তাকিয়ে দীর্ঘবাস কলে চলে এল।” অজাত লোকদের গল্পে ভারী হয়ে এল হাতের। লবাই হুগ করে এগিয়ে চলেছে। খুবের ভিত্ত ওদের

চেয়েও হালকা—সে বলে আইস প্যাগেল দেখব আগে—আমি তাহলে অবজারভেটরীর উপরে বাই।” আরে নানা—আইসপ্যাগেলটা চট করে একবার দেখে নিয়ে, শুধানে গিয়ে বতকণ খুঁচী বোস, “খুবের বাবা হুগকে সাবলান। বরফের পাহাড় কেটে শুবার মধ্যে প্রকাণ্ড প্রাসাদ তৈরী করেছে। বিশাল নাচঘর, খাম ঘিরে ঘেরা, কোণে কোণে তুবারের বেরীতে তুবারের কুলদানী। তাতে একগুচ্ছ তাল ফুল। বরফের আলোড়ানে ইলেক্ট্রিক বাতী। তাতে কোথাও লাল, কোথাও বা নীল আলো স্বপ্নজাল মেলেছে—এ কোন বাহুরকের দেশ।

অবজারভেটরীর ছাতের উপরে বসে আছি—নীচে, উপরে চারিপাশে বতহু চাও, ধু ধু করছে বরফ, জলছে সূর্যের আলোর, একএকদিকে তাকানো যায় না। তীক্ষ্ণ সাদার ধার ছুরির কলার মত বিধে চোখে।



একটি বাড়ির নক্সা দেওয়াল

বসে থাকতে থাকতে কেমন বেন লাগে। মন কেমন করা অভূত এক অনুভূতির আধায়ে আচ্ছন্ন হয়েছি সখা। আমি যে আমি, সে কথা একেবারে ভুলে গেছি। এই যে আমি এখন নীচে গিয়ে বাজীরের সঙ্গে কলরব করতে করতে ট্রেপে চড়ব, ফিরে গিয়ে ডিমার খাব, এ আমি কোথায় হুয়ে সেরে গেছে।—আর এই রোজকরোজ তুবাররাশির দিকে তাকিয়ে আছে আমার এক অপরিচিত সখা। শুধু তাকিয়ে থাকা—কিছু ভাবা নয়, হাসি নয়, শুধু চোখ দিয়ে অনুভব করা। একেই কি বলে তুবারের মার। আরসের মোহময় সমস্ত চেতনা ঢেকে ছায়া কলে। ধীরে ধীরে বদলে আসে সব। ছুরির কলার মত তীক্ষ্ণ সাদা নয় হয়ে আসে নানা রঙের বাণিকাভরে। আরে দেখতে দেখতে একী! এ যে সোনা, একেবারে সোনা। কঠিন বর্ণের তুপে আগুন লেগেছে বেন। আর তারি বাঁধে বাঁধে চুড়ার চুড়ার, রামধনুর বিভিন্ন লীলা।—এ কি এ—? এক্তি এই পৃথিবী? এই যে পৃথিবীতে আমরা সকাল থেকে রাত অবধি

কপিকের বিই।—সেইকি যেতে হবে ? এত দূর ? আর দেবী নেই, ঐশ্বর্যের  
লক্ষ্য হয়েছে।—হ্যাঁ যেতে হবেই। এমনি সর্বদাই যেতে হয়, ভাল জিনিষ  
বেশীকণ থাকে না। হুইই কণিক, হুংথ অনন্ত। বার বার চোখ বুজে  
হৃদয়ের মধ্যে গভীরভাবে এঁকে নিতে চাই ছবি, চোখ খুললেই অপকল্পের  
প্রশ্নের মধ্যে মিলিয়ে যায়। ধ্যানের দুটি আবার নেই, থাকে চোখে  
হৃৎকলায়, তাকে হৃদয়ের মধ্যে তেমনি করে বরণ করে নিতে পারি

কই। হৃৎকলাকে দেখতে হয় কণ্ঠ জাণ দিয়ে—সব, সব দিয়ে। সেই  
অনন্তবের মত কি আশ্বাসের আছে ? কুরাশী ঢাকা হৃদয়ের আকাশে তেমন  
করে ফুটে ওঠে না সেই ছবি—অব্যক্ত বেদনার হৃৎ করে যায় মন—বীরে  
উঠে আসি—ফিরে যেতে হয় প্রত্যহের পৃথিবীতে। কণিকের বদন হৃদয়ে  
যায়। কোম মন্ত্র বলে নেমে এসেছিল পাহাড় চূড়ার বর্ষ এই মনুষ্যটির  
সীমানার আবার গেল মিলিয়ে।

## দুইটি বটগাছের কথা

যমদত্ত লিখিত

ইংরাজী ১৭৫৭ সালে পলাশীর যুদ্ধজয়ের পর লর্ড ক্লাইব  
(তখন অবশ্য তিনি লর্ড উপাধি পানেন নাই; সর্ব  
সাধারণে কর্ণেল রবার্ট ক্লাইব বলিয়া পরিচিত ছিলেন)  
বঙ্গ, বিহার ও উজ্জিন নতুন স্বেদার নবাব বাহাদুর  
সীরাজকর আলি খানের নিকট হইতে যে চব্বিশটি পরগণার  
জমিদারী সনদ লাভ করেন তাহা হইতেই বর্তমান ২৪  
পরগণা জেলার উৎপত্তি। রবার্ট ক্লাইব যে ২৪টি পরগণা  
পাইয়াছিলেন, তাহার কতকাংশ অল্প জেলায় চলিয়া  
গিয়াছে এবং অল্পাংশ জেলারও কতক কতক অংশ  
বর্তমানের ২৪ পরগণা জেলার অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। ভারত  
বিভাগের ফলে বশোহর জেলার দুইটি থানা, বধা :—  
বনগাঁ ও গাইঘাটা, ২৪ পরগণা জেলার সহিত যুক্ত  
হইয়াছে।

লর্ড ক্লাইব যে ২৪ পরগণার সনদ পাইয়াছিলেন তাহার  
১৭নং হইতে ১৯নং পর্যন্ত জৌজীর জমিদার ছিলেন সাবর্ণি  
জায় চৌধুরীরা। কাল ক্রমে ইহাদের বহু জমিদারী  
কোষ্টায় ও অনিচ্ছায় অল্প লোকের হাতে চলিয়া যায়।  
কলিকাতার সুবিখ্যাত এ্যাটর্নী নিমাইচন্দ্র বসুর (গত  
একশত বৎসর বৎসরের মধ্যে কলিকাতার একমাত্র ইনিই  
স্বাভাব্যে “দম্পতী-বরণ” করিতে পারিয়াছিলেন) ও  
কলিকাতা হাইকোর্টের সর্ব শ্রেষ্ঠ “ব্রীডার” রাজেন্দ্রনাথ  
বসুর (ইহাকে একবার হাইকোর্টের জজ করিবার প্রস্তাব  
কখনকার প্রধান বিচারপতি Sir William Comer  
Fotheram করিয়াছিলেন) পূর্বপুরুষ মদন বহু বধন  
বর্তমান হইতে আসিয়া গঙ্গাতীরে পানিহাটী সমাজগ্রাম

বলিয়া ঐ গ্রামে ভিটা পত্তন করেন; তখন অপরের  
জমিদারীতে বসবাস করিবেন না বলিয়া বহুগণ গোমেন ৩নং  
ভৌজী খরিদ করেন।

পানিহাটী পূর্বে কিরূপ সমাজগ্রাম ছিল সে সম্বন্ধে  
দুই একটি কথা বলিলে আশা করি পাঠকগণ সৈধ্যচ্যুত  
হইবেন না। দক্ষিণ রাঢ়ী কাষস্থ সমাজে কর বংশের স্থান  
উচ্চে—ইহাদের দুই সমাজ, পানিহাটীর কর ও বন্দীপুরের  
কর। ঐচ্ছিকভাবে বধন পানিহাটীতে আসিয়াছিলেন,  
তখন মকরল কর তাঁহাকে আহ্বান করিয়া নিজ বাটীতে  
লইয়া গিয়াছিলেন। তাঁহার ভিটা “হলদে কালিবাড়ীর”  
উত্তর পশ্চিম কোণায় ডাঃ রাধিকাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের  
ভিটার সামিল আয়গায় ছিল। অবিনাশচন্দ্র দত্তের পূর্ব-  
পুরুষ শ্রীকর্ষ দত্ত বাংলা সন ১২০৭ কি ১২০৮ সালে  
পানিহাটীর শেব করের নিকট হইতে তাঁহার ভিটা ক্রয়  
করিয়া বসবাস করিতে আরম্ভ করেন। কোবালায়  
লিখিত থাকে যে তাঁহুর দালান কখনও ভগ্ন করিবে না।  
তাঁহার কংশধরেরা এই প্রতিশ্রুতি গত সন ১০৪০ সাল  
অবধি রক্ষা করিয়া আসিয়াছেন। একশকার অবস্থা  
বলিতে পারি না। পানিহাটীতে গত একশত বৎসরের  
মধ্যে কোনও কর বংশীরের সন্ধান পাই নাই।

পানিহাটীর কাষস্থ ঘোবাবুড়া কিরূপ স্থলীন ও প্রতিষ্ঠা-  
সম্পন্ন ছিলেন তাহা দুইটি ঘটনা হইতেই বুঝা যাইবে।  
শোভাবাজারের রাজা রাজকৃষ্ণ দেব বাহাদুর তাঁহার  
একমাত্র কন্যা কৃষ্ণাবিনীর বিবাহ পানিহাটীর হরকালি  
ঘোষের সহিত মেনে। আর কলিকাতার বিখ্যাত বন্দী

রাইহুল দেব তাঁহার কোঠ পুত্র আন্তোব দেবের ( যিনি ছাছু বাবু নামে বিখ্যাত ) বিবাহ পানিহাটী নিবাসী শঙ্কুচন্দ্র বোবের কন্যা নবীনমণির সহিত দেন। হরকালি বোবের বিবাহ হয় আশ্বাজ ইংরাজী ১৮০১ সালে; আর নবীনমণির বিবাহ হয় আশ্বাজ ইংরাজী ১৮২০ সালে।

পানিহাটীর মিজেরা সুবিখ্যাত ও বহু শাখায় বিভক্ত। আমী বিবেকানন্দর পিতা পানিহাটীর মিজ বাটীতে কন্যা সন্তান করিয়া গর্ভ অল্পতব করিয়াছিলেন। কবি গিরীন্দ্রমোহিনী পানিহাটীর হারাণচন্দ্র মিজের কন্যা। বিখ্যাত সরদ ও সেতার বাদক ও সঙ্গীতজ্ঞ ষটপেন্দ্রনাথ মিজ মহাশয় একবার আসামে বেড়াইতে গিয়েন। সেখানকার বঙ্গদেবীর কারুগণ বেই শুনিলেন তিনি পানিহাটীর মিজ বংশীয় অমনি তাঁহার গলায় মালা ও চন্দন দিয়া তাঁহার সর্বাঙ্গের ব্যবস্থা করিলেন।

এইরূপে আজ মদনবাবু ৬৮ং তৌজী লইলেন; কাল মণ্ডলয়া অস্ত্রান্ত তৌজী অর্জন করিলেন; রায় চৌধুরীদের বহু তৌজী অস্ত্রের হতে চলিয়া যায়। বাংলার গবর্নর জেনারেল Warren Hastings এর রাজস্ব ব্যবহার ফলেও বহু তৌজী তাঁহাদের হস্তচ্যুত হয়। Warren Hastings এর দেওয়ান শোভাবাজার রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা মহারাজা নবকৃষ্ণ দেব বাহাদুর এইরূপে ১৫৫১৫৬নং প্রতীতি বহু তৌজীর মালিক হইলেন ও মহারাজা উপাধি পাইলেন। এই উপাধি দিল্লীর বাদশাহ হইতে লাট সাহেব আনাইয়া দিয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র রাজা রাজকৃষ্ণ দেব বাহাদুর। ইনি টালিগঞ্জের টিপু সুলতানের বংশধরদের গৌরারার সহিত বুক চাপড়াইতে চাপড়াইতে “হাসান, হোসেন” শব্দ করিতে করিতে পদত্রেণে গিয়েন। ইহাতে গোঁড়া হিন্দুরা আগতি করাতে তিনি চৌদ্ধ মাসের কীর্তনসহ শোভাবাজার রাজবাটী হইতে বহির্গত হইয়া খড়মহের শ্রামহুন্দরের দ্বারে গিয়েন ও শ্রামহুন্দরের গলায় নীলার মালা পরাইয়া দেন।

দেওয়ান গৌরীচরণ রায় চৌধুরী পূর্বে নিম্নকির অর্থাৎ নিম্নক মহালের দেওয়ান ছিলেন। তিনি নিজেও সাধার্ন ময় চৌধুরী বংশসম্বৃত। তিনি জাতিগণের নিকট হইতে ১৭২৮ং হইতে ১৭৩৪ং প্রতীতি বহু তৌজী ধরিষ করেন ও টিপুসহ করেন এক কালক্রমে বিশাল দুর্গাপুর জমিদারীর

মালিক হইলেন। লর্ড অকল্যান্ডের সময় একমাত্র বর্ডমানে মহারাজাধিরাজ বাহাদুর ব্যতীত সুবে বাংলার মধ্যে অন্যর কোনও জমিদার এত বেশী রাজস্ব সরকারকে আদায় দিতেন না। তিনি নিজ জমিদারীভুক্ত পানিহাটী গ্রামে বিশাল অট্টালিকা নির্মাণ পূর্বক জাতিগোষ্ঠীদের আনাইয়া ব্রহ্মোত্তর ও জমিদারী দান করিয়া বসবাস আরম্ভ করেন। ইহাদের নির্মিত ৭ কোঁকর বিশিষ্ট ঠাকুর দালান আজও বর্তমান। সম্মুখের নাটমন্দির তিনতলা সমান উচু করা হয়—বাহাতে দোতালার বা তে-তালার বসিয়া মেয়েরা পর্দার আড়াল হইতে যন্ত্রা, নাচ, গান, তামাসা প্রভৃতি দেখিতে পায়। বাড়ীর দেওয়াল সব ৬ ফুট করিয়া চওড়া—চোরে বা ভাঙাতে সারা রাজি ধরিয়া নির্মিত দিলে ৬ ফুট করিতে পারিবে না।

দেওয়ান গৌরীচরণের দত্তক পুত্র জয়গোপাল রায় চৌধুরী বড় সৌখীন, তেজী ও ক্রিয়াবান পুরুষ ছিলেন। দেওয়ান গৌরীচরণের নিজের কোনও পুত্র সন্তান ছিল না। তিনি যেহিদি দুর্গাপুর তালুক অর্জন করেন সেই দিনই জয়গোপালবাবু জন্মগ্রহণ করেন। তিনি তাঁহার মাতার অষ্টম গর্ভের পুত্র সন্তান। তাঁহার জন্মের অষ্টম দিন “আট-কোড়ের” আয়োজন করিতেছেন তাঁহার জেঠাইমা, অর্থাৎ দেওয়ান গৌরীচরণের স্ত্রী। একমত সময়ে হঠাৎ তাঁহার গর্ভধারিণী মা বলিলেন যে “দিল্লী! আমার এই ছেলেকে ধর, তোমাকে দিলাম, তুমিই ইহাকে মানুষ করিও; আমার শরীর অত্যন্ত ধারাপ বোধ করিতেছি; আমার ডাক আসিয়াছে—আর তোমার দেওয়ানকে খবর দাও, যদি শেষ দেখা করিতে পারি।” বলিতে বলিতে তিনি অজ্ঞান হইয়া গেলেন ও অল্পকাল পরেই মারা গেলেন। বাড়ীতে কান্নার রোল উঠিয়া দেওয়ান গৌরীচরণ বাড়ী ফিরিয়া সবই শুনিলেন; তাহাকে বলিলেন যে বৌ-মাত ছেলেটিকে আমাদের দিরাছেন, তুমি যদি মত কর ত শুভ দিন কণ দেখিয়া ইহাকে দত্তক গ্রহণ করি। তাই প্রথমে শুক্র-বিক্রয় করিতে রাজি হইলেন নাই; পরে রাজী হইলেন কিন্তু কথা থাকে যে আবশ্যক হইলে জয়গোপাল তাঁহারও প্রাণাদি করিবেন। দেওয়ান গৌরীচরণ ইংরাজী ১৮০১ সালে দেহরক্ষা করেন। জয়গোপাল বাবু সখের কথা একটা বলি; তিনি যে

ঘরে বসিভেন সেই ঘরের দেওয়ালে পঙ্কের কারুকার্যের ভিত্তর কাশী, লক্ষ্মী, প্রভৃতি স্থান হইতে আনীত হাতির দাঁতের উপর অঙ্কিত নানাবিধ রঙ্গীন ছবি পাতলা অস্ত্রের চকনি দিয়া গাঁথা ছিল। সমগ্র রামায়ণ ছবিতে দেখান ছিল। আর কাছারী বাড়ীর দেওয়ালে শতানেক হাতির দাঁতের বাট দেওয়া তরবারী, অসি ও সোনালী গুল্ দেওয়া গণ্ডারের চামড়ার ঢাল স্থলিত। বসিবার আসনের পিছনে কয়েকটা কারুকার্য খচিত বন্দুক ও একটা বড় “কড়া-বীন্” (carabine) ছিল। বাড়ীর ছাদের ওপর ‘হুজুম-গান’ ছিল। গজার এপার হইতে ছুঁড়িলে ওপারে গিয়া গুলি বা ছট্‌রা পড়িত।

একবার সেকালের বিখ্যাত ডাকাত ভজ্জহরি সর্দার গুরকে ভজ্জা সর্দার কোননগরের মিজবাবুদের বাড়িতে চিঠি দিয়া ডাকাতি করিতে আসিলে খুব লাঠালাঠি সোর-গোল হয়। জয়গোপালবাবু তাহা শুনিতে পাইয়া নিজ হাতে তাগ্ করিয়া “কড়া-বীন্” বা “হুজুম-গান” ছুঁড়েন। জয়গোপালবাবুর গুলির আঘাতে ভজ্জহরির বাঁ হাত ভাঙ্গিয়া যায়—ভজ্জহরি নিজের দলবল লইয়া পলায়ন করেন। ভজ্জহরি দুঃখ করিয়া বলিয়াছিল যে সালখিরাতে (হাবড়ার সন্নিকট—কলিকাতা হাটখোলার আড়পার) ডাকাতি করিতে গিয়া হাটখোলার দস্তাবাবুদের কড়াবীনের “পেরেক-লাল্” দেখে-ছিলাম; আর আমার ডান হাত (তাহার একমাত্র পুত্র নরহরি—নরহরি তরবারির এক কোপে মহিষের মাথা উড়াইতে পারিত; নিত্য ২৥ সের চাউলের ভাত খাইত) ছারাইয়াছিলাম;—আর আজকে বাঁ হাত গেল। ইহা ইংরাজা আকাজ ১৭২০ খৃষ্টাব্দের কথা। মিজবাবু তাহাদের কৃতজ্ঞতার চিহ্নরূপ জয়গোপালবাবুকে একটা স্বর্ণশিবর্ত্ত পানি-শয্য উপহার দেন। বহুদিন ইহা তাঁহার সংশ্লে ছিল—পরে কোন জামাই ইহা চুরি করিয়া লইয়া যান।

জয়গোপালবাবু পানিহাটীর বাজার স্থাপন করেন ও দ্বাদশমাস আনিবার সুবিধার জন্ত বাঁধাঘাট করিয়া দেন। ঘাট করিয়া দিলে কিরূপ সুবিধা হয় লোকের রায় চৌধুরী বাবু তাহা জানিতেন। পূর্বে জমীদাররা নিজ নিজ এলাকায় সহজে জন্ত কাহাকেও বাঁধা ঘাট করিতে দিতেন না; কিন্তু রায় চৌধুরীবাবুদের ব্যবস্থা অন্তরূপ। কোন

প্রজা বা জন্ত কেহ বাঁধা ঘাট স্থাপন করিতে ইচ্ছুক হইলেই তাঁহারা লিখিত সন্মতি দিতেন এবং এই জমীর খাজনা লইতেন না। এই জন্ত পানিহাটী গ্রামে ও রায়চৌধুরী বাবুদের এলাকায় যত বাঁধা ঘাট তত বাঁধা ঘাট—অন্ত কোনও জায়গায় নাই।

তিনি বাজার ঘাটের দুই পার্শ্বে নহবৎ-খানা করিতে পার্শ্ববর্ত্তী গ্রাম সুখচরের জমীদার “রাজারা” (শোভা-বাজারের মহারাজা নবকৃষ্ণ দেব বাহাদুরের পুত্র রাজা রাজকৃষ্ণ দেব বাহাদুর) আপত্তি তুলেন যে পানিহাটীর “বাবুয়া” যখন রাজা নহেন বা বাদসাহী পাঞ্জা পান নাই তখন তাঁহাদের নহবৎ-খানা গাঁথা বে-আইনী। সুখচরের “রাজারা” বহু হাব্‌সী গুণ্ডা আনিয়া একদিন নহবৎ-খানা ভাঙ্গিয়া দেন।

“রাজাদের” সুখচরে স্থানর বাগান বাটী আছে। গজার জল বারান্দার নীচের ঘরে আপনা আপনি প্রবেশ করে—এইরূপ ঘরে বসিয়া সন্ধ্যা-আহ্নিক করিবার সুবিধার জন্ত চারিদিক মার্বেল পাথর দিয়া বাঁধান ও গজা স্নানের সুবিধার জন্ত লাগাও ছোট সিঁড়ি আছে। রাজা স্তর রাধাকান্ত দেব বাহাদুর এই ঘরে বসিয়া সন্ধ্যা-আহ্নিক করিতেন; একদিন সন্ধ্যায় এক বাহুরের কাতর হাখা রব শুনিয়া তাঁহার মনে নির্ঝেউ উপস্থিত হয়; তিনি বৃন্দাবন-বাসী হইলেন। যুতুকাল পর্যন্ত তিনি বৃন্দাবন ছাড়িয়া বাহিরে কোথাও যান নাই। ভারতের তদানন্তীন বড়লাট লর্ড লয়েল তাঁহাকে K. C. S. I. উপাধি দেন; দরবারে তাঁহাকে দেখিতে না পাইয়া অল্পসন্ধান করেন যে রাজা রাধাকান্ত দেব কেমন উপস্থিত নাই। যখন জানিতে পারিলেন যে রাজা বৃন্দাবন-বাসী হইয়াছেন এবং বৃন্দাবনের চতুঃ-সীমার বাহিরে কোথাও যাইবেন না সন্মত করিয়াছেন তখন তিনি বৃন্দাবনের অগ্রবনে (আগ্রায়) Special durbar করিয়া তাঁহাকে K. C. S. I.র সনদ দেন। রাজার অগ্ররোধে ব্রজমণ্ডলে জীব হিংসা ও গো-হত্যা লাট-সাহেব বন্ধ করিয়া দেন। এই হুকুম গোবিন্দবল্লভ পদ্ম-মজীরের পূর্বে পর্যন্ত বহাল ছিল।

বাক্ এই সব কথা। সুখচরের “রাজারা” নহবৎ-খানা ভাঙ্গিয়া দিলে জয়গোপালবাবু রাজাদের সুখচরের বাগান-বাটী লুণ্ঠ করেন ও ভাঙ্গিয়া দেন। এই বাগানে গোবিন্দ



জেকের উপর প্রতিষ্ঠিত এক খালগ্রাম ছিল—তাহাও লুটিয়া গিয়া আইসেন।

বিবাদ ক্রমশঃই পাকিয়া উঠিল। উভয় পক্ষই বলবান—পুনরায় বল পরীকার আয়োজন চলিতে লাগিল। এক-দিন সূর্যচর গ্রামের সীমানার রাজারা প্রায় পাঁচ-শতাধিক লাঠিয়াল, সড়কিওয়াল, বন্দুকওয়াল, হাবসী কিরিস-ওয়াল জমারোত করিলেন। জয়গোপালবাবুও জাহাজী গোরা, শান্তিপুরের গোড়ো গোয়াল, তুর্কী সওয়ার ও সঁওতালী “এক কাঁড় বিধাই” (অর্থাৎ তীরন্দাজ) প্রভৃতি সংগ্রহ করিলেন। সীমানা পাহারা দিবার জন্য গোড়ো গোয়ালাদের রাখিলেন। শেষ রাজি হইতে রাজারা তাহাদের উপর চড়াও হইলেন; লাঠির চোটে গোয়ালারা রাজাদের হটাইতে লাগিল—এমন সময়ে ভোর হইলে বন্দুকওয়ালারা নিসানা করিয়া গোয়ালাদের দলপতিদের মারিতে লাগিল। সামন্তদীন বন্দুকওয়াল এক ত্রিশুলের উপর বন্দুক রাখিয়া অব্যর্থ টীপে গোয়ালাদের মারিতেছে। তাহারা ক্রমে ক্রমে হটিয়া এখন যেখানে হরিশচন্দ্র দত্তের দেবালয়ের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে বটগাছ আছে ঐ অবধি হটিয়া আসিল। ইতিমধ্যে খবর জয়গোপালবাবুর কাছে গিয়াছে—তিনি ও “নীলা-সবজি” বোড়ায় চড়িয়া রণাঙ্গনে উপস্থিত হইলেন। তাঁহার উপস্থিতিতে উৎসাহিত হইয়া তাঁহার দল এগাইয়া চলিল। হুকুম দিলেন ৫০০ টাকা নগদ দিবেন যে সামন্তদীনের মাথা আনিতে পারিবে। সামন্তদীন বাদসাহী ফোজে কাজ করিয়াছিল; পানিপথের যুদ্ধে লড়াই করিয়াছিল বলিয়া গর্ব করিত। শ্রামা ঢুলী ঢোল ফেলিয়া দিয়া শুস্তিতে টিপ করিয়া সামন্তদীনের চোখ উপড়াইয়া ফেলিল। এইরূপে একের পর এক করিয়া বন্দুকওয়ালাদের চক্ষু নষ্ট করিতে লাগিল। রাজাদের দল পলাইতে লাগিল। এই সময় রায়চৌধুরীদের রণপিঞ্জন বাজিয়া উঠিল—তাঁহাদের দল ডান-কানি আক্রমণ করিয়া রাজাদের নদীর দিকে ঠেলিয়া লইয়া বাইতে লাগিল। ঢুলীরা ঢোল বাজাইতে লাগিল।—

চড়াক্ হুম্! চড়াক্ হুম্—হুমমনের আকেল গড়ুম্।

চড়াক্ হুম্! চড়াক্ হুম্—ধুম্ধুমারি বড় ধুম্-বড় ধুম্ ॥

রাজাদের দল হটিতে লাগিল। সামন্তদীনকে লইয়া

হটিতে লাগিল—এমন সময়ে ছিদাম ঢালি তলওয়ারের এক কোণে তাহার মাথাটা কাটিয়া ফেলিল। তাহারা ঠাকুরদাস বাবাজীর আখড়ার দক্ষিণ অবধি হটিয়া গেলেন। এই আখড়ার জায়গায় এখন মহেন্দ্রবাবুর ঠাকুর-বাড়ী হইয়াছে। “সাহেব-বাগানের” উত্তর-পশ্চিম কোণে যে বটগাছ আছে ঐখানে সামন্তদীনকে কবরস্থ করা হল। তাহার মাথাটা ছিদাম ঢালি পুরস্কার পাইবার পর গদায় ফেলিয়া দেয়। জয়গোপালবাবু শ্রামা ঢুলি ও ছিদাম ঢালি দুই জনকেই ৫০০ টাকা করিয়া হাজার টাকা পুরস্কার দেন।

এই সময়ে বারাকপুর ছাউনীতে বাইবার জন্য কলিকাতার গড়ের মাঠের কোলা হইতে এক রেজিমেন্ট গোরা সৈন্ত বড় রাস্তা (Barrackpore Trunk Road) তখন হয় নাই—খুব সম্ভব নীলগঞ্জের রাস্তা) ধরিয়া কুচ্ করিতেছিল। সঙ্গে দুইটা কামান টানিয়া লইয়া বাইতেছিল। বরাহনগর সিঁতির কাছে আসিয়া তাহারা “তলু” দত্তের বোম-কাটা পুর্কিরিগীর বাঁহ্যপ্রদ কাক-চক্ষু জল খাইবার জন্য বিশ্রাম করিতেছিল। “তলু” বাবুর বাগানে খবর আসিল যে রাজাদের সঙ্গে পানিহাটীর বাবুদের যোরতর দাঙ্গা বাধিয়াছে—২০।২৫ জন ঘায়েল হইয়াছে। “তলু” বাবুর সঙ্গে কর্ণেল সাহেবের আলাপ পরিচয় ছিল—তিনি তাঁহাকে এই লড়াই থামাইয়া দিতে অনুরোধ করেন। কর্ণেলও রাজি করেন। এক প্রহর বেলায় সময় দাঙ্গার স্থলে উপস্থিত হইয়া দুই পক্ষকে থামিতে ইসারা করিলেন এবং বিবদমান দুই দলের মধ্যে দুই সারি গোরা-সৈন্ত সাজাইয়া দিলেন।

পরে বিবাদ মিটাইয়া দিলেন এই সর্ভে—রাজারা বতদুর পর্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিলেন পানিহাটা গ্রামে সেই-খানে একটা বটবৃক্ষ পোতা হইবে। কখনকালে কেহ এই বটবৃক্ষ কাটিতে পারিবে না। আর রায়-চৌধুরীদের লোক সূর্যচর গ্রামের ভিতর বতদুর অগ্রসর হইয়াছিলেন সেইখানে আর একটা বটবৃক্ষ পোতা হইবে—এই গাছও কেহ কখনও কাটিতে পারিবে না। এখনও এই বটবৃক্ষ দুইটা খোঁষমেজাজে বহাল তবিয়াতে বর্তমান থাকিয়া সূরুর অতীতের ঘটনাবলীর সাক্ষ্য দিতেছে।

আর এই দুই বটবৃক্ষের ঠিক মাঝখানে দড়ি ফেলিয়া

সুখচর ও পানিহাটি গ্রামের সীমা নির্ধারিত হইল। অবিকল্পে গোলবাগ নিবারণের জন্য পূর্ব-পশ্চিমে লম্বা একটা খাদ কাটিয়া কাঠ-কয়লা ও কড়ি দিয়া তাহা ভর্তি করা হইল এবং সীমানা রক্ষার ভার “খটিদার” অন্তরচরণ চট্টোপাধ্যায়ের যাতায়াত — গাঙ্গুলির হাতে দেওয়া হইল। সন ১২৭৫ সালেও রাজা স্ত্র রামাকান্ত দেব বাহাদুরের দৌহিত্র আনন্দকৃষ্ণ বহু সীমানা বজায় আছে কিনা দোষিবার জন্য এই স্থান খনন করেন ও কাটা খাদ কাঠ-কয়লা পরিপূর্ণ দেখেন।

রাজার কখনও অশ্রমজ লইয়া সুখচরের এই বটবৃক্ষের দক্ষিণে আসিবেন না; আর পানিহাটির বাবুগাও তদ্রূপ পানিহাটির বটবৃক্ষের উত্তরে আসিবেন না। উভয় পক্ষই এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিলেন। বিবাদ প্রায় মিটিয়া গেল, এমন সময়ে গোল বাধাইল গোমতীচক্র ও শালগ্রাম শিলা। রাজারা ইহা ফেরৎ চাহিলেন; রায়চৌধুরীরা ব্রাহ্মণ বলিয়া স্বয়ং পূজার দাবি করিলেন ও বলিলেন যে তাঁহারা ঠাকুরকে অন্নভোগ দিতেছেন, ফেরৎ দিলে কায়স্থ বাটাতে তাহা হইবে না—সুতরাং ঠাকুরের কষ্ট হইবে। সুতরাং ঠাকুর তাঁহাদের কাছেই থাকুক। রাজারা ইহাতে রাজি হইলেন না, বলিলেন জয়গোপালবাবু যদি রাজাদের এলাকার ব্রাহ্মোত্তর দান গ্রহণ করেন তাহা হইলে তাঁহারা ঠাকুর ছাড়িয়া দিতে সম্মত আছেন। জয়গোপালবাবু ইহাতে রাজি হইলেন না।

কর্ণেল সাহেবের খাগ কুলীজী মিশির এই বিবাদের এক সমাধান করিয়া দিলেন। তাঁহার জানা এক নির্ভাবান ব্রাহ্মণ এই গোমতীচক্র ও শালগ্রাম পূজার ভার পাইলেন। জয়গোপালবাবু পাট্টনা গ্রামে দশ বিধা দেবোত্তর করিয়া দিলেন; রাজারা পূজার জন্য মুড়াগাছা পরগণার মধ্যে পঞ্চাশ বিধা দেবোত্তর করিয়া দিলেন। সকল বিবাদ মিটিয়া গেল।

পানিহাটির শেষ জমিদার জয়গোপাল রায়চৌধুরীর পৌত্র শিবচন্দ্র রায়চৌধুরী মহাশয়কেও (শেষ জমিদার বলিতেছি এই জন্য যে পানিহাটির বর্তমান জমিদাররা আর পানিহাটি গ্রামে দেওয়ান গৌরীচরণের ভিটায় বসবাস করেন না) এই প্রতিশ্রুতি রক্ষা করিতে দেখিয়াছি। বখনই তিনি বাড়ীর বাহির হইতেন দুই জন চাপরাসী সঙ্গে তরবারি লইয়া বাইত। কিন্তু এই বটগাছের উত্তরে আসিলে হয় একলা, না হয় নিরস্ত্র চাপরাসী সঙ্গে লইয়া আসিতেন। আমরা একবার তর্ক করিয়া তাঁহাকে বলিয়াছিলাম—যে যে কারণে ও যে যে অবস্থায় এই প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইয়াছিল বর্তমানে সেই সেই কারণ বা অবস্থা নাই, তিনি কেন এই dry formality বজায় রাখিতেছেন। ইহাতে তিনি বলেন যে পূর্বপুরুষের প্রতিশ্রুতি রক্ষা করা ত পরম ধর্ম বটেই, আর তাঁহাদের বিষয় ভোগ করিব; কিন্তু তাঁহাদের প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি বা দেবোত্তর ব্রাহ্মোত্তর রক্ষা করিব না এইরূপ বে-ইমানী করা কি উচিত? আমরা হিন্দু—বিশেষ ব্রাহ্মণ।

## চাওয়া

### শ্রীহাসিরাশি দেবী

তোমার চরণ-ধ্বনি নিত্য যেন আমার অন্তরে  
বাজে কণে কণে  
ছায়া ঢাকা বনপথে, রৌদ্রভরা বিজন প্রান্তরে—  
মৌন আবাহনে।

বসন্তের বেলা শেবে—মুঞ্জরিত পিরিয়াল শাখায়,  
উদাসী চৈতালী হাওয়া যেন এসে ডাক দিয়ে যার—  
তোমার কর্ণের গানে; বরষার বেপূবনে যেন এর সুর—  
আমারে উদ্দীপ্ত করে;—হে সুরদূর! আমার সুরদূর।

তোমার নয়নপাতে নিত্যকার মুহূর্ত আমার  
পরিপূর্ণ হোক—  
এহর শেষের আলো প্রস্ফুট করুক বারবার  
কিংবদন্ত অশোক।

আমার পৃথিবী তরা আলো আর আকাশের নীল,  
তোমারই মাঝারে যেন খুঁজে পায় অনন্ত নির্খিল  
রূপে, রসে, গন্ধে তরা;—বেদনায়—মিলনে—উজ্জ্বলসে,  
তোমার ইজিত যেন কাছে আসে—আরো কাছে আসে



# দ্রাণী



## মীরাবাই

কোন যতন প্রভু পায়ে মীরা কোন যতন প্রভু পায়ে ।  
 মৈ তো প্রীতম চুঁটনে আজি, অপনা আপ গবায়ো ॥  
 কীকে পড়্ গয়ে বন্ধন সারে জিন য়হ হম ভরমায়ো ।  
 হুক উঠা এসো জীবনমে জীবন কির নহি ভায়ো ॥  
 ছোড়ী আস নিরাশা ছুটী ছুটো অপনো পরায়ো ।  
 “জগ রুঠে—অব তু না রুঠে—রো রো মীরা গায়ো ॥  
 জনম জনমকী প্রীত পুরানী—মোহন ! না বিসরায়ো ।  
 জুঁ ভাবে অব রাখো আমি ! দুখমে ভী সুখ পায়ে ॥

তোমারে কেমনে পাবে মীরাহায়, তোমারে পাবে কেমনে ?  
 আপনারে যবে হারালো সে এসে তোমারি অধেষণে ?  
 মমতার হুল শিখিল—যাহারা বেঁধেছিল বন্ধনে,  
 তারি বেদনায় সাধ আর নাথ রহিল না এ-জীবনে !  
 আশা ও নিরাশা মিলালে—আপন-পর কি রহে স্বরণে ?  
 সব যায় যাক—ফিরায়ো না মুখ তুমি এ-আধার কণে ।  
 জন্ম জন্ম চেয়েছি তোমারে রেখে প্রভু রেখে মনে,  
 সুখে রাখো কি বা দুখে রাখো, যেন দুখে মীরা সুখ গণে ।

হিন্দিকথা—শ্রীমতী ইন্দিরা মালহোত্র, বাংলা অনুবাদ ও সুর—শ্রীদিলীপকুমার রায়, তাল—চতুর্মাত্রি

II সা পা পা দা | পমা পা মজা জা I পা সঁ সা -১ | রঁ পা পা -১ I  
 কো - ন য ত ন প্র ভু পা - যো - মী - রা -  
 তো মা - রে কে - য নে পা - বে মী রা - না থ

পা রঁ রঁ জঁ | রঁ সঁ রঁ পা রঁ I রঁ সঁ সঁ -১ | -১ -১ -১ -১ II  
 কো - ন য ত ন প্র ভু পা যো - - - -  
 তো - মা রে পা - বে কে য নে - - - -

পা রাঁ রজ্জাঁ সঁরাঁ | রাঁ -১ জ্জাঁ মাঁ | মজ্জমাঁ রজ্জাঁ রাঁ জ্জাঁ | সঁরাঁ -১ সঁ -১ |  
 মৈ - তো - জী - ত ম ঢু - চ নে আ - ই -  
 আ প - না রে য বে হা - রা লো সে - এ সে

সা রা জ্জা মা | পা দা গা সঁ | রঁসঁ গঁসঁ গঁধা গা | দপা দা পমা পা II  
 অ প না - আ - প গ বা - য়ো - - - -  
 তো মা - র অ ন - নে য - গে - - - -

সা ঋ সা রা | জ্জা মা মা মা | পা দা পা ধা | গা সঁ সঁ -১ |  
 ফী - কে - প ড় গ য়ে ব ন্ ধ ন সা - রে -  
 ম ম তা - রা গো লো শি থি ল - যা - হা রা

সঁ ঋ সঁ রাঁ | জ্জাঁ মা জ্জাঁ রাঁ জ্জাঁ | সঁজ্জাঁ ঋ সঁ -১ | -১ -১ -১ -১ |  
 গি ন য ঙ্গ হ ম ভ র মা - য়ো - - - -  
 বে - ধে - ছি ল বন্ - ধ - নে - - - -

সঁ ঋ জ্জমা জ্জাঁ ঋ | সঁ -১ সঁ -১ | পদা গঁসঁ গা -১ | পগা দা পা -১ |  
 হু - ক উ ঠা - ঐ - সী - জী - ব ন মে -  
 তা - দি বে - দ না য সা - ধ আ র না থ

সঁ ঋ জ্জমা জ্জাঁ ঋ | সা দা গা সা | ঋ ঋ সঁ গঁসঁ | গা ধগা দা পা II  
 জী - ব ন ফি র ন চি ভা - য়ো - - - -  
 র - হি লো - না এ জী ব নে - - - -

পা -১ পা -১ | মজ্জা বজ্জা জ্জা মা | পা গা গা সঁ | সঁ -১ সঁ -১ |  
 ছো - ডী - আ - শ নি রা - শা - হু - টা -  
 আ - শা ও নি - রা শা মি - লা লে আ - প ন

পা দা পা গা | পা সঁ পা রাঁ | পা জ্জাঁ রাঁ সঁ | -১ -১ -১ -১ |  
 হু - টো - আপ নো প রা - য়ো - - - -  
 প - র কি র হে - অ র - গে - - - -

পা মা জ্জাঁ -১ | ঋ -১ সঁ সঁ | মা ঋ সঁ -১ | গা -১ দা -১ |  
 জ গ কু ঠে - অ ব তু - না - কু - ঠে -  
 স ব যা য যা কু ফি রা য়ো - না - যু থ

জা গা দা -১ | সা পা মা -১ | জ্ঞা -১ সা -১ | -১ -১ -১ -১ ||  
 রো - রো - মী - রা - গা - য়ো - - - - -  
 তু - মি এ জা - ধা র ক্ষ - গে - - - - -

সা জ্ঞা জা মা | পা দা মা -১ | জা মা পা দা | গা সা দা -১ ||  
 জ ন ম জ ন ম কী - প্রী - ত পু রা - নী -  
 জ ন্ ম - জ ন্ ম - চে য়ে ছি - ত্তো মা রে -

পা দা গা সা | সা জ্ঞা গা মা | জ্ঞা -১ সা -১ | -১ -১ -১ -১ ||  
 মো - হ ন না - বি স রা - য়ো  
 রে - থো প্র - তু রে থো ম - নে

পক্ষা -১ সা -১ | পক্ষা -১ সা সা | পক্ষা -১ গা -১ | পদা -১ দা -১ ||  
 জু - ভা রে - অ ব রা - থো - স্বা - মী -  
 সু থে - রা থো - কি বা হু থে - রা থো - য়ে ন

মপা পা পু -১ | জমা -১ রজা জা | সক্ষা -১ সা -১ | -১ -১ -১ -১ ||  
 হু থ মে - ভী - সু থ পা - য়ো - - - - -  
 হু থে - মী রা - সু থ গ - গে - - - - -

## পালবংশীয় মদনপাল ও গোবিন্দপাল

ডক্টর শ্রীদীনেশচন্দ্র সরকার

যাঁহারা বাংলাদেশের ইতিহাসের চর্চা করেন, তাঁহারা সকলেই অবগত আছেন যে, পালবংশীয় রাজগণের লিপিতে বিভিন্ন নরপতির রাজত্বের বর্ধক মাত্র উল্লিখিত হইত, উহার তারিখে কোন অক্ষ বা সাল ব্যবহারের প্রথা প্রচলিত ছিল না। এই কারণে কোন পালরাজারই সিংহাসন আরোহণের কাল নিরূপণ করা সম্ভব হয় নাই।

পালরাজগণের সময়কালীন মাত্র দুইখানি লিপিতে বিক্রমসংবতের ব্যবহার দেখা যায়। ইহার মধ্যে প্রথম মহীপালের সারনাথ শিলালিপি প্রথমে উল্লেখ করা প্রয়োজন। এই লিপির তারিখ ১০৮৩ বিক্রমাব্দ অর্থাৎ ১০২৬ খ্রিষ্টাব্দ। লিপিখানি কালীর নিকটবর্তী বৌদ্ধ তীর্থ সারনাথে পাওয়া গিয়াছে। লিপিতে উল্লিখিত হইয়াছে যে, রাজা তীর্থ ভ্রমণ করিতে গিয়া তাঁহার দুই জাতার সাহায্যে ঐ অঞ্চলে কতকগুলি

মন্দিরের নির্মাণ ও সংস্কার কার্য সমাধা করিয়াছিলেন। মৌখিক, গুরুত্ব-প্রাপ্তিহার প্রভৃতি বংশের রাজগণের চেষ্টায় ইতিপূর্বেই বর্জমান উত্তরপ্রদেশ অঞ্চলে বিক্রমসংবতের ব্যবহার সুপ্রচলিত হইয়াছিল। এই স্থানীয় প্রথার প্রভাবই মহীপালের সারনাথ লিপিতে বিক্রমাব্দ ব্যবহারের একমাত্র কারণ। দুঃখের বিষয়, লিপিখানিতে ১০৮৩ বিক্রমাব্দের সঙ্গে সঙ্গে প্রথম মহীপালের রাজ্য সংবৎসরের উল্লেখ করা হয় নাই। তাহা হইলে অন্ততঃ এই পাল নরপতির সিংহাসন লাভের কাল হিসাব করিয়া বাহির করা যাইত।

বিক্রমাব্দের তারিখসংবলিত পাল যুগের যে দ্বিতীয় লিপিখানি পাওয়া গিয়াছে, উহা গোবিন্দপালের গয়া শিলালিপি। গোবিন্দপাল যে অনেক উত্তরকালীন পালবংশীয় নরপতি, তাহাতে কাহারও সন্দেহ হয় নাই;

কিন্তু তাঁহার সহিত এই রাজবংশের পরিচিত নরপতিগণের কোন সম্পর্ক অত্যাধিক নিরূপিত হয় নাই। গোবিন্দপালের গয়ালিপির তারিখ ১২৩২ বিক্রমাব্দের আশ্বিন মাসের শুক্লা পঞ্চমী। উত্তর ভারতে প্রচলিত বার্ষিকচক্রানুযায়ী বৎসরটির নাম দেওয়া হইয়াছে বিকারী। পণ্ডিতগণ হিসাব করিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, গয়া লিপির প্রকৃত তারিখ ১১৭৫ খ্রীষ্টাব্দের ২২শে সেপ্টেম্বর। লিপিটির তারিখে আরও বলা হইয়াছে যে, ১২৩২ বিক্রমাব্দ ছিল রাজা গোবিন্দপালের “গত রাজ্যের” ১৪শ বর্ষ। সাধারণতঃ নরপতিগণের রাজ্যসংবৎসর উল্লেখ হলে “প্রবর্তমান বিজয় রাজ্য” প্রভৃতি কথা ব্যবহার দেখা যায়; কিন্তু সে হলে গয়া-লিপিতে গোবিন্দপালের বিগত রাজ্যের উল্লেখ করা হইয়াছে। ইহা হইতে পণ্ডিতগণ স্থির করিয়াছিলেন যে, গোবিন্দপাল রাজ্য হারাইবার পর চতুর্দশ বৎসরে উল্লিখিত গয়া লিপি উৎকীর্ণ হইয়াছিল। এই হিসাব অনুসারে ১২১৯ বিক্রমাব্দে অর্থাৎ ১১৬২-৬৩ খ্রীষ্টাব্দে গোবিন্দপালের রাজ্য শত্রুহস্তগত হইয়াছিল। কেশ্বিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে রক্ষিত একখানি বৌদ্ধগ্রন্থের পুথিতে গোবিন্দপালের ৪র্থ “বিজয়রাজ্য সংবৎসরে” উহা সমাপ্ত হইবার উল্লেখ আছে। সুতরাং পণ্ডিতগণ সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন যে, গোবিন্দপাল অন্ততঃ চারি বৎসরকাল রাজত্ব করেন, অর্থাৎ অন্ততঃপক্ষে তিনি আনুমানিক ১২১৬ বিক্রমাব্দ (১১৫৯-৬০ খ্রীষ্টাব্দ) হইতে ১২১৯ বিক্রমাব্দ (১১৬২-৬৩ খ্রীষ্টাব্দ) পর্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন। গোবিন্দপালের রাজ্য শত্রুকর্তৃক অধিকৃত হইবার পর কেন তাঁহার ভূতপূর্ব প্রজাগণ নূতন রাজার রাজ্যসংবৎসরের পরিবর্তে গোবিন্দপালের রাজ্যকাল উল্লেখ করিত, ইহার কারণ স্বরূপ পণ্ডিতেরা বলিয়াছেন যে, রাজ্যচ্যুত বৌদ্ধ রাজা গোবিন্দপালের প্রতি দক্ষিণ বিহারের বৌদ্ধ অধিবাসিগণের পক্ষপাতিত্বই ইহার কারণ। সম্ভবতঃ ঐহাঙ্গী গোবিন্দপালকে উচ্ছেদ করিয়া দক্ষিণ বিহার অধিকার করেন, তাঁহার বৌদ্ধ ছিলেন না। বাহা হউক, গোবিন্দপালের রাজত্বকাল সম্বন্ধে পণ্ডিতগণের উপরিলিখিত সিদ্ধান্ত নিতান্তই অসার বলিয়া বোধ হয়। রাজার রাজ্যচ্যুতের সময় হইতেই রাজ্যত্বের গণনা আরম্ভ হওয়া স্বাভাবিক; রাজা রাজ্য হারাইবার সময় হইতে কালগণনার কল্পনা অত্যন্ত অস্বাভাবিক। গোবিন্দপালের গয়া লিপির এবং পূর্বোক্ত পুঁথিখানির তারিখ হইতে স্পষ্টতঃই বোধ হয় যে, তিনি ১২১৯ বিক্রমাব্দে (১১৬২-৬৩ খ্রীষ্টাব্দে) সিংহাসন আরোহণ করিয়াছিলেন; অন্তঃপর তিনি অন্ততঃ তাঁহার চতুর্থ রাজ্যসংবৎসর অর্থাৎ ১২২২ বিক্রমাব্দ (১১৬৫-৬৬ খ্রীষ্টাব্দ) পর্যন্ত সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন; কিন্তু তাঁহার রাজ্যচ্যুতের পরবর্তী চতুর্দশ বৎসরের অর্থাৎ ১২৩২ বিক্রমাব্দ বা ১১৭৫ খ্রীষ্টাব্দের আশ্বিন মাসের পূর্বেই তদীয় রাজ্য শত্রুহস্তগত হইয়াছিল। অবশ্য রাজ্য হারাইবার পরেও কিছুকাল পর্যন্ত দক্ষিণ বিহারের প্রজাগণ দলিলে তারিখ দিতে বা পুঁথি সমাপ্তির কাল বুঝাইতে গোবিন্দপালের রাজ্য সংবৎসরের গণনাই ব্যবহার করিয়া থাকিতেছিল। এই সিদ্ধান্তের সমর্থক একটি অকাটা প্রমাণ আমি সম্রাট আবিষ্কার করিতে সমর্থ হইয়াছি।

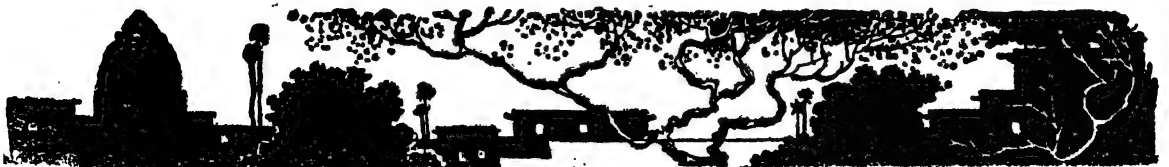
পালরাজগণের বংশলতার সর্বনিম্নস্থানবর্তী নরপতির নাম মদনপাল। অত্যাধিক পালরাজার জ্ঞান ইহার রাজত্বকাল সম্পর্কেও পণ্ডিতগণের মধ্যে একমত্য নাই। মদনপালের জয়নগর লিপির তারিখ তদীয় রাজত্বের চতুর্দশ বৎসর। সুতরাং তিনি অন্ততঃ চৌদ্দ বৎসরকাল রাজত্ব করিয়াছিলেন, এইরূপ মনে করা হইত। গত জানুয়ারী মাসের প্রথম ভাগে আমি মুন্সের জেলার পশ্চিমাঞ্চলস্থিত কতিপয় গ্রামে শিলালিপি প্রভৃতির খোঁজ করিতে গিয়াছিলাম। এই সময়ে আমি ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলপথের লক্ষ্মীসরাই স্টেশনের নিকটবর্তী এক গ্রামে মদনপালের একখানি শিলালিপি আবিষ্কার করি। এই লিপিটি রাজা মদনপালের ১৮শ রাজ্যসংবৎসরের ১১ই জ্যৈষ্ঠ তারিখে উৎকীর্ণ হইয়াছিল। কিন্তু লিপিটির একটি মূল্যবান বৈশিষ্ট্য এই যে, ইহার তারিখে মদনপালের ১৮শ রাজ্যাব্দের সহিত ১০৮৩ শকাব্দের অর্থাৎ ১২১৮ বিক্রমাব্দ বা ১১৬১-৬২ খ্রীষ্টাব্দের উল্লেখ আছে। ইহা হইতে নিঃসংশয়ে জানা গেল যে মদনপাল ১০৬৬ শকাব্দ অর্থাৎ ১২০১ বিক্রমাব্দ বা ১১৪৪-৪৫ খ্রীষ্টাব্দে সিংহাসন আরোহণ করিয়াছিলেন এবং অন্ততঃ ১১৬১-৬২ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন। আমরা ইতিপূর্বে দেখিয়াছি যে, গোবিন্দপাল ঠিক ইহার পর বৎসর রাজ্যচ্যুত করেন। সুতরাং গোবিন্দপাল যে মদনপালের উত্তরাধিকারী অর্থাৎ অব্যবহিত পরবর্তী রাজা ছিলেন, তাহাতে কোন সন্দেহের অবকাশ নাই। সম্ভবতঃ গোবিন্দপাল মদনপালের পুত্র ছিলেন। বাহা হউক, বর্তমান লিপি হইতে ইহাও নিশ্চিত জানা গেল যে, গোবিন্দপাল ১১৬১-৬২ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে চারি বৎসর বা তদধিককাল রাজত্ব করিয়া ঐ সময়ে রাজ্যচ্যুত হন, পণ্ডিতগণের এই ধারণা ভ্রান্ত। নবাবিচ্ছৃত লিপিখানি উত্তর-কালীন পালরাজগণের ইতিহাসের উপর অনেকখানি নূতন আলোকপাত করিয়াছে। প্রথমতঃ, ইহাতে মদনপালের সিংহাসন লাভের সময় স্থিররূপে নির্ধারণ করা সম্ভব হইল। দ্বিতীয়তঃ ইহা হইতে মদনপালের রাজত্বের সমাপ্তির কাল অনুমান করা সম্ভব হইল। তৃতীয়তঃ, এই লিপির উপর ভিত্তি করিয়া মদনপাল ও গোবিন্দপালের পারস্পরিক সম্পর্ক নিরূপণের একটি পুত্র পাওয়া গেল। চতুর্থতঃ, ইহার সাহায্যে গোবিন্দপালের রাজত্বকাল সম্পর্কিত প্রচলিত ভ্রান্ত ধারণার অসারতা স্পষ্টরূপে প্রমাণিত হইল।

পালবংশীয় নরপতিগণ বাংলা ও বিহারের অধীশ্বর ছিলেন। কিন্তু দ্বাদশ শতাব্দীতে মদনপাল ও গোবিন্দপালের সময়ে এই বিশাল সাম্রাজ্যের নানা বিচ্ছিন্ন অঞ্চল হইতে পাল অধিকার বিলুপ্ত হইয়াছিল। বাংলাদেশের প্রায় সমুদ্র অংশ এই সময়ে সেনবংশীয় রাজগণের হস্তগত হইয়াছিল। এই বংশের প্রথম স্বাধীন নরপতি বিজয় সেন ১০৯৫ হইতে ১১৫৮ খ্রীষ্টাব্দ কিংবা ১১২৫ হইতে ১১৫৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন। তিনি প্রথম জীবনে পাল সম্রাটগণের অধীন সামন্তমাত্র ছিলেন; কিন্তু জীবনের শেষ দিকে পালবংশীয় নরপতিকে পরাজিত করিয়া তিনি বাংলাদেশে স্বাধীন রাজা প্রতিষ্ঠা করেন। বিজয় সেন কর্তৃক পরাজিত পালনৃপতি মদন পাল হওয়া অসম্ভব

নহে। সেন বংশীয়েরা মূলতঃ দাক্ষিণাত্যের কর্ণাট অঞ্চলের অধিবাসী ছিলেন। একাদশ শতাব্দীর শেষ দিকে তাঁহারা বাংলাদেশে আগমন করেন। এই সময়ে আরও একটি কর্ণাটীয় রাজবংশ পূর্বভারতে বাধীন রাজ্য স্থাপন করিয়াছিল। ১০৯৭ খ্রীষ্টাব্দে নাজুদেব নামক জনৈক কর্ণাটবাসী বীরপুরুষ মিথিলা অর্থাৎ উত্তর বিহারে রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁহার উত্তরাধিকারিগণ দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত বাধীনভাবে উত্তর বিহার শাসন করিয়াছিলেন। হুত্তরাং দেখা যায় যে, ষাটশ শতাব্দীর মধ্যভাগে মদনপাল এবং গোবিন্দপালের সময়ে কেবলমাত্র দক্ষিণ বিহারে পাল বংশীয় রাজগণের অধিকার স্বীকৃত হইত। কিন্তু প্রাচীন পাল সাম্রাজ্যের এই অতি ক্ষুদ্র অংশেও পাল অধিকার অক্ষুণ্ণ ও অব্যাহত ছিল না। মদনপালের সিংহাসন লাভের পূর্বে হইতেই দক্ষিণ বিহারের অধিকার লইয়া পাল এবং উত্তর প্রদেশের গাহড়বালবংশীয় রাজগণের মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হইয়াছিল। গাহড়বালবংশীয় পরাক্রান্ত নরপতি গোবিন্দচন্দ্রের ১১১৪-৫৫ খ্রীষ্টাব্দ মানের তাম্রশাসন হইতে জানা যায় যে, ১১২৪ খ্রীষ্টাব্দে তিনি আধুনিক পাটনা অঞ্চলে ভূমিদান করিয়াছিলেন। আবার ১১৪৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রদত্ত লার তাম্রশাসন হইতে জানা যায় যে, ঐ সময়ে গোবিন্দচন্দ্র স্বয়ং মুণাগিরি অর্থাৎ মুন্সেরে অবস্থান করিতেছিলেন। অবশ্য পালবংশীয় মদনপালের কতিপয় লিপিও দক্ষিণ বিহারে পাওয়া গিয়াছে। উপরে আমরা যে নবাবিকৃত শিলালিপির উল্লেখ করিয়াছি, তদনুসারে ১১৬১-৬২ খ্রীষ্টাব্দে পাটনা ও মুন্সেরের মধ্যবর্তী অঞ্চলে মদনপালের অধিকার স্বীকৃত হইত। ইহা গাহড়বালদিগের সহিত সজর্বে মদনপালের সাক্ষ্য হুতি করে। কিন্তু পরিণামে এই গাহড়বালেরাই যে দক্ষিণ বিহার হইতে পালবংশীয়দিগের শাসন উচ্ছেদ করিয়াছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। কারণ ১১৭৫ খ্রীষ্টাব্দের সীহবর তাম্রশাসন অনুসারে গোবিন্দচন্দ্রের পৌত্র জয়চন্দ্র (১১৭০-৯৩ খ্রীঃ) পাটনা জেলার অন্তর্গত একটি গ্রাম দান করিয়াছিলেন। এই জয়চন্দ্রের একখানি শিলালিপি বোধগম্যতাতে পাওয়া গিয়াছে। ইহার তারিখ ১২৪০ বিক্রমাব্দ (১১৮৩-৮৪ খ্রীঃ) কিংবা উহার কিঞ্চিৎ পরবর্তী। গয়া অঞ্চলে ১১৭৫ খ্রীষ্টাব্দে গোবিন্দপালের বিগতরাজ্যের উল্লেখ এবং উহার মাত্র কয়েকবৎসর পরবর্তী জয়চন্দ্রের এই লিপিখানির আবিষ্কারে মনে হয়, জয়চন্দ্রই গোবিন্দপালকে উচ্ছেদ করিয়াছিলেন। এই ধারণা সত্য হইলে, গোবিন্দপাল অন্ততঃ দশ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন বলিয়া ধরা যাইতে পারে।

গোবিন্দপালের গয়া লিপিতে বিক্রমসংবতের উল্লেখের কারণ এই যে, এই সময়ে ঐ অঞ্চলে গাহড়বাল বংশের অধিকার প্রতিষ্ঠিত

হইয়াছিল এবং এই বংশের রাজগণ রাজকীয় দলিলপত্রে ঐ সংবতের ব্যবহার করিতেন। উত্তরপ্রদেশবাসী বৌদ্ধগণও বিহারের বৌদ্ধ তীর্থগুলিতে বিক্রমসংবতের ব্যবহার প্রচলনের জন্য আংশিকভাবে দায়ী ছিলেন বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। কিন্তু মুন্সের জেলার পশ্চিমাঞ্চলে আবিষ্কৃত মদনপালের পূর্কোন্নিষিত লিপিখানিতে শকাব্দ ব্যবহারের কারণ নির্ধারণ করা সত্যই কঠিন। পূর্বভারতের যে সকল লিপি ও গ্রন্থে শকাব্দের ব্যবহার দেখা যায়, তন্মধ্যে এই নবাবিকৃত লিপিটিই সর্বাপেক্ষা প্রাচীন। খ্রীষ্টীয় দশমশতাব্দীতে গঙ্গ-বংশীয় নরপতিগণ উড়িষ্যাদেশে শকাব্দের ব্যবহার প্রচলিত করেন। ষাটশশতাব্দীর প্রথমভাগে গঙ্গবংশীয় রাজগণের অধিকার উত্তর-পূর্ব দিকে ভাগীরথী নদীর তীরবর্তী প্রদেশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়। এই রূপে বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাংশের সহিত শকাব্দের পরিচয় হইয়াছিল। কিন্তু বাংলাদেশে শকাব্দের ব্যবহার জনপ্রিয় হইবার প্রধান কারণ, ঐ দেশে দাক্ষিণাত্য হইতে আগত সেনবংশের প্রতিষ্ঠা। সেনগণ স্বদেশ কর্ণাট হইতে বাংলাদেশে এই অব্দের ব্যবহার আমদানী করিয়াছিলেন বলিয়া বোধ হয়। সেনবংশীয় নরপতিগণ রাজকীয় দলিলপত্রে পূর্ববর্তী পালরাজগণের স্থায় রাজ্যব্যবহার করিতেন; কিন্তু সেন আমলেই শকাব্দের ব্যবহার বাংলাদেশে হুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। বল্লালসেনের অতুতসাগর ও দানসাগর গ্রন্থে শকাব্দের ব্যবহার দেখা যায়। শ্রীধরদাসকৃত সহস্রিকর্ণামৃত গ্রন্থেও শকাব্দের তারিখ রহিয়াছে। আবার ডোমরাপালের স্তম্ভরবন তাম্রশাসন (১১১৮ শকাব্দ), হরিকালদেব রণবন্ধমন্ডের ত্রিপুরা তাম্রশাসন (১১৪১ শকাব্দ), দানোদয়ের চটগ্রাম তাম্রশাসন (১১৬৫ শকাব্দ) প্রভৃতি লিপিও এই প্রসঙ্গে উল্লেখনীয়। এই যুগে বাংলাদেশ হইতে আসামে শকাব্দের ব্যবহার প্রচলিত হয়। ১১০৭ শকাব্দে প্রদত্ত বলভদ্রদেবের তাম্রশাসন এবং ১১২৭ শকাব্দের কানাই বড়শী শিলালিপি এই সম্পর্কে প্রমাণবরণ উপস্থিত করা যাইতে পারে। মিথিলার কর্ণাটবংশের প্রতিষ্ঠা সম্ভবতঃ উত্তর-বিহারে আংশিকভাবে শকাব্দ প্রচলিত হইবার প্রধান কারণ। কিন্তু বাংলা, আসাম ও উত্তরবিহারে শকাব্দের প্রচলন যে-যে কারণেই ঘটয়া থাকুন, মুন্সের জেলার আবিষ্কৃত মদনপালের লিপিটিতে উহার ব্যবহার সত্যই কিছু অস্বাভাবিক। এই লিপির বিবরণে দুইজন পরম বৈষ্ণব ব্রাহ্মণ-কর্তৃক একটি নারায়ণ মূর্তি প্রতিষ্ঠা; ইহা মদনপালের কোন রাজকীয় দলিল নহে। সম্ভবতঃ ঐ দুইজন ব্রাহ্মণ মূলতঃ ভিন্ন কোন দেশের অধিবাসী ছিলেন এবং তাঁহাদের স্বদেশে শকাব্দের ব্যবহার জনপ্রিয় ছিল।

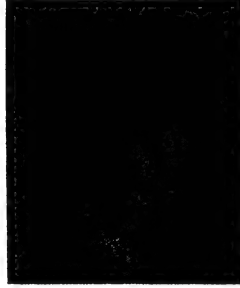


## রুসো

### শ্রীতারকচন্দ্র রায়

অষ্টাদশ শতাব্দীতে যে সকল মনীষী ফরাসীদেশে নূতন ভাবের প্রচার করিয়া ফরাসী বিপ্লবের ক্ষেত্র প্রশস্ত করিয়াছিলেন, রুসো তাঁহাদের অঙ্গতম। বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের বহুল প্রচারের উদ্দেশ্যে ডিডেরো ও ড্যালেমবার্ট (Diderot and D'Alembert) যে বিশ্বকোষ (Encyclopedia) প্রকাশ করিতে আরম্ভ করেন, রুসো প্রথমে তাহার সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন। Diderot ও Voltaire তাঁহার বন্ধু ছিলেন, পরে মতভেদের ফলে বন্ধুত্ব-বন্ধন ছিন্ন হইয়া যায়। Encyclopedistগণ—প্রজ্ঞাবাদী (Rationalist) ছিলেন, যুক্তিকেই তাঁহার সর্ববিষয়ে বিচারের মানদণ্ড বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু রুসো যুক্তি অপেক্ষা হৃদয়বৃত্তিকে (feeling) প্রাধান্য দিতেন। রুসো একতপক্ষে দার্শনিক ছিলেন না; কিন্তু সাহিত্য, রাজনীতি ও প্রচলিত রচিও আচার ব্যবহারের সহিত দর্শনের উপরও যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন।

১৭১২ খৃষ্টাব্দে সুইজারল্যান্ডে জেনিভা নগরে রুসো জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতামাতা ফরাসী বংশীয় এবং ক্যালভিন (Calvinist) সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন। বাল্যকালে রুসো নিষ্ঠাবান ক্যালভিনীয়ের উপযোগী শিক্ষাই গ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার পিতার অবস্থা ভাল ছিল না। খড়ী নির্মাণ



রুসো

করিয়া ও নৃত্যশিক্ষা দিয়া তিনি জীবিকা অর্জন করিতেন। পৈশবেই রুসোর মাতার মৃত্যু হওয়ার এক আত্মীয় তাঁহার লালন-পালনের ভার গ্রহণ করেন। দ্বাদশ বৎসর বয়সে বিভ্রান্ত ত্যাগ করিয়া তিনি একটর পরে একট করিয়া নানা ব্যবসারে শিক্ষানবিসী করেন, কিন্তু কোন ব্যবসারই তাঁহার মনঃপূত না হওয়ার, বোড়শ বৎসর বয়সে গৃহ হইতে পলায়ন করিয়া কপর্দকহীন অবস্থায় ইটালী দেশের স্ত্রান্তর এদেশে উপস্থিত হন। তথায় জীবিকা উপার্জনের কোনও উপায় দেখিতে না পাইয়া, তিনি এক Catholic পাদ্রীর নিকট গিয়া Catholic ধর্মে দীক্ষা-গ্রহণের ইচ্ছা ব্যক্ত করেন, এবং Turin নগরে ক্যাথলিক-ধর্মগ্রহণেচ্ছুকিণের শিক্ষাজন্মে প্রেরিত হন। সেই আশ্রমে বাসকালে আশ্রমবাসী এক পাণ্ডা কতৃক তাঁহার উপর পাশবিক বলপ্রয়োগের এক কাহিনী রুসো তাঁহার জীবন-চরিতে বর্ণনা করিয়াছেন। আশ্রমের কতৃপক্ষের নিকট অভিযোগ করিলে, তাহার ছদ্মবেশে শাস্তিবিধান তো করিলেনই না, পরন্তু

যটনাটি প্রকাশ না করিতে তাঁহাকে উপদেশ দিলেন। শিক্ষা-পেয়ে রুসো Catholic ধর্মে দীক্ষিত হইলেন। কিন্তু যে আশ্রয় পৈতৃক ধর্মত্যাগ, তাহা পূর্ণ হইল না। প্রভূত উপদেশও সামান্য অর্থ (২০ ফ্রাঙ্কের কিছু বেশী) দিয়া আশ্রমের অধ্যক্ষ তাঁহাকে বিদায় দিলেন।

কয়েক দিন ঘোরাঘুরির পরে এক পোষাকের দোকানে রুসো সহকারীর পদে নিযুক্ত হইলেন। দোকানের মালিক বিদেশে ছিলেন। তাঁহার যুবতী স্ত্রী—Madame Basle—রুসোর প্রতি যথেষ্ট সদয় ব্যবহার করিতে লাগিলেন। উভয়ের মধ্যে ভালবাসার সন্ধারও হইয়াছিল। কিন্তু ব্যাপার অধিক দূর অগ্রসর হইবার পূর্বেই দোকানের মালিক দেশে ফিরিয়া আসিলেন। রুসো কর্তৃচ্যুত হইলেন।

ইহার পরে Madame de Verceze নামে এক মহিলা রুসোকে ভূত্যের কাজে নিযুক্ত করেন। তিন মাস পরে মহিলার মৃত্যু হয়। তখন তাঁহার একগাছি ফিতা রুসোর নিকট পাওয়া যায়। রুসো ফিতা চুরী করিয়াছিলেন, কিন্তু ধরা পড়িয়া Marion নামী এক যুবতী পরিচারিকার নিকট উহা পাইয়াছেন, বলিলেন। ফলে যুবতী কর্তৃচ্যুত হইল। এই মিথ্যা অভিযোগের কারণ বর্ণনা করিতে গিয়া রুসো লিখিয়াছেন, যুবতীকে তিনি ভালবাসিতেন এবং তাহার কথা সর্বদাই তাঁহার মনে হইত। আপনার দোষক্ষালনের উপায় যখন চিন্তা করিতেছিলেন, তখন যুবতীর কথা মনে হইল, এবং বিবেচনা না করিয়াই তিনি তাহার নাম করিলেন। অদ্ভুত ব্যাখ্যা !! অভিযোগ শুনিয়া যুবতী কাতর দৃষ্টিতে রুসোর দিকে চাহিয়াছিল, একটী নির্দোষ বালিকার সর্বনাশ না করিতে তাহাকে অনুন্নয় করিয়া বলিয়াছিল; কিন্তু রুসোর ভালবাসা তাহাতে কর্পপাত করে নাই। এই হীন কার্যের জন্য রুসো চিরকাল অন্ততপ্ত ছিলেন।

ইহার পরে Turin ত্যাগ করিয়া রুসো Annecy নগরে গমন করিলেন। সেখানে madame de Warrens তাহাকে আশ্রয় দান করেন। সম্ভ্রান্ত-বংশোদ্ভবা এই মহিলা স্বামীর আশ্রয় ত্যাগ করিয়া Annecy নগরে বাস করিতেছিলেন, পৈতৃক ধর্ম ত্যাগ করিয়া Catholic ধর্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং Savoyএর রাজার নিকট হইতে বাৎসরিক ১৫০০ লিভার বৃত্তি পাইতেছিলেন। নয় বৎসর রুসো এই মহিলার সহিত বাস করিয়াছিলেন। তাঁহাকে তিনি “মা” বলিয়া ডাকিতেন, কিন্তু তাহার সহিত তাহার যে অবৈধ সংসর্গ ছিল, তাহা তিনি লিখিয়াছেন। Grossi নামে মহিলার এক কর্তৃচাচী ছিলেন। মহিলা Grossi ও রুসো উভয়েরই শয্যাসঙ্গিনী ছিলেন। Grossiর মৃত্যু হইলে তিনি আর একজনকে তাহার স্থলাভিষিক্ত করেন। মর্দাহত হইয়া রুসো তখন অন্তত চলিয়া যান। (১৭৪১)

রুসোকে জীবনে হুঁতুটিত করিবার জন্ত, তিনি বাহাতে বাধীন-ভাবে জীবনযাপন করিতে পারেন তাহার জন্ত, Madame de Warrens অনেক চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু রুসোর ইচ্ছাশক্তির দুর্বলতার জন্ত কোনও চেষ্টাই ফলশ্রুত হয় নাই। কেহই তাকে কোনও কর্ণের উপযুক্ত মনে করে নাই। অস্থিরচিত্ত, অলস ও বদভাবের প্রকৃতির জন্ত কোন কার্যেই রুসো সফলতা লাভে সমর্থ হন নাই। ভবিষ্যতের জন্ত তাহার কোনও চিন্তাই ছিল না; উচ্চাকাঙ্ক্ষার প্রেরণা তিনি কখনও অনুভব করিতেন না; বেশী কিছু তিনি চাহিতেন না, কোনও প্রকারে শান্তিতে থাকিতে পারিলেই সন্তুষ্ট হইতেন। অভাবের তাড়না না থাকিলেও যৌন-লিপ্সা প্রবল ছিল এবং জীবনে একাধিক স্ত্রীলোকের সহিত অবৈধ সংসর্গ তাহার সংঘটিত হইয়াছিল।

Madame de Warrens-এর আশ্রয় ত্যাগ করিয়া যাইবার পূর্বে তিন বৎসর রুসো তাঁহার সহিত চারমের (Charmettes) নামক পল্লীগ্রামে এক মনোরম গৃহে বাস করিয়াছিলেন। এই তিন বৎসর তাহার নিরন্তরিত্র স্ত্রীতে অতিবাহিত হইয়াছিল। এই সময়ে নানা বিষয়ে গ্রন্থপাঠ করিয়া তিনি জ্ঞানার্জনের চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু অধ্যয়নের কোনও হুঁতুটিত প্রণালী না থাকায় ইচ্ছানুরূপ সফলতা লাভ করিতে পারেন নাই। Voltaire-এর Letters Philosophique তিনি আগ্রহের সহিত পাঠ করিয়াছিলেন। Montaigne, La Bruyere, Boyle, Bossuet-এর গ্রন্থও যত্নের সহিত পড়িয়াছিলেন। দর্শনশাস্ত্রে Locke's Essay, Malebranche, Leibnitz, Descartes, Logic of Port Royal প্রভৃতি পড়িয়াছিলেন। দর্শনের পরে শারীর বিজ্ঞা (anatomy), জ্যামিতি, বীজগণিত, জ্যোতিষ ও লাতিন ভাষার চর্চাও করিয়াছিলেন। অধ্যয়ন প্রণালী স্বল্পে তিনি তাহার জীবনচরিতে লিখিয়াছেন : “এই সময়ে আমার ক্রান্ত ধারণা ছিল, যে কোনও গ্রন্থ পড়িয়া লাভবান হইতে হইলে, তাহা বুঝিবার জন্ত যে যে বিষয়ের জ্ঞান আবশ্যক, সেই সেই বিষয়ের সম্পূর্ণ জ্ঞান থাকার প্রয়োজন। তখন জানিতাম না, যে এই প্রকার জ্ঞান অনেক সময় গ্রন্থকারদিগেরও থাকে না। তাহার প্রয়োজনমত অল্প গ্রন্থকারের গ্রন্থের সাহায্য গ্রহণ করেন। আমার ক্রান্ত ধারণার ফলে পাঠে অগ্রগতি বিলম্বিত হইত। প্রত্যেক গ্রন্থেই পদে পদে পাঠ স্থগিত করিয়া গ্রন্থান্তর হইতে প্রয়োজনীয় জ্ঞান সংগ্রহ করিয়া স্থগিত পাঠ আরম্ভ করিতে হইত। এমনও ঘটনাছে, যে আরম্ভ গ্রন্থের দশ পৃষ্ঠা মাত্র শেষ করিবার পূর্বেই গ্রন্থ বন্ধ করিয়া অন্য বহু গ্রন্থ পড়িয়া লইতে হইয়াছে।” ভুল বুঝিতে পারিয়া রুসো পঠনপ্রণালীর পরিবর্তন করেন। Encyclopede-এর বিভিন্ন বিষয়ের প্রত্যেক পাঠ করিয়া তিনি নানা বিষয়ে জ্ঞানলাভ করিয়াছিলেন। তিনি লিখিয়াছেন—“২৫ বৎসর বয়সে যে বুঝ কিছুই জানিত না, অথচ বাস্তবিক বিষয়ে জ্ঞানলাভে ইচ্ছুক হইয়াছিল, সময়ের যথাযথ ব্যবহার করা তাহার পক্ষে অপরিহার্য হইয়াছিল। বহু অথবা দুরদৃষ্ট বশতঃ যে কোনও সময়ে আমার চেষ্টা ব্যাহত হইতে

পারে জানিয়া, আমার ক্ষমতার বাস্তবিক প্রবণতা কোন্ দিকে, এবং কোন্ কোন্ বিজ্ঞা চর্চা করিবার আমি উপযুক্ত, তাহা জানিবার জন্ত সকল বিষয়েই কিছু কিছু জ্ঞান সঞ্চয়ের জন্ত আমি চেষ্টা করিতে লাগিলাম।\*\*\* অধ্যয়নের জন্ত নিশ্চয়ই আমি জয়গ্রহণ করি নাই। কোনও বিষয়েই আমি অর্ধ ঘণ্টার অধিককাল মনঃসংযোগ করিতে পারিতাম না। অন্তের চিন্তা অনুসরণ করিতে চেষ্টা করিয়া অল্পেই ক্রান্ত হইয়া পড়িতাম। কিন্তু নিজের চিন্তার অনেক সময় অধিকক্ষণ কাটাইতে সক্ষম হইতাম।\*\*\* এমনো হইয়াছে যে কোনও গ্রন্থের কয়েক পৃষ্ঠা পড়িবার পরেই আমার মন অন্যত্র চলিয়া গিয়াছে। তখন মনঃসংযোগের চেষ্টা করিয়া দেখিয়াছি, মন তত্ত্বিত হইয়া পড়িয়াছে, কিছুই ধারণা করিতে পারে না। কিন্তু বিভিন্ন বিষয়ের গ্রন্থ একটির পর একটি অবিরুদ্ধে পড়িতে গিয়া দেখিয়াছি, মনোযোগ অনুন্নত থাকে। এক বিষয়ে অধ্যয়নের ক্রান্তি বিষয়ান্তরে মনোনিয়োগের ফলে বিঘ্নিত হয়।\*\*\* এই ভাবে পাঠপদ্ধতির পরিবর্তন করিয়া সমস্ত দিনই বিনা ক্রান্তিতে পড়িতে পারিয়াছি।”

দর্শনশাস্ত্র পাঠকালে রুসো বিভিন্ন দার্শনিকদিগের পরস্পর বিরোধী মতের সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করিয়া বিফলপ্রবৃত্ত হন। অবশেষে সমন্বয়ের চেষ্টা ত্যাগ করিয়া তিনি প্রত্যেক দার্শনিকের মত বিলা প্রতিবাদে গ্রহণ করিয়া, তাহার বিকাশ ও পরিণতি বুঝিবার চেষ্টা করেন। সেই মতের বিরুদ্ধ কোনও বুদ্ধি মনে উঠিলেও তাহা গ্রাহ্য করিতেন না। এই প্রসঙ্গে তিনি লিখিয়াছেন “আমি জাবিলাম, প্রথমে আমার মনের ভাঙারে কতকগুলি ভাব (idea) সঞ্চয় করিয়া লইব। সে সকল ভাব যদি বিশদ হয়, তাহা হইলে তাহার সত্য কি মিথ্যা, তাহা সঞ্চয়কালে দেখিব না; পরে যখন যথেষ্ট পরিমাণে ভাব সঞ্চিত হইবে, তখন তুলনা করিয়া কোনটি গ্রহণ করিব, কোনটি বর্জন করিব, তাহা ভাবা যাইবে। কয়েক বৎসর অন্তের চিন্তার দ্বারা চালিত হইয়া দেখিতে পাইলাম, যথেষ্ট বিজ্ঞা অর্জন করিতে সক্ষম হইয়াছি। তখন অপরের চিন্তার সাহায্য বর্জন করিয়াও চিন্তা করিবার শক্তি অর্জন করিয়াছি, এবং স্বকীয় বুদ্ধি দ্বারা অধীত বিষয়ের বিচার করিবার সামর্থ্যও লাভ করিয়াছি।” যথেষ্ট চেষ্টা সত্ত্বেও রুসোর শিক্ষা কখনও পূর্ণতা লাভ করিতে পারে নাই। Encyclopedist-দিগের সর্বতোমুখী বিজ্ঞার সহিত তাহার অজ্ঞিত বিজ্ঞার তুলনা হইত না। Plutarch, Tacitus, Seneca, এবং Plato ও Virgil তিনি অধ্যয়ন করিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু গ্রীক ও লাতিন ভাষার অজ্ঞাত লেখকদিগের সহিত তাহার পরিচয় ছিল না।

চারমেরে বাস করিবার সময় রুসো প্রতিদিন হুঁতুটিতের পূর্বেই শব্দাত্যাগ করিয়া ভ্রমণে বহির্গত হইতেন এবং ভ্রমণের সময় প্রকৃতির হস্তিকর্তার উপাসনা করিতেন। তিনি লিখিয়াছেন “আমার উপাসনা কেবল কতকগুলি শব্দের উচ্চারণেই শেষ হইত না। আনন্দ-নারিনী প্রকৃতির স্রষ্টার নিকট আমার ক্ষমত তুলিয়া ধরিয়া রাখিতাম। যত্নের মধ্যে উপাসনা করিতে আমার ভাল লাগিত না, যত্নের বেগমাত্র ও



বরের মধ্যের ব্যবতীয় প্রবৃত্তি ভগবান ও আমার মধ্যে ব্যবধান সৃষ্টি করিত। ভগবানের সৃষ্টির মধ্যে তাঁহার ধ্যান করিতে আসার ভাল লাগে। \*\*\* বাঁহার জীবন আমার জীবনের সহিত অচ্ছেদ্য বন্ধনে বাঁধা ছিল, তাঁহার ও আমার নিজের অল্প পাপ-বল্লী-ও-অভাবমুক্ত নির্দোষ শান্তিপূর্ণ জীবন, ধার্মিকোচিত মুক্তা এবং পরলোকে ধার্মিকোচিত গতি ভিন্ন অল্প কিছুই আমার প্রার্থনীয় ছিল না। প্রার্থনার সঙ্গে ভগবানের ধ্যান করিতাম। আমি জানিতাম সর্বমঙ্গল-দাতা ভগবানের অনুগ্রহের উপরিত্ব হওয়ারই তাঁহার অনুগ্রহ পাইবার স্রেষ্ঠ উপায়—প্রার্থনা নয়।”

১৭৪১ সালে Madame de Warrens-এর আশ্রয় ত্যাগ করিয়া রুসো প্যারিস নগরে গমন করিলেন। তখন তাঁহার সম্বল ছিল ১৫ লুই (রৌপ্য), একখানা নাটকের হস্তলিপি, এবং সঙ্গীতের স্বরলিপি। এক নূতন পদ্ধতি, বাহা হইতে তিনি অর্থ ও যশঃ, উভয়ই আশা করিয়াছিলেন। প্যারিসে কিছুদিন ইতস্ততঃ গমনাগমনে অতিবাহিত হইল। Fontenelle, Marivaux, Condillac ও Diderot ও কয়েকজন সম্ভ্রান্ত মহিলার সহিত এই সময় পরিচয় হইয়াছিল। Diderot-এর সহিত পরিচয় বন্ধুত্বে পরিণত হইয়াছিল। একজন মহিলার অনুরোধে রুসো ভিনিসহ করাসী রাষ্ট্রদূতের সেক্রেটারী নিযুক্ত হইলেন। (১৭৪৩) কিন্তু রাষ্ট্রদূতের সহিত কলহ করিয়া সে পদ ত্যাগ করিলেন। এই কলহে রুসোর ঘোষ ছিল না। রাষ্ট্রদূত তাঁহার বেতন না দেওয়ার তিন প্যারিসে আসিয়া গবর্নমেন্টের নিকট বিচার-প্রার্থী হন। বহুদিন পরে তিনি প্রাপ্য বেতন পাইয়াছিলেন। প্যারিসে কিরিয়া আসিবার পরে রুসোর কয়েকখানা নাটক রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হয়, কিন্তু তাহা হইতে অর্থাগম হয় নাই। ১৭৪৪ সালে তিনি Therese le Vasseur নামী এক হোটেল পরিচালিকার প্রণয়ে আবদ্ধ হন এবং তাঁহার সহিত খামী খ্রীর মত বাস করিতে থাকেন। Therese অশিক্ষিতা ও দেখিতে কুৎসিত ছিলেন। লিখিতে অথবা পড়িতে জানিতেন না, বৎসরের হাসগুলির নাম কখনও একাদিক্রমে বলিতে পারিতেন না, সংখ্যা গণনা করিতেও শেখেন নাই। Therese মাতা তাঁহার সহিত বাস করিত এবং মাতা ও কন্যা উভয়েই রুসো এবং তাঁহার বন্ধুদিগকে আর্থোপার্জনের উপায়স্বরূপ ব্যবহার করিত। Therese-এর প্রতি রুসোর যে বিন্দুমাত্রও ভালবাসা ছিল না, তাহা তিনিই লিখিয়াছেন। তবুও ২৫-বৎসর তাঁহার সহিত বাস করিয়া অবশেষে তাহাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। Therese-এর গর্ভে রুসোর পাঁচটি সন্তান হইয়াছিল। সকলগুলিকেই তিনি মাতৃহীন শিশুদিগের হাসপাতালে দান করেন। (Foundling Hospital) এই জঘন্য কাজের জন্য রুসো তাঁহার “Confessions” গ্রন্থে অনুতাপ প্রকাশ করিয়াছেন। খীর সন্তানের প্রতিপালনের দায়িত্ব নিজে গ্রহণ না করিয়া রাষ্ট্রের উপর অর্পণ করিয়া তিনি যে ভুলভর অজ্ঞান করিয়াছিলেন, তাহা তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন। অনুতাপ ধর্মবুদ্ধিকে সাধনা দিবার জন্য তিনি লিখিয়াছেন “খীর

সন্তানদিগকে উপযুক্তভাবে লালনপালন করিবার আর্থিক সামর্থ্য আমার ছিল না। তাহাদিগকে হুশিক্ষিত করিয়া তোলা আমার সাধ্যাতীত ছিল। ভবিষ্যৎকালের উপযুক্ত শিক্ষার অভাবে আমার সন্তানেরা সাধু উপায়ে ভ্রষ্টজীবনযাপন করিতে পারিবে না। Therese-এর মাতা ও তাঁহার ভ্রাতা ভগিনীদিগের সংসর্গও কাহারও পক্ষে মঙ্গলকর হইতে পারে না। অথচ আমার সন্তানগণ গৃহে প্রতিপালিত হইলে, তাহাদের সংসর্গ অপরিহার্য হইবে। এরূপ অবস্থায় সরকারী শিশু-আশ্রমে প্রতিপালিত হইয়া তাহারা যদি ক্রমক্রমে অথবা শিল্পীর ব্যবসায় সাধুভাবে জীবিকা উপার্জনে সক্ষম হয়, তাহাই প্রিয়ঃ বলিয়া মনে করিয়াছিলাম। Plato-র কল্পিত Republic-এ জন্মের পরেই শিশুদিগকে পিতামাতার নিকট হইতে হানাত্বরিত করিয়া রাষ্ট্রের তত্ত্বাবধানে তাহাদের শিক্ষার ব্যবস্থা আছে। কোনও শিশুরই সেখানে খীর পিতামাতার গৃহান পাইবার সম্ভাবনা নাই। মেটোর আদর্শে রাষ্ট্রের নাগরিকের কর্তব্য আমি পালন করিয়াছি।” তাঁহার বন্ধুবান্ধবদিগের মধ্যে কেহ কেহ তাঁহার সন্তানদিগের প্রতিপালনের ভার গ্রহণ করিতে সম্মত ছিলেন, কিন্তু তাহাদের প্রস্তাব রুসো স্বীকার করিলে, তাঁহার সন্তানদিগের জীবন অধিকতর সুখী হইত বলিয়া তিনি বিশ্বাস করিতে পারেন নাই। অল্প কতক প্রতিপালিত হইয়া তাহারা আপনাদের পিতামাতাকে ঘৃণা করিতে শিখিত, তাহাতে সন্দেহ নাই।

৩৭ বৎসর বয়সেও রুসোর জীবনে তাঁহার উজ্জ্বল ভবিষ্যতের কোনও চিহ্নই লক্ষিত হয় নাই। তখনও তিনি তাঁহার জীবনের লক্ষ্যের সম্ভান পান নাই। উদ্বেগহীন ভাবে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলেন। তার পরে হঠাৎ একদিন অচিন্তিত ভাবে তাঁহার জীবনের গতি কিরিয়া গেল, তিনি তাঁহার অন্তর্নিহিত শক্তির সম্ভান পাইলেন। ১৭৪৯ সালে একদিন রুসো তাঁহার বন্ধু Diderot-এর সঙ্গে দেখা করিতে বাইতেছিলেন। Diderot তখন প্যারিস হইতে ছয় মাইল দূরে এক কারাগারে আবদ্ধ ছিলেন। পদব্রজে পথ চলিবার স্বয়ং রুসো একখানা সাহিত্যিক পত্রিকার পাতা উন্টাইতেছিলেন। হঠাৎ তাঁহার দৃষ্টি পড়িল সেই পত্রিকার মুদ্রিত একটি বিজ্ঞাপনের উপর। Academy of Dijon “বিজ্ঞান ও কলার উন্নতি দ্বারা মানুষের নৈতিক উন্নতি অথবা অবনতি হইয়াছে” এই সম্বন্ধে প্রবন্ধের জন্য একটা পুরস্কার ঘোষণা করিয়াছিলেন। এই ঘোষণা পাঠ্যমাত্র রুসোর মনে প্রবল আন্দোলন আরম্ভ হইল। শত শত ভাব তাঁহার মনের মধ্যে কলরব করিয়া উঠিল। ভাবের উদ্বেগজন্য তাঁহার ঘাসরোধের উপক্রম হইল। এক বৃক্ষতলে উপবেশন করিয়া তিনি অর্ধবৃত্তা প্রণাট চিন্তায় অতিবাহিত করিলেন। মনে হইল তিনি অল্প জগতের অধিবাসী, অল্প মানুষ হইয়া গিয়াছেন। Academy-এর উত্তরই যে কেবল তাঁহার মনে উদ্ভিত হইয়াছিল, তাহা নহে। অল্প বহু সত্যও তাঁহার মনে প্রকাশিত হইয়াছিল। সেই মুহূর্তে রুসো আপনাব্যবসায়ের পরিচয় প্রাপ্ত হইলেন। তখন যে সত্যের



এই তিনি পাইয়াছিলেন, তাঁহার ভবিষ্যতের সমস্ত রচনা তাহার লোকে উদ্ভাসিত হইয়াছিল।

করাগী সমাজে তখন অশান্তির অগ্নি অগ্নে অগ্নে ধূমায়িত হইতেছিল। অসংযত রাজশক্তির অধীনে নৈতিক শিথিলতা ক্রমশঃ বিস্তার লাভ করিতেছিল। মানব-জীবনের মধ্যে সন্দেহ সর্বশ্রেণীর মধ্যে প্রসারিত হইতেছিল। সাইন্স বৎসর বাবত রুসো ভাব্যুরের জীবন যাপন করিয়াছিলেন। সমাজের বিধি ও নিষেধ গ্রাহ্য করেন নাই। রাজশক্তির বধেচ্ছাচার ও সামাজিক দুর্নীতি দেখিয়া তাঁহার মন মাঝে মাঝে বিচলিত হইত, বিরক্তি দমন করিয়া রাখিতেন। কিন্তু দমিত বিরক্তি ও বিরোধী ভাব মনে সঞ্চিত হইতেছিল। আশি তাহা বিস্মৃতি হইয়া পড়িল। সমাজের ক্রমবর্ধমান দুর্নীতি ও অন্যায় তাঁহার লেখনী-মুখে লোহিত বর্ণে রঞ্জিত হইয়া উদ্ঘাটিত হইল।

রুসো Academy of Dijon-এর প্রস্তাবিত বিষয়ে প্রবন্ধ লিখিয়া পাঠাইলেন। তাঁহার এই প্রথম রচনা পুরস্কারের যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবে, ইহা তিনি আশা করেন নাই। কিন্তু যাহা অপ্রত্যাশিত ছিল, তাহাই সংঘটিত হইল। তাঁহার প্রবন্ধই পরীক্ষকগণকর্তৃক পুরস্কারের জন্য নির্বাচিত হইল। হঠাৎ তাঁহার ঘণঃ বিতীর্ণ হইয়া পড়িল। বিপ্লবস্থির কোনও উদ্দেশ্য তাঁহার না থাকিলেও, পাঠকেরা তাঁহার প্রবন্ধের মধ্যে বিপ্লবের ইঙ্গিত দেখিতে পাইল। প্রবন্ধে তিনি প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, যে সাহিত্য কলা ও বিজ্ঞান হুঁতুরি প্রদান শত্রু। অন্যায়ের প্রবোধের অভাব-বোধের সৃষ্টি করিয়া তাহার মানবের স্বাধীনতা অপহরণ করে এবং তাহাকে দাসে পরিণত করে। সত্যতা হইতে পরিচ্ছদের প্রয়োজন অনুভূত হইয়াছে; আমেরিকায় অসত্যদিগের মত বাহ্যার উলঙ্গ থাকে, তাহারিগকে দাসত্বশৃঙ্খলে আবদ্ধ করা সম্ভবপর হয় না। বিজ্ঞান ও হুঁতুরি পরস্পর-বিরোধী। নীচ ও ধূণিত মূল হইতে বাবতীর বিজ্ঞান উদ্ভূত হইয়াছে। কুসংস্কার-প্রসূত কলিত জ্যোতিষ হইতে জ্যোতিষশাস্ত্রের (astronomy) জন্ম; অর্থলোভ হইতে জ্যামিতির উৎপত্তি; বুধা কৌতুহল প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের জনক; মানুষের অভিমান হইতে চরিত্র-নীতির উদ্ভব; উচ্চাকাঙ্ক্ষা বাগ্মিতার ব্রহ্মি। শিক্ষা ও মৃত্যুব্রজ দ্বারা মানুষের কোনও উপকারই হয় নাই। অসত্য মানুষ হইতে সত্য মানুষের ব্যবস্তুক সমস্ত গুণ ও আচারই বনজলের আকর। শৈশবে পঠিত Plutarch's Lives রুসোর উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। এথেন্স অপেক্ষা স্পার্টার জীবনযাপন প্রাণী তাঁহার অধিকতর মনোমত ছিল। Lycurgus তাঁহার বিশেষ প্রভাব পাত্র ছিলেন। যুদ্ধে জয়লাভ রুসো পৌরবের বর্ষ বলিয়া মনে করিতেন। কিন্তু ইয়োনিয়ানদিগের সহিত যুদ্ধে পরাজিত অসত্যদিগের প্রতি তাঁহার প্রভাব অভাব ছিল না। মানবের স্ব-ও-গতিবিধানে সত্যতার কোনও কৃতিত্বই তিনি দেখিতে পান নাই। সত্যতার উন্নতিতে তিনি মানবজাতির অবনতিই দেখিতে পাইয়াছিলেন, এবং তাহার সর্বজনীন সম্পন্ন হইতে যদিও তাঁহার জন্মভূমি জেনিভা ও

আপনাকে রক্ষা করিতে চাহিয়াছিলেন, তথাপি তাঁহার প্রবন্ধ হইতে কোনও স্বকলের প্রত্যাশা তিনি করেন নাই।

হস্তে লেখনী ধারণ করিয়া রুসো ধামিতে পারিলেন না। প্রথম প্রবন্ধের সফলতার তাঁহার চিন্তার স্রোত প্রবলতর বেগে প্রবাহিত হইতে লাগিল এবং যে সমস্ত চিন্তা মনে উদ্ভিত হইতে লাগিল, বিস্তারিত করিয়া তাহা বর্ণনা করিবার জন্য তিনি ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন। এই সময়ে তাঁহার মৃত্যুর পীড়া প্রবল হইয়া উঠিল। চিকিৎসকেরা বলিলেন, ছয় মাসের অধিক তাঁহার বাঁচিবার সম্ভাবনা নাই। এই জন্মই বাহা বলিবার আঁড়ে, তাহা বলিয়া শেষ করিবার জন্য তিনি চঞ্চল হইয়া উঠিলেন। যে সমস্ত দার্শনিকের মত তিনি প্রচার সহিত পাঠ করিয়াছিলেন, তাহারিগের শিক্ষণ লাভ ও নির্মূল্যতা ভিন্ন আর কিছুই এখন দেখিতে পাইলেন না। সমাজের সর্বপ্রাণে বর্তমান অত্যাচার ও দুর্গতি তাঁহাকে পীড়া দিতে লাগিল। তাঁহার মনে হইল নিজের বিশ্বাসের সহিত যদি তাঁহার জীবনের সামঞ্জস্য না থাকে, তাহা হইলে কেহই তাঁহার কথাই কর্ণপাত করিবে না। এই বিশ্বাসে তিনি স্বকীয় জীবনযাপন-প্রণালী পরিবর্তিত করিয়া ফেলিলেন। সাদা শোভা ও স্নান বস্ত্র বর্জন করিলেন, ঘড়ি বিক্রয় করিলেন, মোটা কাপড়ের সাধারণ স্ট্রট ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিলেন। ইহার পূর্বে তিনি এক আকিসে ধনরক্ষকের পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। সে কাজ ছাড়িয়া দিয়া বরলিপি নকল করিয়া জীবিকা উপার্জন করিতে আরম্ভ করিলেন। তাহার অন্তরে যে বিপ্লব সংঘটিত হইয়াছিল, এ সকল তাহার বাহ্যিক প্রকাশ। শতবর্ষ পরে তাঁহারই শিক্ষা ও দৃষ্টান্তে অনুপ্রাণিত হইয়া কাউন্ট টলষ্টয় সর্ববিধ বিলাস বর্জন করিয়াছিলেন। রুসোর স্বভাবেও সম্পূর্ণ পরিবর্তন লক্ষিত হইল। ভয় ও লজ্জার সঙ্কোচ তিরোহিত হইয়া গেল। প্রচলিত আচার ও সংস্কারের বশীভূত লোকের স্নেহ ও বাস্তব অবজ্ঞায় অগ্রাহ্য করিয়া তিনি অসম সাহসে সমাজের দুর্নীতি ও কুসংস্কারের প্রতি কশাঘাত করিতে উদ্ভূত হইলেন। দুই বৎসর পূর্বে ও দশ বৎসর পরেও যিনি মনের ভাবপ্রকাশের উপযুক্ত ভাষা খুঁজিয়া পাইতেন না, তাঁহার প্রবোধিত সমগ্র পারিসের মুখে মুখে প্রবাহিত হইতে লাগিল। কলে অনেকের মনে তাঁহার প্রতি দারুণ বিদ্বেষের সৃষ্টি হইল।

১৭৫৩ সালে রুসোর "Discourse on the origin of Inequality" প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থে তিনি পূর্বগ্রন্থে প্রকাশিত মত বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন এবং "ব্যক্তিগত সম্পত্তি" (Property) কে সামাজিক বৈষম্যের কারণ বলিয়া নির্দেশ করিয়া, রাষ্ট্রকর্তৃক এই অসাম্য—নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজনীয়তা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। ধনী সম্প্রদায় কর্তৃক রাষ্ট্র-ক্ষমতা অস্তায়পূর্বক অধিকৃত হইলে যে রাষ্ট্রের অবনতি হয় ও প্রজাসাধারণ দাসে পরিণত হয়, তিনি তাহাও প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। অষ্টাদশ শতকের অনেক পূর্বে এই দার্শনিক মত প্রকাশ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহাদের কেহই স্বকীয় মতকে সাধারণ-বুদ্ধিগ্রাহ্য রূপ দান করিয়া রুসোর মত দৃঢ়ভাবে ব্যক্ত করেন নাই। এই সময়ে কোনো কাণ্ডাই রুসো অর্জসমাপ্ত করিয়া ফেলিয়া রাখেন

না। চিন্তা তাঁহার নিকট ক্রীড়া অথবা বিলাসের উপকরণ মাত্র ছিল না। যাহা ভাল বলিয়া বুঝিতেন, ঐকান্তিক আগ্রহের সহিত তাহা গ্রহণ করিতেন। তিনি লিখিয়াছিলেন, মানুষ স্বভাবতঃ নিষ্পাপ; তাহার স্রষ্টা প্রতিটাই তাহাকে কলুষিত করে। এই মত খৃষ্টধর্মের “আদি পাপ” (Original Sin) ও “চার্চের মাধ্যমে মুক্তি”বাদের (Salvation Through the Church) বিরোধী। তৎকালীন অনেক দার্শনিক “প্রাকৃতিক অবস্থা”র কথা বলিয়াছিলেন। রুসো এই অবস্থার বিস্তারিত বর্ণনা করিয়াছিলেন। এই অবস্থা যে কোথাও বর্তমান নাই, কখনও বর্তমান ছিল না, এবং ভবিষ্যতেও কখনো ইহার উদ্ভব হইবে না, তাহা তিনি স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু মানুষের বর্তমান অবস্থার সম্যক জ্ঞানের জন্য এইরূপ এক অবস্থার কল্পনা করা আবশ্যক। “প্রাকৃতিক ব্যবহারের” (Natural Law) ধারণা “প্রাকৃতিক অবস্থার সম্যক ধারণা ব্যতীত উৎপন্ন হইতে পারে না। মানুষের কতটুকু প্রকৃতি হইতে প্রাপ্ত, যতক্ষণ সে সম্যকে হুস্পষ্ট ধারণা না করে, ততক্ষণ তাহার জ্ঞান আদিত্তে বিহিত, অথবা তাহার সেই অবস্থার সম্পূর্ণ উপযোগী নিয়ম কি, তাহা নির্ণয় করা অসম্ভব। এই নিয়মের বাহারা অধীন, এই অধীনতা সম্যকে তাহাদের সচেতন হওয়া অতীব প্রয়োজনীয়। এই তেমনা চেষ্টা গ্রহণ না হইয়া স্বাভাবিক হওয়া আবশ্যক। মানুষে মানুষে যে স্বাভাবিক ভেদ আছে, তাহাতে রুসোর আগন্তি নাই। বরস, স্বাস্থ্য, বুদ্ধি প্রভৃতি বিষয়ে ভেদ অপরিহার্য। কিন্তু সমাজকর্তৃক অনুমোদিত বিশেষ অধিকার সমর্থনযোগ্য নহে।

“ব্যক্তিগত সম্পত্তি”ই সামাজিক বৈষম্যের মূল। প্রথমে যে লোক একখণ্ড জমিতে বেড়া দিয়া বলিয়াছিল “এই জমি আমার,” এবং তাহার কথা সরলভাবে বিশ্বাস করিয়া তাহার প্রতিবাসীদিগকে তাহার সামিধ স্বীকার করিতে দেখিয়াছিল—সেই লোকই সমাজের (Civil Society) প্রতিষ্ঠাতা। তাহার পরে ধাতুর ব্যবহার ও কৃষিকার্যের উদ্ভাবন দ্বারা এক অনিষ্টকর বিশবের স্রষ্টা হইয়াছিল। শত মানুষের চূর্তাগোর প্রতীক, ইয়োরোপে সর্বাপেক্ষা অধিক শস্ত ও লৌহ উৎপন্ন হয়। এই জন্ত ইয়োরোপের দুঃখকষ্ট অধিক। এই অনিষ্টের প্রতীকার করিতে হইলে সভ্যতা বর্জন করিতে হইবে। কেননা সভ্যতাবর্জিত স্বাভাবিক মানুষ দোষহীন; অসভ্য মানুষের যখন উন্নয়ন পূর্ণ থাকে, তখন সমগ্র প্রকৃতি ও তাহার মধ্যে শান্তি বিরাজ করে; তখন সে স্বজাতীয় সকলেরই বন্ধু।

নূতন গ্রন্থের একখণ্ড রুসো ভলটেরারকে পাঠাইয়া দিয়া ছিলেন। গ্রন্থ পাঠ করিয়া ভলটেরার লিখিয়াছিলেন, “মানবজাতির বিরুদ্ধে লিখিত আপনার গ্রন্থ প্রাপ্ত হইয়াছি। তৎক্ষণাৎ ধন্যবাদ দিতেছি। আমাদের সকলকে সুখে পরিণত করিবার উদ্দেশ্যে এরূপ চতুরতা পূর্বে কখনও দেখা যায় নাই। আপনার গ্রন্থ পড়িয়া চারি হাত পায়ে হাটুবার ইচ্ছা হয়। কিন্তু ৬০ বৎসরের অধিককাল পূর্বে যে অভ্যাস ত্যাগ করিয়াছি, চূর্তাগরকে এখন তাহাতে কিরিয়া বাওয়া অসম্ভব। Canadaর অসভ্যদিগের অনুসন্ধানে যাত্রা করাও

আমার পক্ষে সম্ভব নয়। কেননা যে সমস্ত পীড়ার আমি ভুগিতেছি, তাহার জন্ত একজন ইয়োরোপীয় চিকিৎসক আমার আবশ্যক। দ্বিতীয় কারণ এই যে ক্যানাডায় এখন যুদ্ধ চলিতেছে, এবং আমাদের দৃষ্টান্তে সেখানকার অসভ্যগণও আমাদের মতই দুর্নীতি-পরায়ণ হইয় পড়িয়াছে।” ইহা হইতেই ভলটেরার ও রুসোর কলহের সূত্রপাত।

“Discourse on Inequality” রুসো জেনিভার নগরপিতৃ সিংগের (City Fathers) নামে উৎসর্গ করিয়াছিলেন। কিন্তু এই গ্রন্থপাঠে তাহার সন্তোষ হন নাই। সাধারণ নাগরিকদিগের সম্মান বলিয়া গণিত হওয়া তাহাদের বাঞ্ছনীয় মনে হয় নাই। কিন্তু রুসোর বশঃ বিস্তৃত হইতে দেখিয়া তাহার তাহাকে জেনিভার নিয়ন্ত্রণ করিলেন। রুসো নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করিলেন এবং ক্যালভিনী সম্প্রদায়ের লোক ভিন্ন কেহ জেনিভার নাগরিক হইতে পারিত ন বলিয়া তিনি রোমান ক্যাথলিক ধর্ম বর্জন করিয়া প্রোটেষ্ট্যান্ট ধর্মে পুনরায় দীক্ষিত হইলেন। ইহার পূর্বে হইতেই তিনি আপনাকে জেনিভার নাগরিক বলিয়া অভিহিত করিয়া আসিতেছিলেন জেনিভার বাস করিবার ইচ্ছাও তাহার মনে উদ্ভিত হইয়াছিল। কিন্তু জেনিভার শাসনকর্তাদের তাহার গ্রন্থের প্রতি বিরাগ দেখিয়া সে ইচ্ছা ত্যাগ করিলেন। জেনিভার বাস না করিবার আরও এক কারণ ছিল। ভলটেরার তখন জেনিভার নিকটবর্তী এক পরীষে বাস করিতেছিলেন। জেনিভার কোনও নাটক অভিনীত হইতে পারিত না। ভলটেরার এই বাধা দূর করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন তাহার ইচ্ছা ছিল জেনিভার তাহার নাটকের অভিনয় হয়। রুসো নাট্যাভিনয়ের বিরুদ্ধে লেখনী চালনা করিলেন। অসভ্যের নাটকে অভিনয় করে না। মেটো নাট্যাভিনয়ের অনুমোদন করেন নাই বাহার অভিনয় করে ক্যাথলিক পুরোহিতগণ তাহাদের বিঘায়ে অথবা অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় পৌরহিত্য করেন না। Bossuet নাটককে ইন্দ্রিয় লালসার পাঠশালা (School of Concupiscence) বলিয়াছেন ইত্যাদি যুক্তির প্রয়োগ করিয়া রুসো বিলাসবর্জিত কঠোর জীবনে পক্ষে তর্কযুক্ত অবতীর্ণ হইলেন।

১৭৫৫ সালে ভীষণ ভূমিকম্পে লিসবনে বহুসংখ্যক লোক মৃত্যুমুখে পতিত হয়। এই সংবাদে বিচলিত হইয়া ভলটেরার এক কবিতা করুণাময় সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্বে সন্দেহ প্রকাশ করেন। এই কবিতা পাঠ করিয়া রুসো বিরক্ত হইয়া লিখিলেন—“বশঃ, পৌরষ ও সম্পদে গর্বে অভিভূত ব্যক্তিকে মানবজীবনের দুঃখকষ্টের বিরুদ্ধে স্তম্ভিত ভীঃ বচন প্রয়োগ করিতে এবং জাগতিক যাবতীয় পদার্থকে অমূল্য বলিয়া ঘোষণা করিতে দেখিয়া, তাহাকে বহানে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত, ও জগতের প্রত্যেক পদার্থই যে উৎকৃষ্ট, তাহা প্রমাণ করিবার অর্থহী ইচ্ছা আমার মনে উদ্ভিত হইল। ভলটেরার দৃষ্টান্তঃ ঈশ্বরে বিশ্বাস করিলেও, প্রকৃতপক্ষে সন্ন্যাস ভিন্ন কাহারও অস্তিত্বে বিশ্বাস করে না। যে ঈশ্বরে তিনি বিশ্বাসের ভাণ করেন, তিনি এক ঈর্ষান্বিত পুরুষ মাত্র, অনিষ্টকর কার্য ভিন্ন অন্য কিছুতেই তাঁহার মন হয় না

তার এই মত শব্দটাই যুক্তিহীন। সর্ববিধ সৌভাগ্যের অধিকারী হুখের ক্রোড়ে শায়িত ব্যক্তির পক্ষে তিনি নিজে যে দুঃখকষ্টের বাত ভোগ করেন নাই, তাহার ভয়াবহ নিকরূপ চিত্র অঙ্কিত রইয়া, অপরকে নিরাশার গহ্বরে নিক্ষেপ করিবার চেষ্টা নিতান্তই অজ্ঞিকর। মানবজীবনের দুঃখকষ্টের বিরুদ্ধে অভিযোগের অধিকার হার অপেক্ষা আমার অধিক থাকিলেও, আমি নিরপেক্ষ বিচারী। প্রমাণ করিয়া দিলাম যে মানুষের দুঃখ কষ্টের জন্ত ইশ্বর স্মাত্রও দায়ী নহেন। মানবীর বৃত্তি নিচয়ের (Faculties) ব্যবহারই তাহার জন্ত দায়ী। পদার্থের ধরূপের সেজন্ত কোনও দায়িত্বই নাই।” রুসো ভলটেরার কবিতায় কঠোর সমালোচনা করিয়া তাঁহাকে এক পত্র লিখিয়াছিলেন। তাহাতে লিখিয়াছিলেন “ভূমিকম্প লইয়া এত হৈ চৈ করিবার কোনও সম্ভব কারণ নাই। মধ্যে মধ্যে কতকগুলি লোক যে ভূত্যাগ্রে পতিত হইবে, ইহাতে অমঙ্গলের কিছুই নাই। লিসবনের লোকেরা যদি সপ্ততল গৃহ নির্মাণ না করিয়া বিচ্ছিন্ন ভাবে অরণ্যের মধ্যে বাস করিত, তাহা হইলে তাহাদের বিপদ ঘটত না। প্রকৃতির বিরোধী আচরণ দ্বারা ই তাহার বিপদ আহ্বান করিয়াছিল।” ভলটেরার রুসোর পত্রের উত্তরে কোনও পত্র তাহাকে লেখেন নাই। উত্তর দিয়াছিলেন তাঁহার Candidate নামক গ্রন্থে। এই গ্রন্থে তাহার ভীষণতম অঙ্গ—“ভলটেরার প্লেক” (The mockery of Voltairs)—রুসোর বিরুদ্ধে প্রয়োগ করিয়া ছিলেন।

এইরূপে ভলটেরার ও রুসোর মধ্যে যে কলহের সূত্রপাত হইল, তৎকালের সমস্ত দার্শনিকই তাহাতে একতর পক্ষ গ্রহণ করিয়াছিলেন। ভলটেরার রুসোকে “অনিষ্টকারী উম্মাদ” বলিতেন। রুসো ভলটেরারকে “অধর্মের ভেরী, উৎকৃষ্ট প্রতিভার অধিকারী, কিন্তু নীচ আত্মা” প্রভৃতি

অভিধানে ভূষিত করিয়াছিলেন। ১৭৬০ সালে তিনি ভলটেরারকে লিখিয়াছিলেন “আমি বস্তুতঃ আপনাকে ঘৃণা করি, কেননা আমার ঘৃণাই আপনি চাহিয়াছিলেন। যদি আপনি চাহিতেন, আপনাকে ভালবাসিতেও পারিতাম। এক সময়ে আপনার সম্বন্ধে যে সমস্ত ভাবে আমার অন্তর পূর্ণ ছিল, তাহাদের মধ্যে কেবল আপনার প্রতিভার প্রতি শ্রদ্ধা এবং আপনার রচনার প্রতি আকর্ষণই অবশিষ্ট আছে। আপনার প্রতিভা ব্যতীত অস্ত্র কিছুই যদি আমার শ্রদ্ধা না থাকে, তাহা হইলে তাহাতে আমার দোষ নাই।”

Discourse on Inequality গ্রন্থে রুসো ক্রমবর্ধমান বর্ণোচ্চারণের প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে উদ্ভাবিত বিব্রোহকে “বিধিসঙ্গত কার্য” (Judicial action) বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন। এতাদৃশ মত-প্রচারে বিপদ ভোগ ছিলই। অধিকন্তু রুসো সাধারণের উপর প্রভূত প্রভাব-বিস্তারে সমর্থ বাক্যপটুতার অধিকারী ছিলেন। তিনি মৃত বাতালে বক্তৃতার উপযোগী এবং রচনা-শৈলী সৃষ্টি করিয়াছিলেন। তাহা পাঠে জনসাধারণ উত্তেজিত হইয়া উঠিত। ১৭৫৮ সালে তিনি D' Alembertকে যে ২৮৩ পৃষ্ঠাব্যাপী পত্র লেখেন, তাহাতে এই রচনা-শৈলীর পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই পত্রে উন্মাদিনী ব্যক্তিতার শ্রোত প্রবাহিত ছিল। পাঠ করিয়া সাধারণে বিশেষ ভাবে উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছিল। বিখ্যাত পণ্ডিত, বহু বিষয়পরিব্রমের সভ্য, D' Alembert তাহার সহিষ্ঠ তর্কযুদ্ধে অগ্রসর হইতে সাহসী হন নাই, তিনি তাঁহাকে লিখিয়াছিলেন “আপনার লেখনীর মত লেখনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা বিপজ্জনক। যে অবজ্ঞা আপনি সাধারণের প্রতি প্রদর্শন করেন, তাহা দ্বারা ই কিরূপে তাহাদিগকে সন্তুষ্ট করিতে হয়, তাহা আপনিই জানেন।” এই পত্রে তিনি পুথারের সঙ্গে রুসোর তুলনা করিয়াছিলেন।

(ক্রমশঃ)

## বর্ষার উৎসবে

### শ্রীপ্রভাতকিরণ বহু

কাঁঠাল পাঁকাবে ব'লে জ্যৈষ্ঠ যবে আনিল গরম,  
মনে হ'ল স'য়ে থাকি, কোয়াগুলি মিঠে ও নরম  
চেখে চেখে খাওয়া যাবে, গরম হোক সে ভালো ক'রে!  
‘দেখিনি এহেন গ্রীষ্ম’ মনে হয় প্রত্যেক বছরে,  
এ আর এমন কিবা? তারপরে ‘পরিত্রাহি’ ডাক!  
থাক থাক, ভগবান্ কাঁঠাল হবে না পরিপাক,  
পাগলের নেশা বটে! কাঁঠালের ছুটি মুদ্রা দাম!  
টাকায় তিনটি আম! হু আনার কুড়ি কালো জাম!  
প্রাণ যায় প্রাণ যায়, যেমে যেমে হয়ে পড়ে ষাড়!  
মেঘের পুঁটলী নিয়ে অকস্মাৎ নামিল আবাড়।

ভলাপটিতে জল, জল জমে ঠনঠনে ভ'রে;  
বন্ধ ঠাঁমে ব'সে ব'সে বর্ষার কবিতা লিখি জোরে।  
পকেটে ফাউন্টেন পেন, আর ছিল লাইব্রেরীর বই  
তাতেই কবিতা লিখি, তারা আর দেখে নেয় কই?

ছাতা ছিলনাকো কাছে, ঘরে কবে ফিরিব কে জানে!  
ফুটপাথ থেকে জল ঢোকে গিয়ে দোকানে দোকানে।  
আমি ত কবিতা লিখি—ভালোবাসি প্রবল বর্ষণ,  
মাঝ পথে নয় বন্ধ, অধিকার ক'রে গৃহ কোণ।  
সমস্ত ছপুর্ ধ'রে, আর ধ'রে সমস্ত রাত  
ঝর ঝর ঝর ধারে আকাশের বন্ধক প্রপাত।  
কবে ভালো লেগেছিল, আজো যে তেমনি ভালো লাগে,  
মুড়ি তেলেভাজা আর খিচুড়িতে ভালোবাসা জাগে।  
বরষারে ভালোবাসি, এঁকে যেতে পারি তার ছবি,  
এ গোড়া বাংলা দেশে তাই লোকে বলেছিল ‘কবি’।  
নগণ্য কবির মাঝে পেয়েছিছ একটু ঠাই!  
পথের কাদার ভয় কুকুরের ভয় যায় নাই।  
আমার এ কাব্যখানি অস্ত্র কবি পড়ে দিক্ তব,  
বর্ষণের আশঙ্কার গেলাম না বর্ষার উৎসবে ॥



# দ্বারমণ্ডল

জালালপুর বন্দোপাধ্যায়

(পূর্বাত্মবৃত্তি)

দেবু চাঁদের কাপ হাতে লইয়া বার দুই চুমুক দিয়াই অক্লমনক হইয়া গেল।

সে গিরীশদের কথা ভাবিতেছিল।—ইতিহাসের চক্রান্তের চড়কে পিঠে বাণ ফুঁড়িয়া পুরুষাত্মকসে মহানন্দে ঘুরপাক খাইতেছে—আর ভাবিতেছে পাকে পাকে উঠিয়া স্বর্গে চলিয়াছে। হিন্দুর শিবঠাকুরের সিংহাসন গিয়াছে সেই কবে, মুসলমানের পীরের মসনদও গিয়াছে, সিংহাসন বল মনসদ বল—দখল করিয়া বসিয়াছে ইংরাজ, তবুও হিন্দু মুসলমানের আক্রোশ আর মিটিল না। দুই বিড়ালের ঝগড়ার রুটির গোছা লইয়া বীদর গাছে উঠিয়া পরমানন্দে রসাশ্বাসন করিতেছে—বিড়াল দুইটার সেদিকে দৃকপাত নাই—তাহারা লেজ এবং রোঁয়া ফুলাইয়া নখ বাহির করিয়া পরস্পরের বুক চিরিয়া ছুঁপিও বাহির করিবার জন্ত যুদ্ধে মাতিয়া রহিয়াছে।

সে বুঝিতে পারে না—কেন এই সহজ সত্যটা তাহাদের বোধগম্য হয় না। অবশ্য সে নিজেও একদিন বুঝিতে পারিত না। একদিন বিত্তভাইয়ের সঙ্গে এই লইয়া তাহার বিরোধও হইয়াছিল। সে কথা মনে পড়িলে আজও তাহার হৃৎক হয়। লজ্জাও হয়। মনে মনে তাহার জেলবাসটাকে সে ভাগ্য বলিয়া মানে। ভাগ্যে তাহার জেল যাওয়ার সুযোগ হইয়াছিল।

স্বর্গ মান সারিয়া বাহির হইয়া আসিল। তোয়ালে দিয়া মাথার চুল মুছিতে মুছিতে জিজ্ঞাসা করিল—কি হ'ল?

দেবু ব্যঙ্গ করিয়া বলিল—সনাতন ভৌতিক কাণ্ড। ভূতে সব উঠে দিলে।

—মানে?

—মানে আবার কি? এ দেশে সর্বের মধ্যে ভূত বাসা বেঁধে থাকে। হাটের ব্যাপারেও হিন্দু মুসলমানের দাঙ্গা বাসা বেঁধে রয়েছে।

স্বর্গ যত বিস্তৃত হইল তাহার চেয়ে অনেক বেশী উত্তপ্ত হইয়া উঠিল। স্থির দৃষ্টিতে দেবুর মুখের দিকে চাহিয়া—দেবুকেই কঠোর স্বরে বলিল—হেঁয়ালী রাখ বাপু। কি হয়েছে বল।

—মুসলমানেরা দাবী করেছে—হাটে জয়তারার আশ্রমের জন্তে যে তোলা ওঠে—তার ভাগ পীরের দরগার জন্তে দিতে হবে।

—তারপর?

—তারপর আর কি? হিন্দুরা বলছে—তার চেয়ে আমাদের জমিদারের সঙ্গে মিটমাট করাই ভাল।

—মিটমাট করাই ভাল! এই কথা বললে? কে?

—গিরীশ।

স্বর্গ তরু হইয়া গেল। ক্ষোভে তরু হইয়া গেল। দেবু একটু হাসিল—বলিল—কথা বল না যে!

স্বর্গ বলিল—ওদের—

—ওদের কি?

কথা বোধ হয় খুঁজিয়া না পাইয়াই স্বর্গ বলিল—ওদের ম'রে যাওয়া উচিত। ম'রে থাক, সব ম'রে থাক।

তাহার মুখচোখ ক্ষোভে লাল হইয়া উঠিয়াছে। দেবুর চেয়ে উত্তেজনা তাহার অনেকগুণে বেশী। স্বাভাবিক ভাবেই বেশী। ধর্মই হোক—রাজনীতিই হোক—সংসারই হোক—মেয়েরা যত আবেগের সঙ্গে আঁকড়াইয়া ধরিতে পারে, নিজেদের কঠিন পাকে জড়াইয়া দিতে পারে—পুরুষে ততখানি গাঢ় আবেগের সঙ্গে জড়াইয়া ধরিতে পারে না। তাহার উপর স্বর্গ স্বামী পাইয়াছে—সংসার পাইয়াছে; কিন্তু আজও সন্তান কোলে পায় নাই। রাজনীতির পথে পা দিয়া সে দেবুর অপেক্ষাও প্রবল বেগে ছুটিতে চায়। সে দিক দিয়া—পঞ্চগ্রামের মাল্লবের সঙ্গে অনেকগুণে বেশী পৃথক—বেশী স্বতন্ত্র হইয়া উঠিয়াছে। নারীপ্রকৃতির স্বভাবধর্মই বোধ করি এমনি, জীবনে বাহা আঁকড়াইয়া

হরে—তাহাকে পরিত্যাগ করা তাহার পক্ষে জীবন পরিত্যাগ করা অপেক্ষাও কঠিন, কিন্তু কোনক্রমে পরিত্যাগ করিলে আর সে সেদিকে কিরিয়াও তাকাই না, ব নূতন খাতে সে প্রবেশ করে—সেই পথেই ছুটিয়া চলে স্রবলতর গতিতে, যে নূতন আশ্রয়কে পায়—তাহাকেই বড়াইয়া ধরে স্রবলতর আবেগে। দেখুড়িয়ার তিনকড়ি গুল—জাতিতে সদগোপ—নিজে হাতে সে চাষ করিত, তাহার কত্যা সে। দশ বৎসর বয়সে বিধবা হইয়াছিল, তারবেলা হইতে উঠিয়া হিন্দুসমাজের আচার-আচরণ পালন করিয়া চলিত, হিন্দু সমাজের অন্ধবিশ্বাস ঝাঁকড়াইয়া ধরিয়া বাপের সংসারে ধান কাপড় পরিয়া, পাখার চুল ছোট করিয়া ছাটিয়া, নানা ব্রতবারে উপবাস করিয়া—তাইয়ের আমলে তাজের সঙ্গে কলহ করিয়া হিন্দু বালবিধবার জীবনের বাধা ছকে ছকে—ঘুরিয়া একদা গোলকধামের খুটির মত বৈকুণ্ঠে যাওয়ার কথা। কিন্তু তিনকড়ি মেয়েকে লেখাপড়া শিখাইতে স্কন্ধ করিল। স্বর্ণ তাহার দাদা গৌরের বই লইয়া পড়াশুনা আরম্ভ করিল। তারপর ষাটল বিপর্যয়। ডাকাতির মামলায় তিনকড়ির জেল হইয়া গেল। ছেলেটি ও মেয়েটি দেবুর উপর নির্ভর করিয়া বসিল। দেবু স্বর্ণের ভবিষ্যৎ চিন্তা করিয়া তাহাকে লেখাপড়া শেখানোই সর্বোত্তম পন্থা বলিয়া মনে করিল। তিনকড়ির ছেলে গৌরের লেখাপড়া হইল না, সে দেবুর নান্দ্রয়ে আসিয়া কংগ্রেসের ভলেন্টিয়ারী স্কন্ধ করিল। তারপর একদা হইল নিরুদ্ধেশ। স্বর্ণ প্রাণপণে লেখাপড়াকেই ঝাঁকড়াইয়া ধরিল। মাইনর পরীক্ষায় বৃত্তি পাইল। দেবুর ইচ্ছা ছিল—স্বর্ণকে মাইনর পাস করাইয়া গ্রামেই ছোট ছেলে-মেয়েদের পাঠশালা খুলিয়া বসাইয়া দিবে। হয়তো—তাইই হইত। কিন্তু তিরিশ সালে দেবু গেল জেলে। জেল হইতে ডিটেনশনে। স্বর্ণ তখন নূতন পথে ছুটিতে স্কন্ধ করিয়াছে। জংসনের বালিকা বিভাগয়ে ছোট দিমিগিরি চাকরী লইয়া—ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিবার স্তম্ভ উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়া গেল। জংসন তার জীবনে আনিল নূতন ধারা। সে ম্যাট্রিক পাস করিল, দেবু জেল হইতে কিরিল। তারপর একদিন কি জানি কেমন করিয়া কি হইয়া গেল—দেবু অজ্ঞতব করিল—স্বর্ণকে তাহার জীবনে-চাই। আশ্চর্য—স্বর্ণ শিহরিয়া উঠিল না, অলিয়া

উঠিল না, পুলকিত লজ্জায় মাথাটি হেঁট করিয়া বলিল—এত বড় ভাগ্য যে আমি ভাবতেও পারি না দেবু। আমাকে ভূমি—? দেবু বলিল—আমরা রেজেন্টী ক’রে বিয়ে করব স্বর্ণ—যদি চাও তা হ’লে পুরুতও ডাকব!

বিবাহ হইয়া গেল। কিন্তু শিবকালীপুর দেখুড়িয়া; তাই বা কেন—পঞ্চগ্রামের সমাজ অসহ্য হইয়া উঠিল। স্বর্ণের কৃতিত্বে একদা সকলে মুগ্ধ হইয়াছিল, দেবুর আত্মত্যাগে সেবায় গোটা পঞ্চগ্রাম তাহাকে নেতৃত্বের আসন দিয়াছিল, কিন্তু এই বিবাহের পর গোটা পঞ্চগ্রামের সমাজ তাহাদের দিকে ক্রিছন কিরিয়া বসিল। পূর্বের কাল হইলে হয়তো অনেক নির্যাতন সহ্য করিতে হইত। বিংশ শতাব্দীর চতুর্থ দশকে সেটা সম্ভবপর ছিল না। শুধু সকলে যেন সরিয়া গেল।

স্বর্ণ এবং দেবু একদা আসিয়া জংসনে বাসা করিল। দেবুর রাজনৈতিক জীবন ক্ষেত্র খুঁজিয়া পাইল। স্বর্ণ দেবুর কাছে সেই শিক্ষা গ্রহণ করিল। তারপর আসিল অন্ধা। দেবুই যোগাযোগ করিয়া তাহাকে এখানে আনিল। সদগোপ গৃহস্থের শান্তশিষ্ট বালবিধবা কত্যাটি কোথায় যে হারাইয়া গেল এই নূতন স্বর্ণের মধ্যে, সে কথা বোধ করি স্বর্ণ নিজেও জানে না। জানা দূরের কথা, কোনদিন কোন মুহূর্তের জন্ত সে-দিনের কথা তাহার মনেও পড়ে না। পড়িলে বোধ হয় নারী হইয়া এমন ভাবে গিরাশ-কাকাদের বলিতে পারিত না—ওদের ম’রে যাওয়া উচিত। ম’রে থাক সব, ম’রে থাক।

দেবু চায়ের কাপটি শেষ করিয়া আরও খানিকটা চা ঢালিয়া লইয়া বলিল—ভূমি বেশী উত্তেজিত হয়ে কাউকে কিছু ব’লো না যেন।

—কলব না? কেন? তোমার ভয় হচ্ছে না কি?

—ভূমি ইহুলে চাকরী কর স্বর্ণ। ওরা সব আগে থেকেই চেষ্টা করছে তোমাকে সরাবার।

—চাকরী ছেড়ে দেব।

—না। সে ঠিক হবে না।

—আমার কিন্তু এই ভাবে নুকোচুরি খেলে চাকরী করতে ভাল লাগছে না। চাকরী ছেড়ে আমি পার্টির কাজই করব।

—না। এখন প্রয়োজন হবে তখন দিতেই হবে।

সে প্রয়োজন এখনও আসে নি। তার চেয়ে স্থলের চাকরীতে অনেক বেশী কাজ হচ্ছে।

—কিন্তু এবার অবস্থাটা কি হ'ল তেবে দেখছ? অরুণাদি চ'লে গেলেন। এবার বে কে আসবেন—কেমন লোক—তার সঙ্গে বনিয় চলেতে পারব কি না—সে সব তেবে আমার একদম ভাল লাগছে না।

হঠাৎ উনানে কটু-কটু শব্দে করলা কাটিয়া তাহাদের চকিত করিয়া তুলিল। স্বর্ণ বলিল—দাঁড়াও।

লোহার শিক দিয়া নিচে খুঁচাইয়া আঁচ খানিকটা নামাইয়া দিল, তারপর ভাতের হাঁড়ি চাপাইয়া দিয়া বলিল—এক একবার মনে হয় কি জ্ঞান? মানে, হচ্ছে হয়। ইচ্ছের কথা বলছি। ইচ্ছে হয়—চাকরী ছেড়ে শিবকালী-পুরে গিয়ে থাকি। আগের আমলের মত ওখানে কাজ করি।

বাড় নাড়িয়া দেবু বলিল—সে আর হয় না।

—হবে না কেন? হবে না—মনে ভাবলেই হবে না। হবে, বিশ্বাস রাখলে হতেই হবে। কথাতেই রয়েছে—‘নেই’ বললে সাপের বিষ থাকে না।’

—কথাটা মিথ্যে স্বর্ণ। বিষধর সাপ যদি হয়—তবে পৃথিবীও লোক ‘নেই’ বলে সমস্তই চাঁৎকার ক’রে উঠলেও—বিষ না-থাকা হবে না, বিষ থাকবেই। আর যদি হেলে বা জল-চোঁড়া হয় তবে ‘নেই’ বলে না-চোঁচালেও বিষ থাকবে না। শিবকালীপুরে ফিরে যাওয়া—বাস করতে যাওয়া—আর হবে না।

সে বারবার বাড় নাড়িয়া অস্বীকার করিয়া কথাটার উপর জোর দিতে চেষ্টা করিল।

—পণ্ডিত! পণ্ডিত মশায়!

দরজার কড়াটা নড়িয়া উঠিল। সঙ্গে সঙ্গে বাহির হইতে কে ডাকিল—পণ্ডিত মশায়! কর্তব্যর বৃত্ত শান্ত তত কুণ্ঠিত। দেবু মুহূর্তে চিনিল—নলিন ডাকিতেছে। এ কর্তব্যর আর কাহারও হইতে পারে না। বি-এ পাস করার পর অংসনে সে দেবু মাষ্টার—মাষ্টার মশাই নামে পরিচিত, তাহার জীবনের সকল পরিবর্তনকে স্বীকার করিয়া লইয়া—গুরুগ্রাম সমাজও ওই নামেই তাহাকে ডাকে। শিবকালীপুরের জগন ডাক্তারও তাহাকে মাষ্টার বলে, শুধু নেলো বা নলিন তাহাকে বলে, পণ্ডিত মশায়!

স্বর্ণ দরজা খুলিয়া দিল। নেলো আসিয়া নীরবে দাওয়ায় বসিল। দেবু প্রশ্ন করিল—কি সংবাদ নলিনচন্দ্র, বল।

নেলো খুঁট খুলিয়া টাকায় পরসার রেজকিতে প্রায় মুঠাখানেক নামাইয়া দিয়া বলিল—ওনে নেন। মহিলা সমিতির টাকা।

স্বর্ণ বলিল—টাকা তো মাসের শেষে নেওয়া হয়। এখন কেন? ঠিক মিলিয়ে হিসেব ক’রে নিতে সময় লাগবে তো!

দেবু বুঝিয়াছে। সে জু কুঞ্চিত করিয়া বলিল—হয়েছে কি? হঠাৎ টাকা পরসার মিটিয়ে দিতে এসেছিস?

নলিন প্রায়রোগগ্রস্তের মত বায়কয়েক কাঁধ ঝাঁকি দিয়া—নড়িয়া চড়িয়া সংকোচ কাটাইয়া বলিল—আপনারা আলাদা লোক দেখুন। ও—আমি—

সে নথ দিয়া মাটি খুঁটিতে আরম্ভ করিল।

দেবু বলিল—তুই পারবি না?

শান্ত নিরাসক্ত ভাবে নলিন বলিল—না।

—কেন? কি হ'ল?

—হয় নাই কিছু। হবে আর কি? মানে—। বাড় হেঁট করিয়া সে নথ দিয়া মাটির উপর ছবি আঁকিতে আরম্ভ করিল।

—মানেটা কি রে? সেই তো জিজ্ঞেস করছি।

—মানে—। বাড় তুলিল নেলো, কিন্তু দেবুর দিকে তাকাইল না—অল্প দিকে দৃষ্টি রাখিয়া বলিল—মানে, আমি পারব না। মানে—। আবার বাড় হেঁট করিয়া নথ, আঁকা ছবির দিকে চাহিয়া বলিল—মানে, মনটা আমার খচ-খচ করছে।

—মন খচখচ করছে? কেন, সেই ছেলেটার হাত থেকে পুতুল কেড়ে নেওয়ার অন্তে?

—হ্যাঁ। তা ছাড়া—। নলিনের হেঁট-করা মাথাটা নানা অস্বচ্ছন্দ ভাবিতে নড়িতে লাগিল।

—তা ছাড়া আবার কি?

কিছু না। টাকা নিয়ে ওকে যেতে দাও। স্বর্ণ তীব্র-স্বরে বলিয়া উঠিল।—ও এখন পারবে না, তখন জোর ক’রে লাভ কি? জেনেই বা হবে কি?

হাসিয়া দেবু বলিল—না—না—না। জানতে হবে বৈ



কি। নলিনের সঙ্গে আমার তো সাধারণ সম্পর্ক নয়!

শ্রবণ বলিল—না। সব মিথ্যে। যেখানে স্বার্থ নেই সেখানে সম্পর্কের কোন দাম নেই। যখন নলিনের রঙ-তুলি কেনার পরস্যা ছিল না, যখন গাঁয়ের লোকে ওকে খরসা করত, যা-তা বলত, তখন তুমি ভালবেসেছিলে, আপনাতর জনের মত মেহ করেছিলে, সাহায্য করেছিলে—তখন সম্পর্কের দাম ছিল। আজ নলিনের হাতের পুতুল দেখে কলকাতার ব্যারিষ্টারের ছেলে—কঙ্কনার জমিদার-বাড়ীর বংশধর কান্দে, হাটে নলিনের ডালা-ডালা পুতুল বিক্রী হয়—আজ আর তোমার সঙ্গে সম্পর্কের দাম কি বলতে পার? সাধারণ সম্পর্ক নয়—মানে—অসাধারণ সম্পর্ক! হাসিও পায়—হুঃখও ধরে। ছি! তোমার ব্রজা হয় না, কিন্তু আমি লজ্জা পাই।

টাকা পরস্যাগুলি মুঠায় তুলিয়া শ্রবণ ঘরের মধ্যে চলিয়া গেল। বলিল—মহিলা-সমিতির সঙ্গে তোমার সম্পর্কও কিছু নাই, আমি এ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারী, আমি নিলাম টাকা। ঠিক মিলিয়ে হিসেব ক'রে দেখে নেব। নলিন, তোমাকে আমি খালাস দিলাম। আমাদের ব্যবস্থা আমরা যা হয় করব।

নলিন ঘাড় হেঁট করিয়া বসিয়াই রহিল। কোন উত্তর সে দিল না।

দেবু বলিল—চা খাবি?

নলিন ঘাড় নাড়িল—না। ঘাড় তুলিয়া বলিল—চা খেয়েছি একবার। তারপর একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল—তা হ'লে আমি যাই।

—আচ্ছা।

যাইতে গিয়া নলিন কিন্তু ঘুরিয়া দাঁড়াইল। বলিল—ছেলের হাত থেকে পুতুলটা নেওয়া কিন্তু আমার মনে ভারী লেগেছে পণ্ডিত। আমি একদিন বাবুদের বাড়ীতে গিয়ে একটি বুড়ো পুতুল ওদের দাঁওয়ার ওপর রেখে পালিয়ে এসেছি। শুনলাম বাবু সেটাকে লাধি মেয়ে ভেঙে দিয়েছে। তা দেখ। তার ধর্ম তার ঠাই—আমার ধর্ম আমার কাছে।

আবার একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল—স্বয়ংসিদ্ধি বললে আমাকে কথাগুলান—তা—কথাগুলান সত্যি।

একটুকুও বাড়িয়ে বলে নাই। সেই নজরবন্দীবাবু আর তুমি না থাকলে পণ্ডিত আমার ভাগ্যে—। বোধ হয় খানিকটা ভাবিয়া লইয়া বলিল—মুটে মজুরের কাজ ক'রেই জীবন কাটত আর কি! আমার জাতজন্ম নিয়ে পাঁচজনে পাঁচ কথা বলে—বাড়ীতে চাকরও কেউ বোধ হয় রাখত না। তা ছাড়া তুমিই আমাকে টেনে নিয়ে এলে জংসনে। আমার খুব ভয় ছিল। জংসনকে দেখে এখনও আমার ভয় লাগে। জংসনে টেনে এনেছ, তাই পুতুল বিক্রী হচ্ছে। লোক জানতে পেরেছে—তারিফ করছে। তা—। তা যতদিন বাঁচবে—আমি বলব সবাইকে, আজও বলি—এর পরও বলব—পণ্ডিত ছিল তাই আমার সব। তা আমি বলব।

দেবু এতক্ষণে রাগ করিল। বাহার কাছে কৃতজ্ঞতা পাওনা থাকে—সে অকৃতজ্ঞ হইলে হুঃখ অবশ্যই হয়, কিন্তু কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিবার ভান করিয়া জ্বাকামি করিলে সর্বদা জলিয়া যায়। দেবুর মনে হইল, .নেলো এইবার জ্বাকামি শুরু করিয়াছে। ক্র কুণ্ঠিত করিয়া সে বলিল—সে না বললেও চলবে রে। সে আশা ক'রে তোকে আমি সাহায্য করি নি। বুঝিল।

—সে আমি জানি পণ্ডিত। আমার গুল আছে দেখে তুমি সাহায্য করেছিলে। আমিও এতদিন তুমি যা বলেছ—না করি নাই। তুমিই বল পণ্ডিত। তখন আমি ছেলেমানুষ, তুমি—সেই নজরবন্দীবাবু কত চিঠি আমাকে দিয়েছ... আমি জংসনে—সদরে দিয়ে এসেছি—ভেবে দেখ! তার পরে—কত ছবি তুমি বরাত করেছ—আমি এঁকেছি, তুমি ভেবে দেখ। সেই একটা শেকল বাঁধা মানুষ—টেনে শেকল ছিঁড়েছে ছবি তুমি আঁকালে—আমি আঁকলাম। তুমি বললে না কিছু, তবু আমি তো বুঝতে পেরেছিলাম ওর মানে কি? 'না' তো আমি করি নি। দারোগা ডেকে নিয়ে বললে—তুই এঁকেছিস। তোমার বিপদ হবে বুঝে আমি বলেছিলাম—না। মার দিয়েছিল—তবু হ্যাঁ বলি নাই। মনে কর তুমি। তারপরে কত ছবি আঁকালে। কিন্তু—ও-সব আমার ভাল লাগে না পণ্ডিত, তাতেই পণ্ডিত—। তাবছিলাম অনেক দিন থেকেই। এবারে এই ব্যাপারে মনে আমার ভারী যা লেগেছে। তাই সব ব'লে ক'রেই আমি স'রে যাচ্ছি।

এই ধরনের কথা দেবু নলিনের কাছে প্রত্যাশা করে নাই। সে তাহাকে দিয়া দলের মত-অনুযায়ী কতকগুলি পোষ্টারের ছবি আঁকাইয়াছিল। উদ্দেশ্যটা কেবল যে দলের কার্যোদ্ধার একথা ঠিক নয়, চিত্রশিল্পের কল্পনায় অঙ্কন-পদ্ধতিতে তাহার চোখের সামনে একটা নূতন পথের ইঙ্গিত দিতেও চেষ্টা করিয়াছিল। সেই চেষ্টাকে এমন বিকৃতভাবে নেলো গ্রহণ করিবে—তাহা সে ভাবে নাই। দেবুর মাথার মধ্যে রক্ত যেন চনচন করিয়া উঠিল। নেলো পরসাকড়ির ব্যাপারে অত্যন্ত হিসাবী এবং কৃপণ সে তাহা জানে। সেই কারণে পোষ্টারের ছবি আঁকাইয়া সে তাহাকে মজুরী দিতেও চাহিয়াছিল। নলিনই লয় নাই। হাতজোড় করিয়া বলিয়াছিল—পণ্ডিত, তোমার কাছে আমি ছবির দাম নিতে পারব না। এখন আমার পরসা আছে। কিছু টাকা আমি জমিয়েছি। যদি অভাব কখনও হয়—এমনি চেয়ে নোব। তুমি যা করেছ—আমার বাপ-দাদাতে তা করত না পণ্ডিত। তারা আমাকে ছবি আঁকতে রঙ তুলি কিনে দিত না। বোষ্টমের ছেলে—কাঁখে খোলা দিয়ে বলত—ছবি আঁকতে হবে না পোষ্টার মত—ভিক্ষে ক’রে আন গিয়ে। নয় তো জঙ্গলোকেবর বাড়ীতে চাকর-খানসামার কাজে ভর্তি ক’রে দিত।

কথাগুলি শুনিয়া দেবুর বড় ভাল লাগিয়াছিল, শুধু তাই নয়—নেলোর উপর তাহার যে মেধ সেই মেহের সঙ্গে একটা প্রকাবোধ যুক্ত হইয়াছিল। মনে হইয়াছিল—ছেলেটা শুধু জন্মগত শিল্পবোধ লইয়াই সংসারে আসে নাই—শিল্পবোধের সঙ্গে শুদ্ধ মনুষ্যত্ব-তৃষ্ণাও লইয়া আসিয়াছে।

আজ দেবুর সমস্ত ধারণা এক মুহূর্তে ধুলিসাং হইয়া গেল। রাগ তাহার হইয়াছিল—সে-রাগ সংযত করিয়াও দেবুর কর্ণধর মাত্রাতিরিক্ত গভীর হইয়া উঠিল। গভীর কর্তে দেবু বলিল—তার ক্ষেত্রে তো আমি মজুরী দিতে চেয়েছিলাম নলিন। তুমিই নাও নি। ভাল ক’রে স্বরণ ক’রে দেখ তুমি।

নলিন একটু চমকিয়া উঠিল—বলিল—তা কি আমি বলেছি পণ্ডিত ?

—তবে ? তবে তুমি বলছ কি ?

—বলছি—। নলিন মাথা চুলকাইতে লাগিল। মনের কথা সে যেন ঠিক প্রকাশ করিতে পারিতেছে না।

—কি বলছ—বল ?

—মানো—। ও সব আঁকতে আমার ভাল লাগে না।

ও-সব—। এবার সে একবার বাঁ কাঁধ—একবার ডান কাঁধ কাঁকি দিয়া নিজের মনের অস্বচ্ছন্দ্য এবং অক্ষমতা অসহায়ভাবে প্রকাশ করিল। তারপর বলিল—আমি যাই পণ্ডিত মশায়। নতুন দোকান করছি—তার উদ্ব্যগ আছে। আমি যাই।

—যাও।

নলিন আবার বাইতে যাইতে ঘুরিল—বলিল—আমি নিজেও আর হাতে দোকান করব না পণ্ডিত মশায়। তাতেই আরও মিটিয়ে দিলাম আপনাদের সমিতির টাকা। বাবুদের ছেলের হাত থেকে পুতুলটা ছোঁ মেরে তুলে নিলে বড় দিদিমণি, সেটাও আমার বেগুন মনে লেগেছে, বাবুদের ছেলের জন্তে পুতুল দিয়ে এলাম—সেই পুতুল বাবু লাখি মেরে ভেঙে দিয়েছে—তাও তেমনি আমার মনে লেগেছে। ওদের হাতে আর আমি দোকান করব না। সে যদি না-থেকে পেয়ে ম’রেও যাই, তবুও না। আমি ইষ্টিশানের ফটকের ধারে বড় অশথ গাছটার নিচে—দোকান পাতিব। ওই যে—কবরাজ জ্ঞান মশায় আছেন—উনি নিয়ে গিয়েছিলেন স্মরণতিবাবুর কাছে ;—উনি ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের ভাইস-চেয়ারম্যান তো, ঠিক বলে ক’রে দিলেন। রাত্তা বোর্ডের, জায়গাটাও বোর্ডের। গাছতলায় একটি তক্তাপোষ পাতিব, তার ওপরে কাঠের খুপরী ঘর ক’রে নোব—পানের দোকানের মত। তা ছাড়া খানিকটা—

একসঙ্গে এতগুলো কথা বলিয়া ফেলিয়া নলিন হঠাৎ চূপ করিয়া গেল। অত্যন্ত অস্বচ্ছন্দ হইয়া উঠিল। যে কথাটা বলিতে গিয়া থাকিয়া গিয়াছে—সে কথাটা সংকোচে আটকাইয়া গিয়াছে। ওই গাছতলায় দোকান বন্দোবস্ত লওয়া ছাড়াও সে খানিকটা ভিটা বন্দোবস্ত লইয়াছে। জংসনে দক্ষিণ দিকে একটা মেহব্যবসায়িনীদের পল্লী আছে। সেই পল্লীর মুখেই একটি ভিটে সে কিনিয়াছে। গিরীশ চুতার মধ্যে থাকিয়া সস্তার ভিটাটা করিয়া দিয়াছে। ওইখানেই সে ঘর তুলিবে। একখানা



—একটা বড় চালা, আরও একটা ছোট চালা।  
খানায় সে বাস করিবে, ছোট চালাটার রান্না হইবে,  
চালাটা হইবে তাহার পুতুল গড়িবার ঠাই।

দেহব্যবসারিনীদের সম্পর্কে তাহার নিজের কোন  
বকোচ নাই। কিন্তু দেবু পণ্ডিত, স্বর্ণ—ইহাদের আছে,  
কথা জানে বলিয়াই কথটা বলিতে গিয়া সে হঠাৎ  
মিসিয়া গেল।

দেবু বেশ একটু বিষয় বোধ করিল। সমস্ত গুনিয়া  
শ্রীর মনও অনেকটা প্রসন্ন হইয়া আসিয়াছিল। বিশেষ  
কিছু জমিদারের হাট পরিত্যাগ করিয়াছে এই সংবাদে  
স্বর্ণের দুইজনেই খুশী হইয়াছে।

স্বর্ণ বলিল—এতক্ষণ এ কথা বলিস নি কেন?

দেবু হাসিল—বলিল—শ্রীমান নলিনচন্দ্রের কথাবার্তার  
শ্রবণ এই। ক্র্যাস ব্যাকটা খুব পছন্দ ওর।

নলিন বার দুই কাঁধ ঝাঁকি দিয়া বাহির হইয়া গেল।  
ঠাৎ যেন পলাইয়া গেল। দেবু একটু ব্যস্ত হইয়া  
গেল—নলিন!

দরজার ওপার হইতে উত্তর আসিল—কাল আসব।  
স্বর্ণ—

আজ সকালেই সতীশ বাউরীর আসিবার কথা আছে।  
সে ঠিক লইবে। সতীশ বাউরী পঞ্চগ্রামের মধ্যে পাকা  
দেওয়াল-বাড়ী, তাহার হাতের কাঁচা মাটির ঘরের আজও  
বকশ বৎসর পরমায়ু।

সতীশ বলে—চার শতাব্দী—পাঁচ শতাব্দী ধর সে আমরা  
পারি না। তবে—হ্যাঁ, শতাব্দী ধর—মানে যদি ঠিক মতন  
হাটন টাটন দিয়ে রক্ষা করেন তবে একশো বছর বাবে।  
তিন চার বছর অন্তর পোতা বেঁধে বাবেন—মেঝেতে ইঁহর  
গাঙ্গে—খুঁড়ে জল ঢেলে—নতুন মেঝে করবেন—বাস।

সতীশও আজকাল পঞ্চগ্রামের জীবনগতী অতিক্রম  
করিয়া জংসনে আসিয়াছে। অবশ্য পুরাপুরি নয়,  
প্রাথমিক ভাবে। চাষের সময় পঞ্চগ্রামের মাঠে চাষ করে,  
সন্ধ্যা উঠিয়া গেলে—মাস চারেক সে জংসনে আসিয়া  
কাঁচা মাটির বাড়ী ঠিক লইয়া কাজ করে। গিরীশ ছুতার  
সব কাঠামো তৈরী করে, সে সভ্যকে কাজ জুটাইয়া  
দেয়, সতীশ দেওয়াল তৈরী করিয়া গিরীশকে কাঠামোর  
কাজ আনিয়া দেয়।

গিরীশ বলে—এটা আমাদের গিরীশ সতীশ এ্যাণ্ড  
কোম্পানী লিমিটেড। কন্ট্রাক্টার বিভাগ এ্যাণ্ড  
কারপেন্টার।

সতীশ হাসে।

গিরীশ বলে—তুই যদি হোলটাইম হ'তে পারিস  
সতীশ, হাকটাইম হলেও হ'ত একরকম। এ যে কোয়ার্টার  
টাইম। মোটে তিন চার মাস!

গিরীশ নলিনের তত্ত্বাপোষ দোকানটা ঠিক লইয়াছে।  
বলিয়াছে—এত বানিয়ে দোব, দেখবি। শিখনের কাঠের  
দেওয়ালে—থাক লাগিয়ে দোব। দুই পাশে কজা দিয়ে  
ছপালা—তাতেও থাকবে আলমারী। বন্ধ ক'রে তাল  
দিয়ে দাও, একটা বন্ধ আলমারী। খুলে দাও, থাকে-থাকে  
পুতুল সাজানো সারি-সারি। সবুজ রঙ লাগিয়ে দোব।  
সাদা হরকে লিখে দোব—“গিরিন কেবিন—পুতুলের  
দোকান।” অর্থাৎ গ্রীন কেবিন—

স্বর্ণ বলিল—মিথ্যে ওর ওপর রাগ করছিলাম আমরা।  
সেকালের মন ওদের, ওরা সব বুঝতে পারে না। তুমি  
যে সব আইডিয়া দাও, সে সব ওর ঠিক মাথায় ঢোকে না।

দেবু একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল।

নদীর ধারে মুখার্জীবাবুর মিলে—ঢং ঢং করিয়া আটটা  
বাজিল। সে উঠিল। প্রাইভেট টিউশনির সময় হইয়াছে।  
ঠিক প্রাইভেট টিউশনি নয়, কোচিং ক্লাস। স্টেশন-  
মাষ্টারদের ছেলেমেয়েদের লইয়া সকাল সন্ধ্যা কোচিং ক্লাস  
করে সে। দশ বারোটি ছেলে, ছেলে পিছু তিন টাকা  
মাইনা। পয়ত্রিশ চল্লিশ টাকা ওখানেই হয়। এ ছাড়া  
ধবরের কাগজ আছে, গৌর কাগজ বেচে, কমিশনের  
অর্ধেক সে পায়, অর্ধেক দেবুর, তাহাতেও দশ পনের  
টাকা পায়। স্বর্ণ মাইনে পায় তিরিশ টাকা। আশী  
টাকার বেশ চলিয়া যায় দুজনের। চাষের ধান চালাটা  
ইহার পরে।

—হালো কমরেড ডেবেনোভি!

দেবু দেখিল—উকীল সুরপতিবাবু বাইসিক্লে চড়িয়া  
পিছন হইতে আসিতেছেন। আগে সুরপতি দেবুকে  
অত্যন্ত অবজার চোখে দেখিতেন, বলিতেন—চাষ!

আজকাল দুটি খানিকটা পান্টাইয়াছে। এখন যাক

করিয়া বলেন—কমরেড। কখনও কমরেড গোতা, কখনও কমরেড ডেবেনোভস্কি, কখনও বলেন—এই যে ব্রাদার—এলোমেলো ক’রে দে-মা লুটেপুটে খাই।

কাজ হুরপতি নাই—সে দেবু জানে; শুধু ওই কমরেড ডেবেনোভস্কি বলিয়া ব্যঙ্গ করিবার জন্যই ডাকিয়াছে। দেবু কিরিয়া হাত তুলিয়া নমস্কার করিয়া হাসিল।

হুরপতি সাইক্ল হইতে নামিয়া বলিল—কি ব্যাপার ভাই দেবনাথ? তোমার সেই কারিগর ছোকরা দেবকী সেনের হাতে গিয়ে পড়ল কেমন ক’রে বল তো? আমার কাছে গিয়েছিল সেনকে নিয়ে—ট্রেনের ধারে ডিষ্ট্রিক্ট-বোর্ডের গাছতলায় দোকান করবে। আমি অবিশ্রিত তাকে জিজ্ঞাস্য করলাম না কিছু, তবে একটু আশ্চর্য হয়ে গেলাম। তোমার বাদ দিয়ে দেবকীকে নিয়ে এসেছে—ব্যাপার কি? হাটে টল করছিল—তোমাদের মহিলা-সমিতির ইলের সঙ্গে—হঠাৎ ঘুড়ির মত গৌতা খেয়ে লাইনের ওপার থেকে—এপারে এসে পড়ল ছোকরা!

দেবু হাসিয়া বলিল—কি জানি কি হ’ল! শুধু বললে—ছেলের হাত থেকে পুতুল কেড়ে নিলে পণ্ডিত—! সেটিমেটে লেগেছে আর কি!

হুরপতি বলিলেন—ঠিক করেছিলেন অরুণা ভট্টাচার্য। ওতে আমি তোমাদের সঙ্গে আছি। কখনো জমিদার-নন্দন প্রজার বুকের রক্ত-চোখা টাকার বিলেত থেকে ব্যাণ্ডিটার হয়ে এসে একেবারে লীডার সঙ্গে বসবার মতলব—ওদের আমিও একেবারে দেখতে পারি নে। আরে বাবা, পাড়ারগায়ের মহালে প্রজাদের সঙ্গে যা করিস তা’ করিস, জংসন দারমণ্ডলের মত একটা এতবড় জারগা—এখানে পর্যন্ত জমিদারী চাল চালতে যায়! জমিদার—বলে কি জান?—জমিদার বোঝ তো? জমিদার কাজ ব্যাণ্ডিটার—জমিদার! জমিদার সাহেব—সেদিন বলে—অরুণা ভট্টাচার্য চাকরী খেতে হবে—অর্ণের চাকরীও। শেষ বলে—ভায়রস অরুণা দেবীকে নাত-বউ স্বীকার ক’রে ওর বাড়ীতে যখন নিমন্ত্রণ নিলেন—তখন ঠেকে পণ্ডিত করা হোক! আমি তো হাসব—না—কাঁদব ভেবে পাই নে!

দেবু বলিল—জানি। তুনেছি সব।

—তুনেবে বই কি। তোমাদের স্পাইরিং সিষ্টেম—পুলিসের চেয়ে খারাপ নয়। হুরপতি হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। হঠাৎ হাসি থামাইয়া বলিলেন—অরুণা দেবীর রেজিগ্‌মেশন আমি এ্যাকসেন্ট করতে চাই নে। শুকে আমি লিখেছি—আপনি একবার অন্তত আনুন! চার্জ বুঝিয়ে দিতেও তো আসতে হবে। তখন আনুন—এলে সাক্ষাতে সমস্ত কথাবার্তা হবে। তারপর যা হয় করবেন। আজ চিঠি পেলাম—আসছেন তিনি। শীগ্‌গির আসবেন।

—আসছেন? লিখেছেন? দেবু চকিত হইয়া উঠিল।

—আজই সকালে চিঠি পেয়েছি। আজ্ঞা, চলি। হ্যাঁ, কথায় কথায় আসল কথাটা ভুলে গিয়েছি। হাটের তোলা নিয়ে আন্দোলনটা বন্ধ করছ কেন? খান চালের চলতা ঈশ্বরভক্তি—ও দুটো নিয়েও যা আরম্ভ করছ, এতে আমার সিম্প্যাথি আছে। ফুল সিম্প্যাথি।

হুরপতি চলিয়া গেল। বড় ভাল সাইক্ল চালান তত্ত্ব-লোক। ধীর গতিতে চলেন—বনিয়াদী চাল সাইক্লের গতির মধ্যেও ফুটিয়া উঠে।

ট্রেনের কাছাকাছি আসিয়া সে থমকিয়া দাঁড়াইল। সামনেই রেলওয়ে কম্পাউণ্ড, ডিষ্ট্রিক্ট-বোর্ডের রাস্তাটা আসিয়া রেলের ফটকের মুখে শেষ হইয়াছে। চারিপাশে অনেকটা খোলা জায়গায় খান দশেক মোটর বাস দাঁড়াইয়া আছে। খোলা জায়গাটার চারিপাশে বড় বড় গাছের শ্রেণী একটি ছায়ামণ্ডলের সৃষ্টি করিয়াছে। আগে গরুর গাড়ী ট্রেনে যাত্রী আনিয়া এই ছায়ার বিশ্রাম করিত। মোটর-বাসের চলন হওয়ার পর গরুর গাড়ীর সংখ্যা কমিয়া গিয়াছে। এখন এই সব গাছের তলায়—ছোট-খাটো দোকান বসিতেছে। পান-সিগারেট, চানাচুর, তেলে-ভাজা, গোটা কয়েক ছোট চায়ের দোকান—ভাঁড়-চা-বিক্রেতা, একটা গাছতলায় মাড়োয়ারী ব্যবসারীদের জলসজ—এই সব গইয়া বেশ একটি ছোট বাজার বসিয়াছে, এইখানেই সম্ভবত এই অশখ গাছটার তলায় নেলোর দোকান বসিবে।

বাসের ভিড়ের মধ্য হইতে একটা ছোকরা ছুটিয়া আসিল।—মাষ্টারজী!

ছেলেটা উচ্চৈঃস্বরে।

শিবকালীপুরের সদগোপদের একটি অনাথ ছেলে।  
। আর সে অনাথ নয়, নিজের তার সে নিজেরই  
। ছেলেবেলার অনাথ ছিল। বছর আঠেক  
দ—মা-বাপ দুইই মারা গিয়াছিল, ছেলেটা পথে  
খেলিয়া বেড়াইত—প্রতিবেশীর দাঁওয়ায় বা চণ্ডী-  
প—ঘুমাইত, লোকের বাড়ীতে মাগিয়া খাইত।  
কৃৎকারের সন্তানহীনা স্ত্রী—ছেলেটাকে কুড়াইয়া  
। মাহুত করিয়াছিল। কামার-বউ একদিন চলিয়া

দেবু দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল।

উচ্চিৎরে আসিয়া জংসনে আপনার স্থান করিয়া  
লইয়াছে। প্রথমে করিত ভিক্ষা। তারপর সে নিজের  
কাজ বাছিয়া লইয়াছে। বাসে আসিয়া কাজ লইয়াছে।

উচ্চিৎরে একখানা চিঠি দেবুর হাতে গুঁজিয়া দিয়া  
চলিয়া গেল।

উচ্চিৎরে দেবুর চোলা। দেবুর একটি চেলার দল আছে।

দল নষ্টিলে—পৃথিবীতে বাঁচিবার উপায় নাই। বিশেষ  
জংসনে। (ক্রমশঃ)



জালী বুঝকের পক্ষে জাতীয় বাহিনীতে যোগ দিবার সুবর্ণ  
যোগ উপস্থিত। ১৮ হইতে ৩০ বৎসরের বাহ্যবান বুঝক মহকুমা-  
সকের নিকট সত্বর আবেদন করুন। আশ্রয় তিন সপ্তাহ শিক্ষা  
ওলা হইবে; বাহারা উত্তীর্ণ হইবে, বিভিন্ন কার্যে নিযুক্ত হইতে  
পারিবে। বাঙ্গালী যুদ্ধ করিতে সুযোগ পায় না বলিয়া বাহারা  
তদন অসুযোগ করিতেন, আশা করি, সত্বর এই জাতীয় বাহিনীতে  
যোগ দিবার প্রেরণা দিবেন। দেশের ছেলেদের দেশরক্ষা কার্যে  
বিকালান্তের এ মহাসুযোগ কখনই ত্যাগ করা উচিত নয়। —পরীবাণী

\* \* \*

বর্ধমান জেলার নবপ্রতিষ্ঠিত বিরাট নগরী চিত্তরঞ্জন বাঙ্গালীর স্থান  
হই। অথচ বাঙ্গালীদের মধ্যে সহস্র সহস্র বেকার পথে ঘাটে ঘুরিয়া  
বড়াইতেছে। প্রাদেশিকতার চিত্তরঞ্জন বিবাক্ত হইয়া আছে। অবশ্য  
এখানে প্রাদেশিকতা করিতেছে মাজাজীরা। মাজাজী কেরাণী, মাজাজী  
ইন্সটিটুট, এমন কি মাজাজী পুল শিক্ষকও চিত্তরঞ্জন সমস্ত দিক দখল  
করিয়া আছে। উপরের কথা তো বলিতেই নাই। কেমিষ্ট নারায়ণ,  
এ. এ. ই. শাস্ত্রী-চার্জমেন সীতারমন, কুকসারী ও তত্ত্বজ্ঞাতা নারায়ণ  
সীতার, বীর রাঘবনের দৃষ্টান্ত এবং তাহাদের সম্বন্ধে অনুসন্ধান  
করিলেই সব বুঝা যাইবে। স্বজনপ্রীতি আত্মীয়পোষণ চিত্তরঞ্জনরও  
অতিক্রম্য কলম্বিত করিয়াছে। —দামোদর

\* \* \*

সাংবাদিক সম্মেলনে পশ্চিমবঙ্গের সম্পাদকগণের মুখপাত্র হিসাবে  
বাঁজালী পত্রিকা সম্পাদক শ্রীজগদীশচন্দ্র বোস তাঁহার ভাষণে

উত্তর রাষ্ট্রের মধ্যে মিলনের অন্তরায় কোথায় তাহা খোঁজাখুঁজিভাবে  
বিশ্লেষণ করিতে গিয়া বলেন, “পাকিস্তানের বিরুদ্ধে আমাদের প্রধান  
অভিযোগ এই যে উহার ভিত্তি ধর্মের উপরে। আমাদের শাসনতন্ত্র  
অনুযায়ী, আমাদের রাষ্ট্র ধর্মনিরপেক্ষ এবং শাসনতন্ত্রে সংখ্যালঘুদের  
অধিকার রক্ষার ব্যবস্থা রাখিয়াছে। ভারতের প্রধান মন্ত্রী যিনিই হউন  
না কেন, তাঁহার হাত শাসনতন্ত্র দ্বারা বাঁধা, কিন্তু চুঃখের বিষয়  
পাকিস্তানে সেরূপ কোনও ব্যবস্থা নাই। পাকিস্তানের প্রধান মন্ত্রী  
পাকিস্তানে হিন্দুদের রক্ষা করিবার আশ্বাস দিয়াছেন, কিন্তু এই  
প্রতিশ্রুতি মৌখিক! কাল হইতে জনাব লিয়াকত খান পাকিস্তানের  
প্রধান মন্ত্রী বা জনাব মুহম্মদ আমিন পূর্ববঙ্গের মুখ্য মন্ত্রী না থাকিতে  
পারেন। তাহাদের স্থলাভিষিক্তগণ শাসনতন্ত্রগত কোন বাধ্যবাধকতা  
না থাকায় এই প্রতিশ্রুতি নাও মানিতে পারেন।” সম্পাদক সম্মেলনে  
ঐহুত যোগ পরিচরভাবে ভারতের দাবী পেশ করিয়াছেন। আমরাও  
বরাবর পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় আদর্শকে ধর্মনিরপেক্ষ বলিয়া ঘোষণা  
করিতে দাবী জানাইয়া আসিতেছি। পাকিস্তান গণপরিষদ এখনও  
শেষ হয় নাই। পাকিস্তান ইচ্ছা করিলে আজই তাহা করিতে পারেন।

—দামোদর

\* \* \*

বাঙ্গালী ধনী জমিদার আজ সর্বস্বভাষা হইয়া পশ্চিমবঙ্গে অবস্থান  
করে। এক মুঠা নামজাদা ডাক্তার ও ব্যারিষ্টার, উকিল লইয়া  
বাঙ্গালী জাতি নহে। যে দেশে শতকরা ৮৮ জন নিরক্ষর গ্রন্থিক ও  
নারী, সেই দেশকে বাঁচাইতে হইলে, এই মুক বুণ যে তাহা দিতে

হইবে শুধু তাহা অক্ষর পরিচয় নহে। আমাদের ঘরে ঘরে ঈশ্বর বিশ্বাসের উপাসনা-মন্ত্র উচ্চারণ করিতে হইবে। আত্ম মুক্তির পথ-ত্যাগের ব্যবস্থা বাহাতে হয়, সেই বিবেচনা মনে দিতে হইবে। সমষ্টিচৈতন্যকে আগাইবার জন্য আমাদের সমাজে সুনীতি প্রবর্তন করিতে হইবে। আমাদের ব্যক্তিগত সমষ্টিগঠনে তিরদিন অনুব্রূত, তাই আমাদের দেশের ৫০টা ব্যাক্ত অকৃতকার্য হইয়া মাথা শুষ্কিল। যৌথ কারবার গড়িয়া উঠার প্রতীপশিখা আলোহিতে পিরাও বাঙ্গালী জাতি অকৃতার্থ হইল। ধনসম্পদে, সমাজে, রাষ্ট্রে সমষ্টিগত বিনিয়োগ করার ক্ষমতা আমরা জাতির প্রাণশক্তির মূলে ঈশ্বরবিশ্বাসের দীপশিখাই উজ্জ্বল করিতে বলি। ব্যক্তির ধনদৌলত, বাড়ী-ঘর কিছুই ছাড়। হইবে না, সমষ্টিগত প্রাণ চাই। সেই সমষ্টির মূলে ঈশ্বরচৈতন্য যদি জাগ্রত না হয়, আমরা যে দল গড়িব—সে দল স্বার্থ-কলুষিত হইয়া হিরমন্তার স্তার আপনার কঠিনালী ছিন্ন করিয়া আপনারই রক্ত পান করিবে।

—নবসংঘ

পূর্ববঙ্গ হইতে আগত উষান্তরা মজা পাইয়া বসিয়াছে। বাহার বেখানে খুশী খালি বাড়ী দেখিলেই ঢুকিয়া পড়িতেছিল এবং খালি জরি পাইলেই খুঁটি গাড়িতেছিল। সরকারী কর্মচারীরা এতদিন শুধু ইহাদের দৌড় কতদূর তাহাই দেখিতেছিলেন। ইহারা ভাবিয়াছিল এমনি করিয়াই বোধ হয় দিন চলিয়া যাইবে। কিন্তু পরে পিঠে বধন লাগি পড়িল এবং নাকে চোখে টিয়ার-গ্যাস ঢুকিল তখন নাকের জলে চোখের জলে এক হইয়া আইনের মধ্যমা কি উপলব্ধি করিতে পারিল। এই সামান্য কথাটা তাহার বুদ্ধিতে পারে নাই যে তাহাদের অদৃষ্টে যদি স্থখশান্তি থাকিবে তাহা হইলে সাতপুরুষের ভিটা পরিত্যাগ করিতে হইবে কেন? আবার শুনিলাম ইহারা দল বাঁধিয়া বাংলার মুখ্যমন্ত্রী রায় মহাশয়ের নিকট কৈফিয়ৎ তলব করিতে গিয়াছিলেন। আশ্চর্য্য স্পর্শ! অন্তর্য্যাপ্ত করিব চোখও রাঙাইব? পুলিশ ইহাদের ক্ষমত করিয়া একটা কাজের মত কাজ করিয়াছে। —যুগবাণী

উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারী পাবলিক সার্ভিস কমিশন কর্তৃক নিযুক্ত করা নিষয়। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে এই নিয়ম পালন করা হইতেছে না। মন্ত্রীদের প্রিয় এবং অমুগ্ধহীত ব্যক্তিদের সরাসরি নিয়োগ করা হইয়া থাকে। সম্প্রতি শোনা যাইতেছে যে সেলস ট্যাক্স কমিশনার এবং আরও কোন কোন উচ্চপদস্থ কর্মচারী পাবলিক সার্ভিস কমিশনকে না জানাইয়া সেল ট্যাক্স কমিশনারকে খীর পদে পাকা করা হইয়াছে। এই নিয়মের ব্যতিক্রম কেন হইল পাবলিক সার্ভিস কমিশন গবর্নমেন্টের নিকট তাহা জানিতে চাহিয়া কোন জবাব পান নাই। ইহা সত্য কি না গবর্নমেন্ট তাহা জানাইবেন কি?

—যুগবাণী

ভারতের প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু প্রাক্তন মার্কিন প্রেসিডেন্ট হুভারের প্রস্তাবের প্রতিবাদ করিয়া বাহা বলিয়াছেন তাহা আজকের দিনে ভারতের মনোভাবকেই বিশ্লেষণ করিয়াছে। তিনি বলিয়াছেন, রাশিয়া ও অন্যান্য কমিউনিষ্ট দেশকে বাহ দিয়া জাতি সংঘকে নুতন করিয়া গঠন করার প্রস্তাব অবিজ্ঞোচিত ও অনিষ্টকর। যে উচ্চাকাঙ্ক্ষা লইয়া জাতিসংঘ গঠিত হইয়াছিল, তাহা অবশ্য পূর্ণ হয় নাই। কিন্তু একথাও সত্য যে, জাতি সংঘের শুধু অস্তিত্বের দরুণই আমরা বহু বিপদ হইতে রক্ষা পাইয়াছি।

জাতিসংঘ দ্বিধা-বিভক্ত হইলে পর বহু রাষ্ট্র এই দ্বিধা-বিভক্ত সংস্থার অঙ্গীভূত হইতে রাজী নাও হইতে পারে। ঘটনাবলীর চাপে অবশ্য নিজদেশের স্বার্থে এই সকল রাষ্ট্র কোন জোটের সহিত মিলিত হইতে সম্মত হইবে না। তাহারাতখন স্বতন্ত্র অস্তিত্ব রক্ষা করিয়া আত্মরক্ষার সেবা করিয়া যাইবে। জাতিসংঘের রূপ পরিবর্তনের চেষ্টা করা হইলে, তাহা স্বাধীন আরও শক্তিশালী সংস্থা গড়িয়া উঠিবে না।

—সৈনিক

বিহার প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সম্প্রতি অনুষ্ঠিত এক অধিবেশনে একটি প্রস্তাব গৃহীত হইতে দেখিয়া অত্যন্ত বিস্ময় বোধ করিতেছি। তাহার মুকৌশলে বিহারের অন্তর্গত বাঙ্গলাভাবাত্মী অকলসমুহের পশ্চিমবঙ্গে অন্তর্ভুক্তির যে বহুদিনের দাবী, তাহা চাপিয়া দিবার চেষ্টা করিয়াছেন। প্রস্তাবটির মর্ম্ম এই : পূর্ববঙ্গাগত শরণার্থীদের পুনর্বাসনে সাধ্যমত চেষ্টা করার জন্য কমিটি কংগ্রেস কর্মীগণের নিকট আবেদন করেন। কিন্তু এক শ্রেণীর দায়িত্বহীন লোক যে এই অবস্থার সুবাদে লইয়া বিহারের অংশবিশেষ বাঙ্গলার অঙ্গীভূত করার দাবী করিতেছে তাহার নিন্দা করিয়া বলা হয় যে, ইহাতে বিহারবাসীদের মনে তীব্র অসন্তোষ সৃষ্টি হইবে এবং শরণার্থীদের স্বার্থহানি হইবে।

পশ্চিমবঙ্গের অমুতুলে তাহার প্রাপ্য ভূমি ছাড়িয়া দিতে বিহারের অনিচ্ছার সংবাদ জানি। কিন্তু একটি প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি পশ্চিমবঙ্গের বহুকালের দাবীকে কিরূপে এই বলিয়া বর্ণনা করিতে পারেন যে, এক শ্রেণীর দায়িত্বহীন লোক এই অবস্থার সুবাদে লইতেছে, তাহা বুঝিতে পারি না। বিহার রাজ্যের কংগ্রেস ওখা সরকারের এই কুটকৌশল মনোভাব সত্যকে প্রত্যেক বাঙ্গালীরই ওয়াকিবহাল থাকা কর্তব্য।

—জনসেবক

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সদর দপ্তর রাইটাস বিভিন্ন সম্প্রতি ট্যাপিওকা হইতে প্রস্তুত নানা প্রকারের খাদ্যদ্রব্য পরীক্ষার পরিবেশন করা হইয়াছে। ট্যাপিওকা জিবাভূরের অধিবাসীদের একটি অন্ততম প্রধান খাদ্য। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কৃষিবিদ্যক গবেষক মিঃ শ্রেণেরী কণা প্রমুখ ১৯৪০ সালে বাংলাদেশের জুড়িকের কথা উল্লেখ করিয়া

লেন যে, সেই সময়ে ত্রিবাঙ্কুরেও দুর্ভিক্ষ ঘটে, কিন্তু ত্রিবাঙ্কুরের  
জার হাজার লোক এই ট্যাপিওকা আহার করিয়া প্রাণরক্ষা  
করেন। খাদ্য হিসাবে দেখা গিয়াছে ট্যাপিওকা আলুর অপেক্ষাও  
বেশি খাদ্যপ্রাণসমৃদ্ধ। বাংলাদেশে ইহার প্রচলন আজও না  
হইলেও খাদ্যমন্ত্রী শ্রীযুত সেন এই বলিয়া আশা প্রকাশ করেন যে  
একদিন না একদিন ইহা বাঙালীর প্রিয়খাদ্য হইয়া উঠিবে। খাদ্য  
সম্বন্ধে বাঙালীর অভ্যাস যেরূপ অদ্ভুত, তাহাতে এই আশা কোনদিন  
পূর্ণ হইবে কিনা বলিতে পারি না। অবশ্য উপায়াস্তর না দেখিয়া  
খাদ্যের ব্যাপারে অনেক কিছু অসুবিধাই বাঙালীকে সহ্য করিতে  
হইতেছে; কিন্তু তথাপি রন্ধনের প্রণালী পরিবর্তনের কোন লক্ষণ দেখা  
যায় নাই। বিশেষতঃ পশ্চিমবঙ্গ অধিবাসীদের এই জন্ত অনেক ক্ষতি  
হইতেছে। বহু রন্ধনীর উপকরণের মধ্যে ভেজাল আছে জানা সম্বন্ধেও  
মুখরোচক আখ্যায়িকার গৌণে আমরা পুরাতন রন্ধনের প্রণালী ত্যাগ  
করিতে প্রস্তুত নহি। এই রন্ধনের প্রণালী এবং বিশেষ বিশেষ  
অয়োজনীয় রন্ধন দ্রব্যের আসক্তি ধীরে ধীরে ত্যাগ করিতে না  
পারিলে আরো কতো দুর্ভোগ ভোগে আছে তাহা বলা শক্ত। —নির্মল

\* \* \*

বিভিন্ন প্রদেশের প্রধান মন্ত্রী ও কংগ্রেস প্রেসিডেন্টগণের দিল্লীতে  
অনুষ্ঠিত সাম্প্রতিক সম্মেলনে একটি স্বল্প-মেয়াদী অর্থ-নৈতিক কর্মসূচী  
গ্রহণ করে জনসাধারণের কর্ত্তে উৎসাহ বর্ধনের প্রস্তাব গৃহীত হয়।  
...কিন্তু এই প্রচেষ্টা আজও অসুচলিত হয় নাই।...সকলেই স্বীকার  
করছেন যে স্বাধীন ভারতের সরকার যে মানসিকতা পরিবর্তনের  
ফলে অর্থ-নৈতিক ও অস্ত্রাস্ত্র বিষয়ে প্রগতি অনিবার্য হ'য়ে ওঠে, সে  
সম্পর্কে ব্যবস্থা করতে পারেননি।...কার্য জনসাধারণের মধ্যে উত্তমের  
সঞ্চার সরকার করতে পারেননি।...সমাজবিরোধী কার্যকলাপ যথা  
চোরাবাজার, অস্ত্রের সুনাকা, ট্যাক্স কাঁকী, ভেজাল প্রভৃতি অপরাধ  
আইনের চক্ষে ধরা পড়ে না। উপরন্তু এই দুষ্কৃতকারীরা সরকারী  
উর্ভবন কর্ত্তাদের প্রভাবিত করে শাসন পরিচালনা বিঘ্নিত করে  
ছুলেছেন।...সাধারণ লোক মনে করে যে কতকগুলি ধনী ব্যক্তিরাই  
কার্যেবী কার্যের প্রয়োজনে শাসন ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণ করছে এবং প্রকৃত  
পক্ষে এটাকে জনসাধারণের সরকার বলা যায় না।...একজন প্রয়োজন  
ছিল এই সবে। বিরুদ্ধে কঠিন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করা, যাতে  
সাধারণের সঙ্গে সরকারের ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি পেতো। তারই অভাবের  
জটাই জনসাধারণের মধ্যে সরকারী প্রচেষ্টার উত্তমের সাড়া পাওয়া  
যায় না।...আমাদের বিশ্বাস এই সমাজ-বিরোধী দুষ্কৃতকারীদের বিরুদ্ধে  
অভিযান চালালে...অবিলম্বে জনসাধারণের উত্তমের বন্ধন খুলে যাবে।

—হিন্দুস্থান ট্যাগার্ড

\* \* \*

বর্ত্তমান জেলায় পাঁচটি টেলিফোন এক্সচেঞ্জ হইয়াছে বটে, কিন্তু  
একটি এক্সচেঞ্জ হইতে অন্য এক্সচেঞ্জে কথা বলিতে গেলে ট্রান্সকল

চার্জ করা হয় প্রতি তিন মিনিটে এক টাকা আট আনা। এখন  
হইতে কলিকাতা ও সহরতলীতে টেলিফোন করিতে গেলেও তিন  
মিনিটে ঐ বেড় টাকাই চার্জ দিতে হয়। কিন্তু বর্ত্তমান হইতে যেসকল  
টেলিফোন করিতে গেলে প্রতিদিন মিনিটে লোক্যাল চার্জ হিসাবে  
লাগে হয় আনা মাত্র। এক জেলার বাস করিয়া জেলাস্থিত বিভিন্ন  
এক্সচেঞ্জে যদি কলিকাতার স্তার সম হারে কোন-সেলারী দিতে হয়,  
তাহা একান্ত পরিতাপের বিষয়। আমরা বর্ত্তমান জেলাস্থিত সমস্ত  
এক্সচেঞ্জগুলিতে পরস্পর কথা আদান প্রদানের সুযোগের জন্ত একটা  
স্বাভাৱিক পরিমাণ লোক্যাল চার্জ ধার্য করিয়া ট্রান্সকলের দায় হইতে  
অব্যাহতি দিবার জন্ত অনুরোধ করি। —দামোদর

\* \* \*

অনেকেরই ধারণা আছে যে ভারতের আদর্শবাহী কংগ্রেসী প্রধান-  
মন্ত্রী পণ্ডিত নেহরু স্যাকমার্কেটের উপর নিত্যন্তই খড়গহস্ত। তাহাদের  
অবগতির জন্ত জানাইতেছি যে পণ্ডিতজী বার বার এই প্রসঙ্গ মিত্রত  
হইয়া নিজেই ইহার ভীতি প্রতিবাদ করিয়াছেন। ধানবাং তিন  
বলিয়াছেন যে স্যাকমার্কেটসহকারীদের কাঁসি দিবেন একথা তিনি কোনদিন  
বলেন নাই, তবে ১৯৪৩ সালের বাঙ্গলার দুর্ভিক্ষের সময় বাহারা  
চাউলের স্যাকমার্কেট করিয়াছিল তাহাদের কাঁসি হওয়া উচিত ইহাই  
তিনি বলিয়াছিলেন। বড়লোকের নামে দুষ্টলোকে বা তা'র টাকার, ইহা  
সকলেই জানে। কিন্তু এরূপ ভাবে মিথ্যা কথা রটাইয়া বাহারা  
কংগ্রেসের বিশিষ্ট মুকব্বীদের সঙ্গে পণ্ডিতজীর বিরোধ ঘটাইবার চেষ্টা  
করিতেছেন তাহারা নিতান্ত পান্ড এবং দেশত্রোহী সন্দেহ নাই।

—সুগন্ধা

\* \* \*

দামোদর পরিকল্পনার স্তায়ই ময়ূরাক্ষী পরিকল্পনা আর একটি  
গুরুত্বপূর্ণ পরিকল্পনা। এই পরিকল্পনা সম্পূর্ণভাবে কার্যকরী হইলে  
পশ্চিমবঙ্গের বীরভূম, মুর্শিদাবাদ এবং বর্ত্তমান জেলায় ১৮ লক্ষ বিঘা  
জমিতে জল সেচের সুব্যবস্থা হইবে এবং ৮১ লক্ষ মণ ধান ও ৪৩ লক্ষ  
৫০ হাজার মণ রবিশস্ত উৎপন্ন হইবে। অসুমান, এতদৃশ্যের কৃষি  
সম্পদ শতকরা একশত ত্ত্ব বৃদ্ধি পাইবে। ময়ূরাক্ষীর বাঁধ নির্মাণ  
কার্য অ্রতগতিতে অগ্রসর হইতেছে। বীরভূমের সিউড়ী শহরের  
দুই মাইল দূরে ১০৩ ফুট দীর্ঘ তিলপাড়া বাঁধ আর সম্পূর্ণ  
হইয়া আসিল। আশা করা যায়, ১৯৫১ সালে বর্ষা সমাগমের পূর্বেই  
উহা সমাপ্ত হইবে এবং ৩ লক্ষ বিঘা জমি জল সেচের আওতার  
আনা সম্ভব হইবে। এ পর্য্যন্ত আনুমানিক দুই কোটি টাকা  
ব্যয়িত হইয়াছে। —জনসেবক

\* \* \*

ভারতসরকারের আইন সচিব ডাঃ বি. আর. আবেদকর ও তাহার  
পত্নী সন্ন্যাসিনী বৌদ্ধবিহারে অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানের মধ্যে বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ  
করিয়াছেন। ডাঃ আবেদকর তপস্বীল জৈগীতুত হিন্দু সেতা। তিনি

হই বৎসর পূর্বে এক ব্রাহ্মণ মহিলাকে বিবাহ করেন। ভাষ্যভাষ্যের সামাজিক ও রাজনৈতিক অধিকার লাভের জন্য তাঁহার বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন প্রচেষ্টার জন্য তাঁহার ব্যক্তি ও শাসনভিত্তিক আইনে তাঁহার গভীর পাণ্ডিত্যের জন্য তিনি ভারতে এক বিশেষ স্থান অধিকার করিয়া আছেন। বিশেষতঃ তিনি ভারতের বর্তমান শাসনভিত্তিকের অন্ততম প্রধান রচয়িতারূপে চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবেন। বর্তমানে তিনি মনে করেন যে একমাত্র বুদ্ধের শিক্ষাই পৃথিবীর শান্তি আনিতে সমর্থ।

—অজয়

কিরোধে বিধাবিভক্ত হইয়া পড়িল। শুধু তাই না, বেথা গেলো, আড়ালে আড়ালে হই তরকই ব্যাপক রূপ-প্রভতির উত্তোষ আরোহণ আর শেষ করিয়া ফেলিয়াছে। আরো লক্ষ্য করা বাইতেছে, যে জিয়ার “বিপন্ন ইসলাম” ধর্মের মতো এই সকল অকলে পাশ্চাত্য গণতন্ত্রগুলিও একটা “বিপন্ন-ইউরোপীয় উদার নীতি”র ধূম তুলিতেছেন। শুধু ধূম তুলিয়াই তাঁহার চুপ করিয়া রহিলেন না, বল ভারী করিবার বিবিধ চেষ্টা ঐ সঙ্গে করিতে লাগিলেন।

অসুস্থান করা বাইতেছে, এই প্রাথমিক উত্তোষ পর্বের আড়ালে একটা বৃহৎ সম্ভাবনা আসিল।

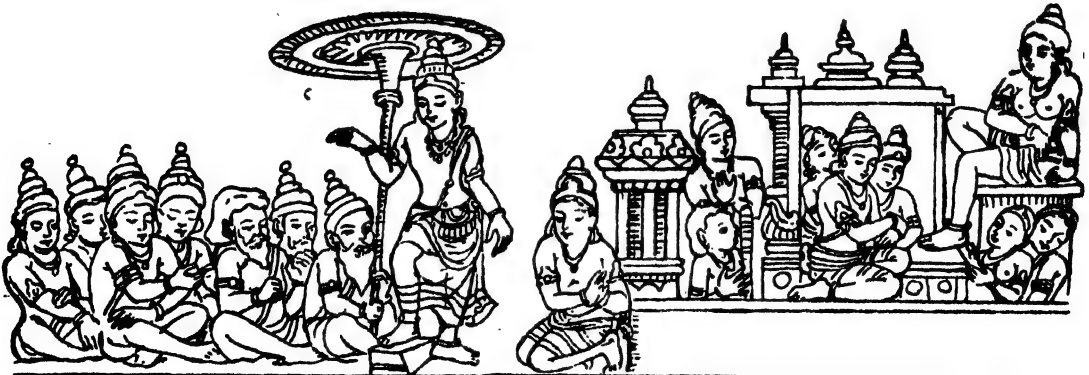
—সৈমিক

দ্বিতীয় মহাবুদ্ধ শেষ হইয়া গেলো—আরও একটি যে বুদ্ধ পৃথিবীর অন্তরালে আত্মগোপন করিয়া আছে ইহা আমরা সকলেই জানি। আর জানি, সেই মহাবুদ্ধে আগতের যে-সকলও ভাঙিয়া গিয়াছে তাহা জোড়া না-লাগা পর্বত সেই ভয়াবহ বুদ্ধ কোনোদিনই সম্ভব হইবে না। কিন্তু স্মরণে লক্ষ্য করিতেছি, পূর্বের ভাঙা-হাড় জোড়া না লাগিতেই বুদ্ধের জন্য আমরা সকলেই গোপনে প্রস্তুত হইয়া রহিয়াছি। এই গোপন-প্রস্তুতির অন্তরালে আর বাহাই থাকুক, শান্তি যে কেহই চাহিতেছে না ইহা স্পষ্ট। অথবা শান্তির জন্যই আর একটি দাক্ষিণ্য অশান্তিকে আহ্বান করিয়া আনিতেছে। কিন্তু সেই দাক্ষিণ্যে শান্তি আনিয়া আগতের কি কল্যাণ সাধিত হইবে আমরা বলিতে পারি না।

দ্বিতীয় মহাবুদ্ধে ক্যাসিট শক্তিধর—জার্মানী, ইতালী ও জাপান, ইংরেজ, ফরাসী, রুশ ও মার্কিন শক্তিপুঞ্জের উপর যে আঘাত হানিয়াছিল, তাহাতে এই চতুর্ভুজ এক সঙ্গে মিলিত হইয়াছিলেন ক্যাসিট শক্তি ধ্বংস করিবার জন্য। কিন্তু ধ্বংস-কার্য শেষ হইলে দেখা গেলো, তাহার আর এক লক্ষ্য হাত ধরাধরি করিয়া অগ্রসর হইতে পারিলেন না। ‘এ অবস্থায় পশ্চিম শক্তিধর নিহক আত্ম-স্বার্থ রক্ষার তাগিদেই মোট বাধিলেন এবং উত্তর অত্যাধিক চুক্তি হইতে হুক করিয়া কলম্বো ও সিডনির কমনওয়েলথ সম্মেলন পর্যন্ত যতকিছু উত্তোষ আরোহণ হইয়াছে, তাহার মাধ্যমে নিজ নিজ অধিকার রক্ষার জন্য কোষর বাধিলেন—এইভাবেই বুদ্ধোত্তর পৃথিবী অনিবার্য আঘর্ষ-

ভারতবর্ষ হইতে বৎসর বৎসর যে কোটি টাকা মূল্যের চা বিশেষে রপ্তানী হয় তাহার কারবার বেতনদের একাটরা। এই অনভিজ্ঞত অবস্থার পরিবর্তনের অন্ততম উদ্দেশ্য হইয়া ভারত সরকার কিছুদিন পূর্বে ইতিহাস টি মার্কেট এরূপেপনমন বোর্ডের স্থলে কেন্দ্রীয় চা বোর্ড নামে একটি প্রতিষ্ঠান গঠন করেন এবং মিঃ এম কে সিংহ উহার সভাপতি নির্বাচিত হন। সম্ভ্রান্তি মিঃ সিংহ দ্রুত লগ্ন্যতে তাঁহার স্থলে জেমস ফিল্ডে এও কোম্পানীর মিঃ বেলকে উক্ত পদে নিযুক্ত করা হইয়াছে। এই পদে নিযুক্ত করিবার মত একাধিক বোয়া ভারতবাসী ধাকা সম্বন্ধে একজন বেতনকে কেন এই পদে নিযুক্ত করা হইল তাহাতে অনেকেই বিস্মিত হইয়াছেন। আলোচ্য বোর্ড প্রতিষ্ঠিত হইবার পর হইতে ভারতবাসী বাহাতে চায়ের রপ্তানী ব্যবসারে একেধা করিতে না পারে তৎক্ষণ ইউরোপীয় চা ব্যবসায়ীগণ উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন। এরূপ অবস্থায় বোর্ডের সভাপতির দ্বারা দায়িত্বপূর্ণ পদে উক্ত ইউরোপীয় চা ব্যবসায়ীদেরই একজন প্রতিদ্বন্দ্বিতাকে নিয়োগ করার ফলে ভারতীয় চা ব্যবসায়ীদের বার্ষিক সমুদ্র ক্ষতি হইবে বলিয়াই আশঙ্কা হইতেছে। এই কারণে উক্ত নিয়োগ সম্বন্ধে পুনর্নিবেশনা করিবার জন্য ভারত সরকারকে আমরা অনুরোধ জ্ঞাপন করিতেছি।

—আর্থিক জগৎ





# চেষ্টা

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়



—এগারো—

রশমির কুটির শ্রীহীন কম্পাউণ্ডটার মাঝখানে দার্শনিকের ভাষা নিরাসক্ত হয়ে পাড়িয়ে ছিল জু সাহেব।

দুটিটা আকাশের দিকে। একটা বিশাল কালো দৃশ্যের কয়েকটা ছিন্নবিচ্ছিন্ন খণ্ডের মতো ভেসে বেড়াচ্ছে হালো মেঘের টুকরো। রক্তমাখানো ছোটো ঠোঁটের কানেক্টরকে যেন এক ঝলক তীক্ষ্ণ হাসির আভাস জাগিয়ে ললে যাচ্ছে বিদ্যুৎ। আজ হোক কাল হোক—লাল-পাটির রাঙা ধুলোয় তাওব তুলে ছুটে আসবে ঝড়, ভেঙে ডাবে রূপোর তীরের মতো ধরধার বৃষ্টি।

উগ্র সূর্যকিরণের আলায় কঠিন পোড়া মাটি এলিয়ে গাছে একখানা বিশাল পাথরের মতো—যেন বলির রক্তের ঝুঁ মাখা। বর্ষার জল পড়লে একরাশ ঘন রক্তচন্দনের মতো কোমল হয়ে যাবে—তৃণাঙ্গুর মাখা কুলবে এখানে। শুকিয়ে আসা কিলগুলো ভরে যাবে ঘোলা জলে তার গাঢ় সবুজ উজ্জল পদ্মপাতায়।

এখনো যেন পোড়া মাটি থেকে কী একটা উঠছে পানিক তপ্ত দীর্ঘশ্বাসের মতো। শুকনো কলাপাতার মতো রা ঘাসের রঙ। জলহীন খানা ডোবার কাটলে কাটলে। একরাশ শুটুকি মাছের মতো কুণ্ডলি পাকিয়ে ঘুরিয়ে গাছে জীওল মাছের কঁাক। তিন হাত মাটির নিচে শক্ত ধালার ভেতরে পা-মুখ গুটিয়ে নিয়ে বোগমগ্ন আছে হুঁসের লল—সাঁওতালোরা এখনো ওদের সন্ধান পাবে না।

কিন্তু ক'বে আসবে বৃষ্টি?

একটা অক্লান্ত চোখ মেলে তাকিয়ে রইল জু সাহেব। ঈগ-বিগতব্যাপী মাঠজুড়ে ছুটে আসবে মহানন্দা—পুনর্ভবা গাঝাইয়ের জল, দাম ঘাসের শীরকে বারো হাত লম্বা করে ঈয়ে সমুদ্রের ডেউ খেলাবে সীমাহীন ‘চাকালে চাকালে’? তার চাকাল থেকে সেই জল বয়ে আসবে এই শুকনো মাছের সংকীর্ণ খাত দিয়ে—বয়ে নিয়ে যাবে, তাসিয়ে

নিয়ে যাবে মাটির তলায় সম্বর্পণে পুঁতে রাখা বাদামী রঙের সেই হাড়গুলি?

খুন। সে খুন করেছে।

নিজের হাত ছোটো চোখের সামনে বাড়িয়ে ধরল জু সাহেব। ‘যেন মণিবন্ধের হাড়ছটো তার ভেঙে ভেঙে গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে গেছে, তাই আঙুলগুলো অসহায় ভাবে কাঁপছে ধর ধর করে। তাদের ওপর কোনো কর্তৃত্ব নেই তার। দিনের পর দিন—বহরের পর বছরগুলি মনের বে অন্ধকার সংকীর্ণতায় স্তরে স্তরে মাকড়শার জাল বুনেছিল—জটীল সিংয়ের খুন সেই জালটাকে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে দিয়েছে।

তখনো মার্খা আসেনি জীবনে। তখনো আরম্ভ হয়নি এমন একটা শাস্ত-নিরীহ অহিংস অধ্যায়। পার্শ্বাত্ম্যাল ক্যারর উদ্দাম রক্ত ধমনীতে ধমনীতে মাডলালি করে কিরছে। কালো মায়ের তপ্ত কামনার সঙ্গে বাপের মত্ত লালসার প্রেরণায় সেদিন—

একটার পর একটা উল্কা ঝরে পড়া সেন্টেমেন্টের রাঙে—চামড়ার মতো পুরু নীরেট অন্ধকারে—হাওয়ার শিশিরানি লাগা ঘন বেনাবনের মধ্যে। বায় কয়েক দশ দশ করে অস্বাভাবিক দ্রুত গতিতে বেজে উঠেই—হঠাৎ একটা ফুটবল-ব্রাডারের মতো চূপসে নেমে গিয়েছিল হুংগিগুটা। হাতের তলায় সেটা স্পষ্ট টের পেয়েছিল শ্বাইদ ক্যার। টের পেয়েছিল কেমন করে শরীরের উত্তাপ নিবে গিয়ে তা ক্রমশ শীতল আর আড়ষ্ট হয়ে আসতে থাকে।

—হালো শ্বাইদ!

কোথার যেন বিস্ফোরণ ঘটল ডিনামাইটে। ছেঁড়া ছেঁড়া মেঘের কোলে বিদ্যুতের রক্তমাখা ঠোঁট থেকে যেন বেরিয়ে এল বজ্রের জ্বল্ গর্জন। অন্তলবাহী কোনো লাভাঘোড়ের উৎকেপে যেন দোলা খেয়ে উঠল পারের তলার মাটিটা।

—হালো আইদ!

ভগবানের জ্বল হতে পারে, শয়তানের জ্বল হওয়াও সম্ভব, কিন্তু অ্যালবার্টের নয়। ভিতরের কোনো পাহাড়ী গুহায় গিয়ে লুকিয়ে থাকলেও সে ঠিক আবিষ্কার করে ফেলত। প্রাণান্ত মহাশয়গরে ডুব দিয়ে থাকলেও ডুবুরী হয়ে ঠিক ধরে ফেলত অ্যালবার্ট।

কোড়ার মধ্যে ছুরি বসিয়ে ডাক্তার কুগীকে হাসতে বললে কেমন দেখায়, সেটা অভিব্যক্ত হল জু সাহেবের মুখে। একটা প্রাণান্তিক মোহিনী হাসি হেসে বললে, হালো অ্যালবার্ট।

—অনেক খুঁজে আসতে হল—পিঠের ওপর একজোড়া বন্ধুকের তারে কঁকো হয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে অ্যালবার্ট বললে, সে স্নানমতো অ্যাডভেঞ্চার—একেবারে মনোপার্কের মতো।

—মনোপার্কের পরিণামটা তোমারও ঘটলে আমি বেঁচে যেতাম—মনে মনে দাঁত খিঁচিয়ে বললেও বাইরে দোঁতো হাসিটা বজায় রাখতেই হল ক্যারকে : কিন্তু আজকে তো তোমার—

—না, আমার আসবার প্ল্যান ছিল আগামী কাল সকালে। কিন্তু শিকারের লোভে মনটা এমন ছটফট করছিল যে একটা দিনও আর দেরী করতে ইচ্ছে করল না। তা ছাড়া ভাবলাম, তোমাকে একটা সারপ্রাইজও দেব, তাই—

—কিন্তু তোমার তো খুব কষ্ট হল। যদি কাল সকালের ট্রেনে আসতে তা হলে এসব ঠাঁবল হত না—এতকণে একটা আশুত আশ্রয়ভাষ্যের স্বর ফুটল ক্যারর গলায়। সত্যিই তো, কালকের ট্রেনে যদি অ্যালবার্ট আসত, তা হলে কী হত কে বলতে পারে? কে বলতে পারে একখানা গাড়ি নিয়ে সে স্টেশনে যেত না, একটা রাজকীয় আরোহণের মধ্য দিয়ে অভ্যর্থনা করে আনত না অ্যালবার্টকে। একটা রাজি—একটা সম্পূর্ণ রাজি ছিল তার হাতে। সে রাজিটিতে কী হতে পারত আর কী যে হতে পারত না—তা তো অ্যালবার্টের জানার কথা নয়।

—একটা সম্পূর্ণ অ্যাডভেঞ্চার তো হল না!—কাঁধের ওপর ছোটো বন্ধুকের তার বয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে অ্যালবার্ট ডাকালো নিজের ঈউজারের দিকে। পা থেকে তল করে

কোমর পর্যন্ত লাল-কালো কাঁদার একাকার। চকচকে জুতো জোড়ার আভিভ্যক্ত একরাশ কাঁদার প্রলেপে চাপা পড়ে গেছে। নিরানন্দটা কল্প চোখে লক্ষ্য করে অ্যালবার্ট বললে, ঠাঁবলও অবশ্য দিয়েছে কিছু কিছু।

—তাই তো, ছিঃ ছিঃ—সখেদে জানালো জু সাহেব কিন্তু মনের মধ্যে যেন একটা হিংস উল্লাস সাড়া দিয়ে বললে, বেশ হয়েছে, বেশ হয়েছে। যেমন অকারণে ভুতের মতো পরের ঘাড়ে এসে চেপে বসতে চাও, উপযুক্ত একটা শিক্ষা হয়েছে তার। শুধু কাদা কেন, কাঁদড়ের ভেতর তুমি ঠ্যাং ভেঙে পড়ে থাকলেই আমি সত্যিকারের খুশি হতাম।

পাকা বারো মাইল পথ ঠেঁদিয়ে এখন অ্যালবার্টের প্রায় নাতিশাস। শুধু কাঁধের ওপর ছোটো বন্ধুক ঝুলছে তাই নয়—হাতে একটা আধমণী স্ট্রুকেস। ক্যারর প্র্যাটেশনের স্বপ্ন স্বর্গে আসবার খেসারত ইতিমধ্যেই অনেকখানি দিতে হয়েছে অ্যালবার্টকে। মাঠে গোক ছেড়ে দিয়ে যুগ্মবার আশায় গল্পের যে লোকটি খাটিয়া সঙ্গে করে নিয়ে গিয়েছিল এবং তারপর সারা ছপূর বাকে সেই খাটিয়া পিঠে বেঁধে মাঠঘাট বন-বাদাড় ছুটতে হয়েছিল গোকর পিছে পিছে—অ্যালবার্টের এখন সেই দশা।

নিরুপায় হয়ে শেষ পর্যন্ত বলেই ফেলল।

—কি হে আইদ, এখন কি এখানে ঠার দাঁড় করিয়ে রেখে রসালোপ করবে, না তোমার বাড়িতে নিয়ে গিয়ে একটু বসতে দেবে?

—ওহো—সো সরি!—চোখ কান হুঁজে হেডিস্ কিংবা লিথোতে ঝাঁপ দিয়ে পড়বার মতো জু সাহেব বললে, এসো, এসো। ওই আমার কুঠি।

কুঠি নয়—আফ্রিকার জঙ্গল। কালো জানোয়ারের মতো খাবা পেতে বসে আছে মাঝা কাক। ও ক্রাইস্ট—ও হোলি শেফার্ড, এই মহা-সংকটে নিরীহ মেঘশাবক জু সাহেবকে রক্ষা করো প্রভু! ইহদীনের অমন জুসের বয়না সইতে পেরেছ, আর মাঝারী দাঁতের ধার একটু লম্ব করতে পারবে না? হে মানবপুত্র, ইচ্ছা করলে তুমি সব পারো।

ধরা ইচ্ছাকে নিয়ে বেঞ্চাল যেমন কিছুকণ নিরুপায় চিত্তে খেলা করতে থাকে, তেমনি নিম্পূর্ণ ভবিষ্যৎ, লক্ষ্য



নাস্তরিকতার অ্যালবার্টকে আহ্বান এবং বাগত জানালো মার্খা।

পাছে অ্যালবার্ট আসবার সঙ্গে সঙ্গেই মার্খা তার নাস্তরিক গলা-বাজানো শুরু করে, এই ভয়ে আগে থেকেই 'সিয়ার হতে চাইল জু সাহেব। বেশ শক্ত করে, রাতিঘাট বেঁধে।

—খুব বড় ঘরের ছেলে অ্যালবার্ট।

মার্খা সংক্ষেপে বললে, হঁ।

—ওর এক পিসেমশাই লর্ড। লর্ড অফ—লর্ড অফ—সাহাব্যের আশায় আইন্স এবার কাতর দৃষ্টিতে তাকালো অ্যালবার্টের দিকে।

অ্যালবার্ট তখন খুঁকে পড়ে গভীর মনোযোগের সঙ্গে দর্শনজ্ঞ জুতোটার ফিতে খুলছিল। মাথা না তুলেই জু সাহেবের অসমাপ্ত কথাটা শেষ করে দিলে: লর্ড অফ ব্রটনক্রকশায়ার, নর্থ এঞ্জিটার।

ব্রটনক্রকশায়ার—নর্থ এঞ্জিটার! গালভারী শব্দটো বোমার আওয়াজের মতো জু সাহেবের নিজের মনেই শোনালো। এই ছোটো প্রচণ্ড ভয়ঙ্কর নামের কী তিক্তিক্রিয়া মার্খার ওপরে ঘটে, সেটা লক্ষ্য করবার জন্তু সাহেব তাক চোখে তাকিয়ে রইল জীর দিকে।

না, লক্ষ্য একেবারে ব্যর্থ হয়নি। বেশ কিছুক্ষণ ধরে কটা সজ্জক বিষয়ের চমক লেগে রইল মার্খার মুখে চোখে। গান্ডার্স গ্রীনে কোনো এক 'ক্যাকজ'-এর অবাস্তব একটা রমূতি নয়; অ্যালবার্টের মধ্যে সার আছে, ভার আছে। সার টাই-পিন, জামা আর হাতের বোতাম খাঁটি সোনার। হাতের কড়ে আঙুলের আংটিটায় সবুজাভ একটুকরো খের ঝলমল করছে—হীরে হওয়াই সম্ভব। শূলা-কাদায় খা বেশ-বাসে স্পষ্ট স্বচ্ছলতার ছাপ। আপাতত পুরু কটা কাদার প্রলেপের নিচে ঢাকা পড়লেও জুতোজোড়া খাঁটি পেটেন্ট লোহারের তাতে সন্দেহ নেই।

নেয়েদের জয়গত তীক্ষ্ণ পর্ববেষ্ণনশক্তির সাহায্যে নিট তিনেকের মধ্যে এতগুলো জিনিস আবিষ্কার করল মার্খা। আরো আবিষ্কার করল—অ্যালবার্টের চুলের রঙ সোনালি, গায়ের বর্ণ তুব্বার শুভ্র, মার্খার হাতের 'ক্যাটস ই' পাখরটার মতো কপিল চোখের তারা।

আর পাশাপাশি ক্যাক? কালো মায়ের কালো

ছেলে; পার্শ্বেভালের এতটুকু চিহ্ন কোনোখানে খুঁজে পাওয়ার জো নেই।

একচোখে বিরাগ আর একচোখে বিষম্ব বিষম্ব দুটিয়ে মার্খা বললে, হাতমুখ ধুয়ে তাজা হয়ে নিন মিস্টার ফিলিপসন—আমার চা এখনি তৈরী হয়ে যাবে।

জুতোটার তদ্বাবধান করতে করতে মাথা না তুলেই অ্যালবার্ট বললে, অনেক ধন্যবাদ।

লর্ড অফ ব্রটনক্রকশায়ার, নর্থ এঞ্জিটার—শব্দ দুটোকে কানের মধ্যে ভরে নিয়ে চায়ের সন্ধানে চলে গেল মার্খা।

শুধু জু সাহেব দাঁড়িয়ে রইল নিস্তব্ধ হয়ে। এখনো সামলে নেয়নি অ্যালবার্ট, এখনো ঠিক ধাতুস্থ হয়ে ওঠেনি। কিন্তু একটু পরে? মিথ্যার বালির বাঁধটা ধবসে একাকার হয়ে গেছে। কোন্ অলৌকিক উপায়ে এখন অ্যালবার্টকে দেখানো যাবে সারি সারি ফলস্ত আধরোটের বন, টলটলে নীল জলের নদীতে কার্পের কাঁক, ছবির মতো পামগাছের সারি! কোন্ ইল্লজাল দিয়ে সৃষ্টি করা যাবে পার্শ্বেভালের সেই জম্জমাট রেশমের কুঠি—একখানা নয়, দু-তুখানা মোটর গাড়ি?

জু সাহেবের কপালে ঘামের ফোঁটা জমতে লাগল।

জুতোটাকে ছুঁড়ে ফেলে অ্যালবার্ট ক্রান্তভাবে শরীরটা মেলে দিলে।

—আঃ!

জু সাহেব অপেক্ষা করতে লাগল বলির পত্তর মতো।

—কী বিল্লী কাদা এদিককার। উঠতে চায় না কিছুতেই।

—হাঁ, এঁটেল মাটি।—সত্যয়ে জবাব দিলে জু সাহেব। যেন মাটিটা তারই হাতে তৈরী—সেই অপরাধে কৈফিয়ৎ দিচ্ছে একটা।

—পথে থানা-খন্দলও খুব।

—বর্ষায় জল আসে।—ফিস্‌ফিসে গলায় জু সাহেব জানাল।

—বোসো না, দাঁড়িয়ে আছো কেন?—সহজ অন্তরঙ্গতার অ্যালবার্ট বললে।

বসতে ভয় করে। কেমন শক্তিশাল হয়ে পড়বে, ইচ্ছে করলেই উঠে পালাতে পারবে না। শুবু বসতেই হল।

ারে কোথাও একবিন্দু জোর নেই। যেন সাতদিন  
লেরিয়ার ভূগে এই মাত্র উঠে দাঁড়িয়েছে।

যে ঘরটার ছুজনে বসেছে—এটাই জু সাহেবের ড্রয়িং  
।। পার্সিভালের আমলে ঝলমল করত স্ত্রী-সমৃদ্ধিতে;  
জ্বতে ছিল দুইকি পুরু রং-বেরঙের ছবি আঁকা কাশ্মীরী  
পেঁট; ছিল সোকা সেটি, গদী মোড়া চণ্ডা চণ্ডা  
ভের চেয়ার। এখন সে কাশ্মীরী কার্পেট কুঠিবাড়ির  
গানো ছাত ফাটা অন্ধকার ঘরে একরাশ ধুলোর লজ্জায়  
গীন হয়ে গেছে; সোকা সেটি কোন্ মস্তবলে ডানা মেলে  
ফে গেল কার সাহেবের নিজেরই তা ভালো করে জানা  
ই। ভাঙা বেতের চেয়ারগুলিতে ছারপোকায় রাশি  
য়েদের আরসোলার আঁকার ধারণ করছিল—মার্খা  
ই সেগুলোকে বাড়ির পেছনের আন্তাকুঁড়ে বিদায়  
উঠছে।

সিমেন্টের চটা ওঠা মেজাজে এখন খানকয়েক কাঁটাল  
ঠের চেয়ার। শুধু সেদিনের স্মৃতিচিহ্ন হয়ে ঘরে টিকে  
াছে—বার্খা সেতনের একখানা বার্গিশ ওঠ ভারী টেবিল;  
গোয়ালে ফাটা কাচের ক্রেমে বিবর্ণ কয়েকখানা ছবি—  
পনিবেশিক ইংরেজের রুচিমাকিক খানকতক শিকারের  
জ, ক্যাভালারিচার্জের একটা রোমহর্ষক ব্যাপার, রঙ  
লে বাওয়া সোনালি ক্রেমে একখানা পঞ্চম জর্জের ছবি,  
ার তলার ল্যাটিন হরকে গড়্ সেত শু কিং। আর আছে  
বুজ ক্রেমে ওভ্যালশেপের বড় একখানা ব্রেজিলিয়ান  
মায়না—পারা উঠে গিয়ে তার ভেতরে ফুটেছে বসন্তের  
লতাকের মতো একরাশ বিন্দুচিহ্ন—কাচের ওপর কুয়াশার  
তো একটা ঝাপসা আবরণ।

গৃহসজ্জা থেকে শুরু করে টানা-পাখার শূভ্র হকে  
শাকড়শার জাল পর্যন্ত কিছুই দৃষ্টি এড়াল না অ্যালবার্টের।  
বুহু হেসে পকেট থেকে সিগারেট কেস বার করল।  
একটা সিগারেট দিলে জু সাহেবকে। একটা নিজে  
ইরালো।

তত্বতা। কী বলা যাবে কেউ খুঁজে পেল না খানিকক্ষণ।

তবু অ্যালবার্টই তত্বতা ভাঙল।

—এখানে তোমরা কতদিন আছে।

—প্রায় চল্লিশ বৎসর।—বলতে গিয়ে জু সাহেব  
সিগারেটের গোঁফটা টিবিয়ে কেলল।

কিন্তু আর যাই হোক, নির্ভর নয় অ্যালবার্ট। বন্দুক  
দেখেই যে পাখি মাটিতে লুটিয়ে পড়েছে, তার ওপর  
অকারণে আরো দুটো একটা টোটা খরচ করবার প্রবৃত্তি  
নেই তার। আর তা ছাড়া—তা ছাড়া মদের নেশা। সেই  
নেশার ঝোঁকে নিজের অতৃপ্ত কামনাগুলোর ওপর কল্পনার  
রঙ কলিয়ে ছিল স্নাইদু। তার দোষ নেই।

সুতরাং অ্যালবার্ট সমস্ত জিনিষটাকে যেন পাশ  
কাটিয়ে গেল।

—তোমাদের বাড়িটা একটু পুরোনো হলোও নেহাৎ  
খারাপ নয়।

—হঁ।

—বেশ খোলা মেলা। চারদিকে চমৎকার মুক্ত-  
প্রকৃতি?

ঠাট্টা করছে নাকি? জু সাহেব বুঝতে পারল  
না। একবারের জন্তে মাথা তুলেই চোখ নামিয়ে  
দিলে।

—শহর থেকে এখানে এসে যেন স্বস্তির নিঃশ্বাস  
কেলতে পারছি। আঃ—কী চমৎকার মাঠের হাওয়া।  
দূরের গাছপালাগুলোকেও কি স্পষ্ট দেখাচ্ছে।

ঠাট্টা? জু সাহেব একটা ঢৌক গিলল। যদি ঠাট্টাও  
হয়—তবু কি অদ্ভুত কৃতিত্ব অ্যালবার্টের! ছুরি যদি  
চালিয়েও থাকে, তার আগে ব্যবহার করেছে মর্কিনা—  
বেদনা বিন্দুমাত্র টের পাবার উপায় নেই।

—হঁ।

—আমার এই সব কুঠিবাড়ির ওপরে একটা অদ্ভুত  
মোহ আছে। ইংল্যান্ডের প্রাচীন ক্যাসলগুলোতে গেলে  
এইরকম একটা অদ্ভুত অল্পভূতি জাগে আমার। পুরোনো  
বাড়ি আর বিচিত্র প্রকৃতি মিলে যেন একটা আশ্চর্য  
অভীতকে জাগিয়ে তোলে। বর্তমানটাকেই কেমন অবাস্তব  
বলে বোধ হতে থাকে।

কাব্য করছে নাকি অ্যালবার্ট? না ব্যঙ্গকাব্য?

এবার সাহসে ভর করে জু সাহেব সোঁতা তাকিয়ে  
যেখল। না—ব্যঙ্গের চিহ্নও কোথাও নেই। নিজের  
মধ্যে যেন মগ্ন হয়ে গেছে অ্যালবার্ট, হারিয়ে গেছে নিজের  
ভাবনার গভীরে। চোখ দুটোতে একটা মূঢ় ভগ্নভাৱ।  
সে কি এই বাড়ির প্রভাবই? না—ইংল্যান্ডের সেই

অভীভের বনহারার মায়ায় আচ্ছন্ন অভিযায় ক্যাসলগুলির  
বন্দ-বৃত্তিতে ?

দিগন্তের সবুজ গাছগুলি ছাড়িয়ে আরো দূরে সঞ্চার  
করে কিরল অ্যালবার্টের দৃষ্টি।

—আচ্ছা, আকাশের কোলে ওই যে নীল মেঘের মতো  
রেখা—ওটাই কি হিমালয়ান রেঞ্জ ?

—ওর নাম—ডি—ভিন পাহাড়।—বাংলাদেশের  
ভূগোল সম্পর্কে অ্যালবার্টের জ্ঞানটা খুব মারাত্মক নয়,  
এমনি প্রত্যাশা করে জু সাহেব বললে, তা হিমালয়ান রেঞ্জই  
বলতে পারো বই কি !

—ভারী সুন্দর দেখাচ্ছে তো'। ঠিক যেন একটা  
মোবের পিঠের মতো যেন হচ্ছে।

—হ' !

—আচ্ছা, মাউন্ট এভারেস্ট দেখা যায়না এখান  
থেকে ? আর কান্ধনজঙ্ঘা ?

এতবড় মিথ্যে কথা আর কী করে বলা যায় ? জবাব  
মিতে হল, না।

—তবু এও মন্দ নয়।—হাতের সিগারেটটার কথা  
ভুলে গিয়ে অ্যালবার্ট পাহাড়টার দিকে তাকিয়ে রইল।

—চা এসেছে।

বীপার বন্ধারের মতো শোনালো মার্খার গলা। চমকে  
জ্বলনই কিরে তাকালো। মার্খার এ গলা ক্যার সাহেব  
সর্বশেষ শুনেছিল জীবনের পূর্বরাগ পর্বে। তারপর এতকাল  
ধরে কাটা-কাঁসরের পালাই চলে এসেছে।

তু ধু ভাই নয়। মাত্র পনেরো মিনিটের মধ্যেই  
আশ্চর্যভাবে নিজের ভোল বদলে ফেলেছে মার্খা। কোন্  
কীকে একটা ভালো পোষাক ভুলে রেখেছিল, সেইটে  
পরে এসেছে, গালে মুখে পড়েছে প্রসাধনের একটা লম্বা  
প্রলেপ। হঠাৎ যেন দশ বছর আগেকার কিশোরী মার্খা  
নবজন্ম লাভ করেছে।

তু ধু ভাই নয়। পুরোনো কাঠের বাজটা থেকে কী  
করে খুঁজে এনেছে সে আমলের একটা আদালীর  
পোষাক। চাপিয়েছে রাজবংশী চাকরটার গারে। হু  
একটা জায়গার পোষাক কেটেছে বটে, তবু তো মন্দ  
দেখাচ্ছে না একেবারে !

চাকরটা সামনের টেবিলের ওপর একটা কাঠের

ট্রেতে করে চা আর খাবার রাখল। কোথায় শেল মা  
চিনির চা—কেমন করে এল শাদা রুটি, একটুখানি মাখ  
ছোটো ডিম ? বিহ্বল হয়ে ক্যার সাহেব বসে রইল !

দুখার্ড অ্যালবার্ট গোয়ালে রুটি ডিম গিলতে লাগল  
আর মাঝে মাঝে কৃতজ্ঞ দৃষ্টি ফেলতে লাগল মার্খার ওপরে

কিন্তু শুধুই কি কৃতজ্ঞ দৃষ্টি, না আরো কিছু ? আ  
ক্যারর মনে হল, দশবছর আগে কিশোরী মার্খা সত্যি  
সুন্দরী ছিল তা হলে ! হোক নেটিভ ক্রীশানের মে  
তবু ফর্সার দিকেই তার গায়ের রঙ, চোখের তা  
ছোটো আশ্চর্য গভীর—মুখে একটা দ্বিধা কমবীরত  
আরো আশ্চর্য, মার্খার বা গালে একটা ছোটো ভিল  
আছে—সেটাও কেন এতদিন তার চোখে পড়েনি ?

—তুমি চুপ করে বসে আছ কেন ? চা খাবে না ?  
সস্তায়ণটা ক্যারর প্রতি। এবার আর বীপা বা  
না, কাটা কাঁসরের রেশটা অস্পষ্ট ভাবে শুনে পায়  
গেল।

—হ্যাঁ, এই যে নিই—খতমত খেয়ে একটা চা  
কাপ কোলের দিকে টেনে নিলে জু সাহেব।

খাবার শেষ করে রুমালে মুখটা মুছে নিলে অ্যালবার্ট  
মার্খাকে পরিতৃপ্ত স্বরে জানালো, অশেষ ধন্যবাদ।

মার্খা হাসল। জু সাহেবের আবার মনে হল জ  
শাদা দাঁতগুলি।

মার্খা বললে, এই পাড়াগাঁয়ে বন্ধন এসে পড়লে  
তখন এ কষ্টটুকু করতেই হবে। এখানে এ ছাড়া  
কিছুই পাওয়া যায় না।

বেশ ভালো ইংরেজি বলে তো মার্খা। সহজ, ছ  
চমৎকার নিছুল উচ্চারণ। হ্যাঁ—হ্যাঁ, মনে পড়ে  
মিশনারী বাপের মেয়ে—দার্জিলিংয়ের কী একটা স্কুলে  
জুনিয়ার কেবুল পাশ করেছিল বটে। আর এই মার্খা  
এতকাল ভুলে ছিল আইন্ ক্যার—ভুলে ছিল দীর্ঘ দশ  
ধরে। গোল্ডার্স গ্রীনে ক্যার কোম্পানির জাগ্রত  
এতদিন এই বাস্তব জগৎটা কোন্‌খানে হারিয়ে গিয়েছি

ক্যারর কালো হাতের পাশে ধবধবে সাদা এক  
হাত অ্যালবার্টের। সে হাতের কড়ে আঙুলে বকবক ক  
জীবৎ হরিৎ একখণ্ড পাথর—হীরেই নিশ্চয়। সো  
রঙের চুলে বকবক করছে বিকেলের সোনালি আ

এই-ই পার্সিভালের সৃষ্টিকারের স্বাভাতি, তার সগোত্র।  
আপারমন্তক এমন একটা অনন্ততা নিয়ে সামনে এসে  
দাঁড়িয়েছে যে এর পাশাপাশি কালো মারের কালো ছেলে  
এক মুহূর্তে মিথ্যে হয়ে গেছে। যেন অবচেতন মনে হঠাৎ  
উপলব্ধি করতে পেরেছে, অমন করে তাকে পথের ধুলোয়  
কেলে দিয়ে কেন চলে গিয়েছিল পার্সিভাল কারু!

—আপনি কখনো যান নি ইয়োরোপে?—মার্থার  
প্রতি অ্যালবার্টের একটা উজ্জল প্রশ্ন প্রশ্ন।

—নাঃ—মার্থার দীর্ঘশ্বাস।

—যাবেন একবার। দেখে আসবেন।—মার্থাকে  
অ্যালবার্ট বলে চলল, যদি আগে থেকেই খবর দেন, আমিও  
না হয় সহযাত্রী হবো। তারপর আমাদের ওখানে ছ  
চারদিন আতিথ্য নিয়ে আসবেন।

\* কারু সাহেব চুপ করে বসে রইল। এ আলাপের  
মধ্যে তার যেন কোথাও স্থান নেই। সে যেন একান্তই  
অনাহুত, অবাঞ্ছিত আগন্তক। এখানে অ্যালবার্ট  
পার্সিভালের সগোত্র—আর মার্থা? মার্থা যেন হঠাৎ  
দশ বছর আগে তার কুমারী জীবনে ফিরে গেছে,—  
পরিচ্ছন্ন, কমলীয় একটি বিহুসী মেয়ে। গোল্ডার্স গ্রীণের  
স্বপ্ন না দেখালে যে মার্থাকে কোনোদিন জয় করা  
যেত না।

কারু শুনে যেতে লাগল।

—যাবেন এক্সিটারে। দেখে খুশি হবেন।

—কী আছে দেখবার?—মার্থার সাগ্রহ প্রশ্ন।

—সেন্ট পিটার্স ক্যাথিড্রাল। আটশো বছর  
আগেকার।

—আর?

—আর জয়ন্তভ। উইলিয়াম দি কল্লারার তৈরী  
করিয়েছিলেন।

এক্সিটার। চোখ বুজে মার্থা দেখতে লাগল।

—ওখান থেকে কিছু দূরেই ব্রেটনক্লেঞ্চশায়ার।  
সেইখানে আমাদের বাড়ি ক্লেঞ্চশায়ার হল। ছবির মতো  
একেবারে। বড় বড় পপলার গাছের ছায়া। হনিসাক্লে  
ঢাকা বাড়িগুলি। পপিতে আলো করা বাগান, আর রাশি  
রাশি পাকা আপেল।

কু সাহেব বেমন করে তার প্র্যাক্টেশনের গল্প বলেছিল,  
এ কি তাই? ঠিক বুঝতে পারল না। কিন্তু এটা বুঝতে  
পারল এই মুহূর্তে মার্থা আর অ্যালবার্টের মধ্যে সে যেন  
কোথাও নেই। একটা অনধিকারীর মতো সঙ্গম্যে  
অনেকখানি দূরে সরে দাঁড়িয়ে আছে।

মাঠের ওপারে সূর্য অস্ত গেল। অন্ধকার নেমে  
আসবার আগেই উঠল ঝিঁঝিঁর ডাক। কুঠিবাড়ির কল্লা-  
ভাঙা জানলা বাতাসে আর্দ্রনাদ তুলতে লাগল পোন্নার  
কারার মতো।

মার্থা উঠে দাঁড়িয়ে বললে, আলো জেলে আনি।

আশ্চর্য চঞ্চল পায়ে বেরিয়ে গেল সে। আটশো বছর  
আগেকার সেন্ট পিটার্স ক্যাথিড্রাল তাকে হাতছানি  
দিচ্ছে, ডাক পাঠিয়েছে উইলিয়াম দি কল্লারারের  
সিটাডেল। হনিসাক্লেচের আবরণে ঢাকা বাড়িগুলির চার-  
পাশ থেকে তার রক্তে সাড়া দিয়েছে হয়তো দীর্ঘকাল  
পপলার-বাঁধির মর্মর স্বর।

অ্যালবার্ট একটা সিগারেট ধরালো।

আর আইদ কারু শুনেতে পেলো মাঠের ওপারে ডেকে  
উঠছে শেয়াল।

ক্রমশঃ



# পূর্ববঙ্গের আশ্রয়প্রার্থী সমস্যা (৩)

অধ্যাপক শ্রীশ্যামসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায়

পূর্ববঙ্গের আশ্রয়প্রার্থী সমস্যার সর্বপ্রাণী চাপে পশ্চিমবঙ্গের নিজস্ব হাজার সমস্যা যে আজ চাপা পড়িয়া গিয়াছে, একথা বর্তমান অবস্থে আগেই বলা হইয়াছে। এই অসাধারণ পরিস্থিতির প্রতিক্রিয়া সুদূরপ্রসারী। পশ্চিমবঙ্গের শিল্প বাণিজ্যগত আয় যতই হউক এবং শিল্প বাণিজ্যে যত লোকেরই কর্মসংস্থান হইয়া থাকুক, অরণ্য রাখিতে হইবে যে, এই সব শিল্পবাণিজ্যের মূলধন বা শ্রমিক সংস্থানের ব্যাপারে অব্যাহত প্রভাপই বেশী, বাস্তবিক নিঃস্ব লাভ এক্ষেত্রে খুবই সীমাবদ্ধ। কাজেই মোটের উপর পশ্চিমবঙ্গের পুরাতন অধিবাসীদের আর্থিক অবস্থা কোনকালেই স্বচ্ছল নহে। এই প্রদেশে যন্ত্রশিল্পে নিযুক্ত শ্রমিকের সংখ্যা সাড়ে ছয় লক্ষের কিছু বেশী, ইহাদের মধ্যে অব্যাহত শ্রমিকদের কথা বাদ দিলেও পশ্চিমবঙ্গের প্রায় আড়াই কোটি অধিবাসীর হিসাবে যন্ত্রশিল্পের শ্রমিক সংখ্যা সমগ্র প্রদেশের সার্বজনীন কর্মসংস্থান সমস্যার পরিপ্রেক্ষিতে যথেষ্ট নয় এবং সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে যে, ভারতের স্তর সমগ্রভাবে পশ্চিমবঙ্গের অর্থনীতিও কৃষিকেন্দ্রিক। অত্যধিক লোক কৃষির উপর নির্ভরশীল বলিয়া পশ্চিমবঙ্গে আবাদযোগ্য পতিত কৃষি জমির পরিমাণ প্রচুর হইতে পারে না। অনুমিত হয় এইরূপ জমি পরিমাণে ২০ লক্ষ একরের মত। এই জমি কিন্তু টুকরো টুকরো ভাবে প্রদেশের নানা স্থানে ছড়াইয়া আছে এবং সাধারণভাবে ইহাদের চাষ লাভজনক বা সহজ হয় নাই বলিয়াই দুঃস্থ কৃষিজীবী পশ্চিমবঙ্গবাসী এগুলি অনাবাদী থাকিতে দিরাছে। ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দের আদমশুমারী অনুযায়ী বাংলার গত ৪০ বৎসরে শতকরা ৪৩.১ ভাগ জনসংখ্যা বাড়িয়াছে। কৃষিজমির পরিমাণ বাড়ে নাই বলিয়া এবং কসল উৎপাদন বাড়িবার পরিবর্তে নিয়ম নীতি অনুযায়ী কন্মের দিকে গিয়াছে বলিয়া এই প্রদেশে আর্থিক তথা বেকার সমস্যা ক্রমশঃই তীব্র আকার ধারণ করিয়াছে। পূর্ববঙ্গের তুলনায় অপেক্ষাকৃত অমূর্কর পশ্চিমবঙ্গেই যে কৃষিজীবির পক্ষে এই সমস্যার চাপ অধিকতর ভয়াবহ হইয়াছে, তাহা বলা বাহুল্য। স্বাধীনভাষান্তের পর সরকারী প্রয়াসে পশ্চিম বাঙ্গলার স্থায়ী অধিবাসীরা নিজেদের দীর্ঘকালীন দুঃখমোচনের অনেক আশা করিয়াছিল। কিন্তু দেশবিভাগের পর পাকিস্তানে বসবাস অসম্ভব হস্তায় পূর্ববঙ্গ হইতে যেভাবে লক্ষ লক্ষ লোক পশ্চিমবঙ্গে আসিয়া উপস্থিত হইল এবং যেভাবে তাহারা সরকারের আর্থিক সঙ্গতি বিপন্ন করিল, তাহাতে পশ্চিমবঙ্গের আর্থিক পুনর্গঠনের প্রায় আজ পশ্চিমবঙ্গের নিছক অস্তিত্ব রক্ষার প্রার্থে অন্তরালে আত্মগোপন করিতে বাধ্য হইয়াছে। ভারতীয় সুভাষচন্দ্রের, বিশেষ করিয়া পশ্চিমবঙ্গের উপর গভীর ভরসায় যেসব

সর্বস্বত্ব সীমান্ত অতিক্রম করিয়াছে, তাহাদের উপস্থিত বাঁচাইবার সমস্যা এত জরুরী যে, এখন আশ্রয়প্রার্থী সমস্যা ছাড়া পশ্চিমবঙ্গে অস্ত্র কোন সমস্যা আলোচিত হইবারই সুযোগ পাইতেছে না। কিন্তু মানবতার আবেদন বত মহানই হউক, এইভাবে সবকিছু আর দীর্ঘকাল উপেক্ষা করা উচিত নয়। আশ্রয়প্রার্থী সমস্যা এমনই বিচিত্র এবং প্রসারণশীল যে, পরিমিত সম্পদ লইয়া এ সমস্যার সমাধানের পর অস্ত্র কিছুতে হাত দিবার কল্পনা করাই বাতুলতা মাত্র। এক্ষেত্রে দেখিতে শুনিতে খারাপ হইলেও দীর্ঘ উপেক্ষিত পশ্চিমবঙ্গের নিজস্ব সমস্যাগুলি এইবার আপন গুকে বিবেচিত হওয়া দরকার। পশ্চিমবঙ্গের ভৌগোলিক অবস্থিতি, আর্থিক অবস্থা ইত্যাদি অরণ্য করিয়া সারা ভারত যদি পূর্ববঙ্গের আশ্রয়প্রার্থী সমস্যাতে সত্যকার সর্বভারতীয় সমস্যা হিসাবে গ্রহণ করিত, তাহা হইলেও পশ্চিমবঙ্গও অবশ্যই বেচ্ছার যতটা সম্ভব দুঃখবরণে অগ্রসর হইত, কিন্তু কার্যতঃ সর্বভারতীয় সক্রিয় সহযোগিতা যথেষ্ট না হওয়ার পশ্চিমবঙ্গের উপরই চাপ পড়িতেছে অসম্ভব রকম বেশী এবং ফলে পশ্চিমবঙ্গের অর্থনীতি ও সমাজব্যবস্থা ভাঙ্গিয়া পড়িবার উপক্রম হইয়াছে। এই শোচনীয় পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতেই অনেকে সাম্প্রতিক দিল্লী-চুক্তির পর বিবরণনে শরণার্থীদের পূর্ববঙ্গে প্রত্যাগমনের প্রয়োজন লইয়া আলোচনা করিতেছেন।

দিল্লীচুক্তি বতটা কার্যকরী হয় এবং ভারতসরকার ও ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের কর্তৃপক্ষ সহানুভূতিসূচক মনোভাব লইয়া বতটা আগাইয়া আসেন, ততই মঙ্গল। অবশ্য পরিস্থিতির প্রকৃত উন্নতি হইলেও পূর্ববঙ্গ হইতে আগত সমস্ত আশ্রয়প্রার্থীর পুনরায় পূর্ববঙ্গে প্রত্যাগমন আশা করা যায় না। অবস্থার উন্নতি না হইলে আশ্রয়প্রার্থী সমস্যাই হয়তো পশ্চিমবঙ্গের সর্বনাশ ঘটাইবে। যাহা হউক, পরিকল্পনাদি রচনার সময় আশাবাদী মনোভাব লইয়া অগ্রসর হওয়া ছাড়া উপায়ও নাই। পূর্ববঙ্গের বহু শরণার্থী শেষ পর্যন্ত ভারতে থাকিয়া যাইবে, অস্ত্র প্রদেশে বতই স্থান হউক, পশ্চিমবঙ্গে থাকিবে ইহাদের একটি বড় অংশ। এই সব আশ্রয়প্রার্থীর কর্মসংস্থান ছাড়া পশ্চিমবঙ্গের নিজস্ব বেকার সমস্যা বিদ্যুৎগেও অমূল্য কর্মসংস্থানের প্রয়োজন। এইভাবে বহুসংখ্যক মূল্যবান কর্মের সংস্থান ঘরাবিত না হইলে অর্থনৈতিক ও আভ্যন্তরীণ বিশ্বাসলার চাপে পশ্চিমবঙ্গের ভবিষ্যত অন্ধকার হইয়া যাইবে বলিয়া আশঙ্কা হয়। পশ্চিমবঙ্গের নিজের ক্ষমতা বেরূপ, তাহাতে এই ক্ষমতার প্রবেশ এ বিবরে লক্ষণীয় সাফল্যলাভ করিতে পারিবে কিনা সন্দেহ। আগেই

বলা হইয়াছে পশ্চিমবঙ্গের আবাসযোগ্য পতিত জমির পরিমাণ ২০ লক্ষ একরের মত হইতে পারে, তবে এই জমি অত্যন্ত বিচ্ছিন্নভাবে প্রদেশের নানা স্থানে ছড়াইয়া আছে। এই জমি যতদূর সম্ভব ব্যবহার করিতেই হইবে। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, পশ্চিমবঙ্গের প্রতিবেশী রাজ্য আসাম, বিহার ও উড়িষ্যার সমগ্রভাবে আবাসযোগ্য পতিত জমির পরিমাণ যথাক্রমে ১ কোটি ৭৪ লক্ষ একর, ৬৪ লক্ষ ৫০ হাজার একর ও ৩১ লক্ষ ৪৪ হাজার একর, বিশেষভাবে ২০/২৫ লক্ষ শরণার্থী কৃষিজীবীকে এই সব জমিতে পুনর্বাসন করা চলিতে পারে। পশ্চিমবঙ্গের কৃষিব্যবস্থা বর্তমানে যুগান্তরের প্রতীক্ষায় রহিয়াছে, দামোদর পরিকল্পনা কার্যকরী হইলে ৯ লক্ষ একর ও ময়ূরাক্ষী প্রভৃতি অস্ত্রান্ত সেচ পরিকল্পনা কার্যকরী হইলে আরও ১৩ লক্ষ একর, একুনে পশ্চিমবঙ্গের এই ২২ লক্ষ একর জমিতে জলাসেচের সম্ভাবনা আছে। কাজেই শরণার্থী পুনর্বাসিত এবং প্রাদেশিক আর্থিক পুনর্গঠনের প্রসঙ্গের নিরিখে এই কৃষিসম্পর্কিত উন্নয়ন পরিকল্পনাগুলির কার্যকারিতা দ্রুততর হওয়া দরকার তবে ইহা সত্ত্বেও বলা যাইতে পারে যে, পূর্ববঙ্গের শরণার্থীদের মধ্যে অধিকাংশ কৃষক শ্রেণীর লোক হওয়ার ইহাঙ্গিরের সামান্য অংশকেই নিজ বৃত্তিতে পশ্চিমবঙ্গে পুনঃ সংস্থাপন সম্ভব হইবে।

দিল্লীর বিখ্যাত অর্থনৈতিক সাপ্তাহিক 'ইষ্টার্ন ইকনমিস্ট' গত ২১শে এপ্রিলের সংখ্যায় পশ্চিমবঙ্গের নিরোগসমস্তার সমাধানযুতক একটি পরিকল্পনা প্রকাশ করিয়াছেন। এই পরিকল্পনার ভিত্তিতে অনুমান করিয়াছেন যে, এই প্রদেশের কৃষিশিল্পের উন্নতিসাধন করিয়া এখানে আগামী তিন বৎসরের মধ্যে ৫ লক্ষ নতুন কর্মসংস্থান সম্ভব হইতে পারে। একান্ত ভীষণ নতুন মূলধনের প্রয়োজন অনুমান করিয়াছেন ১২৫ কোটি টাকা। পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান জাতীয় আয়ের পরিমাণে ৭০০ কোটি টাকার মত। উপরোক্ত মূলধন খাটিবার কলে জাতীয় আয় শতকরা ২০ ভাগ বাড়িলে ৫ লক্ষ বাড়তি কর্মসংস্থানের সম্ভাবনা। তবে শতকরা ২০ ভাগ বা ১৪০ কোটি টাকার মধ্যে ভীষণ কৃষির উপর বেশী ভরসা না করিয়া কৃষির হিসাবে ৩৫ কোটি টাকা লম্বী করিয়া বৎসরে ১০ কোটি টাকা আর বাড়াইবার কথা বলিয়াছেন এবং আশা করিয়াছেন যে সম্প্রসারিত কৃষিতে নতুন এক লক্ষ লোকের কর্মসংস্থান হইবে। পশ্চিমবঙ্গ যদিও শিল্পের হিসাবে কিছুটা সন্মুখত, তবু আপেক্ষিক হুবিধা থাকার পশ্চিমবঙ্গে আরও শিল্পসম্প্রসারণ সহজ ও সম্ভব বলিয়া ইষ্টার্ন ইকনমিস্টের ধারণা। ভীষণের মতে শিল্পবাণিজ্যে ৮৫ কোটি টাকা বিনিয়ুক্ত হইলে আগামী তিন বৎসরের মধ্যে বাৎসরিক ১০০ কোটি টাকা আর বৃদ্ধি হইতে পারে এবং কর্মসংস্থান হইতে পারে বোটা ৪ লক্ষ লোকের। এই স্থলে উল্লেখযোগ্য যে পশ্চিমবঙ্গে বর্তমানে শিল্প সংগঠন হইতে এই প্রদেশের জাতীয় আয়ের শতকরা ৩৪ ভাগ বা ২৪০ কোটি টাকা আর হয় এবং এই সব শিল্পে সাড়ে চার লক্ষের কিছু বেশী লোকের কর্মসংস্থান

হইয়াছে। এই শিল্পগুলিতে নিয়োজিত মূলধনের পরিমাণ ১০০ কোটি ৫৫ লক্ষ টাকা।

ইষ্টার্ন ইকনমিস্ট পত্রিকার উপরোক্ত পরিকল্পনার গুরুত্ব অবশ্যই স্বীকার্য, কিন্তু সমস্তার ব্যাপকতার তুলনায় ইহা যে বৃষ্টি নয়, তাহা নইয়া আলোচনা না করিলেও চলিবে। তবু ইষ্টার্ন ইকনমিস্ট বাহা বলিয়াছেন, কার্যক্ষেত্রে তাহাও কতখানি সম্ভব হইবে কে জানে? কর্মসংস্থান এলাকার নিকটবর্তী হওয়ার এবং কলিকাতা বন্দর থাকার পশ্চিমবঙ্গের শিল্প সংগঠনের হুবিধা অবশ্যই আছে, কিন্তু সারা ভারতের হিসাবে পশ্চিমবঙ্গ ইতিমধ্যেই যেভাবে শিল্পসমৃদ্ধ হইয়াছে, তাহাতে এই প্রদেশে আরও অনেক বেশী শিল্পপ্রসারের চেষ্টার সুকি আছে। পৃথিবীর সর্বত্র যুক্তোত্তর অর্থনৈতিক মন্দা দেখা দিতে আরম্ভ করিয়াছে, এসময় মূলধন বিনিয়োগে লোকের ইতস্ততঃ করাও যেমন স্বাভাবিক, মূলধন বিনিয়োগে লাভের ভরসাও তেমনি কম। সীমান্তবর্তী প্রদেশ হিসাবে পশ্চিমবঙ্গে বিশৃঙ্খলা যখন তখন আশঙ্কা করা যায়, কাজেই ধীরে হুয়ে পরিকল্পনা অনুযায়ী শিল্পসম্প্রসারণ ও সম্প্রসারিত শিল্প বাড়তি কর্মসংস্থান ইচ্ছা থাকিলেই হয়তো নিশ্চিত হইবে না। পশ্চিমবঙ্গ ইতিমধ্যেই বিশালায়তন ভারতের আরকর ও কর্পোরেশন ট্যান্ডের এক পঞ্চমাংশ জোগাইয়া থাকে। ইহা হইতেই পশ্চিমবঙ্গের শিল্প সংস্থান অনুমান করা যায়। ইহার উপর প্রচুর পরিমাণে নতুন শিল্প এই প্রদেশে বাড়াইবার আগে অল্প প্রদেশের শিল্পপ্রসারের প্রায় ১০ লক্ষ করা দরকার। কলিকাতার বন্দর দিগা এখনই বৎসরে ৩০০ কোটি টাকার মত পণ্য চলাচল হয়। পশ্চিমবঙ্গের উপর শিল্পপণ্যের মূল্য ২৪০ কোটি টাকার মত এবং ইহার মধ্যে একমাত্র কলিকাতার কেন্দ্রে ১৬০ কোটি টাকা মূল্যের পণ্য উপর হয়। আশ্রয়প্রাপ্ত সমস্তার চাপে এবং রাজনৈতিক কাটাকাটার পীঠস্থান হওয়ার কলিকাতার বর্তমানে যে হাল হইতেছে, তাহাতে কলিকাতা-কেন্দ্রিক পশ্চিমবঙ্গের আরও প্রভূত শিল্পসম্প্রসারণ সত্যিই অনিশ্চিত। হুগলী নদী মলিনা যাইতেছে বলিয়া বন্দর হিসাবে কলিকাতার ভবিষ্যৎ সকলেরই মাথাব্যথার কারণ হইয়া উঠিতেছে। শিল্প বাণিজ্যসম্প্রসারণ করিয়া পশ্চিমবঙ্গে অসংখ্য নতুন লোকের কর্মসংস্থানের শুভেচ্ছা প্রকাশের সময় হুগলী নদীর ক্রমাবনতির কথাও অবশ্যই স্মরণ রাখিতে হইবে। সমগ্রভাবে পশ্চিমবঙ্গের সরকারী অর্থনীতির কাঠামো ভাঙিয়া পড়িবার উপক্রম হইয়াছে, বেসরকারী অর্থনীতিও যে শোচনীয় তরে আসিয়া পড়িয়াছে তাহা টাকা ও শেয়ার মালিকদের মন্দা অবস্থা হইতে অনুমান করা যায়। এসময় শিল্পসম্প্রসারণ হইবে কাদের দায়িত্বে? অথচ একথাও ঠিক যে, কৃষির প্রসার-সম্ভাবনা একান্ত সীমাবদ্ধ বলিয়া কর্মসংস্থানের জন্য শিল্পবাণিজ্যের সুযোগেরী না হইয়া উপায় নাই। পশ্চিমবঙ্গ সীমান্তের রাজ্য বলিয়াই হউক, অথবা এই প্রদেশে আগের মত সর্ববিধ হুবিধার আশা না থাকিবার জন্যই হউক, অবাকালী শিল্পপতিরা ইতিমধ্যেই বাংলা হইতে ভীষণের কারবার বতটা সম্ভব ভটাইবার কথা চিন্তা করিতেছেন। কোম কোম বড় প্রতিষ্ঠান ইতিমধ্যেই কলিকাতা হইতে ভীষণের



এখান অকিসের কালকর্ষ ভারতের অন্ত কোন বড় সহরে স্থানান্তরিত করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। ভারত সরকারের শিল্পনীতিও বিকেন্দ্রীকরণের দিকে। সরকারী প্রয়াসে ভারতে যে দুইটি লৌহ ও ইস্পাতের বড় কারখানা বসিতেছে, আপেক্ষিক হুবিধা থাকা সত্ত্বেও তাহাদের একটিও পশ্চিমবঙ্গে প্রতিষ্ঠিত হইতেছে না। হুতরাং এক্ষেত্রে সরকার যদি নীতি পরিবর্তন করিয়া ইনডাস্ট্রিয়াল কিনাল করপোরেশনের হুবিধা দিতে বা অন্ততাবে অর্থ সাহায্য করিতে রাজী থাকেন, তবেই পশ্চিমবঙ্গে নুতন করিয়া শিল্পসম্প্রদায় আশা করা যায়। বেসরকারী পুত্র হইতে মূলধন সংগ্রহ এখন কিরণ কঠিন ও অনিশ্চিত হইয়া উঠিয়াছে, ভারতসরকার ও সিঙ্গিয়া ষ্টীম নেভিগেশন কোম্পানীর মত প্রয়াসে পণ্যবাহী জাহাজ প্রতিষ্ঠান স্থাপনের চেষ্টাতেই তাহার প্রমাণ মিলিবে। এই প্রতিষ্ঠান ইষ্টার্প সিপিং কর্পোরেশনে জনসাধারণের নিকট হইতে শতকরা ২৬ ভাগ মূলধন সংগ্রহের কথা ছিল, কিন্তু শেষপর্যন্ত বাণিজ্যের অবস্থা দেখিয়া সরকার জনসাধারণের আশা ছাড়িয়া দিয়া নিজেদের পূর্বসিদ্ধান্তমত শতকরা ৫১ ভাগ শেয়ার ছাড়াও উপরোক্ত ২৩ ভাগ শেয়ারও নিজেরাই গ্রহণ করিবার সংকল্প করিয়াছেন।

পশ্চিমবঙ্গের আর্থিক অবস্থা ভাল নয়, কেন্দ্র হইতে আশ্রয়প্রার্থী থাকে যে ৫ কোটি টাকা পাওরা গিয়াছে, সাময়িক সাহায্যদান ব্যবস্থা পরিচালনারও তাহা যথেষ্ট মনে হয় না; এখন পূর্ববঙ্গ হইতে আগত বহু লক্ষ লোকের পুনর্বাসনের সমস্যা কিস্তি হইবে? আগেই বলা হইয়াছে, পূর্ববঙ্গ হইতে বাহারা আসিয়াছে তাহারা অধিকাংশই কৃষিজীবী এবং তাহাদের অনেকেই নিঃসম্বল। ইহাদের ঘরের ব্যবস্থা করিতে হইবে, কাজের ঠিক করিয়া দিতে হইবে, যতদিন না নিজের পায়ে ঠাঁড়ার ততদিন ইহাদের নিরন্নিত অর্থসাহায্য করিতে হইবে। খাস পশ্চিমবঙ্গে এসব হওয়া কেনন করিয়া সম্ভব? আলোচ্য প্রবন্ধের পূর্ব-প্রকাশিত অংশে দেখানো হইয়াছে ১৯৫১ খ্রীষ্টাব্দের আদমশুমারী অনুযায়ী ২ কোটি ১২ লক্ষ লোকের উপর দেশবিভাগের প্রথম ধাক্কা আশ্রয়প্রার্থী ও হৃত্যু অপেক্ষা জঙ্গহাের আধিক্যের দরুন বাড়তি জনসংখ্যা ধরিয়া যে লোক বাড়িয়াছে, তাহাতে এখানে প্রতি বর্গ-মাইলে জনবসতির ঘনত্ব গড়ে ৮৬ জন বাড়িয়াছে। ইংলও, জাপান ও জার্মানীকে জনবহুল দেশ বলা হল, এইগুলির মাইল পিছু জন-

সংখ্যার ঘনত্ব যথাক্রমে ৭০০, ৪৮২ ও ৩৭০। কাজেই সহানুভূতি আছে বলিয়াই পূর্ববঙ্গের অসংখ্য শরণার্থীকে পশ্চিমবঙ্গ যদি স্থান দিবার চুঃসাংস করে, তাহা তাহার আত্মহত্যা হই কারণ হইবে। কোন রাষ্ট্রের একজন সাধারণ নাগরিক সম্পর্কে রাষ্ট্রের বতথানি দারিদ্, একজন সর্বহারা শরণার্থীকে আশ্রয় দিবার দারিদ্ তাহার চেয়ে অনেক বেশী। পশ্চিমবঙ্গ তাহার বহু দুর্ভাগ্য পীড়িত পুরাতন বাসিন্দাদের কিছু করিতে পারে না, শরণার্থীদের সব প্রয়োজন মিটাইবার দারিদ্ লইবে কোন সাহসে? দেশ বিভাগের সময় ভারতীয় নেতৃবর্গ যে প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন, শরণার্থীদের সেই প্রতিশ্রুতিই সবচেয়ে বড় মূলধন। এই প্রতিশ্রুতি পালন করিয়া তাহাদিগকে বাচাইবার দারিদ্ ভারতসরকারের তথা ভারতের সমস্ত রাজ্যের। পশ্চিমবঙ্গে ভিড়ের প্রথম চাপ পড়িবেই, কিন্তু তাই বলিয়া পশ্চিমবঙ্গকে বর্তমানে পুনর্বাসনের যে বিপুল সমস্যার সম্মুখীন হইতে হইতেছে, তাহা পশ্চিমবঙ্গের সাধ্যাতীত। কেন্দ্রীয় সরকারের অর্থসাহায্যে শরণার্থীদের ঘর বাধিয়া দিলেই বা তাহাদের সাময়িক সাহায্য করিলেই সমস্যার শেষ হইবে না, এই জনতার চাপ হইতে পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ অর্থ-ব্যবস্থাকে রক্ষা করিবার কি হইবে?

জঘন্যাবেগের দিক হইতে শরণার্থীদের পশ্চিমবঙ্গে আশ্রয়লাভই বাঞ্ছনীয়, অন্তপ্রদেশে তাহাদের বান্ধালীক হয়তো বিপন্ন হইবে, কিন্তু পরিস্থিতি বর্তমানে ঘেরাপ তাহাতে এই জঘন্যাবেগের কথাই সমস্যা সমাধানের শেষ কথা ধরিয়া লওয়া উচিত নয়। পূর্ববঙ্গে বসবাস যদি শেষপর্যন্ত অসম্ভবই হয়, একেবারে নিঃস্বদের যতটা সম্ভব পশ্চিমবঙ্গ হইতে অন্তপ্রদেশে পাঠাইবার ব্যবস্থা হওয়াই দরকার। পুনর্বাসনের সময় অবশ্য লক্ষ্য রাখিতে হইবে বাহাতে বাহারা একসঙ্গে বসবাস করিবে তাহাদের মধ্যে কুটি বা সংস্কৃতিগত একটা বোপাযোগ যেন রক্ষিত হয়। পূর্ববঙ্গ হইতে আশ্রয়প্রার্থী হিসাবে বাহারা আসিতেছে, তাহারা সকলেই পশ্চিমবঙ্গে সব কিছু হুবিধা পাইয়া পুনর্বাসনের সুযোগ লাভ করিবে, শুভেচ্ছা হিসাবে এই দাবীর যে মূল্যই থাক, বাস্তবক্ষেত্রে ইহা অসম্ভব। পশ্চিমবঙ্গ বর্তমানে আশ্রয়-প্রার্থীদের সকলকে আশ্রয় দিতে ও বাচিবার পূর্ণ সুযোগ দিতে যদি না পারে, ধরিয়া লইতে হইবে তাহা তাহার অনিচ্ছার নহে, অক্ষমতারই পরিচায়ক।







### বাস্তবায়ন পুনর্নবীকরণ—

পূর্ববঙ্গ হইতে প্রায় ৫০ লক্ষ বাস্তুহারা পশ্চিমবঙ্গে আগমন করায় তাহাদের পুনর্নবীকরণ সমস্যা এখন সকল দেশকর্মীকে বিব্রত করিয়াছে। পশ্চিমবঙ্গ পল্লী মঙ্গল সমিতির পক্ষ হইতে তাহাদের পুনর্নবীকরণের এক পরিকল্পনা প্রস্তুত করিয়া গত ৩১শে মে এক সাংবাদিক সম্মিলনে উপস্থিত করা হইয়াছিল। পশ্চিমবঙ্গে প্রায় ২ হাজার ইউনিয়ন বোর্ডের অন্তর্গত ৩৫ হাজার গ্রাম আছে। প্রত্যেক গ্রামেই এখন রজক, নাপিত, ছুতার, কামার, রাজমিস্ত্রী, তাঁতি কৃষক প্রভৃতির অভাব হইয়াছে। এই সকল গ্রামের অধিবাসীরা যদি ২৪ ঘর করিয়া প্রয়োজন মত বাস্তুহারা গ্রহণে অগ্রসর হন ও তাহাদের বাসের জন্য জমি, বাসগৃহের ব্যবস্থা প্রভৃতি করিয়া দেন, তাহা হইলে কয়েক লক্ষ বাস্তুহারাকে বাংলার গ্রামগুলিতে স্থান দান করা বাইতে পারে। এ বিষয়ে সকল ইউনিয়ন বোর্ডের সভাপতি ও গ্রাম-সেবক কর্মীদের অহরোধ করা হইয়াছে। কলিকাতা শ্রামবাজার ১৭৫-এ রাজা দীনেন্দ্র ষ্ট্রীটে সমিতির সম্পাদক শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয়কে পত্র লিখিলে এ বিষয়ে বিস্তৃত বিবরণ জানা যাইবে। পল্লী মঙ্গল সমিতির এই নতুন পরিকল্পনা সাফল্য মণ্ডিত করিবার জন্য সকলেরই চেষ্টা করা কর্তব্য।

### পশ্চিম বাংলায় পথ সমস্যা—

গত প্রায় ১০ বৎসর ধাবৎ সকল জিনিষের মূল্য বৃদ্ধির ফলে পশ্চিম বাংলার সকল পথের অবস্থাই অত্যন্ত খারাপ হইয়াছে। মিউনিসিপালিটি, জেলা বোর্ড, ইউনিয়ন বোর্ড প্রভৃতির আয়-ভ্রাস ও ব্যয় বৃদ্ধির ফলে তাহারা রাস্তাগুলির মেরামত করিতে সমর্থ হয় নাই—নতুন পথও নির্মিত হয় নাই। সেই জন্য আর দেশবাসীর অসুবিধা ও কষ্টের শেষ নাই। সেজন্য জনগণের পক্ষ হইতে একটি পথ ও যানবাহন উন্নতি সমিতি গঠিত হইয়াছে। সমিতির পক্ষ হইতে দেশের পথ সমূহের প্রয়োজনীয়তা স্থিরীকৃত হইতেছে ও কোণায় অবিলম্বে নতুন পথ নির্মাণ করা

প্রয়োজন, সে বিষয়েও তদন্ত করা হইতেছে। সর্ব জেলা ও মহকুমা সহরে ও থানার গ্রামে বাইবার উপযুক্ত পথ না থাকায় সকল সময়ে জনগণকে কষ্ট ভোগ করিতে হয়। এ বিষয়ে পশ্চিমবঙ্গ সরকার কাজ আরম্ভ করিয়াছে বটে, কিন্তু শুধু সরকারী চেষ্টায় এ কাজ শেষ করা সম্ভব হইবে না। পূর্বে বহু ধনী লোক ব্যক্তিগত অর্থ নতুন পথ প্রস্তুত করিয়া দিতেন—এখন আবার জনগণকে সে কার্যে অবহিত করা বিশেষ প্রয়োজন। জেলাবোর্ড, ইউনিয়ন বোর্ড প্রভৃতি দ্বারাও নতুনভাবে অর্থ সংগ্রহ করিয়া গ্রাম্য পথগুলির সংস্কার বা পুনর্নির্মাণ করা অবিলম্বে প্রয়োজন। পথ ও যানবাহনের ব্যবস্থা না হইলে লোকে পক্ষে গ্রামে যাতায়াত করা বা বাস করা কিছুতেই সম্ভবপাঃ হইবে না।

### শ্রান্ত উৎপাদনের জন্য পুরস্কার—

গত বৎসর পশ্চিমবঙ্গের কৃষকগণকে অধিকতর ধাত্ত উৎপাদনের জন্য পুরস্কার দিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। সাধারণতঃ প্রতি বিঘা জমীতে সাড়ে ৫ মণ ধাত্ত জন্মে—যে সকল কৃষক অধিক পরিমাণে ধাত্ত উৎপাদন করিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলিয়া বিবেচিত ২২০জন কৃষকের প্রত্যেককে ১০০ টাকা হিসাবে মোট ২২ হাজার টাকা পুরস্কার দেওয়া হইয়াছে। মোট ২৩৭টি থানার মধ্যে ২২০টি থানার কৃষক পুরস্কার পাইয়াছে। এইভাবে উৎসাহ দানের ফলে এবার পশ্চিমবঙ্গে ৮৭ হাজার বিঘা অধিক জমীতে ধানচাষের ব্যবস্থা হইয়াছিল। যে সকল কৃষক পুরস্কার পাইয়াছে, তাহাদের প্রত্যেককে অন্ততঃ ২ বিঘা জমী চাষ করিতে হইয়াছে। মেদিনীপুর জেলায় একজন তিন বিঘায় ৭০ মণ ৩০ সের, হুগলী জেলায় ৫৮ মণ ২৭ সের ও নদীয়া জেলায় ৫৮ মণ ১৩ সের ধাত্ত উৎপাদন করিয়াছেন। এইভাবে সকল প্রকার কৃষির জন্য পুরস্কার দানের ব্যবস্থা করিলে দেশে ধাত্ত উৎপাদন বৃদ্ধি পাইবে, ফলে খাদ্যাতাব দূর হইবে ও বিদেশ হইতে ধাত্ত আমদানী করার প্রয়োজনও থাকিবে না।

### মিউনিসিপাল-শাসন—

হগলী জেলার আরামবাগ মিউনিসিপালিটির কমিশনার-  
গকে নির্দিষ্ট কর্তব্য পালনে অযোগ্য স্থির করিয়া  
পশ্চিমবঙ্গ সরকার মিউনিসিপালিটি বাতিল করিয়া  
দাখল করেন ও একজন সরকারী কর্মচারীর উপর কার্য  
পরিচালনার ভার দিয়াছেন। এ ব্যবস্থা নূতন নহে,  
কলিকাতা কর্পোরেশন হইতে আরম্ভ করিয়া বাংলার বহু  
মিউনিসিপালিটাই এইভাবে বাতিল হইয়াছে। প্রকাশ—  
পৌর সভার পরিচালনায় কয়েকটি কুকার্য, অনিয়ম ও  
দলাদলি ঘটিয়াছিল এবং একজন কমিশনারকে অপর এক  
ব্যক্তির বেনামিতে মিউনিসিপাল ঠিকাদারী দেওয়া  
হইয়াছিল। অন্যথা ঐশ্বর্য গৃহীত হওয়া সত্ত্বেও চেয়ার-  
ম্যান বা ভাইস-চেয়ারম্যান পদত্যাগ করেন নাই। এইরূপ  
অবস্থা বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গের অনেকগুলি মিউনিসিপালিটির  
মধ্যে বর্তমান থাকা সত্ত্বেও সরকার পক্ষ কঠোরতার  
সহিত কার্য করেন না। যে কারণেই হউক, স্বায়ত্তশাসন  
ব্যবস্থায় গলদ হইয়াছে। ইহার দূরীকরণে সরকার পক্ষ  
উদ্যোগী না হইলে মিউনিসিপাল শাসনের নামে দেশে  
কুশাসন চলিয়া দেশবাসীকে ক্ষতিগ্রস্ত করিবে। আমরা  
এ বিষয়ে সরকারী স্বায়ত্তশাসন বিভাগকে উৎসাহের  
সহিত কর্তব্যপালনে অবহিত হইতে অনুরোধ করি।

### মন্ত্রী ও গভর্ণর—

শ্রীযুত শ্রীপ্রকাশ আসামের গভর্ণর ছিলেন, তাঁহাকে  
সম্প্রতি কেন্দ্রীয় সরকারের মন্ত্রী নিযুক্ত করিয়া দিল্লীতে  
লইয়া যাওয়া হইয়াছে। শ্রীযুত জয়রামদাস দৌলতরামও  
পূর্বে বিহারে গভর্ণর ছিলেন, তাঁহাকে কেন্দ্রীয় সরকারের  
মন্ত্রী নিযুক্ত করা হইয়াছিল—এখন আবার তাঁহাকে  
আসামের গভর্ণর করা হইল। উভয় ব্যক্তিরেই আজীবন  
কংগ্রেস কর্মী—যোগ্য ব্যক্তি। কিন্তু এই একই লোককে  
বার বার বিভিন্ন পদে নিযুক্ত করা অত্যন্ত অশোভন  
ব্যাপার। বিশেষ করিয়া গভর্ণরের পদ যেরূপ সম্মানজনক  
—তাঁহাতে প্রাদেশিক গভর্ণরের পদে নিযুক্ত লোককে  
মন্ত্রীপদে নিযুক্ত করা আদৌ ভাল দেখায় না। ইহাতে  
শাসন ব্যবস্থার ক্ষতিই পরিলক্ষিত হয়। তাহা ছাড়া,  
সকলই মনে করে, ভারতে পণ্ডিত নেহরুর সহকর্মী  
কয়েকজন লোক ছাড়া উচ্চপদে কাজ করিবার যোগ্যতা

আর কাহারও নাই। এই প্রসঙ্গে শ্রীচক্রবর্তী রাজা-  
গোপালাচারীকে পুনরায় মন্ত্রী নিয়োগ করার কথা  
আসে—গভর্ণর জেনারেলের পদ হইতে অবসর গ্রহণ করার  
পর আর তাঁহাকে নিয়পদে নিযুক্ত না করাই শোভন  
হইত। তিনি যোগ্য ব্যক্তি হইতে পারেন, কিন্তু  
অপেক্ষাকৃত কম বয়সের কাহারও উপর ঐ কার্যভার  
দিলে হয় ত তিনি অধিকতর যোগ্যতার পরিচয় দিতে  
পারিতেন।



হুম্মরবন প্রজামঙ্গল সমিতির যুগ্ম সম্পাদক ব্রজচরী ভোলানাথ  
ও হুম্মরবনবাণী শ্রীপ্রভু মিটার হুম্মরবন গ্রামাঞ্চলের চোরাই চালান  
দমন মানসে ২৪ পরগণা জেলার কাকদীপ, সাগর আনা প্রভৃতি  
এলাকার নৌকাযোগে পরিভ্রমণ  
ফটো—শ্রীঅনুপল পাত্র

### সাহিত্যপরিষদ ষ্ট্রীট—

কলিকাতায় সাহিত্যপরিষদ ষ্ট্রীটে বহুসংখ্যক খাটালে  
গো-মহিষ রাখার ব্যবস্থা থাকায় ঐ অঞ্চলটি দিয়া জনগণের  
যাতায়াত অত্যন্ত কষ্টকর ছিল। সম্প্রতি কলিকাতা  
ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাষ্ট ঐ অঞ্চলের খাটালগুলি তুলিয়া দিয়া ৯  
বিঘা জমা দখল করিবেন ও ৫০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে তথায়  
পার্ক ও বাসগৃহাদি নির্মাণ করিয়া দিবেন। এত দিনে  
যে এ বিষয়ে কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে, ইহা সত্যই  
আনন্দের বিষয়। উহার অনতিদূরে হরিনাথ দে রোডেও  
পশ্চিমবঙ্গ সরকার খালি জমীতে দরিদ্র জনগণের বাসের  
জন্য গৃহ নির্মাণ করিয়া দিবার পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন।

কলিকাতার বস্ত্রীগুলি ক্রমে ক্রমে উঠাইয়া দিয়া তথায় কম ভাড়ার বাড়ী নির্মিত হইলে সহরের নোংরাও দূর হইবে, দরিদ্র জনগণও বাসের অধিক সুবিধা লাভ করিয়া যত্ন হইবে। এখন কলিকাতা কর্পোরেশন, কলিকাতা ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাষ্ট ও পশ্চিমবঙ্গ সরকার—সকলের এক যোগে এবিষয়ে কার্য করা উচিত। প্রধান মন্ত্রী ডাক্তার রায়ের এ বিষয়ে বহু অতিনিব পরিকল্পনা আছে বলিয়া আমরা শুনিয়াছিলাম—সেগুলি সম্বর কার্যে পরিণত হইলে সহরবাসী সত্যই উপকৃত হইবে।

রাজ্যেও আদিবাসীর সংখ্যা অধিক। সত্য জাতি লোকেরা অপেক্ষাকৃত কম সত্য আদিবাসীদের উন্নতি জন্য প্রয়োজনীয় চেষ্টা করে না। তাহাই শ্রীজয়প সিংএর অভিযোগ। আগামী নির্বাচনে বাহাতে আদিবা ছাড়া অন্য কোন সম্ভাব্যের সমস্ত ব্যবস্থা পরিষদে প্রবেশ করিতে না পারে, সেজন্যও এখন হইতে প্রচার কা চলিতেছে। অথও ভারতকে বিচ্ছিন্ন করিয়া ক্রমে প্রদেশে বিভক্ত করার চেষ্টা সর্বত্র চলিতেছে। ইহার কি হইবে বলা কঠিন। মাদ্রাজ ও বোম্বাই বিভাগে



বিগত ২৫শে বৈশাখ জোড়াসাঁও  
ঠাকুরবাড়িতে রবীন্দ্রনাথের  
দিবসে প্রজাপতি—সত্য  
শ্রীপ্রভাত মুখোপাধ্যায় পৌরো  
করেন শ্রীহাজারীপ্রসাদ দ্বি  
মঙ্গলাচরণ করেন।

কটো—শ্রীগঙ্গা ০

### আত্মপ্রদর্শন—

শ্রীযুক্ত জয়পাল সিং ছোটনাগপুরে আদিবাসীদের নেতা। তিনি ঐ অঞ্চলে ঝাড়খণ্ড প্রদেশ গঠনের জন্য তীব্র আন্দোলন আরম্ভ করিয়াছেন। আদিবাসীদের বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যা—তিনটি প্রদেশের মধ্যে পৃথক ভাবে বাস করিতে না দিয়া—সকল আদিবাসী-অধ্যুষিত অঞ্চল একত্র করিয়া একটি স্বতন্ত্র প্রদেশ গঠন করাই শ্রীজয়পাল সিংএর উদ্দেশ্য। ছোটনাগপুরের সকল জেলাতেই আদিবাসীর সংখ্যা অধিক। সেরাই-কোলা ও খরসোয়ান রাজ্য এখন বিহারের মধ্যে। ময়ূরভঞ্জ উড়িষ্যার মধ্যে। ঐ সকল রাজ্য ছাড়াও কিওনঝড়, বোনাই, বাসরা, গাংপুর, বশপুর, সারগুজা, উদয়পুর, কোরিয়া ও চাংরেকার

আন্দোলন প্রবলতর হইয়াছে। বাংলা, বিহার, উড়ি পূর্বে একটি প্রদেশ ছিল—এখন তিনটি হইয়াছে—আ বিভক্ত হইলে শাসন-ব্যয় ক্রমেই বাড়িয়া যাইবে।

### শ্রীচাকরচন্দ্র বিশ্বাস—

ডক্টর শ্রীমাদ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত কিজীপ নিয়োগী কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা হইতে পদত্যাগ করার কলিকাতা হাইকোর্টের তৃত্বপূর্ব বিচারপতি ও কলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের তৃত্বপূর্ব আইন-চেলেনার শ্রীচাকরচন্দ্র বিশ্ব কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার সহকারী মন্ত্রী নিযুক্ত হওয়ার বাং দেশে কেহই তাঁহার এই কার্যে সমর্থ হইতে পারেন ন এবং এই নিয়োগের জন্য কেহ প্রস্তাব দ্বারা পণ্ডিত নৈ কার্যও সমর্থন করেন নাই।

হয়। কোন প্রকারে বাংলার মান বজায় রাখা হইয়াছে। ভারতের মধ্যে আজ পশ্চিম বাংলার সমস্তাই সর্কাপেক্ষা অধিক—সে সকল সমস্তার কথা কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভাকে ঠিক ভাবে জানাইবার জন্য পশ্চিম বাংলা হইতে একজন শক্তিশালী সমস্তকে যদি কেন্দ্রীয় সরকারে মন্ত্রী নিযুক্ত করা হইত, তবে লোক কতকটা সন্তুষ্ট হইতে পারিত। বাংলার জ্ঞাতব্য অভিযোগ ও নিবারণ লোক নাই—ইহা অপেক্ষা বাংলার দুর্ভাগ্য আর কি হইতে পারে? বাঙালী কি সত্যই ধ্বংসের পথে অগ্রসর হইতেছে? ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায় মহাশয়ের মত লোক প্রধান মন্ত্রী থাকিতেও পশ্চিম বাংলার প্রতি এইরূপ অবিচার কি তিনি সহ্য করিয়া যাইবেন?

### কলিকাতার দুগ্ধ সরবরাহ—

কলিকাতা সহরে প্রতিদিন ২০ হাজার মণ দুগ্ধের প্রয়োজন। কিন্তু তাহার জন্য কোন ব্যবস্থা নাই। সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গ সরকার দক্ষিণ কলিকাতার ৪০টি ডিপো খুলিয়া ১০০ মণ দুগ্ধ ১২ আনা সের দরে সরবরাহের ব্যবস্থা করিয়াছেন। ক্রমে এই ব্যবস্থা প্রসার করিয়া সমগ্র সহরে দুগ্ধ সরবরাহ করা হইবে। খাত্ত মন্ত্রী আশা করেন, এক বৎসরের মধ্যে সহরে দুগ্ধ জোগান দেওয়ার ব্যবস্থা হইবে। কাঁচরাপাড়ার নিকট হরিণঘাটার একটি সরকারী গো-শালা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে—ইহাও সম্প্রসারণের ব্যবস্থা চলিতেছে, আমরা খাত্তমন্ত্রীর পরিকল্পনার সাফল্য কামনা করি। সঙ্গে সঙ্গে বলা প্রয়োজন, সরকারী অর্থ যেন এ জন্য অপব্যয়িত না হয়। অনেক সময় দেখা যায়, জনগণের সামান্য উপকার করিতে গিয়া সরকারী কর্মচারীরা অনাবশ্যক অধিক অর্থ ব্যয় করিয়া থাকেন। হরিণঘাটার সরকারী গোশালা দেখিলে সেই অপব্যয়ের আশঙ্কাই মনে হয়। তথায় যে ভাবে অর্থ ব্যয়িত হইতেছে, ব্যবসা হিসাবে দুগ্ধ বিক্রয় করিয়া লাভ করা অসম্ভব হইবে বলিয়া মনে হয়। খাত্তমন্ত্রী মহাশয়কে আমরা এ বিষয়ে বিশেষ সতর্কতার সহিত কার্যে অগ্রসর হইতে অনুরোধ করি।

### সংস্কৃত-ভাষার শিক্ষা—

কর্কট জেলার আশাপুর ইউনিয়নের অন্তর্গত দেউলিয়া গ্রামে বিখ্যাত প্রাচীন সন্ত-দেউলের মন্দির আছে—উহা

মশাগ্রাম রেল ষ্টেশন হইতে এক মাইল উত্তর পশ্চিমে অবস্থিত। মেরামত ও রক্ষার অভাবে মন্দির গায়ে কাককাণ্ড ধ্বংস হইতেছে। ইটগুলি খুঁড়িয়া বাহির করিয়া লোকে লইয়া যাইতেছে। ঐ স্থান হইতে বহু মূর্তিও স্থানান্তরিত হইয়াছে। গ্রামটির সর্বত্র ও পাশের মাঠ-গুলিতে প্রচুর ইট পাওয়া যায়। আমরা সরকারী প্রত্নতত্ত্ব-বিভাগকে মন্দির রক্ষার জন্য অবহিত হইতে অনুরোধ করি। স্বাধীন দেশে পুরাকীর্তিগুলির রক্ষার জন্য অবিলম্বে উপযুক্ত ব্যবস্থা হওয়া উচিত।

### কবি অনন্তেশ্বর দেব ও শ্রীধারদাসী দেবী—

বাংলা দেশের এই সুপ্রসিদ্ধ কবি-দম্পতী এই কুন তারিখে ‘পি এণ্ড ও’ কোম্পানীর আহ্বান ‘এস, এস, চিত্রনে’ বোম্বাই হইতে পৃথিবী ভ্রমণে বাহির হইয়াছেন।



কতা নবনীতা সহ কবি দম্পতী—শ্রীঅনন্ত দেব ও শ্রীধারদাসী দেবী তাঁহাদের একমাত্র কতা কুমারী নবনীতাও সঙ্গে গিয়াছেন। তাঁহারা ইংল্যান্ড, স্কটল্যান্ড, আয়ারল্যান্ড, নরওয়ে, সুইডেন, ডেনমার্ক, ফ্রান্স, বেলজিয়াম, আলসেস-লোরেন, রাইনল্যান্ড, কানা, সুইজারল্যান্ড, ইটালি, রমানিয়া,

হুগোজাতিয়া, চেকোস্লোভাকিয়া, আলবেনিয়া, স্পেন, পোর্তুগাল ও মিশর ঘুরিয়া ভারতে প্রত্যাবর্তন করিবেন। রাত সাগর পারে তাঁহাদের এই প্রবাসযাত্রা শুভ হউক এবং তাঁহারা নিশ্চিত নিরাপদে ভ্রমণ শেষ করিয়া সুস্থ দেহে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করুন ইহাই আমরা সর্বাত্মকরূপে কামনা করি।

### পদ্মলোকে স্বামী অমৃতানন্দ -

গত ১৮ই মে বৃহস্পতিবার প্রাতে ৯ ঘটিকায় সিওয়ানে শ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ মঠের প্রতিষ্ঠাতা স্বামী অমৃতানন্দ মহারাজ দেহত্যাগ করিয়াছেন। ঠাকুর পরমহংসদেবের জ্ঞায় তিনিও কঠিনাশ্রিতে দীর্ঘ কালার রোগে আক্রান্ত হইয়াছিলেন। মুক্তিপ্রাপ্ত দীক্ষাদাতা ও অগ্নিমন্ত্রের উপাসক



স্বামী অমৃতানন্দ

অমূল্য সন্নিহিত ও বোগেন্দ্র ঠাকুরের পরিচালিত অঙ্গুলে স্বাধীনতা লাভে দৃঢ়সংকল্প বিদ্রোহী যুবকগণের সংসর্গ হইতে ঠাকুর পরমহংসদেবের মন্ত্রশিষ্য স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহারাজ তাঁহাকে পরম বোদ্ধাভাৱে পথে স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শে উদ্বুদ্ধ করিয়া সন্ন্যাস ধর্মে দীক্ষা দেন। পূর্বপ্রাণে তাঁহার নাম ছিল নলেন্দ্র দেব। ঠনুঠনিয়া

ছিলেন। তিনি পরলোকগত দেশকর্মী রাজেন্দ্র দেব এবং বিশিষ্ট কবি ও সাহিত্যিক শ্রীনরেন্দ্র দেবের কনিষ্ঠ ভ্রাতা ছিলেন। আমরা তাঁহার আত্মার মুক্তি ও শান্তি কামনা করি।

### প্রজ্ঞাপে বাঙ্গালী কবি সম্মিলন—

গত ১৬ই বৈশাখ এলাহাবাদ প্রাঙ্গণে বিচিত্রা কৃষ্টি সংঘের উদ্যোগে স্থানীয় বাঙ্গালী কবিদের এক সম্মিলন হইয়া গিয়াছে। এলাহাবাদস্থ অমৃতবাজার পত্রিকার বার্তা সম্পাদক শ্রীপ্রমোদকুমার সেন সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন। ১৪ জন কবি মিলিত হইয়া স্বরচিত কবিতা পাঠ করেন—তাঁহাদের নাম—শ্রীমতী প্রতিভা মুখোপাধ্যায়, শ্রীঅমর মুখোপাধ্যায়, শ্রীনিশিকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীপ্রণব মুখোপাধ্যায়, শ্রীজহর রায়, শ্রীসুনীল বসু, শ্রীসমরেন্দ্র দে, শ্রীহরিপদ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীসমর বোষ, ডাঃ আশামুখল দাস, শ্রীমতী জাহ্নবী চট্টোপাধ্যায়, শ্রীমতী উমা মুখোপাধ্যায়, কুমারী সাধনা চট্টোপাধ্যায় ও কুমারী অর্চনা মুখোপাধ্যায়। স্থানীয় বাঙ্গালী সাহিত্যিকগণের উপস্থিতি ও সহযোগিতায় সম্মেলন সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছিল।

### ডাক্তার মাথাই ও শ্রীসাকসেনা—

কেন্দ্রীয় গভর্নমেন্টের অর্থ-সচিব ডাঃ জন মাথাই ও পুনর্বসতি-সচিব শ্রীমোহনলাল সাকসেনা গত ৩১শে মে পদত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহাদের স্থানে যথাক্রমে শ্রীচিন্তামণি দেশমুখ ও শ্রীঅজিতপ্রসাদ জৈন নূতন মন্ত্রী নিযুক্ত হইয়া কার্যভার গ্রহণ করিয়াছেন। পদত্যাগ কালে ডাঃ মাথাই বলিয়াছেন যে রাষ্ট্র পরিচালন ব্যাপারে মূলনীতি সম্পর্কে প্রধান মন্ত্রীর সহিত মতভেদ হওয়ার তিনি পদত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছেন। তাঁহার বিশ্বাস পণ্ডিত নেহরু যে পথে ভারতকে পরিচালিত করিতেছেন তাহাতে শীঘ্রই দেশে অর্থ-নৈতিক সঙ্কট উপস্থিত হইবে। শ্রীসাকসেনাও পদত্যাগ কালে বলিয়াছেন—মন্ত্রী নিযুক্ত হইয়া তিনি যে প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন, নানা কারণে তিনি তাহা পালন করিতে সমর্থ হন নাই। কাজেই তাঁহার পক্ষে পদত্যাগ করা ভিন্ন অল্প উপায় ছিল না। ডক্টর জামাপ্রসাদ ও কিতীশবাবু উক্তির পর ডাক্তার মাথাই ও শ্রীসাকসেনার বিরুদ্ধে কি প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত নেহরুর মত্যা

মতামতসারে কাজ করিতে সমর্থ হন নাই। ইহার পর কি হয়, তাহাই আমাদের চিন্তার বিষয় হইয়াছে।

### শ্রীযুত হরেকৃষ্ণ মহাতাব—

উড়িষ্যায় প্রধানমন্ত্রী থাকাকালীন শ্রীযুত হরেকৃষ্ণ মহাতাব উড়িষ্যা-দেশবাসীর নানা প্রকার সুখ সুবিধার ব্যবস্থা করিয়া দেশবাসীর ধন্যবাদভাজন হইয়াছিলেন। উড়িষ্যায় বাঙ্গালী বাস্তুহারাাদের পুনর্বাসন ব্যবস্থাতেও তিনি বিশেষ সাহায্য করিয়াছেন। তাঁহার চেষ্টায় কয়েক সহস্র বাঙ্গালী উড়িষ্যায় বসবাসের সুবিধা লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছেন। তিনি কেন্দ্রীয় সরকারের শিল্প ও সরবরাহ বিভাগের কার্যভার গ্রহণ করিয়াই কতকগুলি বিষয়ে নতুন নীতি প্রবর্তনে অবহিত হইয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, তিনি বক্তৃতা অপেক্ষা কাজ বেশী করিবেন। শিল্প ও সরবরাহ বিভাগে তিন পক্ষকে একত্র হইয়া কাজ করিতে হয়—তিন পক্ষের কার্যই পরস্পর বিরোধী—(১) শিল্পপতি ধনী পক্ষ (২) সরকার পক্ষ ও (৩) দরিদ্র শ্রমিক পক্ষ। তিনি সকল পক্ষকেই বিবেচনার সহিত কাজ করিতে অহুরোধ করিয়াছেন। শ্রমিক মালিক বিরোধ লাগিয়াই আছে—তৃতীয় সরকার পক্ষকে সর্বদা তাহা মিটাইবার ব্যবস্থা করিতে হয়। সরকার পক্ষের সহিত ধনীদেহও বিবাদে অস্ত্র নাই—শ্রীযুত মহাতাব কি সে বিষয়ে কিছু করিতে পারিবেন? যাহা হউক, কার্যভার গ্রহণ করিয়াই গত ২৮শে মে তিনি দিল্লীতে যাহা বলিয়াছেন, তাহা অন্তত সকলের মনে আশার সঞ্চার করিবে।

### বাস্তুভ্যাগী ছাত্রদের জন্য ব্যবস্থা—

২৪ পরগণা মসনদপুরের নিকটস্থ দক্ষিণ চাতরা উচ্চ ইংরাজি বিদ্যালয়ের কতৃপক্ষ এক শত বাস্তুভ্যাগী ছাত্রকে তাঁহাদের বিদ্যালয়ে বিনা বেতনে শিক্ষা দানের ব্যবস্থা করিয়াছেন জানিয়া আমরা আনন্দিত হইলাম। ঐ সকল বাস্তুভ্যাগী ছাত্র যদি ছাত্রাবাসে থাকে, তবে মাসিক মাত্র ১০ টাকায় তাহাদের আহার ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করা হইবে। বিদ্যালয়টি ফাঁকা মাঠের উপর, নদীর ধারে, গ্রামের বাহিরে অবস্থিত—সেখানকার স্বাস্থ্য ভাল—কাজেই তথায় এইভাবে একটি বৃহৎ আবাসিক বিদ্যালয় গঠিত হইতে পারে। আমরা এই চেষ্টার জন্য বিদ্যালয়ের সম্পাদক দেশকর্ষী শ্রীহরেন্দ্রনাথ রায়কে অভিনন্দন জানন

করি এবং আশা করি, তাঁহার এই আদর্শ সর্বত্র অনুসৃত হইবে। দক্ষিণ চাতরা বসিরহাট মহকুমার অন্তর্গত একটি গড়গ্রাম।

### বোম্বাইয়ে বাঙ্গালীর সম্মান—

ডাক্তার বীরেন্দ্রকুমার নন্দী সম্প্রতি পার্লে-আনধেরী এলাকা হইতে বোম্বাই মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের সদস্য নির্বাচিত হইয়াছেন জানিয়া আমরা আনন্দিত হইলাম। তিনি ১৯৪৭ ও ১৯৪৮ সালে সংক্রামিক ব্যাধির সমর



ডক্টর বীরেন্দ্রকুমার নন্দী

সাহায্য কার্য পরিচালনা করেন ও সে সময়ে মিউনিসিপ্যাল শাসনের সহিত সংযুক্ত হইবার তাঁহার ইচ্ছা হয়। ইহার পূর্বে কোন বাঙ্গালী বোম্বায়ে মিউনিসিপ্যাল সদস্য নির্বাচিত হন নাই। তাঁহার কেন্দ্র হইতে যে ৩ জন সদস্য নির্বাচনে সাফল্য লাভ করিয়াছেন তন্মধ্যে ডক্টর নন্দাই সর্বাপেক্ষা অধিক ভোট পাইয়াছেন। তিনি কলিকাতার এম-এস-সি, ম্যাগেস্ত্রের পিএচ-ডি ও লণ্ডনের এ-আই-সি। টেডিংটন কেমিকেল কারখানার তিনি প্রধান কেমিষ্ট, ম্যানেজার ও ডিরেক্টর। আমরা তাঁহার সাফল্য কামনা করি।

### শ্রীযুত শ্রীযুক্ত কুমার হালদার—

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অম-মহাধ্যক্ষ (লেবার কমিশনার) শ্রীযুক্ত কুমার হালদার আই-সি-এস সম্প্রতি ভারত



সরকারের প্রতিনিধি-উপদেষ্টারূপে জেনিভার আন্তর্জাতিক শ্রম প্রতিষ্ঠানে যোগদান করিতে গিয়াছেন জানিয়া আমরা আনন্দিত হইলাম। তিনি ১৯৪৯ সালের এপ্রিল মাস হইতে শ্রম-মহাধ্যক্ষের পদে কাজ করিয়া সকলের প্রশংসা অর্জন করিয়াছেন। তিনি সুপণ্ডিত ও সুলেখক—তাঁহার বহু প্রবন্ধ ‘ভারতবর্ষ’ পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে।



শ্রীমুখাণ্ডকুমার হালদার আই-সি-এস

জেলা-জজ ও টাইবিউনালে জজ হিসাবেও তিনি বহুদিন দক্ষতার সহিত কাজ করিয়াছেন। আমাদের বিশ্বাস, তাঁহার উপস্থিতি ও কার্যের দ্বারা জেনিভার বাঙ্গালীর গৌরব বৃদ্ধি পাইবে ও শ্রমিক সমাজ সমাধানের নূতন উপায় উদ্ভাবিত হইয়া জগৎবাসীর কল্যাণ সাধন করিবে।

**মন্দিরা জেলায় উদ্ভাস্ত নগর—**

নদীয়া জেলার শান্তিপুর ও রাণাঘাটের মধ্যবর্তী স্থানীয় ট্রেনের নিকট সরকার সাড়ে ৩৭ লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া একটি নূতন উদ্ভাস্ত নগর নির্মাণ করিতেছেন। তথায় প্রায় ৩০ হাজার লোক বাস করিতে পারিবে। অধিবাসী-দিগকে কাজ দিবার জন্য তথায় আড়াই লক্ষ টাকা ব্যয়ে একটি কারিগরী বিদ্যালয়ও প্রতিষ্ঠা করা হইবে। ঐ কেন্দ্রে কাহাকেও খয়রাতি দান দেওয়া হইবে না। ইহা একটি আশার সংবাদ বটে; কিন্তু ২৪ পরগণা জেলার বসিরহাট মহকুমায় ৩ শত বিঘা জমী দখল করিয়া সরকার তথায় যে ৫ শত উদ্ভাস্ত গৃহ নির্মাণ করিয়াছেন, তাহার সংবাদে আমরা চিন্তিত হইয়াছি। ঐ সকল গৃহ নাকি বর্ষায় ঝিকিয়ে না—২১০ পসলা বৃষ্টির পরই পড়িয়া বাইতেছে—

অথচ প্রত্যেকটি গৃহ নির্মাণে ৫ শত টাকা ব্যয় হইয়াছে। নদীয়ার নূতন নগর নির্মাণের পূর্বে সে জন্য আমরা কর্তৃপক্ষকে সতর্কতার সহিত কার্যে অগ্রসর হইতে অপরোধ করি। ‘সংগঠনী’ পক্ষে বসিরহাটের ‘জাতীয় অর্থের ছিনিমিনি’ শীর্ষক যে সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে, সে জন্য উপযুক্ত তদন্ত হওয়া ও অপরাধীদের শাস্তিবিধান হওয়া বাঞ্ছনীয়।

**শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র নিরোঙ্গী—**

শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র নিরোঙ্গী কেন্দ্রে মন্দির ত্যাগ করিয়া আসিয়া বর্তমানে কলিমগঞ্জে বিশ্রাম গ্রহণ করিতেছেন। তিনি তথায় যুগান্তরের প্রতিনিধির নিকট বলিয়াছেন—“আমি নিজে পূর্ববঙ্গের লোক ও পূর্ববঙ্গের বর্তমান অবস্থার আমি নিজে তথায় বাইরা নির্ভয়ে বসবাস করিতে পারি না। কাজেই মন্ত্রী হিসাবে আমি অন্ত লোককে কিরূপে তাহা করিতে বলিব? কাজেই মন্ত্রীত্ব ত্যাগ করা ছাড়া চুক্তির পর আমার অন্য উপায় ছিল না।” ক্ষিতীশবাবুর এই স্পষ্ট উক্তির পর আর কিছু বলিবার নাই। পণ্ডিত নেহরু ডক্টর শ্রীমাংগলাদ ও ক্ষিতীশবাবুর মত সহকর্মীদের এই মনোভাব জানান পরও কেন যে চুক্তি করিয়াছেন, তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। ডক্টর শ্রীমাংগলাদেব মত ক্ষিতীশবাবুরও তাঁহার মনের কথা ব্যক্ত করিয়া বর্তমান সমস্যার দেশবাসী সকলকে কর্তব্য নির্দেশ করা উচিত। তাঁহার পদত্যাগে দেশবাসী যেমন আনন্দিত, তাঁহার মত অসাধারণ শীশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তির উপদেশ ও পরামর্শ লাভ করিলে তেমনই তাহার উপকৃত হইবে।

**হস্তিগণাভ্যাস্ত মন্দি-নিবৃত্তান্ত মন্দির—**

গত ২১শে মে রবিবার সকালে প্রধান মন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় কলিকাতা হইতে ৩২ মাইল দূরে হরিণ-বার্চায় পশ্চিম বাংলার নদীর গতি প্রকৃতি সম্বন্ধে গবেষণার জন্য নদী-বিজ্ঞান মন্দিরের ভিত্তি স্থাপন করিয়াছেন। ১৯৪০ সাল হইতে নদী-বিজ্ঞান সম্বন্ধে গবেষণা চলিতেছে। এতদিন গলসিতে একটি রিটার মডেল ট্রেন ও বেলঘরিরায় একটি টাইডেল মডেল ট্রেন ছিল। পরে (১) পরিসংখ্যান বিভাগ (২) পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগ (৩) রসায়ন বিজ্ঞান ও (৪) হাইড্রলজিক্যাল বিভাগ খোলা হইয়াছিল। যুক্তিকা গবেষণাগারও পরে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।



হইয়াছে। বর্তমানে সকল বিজ্ঞান নূতন মন্দিরে স্থানান্তরিত হইবে। বাংলা দেশের সকল বাণিজ্য ও ঐশ্বর্য নদীর গতিপ্রকৃতির সহিত জড়িত। কাজেই নদী-বিজ্ঞানের আলোচনা এদেশে বিশেষ প্রয়োজন। এই মন্দির সম্বন্ধে দেশের প্রকৃত মঙ্গল সাধন করিতে পারিলেই—ইহার প্রতিষ্ঠা সার্থক হইবে।

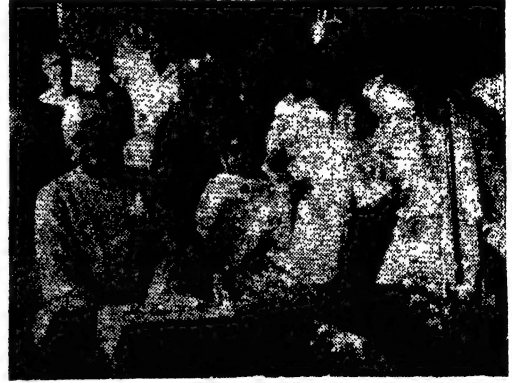
### পূর্ববঙ্গে হিন্দু-মসজিদ—

নেহরু-লিয়ারকং চুক্তি লিপিবদ্ধ হওয়ার পর লোকে মনে করিয়াছিল যে পূর্ববঙ্গে হিন্দুদের উপর মুসলমানদের অত্যাচার বন্ধ হইবে। চুক্তির পর হিন্দুদের পশ্চিমবঙ্গে বা আসামে গমনে ও অস্থাবর সম্পত্তি আনয়নের কিছু সুবিধা হইয়াছে বটে, কিন্তু পূর্ববঙ্গে মুসলমান কর্তৃক হিন্দুর লাঞ্ছনা প্রায় সমভাবেই চলিয়া আসিতেছে। উক্তর আমাএসাদ মুখোপাধ্যায় এ বিষয়ে বহু তথ্য সংগ্রহ করিয়াছেন এবং সেগুলি অমুদ্রিত তিনি উপযুক্ত কর্তৃপক্ষকে জানাইয়াছেন। কর্তৃপক্ষ মুখে বাহাই বলুন না কেন, তাঁহারও সকল সংবাদ জানেন। ২৮শে মে দিল্লী হইতে জানা গিয়াছে যে এই সকল অত্যাচারের কাহিনী দিল্লী কর্তৃপক্ষ পাকিস্তান কর্তৃপক্ষকেও জানাইয়াছেন। কিন্তু তাহার কোন ফল হইবে বলিয়া আমরা মনে করি না। কারণ পূর্বের জ্ঞান এখনও পাকিস্তান কর্তৃপক্ষ বলিতেছেন যে ঐ সকল অনাচার সরকারী লোক করে না, বেসরকারী ওজা বা আনসার দল তাহা করিয়া থাকে—কিন্তু সে কথা সত্য নহে। সত্য হইলেও সরকারী কর্মচারীরা সে সকল অত্যাচার বন্ধ করার কোন ব্যবস্থা করেন না। এ অবস্থার চুক্তির সর্ব ভারতরাষ্ট্র কতদিন আর মানিয়া চলিবেন? বাহাদের জন্ত চুক্তি তাহারা যদি কোন সুবিধা না পায়, তবে ত এই চুক্তি বিফল হইয়াছে। তাহার পর দেশবাসীর কর্তব্য কি?

### অধ্যাপক ভাণ্ডারকর—

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের খ্যাতনামা অধ্যাপক, ভারতীয় সংস্কৃতিতে সুপণ্ডিত ডাক্তার দেবদত্ত রামকৃষ্ণ ভাণ্ডারকর ৭৫ বৎসর বয়সে গত ৩০শে মে কলিকাতায় পরলোক গমন করিয়াছেন। তিনি পুনর খ্যাতনামা পণ্ডিত, ভাণ্ডারকর ইনষ্টিটিউটের প্রতিষ্ঠাতা স্বর্গত সার রামকৃষ্ণ গোপাল ভাণ্ডারকরের পুত্র। তিনি ১৯১৭ সাল হইতে

দীর্ঘ ২০ বৎসর কাল কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতির অধ্যাপক ছিলেন। তিনি ভারতের প্রাচীন সংস্কৃতি সম্বন্ধেও বহু গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুতে একজন শিকারতী পণ্ডিতের অভাব হইল।



শ্রীশ্রীযোগেশ্বরী রামকৃষ্ণ মঠে পশ্চিমবঙ্গের প্রদেশপাল ডাঃ কৈলাসনাথ কাটজু। সমবেত সভ্যবৃন্দ ও প্রদেশপালের সমক্ষে মঠের বাৎসরিক আর ব্যয়ের হিসাব দাখিল রত মঠ-সম্পাদক শ্রীরাঙ্গেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায়। বামে মঠের অন্ততম কর্মী শ্রীশৈলেন মুখোপাধ্যায়  
কটো—দিলীপ সেন

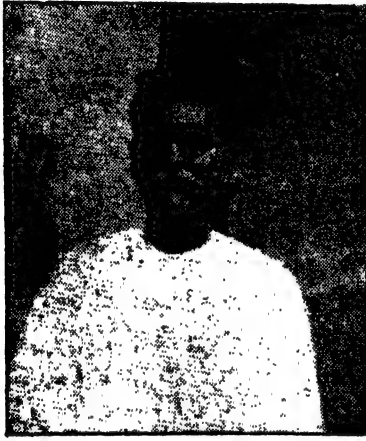
### কাশ্মীর সমস্যা ও তাহার সমাধান—

ভারতরাষ্ট্র ও পাকিস্তান উভয় দেশই কাশ্মীর দাবী করায় যে অচল অবস্থার উদ্ভব হইয়াছে, তাহার সমাধানের জন্য রাষ্ট্রসংঘের পক্ষ হইতে সার ওয়েন ডিক্সন ভারতে আসিয়া সকল অবস্থা পর্যবেক্ষণ করিতেছেন ও উভয় পক্ষের সহিত কথা বলিয়া সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করিতেছেন। তিনি কয়েকদিন সকলের কথা শুনার পর মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন যে, সমস্যা এরূপ জটিল যে উহার সমাধান সহজসাধ্য হইবে না। অথচ কাশ্মীর সমস্যা সমাধানের উপর শুধু ভারত-পাকিস্তানের শান্তি নহে, সমগ্র জগতের শান্তি নির্ভর করিতেছে। উভয় পক্ষকে সঙ্কট করিয়া তিনি সমাধানের ব্যবস্থা করিবেন বলিয়া আশা করেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কি তাহা সম্ভব হইবে? প্রথমেই ঐ দেশ দখল না করিয়া পণ্ডিত জহরলাল নেহরু যে ভুল করিয়াছেন, তাহার জন্য ভারতকে হয় ত শেষ পর্যন্ত দারুণ ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইবে। সে সময়ে জাতি সংঘের দ্বারস্থ না হইলেই পণ্ডিতজী ভাগ কাঁজ করিতেন। এখন

বোধ হয় কাশ্মীর ভাগ অথবা যুদ্ধ—এ ছাড়া সমস্ত সমাধানের অল্প উপায় নাই। পণ্ডিতজী যুদ্ধ-বিরোধী, কাজেই কাশ্মীর ভাগ করা ছাড়া অল্প উপায় দেখা বাইতেছে না।

### নগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়—

নদীয়া জেলার রাণাঘাট নিবাসী খ্যাতনামা উকীল, নদীয়া জেলা বোর্ডের ভূতপূর্ব চেয়ারম্যান নগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় গত ২১শে মে ৭৮ বৎসর বয়সে তাঁহার রাণাঘাটের বাসগৃহে পরলোক গমন করিয়াছেন।



নগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

তিনি সামান্য অবস্থা হইতে নিজ পরিশ্রম ও কর্মদক্ষতায় উন্নতিলাভ করেন। তিনি এক সঙ্গে ২০ বৎসর নদীয়া জেলাবোর্ডের চেয়ারম্যানের কাজ করেন—সে সময়ে নদীয়া জেলায় মুসলমান প্রাধান্য ছিল। তিনি সমবায় আন্দোলনের প্রথম হইতে উহার সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন। তাঁহাকে ১৯২৮ সালে রায় বাহাদুর ও ১৯৩৭ সালে ও-বি-ই উপাধি দেওয়া হইয়াছিল। রাণাঘাটের সকল সদস্যদের সহিত তিনি সংশ্লিষ্ট ছিলেন ও সর্বদা রাণাঘাটের উন্নতির জন্য চেষ্টা করিতেন। তিনি ১২ বৎসর কাল রাণাঘাট লোকাল বোর্ডের সভাপতি ও ১২ বৎসর রাণাঘাট মিউনিসিপালিটির ভাইস চেয়ারম্যান ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর সপ্তম দিনে তাঁহার পত্নীও পরলোকগমন করিয়াছেন।

### কম্যুনিষ্ট চীন বহিষ্কার—

ক্লোরেন্স রাষ্ট্রসংঘের শিক্ষাবিজ্ঞান-সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠানে

কৃষ্ণনের প্রভাবে জাতীয়তাবাদী চীনের প্রতিনিধিকে অপসারিত করিয়া কম্যুনিষ্ট চীনের প্রতিনিধিকে গ্রহণ করার প্রস্তাবের বিপক্ষে ৩০ জনও পক্ষে মাত্র ৪ জন ভোট দেওয়ায় ঐ প্রস্তাব অগ্রাহ্য হইয়াছে। ১৪ জন প্রতিনিধি নিরপেক্ষ ছিলেন। এই ঘটনা হইতে সাম্রাজ্যবাদের অবস্থা স্পষ্ট বুঝা যায়। পৃথিবী গণতন্ত্রের বতই জয় ঘোষণা করুক না কেন, সাম্রাজ্যবাদীদের প্রতীক ও প্রতিষ্ঠা এখনও পৃথিবীতে পূর্ণভাবেই রহিয়া গিয়াছে। সে জন্য কম্যুনিষ্ট চীন চৈনিক সংস্কৃতির প্রকৃত প্রতিনিধি হইয়াও রাষ্ট্রসংঘে স্থান লাভ করিতে পারিল না।

### কম্যুনিষ্ট দলের পলন্দ—

ভারতে এক সময় কম্যুনিষ্ট ভীতি সকলকে সন্ত্রাস করিয়াছিল এবং নানা প্রদেশে কম্যুনিষ্ট অনাচার হওয়ায় দেশবাসী শঙ্কিত হইয়াছিল। কিন্তু ঐ দলের যুদ্ধ কালীন নেতা শ্রীপুরাণচাঁদ বোশী দল হইতে বহিষ্কৃত হওয়ার পর দলে ভাঙ্গন ধরিয়াছে ও দল ক্রমশঃ হীনব হইয়া পড়িতেছে। শ্রীবোশী ৬৪ পৃষ্ঠার একখানি পুস্তিক প্রকাশ করিয়া দলের গল্প প্রকাশ করিয়াছেন ও তাহা ফলে দল হইতে বহু ভাল নেতা সরিয়া পড়িয়াছেন শুধু দেশের সকল কাজ পণ্ড করিয়া নিজ নিজ স্বার্থ সিদ্ধির জন্য যে কম্যুনিষ্ট দল এ দেশে গঠিত হইয়াছিল তাহা যে স্বার্থ লাভ করিতে পারে না, তাহা প্রমাণ হইতেই বুঝা গিয়াছিল। একদল অসম্ভব রাজনীতি কর্মী ভুল করিয়া ঐ দলে প্রবেশ করে ও পরে যৎ নিজেদের ভুল বুঝিতে পারে, তখন দল ছাড়িয়া চলা আসে। শুধু স্বার্থসিদ্ধির উপায়রূপে কোন রাজনীতি দল দেশে টিকিয়া থাকিতে পারে না। বহু অধিক কম্যুনিষ্ট এই সত্য বুঝিতে পারিবে, ততই দেশের পক্ষে মঙ্গল।

### ভারতের পণ্ডিতগণ—

ভারতের পণ্ডিতগণ বিলি লইয়া গওগোলের কী তীর্থঙ্কর মোহান্ত মহারাজের উপর যে আক্রমণ হইয়াছে সে সংবাদে দেশবাসী সকলেই ব্যথিত হইয়াছে। বাহারা ঐ আক্রমণের জন্য দায়ী, তাহারা মোহান্ত মহারাজের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা না করায় তথায় ও অচল অবস্থা সৃষ্ট হইয়াছে। সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গ

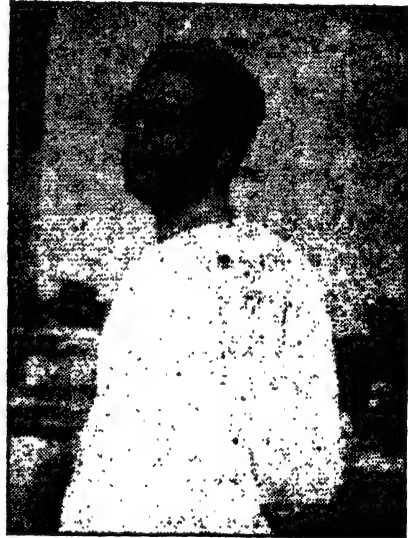
প্রজামন্ডল সমিতির প্রকাশ্য প্রতীতি তথায়  
হাইয়া এই সম্বন্ধে উদ্দেশ্যের পর যে বিবৃতি প্রকাশ  
করিয়াছেন, তাহাতে সত্য ঘটনা জানা যায়। ভোগ-  
বিতরণ ব্যাপারে যেমন ক্ষতি দেখা যায়, তেমনই আক্রমণ-  
কারীদের কার্যও কিছুতেই সমর্থন করা যায় না। বহু  
দিন হইতে তারকেশ্বর পরিচালনা-কমিটির সহিতও  
মোহান্ত মহারাজের বনিবনাও হইতেছিল না। বর্তমানে  
এ সমস্যার সমাধান হওয়া প্রয়োজন। আমরা গল্পী-  
মন্ডল সমিতিতে অগ্রণী হইয়া অব্যবস্থা দূর করিবার জন্ত  
চেষ্টা করিতে অগ্ররোধ করি। তারকেশ্বরের বর্তমান  
মোহান্ত বাঙ্গালী ও অসাধারণ পণ্ডিত ব্যক্তি—সাধক।  
তাঁহার সময়ে তারকেশ্বরে গণগোল থাকাও আদৌ  
বাঞ্ছনীয় নহে। স্বাধীন দেশে ধর্ম্মস্থান সংস্কারেও শাসক-  
মণ্ডলীর চেষ্টা থাকা প্রয়োজন।

### দিল্লীতে ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়—

প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত জহরলাল নেহরুর আহ্বান পাইয়া  
পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায় দিল্লী  
গিয়াছিলেন এবং গত ২৭শে ও ২৮শে মে দিল্লীতে ছিলেন।  
লিয়াকৎ-নেহরু চুক্তি সম্পর্কে ডক্টর শ্রীমাশ্রাদ ও  
ডক্টর প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ যে সকল বিবৃতি দান করিয়াছেন,  
তাহাতে বিচলিত হইয়া ও সে বিষয়ে পশ্চিমবঙ্গ  
সরকারকে কর্তব্য নির্দেশ করিবার জন্ত পণ্ডিতজী  
ডাঃ রায়কে দিল্লীতে আহ্বান করিয়াছিলেন। পূর্ববঙ্গ  
সরকারের সদিচ্ছা সম্বন্ধে পশ্চিম বাংলায় কেহই  
বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারিতেছেন না—সে কথা  
বার বার ডক্টর শ্রীমাশ্রাদ ও ডক্টর প্রফুল্ল ঘোষ  
প্রকাশ করিয়াছেন। পশ্চিমবঙ্গ গভর্ণমেন্টের পক্ষে  
বেশবাসীর সে মনোভাবের পরিবর্তন সাধন কি সম্ভব?  
পণ্ডিত নেহরু ইন্দোনেশিয়া হইতে ফিরিবার পথে  
২৪শে জুন কলিকাতার আসিবেন ও ২ দিন থাকিয়া  
পশ্চিমবঙ্গের অবস্থা দেখিয়া যাইবেন। তিনি কি সে  
সময়ে মত পরিবর্তন করিতে সমর্থ হইবেন? পূর্ববঙ্গে  
উৎপীড়ন ও অত্যাচার বন্ধ হইবার কোন আশাই দেখা  
যায় না—কাজেই চুক্তি হয় ত শেষ পর্যন্ত ছেঁড়া কাগজে  
পরিণত হইবে।

### মণীন্দ্রচন্দ্র সমাদান—

‘বিহার হেরাল্ড’ সম্পাদক ও ‘প্রভাতী’ মাসিক পত্রের  
প্রতিষ্ঠাতা মণীন্দ্রচন্দ্র সমাদান গত ২৩শে মে মাত্র ৩৬  
বৎসর বয়সে পাটনার পরলোক গমন করিয়াছেন জানিয়া  
আমরা মর্মান্বিত হইলাম। তিনি পাটনার খ্যাতনামা  
ঐতিহাসিক অধ্যাপক যোগীন্দ্রনাথ সমাদানের কনিষ্ঠ পুত্র।  
‘বিহার হেরাল্ড’ নামক ইংরাজি সাপ্তাহিক ১৮৭৪ সালে  
স্বর্গত গুরুপ্রসাদ সেন প্রতিষ্ঠা করেন—১৯৩৮ সালে মণীন্দ্র  
এ পত্রের সম্পাদক হন। কৃতিত্বের সহিত এম-এ পাশ



মণীন্দ্রচন্দ্র সমাদান

করিয়া তিনি সরকারী চাকরী বা অধ্যাপনার জীবন  
গ্রহণ না করিয়া সাংবাদিক হন ও গত ১৩ বৎসর ধরিয়া  
স্বাধীনভাবে দক্ষতা ও সাহসের সহিত সে কাজ করিয়া  
গিয়াছেন। ১৯৪০ সালে তিনি পাটনার বাঙ্গালী  
সমাজের মুখপত্ররূপ ‘প্রভাতী’ প্রকাশ করেন। এক  
বৎসর পূর্বে তিনি প্রভাতীর সম্পাদনভার শ্রীবুদ্ধদেব  
তট্টাচার্যের উপর অর্পণ করিয়াছিলেন। মণীন্দ্রের এই  
অকাল মৃত্যুতে পাটনার সাংবাদিক সমাজের ও বাঙ্গালী  
অধিবাসীদের যে ক্ষতি হইল তাহা সহজে পূর্ণ হইবে না।  
আমরা তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গকে সমবেদনা  
জ্ঞাপন করি।

### বাস্তবত্যাগী ও উত্তর শ্রামাশ্রমাদ—

উত্তর শ্রামাশ্রমাদ মুখোপাধ্যায় মহাশয় কেন্দ্রীয় সরকারের মন্ত্রী কাজ ছাড়িয়া দিয়া কলিকাতায় কিরিয়া আসিয়া নিশ্চিত হইয়া বসিয়া থাকেন নাই। তিনি পূর্ববঙ্গ হইতে আগত লক্ষ লক্ষ বাস্ত-

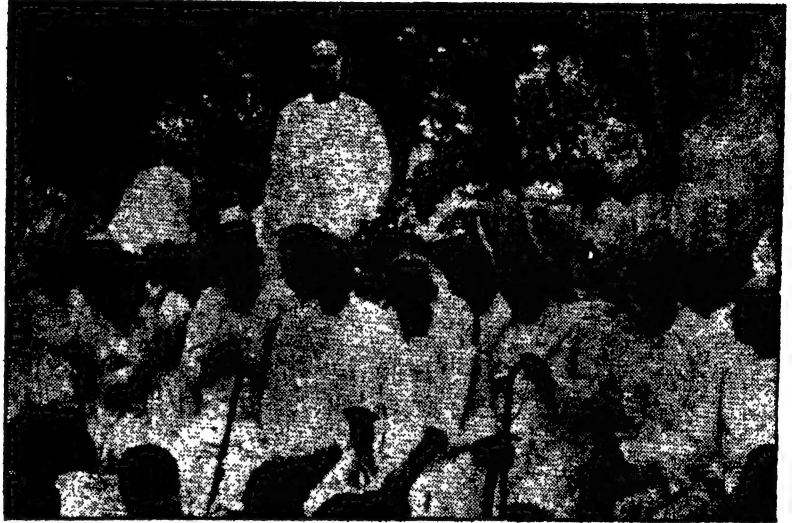
হারার দুঃখ দুর্দশা সম্বন্ধে তদন্ত করিয়া ঘুরিয়া বেড়াই-  
তেছেন ও সে বিষয়ে কর্তব্য  
নির্দেশ করিতেছেন। তিনি  
পর পর কয়দিন কাঁচরা-  
পাড়া, রাধাঘাট, বেনাপোল,  
বনগাঁ প্রভৃতি স্থানে গমন  
করিয়াছিলেন। কয় দিন  
ধরিত্রী নদীয়া ও মুর্শিদাবাদ  
জেলায় সীমান্তস্থিত গ্রাম-  
গুলির অবস্থা দেখিয়া  
আসিয়াছেন। সাহায্য ও  
পুনর্বাসতি কার্যে যে সকল  
গলদ দেখা যাইতেছে, তিনি  
সেগুলি সম্বন্ধেও কর্তৃপক্ষকে  
অবহিত করিতেছেন। সে  
জন্ত কয়বার তিনি পশ্চিম

বঙ্গের প্রধান মন্ত্রী ডাক্তার রায়ের সহিতও সাক্ষাৎ  
করিয়াছেন। মোটের উপর কি ভাবে দুর্গত বাস্ত-  
হারাদের পুনরায় উপযুক্তভাবে বাসস্থান ও কার্য  
দেওয়া যায়, উত্তর শ্রামাশ্রমাদের সে বিষয়ে বহু ও  
চেষ্টার অভাব নাই। মোটা বেতনের চাকরী ছাড়িয়া  
দিয়া আসিয়া তিনি যে দেশসেবার কার্য গ্রহণ করিয়াছেন,  
তজ্জ্ব তিনি পূর্ব ও পশ্চিম বঙ্গ উত্তর রাষ্ট্রের অধিবাসীদেরই  
বস্তাব্যবসায় হইয়াছেন, তাঁহার এই চেষ্টা সাক্ষ্যমণ্ডিত  
হউক, সকলেই উহা প্রার্থনা করিতেছে। বর্তমান দুর্গত  
বাংলার তাঁহার এই সেবাকার্য তাঁহাকে অসমর্থ বান  
করিবে।

### মুন্সিববন অঞ্চল হস্তবস্থা—

পশ্চিম বাংলার দক্ষিণপূর্ব সীমান্তে ২৪ পরগণা জেলার

অধিবাসীরা নানারূপ দুঃখকষ্ট ভোগ করিতেছে। এ  
বৎসর যোগেশগঞ্জ ইউনিয়নে ও পার্শ্ববর্তী ইউনিয়নে  
পানীয় জলের অভাবে বহু লোক কলেরায় মারা গিয়াছে।  
এ অঞ্চলে জেলাবোর্ডের যে সকল হেল্প এসিষ্ট্যান্ট



কাঁচরাপাড়া চাঁদমারী আশ্রমপ্রার্থী শিবিরে জনসভায় বক্তৃতা-রত উত্তর শ্রামাশ্রমাদ মুখোপাধ্যায়। দক্ষিণে  
শ্রীমখনলাল সেন, বামে শ্রীকলীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, মেজর প্রভাত বর্দন, ডাঃ ডি-এন, ভাষ্করী প্রভৃতি।

ছবির নিম্নে উপবিষ্ট পশ্চিমবঙ্গ পরী-মঙ্গল সমিতির সদস্যগণ—(বাম দিক হইতে)

শ্রীরজনীকান্ত পাল, শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মিত্র (সম্পাদক), শ্রীঅক্ষয়কুমার বসু, শ্রীহেমচন্দ্র রায়

শ্রীদীপেন্দ্রনাথ বর, শ্রীশ্রীচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীপ্রকাশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কটো—পাশা সেন

আছে তাহারা মাত্র ২০ টাকা মাসিক বেতন পান ও  
মদে ২০ টাকা ভাতা, ঘোরার জন্ত ৫ টাকা ও  
বাড়ীভাড়া ২ টাকা মোট ৪৭ টাকা পান। অথচ এই  
অঞ্চলে সরকারী হেল্প এসিষ্ট্যান্টগণ বেতন ৪৫ টাকা  
লইয়া মোট ১০৫ টাকা পাইয়া থাকেন। কাজেই  
তাহাদের দ্বারা কতটুকু কাজ হয় তাহা সহজেই বুঝ  
যায়। অথচ এই অঞ্চল হইতে ব্যবস্থা পরিবর্তে ৪ জন সদস্য  
নির্বাচিত হইয়াছে—ভদ্রাধো শ্রীবিমলচন্দ্র সিংহ ও শ্রীহেমচন্দ্র  
নন্দর মন্ত্রী, শ্রীঅর্কেন্দ্রেশ্বর নন্দর পার্লামেন্টারী সেক্রেটারী  
শ্রীচাক্রচন্দ্র ভাণ্ডারী ভূতপূর্ব মন্ত্রী। অতঃপর মন্ত্রী শ্রীহরেন্দ্র  
নাথ চৌধুরীও এই অঞ্চলের অধিবাসী। তাঁহার বা  
মুন্সিববনের দরিদ্র অধিবাসীদের সম্বন্ধে একটু অবহি  
হন, তবে তাহারা বহু প্রকারে উপকৃত হইতে পারে।

বিক্রা ও অতি সীমাস্ত। ২৪ পরগণা জেলা বোর্ড  
কর্তৃপক্ষ ও এ সম্পর্কে কিছু করেন বলিয়া মনে হয় না।

### সংশ্লিষ্ট অঙ্গ-সংস্থা—

স্বাধীনতা লাভের পর দেশরক্ষা ব্যবস্থা সম্বন্ধে নূতন  
শাসক মণ্ডলীকে অবহিত হইতে হইয়াছে। কেন্দ্রে যে  
সামরিক বিভাগ ছিল, তাহা সম্প্রসারিত হইয়াছে।  
পদাতিক ও অর্ধারোহী সৈন্ত ছাড়া এখন নৌ-সেনা ও  
বিমান-সেনার বিশেষ ব্যবস্থা করিতে হইয়াছে। প্রদেশ  
গুলিতেও দেশরক্ষা বিভাগ স্থাপন করিয়া বিশেষ  
প্রয়োজনের জন্য সৈন্ত সংগ্রহ বা খেজা-সৈনিক সংগ্রহ করা  
হইতেছে। পশ্চিম-বঙ্গ আজ বিশেষ বিপন্ন। পাকিস্তান  
হইতে অত্যাচারী আফ্রার বাহিনী প্রায়ই ২ হাজার মাইল  
সীমান্তের যে কোন স্থান দিয়া পশ্চিম বঙ্গ আক্রমণ  
করিতেছে—গিয়াক-নেহরু চুক্তির পরও সে আক্রমণ বা  
অত্যাচার বন্ধ হয় নাই। আক্রমণে বাধা দিবার কোন  
উপযুক্ত ব্যবস্থা পশ্চিম বঙ্গের পক্ষ হইতে করা হইয়াছে  
বলিয়া মনে হয় না। আমরা নরীয়া ও মুর্শিদাবাদের  
সীমান্ত পরিভ্রমণের সময় যে অব্যবস্থা দেখিয়াছি, তাহাতে  
চিন্তিত না হইয়া থাকা যায় না। ৪ মাইল অন্তর একটি  
করিয়া সীমান্ত পুলিশ স্টেশন—তথায় মাত্র ৫১৬ জন প্রহরী  
বাস করে—তাহার পর ৪ মাইলের মধ্যে কোন পাহারা  
নাই। সীমান্তে প্রাচীর, নদী বা কোন বাধা দিবার কিছুই  
নাই। তাহার সুযোগ লইয়া পাকিস্তানী আশ্রয়গণ  
আমাদের রাজ্যে আসিয়া প্রয়োজন মত সকল জিনিষ লুণ্ঠ  
করিয়া বাজর করিয়া লইয়া যাইত। সে ব্যবস্থা এখনও  
বন্ধ হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। পাকিস্তান হইতে আগত  
হিন্দুরা ঐ সকল সীমান্তে গৃহ নির্মাণ করিয়া বাস করে।  
তাহাদের উপর আনুসারদের ক্রোধ অধিক—কাজেই ঐ  
সকল হিন্দু প্রায়ই অত্যাচারিত ও লুণ্ঠিত হয়। পাকিস্তানী  
আনুসার বাহিনী ওদেশে সীমান্ত রক্ষার কাজ করে।  
আমাদের রাজ্যে ঐরূপ কোন রক্ষীদের ব্যবস্থা নাই।  
একদল লোককে জাতীয় রক্ষী বাহিনীর অন্তর্ভুক্ত করিয়া  
সামরিক শিক্ষা দান করা হইয়াছে বটে, কিন্তু এখন  
পর্যন্ত তাহাদের সীমান্ত রক্ষার কার্যে নিযুক্ত করা হয়  
নাই। ২৪ পরগণার সীমান্তগুলিও এখন পর্যন্ত অরক্ষিত  
অবস্থায় আছে। যে সকল স্থান দিয়া চোরাই মাল

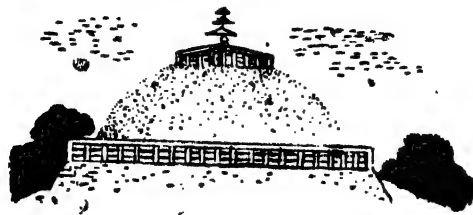
আনদানী রপ্তানী হইয়া থাকে—পাহারার ব্যবস্থা না থাকায়  
চোরাই কারবারের ব্যবসায়ীরা তথায় কালোবাজার তৈয়ারী  
সুবিধা পাইয়া থাকে। ঐ ভাবে কত মাল যে ভারত রাষ্ট্র  
হইতে পাকিস্তানে চলিয়া গিয়াছে, তাহার কোন হিসাব  
পাওয়া যায় না। আমাদের শাসকবর্গ কেন যে এখনও  
দেশরক্ষা ব্যাপারে উপযুক্ত সতর্কতা অবলম্বন করেন নাই,  
তাহা জানি না। এ জন্য যে পরিমাণে রক্ষী বাহিনী গঠন  
করা প্রয়োজন ছিল তাহাও করা হয় নাই। সে জন্য  
পাকিস্তানী আক্রমণ চলিলেও এ পক্ষ হইতে তাহাতে বাধা  
দেওয়া সম্ভব হয় না। কতদিন এই ভাবে আমরা আক্রান্ত  
ও অত্যাচারিত হইব, তাহা কে জানে?

### বৃক্ষ-রোপণ উৎসব—

গত কয় বৎসর ধরিয়া পশ্চিম বঙ্গ গভর্নমেন্টের কৃষি  
বিভাগ হইতে বর্ষাকালে বৃক্ষ রোপণ উৎসবের আয়োজন  
করা হইতেছে। কিন্তু ছুঃখের বিষয় এই যে, এক দিকে  
জনগণের উৎসাহের অভাব, অন্য দিকে সরকার পক্ষের  
মামুলী বিজ্ঞাপন—উভয়ের জন্য অধিকসংখ্যক বৃক্ষ  
রোপণের ব্যবস্থা দেখা যায় না। বাংলা দেশে গাছের  
সংখ্যা কমিয়া বাওয়ায় উপযুক্ত বর্ধারও অভাব দেখা  
দিয়াছে, সে জন্য বন বিভাগ হইতে পশ্চিম বাংলার কোন  
কোন জেলায় নূতন করিয়া বন স্থষ্টিরও আয়োজন  
চলিতেছে। এ দেশে সাধারণ গৃহগণ গ্রামে আম, জাম,  
কাঁঠাল, পেয়ারা, জামরুল, লিচু প্রভৃতি ফলের বাগান নিজ  
নিজ গৃহের চতুর্দিকে তৈয়ার করিত। মানুষ গ্রামের বাহ  
ছাড়িয়াছে, সকলে সহরের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছে, কাজেই  
কেহ আর ফলের বাগান তৈয়ার করে না। পিতামহ বা  
প্রপিতামহ যে ফলের বাগান তৈয়ার করিয়া গিয়াছিলেন,  
গত মহাযুদ্ধের সময় একটা গাছের দাম এক শত টাকা  
হওয়ায় (কমলার অভাবে কাঠের চাহিদা বাড়ায়) লোক  
সে সকল গাছ অর্থের লোভে বিক্রয় করিয়া দিয়াছে, ফে  
সকল ফলের গাছের স্থানে নূতন বাগান তৈয়ারী হয় নাই  
সে জন্য আজ বাংলায় ফলের দামও অত্যধিক হইয়াছে  
এ অবস্থায় সরকারী কৃষি-বিভাগ হইতে বৃক্ষ রোপণ সম্বন্ধে  
বিশেষ চেষ্টা প্রয়োজন হইয়াছে। বাহাতে প্রত্যেক গৃহ  
নিজ নিজ জমীতে ফলের গাছ রোপণ করেন, সে জ

সকলকে অবহিত করা প্রয়োজন। সরকারী বাগানে ফলের গাছের চারা তৈয়ার করিয়া তাহা সকলের মধ্যে ভুলতে সরবরাহ করা কর্তব্য। এবার বাংলায় প্রচুর আম হইলেও আমের দর কমে নাই—কারণ মানুষের সংখ্যার তুলনায় আম গাছের সংখ্যা খুবই কমিয়া গিয়াছে। ধনীরা বাহাতে ফলের বাগান করিতে উৎসাহিত হয়, কৃষি-বিভাগ সে জন্ত কোন চেষ্টা করেন না। বৃক্ষ রোপণের নানা মিক আছে। নিয় বন্ধে প্রচুর নারিকেল উৎপন্ন হয়—অথচ নারিকেলের চাব বৃদ্ধিতেও সরকার কোন প্রকার উৎসাহ দান করেন না। যে ভাবে ধান-চাষীদের অধিক পরিমাণ ফসল উৎপাদনের জন্ত পুরস্কার প্রদান করা হইয়াছে, সেই ভাবে ফলের বাগান তৈয়ারীর জন্ত, অধিক পরিমাণ তরিতরকারী উৎপাদনের জন্তও পুরস্কার প্রদানের ব্যবস্থা করা উচিত ছিল। অনেক বড় বড় প্রশস্ত নতুন পথ তৈয়ার হইতেছে—সেই সকল পথের ধারে ফলবান বৃক্ষ রোপণ করিলে পথের সৌন্দর্য বৃদ্ধি পায়, পথচারীরা রৌদ্রের তাপ হইতে রক্ষা পায় ও সঙ্গে সঙ্গে ফল উৎপন্ন হইয়া দেশে ফলের অভাব দূর করে। সে বিষয়ে কাহারও কোন চেষ্টা দেখা যায় না। পুরাতন পথগুলির ধারে যে বৃক্ষরাজি ছিল, সেগুলি নষ্ট হইয়া বাইতেছে, তাহার স্থানে নতুন বৃক্ষ লাগাইবারও কোন চেষ্টা দেখা যায় না। ৩০ বৎসর পূর্বে আমরা দেখিয়াছি, বারাকপুর ট্রাক রোডের ধারে কেহ একটি নতুন গাছ তৈয়ার করিয়া দিলে তাহাকে ৫ টাকা পুরস্কার দেওয়া হইত। এখন কি আবার সে প্রথা প্রবর্তন করা যায় না? অবশ্য এখন পুরস্কারের পরিমাণ ৪।৫ গুণ করা প্রয়োজন হইবে। তাহা করিলে শুধু ঐ একটি পথের ধারেই কয়েক সহস্র গাছ তৈয়ার হইতে পারে। আমাদের এক বন্ধু কয়েক বৎসর পূর্বে বড় বড় রাস্তার ধারে নারিকেল গাছ রোপণের প্রস্তাব করিয়াছিলেন। প্রচুর পরিমাণ নারিকেল উৎপন্ন হইলে তাহার দেশের খাদ্যভাব কতক পরিমাণে কমিয়া যাইবে। বর্তমানে দেশে জ্বালানী

কাঠের খুবই অভাব। অথচ এক শ্রেণীর জ্বালানী কাঠের গাছ পথের ধারে রোপণ করিলেই বড় বড় গাছে পরিণত হয়—সে গাছগুলি অতি শীঘ্র বর্ধিত হইয়া থাকে। সে দিকেও কৃষি বিভাগের কর্তৃপক্ষদের যত্নবান হওয়া প্রয়োজন। মিউনিসিপালিটি, ইউনিয়ন বোর্ড, জেলা বোর্ড প্রভৃতি বাহাতে এ কার্যে আগ্রহ হয়, সরকারী স্বায়ত্তশাসন বিভাগ ও কৃষি-বিভাগ সে বিষয়েও কেন অবহিত হন না জানি না। স্কুল কলেজের ছাত্রদিগকে অতি সহজে এই কার্যে নিযুক্ত করা যায়। তাহার্য বোঝেন এ কার্যে উৎসাহ পাইলে সারা জীবন সে অভ্যাস রক্ষা করিয়া চলিতে পারিবে। বাংলাদেশের বহু স্থানে রথের উৎসব হয়, রথের বাজারে পূর্বে বহু গাছের চারা বিক্রীত হইত—এখনও কোন কোন স্থানে সে ব্যবস্থা দেখা যায়। বর্ষার প্রথমেই রথ হয়—কাজেই লোক রথের বাজারে চারা কিনিয়া বর্ষার প্রথমে তাহা বাগানে রোপণ করিলে বর্ষার জলে সে সকল গাছ বাঁচিয়া বাইত। সে ব্যবস্থায় উপযুক্ত ব্যক্তিদেরও অহুপ্রাণিত ও উৎসাহিত করা প্রয়োজন। কৃষি-বিভাগের কর্মচারীরা বাহাতে এ সকল কাজে মন দেন, তাহার ব্যবস্থা প্রয়োজন। খাত-বিভাগ হইতেও এ বিষয়ে কাজ করা উচিত। ফলের গাছই হউক, জ্বালানী কাঠের গাছই হউক—আমাদের খাত ব্যবস্থা সম্পর্কে সেগুলির বিশেষ প্রয়োজনীয়তা আছে। পূর্বে পথের ধারের তেঁতুল গাছগুলি হইতে এত অধিক তেঁতুল পাওয়া যাইত যে তেঁতুলের সের ছিল ১ পয়সা। আর এখন তাহা ৮ আনা। পথের ধারে কাহাকেও আর নতুন তেঁতুল গাছ বসাইতে দেখা যায় না। জীবনে হয় ত সরকার পক্ষ হইতে বৃক্ষ রোপণ সপ্তাহ অহুপ্রাণিত হইবে, সে জন্ত আমরা এখন হইতে সকলকে উৎসাহের সহিত সে বিষয়ে কার্য করিতে অহুপ্রাণিত করি। দেশের প্রত্যেক নরনারী যদি এ বিষয়ে মনোবোর্ধ হন, তাহা হইলে সমস্তার সমাধান করা আরো কষ্টকর হইবে না।







শ্রীক্ষেত্রনাথ রায়



হৃৎকম্পের চট্টোপাধ্যায়

### ফুটবল লীগ ৪

ক'লকাতার গড়ের মাঠে ক্যালকাটা ফুটবল লীগের ঐতিহ্য বিভাগের খেলা যথারীতি আরম্ভ হয়ে গেছে। গত বছরের থেকে খেলার মাঠের দর্শক সংখ্যা বহুগুণ দ্বিগুণ হয়েছে। মোহনবাগান কিংবা ইস্টবেঙ্গল দলের সঙ্গে যেকোন দুর্বল দলের খেলায় মাঠে বেশ দর্শক সমাগম হচ্ছে। এর কারণ, খেলার ভাল স্ট্যান্ডার্ড নয়, প্রধান কারণ হল ক'লকাতায় লোক সংখ্যা অনেক বেড়ে গেছে। ঐ পর্যন্ত প্রথম বিভাগের লীগে যতগুলি খেলা হয়েছে তার ফলাফলের উপর লীগের উপরের দিকে আছে গত বছরের লীগ ও শীল্ড বিজয়ী ইস্টবেঙ্গল ক্লাব, মোহনবাগান এবং রাজস্থান। ইস্টবেঙ্গল ৯টা খেলায় ১৭ পয়েন্ট করেছে। জর্জ টেলিগ্রাফের সঙ্গে তাদের খেলার ফলাফল এর সঙ্গে ধরা হয়নি। সেদিন খেলা শেষ হবার নির্ধারিত সময়ের তিন মিনিট আগে পর্যন্ত খেলাটা ড্র থাকছিল এমন সময় ইস্টবেঙ্গল এক গোল দেয়। এই গোল হবার আগেই রেফারী অফ সাইডের হুইসেল দেন। কিন্তু মাঠে একদল উচ্ছৃঙ্খল দর্শক ঢুকে পড়ায় খেলাটা শেষ পর্যন্ত আর হয়নি, অসমাপ্ত অবস্থায় থেকে যায়। এ খেলার পয়েন্ট সম্পর্কে আই এফ এ-র কাছ থেকে এখনও কোন স্পষ্ট মত পাওয়া যায়নি। ইস্টবেঙ্গল ক্লাব ১০টা খেলার মধ্যে ৩টে খেলায় দলের সুনাম অস্থায়ী খেলতে পারেনি। তাদের খারাপ খেলা হয়েছে কালীঘাট, জর্জ টেলিগ্রাফ এবং ক্যাল: গ্যারিসন দলের সঙ্গে। কালীঘাট ক্লাবের সঙ্গে খেলায় ইস্টবেঙ্গল ক্লাব শেষ পর্যন্ত ১-০ গোলে জয়ী হয়ে কোন রকমে মান রক্ষা করেছে। খেলার আগে কেউ ভাবতে পারেনি

অধ্যাতনামা একেবারে তরুণ বাঙ্গালী খেলোয়াড় নিয়ে কালীঘাট ক্লাব গত বছরের লীগ-শীল্ড-বোভাস বিজয়ী ইস্টবেঙ্গল ক্লাবকে একেবারে নাজেহাল করবে। নিরপেক্ষভাবে সেদিনের খেলা বিচার করলে ঐ দিনের খেলার কালীঘাট ক্লাবের জয়লাভই সম্ভব হ'ত। কালীঘাট ক্লাব-দুর্ভাগ্যক্রমে হেরে গেলেও দর্শকদের একথা বুঝিয়ে দিয়েছে বাঙ্গলার যুব শক্তি উপেক্ষিত হলেও এখনও মরেনি; অভিজ্ঞতা এবং খ্যাতির দিক থেকে কালীঘাট ক্লাব ইস্টবেঙ্গল দলের খেলোয়াড়দের সামনে দাঁড়াতে পারে না কিন্তু এ সমস্তই সম্ভবদ জাতীয়তাবোধের কাছে কি ভাবে চুরমার হতে পারে সেদিনের খেলায় তারা দেখিয়ে দিয়েছে। আমরা কালীঘাট ক্লাবের বাঙ্গালী খেলোয়াড়দের আন্তরিক অভিনন্দন জানিয়ে বলি 'সাবাস! সাবাস! এই সঙ্গে যে সব ক্লাব উৎকট দলীয় স্বার্থে বাইরের খেলোয়াড় আমদানী ক'রে লীগ-শীল্ড পাওয়াটাই একমাত্র কাম্য হিসাবে গ্রহণ করেছে, তাদের সেদিনের খেলার অবস্থা অসুধাবন করতে অসুযোগ করি। জর্জ টেলিগ্রাফের সঙ্গে খেলায় ইস্টবেঙ্গল দলের আক্রমণ ভাগের খেলোয়াড়রা দর্শকদের হতাশ করেছে। খেলোয়াড়দের বহু ক্ষুণ্ণ সমর্থকেরা শেষ পর্যন্ত বিরক্ত হয়ে উঠেছিলেন। ক্যালকাটা গ্যারিসনের বিপক্ষে ইস্টবেঙ্গলের তিনজন নিরমিত খেলোয়াড় নামেনি। ভিলে মাঠের সুরীধা পেয়ে সৈনিকদল ইস্টবেঙ্গল দলের থেকে অধিক অব্যর্থ গোলের সুযোগ পায় কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তার একটীকও সফলতার করতে পারেনি। ইস্টবেঙ্গল দলের খেলোয়াড় আবিদ এবছর মহম্মদান স্পোর্টিং দলে যোগদান করার দলের বিশেষ কতি হয় নি। তাদের 'করওয়ার্ড লাইন' এখনও অল্প দলের থেকে



সর্বাপেক্ষা ক্রতপারী এবং শ্রেষ্ঠ। সেই ভুলনার হাক লাইন সুবিধার নয়। রক্ষণভাগে একমাত্র ব্যোমকেশ বোসই নির্ভরশীল। তাজ মহম্মদের মত একজন শক্তিশালী ব্যাকের অভাব বেশ বুঝতে পারা যাচ্ছে। আক্রমণভাগে শক্তিশালী খেলোয়াড় থাকার জন্য রক্ষণভাগে এখনও তেমন চাপ পড়েনি। দলের কৃতিত্ব এ পর্যন্ত একটা খেলাতেও হারেনি এবং মাত্র একটা গোল খেয়েছে। গোল দিয়েছে ই-আই রেলদলের মেওয়ালাল। খেলা দু' গেছে একটা, ডালতৌসির সঙ্গে। ১০টা খেলায় ২১টা গোল দিয়েছে। ১০টা খেলায় ১৬ পয়েন্ট করে দ্বিতীয় স্থানে আছে গত বছরের আই এক এ লিগের রানার্স-আপ মোহনবাগান ক্লাব। মোহনবাগান এখনও পর্যন্ত হারেনি। ২০টা গোল দিয়ে ৩০টে গোল খেয়েছে। দলের নতুন খেলোয়াড়দের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ফরওয়ার্ডে সন্তার (মহঃস্পোর্টিং), এস গড়গড়ি, অনিল মুখার্জি (রাজহান); হাফব্যাকে ডি পাইন (এরিয়াল) এবং রতন সেন (রাজহান)। মূল্যবান এক পয়েন্ট নষ্ট করেছে স্পোর্টিং ইউনিয়নের সঙ্গে খেলা দু' করে। রাজহান ক্লাব ১০টা খেলে ১৫টা পয়েন্ট পেয়েছে। রাজহান লীগের খেলায় প্রথম হেরেছে ১-০ গোলে ইস্টবেঙ্গল দলের কাছে। রাজহানে একাধিক নামকরা খেলোয়াড় এ বছর যোগ দিয়েছে। ভারতীয় অলিম্পিক গোলরক্ষক সঞ্জীব, হাফব্যাকে অরোকিয়া স্বামী ও মহাবীর, ফরওয়ার্ডে বজ্র ভেলু, জাম্পাদী, রমন, এটনি এবং ডি জুজ। দলের রক্ষণ এবং আক্রমণভাগ সমান শক্তিশালী। খেলোয়াড় সংগ্রহের দিক থেকে রাজহান ক্লাব ফুটবল ক্রীড়ামহলে যে চাকল্য সৃষ্টি করেছিল খেলায় তেমন কিছু দেখাতে পাচ্ছে না। এ পর্যন্ত বেশী গোল দেওয়ার কৃতিত্ব লাভ করেছে আর দাশগুপ্ত (কালীঘাট) ৭; মেওয়ালাল (ই-আই-আর) ৭; এই সঙ্গে উল্লেখযোগ্য, ডেকটেন ও ধনরাজ (ইস্টবেঙ্গল) ৬; কে সিংহ, (কালীঘাট) ৬; এ ব্যানার্জি (জর্জটেলিঃ)—৫; ইউরোপীয় সমাজের স্বজাধারী বিখ্যাত ক্যালকাটা ক্লাব লীগের শেষ ধাপে আছে। ১২টা খেলায় ২ পয়েন্ট করেছে। পর পর দশটা খেলায় হেরে ক্যালকাটা ক্লাব ভবানীপুর দলের সঙ্গে ২-২ গোলে খেলা দু' করে। এক পয়েন্ট পায়। এবছর কোন দল লীগ পাবে এবং কোন দল দ্বিতীয়

বিভাগে নামবে এ জানবার আগ্রহ দর্শকমহলের সমান। শেষ পর্যন্ত যদি ক্যালকাটা ক্লাবই লীগের সর্বশেষ স্থান অধিকার করে তাহলে এই দলের সম্মান কি উপার্ণে বজায় রাখা যায় এই নিয়ে নিশ্চয় ক্রীড়ামহলে নানা জল্পনা কল্পনা চলবে। এটা কম উপভোগ্য বিষয় হবে না।

মহম্মেদান স্পোর্টিং লীগের তালিকায় বর্তমান অবস্থায় ১০টা খেলায় ১৩ পয়েন্ট করে চতুর্থ স্থানে আছে। হার হয়েছে ১টার, রাজহান দলের কাছে ১-০ গোলে। জর্জটেলিগ্রাফ আছে পঞ্চম স্থানে এদের হার ২টো।

ভবানীপুর ১০টা খেলায় ৮টা ম্যাচ ড্র করেছে, হেরেছে ১টার, ইস্টবেঙ্গলদলের কাছে এবং জিতেছে ক্যালকাটা গ্যারিসনের সঙ্গে ৮ গোলে। 'কালীঘাট ৮-১ গোলে বি এন আরকে হারিয়েছে। এ বছর এ পর্যন্ত এত বেশী গোলে এই দু'দল ছাড়া কোন দল জিতে পারেনি।

**ইন্ডিয়ান ফুটবল মাস্তুল ৪**

১৯৫০ সালের ইলিংস ফুটবল মরসুমের পরিসংখ্যান ঘটেছে। নিচে ফলাফল দেওয়া হল।

এক এ কাপ :

বিজয়ী	রানার্স-আপ
আর্সেনাল—২	সিতারগুল—০
প্রথম বিভাগ লাগ	
চ্যাম্পিয়ানস	রানার্স-আপ
পোর্টসমাউথ—(৫০)	উলতার হামটন ওয়াটার্স (৫০)
দ্বিতীয় বিভাগ লীগ :	
টোটেনহাম হটস্পার (৬১)	শেফিল্ড ওয়েডনেসডে (৫২)
তৃতীয় বিভাগ (সিউথ)	
নটস কাউন্টি (৫৮)	নর্থহামটন টাউন (৫১)
তৃতীয় বিভাগ (নর্থ)	
ডনকাষ্টার রোভার্স (৫৫)	গেটসহেড (৬০)

৪২টা খেলায় কোন দল কত পয়েন্ট করেছে তা দলের নামের পর বন্ধনীর মধ্যে দেওয়া হয়েছে।

ফুটস লীগ 'এ' রেজার্স (৫০) হিবারনিয়ান (৪৯)  
ডিভিসন 'বি' মর্টোন (৪৭) এয়ারড্রিওনিয়ান (৪৪)  
**জাতীয় জীবনে ফুটবল খেলা ৪**

বাংলা দেশের সব থেকে জনপ্রিয় খেলাগুলো ফুটবল খেলার মরসুম কলকাতার গড়ের মাঠে গত যে মাসের

প্রথম থেকে শুরু হয়ে গেছে। ক'লকাতার গড়ের মাঠকে সারা ভারতের ফুটবল এবং হকি খেলার মহা-তীর্থক্ষেত্র বলা অসম্ভব হবে না। ফুটবল খেলার সঙ্গে বাঙ্গালী জাতির কৃষ্টি-সত্যতার বেন এক অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ, যেমন জীবনধারণের ক্ষেত্রে তাত ও মাছের। ক'লকাতা সহর ছাড়িয়ে বাংলার মকঃখল সহর, সহরতলী এবং পল্লী গ্রামাঞ্চলগুলিতে ফুটবল খেলার জনপ্রিয়তার তুলনা ভারতবর্ষের অন্য কোন প্রদেশে মিলবে না। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বাঙ্গালী জাতি ইংরেজ রাজত্বের সময় থেকেই নিঃস্ব হয়ে কল্পণাব পাত্র হাতে নিয়ে দাঁড়িয়েছে। বৈদেশিক শাসক-কূলের স্বার্থের প্রয়োজনে বাঙ্গালী জাতিকে আত্মত্যাগ এবং নানা প্রলোভনের বিনিময়ে চাকুরীবৃত্তির পথ বেছে নিতে বাধ্য করা হয়েছিলো। এর কুফল সমগ্র জাতির স্বাধীন সত্তার আত্মবিকারের পথে বর্ধিত বাধাব কারণ হয়ে দাঁড়ালেও বাঙ্গালী জাতির মধ্যে একাধিক প্রতিভাবান মনীষি জন্মগ্রহণ ক'রে সারা ভারতের দাসত্ব শৃঙ্খলমোচনের সংগ্রামে নেতৃত্বের সম্মান লাভ এবং সেই সঙ্গে চরম দুঃখ দুর্দশা এবং মৃত্যু পর্যন্ত বরণ করেছিলেন। বাঙ্গালী জাতির জীবনসত্তার মধ্যে রাজনীতিক চেতনার উন্মেষ বৈদেশিক শাসকমণ্ডলীর চোখে কিন্তু অপরাধের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এই অপরাধের শাস্তিরূপ শাসক সম্প্রদায় সমগ্র বাঙ্গালী জাতির ধন-প্রাণ, মান-সম্মানকে কি তাবে লুপ্তিত এবং লাহিত করেছে তার ইতিহাস দীর্ঘদিনের এবং আজকের ক্ষয়িষ্ণু বাঙ্গালী জাতিই বৈদেশিক কুটনীতি এবং নিপীড়নের যুগকাঠে আত্মবলি দিয়ে আজ নিজ দেশে পরবাসী হয়েছে। অর্থনৈতিক চাপে নিশ্চিষ্ট হয়ে সমগ্র বাঙ্গালী জাতির মুখ থেকে অনেক দিন আগেই হাসি মিলিয়ে গেছে। বাঙ্গালী হাসতে জানে না, এ রকম মজব্ব বাঙ্গালী জাতি সম্পর্কে দীর্ঘকাল চালু আছে। একথাটা যেমন ঝাঁটি সত্য, তেমনি এর ব্যতিক্রম আছে মাত্র ছুটি ক্ষেত্রে। একদিকে, দেশপ্রেমের গুরুতর অপরাধে অভিযুক্ত হয়ে ফাঁসির দড়ি গলায় পরতে গিয়ে বাঙ্গালী যুধকদের মুখে হাসি ঝরেছে অপরাধিকে বাঙ্গালীর মুখে হাসি দেখা গেছে ফুটবল খেলার মাঠে। চাকুরীজীবী মধ্যবিত্ত কেরাণী, কুল কলেজের ছাত্র, কেম্ব্রিজ ভাণ্ডার নিয়েই ফুটবল খেলোয়াড় আর

এরাই হ'ল ফুটবল খেলার দর্শক এবং বড় সমর্থক। বছরের মধ্যে মে মাস থেকে শুরু ক'রে তিনচার মাস ক'লকাতার বাঙ্গালী জাতির মধ্যে একটা আনন্দ-উজ্জীপনার সাড়া পাওয়া যায়। বাঙ্গালী জাতি যে হাসতে পারে, তাদের প্রাণে যে আনন্দের প্রাচুর্য আছে সেই সঙ্গে ধৈর্য এবং কষ্ট-সহিষ্ণু গুণও যে আছে, বোশেখ এবং জষ্টি মাসের কাঠফাটা রোদে আবার আবাড়-প্রাবণ মাসের অবিরাম বারিপাতের মধ্যে খেলার মাঠে আট দশ ঘণ্টা অপেক্ষামান বাঙ্গালী দর্শকদের দেখলে তা স্বীকার না ক'রে পারা যায় না।

বৃটিশ আমলে পুলিশের গুলো এবং বোকার লাখির বেড়াঝাল পার হবে মাঠের মধ্যে ঢুকে সে কি আরামের নিশ্বাস আর একমুখ হাসি। আব যেদিন খেলার গোর কিবা ইউরোপীয় দলকে বাঙ্গালী দল হারিয়ে দিত সেদিন মনের আনন্দে বাঙ্গালী দর্শকদের মুখে হাসি উপরে পড়তো। আগের দিনে বাঙ্গালী ফুটবল খেলোয়াড়দের খেলায় নিষ্ঠা এবং আন্তরিকতার বিশেষ প্রশংসা শোন যায়। এর পিছনে নিছক খেলাটাই বড় ছিল না, ছিঃ বছরদিনের উৎপীড়নের ফলে প্রতিশোধের আক্রোশ, জাতীয়তাবোধ এবং রাজনৈতিক চেতনা। ভারতীয় রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে প্রকৃত্ব নিয়ে বৈদেশিক সরকারের সঙ্গে আমাদের যে বিরোধ ছিল খেলার মাঠে তাদেরই জাতীয় ফুটবল খেলার হারিয়ে আমরা জাতীয় জয়লাভের সমান আনন্দ এবং আত্মপ্রসাদ লাভ করতুম। শিক্ষা, সত্যতা এবং কৃষ্টির ক্ষেত্রে যেমন পাক্ষাত্য পদ্ধতি এবং ভাবধারাকে আমরা অঙ্কের মত অঙ্ককরণ করেছি তেমনি ফুটবল বিদেশী খেলা হওয়া সত্ত্বেও আমরা জাতীয় খেলার সমান পদমর্যাদা দিয়েছি ভারতীয় ফুটবল খেলার যে একটা নিজস্ব পদ্ধতি এবং স্বাতন্ত্র্য ধারা রয়েছে তার পথ প্রদর্শক হ'ল বাঙ্গালী ফুটবল খেলোয়াড়রা। আজ যেমন ঘটনাচক্রে জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে আমরা পিছু হটেছি, তেমনি পিছনে পড়ে আছি খেলাধুলা। এমন কি ফুটবল খেলাতেও। ক'লকাতার অর্থবান ফুটবল প্রতিষ্ঠানগুলির উগ্র দলীয় মনোভাব এবং তাদের অবলম্বিত নীতিই ফুটবল খেলার বাঙ্গালী খেলোয়াড়দের জীবনে চরম ব্যর্থতা ডেকে এনেছে। শিক্ষাক্ষেত্রে

যেমন সট-কাট নোট মুদ্রা করে ছাত্র-ছাত্রীরা পরীক্ষার সাক্ষ্য লাভের সোজা পথ বেছে নিয়েছে, আমাদের দেশের নামকরা একাধিক কুটবল টীমের কর্তৃপক্ষ মহলকে লীগ-লীড জয়লাভের অকমোহে জাতীয় সম্মান এবং খেলাধুলার মূলনীতি বিসর্জন দিয়ে কেবল দলগত স্বার্থের উদ্দেশ্যে বাঙ্গলার বাইরে ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে এমন কি বর্ষা মূল্যকেও খেলোয়াড় সংগ্রহের আড়কাঠি পাতেতে দেখা গেছে। এসব কাজে তাঁদের কি উৎসাহ, উদ্বীর্ণতা এবং আইনের ছিদ্র পথ আবিষ্কারের কুতূহল! আজ তাঁদের কাছে বড় কথা, লীগ-লীড নিয়ে দলের নাম প্রতিষ্ঠা করে বেশী সংখ্যক সমর্থক যোগাড় করা। এর

মধ্যে নীতি বা কোন আদর্শের বালাই নেই, একমাত্র দলার এবং ব্যক্তিগত স্বার্থ ছাড়া। মনের মধ্যে এবং আচার ব্যবহারে প্রাদেশিকতা এবং সঙ্কীর্ণতা পোষণ করা মহত্বের যেমন পরিচয় নয় তেমনি এর দোহাই দিয়ে এমন উদারতার পথ নিশ্চয় অবলম্বন করা উচিত হবে না যার ফলে সমগ্র জাতিকে আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভের অধিকার থেকে বঞ্চিত হ'তে হবে। আজ কলকাতার যে অবাদালী কুটবল খেলোয়াড়দের উপর দলের সম্মান রক্ষার ভার ছেড়ে দেওয়া হয়েছে এবং যে সব কৌশলে তাদের দলভুক্ত করা হয় তা আত্মপ্রবঞ্চনার সমান এবং তাতে সখের খেলোয়াড়দের মর্যাদা রক্ষা হয় না। ১১. ৬. ৫০.

## নব-প্রকাশিত গুপ্তকাবলী

নরেন্দ্র দেব প্রণীত অমণ-কাহিনী “রাজপুত্রের দেশে”—৩০.

সমরথ রায় প্রণীত নাট্যোপস্থাপন “কুখ্যাত”—২.

শ্রীবিলাপকুমার রায় প্রণীত স্বরলিপি “হরবিহার”—৫৯, পানের বই “ভাগবতী গীতি”—৫.

শ্রীবিধনাথ মজুমদার প্রণীত উপস্থাপন “মানস-প্রতিমা”—২১.

যজ্ঞেশ্বর রায়-সম্পাদিত গল্প-গ্রন্থ “ধূসর পথচিহ্ন”—২.

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রণীত “উপনিষদ” (৩য় খণ্ড)—২.

শ্রীশশধর বসু প্রণীত ডিটেকটিভ উপস্থাপন “দুর্ভাগ্য বপন”—২১.

“হীরক-বীপে বপন”—২১, “অপরাজেয় মোহন”—২.

শ্রীহুমবনাথ বোম-অনুদিত “আইত্যানুহা”—১.

শ্রীমুগ্ধকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রণীত জীবনী “কানাইলাল”—১০.

“সত্যেন বহু”—১.

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়-সম্পাদিত রহস্তোপস্থাপন

“গ্রীণ হাউস”—১১.

শ্রীঅজয়চন্দ্র সরকার প্রণীত “বহিঃসম্প্রের ভাষা”—২.

শ্রীমতী বিজয়লতা দেবী প্রণীত উপস্থাপন “মূল্যের ধরগীতে”—২১.

প্রবোধ সরকার প্রণীত শিশুপাঠ্য উপস্থাপন “লক্ষ বর্ষ পরে”—১১.

শ্রীমনাথ রায় প্রণীত “অদৃশ্য কালো গোয়েন্দা”—১.

শ্রীশ্রীমদগুরু সাধন সত্ত্ব প্রকাশিত “পারের কড়ি”

(ত্রয়োদশী গজানন্দজীর পত্রাবলী)—২.

শ্রীললিতমোহন ভট্টাচার্য প্রণীত কাব্যগ্রন্থ “বনলতা”—১.

শ্রীশচীন্দ্রনাথ মিত্র প্রণীত “ভারতীয় সঙ্গীত পরিচিতি” (১ম খণ্ড)—৭.

শ্রীকালিদাস রায় প্রণীত “বঙ্গ সাহিত্য পরিচয়” ২য় খণ্ড—৬.

মিহিরলাল গঙ্গোপাধ্যায় প্রণীত নাটক “পাটলিপুত্র”—২.

## বিজ্ঞপ্তি

আমাদের পাকিস্তানস্থ গ্রাহকগণের মধ্যে যীহারী আমাদের কার্যালয়ে “ভারতবর্ষ”—এর চাঁদা পাঠাইতে বা জমা দিতে অসুবিধা ভোগ করিয়া থাকেন, তাঁহারা অতঃপর ইচ্ছা করিলে গ্রাহকনম্বর উল্লেখপূর্বক The Asutosh Library, 78/6, Lyall Street, Dacca, East Pakistan—নিকট চাঁদা পাঠাইতে বা জমা দিতে পারেন। নূতন গ্রাহকগণ টাকা জমা দিবার সময় “নূতন গ্রাহক” কথাটি উল্লেখ করিবেন। ইতি— বিনীত

কার্যাব্যয়ক—ভানুপ্রসাদ

## সম্পাদক—শ্রীকণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম-এ.





হায়ে দেখতে নান্নি তার চন্দন ঝাঁক।

শিল্পী :—( প্রত্যাখ্যাত ছবিগুলি সংগ্রহ করিয়া ) কুটি জানতে পারলে সংশোধন করতে পারতাম ।  
সম্পাদক :—অসম্ভব । ই হেতারা আর কতো পোষরাবেন ! তা ছাড়া আপনাব গুপ্তি-চালনিটাও কুদিধার নয় ।



শ্রাবণ-১৩৫৭

প্রথম খণ্ড

অষ্টত্রিংশ বর্ষ

| দ্বিতীয় সংখ্যা

## গীতার সন্ন্যাসের আদর্শ

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এ

কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ আরম্ভ হইতে আর বিলম্ব নাই। শর-বর্ষণের অন্ত ধমুর্বাণ তুলিয়া অর্জুন সহসা খামিয়া গেলেন, সারথিকে বলিলেন—রথ ফিরাও, যুদ্ধ আমি করিব না, বিজয় রাজ্য অর্থ আমি চাহি না, ‘কৃথির-প্রদীপ্তান’ ভোগে আর কাজ নাই। কর্মত্যাগ সংসারত্যাগ করিয়া আমি সন্ন্যাসী হইব, ভিক্ষায় জীবন ধারণ করিব। কিন্তু ফিরিবার পথ নাই—‘সেনয়োক্‌ভরোর্মধ্যে’ রথ স্থাপিত। পাণ্ডবপক্ষের সর্বময় অধিনায়ক রথীন্দ্র অর্জুনকে যুদ্ধ করিতে বিমুখ দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ কঠোর ভাষায় বলিলেন—ক্লৈব্যঃ শাস্ত্র গমঃ পার্থ। অর্জুন, ক্লীব হইও না, অধর্মের গ্লানিতে ক্লিষ্ট বিশাল ভারতকে ভাঙিয়া চুরিয়া নূতন মহাভারত সৃষ্টি কর। বৃজোয়া মনোবৃত্তি, আভিজাত্যের চিন্তাপ্রাণালী ছাড়িয়া দাও। একতরফা ভীষ্ম-দ্রোণের অন্ত ‘কৃপয়াবিষ্ট-মশপূর্ণাকুলেকণম্’ হইলে জনসাধারণ—বেংপি স্র্যঃ পাপ-

যোনয়ঃ—স্ত্রী বৈশ্ব শূদ্র পতিত চণ্ডাল বাদ পড়িয়া যায়। গণশক্তিই রাষ্ট্র-শক্তি।

যাঁহারা বলেন—রূপক ছলে অন্তর্জগতের রহস্যসমূহ সমাধান করাই গীতার উদ্দেশ্য, গীতার কুরুক্ষেত্র ঐতিহাসিক কুরুক্ষেত্র নহে, উহা মানুষের হৃদয়ক্ষেত্র, মানুষের সহিত মানুষের যুদ্ধ গীতার বর্ণিত হয় নাই, উহা সাধন-সমর, তাঁহাদের সহিত আমরা একমত হইতে পারি নাই। মানুষের অন্তর্জগতে যেমন পাপ-পুণ্যের ঝড় চলিতেছে, বহির্জগতে মানুষের বাস্তব কর্মজীবনেও সেইরূপ ঘাত-প্রতিঘাত নিরন্তর চলিতেছে। ভারতের নবযুগে আজ এই কথাটি সর্বাত্মে মনে রাখিতে হইবে যে, এক ঐতিহাসিক মহাযুদ্ধই গীতার পটভূমি, রক্ত-প্রাণিত ইতিহাসের ক্ষেত্রেই গীতার বাণী উচ্চারিত। ধর্মক্ষেত্র আজ আর নৈমিষারণ্যের শান্ত পরিবেশের মধ্যে নহে,

ভারতের শেষ বেদান্ত সকল শেষ প্রব্লেমের চরম মীমাংসা দিতে রণভূমির কেন্দ্রস্থলেই আবির্ভূত, কলকোলাহলময় যুদ্ধক্ষেত্রেই শ্রীকৃষ্ণার্জুন সংবাদরূপে প্রকট হইয়াছে। দুর্ধোগময় কুরুক্ষেত্রেই শ্রীকৃষ্ণ ‘ব্রহ্মবিজ্ঞানঃ যোগশাস্ত্রঃ’র উপদেশ দিয়াছেন, ধূলিমলিন ধরার কর্মের মধ্যেই নৈকর্ম্যের আদর্শ প্রচার করিয়াছেন। গীতা ঝড়ের শাস্ত্র—ঝড়কে বুকে লইয়া কেমন করিয়া পরম শান্তি নামিয়া আসে সেই সংবাদ গীতা দিয়াছেন। শ্রাশানের শান্তি গীতা প্রচার করেন নাই।

সংসার যুদ্ধক্ষেত্র—ইহাই সংসারের স্বরূপ, এখানে সকলে যুযুৎসু হইয়াই সমবেত। বিশ্বপ্রকৃতি এখানে চ্যালেঞ্জ দিয়া বলিয়া আছেন—যো মাং জয়তি সংগ্রামে \* \* \* স মে ভর্তা ভবিষ্যতি। এই যুদ্ধ-আহ্বান গ্রহণ করিয়া তাহাকে জয় করিতে হইবে। এই জয় করার সাধনা গীতাতে বর্ণিত। অন্তর্জগতে বহির্জগতে যত প্রকার শত্রু আছে সব জয় করিয়া সমৃদ্ধ রাজ্য ভোগ করিতে হইবে। ভিতরের কামক্রোধাদিই কেবল শত্রু নয় বাহিরের আততায়ী দুর্ধোখনাদিও পরম শত্রু। এ বিক্ষেপে পরাজিতের স্থান নাই।

জটিল সমস্তাপূর্ণ সংসারকে পায়ে ঠেলিয়া জগতের ওপারে মুক্তির সন্ধান দিবার জন্য সকল উপনিষদের সার লইয়া গীতার সৃষ্টি হয় নাই। গীতার মুক্তি এই জগতের মাটির বুকে—ইহেব তৈজিতঃ সর্গো যেষাং সাম্যো স্থিতঃ মনঃ—যুত্বার পূর্বে এই মানব দেহে—প্রাক শরীর-বিমোক্ষণাৎ। সংসার ত্যাগ করিলেই শান্তি আসে না, রস-লালসা অতৃপ্ত-বাসনা অবচেতনায় বাসা বাঁধিয়া স্রোতের অপেক্ষায় শুক থাকে। অস্বীকার করিলেই বিশ্বপ্রকৃতি অস্বীকৃত হয় না। ইহার অনেক দৃষ্টান্ত পুরাণকার দিয়াছেন—রাজা অরুণ, বৈশ্র সমাধি, সৌভরি পরাশর ঋষিশ্রব বিশ্বামিত্র রাজা ভরত। নিগৃহীত হইলেই কামনা মরে না, দায়ুশূলকে শুকাইলে বাসনা শুকাই না—ইহা রোগীকে শেষ করিয়া রোগ উপশমের নিষ্ফল প্রয়াস। গীতার আদর্শ জনকাময়ঃ। রাজর্ষি জনক প্রকৃতির সঙ্গে সংগ্রামে জয়ী হইয়া সংসারে থাকিয়াই সন্ন্যাসী। কর্মক্ষেত্রের মত্ততার মধ্যে তিনি স্থিতপ্রজা সমতা নৈকর্ম্যের অবিচল শান্তি আনিয়াছিলেন। ভোগ ও ত্যাগ, সংসার

ও সন্ন্যাস—উভয়ের সত্য সম্বন্ধ স্থাপন, তাহাদের সমন্বয় গীতার মহাদান।

কিছুদিন পূর্বে ভারতের তদানীন্তন মহামান্য রাষ্ট্রপতি শ্রীরাজাগোপালচাট্টারী এক বক্তৃতায় বলিয়াছিলেন—ভারতের বৈদান্তিক সভ্যতা, তাহার অজড়বাদী সংস্কৃতি ভারতের সকল বিপদ হইতে রক্ষা করিয়া আসিয়াছে। আত্মসভ্যতার মূল প্রকৃতি, তাহার অধ্যাত্মবাদ একভাবে চলিয়া আসিয়াছে, তাহা আজও অজ্ঞান। সভ্য বটে অতি প্রাচীন সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য বহন করিয়া ভারত আজ বাঁচিয়া আছে, কিন্তু কিভাবে সে জীবিত তাহা আর বিশেষভাবে প্রণিধান করিতে হইবে। কোনমতে টিকিয়া থাকাই পরম পুরুষার্থ নহে। একটা জাতি জীবন্ত অবস্থায় বহুকাল টিকিয়া থাকিতে পারে, ক্ষয়রোগী দীর্ঘজীবী হয়। বহুকাল বাঁচিয়া আছি অতএব ভবিষ্যতে থাকিব, এযুক্তি বালকেই করে। অজড়বাদের বহিঃপ্রতিমাহিমা, তবে সহস্র বৎসর ধরিয়া ভারতবর্ষ পরাধীন কেন মুসলিম আক্রমণ, ব্রিটিশ-বণিকের রাজ্য প্রতিষ্ঠা সে প্রতিরোধ করিতে পারে নাই কেন? পশ্চিম পদ্ধতিতে মুসলমান সংখ্যাধিক্যের একটা কারণ থাকিতে পারে, কিন্তু পূর্ববর্তী হিন্দুর দেশ, আফগানিস্তান বেলুচিস্তান হইতে তাহা অনেক দূরে, সেখানে মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায় হইল কেন চোখের উপর অথও ভারতবর্ষ ছিন্নভিন্ন হইল, তাহা দুইটি অঙ্গ খসিয়া গেল। অজড়বাদী সংস্কৃতি, তাহা নেতিবাদ সকল বিপদ হইতে ভারতকে রক্ষা করিতে পারে নাই—একথা আজ অকুণ্ঠভাবে স্বীকার করিতে হইবে ভারতীয় সংস্কৃতির যে ক্রটির জন্য এই দুর্দুরপ্রসারী পরাধীনতার জ্বালা, তাহার কোলের কোটা কোটা সভ্য ইসলামধর্ম গ্রহণ করিয়াছে, লক্ষ লক্ষ ক্রীষ্টান হইয়াছে সেই গলদ দূর করিতে হইবে, যাহাতে আর ইহা পুনরাবৃত্তি না ঘটে। হিন্দুকে বাঁচিতে হইলে, নবল স্বাধীনতা স্থায়ী করিতে হইলে, স্বাধীনতা রক্ষার যোগ্য লাভ করিতে হইবে, সনাতন ধর্মকে অচলায়তন সমাজে আবর্জনামুক্ত করিয়া প্রকৃত হিন্দুধর্মের আদর্শে নবরূপে রূপায়িত করিতে হইবে।

প্রশ্ন উঠে, ভারতীয় সংস্কৃতির ক্রটি কোথায় এবং তা কেমন করিয়া আসিল? কেমন করিয়া এই মহাদেশ ধীরে



রে নৈকর্মের প্রেরণায় অভিভূত হইল, গীতার প্রাণবান ব্রহ্মমূলক শিক্ষা কেমন করিয়া চাপা পড়িল? মাহুয়ের যৌবনে যেমন কোমার যৌবন জরা—জাতির জীবনেও এইরূপ উত্থান সমৃদ্ধি ও পতন আসে। বহু কাল ধরিয়া যৌবনের সকল ক্ষেত্রে অপূর্ণ সৃষ্টি-শক্তি, কর্মদক্ষতার পরিচয় দিয়া কালধর্মে ভারতের জীবনীশক্তি কর্মপটুতা চিন্তা-শক্তি অবসর হইল। ভগবান বুদ্ধ আবির্ভূত হইলেন। একজন রাজার ছেলে বিশ্বমানবের দুঃখনিবৃত্তির সন্ধানে যৌবনেই সকল পার্শ্বিক ঐশ্বর্য ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হইলেন। পণ্ডিত-গণ বলেন, গৌতম বুদ্ধই ভারতের প্রথম ঐতিহাসিক সন্ন্যাসী। বৌদ্ধধর্ম প্রচার করিল—শূন্যবাদ, পরলোকে নির্বাণ ও ইহলোকে নৈকর্মের মাহাত্ম্য, অহিংসার মহিমা। সংসার অনিত্য দুঃখময়। দুঃখ জয় করিতে হইলে কর্মবন্ধন ছিন্ন করিয়া সন্ন্যাসধর্ম অবলম্বন করিতে হইবে, তাহেই নির্বাণলাভ সম্ভব। দলে দলে লোক সংসার ত্যাগ করিয়া ভিক্ষুর জীবন গ্রহণ করিতে লাগিল। একটা প্রদেশ ভিক্ষু ভিক্ষুণীর বিহারে পরিণত হইল। মহারাজ অশোক অসাধারণ কর্মশক্তির পরিচয় দিলেন বটে, কিন্তু তিনিও শেষে রাজকাৰ্য্যে উদাসীন হইয়া সন্ন্যাসের দিকে আকৃষ্ট হইলেন। ঐতিহাসিক ডক্টর রমেশচন্দ্র মজুমদার লিখিতেছেন—But the policy of blood and iron was not suitable to Asoke who embraced Buddhism and spent his energy in an organised missionary propaganda. \* \* \* The political disintegration and foreign domination were perhaps the price India had to pay for the religious propaganda of Asoke. বুদ্ধের জীবনাদর্শ, অশোকের দৃষ্টান্ত জাতির মনে ধীরে ধীরে প্রভাব বিস্তার করিতে লাগিল। গৌতম বুদ্ধ সনাতন ধর্মের ভিত্তি বেদকে অস্বীকার করিয়াছিলেন। আচার্য শঙ্কর আবির্ভূত হইলেন। বৌদ্ধমত খণ্ডন করিয়া বৈদিক ধর্ম প্রতিষ্ঠা করিলেও আচার্য বুদ্ধের প্রভাব অতিক্রম করিতে পারেন নাই, তিনিও বৌদ্ধসন্ন্যাসবাদ স্বীকার করিলেন। আচার্যের মায়াবাদ, নিগূর্ণব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা এবং বৌদ্ধদের শূন্যবাদ ও নির্বাণে পার্থক্য অতি সূক্ষ্ম। এই জন্যই বলে শঙ্কর ‘প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ’।

আচার্যের মতে সন্ন্যাস, পূর্ণভাবে কর্মত্যাগ করাই চরম লক্ষ্য, গীতা যে বাসনা ত্যাগ করিয়া নিকামভাবে কর্ম করিতে বলিয়াছেন, তাহা কেবল প্রথম অবস্থায় চিত্তশুদ্ধির জন্যই উপযোগী। জীব ও ব্রহ্ম অভিন্ন, কেবল অজ্ঞানের জন্য জীব নিজেকে ব্রহ্ম হইতে পৃথক বলিয়া মনে করে, এই অজ্ঞান দূর হইলেই সে নিজেকে ব্রহ্ম বলিয়া জানিতে পারে এবং তাহাই মোক্ষ বা মুক্তি। জ্ঞানেই মুক্তিলাভ হয়। নিকাম কর্ম চিত্তশুদ্ধি করিয়া জ্ঞানলাভে পরোক্ষভাবে সহায়তা করে মাত্র। অজ্ঞান অজ্ঞান অবিদ্যান, তাই শ্রীভগবান পাণ্ডবকে নিকাম কর্মের উপদেশ দিয়াছিলেন। গীতার শঙ্কর-ব্যাখ্যা সন্ন্যাসমূলক এবং গীতার সকল প্রাচীন ব্যাখ্যা মূলতঃ শঙ্কর ভাষ্যের অনুরণনে রচিত। পরিদৃশ্যমান জগৎ প্রপঞ্চ মায়ায় ছলনা, জীবের কর্তৃত্ব অংশত মিথ্যা, এই মিথ্যার অবসান করিয়া সত্ত্বব্রহ্মে লীন হওয়াই জীবের পরমা গতি—এই বাণী অগণিত শাস্ত্রব্যাখ্যার মাধ্যমে, যজ্ঞতন্ত্র বিচরণশীল সহস্র সহস্র সন্ন্যাসীর মুখে, শত শত মঠ-মন্দির-আশ্রম হইতে ব্যাপকভাবে প্রচারিত হইল। গীতার সম্বন্ধমূলক শিক্ষা এইভাবে চাপা পড়িয়া গেল।

যে দিব্যদৃষ্টি লাভ করিয়া মহাযোগী শঙ্কর জগৎকে মিথ্যা বলিয়াছিলেন সে উচ্চভূমিতে উঠিবার যোগ্যতা অতি অল্প মানবের বটিয়া থাকে। কালধর্মে জাতির জীবনে বার্কক্য আসিয়াছিল, তাহার চিন্তাশক্তি নিস্তেজ হইয়াছিল। কর্মের নিজস্ব পারমার্থিক মূল্য অস্বীকার, জগৎ মিথ্যা সন্দেহ অবসর জাতির কর্ণে মধুবর্ণ করিল। মায়াবাদী সন্ন্যাসীর জীবন্ত দৃষ্টান্ত কেহ দেখিল না। অল্পপরিসর জীবনে যানবাহনহীন সেই প্রাচীন যুগের অশ্বৈতবেদান্তের প্রাণপ্রতিষ্ঠাতা আচার্যের বিরাট কর্মের পরিচয় কেহ লইল না। পণ্ডিত নেহরু লিখিয়াছেন—And yet Shankar was a man of amazing energy and vast activity. He was no escapist retiring into his shell or into a corner of the forest, seeking his own individual perfection and oblivious of what happens to others.

ব্যাপকভাবে মায়াবাদ প্রচারের ফলে জনসাধারণ নির্বিচারে জগৎ মিথ্যা বলিয়া মানিয়া লইল। শঙ্কর-দর্শনে

‘মিথ্যা’ শব্দের প্রকৃত অর্থ না বুঝিয়া সহস্র সহস্র অযোগ্য লোক সংসার ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হইল। এতগুলি লোকের কর্মশক্তি হইতে জাতি বঞ্চিত হইল। বাহারা সংসার ত্যাগ করিতে পারিল না তাহারা চোখ কান বুজিয়া কোন রকমে সংসার করিতে লাগিল। সংসারে তাহাদের যোর অবিবাহ, সন্দেহ। মায়া পিশাচী এখানকার প্রতি ধূলিকণায় লুকাইয়া চক্রান্তের জাল বুনিয়া জীবকে বিভ্রান্ত করিতেছে। সমুদ্র-সৈকতের তপ্ত বালুচরে বৃষ্টিবিন্দু যেমন ক্ষণিকে মিলাইয়া যায়, এ সংসার, ‘সুতমিত-রমণীসমাধ’ তেমনি অনিত্য ক্ষণবিশ্বংসী। যে সংসার ক্ষুধার অন্ন, তৃষ্ণার জল, লজ্জানিবারণের আবরণ যোগায় তাহাকে অবহেলা করিয়া ইহলোকের পরপারে নিত্য বস্তুর সন্ধানে এদেশের ছোট বড় সকলেই ব্যাকুল—কবে তৃপ্তি এ মল্ল ছাড়িয়া বাইব তোমার রসাল নন্দনে। যে জাতির অস্থিমজ্জায় রক্তে রক্তে চিন্তার প্রতি স্পন্দনে এই শিক্ষা বহুল, তাহারা পাণ্ডব জীবনে কতটুকু উন্নতি করিবে? সংসার পাছ-শালা, সংঘবদ্ধ হইয়া ছুষ্টার পাছশালার উন্নতি কে করিতে চায়? দেশভুক্ত লোক যে সংসার ছাড়িয়া সন্ন্যাসী হইয়াছে তাহা নয়, সংসারে থাকিয়া তাহারা জীবনে উৎসাহ হারাইয়াছে; এইরূপে একটা জাতি নির্জীব কর্মবিমুখ লৌকিক ব্যাপারে উদাসীন। এ সংসার যদি প্রবাসভূমি তবে প্রবাসের উন্নতির জন্ত কে চেষ্টা করে? চল মন নিজ নিকেতনে, সংসার বিদেশে বিদেশীর বেশে ভ্রম কেন অকারণে?

শূন্যবাদ, মায়াবাদের মধ্যে বাহা কিছু উচ্চ আদর্শ জনসাধারণ তাহা বুঝিতে পারিল না, তাহারা বুঝিল যে সংসার অনিত্য দুঃখময়, অতএব তুচ্ছ ব্যাপারে মন না দিয়া পরলোকে মুক্তির জন্ত প্রস্তুত হওয়াই মানুষের কর্তব্য। এই মনোভাব জনসাধারণের মধ্যে কর্মবিমুখতা এবং ইহজীবনের প্রতি একটা বৈরাগ্যময় অবসাদ আনিয়া দিল। সর্ববিশেষের ক্ষেত্রে এই সংসার হইতে মুখ ফিরাইয়া একান্ত নির্বিশেষের ভাবনাই ভারতীয় সংস্কৃতির দ্রুতি। ইহাই পলায়নপরতা-রূপ ক্রৈব্যা, বাহার জন্ত শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে ‘কৈব্যাং মান্ব গমঃ’ বলিয়া মেহ-মধুর তিরস্কার করিলেন।

গীতার স্পষ্টবাণী—ন বুদ্ধিতেহ জনয়েদজানাং কর্ম-

সন্নিবান্। যোজয়েৎ সর্বকর্মাণি বিদ্বান্ বুদ্ধঃ সমাচরঃ অজ্ঞানকে বড় বড় কথা বলিয়া কর্মপ্রলুপ্ত করিয়া বিচালিত করিও না, তাহাদের বুদ্ধি ভেদে অন্মাইও ন যাঁহারা বিদ্বান্ বুদ্ধিমান তাঁহারা সকল কর্ম করি সাধারণকে কর্মে নিযুক্ত রাখিবেন, কারণ নির্বিচারে জনসাধারণের মধ্যে ত্যাগ বৈরাগ্যের আদর্শ প্রচার করি তাহাদের বুদ্ধির মধ্যে দ্বন্দ্ব উপস্থিত হয়। কর্মের দ্বা সিদ্ধি হয় না, জ্ঞানের দ্বারাই হয়—এই মত খণ্ডন করিবার জন্ত গীতা বলিতেছেন—কর্ম করিয়াই জনকাদি পূর্ণত মুক্তিলাভ করিয়াছিলেন। শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি যেরূপ আচরণ করেন সাধারণে না বুঝিবার তাহাই করে। তিনি ‘আদর্শের সৃষ্টি করেন সাধারণ’ লোক তাহাই করে ৩২০-২১। শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি কিরূপ আচরণ করেন অবতাররূপ ভগবান নিজের দৃষ্টান্ত দিয়া তাহা বুঝাইতেছেন। দেহ অর্জুন, কর্মের দ্বারা লাভ করিবার আমার কিছুই নাই; ত্রিভুবনে কোন কিছুর জন্ত কাহারও নিকট আমি কিছু প্রত্যাশা করি না, তথাপি আমি কর্ম করি। আমি যদি আলম্ব্যশে কর্ম না করি, তবে লোকে আমারই পথে চলিবে ও উৎসাহে যাইবে। ৩২২-২৪। সাধারণ লোকে সংসারে যে সব কর্ম করে জানীয়াও সেই সকল কর্ম করিবেন, তবে জানী কর্ম করিবেন ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির জন্ত নয়, আসক্তিশূন্য হইয়া সর্বভূতহিতের জন্ত, লোক-সকলকে ভগবানের দিকে অগ্রসর হইতে সাহায্য করিবার জন্ত। ৩২৫। সন্ন্যাসীরা মনে করেন তাঁহারা কর্মত্যাগ করিতে বাধ্য, কিন্তু ভগবান কর্মত্যাগ করেন না—বর্ত এবং চ কর্মণি।

গীতার প্রথম অধ্যায়ে অর্জুনের প্রশ্নের উত্তরেই শ্রীকৃষ্ণ সন্ন্যাসের এক অভিনব আদর্শ স্থাপন করিয়াছেন। সন্ন্যাসী বলিলে সাধারণত বুঝায় যিনি সংসারের সকল কর্তব্য পরিহার করিয়া পরিত্রজ্যা অবলম্বন করিয়াছেন। শরীর ধারণের জন্ত যেটুকু কর্ম করিলে নয় তিনি কেবল তাহাই করেন। কর্ম সাক্ষাদভাবে মুক্তি দিতে পারে না, জ্ঞানের দ্বারাই মুক্তি হয়—এই ধারণার বশেই সাধক সন্ন্যাসমার্গ অবলম্বন করেন। তৎকালপ্রচলিত জ্ঞান-কর্মের এই বিরোধের কথা অর্জুন জানিতেন। অর্জুন প্রশ্ন তুলিলেন—তোমার কথার ভাবে বোধ হইতেছে তুমি

কৰ্মত্যাগ ও কৰ্মছাটান ছই-ই কৰিতে বলিতেছে; এই দুয়ের মধ্যে কোনটি শ্রেয় ঠিক করিয়া আমাকে বল। ৫।১। আমি সংসারে থাকিয়া কৰ্তব্যকৰ্মাদি কৰিব, না সৰ্বকৰ্ম বৰ্জন কৰিয়া সকল লৌকিক সম্পৰ্ক ছিন্ন কৰিয়া সম্যাসী হইব? ভাল মন্দ সকল কৰ্মই যখন বন্ধন, তখন কৰ্মের হাকামার মধ্যে না গিয়া সৰ্বকৰ্ম ত্যাগ কৰিয়া সম্যাসী হই না কেন? উত্তরে শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—সম্যাস ও কৰ্মযোগ উভয়ই মোক্ষপ্ৰদ (উভৌ নিঃশ্ৰেয়সকরৌ) কিন্তু দুইয়ের মধ্যে কৰ্মযোগের একটু বৈশিষ্ট্য আছে—কৰ্মসম্যাসাৎ কৰ্মযোগো বিশিষ্টতে। সংসার ত্যাগ কখনই আচরণীয় নহে এমন কথা শ্রীকৃষ্ণ বলেন নাই। প্রবৃত্তিতেই দুৰ্বার প্রেরণা আসিলে সৰ্ব্বত্র ত্যাগ কৰিতে হয়। স্থিতিস্থিত ভগবানের আহ্বানে সিদ্ধার্থ সৰ্বত্যাগী, শঙ্কর আজ্ঞায় সম্যাসী, সম্যাসী নিমাই পথে পথে কলিযুগের নবগায়ত্ৰী হরিনাম প্রচারে পাগল। সংসারে থাকিলেই বন্ধন হইবে একথাও ঠিক নহে। নিয়ত কৰ্মে রত গৃহীও সম্যাসী হইতে পারে। কৰ্মত্যাগ কৰিলেই সম্যাসী হয় না, সম্যাসী হইলেই কৰ্মত্যাগ হয় না। দেহধারী মানুষের পক্ষে কৰ্মত্যাগে বহু বাধা অনেক ক্লেশ। কৰ্ম না কৰিয়া কেহ কখনও ক্ষণমাত্রও থাকিতে পারে না। জোর কৰিয়া কৰ্ম বন্ধ কৰিলে মন বিষয় চিন্তা করে—শরীরে মনে নানা ব্যাপার চলিতে থাকে—সে সবই কৰ্ম। কৰ্তার অন্তৰ্গত ভাবই বাহ্যজগতে কৰ্মরূপে প্রকাশিত হয়। বাহ্য প্রকাশ না থাকিলেই যে অন্তৰ্গত ভাব থাকিবে না, তাহা নহে। এ অবস্থায় কৰ্ম বন্ধ করা মিথ্যাচার। কৰ্ম না কৰিলেই যে সিদ্ধি হয় তাহাও নহে—ন চ সম্যাসনাদেব সিদ্ধিং সমধি-গচ্ছতি। কৰ্মত্যাগ যখন অসম্ভব তখন কৰ্মমার্গে থাকিয়াও কি কৰিয়া নৈকৰ্ম্যের পরম শান্তি লাভ করা যায় শ্রীকৃষ্ণ তাহা বলিতেছেন। কৰ্ম কৰিয়াও সম্যাসীর লভ্যস্থানে পৌছান যায় এবং কৰ্মযোগের বাহা বৈশিষ্ট্য, সাংসারিক অত্যাশয়, তাহাও ক্ষুণ্ণ হয় না। কৰ্মযোগ বিনা সম্যাসও কষ্টকর—সম্যাসস্ত মহাবাহো হুঃখমাপ্তুমযোগতঃ। কিন্তু যে দেহেন্দ্ৰিয়াদির জন্ত সম্যাস কষ্টকর, তাহাতে কৰ্মেরও বিয় নিহিত—ইন্দ্ৰিয়ভ্ৰম্ভ্ৰিয়ভ্ৰম্ভে রাগদ্বৈৰ্যো ব্যবহিতৌ। প্রতি ইন্দ্ৰিয়েরই নিজ নিজ ভোগ্য বিষয়ে রাগ-দ্বৈৰ রহিয়াছে। অহঙ্কল বিষয়ে আসক্তি ও প্রতিভুল বিষয়ে বিবেকের ফলেই মানুষের কৰ্ম দোষযুক্ত হয়। গীতার মতে তিনিই চির-সম্যাসী যাহার কোন বস্ত বা বিষয়ে রাগও নাই দ্বৈৰও নাই।

জ্ঞেয়ঃ স নিত্যসম্যাসী যো ন ঘোটি ন কাঙ্ক্ষতি ।

নিৰ্বন্দ্বো হি মহাবাহো স্ত্বং বন্ধাৎ প্রমুচ্যতে ॥

রাগদ্বৈৰ-দ্বন্দ্ব হইতে মুক্ত গৃহীও সম্যাসীপদবাচ্য; তিনি অন্যায়সে সংসার-বন্ধন ছিন্ন করেন।

অনাশ্রিতঃ কৰ্মফলং কাৰ্যং কৰ্ম কৰোতি যঃ ।

স সম্যাসী চ যোগী চ ন নির্যম্বিনচাক্রিয়ঃ ॥

কৰ্মফলে আসক্তিশূন্য হইয়া সংসারের সমাজের সকল কৰ্তব্য যিনি কৰিয়া যান তিনিই একাধারে সম্যাসী ও যোগী। সংসারত্যাগ (নির্যম্বি), কৰ্মত্যাগ (অক্রিয়) সম্যাসীর প্রকৃত লক্ষণ নয়, সম্যাসের লক্ষণ ফলকামনাত্যাগ। কৰ্ম-যোগের পরিণতিও সম্যাস, কিন্তু তাহা বাহ্য সম্যাস নয় আভ্যন্তরীণ সম্যাস। সম্যাস অন্তরের বস্ত, ভিতরের ত্যাগ—রাগদ্বৈৰের দ্বন্দ্ব হইতে মুক্ত হইয়া নিকাম সমতা লাভ। আত্ম-কেন্দ্রিক ভোগ-লালসার প্রেরণায় কৰ্ম না কৰিয়া সৰ্বভূত-সেবা হিসাবে যিনি কৰ্ম করেন, তিনি সম্যাসী। বিবেকের বিশ্ব-সেবার কাম্যকৰ্মের অৰ্পণকেই (ত্ৰাস) গীতা সম্যাস বলিয়াছেন—কাম্যানাং কৰ্মণাং ত্ৰাসং সম্যাসং কবয়ো বিদুঃ। শ্রীকৃষ্ণে কৰ্মাৰ্পণই গীতার নৈকৰ্ম্য—যং কৰোমি \* \* \* তং কুরুষ মদৰ্পণম্। এই অৰ্পণ, শরণাগতি সাধনা গীতার পরম ও চরম রহস্য।

শৃঙ্খলিত ভারতবর্ষ আজ বন্ধন-মুক্ত। বাহির হইতে ঘটনাস্রোত আসিয়া মায়াবাদের দৃঢ়মূল শিথিল করিয়াছে। কিন্তু পাশ্চাত্য সভ্যতার স্পর্শে, তাহার জ্ঞান বিজ্ঞানের তীব্র আলোকে ভারত আর এক বিপজ্জনক প্রতিক্রিয়ার সম্মুখীন। পাশ্চাত্যের ভোগবাদ ও জড়বাদের আদৰ্শে ভারতবাসী আকৃষ্ট হইয়াছে। দেশজোড়া অভাবের তাড়নায়, সমস্তার উপর সমস্তায় দিশেহারা মানুষ বলিতেছে—জগৎ সভ্য ব্রহ্ম মিথ্যা। অন্নই সভ্য, ব্রহ্ম নাই। পঞ্চভূতের চক্রান্তে পড়িয়া ব্রহ্ম আজ কাঁদিতে বসিয়াছেন। প্রকৃতির নিষ্ঠুর পরিত্যাস। এই দুই বিপরীত প্রান্তের (সংসার-সম্যাস, ভোগ-ত্যাগ) মধ্যবর্তী পথের সন্ধান গীতা নির্দেশ করিয়াছেন, তাই আজ সমন্বয়মূলক গীতার্থ প্রচারের এত প্রয়োজন। ভোগের ক্ষেত্রে ত্যাগের অবতরণই গীতার প্রাণ। গীতা যুগপৎ যুদ্ধশাস্ত্র ও যোগশাস্ত্র। কুটিল সংসারে চলিবার প্রকৃত কৌশল গীতা শিখাইয়াছেন—যোগঃ কৰ্মসু কৌশলম্।

# একটি কাহিনী

## শ্রীসন্তোষকুমার অধিকারী

ভালো খাইয়ে ব'লে নাম ছিলো শৈলেশের। বন্ধু সিতিকর্ষের বোভাতের নেমন্ত্রণে কাল ওরা সদলে উপস্থিত থেকে শৈলেশকে খাইয়েছে। যদিও কেউই বাদ যায়নি, তবু প্রচুর আয়োজনের সদ্যবহার শুধু বৃষ্টি শৈলেশের ঝারাই সম্ভব হ'য়েছিলো। সকলের সমবেত অহরোধকে এমনভাবে এক সঙ্গে রন্ধা করা আর কারও পক্ষে সহজ হ'তো না।

সে রাতে শৈলেশের থাকার কথা ছিলো। কারণ সেই একমাত্র ঘনিষ্ঠ বন্ধু সিতিকর্ষের। আর থাকেও অনেক দূরে—হাওড়া ময়দানের সামনে। খাওয়া-দাওয়ার পরে একটা ফাঁকা ঘরে করাসের ওপরে তাকিয়ায় ভর দিয়ে শৈলেশ বিজ্ঞানের চেষ্টা করছিলো। গোলমালের বাড়ীতে শোয়ার জন্তে এর চেয়ে ভালো জায়গা হয়ত আর পাওয়া যাবে না। আর একটু পরে ঘুমোনার চেষ্টা করা চলবে। আপাততঃ শৈলেশ একটি সিগারেট ধরিয়ে আয়াম ক'রে বসলো।

অজ্ঞানের মাঝামাঝি চলছে। কাজেই রাতের দিকে একটু শীতের আমেজ পাওয়া যায়। খোলা জান্না দিয়ে বেশ খানিকটা ঠাণ্ডা হাওয়া এসে ছুঁয়ে যাচ্ছিলো শৈলেশকে। এতক্ষণে শৈলেশের মনে হ'লো খাওয়াটা একটু বেশীই হ'য়ে গেছে। সিগারেটে দু' একটা টান দিয়ে সে শরীরটাকে গরম ক'রে নেওয়ার চেষ্টা করলো।

সিতিকর্ষ এসে ঢুকলো ঘরে—কিরে, ব'সে ব'সেই ঘুমোচ্ছিস নাকি? এক মুখ ধোঁয়া ছেড়ে শৈলেশ বললো—আয়, বোস। খাওয়াটা বেশ ভালোই হ'য়েছে। একে তোর বিয়ে, তায় প্রত্যেকটা জিনিসই ভালো হয়েছে। নেমন্ত্রণ খাওয়ার মত সুখ আর কিছুতে আছে কিনা তাবহি।

সিতিকর্ষ তৃপ্তির হাসি হাসলো। কিন্তু শৈলেশ পরক্ষণেই বলে উঠলো—তবু খেতে বসে খাওয়াটাকেও যে কত বিজ্ঞী লাগতে পারে, শুধু অবহার ভেদ বিশেষ ঘটলে—তাই, মনে হচ্ছে আমার।

—কেন, কেউ নিমপাতা খাইয়েছিলো বৃষ্টি?

শৈলেশ গভীর মুখে উত্তর দিলো—না।

—তবে? কেউ অপমান—

সিগারেটের ধোঁয়ায় সমস্ত ঘরের বর্ণ বদলাতে শুরু করেছে। অগস্ত টুকরোটুকু ঘরের এক কোণে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে শৈলেশ যেন অনেক দূর থেকে উত্তর দিলো—এমন ঘটনা কি ঘটতে পারে না? মনে কর, প্রত্যেকটি জিনিসই সুস্বাদু, আদর আপ্যায়নে কোন ত্রুটি নেই, সমস্ত পৃথিবীর খিদে জমেছে পেটে—অথচ এক মুহূর্তে মনে হ'লো, খাওয়াটাই বৃষ্টি সবচেয়ে কুৎসিত ও জঘন্য রকম দুঃসহ...

শৈলেশ বলে চলেছে—মনে কর, এমনি এক প্রথম শীতের দিন। অপরাহ্নের স্নান ছায়ায় তখনও আকাশ উজ্জ্বলিত। সূর্যের প্রথর ও চোখ-ঝলসানো অগ্নি-গোলকে লাগচে আভা ধরতে শুরু ক'রেছে। আর তুই চলেছিস মোটরবাসে এক অরণ্য-ভরা বিজন গ্রাম্য পথ ধরে। মনে কর সে জায়গাটা মুর্শিদাবাদ জেলার অন্তর্গত। আর বাসে যে পথ ধ'রে তুই এগিয়ে চলেছিস সে পথটা আটাশ মাইল দীর্ঘ। এই আটাশ মাইল বনপথ অতিক্রম ক'রে বাস যেখানে এ যাত্রার মত ধামবে তুই সেইখানটার নেমে পড়লি। কলকাতাবাসী শহরে যুবকের পক্ষে এই সঙ্ক্যার অন্ধকারে আচ্ছন্ন একান্ত বিজন একটি গ্রামের রাস্তা আতঙ্কজনক বইকি, কিন্তু তোর যথেষ্ট সাহস রয়েছে। তাই ভয় না পেয়ে সেখানে নেমেই প্রথমে ঘোঁষ করবি সেখানে চায়ের কোন দোকান আছে কি না। নেই শুনে আবার প্রশ্ন করবি—‘শ্রামলগাছি এখান থেকে আরও কত দূর তাই?’ বাসের আর একটি যাত্রী তোকে বলবে—‘এই ত’ মাইল চারেক মাত্র রাস্তা। কাদের বাড়ী যাবেন আপনি? ও চৌধুরীদের বাড়ী? নরেন চৌধুরী আপনার বন্ধু? তা তেনাদের ত' বাড়ীর গাড়ী আছে। আপনি বৃষ্টি ধবর না দিয়েই আসছেন? তা' এই পথ ধরে সোজা চলে যান; সেই

বেথানে কাতলামারীর বিলের পাশ দিয়ে রাস্তাটা ঝাঁক খেয়ে পূবে ঘুরে গেছে সেইখানে জিজ্ঞাসা করবেন, সবাই দেখিয়ে দেবে। গাঁয়ে পৌছুলে আপনিও চিনে নিতে পারবেন। এ তল্লাটে অত বড় বাড়ী ত' আর নেই। অত বড় লোকও—

তার কথা শেষ হওয়ার আগেই তুই চলতে শুরু করেছিল? সেই নিঃশব্দ গ্রাম্য পথে তখন জ্যোৎস্না লুটোপুটি খেতে আরম্ভ করেছে। হাঁটু অবধি ভরে উঠেছে সাদা ধুলোয়, পথের দুধারে ছোট ছোট ঝোপ জঙ্গল। মাঝে মাঝে আতাকুলের একটু মিষ্টি গন্ধ। কোনখানে আবার দু-পাশে মাঠ ঘুর পর্যন্ত বিস্তৃত হ'য়ে পড়েছে। তার মাঝে মাঝে চালা ঘর। কিন্তু কোথাও মাল্লবের সাড়া নেই। অজস্র চক্রালোকে উদ্ভাসিত আকাশ আর নতুন এ্যাডভেঞ্চারের রসে ভরা সেই অরণ্যপথ... কিন্তু তোর মনে তখন কবিতা নেই। তুই ভাবছিল অল্প কথা।

—হ্যাঁ বেণুর কথাই। বেণু নরেনের ছোট বোন। বিয়ে হয়নি তখনও। তোর সঙ্গে আলাপ হয়েছে কলকাতায়। এম-এ পড়ার সময় নরেন ছিলো সহপাঠী। অনেক দিন সে টেনে নিয়ে গেছে তোকে তাদের বাড়ীতে। হাজরা রোড বেথানে ল্যান্ডাউনকে খণ্ডিত ক'রে বালীগঙ্গী আভিজাত্যের হোওয়ার প্রবেশ করেছে, সেই-খানেই ওদের বাড়ী। তুই অনেক দিন গিয়েছিল ওদের বাড়ী—কিন্তু নরেন ছাড়া আর কারুর সঙ্গেই আলাপ হয়নি। আর হবেইবা কি করে? তুই ত মেয়েদেরকে চিরকাল অবজ্ঞা করিস। তাদের সঙ্গে মেশার মত চেষ্টাও তাই কখনও ছিলো না।

তবু একদিন আচমকা আলাপ হ'য়ে গেলো। নরেনকে খুঁজতে তাদের বাড়ীতে প্রবেশ ক'রে তার একতলার স্টাডিতে সোজা ঢুকে পড়েছিল। কিন্তু ঘরে ঢুকেই অপ্রস্তুত হয়ে গেলি। নরেন নেই—তার চেয়ারে একটি তরুণী ব'সে ব'সে বোধ হয় কিছু নকল করছিলো। তোকে দেখেই সে উঠে দাঁড়ালো—“আনন্স, দাদা নেই, একটু বাইরে গেছেন। আপনাকে বসতে বলে গেছেন দাদা।”

একটি অপরিচিতা তরুণীর সামনে দাঁড়িয়ে তুই বিব্রত

বোধ করছিল বইকি। সঙ্কোচের সঙ্গে হয়ত বলছিল—“আচ্ছা, আমি না হয় পরে ঘুরে আসছি।”

খিলখিল করে হেসে উঠলো তরুণীটি। অত্যন্ত সপ্রতিভ-কণ্ঠে সে বললো—“কেন, দাদা না থাকলে বসতে পারেন না? আমাদের সঙ্গে কথা বলতে লজ্জা করে নাকি?”

জোর করে লজ্জা খেড়ে তুই বলে উঠলি—“না লজ্জা নয়, ইচ্ছে হয় না।”

—“ইচ্ছে হয় না!” একটু ঝাঁঝালো কণ্ঠে তরুণী প্রশ্ন করলো—“কারণ?”

“কারণ?”...তুই হঠাৎ বলে ফেললি—“আধুনিক মেয়েরা কথা বলতে জানে না বলে।”

তুই যদি সঙ্কোচ খেড়ে মেয়েটির চোখে চোখে চাইতে পারতিস, তাহ'লে দেখা যেতো, প্রথমে রাগে লাল হ'য়ে উঠলো তার মুখ, তারপর তার কপালে জাগলো দ্রুতকণ। চোখের কোণে নামলো তীব্রতা। সেই মেয়েটি বলে উঠলো—“সত্যি কথা, আপনাদের মত লোকের সামনে দাঁড়িয়ে কথা বলতে জানার দরকার হয় না। পুরুষ যদি পুরুষ না হয়ে মেয়েমুখো হয়, তবে আমাদেরও ঘৃণা আসে।”

অপমানে তুই ততক্ষণে বিবর্ণ হ'য়ে গেছিল। খুব শক্ত মত একটা প্রত্যুত্তর তৈরী ক'রে বলতে গিয়ে দেখবি, মেয়েটি সেখানে নেই। তোর কথার উত্তর দিয়েই সে ভেতরে পালিয়েছে।

অনেকক্ষণ শক্ত হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইলি তুই। তারপর অনিচ্ছার সঙ্গেই এগিয়ে যাবি চেয়ারটার দিকে। লক্ষ্য পড়লে দেখবি, টেবিলের ওপর একটি ছোট্ট খাতা খোলা পড়ে আছে। তাতে মেয়েলি অক্ষরের ছোট ছোট স্তম্ভের হরফ যেন যন্ত্র ক'রে সাজানো। একটু কৌতূহলি হ'য়ে তুই বুকে পড়বি খাতাটির ওপর। একি? অবাক হ'য়ে তুই দেখবি সেই খাতাটির বুকে লেখা ছোট ছোট অনেকগুলি গান। আর সে গানগুলোর সবই তোর লেখা। এবারে চোখে পড়বে ওপরে আর একটি খাতা খোলা পড়ে আছে। তোর লেখা গানগুলো পড়বার জন্তে নরেন যে খাতাটি নিয়ে এসেছিলো সেই খাতাটি। এতক্ষণে কেমন যেন একটু আনন্দ আসবে তোর মনে। অপরিচিতা এক তরুণীর হাতে নিজের কবিতাকে সমাদৃত হ'তে দেখলে কার না আনন্দ হয়! মনে হ'লো এত গান লেখা সেই

একমুহূর্তেই বুঝি সার্থক হ'য়ে উঠেছে। মেয়েটির ওপর এতক্ষণ ধরে যে রাগ সঞ্চিত হ'য়েছিলো তোর, তার সবটুকু ঝরে পড়বে। একটু অল্পতপ্ত বোধ করবি। আর একবার দেখা পেতে ইচ্ছে হ'বে তার। খাতার পাতাগুলি ওলটাতে ওলটাতে একজারগায় এসে থমকে দাঁড়াবি। স্তম্ভর অক্ষরে লেখা একটি নাম—শ্রীমতী বেণু চৌধুরী।

ইতিমধ্যে শ্রীমতী বেণু কিরে এসেছে। খাতাটিকে তোর হাতে বিপর্যস্ত হ'তে দেখে প্রায় চিংকারের সুরে সে প্রশ্ন করলো—“আমার খাতা আমার না ব'লে আপনি খুলে দেখছেন?”

তার ক্রোধরক্ত চোখের দিকে তুই বেন চেয়ে রইলি। সূর্য্যাস্ত তার তখনও কাঁপছে রাগে। সেই অবস্থায় তার মধ্যে এক অদ্ভুত সৌন্দর্যের সন্ধান পেলো তোর চোখ। মিনিটখানেক চোখে চোখে চেয়ে থেকে হঠাৎ এক শুভ মুহূর্তে ছজনেই একসাথে হেসে উঠলি; আর সঙ্গে সঙ্গে সেই হাসির মধ্যে দিয়ে তাদের সন্ধি হ'য়ে গেলো।

এরপর বেণুর একটু বর্ণনা দেওয়া থাক। বড়লোকের মেয়ে; বাড়ী মুর্শিদাবাদের অন্তর্গত এক অতি অখ্যাত পল্লীগ্রামে। বেণু ও নরেন কলকাতায় থেকে পড়াশোনো করে। তারা মামারবাড়ী থেকে পড়ে এবং তাদের মামা কলেজের প্রোফেসর ও আধুনিক মনোভাবাপন্ন।

আপাততঃ ধ'রে নেওয়া যাক বেণুর বয়স প্রায় কুড়ি। শরীরের গঠনে পাঞ্জাবী মেয়ের দৃঢ়তা। তার দীর্ঘ ও বলিষ্ঠ দেহে কমবয়সীতার অভাব ছিলোনা কিন্তু তবুও সে রূপসী নয়। বর্ণ শ্রাম। চোখের দুটি গভীর কিন্তু চকল। সে চোখে স্বপ্ন দেখা চলে এবং অভিজাত ঘরের ছলানদের কেউ কেউ সে চোখের মায়াঅজনে মুগ্ধ হয়েছেন বলে শোনা যেত।

অতঃপর নরেনের সঙ্গে তোর বন্ধুত্ব আরও গভীর হ'য়ে উঠলো ও সে বাড়ীতে তোর যাতায়াত নিয়মিত হ'লো। অবশ্য এর মধ্যে মনোজগতের কোন দেবতার হাতের স্পর্শ আছে কিনা সে খবর তুই রাখতিস না। কারণ প্রেম পড়ার অভাব তোর মোটেই ছিলোনা। তুই ভালো-বাসতিস শুধু পর্যাপ্ত পরিমাণে চা ও বিদ্রুত ধ্বংস করতে, আর সে বাড়ীতে ইদানীং প্রবেশ করলেই চা ও বিদ্রুত

প্রচুর পরিমাণেই এসে হাজির হ'তো। চা-সরসরাহের তার গ্রহণ করেছিলো আন্তোভাবের আই-এ ক্লাসের ছাত্রী শ্রীমতী বেণু চৌধুরী।

দিনের পর দিন তুই ওদের সঙ্গে বসিষ্ঠ হ'য়ে উঠতে লাগলি। তোর মেলামেশায় কোন উদ্বেগ ছিলোনা। শুধু নরেনের অহুরোধেই তুই ওখানে যেতিস। আর ওখানে গেলেই বেণুর সাহচর্য্য অপরিহার্য্য হ'য়ে উঠতো। অবশ্য বেণুর সাহচর্য্য পরিহার করবার চেষ্টাও তুই কোন দিনই করিস নি। কারণ তোর মধ্যে কোন অসহুদেস্ত ছিলোনা। আর মেয়েদের চোখে চোখে তুই চাইতে পারতিসনা। কাজেই বেণুর চোখে অহুরাগের আশ্রয় সঞ্চিত হ'য়ে উঠছে কিনা লক্ষ্য করবার মত সুযোগও তোর আসেনি।

তবু হঠাৎ একদিন সে ধরা পড়লো তোর কাছে। কিন্তু ধরা পড়লিনা তুই। তাই অনেক অমূল্য মুহূর্ত বৃথাই অতিবাহিত হলো। অনেক স্বর্ধ্য আকাশে জলে জলে ক্ষয়ে গেলো। তবুও চেতনা এলোনা তোর। আচ্ছা, ধরে নে একটি সন্ধ্যা—যে সন্ধ্যায় তুই নিয়মমত হাজির হলি নরেনের ধোঁজে। বাড়ী গিয়ে যখন শুনলি নরেন বায়োকোপে গেছে, তখন তোর মনে পড়ে গেলো যে তোরও বাওয়ার কথা ছিলো। কিন্তু তখন প্রায় সাতটা। কাজেই আর যাওয়া চলেনা। অগত্যা বসে পড়ে তুই বললি—আমি চলি তাহ'লে?

তুই কালোচোখে বিদ্যুৎ ঝলসে উঠলো। মেয়ের গরজনে শোনা গেলো—ইস্ আমি চা খাবোনা বুঝি? তুই বোকার মত বলে ফেললি—তা খাও না? কিন্তু আমি থেকে কি করবো?

সেই কালোচপল চোখ তখন বলে উঠলো—“বন্ধন চূপ করে। একা চা খেতে আমার ভালো লাগেনা।”

কিন্তু তুই যে চিরকালের হাঁদা। এততেও তুই উঠবার চেষ্টা করলি। বললি—“একা কেন, তোমার মামা ও মামীমাও তা' চা খান?”

তবু সমান উৎসাহে বললো বেণু—“ওঃ তাহ'লেই হয়েছে। তাঁরা গেছেন শ্রামবাজারে নেমস্তর রাখতে। ফিরবেন রাত দশটায়।”

কাজেই তাকে বসতে হলো। বোধহয় তিন মিনিটের



যেই বিদ্যাতের মত চকিতে চা নিয়ে ফিরে এলো বেণু।  
ললো—“একা একা চা খেতে হ’বে ভেবে এতক্ষণ যা  
ধৈর্য লাগছিলো।”

কথায় কথায় তোর অনেক কথার অবতারণা করলি।  
অনেক আলোচনা হলো। রাতের ঘোর নামলো ঘরের  
ঘো। বেণু তোর একান্ত পাশে বসেই গানের খাতাটা  
লে রাখলো। বললো—“এ কথাগুলোর মানে বুঝতে  
পারিনা যে ?.....”

এক সময়ে তুই হঠাৎ উঠে পড়লি। বললি—“রাত  
’য়ে যাচ্ছে, আমি চলি।”

নিমেষে সোজা হ’য়ে বসলো সে, বললো—“না।”

—“বাঃ, রাত হচ্ছে না ?”

কেমন যেন গভীর অশ্রু কণ্ঠে বেণু বললো—“না।”

হঠাৎ সে তোর মণিবন্ধুতা তার কোমল একটি হাতের  
পর্শে চেপে ধরে বললো—“যান্ দেখি, কেমন জোর গায়ে !”

কজিটা খুরিয়ে নিমেষের মধ্যে ছাড়িয়ে নিয়ে দরজার  
দিকে এগিয়ে গেলি তুই। কিন্তু পেছন থেকে ডাকলো  
বণু—“শৈলেশবাবু...”

হঠাৎ চমকে উঠলো শৈলেশ। আচমকা নিজের নাম  
উচ্চারণ করে ফেলেছে সে। অপ্রস্তুতভাবে সিতিকণ্ঠের  
দিকে চাইতে গিয়ে দেখাল হলো সিতিকণ্ঠ নেই। তার  
স্বপ্নতার স্রবোগ নিয়ে সে কখন উঠে গেছে। আপন  
নে হাসলো শৈলেশ। বললো—ভাগ্যিস সিতি উঠে গেছে,  
ইলে ধরা প’ড়ে যেতুম যে !

কিছুক্ষণ শুক হ’য়ে থেকে এবার নিশ্চিন্ত হ’য়ে সে  
মাগন মনেই বলতে শুরু করলো...

—“শৈলেশবাবু...”

তুই ফিরে তাকালি। সোকার ওপর ব্যাকুল দৃষ্টি নিয়ে  
প্রতীক্ষা করছে বেণু। তার উদগ্রকণ্ঠে অক্ষুট ধ্বনি জেগে  
ঠলো—“দাদা এলে যাবেন ; এখন না।”

কিছুক্ষণ নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে রইলি তুই, কিন্তু তোর  
খয়াল বড় অস্থির। তুই বললি—“না, কাজ আছে।  
মামি এখনই যাবো।”

দাদা বাড়িবার আগেই বিদ্যুৎগতিতে বেণু এসে পথরোধ  
করে দাঁড়ালো।—“না, আপনি যাবেন না।”

সেই রাত্রির রহস্ত-আচ্ছন্ন বেণুকে যে-কোন লোকেরই  
বিস্ময়কর ব’লে বোধ হ’তে পারতো। কিন্তু কবিতা  
লিখেও তুই কোনদিন মনে প্রাণে কবি হ’তে পারিস নি।  
ঘরের মধ্যে ফিরে এসে বললি—“তারপর ?”

বেণু তোর বিরক্তিকুক্ষিত চোখের দিকে চেয়ে মিষ্টি  
করে একটু হাসবার চেষ্টা করলো—“আমায় খুব বিরক্তি-  
কর মনে হচ্ছে ?”

তার হৃদয়ের দুর্বলতা গলার করুণ সুরে যেন বেজে  
উঠলো। কিন্তু তুই অবিলম্বে। তোর মুখের দিকে চেয়ে  
অবশেষে হতাশ ভাবে সে বললো—“না, আপনাকে জোর  
ক’রে ধ’রে রাখবো না। আপনি যান...”

তুই আর বিলম্ব না করে একতলায় নামবার সিঁড়িতে  
পা দিলি। কয়েকটা সিঁড়ি মাত্র নেমেছিস—হঠাৎ বেণু  
ঝড়ের মত লাফিয়ে এসে দাঁড়ালো তোর গা ধেঁবে।  
হাত চেপে ধরে বললো—“না, যাবেন না।”

কিন্তু সেই মুহূর্তে তোর চোখে জান্নাথ ফাঁক দিয়ে  
আলো এসে পড়েছিলো। সেই চোখের দিকে চেয়ে  
ওর মুষ্টি শিথিল হ’য়ে এলো। হাত ছাড়িয়ে নিয়ে  
তুই নেমে এলি রাস্তায়। তারপর সোজা তোর মেসে  
ফিরে গেলি।

মনে কর, মেসে গিয়ে দেখলি একটা টেলিগ্রাম এসে  
পড়ে আছে। টেলিগ্রাম প’ড়ে তুই জানলি—বাড়ীতে  
মার টাইফয়েড। আর দেবী না ক’রে সেই রাত্রেই  
বাড়ী ফিরে এলি। মাকে নিয়ে মাসখানেক ব্যস্ত থাকা  
গেলো ; তোর পরীক্ষা ত’ আগেই চুকে গেছে। কাজেই  
বাড়ী ব’সে চাকরীর দরখাস্ত ছাড়তে লাগলি। ইতিমধ্যে  
আরও কিছুদিন কেটে গেলো।

এমনি একদিন রাত্রে হঠাৎ একটা দরকারে কলকাতায়  
এলি। তারপর ভবানীপুরের দিকে কাজ সারতে গিয়ে  
ইচ্ছে হ’লো হাজরা রোড অবধি এগিয়ে যাওয়ার। কিন্তু  
বেণুরা কেউ ছিলো না ; কাজেই তোকে ফিরতে  
হ’লো। খবর পাওয়া গেলো, ওরা দেশের বাড়ীতে  
ফিরে গেছে।

এই প্রথম একটা অস্থিতাপ এলো তোর মনে। আশ্চ-  
মানিকে প্রশ্ন দেওয়ার মত লোক তুই নোস্, তবু কেমন  
যেন ফাঁকা ফাঁকা লাগলো কলকাতা। একদিনের বেশী



থাকতে ইচ্ছে হ'লোনা। পোঁটলা বেঁধে রওনা দিলি বাড়ীর দিকে।

বাড়ীতে এসেই দেখা গেলো একখানা ছোট চিঠি এসে পড়ে আছে। লিখছে শ্রামলাগাছি থেকে বেণু চৌধুরী। ধরে নেওয়া যাক চিঠিটা এই রকম—

শৈলেশবাবু, নববর্ষের প্রীতি ও শুভাকাঙ্ক্ষা গ্রহণ করুন। নতুন বছরের সুরুতে আপনার শুভেচ্ছা কামনা করছি। মনে আমার জন্তে যদি কোন স্থগা সঞ্চিত থাকে তবে তা তুলে যাবেন আশা করি।—বেণু—

সেদিন রাত্রে তুই স্বপ্ন দেখবি। দেখবি দিগন্তের একটা রক্তরাঙা মেঘ আস্তে আস্তে মাহুঘের মূর্তিতে রূপ নিলো। দেখবি, সেই মাহুঘের মূর্তিতে ফুটে উঠেছে বেণুর স্মৃষ্টি মুখখানি। স্বপ্নের ঘোরে মনে হ'বে এই মেয়েকে চেয়েই তুই জন্ম জন্ম সাধনা ক'রে আসছিস। কিন্তু যুম ভাঙতেই স্বপ্নের মায়াও মিলিয়ে যাবে। তখন নিজের ওপরেই হয়ত অকারণ রাগ হবে।

তবু সারাদিন ধ'রে একটা ইচ্ছে হবে মনে—একবার শ্রামলাগাছি যেতে। পল্লীগ্রামের অসুরস্ব সৌন্দর্যের ছবি ভেসে উঠবে চোখে। কিন্তু যাওয়া হবে না। পরের দিন সকালেই একটা চাকরীর উমেদারীতে তোকে বর্ধমান ছুটতে হবে।

চাকরী নিয়ে বসেছিস আসানসোলে। কাজের চাপে অল্প কোন কথা হয়ত মনে নেই। কিন্তু আষাঢ়ের প্রথম দিনে একটুকরো একটা চিঠি এসেছে। লেখকের নাম নেই, তবু লেখককে চিনতে দেবী হবে না। চিঠিটা হয়ত এমনিও হ'তে পারে—“এই সজল আষাঢ়ের প্রথম দিনটিতে তোমার জন্তে প্রার্থনা জানাচ্ছি। তোমার পথযাত্রা নির্বিঘ্ন হোক। আমার কি একেবারেই ভুলে গেলে?” —সে—

হঠাৎ মনে হবে—না, ভুলিনি। ভুল সেদিন হ'য়েছিলো। কিন্তু সে ভুলের সংশোধন করবো। নিজের সঙ্গে প্রতারণা করবোনা আর। বেণু, তোমায় আমি খুঁজে পেয়েছি আজকে।

অপেক্ষায় দিনগুলি দীর্ঘ হ'য়ে উঠলো। অবশেষে আশ্বিনের ছুটিতে বাড়ী আসার সুযোগ ঘটলো। পুজোটা কাটিয়েই রওনা দিলি মুর্শিদাবাদের দিকে।

তারপর.....

আমার সেই প্রথম বর্ষনার স্থানে এসে দাঁড়িয়েছি তুই। সেই জ্যোৎস্না-জড়ানো কাঁচা রাস্তা ব'য়ে এক একটা ক'রে গ্রামগুলোকে ছাড়িয়ে এগিয়ে গেছি। বাঁদিকে বিলের মুখে প্রাগৈতিহাসিক যুগের এ বটগাছকে ছেড়ে এগিয়ে গেলি। সেই নিঃশব্দ পথে চলতে চলতে বারবার দাঁড়িয়ে পড়েছিস। পেছন দিগে চেয়ে আবার এগিয়ে গেছিস। তারপর একটা গ্রাম এসে থমকে দাঁড়ালি। পথের ওপরেই একটা প্রাসাদে মত বাড়ী। সেই অরণ্যের দেশে একটা অসুত অভিনব উৎসব শেষের বাতিটির মত একটি ঝাঙল ঘুলছিলো! তার বৈঠকখানায়। গোটানো সতরফিটি এপাশে ওপাশে জড়ো করা আসন আর পাতা। ব্যাং তাবে এদিক ওদিক ছুটছিলো দু'একটি চাকর। তাদের একজন এসে হয়ত প্রশ্ন করে বলবে—“কাকে চান?”

“নরেন নেই?”

চাকরের ডাকে নরেন বেরিয়ে এলো। অত্যন্ত বিষ ও ক্লান্ত মনে হলো তাকে। হয়ত সারাদিনের পরিশ্রমে অবসর হ'য়ে পড়েছে সে। তাকে দেখেই চমকে উঠে যেন। তার মুখ থেকে বেরিয়ে আসবে কটি কথা—“শৈলেশ?” এমনভাবে বিস্মিত হ'য়ে দাঁড়িয়ে থাকবে যে, তুই কিছুটা লজ্জিত হ'য়ে পড়বি। মনে হবে এ উৎসব বাড়ীতে হয়ত তার আসাটা উচিত হয়নি। কিন্তু নরেন বলবে—“আয় ভেতরে।”

ভেতরের ঘরে তাকে বসিয়েই নরেন অদৃশ্য হ'য়ে যাবে। তুই বসে বসে দেখছিস বাড়ীতে একটু ব্যস্ততা ভাব। চাকর এসে তাকে মুখ হাত ধোয়ার জল এনে দেবে। চাকরেই এনে দেবে চা। চা খেতে গিয়ে তোর একটা অভিমান আসবে মনে। কলকাতার বাড়ীতে বেণু বরাবর নিজের হাতেই তাকে চা এনে দিতো। এখানে তার দেখাও পাওয়া গেলো না এখন পর্যন্ত। অর্ধেকটা খেয়ে জুড়োনো চাটা সরিয়ে রেখে দিবি।

অবশেষে নরেন ফিরে আসবে। বলবে—“একটু দেবী হ'য়ে গেছে। কিন্তু সত্যি বলছি, তুমি যে আসবে এ আমি কল্পনাও করিনি।”

অভিমানে শুক হ'য়ে তুই দাঁড়িয়ে রইলি। হঠাৎ এক সময়ে মাথা তুলতেই চোখে পড়লো নরেনের

লতরা চোখ ছুটো। তুই বিস্মিতভাবে তার হাত চেপে রেবি.....“নরেন ?”

হাত ছাড়িয়ে নিয়ে সে ডাকবে—“আয়,” নরেনের সঙ্গে খাওয়ার ঘরে এসে ঢুকবি। নরেন হাত ধ’রে এনে গাতার সামনে বসিয়ে নিজেও তাঁর পাশে বসে পড়বে। লবে হস্ত—“আমিও খেয়ে নিই।”

আয়োজনের ক্রটি নেই। লুচি তরকারি সন্দেশ। প্রত্যেকটি জিনিষ সুপাচ্য ও পর্যাপ্ত। কিন্তু তুই তখনও চাকুল হয়ে রয়েছিস—কই বেণু ত’ এলো না একবার! অবশেষে মুখ ফুটে বলে ফেলবি—“বেণুকে দেখছি না ত ?”

এক মুহূর্তে সকলের বিস্মিত দৃষ্টি সমবেত হ’লো তাঁর ওপরে। খাওয়া বন্ধ করে নরেন বললো—“সেকি ? তুমি কি জানো না তবে...?”

সামনে সাজানো লুচি তরকারি ও সন্দেশের স্তূপ নিমেষে নিমগ্নতার মত বিস্মাদ হ’য়ে উঠলো। হাত গুটিয়ে নিয়ে বুকের সমস্ত রক্তশোতকে শুক করে স্বাগুর মত বসে বসে তুই শুনে গেলি—বেণু মারা গেছে আজ দশ দিন—পুরো দশ দিন। তিন দিনের জরে হঠাৎ সে..... আজই তার শ্রাদ্ধ; এ খাওয়া দাওয়ার সামান্য আয়োজনও সেই জন্তেই।

## দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

### শ্রীবিজয়রত্ন মজুমদার

মাজ তেসরা জ্যৈষ্ঠ। আর একটি তেসরা জ্যৈষ্ঠের কথা আর বার মনে পড়িতেছে। কলিকাতার মাঠে ফুটবলের রক্তম। আমরা খেলা দেখিতেছি : প্রতিদ্বন্দ্বিতা জোর, পাঠ গম্ গম, খেলা খুব জমিয়া উঠিয়াছে। অকস্মাৎ একজন লোক আসিয়া আমাদের এক বন্ধু-সহদর্শককে ডাকিয়া ইয়া চলিয়া গেল। বন্ধু নিঃশব্দে স্থান ত্যাগ করিলেন। ফণেকের তরে আমরা বিম্বন হইয়া পড়িয়াছিলাম। চ্যাচের মাদকতা অসাধারণ; প্রিয় স্ত্রীদের অস্থপস্থিতি বিন্মত হইতে বেগী সময় লাগিল না। কিন্তু সেদিনের মস্তমনস্ততার মনস্তাপ আজও অব্যাহত রহিয়াছে।

এই বন্ধু—দিলীপকুমার রায়। পরদিন প্রাতঃকালে বিনা মেঘে বজ্রাঘাতের মত দিলীপের পিতা কবির বৈজেন্দ্রলাল রায়ের বিয়োগবার্তা সহরে ছড়াইয়া পড়িল। নূতন নূতন নাটক স্রষ্টা করিয়া আর তিনি বঙ্গীয় নাট্যশালায় গুণি সাধন করিবেন না; নূতন নূতন গানে নিত্য নূতন সুর গবেষণা করিয়া বাজলার আকাশে বাতাসে আর তিনি নব নব উদ্গাদনার সঞ্চার করিবেন না; বৈজেন্দ্রলাল রায়ের জননী বঙ্গভূমিকে নিতুই নব, অতিনব সাজে সজ্জিত করিয়া, বিচিত্র রূপে, বিচিত্র বর্ণে, বিচিত্র কুসুম, বিচিত্র রত্নালঙ্কারে বিভূষিত করিয়া, জগজ্জননী, জগদ্ধাত্রীপীণী জননীকে

নিত্য নূতন রত্ন-বেদীতে অধিষ্ঠিত করিয়া সাতকোটি সন্তানের অন্তরে প্রেরণার বিদ্যুৎ প্রবাহ প্রবাহিত করিবেন না; সুরের সপ্তস্বর আর বাজাইবেন না; সঙ্গীতের মধ্য দিয়া ভারতের আকাশে ভক্তির ইন্দ্রধনু আর আঁকিবেন না; পূর্ণিমা সন্মিলনে আর প্রাণের স্পন্দন জাগিবে না; বঙ্গসাহিত্যে রসের মন্মাকিনী ফুলকুলনাদে আর বহিবে না; হান্ত—রক্ত—রক্তের গঙ্গা-বয়না-সরস্বতীর ত্রিধারায় বঙ্গভূমি আর প্রাবিত হইবে না। কাল সকালেও ঝাঁহার হাসি সন্তোগ করিয়াছি, গান শুনিয়া মুগ্ধ মোহিত হইয়াছি, অপরিমিত অনাবিল মেহলাভে ধস্ত হইয়াছি, আজ আর তাঁহাকে দেখিব না। পিকবর নীরব; মধুচক্র অদৃশ্য; কুঞ্জবন ভঙ্গ। দ্বিজেন্দ্রলালের মৃত্যু অভ্যস্ত আকস্মিক। স্ত্রী পিতাকে “বঙ্গনারী” নাটকের পরিশোধন কার্যে ব্যাপৃত দেখিয়া দিলীপ খেলা দেখিতে গিয়াছিল; বাড়ী ফিরিয়া, মেহন্থের আর সে “মটু” ডাক শুনিতে পাইল না। তার পর কত কাল কাটিয়া গিয়াছে! কত কাল! কাল না কহিয়া, তার পর কত বজ্রাস্ত বিগত হইয়াছে বলিলেই বোধহয় ঠিক বলা হয়। কিন্তু কি উবর, শুক, বিরস, মরুভূমি সদৃশ কল্প আমরা অতিক্রম করিয়াছি। দ্বিজেন্দ্রের বোগ্য বন্দনা আমরা করি নাই। তাঁহার

প্রাণ্য পূজার্তনা বঙ্গদেশে হয় নাই। এই হত্যার তাঁহাকে স্পর্শ না করিলেও, জাতির চিত্তপটে অল্পপনের কলঙ্কের পশরা হইয়া রহিয়াছে এবং আজ, অতীব বীভৎস আকারেই প্রকটিত হইতে চলিয়াছে। কৃষ্ণনগর হইতে খবর আসিয়াছে, যে-গৃহে বিজ্ঞেন্দ্রলাল জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই গৃহ পরহৃতগতপ্রায়। শুনি, বেশী নয়, পাঁচ সাত হাজার টাকার দায়েই সেই মুক্তিকাখণ্ড নিলামে উঠিয়াছে। আমাদের জাতীয়তা বোধ যে কত অন্তঃসারশূন্য অসার, ইহার আগেও বহুবার—বারম্বার তাহা বিজ্ঞাপিত হইয়াছিল। কিন্তু ইত্যবসরে, দেশ স্বাধীন হইয়াছে—আমরা জগৎ সভায় আসন পাইয়াছি; হইলে কি হয়, অপযশের পশরা আজও তেমনই পরিপূর্ণ, তেমনই ভারি। দৈবরচনায় বিজ্ঞানসাগরের বাস-শবনের কথা আমরা ভুলি নাই। বঙ্কিমচন্দ্রের কাঁঠালপাড়ার বাড়ীর কথা কি ভুলিবার? কিন্তু কেন এমন হয়? দাঁওয়ানজী কার্তিকেশ্বর রায়ের সহধর্মিণী সেদিনের বঙ্গ সমাজ মধ্যে রত্নপ্রসবিনীরূপে সমাদৃত ছিলেন। তাঁহার সকল সন্তানই দিকপাল—কৃতী ও প্রতিষ্ঠা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। সত্যই কি তাঁহাদের বংশধরগণ ঐ পবিত্র মুক্তিকাখণ্ডটিকে রায় বংশের স্বাধিকারে রাখিতে অক্ষম? বঙ্গভারতীর প্রিয়তম পুত্র, স্বাধীনতার অজুতম সাধক, মাতৃমন্দিরের বরণ্য পুরোহিত বিজ্ঞেন্দ্রলালের বংশোদ্ভূত বলিয়া, বঙ্গদেশ ও বাঙ্গালীজাতি অনন্তকাল তাঁহাদের গলে যশোমালা উপহার দিবে; বঙ্গদেশ যতদিন বঙ্গদেশ, বঙ্গভাষা যতদিন বঙ্গভাষা, দেশপ্রেম যতদিন দেশপ্রেম, ততদিন তাঁহাদের পানে চাহিয়া নীরব শ্রদ্ধাজলি অর্পণ করিবে। আর এইটুকু—সমুদ্রের তুলনায় গোপদসম—ত্যাগ স্বীকারও অকটিকর হইল? যে মাহুষ গঙ্গাজলে অবগাহন করিয়া দেহ মন ধস্ত, পবিত্র বোধ করে, গঙ্গোত্রির কোন মর্যাদাই সে দেয় না; এ কি আশ্চর্য! বঙ্গদেশীয় নাট্যশালাই বা নিষ্ক্রিয় নিশ্চেষ্ট থাকিতে পারেন কি রূপে তাহাও ত ভাবিয়া পাই না। ডি, এল, রায়ের নাটকের জাবর কাটিয়া ও তাহার অপচার ঘাঁটিয়াই তাঁহারা লক্ষ্মীর বরণাভ করিয়াছেন। এ কথা কি মনে পড়ে না? সম্ভাচারনিষ্ঠ এই দেশ হইতে পিতৃ ভ্রমণ কি তবে উঠিয়া গেল? অতঃপর অস্বদেশে মহালয়া নিছক ছুটির দিন বলিয়াই পরিগণিত হইবে কি?

ভারপর, আমাদের এই বঙ্গভূমি? সত্যকথা বলিতে হইলে নিরতিশয় লজ্জায়, নতশিরে, মানমুখে ইহাই বলিব যে: বিজ্ঞেন্দ্রলাল রায়ের অপরিশোধনীয় ঋণ স্বীকার করিয়াই কর্তব্য সম্পাদন করা হইয়াছে। পৃথিবীতে একটি ঋণ কোন মতেই শোধ হয় না। সে মাতৃঋণ! দেবতার দয়ার মত, প্রায়ুটের বারি ধারার মত, ভাগীরথীর পুণ্য প্রবাহের মত, অপার্থিব মাতৃঋণ অবাচিত, অপরিমেয় ও অবাধে বর্ষিত হয়। সন্তানের সাধ্য কি সে অনন্ত ঋণভার শোধ করে? আমাদের দেশের স্বাধীনতার ইতিহাস যতপি কোনদিন কোন নিরপেক্ষ ঐতিহাসিকের দ্বারা রচিত হয়, রাজনৈতিক স্বাধীনতা মুক্ত, প্রাদেশিকতার কলহ কলঙ্ক-বিবর্জিত নিখুঁত ও সর্বদীন ইতিহাস প্রস্তুত হয়, তাহাতে দেখা যাইবে, ডি, এল, রায় নামধারী বাঙ্গালী নাট্যকার ও কবির ঋণ মাতৃঋণের মত অসীম, অনন্ত ও অপরিশোধ্য। মায়ের মত এই কবিও মুক্ত হতে কেবল দিয়া গিয়াছেন। প্রত্যাশা ছিল না; প্রতিদান চাহেন নাই; বিনিময়ের চিন্তাও করেন নাই। সেই ইতিহাসে আরও দেখা যাইবে, স্বাধীনতার ভাঙ্গা আসর তিনিই জাগাইয়া রাখিয়াছিলেন; সে ভাঙ্গা কুঞ্জবন শিককুঞ্জে তিনিই সজীব রাখিয়াছিলেন; কথায় আছে, মাহুষের দেহের মধ্যে রাবণের চিতা নাকি অনন্তকাল ধরিয়াই জলিতেছে—এ কথার অর্থ কি তাহা আমার জানা নাই বটে; তবে পরাধীন জাতির প্রাণের প্রাণে, অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে স্বাধীনতা যজ্ঞের হোমান্নি সূর্য্যকাল ধরিয়া জালিয়া রাখিতে পারা যে যায়, তাহা এই আমি, আমার এই ছুটি চক্ষুক্ষু দিয়াই দেখিয়াছি। এই আমরাই দেখিয়াছি, বাঙ্গলার অন্ধকার অশানে দীর্ঘকাল বিজ্ঞেন্দ্রলালই চিত্তাঘ্নি প্রধূমিত রাখিয়াছিলেন; স্বাধীনতার বর্ষিকাটি তিনিই নিবিতে দেন নাই। পরাধীন জাতির নরনারী স্বাধীনতার গানখানি পাছে ভুলিয়া যায়, মাতৃমন্ত্রে দীক্ষিত বাউল তাঁহার একভায়াটি বারেকের তরেও ধামিতে দেন নাই। সেই বিজ্ঞেন্দ্রলালের কোন মর্যাদাই আমরা মিই নাই। যে জাতি জীবনের কৃষ্টি, সংস্কৃতি ও অতীতের গৌরব করে, তাহার পক্ষে ইহা শোভন, সঙ্গত ও সমীচীন হইয়াছে কিনা, আমি যদি আজ সে কথা বঙ্গবাসীজনকে বিবেচনা করিতে বলি, আশা করি, তাহা অস্বাভাব্য হইবে না।

বাঙ্গলার আজ চরম দুর্দিন। অতিকার হস্তী কর্দমে প্রোথিত। রক্ত দেখিয়া পচা পুতুর পরিত্যাগ করিয়া কাদরীও তাহাকে ব্যঙ্গ করিয়া বাইতেছে। দিল্লীর মন্ত্রী-সভায় আসন লাভ করিয়া গোপালবাহাদুর আরেকবারও বক্র হস্ত, বক্সিস কটাক্ষ নিক্ষেপ করে। বুকু-ব্র্যাও দীর্ঘজটা কঠাৎ-বোগী মিনিষ্টাররাও বাঙ্গলায় আসিয়া বাঙ্গালী বিধান-চন্দ্র রায় ডাক্তারকে হিতোপদেশের পাঠ দেয়। আজ বাঙ্গলার মান মর্যাদা, বাঙ্গালীর প্রাণ, বঙ্গরমণীর সতীত্ব দিল্লীর দাবা ব'ড়ের ঘুঁটি হইয়া পড়িয়াছে। সবচেয়ে বড় দুঃখ এই যে, তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ ইতিহাসের দোহাই পাড়িতেও ছাড়ে না। সে ইতিহাস বোধ হয় তাহাদের মন-গড়া ইতিহাস। কান্তবের সহিত তাহার কোন সম্পর্ক নাই; সত্য তাহার ছায়াও মাড়ায় নাই। তাহারা ত জানে না, শতধা বিচ্ছিন্ন, সুবৃথ ও আত্মবিস্মৃত জাতির অন্তরে জাতীয়তা বোধ এই বঙ্গদেশই জাগাইয়াছিল। তাহারা হয়ত ভুলিয়া গিয়াছে, পরাধীন দেশের মর্মে স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা এই বঙ্গদেশই স্ফুট করিয়াছিল। শ্রুতি শক্তি তাহাদের খুব হাতধরা, তাহাতে তিলমাত্র সন্দেহ নাই। তাই তাহারা ভুলিয়া গিয়াছে স্বাধীনতার রাজহুয় যজ্ঞ, এই বঙ্গেই অল্পকিট হইয়াছিল। সমিধ সংগ্রহ এই বঙ্গদেশই করিয়াছিল এবং যজ্ঞানলে পূর্ণাহুতি এই বাঙ্গলাই দিয়াছিল। তখন কোথায় ছিল, ভারতবর্ষ? সেদিন কোথায় ছিল আরেকবার সাকসেনার দল? জননী জম্মভূমির পূজা মণ্ডপে সন্ধি পূজার বাণ্ডভাণ্ড যখন উদ্দাম ও উদ্ভাসিত হইয়া উঠিত, নিদ্রাঘের ক্ষুধিত, ছিন্নভিন্ন ও বিদীর্ণ-বক্ষ: ধরিজীর মত মণ্ডপের হাঁড়ি-কাঠ যখন 'বলি চাই' আরও 'বলি চাই' রবে ব্যাকুলতা নিনাদিত করিত; কামারের রক্তাক্ত খড়্গ মুহূর্হ: যখন রবিকর ঝলকে উঠিত ও নামিত এবং ক্রধির প্রাবনে এই বঙ্গের মৃত্তিকা উর্ধ্ব করিয়া, বকীর তরুণকে বীর নির্ভীক নিরুদ্ভা করিয়া দুর্গিরীক্ষ্য লক্ষ্যকের, স্পষ্ট ও নিকটতর করিয়া; সাধনার সিদ্ধিকে করতলগত করিতেছিল, তখন কোথায় ছিল ভারতের অন্ত্রাত্ম প্রদেশ ও তাহাদের বাক্যবীরবৃন্দ? সে দুর্দ্দৈব রণরঙ্গে কে দাতিয়াছিল? দলে দলে আত্মবলি কাহার দিয়াছিল? মা'কে মা বলিয়া সকলের আগে কে ডাকিয়াছিল? "বন্দেমাতরম্" সর্বপ্রথম কোথায় ধ্বনিত হইয়াছিল?

জননী জম্মভূমির চরণাবধিনে ভক্তিচন্দনচর্চিত প্রাণপুষ্পাঞ্জলি বাঙ্গালী ভিন্ন আর কে দিয়াছিল? দিল্লী? দিল্লী যে অনিষ্ট করিয়াছে তাহার তুলনা মেলা তার। আজ সিকিউলারের মামদো এমন পিকিউলাররূপে ভারতবর্ষের ষাড়ে চাপিয়া বসিয়াছে যে, "বন্দেমাতরম" ও পরিত্যক্ত হইয়াছে; মা'কে মা বলিয়া ডাকা নিষিদ্ধ ও মাতৃপদে ভক্তি নিবেদনও সেকলে কুসংস্কার বোধে বর্জনীয় হইয়াছে। তরসা আছে, অদূর ভবিষ্যতে আমাদের স্বর্গাদপি গরিয়সী জননী জম্মভূমি জ্যাকেট স্ফাট ধারণ করিয়া ত্রিংশ কোটি সন্তানের নয়নানন্দ বর্ধন করিবেন। আমরাও "ও মাই ডিয়ার কেরারিলাও" মজোকারে তাহার বন্দনা করিব। হা রে হতভাগ্য জাত! যাঁহারন্তে, নবজীবনের প্রাকালে পবিত্র মাতৃনামও পরিত্যাগ করিল।

বাঙ্গলার স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রথম পর্বে, স্বাধৈশিকতার প্রস্তাবনা অধ্যায়ে দ্বিজেন্দ্রনাথের যে দানই থাকুক, বর্তমান প্রবন্ধে তাহার আলোচনা আমি নিম্নয়োজন মনে করি। বঙ্গসাহিত্যের সমৃদ্ধি করে তাহার অনন্ত, অবিনশ্বর দানও আমার আলোচ্য নহে। সাহিত্য কি আমার আকিসের লেডী টাইপিস্ট যে, তাহার ভাল মন্দ সার্টিফিকেটের উপর তাহার চাকরীর উন্নতি অবনতি, স্থায়িত্ব নির্ভর করিবে? সাহিত্যের রত্নভাণ্ডারে তাহার যে দান, তাহা ত জাতীয় সম্পদ হইয়া রহিয়াছে; কালের তুলাদণ্ড তাহার বিচার করিবে। আমি বলিতেছি দ্বিজেন্দ্র-সাহিত্যের কথা, যাহা জাতির, দেশের প্রভূত হিত সাধন করিয়া সাহিত্য শাস্ত্রের সম্পূর্ণ সার্থকতা প্রতিপন্ন করিয়াছে। এ হিত কালনিক হিত নহে; প্রবন্ধ লিখিয়া সে হিত-কথা বুঝাইতে হয় না; হিতের পরিমাণ করিতে অথবা তাহার ঔৎকর্ষ যাচাই করিতে দেশীয় বা বিদেশীয়দিগের সুপারিশ বাচিয়া বেড়াইবার দরকার হয় না। দ্বিজেন্দ্রনাথ রায় বাসুদেবদাসী কবি; তাহার দানও বাস্তুব এবং আমাদের বঙ্গভূমি তাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছে। প্রস্তরোৎকীর্ণ লিপির মত দ্বিজেন্দ্রের দান জাতির চিত্তকলকে ধোমিত আছে; অনন্তকাল ধরিয়া অনন্ত মহত্ত্ব জাতি তাহা পাঠ করিবে।

তখন দামোদরের ঢল নামিয়া গিয়াছিল। বঙ্গের অদ্বৈত উপলক্ষ্য করিয়া বঙ্গোপসাগরে যে আলোড়ন হইয়াছিল, তৎকালে বঙ্গ দেশে যে প্রভঞ্জন বহিয়াছিল,

বঙ্গীয় সমাজ হইতে আগেরগিরির যে লাভাপ্রবাহ ছুটিয়াছিল, তাহা বাঙ্গলা জোড়া লাগায়, বৃটিশের সেটেলড্ ক্যাপ্ট. আনসেটেলড্ হওয়ায়, সে সকলই প্রশমিত হইয়াছিল। বঙ্গীয় তরুণের হাতে গীতা, বুক্ বীথী ও অধরে “বন্দে মাতরম্” মন্ত্র দিয়া শ্রীঅরবিন্দ বন্দে যে অগ্নি যুগের উদ্বোধন করিয়াছিলেন, সে দিগদাহী অগ্নির তেজও মন্দীভূত হইয়াছিল। সে একটা সময় আসিয়াছিল। যেন কাল-বৈশাখীর প্রলয়ে মাতামাতি করিয়া বারি বক্ষ শাস্ত হইয়াছে। যেন গ্রীষ্মের কাঠকাটা মধ্যাহ্নে হ্রস্ব শিশু সারাক্ষণ দাপাদাপি করিয়া অবশেষে নিত্রিতা জননীর আঁচল ধরিয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। যেন কুরুক্ষেত্র মহাসমরের পর প্রায়-নির্মহুত ধরিত্রী মাটিতে লুটাইয়া পড়িয়াছে। সংগ্রামে ইচ্ছা আছে কিন্তু শক্তি নাই; বাগনা উদ্ধাম অথচ সাধ্য নাই; দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধশেষে জার্মানীর যেমন উরু-ভঙ্গ, নিঃশেষিত বক্ষঃরক্ত, ১৯১২ সালের পর হইতে আমাদের এই বাঙ্গলা দেশেরও সেই দশা ঘটিয়াছিল। একটা মহারণের রত সারমেয় যুগল যুদ্ধান্তে দূরান্তে এলাইয়া ক্ষতস্থান লেহন করিতেছিল। ঠিক এই সময়েই বিজ্ঞানজ্ঞান রায় তাঁহার নাট্যকাব্যের সজীবনী সুধা বিলাইয়া বাঙ্গলাকে বাঁচাইয়া, বাঙ্গালীর স্বাধীনতার সাধনাকে সজীব রাখিয়া, তাহার আশা-আকাঙ্ক্ষার তরু-মূলে বারি সিক্ত করিয়াছিলেন। মহাভারতের শেষের দিকে অর্গারোহণ পর্বের মত স্বাধীনতারও অর্গ যাত্রার পালা শুরু হইয়া গিয়াছিল। এই ডি-এল-রায়ই সে অন্তিম যাত্রা নিবারণ করিয়াছিলেন। দেশের তখন মহাবুদ্ধের পরে মহানিজা নামিয়া আসিয়াছে। বিরটি উত্তেজনার পরে নিরতিশয় অবসাদ আসে; উগ্র কণ্ঠ-চাক্ষুর অবসানে সীমাহীন জাভা দেখা দেয়; প্রবল আশা ভঙ্গে নিরাশার হিম প্রবাহ প্রবাহিত হয়। বঙ্গদেশও হইয়াছিল। উদ্দীপনা একদা আকাশ স্পর্শ করিয়াছিল; আবার হতাশাও বাঙ্গালীকে রসাতলে প্রোথিত করিয়াছিল। তখন এই ডি-এল-রায়ই দৈত্যগুরু গুজ্জাচাখের মত মুমূর্ষু মৃতকল বাঙ্গালীকে পুনরুজ্জীবিত রাখিয়াছিলেন। বিজ্ঞান-রচিত একখানি নাটকের নান্যিকাকে যুদ্ধক্ষেত্রের “তুলীকৃত মৃত্যুর” মাঝখানে পাড়াইয়া মৃতের সংকার ও আহতের সেবা করিতে দেখিয়াছিলাম। নাট্যকার ডি-

এল-রায়কেও আমরা বনাক্কারাবৃত্ত, নৈরাশ্রীড়িত বাঙ্গলার অশানভূমিতে পাড়াইয়া আশার বাণী শুনাইতে দেখিয়াছি। কি শাস্ত স্তম্ভের উদার গভীর সে মূর্তি! কি নিম্ন মধুর আশাপূর্ণ ললিত সে দৈববাণী! আমরা অত্যন্ত অকৃতজ্ঞ ও কৃত্রিম জাতি; তাই তাঁহাকে তুলিতে বসিয়াছি।

ডি-এল-রায় রাজপুতানা—রাজস্থানের ইতিবৃত্ত হইতে হিন্দু মুসলমান—মুঘল রাজপুতের কাহিনী লইয়া নাটক রচনায় প্রবৃত্ত হইলেন। নাটকের ভাষা করিলেন, অভিনব; ঘটনা সংস্থাপন অভিনব; গীতাবলী অভিনব; গানে সুর সংযোগ করিলেন, তাহাও অপূর্ণ ও অভিনব। তাঁহার উদ্দেশ্য অভিনব; লক্ষ্য অভিনব; কাজেই অভিনবও উদ্ভাবন করিতে হইয়াছিল। যুদ্ধ নাই বটে; কিন্তু যুদ্ধার্থ জাতিকে প্রস্তুত করিতে হইবে; আশা নাই বটে, কিন্তু নিরাশাময় দেশবাসীর উচ্চাশার তন্ত্রীগুলিতে ঝকঝক জাগাইতে হইবে। সে ত নিজা নয়, অবসাদের পাঁতালপুরী হইতে স্বাধীনতাকামী নরনারীকে উদ্ধৃত করিতে হইবে, অভিনবত্বের মহাসমারোহে ব্যতিরেকে তাহার সম্ভাবনা কোথায়? ডি-এল-রায়ের ঐতিহাসিক নাটকের অভিনয় দেখিতে বসিয়া দর্শক বিজয়ী মুঘল সম্রাটকে দেখিত না; বিজিত রাজপুত অথবা হিন্দুকেও দেখিতে পাইত না;—দেখিত, বিজয়ীর বেশে বৃটিশের পদতলে বিজিত ভারতবর্ষ। নাটকের পাত্রপাত্রীগুলিকে সে মধ্য ভারতের—রাজপুতানা বা দিল্লীর অধিবাসী বলিয়া ভাবিতে পারিত না; বরং তাহারা যেন বড় পরিচিত; যেন বড় চেনা; যেন রক্তক্ষের বাহিরে বাস্তবেও তাহাদিগকে নিত্যনিয়ত দেখিতে পাইতেছে। নাটকীয় সংলাপ, সে যেন সেই পাঁচ শত বর্ষের পূর্বের অদেখা, অজানা মহয়ুগোষ্ঠীর উক্ত নহে; পরাধীন ভারতবর্ষের প্রত্যেকটি নরনারীর অন্তরে সেগুলো সত্তত ধ্বনিত ও প্রতিধ্বনিত হইতে শুনিতে। ডি-এল-রায়ের নাটকে নাটকীয় রঙ্গ রস—হাস্য কৌতুক, গীত বাস্তব, প্রেম, ভালবাসা, অহুসার, পূর্বরাগ, কামক্রোধ যুদ্ধবিগ্রহ চক্রান্ত বড়বস্ত্র সব ছিল, কিছুই অভাব ছিল না; কিন্তু অভিনয়ান্তে ভারতবর্ষের দর্শক যখন গৃহ প্রত্যাগত হইতেন, তখন নৈশাকাশে শুকতারাটির মত একটি উজ্জল নক্ষত্রই অমান জ্যোতিঃতে তাঁহার হৃদয়াকাশ প্রভাসিত রাখিত—দেশ-প্রেম। একটিমাত্র আকাঙ্ক্ষাই জাগরক থাকিত—স্বাধীনতার

কামনা। দুর্ভেদ্য অন্ধকারের মধ্যেও সুবিমল ছাতি একটি গন্ধাই নির্দেশ করিত—স্বাধীন ভারতবর্ষ।

একদিন, এক মাস বা এক বৎসর নহে; বহু বর্ষ বহু কাল ধরিয়াই দ্বিজেন্দ্রলাল রায় ঐকান্তিক নিষ্ঠাভরে, এক-তানমানলয়ে, ব্রতধারিণী হিন্দু বিধবার মত এই ব্রত উদ্‌যাপন করিয়াছিলেন। দেশে, তখন কোন আন্দোলন ছিল না; নিদাঘের নিস্তরঙ্গ নদীর মত দেশ নীরব, নিধর, শান্ত। আঘাতের পর আঘাত, নির্মম নিষ্ঠুর আঘাতে সাত কোটা বাঙ্গালী অধ্যুষিত বঙ্গদেশ ভূশ্যাশায়িত; চলচ্ছক্তিহীন, অক্ষম, অশক্ত। সে বেদনা কোনদিন যে শমিত হইবে, পক্ষাঘাতে অবসন্ন দেহ কোন কালে যে উজ্জীবিত হইবে, বলহীন, দুর্বল এই জাতি নব বলে বলীয়ান হইয়া আবার যুদ্ধোত্তম করিবে, কোন আশাই ছিল না; নিশ্চিহ্ন অন্ধকারে একটি ক্ষীণ আলোক রশ্মিও রেখাপাত করিত না; বরং আশঙ্কা হইত শরবিদ্ধ শাদ্দলের মত এই বাঙ্গালীজাতিও শেষ শয্যায় শুইয়া শেষ নিঃশ্বাস পরিত্যাগের প্রতীক্ষা করিতেছে। মুমূর্ষু কর্ণে হরিনামের মত এই কবি মৃত্যুপথ যাত্রার কাণে জীবনের গান, নয়নে নব জন্মের ছবি জ্বরে মৃতসঞ্জীবনীস্বরূ—ভ্রাণ্ডি মকর-ধ্বজ ঢালিয়াছিলেন। অবসাদে আচ্ছন্ন জাতি আত্মহতায় জীবনাবসান না করে, হতাশার ঘূর্ণ্যাবর্তে ভাসিয়া না যায়, প্রদোষের অন্ধকারে দিকভ্রান্ত পথিক অপঘাতে না আত্ম-বিলয় প্রাপ্ত হয়, নাট্যকার, গীতিকার, সুরকার দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের তাহাই ব্রত ছিল। ভবিষ্যদ্রূপী কবি জানিতেন, দিব্যজ্ঞানে, দিব্যদৃষ্টিতেই দেখিয়াছিলেন, উর্বর ক্ষেত্র চিরদিন উষর প্রান্তর রহিবে না। একদিন কৃষক আসিবে; ক্ষেত্রে বীজবপন করিবে; অবশ্রুই বৃক্ষ রোপন করিবে; সোনার ফসল কলিবে। তাই তিনি সবতনে ভূমি প্রস্তুত রাখিয়াছিলেন; আগাছামুক্ত ক্ষেত্র কর্তিত করিয়া, জমির পাট করিয়া গিয়াছিলেন। প্রতিভার বরপুত্র কবি জানিতেন, আবার রখী আসিবে; আবার রথ চলিবে; বিজয়শব্দ নির্ঘোষে আবার ভারতবর্ষ প্রকম্পিত হইবে, স্বাধীনতা সংগ্রামে জাতির জীবন মৃত্যু আবার পায়ের

ভূতা হইবে; তাই কবি পথ পরিষ্কার রাখিয়াছিলেন। মনে আছে, তাঁহার এক একখানি ঐতিহাসিক নাটক একাদিক্রমে এক, দেড়, দুই বৎসর পর্য্যন্ত “ক্ষেত্র” উত্তম রাখিত এবং উত্তাপ মন্দীভূত হইবার পূর্বেই আর একখানি নাটক আবির্ভূত হইয়া ব্যারমিটারের পারদ পুনরায় মার্জিত স্পর্শ করিত। বাস্তবিকের খরদৃষ্টি, বজ্রাঘি না নির্দীপিত হয়। শিল্পাধ্যক্ষ সদা সতর্ক, বয়লারের আশুন যেন না নিবে। বঙ্কিমের মত দ্বিজেন্দ্রলালও পৌরুষ ও পুরুষকারেরই হোতা। স্ভাকামৌ, ভগুমৌ ও বহুতর “মৌর” মর্মান্তিক শত্রু দ্বিজেন্দ্রলাল জাতিকে গৌরবের প্রেরণাই দিয়াছেন। তাঁহার শেষ দান, “ভারতবর্ষ” বন্ধে জলদ-মস্ত্রে পুরুষের গান, পৌরুষের সঙ্গীত—“ভারতবর্ষ।” অথচ, স্বাধীনতা-সংগ্রামের ইতিহাস লিখিতে, বলিতে, বুঝাইতে যেন অনেকের নাম আমরাও করি, অনেকেই করেন, কিন্তু কেন জানি না, দ্বিজেন্দ্রলাল রায় নামটি বাদ পড়িয়া যায়। তাঁহার নামটি বাদ পড়িয়া যায়। তাঁহার নামটা কেহ করে না। রামায়ণ হইতে রামলক্ষ্মণকে বাদ দিবার গুণ্ডতাও হয়ত একদিন দেখিতে ও সঙ্ক করিতে হইবে। এও তাহারই পূর্বাভাস। একদা বঙ্কিমচন্দ্র সুপ্ত জাতিকে জাগাইয়াছিলেন; আর একদিন আঘাতে আঘাতে মৃতকল্প জড় ও অচেতন জাতিকে অত্যাঙ্ক ভবিষ্যতের জন্ত উদ্বুদ্ধ করিতে দ্বিজেন্দ্রলাল রায় তাঁহার বিজয়িনী লেখনী ধারণ করিয়াছিলেন। বঙ্কিমকে আমরা ভুলিতে বসিয়াছি এবং দ্বিজেন্দ্রলালের ঋণ আদৌ অস্বীকার করিয়াছি বলিলেও ভুল হইবে না। বঙ্কিমচন্দ্র জাতীয়ত্ব বোধের জন্মদাতা জনক হইলেও জাতির পিতৃদে তাঁহার অধিকার নাই যে কারণে, নিরাশা-নিপীড়িত জাভ্যক্রিষ্ট মৃতপ্রায় জাতিকে সঞ্জীবনী মস্ত্রে সঞ্জীবিত রাখিলেও ঠিক সেই কারণেই দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ও অনাদৃত। বিলাত—ইংরাজ তাঁহাদের লগাটে অলকা তিলক আঁকিয়া দেয় নাই। তাই স্বাধীন ভারতবর্ষেও বঙ্কিমচন্দ্র বঙ্গভাষার লেখকমাত্র! হা রে বরাত’ আর দ্বিজেন্দ্রলাল, শুদ্ধ একজন নাট্যকার !!! বন্দে মাতরম। জয়হিন্দ !!





# অমর

## শ্রীগোপালদাস চৌধুরী

অমরকোষে অমরদিগের দশটি নাম দেখা যায়—

“অমরা ‘দৈত্য’ দৈত্যের ‘দমুজজারি-দানবঃ’।

শুক্লশিখা ‘দিত্তিহতাঃ’ পূর্বদেবাঃ ‘সুরধিবঃ’” বর্ণবং। ১২।

অমর, দৈত্য, দৈত্যের, দমুজ, ইজারি, দানব, শুক্লশিখা, দিত্তিহতা, পূর্বদেব ও সুরধিব। অমর শব্দের ব্যুৎপত্তি—অস্তিত্ব কিপ্যন্তি দেবান্ ‘দেবতাদিগকে বাহারী ক্ষেপণ করে অর্থাৎ নিজের অধিকার হইতে বিতাড়িত করে, তাহার অমর’। অমরক্ষেপণে অস্বাভাব্য উৎপাদি “উরণ” প্রত্যয় যোগে সিদ্ধ। অথবা বিরুদ্ধার্থে নঞ-যোগে তৎপুরুষ সমাসে অমরপদ সিদ্ধ। অর্থ সুরদিগের বিরোধী। এই ব্যুৎপত্তি ভামুজী সম্মত। রামায়ণে সুরা-সম্বন্ধ-রহিত বলিয়া অমর হইয়াছে, এই বিবরণ জানা যায়। সমুদ্রমন্থনে সুরা উৎখিত হইয়া প্রথম অমর সমীপে গমন করিয়াছিল, কিন্তু অমরেরা আপভয়ে গ্রহণ না করায় তাহার অমর নামে অভিহিত হইল। (১) কল্পপ পত্নী দিতির অপত্য্য নিবন্ধন অপত্যার্থে (দিত্যাদিত্য পাং। ৪।১।৮৫) “জ” প্রত্যয় যোগে দৈত্য এবং চ্যক্ প্রত্যয় যোগে (৪।১।২০) দৈত্যের। কল্পপ পত্নী দমুর অপত্য্য দানব। হিরণ্যকশিপু প্রভৃতি দৈত্য, এবং শব্দ প্রভৃতি দানব—কিন্তু দৈত্য দানব উভয়ই অমর।\* দমু হইতে জাত অতএব দমুজ (জন+ড প্রত্যয়) ইজের শব্দ ইজারি, শুক্লের শিখা, দিতির হতা ইহার পূর্বে দেবতাই ছিল পরে অত্যাচারণে ভ্রষ্ট হইয়া অমর নামে পরিচিত হইয়াছে। পূর্বেচতে দেবাস্তেতি “পূর্বদেবাঃ”। সুরদিগকে ঘেব করে অতএব সুরধিব (সুর-ধিব-কিপ্ ৩২।৬১)। ভামুজী অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, যদিও ইহার পাতালবাসিত্ব নিবন্ধনে পাতাল বর্ণে কথিত হইবার উপযুক্ত, তথাপি দেব-বিরোধিত্ব নিবন্ধন বর্ণবর্ণে পঠিত হইয়াছে। “যত্বেপি পাতালবাসিত্বেন পাতালবর্ণে বক্তব্যঃ—তথাপি বৃদ্ধ্যপারোহাদিহৈবোক্তাঃ”, এই এসঙ্গে বক্তব্য যে সাধারণতঃ পাতালই অমরদিগের নিবাসস্থল বলিয়া পরিচিত। মার্কণ্ডেয় পুরাণীয় চণ্ডাতে (উত্তরচরিত ৮অ) শিবদূতীর উক্তি হইতে বুঝা যায় যে, পাতালই অমরদিগের স্থান বলা—

“ত্রৈলোক্যমিল্লোলভতাং দেবাঃ সন্ত হবিভূজঃ।

যুগং প্রসাত পাতালং যদি জীবিতুসিচ্ছথ।”

(১) বরুণভূত ততঃ কচ্ছা বারুণী রঘুনন্দন। উৎপপাত মহাভাগা মার্গমানাঃ পরিগ্রহং। দিতেঃ পুত্রা পতাং রাম অগৃহ্বরুণাক্ষজাং। অদিতেন্দু স্ততা বীর অগৃহ তামনিমিত্তাম। অমরা তেন দৈত্যৈঃ সুরা তেনা দিতেঃ স্ততাঃ। ক্ষুণ্ডাঃ প্রমুখিতাবাসন্ বারুণীগ্রহণাং সুরাঃ। (বালকাণ্ড) বং। ৩৮। ৪

ইল্ল ত্রৈলোক্যাদিপত্যলাভ করুন, দেবগণ স্বর্গীয় হবি ভোজন করুন। তোমরা যদি বাঁচিতে চাও, তবে পাতালে চলিয়া যাও। ১২ অধ্যায়ে আরও স্পষ্ট জানা যায় যে, শুভ নিশুভ বধের পর অংশিষ্ট দৈত্যগণ পাতালে গমন করিয়াছিল।

“দৈত্যাস্ত দেব্যা নিহতে শুভে দেবরিপৌ যুধি।

অগধিধ্বংসিনী তস্মিন্মহোৎসেভুলবিক্রমে। ৩৪

নিশুভে চ মহাবীর্যে শেবাঃ পাতালমায়ুঃ। ৩৫

এখানে বিশেষ বক্তব্য এই যে যদিও সাধারণতঃ পাতালই অমরের নিবাস বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে, তথাপি অন্ততঃ ইহাদের বাসস্থানের প্রভূত প্রমাণ পাওয়া যায়।

খিলহরিবংশের বিষ্ণুপর্বাস্তগত ঘটপুরবধবৃত্তান্ত এই এসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। “পারিপাত্র নামক পর্বতের সাহুদেশে ঘটপুর নামক অমর নগর অবস্থিত। শিব বিষ্ণুকে বলিয়াছেন,

“ঘটপুরং নামনগরং দানবানাং জনার্দন।

অত্রাস্তর্ধরীদেশে পরাক্রম্য মহাবল্যঃ।

এতে দৈত্যা দুর্ভাক্সানো অগতো দেবকটকাঃ।

ছরা বসন্তি গোবিন্দ সানাবস্ত মহাগিরেঃ।

অবধ্যা দেবদেবানাং বরেণ ব্রহ্মোৎসাহনথ।

মাহুবাস্তরিতাত্ত্বান্মামেতান্ জহি কেশব।

বিষ্ণুপর্ব ৭৪ অ ৪৩।৪৫

এই পারিপাত্র পর্বতের সাহুতে ভুবির প্রদেশে দানবদিগের ঘটপুর নামক নগর অবস্থিত। দুর্ভাক্সা, অগতের কটকবরণ দেবত্রোহী অমরগণ প্রচ্ছন্নভাবে ইহাতে বাস করে। ইহার ব্রহ্মার বরে দেবতাদিগের অবধ্য। অতএব তুমি মাহুবশরীরে ইহাদিগকে বধ করিবে। ৮২ অধ্যায়ের পিণ্ডিতার্থ হইতে জানা যায় যে, ত্রিপুরাসুর বধের পর যে সকল অমর জীবিত ছিল, তাহার কঠোর তপস্যার দ্বারা ব্রহ্মাকে তুষ্ট করিয়া বর প্রার্থনা করিয়াছিল যে,

“ত উচুঃ সর্বদেবানামবধ্যাঃ স্ত্রাম হে বিভো।

পুত্রাণি ঘট চ নো দেব ভবন্তবস্তর্মহীতলে। ১৭।

আমরা সকল দেবতার অবধ্য হইব এবং জুঁমিতে আমাদের ঘটপুর হটক ইহাতে আমরা স্থখে বাস করিব।

মহাভারতের দ্রোণপর্বের ২৯১ অধ্যায়ে দ্রালোকে অমরদিগের তিনটি পুরীর বর্ণনা দেখা যায়। যথা,

“অমরাণাং পুরাভাসং শ্রীণ বীৰ্য্যবত্যাং দিবি।

আয়সং রাজতকৈব দৌবর্ণং পরমং মহৎ। ৬৪



লৌহবর্ণ কমলাকান্ত তারকাকান্ত রাজতং ।

ভূতীষত পুরস্বেবাং বিদ্যামালিন আয়সং । ৬৫

বীর্ঘবান্ অহরদিগের তিনটি পুর ছিল। একটি লৌহময় রাজতময় এবং অষ্টটি স্বর্ণময়। স্বর্ণময় পুরের অধীশ্বর রাজতপুরের স্বামী তারকাকান্ত এবং আয়সপুরের স্বামী । এসময়তঃ বক্তব্য যে উক্ত ত্রিপুরনিবাসী অহরগণই ত্রিপুরাহর ভিত্তি এবং শিব কর্তৃক নিহত। ত্রিপুরাহর একটি নহে। ৩৩ অধ্যায়ে কথিত হইয়াছে যে,

নির্জিতেষু চ দৈত্যেষু তারকস্ত স্তাত্তরঃ ।

তারাকঃ কমলাকান্ত বিদ্যামালীচ পাণ্ডিবা ।

তপ উগ্রং সমাহ্বায় পরমে নিয়মে স্থিতাঃ ॥ ৪৫ ॥

ই রাজন্! দেবগণ কর্তৃক অহরেরা পরাজিত হইলে তারকাহরের ত্রয়ের তারাক কমলাকান্ত ও বিদ্যামালী বিশেষ নিয়ম পূর্বক উগ্রতপস্তা করিয়াছিল, তাহাদের তপস্তার ফলে ময় তিনটি পুর নির্মাণ করিয়াছিল।

“ততোময়ঃ স্বতপসা চক্রেধীমান্ পুরাণিচ ।

ত্রীণি কাকনমেকংৈব রৌপ্যং কাকায়সংভবা । ১৫ ।

কাকনং দিবিত্রাসীদস্তরীক্ষে চ রাজতং ।

আয়সকান্তবন্ ভোমং চক্রহং পৃথিবীপতে ॥ ১৬ ॥

একটি পুর কাকনময় অপরটি রৌপ্যময় অষ্টটি কৃষ্ণলৌহময়। কাকনময় পুর দুয়ালোকে, রাজত অন্তরীক্ষে এবং লৌহময় ভুলোকে নির্মিত হইয়াছিল। পুর চক্রের উপর রচিত হইয়াছিল।

বিশ্বপর্কের ৮৩ অধ্যায়ের বৃত্তান্ত হইতে অবগত হওয়া যায় যে, ত্রিপুরেরাও অবস্থা-বিশেষে অহরের পক্ষভুক্ত হইয়া দেবতাদিগের সন্ধে যুদ্ধ করিত। ইহাও বুঝা যায় যে, অহর নিবাসে ব্রাহ্মণাদিগও বাসন হইত। যথা—

“বৈশম্পায়ন উবাচ—

এতস্মিন্নেব কালে তু চতুর্বেদ-বড়াঙ্গবিৎ ।

ব্রাহ্মণো যাজ্ঞবল্ক্যস্ত শিষ্যো ধর্মগুণাযিতঃ ॥ ১ ॥

ব্রহ্মদত্তেতিথিযাতো বিশ্রোবাজ্ঞসনৈরিবান্ ।

অশ্বমেধঃ ক্রতন্তেন বহুদেবস্ত ধীমতঃ ॥ ২ ॥

স সংবৎসরীক্ষয়াং ধীক্ষিতঃ ষট্পুরালয়ে ।

আবর্তীয়াঃ শুভে তীরে হনতা মুনিজুষ্টিয়া ॥ ৩ ॥

সখা চ বহুদেবস্ত সহাধ্যায়ী বিজ্ঞোক্তমঃ ।

উপাধ্যায়ন্ত কৌবধ্য কীরহোতা মহাজ্ঞনঃ ॥ ৪ ॥

বশম্পায়ন জননজয়কে প্রবলিতেছেন—এ সময়ে ষড়ঙ্গের সহিত চতুর্বেদবিৎ ব্রাহ্মণ যাজ্ঞবল্ক্যের শিষ্য ধার্মিক বিবিধগুণসম্পন্ন বাজ্ঞসনৈরী উপাধ্যায়ী ব্রহ্মদত্ত নামক এক বিদ্বৎ ছিলেন। ইনি বুদ্ধিমান বহুদেবের স্বমেধ সম্পন্ন করিয়াছিলেন। ষট্পুরস্থ মুনিগণ—সেবিত আবর্তী নামক নদীর পোতন তীরে সেই ব্রাহ্মণ সংবৎসর ব্যাপক যজ্ঞে ধীক্ষিত হইয়াছিলেন ইনি বহুদেবের সখা, সহাধ্যায়ী এবং কীরহোতা অর্থাৎ

অধ্বর্যু ছিলেন। (২) ইনি একজন উপাধ্যায় ছিলেন। অথবা সহাধ্যায়নের পর বহুদেবেরই উপাধ্যায় হইয়াছিলেন। এখানে উপাধ্যায় শব্দের অর্থ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা আবশ্যক। অমর সিংহ বলিয়াছেন, “উপাধ্যায়োঃ অধ্যাপকঃ,” উপাধ্যায় শব্দের অর্থ অধ্যাপক। ইহা হইতে প্রকৃত অর্থ প্রকাশ পাইল না। “উপেত্য অধীরতে অন্নাৎ” ছাত্র আসিয়া ইহার নিকট হইতে অধ্যয়ন করে এই অর্থে (ইউশ্চ। পাণ্ড। ৩। ৩। ২১) এই পাণ্ডিণি সূত্রানুসারে ইচ্ছাভাব পর অপাদানে যৎ প্রত্যয় যোগে উপাধ্যায় শব্দ নিস্পন্ন হইয়াছে। স্তত্রাৎ বর্তমান যুগের স্কুল কলেজের শিক্ষক অধ্যাপক নহেন। কারণ ইহারা ক্লাসে ক্লাসে ঘুরিয়া ঘুরিয়া পড়ান। মনু বলিয়াছেন। ২। ১৪১

“একদেশস্ত বেদস্ত বেদান্তাপি বা পুনঃ ।

যোহধ্যাপয়তি বৃত্তার্থঃ উপাধ্যায়ঃ স উচ্যতে ॥”

বেদের একদেশ অথবা বেদের অল্প যিনি বৃত্তির জন্য অধ্যাপনা করেন, তিনি অধ্যাপক। বৃত্তি শব্দের অর্থ গুরুদক্ষিণা অথবা রাজ-প্রদত্ত সাহায্য। বেতন নহে।

“বহুদেবস্তত্র যাতো দেবক্যা সহিতঃ প্রভো ।

যজমানং ষট্পুরস্থং যশাশ্রকো বৃহস্পতিম্ ॥ ৫ ॥

তৎ সত্রং ব্রহ্মদত্তস্ত বহবঃ বহুদক্ষিণম্ ।

উপাসন্তি মুনিশ্রেষ্ঠা মহাত্মানো মহাত্রতাঃ ॥ ৬ ॥

ব্যাসোহহং যাজ্ঞবল্ক্যস্ত হুমন্ত জৈমিনিপুত্রা ।

দুতিমান্ জাজলিষ্টেব দেবলাজান্ত ভারত ॥ ৭ ॥

যজ্ঞানুসঙ্গপরাযুক্তং বহুদেবস্ত ধীমতঃ ।

যত্রেপিতান্ দদৌ কামান্ দেবকী ধর্মচারিণী ॥ ৮ ॥

বাহুদেব প্রভাবেন জগৎ শ্রষ্টুর্দ্বীতলে ।

তস্মিন্ সত্রে বর্তমানে দৈত্যাঃ ষট্পুরবাসিনঃ ॥ ৯ ॥

নিকৃষ্টাভাঃ সমাগয়া তনুচূষ্মরপিতাঃ ।

কার্যতাং যজ্ঞভাগো নঃ সোমং যাত্নামহেবয়ং ॥

কজ্ঞান্ত ব্রহ্মদত্তো নো যজমানঃ প্রযচ্ছতু ॥ ১০ ॥

হে প্রভো! দেবকীর সহিত বহুদেব ষট্পুরে অস্থিত সেই যজ্ঞে যজমান ব্রহ্মদত্তের সমীপে বৃহস্পতি যজ্ঞে ইন্দের স্তায় গমন করিয়াছিলেন। বহু অন্নযুক্ত এবং প্রচুর দক্ষিণায়ুক্ত ব্রহ্মদত্তের সেই সত্রে মহাত্রত মহাত্মা মুনিশ্রেষ্ঠগণ গমন করিয়াছিলেন। ইহাদের মধ্যে ব্যাস আশ্রিত (বৈশম্পায়ন) যাজ্ঞবল্ক্য হুমন্ত জৈমিনি দুতিমান্ জাজলি এবং দেবল প্রভৃতি। সেই সত্রে বুদ্ধিমান বহুদেবের সম্পত্তির অনুসঙ্গ হইয়াছিল। ইহাতে ধর্মচারিণী দেবকী প্রার্থীর অভিলষিত বস্তু দান করিয়াছিলেন। জগৎশ্রষ্টা বাহুদেবের প্রভাবানুসারে ভূতলে সেই সত্রে আরও হইলে ষট্পুরবাসী নিমুন্ড প্রভৃতি অহরগণ উপস্থিত হইয়া বলিয়াছিল যে, আমাদের জন্য যজ্ঞের ভাগ নির্দিষ্ট হউক, আমরা

(১) অধ্বর্যুদগাতৃ হোতারো যজুঃ সামগৃবিদঃ ক্রমাৎ । যজ্ঞব্যাপৃত বহুর্বেদবিদ ব্রাহ্মণ অধ্বর্যু। অমর ব্রহ্মবর্ণ।

যজ্ঞীয় নোমলভারি নিকট যাইব। যজ্ঞাভ্যুত্থাতা ব্রহ্মদত্ত আমাদিগকে কস্তা দান করুক, অস্ত্রান্ত বস্ত্রও প্রার্থনা করিয়া জানাইয়াছিল যে,—

“অস্ত্রাণা তু ন যন্তব্যং বরমাজ্ঞাপরামহে” ১২

“আমরা আদেশ করিতেছি যে, আমাদের আজ্ঞা লঙ্ঘন করিলে যাগ করিতে দিব না।” এমিকে ব্রহ্মদত্তের নিমন্ত্রণে জরাসন্ধ প্রভৃতি ভারতীয় নৃপতিবৃন্দ সমাগত হইয়াছিলেন। অশ্বরের সহিত বিবাদ করিবার জন্ত বহুদেবের অভিপ্রায়ানুসারে কৃষ্ণ প্রহ্লাদ প্রভৃতির সহিত বটপুরে উপস্থিত হইয়াছিলেন। যুদ্ধের উপক্রমে নারদ মুনী চিন্তা করিয়া অশ্বর সমীপে উপস্থিত হইলেন এবং বলিলেন—

“কথং বিরোধং যদ্বিঃকৃৎস্বা যদ্বৈরিহাস্ততে।

যো ব্রহ্মদত্তঃ স হরিঃ সহি তন্ত পিতৃঃ সখা।”

তুমি যাদবদিগের সহিত বিরোধ বীধাইয়া এখানে নিশ্চিন্ত ভাবে বসিয়া আছ কেন? যে ব্রহ্মদত্ত সেই হরি। কারণ সে তাহার পিতা বহুদেবের সখা। কৃষ্ণের জন্ত ব্রহ্মদত্ত বহু ভাল ভাল কস্তা রাখিয়াছে। তুমি যে একশত কস্তা হরণ করিয়া আনিয়াছ তাহা উপযুক্ত রূপে ক্ষত্রিয় রাজাদিগকে ভাগ করিয়া দিয়া তাহাদিগকে সহায় কর। নারদের পরামর্শে নিকুণ্ড তাহাই করিল।

“নিকুণ্ডোৎথাব্রীকৃষ্টঃ ক্ষত্রঃ হুররিপুস্তদা।

অমুর্বার্গরিয়া ক্ষত্রস্ত্র সাহাস্ত্র্যং সত্যমেব চ ১৪২

তখন দেবশত্রু নিকুণ্ড হুইয়া ক্ষত্রিয়ের মাহাত্ম্য বর্ণনা করিয়া বলিল—

“যুদ্ধং নো রিপুভি সার্কং ভবিষ্যতি নৃপোত্তমাঃ।

সাহায্যং দাতুমিচ্ছামো ভবন্তিস্তত্র সর্বথা ১৫০

এবমস্থিতিতানুচুঃ ক্ষত্রিয়াঃ ক্ষীণ কিম্বাঃ।

পাণ্ডবেরানুভে বীরান্ ক্রতার্থান্নারদাঘিভো ১৫১

শত্রুর সহিত আমাদের যুদ্ধ উপস্থিত। হে নৃপতিশ্রেষ্ঠগণ! ইহাতে আপনাদের সর্বথা সাহায্য পাইতে ইচ্ছা করি। ইহাতে কেবল পাণ্ডবগণ ব্যতীত সকল ক্ষত্রিয়ই সম্মত হইলেন।

অতঃপর যুদ্ধ এবং তাহার কলাকল। আমরা এইমাত্র প্রতিপাদন করার অভিপ্রায়ে এই বৃত্তান্তটি উদ্ধৃত করিলাম যে,—সেকালে ক্ষত্রিয়গণ জায় এবং ধর্মের পক্ষপাতী ছিলেন না। বার্ষ সিন্ধির জন্ত দেবদ্বিজের বিরুদ্ধেও অস্ত্রধারণে বিরত হইতেন না।

### কিরাত-প্রসঙ্গ

বিষ্ণুপুরাণের ২ অংশ। ২৮ অধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে যে, “পূর্বে কিরাতাযন্ত্রাঃ পশ্চিমে যবনাঃ স্থিতাঃ।” যে ভারতবর্ষের পূর্বে দিকে কিরাত নিবাস এবং পশ্চিমে যবন স্থান। পূর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে যে, কিরাত একশ্রেণীর য়েচ্ছ। ইহাদের নিবাস যে কেবল ভারতের বাহিরে পূর্বদিকেই নিয়ত ছিল, তেমন বুঝা যায় না। মহাদেব আরাধনার অর্জুন হিমালয় পর্বতে তপস্তা করিতে গিয়াছিলেন। উহা উত্তর দিকে অবস্থিত।

“দিশং হরীচীং কৌরব্য হিমবচ্ছধরং প্রতি।” (বনপর্ব ৩৮ অ- ৩১) উত্তর দিকে হিমালয় পর্বতের শিখরের উদ্দেশে অর্জুন গমন করিয়াছিলেন। এখানেই অর্জুনের চলমার জন্ত মহাদেব কিরাতবেশ গমন করিয়াছিলেন। উমা দেবীও কিরাতবেশধারিণী হইয়াছিলেন।

“কৈরাতং বেশমাস্ত্র্য কাকুনক্ষম-সন্নিভম্।

বিজাজমানো বিপুলো গিরির্দেবকরিবাচলঃ। (বনপর্ব ৩৯ অ ২)

সেই মহাদেব কাকুনক্ষের স্তায় কৈরাতবেশ ধারণ করিয়াছিলেন ইহাতে বিপুলকায় মহাদেব স্বমের পর্বতের স্তায় শোভা পাইয়াছিলেন।

“দেবো সহোময়া শ্রীমান্ সমানব্রতবেশরা।

নানা বেশধরে হৃষ্টে ভূতৈর্মমুগত স্তদা ১৪৪

কিরাত বেশ-সংছন্ন গ্রীভিষ্ঠ্যপি সহস্রশঃ।

অশোভত তদা রাজান্ স—দেশোহতীৰ ভারত ১৫৫

মহাদেব কিরাতবেশ ধারণ করাতে উমা দেবীও ঐ বেশ ধারণ করিয়াছিলেন। মহাদেবের অশ্রুচর ভূতবর্গও নানাপ্রকার বেশ ধারণ করিয়াছিল। কিরাতবেশধারী গ্রীগণ কর্তৃক সমাচ্ছন্ন সেই দেশ অতীত শোভা পাইয়াছিল।

এই বর্ণনা হইতে বুঝা যায় যে, হিমালয়ের অন্তর্গত ও কিরাত—নিবাস ছিল। কিরাতদিগের বেশভূষা কিরূপ ছিল, তাহা স্মরিতা দেবীর ধ্যানগম্য রূপের বর্ণনা হইতে বুঝা যায়।

যথা,—“শ্রামাং বহিকলাপশেখর-যুতা সাবঙ্গপর্বাঃ শুকাং

গুঞ্জাহার-লসং পরোধরভরা মট্টাহিকাল্ বিজতীম্।

তাড়কাক্রান্ত মেঘলা-গুণরণমঞ্জরীত্যাং বিজতীং

কৈরাতীং বরদাভরোজিতকরাং দেবীং ত্রিনেত্র্যাং ভজে ১৫৬

শ্রামবর্ণা, ময়ূরপুচ্ছনির্মিত-মস্তকভূষণালঙ্কৃতা পত্রময়-বসন-পরিধানা, গুঞ্জাময়হারের দ্বারা বীহার স্তনযম শোভমান, যিনি অষ্ট সর্প ধারণ করিতেছেন, তাড়ক বলয়-কটিপুত্র ভূষিতা এবং শকাবমান নুপুরধারিণী কিরাত বেশধারিণী বরদ মূর্ত্তা ও অভয় মূর্ত্তার দ্বারা বীহার হস্ত উজ্জত ত্রিনয়না দেবীকে ভজন করি। ইহা হইতে বুঝা যায় যে, কিরাতেরা মস্তকে ময়ূরপুচ্ছ ধারণ করিত, লতাপাতার আবরণ বস্ত্ররূপে ব্যবহার করিত, এবং বৃকে গুঞ্জার মালা পরিত।

কিরাতদিগের কিরূপ ধর্ম ছিল, তাহারও পরিচয় পাওয়া যায়। তিথিবিশ্ব ধৃত স্বল্প-পুরাণীয় এবং ভবিষ্য-পুরাণীয় যচনে কথিত হইয়াছে যে,—

“স্বরামাস্ত্র্যাপহারৈরর্কপথজৈবিনা তু যা।

বিনা মৈত্রেয়ামণী স্ত্রাং কিরাতানান্ত সমস্তা ১৫৭

তপ যজ্ঞ মন্ত্র রহিত যে পূজা বাহাতে স্বরা ও মাংস প্রভৃতি উপহার দেওয়া হয় সেই পূজা তামসী বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। ভবিষ্যন্তরে বলা হইয়াছে যে,—

“ব্রহ্মণৈঃ ক্ষত্রি়ৈঃ কৈট্ঠৈঃ শূদ্রৈরৈকৈশ্চ সেবকৈঃ।

এবং নানা য়েচ্ছপণৈঃ পূজ্যতে সর্বদম্ভ্যতি ১৫৮

৭ কজির বৈজ্ঞ শূর এবং অন্তান্ত সেবকগণ দুর্গা দেবীর পূজা করিয়া  
। দহাত্যা ব্যবসায়ী নানাপ্রকার রোজুগণও পূজা করিয়া থাকে।  
যত্না বুঝা যায় যে, দহাত্যাই কিরাতদিগের ব্যবসায় ছিল।  
দশকুমার চরিত কাব্যের অন্তর্গত উপহার বর্ণিতরিত পাঠে জানা যায়  
বদেহ দেশ ও মগধের মধ্যস্থানে অরণ্য মধ্যে কিরাত নিবাস ছিল।  
কার সমীপে কিরাতেরা নরহত্যা করিত।

### ভারতবর্ষ

বিক্র পুরাণ ২য় অংশ ২য় অধ্যায়ে মৈত্রেয় কর্তৃক ভূমণ্ডল বিষয়ক  
কালের উত্তরে পরাশর বলিয়াছেন;

“জম্বু দ্বীপাং যো দ্বীপো শাল্লিলিচাপারো দ্বিজ।

কুশঃ কৌকিল্য শাকঃ পুষ্করশ্চৈব সপ্তম ॥ ৫

এতে দ্বীপাঃ সমুদ্রে স্তম্ভ সপ্তভিরাবৃতাঃ।

লবণেশ্বরাঙ্গাঙ্গির্দ্বিধিহ্রজলৈঃ সমম্ ॥ ৬

দ্বিধি মধ্যে সাতটি দ্বীপ অবস্থিত। তাহাদের নাম জম্বুদ্বীপ, দ্বন্দ্বদ্বীপ,  
শাল্লিলদ্বীপ, কুশদ্বীপ, কৌকিল্যদ্বীপ, শাকদ্বীপ ও পুষ্করদ্বীপ। এই সাতটি  
দ্বীপ, লবণ, ইন্দ্র, সুরা, ঘৃত, দধি, দুগ্ধ ও জল এই সপ্ত পদার্থময়  
তিনটি সমুদ্রের দ্বারা সমভাবে আবৃত অর্থাৎ বেষ্টিত। এই সকল দ্বীপের  
আশেপাশে জম্বুদ্বীপ অবস্থিত। এই জম্বুদ্বীপের মধ্যস্থানে স্বর্ণময় সুরেন্দ্র  
পর্বত অবস্থিত।

হিমবান হেমকূটশ্চ নিবদশ্চাত্ত দক্ষিণে।

নীলঃ শ্বেতশ্চ শূদ্রী চ উত্তরে বধ পর্বতাঃ ॥ ১০

হিমালয় প্রভৃতি ছয়টি পর্বত বর্ধনংজক অংশকে বিচ্ছিন্ন করিয়া  
বিস্তার করিয়াছে, অতএব ইহাদের নাম বর্ধ পর্বত। বর্ধ পর্বতের  
দ্ব্যে হিমালয়, হেমকূট ও নিবদ এতিনটি মেকর দক্ষিণে নীল, শ্বেত ও  
শূদ্রী এই তিনটি পর্বত ত্রিমেকর উত্তরে।

“ভারতঃ প্রথমঃ বর্ধঃ ততঃ কিস্পুবধঃ পুত্ৰম্।

হরিবর্মণঃ তথৈবাত্মন মেরৌদক্ষিণতো দ্বিজ ॥ ১২

রম্যাক্ষোত্তরে বর্ধঃ তন্ত্ৰৈবাত্মন হরিবর্মণম্।

উত্তরাঃ কুরবশ্চৈব যথা বেতারতন্ত্ৰা ॥ ১৪

১ দ্বিজ মৈত্রেয়! মেকর দক্ষিণদিকে প্রথমতঃ ভারতবর্ষ, তৎপর  
নস্পৃকবর্ধ, তৎপর হরিবর্ধ। মেকর উত্তরদিকে রম্যাক্ষ ৬৭সমীপে  
রথমবধ তৎপর উত্তর কুরবধ। এই বর্ধ ভারতের মত অর্থাৎ  
সুরাকার।

“নবসহস্রমৈকৈকমেতেবাং দ্বিজ সপ্তম।

ইলাবৃত্তক তন্মধ্যে সৌবর্ণোমেককচ্ছিতঃ ॥ ১৪

ই সকল বর্ধের পরিমাণ নবসহস্র যোজন। ইলাবৃত্ত বর্ধেরও প্রমাণ  
নবসহস্র যোজন তাহার মধ্যভাগে স্বর্ণ বৈক উত্তরভাগে অগ্নিহিত।

“মেরৌশ্চতুর্দিশঃ ভক্ত নবসহস্রবিস্তৃতঃ।

ইলাবৃত্তঃ মহাভাগ চত্বারিংশতঃ পর্বতাঃ ॥ ১৫

নবসহস্র যোজন বিস্তৃত ইলাবৃত্ত বর্ধে মেকর চারিদিকে বিস্তৃত স্বরূপ  
ভূত যোজন সমুদ্র চারিটি পর্বত আছে।

“পূর্বেণ মন্দরো নাম দক্ষিণে গন্ধমাদনঃ।

বিপুলঃ পশ্চিমে পার্শ্বে হুপার্শ্বেচোত্তরে শ্বতঃ ॥ ১৭

পূর্বদিকে মন্দর পর্বত, দক্ষিণে গন্ধমাদন, পশ্চিমে বিপুল,  
উত্তরে হুপার্শ্ব।

“ভজাঃ পূর্বতো মেরোঃ কেতুমালক পশ্চিমে।

বর্ধে শ্বেত মুনিস্রোত তদোর্মধ্যে ইলাবৃত্তম্ ॥ ২০

মেকর পূর্বদিকে ভজাঃবর্ধ এবং পশ্চিমদিকে কেতুমালক, এই দুইটির  
মধ্যে ইলাবৃত্তবর্ধ।

ভারতের সীমা—বিক্র পুরাণ ২য় অংশ ৩ অধ্যায় পরাশর উবাচ

“উত্তরং বৎ সমুদ্রশ্চ হিমাত্রেণৈব দক্ষিণং।

বর্ধং তৎ ভারতঃ নাম ভারতী যত্র সন্ততিঃ ॥

নবযোজন সাংশ্রোবিস্তারস্ত মহামুনে ॥ ২

হে মুনি প্রবর! সমুদ্রের উত্তরে এবং হিমালয়ের দক্ষিণে নয় হাজার  
যোজন বিস্তৃত যে স্থান ভারত নাম ভারতবর্ষ। এই ভারতবর্ষে  
মহেন্দ্র মলয় সন্ধ্যা শুক্তিমান বৃক্ষ বিক্ষা ও পরিপাক এই সাতটি  
কুল পর্বত আছে।

মহেন্দ্রো মলয়ঃ সন্ধ্যা শুক্তিমান বৃক্ষ পর্বতঃ।

বিক্ষাশ্চ পারিপাকশ্চ সন্ধ্যা কুল পর্বতাঃ ॥ ৩

এই ভারতবর্ষ নবভাগে বিভক্ত।

“ভারতস্তাত্ত বহুস্ত নবভেদান্ নিশাময়।

ইন্দ্রদ্বীপঃ কশেকমান্ তাম্রবর্ণো গভস্তিমান্ ॥

নাগদ্বীপস্তথা সৌম্যো গন্ধকপুষ্কবাক্ষঃ ॥ ৬

অয়ন্ত নবমন্তোদগা দ্বীপঃ সাগর সংবৃতঃ।

যোজনানাং সহস্রত্ব দ্বীপোত্তরং দক্ষিণোত্তরাং ॥

পূর্বেকিরাতা যন্ত্রাঃ পশ্চিমে যবনাঃ স্থিতাঃ।

ব্রাহ্মণা ক্ষত্রিয়বৈজ্ঞা মধ্যে শূদ্রাঃ ভাগশঃ ॥ ৮

ইজ্যা যুদ্ধবর্ণিষ্ঠ্যৈকৈকবর্ণস্তোব্যবস্থিতাঃ।

ইহাতে ইন্দ্রদ্বীপ কশেকমান্ তাম্রবর্ণ গভস্তিমান্—নাগদ্বীপ, সৌম্যদ্বীপ,  
গন্ধকদ্বীপ, বাক্ষদ্বীপ নবম। এই দ্বীপ দক্ষিণোত্তরে সহস্র যোজন  
বিস্তৃত—উহা সাগর দ্বারা সংবৃত। ইহার পূর্বদিকে কিরাত নিবাস  
এবং পশ্চিমে যবন নিবাস। ইহার মধ্যে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈজ্ঞ ও  
শূদ্রগণ স্ব স্ব ভাগক্রমে বাস করে। ইহার যজ্ঞ, যুদ্ধ, বাণিজ্য প্রভৃতির  
দ্বারা জীবনধারণ করে। এই বর্ণনা তত্বে বুঝা যায় যে, ভারতের  
পূর্বদিকে কিরাত নিবাস এবং পশ্চিমে যবন অবস্থিত। পূর্বে উল্লেখ  
করা ইহাখাছে কিরাত এক ভ্রোণীর স্রোত। মহাদেবের আরাধনার্থ  
অর্জুন হিমালয়ে উপস্থিত কীরতে গিয়াছিলেন। উহা উত্তরদিকে  
অবস্থিত। “দিশং তু দীর্ঘাং কীরত্যাং হিমবচ্ছিন্নং প্রতী।” (বনপর্ব  
৩৮ অ ১০) উত্তরদিকে হিমালয়ের শিগরের উদ্দেশে অর্জুন গমন  
করিয়াছিলেন। এখানেই অর্জুনের চলনার জন্ত মহাদেব কিরাত  
বেশে গমন করিয়াছিলেন, এবং উমা দেবীও কিরাত বেশধারিণী  
হইয়াছিলেন,

কৈরাটঃ বেশমাত্তার কাকন জমসমিতম্।

বিভ্রাঙ্গমানো বিপুলো গিরির্দেবকিরাতালঃ ॥

সেই মহাদেব কাকন বৃক্ষের ছায় কৈরাট রূপ (কিরাত বেশ) ধারণ  
করিয়াছিলেন। ইহাতে বিপুলকার মহাদেব হুমেক পর্বতের ছায়  
শোভা পাইয়াছিলেন।

“দেব্যা সোহা মাতা স্ত্রীমান্ সমানব্রত বেশরা।

নানা বেশ ধরে স্ত্রীভেদভেদভেদভেদভেদ ॥ ৪।

কিরাত বেশ সংচ্ছন্নঃ স্ত্রীভিষ্ঠ্যাপি সহস্রণঃ ॥

অশোভিত তদাঙ্গজন্ম স দেশোত্তীভ ভারত ॥ ৫।

মহাদেব কিরাত বেশ ধারণ কহাতে উমা দেবীও ঐ বেশ ধারণ  
করিয়াছিলেন, মহাদেবের অমৃতচর ভূতবর্গও নানা প্রকার বেশ ধারণ  
করিয়াছিল। কিরাত বেশধারী স্ত্রীগণ কর্তৃক সমাচ্ছন্ন সেই দেশ  
অতীত শোভা ধারণ করিয়াছিল।



দশম পরিচ্ছেদ

তিলক বর্মা

# কালের মন্দির।

শ্রী শরাদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

পরদিন প্রাতঃকালে সচিব চতুর ভট্ট রাজভবনে চিত্রকের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন। স্বস্তিবাচন করিয়া বলিলেন—‘কাল রাত্রে আপনি পুরভূমিতে আক্রান্ত হইয়াছিলেন শুনিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছি। আপনার দেখিতেছি মন্দ দশা চলিয়াছে; পদে পদে বিপন্ন হইতেছেন। গভীর রাত্রে অরক্ষিত অবস্থায় বাহির হওয়া নিরাপদ নয়; রাজপুরীর মধ্যেও বিপদ ঘটিতে পারে।’

কঙ্কূকী উপস্থিত ছিল; সে বলিল,—সেই কথাই তো আমিও বলিতেছি। কিন্তু দূত প্রবরের বয়স অল্প, মন চঞ্চল—’ বলিয়া মুখ টিপিয়া হাসিল।

চতুর ভট্ট জিজ্ঞাসা করিলেন—‘রাত্রে কি নিদ্রার ব্যাঘাত ঘটিয়াছিল?’ প্রশ্নের অন্তর্নিহিত প্রকৃত প্রশ্নটি চিত্রক বুঝিতে পারিল; সচিব জানিতে চান কী জন্ত রাজ্যের মধ্যভাগে সে একাকী বাহিরে গিয়াছিল। এই প্রশ্নের জন্ত চিত্রক প্রস্তুত ছিল, সে মনে মনে একটি কাহিনী রচনা করিয়া রাখিয়াছিল, এখন তাহাই সচিবকে শুনাইল।

—গভীর রাত্রে চিত্রকের ঘুম ভাঙ্গিয়া যায়। ঘুম ভাঙ্গিয়া সে দেখে, একটা লোক বাতায়ন পথে তাহার কক্ষে প্রবেশ করিবার চেষ্টা করিতেছে। তখন চিত্রক তরবার লইয়া দুরভীষ্ট ব্যক্তির দিকে অগ্রসর হয়। চোর তাহাকে আগ্রহ দেখিয়া পলায়ন করে; চিত্রকও বাতায়ন উল্লঙ্ঘন করিয়া তাহার পশ্চাদ্ভাবন করে। কিছুদূর পশ্চাদ্ভাবন করিবার পর সে আর চোরকে দেখিতে পায়না। তখন ইতস্তত অন্বেষণ করিতে করিতে তোরণ সন্নিকটে উপস্থিত হইলে ওহ তাহাকে অতর্কিতে আক্রমণ করে—ইত্যাদি।

কাহিনী অবিস্মৃত নয়। চতুর ভট্ট মন দিয়া শুনিলেন মনে মনে ভাবিলেন, ইহা যদি মিথ্যা গল্প হয় তবে দূত মহাশয়ের উদ্ভাবনী শক্তি আছে বটে। মুখে বলিলেন—‘যা হোক, আপনি যে উদ্ভাদের আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইয়াছেন ইহাই ভাগ্য। আপনি মগধের মহামাত্র দূত আপনার কোনও অনিষ্ট হইলে আমাদের আর সাহস থাকিত না। কঙ্কূকীকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—‘লক্ষ্য দিবারাত্র দূত মহাশয়ের রক্ষার ব্যবস্থা কর। তিনি এখন কিছুদিন রাজ-অতিথিরূপে থাকিবেন; তাঁহার অনিষ্ট হইলে দায়িত্ব তোমার, স্মরণ রাখিও।’

চিত্রক উদ্বিগ্ন হইয়া বলিল,—‘কিন্তু আমি শীঘ্র চলিয়া যাইতে চাই। আতিথ্য রক্ষা তো হইয়াছে, এবা আমাকে বিদায় দিন।’

সচিব দৃঢ়ভাবে বলিলেন,—‘এত শীঘ্র যাওয়া অসম্ভব চণ্ডন দুর্গে মহারাজের নিকট মগধের লিপি প্রেরিত হইয়াছে, মহারাজ সম্ভবত আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে চাহিবেন। তাঁহার সহিত সাক্ষাৎকার করিয়া আপনি চলিয়া যাইতে পারেন না।’—গাত্ৰোৎখা করিয়া চতুর ভট্ট নরম স্বরে বলিলেন—‘আপনি ব্যস্ত হইতেছেন কেন? রাজকাৰ্য্য একদিনে হয়না। কিছুদি বিশ্রাম করুন, আরাম উপভোগ করুন; তারপর বিটম্ব রাজ্যের দূত যখন পত্রের উত্তর লইয়া পাটলিপুত্রে যাইবে তখন আপনিও সঙ্গে ফিরিতে পারিবেন। সকল দিব দিয়া সুবিধা হইবে।’

সচিব প্রস্থান করিলেন। চিত্রক হতাশা-পূর্ণ হৃদয়ে বসিয়া রহিল। তাহার মনশ্চক্রে কেবলই শশিশেখরের সমুদ্র মুখ ভাসিয়া উঠিতে লাগিল।

দিনটা প্রায় নিষ্ক্রিয় ভাবেই কাটিল। কঙ্কূকী লক্ষ্য যদি বা এ পর্যন্ত চিত্রককে কড়াচিৎ চক্ষের অন্তরায় করিতেছিল, এখন একেবারে জলোকার ভায় তাহার

মদে ছুড়িয়া গেল; নানে আহারে নিজায় পলকের তরে  
তাহার সঙ্গ ছাড়িল না।

অপরাত্নের দিকে উভয়ে অন্ধকৌড়ায় কাল হরণ  
করিতেছিল। বিনা পণের খেলা, তাই চিত্রকের বিশেষ  
ন লাগিতেছিল না; এমন সময় অবরোধ হইতে  
রাজকুমারীর স্বকীয়া এক দাসী আসিল। দাসী কৃতাজ্ঞালী-  
পুটে দাঁড়াইতেই কঙ্কী জবৎ বিষয়ে বলিল—‘বিপাশা,  
তুমি এখানে কি চাও?’

বিপাশা বলিল—‘আর্থ, দেবহুহিতার আদেশে  
আসিয়াছি।’

কঙ্কী স্বরিতে উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল—‘দেবহুহিতার  
কী আদেশ?’

বিপাশা বলিল—‘দেবহুহিতা উল্লীর-গৃহে অবস্থান  
করিতেছেন, সঙ্গে সখী স্নগোপা আছেন। দেবহুহিতা  
ইচ্ছা করিয়াছেন মগধের দূত মহোদয়ের সহিত কিছু  
বাক্যালাপ করিবেন। অমুমতি হইলে তাঁহাকে পথ  
দেখাইয়া লইয়া যাইতে পারি।’

কঙ্কী বিপদে পড়িল। কোনও রাজদূতের সহিত  
অবরোধের মধ্যে সাক্ষাৎ করা রাজকন্টার পক্ষে শোভন  
নয়, নিয়মাহুগুণ নয়। কিন্তু রাজকুমারী একে স্ত্রীজাতি,  
তায় হুণকন্টা; অবরোধের শাসন তিনি কোন কালেই  
মানেন না। উপরন্তু, গণ্ডের উপর পিণ্ড, ঐ স্নগোপা  
সখীটা আছে। স্নগোপাকে কঙ্কী স্নেহের চক্ষে দেখে  
না। স্নগোপার সহিত মিশিয়াই রাজকন্টার মর্যাদাজ্ঞান  
শিথিল হইয়াছে। কিন্তু উপায় কি? এদিকে অবরোধের  
শালীনতা রক্ষা করিতে হইবে; নহিলে কঙ্কীর কর্তব্যে  
ত্রুটি হয়। আবার দূত-প্রবরকেও একাকী ছাড়িয়া  
দেওয়া যায় না—

লক্ষণ কঙ্কী চট্ করিয়া কর্তব্য স্থির করিয়া ফেলিল;  
বিপাশাকে বলিল—‘তুমি অগ্রবর্তিনী হও, আমি দূত  
মহাশয়কে লইয়া স্বয়ং যাইতেছি।’

কঙ্কী সঙ্গে থাকিলে অবরোধে পুরুষ প্রবেশের দোষ  
অনেকটা ক্ষালন হইবে, অধিকন্তু দূত মহাশয়ও চোখে  
চোখে থাকিবেন।

অবরোধের পশ্চিম প্রান্তে উল্লীর গৃহ। সারি সারি  
কয়েকটি কক্ষ; ঘারে গবাক্ষে সিন্ধু উল্লীরের জাল।

গ্রীষ্মের তাপ বর্ধিত হইলে পুরজীরা এই সকল শীতল কক্ষে  
আশ্রয় লইয়া থাকেন।

একটি কক্ষে শুভ্র মর্মর পট্টের উপর কুমারী রত্না  
উপবিষ্টা ছিলেন; স্নগোপা তাঁহার কাছে কুটুমের উপর  
তালবৃন্ত হাতে লইয়া বসিয়াছিল। কঙ্কী ও চিত্রক  
ঘারের কাছে আসিয়া দাঁড়াইলে স্নগোপা তাড়াতাড়ি  
উঠিয়া একটি গোড়দেশীয় মস্তণ পট্টিকা পাতিয়া দিল।

উভয়ে উপবিষ্ট হইলে রত্না মুখ টিপিয়া একটু হাসিলেন।  
কঙ্কীকে চিত্রকের সঙ্গে দেখিয়া তিনি ব্যাপার বুঝিয়া-  
ছিলেন, কোতুক-তরল কণ্ঠে বলিলেন—‘এই অবরোধের  
প্রতি আর্থ লক্ষণের যেমন সতর্ক স্নেহ-মমতা, শিশু সন্তানের  
প্রতি মাতারও এমন দেখা যায় না।’

লক্ষণ অতিশয় অপ্রতিভ হইয়া পড়িল। চিত্রক  
রাজকুমারীর বাক্যে স্ফোটন দিয়া বলিল—‘কঙ্কী  
মহাশয় আমার প্রতিও বড় স্নেহশীল, তিলার্থের জন্তও  
চোখের আড়াল করেন না।’

বিড়ম্বিত কঙ্কী নতমুখে হেঁ হেঁ করিয়া হাসিবার চেষ্টা  
করিল। তাহার উভয় সঙ্গ; কর্তব্য করিলে বাক্য যন্ত্রণা,  
না করিলে যুগু লইয়া টানটানি।

যাহোক, অতঃপর কুমারী রত্না চিত্রককে বলিলেন—  
‘দূত মহাশয়, আমার সখী আপনাকে কিছু কথা বলিতে  
চায়, তাই আপনাকে কষ্ট দিয়াছি। স্নগোপা, এবার  
তোমার কথা তুই বল।’

স্নগোপা কোলের উপর দুই মুক্ত হস্ত রাখিয়া নতচক্ষে  
বসিয়া ছিল, এখন ধীরে ধীরে বলিল—‘আর্থ, আমি  
আপনার অনিষ্ট করিবার চেষ্টা করিয়াছিলাম, প্রতিদানে  
আপনি আমার ইষ্ট করিয়াছেন। আপনার প্রসাদে আমার  
মাতাকে ফিরিয়া পাইয়াছি।’

চিত্রক অবহেলা ভরে হস্ত সঞ্চালন করিয়া এমন ভাব  
প্রকাশ করিল যে মনে হয় এই সব ইষ্টানিষ্ট চেষ্টা তাহার  
কাছে অকিঞ্চিৎকর। স্নগোপা তখন বলিল—‘আপনি  
উদার চরিত্র। তাই সাহস করিয়া আপনার নিকট একটি  
অমুগ্রহ ভিক্ষা করিতেছি। আমার অভাগিনী জননী—’  
স্নগোপার চক্ষু ছলছল করিয়া উঠিল—‘উদ্ধার পাইবার  
পর শয্যা লইয়াছেন। তাঁহার শরীর অতি দুর্বল, বে-  
কোনও ঘ্রুহে প্রাণবায়ু বাহির হইতে পারে। কিন্তু

তাঁহার সংজ্ঞা সম্পূর্ণ সূক্ষ্ম আছে। তাঁহার বড় সাধ আপনাকে একবার দেখিবেন, নিজস্ব কৃতজ্ঞতা জানাইবেন—’

চিত্রক বলিল—‘কৃতজ্ঞতা জানাইবার কোনই প্রয়োজন নাই। কিন্তু তিনি যদি আমাকে দেখিলে সূখী হন আমি নিশ্চয় দেখা করিব। কোথায় আছেন তিনি?’

সুগোপা বলিল—‘আমার গৃহে। আমার কুটীর রাজপুত্রীর বাহিরে কিছু দূরে। যদি অগ্রসর করেন, এখনি লইয়া যাইতে পারি।’

চিত্রক উঠিয়া দাঁড়াইল—‘চলুন। আমি প্রস্তুত।’

কঞ্চুকী ত্রস্তভাবে লাফাইয়া উঠিল—‘আ—রাজপুত্রীর বাহিরে! তা—তা—আমি সঙ্গে ছইজন রক্ষী দিতেছি—’

চিত্রক বলিল—‘নিশ্চয়প্রয়োজন। আমি আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ।’

বিত্ত কঞ্চুকী বলিল—‘কিন্তু তাহা কি করিয়া হইতে পারে! আর্থ চতুর ভট্ট—অর্থাৎ—আপনার রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব আমার উপর—’

চিত্রক রট্টার দিকে চাহিয়া কক্ষণ হাসিল—‘আমার উপর কঞ্চুকী মহাশয়ের বিশ্বাস নাই। তিনি বোধহয় এখনও আমাকে চোর বলিয়াই মনে করেন। তাঁহার সন্দেহ, ছাড়া পাইলেই আমি আবার বোড়া চুরি করিব।’

রট্টা দ্বিধা ভ্রুকুণ্ণ করিলেন—‘আর্থ লক্ষণ, রক্ষীর প্রয়োজন নাই। সুগোপা দূত মহাশয়কে লইয়া যাইবে, পৌছাইয়া দিবে।’

পিণ্ড গলাধঃকরণ করিয়া কঞ্চুকী বলিল—‘তা—তা—শেবছহিতার যদি তাহাই অভিক্রটি—’

চিত্রক মনে মনে ভাবিল—এই সুযোগ! সে আর রাজকুমারীর সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় করিল না; রট্টার চোখে কি জানি কী সম্মোহন আছে, চোখোচোখি হইলে আবার হয়তো তাহার মনের গতি পরিবর্তিত হইবে। সে সুগোপার অঙ্গসরণ করিয়া উত্তীর্ণ-গৃহ হইতে বাহির হইল।

রাজপুত্রীর তোরণ দ্বারের সম্মুখ দিয়া যে পথ গিয়াছে তাহা দক্ষিণ দিকে কিছুদূর গিয়া নিম্নাভিমুখে অবতরণ করিয়াছে, তারপর আরও ষাণিকদূর গিয়া একটি বাঁকের মুখে আসিয়া আবার নীচে নামিয়াছে। এই বাঁকের উপর

সুগোপার কুটীর; ইহার পর হইতে রাজপুত্র ও নাগরিক সাধারণের গৃহাদি আরম্ভ হইয়াছে।

সুগোপার কুটীর ক্ষুদ্র হইলেও সূক্ষ্ম, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন; চারিদিকে ফুলের বাগান। সুগোপার মালাকর স্বামী গৃহেই ছিল; সুগোপাকে আসিতে দেখিয়া সে ফুল-মালাদি লইয়া বাহির হইল। বাজারে ফুল-মালা বিক্রয় করিয়া যাহা পাইবে তাহা লইয়া সে মন্দিরালয়ে প্রবেশ করিবে। লোকটি অতিশয় নীরব প্রকৃতির; আপন মনে উত্তানের পরিচর্যা করে, মালা গাঁথে বিক্রয় করে, আর মন্দিরা সেবা করে। কাহারও সাতে পাচে নাই।

সুগোপা চিত্রককে মাতার নিকট লইয়া গেল। একটি দৈবদক্ষতার কক্ষে খট্টার উপর সমুদ্রবিভ্রান্ত শয্যায় পৃথা শুইয়া আছে। তাহার দেহ যথাসম্ভব পরিস্কৃত হইয়াছে; নখ কাটিয়া মাথায় তৈল সেক করা হইয়াছে। কিন্তু কেশের গ্রন্থিযুক্ত তাত্ত্ব্য বর্ণ দূর হয় নাই। মুখের ও দেহের ত্বক দীর্ঘকাল আলোকের স্পর্শভাবে হরিদান্ত বর্ণ ধারণ করিয়াছে।

পৃথা শয্যার সহিত যেন মিশিয়া গিয়াছিল; কোটরগত চক্ষু উন্মেষ নিবদ্ধ ছিল; চিত্রক নিঃশব্দে তাহার শয্যা-পার্শ্বে গিয়া দাঁড়াইলে সে ধীরে ধীরে চক্ষু নামাইল। অনেকক্ষণ চিত্রকের মুখের পানে চাহিয়া থাকিয়া কণিকণে বলিল—‘তুমিই সেই?’

সুগোপা শয্যাপার্শ্বে নতজাহ্নু হইয়া মাতার কপালে হস্ত রাখিল, নিশ্বকণ্ঠে বলিল—‘হাঁ মা, ইনিই সেই।’

আরও কিছুক্ষণ চিত্রককে দেখিয়া পৃথা বলিল—‘তুমি হৃণ নও—আর্থ।’

চিত্রক হাসিয়া বলিল—‘হাঁ আমি আর্থ। যে ছুপ তোমাকে বন্দী করিয়া রাখিয়াছিল সে মরিয়াছে।’ বলিয়া সংক্ষেপে গুহের মৃত্যু বিবরণ বলিল।

শুনিয়া পৃথা বলিল—‘এখন আর কী আসে যায়। আমার জীবন শেষ হইয়াছে।’

চিত্রক শয্যাপাশে বসিয়া সাত্ত্বনার কণ্ঠে বলিল,—‘এরূপ কেন মনে করিতেছ? তোমার শরীর আবার সূক্ষ্ম হইবে। তোমার কন্ঠা আছে; তাহাকে লইয়া আবার তুমি সূখী হইবে। যাহা অতীত তাহা তুলিয়া যাও।’

পৃথার মুখে আশা বা আনন্দের রেখাপাত হইল না।  
স অনেকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল—‘আমার  
কথা থাক। তোমার কথা বল। তুমি আমাকে উদ্ধার  
করিয়াছ, তোমার কথা শুনিতে চাই।—তোমাকে  
দখিয়া মনে হইতেছে তুমি অপরিচিত নও—পূর্বে যেন  
দখিয়াছি।’

চিত্রক লঘু হাস্তে বলিল—‘তুমি তো অন্ধকারে দেখিতে  
পাও। সে-রাত্রে কুট-কক্ষে দেখিয়াছিলে—হয়তো সেই  
[তি মনে জাগিতেছে।’

‘তাহাই হইবে। তোমার নাম কি?’

‘চিত্রক বর্মা।’

পৃথা নীরবে তাহার ক্ষতরেখা চিহ্নিত অঙ্গে চক্ষু  
বুলাইল।

‘মাতা পিতা জীবিত আছেন?’

মাতা পিতা! চিত্রক মনে মনে হাসিল; তাহার মাতা  
পিতা থাকিতে পারে ইহাই যেন অসম্ভব মনে হয়। বলিল  
—‘না, জীবিত নাই।’

‘তোমার বয়স অল্প মনে হয়—’

‘নিতান্ত অল্প নয়, পঁচিশ ছাব্বিশ বছর।’

পৃথা কিয়ৎকাল চক্ষু মুদিত করিয়া রহিল; শেষে ধীরে  
ধীরে বলিল—‘আমার তিলক বাঁচিয়া থাকিলে তোমার  
সমবয়স্ক হইত।’

‘তিলক কে?’

‘কুমার তিলক বর্মা। আমি তাহার ধাত্রী ছিলাম।  
সে আর সুগোপা এক দিনে জন্মিয়াছিল; আমায় দুই  
দু’জনকে ভাগ করিয়া দিতাম।’

সুগোপা নিম্নবরে বলিল—‘মা, ও কথা আর মনে  
আনিও না।’

পৃথা চক্ষু নিম্নলিত করিয়া বলিল—‘তাহার কথা  
তুলিতে পারি না। নবনীতের স্তায় সুকুমার শিশু—সেই  
শিশুকে হুণেরা আমার বুক হইতে ছিঁড়িয়া লইল—তারপর  
—তারপর—’

অকালবৃদ্ধা পৃথার পাণ্ডুর গণ্ড বহিয়া বিন্দু বিন্দু অশ্রু  
ক্ষরিত হইতে লাগিল। সুগোপা চিত্রকের সহিত বিষয়  
দুটি বিনিময় করিল।

চিত্রক বলিল—‘কজিয় শিশু যদি গুরবারির আঘাতে

মরিয়া থাকে তাহাতে আক্ষেপ করিবার কী আছে?  
কীতদাস হইয়া বাঁচিয়া থাকার অপেক্ষা সে ভাল।’

পৃথা নিস্তেজ স্বরে বলিল—‘রাজার পুত্র কীতদাস হয়  
নাই সে ভাল। কিন্তু রাজজ্যোতিষী বলিয়াছিলেন, এ  
শিশু রাজটীকা লইয়া জন্মিয়াছে, রাজচক্রবর্তী হইবে।  
কই, তাহা তো হইল না! রাজজ্যোতিষীর কথা মিথ্যা  
হইল—’

চিত্রক মুহূর্ত্তে বলিল—‘রাজজ্যোতিষীর কথা  
অমন মিথ্যা হয়। কিন্তু রাজটীকা লইয়া জন্মিয়াছে ইহার  
অর্থ কি?’

পৃথা ধীরে ধীরে বলিল—‘আমি যেন চোখের উপর  
দেখিতে পাইতেছি। তাহার জ্বর মধ্যস্থলে জটুল ছিল;  
অন্ত সময় দেখা যাইত না, কিন্তু সে কঁাদিলে বা জুঁক হইলে  
ঐ জটুল রক্তবর্ণ হইয়া ছুটিয়া উঠিত। মনে হইত যেন  
রক্ত-চন্দনের তিলক। তাই তাহার নামকরণ হইয়াছিল—  
তিলকবর্মা।’

বাতাসের ফুৎকারে ভ্রম্যবৃত্ত অঙ্গার যেমন স্ফুরিত  
হইয়া উঠে, চিত্রকের ক্রোধে তেমনি রক্তটীকা জলিয়া  
উঠিল। সে ব্যাঘ্রত চক্ষে চাহিয়া অর্ধাবরুদ্ধ কণ্ঠে বলিল—  
‘কী বলিলে?’

পৃথা চক্ষু মেলিল। সম্মুখেই চিত্রকের মুখ তাহার  
মুখের উপর বুঁকিয়া আছে; সেই মুখে জয়গলের মধ্যে  
প্রবালের ত্রায় তিলক জলিতেছে। পৃথার চক্ষু ক্রমে  
বিস্ফারিত হইতে লাগিল; তারপর সে চীৎকার করিয়া  
উঠিল—‘তিলক! আমার তিলক বর্মা! পুত্র! পুত্র!’

পৃথা দুই কক্ষালসার হস্তে চিত্রককে টানিয়া বুকের  
উপর চাপিয়া ধরিতে চাহিল; কিন্তু এই প্রবল উদ্বেগনায়  
তাহার দেহের সমস্ত শক্তি নিঃশেষ হইয়া গিয়াছিল; সহসা  
তাহার হস্ত শিথিল হইয়া চিত্রকের স্বন্ধ হইতে খসিয়া  
পড়িল। সে চক্ষু মুদিত করিয়া মৃতবৎ স্থির হইয়া রহিল।

সুগোপা কঁাদিয়া উঠিল। চিত্রক পৃথার বক্ষের উপর  
করতল রাখিয়া দেখিল অতি ক্ষীণ হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন  
অল্পভূত হইতেছে। সে সুগোপাকে বলিল—‘এখনও  
বাঁচিয়া আছেন। যদি সম্ভব হয় শীঘ্র চিকিৎসক ডাকো।’

সুগোপা ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল। রাজবৈজ্ঞানিক রত্নার  
আদেশে পৃথার চিকিৎসার ভার লইয়াছিলেন। রাজ-



বৈঠকের বাসভবন নিকটেই; অল্পক্ষণের মধ্যে অগোপা বৈঠকে লইয়া ফিরিয়া আসিল।

নাড়ী পরীক্ষা করিয়া বৈঠকরাজ ঈষৎ মুখ বিকৃত করিলেন, তারপর সূচিকাভরণ প্রয়োগ করিলেন।

সে রাত্রে চিত্রক রাজপুরীতে ফিরিয়া গেল না।

সন্দিগ্ধ কক্কী অলক্ষিতে দুইটি গুপ্ত-রক্ষী পাঠাইয়াছিল, তাহারা সারা রাত্রি অগোপার কুটীরের বাহিরে পাহারা দিল।

গভীর রাত্রে পৃথা মোহাচ্ছন্ন ভাবে পড়িয়া ছিল। চিত্রক তাহার শয্যাপাশে দাঁড়াইয়া অগোপার স্বপ্নের উপর হাত রাখিল—‘অগোপা, তুমি আমার ভগিনী; আমরা একই শ্বশুরপুত্র পান করিয়াছি।’

অগোপা শুধু সজল নেত্রে চাহিয়া রহিল।

চিত্রক বলিল—‘যে কথা আজ শুনিয়াছ তাহা কাহাকেও বলিও না। বলিলে আমার জীবন সংশয় হইতে পারে।’

অগোপা ভয়বরে জিজ্ঞাসা করিল—‘এখন তুমি কী করিবে?’

চিত্রকের অধরে ত্রিভুজ হাঁসি দেখা দিল—‘ভাবিয়া-ছিলাম পলায়ন করিব। কিন্তু এখন—কি করিব জানি না। তুমি একথা কাহাকেও বলিও না। হয়তো তোমার মাতা ভুল করিয়াছেন; ঋণ দেহে এরূপ ভ্রান্তি অসম্ভব নয়—।’

অগোপা বলিল—‘ভ্রান্তি নয়। আমার অন্তর্ধর্মী বলিতেছেন, তুমি তিলক বর্মা।’

‘তিলক বর্মা। শুনিতে বড় অদ্ভুত লাগে। কিন্তু সত্য হোক মিথ্যা হোক, তুমি শপথ কর এ কথা গোপন রাখিবে।’

‘ভাল, গোপন রাখিব।’

‘কাহাকেও বলিবে না?’

‘না।’

পৃথার আর জ্ঞান হইল না। রাত্রি শেষে তাহার প্রাণবায়ু নির্গত হইল। (ক্রমশঃ)

## আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ

অধ্যাপক শ্রীমণীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এ, বি-এল

পাঁচ

২০-এ সেপ্টেম্বর ১৯৪৯ মঙ্গলবার দুপুরে এন্স এন্স মহারাজা জাহাজ পোর্ট-রেয়ারে পৌঁছিল। মঙ্গলবার সকাল হইতেই অল্প অল্প বৃষ্টি হইতেছিল, পোর্টরেয়ার জেটীতে জাহাজ ভিড়িবার সঙ্গে সঙ্গেই এবলভাবে বৃষ্টি পড়িতে লাগিল।

এবার জাহাজে যাত্রীসংখ্যা ছিল সাড়ে তিনশতের কিছু বেশী। জাহাজের প্রথম শ্রেণীতে ছিলেন কংগ্রেসকর্মী শ্রীজীবানন্দ ভট্টাচার্য মহাশয়, তবে জাহাজে তাঁহার সহিত আলাপ হয় নাই, পোর্টরেয়ারে পৌঁছাইয়া তাঁহার সহিত প্রথম পরিচয় হইয়াছিল। তিনি পুনর্কাসন বোর্ডের সভ্য, অতএব সরকারী খরচে আন্দামানে পুনর্বাসতির তত্ত্বাবধান করিতে বাইতেছিলেন। আন্দামানে এক সপ্তাহ থাকার পর তিনি আমাদের সহিত ঐ জাহাজেই মাত্রাজে আসেন। আন্দামানে তিনি ছিলেন ডেপুটি কমিশনারের বাংলোতে, মাত্রাজে আসিয়া তিনি Woodlands Hotel-এ উঠিয়াছিলেন। আমরা সামান্ত লোক তাঁহার সহিত একত্রে থাকিতে পারি নাই। উপরন্তু মাত্রাজ হইতে তিনি বিমানযোগে কলিকাতায় ফিরিয়াছিলেন। কাজেই তাঁহার সহিত আমাদের শেষ

দেখা মাত্রাজেই হইয়াছিল। সরকারী অর্থে প্রথম শ্রেণীর সেলুন ও বিমানে করিয়া যে সমস্ত দেশ-সেবক বোরাফেরা করেন, তাঁহাদের সহিত আমরা সামান্ত শিক্ষক—পকেটের পরলা খরচ করিয়া একত্র বোরাগুরি করার সামর্থ্য কিরূপে লাভ করিতে পারি! জীবানন্দবাবু ছাড়া আরও কয়েকজন জাহাজের প্রথম শ্রেণীতে আসিতেছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে মিঃ চিত্রাঙ্গা নামক আন্দামানের বনপাল (Conservator of Forests) ছিলেন। তিনি ফাষ্ট ক্লাসের ডেকের উপর সবেগে পায়চারী করিতেন এবং স্বেযোগ ও স্বেবিধা পাইলেই সকলকে শুনাইয়া দিতেন যে, তিনি ভারতের প্রধান সেনাধ্যক্ষ (Commander-in-Chief) মিঃ ক্যারিগ-গার নিকট আত্মীয়। এ ছাড়া কয়েকজন বেতাদ ও অস্ত্র কয়েকজন কৃষ্ণাঙ্গ যাত্রী ও জাহাজের প্রথম শ্রেণীতে দিলেন, তাহাদের পরিচয় পাই নাই। দ্বিতীয় শ্রেণীতে কতকগুলি ছাত্র পুজাবকাশে কলিকাতা হইতে পোর্টরেয়ারে নিজেদের আত্মীয়ের নিকট ফিরিতেছিল। ইহাদের মধ্যে কতকগুলি local born, অর্থাৎ পূর্বে তাহাদের দেশ ছিল ভারতের কোন না কোন প্রদেশে, তবে পিতা বা পিতামহ কয়েদীরূপে আন্দামানে গিয়া সেইখানেই বসবাস করিয়া তাহারা এখন আন্দামানেরই

নাক হইয়া গিয়াছেন। শিক্ষা, আচার ও ব্যবহারে তাহারা এখন ন কোন উচ্চতরের নাগরিকের সহিত সমান পৰ্য্যায়ে উন্নীত হইয়াছে এবং নৈতিকতার মান কোন অংশেই কম নাই। অপর কতকগুলি রত্নের পিতা বা আত্মীয় চাকুরী হুজে আশ্চর্য্যম্ভবে আছেন, ঐ সমস্ত রত্নেরা ছুটিতে বেড়াইবার উদ্দেশ্যে বাইতেছিল। এ ছাড়া কতকগুলি আশ্চর্য্যম্ভবের কর্মচারী কোন না কোন কাজে কলিকাতায় আসিয়াছিলেন, অন্যর কর্মস্থলে কিরিতেছিলেন। ইংরাজ নিজেদের চাকুরী অনুযায়ী কতক দ্বিতীয় শ্রেণী, কেহ বা তৃতীয় শ্রেণীর টিকিট পাইয়াছিলেন। সরকারী কর্মচারীদের টিকিট বা T.A. দেওয়ার ব্যাপারে একটি অজ্ঞত ব্যবস্থা আছে শুনিলাম। আশ্চর্য্যম্ভবের সরকারী কর্মচারীগণ নিজেদের পদমর্যাদা অনুযায়ী দ্বিতীয়, তৃতীয় বা ডেক শ্রেণীর ভাতা কিম্বা পাস পাইয়া থাকেন, কিন্তু তাহাদের পত্নীরা সর্বদাই ডেকের ভাতা বা পাস পাইয়া থাকেন। এই নিয়মের মূলে কি আছে জানি না। অথচ যে সমস্ত কর্মচারী প্রথম শ্রেণীর ভ্রমণ-ভাতা পাইয়া থাকেন তাহাদের পত্নীরাও প্রথম শ্রেণীর ভাতা পাইয়া থাকেন। সাহেবী যুগের কোন এক অব্যক্ত কারণে এই নিয়ম বোধ হয় চালু হইয়াছিল। অজ্ঞাবোধ সেই নিয়মই চলিতেছে। অল্পপক্ষে এখানকার চাকুরীতে নিযুক্ত কর্মচারীদের ছুটির নিয়মও একটু বিশেষ ধরণের। ভারতের অস্ত্র সকল স্থানেই যে কয়দিন অফিসে না যাওয়া যায় সেই কয়দিনই ছুটি বলিয়া ধরা হইয়া থাকে, কিন্তু আশ্চর্য্যম্ভবের কর্মচারীগণ আশ্চর্য্যম্ভবে হইতে কলিকাতা বা মাদ্রাজে আসিয়া যে কয়দিন ভারতে অবস্থান করেন, মাত্র সেই কয়দিনই ছুটি লইয়াছেন বলিয়া পরিগণিত হয়, অর্থাৎ জাহাজে আসা-যাওয়ার আট দিন সময় ছুটি বলিয়া গণ্য হয় না।

জাহাজে চারিদিন একত্র অবস্থানের ফলে সহযাত্রী অনেকেরই সহিত আলাপ হইয়াছিল। আশ্চর্য্যম্ভবে গিয়া কোথায় উঠিব সেই বিষয় ইহাদের সহিত আলাপ করিয়া শেষ পর্যন্ত ঠিক করিয়াছিলাম, যা হোক, একটা ব্যবস্থা হইয়াই বাইবে। আমরা যে তিনজন একসঙ্গে ছিলাম, সেই তিন বন্ধুর মধ্যে একজন নাকি কমিউনিষ্ট, একজন ছিলেন মহাসভাপন্থী, অপরজন কংগ্রেসভক্ত। কমিউনিষ্ট বন্ধুটি জাহাজের মুসলমান যাত্রীদের সহিত রীতিমতকথালাপ জমাইয়া তুলিলেন, কঙ্গরসী বন্ধুটি খন্দরখারীদের সহিত খনিষ্ট হইয়া পড়িলেন, আর মহাসভাপন্থীটি কোন মুসলমান হিন্দু নারী-ছরণ করিয়া পলাইতেছে সেই গবেষণায় প্রাণ উত্তাক্ত করিতে লাগিলেন। শেষ পর্যন্ত নিজেদের মধ্যে রক্য করা গেল যে, তিন মুষ্টি তিন দিক হইতে চেষ্টা করিব এবং যে কোনো দিক দিয়াই ব্যবস্থা হউক না কেন, কমিউনিষ্টরীতি অনুযায়ী তিনজনই সমানভাবে উহা ভাগ করিয়া লইব।

২০-এ সেপ্টেম্বর দুপুরে জাহাজ পোর্টরোয়ারে অর্থাৎ 'চাখামের' জেটিতে লাগিল বটে, কিন্তু স্বস্থান করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছিল। নিজেদের মালপত্র বাঁধিয়া লইয়া বহু কষ্টে এক কুলির ব্যবস্থা করিয়া ওয়াটারফ্রন্ট গারে ছাড়া ছাড়ে জাহাজ হইতে নামিতে বাইব, শুনিলাম পোর্টরোয়ারের ডাক্তার সাহেব জাহাজে আসিয়া বসিয়াছেন, তাহার নিকট কলেরা ও

বসন্তের প্রতিবেদক টাকা বে বেওয়া হইয়াছে, সেই সার্টকিকিট দেখাইতে হইবে। তাবি যাত্রীদের অবগতির জন্ত চলিয়া রাখি যে ইহা বিশেষ প্রয়োজন। বাহা হউক, ডাক্তার বি চক্রবর্ত্তীর নিকট সার্টকিকিট দেখাইয়া উহাতে সহি করাইয়া আমরা বাটে নামিয়া পড়িলাম। এই ডাক্তার চক্রবর্ত্তীর নিকট আমার একখানি পরিচয়পত্র ছিল, কিন্তু তখন ত আর উহাকে চিনিলাম না, কাজেই তখন কোন পরিচয় হয় নাই। অকিসী কায়দার তাহার নিকট হইতে বিদায় লইয়া জেটীর উপর অবতরণ করিলাম।

পরবর্তী বিপদ, পোর্টরোয়ারে সরাসর কোনরূপ ভাড়াটে গাড়ী পাওয়া যায় না। পূর্বাঙ্কে টেলিফোন করিলে ট্যাক্সি পাওয়া যায়। কিন্তু এ সমস্ত সংবাদ সে সময়ে জানতাম না। এ ছাড়া আমাদের জানা ছিল যে, থাকিবার মত কোন হোটেলও নাই, আছে এক সরকারী Guest house। এই সরকারী অতিথিশালাটি পোর্টরোয়ারের জাহাজঘাট 'চাখাম' হইতে প্রায় দেড় মাইল দূরে একটি অতিশূন্যর কাঠের বৃহৎ বাংলো বাটীতে অবস্থিত। এখানে সাতদিন পর্যন্ত থাকা যায়, তবে আশ্চর্য্যম্ভবের চিকিৎসা কামিনার বা এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ারের অনুমতি লইয়া সাতদিনের বেশীও থাকা যায়। এই সরকারী অতিথিশালায় সর্বসময়ের জন্ত একজন care-taker এবং অনেকগুলি বেয়ারা-চাপরাসী থাকে। এখানকার দক্ষিণাও বড় কম নয়। এই অতিথিশালায় পাঁচখানি ঘর আছে। ১নং ও ২নং কামরায় থাকিতে হইলে জনপ্রতি দৈনিক ৫ টাকা ভাড়া লাগে, ৩নং ও ৪নং এ-টাইপ কামরায় জন্ত দৈনিক মাথা পিছু ৪ টাকা এবং ৫নং বি টাইপ ও ৬নং কামরায় জন্ত দৈনিক প্রতিজনের ২ টাকা ভাড়া লাগে। এ ছাড়া আহােরের জন্ত দৈনিক ১০ হইতে ৫ টাকা পর্যন্ত তিন শ্রেণীর তিন রূপ খানা আছে; প্রাতরাশ ও অপরাহ্নের চা পান বত্বর। অতএব ঠিক করিয়াছিলাম, এখানে না উঠিয়া সম্ভাব্য অল্প কোন ব্যবস্থা করিতে হইবে। শুনিয়াছিলাম, পোর্টরোয়ার সহরের মধ্যস্থলে অবস্থিত এবং জেটা হইতে তিনমাইল দূরে Bachelor's Mess নামক একটি প্রতিষ্ঠান আছে, সেখানে পোর্টরোয়ারের বাঙ্গালী কর্মচারীগণ বাস করেন। ইচ্ছা ছিল সেইখানেই বাইয়া থাকার ব্যবস্থা করিব। কিন্তু বাই কি করিয়া। এদিকে বৃষ্টি আরও জোরে পড়িতে লাগিল। কুলিরা রাগারাগি করিয়া রাত্তার মাঝখানে মাল নামাইয়া দিয়া চলিয়া গেল। হুনীলবাসু কোমরপ অহুবিধা হইলেই বলিয়া উঠিতেন 'মহা বিপদ'; তিনি আর একবার তাহার সেই প্রিয় কথাটি উচ্চারণ করিলেন।

বৃষ্টির মধ্যেই খোঁজ করিয়া দেখা গেল, অনেকগুলি মালবাহী লরী পাড়াইয়া আছে এবং সেগুলিতে মাল ও মানুষ উভয়ই উঠিতেছে। এইরূপ কোন লরী পাওয়া যায় কি না তাহার সম্ভান করিতে গিয়া দেখি আমাদেরই সহযাত্রী এক মুসলমান ছাত্রের দাখা তাহার ভাইকে লইবার জন্ত একখানি লরী আনিয়াছিলেন। তিনি সেই লরীতে আমাদের তুলিয়া লইলেন এবং বলিলেন যে Bachelor's Mess-ই বাঙ্গালী আগন্তকের প্রথম বাওয়ার পক্ষে স্রেষ্ঠ-স্থান এবং লরীতে

হুকুম শীকুনি খাওয়ার পর বেলা প্রায় তিনটা নাগাদ আমরা গিটিলার ঘেসে উপস্থিত হইলাম।

ব্যাটিলার যেসটি সহরের মধ্যস্থলে অবস্থিত একখানি স্থলর কার্টের হাতলা বাড়ী। উহার একতোলায় গভর্ণমেন্টের ছাপাখানা। দোতলায় টিরা যে ঘরে প্রথম বসিলাম উহা বাঙ্গালীদের ক্লাবঘর। ঐ ঘরে রমণী পূজা হইতে বাঙ্গালীদের নাট্যাভিনয়ের রিহাসাল ও গল্পগুজন ত্যাদি হয়, এবং এখানেই তিনটি আলমারিতে বাংলা বই আছে, যথাঃ উহাই স্থানীয় বাঙ্গালীদের লাইব্রেরী। মেসের দরওয়ান বলিল য, এখানে থাকিবার মত কোন খালি আরগা নাই, অতএব—

মালপত্র কেলিয়া, ওয়াটারপ্ৰক খুলিয়া বেকির উপর স্থির হইয়া সিতে না বসিতে স্থলধারে বৃষ্টি পানিল। শুমিলাম এইরূপ বৃষ্টি খানে নয়মাস বাবৎ হইয়া থাকে, বাকী তিনমাস অপেক্ষাকৃত শুষ্ক থাকে। সহযাত্রী বন্ধু নির্মলবাবু তাহার ছাত্রের দাদা শ্রীঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের নামে একখানি চিঠি লইয়া গিয়াছিলেন। তিনি রদের বেরারাকে সেই চিঠি দিয়া ঠাকুরদাসবাবুর সন্ধান লইতে লিলেন। বেরারা চলিয়া গেল। আশ্চর্য্যের মধ্যেই ঠাকুরদাসবাবু সিয়া উপস্থিত হইলেন।

ঠাকুরদাসবাবু CPWD র ওভারসিয়ার, ষাষ্ট্যবান প্রিয়দর্শন রসিক বক, এককথায় মাই-ডিমার-জাতীয় লোক। কোনরূপ দ্বিধাবোধ করিয়াই এক বেরারার সাহায্যে আমাদের মালপত্র উঠাইয়া নিজের চীতে আনিয়া হাজির করিলেন। তাহার বাটী বিধী লাইন নামক রক্তার উপর, যেহু হইতে খুব নিকটেই বটে। স্ত্রী, শিশুকন্যা ও কটি ভৃত্য লইয়া তিনি প্রবাসে সুখী জীবন যাপন করেন। এই কুরদাসবাবুর সহায়তার আমরা আশ্বাসের বহু বাঙ্গালীর সহিত রিচিত হইয়াছিলাম। অবশ্য তিনি সুখে বলিয়াছিলেন যে, তিনি আমাদের লইয়া বেশী বেড়াইতে বা দেখাইতে পারিবেন না, কারণ হাঁজ যে কয়দিন বন্ধের থাকে, সে কয়দিন তাহাদের বড়ই ব্যস্ত ক্রিতে হয়, ইত্যাদি। কিন্তু বাস্তবে দেখা গেল, তিনি আমাদের লইয়া রভাবে ঘুরাইলেন, তাহার অধিক কোন মানুষের দ্বারা সম্ভব নয়। ক্রুতপক্ষে আশ্বাসের ঘাটে জাহাজ যাওয়া এবং থাকা একটা রসব বিশেষ। দেশের বাবতীর চিঠি, খবরের কাগজ, দোকানের রয়োজনীয় মাল সমস্তই এই জাহাজ যোগে যায়। জাহাজের যাওয়া দেশের 'জীবনকাঠি', চলিয়া আসা 'মরণকাঠি'। সারা বছরে ১৮ বার ত্র জাহাজ যাইয়া থাকে, ১২ বার কলিকাতা হইতে এবং ৬বার জাহাজ হইতে। ঐ একখানি জাহাজ 'এস্‌এস্‌ মহারাজাই' এইভাবে তারাত করে। এ জাহাজ ছই একখানি চাটার-করা জাহাজও মধ্যে মধ্যে যায় এবং বর্ষা হইতে পেট্রলবাহী জাহাজও আসে।

কিন্তু এদেশের আসল আশপত্তি-সকারকারী জাহাজ ঐ 'এস্‌এস্‌ মহারাজ'।'

বিকাল আশ্রাজ ৪টার সময় বিধী লাইনে ঠাকুরদাসবাবুর বাটীতে আসিয়া হাত পা ধুইয়া কাপড় ছাড়িয়া চা এবং পাঁপার ভাজা খাইতে সন্ধ্যা হইয়া আসিল। বৃষ্টি সমানেই পড়িতেছিল। তিনি বলিলেন, বৃষ্টি এইরূপেই পড়ে এবং পড়িতেই থাকিবে, অতএব বৃষ্টির জন্ত চিন্তা করিলে চলিবে না। চাপানের পর তিনি আমাদের 'ভিনজনকে লইয়া চিক্‌ কমিশনারের সেক্রেটারী শ্রী কে সি বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের বাংলায় লইয়া চলিলেন।

প্রৌঢ়বয়স্ক বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় পাকা সাহেবী কায়দার প্রবাসী বাঙ্গালী। বাড়ী ঘরের বন্দ্যোবস্ত নিখুঁত সাহেবী ধরণে, নিজের পরিচ্ছদ এবং ব্যবহার অত্যন্ত ভদ্র এবং মার্জিত ইংরাজের মত। চুলচেরা হিসাব এবং গুজন করিয়া কথা বলেন। নবাগন্তকের সহিত ভদ্রতা রক্ষার জন্ত যতটুকু আবহাওয়ার সংবাদ এবং রাষ্ট্রনীতি চর্চার প্রয়োজন মাত্র ততটুকুই করিলেন এবং আশ্বাসমানের বাস্তবতার উপনিবেশগুলি ঘুরিবার জন্ত আমাদের পরিপূর্ণভাবে সাহায্য করিলেন। তাহার সহায়তা না পাইলে আমরা হয়ত সমস্ত দক্ষিণ আশ্বাসমান ঘুরিতে পারিতাম না। তাহার সাহায্যেই আমরা 'রস' ধীপে ঘাইবার জন্ত মোটর লঞ্চ পাইয়াছিলাম। তিনি নানাভাবে আমাদের নিকট প্রের করিয়া শেষে এই বলিয়া স্বীকার করিলেন যে, বিনা প্রয়োজনে, কোনরূপ আশ্রয় বন্ধু না থাকা সত্ত্বেও কেবলমাত্র বেড়াইবার উদ্দেশ্যে এ পর্য্যন্ত কেহ কখনও পোর্ট রেমারে আসেন নাই এবং বলিলেন যে যদি কখনও কেহ আশ্বাসমানের উদ্দেশ্যেই দর্শকের তালিকা প্রস্তুত করে, তাহা হইলে আমরাই সেই তালিকায় প্রথম স্থান অধিকার করিব। প্রায় ঘটানেক কথাবার্তার পর আমরা সেখান হইতে বাহির হইয়া পড়িলাম।

পরদিন সকাল 'হইতেই আমাদের আশ্বাসমান জ্রম শুরু হইল। জীপে, লঞ্চে এবং পনরজে সাতদিন ধরিয়া সর্বত্র ঘুরিয়াছি, কতকগুলি পুরাতন বন্ধু এবং সহপাঠীর সাক্ষাৎ পাইয়াছি, কতকগুলি নূতন বন্ধু লাভ করিয়াছি, অনেকের বাটীতেই সাদরে অভ্যর্থিত বা ১৫ মিমমিত হইয়াছি এবং সাতদিন পরে যখন জাহাজে চড়িয়াছি তখন বহু প্রবাসী বাঙ্গালী স্ত্রীপুরুষে জেগীতে আসিয়া আমাদের বিদায় সভাষণ জানাইয়াছেন। জাহাজ যখন জেগী ছাড়িয়া বহুদূর পর্য্যন্ত চলিয়া গিয়াছে, তখনও তাহাদের বুদ্ধিগুলি ছবির স্রায় জেগীর উপর স্থির নিশ্চলভাবে দাঁড়াইয়াছিল, অবসর সময়ে এখনও সেই এক সপ্তাহের বন্ধু ও বান্ধবীদের চাখাম জেগীর উপর দণ্ডায়মান নিশ্চল বুদ্ধিগুলি জিরাপিতবৎ মানসচক্ষে ভাসিয়া উঠে। (ক্রমশঃ)



# রুসো

## শ্রীতারকচন্দ্র রায়

(পূর্বপ্রকাশিতের অন্তর্ভুক্তি)

সকলের কিছুতেই রুসোর তৃপ্তি হইতেছিল না। সংসার হইতে ইহা পারিস হইতে দূরবর্তী কোনও স্থানে নির্জনে বাস করিবার নি ব্যাকুল হইলেন। তাঁহার এই ইচ্ছার বিষয় অবগত হইয়া বান্ধবী Madame d'epincy মন্টমরেন্সির অরণ্যের মধ্যে নিজের গৃহের সম্মুখে তাঁহার জন্য একটি গৃহ নির্মাণ করিয়া। গৃহের নাম হইল Hermitage (নিভৃত কুটার)। ১৭৫৬ রুসো পারিস ত্যাগ করিয়া এই কুটারে আসিয়া বাস করিতে গেল। তাঁহার বন্ধুগণও তাঁহার এই নির্জন-প্রিয়তার অর্থ বুঝিতে পারেন না। কেহ তাঁহাকে মানব-বিদ্বেষী (misanthrope) বলিত; কেহ বলিলেন, প্রশংসা-লোভী। ১৭৬২ সালে Malesherbesকে এক পত্রে রুসো তাঁহার নির্জনবাসের কারণ বর্ণনা করিয়াছিলেন। লিখিয়াছিলেন “লোকালয়-ত্যাগের প্রকৃত কারণ আমার অন্তর্য প্রকৃতি। এই প্রকৃতির নিকট সম্মান, ধনসম্পদ, যশঃ কিছুই মূল্য নাই। এই প্রকৃতি আমার অহংকার হইতে উদ্ভূত নহে; তা আলস্য হইতে ইহার উদ্ভব। আমার এই আলস্যের পরিমাণ যেন, যে তাহা বিশ্বাস করিতে পারিবেন না। ইহার জন্য সকল রকমই আমার ভয় পায়। নাগরিক জীবনের সামান্ততম কর্তব্যও আমার হইয়া পড়ে। যখন প্রয়োজন উপস্থিত হয়, তখন একটা কথা একখানা পত্র লেখা, অথবা কোথাও গিয়া কাহারও নহিত করা, আমার ভাষণ গীড়াদারক হইয়া উঠে।” রুসোর যৌবনের প্রচেষ্টার মূলে ছিল এক আকাঙ্ক্ষা—অবসর ও শান্তি। অবসর স্থির হযোগ উপস্থিত হইবামাত্র তিনি তাহা গ্রহণ করিলেন। ১৭৫৩ ও তাঁহার মাতাও রুসোর সহিত Hermitageএ বাস করিতে লাগিলেন।

রুসো চিরকাল ভালবাসার কাঙাল ছিলেন। নিজের স্নেহের উজ্জাদ করিয়া তিনি বন্ধুবান্ধবদিগকে দান করিতেন; স্বার্থ-হীন বেশ তাঁহার ছিল না। কিন্তু সে ভালবাসার উপযুক্ত প্রতিদান ও প্রাপ্ত হন নাই। অন্তরের সমস্ত স্নেহ তিনি Thereseকে দিয়াছিলেন, কিন্তু তাহার নিকট যে স্নেহ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহা তাহার অন্তর তৃপ্ত হয় নাই। Montmorencyর অরণ্যের ভাষার মধ্যে তাঁহার স্মৃতির দ্বার উন্মুক্ত হইয়া বাইত এবং অন্তর কার করিয়া উঠিত। তিনি লিখিয়াছেন—“বাঁচা ও ভালবাসা আমার কাছে অভিন্ন। তবুও কেন আমাতে সম্পূর্ণ অহরহ একজন পাইলার না? \*\*\* কেন আমার অন্তর স্নেহে পূর্ণ ও সহজেই সন্তোষ বিচলিত হইলেও কোনও ব্যক্তিবিশেষকে আমি ভাল-

বাসিতে পারিলাম না? ভালবাসিবার ইচ্ছার আশুনে দগ্ধ হইতে হইতে বার্ষিকের নিকটবর্তী হইয়াও আমার ইচ্ছা পূর্ণ হইল না। মৃত্যুর পূর্বে প্রকৃতপক্ষে বাঁচা আমার ঘটিয়া উঠিল না। \*\*\* যদি আমার স্বকোমল বৃত্তিবিচয়ের ব্যবহারই করিতে পারিবা না, তবে কেন তাহা লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলাম? নিয়তি আমার ঋণ সম্পূর্ণ পরিশোধ করে নাই; তাহার নিকট এখনও আমার কিছু প্রাপ্য আছে।”

জুন মাসে একদিন রুসোর স্থানীয় ছায়ায় উপবিষ্ট হইয়া রুসো চিন্তা করিতেছিলেন। নাইটিংগেল তখন মধুরস্বরে গান করিতেছিল; অদূরে শ্রোতব্যতী কুলকুলনাদে বহিয়া বাইতেছিল। রুসোর দেহ আলস্যে অবশ ও মন স্বপ্নাবিষ্ট হইয়া আসিল। অকস্মাৎ স্মৃতির দ্বার খুলিয়া গেল। তাঁহার প্রেমাতুর মনের সম্মুখে পূর্ব-পরিচিতা হৃন্দরীগণের জীবন্ত চিত্র ভাসিয়া আসিল। হৃন্দরীগণ-পরিবেষ্টিত রুসোর প্রেমভূমি অবল হইয়া উঠিল, চিত্র অস্থির হইল। অস্থিরতার মধ্যে মনে হইল তাঁহার প্রেমলীলার বয়স উত্তীর্ণ হইয়াছে। বাস্তব জগতে প্রেম-পিপাসার পরিভূক্তি অসম্ভব জানিয়া কল্পনার জগতে মন ধাবিত হইল, স্বর্গীয় সৃষ্টির মধ্যে পরিভূক্তির সন্ধানে ছুটিল। তাঁহার অমর উপন্যাস La Nouvelle Heloiseএর নায়িকা জুলি ও ক্রেয়ার তখন সৃষ্টি প্রগ্রহ করিয়া তাঁহার মানস চক্ষুর সমীপে আবিস্কৃত হইল। রুসো গ্রন্থ রচনা আরম্ভ করিলেন। ১৭৬০ সালে এই গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। সমসাময়িক সাহিত্যিকগণ ঈর্ষাধনে গ্রন্থের কঠোর সমালোচনা করিয়াছিলেন। ভলটেয়ার অতি নীচ ও জঘন্য ভাষায় রুসোকে আক্রমণ করিয়াছিলেন। কিন্তু জনসাধারণ ঐ সমস্ত সমালোচনা অগ্রাহ করিয়া বিপুল সমাদরে গ্রন্থের অভ্যর্থনা করিয়াছিল।

Hermitageএ রুসো বহুদিন বাস করিতে পারেন নাই, Madame d'epincyর সহিত কলহ করিয়া তিনি ১৭৫৭ সালের ডিসেম্বর মাসে Montmorencyতে উঠিয়া যান, এবং সেখানে Duke of Luxembourgএর আশ্রয়ে বাস করিতে থাকেন। চারি পাঁচ বৎসর তিনি এই স্থানে বাস করিয়াছিলেন। এই সময়েই তাঁহার La Nouvelle Heloise সম্পূর্ণ হইয়া প্রকাশিত হয়। Letter to D'Alambert on the theatre, Emile ও Social Contractও এই সময়ে রচিত ও প্রকাশিত হয়।

Emile শিক্ষা সম্বন্ধীয় গ্রন্থ। প্রকৃতির সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করিয়া কল্পে শিক্ষা দেওয়া যায়, গ্রন্থে তাহারই আলোচনা আছে; এই শিক্ষা-প্রণালীতে আপত্তিজনক কিছু না থাকিলেও “The confession of a Savoyard Vicar” নামক অধ্যায়ে “প্রাকৃতিক ধর্মের (natural

ligion) যে ব্যাখ্যা আছে, তাহা পাঠ করিয়া রোমান ক্যাথলিক ও প্রটেস্ট্যান্ট উভয় সম্প্রদায়ই দ্বন্দ্ব হইয়াছিল।

সভ্যতা তাহার মতে যাবতীয় অনর্থের মূল। সভ্যতার অনিষ্টকর প্রভাব হইতে মুক্ত পরিবেশের মধ্যে শিশুর শিক্ষা হওয়া উচিত। যাহা মানুষ জন্ম হইতে মৃত্যু পর্যন্ত পরাধীন। জন্মমাত্র তাহাকে কাপড় পরাইয়া দেওয়া হয়, মৃত্যু হইলে কবিনে বন্দী করা হয়। প্রকৃতি তাহার সন্তানদের শিক্ষার জন্ত যে পথ অনুসরণ করে, তাহাই শিশুদিগের শিক্ষার অবলম্বিত হওয়া উচিত। নানাবিধ অহবিধাজনক অবস্থার লিখা প্রকৃতি শিশুদিগের শরীর কষ্টসহ করিয়া তোলে—দুঃখ ও কষ্ট করিতে শিক্ষা দেয়। শিশুদিগকে আঘাত হইতে রক্ষা করিবার চেষ্টা করা উচিত নয়। কষ্ট সহ করাই তাহাদিগের প্রথম ও প্রধান শিক্ষা হওয়া উচিত।

অভাব অপেক্ষা তাহা পূরণ করিবার শক্তি বাহার কম, তাহাকেই লক্ষ্য বলে। এই দুর্বলতা দূর করিতে হইলে, অভাবপূরণের শক্তি বৃদ্ধি করিতে শিক্ষা দিতে হইবে।

যে ব্যক্তি বাহা সম্পন্ন করিতে সক্ষম, তাহাই ইচ্ছা করে এবং বাহা লাভ করে, তাহাই করে, সেই প্রকৃতপক্ষে স্বাধীন। পরনির্ভরতা বিধ—ক্রমের উপর নির্ভর ও মানুষের উপর নির্ভর। প্রথমটির গণনও নৈতিক বল নাই, কিন্তু দ্বিতীয়টি যাবতীয় দোষের আকর। শিশুদিগকে মানুষের উপর নির্ভর হইতে রক্ষা করা কর্তব্য। শিশু হা চায় তাহাই তাহাকে দিওনা; বাহা তাহার প্রয়োজন, কেবল তাহাই দেওয়া উচিত। প্রকৃতির প্রথম তাড়নায় কোনও দোষ নাই। "মাদির পাপ" (original sin) বলিয়া মানুষের অন্তরে কোনও পাপ-প্রবৃত্তি নাই। কিন্তু পাপ মানুষের অন্তরে প্রবেশ করে, তাহা লক্ষ্য করা যায়। শিশুদিগকে তাহাদিগের কর্তব্য কি, তাহা শিক্ষা না দিয়া, তাহাদের অন্তরকে পাপের স্পর্শ হইতে রক্ষা করাই উচিত। শিশুর উপযুক্ত একমাত্র নৈতিক শিক্ষা এই—"কাহাকেও আঘাত করিও না।"

জ্ঞানের অভাব হইতে কাহারও কোনও অনিষ্ট হয় না। কিন্তু মূলের বল মারাত্মক। শিশুদের শিক্ষার জন্ত পুস্তকের প্রয়োজন নাই। গ্রন্থদের ইঙ্গিতের ব্যবহার করিয়া তাহার শিশুক। সমগ্র পৃথিবীই গ্রন্থদের পুস্তক, বাহা প্রত্যেক তাহাই তাহাদের শিক্ষার বিঘ্ন। ব্রাহ্মণিক ব্যাপার সকল তাহাদিগকে পর্যবেক্ষণ করিতে দাও; গ্রন্থদের কোতুল উদ্দীপ্ত হইতে দাও, শীঘ্র শীঘ্র সে কোতুল পরিভূত পরিবার জন্ত ব্যস্ত হইও না। আপনার চোখেই তাহাকে কোতুল পরিভূত করিতে দিও। অনেক বিঘ্ন তাহাকে শিখাইও না। কিন্তু কোনও বিঘ্নেই ভুল শিখিতে দিও না। স্মৃতি ও বিচারশক্তি ধীরে ধীরে ব্রাসে, কিন্তু নিখ্যা সংস্কার আসে দলে দলে। তাহা হইতে শিশুদিগকে রক্ষা করা চাই। যদি কোনও পুস্তক শিশুদিগকে দিতেই হয়, তবে সে পুস্তক Robinson Crusoe.

জ্ঞান বৃদ্ধির চেষ্টা করিও না। কিন্তু জ্ঞানবৃদ্ধির সঙ্গে মানুষের পরম্পরের উপর নির্ভরশীল, তাহা বুঝাইবার জন্ত শিশুর দিকে তাহার মনোযোগ আকৃষ্ট কর। কৃষিই সর্বোপেক্ষা প্রাচীন ও সম্মানজনক শিল্প; তাহার পরেই ধাতু-শিল্প, তাহার পরে স্থলযন্ত্রের কর্ম। এইরূপে মানুষের পারস্পরিক সম্বন্ধের জ্ঞান হইবে।

যদি এমন অবস্থা পৃথিবীতে আবির্ভূত হয়, যে কাহারও পক্ষে অস্ত্রায় কর্ম না করিয়া জীবনধারণ অসম্ভব হয়, এবং লোকে অস্ত্রায় কর্ম করিতে বাধ্য হয়, তাহা হইলে অস্ত্রায়কারী কান্দী না দিয়া বাহার তাহাকে অস্ত্রায় করিতে বাধ্য করেছে তাহাদেরই কান্দী দেওয়া উচিত। বর্তমান সামাজিক শৃঙ্খলার উপর নির্ভর করিয়া থাকিও না। এ শৃঙ্খলা চিরস্থায়ী নহে। ভবিষ্যতে সমাজে কি বিপ্লব আসিতে পারে, তাহা বলা যায় না। সে বিপ্লবে ধনী দরিদ্র হইয়া বাইতে পারে, দরিদ্র ধনী হইতে পারে; রাজা সাধারণ লোকের একজন হইতে পারেন। অদূরের আঘাত কি এতই বিরল, যে তাহার আঘাত তোমার সন্তানদিগের উপর পড়িবে না বলিয়া নিশ্চিন্ত থাকিবে? সে সঙ্কটকাল অদূরবর্তী। বিপ্লবের ধারে আমরা দাঁড়াইয়া আছি। সমাজের বাহিরে নির্জনে যে বাস করে, সে যেসব ইচ্ছা সেই ভাবেই বাস করিতে পারে। কাহারও নিকট তাহার কোনও গুণ নাই। কিন্তু সমাজে যে বাস করে, হয় তাহাকে অস্ত্রের ব্যয়ে জীবিকা নির্বাহ করিতে হইবে, অথবা তাহার জীবিকার জন্ত বাহা ব্যয় হয়, তাহা নিজের পরিশ্রম দ্বারা পরিশোধ করিতে হইবে। ধনী, নির্ধন, সবল অথবা দুর্বল—সমাজের প্রত্যেককেই খাটিতে হইবে। যে পরিশ্রম করে না, সে ভ্রমর। বিভিন্ন উপায়ে জীবিকা নির্বাহ করিলেও, সকল মানুষই সমান। যে শ্রেণীতে অধিকসংখ্যক লোক, সেই শ্রেণীই অধিক সম্মান পাইবার উপযুক্ত।

শিশুদিগের সঙ্গীনির্বাচন এমন ভাবে করিতে হইবে, যে তাহার সঙ্গীদিগকে ভাল বলিয়া মনে করিতে পারে। কিন্তু সংসারের সহিত তাহার পরিচয় এমন ভাবে করিয়া দিতে হইবে যে, সংসারে বাহা ঘটে, তাহার সকলই সে মন্দ মনে করে। মানুষ যে স্বভাবতঃ ভাল, তাহা শিশুকে বুঝিতে দিতে হইবে, কিন্তু সমাজ কিরূপে মানুষকে দূষিত করে তাহাও দেখাইতে হইবে। সাবধানে চলিতে, বয়োজ্যেষ্ঠদিগকে সম্মান করিতে, স্নেহভাবী হইতে, সভ্য বলিতে সাহসী হইতে শিশুদিগকে শিক্ষা দিবে।

শিশুদিগকে বিবাদ-বিসম্বাদ দূর করিতে শিক্ষা দিতে হইবে। পরের উপর প্রভুত্ব করিয়া অথবা অন্তের কষ্ট দেখিয়া যেন তাহার আশ্রয় না পায়। কষ্ট দেখিয়া স্বভাবতঃ যেন তাহাদের কষ্ট হয়।

মানুষকে অসভ্য পরিণত করা, অথবা পুনরায় জন্মে পাঠাইয়া দেওয়া আমার ইচ্ছা নহে। সংসার অথবা অদ্য প্রবৃত্তি দ্বারা চালিত না হইয়া তাহার মুক্তিসম্মত জীবনধারণ করে ইহাই আমার লক্ষ্য। চক্ষু দ্বারা যেমন দেখা যায়, তেমনই হৃদয় দ্বারা অনুভব করা চাই।

ভুল শিক্ষা পাইবার বিপদ আছে। “মুক্তির জন্য ঈশ্বরে  
 প্রয়োজন”—ইহা ঠিক ভাবে বুঝিতে না পারার জন্যই  
 হিফুতার উদ্ভব হয়। ঈশ্বরে বিশ্বাস না থাকিলেও মুক্তি  
 শেষে সম্ভবপর। শিশু ও উগ্রাদর্শিগণের ঈশ্বর সম্বন্ধে জ্ঞান লাভের  
 নাই। কেহ যদি ইচ্ছাপূর্বক অবিশ্বাস পোষণ না করে, তাহা  
 ক্ষ অবস্থার অবিশ্বাসী হইলেও পরলোকে ঈশ্বরের সান্নিধ্য হইতে  
 বঞ্চিত হইবার কারণ নাই। বাহ্যারী বুঝিতে পারে না,  
 ঈশ্বর নিকট সত্য-প্রচারের ফলে ভুল প্রচার হইবে। ঈশ্বর  
 দ্রাস্ত ধারণা থাকা অপেক্ষা কোন ধারণা না থাকাই ভাল।  
 অপমান করা অপেক্ষা তাহাকে দেখিতে না পাওয়াই ভাল।  
 Nile ও Social Contract—উভয় গ্রন্থই ১৭৬৭ সালে  
 ত হয়। উভয় গ্রন্থ হইতে ৮০০০ ক্রাক লাভ হইবে বলিয়া  
 াশ করিয়াছিলেন। \*এই অর্থ হস্তগত হইলে তিনি সাহিত্যক্ষেত্রে  
 যবসর গ্রহণ করিয়া নিজের একখানা সত্য জীবনচরিত লিখিবার  
 করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহার চতুর্দিকে বিপদের মেঘ সঞ্চিত  
 ল। বহুসংখ্যক শত্রু তাহার সর্বনাশের চেষ্টা করিতেছিল।  
 “Julie” গ্রন্থের এক স্থানে তিনি লিখিয়াছিলেন “রাজপুত্রের  
 (Mistress of a Prince) অপেক্ষা করলা-খনির “শ্রমিকও  
 সম্মানের উপযুক্ত।” ইহা পড়িয়া রাজার উপপত্নী Madame  
 omepadour তাহার উপর ভীষণ রুষ্ট হন। প্রধান স্ত্রী  
 eulও তাহার উপর ভয়ানক অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন।  
 clopedist গণ তাহাকে দলত্যাগী বলিয়া ঘৃণা করিতেন।  
 দেশব্যাপী খ্যাতি ভলটেরারের অসহ্য হইয়াছিল। পার্লামেন্টের  
 তাহার প্রচারিত মত দেশের অনিষ্টকর বলিয়া মনে করিতেন।  
 ষ্টাণ্ট ও রোমান ক্যাথলিক উভয় সম্প্রদায়ের পুরোহিতগণই  
 “প্রাকৃতিক ধর্মের” প্রচারে বন্য ধর্মের বিপদ দেখিতে পাইয়া-  
 । এই সময়ে Encyclopedist ও খৃষ্টধর্মে বিশ্বাসীদিগের  
 দীর্ঘ কলহ চলিতেছিল। রসো লিখিয়াছেন “উন্নত ব্যক্তির মত  
 । পরস্পরকে আক্রমণ করিয়া যুদ্ধে লিপ্ত হইয়াছিল। উপযুক্ত  
 কোনও দলের ছিল না তাই রক্ষা, নতুবা দেশে অন্তরিক্ষোভ  
 ত হইত। নিষ্করণ পরমঅসহিষ্ণুতাজাত ধর্মসংক্রান্ত যুদ্ধের ফল  
 ত, তাহা ঈশ্বরই জানেন।” এই বিরোধ শান্তির জন্যই রসো  
 telle Heioice এবং Emile গ্রন্থে পরমত সহ্য করিবার  
 নীয়তা ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহার কল হইয়াছিল  
 ত। উভয় দল মিলিত হইয়া তাহার সর্বনাশে উদ্ভত হইল।  
 । চতুর্দিকে যে বিপদের মেঘ ঘনীভূত হইয়া উঠিতেছিল, রসো  
 । কিছুই জানিতে পারেন নাই। নির্জন পল্লী-নিবাসে নিজের  
 সকলতার আশ্রমে তাহার দিন অতিবাহিত হইতেছিল। মেঘ-  
 তাহার ঋতিগোচর হয় নাই। বখন বিপদের কণা জানিতে  
 নন—অপরিসীম ভয়ে বিমূঢ় হইয়া পড়িলেন এবং যেখানে বিপদ  
 ন, সেখানেও বিপদ দেখিতে লাগিলেন। এই সময়ে তাহার

মস্তক-বিকৃতি আরম্ভ হইল। সকলেই তাহার শত্রু, সকলেই তাহাকে  
 বিপন্ন করিবার চেষ্টা করিতেছে, এই বিশ্বাসে তাহার মনের সমতা  
 হারাইয়া ফেলিলেন—উৎপীড়নের ভীতি তাহাকে উদ্ভাদ করিয়া তুলিল।  
 তাহার মৃত্যুশয়ের পীড়া এই উত্তেজনার অসম্ভব রূপে বাড়িয়া উঠিল।  
 যত্রায় অনেক সময় আত্মহত্যার ইচ্ছা তাহার মনে উদ্ভিত হইতে লাগিল।  
 Emile গ্রন্থ মুদ্রিত হইয়াছিল হল্যাণ্ডে। হল্যাণ্ডে গ্রন্থ মুদ্রায়  
 হইতে বাহির হইবার পরে কুড়িদিন গত না হইতেই প্যারিসের  
 পার্লামেন্ট রসোর নিকট হইতে কোনও কৈয়দত না লইয়াই  
 উক্ত গ্রন্থ পোড়াইয়া ফেলিবার এবং রসোকে বন্দী করিবার আদেশ  
 প্রচার করিলেন। ১ই জুন আদেশ প্রদত্ত হয়, ১০ই তারিখে Palais de  
 Justice-এর সম্মুখে প্রকাশ্যভাবে ‘গ্রন্থ প্রধনে ছিড়িয়া ফেলা হইল,  
 তারপরে আগুনে পোড়ানো হইল। অনেকে প্রকাশ্য ভাবেই বলিতে  
 লাগিল, গ্রন্থের সঙ্গে গ্রন্থকারকে পোড়াইয়া মারা উচিত। রসোর  
 সম্ভ্রান্ত বন্ধুগণ তাহাকে পলায়ন করিবার পরামর্শ দিলেন। ১১ই  
 জুনই রসো পলায়ন করিয়া সুইজারল্যাণ্ডে উপস্থিত হইলেন। কিন্তু  
 সেখানেও তিনি নিরাপদ হইতে পারিলেন না। তাহার শত্রুগণ  
 সেখানেও তাহাকে অনুসরণ করিল। ২ দিন পরে জেনিভাতেও  
 তাহার গ্রন্থ আগুনে পোড়াইয়া ফেলা হয়। বার্ষিক মিউন্সিটাল ও  
 জেনিভার অনুসরণ করিল। সমস্ত ইউরোপে তাহার বিরুদ্ধে অভিসম্পাত  
 উচ্চারিত হইতে লাগিল। এরূপ প্রচণ্ড রোষ পূর্বে কখনও দেখা  
 যায় নাই। সর্বত্রই রসোকে অবিশ্বাসী নাস্তিক, উদ্ভাদ, হিংস্রপশু,  
 ব্যাদ্র প্রভৃতি অভিধানে অভিহিত করিতে লাগিল। রসোর মনে হইল,  
 সমগ্র পৃথিবী তাহার বিরুদ্ধে বড়যন্ত্রে লিপ্ত হইয়াছে। রসোর অন্তর  
 ছিল অতি দুর্বল ও কোমল। ভীষণ যন্ত্রণাদায়ক ব্যাধিতে তিনি  
 ভুগিতেছিলেন। এরকম অবস্থায় যে ভীষণ বিবেকের বজ্র তাহার  
 উপর আসিয়া পড়িল, তাহার চাপে তিনি যে বুদ্ধিবিবেচনা হারাইয়া  
 ফেলিলেন, তাহাতে আশ্চর্য্যবিত হইবার কিছুই নাই। জীবনের শেষ  
 দিন পর্যন্ত উৎপীড়ন-ভীতি তাহাকে ব্যাকুল করিয়া তুলিত।

সুইজারল্যাণ্ডে হইতে পলায়ন করিয়া রসো প্রাসিয়ার রাজা  
 Frederick the great-এর রাজ্যে Motiers গ্রামে আশ্রয় লইলেন।  
 আড়াই বৎসর তিনি তথায় বাস করিয়াছিলেন। কিন্তু সেখানে অবস্থান  
 কালে জেনিভার রাষ্ট্র ও চার্চকে আক্রমণ করিয়া প্রবন্ধ লেখার জন্য  
 পুরোহিতেরা ভীষণ উত্তেজিত হইয়া উঠিল। Motier এর গীর্জার  
 তাহার প্রবেশ নিষিদ্ধ হইল এবং গীর্জার পুলপিট হইতে ধর্মোপদেশ  
 তাহাকে anti-Christ (খৃষ্টশত্রু) বলিয়া অভিহিত করিলেন।  
 সাধারণ লোক উত্তেজিত হইয়া পথে ঘাটে তাহাকে আক্রমণ করিতে  
 আরম্ভ করিল। একদিন রাত্রিকালে বহুসংখ্যক লোক মিলিত হইয়া  
 তাহার গৃহ আক্রমণ করিলে তিনি পলায়ন করিয়া জীবন রক্ষা করিলেন।  
 Bienne ত্রয়ের ভীয়ে একমাগ বাস করিবার পরে Berne নগরের  
 শাসনকর্তৃগণের আদেশে তাহাকে সে স্থানও ত্যাগ করিতে হইল।  
 রসো ইংলণ্ডে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন।



দার্শনিক পণ্ডিত ডেভিড হিউম রুসোকে ইংলেণ্ডে নিমন্ত্রণ করিয়া ছিলেন। এই বিপদের সময় তিনি তাহাকে আশ্রয় দিলেন। ইংলেণ্ডে সকলেই রুসোকে সাধারণ গ্রহণ করিল। ইংলেণ্ডের তৃতীয় জর্জ তাঁহাকে বৃত্তি দান করিলেন। এসিদ্ধ বক্তা বার্কের সহিত তাহার বন্ধুত্ব হইল, কিন্তু সে বন্ধুত্ব স্থায়ী হয় নাই। বার্ক লিখিয়াছেন “একমাত্র আত্মাভিমান ভিন্ন, তাঁহার হৃদয়কে প্রভাবিত অথবা বুদ্ধিকে চালিত করিবার উপযোগী কোনও নীতি (Principle) তাঁহার ছিল না।” হিউম বহুদিন পর্য্যন্ত বন্ধুত্ব রক্ষা করিয়াছিলেন। তিনি তাহাকে ভালবাসিতেন, এবং শ্রদ্ধা করিতেন। কিন্তু রুসোর উৎপীড়নভীতি তাঁহাকে সকলকেই অবিবাস্য করিতে শিক্ষা দিয়াছিল। তাঁহার বিশ্বাস হইল, হিউমও তাঁহার শত্রুদিগের সহিত মিলিত হইয়াছেন। মাঝে মাঝে এই অশুলক ধারণার লজ্জিত হইয়া তিনি হিউমকে আলিঙ্গন করিয়া বলিতেন “না না। হিউম বিশ্বাসঘাতক নয়।” কিন্তু অবশেষে অবিবাস্যই জয় হইল, রুসো পলায়ন করিলেন। হিউম তাঁহার সম্বন্ধে লিখিয়াছেন “তাঁহার সমস্ত জীবনই বেদনার (feeling) জীবন। তাঁহার বেদনাবোধ এত তীব্র হইতে দেখিয়াছি, যে অল্প কোথাও তাঁহার তুলনা মিলে না। কিন্তু এই বেদনাবোধ তাঁহাকে সুখ অপেক্ষা দুঃখের তীব্রতর অনুভূতিই দিয়াছে। যদি কোনও লোকের পরিচ্ছদের সহিত তাঁহার শরীর হইতে ত্বক ও খুলিয়া লওয়া হয় এবং সেই অবস্থায় সে প্রাকৃতিক দুঃখোপগের সম্মুখীন হয় তাহা হইলে তাহার যে অবস্থা হয়, রুসোর অবস্থাও তদ্রূপ।”

ইংলেণ্ড হইতে পলায়নের পরে নাম পরিবর্তন করিয়া রুসো হান হইতে হানান্তরে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। অবশেষে তাহাকে ক্রাসে প্রত্যাবর্তনের অনুমতি প্রদত্ত হইল। প্যারিসে একটি সামান্য গৃহে স্বয়ংলিপি নকল করিয়া তিনি দরিদ্রভাবে জীবন যাপন করিতে লাগিলেন। ইহার পূর্বেই তিনি তাহার জীবনচরিত লিখিয়া শেষ করিয়াছিলেন। এই জীবনচরিতের নাম দিয়াছিলেন Confessions (স্বীকারোক্তি)। এই গ্রন্থ তিনি কয়েকজন বন্ধুকে পড়িয়া শুনাইয়াছিলেন। কিন্তু Madame d'Epincy ও অন্যান্য বন্ধুগণ তাঁহাদের গুপ্তকথা প্রকাশিত হইবার ভয়ে পুলিশের সাহায্যে ইহার পাঠ নিষিদ্ধ করিয়া দিলেন। তাঁহার চিঠিপত্রও গবর্ণমেন্টের আদেশে খুলিয়া পড়া হইতে লাগিল। কলে রুসোর মানসিকব্যাপি বাড়িয়া চলিল। তিনি “নির্জন ঘাঁপে রবিনসনক্রুসো” অপেক্ষা প্যারিসে আপনাকে অধিকতর নিঃসঙ্গ মনে করিতে লাগিলেন। সমস্ত পৃথিবী তাঁহাকে শত্রু বলিয়া গণ্য করে, এই বিশ্বাসে রুসো “Dialogues de Rousseau Jean Jacks” লিখিলেন। এই গ্রন্থে তাঁহার বিরুদ্ধে বড়োস্ত্রের তিনি যে ভীষণ বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা উদ্ভাদের প্রলাপ মাত্র। তাঁহার হতাশার আত্মনাশ কোনও মানুষের কর্ণে প্রবেশ করিবে না, এই বিশ্বাসে তিনি প্যারিসের Notre Dame গীর্জার বেদীর উপর তাহার গ্রন্থ ঈশ্বরকে সমর্পণ করিবার ইচ্ছা করিলেন। কিন্তু বেদীর পথ রুদ্ধ দেখিয়া কিরিয়া

আলিলেন। এই আঘাতে তাহার হৃদয় একেবারে ভাঙিয়া পড়িল। মনে হইল ঈশ্বরও তাঁহার প্রতি বিরূপ। পতীর স্বর্গবিবাসের কলে তখন তাঁহার মনে হইল, ঈশ্বর যখন তাহার উপর উৎপীড়ন হইতে দিতেছেন, তখন ইহা নিশ্চয়ই তাঁহার “সমান্তর আদেশের” (eternal decrees) অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং সেই আদেশের নিকট দুঃখার্হ হৃদয়ে বিবাসের সহিত নত হওয়া ভিন্ন তাহার করণীয় কিছু নাই। এই বিশ্বাসে তিনি কথঞ্চিৎ শান্তি প্রাপ্ত হইলেন। কিন্তু মানসিক ব্যাধি কিরিয়া পাইলেন না। এই সময়ে Les Reveries du promeneur solitaire গ্রন্থ লিখিতে আরম্ভ করিলেন। (১৭৭৬ সালে এই গ্রন্থ আরম্ভ হয়, কিন্তু শেষ হয় নাই) এই গ্রন্থে তাঁহার মস্তিষ্ক বিকৃতির পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি লিখিয়াছেন “পৃথিবীতে আমি একা। ভাই নাই, প্রতিবাদী নাই, বন্ধু নাই, সখা নাই, আমি ভিন্ন আমার কেহই নাই। মানবের মধ্যে যে ছিল সর্বাপেক্ষা স্নেহশীল ও মিশ্রক, সকলেই তাহাকে বর্জন করিয়াছে।.....কিন্তু গহ্বরের তলদেশে হতভাগ্য মরণশীল মানুষ আমি শান্তই আছি—শান্ত কিন্তু ঈশ্বরের মতই সুখ দুঃখের অতীত।” তাঁহার Reveries সম্বন্ধে Roman Rolland লিখিয়াছেন “এই গ্রন্থে তাঁহার কলা-কৌশলের কোনও অপকর্ষের পরিচয় নাই। বরং তাহার বিপুলতাই দৃষ্ট হয়। অরণ্যের নিপুণতার মধ্যে বিবাদময় বৃদ্ধ নাইটিংগালের মধুর সঙ্গীতের মতই রুসোর এই শব্দ গ্রন্থ। এই গ্রন্থে তিনি তাঁহার জীবনের অসংখ্যক সুখের দিনগুলি আলোচনা করিয়াছেন—যখন তিনি প্রকৃতির সঙ্গে মিলিয়া গিয়াছিলেন, বিশ্বের সঙ্গে একীভূত হইয়াছিলেন। অল্প সমস্ত অনুভূতিবর্জিত হইয়া, সত্তার গভীরে (depths of Being) মনঃনিমজ্জিত করিয়া আপনার স্বরূপের আলিঙ্গনে বদ্ধ (Entwined with himself) হইয়া তিনি যে বিপুল উদ্ভাস অনুভব করিয়াছিলেন, সেই প্রাচ্য উদ্ভাস (ecstasy) পাশ্চাত্যদেশের কেহই তাহার মত অনুভব করে নাই। জীবনের শেষের দিকে তিনি উদ্ভিদ-বিশ্বের আলোচনা করিতেন। বৈজ্ঞানিক জ্ঞান অপেক্ষা পৃথিবীর প্রাণের সংস্পর্শ এবং মাঠ, জলাশয়, বন, নির্জনতা, সর্বোপরি শান্তি ও বিশ্বাসের যে স্তুতি এই আলোচনা হইতে উচ্ছ্বস হইত, তাহাই তাঁহার কাম্য ছিল।” সঙ্গীতেও তিনি আনন্দ পাইতেন।

১৭৭৮ সালের ২০-মে তারিখে M.de Gerardin নামে একজন ধনী ভদ্রলোক রুসোকে তাহার দরিদ্র আবাস হইতে লইয়া গিয়া প্যারিস হইতে নয় মাইল দূরে Ermenville নামক গৃহে প্রতিষ্ঠিত করেন। এই স্বর্গভূয়া উদ্ভাস গৃহে রুসো পরম শান্তি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তাহার বাহ্যের ও কথঞ্চিৎ উন্নতি লক্ষিত হইয়াছিল। কিন্তু ২রা জুন তারিখে হঠাৎ তাঁহার মৃত্যু হয়।

মৃত্যুর পূর্বে রুসো যখন তাঁহার কেহই নাই বলিয়া বিলাপ করিয়া ছিলেন, তখন তিনি জানিতেন না যে, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ তিনি জয় করিয়াছেন। তাঁহার মৃত্যুর পূর্বেই তাঁহার প্রহ্লাদলীল জয় সংকরণ এবং La nouvelle Heloise এর ৬শ সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছিল।



এবং তাহার বাণী বহুলপ্রচারিত হইয়া পড়িয়াছিল। ১৭৮২ সালে তাঁহার Confessions এর প্রথম ভাগ এবং Reveries প্রকাশিত হয়, এবং তাহার দ্বারা পাঠকের মন বহুল পরিমাণে প্রভাবিত হয়। ১৭৮০ সালে ফ্রান্সের রাণী ও রাজপুত্রগণ সহ অর্ধ ফ্রান্স Peupliers দ্বীপে যেখানে তাঁহার দেহ সমাহিত হইয়াছিল, তথায় গিয়া আপনাদের শ্রদ্ধাভক্তি নিবেদন করিয়াছিল এবং তদবধি এই উদ্ভাস পণ্ডিতের সমাধিক্ষেত্র ফ্রান্সের তীর্থক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে। “দার্শনিক”গণের বিববিদগণ সমালোচনার তাঁহার বশঃ বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। ফ্রান্সের যুবকগণ দেখিয়াছিল ভার্গীর অধিবাসী ভলটেয়ার রসোর মৃত্যুর একমাস পূর্বে বিপুল ঐশ্বর্যের মধ্যে পরলোকে গমন করিয়াছিলেন, কিন্তু বহু দুঃখকষ্টের মধ্যেও ঐশ্বর্য মত হইতে বিচ্যুত না হইয়া রসো মৃত্যু পর্যন্ত সাধারণের একজন থাকিয়াই চলিয়া গিয়াছেন। ভাবী ফরাসী বিপ্লবের নায়কগণ—বাহারা পরে পরস্পরের বিজ্ঞানসাধন করিয়াছিলেন—বার্ণেস্, ডাণ্টন, কার্ণট, বিলড্, ভ্যারেন্, কুত্জন, ম্যানন রোলাণ্ড—সকলেই মিলিত হইয়া

রসোর প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। রসোর Discourse on Inequalityর ব্যাখ্যা করিয়া Brissot কায়াবৎ ভোগ করিয়াছিলেন। Robespierre রাজনৈতিক জীবনে প্রবেশ করিবার পূর্বে রসোর মত অনুসরণ করিবেন বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, এবং ১৭৯৪ সালে যখন তিনি অপ্রতিদ্বন্দ্বী ক্ষমতালভ করিয়াছিলেন, তখন এই যে তারিখের এসিদ্ধ বক্তৃতায় তিনি রসোর প্রতি Encyclopedistগণের শত্রুতার প্রতিশোধ গ্রহণ করিয়াছিলেন। বিপ্লবের পক্ষ হইতে তিনি রসোর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়া তাহাকে বিপ্লবের অগ্রদূত এবং মানব জাতির শিক্ষাগুরু বলিয়া অভিনন্দিত করিয়াছিলেন। কৃতজ্ঞ বৈদ্যবিকরণ বিপুল সম্মানের সহিত তাঁহার দেহ নির্জন Peupliers দ্বীপ হইতে আনিয়া প্যারিশের Pantheonএ সমাহিত করিয়াছিল। Constituent Assembly গৃহে তাঁহার মর্গের মূর্ত্তি ফ্রান্সলিন ও ওয়াসিংটনের মূর্ত্তির সম্মুখে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

( ক্রমশঃ )

## রাশি ফল

### জ্যোতি বাচস্পতি

#### মিথুন রাশি

আপনার জন্মরাশি যদি মিথুন হয়, অর্থাৎ চল্লিশে সময় আকাশে মিথুন নক্ষত্রপুঞ্জ ছিলেন, সেই সময় যদি আপনার জন্ম হ'য়ে থাকে, তাহলে এই রকম ফল হবে।

#### প্রকৃতি

আপনি ইঞ্জিতজ্ঞ ও মেধাবী। যে কোন বিষয় চট্ করে বোঝবার ও শেখবার শক্তি আপনার মধ্যে আছে। কিন্তু আপনার মধ্যে বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা বতটা আছে, গভীরতা ঠিক ততটা নেই। কাজেই বহুতর বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করলেও সে জ্ঞান কতকটা ভাসা ভাসা ধরণের হবে।

শিল্প, বিজ্ঞান ও সাহিত্যের দিকে আপনার একটা সহজ আকর্ষণ থাকবে এবং বহুবিধ জ্ঞানবার ও শেখবার একটা প্রবল আকাঙ্ক্ষা আপনার মধ্যে লক্ষিত হবে। আপনার প্রকৃতির বিকাশ হবে ছদ্মের মধ্য দিয়ে ততটা নয়, বতটা বুদ্ধির মধ্য দিয়ে।

অনেক কিছু জানার ইচ্ছা আছে ব'লে, আপনার মধ্যে কম-বেশী অহিরতা ও চাকলা লক্ষিত হবে এবং ঠিক একই বিষয় নিয়ে লেগে থাকা আপনার পোষাবে না। কাজেই লোকে আপনাকে একটু অব্যবস্থিত-চিন্তিত ভাবে পাবে।

প্রত্যেক ব্যাপারে বাইরের খুঁটিনাটি আপনি বতটা লক্ষ্য করবেন, তার ভিতরকার তথ্যের দিকে আপনার ততটা লক্ষ্য থাকবে না।

আপনি যদি শিল্পী বা সাহিত্যিক হন, তাহ'লে আপনার রচনা বা শিল্প মনোজ্ঞ হলেও, তার মধ্যে খুব বেশী গভীরতা পাওয়া যাবে না।

আপনি পরিবর্তনপ্রিয়। একই জায়গায় একই ভাবে বেশীদিন থাকা, অথবা দীর্ঘদিন ধরে একই কাজে আত্মনিয়োগ করা আপনার প্রকৃতির বিরোধী; কি লেখাপড়ার ব্যাপারে, কি বিষয়কর্মে, কি পারিবারিক বা সামাজিক ব্যাপারে সর্বত্রই আপনি চাইবেন পরিবর্তন। একই সঙ্গে একাধিক ব্যাপার নিয়ে থাকতে না পারলে, আপনার মন যেন সন্তোষ পায় না এবং আপনার এ শক্তিও আছে যাতে আপনি মনকে চট্ করে এক বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে চালনা করতে পারেন।

আপনার এই প্রকৃতির জন্ত আপনার মধ্যে বহুমুখীনতা দেখা যেতে পারে, কিন্তু এই জন্তই অনেক সময় আপনার মধ্যে অধ্যবসায়ের অভাব ও অধীরতা দেখা যাবে, যাতে ক'রে কোন ব্যাপার সম্বন্ধে সর্বাঙ্গীন জ্ঞান লাভ করা আপনার পক্ষে সম্ভব হবে না।

আপনি সাধারণতঃ ঘোরাকেরা করতে ভালবাসেন এবং আপনার একাধিক স্বতন্ত্র বাসস্থান একাধিক স্বতন্ত্র পারিবারিক বন্ধন থাকা খুবই সম্ভব এবং সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ভাবে একাধিক কাজে আত্মনিয়োগ করাও আপনার পক্ষে অসম্ভব নয়।

আপনি সাধারণতঃ আনন্দপ্রিয় হবেন, সেইজন্য আপনার সামাজিক ব্যবহার প্রায়ই মধুর হবে এবং বিবাদ বা বিতর্ক উপস্থিত হ'লে হয় সে হান ত্যাগ করবেন, না হয় বুদ্ধি কোণেলের দ্বারা বিসম্বাদের কারণ হু

করার চেষ্টা করবেন। প্রত্যক্ষভাবে বিরোধ করা আপনার প্রকৃতির বিরোধী।

আপনার মধ্যে সমালোচনা ও বিশ্লেষণ করার শক্তি যথেষ্ট আছে এবং তর্ক বিতর্কেও আপনার কম বেশী গঠিত দেখা যাবে। আপনি অবিকাংশ ব্যাপারেই হুক্তিতর্কের সাহায্যে বোঝবার চেষ্টা করবেন এবং যা হুক্তিতর্কের বিষয় নয়; যা প্রত্যক্ষ অনুভূতির উপর নির্ভর করে তাকেও হুক্তিতর্কের গভীর মধ্যে নিয়ে আসতে চাইবেন।

পরের প্রশংসার উপর আপনার একটা লোভ আছে এবং অশুচর-সহচরের স্রীতির চেয়ে তাদের প্রশংসা অর্জন করাই আপনার কাম্য হবে বেশী। অনেকক্ষেত্রে অশুচর সহচরের মনোভাব হিসেবে আপনার নিজের আচরণ নিয়ন্ত্রিত করবেন। সেই জন্য সঙ্গ নির্বাচনে আপনার যথেষ্ট সতর্ক থাকা উচিত। সংসদে পড়লে অনেক সময় যেমন আপনি আপনার বাসনা সংঘত করতে পারবেন; অসং সংসর্গে পড়লে তেমনি আপনার নীতি জ্ঞানের বিরুদ্ধে কাজ করতেও আটকাবে না।

আপনার মধ্যে যৌন আকর্ষণ প্রবল হওয়াই সম্ভব। তবে তাকে যদি উচ্ছ'পথে চালনা করতে পারেন, তাহ'লে আপনার বিশেষ আধ্যাত্মিক উন্নতি হ'তে পারে। সাধারণতঃ কিন্তু তা আপনাকে যৌন ব্যাপারে প্রায়ই একনিষ্ঠ থাকতে দেবে না।

### অর্থ-ভাগ্য

আর্থিক ব্যাপারে আপনার অনেক উত্থান পতন ঘটবে। কোঞ্জিতে যদি বিশেষ ভাল যোগ না থাকে তাহ'লে আর্থিক ব্যাপারে একটা অনিশ্চয়তার ভাব প্রায়ই লক্ষিত হবে। ঐর্ষ্য ও দারিদ্র্য দুইই আপনাকে ভোগ করতে হবে এবং অনেক সময় আপনার নিজের ইচ্ছাতেই ঐর্ষ্য থাকা সত্ত্বেও দারিদ্র্য বরণ করতে পারেন। নিজের বুদ্ধি-কৌশলে আপনি অর্থ উপার্জন করতে পারবেন, কিন্তু অর্থ আপনি যতই উপার্জন করুন, অর্থ সম্বন্ধে কখনই ঠিক নিশ্চিত হ'তে পারবেন না। আপনার পারিবারিক ব্যাপারে এবং স্ত্রী-পুত্র বা মাতার জন্য অর্থনাশ বা সম্পত্তিহানি হ'তে পারে। অর্থ উপার্জনের ব্যাপারে অনেক সময় আপনাকে কৌশল বা কূটবুদ্ধির আশ্রয় নিতে হবে।

### কর্ম-জীবন

কর্ম-জীবনে আপনার বিচিত্র অভিজ্ঞতা হবে। কর্মের ব্যাপারে অনেক সময় ওঠাপড়া বা পরিবর্তন চলতে পারে। আপনার উচ্চাভিলাষ নেই তা নয়, কিন্তু সে উচ্চাভিলাষ অনেক সময় ঠিক নির্দিষ্ট পথে চলতে পারবে না। আপনার নিজের মানসিক অবস্থার জন্যই হোক, অথবা নৈহিক অবস্থার জন্যই হোক, আপনার কর্ম-বিপর্যয় ঘটতে পারে। তা ছাড়া কর্মস্থানে আপনার অনেক শত্রুও থাকবে। আপনার সহকর্মী এবং অধীনস্থ ব্যক্তিদের দ্বারা অনেক সময় প্রকট শত্রুতা হবে এবং আপনার শত্রুরা আপনার ব্যক্তিগত বা পারিবারিক জীবন নিয়ে বিখ্যা কুৎসা বা অপবাদ রটনা করতে পারে, যাতে করে

আপনার কর্মস্থলে কর্ম-বিপর্যয় এবং সমাজে সন্ত্রাসহানি হ'তে পারে। আপনার মধ্যে নানা রকম কর্মের যোগ্যতা আছে। আইনজ্ঞ চিকিৎসক, লেখক, সাহিত্যিক, শিল্পী, বক্তা সাংবাদিক প্রভৃতির কাজ আপনি যেমন যোগ্যতার সঙ্গে করতে পারেন, তেমনি দালালী দৌত্য কার্য, কেরাণীর কাজ, কারিগরি, ইঞ্জিনিয়ারিং প্রভৃতি কাজের যোগ্যতাও আপনার মধ্যে আছে। মোট কথা যে সকল কাজে হাতের কৌশল ও নৈপুণ্য অথবা মস্তিষ্ক চালনা দরকার সে সব কাজে আপনার বিশেষ যোগ্যতা প্রকাশ পাবে। আপনার প্রধান সমস্যা হবে আপনার মন স্থির করা নিয়ে। আপনি মন স্থির ক'রে যদি এর যে কোনটাতে আত্মনিয়োগ করতে পারেন তাহ'লে শিক্ষা ও আবেষ্টনের অশুপাতে আপনার যথেষ্ট প্রতিষ্ঠা অবশ্যস্বাভাবী।

### পারিবারিক

যদিও আপনার অনেক আত্মীয় কুটুম্ব থাকতে পারে, তাহ'লেও তাঁদের সঙ্গে ঠিক স্রীতির বন্ধন থাকা সম্ভব হবে না। অনেকক্ষেত্রেই তাঁদের সঙ্গে সখ্য মৌখিক শিষ্টাচারের মধ্যেই আবদ্ধ থাকবে।

পারিবারিক ব্যাপারে আপনি বিশেষ ভাগ্যশালী হবেন না। অনেক সময় ইচ্ছা করেই হোক বা বাধ্য হ'য়েই হোক, আপনাকে পরিবার হ'তে বিচ্ছিন্ন হ'য়ে থাকতে হবে। আপনার পরিবার মধ্যে কোন শত্রু রহিত থাকতে পারে। পরিবারে অথবা গৃহস্থালির ব্যাপারে কোন রকম বৈচিত্র্য বা অসাধারণত্ব থাকার অসম্ভব নয়। পারিবারিক আবেষ্টন আপনার উন্নতি বা সাফল্যে বাধা সৃষ্টি করতে পারে। কিন্তু আপনি আপনার সম্ভাবনের উপর খুব স্নেহশীল হবেন এবং তাঁদের উন্নতির জন্য ভাগ্য স্বীকার করতেও পরামুখ হবেন না। সম্ভাবনের মধ্যে কেউ কেউ বিশেষ উন্নতিশীল হবেন।

স্নেহ স্রীতির ব্যাপারে আপনার মধ্যে দৃঢ় নিষ্ঠা থাকা কঠিন হবে। আপনি সে সম্বন্ধে হয় একেবারে উদাসীন হ'য়ে উঠবেন, না হয় ঘন ঘন পরিবর্তন কামনা করবেন। মোটকথা স্নেহ স্রীতির ব্যাপারে আপনাকে কম-বেশী দুঃখ ভোগ করতে হবে।

### বিবাহ

বিবাহ ও দাম্পত্য জীবন সম্বন্ধে আপনার বিচিত্র অভিজ্ঞতা হ'বে বিবাহে বাধাবিঘ্ন বা বিলম্ব হ'তে পারে। বিবাহের পর স্ত্রীর (অথবা স্বামীর) সঙ্গে আপনার সখ্য একেবারে উদাসীন হ'য়ে উঠতে পারে। মোট কথা আপনার এই রাশি স্থিরতর দাম্পত্য জীবনের অনুকূল নয়। আপনার স্ত্রীর (অথবা স্বামীর) মতামতের সঙ্গে অনেক সময় আপনি নিজেকে খাপ খাওয়াতে পারবেন না এবং তা নিয়ে কম বেশি বিটনিট বা অশান্তিও চলতে পারে। যদি আপনার স্ত্রীর (অথবা স্বামীর) সঙ্গে মধ্যে মধ্যে বিচ্ছিন্ন হ'য়ে থাকতে পারেন, তাহ'লেই দাম্পত্য জীবনে কিছু শান্তি পাবেন, নতুবা অশান্তি কম-বেশী হবেই। দীর্ঘ সময়-মাস আবার, কার্তিক, পৌষ অথবা কাশ্বন, কিবা দীর্ঘ সময়জি

কৃষ্ণপক্ষের প্রতিপদ বা শুক্লপক্ষের অষ্টমী। এরকম কারো সঙ্গে বিবাহ হ'লে আপনাদের দাম্পত্য জীবনের অশান্তি অনেক কমে পারে।

### বন্ধুত্ব

আপনার অনুচর-পরিচরের সংখ্যা বহু হবে এবং কোন বন্ধুর সঙ্গে আপনার পতীর মেহের বন্ধন থাকবে। সহকর্মীদের মধ্যেও আপনার দু'চারজন বিশ্বস্ত বন্ধু থাকবে কিন্তু বন্ধুদের মধ্যে কেউ কেউ হঠাৎ আপনার বোরতর শত্রু হ'লে ঝাঁড়াবে এবং মানারকমে আপনাকে বিব্রত ও অপদহ করবার চেষ্টা করবে। এই ক্ষত্র বন্ধুত্বের ব্যাপারে আপনি যেমন আনন্দ পাবেন তেমনি দুঃখ ও মনস্তাপও ভোগ করবেন। আপনার প্রগাঢ় বন্ধুত্ব হওয়া সম্ভব তাঁদের সঙ্গে যাঁদের জন্ম মাস আশ্বাঢ়, কার্তিক, অথবা কান্তন এবং বাঁদের জন্মতিথি কৃষ্ণপক্ষের প্রতিপদ কিংবা শুক্লপক্ষের অষ্টমী।

### স্বাস্থ্য

স্বাস্থ্যের ব্যাপারে আপনার একটা উদাসীনতা থাকা সম্ভব। অনেক সময় পীড়ার সূত্রপাতে আপনি তা অগ্রাহ্য করে চলার দরপ পীড়া গুরুতর হ'তে পারে, সে বিষয়ে সতর্ক থাকা উচিত। আপনার চর্মরোগ, রক্ত-সংক্রান্ত পীড়া ও স্নায়বিক ব্যাধির প্রবণতা আছে। অতিরিক্ত উত্তেজনা অথবা মানসিক পরিভ্রমের ক্ষত্র স্নায়ুবেকল্য বা মস্তিষ্কের পীড়া হ'তে পারে। সে সম্বন্ধেও সতর্কতা আবশ্যিক। নিজের অববেচনা; অবহেলা ও কুচিকিৎসা আপনার স্বাস্থ্যহানির কারণ হ'তে পারে।

### অশ্রান্ত ব্যাপার

আপনার জন্মণের অনেক সুযোগ উপস্থিত হবে এবং অনেক সময় ধর্মোপলক্ষে তীর্থভ্রমণও হ'তে পারে। তা ছাড়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভ্রমণ বা স্থান

পরিবর্তন প্রায়ই হবে। আপনার দূরদেশে যাত্রাও হ'তে পারে, এমন কি দূর প্রবাসে মধ্যে মধ্যে দীর্ঘকাল বাসও করতে পারেন। বিশেষ বা ভ্রমণের সময় অনেক অসাধারণ বা বিচিত্র ঘটনা ঘটতে পারে, যার কোনটা শ্রীতিকর কোনটা বা অশ্রীতিকর।

### স্মরণীয় ঘটনা

আপনার ১২, ২৪, ৩৬, ৪৮ এই সকল বর্ষে আপনার নিজের অথবা পরিবার মধ্যে কারো কোন দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। ৩, ৬, ১৫, ১৮, ২৭, ৩০, ৩৯, ৪২ এই সকল বর্ষগুলিতে আনন্দজনক কোন অভিজ্ঞতা হ'তে পারে।

### বর্ণ

আপনার শ্রীতিপ্রদ ও সৌভাগ্যবর্ধক বর্ণ হচ্ছে পাঁচ সবুজ এবং সবুজ রঙের সব রকম প্রকারভেদ। ছাই রঙ, অথবা স্লেট রঙও আপনার উপযোগী।

### রক্ত

আপনার ধারণের উপযোগী রক্ত পান্না, সবুজ Asct হরিৎকেন্দ্র বৈজুর্ঘোণ (Oat's eye)।

যে সকল খ্যাতনামা ব্যক্তি এই রাশিতে জন্মেছেন তাঁদের জন কয়েকের নাম—শ্রীশঙ্করাচার্য, এনি বোসান্ত, কবি বার্লিং, কবি অক্সর বড়াল, প্রসিদ্ধ গায়ক লালচাঁদ বড়াল, মসি'য়ে লাকারয়েত, ডাক্তার মহেন্দ্র লাল সরকার, ডাক্তার বামনদাস মুখার্জি, জাণ্টিন্স রমেশচন্দ্র মিত্র, মহারাজা জ্যোতির্জ্যোত্সোহন ঠাকুর, বামী শিবানন্দ, কালীপ্রসন্ন কাব্য বিশারদ প্রভৃতি।

## হরিদ্বারে কুম্ভমেলা

### ব্রহ্মচারী রাজকৃষ্ণ

ভারতের তথা সমগ্র বিশ্বের সর্ববৃহৎ ধার্মিক মেলা—কুম্ভমেলা এইবার হরিদ্বারে বিশেষ আকর্ষণকভাবে অনুষ্ঠিত হইয়া গেল। স্বাধীন ভারতে এইটাই ইহার প্রথম আবিবেশন। কুম্ভমেলা ভারতের জাতীয় মহামেলা। লক্ষ লক্ষ মরনারী প্রাণের আবেগে সমবেত হয়—এই মহামেলা উপলক্ষে ভারতের চারিটি প্রান্তে প্রয়াগ, হরিদ্বার, উজ্জয়িনী এবং নাসিকে। কে জানে কোন সূত্র অতীতের বন্ধ বিদীর্ণ করিয়া এই মহান প্রেরণা ও উদ্দীপনাময়ী শুভ তিথির আবির্ভাবে আসমুদ্র-হিমালয়বাসী হিন্দু মরনারী প্রাণে এই প্রবল ধর্মোন্মাদনার স্রষ্টি হইয়াছিল। ইতিহাসও তাহার পরিচয় দিতে অশারপ।

কুম্ভমেলার উৎপত্তি সম্পর্কে পুরাণোক্ত ঘটনার পাই—কীর সন্ত্র মধনে অন্ততকৃত কুম্ভে বর্ষভরি আবির্ভূত হইয়া দেবরাজ ইন্ড্রের দিকট

অনুতকৃত সমর্পণ করার দেবায়ের সংগ্রাম বাধে। দেবরাজ ইন্ড্র তদীয় পুত্র জয়ন্তকে সেই অন্তত কুম্ভ প্রদান করিলে—জয়ন্ত তাহা মর্ডের চারিটি স্থানে একদিন করিয়া লুকাইয়া রাখেন। দেবতাগণের একদিনে মানুষের ঘাণ বৎসর, তাই প্রতি বার বৎসরে উক্ত চারিটি স্থানে অন্তত কুম্ভযোগ উপলক্ষে মহামেলার আবিবেশন হইয়া আসিতেছে।

এই কুম্ভমেলা উপলক্ষে বিশেষ করিয়া হরিদ্বার এবং প্রয়াগে সহস্র সহস্র সাধু সন্ন্যাসীর সমাগম হয়। এইবারও গিরি-বন-কান্তার অতিক্রম করিয়া হিমালয়ের তুষারমণ্ডিত শৃঙ্গরাজি উন্নতন করিয়া দূর দূরান্তর হইতে সন্ন্যাসীগণ আসিয়াছিলেন দলে দলে—এই মহামেলার সম্মিলিত হইতে। কী গভীর উৎকর্ষ আবেগ প্রাণে লইয়া—এই সাধু সমাজ মেলার সমাপ্ত হয়—তাহা বিধি না দেখিয়াছেন—তাহার কল্পনাভীত।

উত্তরাধিকার পথের দুর্গমতা, শৈত্যের প্রচণ্ডতা উপেক্ষা করিয়া দক্ষিণাংশ হইতে সম্রাসীর দল আসেন এই মহাপুণ্য তিথিতে ভূবার-শীতল গম্মাধারার অবগাহন করিতে। স্নানের যে কী উদ্দেশ্য আকাঙ্ক্ষা

পূর্বে সম্রাসীন হইয়া অথবা শিবিকারোহণে ভাব গমগমকর্মে বেদমন্ত্র ধনিত করিতে করিতে স্নানার্থে যুগযুগান্তরের আধ্যাত্মিক বিকৃতি-মত্তিত ব্রহ্মকুণ্ড অতিমুখে বাইতেছিলেন—যিনি সে দৃশ্য দর্শন না



একদল স্নানার্থী সম্রাসীর ব্রহ্মকুণ্ডে গমন



ভারত সেবাশ্রমসংঘে কেন্দ্রীয় সরকারের প্রমমন্ত্রী শ্রীজগদীশবদরাম কটো—ব্রহ্মচারী যুত্মজ্ঞ

তাহা প্রত্যাক না করিলে জলরসন করা অসম্ভব। স্নানান্তিমের দৃশ্যও বড় মধুর ও ভাবাবেগপূর্ণ। জটাজুটশোভিত, ভস্মবিষ্মিত সম্রাসীগণ বখন সম্ভবতভাবে “হর হর মহাদেব” ধ্যান করিতে করিতে হস্তী-অব-

বুদ্ধ-বুদ্ধা আসেন—সারা জনমের পাপ-তাপ ক্রান্তি-কালিমা বিসর্জন দিয়া নির্মল নিষ্পাপ নিকল হইতে; জীবনতরঙ্গীর হারিষের পরিমাপে অঙ্গস—মধ্যম বরদের সরসারী আসেন, অদম্য তলতি পথের পাণ্ডুর সঞ্চর

করিয়াছেন—তাহাকে কি ভাবে বুঝাইব—যে সেই দৃশ্য কত মাধুর্য-ময় বা ভাবপ্রদ। সর্ব্বদে ভস্ম অবলোপিত হইয়াছে,—শিরোগরি কেশদাম অযত্নে জটীর আকার ধারণ করিয়াছে। সান্নাত্ত পরিধের-টুকুও বিলাস-সৌধীনতার আশঙ্কায় বাঁহাদের অঙ্গে স্থানপায় নাই, এমনতর সহস্র সহস্র সর্ব্বত্যাগী সম্রাসী চহিরাছেন সাময়্যে আকাশ-বাতাস মুখরিত করিয়া স্নানান্তিলাঘে—এ দৃশ্য তো বিমুগ্ধ হইবার নহে। হে পাশ্চাত্য শিক্ষাগরী ভারতের নব্যসমাজ, একবার প্রাকালুচিত্তে দর্শন করতো কুন্তলেনার ভাবোন্মেষিত সম্রাসীসমাজের স্নানান্তিমান,—বুঝিতে পারিবে ভোগোন্মুখ পাশ্চাত্য এবং তপসৈক-সখল প্রাচ্যের পার্থক্য কোথায়!

সাধুদর্শন, সংপ্রসঙ্গ এবং মহাপুণ্যিত এই শুভ লগ্নে স্নানান্তিলাঘে লক্ষ লক্ষ গৃহী নরনারীরও সমাগম হয় এই কুন্তলেনা উপলক্ষে। সহস্র সহস্র মাইল দূর দূরান্তর, এমন কি হৃদ্র আফ্রিকা ব্রহ্মদেশ হইতে হিন্দুগণ আসিয়াছিলেন—এই সাধুদর্শন তথা সম্ভ্রপাতক সংহন্ত্রী জাহ্নবীর পুত পবিত্র বারিরাশিতে সাংসারিক আলামালা মুইয়া মুছিয়া নিঃশেষ করিয়া দিতে। আগামী মেলার আগমনের পূর্বেই বীর জীবন-দীপ নির্ব্বাপনের আনন্দ করিয়া যেন সকলেই সমবেত হয়—এই মহাপুণ্যিত উৎসবের মাধুর্যের আবাদ করিতে। তাই অঙ্গীতিপর

করিতে। আবার কেহ বা আসেন যুগযুগান্তরের আধ্যাত্মিক শক্তি-পূত এই উৎসবের আনন্দ উপভোগ করিতে।

গৃহীর সহিত সম্মানীয় মহামিলনের মহাতিথি এই কুস্তমেল। প্রাচীন ভারতে সর্বত্রই সাধুসমাজের সহিত গৃহীকুলের সম্বন্ধ ছিল এক অচ্ছেদ্যবন্ধে গাঁথা। কিন্তু কালক্রমে সে আদর্শ পরিত্যক্ত হইয়াছিল। তাই আধুনিক ভারতে গৃহী তথা সাধুসমাজের এই ছরবছা। আচার্য শংকর এই কুস্তমেলার সংস্কার সাধন করিয়া সম্মানী-সমাজের সহিত গৃহস্থ-সমাজের এক সংযোগ স্থাপন করিয়া ভারতের সম্মানী-সমাজকে আবার সমাজ সেবার উদ্বুদ্ধ করিয়াছিলেন। আচার্যশংকর গিরি, সাগর, পর্বত, বন, অরণ্য, পুরী প্রভৃতি দশনারী সম্মানী সম্প্রদায়ের স্রষ্টা করিয়া

এক একটি সম্প্রদায়ের উপর জাতিগঠন, ধর্মপ্রচার প্রভৃতির দায়িত্ব অর্পণ করিয়াছিলেন। পার্শ্বত্যা প্রদেশে একদল সম্মানী থাকিয়া ধর্মপ্রচার করিবে—তাহাদের নাম—গিরি অথবা পর্বত সম্প্রদায়। সমুদ্রের উপকূলবর্তী জনপদে অবস্থান করিয়া একদল সম্মানী জাতি সংগঠন, সমাজ সংস্কার ইত্যাদি কাজে আত্মনিয়োগ করিবে—তা হা রা হ ই বেন সাগর সম্প্রদায়ভুক্ত। এইরূপে ন গ রে থা কি বেন—পুরী সম্প্রদায়, অরণ্য-বনে থাকিবেন বন এবং অরণ্য সম্প্রদায়।

পর্যায় ভারতে বিদেশী তথা বিপ্লবীর শাসনকালে ভারতের সম্মানী সমাজ আচার্য শংকরের অর্পিত সেই দায়িত্ব বিন্ধিত হইয়াছে। আজ ভারতের সহস্র সহস্র সম্মানী শীর দায়িত্ব ছাড়িয়া সমাজের গলগ্রহ হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

সাধুসমাজের উপর স্তম্ভ দায়িত্ব তথা কর্তব্যের কথা স্মরণ করাইয়া দেওয়ার উদ্দেশ্যেই ১৯২৭ সালে ভারত সেবাস্রম সংঘের অধীভা আচার্য দ্বারা প্রণবানন্দজী মহারাজ কুস্তমেলার সেবাকার্য্য তথা ধর্ম-প্রচারের ব্যাপক আয়োজন করেন। সেই সময় হইতে প্রতি কুস্তমেলার সঙ্গ হইতে সেবাকার্য্য এবং ধর্ম প্রচারের ব্যবস্থা হইয়া থাকে। এইবার হরিষাণ্ডেও সম্মানীগণের মধ্যে বিশেষভাবে প্রচারকার্য্য তথা বাকীদেব-সর্বপ্রকারে সহায়তাদানের ব্যবস্থা হইয়াছিল।

এই মহামেলার সঙ্গ হইতে একটি সর্বভারতীয় সাংস্কৃতিক সম্মেলনের আয়োজন করা হইয়াছিল। ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত হইতে প্রতিনিধিগণ

যোগদান করিয়াছিলেন এই সম্মেলনে। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক শ্রীযুত শংকরদাও দেও, ওরাকিং কমিটির অধক্ষক বৈঠকের সভাপতিত্ব থাকিতে না পারায় ভারতের প্রথমন্ত্রী শ্রীযুত জগজীবন রাম এবং অখিল ভারত আধ্যাত্ম সেবাসংঘের সভাপতি গোলামী গণেশদত্তজী উক্ত সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন।

সম্মেলনে বক্তৃতা এসম্বে শ্রীযুত জগজীবন রাম বলেন—“বর্তমানে ধর্ম ও লোকাচারের নামে ভারতীয় সংস্কৃতির মধ্যে বহু কুসংস্কার আসিয়া পড়িয়াছে, যাহার দ্বারা প্রাচীন সংস্কৃতির মধ্যে ছিল না। সেই কুসংস্কার রাজি অপসারিত করিয়া ভারতীয় সংস্কৃতিকে কলঙ্ক মুক্ত করিতে পারিলে তাহা পুনরায় সমস্তাসমূহ ভারত তথা সমগ্র জগতের পক্ষে বিশেষ



ভারত সেবাস্রম সংঘ কর্তৃক অনুষ্ঠিত হরিষাণ্ড সাংস্কৃতিক সম্মেলনে শ্রীজগজীবন রাম। দক্ষিণে এবং বামে উক্তর প্রদেশের আবগারী বিভাগের স্ত্রী চৌধুরী গিরিদারী লাল ও শ্রীসি-এম-নিগম—হরিষাণ্ড

কুস্তমেলার নিম্নোক্ত অকিসর

কল্যাণকর হইবে।” অশ্লীলতা ও অনাচারময়তার উল্লেখ করিয়া সভাপতি মহাশয় বলেন—“হিন্দুধর্ম যদি বিশ্বের সকলের মধ্যে একই আত্মার আভিষেক দাবী করে তবে তাহার সমাজ-জীবনে শ্লথশ্লথের উন্নত অনুন্নতের প্রভেদ আসে কেমন করিয়া। যে হিন্দু-ধর্মের শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ও হৃদয়কে কোল দিয়াছিলেন—সেই ধর্মের মধ্যে যোর অশ্লীলতা কিরূপে আসিল?”

ধর্ম ও বিজ্ঞানের মতবৈধতার কথা উল্লেখ করিয়া শ্রীযুত জগজীবন রাম বলেন—“ধর্ম ও বিজ্ঞানের মধ্যে যে বিরোধ তাহা একান্ত কাল্পনিক। আমি বিজ্ঞানের দ্বারা, কিন্তু বিজ্ঞান আমাকে নাস্তিক করে নাই। বিজ্ঞান কতকগুলি সিদ্ধান্ত গ্রহণে মানিয়া লয়—পরে প্রমাণ বা প্রমাণের দ্বারা তাহার সত্যতা নির্ণয় করে। ধর্মও সেইরূপ কতকগুলি

সত্যকে মানিয়া লইয়া এমায় বা প্রয়োগের দ্বারা তাহার সত্যতা নির্দ্ধারিত করে। ভারতীয় সংস্কৃতি বিজ্ঞানবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত। বিজ্ঞানকে উপেক্ষা করিয়া ধর্ম এবং ধর্মকে বাদ দিয়া বিজ্ঞান টিকিতে পারে না। ইহাই আমার পরিপূর্ণ বিশ্বাস।”

‘সিকিউলার স্টেট’—কথাটির তাৎপর্য ব্যাখ্যা করিয়া মন্ত্রীমহোদয় বলেন—আমাদের সরকার ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র বটে, কিন্তু সে রাষ্ট্র যদি ধর্মহীন হইত তবে আমার জ্ঞান আভিকের স্থান সেখানে হইত না। ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র বলিতে ইহাই বুঝায় যে রাষ্ট্র কোন সাম্প্রদায়িক ধর্মের প্রভাব বিবে না।”

সম্ভব সাংস্কৃতিক মিশনের নেতা শ্রীমতী অম্বোতানন্দা বসেন— জাতি গঠনের সমস্তাই আজ অগতের সমক্ষে প্রধান সমস্ত। এই



হরিদ্বারে ভারত সেবাশ্রম সংঘের সাংস্কৃতিক সম্মেলনে শ্রীমতী অম্বোতানন্দা বসেন

সমস্তার সমাধানের লক্ষ্যই ভারতের স্বাধীনতা। ভারতীয় সংস্কৃতিই একদিন বিশ্বকে শান্তির বাগী শুনাইয়া অগতের প্রকৃত কল্যাণ করিয়াছিল। সে দায়িত্ব আজ স্বাধীন ভারতের নাগরিকগণকে গ্রহণ করিতে হইবে।”

বহির্ভাৱে ভারতীয় সংস্কৃতির প্রচার, পূর্ববঙ্গের উচ্চাঙ্গের প্রতি সক্রিয় সহায়ত্ব প্রতি প্রদর্শন, বিশ্ববিদ্যালয়ে বাধ্যতামূলক ভারতীয় সংস্কৃতির প্রচারের উপযুক্ত শিক্ষা এবং অন্যান্য দাবী জানাইয়া সম্মেলনে কয়েকটি প্রস্তাব গৃহীত হয়।

সম্মেলনের সাফল্য কামনা করিয়া দ্বিহারা তাহাদের শুভেচ্ছা প্রেরণ করেন তদ্বধ্যে—ভারতীয় গণতন্ত্রের সভাপতি ডাঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ, প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু, উপপ্রধান মন্ত্রী সুধীর বসন্তদাস

প্যাটেল, পার্লামেন্টের স্পীকার শ্রী জি.ভি.মলংকার, কেন্দ্রীয় সরকারের মন্ত্রী শ্রী কে.শান্তনম, ডাঃ শ্রীমদ্রাধা মুখোপাধ্যায়, পাণ্ডাব, হুজুপ্রদেশ, জালাল প্রভৃতি প্রদেশের গভর্নর এবং প্রধানমন্ত্রীগণ, ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক শ্রীশঙ্কর রাও দেও, বোম্বাইয়ের বেঙ্গল শ্রী এস.কে.পাতিল অন্ততম।

সম্মানীয় সমাজকে সমাজ সেবার উৎসাহ করিবার উদ্দেশ্যে সম্ভব পক্ষ হইতে একটি অখিল ভারতীয় সম্মানীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন—প্রবন্ধনাথ মঠের মঠাধ্যক্ষ মণ্ডলেশ্বর শ্রীমতী মোহনানন্দী। সভাপতির অভিভাষণে শ্রীমতী বলেন—“হিন্দু শাস্ত্র ‘আত্মনোমোক্ষার্থং অগচ্ছিতায় চ’—অর্থাৎ নিজের মুক্তি এবং অগণ কল্যাণের আদর্শ সিদ্ধির জন্য নিরন্তর কর্ম করিবার জন্য আদেশ

দিয়াছেন। হুঃখের বিষয় সাধু-সমাজ আজ অগণ-কল্যাণের আদর্শ বিস্তৃত হইয়া মাতাবাদের নামে এক ভ্রান্ত আত্মকেন্দ্রিক অধ্যাত্ম সাধনায় ব্যাপৃত হইয়া পড়িয়াছেন। তাহার ভুলিয়া গিয়াছেন যে বাস, বশিষ্ঠাদি আচার্যগণ, শ্রীমদ্রাধা শ্রীকৃষ্ণ আদি অবতার পুরুষগণ লোক সংগ্রহের জন্য প্রাণ-পাতী পদিশ্রম করিয়া তিলে তিলে আত্মদান করিয়া গিয়াছেন। বর্তমান যুগেও শ্রীমানকৃষ্ণ বিবেকানন্দ, মহর্ষি দরশনন্দ, শ্রীমতী প্রমোদিনী প্রভৃতি মহাপুরুষগণ এই সমাজ সেবার আদর্শ বরণ করিয়াই নিজেদের জীবনের কর্ম পন্থা নির্দ্ধারণ করিয়াছেন।”

বর্তমান ভারতের ভাবাবস্থা পর্যালোচনা করিয়া শ্রীমতী

মতী—ব্রহ্মচারী যুক্তাজ্ঞ

বলেন—“ভারত বিভাগের সঙ্গে সঙ্গে আজ বহন লক্ষ লক্ষ আত্ম-জগিনী স্বজন তথা সহায়সম্বলহীন হইয়া নিরাশ্রয় হুঃখ বিপদের সম্মুখীন হইয়াছে,—বহন সমাজের নৈতিক অধোগতি চরমসীমায় উপনীত হইয়া ভারতের অতীত ঐতিহ্যকে কলঙ্কিত করিতে বসিয়াছে,—বহন সাধুসমাজের চিরন্তন সেবক গৃহস্থকুল দ্বারা সমস্তাঙ্গালে বিভাজিত, সেই হুঃখোপ যুদ্ধে ভারতের সাধুসমাজ কিরূপ দীর্ঘব দীর্ঘব হইয়া বেল বে আসে? এই মহা হৃদিনেও কী সম্মানীয় সমাজের মোহনিকার অফসান ঘটবে না? পরিণেবে সভাপতি মহাশয় সম্মানীয় সমাজকে ভারত সেবাশ্রম সম্ভব এবং রাসকৃষ্ণ মিশনের সমাজ-সেবার আদর্শে অনুপ্রাণিত হইতে আবেদন জানান।

মেসার এবং দিকে ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ হরিদ্বারে আসিয়া তিনি



গল্পানান, গল্পাপুঁজা, মন্দির প্রদক্ষিণ ইত্যাদি অনুষ্ঠান করিলে জন-সাধারণের মধ্যে বেশ একটা ভাবের স্রষ্টি হয়।

### অখিল ভারত সাধুসম্মেলনের প্রস্তাবাবলী

১। সাধুসন্ন্যাসী, ত্যাগী-তপস্বী মহাত্মাগণই ভারতীয় শিকা-সংস্কৃতি, ধর্ম ও সাধনার প্রকৃত ধারক ও বাহক। সমগ্র জীবনব্যাপী কঠোর তপস্কর্য্যার দ্বারা তাঁহারা ভারতের ধর্ম ও সংস্কৃতিকে জাগ্রত জীবন্ত রাখিয়া মানুষকে প্রকৃত শান্তি ও কল্যাণ দান করিয়াছেন। আজ ধর্মের প্রানি, নৈতিক অধঃপতন এবং দুর্নীতি ও অন্যায়ের প্রসারের ফলে সমগ্র দেশে যে দুঃখদৈন্ত-অশান্তি দেখা দিয়াছে; সাধুসমাজের অকুণ্ঠ সেবা ও অক্লান্ত পরিশ্রমের দ্বারাই কেবল তাহা দূরীভূত হইতে পারে। এতৎ সম্পর্কে তাঁহাদের এক মহান কর্তব্য দায়িত্ব আছে। সুতরাং অখিল ভারতীয় সাধু সম্মেলনের এই অধিবেশন মত, পঞ্চ ও সম্প্রদায় নির্বিশেষে প্রত্যেক সাধু, সন্ত, মোহান্ত, আখড়া ও মঠাধীশকে এই কর্তব্য উদ্ভাপনে অগ্রসর হইতে আবেদন জানাইতেছে।

২। সাধুসমাজের অমনোযোগ ও অনবহিত থাকার সুযোগে বিজাতীয় রাষ্ট্রকর্তৃপক্ষ ভারতীয় জনসাধারণের প্রজ্ঞার পাত্র সাধু-সমাজকে ‘অজুৎপাদক’ (unproductive) আখ্যায় আখ্যায়িত করিয়া সমাজবহিষ্ঠ গণিকা শ্রেণীভুক্ত করিয়াছে। সাধুসমাজকে সংযতভাবে ইহার প্রতিকারের উপায় উদ্ভাবন করিতে এই অখিল ভারতীয় সাধু সম্মেলন অনুরোধ জানাইতেছে এবং আগামী আদম সম্মারিতে সাধুসমাজকে উৎপাদক শ্রেণীর মধ্যে গণ্য করিতে এই সম্মেলন সরকারকে অনুরোধ করিতেছে।

ইহা ছাড়া সাধুসমাজকে উপযুক্ত শিক্ষাদীক্ষা প্রদান করিয়া সমাজ-সেবার উৎসাহ করিতে অনুরোধ করিয়া আর একটি প্রস্তাবসম্মেলনে গৃহীত হয়। সম্মেলনের সাক্ষ্য কামনা করিয়া সারদাপীঠাধীশ জগদগুরু ঐশ্বর্য্যচর্চা বাণী প্রেরণ করেন।

### এইবার মেলায় প্রায় ১২ লক্ষ নরনারীর সমাগম

মেলা স্তূরূপে এবং সাক্ষ্য সহকারে উদ্ভাপনের উদ্দেশ্যে সরকার হইতে এইবার বিশেষ পরিপাটির সহিত স্বর্কপ্রকার ব্যবস্থা করা হয়। কলেরা প্রতিবেদক ব্যবস্থার সরকার এই বৎসর বিশেষ কৃতিত্ব প্রদান করিয়াছেন।

সেবা বিভাগের কার্য্যাদি হিন্দুস্থান স্টাউট, ভারতীয় পার্স গাইড, ভারত সেবাপ্রম সজ্ঞ এবং মহাবীর দলের খেজাসেবক তথা কর্তৃপক্ষগণের দিবসাত্ম কঠোর পরিশ্রমের ফলে বেশ ভালভাবেই সম্পন্ন হইয়াছে।

মেলায় প্রধান বানের দিনের একটি মাত্র ঘটনার সমস্ত খেজাসেবক তথা যাত্রীগণের অন্তরে এক গভীর শোকের ছায়াপাত করিয়াছিল। পুলিশ কর্তৃপক্ষের দূরদর্শিতার জন্তই যে উক্ত ঘটনাটি ঘটয়াছিল—প্রত্যক্ষদর্শীর ইহাই অভিমত।

৩-শে চৈত্র, মহাবিশুব সংক্রান্তি প্রকৃত কৃত্তযোগের তিথি। ২১শে চৈত্র রাত্রি ১২টার পর হইতেই নান আরম্ভ হইয়াছে। সহস্র সহস্র নরনারী “হর হর মহাদেব”—“গঙ্গা মায়িকী জয়” ধ্বনি করিতে করিতে ব্রহ্মকুণ্ডে ঘাট অভিমুখে চলিয়াছে। কী প্রাণের আবেগ, কী গভীর উৎকর্ষী হৃদয়ের। হাজার মাইল দূর হইতে যাত্রী আসিয়াছে—এই রাত্রি নিশীথে পুণ্যধারায় একটি ডুব দিতে। পুণের প্রান্তি-রাস্তি, সাংসারিক দুঃখকষ্ট, প্রানিনিহান সব খুঁয়া মুছিয়া নিঃশেষ হইয়া বাইবে—ঐ একটিমাত্র ডুব—একবার মাত্র মস্তক নিমজ্জনের পরমুহূর্ত—এই প্রজ্ঞা বিবাস লইয়া অগণিত যাত্রীর দল চলিয়াছে ব্রহ্মকুণ্ডে। স্রবাক হইতে হয়—বানের পরে তাহাদের প্রকৃষ্টতা দেখিয়া। নির্দল নিম্পাণ চরিত্রের প্রসন্নতা কুটিরা ওঠে—সিক্তবসন ভক্তের মুখমণ্ডলে।

বেলা তখন প্রায় ৭টা। ঘাটে ভিড়ের চাপ ভ্রমণ: বাড়িয়া উঠিল, যাত্রীদের নানা প্রকারে সহায়তা দানে আমরা এবং খেজাসেবকগণ সকলে ব্যস্ত। ব্রহ্মকুণ্ডে আগমনের রাস্তার একটি দরজার পুলিশ যাত্রীদের ভিড় নিয়ন্ত্রণ করিতেছিল। অকস্মাৎ জানিনা কী কারণে সেই দরজার কিছু অংশ বন্ধ করা হইল। মাত্র ৫মিনিটের মধ্যে দরজার উভয় পার্শ্বে সাতাশতের উপযুক্ত রাস্তা না পাওয়ার ভীষণ ভিড় জমিয়া গেল। এই সময়েই জনতার পারের নীচে যাওয়া ৩২জন প্রাণ হারাইল এবং বহু যাত্রী আহত হইল।

কৃত্তমেলা দর্শনের সৌভাগ্য থাঁহার হইয়াছে, তিনি বুঝিয়াছেন যে হিন্দুধর্মের মধ্যে প্রাদেশিকতার লেশ নাই, মতবৈধতার স্থান নেই এতটুকু। একই উদ্দেশ্যে মহামিলনের পূর্ণ সুযোগ রহিয়াছে হিন্দুর তীর্থস্থানে। তাই হিন্দুর তীর্থস্থানগুলিই হিন্দু সংস্কৃতির তথা জাতির মহাপীঠস্থান এবং এই তীর্থস্থানগুলিকেই কেন্দ্র করিয়াই হিন্দুধর্ম আবার জাগ্রত হইবে।





# নিজ্ঞান মনের পরিচয়

## শ্রীশান্তীল বিশ্বাস

মানুষের মন বলতে সাধারণের কাছে শুধু সজ্ঞান (চেতন) মনের কথাই মনে হয়, কিন্তু এই সজ্ঞান মনই ত আর মানুষের সমস্ত মন নয়; মনের বিভিন্ন স্তর আছে;—সজ্ঞান, আসংজ্ঞান ও নিজ্ঞান মন—এই সব কর্তা মিলিয়ে সত্যিকারের মানুষের মন। এখন মনের শ্রেণীকৃত হুই স্তরের পরিচয় দেবার চেষ্টা করা যাক।

‘আসংজ্ঞান মন’ ঠিক সজ্ঞান মনের পরেই থাকে, যেখানে চিন্তারশি এত তৎপর হয়ে থাকে যে একটু হৃষোণ পেলেই তা সজ্ঞান মনে চলে আসতে পারে। যেমন ধরুন, ঘরে বসে পড়াশুনা করছেন আর আপনার পাশের টেবিলে রয়েছে ঘড়ি, টিকটিক শব্দে চলেছে, আপনার সজ্ঞান মনে ‘সে শব্দবোধ আসছে না কিন্তু আসবার লজ্জা সর্বদাই তৎপর; হঠাৎ ঘড়িটা বন্ধ হয়ে গেল—অর্থাৎ আপনার খেরলে এলো যে ঘড়িটা বন্ধ হয়ে গেছে। আর নিজ্ঞান মন বলতে বোঝায় যেখানকার চিন্তারশি সোজা হুই আপনার চেতনাতে আসবার চেষ্টা করেও সহজে আসতে পারে না, অথবা এলে আপনি তাঁকে চিন্তে পারেন না যে এ আপনার মনেরই কথা।

সাধারণ মানুষ মনের এই সজ্ঞান ও নিজ্ঞান স্তরের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান চেতন বা অচেতন ভাবে করেই চলে। এই হুই স্তরের মধ্যে যেদিন আর সামঞ্জস্য রাখতে পারে না তখনই হয় সে অস্বাভাবিক। তাই অনেক অস্বাভাবিকতা বা সাধারণ মানুষের মধ্যে বা পাগলের মধ্যে দেখা যায় তার কার্যকারণের সন্ধান মেলে ঐ নিজ্ঞান মনেই। এই ভাবে মনকে স্তরে স্তরে ভাগ করে নিয়ে কোনও মানসিক ঘটনার কারণ উদ্ঘাটন করার নামই মনঃসমীক্ষণ (Psycho-analysis)—যার প্রথম সৃষ্টিকর্তা ডাঃ সিগ্‌মুন্ড ফ্রয়েড।

এই নিজ্ঞান মনের গঠন সজ্ঞান মনকে সর্বদাই প্রভাবান্বিত করে বা করবার চেষ্টা করে। আমরা কখনও তা বুঝতে পারি, কখনও তা পারি না। যেমন একজনকে হঠাৎ দেশ-দেখান্তের বেড়াতে খুব ভাল লাগে। তিনি হৃষোণ পেলেই তাঁর ভ্রমণের কথা বলতে চান। তাঁকে যদি জিজ্ঞাসা করা যায় ‘ভ্রমণ’ আপনার এত ভাল লাগে কেন; তিনি পরিত্রা বলবেন যে তাঁর ওটাই খুব ভাল লাগে অর্থাৎ তিনি সচেতন যে তাঁর এই ভ্রমণের উৎস তাঁর নিজের ভেতরেই আছে—আছে তাঁর নিজ্ঞান মনে এই ভ্রমণের প্রেরণাপূর্ণ বিশেষ মানসিক গঠনকে মনস্তত্ত্বের ভাষায় ‘গুচ্ছ’ (complex) বলে। আবার আর এক ভ্রমণের ‘গুচ্ছ’ নিজ্ঞান মনে গড়ে ওঠে বা থেকে যায়, সজ্ঞান মনে যার কোনও সহজ পরিচয় থাকে না। এই সকল মানসিক জটিলতা গড়ে ওঠে মানসিক সংঘর্ষ (conflict) বলে। যেমন ধরুন আপনার কোনও ব্যক্তিবিশেষের উপরে অত্যন্ত ঘৃণা আছে। সেই ব্যক্তিটি এমন এক কাজ পেলেন যাকে আপনিও খুব ভাল বাসেন, অথচ হয়ত কিছুদিন বাসে

দেখা গেল যে আপনার ঐ কাজটার ওপরে আর প্রভা নেই। আপনি হুঁক করেছেন ঐ কাজটাকে ঘৃণা করতে। আপনাকে জিজ্ঞাসা করলে আপনি বলবেন “আমার কাছে ও কাজটা ভাল লাগে না তার কারণ এই সব দিক থেকে কাজটা খুব খারাপ ইত্যাদি”। এই রকমভাবে ভ্রমো বুদ্ধি দিয়ে ঐ কাজটার প্রতি আপনার ঘৃণার কারণ দেখাবার চেষ্টা করবেন। অথচ ঘৃণার আসল কারণ রইল আপনার নিজের কাছেও অজানা—“আপনার ঐ ঘৃণিত লোকটি যে ঐ কাজ করে।”

এই রকম মানসিক ‘জটিলতা’ আবিষ্কারের মধ্যে দিয়ে আমরা জানা মানুষের অজানা মনের গঠন জানতে পারি। এই মানসিক গঠন আবিষ্কারের কতকগুলি প্রণালী ফ্রিড-ম্যানস্‌ক্‌স্‌ আল আমাদের বলে দিয়েছে, যেমন Word Association Test, Free Association Test, Thematic apperception Test, Rorschach Test. এর মধ্যে এক “Free Association Test” ছাড়া সব করটাই সাধারণতঃ মনস্তাত্ত্বিক গবেষণাগারে বসে সহজে করা সম্ভব। Word Association Test-এর সৃষ্টিকর্তা ডাঃ ইয়ুঙ্গ (Jung) একবার নাকি এক হাসপাতালে এক চুরির ব্যাপারে আমল চোরকে বার করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

অনেক প্রকার মানসিক ব্যাধির কারণ এই নিজ্ঞান মনেই থাকে। এর একটা উদাহরণ দেওয়া যাক। এক রকম মানসিক ব্যাধি আছে যাকে বলে ফিউগ (Fugue)। এ রকম মানসিক ব্যাধিগ্রস্ত রোগীকে দেখা যায় হয়ত হঠাৎ বাড়ী থেকে উধাও হয়ে দূর ভিত্তি দেশে গিয়ে অস্ত-এক উপায়ে কিছুদিন কাটিয়ে বাড়ী ফিরে এসে আর সেই অবস্থার কথা মনে করতে পারে না। হুটো অবস্থার—হুহ ও অহুহ চিন্তাধারার মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করা আর সম্ভব হয় না। একে বলে বিসঙ্গ (Disso- ciation)। আবার এমনও অনেক সময় দেখা যায় যাকে বলে ‘দ্বৈত অস্তিত্ব’ (Double Personality)। একই মানুষ কিছুদিন একরকম অস্তিত্ব থেকে আর একরকম অস্তিত্ব অবলম্বন করলেন, অথচ একের সঙ্গে অপরের সামঞ্জস্য নেই—তারা সম্পূর্ণ পৃথক।

এ সবার নিজ্ঞান মনের অবদমিত বাসনার খেলাই একমাত্র কারণ। একটা বাস্তবিক ঘটনা দেখলে এটা পরিচয় হবে। রেভাঃ এমসেল বোর্গ নামে একজন পাদ্রি সাহেব হঠাৎ বাড়ী থেকে উধাও হয়ে গিয়ে পেনসিলভানিয়ার অন্তর্গত মরিস টাউনে এ, জে, ব্রাউন নাম নিয়ে এক দোকান খুলে বসেন; অথচ এই অবস্থার থাকবার সময়ে তাঁর পূর্বের পাদ্রি জীবনের কিছু মনে ছিল না, শুধু মনে ছিল যে তিনি অস্ত কোথাও থেকে চলে এসেছেন। তারপরে এইভাবে কয়েক সপ্তাহ কাটিয়ে হঠাৎ আবার পূর্ব জীবনের কথা মনে আসে, তিনি তারপরে বাড়ী ফিরে আসেন। কিন্তু

তখন প্ৰত্যেক জীবনের দিনগুলি কি করে কাটিয়ে ছিলেন তাও আর মনে পড়ে না তাঁর। (Psychology of Insanity—Burnard Hurt)।

রেভা: ঘোঁরি পাদ্রি হলেন তাঁর নিজস্ব মনে ব্যবসা করে বড়লোক হবার এক উগ্রবাসনা অবদমিত হয়ে ছিল, যা এত অদ্ভুতভাবেই পরিতৃপ্ত হয়েছিল। এ ধরনের মানসিক ব্যাধি খুব কমই দেখা যায়। সাধারণত: যে সব মানসিক বিকার যেমন প্যারানোইয়া, হিষ্টিরিয়া, মেনিকডিপ্রেন্সিভ সাইকোসিস, অবসেশন, কম্পালসান নিউরোসিস, এক্সক্লাইটাল নিউরোসিস ইত্যাদি খুব বেশী সংখ্যাত্তে দেখা যায়। তাদেরও সমস্ত মানসিক বৈলক্ষণ্যের কারণ পাওয়া যায় ঐ নিজস্ব মনেই। এই সব রকম মানসিক ব্যাধি নিয়ে আলোচনা এখানে স্থানান্তরে সম্ভব নয়। তাও হু' একটা মানসিক ব্যাধির লক্ষণ নিয়ে বিশ্লেষণ করে দেখা যাক। অনেক মানসিক রোগী আছে যাদের ধারণা তারা মস্ত বড়লোক, কেউ হয়ত বলবে যে সে নিজে গাঞ্জিঙ্গী, কি হুভাব বোস, কি আরও কত কি। একে মনস্তত্ত্বের ভাষায় বলে 'মেগালোম্যানিয়া'। এর কারণ দেখা যায় নিজস্ব মনে রয়েছে 'আত্মপ্রেরণ' ও বড় হবার উগ্রবাসনা—যা সকল হয়নি তাই এইভাবে বাস্তব বিকলতা করতে চায় পূরণ।

আবার এক রকম রোগী আছে যাদেরকে বলতে শোনা যায় যে তারা মাতৃগর্ভে চলে যেতে চায়, অথবা এমন ভাবে সর্বদা বসে থাকতে চায় যেমন ভাবে শিশু জন্মিষ্ট হবার আগে মাতৃগর্ভে থাকে। এর কারণ মানুষ বধন মাতৃগর্ভে থাকে তখন তার থাকে না আত্ম অনান্দ বোধ। যার ফলে সে থাকে চরম হুঁপে। তাই জন্মিষ্ট হবার সাথে সাথে পায় এক মানসিক আঘাত থাকে বলা যায় জন্মাত্মঘাত (Birth Trauma)। তখনই তার পুনরায় প্রাক্জন্ম অবস্থায় ফিরে যাবার বাসনা জন্মায় সেটা থাকে অবদমিত হয়ে নিজস্ব মনের অন্তরালে। সেই অবদমিত বাসনা পরিতৃপ্ত করতে চায় মাতৃগর্ভে ক্রম যে অবস্থায় থাকে সেই ধরনে বসে থেকে। এই ধরনের অবদমিত বাসনার পরিতৃপ্তির চেষ্টার অভিব্যক্তি হুঁ সাধারণ মানুষের মধ্যে দেখা যায় তার কুকুর কুওলি হয়ে শোবার চেষ্টাতে—তা ছাড়া কুকুর কুওলি হয়ে শুয়ে কি আর মানুষ সব চাইতে আশ্রয় পায়?

এবার সাধারণ ভুলের কথা ধরা যাক, যার কারণ থাকে ঐ নিজস্ব মনেই। যেমন একজন তাঁর সহকর্মীকে জিজ্ঞাসা করছেন "কাল অফিসে চুট না বন্ধ?" তার কারণ তাঁর নিজস্ব মনে রয়েছে কাল যেন অফিস বন্ধই থাকে। একজন ফ্রয়েডের ওপরে অত্যন্ত চটা ছিলেন তাই তিনি তাঁর বিরুদ্ধে লিখতে গিয়ে 'Freud'এর বানান 'Fraud' লিখেছিলেন ভুলে। এই কারণেই অনেক সময়ে অনেককে প্রশ্ন করতে দেখা যায় Leading question এ "তুমি আপনি খাবেন না ত?"

এই নিজস্ব মনের প্রভাব যে কত বেশী আমাদের জীবনে তা মনোবিজ্ঞানীর চোখে দেখলে পরিষ্কার হয়ে ওঠে। যেমন ধরা যাক—হিন্দুর ছেলে সন্ত বড় সাহেব হয়েও অনেক কুখ্যাত খেয়েছেন এমন লোককেও শোনা গেছে বিবিধ গোমাল খুব বড়াই করে খেতে গিলে

আর পারেননি অথবা খেতে পেরেও অস্থির হয়েছেন—অবশ্য শুধু মানসিক কারণে। তারপর তাঁর মুখে শোনা গেছে "এই মাংসটা অল্প কিছুক্ষণ খেতে আপত্তি নেই; আপত্তি শুধু অস্বাস্থ্যকর বলেই," অথচ যে কারণে সত্যিকারের গোমাল অস্বাস্থ্যকর সে কারণ আরও অনেক প্রকার মাংসেই ত বর্তমান; সে সব ত অনেকেরই খেতে পারেন অন্নান বদনে। এই রকম নিজের মনের আসল দুর্বলতাকে চাক্ষুর জন্ত ভ্রমোন্মুক্তি খাড়া করার নাম 'যুক্ত্যভাস' (Rationalisation)। এই 'যুক্ত্যভাস' দিয়ে আমরা আমাদের মনের অনেক সংস্কার ও দুর্বলতার ঢিলা হুজির বাধনকে করি শক্ত এতে কোনও সন্দেহ মাত্র নেই। এমনি করে নিজেকে দিই কাকি। এই যুক্ত্যভাসের জোরে আজও বেঁচে আছে অনেক সামাজিক কুসংস্কার যাদেরকে জানি আমরা অস্তায় কিন্তু আসল কাজের সময় পারি না করতে কিছুই। মন দুর্বল হয়ে পড়ে বলেই নিয়ে আসি ভ্রমোন্মুক্তি বোঝা। একটু চিন্তা করলেই পরিষ্কার হয়ে যায় যে আমরা অনেক সময়েই হুজির চেয়ে মানসিক অবস্থা ও গঠন দ্বারা বেশী চালিত হই।

আবার এই নিজস্ব মনের অন্তর্নিহিত বর্তমান সংস্কারই করেছে সমাজ জীবনকে সম্ভব, আমাদের মনে সর্বমুহুর্তেই আসছে নানা বাসনা যাদেরকে দমন না করলে আমাদের সমাজ, সভ্যতা বলে থাকে না কিছুই। এই সভ্যতার ভাঙ্গন থেকে আমাদেরকে সর্বদা নিবৃত্ত করে আমাদের নিজস্ব মনেরই নিবেদবাগী থাকে ডাঃ ফ্রয়েড বলেছেন 'অধিশাশ্তা' (Super Ego), যা গড়ে ওঠে আমাদের মধ্যে শৈশব থেকে পিতা মাতার অমুশাসনে, অমুসরণে, একীকরণে ও পরিবারের ও পারিপার্শ্বিকের প্রভাবে ও সেই প্রভাবের বিস্তৃতিকরণে।

কিন্তু এই অধিশাশ্তার শাসনও সিরস্বপ্ন নয়? তাকে বিপর্যস্ত করে দিতে চায় প্রতি মুহুর্তে নানা ধরনের আদিম বাসনা (Primitive Instincts)—যার এসেছে আমাদের মধ্যে আদিম পিতৃপুরুষের কাছ থেকে। তাই মানুষের নিজস্ব মনের অন্তরালে চলে দ্বন্দ্ব (Conflict)। এই দ্বন্দ্ব কোন কোন সময়ে অধিশাশ্তা হয় পরাজিত, আমাদের বাসনা হয় পরিতৃপ্ত, কিন্তু অধিকাংশ সময়ে অধিশাশ্তা মানে না হয়, তাকে বজায় রাখতে হয় নিজের প্রতিপত্তি—সকল দলকারী বাসনাকে মনের আরও নিম্নতরফে নির্কাসন দিয়ে। এই বাসনা নির্কাসনের নামই মনস্তত্ত্বের ভাষায় অবদমন, (Repression)। কিন্তু এই নির্কাসিত বাসনা বন্দীদশাতেও হয়ে থাকে চিরবিজোহী—প্রতিক্রিয়াই করে চলে দ্বন্দ্ব, তাই বখনই আর পারি না আমরা ছুই শক্তির ভারসাম্য রাখতে তখনই আমরা হই—অস্বাভাবিক—এমন কি পাগল।

সাধারণত: এই সব অবদমিত বাসনা পরিতৃপ্ত হয় দিবা স্বপ্নে ও স্বপ্নে। স্বপ্নেই মানুষের নিজস্ব বাসনার পরিচয় থাকে সব চাইতে স্পষ্ট। ডাঃ ফ্রয়েড তাই স্বপ্নকে বলেছেন "মনের অচেতনে যাবার প্রথম রাজপথ"। অবশ্য এই স্বপ্নই অনেক সময় আমাদের দ্বন্দ্ব বিস্তৃত মনের দ্বিত্যকে রাখে অটুট, কিন্তু স্বপ্নেও এই বাসনার পরিতৃপ্তি একেবারে সোজা হুজি সম্ভব হয় না, কারণ সজ্ঞান মন নিবৃত্তি হলেও নিজস্ব

মনের রাজত্বের শাসক প্রেরীয়া (Censor) হয় না সম্পূর্ণ অলস, তারা বাধা দেয় বাসনাকে নগ্নরূপে এসে হানা দিতে। তাই এই বাধাকে অতিক্রম করে আসতে হয় বাসনাকে নানা প্রক্রিয়া করে—যেমন ক্ষুদ্রীকরণ, সাঙ্কেতিকতা, অবস্থান্তর, নাটন, অভিক্ষেপ ইত্যাদি। আমরা যন্ত্রের প্রকাশিতরূপকে প্রায়ই সব সময় পাই “রূপক রূপে”। তাই কোনও যন্ত্রের বিভিন্ন বিবরণ বস্তুকে ভাগ করে তাদের অনুবন্ধ নিয়ে বস্তু এসে পড়ি যন্ত্রের অন্তর্নিহিতরূপে, তখন দেখতে পাই এ শুধু বাসনারই খেলা। যন্ত্রের এই সব রকম প্রক্রিয়া নিয়ে আলোচনা করা স্থানান্তরে এখানে সম্ভব নয়, শুধু একটা উদাহরণ নিয়ে এটা বোঝাবার চেষ্টা করা যাক।

ধরুন একজন বস্তু দেখলেন যে তাঁকে বাঘে ভাড়া করেছে। এই বস্তু ফিরেবরণ করলে দেখা বাবে যে বাঘবে তাঁর পিতা বা অল্প কোনও শাসকের ভীতিই হচ্ছে এর কারণ। শাসক (authority) নিয়েছে যন্ত্রে বাঘের প্রতীক। শিশুদের বস্তু অনেকটা সোজা সরল প্রকাশিত হয়, কিন্তু বয়স্কদের বস্তু প্রায় সবসময়ই আসে জটীলাকারে।

এই নির্জান মনের খেলা আরো নানা দিক থেকে বিস্তারিত করা যেতে পারে। যেমন দেখি জনের বস্তুভাব জনতাতে (crowd) বিশেষ হয়ে যায় অনেক, সময়ে আর এক। সাধারণ জনতার বস্তুভাব লক্ষ্য করলে দেখা যায় তার অনেক বৈশিষ্ট্য—যেমন এক বিশেষ কারণ বা লক্ষ্যবস্তুকে নিয়ে গড়ে ওঠা জনতার ধাক্কা প্রবল ভাবাবেগ, আর সাথে সাথে হয়ে যায় অনেক পরিমাণে বুদ্ধিহীন। তাই জনতার মনে মন মিলিয়ে অনেক বিচক্ষণ লোকও করে কেলে দেয় অনেক দারিদ্রহীন কাণ্ড। এরকম কেন হয়? তার কারণ বিশেষণ জিন্দাবর্গ, মাকড়গাল প্রমুখ অনেকে অনেক দিয়েছেন, তার বিশদ বর্ণনা এখানে দরকার নেই। শুধু দেখা যাক নির্জান মনও এখানে কতখানি দারী। পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে আমাদের মনের অচেতনতায় রয়েছে ‘আদিম বস্তুভাব’ বা জনতার মাঝে অন্তর্ভুক্ত অসুস্থকরণে, একীকরণ ও অন্তর ভাবাবেগের প্রভাবে (Sympathetic Induction) জনতার মাঝে নিজের দারিদ্র এড়াবার সুযোগ নিয়ে হয়ে পড়ে অভিযুক্ত।

আজকে ‘মনস্তত্ত্ব’ নানা ক্ষেত্রেই এগিয়ে গিয়েছে। ‘শিল্প’ ক্ষেত্রেও এগিয়ে আসতে পিছপাও হয় নি। যদিও এই ‘শিল্প’ ক্ষেত্রে ‘মনস্তত্ত্বের’ প্রয়োগ মাত্র বিশ কি পঁচিশ বছর, তবুও এ দিয়েছে উজ্জ্বল ভবিষ্যতের

ইঙ্গিত। আজকের দিনে শিল্পক্ষেত্রে সব চাইতে বড় সমস্যা দেখা দিয়েছে ‘প্রমিত সমস্তার’ নানাদিক।—প্রমিত বিকোভ, ধর্মবট, অনুপস্থিতি, প্রমিত পরিবর্তন ইত্যাদি, এ সব কারণে ‘শিল্প-বাণিজ্য’ জগতে যে কি বিরাট ক্ষতিসাধন হচ্ছে তার একটা উদাহরণ উল্লেখ করছি তাতে পরিষ্কার বোঝা যাবে। আমেরিকাতে ফিবনার ও হান্স এ দু’জনে ১৯৩৪ সালে একটা হিসাব নিয়ে দেখেছেন একমাত্র প্রমিত পরিবর্তনের কলে এক বছরে ১০০০০,০০০ ডলার পরিমাণ অর্থের ক্ষতি হয়েছে। আরো কত ক্ষতিসাধন যে হতে পারে এই ‘প্রমিত বিকোভের’ কলে তা বুঝতে আর বেশী চিন্তার প্রয়োজন হয় না। আজকের ‘কলিত মনস্তত্ত্ব’ মনোভাব-পরিমাপক প্রয়োগের প্রয়োগ ও আরও অন্তর্ভুক্ত পদ্ধতিতে গবেষণা করে দেখেছেন এবং এখানে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ‘কলিত মনস্তত্ত্ব’ শাখাও এখানে গবেষণা করে যা পেয়েছেন তাতে দেখা যায় এই প্রমিতবিকোভের গাণ চাইতে বড় কারণের সূত্র মেলে ঐ নির্জান মনেই, প্রমিত সাধারণের মনের নির্জানে যে হীনতাভাব (Inferiority Complex) জন্মে ওঠে নানা ভাবে তার অবহেলিত ও অপমানিত হয়ে তারই কলে দেখা দেয় সংঘাত। “মাহিমা বাড়ানো” এই জেহাদ প্রায় সব ধর্মবটের কারণ বলে প্রতীয়মান হলেও মনস্তাত্ত্বিক কারণ বেশী ভাগ ক্ষেত্রে ওঠা নয়।

আবার রাজনীতি ক্ষেত্রেও এই নির্জান মনের প্রভাবকে আবিষ্কার করা কঠিন নয়। সাধারণ বুদ্ধিবাদের ওপরে অনেক সময়েই হান পার মানুষের মনের অন্তর্নিহিতে বর্তমান পুঞ্জীভূত সংস্কার (Prejudice)। এই কৌশলকে অবলম্বন করে রাজনীতি ক্ষেত্রেও অনেক কিছুই সম্ভব হচ্ছে আজও, তাই রাজনীতির সব চাইতে বড় অস্ত্র হল “প্রচার”। এই প্রচার সব চাইতে সাকল্য লাভ করে যখন সামান্য বুদ্ধির আবরণে গা ঢাকা দিয়ে চলে যেতে পারে মানুষের নির্জান মনের ভিত্তিতে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে যে নাৎসী জার্মানীতে ৯৫% জন শিক্ষিত হয়েও হিটলারকে তার নিজেদের জাণকর্তা বলে মনে করত, নাৎসীদের প্রচারকাণ্ডের কলে। এই ভাবে আমরা সর্বদিক থেকেই দেখতে পাই নির্জান মনের গুরুত্ব ও প্রভাব।

পদার্থবিজ্ঞানের যেমন ‘ইথারের’ অস্তিত্ব স্বীকার করে দিতে হয়েছে তার প্রত্যক্ষ জ্ঞান ছাড়াই তা না হলে অনেক সমস্তার হয় না সমাধান, তেমনি নির্জান মনকে স্বীকার ছাড়া বহু প্রশ্ন থাকে অসমীয়াসিত।



# শ্রীগীতগোবিন্দে পাঠভেদ

শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সাহিত্যরত্ন

শ্রীগীতগোবিন্দের মত একখানি বহুল-প্রচারিত গ্রন্থে পাঠ-ভেদ থাকা স্বাভাবিক। বিভিন্ন দেশে প্রচলিত একই গ্রন্থের ভিন্ন ভিন্ন পাঠ প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু শ্রীগীতগোবিন্দে পাঠভেদ অত্যন্ত অল্প। অথচ আটশত বৎসর পূর্বের রচিত এই গ্রন্থখানি সারা ভারতবর্ষে আজিও সমান সমাদৃত।

শ্রীগীতগোবিন্দের সঙ্গীতগুলির রূপান্তর ঘটয়াছে বলিয়া মনে হয় না। পাঠান্তর পাওয়া যায়—শ্লোকের মধ্যে, শ্লোকের সংখ্যারও নূনাধিক্য ঘটয়াছে। বঙ্গীয় সংস্করণ অপেক্ষা বোম্বাই নির্ণয়সাংগর্য্যে মুদ্রিত সংস্করণে কয়েকটি শ্লোক অধিক আছে। আবার বাঙ্গালায় প্রচলিত গ্রন্থের বাঙ্গালী টীকাকারগণও কেহ কেহ কোন কোন শ্লোক ব্যাখ্যা করেন নাই। উদাহরণস্বরূপ সর্গান্ত শ্লোকগুলির উল্লেখ করিতে পারি।

বাঙ্গালী টীকাকারগণের মধ্যে বোধ হয় ধৃতিদাস বৈষ্ণব যোগ্যোষ্ঠ। নিত্যধামগত রসিকমোহন বিত্তাভূষণ মহাশয় তৎসম্পাদিত শ্রীগীতগোবিন্দের ভূমিকায় নারায়ণ দাসের সময় নিরূপণ করিয়াছেন। “বহুবাণ ভুবন গণিতে শাক্য” ৮৫১৪ = ১৪৫৮ শকাব্দায় রমানাথ শর্মা “মনোরমা” নামে ‘কাতজ ধাতুভুক্তি’ রচনা করেন। রমানাথ ‘৫সর’ ধাতু ব্যুৎপন্ন পদ প্রয়োগ বিচারে শ্রীগীতগোবিন্দের ‘ছলয়সি বিক্রমণে বলিমন্তুতবান’ পদ উদ্ধার ও তৎপ্রসঙ্গে নারায়ণ দাসের টীকার উল্লেখ করিয়াছেন। রমানাথ শ্রীমন্ মহাপ্রভুর সম-সাময়িক। নারায়ণ দাস তাঁহার পূর্ববর্তী। নারায়ণ দাস শকাব্দার চতুর্দশ শতকে বর্তমান ছিলেন বলিয়া অনুমিত হয়। নারায়ণ দাস স্বপ্রণীত ‘সর্বোৎকৃষ্ট’ টীকায় পদ্মাবতী শব্দের ব্যাখ্যায় ধৃতিদাসের টীকা হইতে উদাহরণ উদ্ধৃত করিয়াছেন—“শৃঙ্গারিষ্যকেত্যাঃ ধৃতিদাসস্তদ সমীক্ষিতা বিধানম্”। সুতরাং শকাব্দার অষোদশ শতকে ধৃতিদাসের জীবৎকাল অনুমান করা চলে। ধৃতিদাসের টীকার নাম ‘সন্দর্ভ-দীপিকা’। প্রতি সর্গের শেষে—“ইত্যাহান চতুরানন- বিদ্যাস বৈষ্ণু শ্রীধৃতিদাস

বিরচিতায়াঃ সন্দর্ভদীপিকায়াঃ শ্রীগীতগোবিন্দ টীকায়াঃ” এইরূপ লেখা আছে। বঙ্গবর পণ্ডিত শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয় “ইত্যাহান চতুরানন”—কথা কয়েকটি হইতে অনুমান করেন ধৃতিদাস কোন রাজসভাসদ ছিলেন।

ধৃতিদাস এবং নারায়ণদাসের টীকায় সর্গান্ত শ্লোকের ব্যাখ্যা নাই। এসিয়াটিক সোসাইটির (নারায়ণ দাসের টীকাযুক্ত) পুঁথিতে সর্গান্ত শ্লোকের ব্যাখ্যা আছে, কবির পরিচয়-শ্লোকের ব্যাখ্যা নাই। রসিকমোহন বিত্তাভূষণ সংগৃহীত টীকায় এবং বাঁকুড়া জেলার ভাদুল গ্রাম-নিবাসী শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ পালিত মহাশয়ের সংগৃহীত ১৫৬৫ শকাব্দায় অঙ্কলিখিত পুঁথিতে নারায়ণদাসের টীকায় সর্গান্ত শ্লোক ও কবির পরিচয়-শ্লোক ব্যাখ্যা হয় নাই। ডক্টর শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার দে মহাশয় বলেন, সর্গান্ত শ্লোকগুলি সন্দেহজনক। কারণ মৈথিল পণ্ডিত শঙ্কর মিশ্রও স্বপ্রণীত রসমঞ্জরী টীকায় শ্লোকগুলির ব্যাখ্যা করেন নাই এবং রাণা কুন্ত রসিকপ্রিয়া টীকায় চতুর্থ সর্গের অন্ত-শ্লোকের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন—“প্রবন্ধ পৃথিবী তদ্রা প্রবন্ধ প্রীত্যে হরেঃ”।

আমার মনে হয় রাণা কুন্ত বোধ হয় একটি প্রবাদের ভিত্তিতে এইরূপ মন্তব্য করিয়াছেন। প্রবাদটি এই (সংস্কৃত ভক্তমাল)—পুরীর রাজা একখানি গীতগোবিন্দ প্রণয়ন করেন। কোন গ্রন্থ জগন্নাথ দেবের প্রিয়, পরীক্ষার জন্য জয়দেব রচিত ও রচিত গ্রন্থ দুইখানি জগন্নাথ মন্দিরে রাখিয়া ছুয়ার বন্ধ করিয়া দেন। ছুয়ার খুলিলে দেখা যায়—জয়দেবের গ্রন্থ উপরে ও রাজার গ্রন্থ নীচে রহিয়াছে। ইহাতে রাজা হুঃখিত হইলে দৈববাণী হয়—

জয়দেবকৃত গ্রন্থ হাদশ যে সর্গে।

তবকৃত বার শ্লোক থাকিবেক অগ্রে ॥

উক্তির অধীকর গজপতিরাজ পুরুষোত্তমদেবের রচিত একখানি গীতগোবিন্দের পরিচয় পাওয়া যায়—“অতিনব

গীতগোবিন্দ”। হয়তো এই গ্রন্থ লইয়াই প্রবাদের উৎপত্তি এবং রাণা কুন্তের টীকায় এই প্রবাদের ইঙ্গিত রহিয়াছে।

বঙ্গেশ্বর মহাজ্ঞানদেব ও তৎপুত্র যদু বা জলালউদ্দীনের সভাপণ্ডিত রাঢ়ের রায়মুকুট বৃহস্পতি মিশ্র একজন খ্যাতনামা পণ্ডিত। তিনি গীতগোবিন্দের টীকায় সর্গাস্ত গ্লোকের ব্যাখ্যা করিয়াছেন, কিন্তু কবির পরিচয়-গ্লোকের ব্যাখ্যা করেন নাই। শ্রীমহাপ্রভুর অনতিপরবর্তী বিখ্যাত টীকাকার পুজারী গোস্বামী সর্গাস্ত গ্লোক তথা কবির পরিচয় গ্লোকেরও ব্যাখ্যা করিয়াছেন। বৃহস্পতি মিশ্র পাঁচশত বৎসরেরও পূর্বে বর্তমান ছিলেন। পুজারী গোস্বামীর বয়স চারিশত বৎসরের বেশী নহে।

আমাদের মতে শ্রীগীতগোবিন্দের সঙ্গীত ও অপরাপর গ্লোকগুলির মত সর্গাস্ত গ্লোকগুলিও কবি জয়দেবের রচিত। জয়দেবের প্রায় সম-সময়েই ১১২৭ শকাব্দায় সত্ৰাট লক্ষণ সেনের মহাসামন্ত বহুদাসের পুত্র শ্রীধরদাসের “সঙ্কলিত সদ্ধুক্তিকর্ণামৃতে” জয়দেব রচিত একত্রিশটি গ্লোকের মধ্যে শ্রীগীতগোবিন্দের পাঁচটি গ্লোক উদ্ধৃত আছে। তন্মধ্যে—

“জয়শ্রী বিভক্তৈর্মহিত ইব মন্দারকুসুমৈঃ ॥

( সদ্ধুক্তিকর্ণামৃত ॥ ১।৫২।৪ ॥ কৃষ্ণভুজঃ ॥ )

গ্লোকটি শ্রীগীতগোবিন্দের একাদশ সর্গের অন্তিমগ্লোক। আমাদের নিশ্চয়তার আরো একটি কারণ, সর্গাস্ত গ্লোক-গুলি গুঢ়ার্থ ব্যঞ্জক। প্রতি সর্গের বিষয়বস্তুর সঙ্গে— এমন কি সর্গের নামের সঙ্গেও এই সমস্ত গ্লোকের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রহিয়াছে। উদাহরণস্বরূপ উদ্ধৃত গ্লোকটিই গ্রহণ করিতেছি। একাদশ সর্গের নাম “সানন্দ গোবিন্দ”। সর্গের বর্ণনীয় বিষয় শ্রীরাধার অভিসার। শ্রীরাধাকে কুঞ্জে অভিসার করিতে দেখিয়া গোবিন্দ আনন্দিত হইয়াছেন। উদ্ধৃত গ্লোকে কৃষ্ণভুজের বর্ণনা আছে। যে বাহুবল শ্রীরাধাকে আলিঙ্গনের জন্ত লাগান্বিত, সেই ভুজবল সাক্ষাৎ অন্তকসদৃশ কুবলরাপীড় হস্তীর যুতা-পূর্ব-বসিত রক্তবিন্দুতে মণ্ডিত হইয়াছে। অর্থাৎ এ হেন চঞ্চলভুজযুগশালী শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধাকে আলিঙ্গনের জন্ত সানন্দে প্রতীক্ষা করিতেছেন। প্রত্যেক সর্গাস্ত গ্লোকেরই এইরূপ ব্যঞ্জন রহিয়াছে। শ্রীমত্তাগবতের মধ্যেও এই জাতীয় গ্লোক পাওয়া যাইতেছে। দশম স্কন্ধের বড়বিংশ অধ্যায়ের শেষ গ্লোকটি এইরূপ—

দেবে বর্ষতি বজ্র বিপ্রবরুণা বজ্রাশ্ব পরুমানিলৈঃ

সীদৎ পালপন্ত দ্বিযাত্ম শরণং দৃষ্টাঙ্ক কম্পাৎ নয়ন।

উৎপাট্যেক করেণ শৈলমবলো লীলোচ্ছলীক্লং বধা

বিভ্রং গোষ্ঠমপাং মহেন্দ্রমদভিদু শ্রীয়াং ইল্লো গবাং ॥

সর্গের নাম সকল পুঁথিতে একরূপ নহে। বঙ্গীয় সংস্করণের প্রথম সর্গের নাম ‘সামোদ দামোদর’। বোম্বাই নির্ণয়সাগর সংস্করণেও এই নাম গ্রহীত হইয়াছে। কিন্তু বৃহস্পতি মিশ্রের টীকাসংযুক্ত পুঁথিতে এই সর্গের নাম ‘মুগ্ধমনোহর’। নারায়ণ দাসের ও বৃহস্পতি মিশ্রের টীকা সংযুক্ত পুঁথি, দুইখানিতে চতুর্থ সর্গের নাম ‘নিম্গ-মাধব’, অস্তান্ত পুঁথিতে নাম ‘নিম্গ-মধুসূদন’। বোম্বাই নির্ণয়সাগর সংস্করণে, বৃহস্পতি মিশ্র ও নারায়ণদাসের টীকা সংযুক্ত পুঁথিতে দশম সর্গের নাম চতুর ‘চতুর্ভূজ।’ অস্তান্ত পুঁথিতে নাম ‘মুগ্ধ মাধব’।

প্রচলিত বঙ্গীয় সংস্করণের সঙ্গে অনেক প্রাচীন পুঁথির গ্লোক বিভ্রাসের ঐক্য নাই। প্রচলিত সংস্করণে প্রথম সর্গে “দরবিদলিত মল্লী” গ্লোকের পর “আতোৎসঙ্গ” গ্লোক, তাহার পরে “উন্মীলন মধু গন্ধ” গ্লোক আছে। বৃহস্পতি মিশ্রের টীকাসংযুক্ত পুঁথিতে “দরবিদলিত মল্লী”র পর “উন্মীলনমধুগন্ধ” গ্লোক এবং তাহার পর “আতোৎসঙ্গ” গ্লোক আছে। এইরূপ অপর দুই একটি সর্গেও দেখিয়াছি। চতুর্থ সর্গে “গণয়তি বিহিত” গ্লোকে বৃহস্পতি মিশ্র পাঠ ধরিয়াছেন—“কলরতি বিহিত” “কন্দর্প জর সংজরাতুর” স্থলে পাঠ “সংজরাকুল” ষাটশ সর্গে “প্রত্যাহঃ পুলকাকুরেণ” স্থলে সদ্ধুক্তিকর্ণামৃতে পাঠ “উন্মীলং পুলকাকুরেণ” “তস্তাঃ পাট স্থলে সদ্ধুক্তি কর্ণামৃতে পাঠ অস্তাঃ”।

ষাটশ সর্গের প্রচলিত

ইতি মনসা নিগদন্তঃ সুরতাস্তে সা নিতান্তধিমানী।

রাধা অগাদ সাদরমিদ্‌মানন্দেন গোবিন্দম্ ॥

এই গ্লোকের পরিবর্তে বৃহস্পতি মিশ্র নীচের গ্লোকটি গ্রহণ করিয়াছেন—

অথ কাস্তং রতিকাস্তমপি মণ্ডন বাহরন।

নিজগাদ নিরাবাধা রাধা স্বাধানভর্ষক্ ॥

বৃহস্পতি মিশ্র ও নারায়ণ দাস ষাটশ সর্গের “মীলদৃষ্টি

মিলং এবং “ব্যালোল: কেশপাশ” শ্লোক ব্যাখ্যা করেন নাই।

বঙ্গীয় সংস্করণের একাদশ সর্গের “ভঙ্কর্যাস্ত্রান্তঃ” শ্লোকের পর নির্ণয়সাগর প্রকাশিত পুস্তকে এই শ্লোকটি আছে—

সানন্দং নন্দন্তুর্দিশতুমিতিপরং সংমদং মন্দমদং  
রাধামাধায় রাহোবিরমমুদুচং পীড়য়ন্ প্রীতিযোগাৎ ।  
তুর্কো তস্তা উরোজাবতন্ত বরতনোনিগতো, মাংসভূতাং  
পৃষ্ঠং নির্ভিত্ত তন্মাদ্ধিরিতি বলিত গ্রাবমালাকয়ন্ বঃ ॥  
বঙ্গীয় সংস্করণের একাদশ সর্গোক্ত “জয়শ্রীবিভূতঃ” এই শ্লোকের পর নির্ণয় সাগর পুস্তকে এই শ্লোকটি আছে—

সৌন্দর্যৈকনিধেরনজ ললনা লাবণ্য লীলা পুষো  
রাধায়া হৃদিপঙ্কলে মনসিজ ক্রীড়ক রত্নস্থলে ।  
রম্যোরোজ সরোজ খেলন রসিতাদ্যাত্মানঃ ক্যাপয়ন্  
ধ্যাতুর্মানসরাজহংস নিভতাং দেয়ায়ুকুলো মুদং ॥  
বঙ্গীয় সংস্করণের ষাটশ সর্গে কবির পরিচয়েই গ্রন্থ শেষ হইয়াছে। নির্ণয়সাগর পুস্তকে তাহার পর এই শ্লোকটি আছে—

ইথং কেলিততীর্বিদ্বত্য যমুনা কুলে সমং রাধয়া  
তদ্রোমাবলি মৌক্তিকাবলি যুগে বৈদীভ্রমং বিভ্রতি ।  
তত্রাহ্লাদি কুচপ্রয়াস ফলয়ো লিপ্সাবতো ইন্তয়ো  
ব্যাপারঃ পুরুষোত্তমস্ত দদতু স্ত্রীতাঃ মুদাঃ সম্পদম্ ॥  
বঙ্গীয় সকল সংস্করণে নীচের শ্লোকটি পাওয়া যায় না।  
কোন কোন টীকাকারও শ্লোকটির ব্যাখ্যা করেন নাই।  
স্বামপ্রাপ্য ময়ি স্বয়ম্বরপরাং কীরোদ তীরোদরে  
শঙ্কে স্তনুরি কালকুটমপিবদ্যুচো মৃড়ানী পতিঃ ।  
ইথং পূর্বকথাভিরন্ত মনসো নিক্শিপ্য বক্ষেংকলং  
রাধায়া স্তন কোরকোপরি মিল মেত্রো হরিঃ পাতুবঃ ॥  
বৃহস্পতি মিশ্রের টীকা সংযুক্ত পুঁথিতে কয়েকটি নূতন শ্লোক আছে। দুইটি শ্লোক একেবারে অস্পষ্ট। অপর শ্লোক উদ্ধার করিয়া দিলাম। “ষদ্ গান্ধর্ব কলাস্থ” শ্লোকের পরই নিম্নের শ্লোকটি রহিয়াছে।

জয়শ্রী কান্তস্ত প্রসরতর সারস্বত বত  
সুন্দরীন্দ্রে গোবর্জনচরণরেণু প্রণয়িনঃ ।  
ইয়ং মে বৈদগ্ধী স্মরতরল বালাধর সূখা  
রসস্তান্দ্র স্বাহু জয়তি জয়দেবস্ত কবিতা ॥

## ভারত-আমেরিকার কাব্য-বন্ধন

### শ্রীসন্তোষকুমার চট্টোপাধ্যায়

উনবিংশ শতাব্দীর আমেরিকার সর্বাগ্রগণ্য কবি, সাহিত্যিক ও দার্শনিকের উপর প্রাচীন ভারতীয় কৃষ্টি, সাহিত্য ও দর্শনের যে প্রভাব পড়েছিল সে কথা আজ মনে করতে কেবল যে আনন্দই হয় তা নয়, বেশ একটা গৌরবও সেই সঙ্গে মনকে ভরিয়ে তোলে। আজ ভারত স্বাধীন, কিন্তু সেকালে এদেশে ইংরেজের আধিপত্য বেশ কার্যমি হয়ে গিয়েছে। এক পরাধীন জাতির সাহিত্য-দর্শন, কলা-কৃষ্টি যে এক পশ্চিমী দেশের বাস্তবপন্থী মনের উপর কোন আঁচড় কাটতে পারে তা আমরাই সেকালে, বুঝতে পারা দূরে থাকুক, ভাবতেও পারিনি। দার্শনিক এমার্সন উপনিষদের অতীন্দ্রিয়তা উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। চিন্তাসেবী থোমস ভারতীয় ভাবধারার এক অন্তঃস্পর্শী সৌন্দর্য লক্ষ্য করেছিলেন। কবি হুইটম্যান ভারতীয় সাহিত্য-দর্শনের আদর্শ সমস্ত মন দিয়ে গ্রহণ করেছিলেন। জগতের সভ্যতার ঐ আদর্শ যে এক অমূল্য সম্পত্তি তা হুইটম্যানই প্রচার করেন সর্বপক্ষে। ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে একটা ছোট কবিতার বই প্রকাশিত হয়। এ বইয়ে থাকে মাত্র একটা

কবিতা, তার নাম “প্যাসেজ টু ইন্ডিয়া” (ভারত-যাত্রা)। যে ঘটনা সমাবেশকে অবলম্বন করে কবিতাটি লেখা হয় তা হচ্ছে এক কথায় পশ্চিমের সঙ্গে পূর্বের যোগাযোগ। ইয়ুরোপে সুরেজ খাল কাটা, আর আমেরিকার “প্রশান্ত মহাসাগর” রেলপথ স্থাপনা ঐ দুই ব্যবস্থাই পূর্ব আর পশ্চিমের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠতর করে তোলার পথ উন্মুক্ত করে দেয়। পূর্ব-পশ্চিমের মেলামেশার পৃথিবীতে যে এক বিরাট একক সভ্যতার জন্ম হ’তে পারে সে-স্বপ্ন দেখেন হুইটম্যান। ঐ মন্বর্ত্ত সভ্যতার প্রতীচ্যের বাস্তবতা আর প্রাচ্যের আত্মজ্ঞান এই দুয়ের হ’বে সম্মেলন। প্রতীচ্য ও প্রাচ্যের ঐ সম্মেলন পরমপিতার ইচ্ছামুসারেই হ’বে, আর সেই উদ্দেশ্যেই প্রতীচ্যের বিজ্ঞানী সুরেজ খাল কেটেছেন, আর যুক্তরাষ্ট্রে “প্রশান্ত মহাসাগর” রেলপথ উন্মোচন করেছেন। প্রাচ্য-প্রতীচ্যের সংযোগ, তাদের মধ্যে জাত্ববোধ ভগবানের নির্দেশ অনুযায়ী বিজ্ঞানীর প্রচেষ্টায় ঘটতে চলেছে। সে-অবস্থায় প্রতীচ্যের উপলব্ধি হওয়া প্রয়োজন যে প্রাচ্যে এবং বিশেষ করে ভারতবর্ষে, কি এক



বিশেষ কৃষ্টি, কি এক স্বয়ংসম্পূর্ণ আত্মজ্ঞানী সভ্যতার বিকাশ হয়েছে। এই কৃষ্টি-সভ্যতা ভবিষ্যৎ জগতের কৃষ্টি-সভ্যতাকে এক বিশেষ রূপে, এক বিশেষ আদর্শে গড়ে তুলতে সমর্থ। হুইটম্যান তাঁর “ভারত-যাত্রা” কবিতায় এই কথাই বলেছেন এক চরম উপলক্ষের পর। ভারতে আসার পথ আবিষ্কার হওয়ার মূল সার্থকতা হলো এমন এক পুরাতনী আদর্শকে আবিষ্কার করা, যা’র মাঝে এক নতুন যুগের বীজ আছে যুগ হ’য়ে। ভারতযাত্রার উদ্দেশ্যই হ’লো বিস্মৃত জ্ঞানের উদ্ধার। এ যাত্রার প্রতীচ্য প্রাচ্যের কোলে, যেমন ছোট ভাই বড় ভাইয়ের সমন্বয় আশ্রয় লাভ করবে।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে প্রতীচ্য প্রাচ্যের সন্ধানে নতুন নতুন সহজ পথ আবিষ্কার করে। সেই পথে প্রাচ্যে গিয়ে ভারতীয় দর্শন-সাহিত্য, শিল্পকৃষ্টির নানা অভিব্যক্তি সংগ্রহ করে এক নতুন আন্তর্জাতিক সভ্যতা-কৃষ্টির সৃষ্টি করার জন্য এক উদাত্ত আহ্বান প্রতীচ্যের দেশে দেশে ছড়িয়ে দেন আমেরিকার কবি ওয়াশিংটন হুইটম্যান। সে আহ্বানে সক্রিয় সাড়া পাওয়া যায়নি সভ্য, কিন্তু প্রতীচ্যের বুদ্ধিজীবীরা ভারত সম্বন্ধে অমুসন্ধানী ও অশ্রদ্ধাশীল হ’য়ে পড়েন। তাই বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকেই ভারতীয় কবি রবীন্দ্রনাথ ইংরেজী ভাষায় অনূদিত যে “গীতাঞ্জলী” উপহার প্রতীচ্যকে প্রদান করেন, তা’ প্রতীচ্য সাধারণই গ্রহণ করে। লণ্ডনের “ইণ্ডিয়া সোসাইটি” ১৯১২ খৃষ্টাব্দের নভেম্বর মাসের পহেলা তারিখে “গীতাঞ্জলী” নামে ৭৫০ খানা বইয়ের এক বিশেষ সংস্করণ প্রকাশিত হয়। এ বইয়ে কবির “নৈবেদ্য,” “খেয়া” আর “গীতাঞ্জলী” থেকে গৃহীত ১৮৮টি বাংলা কবিতার ইংরেজী অনুবাদ সন্নিবেশিত হয়। বইয়ের পরিচিতি লেখেন আয়র্লণ্ডের প্রসিদ্ধ কবি ইয়েটস্। আর বইয়ের গোড়াতেই কবির যে প্রতিকৃতি দেওয়া হয় তা’ আঁকেন লণ্ডন রয়েল কলেজ অফ আর্টসের অধ্যক্ষ রব্‌নল্টস্। লণ্ডনে “গীতাঞ্জলী” প্রকাশিত হওয়ার চারদিন আগে কবি আমেরিকার নিউ ইয়র্ক সহরে পৌঁচেছেন। নিউ ইয়র্ক থেকে কবি সোজা চলে যান ইলিনইন্স রাষ্ট্রের উরবানা সহরে। এ রাষ্ট্রে কবি নভেম্বর-ডিসেম্বর মাস এবং জানুয়ারীর কয়েকদিন নানা গীর্জার অতীন্দ্রিয় বিষয়ে বক্তৃতা দান করেন। চিকাগো সহর থেকে প্রকাশিত “পোয়েট্” (কবিতা) নামক এক মাসিক পত্রিকার ডিসেম্বর সংখ্যায় ইংরেজীতে অনূদিত হ’টি “গীতাঞ্জলী” কবিতা প্রকাশিত হয়। “পোয়েট্” পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন এজরা পাউণ্ড। পাশ্চাত্য দেশে কবি রবীন্দ্রনাথের কবিতা প্রথম সাময়িক পত্রে প্রকাশিত হয় “পোয়েট্”তে। ইলিনইন্স রাষ্ট্রে ভ্রমণ পূর্ব শেষ করে কবি যান চিকাগো সহরে; সেখানে বিশ্ববিদ্যালয়ে “প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতা” সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন, তারপর সহরের ইউনিটারিয়ান হলে “অন্তায়ের সমস্তা”র উপর আলোচনা পাঠ করেন। এরপর কবি যান রচেস্টার সহরে, সেখানে আন্তর্জাতিক মহাসম্মেলনের অধিবেশন হয়। এখানে আর্দ্রাণ দার্শনিক রডল্ফ হুকের সহিত কবির পরিচয় ঘটে। ১৯১৩ খৃষ্টাব্দের ৩০শে জানুয়ারী তারিখে ভারতীয় কবি “আন্তর্জাতিক বিরোধ”এর উপর এক সারগর্ভ বক্তৃতা দেন। এরপর

কবি যান বোষ্টন সহরে, সেখানে বিশ্বসমাজের সঙ্গে কবি আলাপ-আলোচনা করেন। এরপর কবির আমেরিকা ভ্রমণের এক বিশেষ অধ্যায় রচিত হলো হারভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে পর পর গোটা কয়েক বক্তৃতা দেওয়ার। পরে এসব বক্তৃতা প্রকাশিত হয় “সাধনা” নামক পুস্তকে।

কবির আমেরিকা ভ্রমণের প্রথম পর্যায় শেষ হয় হারভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা দেওয়ার পর। এরপর রবীন্দ্রনাথ দ্বিতীয় বারের জন্য আমেরিকায় যান ১৯১৬ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে। এবারে “পণ্ড লাইসিয়াব” নামক বিশিষ্ট বক্তৃতা-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হয়ে কবি আমেরিকার নানা স্থানে বক্তৃতা দেওয়ার উদ্দেশ্যে ওয়াশিংটন সহরে প্রথম পদার্পণ করলেন। প্রথম বক্তৃতা দেন আমেরিকার নারীদের এক সম্মেলনে; তাঁর বক্তৃতার বিষয়বস্তু ছিল “জাতীয়তাবাদ।” এই বক্তৃতায় তিনি ভারতে ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে নানা যুক্তির অবতারণা করেন, পাশ্চাত্য দেশগুলোর সাম্রাজ্যলিপ্সুর প্রতি কটাক্ষপাত করেন।

তারপর কবি পোর্টল্যান্ড, সানফ্রান্সিসকো, লস্ এঞ্জেলিস্ ও নিউইয়র্ক সহরে পর পর বক্তৃতা দেন। সানফ্রান্সিসকোতে কবির বক্তৃতার বিষয়বস্তু ছিল “আন্তর্জাতিক ভ্রাতৃত্ববোধ।” নিউইয়র্ক সহরের কলম্বিয়া থিয়েটার হলে তাঁর এক ছোট গল্পের অনুবাদ পাঠ করেন। এরপর ভ্রমণ তালিকা তৈরী হয় পাসাডেনা, সেন্ট লেক সিটি, চিকাগো, আইওয়া, মিলওয়াকি, লুসেভিল এবং ডেট্রয়েট সহর নিয়ে। ডেট্রয়েট সহরে “জাতীয়তাবাদ” সম্বন্ধে কবি যে আলোচনা করেন আমেরিকার পত্রিকা মহল সে আলোচনার তীব্র সমালোচনা করেন। সে সমালোচনার প্রধান বক্তব্য ছিল যে “কবি ‘মিষ্টি কথা’র অবসাদগ্রস্ত মনের বিব’ উল্লেখ করেছেন মাত্র। কবি কিন্তু এই সমালোচনার বিশেষ বিব্রত হলেন না। তাই ব্রিসল্যাণ্ডে যে বক্তৃতা দেন তা’তে আমেরিকার “স্বর্ণলোভের” প্রতি কটাক্ষপাত করেন। নিউইয়র্ক সহরের কার্ণাগি হলে কবি এসিয়াবাসীর প্রতি আমেরিকার বিদ্বেষ ও বিজ্ঞপকে শ্রোতাদের সামনে ধরে দিতে চেষ্টা করেন। ফিলাডেলফিয়ার “ব্যক্তিত্ববাদের” উপর বক্তৃতা করেন। এ ভাবে বক্তৃতা দেওয়ার তালিকার শেষ সহরের নাম এসে পড়লো, নিউইয়র্ক। তারপর ১৯১৬ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে। কবি দেশে ফিরে এলেন।

প্রায় চার বছর পর ১৯২০ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে কবি গিয়ারসনকে সঙ্গে নিয়ে আমেরিকায় যান। ইয়োরোপেই গিয়েছিলেন বেড়াবার জন্তে; পরে লণ্ডন থেকে কবি যান নিউইয়র্ক সহরে। কবির এই তৃতীয়বারের আমেরিকা ভ্রমণ! ক্রকলিন সঙ্গীত শিক্ষায়তনে কবি “প্রাচ্য-প্রতীচ্যের মিলন” সম্বন্ধে সারগর্ভ আলোচনা করেন। ফিলাডেলফিয়ার নারী বিশ্ববিদ্যালয়ে “বাংলা দার্শনিক (মিস্টিক) কবি” ও নিউইয়র্ক সহরে “কবির ধর্ম” সম্বন্ধে কবি বক্তৃতা দেন। কবি চেষ্টা করেন বিশ্বভারতীয় জন্ম ঢাকা তুলতে, কিন্তু চরম বিকলতা এসে পড়ায় তাঁর সামনে। এর পর কবি যান চিকাগো সহরে; পরে টেক্সাস্ রাষ্ট্রে বক্তৃতা দেওয়ার উদ্দেশ্যে কিছুকাল ভ্রমণ করে বেড়ান। ১৯২১ খৃষ্টাব্দের মার্চ মাসের তৃতীয় সপ্তাহে ইয়োরোপে ফিরে আসেন।



কবি চতুর্থবার আমেরিকা যাত্রা করেন ১৯২৪ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসের মাঝামাঝি সময়ে। সঙ্গে নেন এলমহাষ্ট্র সাহেবকে। এবার কবি যান দক্ষিণ আমেরিকায়। পেরু রাষ্ট্রের শতবার্ষিকী উৎসব এ'বৎসর হয়। কবি পূর্বাহ্নেই নিমন্ত্রণ পান, সেই নিমন্ত্রণ রক্ষা করবার জন্ত যান কিন্তু অসুস্থ হয়ে পড়ার জন্তে তিনি কোন বক্তৃতাও করতে পারেন না।

১৯২৬ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসের শেষে শেষি সময়ে কবি কানাডা যাত্রা করেন কলকাতা থেকে। কানাডার জাতীয় শিক্ষা পরিষদ কবিকে আমন্ত্রণ পাঠান তৃতীয় বার্ষিক আলোচনা সভায় বক্তৃতা দেবার জন্তে। কবি দু'দিন দু'টি বক্তৃতা দেন। প্রথমটি “অবসরের সার্থকতা”; আর দ্বিতীয়টি “সাহিত্যের ধর্ম”। কবি “অবসর”-এর এক অপূর্ণ দার্শনিক ব্যাখ্যা করেন।

“সাহিত্য-ধর্মের” উপর বক্তৃতাও খুবই মনোজ্ঞ হয়। এপ্রিলের মাঝামাঝি পর্যন্ত সময় কবি কানাডায় অবস্থান করেন। আরও কয়েকটি স্থানে বক্তৃতা দেন। পরে আমেরিকার হারভার্ড, কলম্বিয়া, ক্যালিফোর্নিয়া ও ডেট্রয়েট বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর নিমন্ত্রণ পেয়ে লস এঞ্জেলিস সহরে যান। ইতিমধ্যে কবির পাসপোর্ট হারিয়ে যাওয়ার এমন এক অভূত অবস্থার সৃষ্টি হয় যে কবি এবারের আমেরিকা ভ্রমণ বন্ধ করে দিয়ে দেশে ফিরে আসেন। আমেরিকার সরকার কবিকে যে নতুন পাসপোর্ট দেন তাতে লেখা থাকে—যে এই অনুমতি-পত্র এশিয়াবাসী অশেষতকার (কাল আদমি) জনসাধারণের এক

বিশিষ্ট ঐতিহাসিকে বিশেষ ব্যবহার দান করা গেল। কবি ঐ বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে রাজী হলেন না, কারণ ঐ ব্যবহার সঙ্গে আচ্যের প্রতি আমেরিকার চরম বিরূপ একটু হয়েছিলো। কবি ফিরে এলেন জাপানে। এরপর কবির আর আমেরিকা যাওয়া ঘটেনি।

আজ ভারত স্বাধীন রাষ্ট্র। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে আমেরিকার সঙ্গে এসে দেশের যোগাযোগ খুবই দৃঢ়। আজ কবিকে পাসপোর্ট নিয়ে কোন অপমান সহ্য করতে হতো না। কিন্তু যে-দেশের দার্শনিক এমার্সন, কবি হাইটম্যান ভারতবর্ষের দর্শন, ইতিহাস, সভ্যতা সম্বন্ধে এককালে শ্রদ্ধাবান সেই দেশই কিনা ভারতের আন্তর্জাতিক কবি রবীন্দ্রনাথকেও ‘কাল আদমি’ ছাড়া আর কোন জাবে দেখতে চাননি। এ' পরিতাপের বিষয় সন্দেহ নেই। যাই হোক, এ' অভূত ব্যবস্থার ক্ষতিপূরণ হিসেবেই এশিয়াবাসীদের মধ্যে নির্দিষ্ট সংখ্যাকে আমেরিকার নাগরিক অধিকার দেওয়া হবে প্রতি বছরে—আমেরিকার আইনসভা এ' সিদ্ধান্ত করেছেন। ভারত-আমেরিকার কাব্য-দর্শনের বন্ধন এমার্সন-হাইটম্যান, বিবেকানন্দ-রবীন্দ্রনাথ করে গেলেও ভারত স্বাধীন রাষ্ট্র না হওয়ার দরুন ওদেশের কাছে উচিত সম্মান পাননি। বাস্তব-পন্থী আমেরিকার মন কেবলমাত্র বাস্তব বিচারই গ্রহণ করতে পারে সহজ ভাবে, অজ্ঞ বিচার নয়। তবে ব্যক্তিগতভাবে আমেরিকার কাব্য-সাহিত্য, দর্শন-কৃষ্টি, কলা-শিল্প সব কিছুই বিশেষ বিচার, সব কিছুই প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধা, আগেও ছিল আজও আছে।

## বসন্ত-শেষ

আশা দেবী

হঠাৎ কখন অজ্ঞমনে কাজের ফাঁকে  
জানলাটুকু খুলে,  
একটি বলক হাসির মতো  
এলো দধিন হাওয়া।  
নাম-না-জানা ফুলের গন্ধ বয়ে  
হাজার হাজার মোমাছির  
শুনশুনিয়ে গেল  
পাগল-করা ফাগুন দিনের গান;  
মৌ-ঝরা ফুল একটি ছুটি পড়লো এসে  
শিথিল কবরীতে  
হারিয়ে গেল মন।  
হারিয়ে যাওয়া মন  
হঠাৎ যেন উঠলো কেঁদে  
অথোর ঝরে

অকারণে পড়লো মনে যেন :  
ফাগুন যে আজ বন্ধ আমার ঘরে  
আমার মনের গোপন কোণার  
রিক্ত কোঠাগুলো  
দেয় নি তো কেউ ভরে  
এমনিতরো ফাগুন দিনের মতো ;  
মনের বন্ধ উজাড় করে নেয় নি কেউ লুটে  
ভাঁড়ার ঘরের আনন্দময় ধন।  
আরশিখানা তুলে  
পড়েছি তো মহাকাালের লেখা  
ফাগুন যে বায় আমার আসে ঘারে ;  
আসে না তো ফিরে  
মনের ফাগুন দেহের আগল খুলি  
সেই যে গেছে সোনার রঙিন রথে ॥



গত কিছুকাল হইতে শিলালদহ ষ্টেশনে একশ্রেণীর নারীপুরুষের নানাপ্রকার অনাচার ক্রিয়া-কর্মের সংবাদ প্রকাশ পাইতেছে। হুথের বিবর, কলিকাতা পুলিশ উদ্বাস্ত নারী এবং বালিকাদের বিপদ হইতে রক্ষা করিবার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন। গত কয়েকদিনে পুলিশ ৫০ জন নারী এবং ৪০ জন পুরুষকে সম্মেলনকভাবে বোরাকের দ্বারে প্রেরণ করিয়া চালান দিয়াছেন। ইহারা নাকি প্রলোভন দেখাইয়া উদ্বাস্ত নারী এবং বালিকাদের সরাইয়া ফেলিবার ফিকিরে ছিল। শিলালদহ ষ্টেশনে উদ্বাস্ত নারীদের 'বিশেষ প্রকার' সামাজিক বিপদ হইতে রক্ষা করিতে হইলে পুলিশের একক চেষ্টার খুব বেগী ফল হইবে না। এ-বিষয়ে, সাধারণ দায়িত্বশীল ব্যক্তির কর্তব্য হুনির্দারিত। নারীকে পণ্য হিসাবে ব্যবহার করার প্রথা নূতন নহে। সমাজ-বুকে এই পাপ বহুকাল হইতেই ক্ষতের মতো বিরাজ করিতেছে। কিন্তু এই পাপের প্রকাশ এমন ব্যাপকভাবে কলিকাতা সহরে ইতিপূর্বে আর কখনো দেখা যায় নাই। মানুষের চরম বিপদে এবং অসহায় অবস্থার স্বযোগে যাহারা মানুষকে গভীরতম পক্ষে নিমজ্জিত করিতে চায় সামান্য অর্থলাভের আশায়, তাহাদের ক্ষমা নাই। প্রয়োজন হইলে, প্রমাণিত অপরাধীর প্রতি চরম দণ্ডের ব্যবস্থাও বিশেষ আইনবলে করা দরকার। গভীর পরিতাপের বিষয়, একদল বাঙ্গালী-নারীই আজ দুর্গতা নারীর ভীষণতম অকল্যাণের সহায়করূপে কার্য্য করিতেছে। এই সকল নারীর পশ্চাতে গোপনে যে বিশৃঙ্খলী সজ্জ আছে, তাহাদের আবিষ্কার করা পুলিশের এবং জন-সাধারণের প্রধানতম কর্তব্য। মনে রাখা প্রয়োজন, সামান্য সূত্র হইতেই বৃহত্তম বড়মন্ত্রের সংবাদ পাওয়া সম্ভব।

—দৈনিক বহুমতী

\* \* \* \*

মরমনসিংহে পূর্ববঙ্গের সংখ্যালঘু সম্মেলনে অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র চক্রবর্তী বলিয়াছেন—“বর্তমানে সংখ্যালঘুরা কতকগুলি অবাঞ্ছন্যের সম্মুখীন রহিয়াছেন। গুরুতর সাংসারিক প্রয়োজনেও সংখ্যালঘুরা তাহাদের ছাবর-অস্থাবর সম্পত্তি ইচ্ছামত বিক্রয় করিতে পারিতেছেন না। সংখ্যালঘুদের ঘরবাড়ী নানা অজুহাতে দখল করা হইতেছে। সংখ্যালঘুদের বাড়ীর ফল, গাছ, বাগ, পুকুরের মাছ যে কেহ ইচ্ছামত ব্যবহার করিতেছে দেখিয়াও আপত্তি করিবার মত বল তাহারা পান না।” পাক-ভারত চুক্তির ফলে পূর্ববঙ্গের সংখ্যালঘুদের সমস্তা একেবারে জলবৎ তরল হইয়া গিয়াছে বলিয়া বাহারা ভারতীয় ইউনিয়নে বসিয়া দিবারাত্রি প্রচার চলাইতেছেন, তাহারা একথা শুনিয়া কি বলিবেন? সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের বাহারা এখনো পূর্ববঙ্গে রহিয়াছেন, পাকিস্তানী শাসনের সহিবা হাড়ে হাড়ে মাগুম পাইতেছেন—লোকে তাহাদের কথা বিশ্বাস করিবে, না বিশ্বাস করিবে দিল্লীর প্রাসাদকূটে বসিয়া, অপরের মুখে ঝাল খাইয়া বাহারা বিবৃতি ছাড়িতেছেন তাহাদের

কথা? সংখ্যালঘু সম্মেলনে শ্রীযুক্ত দেলী সেনগুপ্তাও বলিয়াছেন, “গত হাঙ্গামার সময় হইতে অসংখ্য লোক পূর্ববঙ্গ ত্যাগ করিয়া চলিয়া বাইতে আরম্ভ করিয়াছেন। আজও পূর্ব বাঙ্গালা হইতে উদ্বাস্তদের হানান্তর গমন বন্ধ হয় নাই। অল্পসংখ্যক উদ্বাস্ত পূর্ব বাঙ্গালার প্রত্যাগমন করিয়াছেন—কিন্তু তাহাদের মধ্যে অনেকেই নিজ নিজ সম্পত্তির বিলি-ব্যবস্থা করার জন্যই পূর্ববঙ্গে ফিরিয়া আসিয়াছেন।” অধিকাংশ উদ্বাস্তই সম্পত্তির বিলি-ব্যবস্থা করার জন্য পূর্ববঙ্গে ফিরিতেছেন—একথা মিথ্যা প্রমাণ করিবার জন্য কিছুদিন আগে পণ্ডিত জওহরলাল এক দীর্ঘ বিবৃতি দিয়াছিলেন। এবার তিনি ও তাহার দলবল কি বলিবেন!

—দৈনিক বহুমতী

\* \* \* \*

করিমগঞ্জ হইতে আমাদের নিজস্ব সংবাদদাতা এই মর্মে একটি সংবাদ প্রেরণ করিয়াছেন যে, গত ২৮শে মার্চ পূর্ববঙ্গ মুসলিম লীগের সভাপতি মৌলানা আকরাম খাঁ মোটর লঞ্চযোগে কুশিয়ারা নদীর অপর পারে জকিগঞ্জে উপস্থিত হইয়া তথাকার ফৌজদারী আদালতের প্রাঙ্গণে আহুত এক সভায় ভাষণ দেন। মৌলানা সাহেব বক্তৃতা প্রসঙ্গে শত্রুর বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণার প্রস্তাব করেন এবং তৎক্ষণাত্ আগাততঃ বিনা বেতনে পাঁচ লক্ষ সৈন্য সংগ্রহের আবেদন জানান। সংবাদটি এই পর্যন্ত পাঠ করিয়াই আমরা কল্পনার চক্ষে সভার অবস্থা প্রত্যক্ষ করিতে গিয়া দেখিলাম, সভাটা হয়তো বা এতক্ষণ সাময়িক আবহাওয়ায় সরগরম হইয়া উঠিয়াছে এবং উপস্থিত ‘জনগণের’ মধ্যে জেহাদী সৈন্য তালিকার নাম লিখাইবার জন্য একটা তাড়া-হুড়া পড়িয়া গিয়াছে। কিন্তু সংবাদের পরবর্তী অংশটি আমাদের কাছে অত্যন্ত হতাশ করিয়াছে : সভাস্থলে কে বা কাহারো বেই-না বলিল যে, ভারতীয় সৈন্যবাহিনী সীমান্ত আত্মমুখে অগ্রসর হইতেছে, অমনি সভাস্থ ‘জনগণ’ জানের ভয়ে দিগবিদিক জ্ঞানশূন্য হইয়া দিরাপদ আশ্রয়ের আশায় হিন্দু বাড়ীর সন্ধানে বাহির হইয়া পড়িল। মৌলানা আকরাম খাঁ সাহেব এই ডামা-ডোলের মধ্যে পড়িয়া কি করিলেন ও কোথায় গেলেন ভাবিয়া আমরা অত্যন্ত উদ্বেগ হইতেছি : ছুটাছুটি করিতে গিয়া যদি হাত-পা ভাঙ্গিয়া গিয়া থাকে, তাহা হইলে বুড়ো-হাড় কি আর জোড়া লাগিবে।

—আমলবাঙ্গার পত্রিকা

\* \* \* \*

এরূপে শেঠ রামকৃষ্ণ ডালমিয়া দিল্লীর হাটে কয়েক দিন আগে কংগ্রেসী ইন্ডি ভাঙ্গিয়া দস্তর মত ‘চাকল্যকর পরিস্থিতি’ সৃষ্টি করিয়া ছিলেন। আর বার্লিনে ‘রয়টারের’ ইন্ডি কাঁসাইয়া মন্ড সোরগোল তুলিয়াছেন মিঃ জন পিট। তত্কালেক ছিলেন বার্লিনে রয়টারের প্রধান সংবাদদাতা। অকস্মাৎ একদিন পূর্ব-জার্মানিতে গিয়া এক সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি ঘোষণা করিয়া বসিলেন—আর তিনি পশ্চিম জার্মানিতে

করিয়া গিয়া ইজ-মার্কিন সমরলিপির হাতের খুলি হিসাবে কাজ করিবেন না। শুধু এই সমস্ত ঘোষণা করিয়াই মিঃ পিট ক্ষান্ত হন নাই। ভ্রমসমাজে 'রয়টারের' নিরপেক্ষ সাংবাদিকতার মুখোশ খুলিয়া দিয়া বলিয়াছেন, "পূর্ব ইউরোপ এবং পূর্ব জার্মানির জনসাধারণের চরিত্রের চেষ্টা সম্বন্ধে যে সব খবর আমি দিভাম, ইচ্ছা করিয়াই তাহা গণিতা রাখা হইত। এতদিনে আমি বিশ্বাসিছি, পশ্চিম ইউরোপের রাষ্ট্রগুলিতে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা আছে বটে, কিন্তু সে শুধু বুদ্ধান্তর প্রচার করিবার স্বাধীনতা। আমরা সাংবাদিকরা এই প্রচারের কাজে সাহায্য করার জন্যই পরমা পাইয়া থাকি।" বলির ভিতর হইতে এই-ভাবে বিড়াল বাহির হইয়া পড়িতে দেখিয়া সভ্যবতঃই বার্লিনের রয়টারের কর্তারা মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িয়াছেন। তাহারা অক্ষুট করে যেন বলিতেছেন—“হেড অফিসের বড়বাবু লোকটি বড় শান্ত, তাঁর যে এমন মাধার ব্যানো কেউ কখনো জুনতো?” কিন্তু মাধার 'ব্যানো' প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিয়াও এই কলেঙ্কারী চাপা দেওয়া যে সহজ হইবে, ব্যাপার দেখিয়া তাহা মনে হয় না।

—দৈনিক বহুমতী

\* \* \* \*

বর্তমানে কলিকাতার বাজারে অনেকেই এরূপ লক্ষ্য করিয়াছেন যে, দোকান হইতে ১০ গজ মাপের কাপড় ক্রয় করিয়া তাহা ধোয়াইবার পর দেখা যায় যে, উহার দৈর্ঘ্য ৯ গজের বেশী নহে। এই ভাবে ছোট মাপের কাপড়ের উপর বড় মাপ ছাপ দিয়া জনসাধারণকে প্রভাৱণা করিবার ব্যাপার "সম্প্রতি আদালত পর্যন্ত গড়াইয়াছে। সম্প্রতি সিঙ্গাপুরস্থ ভারতীয় বণিক সভার সভাপতি সর্দার হরদয়াল সিং এরূপ অভিযোগ করিয়াছেন যে, ঐ স্থানের বাজারেও অনুরূপ ধরণের কাপড় রপ্তানী করা হইতেছে। কেবল তাহাই নহে। রপ্তানীকৃত কাপড়ের ব্রন সকল স্থানে সমান নহে এবং ভারতীয় রপ্তানীকারকগণ অর্ডার মার্কিক মাল সরবরাহ করেন না বলিয়াও সিঙ্গাপুরের বাজারে অভিযোগ রহিয়াছে। মোটের উপর কাপড়ের কলওয়ারা ও কাপড় রপ্তানীকারকদের দুর্নীতিমূলক কাজের জন্য বিদেশের বাজারেও ভারতীয় কাপড়ের দুর্নীতি রটিয়াছে। উহার শেব পরিণতিতে বিদেশের বাজারে ভারতের কাপড়ের কাটতি যে বন্ধ হইবে এবং ভারতের বাজারে উহার কাটতি যে সমুচিত হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। অথচ বর্তমানে বিদেশে কাপড় রপ্তানীর দ্বারা ভারত সরকার ১০০ কোটি টাকার সমমূল্যের বিদেশী মুদ্রা অর্জন করিবার প্রয়াস করিতেছেন। মুষ্টিমেয় কাপড়ের কলওয়ারার দুর্নীতিমূলক বার্ষিকপত্রের জন্য সমষ্টিগতভাবে ভারতের এই ভাবে বার্ষহানি ভারত সরকার আর কতদিন নিরপেক্ষ দর্শক হিসাবে প্রত্যক্ষ করিবে?

—আর্থিক জগৎ

\* \* \* \*

আজ মাঘের চিত্তার মধ্যে যে আবিলতা প্রবেশ করিয়াছে তাহা দুই কয়ই হইবে আজকের দিনের প্রথম কাজ। দেশ স্বাধীন হওয়ার

পরেও আমরা অজ্ঞভাবে চিন্তা করিতে পারিলাম না—এই পরাজয়, আজ আমাদের স্বীকার করিয়া লইতে হইল। দেশকে সভ্যই আমরা ভালবাসি কিনা—দেশের জন্য এতকাল দুঃখ বরণ করিয়াও আজো আমরা প্রমাণ করিতে পারিলাম না। ফাঁকি ক্রমশই আমাদের ধরা পড়িতেছে। ফাঁকি ছিলো ঐ ভালবাসার মধ্যেই। ভালো দেশকে বাসি নাই—ভাল বাসিয়াছিলাম নেতৃত্বের লোভকে.. আমার “অহং” কে। তাই সকল দিকের অনাচার আজ এমন কুৎসিৎরূপে আত্মপ্রকাশ করিল। দেশ-প্রেমিকতার এমন নাটকীয় অভিনয় আর কোন দেশের ইতিহাসে দেখা যায় নাই। শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশ নিয়োগী মহাশয় পদত্যাগকালে বাহা বলিয়াছেন, তাহাতে আমরা বিষয়ে হতবাক্ হইয়া গিয়াছি। বাণিজ্য-সচিব নিয়োগী মহাশয়ের অজ্ঞাতসারেই পাকিস্তানের সহিত এই যে গোপন চুক্তি এতকাল ধরিয়া চলিতেছিল—ইহার কোনো সহজতর গবর্ণমেন্ট দিতে পারেন নাই। রাষ্ট্রকে গণতান্ত্রিক বলিয়া ঘোষণা করার পরেও সরকারের এই মনোভাব অপরিবর্তিতই রহিয়া গেলো—টিক এই কারণেই জনসাধারণ তাহার রাষ্ট্রকে আপন-রাষ্ট্র বলিয়া আজো মনে করিতে পারিল না।

—দৈনিক

\* \* \* \*

সিমলন অঞ্চলে চাবীরা সরকারী বীজাণার হইতে আপুর্ বীজ কিনিয়াছিলেন, কিন্তু পশ্চিমধ্যে এই আপুর্-বীজ জল পাইয়া চিটরা গিয়াছিল। ফলে গাছ টিকমত বাহির হয় নাই বা তাহাতে চাবীদের ক্ষতি হইয়াছিল। এই ক্ষতি পূরণের জন্য সরকারের নিকট আবেদন করা হইয়াছিল। সরকার এই আবেদনে যৌক্তিকতা উপলব্ধি করিয়া চাবীদের নিকট হইতে বাজারের আপুর্ দর যখন ৫।০—৫।৫ মণ, সেই সময় সরকার ১১।০ দরে আপু কিনিয়া ক্ষতিগ্রস্ত চাবীদের ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করিয়াছেন। সরকারের এই প্রচেষ্টা নিশ্চয়ই প্রশংসনীয়।

—বর্ধমানের কথা

\* \* \* \*

পাকিস্তানী গুপ্তচর বা পক্ষমবাহিনীকে সমূলে উৎপাটন না করিতে পারিলে আমরা ধ্বংস হইব। একথা কোন সময়েই বিস্মৃত হইলে চলিবে না যে জনসাধারণের সাহায্য ও সহযোগিতা ব্যতীত কোন সরকার বা পুলিশ বিভাগই এই বিষবৃক্ষের মূলোৎপাটন করিতে সমর্থ হইবে না। মুর্শিদাবাদ জেলার রাষ্ট্রাধিপত্য প্রত্যেকটি হিন্দু-মুসলমান জনসাধারণকে এবিষয়ে অগ্রণী হইতে হইবে। আজ তাহারা আমাদের রাষ্ট্রকে নিজের রাষ্ট্র বলিয়া গ্রহণ করিতে কুণ্ঠিত,—আমাদের নদ, নদী, আমাদের ডাকঘর, আমাদের কলকারখানা, আমাদের অফিস, আমাদের আদালত, আমাদের ক্ষেতের কল, আমাদের বান-বাহন নিজের বলিয়া গ্রহণ করিতে পারে নাই, তাহাদিগকে আজ খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে। তাহারা হিন্দুই হউন, মুসলমানই হউন, খৃষ্টানই হউন, অথবা বৌদ্ধই হউন কোন মতেই যেন তাহাদের ক্ষমা করা না হয়। প্রতিদিন তাহারা আমাদের মুখের আহাৰ, আমাদের পরণের কাপড়, আমাদের রোগের ঔষধ ও রোগীর পথ্য স্বরূপ পথে ঢালাই দিতেছে;

প্রতিদিন বাহারা আমাদের আলো নিভাইয়া দিতেছে, আমাদের বাতাস বিবাক্ত করিতেছে, তাহাকে ক্ষমা করিও না ! একজন লারেক আলী পলাইয়াছে পলাইতে নাও, ঘরের কোণে প্রতিবেশী লারেক আলির হৃদি বেন আর ভবিষ্যতে না হয় । —গণরাজ

\* \* \*

যাঁরা জগতে শান্তির পূজারী, যাঁরা মানবের কল্যাণ প্রতিষ্ঠার আঙ্গ-সমাহিত, যাঁরা নিজের জীবনের উপলক্ষ সাধনা দ্বারা সর্বসাধারণের মনে প্রেরণা সঞ্চার করছেন তাঁরা মমন্ত, পূজ্য। সেই মহাপুরুষের মধ্যে যাদের নোবেল পুরস্কার দেওয়ার কথা উঠেছে তাদের মধ্যে ভারতীয় আছেন শ্রীঅরবিন্দ, সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণ আর পণ্ডিত জগদ্বরলাল। তাঁদেরই সঙ্গে একই পর্বায়ে পাশ্চাত্য দেশের যাদের নাম চোখে পড়ছে তাঁদের মধ্যে আছেন ব্রুটনের ভূতপূর্ব যুক্তকালীন প্রধান মন্ত্রী চার্লিস আর আমেরিকার বর্তমান প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান। শেবোক্ত দুই ব্যক্তির মধ্যে একজনের যুদ্ধের আশা আজও বেটেনি ; অপরজন শ্রাণালকি ও হিরোসীমার মরমেধ যুদ্ধে শান্তির বীজ বপন করে খ্যাতি অর্জন করেছেন ও অহমিকার ভুজ শিখরে বসে সমাগরা ধরিত্রীর অধীশ্বর হওয়ার স্বপ্ন দেখছেন। পুরস্কারের ফসলের ক্ষেত্র পশ্চিমে। সেখানে শান্তির ধারণা কতখানি স্পষ্ট তা এই শান্তি-পূজারীদের নাম-মালায় প্রকাশ পেয়েছে। —পদাতিক

\* \* \*

এবার দীর্ঘদিন অনাবৃষ্টির ফলে বর্ধমানের মধ্যস্থিত বাঁকা নদীটি একেবারে শুকনাইয়া গিয়াছিল ১৩০৭ সালের অনাবৃষ্টির পর বাঁকার এমন দুরবস্থা আর দেখা যায় নাই। স্থানে স্থানে যেটুকু জল থাকিত, এবংসর তাহাও নাই। যেখানে একটু জল আছে, সেখানকার জলে এমন দুর্গন্ধ যে, পার্শ্ববর্তী অধিবাসীরা ভিত্তিতে পারে না। বাধ্য হইয়াই অনেক ঐ জলই পানীয় ও ব্যবহার্যরূপে ব্যবহার করিতেছে। ফলে বসন্ত ও কলেরা রোগ সংক্রমিত হইতেছে। উল্লেখযোগ্য যে, বাঁকার জল বর্ধমানের কয়েকটি অঞ্চলের লোকদের পক্ষে অপরিহার্য। নদী নালা সংস্কারের জন্ত যে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা হইয়াছিল, বাঁকা সংস্কারে সেই পরিকল্পনা কার্যকরী হইলে সহরের জলাভাব প্রভূতরূপে লাঘব হইবে এবং চাষ আবাদেও উন্নতি হইবে। —আর্ধ্য

\* \* \*

পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষা-অধিকার কর্তৃক প্রকাশিত তৃতীয় শ্রেণীর পাঠ্য-পুস্তক “কিশলয়ের” একখণ্ড সম্প্রতি আমাদেরিগের হস্তগত হইয়াছে। সরকারী দপ্তরখানা ভিন্ন অন্তর্জ ইহার দ্রুতপ্রাপ্যতাই অবশ্য আমাদের বিলম্বে প্রাপ্তির প্রদান হেতু।

প্রাথমিক স্তরে পুস্তকহীন-শিক্ষা-ব্যবস্থা চালু করিয়া তাহারই সহিত সম্মতি রক্ষাকল্পে তৃতীয় শ্রেণীর জন্ত একটি পুস্তক শিক্ষা-অধিকার নিজে প্রকাশ করিবেন এবং প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে জন্ত কোন গ্রন্থকারকে প্রবেশ করিতে দিবেন না—এই বিজ্ঞপ্তি যে সময় সংবাদ পত্রাদিতে প্রথম প্রকাশিত হইয়াছিল—তখন দেশের বহু

বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতী এবং শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান উহার প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। আমরাও তখন ইহার অনুমোদন করিতে পারি নাই।.....

কিন্তু সরকার অবাধাভাবিক জেদের সহিত সে সকল প্রতিবাদ তখন সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করিয়াছিলেন এবং তাহারই ফলে আমরা সে সময় স্বভাবতঃই এ কথা মনে করিয়াছিলাম যে প্রস্তাবিত গ্রন্থখানি নিশ্চয়ই অভিনব সম্পদসমৃদ্ধ একটা অপূর্ণ পুস্তকই হইবে। ভাবিয়াছিলাম, প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে একটি যুগান্তকারী গ্রন্থই হয়ত বা পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষা-অধিকার এবার আমদানী করিতে যাইতেছেন নতুবা এতটা দৃঢ়তা তাহার দোখাইতেন না ; কিন্তু পুস্তকখানি হাতে পাইয়া আমরা একেবারেই নিরাশ হইয়াছি। —বাঙলার শিক্ষক

\* \* \*

প্রাথমিক শিক্ষার উন্নতি অনেকাংশে স্কুল সব ইনস্পেক্টার বা অবর পরিদর্শকগণের কার্যের উপর, নির্ভর করে। প্রাথমিক শিক্ষকগণের এক হিসাবে তাহারাই বন্ধু, উপদেষ্টা এবং পথ প্রদর্শক। অথচ এই অতি প্রয়োজনীয় কর্মচারীবৃন্দের দুর্দশার প্রতি প্রাথমিক শিক্ষকগণেরই মত সরকার এবং জন সাধারণ ভুল্যরূপে উদাসীন। আমরা বহু বৎসর ধরিয়া সংবাদপত্রে এবং বক্তৃতা মঞ্চ হইতে সরকার ও জন সাধারণের নিকট ইহাদের এই দুঃস্বপ্নের কথা জানাইয়া আসিতেছি। কিন্তু এখনও পর্যন্ত ইহার কোন প্রতিকার হইল না। ইহাপেক্ষা দুঃখের বিষয় আর কি হইতে পারে। ইহার সকলেই উচ্চ শিক্ষিত। দুঃদৃষ্টবশতঃই শিক্ষা বিভাগের নিম্ন বিভাগে চাকুরী লইতে বাধ্য হইয়াছেন। হাড়ভাঙা খাটুনি ইহাদের খাটিতে হয়। কিন্তু বেশীর ভাগ সময়েই সেই খাটুনির কিছু মাত্র পুরস্কার লাভ ইহাদের ভাগ্যে জুটে না। আমরা শিক্ষা সচিবকে আবার বলিতেছি ইহাদের সক্রিয় সাহায্য এবং পরিপূর্ণ সহযোগিতা ভিন্ন প্রাথমিক শিক্ষোন্নতির কোনও পরিকল্পনাই সাফল্যমণ্ডিত হইবে না।

—শিক্ষক

\* \* \*

এক সংবাদে প্রকাশ যে দিল্লীর এক উদ্বাস্ত কেন্দ্রে উদ্বাস্তদের কুটীরশিল্প ও অন্যান্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিল্প শিক্ষাদানের জন্ত এক ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়াছে। এই ব্যবস্থানুযায়ী জাপান হইতে কিছু জাপানী বস্ত্রপাতি এবং কারিগর আনা হইয়াছে। তাহাদের শিক্ষাধীনে দুই শতাধিক উদ্বাস্ত কারিগরী শিক্ষালাভ করিতেছে। দেশের বিভিন্ন উদ্বাস্ত কেন্দ্রেও অনুরূপভাবে উদ্বাস্তদের কারিগরী শিক্ষাদানের জন্ত ভারত সরকার নাকি আরো কারিগর এবং জাপানী বস্ত্রপাতির অর্ডার দিয়াছেন। পরিকল্পনাটি নিঃসন্দেহে সকলে সমর্থন করিবেন। সাধারণভাবে বাঙালী উদ্বাস্তদের কর্ম বিমূর্ত্তা এবং দুরবস্থা সম্বন্ধে নানা কথা শোনা যায়। এই ব্যবস্থা বাহাতে শীঘ্র পশ্চিমবঙ্গে উদ্বাস্তদের মধ্যে অবলম্বন করা যায় সেদিকে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। এই দৃষ্টান্ত হইতে শরণার্থীদেরও কি শিক্ষণীয় কিছু নাই?

—নির্ণর

—ভারত মুক্তাঙ্গী হ্রাসের পূর্বে পাকিস্তানে যে পাট ক্রয় করে তাহা এবং আসাম হইতে পাকিস্তানের মধ্য দিয়া আমদানীর পথে অনেক পাট পাকিস্তান আটক করে। এক্ষত ভারত পাকিস্তানকে করলা দেওয়া বন্ধ করে। সম্প্রতি ভারতীয় পার্লামেন্টে একটি প্রস্তাব উত্থরে জানা গিয়াছে যে, উক্ত পাটের মধ্যে ৫ লক্ষ ৯৬ হাজার ২০১ মণ পাকিস্তানী পাট এবং ৬ লক্ষ ৮৭ হাজার ৩১৭ মণ আসামী পাট পাকিস্তান এই পর্যন্ত ছাড়িয়া দিয়াছে এবং উহার মধ্যে ৪ লক্ষ ৭৫ হাজার ৬২১ মণ আসামী পাট ও ৫ লক্ষ ১ হাজার ৮২৩ মণ পাকিস্তানী পাট ভারতে পৌঁছিয়াছে। একমাত্র পাকিস্তানেই ২৫ লক্ষ মণের উপর ভারতীয় পাট আটক পড়িয়াছিল। কাজেই মোট পাটের এখনও কিছুই আসে নাই। —বার্ষিক জগৎ

\* \* \*

দিল্লীর অসামরিক সরবরাহ বিভাগের ডিরেক্টর তথাকার সাংবাদিক সম্মেলনে প্রকাশ করেন যে, রাজধানীতে চোরাবাজারে ১ মণ ময়দার মূল্য ১০০ টাকা। উহার নিয়ন্ত্রিত মূল্য প্রতি মণ ১১ টাকা। পক্ষকাল পূর্বে ব্যক্তিগতভাবে তদন্ত করিয়া তিনি অবগত হইয়াছিলেন যে, চোরাবাজারে প্রতি মণ তিনি ৭০ টাকা দরে বিক্রয় হয়। চোরাবাজারের সংবাদ ডিরেক্টর মহাশয় পাইয়াছেন—সাংবাদিকদের সেই সংবাদ পরিবেশন করিয়াছেন—দিল্লীর সংবাদে কেবল ইহাই জানিলাম। কিন্তু জনসাধারণের জানিবার বিষয় চোরাবাজার দমনকল্পে দিল্লী কত পক্ষ বন্ধন হইতেছেন কেন? ১১ টাকা বাহার নিয়ন্ত্রিত মূল্য তাহা ১০০ টাকার ক্রয় করে কাহার, কেন এবং কোন্ উদ্দেশ্যে। দেশে চোরাবাজার আছে—রাজধানীতে (রাজধানী মাঝেই ধনপতিদের মাগন ও সমারোহ ঘটে) হয়তো বেশী আছে ইহা জনসাধারণ জানে ও বিশ্বাস করে। কিন্তু “চোরাবাজার” নিষূল করিবার জন্য রাজধানীর নজর ভঙ্গ হইয়াছে কিনা—তাহাই আমরা জানিতে চাই। চোরাবাজার মনের জন্য সরকার ও সরকারী কর্মচারীগণ উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন ধনসাধারণের মধ্যে এই বিশ্বাস আনিয়া দেওয়া কিন্তু খুব শক্ত নহে; কবল বড় বড় কতকগুলি চোরাকারবারীকে আদর্শ সাজা দান করিয়াই চালা করা যায়। —আনন্দবাজার পত্রিকা

\* \* \*

পূর্ববঙ্গের উষ্মান্তরের পশ্চিমবঙ্গে পুনর্বাসনের ব্যবহার জন্ত ডাঃ শ্যামপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে যে বোর্ড গঠিত হইয়াছে, তাহার একটি পরিকল্পনা সম্প্রতি সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছে। এই পরিকল্পনায় প্রথম করিয়াছেন ডাঃ রাধাকমল মুখোপাধ্যায়। এই পরিকল্পনার তেরো দফা কর্মসূচী পাঠ করিয়া আমাদের ইহাই মনে হইতেছে যে, যেখানে ইচ্ছা আছে, সেখানে উপায়ের অভাব নাই। কিন্তু পুনর্বাসন দপ্তরের শোভা হিসাবে বাহার উচ্চপদে বরাদ্দ করিতেছেন, এই ধরনের পরিকল্পনা বহু পূর্বেই তাহাদের একট হইতে আসা উচিত ছিল। একটা ডামাডোল, হেট-এর মধ্যে র্বের কখনও সম্ভাব্য হইতে পারে না। বাহার প্রকৃত সাহায্য ইবার উপযুক্ত পাত্র, তাহার পিছনের অন্ধকারে পড়িয়া থাকে,

আর বার্ষ ও সুযোগসম্মানী দল সমুখে আগাইয়া সাহায্য লাভ করে। এই দুইই আমরা গত তিন বৎসর ধরিয়া দেখিয়া আসিতেছি। ভারত গভর্নমেন্ট উষ্মান্তর আশ্রয়ার্থীদের জন্য এবাং কম অর্থ ব্যয় করেন নাই, কিন্তু লক্ষ লক্ষ টাকা কোথায় কাহার নিকট গিয়াছে, কিরূপে উহা ব্যয় হইয়াছে তাহার সন্ধান বা হিসাব লইলে তাহা খুব শ্রীতিকর হইবে না। সে যাহাই হউক, অতীতের তিক্ত অভিজ্ঞতার পুনরাবলোচনা করিয়া লাভ নাই। বর্তমানে এবং ভবিষ্যতে লক্ষ লক্ষ উষ্মান্তর কিভাবে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা হইতে পারে, তাহাদের আশ্রয় ও কর্ম সমস্তার কিরূপে সমাধান করা সম্ভব তাহাই প্রশ্ন। এই প্রশ্নের উত্তর ডাঃ শ্যামপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় তথা ডাঃ রাধাকমল মুখোপাধ্যায় দিয়াছেন এবং আমরা বিশ্বাস করি, গভর্নমেন্ট যদি তাহাদের সহযোগিতায় পুনর্বাসনের কাজ সাময়িকতার সহিত গ্রহণ করেন, তাহা হইলে অবিলম্বে না হইলেও অনতিবিলম্বে উহার সামঞ্জস্যপূর্ণ সমাধান সম্ভব হইবে। —মুগ্ধ

\* \* \*

জন মাথাইয়ের পদত্যাগ, আচার্য্য কৃপালনীর বক্তৃতা এবং শেঠ ভালমিয়ার পত্র দেশের বর্তমান আর এক উৎসেগজনক বোষণা। জন মাথাই যে বিবৃতি দিয়াছেন তাহাতে গণতন্ত্রের পঙ্কতা একটু, আর শেঠ রামকৃষ্ণ নরনারী ও পাপপঙ্ক্তি সম্বন্ধে যে ইঙ্গিত করিয়াছেন, তাহাতেও দুর্নীতির কদম্ব নারকীয় রূপ দেখা গিয়াছে। আর শ্রীকৃপালনীর পার্লামেন্টের বক্তৃতা সকলের ত্রাসের কারণ হইয়াছে। তিনি মন্ত্রীপদে সমালীন ব্যক্তির উৎকোচ গ্রহণের কথাও বলিয়াছেন। ইতিপূর্বে শুড় কেলেকারী, জমিদারী কেলেকারীর কথা তো প্রচারিতই হইয়া গিয়াছে। মন্ত্রীর ঘর লওয়া উল্লেখ করিবার পর কৃপালনী আর যাহা বলিয়াছেন তাহাও অত্যন্ত আতঙ্কজনক। তিনি বলিয়াছেন:—“জনসাধারণ বলিতে আরম্ভ করিয়াছে যে, পুরাতন শাসনেই তাহার অপেক্ষাকৃত ভাল ছিল।” সে কি,—বাধীনতা অপেক্ষা পরাধীনতা হুথের? কেন দেশবাসীর মনে এ ভাব জাগিল? কাহার দোষ? কাহাদের ত্রুটি বিচ্যুতিতে? এদিকে নয়। দিল্লীতে ১লা জুনের পার্লামেন্টের বিতর্কে প্রকাশ, শ্রীগিরিজাপ্তকর বাজপেয়ী লর্ড মাউন্টব্যাটেনের লোক হওয়ার পণ্ডিত নেহরু তাহাকে সমর্থন করেন এবং বাজপেয়ীর জন্তই কাশ্মীর ব্যাপার নাকি ভারতের অতিকূল হইতেছে। লর্ড মাউন্টব্যাটেন একদিন গান্ধীজী-কথিত সমতানী শাসনের প্রতিনিধি ছিলেন এবং তিনি বিদেশী। পণ্ডিত জওহরলালের উপর এমন অনতিক্রম্য প্রভাব কিসের জন্ত? —মার্ঘ্য

\* \* \*

আমেরিকার মুক্তরাষ্ট্রে বহুল পরিমাণে আগু উৎস হইয়া পড়িতে উক্ত দেশ ২২ লক্ষ ৩৬ হাজার ৫৫৫ ব্যাগ আগু শেন, পর্চুগাল, ইন্দোনেশিয়া, সিংহল, বেলজিয়াম, ইটালী প্রভৃতি দেশে সত্তা দরে বিক্রয় করিবার জন্য দিয়াছে। প্রতি ব্যাগে ১০০ পাউণ্ড আগু ছিল এবং প্রত্যেক ব্যাগের মূল্য পড়ে ১ পেন্ট—আমাদের দেশের হিসাবে তিন পয়সার সামান্য কিছু বেশী। —বার্ষিক জগৎ

\* \* \*



(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

সিপাহী বিদ্রোহের সময় ইংরাজগণ ইহা বিলকর্ণরূপে উপলব্ধি করিয়া-  
ছিলেন যে বাঙ্গালীরা বিশেষভাবে দেশপ্রেমিক ও চিন্তাশীল এবং  
সেনাবাহিনীতে তাহাদিগকে রাখা মোটেই নিরাপদ নহে। ইহার ফলে  
“বেঙ্গল আর্মি” জারিয়া দেওয়া হয় এবং হীনবল করিবার জন্য  
বাঙ্গালীদিগকে অসামরিক জাতিতে পরিণত করা হয়। বিদ্রোহের পর  
ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট অতঃপর মূলতঃ সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে অঞ্চলবিশেষ  
হইতে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ভাবে সৈন্তসংগ্রহ করিয়া সৈন্তবাহিনীর পুনর্গঠন  
সম্পন্ন করেন এবং তাহাদের মধ্যে যাহাতে ঐক্যবোধ জাগ্রত না হয় ও  
একদল আর এক দলকে ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখে, সে সম্বন্ধে বিশেষভাবে  
সচেতন থাকেন। ভারতবর্ষ হইতে সংগৃহীত সৈন্তবলের সাহায্যেই  
প্রকৃতপক্ষে ইংরাজগণ ভারতবর্ষ শাসন করিতেন—সামান্য গৌরব সৈন্ত  
বাহা থাকিত; তাহা ছাড়া সমগ্র ভারতবর্ষ মাত্র সামরিক শক্তির জোরে



সৈন্তগণ টেনগুন লইয়া বোম্বাই নগরীর রাজপথে পাহারা দিতেছে  
শাসন করা যাইত না। ইংরাজের এই দুর্বলতার বিষয় যাহাতে  
ভারতবাসীদের নিকট স্বতন্ত্র সম্ভব গোপন থাকে, সে সম্বন্ধেও ব্রিটিশ  
গভর্নমেন্ট যথেষ্ট চেষ্টা করিতেন।

অতএব দেখা যায়, যে, ভারতীয় সৈন্তগণের পূর্ণ আত্মগত্যের উপরই  
ভারতে ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের স্থায়িত্ব ছিল প্রধানতঃ নির্ভরশীল এবং  
ইহাকেই মূলধন করিয়া ইংরাজগণ নির্বিবাদে ভারতবর্ষ শাসন  
করিতেন; কিন্তু বিত্তীয় মহাব্যুৎসর্হের সময় প্রয়োজনের তাড়নায় ব্যাপক-  
ভাবে সৈন্তবাহিনীতে লোক-সংগ্রহ করার ফলে সৈন্তবাহিনীতে বহুদিনের  
সংস্কৃত-রক্ষিত শৃঙ্খলা অনেকখানি বিপর্য্যত হয় এবং যুদ্ধের প্রথম দিকটার  
দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ব্রিটিশের ভাগ্যবিপর্য্যয়ের ফলে এই শৃঙ্খলা  
একেবারেই নষ্ট হইয়া যায়। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার রণক্ষেত্র হইতে  
পশ্চাদপসরণের সময় ইংরাজ সৈন্তগণের অপসরণই অপ্রাধিকার লাভ

করে এবং ভারতীয় সৈন্তগণের একটা বৃহৎ অংশকে পশ্চাতে ঝাঁটি  
আগুলাইবার জন্য রাখিয়া অধিকাংশ ইংরাজ সৈন্তই নিরাপদে হানত্যাগ  
করে। ভারতীয় বাহিনী বিপদ ও অসহায়তার মধ্যে পরিত্যক্ত হয়।  
পরবর্তীকালে মূলতঃ এই সকল ভারতীয় সৈন্ত ও অফিসারদের লইয়াই  
আজাদ-হিন্দ-কৌজ সংগঠিত হয় এবং এতদিনের সামান্য বেতনভুক্ত  
পেশাদার সৈন্তগণ আপনাদের জাতীয় স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার উদ্ভুদ্ধ হইয়া  
যোগ্য নাগের নেতৃত্বাধীনে জাতীয় বাহিনীতে রূপান্তরিত হয়।

হাজার হাজার সৈন্তের এইভাবে পরিত্যক্ত হওয়া এবং তাহাদের  
ছাড়া আজাদ-হিন্দ কৌজ সংগঠিত হওয়ার ফলে যুদ্ধোত্তর কালে ভারতীয়  
সৈন্তবাহিনীতে এক গুরুতর প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। ভারতীয় সৈন্তগণ  
ইহা উপলব্ধি করিতে শুরু করে, যে, রণক্ষেত্রে কমান্ডের গোলাবর্ষণের  
হিসাবেই কেবলমাত্র তাহাদের প্রয়োজন—তাহাদিগকে দরকার কেবল  
ইংরাজ সৈন্তগণের হানত্যাগ নিরাপদ করিবার জন্য পশ্চাত্তের ঝাঁটি  
আগুলাইতে। তাহাদের স্বত্ব-স্ববিধা এবং মঙ্গলের জন্য  
ইংরাজ-সরকারের কোনও দায়িত্ব নাই। এতদ্ব্যতীত সৈন্ত ও  
অফিসার হিসাবে ইংরাজ ও ভারতীয়দের মধ্যে বেতনের  
ভারতম্য ছিল গভীর। ইংরাজগণের তুলনায় অতি নিকৃষ্ট  
শ্রেণীর খাদ্য ভারতীয়গণকে দেওয়া হইত। ইংরাজ  
অফিসারদের নিকট হইতে অত্যন্ত আশঙ্কিত ও অসম্মানজনক  
আচরণ লাভ করা ছাড়া ভারতীয় সৈন্তদের আর কিছুই লাভ  
হইত না। এইরূপ অভিযোগও শুনা যায় যে কমান্ডার কি-  
“তলোয়ার” নামক জাহাজের নৌ-শিক্ষার্থীদের নাকি “কুলী-  
বাচ্চা” ইত্যাদি সভাবণে আপ্যায়িত করিতেন। মুক্ত শেখ  
প্রয়োজন না থাকায় সেমা-বিভাগে ব্যাপকভাবে ছাঁটাইয়ের  
উদ্ভোগ চলিতেছিল। তাহার ফলেও অনেকের সহসা বেকার

হইবার সম্ভাবনা দেখা দেওয়ার অসন্তোষ পুঞ্জীভূত হইতে থাকে  
আজাদ-হিন্দ কৌজের সেনানীবৃন্দের বিচারকার্য শুরু করার ফলেও  
সেমা-বিভাগের ভারতীয়গণের মধ্যে প্রবল অসন্তোষের সঞ্চার হয়।

নৌ-শিক্ষার্থীরা তাহাদের বিবিধ অভাব-অভিযোগের বিষয় প্রত্যেক  
কর্তৃপক্ষের গোচর করে, কিন্তু তাহাতে কোনই ফল হয় না। কোনও  
ব্যবহাৰলব্ধনের চেষ্টাও না করিয়া কর্তৃপক্ষ উহা সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা  
করেন। ১৯৪৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের গোড়ার দিকে ভারতীয়  
নৌ-বহরের প্রধান সেনাপতি ভাইস-এডমিরাল গডফ্রে বথন বোম্বাই  
পোতাশ্রয়ে “তলোয়ার” নামক জাহাজে পরিদর্শন করিতে যান, তখন  
পি. সি. নত নামক জনৈক টেলিগ্রাফিষ্ট জাহাজের দেওয়ালে “ভাঃ  
হাড়” “জয় হিন্দ” প্রভৃতি লিখিয়া দেন। এই অপরাধের জন্য পি. সি.  
নতকে প্রেস্তার করা হয়।



কর্তৃপক্ষ চেষ্টা করিলে পি. সি. স্ট্রের আচরণের মধ্যেই নৌ-শিক্ষার্থীদের মনোভাবের পরিবর্তন অনুধাবন করিতে পারিতেন। ব্রিটিশ-সাম্রাজ্যের পাকা বনিয়াদে যে যুগ ধরিয়াছে—ভারতবাসীদের “ভারত ছাড়” দাবী যে সময়-বিভাগের ভারতীয়গণেরও দাবীতে ডাড়াইরাছে—তাহা ছয়রহন করিতে তাঁহার চেষ্টা করিলেন না। চরিত্রিত সাম্রাজ্যবাদীমূলক মনোভাব লইয়াই তাঁহার ঘটনাকে আরও পরিবার চেষ্টা করিলেন। কল যাহা হইবার তাহাই হইল—রক্ত রোব যথেষ্ট ধর্মঘটের আকারে, পরে এতও বিজোহে আত্মপ্রকাশ করিল। তলোয়ার” জাহাজের নৌ-শিক্ষার্থীদের মধ্যে ধর্মঘট এখন শুরু হইল এই কেন্দ্রমণি হইতে। প্রায় ১১০০ নৌ-শিক্ষার্থী এই ধর্মঘটে অংশ গ্রহণ করিল।

অসন্তোষ ক্রম বিস্তারলাভ করিতে লাগিল। “কলাবতী,” “আউথ,” নাসিক” ও “নিলান” জাহাজও পরের দিনই যোগদান করিল এই ধর্মঘটে। ইহাতে ধর্মঘট নৌ-সৈন্য ও নৌ-শিক্ষার্থীদের সংখ্যা ডাড়াইল প্রায় ২০,০০০। ইহার পর ক্রমশঃ “আকবর,” “মাতলিমার,” “কিরোজ” প্রভৃতি জাহাজের নৌ-শিক্ষার্থীরা এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রের অনিচ্ছাও ধর্মঘটে যোগদান করার কলে ধর্মঘটীদের জি প্রভূত পরিমাণে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইল। বোম্বাই শহরের জিপথে ধর্মঘটীদের এক বিরাট শোভাযাত্রা বাহির হইল। সকল লরী তাহাদের দখলে ছিল, সেগুলির উপরে কংগ্রেস ও লীগের পতাকা এবং লালখাঙা উড়াইয়া শোভাযাত্রা বাহির করা হইল। বিক্ষুব্ধ ধর্মঘটীরা যে রীতিমত শান্তিপূর্ণ রহিল, তাহা নহে। কোথাও কোথাও তাহারা ইংরাজ-সৈনিক অথবা পুলিশ অফিসারদিগকে হার করিতেও দ্বিধা করিল না। কতকগুলি ইউরোপীয় তিষ্ঠানও তাহাদের দ্বারা আক্রান্ত হইল। ধর্মঘটীদের মধ্যে কোনও শৃঙ্খলাই বজায় রহিল না। ২১শে তারিখের দ্য বোম্বাই পোস্তাশ্রয়ের প্রায় কুড়িখানি জাহাজ বিজোহীদের হাতে চলিয়া গেল—এমন কি, প্রধান সেনাপতি স্বয়ং যে জাহাজখানিতে কেন, সেই ক্লাগসিপ “নর্দানা” পর্যন্ত বাদ পড়িল না। সবগুলি জাহাজের উপরই ব্রিটিশ পতাকার পরিবর্তে কংগ্রেস ও লীগের পতাকা ভাড়া পাইতে লাগিল।

নৌ-বিজোহে শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বোম্বাই শহরের অধিবাসীরাও গুল হইয়া উঠিল। ধর্মঘটীদের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন নাগরিকগণ ও হইয়া বোম্বাইয়ের গিরগাঁও ও কলবাসেরী অঞ্চলে ট্রাম-বাস সিয়া আগুন ধরাইয়া দিতে লাগিল, সরকারী অফিস প্রভৃতি ক্রমশঃ লুণ্ঠ করিতে লাগিল, ব্রিটিশ সৈন্য ও পুলিশের সহিত লড়াই করার জন্য হানে হানে ব্যারিকেড রচনা করিল। সমগ্র বোম্বাই শহরে সা-হাঙ্গানী আরম্ভ হওয়ার পূর্ণমাত্রার অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলা বিরাজ করিতে লাগিল। পুলিশ ও সৈন্যগণ বিভিন্ন স্থানে বহবার গুলি চালাইল।

নৌ-ধর্মঘটীদের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শনের জন্য বোম্বাইয়ের মেরিন-

ড্রাইভ ও আর্মেরী এলাকার ভারতীয় বৈমানিকগণও ধর্মঘট শুরু করিল। বাংলার কলিকাতার উপকণ্ঠস্থিত বেহালার নৌ-শিক্ষার্থীরা, মাথেরহাটের নৌসৈন্যগণ এবং “হুগলী” জাহাজের নৌ-শিক্ষার্থীরাও ধর্মঘটে আরম্ভ করিল। মাত্রাজে “আদিয়ার” রণপোতের নৌসৈন্যেরাও কাজ বন্ধ করিয়া দিল। বিজোহে কিন্তু প্রবল আকারে দেখা দিল করাচীর বন্দরে। সেখানকার “হিমালয়,” “বাহাদুর,” “চমক” এবং “হিন্দুস্থান” প্রভৃতি বিজোহে যোগদান করিল এবং তাহাদের নেতৃত্ব করিতে লাগিল “হিন্দুস্থান”। “হিন্দুস্থান” জাহাজের নৌসৈন্যেরা একেবারে চরম-পত্র দিয়া বসিল। তাহারা সোজাজি-জানাওয়া দিল, যে, সন্ধ্যা ছয় ঘটিকার মধ্যে তাহাদের দাবী স্বীকার করিয়া না লইলে তাহারা সৈন্যদের উপর গুলি চালাইবে। ইহার পর সামরিক পুলিশ “হিন্দুস্থান”-এর উপর গুলিবর্ষণ করিল—“হিন্দুস্থান” তাহার প্রত্যুত্তর দিল দুইটি কামান হইতে গোলাবর্ষণ করিয়া। সিগন্ডালের দ্বারা ইঙ্গিত করিয়া “হিন্দুস্থান” করাচীর অন্ত্যস্ত বিজোহী জাহাজগুলিকে আবশ্যক নির্দেশাদি দান করিতে লাগিল।



নৌ-বিজোহীদের সমর্থনে বোম্বাই-এ গণ-বিক্ষোভ। মিলিটারির গুলিতে নিহত কর্মকর্তা

আজাদ-হিন্দ কোর্স ভারতীয় সৈন্য-বিভাগে যে ভাবন ধরাইয়াছিল, নৌ-বিজোহে তাহা আরও গুরুতর আকার ধারণ করিল। সামরিক সংগঠনের বিভিন্ন বিভাগে ভারতীয়গণের যে ঐকান্তিক আত্মগত্যের উপর ব্রিটিশ-সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা সূচক ছিল, ইংরাজ কূটনীতি ও সশস্ত্রনীতিবিদগণ বুঝিতে পারিলেন যে তাহা আর বিন্দুমাত্র নির্ভরযোগ্য নহে। যে বিজোহে নৌ-বিভাগে শুরু হইয়াছে, যে কোন মুহূর্তে অন্ত্যস্ত বিভাগেও তাহার সংক্রমণ সংঘটিত হইতে পারে। অসন্তুষ্ট জনসমষ্টি, বিরুদ্ধ আন্তর্জাতিক পরিবেশ এবং বিজোহী সৈন্যদল লইয়া তাহারা বারবার তৃপ্তি বসিয়া আছেন—যে কোনও মুহূর্তে বিক্ষোভ ভয়াবহরূপে আরও প্রচণ্ড হইতে পারে। ক্রমশঃ সত্য সত্যই ভারত হইতে ব্রিটিশ সিংহের সমস্তাৎ প্রস্থানের সময় সমাগত হইয়াছে। ক্ষমতা হস্তান্তর সম্বন্ধে তখনও কর্তৃপক্ষের মনে বেটুকু ইতস্ততঃ ভাব ছিল, নৌ-বিজোহে শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাহা দূরীভূত করিয়া বাস্তব সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে হইল।

নৌ-বিজোহে শুরু হওয়ার একদিন পরেই ১৯৪৬ সালের ১৯শে



কেজারি বিলাতের শ্রমিক গণতর্পমেন্ট ভারত সম্পর্কে এক সিদ্ধান্ত ঘোষণা করিলেন। তাহাতে বলা হইল যে, ভারতে শীঘ্রই এক মজি-মিশন প্রেরিত হইবে এবং ভারত যাহাতে দ্রুত স্বাধীনতা লাভ করিতে পারে, তাহা সাহায্য করিবার জন্য তাহার ভারতের নূতন শাসন-ভর্য সর্বত্র ভারতীয় নেতৃত্বের সহিত আলোচনা করিবেন।

কয়েকদিন যাবৎ নৌ-সৈন্তগণ ক্যাসল ব্যারাকের মধ্যে ঘাঁটি করিয়া ব্রিটিশ সৈন্তগণের সহিত তুলস সংগ্রামে রত রহিল। ব্যারাকের অভ্যন্তরস্থ অস্ত্রাগারটি রহিল তাহাদেরই দখলে। ২১শে তারিখে রাজ্জে ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী মিঃ এ্যাটলি কমন্স সভায় এক বিবৃতি দিয়া জানাইলেন, যে, ঘটনাক্রমে আরও আনিবার জন্য ব্রিটিশ নৌ-বহরের একটা বড় দল বোম্বাই বন্দর অভিমুখে ইতিমধ্যেই যাত্রা করিয়াছে। নরাদিহীর প্রধান কেন্দ্র হইতেও ঘোষণা করা হইল, শক্তিশালী নৌ, স্থল ও বিমানবাহিনী বোম্বাই, পুণা ও করাচীতে প্রেরিত হইয়াছে। ভারতীয় নৌ-বহরের প্রধান সেনাপতি ভাইস এ্যাডমিরাল গডফ্রে ঐ ২১শে তারিখেই বোম্বাই বোতর-কেন্দ্র হইতে নৌ-বিক্রোহীদের উদ্দেশ্যে এক ভাষণে জানাইলেন, বিক্রোহীদের অভাব-অভিযোগ সম্পর্কে তদন্ত করা হইবে এবং সত্যসত্য দাবীগুলি পূরণ করারও চেষ্টা করা হইবে—কিন্তু বিক্রোহীদেরকে করিতে হইবে বিনা সর্বোচ্চ আত্মসমর্পণ। তিনি স্মরণ করাইয়া দিলেন, গণতর্পমেন্টের শক্তি অল্প সবে এবং প্রয়োজন হইলে সমগ্র শক্তি বিক্রোহ-দমনে নিয়োজিত হইবে; এমন কি, সেজন্য প্রয়োজন হইলে তাহাদের গৌরবের নৌ-বহরকে ধ্বংস করিয়া ফেলিতেও তাহারা সক্ষম করিবেন না।

২১শে কেজারি রাজ্জে ভারতীয় নৌ-বহরের একটা দল গিরা বোম্বাই বন্দরে প্রহার করিয়া মিস্ত্র হইল এবং কয়েকখানি জাহাজ ও বোম্বার বিমান উপর হইতে পর্যবেক্ষণ কার্য চালাইতে লাগিল। উভয় পক্ষ হইতেই সারা রাত্রি গুলি ও গোলা বর্ষিত হইতে লাগিল।

বোম্বাই শহরের অবস্থা আরও চরমে উঠিল। ২২শে তারিখে জনসাধারণ কতকগুলি অঞ্চলে এতই বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল যে, পুলিশ ও মিলিটারি নানা স্থানে বহবার গুলি চালনা করিল। সেদিনের গুলি বর্ষণে নিহত হইল প্রায় ৬০ জন এবং আহত হইল প্রায় ৬০০ ব্যক্তি। জনসাধারণ সেদিন আনুমানিক ৪০ খানি সামরিক লরি আগুন লাগাইয়া পুড়াইয়া দিল, ১২টি ডাকঘর ও ৩০টি র‍্যাশন দোকান লুণ্ঠ করিল এবং ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের ৩টি শাখা আক্রমণ করিয়া জিনিষ-পত্র জালিয়া গুড়াইয়া লুণ্ঠও করিয়া দিল। দাঙ্গা-হাঙ্গামা এতই প্রচণ্ড আকার ধারণ করিল যে, কয়েক স্থলে মিলিটারি ও পুলিশের সহিত জনতার রীতিমত লড়াই হইয়া গেল। সরকারী পক্ষে নিহত হইল একজন কনষ্টেবল এবং আহত হইল ১০ জন কনষ্টেবল এবং ৩৭ জন অফিসার।

বোতর মারকত নৌ-সেনাপতির ভীতি প্রদর্শনে কোনও কল কলিল না। ইতিকর্তব্য নির্ধারণের জন্য কেন্দ্রীয় ধর্মঘট কমিটির প্রতিনিধিবৃন্দ

জাতীয় নেতৃত্বের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন এবং তাহাদের নির্দেশ প্রার্থনা করিলেন। শ্রীপুরবোম্বদাদ ত্রিকমদাদ, সর্দার বলভতাই প্যাটেল, জনাব মহম্মদ আলি জিন্না প্রভৃতি নেতাগণ বিক্রোহীদেরকে আত্মসমর্পণ করিতে বলিয়া শান্তির জন্য আবেদন জানাইলেন। সর্দার প্যাটেল আরও জানাইলেন যে, নৌ-সৈন্তগণের অভাব-অভিযোগ পূরণের ব্যাপারে এবং তাহারা যাহাতে শান্তি না পায় সে বিষয়ে কংগ্রেস যথাসাধ্য চেষ্টা করিবে।

ইহার পর ২২শে কেজারি রাজ্জে “তলোয়ার” জাহাজে কেন্দ্রীয় ধর্মঘট কমিটির যে অধিবেশন হইল, তাহাতে জাতীয় নেতৃত্বের উপদেশ ও আবেদন অনুযায়ী বিনা সর্বোচ্চ আত্মসমর্পণ করারই সিদ্ধান্ত গৃহীত হইল। পরদিন ভোর ৬টা ১৩ মিনিটের সময় আত্মসমর্পণের নির্দেশমূলক সাক্ষাতিক, বার্তা বিক্রোহী ঘাঁটিগুলিতে প্রেরণ করা হইল। বিভিন্ন ঘাঁটির বিক্রোহী নৌ-সৈন্তগণ এবং জাহাজগুলি ইহার পর একে একে আত্মসমর্পণ করিল। করাচীতে ইহার একদিন পূর্বেই বিক্রোহের পরিসমাপ্তি ঘটে। ২২শে তারিখে উভয়পক্ষে প্রবলভাবে গোলাগুলি বিনিময়ের পর ব্রিটিশ ছত্রীবাহিনীর আক্রমণে নিরুপায় হইয়া সকাল ১১টা ১৫ মিনিট সময়ে “হিন্দুস্থান” এবং অন্যান্য জাহাজ আত্মসমর্পণ করে।

১৮৫৭ সালের সিপাহী বিক্রোহের পর নৌ বিক্রোহের যত এতবড় বিক্রোহ সমরবিভাগে আর ঘটে নাই। পতনশীল ব্রিটিশ-সাম্রাজ্যের ভিত্তি ইহার দ্বারা যেন কম্পিত হইয়া উঠিল।

১৯৪৬ সালের ১৫ই মার্চ ইংলণ্ডের শ্রমিকদলীয় প্রধান মন্ত্রী মিঃ এ্যাটলি আর একটি ঘোষণা জানাইলেন, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়সমূহকে আর সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়গুলির অগ্রগতি ব্যাহত করিতে দেওয়া হইবে না। মজি-মিশন প্রেরণ সম্পর্কে তিনি বলিলেন, ভারতবর্ষ যাহাতে দ্রুত স্বাধীনতা লাভ করিতে পারে, সে বিষয়ে সাহায্য করিবার জন্য তাহার সহকর্ষণ ভারতে গমন করিতেছেন। ভারতের ভবিষ্যৎ শাসন-ব্যবস্থা কিরূপ হইবে, ভারতবাসীদের দ্বারা তাহা স্থিরীকৃত হইবে। তাহারা ইচ্ছা করেন যে, ভারতের জনগণ সত্ত্ব এ সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতা দাবী করিবার অধিকার তিনি স্বীকার করিলেন এবং যথাসম্ভব দ্রুত ও সহজভাবে ক্ষমতা হস্তান্তর করিতে অভিলাষ প্রকাশ করিলেন।

ইহার পর মজি-মিশনের তিনজন সদস্য—ভারত-সচিব লর্ড পেরিক লরেল, বাণিজ্য-সচিব স্যার ট্যাকোর্ড ক্রীপ্স এবং নৌ-সচিব মিঃ এ. ভি. আলেকজান্ডার—২৩শে মার্চ করাচীতে আসিয়া পৌঁছাইলেন। মিশনের নেতা ছিলেন লর্ড পেরিক লরেল। ভারতে আসিয়াই মিশনকে সংখ্যালঘু-সংখ্যাগুরু সম্পর্কীয় মিঃ এ্যাটলির ঘোষণার ব্যাখ্যা করে এবং সম্মুখীন হইতে হইল। উহা ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে তাহারা বলিলেন যে, উক্ত ঘোষণার মুসলমান সম্প্রদায়কে সংখ্যালঘু সম্প্রদায় হিসাবে গণ্য করা হয় নাই; অর্থাৎ তাহার নির্গলিতার্থ এইরূপ দাঁড়াইল যে ভারতকে আকস্মিক ভিত্তিতে বিভাগ করিলে যে সব এলাকায় মুসলমানগণ

সংখ্যাগরিষ্ঠ, সে সকল স্থানে তাঁহারা সংখ্যাগরিষ্ঠ হিসাবেই পরিগণিত হইবেন। এইভাবে ভারতকে অখণ্ডভাবে বিচার না করিয়া মুসলমান-গণকে সমগ্র ভারতে সংখ্যালঘু সম্প্রদায় হিসাবে বিবেচিত হওয়ার আশঙ্কা হইতে মুক্ত করা হইল। ইহার পূর্বে বড়লাট লর্ড ওয়াভেল একবার ঘোষণা করিয়াছিলেন যে, ভৌগোলিক, সামরিক এবং অর্থ-নৈতিক দিক দিয়া ভারত অখণ্ড—ইহার উপর পাকিস্তানী-অস্ত্রোপচার চলিবে না। মন্ত্রী-মিশনের ব্যাখ্যায় কিঙ্ক পাকিস্তানের আশাবই যেন উঁকিঝুঁকি মারিতে লাগিল।

ভারতে উপস্থিত হইয়া বিভিন্ন সম্প্রদায় এবং দলকে তাঁহাদের বক্তব্য এবং প্রস্তাবসমূহ মন্ত্রী-মিশনের নিকট উপস্থাপিত করিবার জন্য মিশন আমন্ত্রণ জানাইলেন এবং বিভিন্ন দলের নেতৃবৃন্দের সহিত আলাপ-আলোচনা চালাইতে লাগিলেন। আলোচনায় প্রথম পর্যায় শেষ করিয়া মন্ত্রীমণ্ডল বিশ্রাম গ্রহণের উদ্দেশ্যে কয়েক দিনের জন্য ১৯শে এপ্রিল তারিখে কান্দ্রীর গমন করিলেন। তাঁহাদের কান্দ্রীর হইতে প্রত্যাবর্তনের পর ৫ই মে হইতে মন্ত্রী-মিশনের সদস্যগণ, বড়লাট এবং কংগ্রেস ও লীগনেতৃবৃন্দের ত্রিভুজীয় বৈঠক সিমলায় হুজ হইল; কিঙ্ক মুসলিম লীগের পাকিস্তান দাবী এবং কংগ্রেসের অখণ্ড ভারত দাবীর টানা-হেঁচড়ায় ১২ই মে সন্ধ্যায় বৈঠক ভাঙ্গিয়া গেল।

মন্ত্রী-মিশনের সহিত আলাপ-আলোচনায় প্রবৃত্ত হইবার পূর্বে কংগ্রেসের পক্ষ হইতে এই প্রতিশ্রুতি আদায় করিয়া লওয়া হইয়াছিল যে, কংগ্রেস ও লীগের মধ্যে কোনও মীমাংসা সম্ভব না হইলেও ভারতবর্ষ সম্বন্ধে শ্রমিক গভর্নমেন্টের ঘোষণাকে কাঁধে পরিণত করিতে হইবে; হুতরাং বৈঠক ভাঙ্গিয়া গেলেও মন্ত্রী-মিশনের কার্য শেষ হইল না। উভয় দলের মধ্যে কোনও মীমাংসা সম্ভব না হওয়ার এক বিবৃতি মারফত বড়লাট এবং মন্ত্রীমণ্ডল দুঃখ প্রকাশ করিলেন এবং ইহাও জানাইলেন যে, আলোচনা ব্যর্থ হওয়ার সকল উত্তোষ শেষ হইল না; পরবর্তী কর্তব্য সম্বন্ধে নীচুই এক ঘোষণা করা হইবে।

সেই ঘোষণা প্রকাশিত হইল ১৬ই মে। উহাতে গণ-পরিষদ গঠন এবং ভারতের ভবিষ্যৎ রাষ্ট্রীয় রূপ সম্বন্ধে সুপারিশের আকারে এক পরিকল্পনা প্রচারিত হইল। পরিকল্পনার দুইটি অংশ—একটি দীর্ঘ-মেয়াদী ও অপরটি স্বল্পমেয়াদী। দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনার পররাষ্ট্র, দেশরক্ষা এবং বানবাহন ব্যতীত অপর সমুদয় ক্ষমতা প্রাদেশিক ও দেশীয়রাজ্য গভর্নমেন্টসমূহের হস্তে জ্ঞাত করিয়া ব্রিটিশ ভারত ও দেশীয় রাজ্যের সমন্বয়ে এক ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র গঠনের কথা বলা হইল। পররাষ্ট্র, দেশরক্ষা ও বানবাহনের পুরাপুরি কর্তৃত্ব কেবল যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের হস্তে থাকিবে। প্রাদেশিক ব্যবস্থা-পরিষদের সদস্যগণ কর্তৃক সাম্প্রদায়িক অনুপাতে একক হস্তান্তর-যোগ্য ভোটের দ্বারা নির্বাচিত প্রাপ্তবয়স্কের ভোটের ভিত্তিতে প্রতি দশ লক্ষে একজন হিসাবে মোট ৩৮৫ জন সদস্য লইয়া ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের জন্য এক শাসনতন্ত্র-রচনাকারী গণ-পরিষদ গঠিত হইবে। ৩৮৫ জন সদস্যের মধ্যে ব্রিটিশ ভারত হইতে থাকিবেন ২৯২ জন এবং দেশীয় রাজ্য হইতে

৯৩ জন। মুসলিম লীগের পাকিস্তান দাবী আংশিকভাবে পূরণের জন্য ব্রিটিশ ভারতের প্রদেশগুলিকে এভাবে তিনটি মণ্ডলীতে ভাগ করা যাবহা হইল, বাহাতে মুসলমানগণ যে যে অঞ্চল লইয়া পাকিস্তান গঠন করিতে চাহেন, সেই সেই অঞ্চলের প্রাদেশিক শাসন-তন্ত্র প্রণয়নে তাঁহাদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা অক্ষুণ্ণ থাকে। এইরূপ ব্যবস্থা হইল যে, গণ-পরিষদের প্রথম অধিবেশনেই ক, খ ও গ প্রদেশ-মণ্ডলীর অন্তর্ভুক্ত প্রতিনিধিবর্গ পরিকল্পনায় উল্লিখিতমত তিনটি বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত হইয়া তাঁহাদের ঘ ঘ মণ্ডলীর অন্তর্গত প্রদেশসমূহের জন্য শাসনতন্ত্র রচনা করিবেন এবং ঐ সমুদয় প্রদেশ লইয়া মণ্ডলী গঠিত হইবে কি না এবং হইলে কোন্ কোন্ বিষয়ের ভার ঐ মণ্ডলী গ্রহণ করিবে, তাহা স্থির করিবেন। নূতন শাসনতন্ত্র চালু হওয়ার পূর্বে কোনও প্রদেশ ইচ্ছা করিলে উহা যে মণ্ডলীর অন্তর্ভুক্ত আছে, তাহা হইতে বাহির হইয়া আসিতে পারিবে। আলোচনা কমিটির মাধ্যমে দেশীয় রাজ্যগুলির ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে যোগদান সম্বন্ধে আলোচনা করিতে এবং যোগদানের জন্য সর্ব স্থির করিতে নির্দেশ দেওয়া হইল।

স্বল্পমেয়াদী পরিকল্পনায় বলা হইল, যে সকল প্রধান প্রধান দল উপরোক্ত দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা মানিয়া লইবেন, তাঁহাদের মধ্য হইতে সদস্য লইয়া অন্তর্কর্ত্তী কালের জন্য ভারতগভর্নমেন্টে পুনর্গঠিত হইবে।

২৯শে জুন তারিখে মন্ত্রী-মিশনের সদস্যগণ ভারত ত্যাগ করিলেন।

মন্ত্রী-মিশনের সনির্বন্ধ অনুমোদনে কংগ্রেস সর্বসাপেক্ষভাবে দীর্ঘ-মেয়াদী প্রস্তাবটি গ্রহণ করিলেন—কিন্তু স্বল্পমেয়াদী প্রস্তাব স্বীকার করিয়া অন্তর্কর্ত্তী সরকার গঠনে রাজি হইলেন না। মুসলিম লীগ প্রথমে উভয় প্রস্তাবই গ্রহণ করিলেন, কিঙ্ক ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট একমাত্র তাঁহাদের লইয়া অন্তর্কর্ত্তী সরকার গঠনে উচ্ছোঙ্গী না হওয়ার এবং দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনায় মণ্ডলী-গঠন প্রভৃতির ব্যাখ্যা লইয়া মতান্তরের ফলে তাঁহারা পরে আবার স্বীকৃতি বসিলেন। ১৯৪৬ সালের জুলাই মাসে প্রদেশসমূহ হইতে গণ-পরিষদের সদস্য-নির্বাচন সমাপ্ত হইলে দেখা গেল যে, উহাতে কংগ্রেস দলের ২১১ জন এবং লীগের মাত্র ৭৩ জন সদস্য স্থান পাইয়াছেন; হুতরাং বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা (মি: জিন্নার ভাষায় Brute Majority) থাকার ফলে গণ-পরিষদে কংগ্রেসের প্রভাব বিন্দুমাত্রও ক্ষুদ্র হওয়ার সম্ভাবনা ছিল না। তখন ২৯শে জুলাই তারিখের এক অধিবেশনে লীগ কাউন্সিল মন্ত্রী-মিশনের পরিকল্পনা সম্পূর্ণভাবে পরিত্যাগ করিয়া স্বাধীন, সার্বভৌম পাকিস্তানের জন্য প্রত্যক্ষ সংগ্রাম হুজ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলেন। ১৬ই আগষ্ট প্রত্যক্ষ-সংগ্রাম-দিবস হিসাবে পালন করা স্থির হইল।

পণ্ডিত নেহেরু ইতিমধ্যে অন্তর্কর্ত্তী সরকার গঠনের জন্য আমন্ত্রিত হইলেন। লীগও বাহাতে অন্তর্কর্ত্তী সরকারে যোগদান করেন, পণ্ডিত নেহেরু তৎক্ষণাৎ জনাব মহম্মদ আলি জিন্নার সহিত বোম্বাই নগরীতে গিয়া সাক্ষাৎ করিয়া আলাপ-আলোচনা চালাইলেন—কিন্তু লীগের মনোভাবের কোনই পরিবর্তন হইল না। এদিকে ১৬ই আগষ্ট প্রত্যক্ষ-সংগ্রাম-দিবসে নানা স্থানে ভীষণ দাঙ্গা-হাঙ্গামা হুজ

হইল—তদাৰ্থে কলিকাতার দাঙ্গাই হইল ভয়াবহ। উহার পর হইতেই অজাগি নানাহানে দাঙ্গা-হাঙ্গামা চলিল আসিতেছে।

পণ্ডিত নেহেরু নেতৃত্বে ২২রা সেপ্টেম্বর অন্তর্কর্ত্তী সরকার গঠিত হইল। ইহার পর বড়লাট লর্ড ওরাভেলের সহিত লীগ-সভাপতি মিঃ জিন্নার গোপন আলোচনার কলে দীর্ঘ-মেয়াদী পরিকল্পনা মানিয়া লইলেও লীগের পাঁচ জন সদস্যকে ২৬শে অক্টোবর অন্তর্কর্ত্তী সরকারে গ্রহণ করা হইল; কিন্তু ইহার কল শুভ হইল না। দুইটি প্রতিদ্বন্দী দলের আদর্শগত পার্থক্যের জন্য সদস্যগণের মধ্যে মত-বিরোধ এবং অসহযোগিতা তীব্র আকার ধারণ করিল।

২ই ডিসেম্বর হইতে গণ-পরিষদের অধিবেশন শুরু হইবে বলিয়া স্থির হইয়াছিল; কিন্তু অন্তর্কর্ত্তী সরকারে থাকিয়াও লীগের উক্ত গণ-পরিষদ বর্জন করার সিদ্ধান্তে উত্তর হইল এক জটিল পরিস্থিতির। তখন লর্ড ওরাভেল কংগ্রেস, লীগ ও শিখ নেতৃবৃন্দকে লইয়া মিঃ এ্যাটলির আমন্ত্রণে আলোচনার জন্য লন্ডনে গমন করিলেন। কংগ্রেসের তরফে গেলেন পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু এবং লীগের তরফে মিঃ জিন্না। আলোচনার কিছুই শীঘ্রাঙ্গা হইল না। দীর্ঘ-মেয়াদী পরিকল্পনা সম্পর্কে লীগের ব্যাখ্যা সমর্থন করিয়া মিঃ এ্যাটলি ৬ই ডিসেম্বর এক বিবৃতি দিলেও এবং কংগ্রেস সেই ব্যাখ্যাই মানিয়া লইতে সম্মত হইলেও লীগ গণ-পরিষদে যোগদান করিতে রাজি হইল না। লীগ সদস্যগণের অনুপস্থিতি সত্ত্বেও ২ই ডিসেম্বর কিন্তু গণ-পরিষদের প্রথম অধিবেশন বসিল।

১৯৪৭ সালের ২০শে কেক্সরারি মিঃ এ্যাটলি ভারত সম্পর্কে কমল সভার এক চূড়ান্ত ঘোষণা দিলেন। উহাতে বড়লাট হিলাবে লর্ড ওরাভেলের স্থলে লর্ড লুই মাউন্টব্যাটেনের নিয়োগ ঘোষণা করা হইল এবং বলা হইল যে, ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট ১৯৪৮ সালের জুন মাসের মধ্যে ভারত শাসনের সকল দায়িত্ব ও ক্ষমতা পরিত্যাগ করিবেন। ক্ষমতা হস্তান্তরের কাজ অবিলম্বেই আরম্ভ করা হইবে এবং কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক গভর্নমেন্টসমূহ বাহাতে ঐ সময়ের মধ্যে ক্ষমতা গ্রহণের উপযুক্ত হয়, তৎক্ষণাৎ বিশেষ বিশেষ ক্ষমতা প্রদান করা হইতে থাকিবে। সংগ্রহ ব্রিটিশ ভারত উক্ত নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে একায়ত হইয়া ক্ষমতা গ্রহণে ইচ্ছুক না হইলে, কাহার নিকট ক্ষমতা হস্তান্তর করা হইবে, সে বিষয়ে ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট চিন্তা করিয়া দেখিবেন। তখন বিবেচনা করিয়া দেখা হইবে যে, কেন্দ্রীয় সরকার বা অঞ্চল বিশেষে প্রাদেশিক

সরকার অথবা ভারতের বার্ষিক ও ভারপারায়ণতার দিক হইতে অপর কাহার হস্তে ক্ষমতা হস্তান্তর করা যায়। বস্তুতঃ এই ঘোষণার দ্বারা মন্ত্রি-মিশনের পরিকল্পনা কার্যতঃ পরিত্যাগ করা হইল।

ক্ষমতা হস্তান্তরের দায়িত্ব লইয়া মার্চ মাসের শেষ দিকে বড়লাট হইয়া আসিলেন লর্ড লুই মাউন্টব্যাটেন। কংগ্রেস, লীগ ও শিখ নেতৃবৃন্দের সহিত আলোচনার পর তাঁহাদের সম্মতিতে তিনি ৩রা জুন তারিখে ভারত-বিভাগের প্রস্তাব উত্থাপন করিলেন। ইহার কলে বাঙ্গালা ও পাঞ্জাব বিভক্ত হইল—আমাদের শ্রীহট্ট জেলার গণভোট গ্রহণের পর উহা পূর্ববঙ্গের সহিত যুক্ত হইল। উত্তর-পশ্চিম-সীমান্ত প্রদেশেও গণ-ভোট লইয়া উহার পাকিস্তানে যোগদান সাব্যস্ত হইল।

১৯৪৭ সালের ৪ঠা জুলাই ইংলণ্ডের পার্লামেন্ট মহাসভার হাউস অফ কমন্স-এ ভারতীয় স্বাধীনতা-আইন উত্থাপন করা হয় এবং আলোচনাস্থে অতি দ্রুত ১৪ই জুলাই তাহা চূড়ান্তরূপে গৃহীত হয়। বিলটি লর্ড সভায় অনুমোদিত হয় ১৬ই জুলাই তারিখে। রাজা যশ্চন্দ্র ১৮ই জুলাই বিলে সম্মতি দান করিলে উহা আইনে পরিণত হয়।

উক্ত আইন অনুযায়ী ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র ও পাকিস্তান নামে দুইটি নূতন ডোমিনিয়ন গঠিত হয় এবং উক্ত দুইটি ডোমিনিয়নের উপর ব্রিটিশ মন্ত্রি-সভার সর্ববিধ কর্তৃত্ব লোপ পায়। দেশীয় রাজ্যগুলির উপরও ইংলণ্ডের সার্বভৌমত্বের অবদান ঘটে এবং অস্তিত্ব, সংস্কৃতি ও নৈকট্য অনুযায়ী ঐগুলিকে দুইটি ডোমিনিয়নের যে কোন একটিতে যোগদানের অধিকার ও পরামর্শ দেওয়া হয়।

ভারতীয় গণ-পরিষদ শাসন-তন্ত্র প্রণয়নের কার্য চালাইয়া যাইতে থাকেন। ইতিমধ্যে ভারত-রাষ্ট্রের সংগ্রহ দেশীয় রাজ্যগুলিও একে একে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে যোগদান করেন। ১৯৪৯ সালের ২৬শে ডিসেম্বর গণ-পরিষদের শাসনতন্ত্র প্রণয়ন কার্য সমাপ্ত হইয়া ঐদিন উহা চূড়ান্তরূপে গৃহীত হয়। তাহার কলে ১৯৫০ সালের ২৬শে জানুয়ারি মহান্ ভারতীয় গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র ঘোষিত হইয়াছে এবং ভারত বেঙ্গল উপনিবেশ-গোষ্ঠীর মধ্যে থাকিলেও ইংলণ্ডের রাজার প্রতি তাহার আনুগত্যের সমাপ্তি ঘটিয়াছে।

আমাদের স্বাধীনতা-লাভের ইহাই ইতিহাস। স্বাধীনতার বিপুল স্বার্থভাগ এবং আত্মবিসম্বন্ধের উপর এই স্বাধীনতার প্রতিষ্ঠা—তাঁহার চিরদিন পুঞ্জিত হউন।

সমাপ্ত



# বিশ্বের বিখ্যাত পত্রাবলী

ডাঃ শ্রীমাখনলাল রায়চৌধুরী শাস্ত্রী

ভিক্টর হুগোর প্রথম বৈবাহিক পত্র

পত্র পরিচয়—

ফরাসী ভিক্টর হুগো বাঙ্গালী পাঠকের নিকট অপরিচিত নন, তাঁর রচনা “লে মিস্তারেলস,” “হক্, বেক অব্, নতীর দামের” ইংরেজী অনুবাদ শিক্ষিত বাঙ্গালী সাংগ্রহে পাঠ করে।

ফরাসী বিজ্ঞানের সমকালে ১৮০২ সালে বিখ্যাত হুগো পরিবারে তাঁর জন্ম। ১৫ বৎসর বয়সে তাঁর প্রথম কবিতা প্রকাশিত হয়েছিল; ১৯ বৎসর বয়সে তাঁর শৈশব স্ত্রীর সান্নিধ্য এডিলির প্রতি তিনি আকৃষ্ট হন। তিন বৎসর অসংখ্য কবিতা, উচ্ছ্বাস, পত্র বিনিময়, মান অভিমান। ২২ বৎসর বয়সে এডিলিকে বিবাহ করেন। তারপর ভিক্টর হুগোর দুরন্ত চিত্ত শান্ত হয়। Le Dernier Jour d'em Condemne, নামক রচনার মানব-জগতের প্রেক্ষাপটের অপূর্ণ বিশ্লেষণ করেন। প্রেমের আবেদনই ভিক্টর হুগোর শ্রেষ্ঠ গীতি কবিতার উৎস। এই কবিতাগুলি ক্রমশঃ ভিক্টর হুগোকে পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ গীতি কবির আসন দান করেছে।

পরবর্তী জীবনে ভিক্টর হুগো নানা বিষয়ে রচনা আরম্ভ করেন এবং রাজনীতির আকর্ষণে জড়িয়ে পড়েন। তৃতীয় নেপোলিয়নকে তিনি প্রথম নেপোলিয়নের ‘দীর্ঘ সংস্কার’ বলে আখ্যায়িত করেন। Napoleonic Legend, Napoleon le Petit এই দুইটি কথা ইউরোপের ইতিহাসে অবিনশ্বর। কলে ভিক্টর হুগোকে প্রায় ২০ বৎসর নির্বাসন ভোগ করতে হয়েছিল।

এই আলোচ্য পত্রখানি বিবাহের পূর্বে ২১ বৎসর বয়সে লেখা।

সন্ধ্যা—সুক্রবার, মার্চ ১৫

১৮২২ খৃঃ

এডিলি।

আজ রাত্রিতে আর আমি বাইরে যাব না, কাল এবং পরণ্ড দুইটি পক্ষা আমার বেশ কেটেছে, আজ সন্ধ্যার আমি আমার ঘরে বসে থাকব এবং তোমার নিকট পত্র লিখব। এডিলি, আমার কল্পনার এডিলি, তোমাকে বলবার মতন আমার কত কথা আছে জান? গত দুই দিন আমি কেবল আমাকেই প্রাণ করেছি প্রতি মুহূর্তে—এই আনন্দ কি ব্যপ্তির বিলাস রাজ। আমার মনে হচ্ছে আমি যাহা অনুভব করি, তার সঙ্গে পৃথিবীর কোন সন্ধর্ভ নেই। আরও আমি সেখানকার আকাশ পরিকল্পনা করে উঠতে পারি নি।

এডিলি, তুমি ধারণা করতে পারবে না, আমি কত নিঃশব্দে আমাকে নিবেদন করে দিয়েছি। হাই, আমি কি তাই জানি! আমি ছুঁব; তাই আমি ভেবেছিলাম, আমি শান্ত। আমি এক উদ্ভ্রাণ নিরাশায় আচ্ছন্ন হয়েছিলাম, তাই আমি ভেবেছিলাম, আমি নির্ভীক, আমি প্রশান্ত। আজকে আমাকে তোমার চরণ প্রান্তে নিবেদন করবার অধিকার দাও—তুমি কত বিরাট, কোমল, শক্তিময়ী! আমার কেবল মনে হচ্ছে তোমার নিকট আমার আত্মনিবেদনের চরম পরিণতি হবে—তোমার জন্ত আমার আত্ম-বিসর্জন। কিন্তু এডিলি, তোমার প্রেমে আতিশয্যে আমার জন্ত তোমার সমস্ত শান্তি উৎসর্গ করার আরোজ্য করেছ!

এডিলি, গত আট দিন তোমার ভিক্টর কি অদ্ভুত চিন্তা করছে জান? কল্পনায় তোমার অপূর্ণ প্রেমের অর্থ গ্রহণ করেছি যদি আমার পিতা আমার অনুরোধ উপেক্ষা করে অর্থ প্রদানে অসম্মত হন, তবে হয়ত যে কোন উপায়ে কিছু অর্থ সংগ্রহ করে তোমাকে দিই যাব। কারণ, তুমি আমার সঙ্গিনী, বাকুদত্তা, আমার ভবিষ্যৎ পরিণতি। তোমার আমার মিলনে যারা বিশ্ব—ভাদের স্পর্শ খেয়ে বহু দূরে তোমাকে নিয়ে যাব। আমরা ফরাসী দেশ অতিক্রম করে যাব। আমরা এমন দূরদেশে যাব যেখানে আমাদের অধিকা নিঃসন্দেহ। দিনের বেলায় আমরা একই বানবাহনে পথ চলব, রাত্রিতে আমরা একই গৃহতলে হৃদয় লাগ করব।

মহিমময়ী এডিলি! তুমি ভেবো না, আমি তোমার বিশ্বাসে অস্তায় স্রবোগ নেবো, তুমি নিশ্চয় একথা ভেবে আমার উপর অবিচা করবে না আশা করি। তোমার ভিক্টর হুগোর নিকট তুমি অত্যাশঙ্ক্য পাত্রী। আমাদের যাত্রাপথে তুমি নির্ভয়ে নিভা যাবে আমার সঙ্গে একই গৃহতলে; কিন্তু তোমার ভিক্টরের স্পর্শে তুমি আতঙ্কিত হা উঠবে না, তোমার ভিক্টর তোমার প্রতি দৃষ্টিকোণে করবে না। আমি তোমার পার্শ্বে একটা আসনে বসে থাকবো, অথবা তোমার শয্যার নিঃ গৃহতলে বসে তোমার বিশ্রামের প্রহরী হয়ে থাকব। তোমার এই ক্রীতদাস প্রত্যাশা করে যে, সে স্বাধীন অধিকারেই তোমার রক্ষাকর্তা আসন গ্রহণ করবে। তার পর যেদিন পরম্বাজক তাকে অধিকার দেবে.....

এডিলি! তুমি আমাকে যুগা করো না, আমার দুর্বলতাকে ক্ষম করে; তোমার শক্তির প্রাচুর্যে তুমি মহীয়সী। আমার নিঃসঙ্গত আমার আত্মীয় বিচ্যুতি, আমার পিতার অস্বাভাবিকতা একথা বিবেচনা করে দেখো। একটা সপ্তাহ কেটেছে এখন তোমাকে প্রাণ হারিয়েছিলাম, আমার নিরাশায় তীব্রতার তুমি আশ্রয় হনো না

আমার ছোট আদরের বউটী, তুমি যে কত প্রাণের বস্তু ! তোমাকে স্বর্গের অপ্সারার সঙ্গে তুলনা করলে অপ্সারাকে গৌরবাধিত করা হবে। বিধাতা তোমাকে তাঁর সমস্ত সম্পদ অকুণ্ঠ দান করেছেন—তুমি পেয়েছ শৈশব, তুমি পেয়েছ অমূল্য আশ্রয়।

এডিলি ! তুমি ভুল করো না—আমি অন্ধ উচ্ছ্বাসের আবেগে এই কথাগুলি বলে যাচ্ছি—তোমার জন্ম আমার উচ্ছ্বাস আমার জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত নিঃশেষ হবে না—প্রতিদিন আমার উচ্ছ্বাস বেড়ে চলেছে। আমার সমস্ত সখা তোমাতে রূপান্তরিত হয়েছে। আমার সমস্ত জীবন যদি তোমাতে বিলীন না হত, তবে আমার জীবনের স্রব শুষ্ক হয়ে যেত ; আমার মৃত্যু হত, নিরুপায় হয়ে আমাকে মৃত্যু বরণ করতে হত।

এডিলি, এইগুলি অবশ্য আমার কল্পনা। তোমার লিপি আমার মিকট কখনো আশা, কখনো বা হতাশা বহন করে আনত। তুমি যদি বলতে—আমাকে ভালবাস, তুমি জান আমার কি আনন্দ হত ? তুমি যে কি অপূর্ব অমূল্য উপভোগ করেছ তা' আর কল্পনা করব না।

এই অমূল্যের প্রতীক 'আনন্দ' ভিন্ন আর কোন শব্দ রচিত হয় নি কেন বলত ? মানুষের ভাবের শক্তি নেই যে তার ভাবের মধ্য দিয়ে সে এই অমূল্যকে কোন রূপ দেয়। শোকাবহ আত্মবিশ্বাস থেকে অকস্মাৎ এক অপূর্ব আনন্দামূল্য আঞ্জ আমাকে বিহ্বল করেছে। এই মুহূর্তে আমি আমারই পার্শ্বে বসে আছি ; তবু আমি মাঝে মাঝে আতঙ্কিত হয়ে উঠি এই বৃষ্টি আমার দিবা স্বপ্নামূল্য থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়ব।

আজ তুমি আমার এডিলি ! এতদিন পরে তোমাকে আপনার ভাবতে পারছি। কয়েক মাসের মধ্যেই, আশা করি, আমার অপ্সরা আমার বাহপাশে ঘুমিয়ে পড়বে, আমার বাহপাশে জেগে উঠবে, আমার বাহুর আধরণে জড়িয়ে থাকবে, সর্বস্ব তোমার সকল চিন্তা সর্বস্ব তোমার সকল দৃষ্টি আমাকে কেন্দ্র করে নিবিড় হয়ে থাকবে, আমার দৃষ্টি আমার চিন্তা তোমারই হবে, আমার এডিলি !

এবার তুমি আমার হবে, একান্ত আমার, একমাত্র আমার। আজকে আমার মর্ত্যলোকে স্বর্গের আনন্দ উপভোগের দিন। আজকে তুমি আমার মনোরমীতা প্রীতি, তারপর তুমি না হবে—আমার সন্তানের জননী। কিন্তু তুমি আমার চিরন্তন প্রথম দিনের মতই কমলী।

বিবাহিত জীবনের পরিণতিতেও তুমি কুমারী জীবনের মত কুমারী থাকবে। প্রেম কার্যে, বল, বল তুমি, তুমি কি চিরন্তন বিবাহ বন্ধনের মধ্যে অবিদ্বন্দ্ব প্রেমের আনন্দের পরিকল্পনা করতে পার ? অবশ্য সেদিন আমাদের আসবে...এসেছে।

এডিলি, কোন বাধাই আজ আমাকে নিরুৎসাহ করতে পারছে না। তুমি মনে করো না যে, আমি তোমাকে মিনতি জানাচ্ছি। আমি কেবল লিখছি, লিখেই চলেছি, আমার গৌরবে তুমি গরবিনী হবে। এই বিশ্রামহীন পরিশ্রম কত আনন্দ বহন করে আনে জানত। আমি সহস্রবার ভগবানকে মিনতি জানিয়েছি—আমার সমস্ত জীবনের বিনিময়ে যদি তোমাকে একটু আনন্দ দিতে পারি। আজ আমি কত সুখী, আমি কত সুখী হতে চলেছি !

এডিলি, আমার স্বর্গের দেবী, আমার প্রিয়তমা এডিলি। বিদায়। তোমার সুকোমল কেশদাম চূষন করে আমি আমার শয্যা কিরে যাব। আমি তোমার কাছ থেকে বহুদূরে, কিন্তু তোমার স্বপ্ন যে আমার কত কাছে। এই কয়েকদিন পরেই তুমি আমার পার্শ্বে এসে পড়াবে। বিদায়। তোমার স্বামী এই বিহ্বলতাকে ক্ষমা করো। তার আলিঙ্গন গ্রহণ করো, আমার প্রজ্ঞা গ্রহণ করো। ইহলোকে আর পরলোকে। তোমার আলেখ্য ?

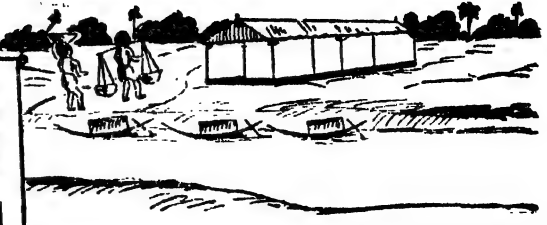
পত্র পরিণাম :—

ভিত্তর হগো অভিজাত পরিবারের সন্তান। তার পিতা নেপোলিয়ানের যুগের সৈন্যধ্যক্ষ। এই বিবাহে ভীষণ আপত্তি। কিন্তু ভিত্তর গোপনে এডিলির সঙ্গে বিবাহ স্থির করলেন। শেষে বাধ্য হয়ে দুই পরিবারই বিবাহে মত দিয়েছিলেন। এই বিবাহের পরে ভিত্তর হগোর জাতি ইয়ুজেন হগো হঠাৎ বিকৃতমস্তিষ্ক হয়ে পড়ল। তাকে বাতুল আশ্রমে প্রেরণ করা হল। এই উন্নয়নের কারণ এডিলির প্রতি নিফল আকর্ষণ।

এডিলি বহু হস্তানের জননী ; বহু সন্তান মৃত। স্বামীর গর্বে এডিলি গর্বিতা। কিন্তু ভিত্তর হগো সেই প্রেমের মর্যাদা রক্ষা করেন নি। তরল ফরাসী সমাজ জীবনের আকর্ষণ থেকে ভিত্তর হগো মুক্তি পান নি, সমাজের পক্ষিল স্পর্শ তাকে নানাভাবে কলুষিত করেছিল।



# দ্বারমণ্ডল



তারাক্ষর বন্দ্যোপাধ্যায়

( পূর্বপ্রকাশিতের পর )

ঠিকানা আসিয়াছে জেলার সদর হইতে। এ জেলায় বুদের যে দলটি আছে সেই দলের সেক্রেটারী থিয়াছেন। লিখিয়াছেন—“কোন . রকমে সরকারী আপন খবর পেলাম যে, আগামী হাটবারে আই-বি পার্টমেন্টের একটা দল ওখানে যাবে। এস-পি যাবে গের দিন। দরবারী শেখ আজ রওনা হবে। বিশেষ ছু একটা ঘটবে তাতে সন্দেহ নেই। পত্র পাওয়া মাত্র গুর সম্ভব সাবধানতা অবলম্বন করবেন। সম্ভবত পুলিশ রও কাছ থেকে খবর পাচ্ছে।”

দেবুজ কুণ্ডিত করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। অনেকক্ষণ ভা করিল, ঠিক করিয়া লইল কি কি করিতে হইবে।

কংগ্রেসের মধ্যে দেবুদের যে উপদলটি এখানে আছে হারা নিজেদের মত ও পথ অমুযায়ী হাটের দিন অত্যন্ত ক্রিয় হইয়া ওঠে। হাটের দিন এখানকার চারিদিক তে যে বিপুল জনসমাগম হয় তাহার সুবিধা তাহার হণ করে। পল্লীতে পল্লীতে যে সব গ্রাম্যকর্মীরা আছে হারা নিজেদের কাজেই হাটে আসে, তাহাদের সঙ্গে থা হয়, তাহাদের হাত দিয়া প্যান্ফলেট পাঠায় গ্রামে-মে। এই সব লোকদের মধ্যে যাহারা বিশেষভাবে হাদের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছে তাহাদের লইয়া বৈঠক দ। তাহাদের নিকট হইতে গ্রাম্যসংবাদ সংগ্রহ রে। বিশেষ করিয়া গ্রাম্য-বিরোধের সংবাদ। জমিদার-জা, মহাজন-খাতক, জোতদার-কৃষাণ, ধনী-দরিদ্রের ধ্য বিরোধ বাধিলে সেই সব বিরোধের ক্ষেত্রে তাহার দা-খাতক-কৃষাণ-দরিদ্রদের প্রতি সহানুভূতি জানায়—ম্যকর্মীদের সক্রিয়ভাবে সাহায্য করিতে নির্দেশ দেয়। রও নানা আলোচনা গল্প হয়। দেবুদের দলের বাদগত দৃঢ় বিশ্বাস এই যে, স্বাধীনতা আন্দোলনে যে

সংগ্রাম আসিতেছে সে সংগ্রাম সামগ্রিকভাবে বিপ্লবাত্মক না হইলে কোন ক্রমেই সার্থক হইবে না। এক সঙ্গে তাহারা রাষ্ট্র এবং সমাজ দুই ব্যবস্থাকেই প্রচণ্ড আঘাত হানিয়া ভাঙিয়া দুই ব্যবস্থাকেই নূতন করিয়া গড়িবে। বিশ্বনাথের কাছে একদিন এই সব কথা শুনিয়া সে শিহরিয়া উঠিয়াছিল, কিন্তু ধারে ধীরে দলগত মতবাদ সংক্রান্ত বই পড়িয়া, অর্থনীতিশাস্ত্রে বি-এ পাশ করিয়া এবং দলের বিভিন্ন নেতার কাছে শিক্ষালাভ করিয়া আজ এমনই দাঁড়াইয়াছে যে এই ছাড়া আর কোন পথ তাহার দৃষ্টির সম্মুখে নাই। তাহার দৃষ্টির সম্মুখে প্রসারিত এই দুর্গম পথের শেষ প্রান্তে তাহার কল্পজগত সে স্পষ্ট দেখিতে পায়। সেখানে সে দেখিতে পায় অপরূপ এক রাজ্য—অপূর্ব এক মানুষের সমাজ। মানুষে মানুষে ভেদ নাই, ব্রাহ্মণ নাই—শূদ্র নাই—চণ্ডাল নাই, হিন্দু নাই—মুসলমান নাই—খৃষ্টান নাই; ধনী নাই—দরিদ্র নাই, রাজা নাই—প্রজা নাই, শোষক নাই—শোষিত নাই, আছে শুধু মানুষ, ভেদ নাই তাই বিরোধ নাই, বিরোধ নাই তাই মিথ্যা নাই; আছে শুধু মানুষ আর পৃথিবীর কর্মক্ষেত্র ও কর্ম। মানুষ আপন আপন সাধ্য অমুযায়ী কাজ করিয়া যায়, প্রত্যেকে কাজ করে সকলের জন্ত, সকলে কাজ করে প্রত্যেকের জন্ত। শুধু তাহার ভারতবর্ষকেই দেখে না, তাহারা দেখে সমগ্র পৃথিবীকে। ভারতীয় কম্যুনিষ্ট পার্টির একটি শাখা, দেবু এই শাখার সেক্রেটারী। ইহারা চরমতম উগ্রপন্থী বলিয়া ইংরাজ সরকার কঠিন দৃষ্টি রাখিয়াছেন। আরও কয়েকটি বামপন্থী দল কংগ্রেসের মধ্যেই আছে—কংগ্রেসী সমাজতন্ত্রী দল। কিন্তু কংগ্রেসী সমাজতন্ত্রী দলের কোন শাখা এখানে নাই। দেবুদের দলের একটা বিশেষ সুবিধা আছে, বিগত যুগের বিশিষ্ট বৈপ্লবিক কর্মীদের অনেকে এই মত—সেই সঙ্গে এই দলকে গ্রহণ করিয়াছেন; আরও



সুবিধা—আছে—সেইটাই খুব বড় সুবিধা—এই দলের ভাঙারে অর্থ আছে।

দেবু মনে মনে স্থির করিয়া লইল কি কি করিতে হইবে। হাটবার আগামী শুক্রবার, আজ সোমবার। দরবারী শেখ নামক পুলিশ কর্মচারীটি কাল সকালে আসিয়া পৌঁছিবেন। লোকটি আকৃতিতে প্রকৃতিতে একেবারে সয়তান। উপরের ঠোঁটটা জন্মকাল হইতেই কাটা—এদেশে বলে—গম্মা কাটা—ইংরাজীতে যাহাকে বলে হেয়ার-লিপস। কাটা ঠোঁটের ফাঁক দিয়া উপরের মাড়ির দুইটা দাঁত বাহির হইয়া থাকে। এ জেলার পুলিশ সাহেব সমশের সাহেবের ডান হাত—উপযুক্ত অস্ত্র। সমশের খান অল্পবয়সী—আই-পি। কিন্তু ইহারই মধ্যে ইংরাজ পুলিশ-কর্মচারীদের নেক নজরে পড়িয়াছে। উনিশ শো তিরিশ সালে মেদিনীপুরে সত্যাগ্রহীদের উপর চরমতম অত্যাচার করিয়াছিল এই খান সাহেব। এ জেলায় আসিয়া বিরাট ষড়যন্ত্র আবিষ্কার করিয়া এক ষড়যন্ত্র মামলা করিয়া উপরে নাম কিনিয়াছে। ষড়যন্ত্র মামলার কথা শ্রবণ করিলে দেবুর হাসি পায়। দেবু তখন অন্তরীণ অবস্থায় জেলের মধ্যে ছিল বলিয়াই রক্ষা পাইয়া গিয়াছে। আসামীদের মধ্যে একজনের স্বীকৃতি অমুযায়ী একটা বড় দীঘি হইতে একটা ট্রাক উদ্ধার করা হয়। সে নাকি বলিয়াছিল যে, ডাকাতি করিয়া ছয় মাস আগে এই দীঘিতে ট্রাকটা ডুবাইয়া রাখা হইয়াছে, ট্রাকের ভিতর নগদ টাকা—একটা রিভলভার কিছু গহনা লুকানো ছিল। গহনার মধ্যে ছিল একছড়া সোনার চেন ও সোনার ঘড়ি। মহা সমারোহ করিয়া মাসখানেক ধরিয়া দিবারাত্রি চৌকীদার-পাহারার মধ্যে প্রচুর খরচ করিয়া দিল্লীর জল মারিয়া সেই ট্রাক বাহির করা হইয়াছিল। এখানকার জেলা ম্যাজিস্ট্রেট তরুণ বাঙালী আই-সি-এস আগাগোড়াই এই মামলাটিকে সন্দেহের চক্ষে দেখিয়াছিলেন বলিয়া খান সাহেব ওই ট্রাক উদ্ধারের সময় উপস্থিত থাকিতে অমুযোগ করিয়াছিলেন। ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব কোতূহলবশত গিয়াছিলেনও। সত্যই ট্রাক উঠিয়াছিল, ট্রাকের মধ্যে স্বীকারোক্তি অমুযায়ী প্রত্যেকটি জিনিষও মিলিয়াছিল। কিন্তু একটা অঘটন ঘটিয়াছিল—ছয় মাস পূর্বে জলে ডুবানো ট্রাকটার মধ্যে রাখা ঘড়িটার সেকেন্ডের

কাঁটাটাকে টিক্ টিক্ শব্দে চলিতে দেখা গিয়াছিল। ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব ঘড়িটা হাতে লইয়া খান সাহেবকে বলিয়াছিলেন—কি মেকারের ঘড়ি খানসাহেব? এক দশে ছ মাস চলছে? অদ্ভুত!

সামসের সাহেব দেখি—দেখি বলিয়া ঘড়িটা হাতে লইয়াছিলেন—সবিস্ময়ে বলিয়াছিলেন—কই? চলছে কই? না তো! বলিতে বলিতেই ঘড়িটা তাঁহার হাত হইতে বাঁধানো ঘাটের উপর পড়িয়া চুরমার হইয়া গিয়াছে। তাহার পরই সামসের সাহেব গেলেন কলিকাতায় দিন দুয়েক পরে ফিরিয়া আসিলেন। তখন ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের কাছে তার আসিয়াছে—অবিলম্বে জেলায় সদরে গিয়া জেলার ভার গ্রহণ কর। তোমাকে বদলী করা হইল।

কিছুদিন আগে—বৎসর দুয়েক আগে—আরও একট বিচিত্র রাজনৈতিক মামলা হইয়া গিয়াছে। জেলার সদর শহর হইতে ষ্টেশনে বাইবার পথে একটা নির্জন বসতি হীন স্থানে ডাক-লুট হইয়াছিল। ইনসিওর এবং পোষ্টাফিসের টাকা লইয়া প্রায় হাজার কয়েক টাক ছিল। ওই অপরাধে জেলার কংগ্রেস প্রেসিডেন্টের এবং ছেলের এবং আরও দুইটি ছেলেকে দীর্ঘকাল জেলে রাখির অবশেষে ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। ডাকলুটের কোটা কিনারা হয় নাই। প্রকাত কিনারা হয় নাই। কি এই দরবারী শেখ যে খানায় এস-আই ছিলেন সেই খানার এক কনেটবল স্থানীয় পোষ্টাফিসে মণিঅর্ডার করিতে গিয়া পোষ্টমাষ্টারের হাতে ধরা পড়িয়াছিল তাহার নোটের নম্বরে এবং আরও কতকগুলি চিহ্ন সঙ্গে পোষ্টাফিসের সেই লুট-হওয়া নোটের নম্বরও চিহ্নের সঙ্গে মিলিয়া গিয়াছিল। কনেটবল বলিয়াছিল—সে নোট পাইয়াছে দরোগাবাবুর কাছে! অর্থাৎ দরবারী শেখ সাহেবের কাছে। বিচিত্র ব্যবস্থা। দরবারী শেখের উন্নতি হইয়া গিয়াছে এই ঘটনার পর। তিনি সদর সহরে একেবারে খোদ সমরেশ খান সাহেবের রীভার হইয়া গিয়াছেন। শুনা বাইতেছে, দরবারী শেখ সাহেব অতঃপর আই-বি বিভাগে বিশেষ পদে উন্নীত হইবেন।

দরবারী শেখ আসিতেছে আগামী কাল। আগামী

বধান হইতে হইবে। সর্ব্বাঙ্গে সাবধান করিতে হইবে গোরকে। সে দিনরাত্রি ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। অজুহাত বশ আছে, সে খবরের কাগজ বিক্রী করে। এখানে ডাঁড়ী বাড়ী কাগজ বিলি করে অপরাহ্নে। পরদিন কালেই সাইকেল ঠেঙাইয়া বাহির হইয়া যায় গ্রামের দিকে।

ভয় স্বর্ণ সম্পর্কেও আছে। সে বেরকম উগ্রমতবাদী হইয়া উঠিয়াছে তাহাতে ভয় অহেতুক নয়। পড়াশুনার মধ্যে ইস্কুলের মেয়েদের যে কি বলিয়াছে তাহা সেই জানে। তবে বলিয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। মেয়েদের কাছে জিজ্ঞাসাবাদ করিলে অপ্রকাশ থাকিবে না। কিছু দিন হইতেই এই লইয়াক অরুণা বারবার তাহাকে বলিয়াছে—ঠিক এ রকম ক'রে কথা-বার্তা মেয়েদের বলো না স্বর্ণ।

স্বর্ণ শ্রেষ্ট মিশাইয়া হাসিয়া উত্তর দিয়াছিল—কেন? ভয় করে আপনার? তারপর বলিয়াছিল—কি করবে? চাকরী থেকে ছাড়িয়ে দেবে? দিক না! কিয়া পুলিশে ধরবে? ধরুক। জুজুর ভয়ে ঘরের কোনে লুকিয়ে তা বলে আর থাকতে পারব না।

উচ্চিৎড়ে ছেলোটো আবার আসিয়া কাছে দাঁড়াইল।  
—মাষ্টারজী!

দেবু বলিল—বল্।

—চিঠি উঠি—কুছ দিঞ্জীয়ে গা?

দেবু কুঁচকাইয়া বলিল—ফের তুই যদি হিন্দী বলবি, তোর মাথায় ডাঙা লাগাব আমি।

উচ্চিৎড়ে খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল।

দেবু বলিল—হাসিস না। হিন্দী কেন বলিস তুই?

উচ্চিৎড়ে বলিল—যো সাদী কো যো মস্তর মাষ্টারজী!

তারপর বলিল—মোটর চালায়েজেনী। চলদে—ইধর—উধর—কেতনা দেশ—দিল্লী লাহোর—বিনা হিন্দীসে কায়সে চলে গা, বলিয়ে তো?

—ওদিকে মটরের হর্ণ বাজিতেছে ঘন-ঘন। ড্রাইভারটা হাঁকিতেছে—আয়ে—এ। এ উচ্চিৎড়োয়া!

—আভি আয়া জী! বলুন, বলুন, চিঠি দেবেন?

—না। তুই শুধু বলিস—যে—ঠিক আছে সব।

আর—

—আর প্রত্যেক বাসের দিকে নজর রাখবি। দরবারী শেখ দারোগার এখানে আসবার কথা আছে। সে যদি—

—কে? সেই গন্না-কাটা?

—হ্যাঁ। সে যদি বাসে আসে তবে আমি যেন সঙ্গে সঙ্গে খবর পাই।

—ঠিক হায়। ঠিক মিলেগা। গোবরা আপনাকে ঠিক জানিয়ে আসবে। আমি শদরে গেলেই ও ছুটি পাবে। পরের বাসেই ও ফিরবে। ওকে আমি বলে দোব। ও এখানে থাকবে। নামলেই খবর পাবেন আপনি। ও রেল এলেও খবর পাবেন। ট্রেনেই থাকবে আজ গোবরা। চায়ের দামটা দেবেন।

বলিয়াই ছুটিয়া গিয়া লাফ দিয়া বাসে উঠিয়া পড়িল উচ্চিৎড়ে। হাঁকিতে লাগিল—আব চলে গা—তুফান মেল! চললো—চললো—চললো। এই ছেড়ে চল-লো!

বাসের গায়ে দুই তিনটা চাপড় মারিয়া শব্দ তুলিয়া বলিল—অ-ব ঠিক হায়!

দেবু একটু হাসিল। সেই উচ্চিৎড়ে—ও গোবরা। শিবকালীপুরে লোকের ঘরে ভিক্ষা মাগিয়া থাইয়া ফিরিত। নিঃসন্তান কর্ম্মকার-বধূ পদ্ম অন্তরের ক্ষুধায় উচ্চিৎড়েকে কাছে টানিয়া আপন করিতে চাহিয়াছিল। কর্ম্মকার-বধূ একদা নিরুদ্দেশ হইল—ছেলে দুইটা আসিয়া আশ্রয় লইল জংসনে। দেবু ভাবিয়াছিল—দুইটা ভিক্ষুক বাড়িল, দুইটা জুয়াচোর কি চোর বাড়িল। কিন্তু বিচিত্র এই বিংশ শতাব্দীর যন্ত্রসভ্যতা-প্রধান নগরস্থিতি। কর্ম্ম-প্রবাহ যেমন বিপুল গতি, তেমনি বিশাল পরিধি, শুধু তাই নয়—তেমনি তাহার বহু বিচিত্র শ্রোতধারা। এখানকার মোটর যন্ত্র ছেলে দুইটাকে আকর্ষণ করিল। প্রথম প্রথম মোটর বাসের পাশে বসিয়া থাকিত, বিস্ত্রিত দৃষ্টিতে এই যন্ত্রযানগুলিকে দেখিত। যাত্রীদের কাছে ভিক্ষা চাহিত। ক্রমে বাস-ড্রাইভারদের সঙ্গে ভাব জমাইয়া মোটর বাসের কাছে আসিল। তারপর বিনা বেতনে বেগার খাটিতে শুরু করিল। তারপর জংসন শহরের বিপুল বিশাল কর্ম্মপ্রবাহের এই বিচিত্র শ্রোতে কাঁপ দিয়া পড়িয়াছে। সংসারে যে কোন কাজ হইলেই তো মানুষের চলে না,

কাজ করিয়ে তৃপ্তি হয় না, প্রয়োজন হয় কাজের সঙ্গে অন্তরের কচির যোগাযোগের।

দেবু জানে—এই ভাঙা ভগ্ন সমাজের নিঃস্ব রিক্ত দেশটার মানুষের পক্ষু জীবন এই জংসনের মত নূতন ক্ষেত্রে সার্থক সচল হইয়া উঠিবে। কংগ্রেসের চরকা-খন্দরে তাহাদের বিশ্বাস নাই; যজ্ঞশিল্পের বিকেন্দ্রীকরণের কথায় একটু বাঁকা হাসি তাহাদের ঠোঁটের কোণে ফুটিয়া ওঠে।

তাহার প্রশ্ন চাই ?

দেবু তাহাকে বলিবে—একবার সকালে কি সন্ধ্যায় ষ্টেশনের ওভারব্রিজের উপর দাঁড়াইয়া দেখিয়া। সার্থকতা কোথায় একথা মানুষকে বলিয়া দিতে হয় না, জীব-জীবনের জ্ঞান ও স্পর্শ শক্তির মত একটা শক্তি আছে তাহার, সেই শক্তিবলে তৃষ্ণার্জ জীবের বাতাসের সজল স্পর্শ হইতে জল কোন দিকে আছে বুঝিতে পারার মত সে বুঝিতে পারে—কোথায় আছে জীবনের সার্থকতা। গ্রামে গ্রামে গ্রামোপযোগী করিয়া এই জীবনধারা ও সভ্যতাকে লইয়া যাও—দেখিবে” সেখানেও মানুষের জীবন সার্থক হইয়া উঠিবে। ঠিক এই কারণেই এই জংসনকে সে তাহার কর্মক্ষেত্রে হিসাবে বাছিয়া লইয়াছে। পৌছাইয়া দিবে সে নবজীবনের ধার।

—মাষ্টার মশায় !

দেবু কিরিয়া দেখিল—ষ্টেশন কম্পাউণ্ডে কোয়াটার্স এলাকায় ছোটবাবুর বাসার বারান্দায় তাহার ছাত্রদের একজন দাঁড়াইয়া তাহাকে ডাকিতেছে। মাষ্টারদের ছেলেপিলেরা একটু বিচিত্র ধরণের। একটা যেন স্বতন্ত্র জাতি বা সম্প্রদায় হইয়া দাঁড়াইতেছে। জীবন স্বপ্ন—রেলের চাকরী। পড়াশুনা—পাশ করিবার জ্ঞান। সে প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছে উহাদের স্বভাব বদলাইবার জ্ঞান—কিন্তু সমস্ত ব্যাপারটা যেন উহাদের রক্তগত হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ফুটবল খেলা—থিয়েটার এই দুইটি হইল—সংস্কৃতির সর্বোত্তম শিখর। বাক—সে তাহার কর্তব্য করিয়া যাইবে। পাশ করাইয়া দিতে হইবে। সে অগ্রসর হইল। তাহার আগে চিঠিখানা ছিঁড়িয়া ফেলিয়া দিল। খবরটা না আসিলে বিপদ হইত। কয়েকদিন আগেই প্রচুর প্যাম্ফলেট আসিয়াছে। সেগুলোকে নষ্ট করিলে চলিবে না। লুকাইয়া রাখিবার খুব ভাল জায়গা

তাহার আছে। রামবিলাস তাহার ব্যবস্থা করিবে। প্রয়োজন হইলে—রেলের কোন গুদামের মালের মধ্যে মিশাইয়া রাখিয়া দিবে। ওদিকেও একটা সুবিধা হইয়াছে। এ জেলায় পুলিশের মধ্যেও দেখা দিয়াছে একটা বিরোধ। সামসের খাঁ আসিয়া অবধি এটার সৃষ্টি। লীগ-শাসনের জন্ম—সমসের খাঁর মধ্যে ইংরেজ-ভক্তির সঙ্গে মুসলীমপ্রীতিও অত্যন্ত উগ্রভাবে দেখা দিয়াছে। বিশেষ করিয়া দরবারী শেখকে অত্যধিক অস্বগ্রহ করার জন্ম হিন্দু কর্মচারীরা অত্যন্ত চটিয়া গিয়াছে। তার উপর জংসনের এই হিন্দু-মুসলীম বিরোধের ফলে সে বিরোধ ভিতরে ভিতরে প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। হিন্দু পুলিশ-কর্মচারীরা অত্যন্ত গোঁড়া হিন্দু। অখাণ্ড কুখাণ্ড বিচার না-করিলেও—তাহাদের দৃঢ় বিশ্বাস—চোর-ডাকাতি-খুনে-সম্ভ্রাসবাদীর হাত হইতে তাহাদিগকে বাঁচাইয়া রাখিয়া-ছেন—দেব-দেবীরা। বিশেষ করিয়া—মা কালী! দেবু আবার একটু হাসিল।

\* \* \* \*

দেবু গোপনে সংবাদটা কয়েকজনকেই জানাইয়া দিল। কংগ্রেস আপিসে জানাইল; গ্রামের কর্মীদের মধ্যে বাহারা দলের সভ্য তাহাদেরও জানাইল—বাহারা সভ্য নয় তাহাদের জানাইল যে, এখন দুই তিন হাটবার দেবু বা অন্ত প্রধানেরা জংসনে থাকিবে না, স্মরণ্য তাহারা যেন দেবুর বাসায় বা কংগ্রেস আপিসে, কি রেলওয়ে ইয়ার্ডের মধ্যে মহাবীর-তলায় না যায়। রাজনৈতিক দলের মধ্যে জানাইল না শুধু হিন্দুমহাসভাকে। ওই দলটিকে দেবু দলের মধ্যেই গণ্য করে না। বলে—এ যুগে ওটা হ’ল নিভাস্তই সখের যাত্রা থিয়েটারের দল—এবং নাটকে কেবল একটি পাটই আছে—ভীমের পাট। পালার নাম—হিড়িম্বার স্বয়ম্বর; হিড়িম্বার মালা পাবার জন্ম যত বর—সবাই ভীম সেজে—তুলোর গদা হাতে নিয়ে—সিংহাসন জুড়ে বসে—স্পিরিটগাম দিয়ে আঁটা—হেপি চুলের গোঁফে তা’ দিচ্ছে। কথাটা অল্প বিস্তর সত্য, কারণ ককন্যার জমিদার বাড়ীর ছেলে—যাকে সুরপতি বলে—‘জমিদার’—সে, কি শ্রীহরি ঘোষ, কি শেঠ সুরবমল রাজরোষে ইহাদের কোন ভয় থাকিতেই পারে না।

কিন্তু দেবকী সেনকেও সে সংবাদ দিল না। দলের  
প্রধানদেরও সরাইয়া দিল।

স্বর্ণ বলিল—তুমিও কয়েক দিন সরে যাও।

—না। এখান থেকে সরব না। তবে বাড়ী থেকে  
সরে থাকব।

—কেন? এখানে থাকবারই বা এমন প্রয়োজন কি?

—আছে। তোমার জন্তে।

—আমার জন্তে? মানে?

—তুমি জল একটু বেশী খোলা করেছ স্বর্ণ। যদি  
বাড়ী সার্চ করে, কি—তোমাকে ডাকে—। দেবু শিহরিয়া  
উঠিল। দরবারী না-পারে এমন কাজ নাই। দরবারী  
একটা পণ্ড।

স্বর্ণ তীক্ষ্ণ হাসিয়া বলিল—ধরেই যদি নিয়ে যায়  
করবে কি?

—করব আর কি? তবু উৎকর্ষা থেকে বাঁচব।

—কোথায় থাকবে?

—থাকব রামবিলাসের আড্ডায়।

—রামবিলাস—এখানকার রেলকর্মীদের একজন  
মাতব্বর। জংসনের ইয়ার্ডের একজন পয়েন্টস্ম্যান।  
ট্রেড ইউনিয়নের একজন সভ্যও বটে। লিলুয়া অঞ্চল  
হইতে বৎসরখানেক আগে এখানে বদলী হইয়া আসিয়াছে।

বেলা আড়াইটার সময় কলিকাতা হইতে ফাষ্ট  
পাসেঞ্জারে খবরের কাগজ আসে। গৌর ষ্টেশনে গিয়া  
কাগজ ডেলিভারি লইয়া থাকে।

হালদার দারোগা—ষ্টেশনে দাঁড়াইয়াছিল। গৌর  
ষ্টেশনে আসিতেই তাহাকে বলিল—কি খবর?  
ওখানে কি?

গৌর হাসিয়া বলিল—কাগজ ডেলিভারী নেব।

—খবরের কাগজ?

—হ্যাঁ।

—বোনাই কোথায়? দেবু ঘোষ?

—কাল রাত্রে কলকাতা গিয়েছে।

—হ্যাঁ! কলকাতা গিয়েছে?

—তারপর—আর সব খবর কি? কি রকম চালাচ্ছ  
রাজকাল?

—কি?

—দলের কাজকর্ম?

—দলবল আর নাই। খেতে পাই না—দল করব!

—হুঁ। তাই বলছিল বটে সব। তা গাঁয়ে গিয়ে  
চাষবাস কর না কেন? খবরের কাগজ বিক্রী ক'রে আর  
কি হবে? না—লাওল ধরতে লজ্জা করে?

গৌর একটু হাসিয়া বলিল—তা করে একটু আধটু।  
ওই ট্রেন আসছে আমি যাই।

সে ভিড়ের মধ্যে মিশিয়া গেল।

ব্রেক-ভ্যানের দরজায় গিয়া কাগজের বাণ্ডিল বগলে  
করিয়া সে আর ষ্টেশন প্রাটকর্মের গেট দিয়া ফিরিল না,  
প্রাটকর্মের প্রান্তভাগ দিয়া বাহির হইয়া গেল। কিন্তু  
গেটের কাছে ফিরিতে হইল তাহাকে। তাহার সাইকেল  
খানা গেটের কাছে পানওয়ারালার দোকানে রাখিয়া  
আসিয়াছে।

গেটের কাছে আসিয়া সে আশঙ্কায় হতবাক হইয়া  
গেল।

—ও কে? সাদা থান কাপড় পরিয়া বিধবার বেশে  
ও কে—অরুণা-দিদি? হ্যাঁ অরুণা-দিদি তো! একেবারে  
চেনা যায় না। চিনিবার উপায় নাই। এ অরুণা-দিদি  
যেন সে অরুণা-দিদিই না।

সে অরুণা-দিদিকে দেখিয়া মনে হইত—কুমারী মেয়ে।  
অরুণা-দিদি বিধবা, সেকথা সে জানিত। কিন্তু অরুণা-দিদি  
পেড়ে কাপড়-ব্লাউজ পরিত। হাতে ছুইগাছি চুড়ি ছিল।  
তাহার সঙ্গে বাঁহাতে থাকিত রিটওয়্যাক, মাথার চুল  
বাঁধিবার ধরণেও কুমারী বা বিধবা চিনিবার উপায় ছিল না।  
এ অরুণা-দিদির পরণে সাদা থান কাপড়, সাদা ব্লাউজ,  
খালি হাত, বেশ-প্রসাধনের ধরণের মধ্যেও বৈধব্যের ইঙ্গিত  
রহিয়াছে।

সে ছুটিয়া কাছে আসিয়া দাঁড়াইল।—অরুণা-দি!

মুখ ফিরাইয়া অরুণা গৌরকে দেখিয়া বলিল—গৌর!

—হ্যাঁ। কিন্তু—

মধ্যপথেই তাহার কথার উপরে—কথা বলিল অরুণা।  
বলিল—তোদের কাউকেই খুঁজছিলাম।—তালই হয়েছে।  
তারপর মুখ ফিরাইয়া অন্য কাহাকেও বলিল—আমার ব্যাং  
বিছানা থানায় নিয়ে যাবার কি দরকার আছে? ষ্টেশনে

তো দেখেছেন সব? এ ছুটো বাসায় পাঠিয়ে দিতে আপত্তি আছে আপনার?

দরবারী শেখ পানের দোকানটার ওপাশে ছিল, গৌর দেখিতে পায় নাই। দরবারী শেখ বলিল—না। ও ছুটো আপনি পাঠিয়ে দিতে পারেন।

অরুণা বলিল—এ ছুটো তুই বাসায় পাঠাবার ব্যবস্থা কর গৌর। আমরা একটু খানায় যেতে হবে।

—খানায় কেন?

রুস্তা ভাষায় শেখ বলিল—দরকার আছে!

গৌর ছুটিগ বাসার দিকে, স্বর্ণকে খবরটা দিয়া সে ছুটিগ ইয়ার্ডের কোয়াটার্সের দিকে—দেবদাকে সংবাদ

দিতে হইবে। গৌরের সঙ্গে সঙ্গে আরও একজন রওনা হইল। আপনার নতুন গিরীণ, কেবিন পুতুলের দোকান বন্ধ করিয়া সেও ছুটিগ। সম্পূর্ণ শেষ না হইলেও, গিরীণ তাহার দোকানটা গাছের গায়ে বসাইয়া দিয়াছে। নেলো ছুটিগ—শ্রান মহাশয়—অর্থাৎ দেবকী সেনের কবিরাজ-খানার দিকে। সেন ছিল না। সে গিয়াছে জয়তারার আশ্রমে স্নায়রত্নের কাছে। নেলো আবার ছুটিগ। ঘণ্টা-খানেক পরে—বৃদ্ধ স্নায়রত্ন দেবকী সেনকে সঙ্গে করিয়া খানায় আসিয়া উঠিলেন। তখন স্বর্ণ সেখানে আসিয়া পৌছিয়াছে। স্নায়রত্নবাবুও আসিয়াছেন, তিনি বসিয়া আছেন খানার ভিতরে। (ক্রমশঃ)

## সাহিত্যিকের কল্পসামান্য

### শ্রীচপলাকান্ত ভট্টাচার্য্য

সংবাদপত্রের সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রে সাহিত্য সাধনার যতটুকু সুযোগ পাওয়া যায় তাহা অতিক্রম করিয়া সাহিত্য সম্মেলনের বিস্তৃততর ক্ষেত্রে যোগ দিবার অবসর সাংবাদিকের কর্মজীবনে সহজে ঘটিয়া ওঠে না। সাহিত্যের ধারক ও বাহক হইলেও উহার নিয়মিত সাধক হইবার সুযোগ সাংবাদিকের জীবনে ক্ষুণ্ণ হইবার অবকাশ পায় না। সাহিত্য নিত্য, কিন্তু সাংবাদিকের অবদান সাময়িক ও নৈমিত্তিক। যে ফুল প্রভাতে ফুটিয়া সন্ধ্যা না হইতে হইতেই খরিয়া যায় সাহিত্যের দিক দিয়া সেই ফুল ফুটাইয়া যাওয়াই আমাদের কল্প ও সাধনা। তথাপি উহারই মধ্য দিয়া সাহিত্যের যজ্ঞস্থলে কিছু দান যে ঘটে, রূপ-রস-গন্ধে কিছু প্রকাশ যে দেখা যায়, তাহা উপলব্ধি করি তখনই, বপন মনীবীর সম্মেলন সাহিত্যের অর্থ্য রচনার ক্ষুদ্র সাংবাদিককে আহ্বান করেন।

মেদিনীপুর জেলায় বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনে বাঁহার নাম প্রজ্ঞা ও কৃতজ্ঞতার সহিত সর্বপ্রথমে উল্লেখযোগ্য, বাঙলা ভাষা ও বাঙলা সাহিত্য গঠনে অগ্রগণ্যের পূর্বদ্বার সেই ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় এই মেদিনীপুরেই আবির্ভূত হইয়াছিলেন। তাঁহার কথা এবং বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যের সহিত তাঁহার সম্বন্ধের কথা যখন চিন্তা করি—তখন রামায়ণের একটি চিত্র মনচক্ষুতে ভাসিয়া ওঠে। রামচন্দ্রের অশ্বমেধ-যজ্ঞসভার বায়ীকির সহিত সীতা যখন প্রবেশ করিতেছেন তাহার বর্ণনার রামায়ণকার বলিয়াছেন :

“তাং দৃষ্ট্বা শ্রুতিমায়ান্তীং ব্রহ্মাণমবুগামিনীম্।”

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অনুগামিনী হইয়া বাঙলা ভাষা ও সাহিত্য বেতাবে বিশ্বসভায় প্রবেশ করিয়াছে রামায়ণের উল্লিখিত বর্ণনাটি তাহার

উপযুক্ত উপমা। পরবর্তীকালে যে গজ রীতি অবলম্বন করিয়া বাঙলা সাহিত্যের বিকাশ ঘটাইয়াছিল বিদ্যাসাগর হইতেই তাহার সৃষ্টি। প্রজ্ঞাবন-চিন্তে লগ কোটিবার প্রণাম করিয়াও তাঁহার প্রতি আমাদের অক্ষা প্রকাশ অসম্পূর্ণ রহিয়া যায়। তাঁহার নামে স্মৃতিমন্দিরের নামকরণ করিয়া এবং তৎস্মরণে বার্ষিক সাহিত্য সম্মেলন আয়োজনের ব্যবস্থা করিয়া মেদিনীপুরের অধিবাসীরা উপযুক্ত কার্য্যই করিয়াছেন।

সাহিত্যের পক্ষে সম্পূর্ণ প্রাসঙ্গিক না হইলেও আর একটি অবগু-পালনীয় কর্তব্য আমাকে করিতে হইবে। মেদিনীপুরে আসিয়া পরলোক-গত কুমার দেবেন্দ্রলাল খানের স্মৃতির উদ্দেশ্যে নিবেদন না করিলে কর্তব্যের ত্রুটি হইবে। তাঁহার সামাজিকতা, বদান্ততা প্রভৃতির কথা তুলিবার প্রয়োজন নাই। তাহা সুপরিচিত। যাহা বিশেষভাবে স্মরণীয় তাহা হইল দেশ-হিতার্থে তাঁহার ত্যাগ ও দুঃখবরণ। এই ত্যাগ ও দুঃখবরণের সম্পূর্ণ কাহিনী লোক সমক্ষে কখনও হয়ত প্রকাশিত হইবে না; ইতিহাসে তাহার কতখানি পরিচয় থাকিবে ভবিষ্যতের কথা।

সাহিত্য অবসরের সৃষ্টি। যথেষ্ট অবসর এবং যথেষ্ট বিরাম না মিলিলে উন্নতত্তরের সাহিত্য বা স্থায়ী সাহিত্যের সৃষ্টি হয় না। সুখের অবস্থাতেই হোক বা দুঃখের অবস্থাতেই হোক, সাহিত্য সৃষ্টির ক্ষমতা অবসর অত্যাগতক। বাহিরের দিক হইতে ইহা স্পষ্ট বা প্রত্যক্ষ না হইলেও মনের দিক হইতে ইহা অবিসংবাদিত সত্য। বাহিরের লোকেরা ইহা হয়তো বুঝিতে পারে না; কিন্তু সাহিত্য রচনা যে করে সে আপনার মধ্যে ইহার সত্যতা প্রত্যক্ষভাবেই উপলব্ধি করে। সাংবাদিকের

অতিবাস্তব জীবনে বাহিরের ও অন্তরের দিক হইতে এই অবসরের একান্ত অভাব বলিয়াই উল্লিখিত সমস্তব্যয়ের সত্যতা আমরা যেমন উপলব্ধি করিতে পারি এমন বোধ হয় আর কেহ পারে না। একই ক্ষেত্রে সাহিত্যিক ও সাংবাদিকের সমন্বিত বাঙলা সাহিত্যে একাধিকবার ঘটয়াছে। কিন্তু সেক্ষেত্রেও দেখা গিয়াছে সাহিত্যেই বাহার মূলপ্রযুক্তি শেষ পর্যন্ত সাহিত্যই তাহার একান্ত উপজীব্য হইয়া উঠিয়াছে।

সাহিত্যের বাহা উপজীব্য, ইতিহাসের বাহা উপাদান তাহা মেদিনীপুরের দিকে দিকে পরিকীর্ণ হইয়া আছে; গম্ভীরনাথী সমুদ্র-সলিলে বিধৌত এই ভূমির প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যে মহৎ ও বিশালত্বের রূপ যেন আপনা হইতেই মিশিয়া রহিয়াছে। উচ্চতম মহিমা, গভীরতম বেদনা এবং নিবিড়তম অনুভূতি—এইগুলিকে আশ্রয় করিয়াই সর্বজন-সমাদৃত হুয়া সাহিত্যের উদ্ভব হইয়া থাকে। মেদিনীপুরের পূর্ব-প্রান্তস্থ সমুদ্রসৈকতে দাঁড়াইয়া বস্তুমন্ডল যে ‘কপালকুণ্ডলার’ উপলব্ধি করিয়াছিলেন তাহা অস্বপ্ন নহে। বহু পুরাতন কথার উত্থাপন করিব না, ১২২০ সালে ‘অসহযোগ আন্দোলনের’ প্রারম্ভ হইতে রাজনৈতিক কর্মজীবনে মেদিনীপুরের যে সকল বন্ধুদের সহিত পরিচয় হইয়াছে, যে সকল ঘটনার সহিত অঙ্গবিস্তার ঘনিষ্ঠভাবে পরিচয় লাভের সুযোগ হইয়াছে এবং যে বিপর্যয় ও উত্থান-পতনের ব্যত-প্রতিব্যত লক্ষ্য করিয়াছি ও অনুভব করিয়াছি তাহা হইতে উপলব্ধি করিতে পারিয়াছি যে, সাহিত্য-শক্তির মূলগত পূর্বোক্ত উপাদানসমূহ এখানে প্রচুর পরিমাণে বর্তমান।

সাহিত্যের কথা আপেক্ষা বাঙ্গালীর নিজ জীবন-সমস্তার কথাই আজ আমাদের কাছে অত্যন্ত বড় হইয়া উঠিয়াছে। বাঙ্গালীর জীবনাকাশ আজ নিবিড় ঘনঘটা সমাচ্ছন্ন আর তাহারই নিকষকৃষ্ণ ছায়া পড়িয়াছে বাঙ্গালীর সমাজ ও সাহিত্যের উপর। ইহা আসন্ন বরষার নবসম্ভাবনাপূর্ণ মেঘসঞ্চার নহে—যে মেঘের জন্ত ভূমিত, আকুল ও আশাপূর্ণ চিহ্ন লোকে চাহিয়া থাকে, বাহা নবশক্তির সূচনা করে, ফলভার-পরিমাণ সাক্ষ্যের প্রেরণায় বাহা নূতন জীবনীশক্তি বহন করিয়া আনে। আমাদের জীবনাকাশে এখন যে ঘনঘটা দেখা দিয়াছে ইহা সেই মেঘ বাহার মধ্য দিয়া প্রলয়ের ইঙ্গিত ও সূচনা প্রকট হইয়া ওঠে, কাল-বৈশাখার ক্ষণিক প্রকাশে বাহার ধ্বংসকারী শক্তির পরিচয় মাঝে মাঝে অকস্মাৎ আমরা পাই—বাহার ঘর্ষণে ঘর্ষণে বিদ্রাবয় লোকত্রাস উৎপাদন করে—বাহা ঝড়ঝপা, উৎপাত, মহামারীর বার্তা বহন করিয়া আনে। জীবনের এই সঙ্কট আমাদের দিকে সমুদ্রতীরের চরম পরীক্ষায় আহ্বান করিতেছে। সেই পরীক্ষায় কিভাবে আমরা উত্তীর্ণ হই তাহার উপরেই আমাদের সমাজ ও সাহিত্যের স্থিতি ও ভবিষ্যৎ নির্ভর করিতেছে। ইতিহাসের যুগ-পরিবর্তনে ও রাষ্ট্রবিপ্লবের পূর্বেও যে বাঙ্গালীসমাজকে এমনতর সঙ্কট ও সমস্তার সম্মুখীন হইতে হইয়াছে তাহার প্রমাণ ও পরিচয় আমাদের সাহিত্যের মধ্যে রহিয়াছে, সাময়িক সাহিত্যের উপর তাহা আপনার ছাপ রাখিয়া গিয়াছে। যে সঙ্কটের প্রকাশ ও ক্রিয়া আমরা সমুখে দেখিতেছি, ইহার ব্যত-প্রতিব্যত সাহিত্যের উপর কি আকারে দেখা দিবে তাহা স্থবীজনের চিন্তনীর বিষয়।

ডাঃ শ্যামপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় আমার উপরে এক বিশেষ ভার স্তম্ভ করিয়াছিলেন। বর্তমানে কি কর্মসাধনা অবলম্বনীয় তৎসম্বন্ধে খীর অভিমত দিতে হইবে। সাধারণ লৌকিক ক্ষেত্রে ইহার যে উত্তর দেওয়া যায়—সাহিত্যের ও সাহিত্যসাধনার মাধ্যম অবলম্বন করিয়াই সেই উত্তর উপস্থাপিত করিতেছি। সাহিত্য সম্বন্ধে যে আলোচনা করিলার তাহাতেই ইহা বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছি যে, ইহা ব্যতীত রচনার ধারা বা সমষ্টি নহে। ইহা শক্তির সমন্বয় ও প্রকাশের কেন্দ্রবিন্দু। ইহা শক্তিকে কেন্দ্রীভূত করে এবং ব্যক্তির মধ্যে ও সমষ্টির মধ্যে নবশক্তি উদ্বোধনের প্রেরণা দেয়—নবশক্তি জাগাইয়া তোলে। ভাবের রাজ্যে, চিন্তার রাজ্যে, অনুভূতির রাজ্যে প্রেরণা ও আলোড়ন জাগাইয়া তাহাকেই কর্মজগতের মধ্যে নূতন রূপ দেয়। আমরা সেই প্রত্যক্ষরূপ দেখিয়া মুগ্ধ হই, অভিভূত হই। কিন্তু সন্ধান ও বিশ্লেষণ করিলে দেখিতে পাই যে, মূল শক্তির ক্রিয়া হইতে উহার উদ্ভব, সাহিত্যের শক্তির আধারেই তাহা প্রথমে সঞ্চিত ও সঞ্চারিত হইয়াছে। সবিশেষ পরিচয় দিবার সময় ও অবসর এখানে নাই। কিন্তু বিশ্ব-সাহিত্য ও বিশ্ব-ইতিহাস একত্রে পাশাপাশি রাখিয়া অনুধাবন করিলে আমার বক্তব্যে উহার অর্থ ও উদ্দেশ্য পরিষ্কৃত হইবে। দুইটা দৃষ্টান্ত দিতেছি। ফরাসী বিপ্লবের মূল শক্তির সন্ধান রহিয়াছে ‘রক্ষণার’ রচনায়। বাঙলার ও ভারতের নবজাতীয়তার মূল প্রেরণা রহিয়াছে বঙ্কিমের আনন্দমঠে।

ইংরাজ রাজত্বের প্রথম দিকে বাঙ্গালী সমাজ ভারতের সর্বত্র ছড়াইয়া পড়িয়াছিল—ইংরাজ রাজত্বের অবসানে পুনরায় ছড়াইয়া পড়িতেছে বা ছড়াইয়া পড়িতে হইতেছে। কিন্তু উত্তর অবস্থার মধ্যে কি মর্গভেদী পার্থক্য! তখন বাঙ্গালী ভারতবর্ষে আপনাকে প্রসারিত করিয়া দিয়াছিল স্বল্প ভারতকে জাগাইবার জন্ত জ্ঞানের বর্তিকা হাতে লইয়া, মুক্তিযুদ্ধের প্রেরণা সর্বত্র সঞ্চারিত করিয়া; তাহাতে ভারত জাগিয়াছিল, বাঙ্গালীর নিকট হইতে জ্ঞান-সাধনার ও মুক্তি-সাধনার দীক্ষা লইয়াছিল; বাঙ্গালীকে গুরুতর আসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল; বাঙ্গালীর প্রতিভা ও দেশাত্মবোধ সেদিন অজল ধারায় আপনার দানে ভারতবর্ষকে পরিপুষ্ট করিয়াছে; উহাকে নূতন রূপ দিয়াছে; আপনাদের ধ্যানের ভারতকে অধ্যাত্মলোক হইতে আনিয়া চক্ষের সম্মুখে নবরূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। সেদিন, আর এদিন! আজ আমরা ছড়াইয়া পড়িতেছি, সংসার ও সমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন বাস্তবতার হইয়া, আশ্রয়হারা হইয়া, সর্বহারা হইয়া; হয়তো বা অনুগ্রহের প্রার্থী এবং কৃপার প্রার্থী হইয়া। বিশ্বসমাজের নিকট ভারতীয় সংস্কৃতির যাহারা বার্তাবহ এবং অগ্রদূত,—রাজা রামমোহন হইতে আরম্ভ করিয়া রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত,—এই বাঙলা দেশ হইতেই তাহারা উদ্ভূত হইয়াছেন। আজ ভিক্ষাপাত্র হাতে লইয়া দাঁড়াইতে হইবে ইহাই কি আমাদের বিধিলিপি? বুঝিতে পারি না, ভবিষ্যৎ দেখিতে পাই বা উপলব্ধি করিতে পারি এমন অভিমানও গোবধ করি না; তথাপি সমগ্র দৃষ্টিতে বর্তমানকে পরীক্ষা করি এবং ভবিষ্যতের



দিকে চাহিয়া থাকি—পরিণাম কি এবং পরিণতি কোথায় ? ভারতে ইংরাজ শাসনের প্রায়বসানকালে আসন্ন দুর্গতির সম্ভাবনা উপলব্ধি করিয়া ভবিষ্যতের দিকে প্রসারিতদৃষ্টিতে রবীন্দ্রনাথ তাঁহার ‘শেষ জন্মদিনের’ অভিজ্ঞাষণে বলিয়াছিলেন :

“ভাগ্যচক্রের পরিবর্তনের দ্বারা একদিন না একদিন ইংরেজকে এই ভারত সাম্রাজ্য ত্যাগ করে যেতে হবে। কিন্তু কোন্ ভারতবর্ষকে সে পিছনে ত্যাগ করে যাবে ? কী লক্ষ্মীছাড়া দীনতার আবর্জনাকে। একাধিক শতাব্দীর শাসনধারা এখন শুষ্ক হয়ে যাবে, তখন এ কী বিতীর্ণ পঞ্চণয়া দুর্বিসহ নিফলতাকে বহন করতে থাকবে।” আজ দেখিতেছি কবির এই ভবিষ্যৎ উপলব্ধি তাঁহার স্বপ্রদেশ সত্যকেই সত্য হইয়া উঠিয়াছে। যে সংঘর্ষের পরিণামে ইংরাজ শাসনের অবসান ঘটিয়াছে এবং ইংরাজ শাসনের অবসানের সহিত যে সংঘর্ষ উদ্ভূত হইয়াছে সেই উভয় সংঘর্ষসম্প্রাত হলাহল পান করিবার ভার বিধাতাপুরুষ বাঙলা দেশের উপর স্তম্ভ করিয়াছেন।

সাহিত্য সমাজের উপর নির্ভর করে। সমাজ যদি ভাঙ্গে, সাহিত্য কিসের উপর দাঁড়াইবে ? সাহিত্যিকের পক্ষে এবং সাহিত্য-সেবীর পক্ষে ইহাই গুরুতর সমস্যা। সাহিত্য কৃত্রিম বস্তু নহে, কৃত্রিমভাবে উহা সৃষ্ট হয় না বা উহার সৃষ্টি করা যায় না। সমাজের মধ্য হইতে রস ও জীবনীশক্তি আহরণ করিয়া উহা আপনিই গড়িয়া ওঠে এবং পরিপুষ্ট হয়। অবশ্য ইহা সত্য যে, যে সাহিত্য দেশ, কাল ও পরিবেশকে যতখানি অতিক্রম করিয়া উঠতে পারে, তাহা ততখানি দূর সাহিত্যের পর্যায়ের উন্নীত হয়। তথাপি উহার মূলে সামাজিক স্থিতির অবশ্য প্রয়োজন। এই স্থিতি হইতে জট হইলে সাহিত্যের ধারা অবলুপ্ত ও শুষ্ক হইয়া যায়। ধারার দৃষ্টান্ত চাহিবেন তাঁহাদের দৃষ্টি সংস্কৃত সাহিত্য ও পালি সাহিত্যের প্রতি আকর্ষণ করিব। এই উভয় সাহিত্যেরই সম্পদ প্রচুর। কিন্তু কোনটিরই ধারাবাহিকতা রক্ষিত হয় নাই। যে সমাজে এবং সমাজের যে অবস্থায় এই দুই সাহিত্য উদ্ভূত এবং পরিপুষ্ট হইয়াছিল ধীরে ধীরে তাহার অবসানের সহিত সাহিত্যের সজীব ধারাও অবলুপ্ত হইতে চলিয়াছে। মধ্যে মধ্যে সামাজিক পুনরুজ্জ্বলনের সহিত সংস্কৃত সাহিত্যের ধারা জাগিয়া উঠিয়াছে বটে, কিন্তু পালি সাহিত্যের ধারা আর জাগে নাই। কারণ, সেই সমাজ ও সেই সামাজিক পরিবেশের পুনরুজ্জ্বলন ভারতবর্ষে আর ঘটে নাই। বাঙ্গালীর জীবনে বর্তমানে যে সঙ্কট দেখা দিয়াছে এবং সমাজ যেভাবে খণ্ড বিখণ্ড হইয়া পড়িতেছে তৎপ্রতি লক্ষ্য করিয়া বাঙলা সাহিত্যের এই সম্ভাবিত বিপদের কথা আশনিই মনে আসে।

রাজনীতির সাধনায় বহু বিপদের সম্মুখীন আমরা হইয়াছি, বহু বিপদ বরণ করিয়াছি এবং বহু বিপদ আমরা অতিক্রমও করিয়াছি। বাঙ্গালী সমাজ তাহাতে বিন্দুমাত্র বিচলিত হয় নাই। তাহার ক্ষয়ক্ষতি আমরা হাসিমুখেই গ্রহণ করিয়াছি এবং জীবনীশক্তির প্রাচুর্য্যে তাহা

এইজন্য যে, সে আঘাত নিতান্ত বাহিরের আঘাত, অন্তর্নিহিত শক্তিতে তাহার প্রতিরোধ করা আমাদের পক্ষে সহজ হইয়াছে। কিন্তু বাঙলা সাহিত্যের উপর কোন আঘাত বা উহার কোন ক্ষতির সম্ভাবনা দেখা দিলে তাহা আমাদের পক্ষে বিচলিত করে। কারণ, সে আঘাত লাগে একেবারে আমাদের মর্ম্মস্থলে। রাজনীতির ক্ষতি বাহিরের, কিন্তু সাহিত্যের ক্ষতি আমাদের পরমৈশ্বৰ্য্যের হানি। বাঙ্গালী অর্থনৈতিক-ক্ষেত্রে দরিদ্র হইলেও, সাহিত্যের ক্ষেত্রে তাহার বৈশ্ব অতুলনীয়। এই বৈশ্বের প্রাচুর্য্যে কেবল ভারতে নহে, সমগ্র বিশ্বে তাহার একটা প্রাধান্য আছে। সাহিত্যই আমাদের সম্বন্ধ ও গৌরবের চিহ্নরূপে সকলের সম্মুখে প্রধান দর্শনীয় বস্তু। কেবল আমাদের নহে, ভারতবর্ষ আপনায় পক্ষ হইতে গৌরবের নিদর্শন স্বরূপে বিশ্বের সম্মুখে বাহ্য উপস্থাপিত করিতে পারে, বাঙলা সাহিত্য তাহার মধ্যে অঙ্গতম প্রধান। বর্তমান যুগে ভারতের যদি কিছু গৌরব থাকে সে, গৌরব বাঙলা সাহিত্যই আহরণ করিয়াছে। কেবল সাহিত্যও নহে, সঙ্গীত, চিত্র, নৃত্য, চারুশিল্প, ভাস্কর্য্য প্রভৃতি ললিতকলায় সকল অংশেই ভারতবর্ষ তথা বিশ্বসভ্যতা বাঙ্গালীর প্রতিভার দানে সমৃদ্ধ। ভারতের রাজহুময় যজ্ঞশালা হইতে আজ শ্রীর অন্তর্দান ঘটবে, যদি তাহা বাঙ্গালীর করম্পর্শ হইতে বঞ্চিত হয়।

যে অবস্থার মধ্যে আজ আমরা সহসা উপনীত হইয়াছি এবং যে ব্যবহার মধ্য দিয়া চলিয়াছি ইহার মধ্যে সাহিত্যিকের স্থান ও কর্তব্য কি এবং সাহিত্যের উপযোগিতা কোথায় সে কথা আলোচনা করিব। পূর্বেই বলিয়াছি মনুষ্য জীবনের গভীরতম বেদনাই সাহিত্যের প্রধানতম উপকরণ। কেবল এ দেশ নহে, সর্ব্বদেশে ও সর্ব্বকালেই ইহা সত্য। জগতের শ্রেষ্ঠ সাহিত্য, বাহ্য দ্বারা সাহিত্যরূপে সমাজের প্রামাণ্য বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে তাহার মধ্যে মানুষের গভীরতম বেদনার অন্তর্ভূত পুঞ্জীভূত ও কেন্দ্রীভূত হইয়া আছে। রামায়ণ মহাভারত, শকুন্তলা বা ইলিয়াডের যুগ হইতে এ কাল পর্য্যন্ত ইহা সত্য। করাসী সাহিত্যে ‘লা মিজারেবল্’, রুশীয় সাহিত্যে ‘মাদার’ জোরান্ বোরারের ‘পিলগ্রিমেন্’ প্রভৃতিও আমার কথার দৃষ্টান্তস্থল।

রামায়ণ রচনার সার্থকতা সীতার বেদনা প্রকাশের মধ্য দিয়াই ফুটিয়া উঠিয়াছে। লক্ষ্য যুদ্ধের সমাপ্তি ঘটয়াছে ; সীতা বিজয়ী রাসের সম্মুখে আনীতা হইয়াছেন ; দীর্ঘ বিচ্ছেদের পর সীতাবিরহিত রাম ও রামবিরহিতা সীতার সাক্ষাৎ। সীতার তখন মনের অবস্থা কল্পনা করিবার। সেই অবস্থায় রামচন্দ্র সীতাকে কি সম্ভাষণ করিলেন। প্রেমের সম্ভাষণ নয়। তিনি বলিলেন—‘তুমি আমার সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছ বটে, কিন্তু তোমার চরিত্র সম্বন্ধে সন্দেহ আসিয়াছে। চক্ষু-রোগীর সম্মুখে প্রজ্জ্বলিত দীপ যে পীড়া দেয় আমার সম্মুখে তোমার উপস্থিতি আমাকে পীড়া দিতেছে। দশদিক উন্মুক্ত আছে যে দিকে ইচ্ছা চলিয়া যাও।’ তৎকালীন সীতার যে বেদনা সে বেদনাকে রূপ দিতে পারে একমাত্র সাহিত্য। রামায়ণে সে বেদনা প্রতিকলিত হইয়াছে। সেইজন্য রামায়ণ আমাদের এত প্রিয়।

রামায়ণ হইতে আর একটি উদাহরণ দিতেছি। অগ্নিপরীক্ষার উত্তীর্ণ হইয়া সীতা অযোধ্যায় কিরিয়াছেন। তারপর মিথ্যা অপবাদে পুনরায় তাঁহার বনবাসের আদেশ হয়। দীর্ঘ বনবাসের পর অবশেষ যজ্ঞসভায় বাণীকি যখন রামচন্দ্রের নিকট আবেদন করেন সীতাকে গ্রহণ করিবার জন্ত, তখন রামচন্দ্র গ্রহণ করিবার প্রস্তাব অমুমোদন করেন নাই। যজ্ঞসভায় সর্বসমক্ষে পুনরায় পরীক্ষা দিবার প্রস্তাব হয়। যে বান্দী তাঁহাকে অগ্নিপরীক্ষা উত্তীর্ণ হইতে দেখিয়াছেন তিনিই পুনরায় পাতিত্রস্তোর পরীক্ষা দিতে বলিতেছেন। সীতার হৃদয়ের তৎকালীন বেদনার কি কোনো পরিমাপ আছে? এই পরীক্ষাই সীতার জীবনের চরম পরীক্ষা। তিনি রামচন্দ্রের মুখের দিকে চাহিলেন না। ইষ্টদেবতা সূর্যের দিকেও তাকাইলেন না। তিনি বৃথিতে পারিলেন তৎকালীন তাঁহার যে বেদনা—সে বেদনা সহ্য করিবার শক্তি সর্বসংসহা বহুমতী ছাড়া আর কাহারও নাই। সেইজন্য সীতা তখন পৃথিবীর দিকে চাহিয়া বলিলেন—রাম ছাড়া আর কাহাকেও আমি জানি না—একথা যদি সত্য হয়, কায়মনোবাক্যে আমি রামের অর্চনা করিয়াছি—একথা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে মা পৃথিবী আমাকে তাঁর বুক স্থান দিন। সীতার মুখ হইতে তিনবার একথা উচ্চারিত হইবার পর যাহা ঘটিয়াছে তাহা আপনারা জানেন। এই অনন্তকালব্যাপী রূপ দিতে পারিয়াছেন বলিয়াই বাণীকি আদি কবিগুরু। মহাভারতের আখ্যায়িকার ভিত্তি জৌপদীর বেদনার উপর প্রতিষ্ঠিত। কৌরব রাজসভায় জৌপদীর অবমান মহাভারত রচনার মূল প্রেরণা। জৌপদী যখন লাহিতা হন—তখন তাঁহার দুইদিকে কুরুকুলের দুই শাখা। জৌপদী একবার দক্ষিণে একবার বামে তাকাইলেন না। কিন্তু তাঁহাকে অবমান হইতে রক্ষা করিবার জন্ত কাহাকেও তিনি উদ্ধত দেখিতে পাইলেন না। মানুষ যখন সেই অবমাননার প্রতিকার করিতে পারিল না তখন জৌপদী আকুল আবেদনে অতীন্দ্রিয়শক্তির নিকট আপনার বেদনা নিবেদন করিলেন। তৎক্ষণাৎ সেই শক্তির ক্রিয়া প্রকাশ পাইল। অবমানিতা জৌপদীর বেদনা মহাভারতকারের রচনার মধ্যে অন্তরতা লাভ করিল। ইহাই সাহিত্য—সাহিত্যের মূল ভিত্তি মানুষের বেদনাকে রূপ দিবার ক্ষমতা। পরবর্তীকালে শকুন্তলার মধ্যে, সেন্স-পায়রের রচনায় ও বঙ্কিমচন্দ্রের রচনার মধ্যে মানুষের বেদনা রূপ লাভ করিয়া অমর ও সর্বকালস্থায়ী সাহিত্য সৃষ্টি করিয়াছে।

জীবনের অগ্রগতির পথে, রাজনীতি ও সমাজের বিবর্তনের পথে মধ্যে মধ্যে বিপর্যয় আসে। সেই বিপর্যয়ের রথক্ষেত্রে কত মানুষ নিপীড়িত হইয়া যায়। মানুষের জীবনধারা এবং মানুষে মানুষে সম্পর্ক ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। সমাজ, সংস্কার ও ঐতিহ্য সহসা ভাঙিয়া

পড়ে। ইতিহাস এইগুলিকে মাত্র ঘটনা হিসাবে এবং ঘটনার অগ্রগতির চিত্র হিসাবে উল্লেখ করিয়া যায়। কিন্তু ইহার প্রকৃত রূপ এবং অন্তর্নিহিত সত্য রক্ষিত ও পরিষ্কৃত হয় সাহিত্যে। সাহিত্যিক আপনার অনুভূতিকে প্রসারিত করিয়া মনুষ্যজীবনের ও মনুষ্যসমাজের ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত অনুভূতিকে গ্রহণ করেন এবং তাহাই পুনরায় আপন কল্পনার বর্ণবিজ্ঞাসে ভাষার মধ্যে রূপ দিয়া সমাজের নিকট কিরাইয়া দেন। ইতিহাসের যুগসন্ধিক্ষণ এইরূপ সাহিত্যিকের উদ্ভবের অপেক্ষা রাখে এবং যুগসন্ধিক্ষণে এইরূপ সাহিত্যিক দেখা দেয়। তাঁহারাই লাভ করেন যুগসাহিত্যিকের পদবী। বাঙালার ইংরাজ-শাসনের প্রথম যুগে 'ছিয়াত্তরের মঞ্চের' দেখা দিয়াছিল; দেশে ও সমাজে বিপর্যয় আনিয়াছিল। মানুষের সেই পুঞ্জীভূত বেদনা রূপ ও ভাষা পাইবার জন্ত যুগসাহিত্যিকের উদ্ভবের অপেক্ষা করিতেছিল। প্রায় এক শতাব্দীকাল পরে ইহাই রূপ লইল বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠ'। মানুষের গভীরতম অনুভূতির আবেদন কখন ব্যর্থ হয় না। স্থূল সত্তার উদ্ভূত কোন স্তরে উহার ক্রিয়া থাকিয়া যায়। সংবেদনশীল মনের ও অধ্যাত্ম-চেতনার স্পর্শ পাইলেই উহা পরিপূর্ণরূপে রূপায়িত হইয়া ওঠে। বঙ্কিমের মধ্য দিয়া উহা আমরা প্রত্যক্ষ করিয়াছি।

বাঙ্গালীর জীবনসমুদ্রের উপর দিয়া আজ যে মন্থন চলিয়াছে সেই মন্থনের মধ্যে আমাদের চক্ষের সমুখে মনুষ্যজীবনের গভীরতম বেদনার ঘটনা ও প্রকাশ অহরহঃ ঘটতেছে। ইহার বিস্তার ও গভীরতা এতখানি যে, সাধারণ চিন্তা ও কল্পনায় সাধ্য নাই যে, ইহাকে ধারণ করে। বাঙ্গালীর জীবনে যে এতবড় দুর্দিন আসিয়াছিল ইহার নিদর্শন রক্ষিত হওয়া প্রয়োজন। কিন্তু ইহাকে ভাণ্ড ও রূপ কে দিবে? বাঙ্গলা সাহিত্যের পূর্বগুরুগণ আজ বর্তমান থাকিলে তাঁহাদের চিন্তা ও রচনার ধারা কিরূপ হইত বলিতে পারি না। কিন্তু যাহা দেখিয়াছি ও যাহা দেখিতেছি ইহাকে রূপ দিবার জন্ত বর্তমানে বা ভবিষ্যতে যুগসাহিত্যিকের প্রয়োজন অপরিহার্য। উৎপীড়িত মানবাত্মার অনুভূতি অধ্যাত্মচেতনার স্তরে যে আঘাত ও যে তরঙ্গের সৃষ্টি করে, তাহা সংবেদনশীল মনে সঞ্চারিত হইয়া আপনাই যুগসাহিত্যিককে জাগাইয়া তোলে একথা সত্য। তথাপি মানব বেদনার এই প্রকাশকে রূপ ও ভাষা দিবার জন্ত সাহিত্যিকের যে দায়িত্ব আছে, বর্তমান সাহিত্যিকগণকে তাহাই বিশেষভাবে স্মরণ করাইয়া দিতেছি।\*

\* ৪ঠা জুন মেদিনীপুর বিভাগাগর হলে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের মেদিনীপুর শাখার বার্ষিক উৎসবের সমুজ্জ্বল সাহিত্য সম্মেলনের সভাপতির অভিভাষণের মর্ম।



# সেইসময়

## নারায়ণ গঙ্গাপাখিয়ার



—বারো—

—একবার জয়গড়ে আশুন, খুব জরুরি দরকার।

নগেন ডাক্তার খবর পাঠিয়েছেন।

দুপুরে সাধারণত চাকরী থাকে না। এই সময়ে গীতোক্ত কৌন্তেয়—অর্থাৎ কুমার ভৈরবনারায়ণ বিশ্রাম শয্যায় গা এলিয়ে দেন। এই বিশ্রাম পর্বটা দেখবার সুযোগ একবার ঘটেছে রঞ্জনের। ব্যাপারটা শুধু রোমাঞ্চকর নয়—রীতিমতো ভয়াবহ। জাহাজের মতো একখানা সুবিশাল খাটে পুশ্যান কুমার বাহাদুর পড়ে থাকেন একটি ব্রহ্মদেশীয় শিশু-হস্তীর মতো। হুবেলা কুস্তি-করা ছজন ছাপরাই চাকর তখন সশব্দে তাঁর অঙ্গসেবা করতে থাকে। মহিষ খনি করানার দৃশ্য তার চোখে পড়েছে—ডলন-মলনের আওয়াজ শুনে পাওয়া যায় আধ মাইল দূর থেকে। কিন্তু কুমার বাহাদুরের অঙ্গ-মর্দনের ধকল একদিন সহ্য করতে হলে বুনা মোষও জেলী মাছ হয়ে যেত। বগা জোয়ান দু'দুটি পালোয়ানেরও মুখ দিয়ে ফেনা ছুটতে থাকে; মাথার ওপর বায়ান্ন ইঞ্চি পাখার প্রচণ্ড ঘূর্ণন সঙ্গেও তাদের গা দিয়ে দরদর করে নামতে থাকে কাল-বাম।

রাজা ভগবানের সাক্ষাৎ প্রতিনিধি—সন্দেহ কী! সকালে-বিকালে অন্তত কয়েক হাজার লোক হাত বুলিয়ে আসে কানীর বিশ্বনাথের মাথায়। অবশ্য হাত বুলিয়ে কিছু তারা হাতাতে পারে কিনা কে জানে, কিন্তু বিশ্বনাথকে বসে বসে দিতে হয় ধৈর্যের পরীক্ষা। সে-হিসেবে ভৈরব-নারায়ণ নিশ্চয় দেবাংশসম্মত। বিশ্বনাথের কাছে কিছু নগদ শ্রদ্ধায় মেলে না, এখানে অন্তত রাজসেবায় দুটি প্রবল-মল্ল প্রতিপালিত হচ্ছে।

বারোটা থেকে পাঁচটা—এইটুকুই সব চেয়ে মূল্যবান সময়। সাময়িকভাবে ঘটোংকচের পতন। তারপর পাঁচটায় চা—তার মধ্যেই ফিরে এলেই চলবে। তখন কুমার বাহাদুরের চার পাশ ঘিরে বসবে স্তাবকের দল—ডাক্তার, পোষ্ট-মাষ্টার, সদর-নায়েব, স্মীরনবীশ। বোড়ায়

চড়ার গল্প, ভৌতিক কাহিনী, কাস্তনগরের যুদ্ধের ইতিহাস, লাট-সাহেবের একখানা আন্তো খাসির রাং খাওয়ার জালাময়ী বর্ণনা। সেই সময় তাকে হাসতে হবে, হেঁ হেঁ করতে হবে—বিমুগ্ধ বিশ্বাসে তাকিয়ে থাকতে হবে বিস্ফারিত দৃষ্টিতে। তার আগে পর্যন্ত আপাতত ছুটির পালা।

কুমার বাহাদুরের অঙ্গ-মর্দন চলতে থাকুক, এই ফাঁকে তার জয়গড় ঘুরে আসা দরকার।

ঘরটায় একটা তাল দিলে, তারপর বারান্দা থেকে সাইকেলটা নামিয়ে বেরিয়ে পড়ল রজন।

আবার সেই ধান-ক্ষেতের মধ্যে দিয়ে কুমারীর সিঁথির মতো পথের রেখা। অগণিত পদ্মকোরকের মতো তুঁতের হিরণ্ময় পাত্রে ঘন ক্ষীরের মতো জমে-আসা ধান। দূর-দূরান্তব্যাপী হরিতের ওপর হিরণের দ্যুতি পড়েছে—আর কদিন পরেই পাকতে আরম্ভ করবে। কিন্তু এবার কিছু পোকের উপদ্রব আছে, কিছু নষ্ট হবার সম্ভাবনা। তা ছাড়া আকাশে কালো মেঘেরও আনাগোনা চলছে—যদি জল আসে তাহলে এদের অর্ধেক ডুবে যাবে এমন আশঙ্কাও জেগেছে লোকের মনে।

দু'ধারের ধান ক্ষেতের চড়াই-উৎরাই ভেঙে সে চলল। হালকা ধুলোর ওপর সাপের রেখা, আর মাছঘের পদচিহ্নের ওপর চাকার দাগ টেনে চলল সাইকেল।

এই ক্ষেতটা পার হলে তিন চারটে শিমূল গাছ এক জায়গায় জটলা পাকিয়ে গোল হয়ে দাঁড়িয়ে—; ওইখান দিয়ে ত্রিভুজের একটা কোণের মতো ভৈরবনারায়ণের এলাকার মধ্যে খানিক দূর ঢুকে গেছে ফতেশা পাঠানের জমি। ছজনের মধ্যে ওটা নিয়েই লাঠালাঠি আর ঝামেলা। এই সীমান্ত-রেখার ওপরে পর পর সাঁওতালদের কয়েকখানা ছোট ছোট গ্রাম—ফতে শাহর অব্যাহত প্রজার দল। টুলু আর ধীরুয়া সাঁওতালের জন্মভূমি।

মাঠ পার হয়ে শন-বাসের বন চলে চলতে চলতে মনে

পড়ছিল দিন কয়েক আগে এখানেই সীওতালদের বুনো-শূয়ার মারতে দেখেছিল সে। আরো মনে পড়ল সীওতালদের ওখানে নাচ দেখবার এবং মাংস-ভাত খাওয়ার একটা নিমন্ত্রণও ছিল তার। সেদিন সেটা রক্ষা করবার সুযোগ হয়নি—একদিন এসে চুকিয়ে যেতে হবে তাকে।

—আদাব বাবু।

তাকিয়ে দেখল পাশের আলু দিয়ে একদল মুসলমান চাবী এগিয়ে আসছে। সম্ভাব্যতা তাদেরই।

—হাজী সাহেব যে। খবর কী?—প্রসন্ন মুখে সাইকেল থেকে নেমে পড়ল রজন : জিয়াবুং আছে নাকি কোথাও?

দলটি তখন রাস্তার সামনে এসে পড়েছে। সকলের আগে আগে পিয়ার হাজী—এ তল্লাটের তিনিই সামাজিক নেতা। সম্পন্ন চাবী। প্রায় একশো বিবে জমি রাখেন, খান চারেক গরুর গাড়ি আছে। অল্প-সল্প ইংরেজী জানেন—হজ্ব ঘুরে এসেছেন।

মধ্যবয়সী লোক—মুখে একটি প্রসন্ন হাসি লেগেই থাকে। হেসেই বললেন, না, জিয়াবুং নয়।

—তবে এত সেজে গুজে চলেছেন কোথায়? আজ তো কোনো পরব নয়।

সাজ গোছের ঘট। সকলেরই একটু আছে, সন্নেহ নেই। কারো মাথায় শাদা ধব ধবে গোল টুপি, কারো রাঙা টকটকে ফেজ। শাদা পায়জামার ওপর হাজী সাহেব কালো রঙের একটা লম্বা কোট পরেছেন, পায়ে চকচকে জুতো। বাকী সকলের কারো ফর্সা পাঞ্জাবী, কারো জাপানী-আঙ্গুর জামা, পাট-ভাঙা লুজি আর পায়জামা। বেশ সমারোহ করেই বেরিয়েছে দলটা।

হাজী সাহেব বললেন, একটা মিটিং আছে আমাদের।

—মিটিং? কিসের মিটিং?

—লীগের।

—লীগের কাজকর্ম এ তল্লাটেও আছে নাকি?—রজন বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করল।

—এতদিন ছিল না—এইবারে হচ্ছে।—হাজী সাহেবের হাসিটা এবারে আর একটু বিস্তৃত হয়ে পড়ল। ফুটে বেরল একটা আন্তরিক প্রসন্নতা।

—সে তো বেশ কথা। কিন্তু মিটিংটা হচ্ছে কোথায়?

—শাহর কাছারীতে। কাল ঢোল দিয়ে গেছে গ্রামে গ্রামে।

—শাহর কাছারীতে!—রজনের স্মৃতি আবার সজাগ হয়ে উঠল : আলিমুদ্দিন মাস্টারও আছেন নিশ্চয়?

—তিনিই তো গোড়া। তাঁর চেষ্ঠাতেই সব হচ্ছে।

—কৃতজ্ঞতার রেশ লাগল হাজী সাহেবের গলায় : খুব এলেমদার লোক।

—হাঁ, আমার আলাপ হয়েছে তাঁর সঙ্গে—রজন বললে, আচ্ছা, আপনারা যান। ওদিকে আবার আপনারদের দেরী হয়ে যাবে।—রজন সাইকেলে উঠল।

—আপনি কোথায় চললেন?

—বাব একটু জয়গড় মহলে।

—আদাব—

—নমস্কার—

শন ঘাসের বনের মধ্য দিয়ে আবার এগিয়ে চলল রজন।

আলিমুদ্দিন মাস্টার! হাঁ—বার তিনেক নানা উপলক্ষে দেখা হয়েছে তাঁর সঙ্গে। কথাবার্তার সুযোগও ঘটেছে কিছু কিছু। তীক্ষ্ণদী, বিচক্ষণ লোক। চাপা ঠোঁট—মুখের ওপর একটা শাস্ত কাঠি। বজ্রগর্ভ মেঘের মতো চেহারা। দেখলেই বোঝা যায়, অনেকগুলি মানুষকে নিয়ন্ত্রিত করার শক্তি তাঁর আয়ত্ত।

তিনিই লীগের সংগঠন কাজে মন দিয়েছেন! খুব চমৎকার কথা। দেশের প্রতিটি সম্প্রদায় আত্ম-সচেতন হোক, নিজের মর্মান্দাকে ফিরে পাক; মুক্তি লাভ করুক সবরকমের হীনমস্ততার পীড়ন থেকে। এর চেয়ে বড় জিনিস আর কী হতে পারে! জাতির এক একটি অঙ্গ যদি শক্তিশালী করতে পারে, তা হলে তার সমগ্র দেহের পূর্ণ জাগরণে আর কতখানি দেরী হবে!

পৃথক জাতীয়তা—পৃথক সংস্কৃতিবোধ! হোক—কোনো ক্ষতি নেই। অন্তত বাঙালি মুসলমান যে প্রধানত নীক্ষিতের সন্তান—এ ঐতিহাসিক সত্যকেও ভুলে যাওয়া চলে! আর সংস্কৃতি! অন্ধের মতো চোখ বুজে না থাকলে মানতেই হবে সভ্যপীরের পাঁচালী আর মানিক পীরের গানের মধ্য দিয়েও তার ব্যবধানের সীমাটাকে কোনোদিন একেবারে মুছে ফেলা যায়নি।

এমন কি, “দীন-ইলাহী”র ঐক্য মন্ত্র যিনি দিয়েছিলেন, সেই সম্রাট আকবরের সময়েও আগ্রা শহরে মসজিদের সামনে বাজনা বাজানো নিয়ে সাংপ্রদায়িক দাঙ্গা হয়েছিল—এমন কথা ইতিহাস বলে।

সুতরাং পৃথক্ জাতিত্বে আপত্তি নেই। ইসলাম জাণ্ডক। শুধু আসন্ন বস্ত্রার ওই মেঘগুলোর মতো একটি প্রশ্ন মনের মধ্যে ঘুরছে। এই হঠাৎ ঘুম-ভাঙা দুর্দান্ত মানবতা যখন খাণ্ড-বজ্র-মুক্তি—সংস্কৃতির আকুলতায় ক্ষুধার্ত গরুড়ের মতো প্রশ্ন তুলবে :—কংখাম,—তখন নিজেদের অযোগ্যতা ঢাকবার জন্তে তাকে প্রতিবেগী কিরাত-পন্নী দেখিয়ে দেবেনা তো এর উলগাতারা? তার ক্ষুণ্ণবৃত্তি পূরণ করবার মতো পর্যাপ্ত সংস্থান তাদের আছে তো?

সেইখানেই ভয়। আর সে ভয় যে একেবারে অমূলক নয়—তারও আভাস দেখা গেছে নানাভাবে। অন্তর্ক-অবিশ্বাস করা নয়—নিজেকে বিশ্বাস করতে পারাই সব চেয়ে বড় কাজ।

হয়তো আলিমুদ্দিন মাস্টার তা পারবেন।

জয়কালী মন্দিরের বট গাছটা সাইকেলের ক্ষতগতির সঙ্গে সঙ্গে ক্রমশঃ দিগন্ত থেকে সামনে এগিয়ে এল।

এই জয়কালীর মন্দির থেকেই সম্ভবত জয়গড়। গড় হয়তো কোনোদিন ছিল—হয়তো ‘পাল-বুরুজের’ গড়খাই এরই সীমান্ত রেখা। কিন্তু গড়ের চিহ্নমাত্র নেই কোথাও। গ্রামের পূর্ব-দক্ষিণ জুড়ে ইংরেজী ‘এল্’ হরফের মতো অজগর জঙ্গলে ছাওয়া একটা জাঙ্গাল আছে বটে—হয়তো গড়ের প্রাচীরের ধ্বংসশেষ। জয়কালীর পুরোনো মন্দির এখন একটা মাটি ঢাকা ইটের পীজা—গ্রামের লোক কিছু খরচপত্র করে একটি ছোট মন্দির তুলে দিয়েছে এখন।

পেছনে একটা বড় বট গাছ—তার তলায় একখানা পঞ্চমুণ্ডী আসন। বাংলা দেশে ‘ডায়াকির’ বৃগে যখন সারা উত্তর-বাংলা জুড়ে ভয়াবহ অরাজকতার স্রোত বয়ে গিয়েছিল—সেই সময়ে কোনো দৃষ্ট্যপতি ওই আসনে বসে সিদ্ধিলাভ করেছিলেন। তার পাশে একটা মলা-দীঘি—ওর ভেতরে সন্ধান করলে নাকি এখনো

একশো আটটি নরবলির ককাল-করোটি খুঁজে পাওয়া যাবে। দুর্বল নায়ুর মাহুস আকো নাকি রাত-বিরেতে বিভীষিকা দেখে এই পঞ্চমুণ্ডী আসনের পাশে।

নির্জন মন্দিরের পাশ দিয়ে যেতে যেতে রঞ্জনের মনে হল, আজ আবার নতুন করে এক তন্ত্রসাধনার সূত্রপাত হয়েছে এই জয়গড়ে। এও কত নরবলি দাবী করবে কে জানে। কিন্তু এই সাধনার শুধু একটিমাত্র মাহুস সিদ্ধিলাভ করবে না—লক্ষ লক্ষ মাহুসকে মুক্তি দেবে।

গ্রামে ঢুকতে গোরুর গাড়ির লিক-আঁকা একটা মেটে রাস্তা পাওয়া গেল। সেই রাস্তা দিয়ে আর একটা বাঁক ঘুরতেই খানিকটা উচু ডাঙার ওপর ছোট একটি মহুয়া বন। আর এই মহুয়া বনটির পরেই নগেন ডাক্তারের বাড়ি।

বাড়ির বাইরের ঘরে ডিসপেন্সারী। ছোট ডিসপেন্সারী—যৎসামান্য আয়োজন। একটা বার্ণিশ-বিহীন চেয়ারে বসে এবং সামনে কাগজ-পত্র আর ডাক্তারী ব্যাগরাখা টেবিলটার ওপরে পা রেখে কী যেন পড়ছিল নগেন ডাক্তার।

বারান্দায় সাইকেল তোলার সঙ্গে বই সরাল নগেন, পা নামালো। সাদরে ডাকল, রঞ্জনদা? এসো—এসো—

রঞ্জন ঘরে ঢুকে নগেনের মুখোমুখি একটা চেয়ার নিয়ে সশব্দে বসে পড়ল।

সামনে ঝুঁকে পড়ল নগেন। অন্তরঙ্গ গলায় বললে, আমার চিঠিটা পেয়েছিলে তা হলে?

—পেয়েছি।—রঞ্জন হাসল : কিন্তু বত তাড়া আমার দিয়েছিলে, তোমার মধ্যে সে তাড়া তো দেখছি না। দ্বিবি নিশ্চিন্ত মনে পড়াশুনো হচ্ছিল। কী পড়ছিলে?

নগেন হাসল লজ্জিতভাবে—গাল দুটো রাঙা হয়ে উঠল। এত ভালো কর্মী, এমন দৃঢ়ব্রত, তবু একটা অপূর্ব শাস্ত কমবীরতা আছে ওর ভেতরে। ব্যেস চবিশ-পঁচিশ—তবু এখনো ছেলোমাল্লিষি চেহারা। দেখলে মনে হয় আঠারো উনিশের বেশি ব্যেস হবে না।

সলজ্জ গলায় নগেন বললে, একটা লিটারেচার পড়ছিলাম।

—কী লিটারেচার?

—আমাদের ডাক্তারী। বিলিভী ওষুধের কোম্পানি গঠিয়েছে।—নগেনের চোখ দুটো বিষন্ন হয়ে উঠল : কিন্তু দিয়ে আমরা কী করব? এ সব পেটেন্ট ওষুধ প্রেস-স্ক্রীপশন করবে শহরের ডাক্তারেরা—মোটামুটি দিয়ে মনে থাকবে শহরের লোক। তা ছাড়া এদের অধিকাংশই ডাক্তারদের সর্বনাশ করছে।

রজন বললে, তোমার প্রথম কথাটা বুঝলাম, কিন্তু তীয়টা ধোঁয়াটে রয়ে গেল। ডাক্তারদের সর্বনাশ করছে মন?

নগেন বললে, মেডিসিন তৈরী করতে ভুলে যাচ্ছে ডাক্তাররা—এদের ওপরেই বরাত দিয়ে নিশ্চিন্ত হচ্ছে। আর ফল কী পাড়াচ্ছে জানো? কম্পাউন্ডিং করে দিলে যার ম পড়ত বারো আনা, পাঁচ টাকা দিয়ে তার পেটেন্ট ষ্ট্রাক্টর কিনে খেতে হচ্ছে লোককে।

রজন হাসল : পৃথিবীতে দেখছি সমস্তার আর অন্তই। কিন্তু ও কথা যাক—ওসব আমার পক্ষে একেবারে অধিকার চর্চা। এখন বলো দেখি, এমনভাবে হঠাৎ ডাক কেন?

নগেন বললে, বলছি সর। কিন্তু এখানে নয়। চলো তরে। অনেকগুলো দরকারী পরামর্শ আছে তোমার জন্য।

হাতের ঘড়ির দিকে তাকিয়ে রজন বললে, এখন ডটা। চারটের মধ্যে আমার ছেড়ে দিতে হবে—মুহুর্ত সে বললে, নইলে আমার চাকরী থাকবে, জানো?

—যাওয়াই ভালো—নগেনও হাসল : নাও, ভেতরে যা।

বাড়িতে মাটির দেওয়াল, টিনের চাল। তবু পাড়ায়ের নিছুল পরিচ্ছন্নতা ঝক ঝক করছে সব জায়গায়। ঠানে ঢেঁকি আছে, তার পাশে লাউ মাচা। পেছনের চৌরী ঘিরে বড় একটা বাতাবী গাছ—অকুপণ ফলের ঝরোহ সেখানে।

নিজের শোবার ঘরে নগেন নিয়ে এল রজনকে। আড়ম্বরহীন ঘর। একধারে ছোট একটি শেল্ফে বসন্তক বই। শীতলপাটি বিছানো তক্তপোষের মাথার ছে জড়ানো সতরঞ্জির বিছানা।  
নগেন বললে, বোসো।

রজন বিছানায় বসল। সামনে একটা টুল টেনে নিলে নগেন।

—তারপর?

—দাঁড়াও। অনেক দূর থেকে এসেছ—একটু জল খাও আগে।

—পাগল নাকি! এই তো খেয়ে-দেয়ে বেরিয়েছি।

—হ' মাইল সাইকেলের থাকায় সে হজম হয়ে গেছে—নগেন চীৎকার করে ডাকল : উত্তমা, উত্তমা?

—আসছি দাদা—বাড়ির কোনো এক দুরপ্রান্ত থেকে সাড়া এল।

—উত্তমা কে? তোমার বোন বুঝি?

—হাঁ।—নগেন বললে, তুমি ওকে দেখোনি আগে। মামাবাড়ি গিয়েছিল মাস তিনেক আগে—মামীমার খুব অসুখ চলছিল।—একটা প্রসন্ন মেহ ফুটে উঠল নগেনের মুখে : ও আমার ডান হাত। সব কাজ-কর্ম করে দেয়। মোটামুটি খানিক কম্পাউণ্ডারী শিখিয়ে নিয়েছি, দরকার হলে ওষুধ-পত্র করে দেয়। ও না থাকায় খুব অসুবিধে হচ্ছিল।

—বিনা পরসায় বৈশ কম্পাউণ্ডার পেয়েছ তো।

—তা পেয়েছি।—নগেন হাসল : কিন্তু ওই কম্পাউণ্ডারটির জালায় আমার ডাক্তারখানা চ্যারিটেবল ডিসপেন্সারী হয়ে উঠেছে।

—কেন ডাকছিলে দাদা?

দোরগোড়ায় উত্তমাকে দেখতে পাওয়া গেল।

—কে এসেছে, চিনিস একে?

—বুঝেছি, রজনদা।—উত্তমা হাসল, এগিয়ে এসে প্রণাম করল রজনকে।

—আরে হিঃ হিঃ—থাক থাক—সসঙ্কোচে পা সরিয়ে নিলে রজন।

—অত ঝাবড়াছ কেন? প্রণামটা পাওনা জিনিস—আদায় করে নিতে লজ্জা নেই।

উত্তমা খিল্ খিল্ করে হেসে উঠল। প্রচুর স্বাস্থ্য আর অপরিমিত প্রাণ থাকলে যে হাসি আলোর মতো নিরব্রজ হয়ে পড়ে—সেই হাসি। রজন ভালো করে তাকিয়ে দেখল উত্তমাকে।

শ্রামবর্ণের ছোট-খাটো একটি মেয়ে। রূপের



ব্যাকরণে স্ত্রী বলতে বাধে। পরশে আধ-ময়লা ডুরে-শাড়ী। মেধাবী পুরুষের মতো চণ্ডা কপাল—গ্রাম-বুড়ারা হয়তো সংজ্ঞা দেবেন ‘উচ কপালী’ বলে। সেই কপালের ওপর এক গুচ্ছ অলকের নিচে স্বেদবিন্দু চিকমিক করছে। অটুট স্বাস্থ্যে গড়া শরীর। আর সব চাইতে আগেই চোখে পড়ল পরিপুষ্ট নিটোল দুখানি হাত। আঙুলগুলি কঠিন—মেয়েদের তুলনায় একটু বেশি লম্বা। চম্পক-কলির ব্যঞ্জনা কোথাও নেই—পরিশ্রমের নিতুর্ল চিহ্ন। হাতে চারগাছা করে কাঁচের চুড়ি—তাদের ওপর মাটির একটা হাল্কা আন্তরণ পড়েছে।

—কী করছিলি রে ?

—বাগানে মাটি কোপাচ্ছিলাম।

—বেশ করছিলি। তা মাটি কোপানো এখন থাক। রজনদার জন্তে কিছু খাবার নিয়ে আয়।

—না—না, কিছু দরকার নেই—সন্তুষ্টভাবে রজন জবাব দিলে।

—গুরুপাক কিছু নয়, সামান্য কিছু গাছের ফল।—নগেন হাসল, তা ছাড়া আমি ডাক্তার—আমার ওপর তুমি নির্ভর করতে পারো। যা—যা—দাঁড়িয়ে রইলি কেন ? উত্তমা বেরিয়ে গেল।

কথা আরম্ভ করার আগে চিন্তাটাকে যেন গুছিয়ে নেবার জন্তে একবার জানালা দিয়ে বাইরে তাকালো নগেন। জানালার ওপারে মহা বন—তার পেছনে টাঙ্গন নদীর খাড়া পাড়ি। অন্তরুখী চোখটাকে সেদিকে রেখে নগেন বললে, তুরী-পাড়ার পঞ্চায়েতে আমি থাকতে পারিনি। তুমি যখন গিয়েছিলে, তখন ওতেই কাজ হয়েছে। কেমন মনে হল ?

—চমৎকার। একেবারে বাকদের মতো তৈরী। আঙুন ধরিয়ে দিলেই হয়।

—হ্যাঁ—ওরা বেশ গড়ে উঠেছে। ভালো লড়াই করতে পারবে—কচি কচি মহা পাভাগুলোর দিকে চোখ রেখে নগেন বললে, এত ব্যয় হয়েছে, তবু সোনাই মণ্ডলের কী রকম জোর দেখেছ ?

—তাই দেখলাম।—উৎসাহিত হয়ে উঠল রজনদার : ওরা তো চাবী। ওদের কাছ থেকে এতখানি আশা আমাদের ছিল না।

—চাবী আর কোথায় দেখছ !—নগেন এবার চো ফিরিয়ে এনে সোজা রজনদের দিকে তাকালো : ওদের দেনার অবস্থা জামো ? বেশির ভাগেরই এখন ক্ষেত মজুরের দশা—লাভের মোটা টাকাটা সোজা চলে যা মহাজনের হাওর-পেটে। যাও সামান্য কিছু হত—ডাঁড়া বানে একেবারে পথে বসিয়ে দিচ্ছে। এবার ডাঁড়া বাঁধ না দিলে ওদের আর বাঁচবার জো নেই।

—কিন্তু ডাঁড়ায় বাঁধ দিলে কী হবে বাড়তি জলটার ওদিকে বান ডাকবে না তো ?

—না, না, সে সব ভয় কিছু নেই। ডাঁড়ার মুখ ব করলে দক্ষিণের ঢালু মাঠটা দিয়ে জল চলে যাবে। তো মরা মাঠ—এমনিতেই বর্ষায় সাগর হয়ে যায়...হাত খানেক করে জল বাড়বে এই যা। আসলে ক্ষতি শু ভৈরবনারায়ণের, জলকর ছুটোয় একটু অসুবিধে হবে কিন্তু কয়েকশো টাকার জলকর বাড়িতে গিয়ে দু হাজ বিঘে জমির ধান এমনভাবে বরবাদ হবে নাকি ?

—না, এবার আর তা ওরা হতে দেবে না। কা পুখুরিতে আঙুন জলবে, আমি স্পষ্ট বুঝতে পেরেছি নগেন বললে, রজনদা তোমার কাছ থেকে আ পরামর্শটাই বাকী। যত দূর মনে হচ্ছে—শুধু তুরী একার লড়াইতেই হবে না। এ অঞ্চলের সমস্ত মাহ গুলোকে নিয়ে একটা ‘কমন্ কন্স’ তৈরী করতে হবে।

—আহীররা ?

—নিশ্চয়। ওরা তো আঙুনের মতো গরম হ আছে। হাতের লাঠি ওদের তৈরী ! তা ছাড়া জটা সিংয়ের খুনের পর পুলিশ এসে ওদের জন-পাঁচেককে ধ নিয়ে গেছে। শোননি বুঝি ?

—না তো !

উদীপ্ত মুখে নগেন বললে, কাল আমি ওদের ওখা গিয়েছিলাম। এতদিন আমাদের কৃষাণ-সমিতির ক বলেছি—কিন্তু আমল পাইনি। এবার দেখলাম—অ ভাবনা নেই। একদম তৈরী। এ লড়াইয়ে ওরাই হ ভ্যানগার্ড। তুরীদের লড়াইয়ের কথা ওদের বলেছি।

—তার পর ?

—বা কেপে আছে, একটা সুরোগ পেলেই হল।

—যাক, এটা একটা সুখবর।

নগেনের চোখ জলতে লাগল : টিলার সীতালদেরও  
খাওয়া যাবে।

—ওরা তো কতে শা পাঠানের প্রাণ।

—তাতে আটকাবে না। সব জমিদারই ওদের পক্ষে  
মান। যদি আমরা ভালো করে অর্গানাইজ্ করতে  
পারি, তা হলে সমস্ত এরিয়ার মাহবুললোকে এই লড়াইয়ে  
টেনে আনতে পারব—নগেনের গলার স্বর একটা আগামী  
বতায় উচু পর্দায় চড়তে লাগল আন্তে আন্তে : ওই  
সীতালদের ওপর তোমার হাত আছে—ওদের টেনে  
মাতে হবে তোমাকে।

—দেখি চেষ্টা করে—রজন হাসল : কিন্তু তোমাদের  
গলায় কুমার বাহাছকের ওখানে আমার অমন ভালো  
করীটা চলে যাবে দেখছি। কোনো খামেলা ছিলনা—  
ধু নির্বিঘ্ন গীতাপাঠ। ভবিষ্যতেরও আশা ছিল—হয়তো  
কটা ব্রহ্মোত্তরও মিলে যেত এক সময়ে।

নগেনও হাসল : আখেরের ভাবনা ভাবতে হবে না।  
তোমার নাম আমাদের বইতে টোকা আছে। দুনিয়া  
খন পাল্টাবে—যখন নতুন করে মাটির বিলি-ব্যবস্থা  
বে, সেদিন তুমিও ফাঁক পড়বে না। তবে তার আগে  
। অস্ত্রবিধেটুকু ভোগ করতেই হবে।

—তার মানে এটা ইন্ডেস্ট্রমেন্ট ?

—তাই—নগেন হেসে উঠল সশব্দে।

উত্তম প্রবেশ করল। শাড়ীটা বদলে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন  
য়ে এসেছে—ধুয়ে মুছে এসেছে শরীর থেকে মাটি  
ফাপানোর চিহ্ন। গাছ-কোমর বাঁধা আঁচলটিকে বিশ্রু  
রে নিয়েছে শোভন কমনীয়তায়। একহাতে ঝকঝকে  
পতলের থালায় সমস্ত কাটা বাতাবী লেবু, কয়েক  
করো পেঁপে, ছুটি কলা আর কিছু নারকেলের নাড়ু,  
র এক হাতে কাচের গ্লাসে জল। সব মিলিয়ে যেন  
পূর্ব একটি রূপান্তর হয়েছে উত্তমার। একটু আগেকার  
তিনবাহ সেই কর্মী মেয়েটি নয়—চির-পরিচিত একটি  
ংলার নন্দিনী সামনে এসে দাঁড়িয়েছে।

নগেন উঠে আর একটা টুল টেনে দিলে। তার  
পর থালা গ্লাস নামিয়ে রাখল উত্তমা।

—এত কী হবে ?

—খাবেন।—উত্তমা হাসল।

—সব ?

—সব।

—কিন্তু আমি তো একটু আগেই খেয়ে এসেছি।

নগেন বললে, রজননা, বিনয় বন্ধ করো। খাওয়াটা  
শেষ করে নাও—অনেক দরকারী কাজ আছে।

রজন বললে, আচ্ছা লোক তো দেখছি। এমনি ভাবায়  
বুঝি অতিথিকে অভ্যর্থনা করে ?

—অতিথি হলে তো অভ্যর্থনা করব।—নগেন বললে,  
নাও, নাও। রাজবাড়ির রাজভোগের ব্যবস্থা অবশ্য  
এখানে নেই। কিন্তু টাটকা গাছের ফল, আর ঘরের  
নাড়ু—সম্পূর্ণ হাইজিনিক্।

অগত্যা আহারে মন দিতেই হল।

—মা কইরে উত্তমা ?

জ্যাঠামশাইয়ের ওখানে গেছেন। ফিরতে দেবী  
হবে।

—আমি পছন্দ করি না—মেঘের মতো মুখ করে  
নগেন বললে।

উত্তমা বললে, মা বলেন, সামাজিকতা রাখতে  
হবে।

—না রাখাটাই নিরাপদ—নগেনের মুখ আরো  
কালো হয়ে উঠল।

উত্তমা জবাব দিল না, দাঁড়িয়ে রইল নিঃশব্দে।

—নীরবে খাওয়া শেষ করল রজন। জাকৃষ্ণিত করে  
বসে রইল নগেন, আর জানালা দিয়ে বাইরের মহুয়া বন  
আর টাঙ্গন নদীর উচু পাড়ির দিকে তাকিয়ে রইল  
উত্তমা।

—আর দেব ?—খানিক পরে মুহু গলার উত্তমা  
জিজ্ঞাসা করল।

—সর্বনাশ—এই ম্যানেজ করতে প্রাণান্ত ! নিতান্তই  
নগেনের ভয়ে এতগুলো খেতে হল।

খালা আর মাশটা হাতে তুলে নিলে উত্তমা।

বেরিয়ে যাওয়ার মুখে নগেন পিছু ডাকল।

—হী রে, পোস্টারগুলো লেখা হয়ে গেছে ?

—সামান্য কিছু বাকী।

—দুপুরেই শেষ করে দিবি—সন্ধ্যার আগে আমার  
চাই।

—আচ্ছা—উত্তমা বেরিয়ে গেল।

—কিসের পোস্টার?—রুমালে মুখ মুছতে মুছতে  
জিজ্ঞাসা করল রঞ্জন।

—আমাদের কৃষক সমিতির ঘোষণা। আগামী  
লড়াইয়ের প্রস্তুতি।—নগেন একটু হাসলঃ আর এ  
গ্রামে আমাদের সবচেয়ে বড় শত্রু, কে জানে? আমার  
আঠামশাই।

—ও?—রঞ্জন তাকিয়ে রইল জিজ্ঞাসু চোখে।  
খানিকটা বোধগম্য হচ্ছে—উত্তমা আর নগেনের ব্যক্তিগত  
আলোচনার তাৎপর্যটা।

—বড় জোতদার। অনেক হাল আর বিস্তর কৃষাণ।  
তিনি আমাদের সমিতিতে ভাঙবার জন্তে তলে তলে  
মতলব ঝাঁটছেন। এখনো সুবিধে করতে পারেননি—  
তবে সময় হলেই যা দেবেন। বাক, সে কথা। এবার  
তোমায় একটু উঠতে হবে রঞ্জনদা।

—আবার কোথায়?

—যেতে হবে আমাদের কিষাণ সমিতিতে। যে  
ম্যান প্রোগ্রাম হচ্ছে, সে সম্বন্ধে ওরা তোমার সঙ্গে  
আলাপ করবে একটু।

—আচ্ছা চলো—হাতের বাড়িটার দিকে তাকিয়ে  
রঞ্জন বললে, ঘটনাক্রমে সময় আছে এখনো।

আগেই খবর পেয়ে কুড়ি পচিশজন এসে অপেক্ষা  
করছিল কৃষাণ সমিতিতে।

বড় একখানা ঘর। ওপরে খড়ের চালা—নিচে  
চাটাই। মাটির দেওয়ালে কিছু পোস্টার—কিছু ছবি।  
কান্ডে হাতুড়ীর ওপর জলজলে একটা লাল তারা—ওদের  
পথের নির্দেশ।

অফিস-সেক্রেটারী মনোহর জানাল, এদিকে ব্যবস্থা  
আমরা করে এনেছি। অন্তত দুশো লোক নিয়ে  
যেতে পারব।

—আহীররা আসবে, সাঁওতালদের ভারও নিয়েছেন  
রঞ্জনদা।—নগেন বললে, এই আমাদের প্রথম লড়াই।  
মনে রাখবেন এই আমার শক্তি পরীক্ষা। এখনো  
যদি আমরা জিততে পারি—তাহলে আমাদের পথ কেউ  
রুখতে পারবে না।

বিপ্লবের জয়ধ্বনিতে ঘরখানা কেঁপে উঠল।

ফেরবার পথে বিকেলের আলোয় বহুদূর থেকে ভৈরব-  
নারায়ণের প্রাসাদটা যেন আজ আবার নতুন করে  
চোখে পড়ল। চোখে পড়ল, বাড়িটার মাথার ওপর  
একপাল শকুন উড়ছে—যেন আসন্ন অপমৃত্যুর আঘাণ  
পেয়েছে ওরা। (ক্রমশঃ)

## ।অরবিন্দ

শ্রীধীরেন্দ্রনারায়ণ রায়

আমি  
তোমারই ভালবেসে যাই—  
হাসির মতন বাঁশীর মতন  
তিমির অন্ধ বাঁশীর মতন,  
শিখার মতন জ্যোতির মতন  
প্রেমের মতন ভেসে যাই।  
আসে  
প্রাণের সাগরে আলোর উৎস নামি’  
মোর  
মুখ হিয়ায় অলকনন্দা কানী—।  
তুমি’

তজ্জার মত আধো-জাগরণে  
চেতনার শত কনক-কিরণে  
শরণ-শাস্ত্র দেশে যাই ॥  
তুমি  
শুভ দীপ্ত মিত্র বহি তরা,  
আমি  
যুগে যুগে চাই, তোমারে বায়না ধরা—  
এলে  
শয়নে স্বপনে অসীমের নীলে,  
হে চিরবন্ধু, মরমে-নিখিলে,—  
স্বপ্নি-হৃদয় হ’তে যেন ভেসে



## বৃক্ষরোপণ সপ্তাহ—

কেন্দ্রীয় গভর্নমেন্টের কৃষিমন্ত্রী শ্রীযুক্ত কানাইলাল মুন্সীর আবেদন মত গত ১লা জুলাই হইতে ৭ই জুলাই ভারতের সর্বত্র বন-মহোৎসব ও বৃক্ষরোপণ সপ্তাহ পালন করা হইয়াছে। নানা কারণ এদেশে গাছের সংখ্যা কমিয়া গিয়াছে—কেহ বৃক্ষরোপণ করে না। তাহার ফলে অনাবৃষ্টি, জমির উর্বরতা ক্ষয় প্রভৃতি নানা বিপদ উপস্থিত হইয়াছে। আমেরিকাতে এই অবস্থা উপস্থিত হওয়ায় ১৮৭২ সাল হইতে বৎসরে একদিন সর্বত্র আনুষ্ঠানিক ভাবে বৃক্ষরোপণ উৎসব করা হইতেছে। বৃক্ষরোপণের প্রয়োজনীয়তার কথা ঐ দিন সকলকে স্মরণ করাইয়া দেওয়া হইয়া থাকে। এই উপলক্ষে বাঙ্গালা দেশের রাষ্ট্রপাল ডাঃ কার্টিজ্জ কলিকাতা দেশবন্ধু পার্কে, মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় বারাকপুর গান্ধীঘাটে, মন্ত্রী হেমচন্দ্র নন্দর ইডেন গার্ডেনে বৃক্ষ রোপণ করিয়াছেন। অন্যান্য সকল মন্ত্রীও নানাস্থানে বৃক্ষরোপণ করিয়া বেড়াইয়াছেন। তাহারা বৃক্ষরোপণ করিয়া বেড়াইবেন—ইহার কোন মূল্য না থাকিতে পারে—কিন্তু প্রত্যেক মানুষেরই যে নিজ নিজ এলাকায় এ সময়ে বৃক্ষরোপণ করা উচিত—এই উৎসবের দ্বারা তাহাই স্মরণ করাইয়া দেওয়া হইয়াছে। সরকারী কৃষি বিভাগ ও বন বিভাগ হইতে এ জন্ত কয়েক লক্ষ গাছ বিতরণ করা হইয়াছে—সে সকল গাছ হইতে জালানি কাঠ ও ব্যবহারযোগ্য কাঠ পাওয়া যাইবে। তাহা ছাড়া অল্পমূল্যে আম ও লিচুর গাছও সরকারী কৃষি বিভাগ হইতে বিতরণ করা হইয়াছে। কলের গাছের সংখ্যা দেশে এই কমিয়া গিয়াছে—সে জন্ত খাড়াভাব উপস্থিত। আমরা বার বার বলিয়াছি, আম, লিচু, কাঁঠাল, নারিকেল, গমরুল, জাম, পেয়ারা, কলা, পেঁপে প্রভৃতির গাছ যদি প্রচুর পরিমাণে করা হয়, তবে ঐ সকল গাছের ফল খাইয়াও মানুষ জীবন ধারণ করিতে পারে। আজ বৃক্ষরোপণ

উৎসব সেই কথাই সকলকে বলিয়া দিতেছে। এ বিষয় এই উৎসব উপলক্ষে বহু বক্তৃতা দান, প্রবন্ধ রচনা, পুস্তিকা প্রকাশ প্রভৃতি হইয়াছে—জনগণের মধ্যে সেগুলি প্রচারিত হওয়ায় লোকে কর্তব্যে অবহিত হইবে বলিয়া মনে হয়। জালানি কাঠের জন্ত গাছের চাষ করিলে কয়লার অভাব কমিয়া যাইবে—এমন কি কয়লার মূল্যও হ্রাস পাইবে। আমরা জালানি হিসাবে গোময় ব্যবহার করি; কিন্তু গোময় একটি সর্বোৎকৃষ্ট শ্রেষ্ঠ সার—জমিতে গোময়-সার প্রদান করিলে তাহার উর্বরতা শক্তি বহু গুণ বর্ধিত হয়। গোময় জালানি রূপে বাহাতে ব্যবহৃত না হয়, সে জন্ত জনগণের পক্ষ হইতে চেষ্টা হওয়া উচিত। গোময়ের পরিবর্তে কাঠ ব্যবহার করাই যুক্তিযুক্ত। অনেক দেশে মানুষের বিষ্ঠাও জমীর সাররূপে ব্যবহৃত হয়—সে সকল স্থানে বিষ্ঠা সংগ্রহ ও তাহা কাজে লাগাইবার উপযুক্ত ব্যবস্থা আছে। আমাদের দেশেও তাহার চেষ্টা হওয়া উচিত। পশ্চিম বঙ্গের কৃষিবিভাগ এই উৎসব মাত্র ৭ দিনে শেষ না করিয়া ১৫ই আগষ্ট পর্যন্ত অর্থাৎ দেড়মাস কাল বাহাতে চলে, সে জন্ত জনগণকে অহরোধ জানাইয়াছেন। ফলবান বৃক্ষ সংগ্রহ করা সকল সময়ে সহজ নহে—সে জন্ত সময় বৃদ্ধির ফলে লোক বৃক্ষ সংগ্রহের সময় ও সুবিধা পাইবে। জালানি কাঠের গাছ বেশী সংখ্যায় পাওয়া যায় বলিয়া সরকার হইতে তাহার কয়েক লক্ষ চারা বিতরণ করা হইয়াছে—কিন্তু ফলবান বৃক্ষ রোপণ করিলে কাঠ ও ফল দুইই পাওয়া যাইবে। সে জন্ত সে বিষয়ই লোকের অধিক উৎসাহ থাকা প্রয়োজন। দেশবাসী জনগণ খাড়া উৎপাদন বিষয়ে বিমুখ হওয়ার ফলেই আজ দেশে খাড়াভাব এত অধিক দেখা দিয়াছে। এই উৎসব যদি দেশবাসীকে অন্ততঃ তাহাদের কর্তব্যে উদ্বুদ্ধ করে তবেই ইহা সার্থক হইয়াছে বুলিতে হইবে। আমরা প্রত্যেক দেশবাসীকে বিষয়টি গভীর ভাবে চিন্তা করিয়া কর্তব্যে প্রবৃত্ত হইতে আহ্বান জানাইতেছি।



সিঙ্গাপুরের গভর্ণরের আফ্রানে এক ভোজসভায় ভারতের প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত জহরলাল নেহরু

### ‘স্বদেশী’ প্রচার—

উড়িষ্যার প্রধান মন্ত্রী শ্রীযুত হরেকৃষ্ণ মহাতাব কেন্দ্রীয় গভর্ণমেন্টের শিল্প ও সরবরাহ মন্ত্রী নিযুক্ত হইয়া দেশীয় শিল্পসমূহের উন্নতি বিধানের জন্ত বহুবিধ চেষ্টায় অবহিত হইয়াছেন। তিনি উৎসাহী কর্মী—তাহার পরিচয় উড়িষ্যায় তিনি দিয়াছিলেন। সম্প্রতি কলিকাতায় আসিয়া বণিক সভাসমূহের এক সম্মিলনে তিনি সকলকে আবার স্বদেশী জব্য ব্যবহার করিতে অগ্ররোধ করিয়া গিয়াছেন। বিদেশী শাসনের আমলে স্বদেশী জব্য ব্যবহারের কথা প্রচার নিষিদ্ধ ছিল। এখন আর সে অবস্থা নাই। অথচ বাজারে আমরা দেখিতে পাই—বিদেশীর সহিত প্রতিযোগিতার ফলে বহু প্রকারে স্বদেশী শিল্প নষ্ট প্রায় হইতেছে। এ অবস্থায় দেশে স্বদেশী জব্য ব্যবহারের জন্ত প্রচারের বিশেষ প্রয়োজন আছে। শুধু লোককে স্বদেশী ব্যবহার করিতে বলিলেই সরবরাহ সচিবের কর্তব্য শেষ হইবে না—উপযুক্ত রক্ষা-শুদ্ধের ব্যবস্থা করিয়া স্বদেশী শিল্পগুলিকে বাঁচাইয়া রাখার ব্যবস্থা করিতে হইবে এবং বিদেশী জব্য আমদানীর সুবিধা বন্ধ করিতে হইবে। দেশে বহু শিল্প-কারখানা নির্মিত হইয়াছিল, কিন্তু বিদেশী লোকের

সহিত প্রতিযোগিতায় দেশী মাল বিক্রয় কম হওয়ায় ঐ সকল কারখানা বন্ধ হইবার উপক্রম হইয়াছে। এনামেল, কাঁচ, পোর্সিলেন বা মাটির বাসন প্রভৃতির কথা সহজেই বলা যাইতে পারে। ঐ সকল জিনিষের বহু কারখানা প্রায় অচল হইয়াছে। শ্রীযুত মহাতাব যদি এ সকল বিষয়ে উপযুক্ত অঙ্গসন্ধানের ব্যবস্থা করেন, তবে শুধু কারখানার মালিকগণ লাভবান হইবেন না, হাজার হাজার বেকার কর্মীরও কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হইবে। তিনি যে স্বাধীন দেশের লোককে আবার ‘স্বদেশী’র কথা স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন, সে জন্ত আমরা তাঁহাকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করিতেছি ও আশা করি, তিনি এ বিষয়ে যথা আবশ্যক ব্যবস্থা করিয়া দেশবাসীর মঙ্গলসাধন করিবেন।

### খাদ্য সমস্যা—

গত ২৪শে জুন এক বেতার বক্তৃতায় পশ্চিমবঙ্গের খাদ্য মন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন খাদ্য-সমস্যার কথা বিশেষভাবে বিবৃত করিয়াছেন। এদেশে যে চাল উৎপন্ন হয়, তাহাতে মাথা পিছু রোজ মাত্র দেড় পোয়া চাল বরাদ্দ করা যায় আর যে গম উৎপন্ন হয়, তাহাতে বছরে মাথা পিছু মাত্র এক সের গম পড়ে; সেজন্য বিদেশ হইতে প্রচুর চাল

৩ গম আমদানী করা প্রয়োজন হয়। ডাল, সরিষা, মাখ ও আলুর চাষ এদেশে বৃদ্ধি না করিলে ঐ সকল জিনিষের মূল্য কোন দিন কমিবে না—বিদেশ হইতে আমদানীর ফলে ঐ সকল জিনিষের দাম অত্যন্ত বেশী দিতে হয়—অথচ এদেশের লোক একটু চেষ্টা করিলে বেশী পরিমাণ আখ, আলু, ডাল ও সরিষা উৎপন্ন করিতে পারে। মাছ, মাংস ও ডিমের অভাব পশ্চিম বাংলায় বিপাক্ষে বেশী—অথচ ঐ সকল জিনিষ উৎপাদনে তাহারও কোন চেষ্টা দেখা যায় না। দুধ, ঘৃত ও মাখনের দখল না বলিলেই হয়। এদেশে গো-পালন প্রায় বন্ধ হইয়াছে। কাজেই দুধ, ঘি বা মাখন পাইবার কোন উপায় নাই। পশ্চিমবঙ্গ সরকার এ বিষয়ে উদ্যোগী হইয়াছেন বটে, কিন্তু ব্যবসা হিসাবে তাঁহাদের গো-পালন বন্ধ কতটা সাফল্যমণ্ডিত হইবে, তাহা এখনও বলা চলে না। খাদ্য মন্ত্রী মহাশয় খাদ্য-উৎপাদন বাড়াইবার জন্য সকল দেশবাসীকে উৎসাহিত করিতেছেন, ইহাই দেশের পক্ষে মঙ্গলের কথা। অন্ত্যাত্ম ব্যবসায়ের মত বিকার্যকেও বাহাতে ধনীরা ব্যবসা হিসাবে গ্রহণ করেন, তজ্জ ধনীদের বাধ্য করার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। রাখানার মালিকগণ যদি কারখানার শ্রমিকদের জন্ত রিতরকারী, মাছ, মাংস, ডিম, দুধ, ঘি প্রভৃতি উৎপন্ন রিতে বাধ্য হন, সেজন্ত তাঁহাদের উপর চাপ দেওয়া যোজন। দরিদ্র কৃষকদিগকে অর্থাভাবে কৃষিকার্যে না অহুবিধা ভোগ করিতে হয়, ধনীরা কৃষিকার্য ব্যবসা সাবে গ্রহণ করিলে আর সে অহুবিধা থাকিবে না। আর প্রত্যক্ষ প্রমাণ আমরা সুন্দরবন অঞ্চলে গো-সাবায় রলোকগত সার ডমিয়েনল হামিলটনের চেষ্টায় দৃশ্য করিয়াছি। প্রত্যেক শিল্প প্রতিষ্ঠানের ঐ ভাবে ষ ও খাদ্য উৎপাদনে আজ অবহিত হওয়ার প্রয়োজন সিয়াছে।

#### দাঙ্গাজিন্জি বিপাক—

গত জুন মাসের প্রথম ভাগে ১১ই হইতে কয়েকদিন পশ্চিম বাংলার অতিবৃষ্টির ফলে যে ক্ষতি হইয়াছে, তাহা নীতীত। দাঙ্গাজিন্জি জেলার যে ক্ষতি সাধিত হইয়াছে, তাহার পরিমাণ কয়েক কোটি টাকা। দাঙ্গাজিন্জি সহরে ১২ জেলার নানান স্থানে শত শত বাসগৃহ ধ্বংসপ্রাপ্ত

হওয়ার কত লোক যে মারা গিয়াছে, এখনও তাহার সংখ্যা জানা যায় নাই। দাঙ্গাজিন্জি বাইবার রেলপথও এমন ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে যে তাহা মেরামতে কোটিরও অধিক টাকা ব্যয়িত হইবে এবং তাহা সম্বন্ধে পথগুলি পূর্বের মত কাজের হইবে না। ঐ অঞ্চলের সকল খাদ্যশস্যও নষ্ট হইয়া গিয়াছে। দাঙ্গাজিন্জি অঞ্চল হইতে প্রত্যহ কয়েক শত মন কাঁচা তরকারী কলিকাতায় আসিত, তাহাও বন্ধ হইয়া গিয়াছে। সেখানে উড়োজাহাজ ছাড়া অন্য কোন উপায়ে খাদ্যপ্রেরণের সুবিধা নাই—কাজেই স্থানীয় অধিবাসীরা দারুণ খাদ্যভাব ভোগ করিতেছে। বাসস্থানের অভাবে লোক দলে দলে পদব্রজে দাঙ্গাজিন্জি ত্যাগ করিয়া চলিয়া আসিতেছে। নূতন যে আসাম-লিঙ্ক রেল তৈয়ারী হইয়াছিল বস্তা ও অতিবৃষ্টির ফলে সে পথেরও বহু অংশ নষ্ট হইয়া গিয়াছে, উহা মেরামত করিতে কয়েক মাস সময় লাগিবে। জলপাইগুড়ী জেলার বহু অংশ, বিশেষ করিয়া জলপাইগুড়ী সহর বস্তার জলে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সেখানেও বহু লোক মারা গিয়াছে ও বহু দরিদ্র ব্যক্তির বাড়ী নষ্ট হইয়া গিয়াছে। সেখানকার ক্ষতির পরিমাণও কয়েক লক্ষ টাকা হইবে। জলপাইগুড়ীতেও সেজন্ত দারুণ খাদ্যভাব উপস্থিত হইয়াছে। ১৪ মাইল পদব্রজে আসিয়া হলদীবাড়ী ষ্টেশনে রেল ধরিয়া লোক দলে দলে পাকিস্তানের মধ্য দিয়া কলিকাতায় চলিয়া আসিতেছে। গৃহ সমস্তা ও খাদ্যসমস্তা জলপাইগুড়ী কর্তৃপক্ষকে বিশেষভাবে বিব্রত করিয়াছে। ঠিক ঐ সময়ে নিয়বজ্ঞেও অতিবৃষ্টির ফলে বর্ধমান, বীরভূম ও মেদিনীপুর জেলার বহু স্থান বিগ্ন হইয়াছে। বর্ধমানে দামোদরের বাধ ভাঙ্গিয়া কয়েকটি স্থান জলমগ্ন হইয়াছে। বীরভূমে ময়ূরাক্ষীতে প্রাবনের ফলে নূতন যে সেচব্যবস্থা নির্মিত হইতেছিল, তাহা ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। মেদিনীপুর জেলার কাঁধি মহকুমাতোও জলপ্রাবনে কয়েক শত গ্রাম ডুবিয়া গিয়াছে। পশ্চিম বাংলা শুধু রাজনৈতিক কারণে বিপন্ন নহে, দৈবছর্কিপাকেও আজ তাহার দুঃখ দুর্দশা চরমে উপস্থিত হইয়াছে। এ সকল বিপদের উপর কাহারও হাত নাই—তথাপি বিপন্ন ব্যক্তিগণের দুর্দশার কথা চিন্তা করিয়া আমরাও আজ নিজেদের বিপন্ন বোধ করিতেছি।



## ডক্টর শাম্মা প্রসাদের সফর—

বাস্তহারীদের প্রকৃত অবস্থা জানিবার জন্ত ও তাঁহাদের  
ছরবছর প্রতীকারের উপায় নির্ধারণের জন্ত ডক্টর



শিলাং ডাঃ শাম্মা প্রসাদ মুখোপাধ্যায়—বামে, আসামের ভূতপূর্ব মন্ত্রী শ্রীমোহিনী চৌধুরী  
কটো—শ্রীপদ্মা সেন



গৌহাটি হারকিট হাউসে ডাঃ শাম্মা প্রসাদ মুখোপাধ্যায় ও আসামের প্রধান মন্ত্রী গোপীনাথ বরদলৈ  
কটো—শ্রীপদ্মা সেন

শ্রীশাম্মা প্রসাদ মুখোপাধ্যায় গত ১ মাসেরও অধিক কাল  
নানাহানে ভ্রমণ করিতেছেন। তিনি কয়েকদিন ধরিয়া নীরা  
জেল ও মুর্শিদাবাদ জেলার পাকিস্তানী সীমান্তগুলি দেখিয়া

বেড়াইয়াছেন। নীরা ও মুর্শিদাবাদ সীমান্তে পাকিস্তান  
হইতে বহু হিন্দু আসিয়া বসবাস করিতেছেন। উত্তর জেলায়  
সীমান্তেই বহু মুসলমান বাস করিত—তাঁহার মধ্যে অনেকে

পাকিস্তানে চলিয়া গিয়াছে ও  
এক অংশ উত্তর রাষ্ট্রেই গৃহ  
রক্ষা করিতেছে। ঐ সকল  
মুসলমান উত্তর রাষ্ট্রের মধ্যে  
যাতায়াত করার কলে ঐ সকল  
অঞ্চলে কালোবাজার জোর  
চলিতেছে—তাঁহারা পাকি-  
স্তানের মাল আনিয়া হিন্দুহানে  
বিক্রয় করে ও হিন্দুহানের মাল  
লইয়া গিয়া পাকিস্তানে বিক্রয়  
করে। হিন্দুহান রাষ্ট্র সে জন্ত  
কোন শুদ্ধ চায় না। তাহা ছাড়া  
ঐ সকল লোকের সাহায্যে  
পাকিস্তানের আত্মারগণ মধ্যে  
মধ্যে হিন্দুহানের গ্রাম আক্রমণ  
ও লুণ্ঠন করিয়া থাকে। ঐ  
সকল সামান্য রক্ষার উপযুক্ত  
ব্যবস্থা নাই। কয়েক মাইল  
অন্তর সীমান্তে একটি করিয়া  
পুলিশ থানা আছে—সেখানেও  
অতি অল্প সংখ্যক লোক বাস  
করে। শাম্মা প্রসাদ বাবু নিজে  
ঐ সকল ভূগম স্থানে বাহিয়া  
প্রকৃত অবস্থা দেখিয়া আসিয়া-  
ছেন—আমরা আশা করি  
ইহার কলে ঐ অঞ্চলের হিন্দু  
অধিবাসীদের হুঃখ হ্রাস  
অবসান হইবে। শাম্মা প্রসাদ  
বাবু আসামেও বহু স্থান ঘোঁরা  
আসিয়াছেন। অত্যন্ত হুঃখ ও

পরিভ্রমণের বিষয় এই যে কতিপয় আসামবাসী হিন্দু আসাম  
হইতে বাঙালী বিতাড়নের জন্ত মুসলমানগণের সহিত একযোগে  
কাণ্ড করিতেছেন। পাকিস্তান হইতে বহু হিন্দু ও মুসলমান

আসামে গমন করিয়াছে—তথ্যের মুসলমানগণকে যেভাবে বসবাসের সুযোগ সুবিধা করিয়া দেওয়া হইয়াছে, হিন্দুদের তাহা করা হয় নাই। আসামে এখনও বাঙ্গালী হিন্দুদের তাড়াইবার জন্য অসমিয়া হিন্দুরা ও আসাম রাজ্যের কর্তৃপক্ষ সর্বপ্রকার চেষ্টা করিতেছেন। অথচ আসামে

চেষ্টা করা হইয়াছে। আসাম কর্তৃপক্ষ যেভাবে চলিতেছেন, তাহাতে আসামে শীঘ্রই মুসলমান অধিবাসীরা সংখ্যাধিক সম্প্রদায় হইবে ও তাহার ফলে আসাম পাকিস্তান বলিয়া গণ্য হইবে। কর্তৃপক্ষের এ কথা সুবিচারে বুঝি বা শিক্ষা নাই দেখিয়া আমরা স্তম্ভিত হইয়াছি। বাহা

ভারত ও পাকিস্তান সীমান্তে  
সাগরপাড়া গ্রামে ডাঃ শামা-  
প্রসাদ—এখানে তিনি বাস্তব-  
হারাদের একটি শিবির উদ্বোধন  
করেন  
ফটো—শ্রীপারমা সেন



বহরমপুর হইতে পলায়ন নাইল  
দূরে এক গ্রামে কতিপয়  
নয়শূরের সহিত কথোপকথন-  
রত ডাঃ শামা প্রসাদ  
মুখোপাধ্যায়  
ফটো—শ্রীপারমা সেন

অধিবাসীর সংখ্যা কম নহে। আসামের একদল উত্তর শামাপ্রসাদের সহিত দুর্জীবহার করিতেও হয় নাই। তিনি যে সকল সভায় বক্তৃতা দিচ্ছেন, সেখানে কোলাহাল ব্যৱস্থা সজ্জা পণ্ডের

হটক, উত্তর শামাপ্রসাদ দেশের এই দারুণ ছদ্মবেশে বিপন্ন বাঙ্গালী হিন্দুদের রক্ষা করার ব্যবস্থার জন্য যে চেষ্টা করিতেছেন, তৎকালে তিনি চিরদিন বাঙ্গালী হিন্দু সমাজের



লালবাগ—মুর্শিদাবাদের অধিবাসীগণ কর্তৃক ডক্টর শ্রীকামাশ্রমদ মুখোপাধ্যায়কে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন—মাইকের সম্মুখে বক্তৃতারত ডাঃ শ্রীকামাশ্রমদ  
কটো—শ্রীপদ্মা সেন

### বিশ্বশান্তির উপায়—

গত ১৯শে জুন লেকসেসমিতি সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের রেডিও হইতে বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানী পণ্ডিত ডক্টর আইন-ষ্টাইন ঘোষণা করিয়াছেন—“মহাত্মা গান্ধীর পথই হইল শান্তির পথ—বাহ্যকে অস্ত্র ও পাপ বলিয়া জানি, তাহার সহিত অসহযোগই হইল সেই পথ। বিভিন্ন জাতির মধ্যে অস্ত্রশস্ত্র বৃদ্ধির প্রতিযোগিতা চালাইলে যুদ্ধ বাড়িবে—যুদ্ধ বন্ধ করার পথ তাহা নহে। সম-সাময়িক রাজনীতিজ্ঞদের মধ্যে মহাত্মা গান্ধীর চিন্তা ও মতই হইল সর্বাপেক্ষা মহৎ ও শ্রেষ্ঠ। আমাদের সকল প্রচেষ্টা তাঁহার ভাবে ভাবিত হইয়া করিতে হইবে।” বর্তমান যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক এই মত প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার কথা শুনিবে কে? মানুষ নিজেই তাহার ধ্বংস চাহে—তাই সকলেই ধ্বংসের পথে ক্ষত অগ্রসর হইতেছে।

### প্রশ্রম সাধারণ নির্বাচন—

আগামী প্রথম নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গ হইতে কেন্দ্রীয় লোক পরিষদের কতজন সদস্য নির্বাচন করা হইবে সম্প্রতি তাহা স্থির হইয়াছে। মোট ৩৪জন সদস্য নির্বাচিত হইবেন—তাহারা এইভাবে স্থান পাইবেন—কলিকাতা ও মহরভলী—৪, মেদিনীপুর—৫, ২৪পরগণা—৫, বর্ধমান—৩, নদীয়া, হুগলী, হাওড়া, বাঁকুড়া, বীরভূম ও মুর্শিদাবাদ

প্রতি জেলায়—২, দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কুচবিহার, পশ্চিম দিনাজপুর ও মালদহ—প্রতি জেলায়—১জন। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের পরিষদের সদস্য সংখ্যা হইবে উহার ৭ গুণ অর্থাৎ ২৩৮ জন। পশ্চিমবঙ্গের জনসংখ্যা ১ কোটি ২১ লক্ষ ও কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল এলাকার জনসংখ্যা ২৬ লক্ষ—এই হিসাব ধরিয়া ঐ প্রকার প্রতিনিধি নির্বাচন স্থির হইয়াছে। এ বিষয়ে দেশে আলোচনা হওয়া প্রয়োজন এবং কোন স্থান বাহাতে প্রতিনিধি প্রেরণে বঞ্চিত না থাকে, তাহার জন্ত চেষ্টা প্রয়োজন। নির্বাচন-কেন্দ্রের উপর প্রতিনিধিদের গুরুত্ব নির্ভর করে।

### রেশম শিল্পের প্রসার—

গত ২৮শে জুন কলিকাতায় কেন্দ্রীয় রেশম বোর্ডের বাবিক সাধারণ সভায় সভাপতিত্ব করিতে আসিয়া শ্রীযুত হরেকৃষ্ণ মহাতাব বলিয়াছেন, “অদূর ভবিষ্যতে ভারতীয় রেশম শিল্প অস্ত্রান্ত্র দেশের রেশম শিল্পের সহিত তীব্র প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হইবে। এই বৈদেশিক প্রতিযোগিতা হইতে আত্মরক্ষা করিবার একমাত্র উপায় আমাদের দেশে কাঁচা রেশম উৎপন্ন করা।” গত বৎসর ৩৬ লক্ষ টাকার কাঁচা রেশম বিদেশ হইতে ভারতে আমদানী করা হইয়াছে। এ বৎসর আরও অধিক টাকার রেশম বিদেশ গইতে আসিতেছে। সেজন্য শ্রীযুত মহাতাব দেশের সর্বত্র ঘুরিয়া কাঁচা রেশম বাহাতে বেশী

উৎপন্ন হয়, সেজন্য চাষীদিগকে উৎসাহ দানের ব্যবস্থা করিতেছেন। ঐ উদ্দেশ্যে তিনি মুর্শিদাবাদের রেশম উৎপাদন কেন্দ্রগুলিও দেখিয়া আসিয়াছেন। আমাদের বিশ্বাস কেন্দ্রীয় সরকারের সাহায্যের ফলে দেশের লোক কাঁচা রেশম অধিক পরিমাণে উৎপাদন করিয়া বিদেশীর প্রতিযোগিতার হাত হইতে রেশম শিল্পকে রক্ষার ব্যবস্থা করিবেন।



আচার্য্যপ্রব্রুজ রায়ের বর্ষ মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে নিমন্তলা অগ্নানবাটে 'ভারতবর্ষ' সম্পাদক কর্তৃক আচার্য্যের সমাধিক্ষেত্রে মাল্যদান  
ফটো—শ্রীপালা সেন

### কলিকাতায় পণ্ডিত নেহরু—

দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া ও ব্রহ্মদেশ ভ্রমণ শেষ করিয়া ভারতের প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জহরলাল নেহরু গত ২৫শে জুন ২ দিনের জন্য কলিকাতায় আসিয়াছিলেন। তিনি বাংলার সকল শ্রেণীর নেতাদের সহিত দেখাসাক্ষাৎ করিয়া বাঙ্গালার প্রকৃত অবস্থা বুঝিবার চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন। পশ্চিম বঙ্গের বর্তমান দুর্দশার কথা তিনি বিখ্যাত কিন্তু বুঝেন না—বাঙালীদের দুঃখের কথা শুনেন না। এখনও কেন যে পূর্ববঙ্গ হইতে প্রত্যহ এক হাজার করিয়া হিন্দু দেশত্যাগ করিয়া পশ্চিমবঙ্গে লিয়া আসিতেছে, পণ্ডিতজী তাহার কারণ অল্পসন্ধান করিয়া তাহার প্রতীকারের কি কোন ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন? লিয়াকৎ-নেহরু চুক্তি কি তাহা পূর্ব-পাকিস্তানে পালিত হইতেছে, তাহা বাঙ্গালা দেশের বাসিন্দাদের সমূহে নিত্য প্রকাশিত হইতেছে। তাহা

সঙ্গেও যদি পণ্ডিতজী চক্ষু বুজিয়া বলেন—পাকিস্তানে চুক্তি ঠিক তাহেই পালিত হইতেছে, তবে এ বিষয়ে আমাদের আর কি বলিবার থাকিতে পারে? শ্রীমুত চাক্ষুঃ বিশ্বাস নূতন মস্তিষ্ক লাভ করিবার পর চাক্ষুঃ মোহে কি সত্য যাহা দেখিতেছেন, তাহা প্রকাশ করার সাহস করেন না? ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায়ের মস্তিষ্ক সত্যও কি এসকল বিষয় পণ্ডিত নেহরুকে স্পষ্ট করিয়া জানাইয়া দেন নাই? বাঙ্গালার এই দুর্গতির দিনে কে বাঙ্গালীকে রক্ষা করিবে কে জানে?

### কংগ্রেস পঞ্চায়েৎ নির্বাচন—

গত দুই মাসে ভারতের সর্বত্র স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠানের প্রাথমিক কেন্দ্র হিসাবে গ্রাম্য-পঞ্চায়েৎ সমূহের সমস্ত নির্বাচন হইয়া গিয়াছে। কংগ্রেস সদস্যগণ শুধু এই নির্বাচনে ভোট দিয়াছেন। এবার কংগ্রেস-সদস্য সংগ্রহের সময়বহুলোক কংগ্রেসের প্রতিবিরক্তিবশতঃ কংগ্রেসের সমস্ত হন নাই। কাজেই এই প্রতিনিধি নির্বাচন ব্যাপারটিতে প্রকৃত প্রতিনিধিগণ নির্বাচিত হওয়ার সুযোগ লাভ করেন নাই। একদল ক্ষমতা-লোভী লোক নিজেদের গভীর মধ্যে কংগ্রেস-সদস্য সংগ্রহ করিয়াছিল এবং তাহারাই পঞ্চায়েৎ দ্বারা নির্বাচনে নিজের দলের লোকদিগকে নির্বাচিত করিয়াছে। পাছে ভোট-যুদ্ধ হইলে দলীয় স্বার্থ ব্যাহত হয়। সে জন্য অধিকাংশ ক্ষেত্রে বিনা যুদ্ধে নির্বাচন শেষ করা হইয়াছে। গ্রাম-পঞ্চায়েৎসমূহের উপর ভবিষ্যতে বহু দায়িত্বপূর্ণ কার্যভার প্রদান করা হইবে—কাজেই তাহাদের নির্বাচন ব্যাপারটি এইভাবে উপেক্ষা ও অবহেলা করার ফলে দেশ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে বলিতে হইবে। অনেক স্থানে বহু অযোগ্য ও স্বার্থান্ধ লোক নির্বাচিত হওয়ার দেশের জনগণের মধ্যে ক্ষোভ উপস্থিত হইয়াছে। নির্বাচন ব্যাপারে যেখানে দলীয় স্বার্থ রক্ষায় বাধা পড়িয়াছে, সেখানে স্বার্থান্ধ ব্যক্তির আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করার বহু অপ্রিয় সত্য কথা প্রকাশ পাইয়াছে। একদল নেতা স্বার্থ কাম্যেবী রাখার জন্য যে সকল দুর্নীতির আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা প্রকাশিত হওয়ার দেশবাসী জনগণ কংগ্রেসের প্রতি প্রজ্ঞা ও বিশ্বাস হারাইতে বাধ্য হইয়াছেন। ইহার ফলে দেশের দুঃখ দুর্দশা যে আরও বাড়িয়া বাইবে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। যে কংগ্রেস এক সময়ে

ভাগ ও সেবার প্রতীক ছিল, আজ যদি তাহা আর্থীষেবীর  
 ও ছর্নীতি পরায়ণের সুবিধা লাভের ক্ষেত্রে পরিণত হয়,  
 তবে তাহা অপেক্ষা পরিতাপের বিষয় আর কি হইতে  
 পারে? কংগ্রেস নির্বাচনের পর উর্দ্ধতন প্রতিষ্ঠানগুলির  
 নির্বাচনের সময় বাহাতে এই ছর্নীতি পুনরায় অহুস্ত না  
 হয়, সেজন্য সকলের অবহিত হওয়া কর্তব্য।

সদস্য। জাতীয়তাবাদী মুসলমান হিসাবেও তিনি সর্বজন  
 পরিচিত। পূর্ববঙ্গে ঐ ভাবে শ্রীযুত বারকানা  
 বারোরীকেও মন্ত্রীপদে নিযুক্ত করা হইয়াছে। কিং  
 তাঁহার নিয়োগের পর পূর্ব পাকিস্তান ব্যবস্থা পরিষদে  
 বিরোধী দলের নেতা শ্রীযুত শ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়  
 বলিয়াছেন যে শ্রীযুত বারোরী কংগ্রেস বাতপলীলভুক্ত কো-



জাকর্ডার ভারতের প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত মহরলাল নেহরু—বামে ইন্ডোনেশিয়ার প্রেসিডেন্ট ডাঃ সোকার্ণ এবং দক্ষিণে প্রধান মন্ত্রী ডাঃ মোহাম্মদ হাঃ

### পশ্চিমবঙ্গে নুতন মন্ত্রী—

ডাঃ আর আমেদ নামক কলিকাতার একজন প্রসিদ্ধ  
 দস্ত-চিকিৎসক গত ৪ঠা জুলাই পশ্চিমবঙ্গে নুতন মন্ত্রী নিযুক্ত  
 হইয়া কার্যভার গ্রহণ করিয়াছেন। দিল্লী চুক্তি অনুসারে  
 পশ্চিমবঙ্গে এই প্রথম একজন মুসলমানকে মন্ত্রীপদে নিযুক্ত  
 করা হইল। ডাঃ আমেদের বয়স ৬০ বৎসর—১৯১৫ সালে  
 আমেরিকা হইতে দস্ত চিকিৎসা শিকারিয়া আসিয়া তিনি  
 ১৯১৯ সাল হইতে কলিকাতার চিকিৎসা ব্যবসা করিতে  
 ছেন। ১৯২০ সালে তিনি যে প্রথম দস্ত-চিকিৎসা হাস-  
 পাতাল প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, সম্প্রতি তাহার পরিচালন  
 ভার গতগণ্ডেষ্ট গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি কয়েক বৎসর  
 কলিকাতা কর্পোরেশনের কাউন্সিলার ও অলভারম্যান  
 ছিলেন এবং পশ্চিম বঙ্গের ট্রেড মেডিকেল ক্যাংগালটীর

সম্প্রদায়েরই প্রতিনিধি নহেন—কাজেই তাঁহার নিয়োগে  
 পূর্ব পাকিস্তানবাসী হিন্দুরা আন্দোলন করিবেন না। পূর্ব  
 পাকিস্তান ও পশ্চিম বঙ্গের শাসন ব্যবস্থার রীতি এ  
 নিয়োগ হইতে সুপ্রকাশ। আমাদের বিশ্বাস ডাঃ আমেদে  
 নিয়োগে পশ্চিম বাঙালার কোন অসন্তোষের কারণ  
 হইবে না।

### শিখারানন্দহ ট্রেডেনে বাস্তবহারা—

গত কয় মাস ধরিয় শিখারানন্দ ট্রেডেনের প্র্যাটিকলে  
 সকল সময়েই কয়েক সহস্র বাস্তবহারকে বাস করিতে  
 বাইতেছে। গত ১লা জুলাই হইতে তাহাদের সংখ্যা না  
 ১০ হাজারেরও অধিক হইয়াছে। তাহাদের অসহনীয়  
 হুঃখ বষ্ট দেখিলে প্রত্যেক মানুষই চকল হইয়া উঠেন  
 স্থানগুলি এমন দুর্গন্ধময় যে ঐ বাস্তবহারের পর্যন্ত তাহাদের

মধ্য দিয়া যাতায়াত করাই কষ্টকর—সময়ে সময়ে বাস্ত-  
হারাদের ভিড়ের জন্ত লোক যাতায়াত করিতে পারে না ও  
সে জন্ত ট্রেন কেল হয়। এই হাজার হাজার লোকের  
মানের জল নাই, পায়খানার ব্যবস্থা নাই—আহার ত দূরের  
কথা। পূর্বে কয়েকটি সেবা প্রতিষ্ঠান খাড়া রক্ষন করিয়া  
আনিয়া তাহাদের খাওয়াইত—মধ্যে সরকারী আদেশে সে  
ব্যবস্থা বন্ধ করা হইয়াছিল—তখন তাহাদের জন্ত চিড়া,  
পাউরুটা প্রভৃতি বন্দা হইত—আবার নাকি রক্ষন-করা-খাড়া  
মানের ব্যবস্থা হইয়াছে। এই সকল লোককে গভর্ণমেন্ট  
কেন কোন ভাল জায়গায় লইয়া না গিয়া ট্রেন প্রাটিকরণে  
কেলিয়া রাখিয়াছেন তাহা আমাদের বুদ্ধির অগম্য।  
কলিকাতার যে কোন স্থানে বড় বড় খালি বাড়ী সংগ্রহ  
করিয়া গভর্ণমেন্ট ইহাদের তথায় লইয়া বাইতে পারেন।  
তাহাতে তাহারা অন্ততঃ ভাল বাসস্থান লাভ করিতে  
পারিবে। সরকারী সকল ব্যবস্থাতেই আমরা ক্ষিপ্ততার  
অভাব দেখিয়া বিস্মিত হই। সাহায্য ও পুনর্বাসতি বিভাগে  
কর্মচারীরও অভাব নাই—অর্থেরও অভাব নাই। তথাপি  
এত অধিকসংখ্যক লোক এরূপ প্রকাশ্য স্থানে এইভাবে  
পত্তর মত বাস করিতে বাধ্য হয় কেন? কেহ কি তাহাদের  
অবস্থাটা দেখাও প্রয়োজন মনে করেন না?

### আসাম রেল লিফটের ক্ষতি—

দার্জিলিংয়ের বস্তার ফলে আসাম যাইবার নতুন রেল  
পথ কিরূপ বিপন্ন হইয়াছে তাহার বিস্তৃত বিবরণ প্রকাশিত  
হইয়াছে। (১) মনিহারীঘাট হইতে ফকিরাগ্রাম  
পর্যন্ত ২০০ মাইল রেলপথের মধ্যে শিলিগুড়ী হইতে বাগরা-  
কোট পর্যন্ত ২০ মাইল পথ মেরামত হয় নাই—বাকী পথ  
মেরামত হইয়াছে। (২) তিত্তা ভ্যালী লাইট রেলে  
শিবক হইতে গেলেখোলা পর্যন্ত ১৬ মাইল রেলপথ নষ্ট  
হইয়া গিয়াছে। ঐ পথ দিয়া শিলিগুড়ী হইতে কালিম্পং,  
গ্যাংটক ও অন্যান্য স্থানে যাওয়া হইত। ঐ পথ এখন  
মেরামত করা যাইবে না (৩) কার্দিয়ং হইতে দার্জিলিং  
পর্যন্ত ২০ মাইল রেলে এত অধিক স্থান নষ্ট হইয়াছে যে  
সব্বর উহার মেরামত হইবে না। (৪) শিলিগুড়ী হইতে  
বাগরা-কোট পর্যন্ত ২০ মাইলের মধ্যে নতুন তিত্তা রেল  
পথের প্রাংশে ৭৬০ ফিট নষ্ট হইয়াছে—উহা মেরামত

করিয়া আগামী ১৫ই আগষ্ট ঐ পথে রেল চলিবে  
বলিয়া মনে হয়।

এই বিবরণ প্রকাশিত হওয়ার পরও ১লা জুলাই হইতে  
দার্জিলিং জেলায় আবার অতিবৃষ্টি হইয়াছে। তাহার  
ফলাফল এখনও জানা যায় নাই। তবে ভবিষ্যতে দীর্ঘকাল  
বে দার্জিলিং যাতায়াত বন্ধ থাকিবে, সে বিষয়ে  
সন্দেহ নাই।

### মুহুর্ত ১০ বৎসর চলিবে—

খ্যাতনামা ব্রিটিশ দার্শনিক বারট্রাও রাসেল গত ৩০শে  
জুন প্রকাশ করিয়াছেন যে রাসিয়া বর্তমান কোরিয়া-  
যুদ্ধে যোগদান করিবে ও এই যুদ্ধ ১০ বৎসর কাল স্থায়ী  
হইবে। ইহাই পৃথিবীর তৃতীয় মহাযুদ্ধ। রাসেলের বয়স  
৭৮ বৎসর, তিনি লর্ড উপাধি পাইয়াছেন, কিন্তু সে উপাধি  
কখনও ব্যবহার করেন না। গণিতজ্ঞ বলিয়া পৃথিবীর  
সর্বত্র তিনি সম্মানিত। তাঁহার এই ভবিষ্যদ্বাণী পৃথিবীর  
সকলকে শঙ্কিত করিয়া তুলিবে, সন্দেহ নাই।

### বাংলায় দুর্ভিক্ষ—

গত ৬ই জুলাই মোলানা আবুল কালাম আজাদ দিল্লীতে  
বসিয়া পশ্চিম বাংলার দুর্ভিক্ষ সম্বন্ধে এক বিবৃতি প্রচার  
করিয়াছেন, তাহাতে তিনি সকল রাজ্যকে প্রাদেশিকতার  
মনোভাব ত্যাগ করিতে অহরোধ করিয়াছেন। আসাম,  
বিহার ও উড়িষ্যায় বাঙ্গালী-বিতাড়ন চেষ্টা ও ব্যবস্থা  
তাঁহাকে ব্যথিত করিয়াছে। ভারত-বিশাগের পর পাঞ্জাব  
ও বাংলাই সর্বাপেক্ষা অধিক ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। এ  
অবস্থার পাশের তিনটি রাজ্য যদি বাংলার অধিবাসীদের  
সহিত ভাল ব্যবহার না করে, তবে শুধু বাংলা নহে, ভারত  
রাষ্ট্রই ভবিষ্যতে বিপন্ন হইবে। মোলানা আজাদের এই  
অহরোধে কেহ কর্ণপাত করিবে কি?

### শ্রীমাখনলাল সেন—

খ্যাতনামা প্রবীণ সাংবাদিক শ্রীমাখনলাল সেন  
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক ১৯৪৯ সালের ‘রামানন্দ  
বক্তৃতা’ দানের জন্ত নির্বাচিত হইয়াছেন। তিনি স্বাধীন  
ভারতে সাংবাদিকতা সম্বন্ধে বক্তৃতা করিবেন। মাখনবাবু  
স্বর্গীয় ৩০ বৎসর সাংবাদিকতার সহিত সংশ্লিষ্ট আছেন।  
তিনি প্রথম জীবনে বিপ্লববাদী ছিলেন ও সমগ্র জীবন  
কংগ্রেসের সেবা করিয়া দেশকে মুক্তির পথে আগাইয়া



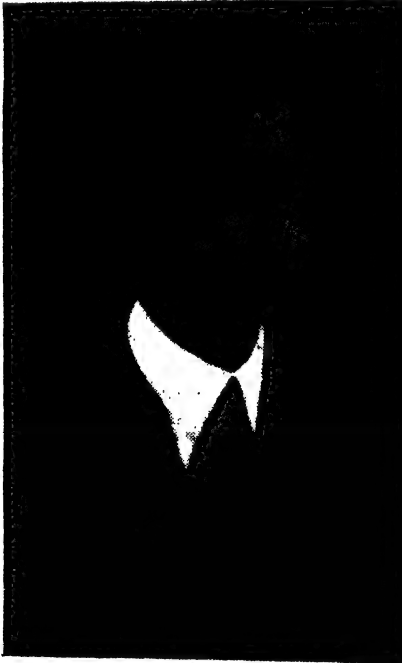
গিয়াছেন। তাঁহার এই সম্মান প্রাপ্তিতে দেশবাসী সকলেই আনন্দিত হইবেন।

### মেদিনীপুর বস্ত্রা—

মেদিনীপুর জেলার তমলুক মহকুমায় কাঁসাই নদীর পাখা খেরাই নদীর জল পর পর বর্ধিত হওয়ায় ময়না ধানার ৮৪ খানি গ্রামের মধ্যে ৫৫ খানি গ্রাম গত ১৪ই জুন হইতে জলমগ্ন হইয়াছে—তাঁহার ফলে প্রায় ৮০ হাজার একর জমী চাষের অগ্রপশ্চাদ্ধ হইয়া গিয়াছে। ঐ অঞ্চলের ৫০ হাজার অধিবাসী বিপন্ন হইয়াছে। নানা স্থানে এইরূপ দৈব-দুর্বিপাক আজ পশ্চিম বাংলাকে ধ্বংস করিতেছে। কি ভাবে ঐ অঞ্চলের অধিবাসীদের রক্ষা করা যাইবে, তাহা চিন্তার অতীত।

### ডাক্তার শ্রী পরিয়াল রায়—

খ্যাতনামা শিক্ষাব্রতী ও কোবিদ ডাক্তার শ্রী পরিয়াল রায় সম্প্রতি পশ্চিম বঙ্গের ডিরেক্টর অব পাবলিক



ডাঃ পরিয়াল রায়

ইনস্ট্রাকসন (শিক্ষা অধিকর্তা) নিযুক্ত হইয়াছেন আনিয়া আমরা আনন্দিত হইলাম। মৈমনসিংহ সহরে জন্মগ্রহণ করিয়া তিনি ১৯১৭ সালে ম্যাট্রিক ও ১৯২৩ সালে অর্থ-

নীতিতে এম.এ পাশ করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ৬ বৎসর অধ্যাপনার পর তিনি ১৯২৯ হইতে ১৯৩২ পর্যন্ত লণ্ডনে অর্থ-নীতি শিক্ষা করেন ও তথায় পি-এস-ডি উপাধি পান। ১৯৩৬ সালে তিনি কলিকাতার গভর্ণমেন্ট কমার্শিয়াল ইনিস্টিটিউটের অধ্যক্ষ ও পরে ঢাকা ইন্টারমিডিয়েট কলেজ, ককনগর কলেজ ও হুগলী কলেজের অধ্যক্ষ হইয়াছিলেন। ১৯৪৪-৪৫ সালে তিনি ভারত সরকারের প্রচার বিভাগে কাজ করিয়াছিলেন। ঢাকায় তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজ সেবা ও পল্লীমঙ্গল সমিতির প্রাণস্বরূপ ছিলেন। ১৯৪৯ সালে তিনি সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের দপ্তরে অর্ধ বিভাগের অর্থ-নীতিক উপদেষ্টা নিযুক্ত হইয়া তথায় গমন করেন ও সেখানে কাজ শেষ হইবার পূর্বেই নূতন পদ পাইয়া সম্প্রতি কলিকাতায় কিরিয়া আসিয়াছেন। আমরা তাঁহার কর্মময় সুদীর্ঘজীবন ও উত্তরোত্তর উন্নতি কামনা করি।

### শ্রী মহত্মানন্দ সন্ন্যাসী—

বিহারের খ্যাতনামা কংগ্রেসনেতা শ্রী মহত্মানন্দ সন্ন্যাসী গত ২৬শে জুন মজঃফরপুরে পরিণত বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি যৌবনে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া তপস্বী করিতে বান নাই—তিনি দেশের জনগণের দুঃখহৃদ্র্দশা দেখিয়া গত প্রায় ৫০ বৎসর কাল সেই দুঃখহৃদ্র্দশা দূর করিবার আন্দোলন পরিচালিত করিয়া ছিলেন। কৃষক সন্ত্রাসীদের মধ্যে স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও সুনীতি প্রচারেই তিনি জীবনের অধিক সময় অতিবাহিত করিয়া গিয়াছেন। প্রয়োজনের সময় তিনি রাজনীতির আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন বটে, কিন্তু সমাজ-সংস্কার ও অর্থনীতিক আন্দোলনেই তাঁহার অধিক আগ্রহ দেখা গিয়াছে। তাঁহার মত নিঃস্বার্থ দেশপ্রেমিকের সংখ্যা খুবই কম।

### পরলোকে ডাঃ পঞ্চানন নিউজামী—

খ্যাতনামা বৈজ্ঞানিক ও শিক্ষাব্রতী কলিকাতা শ্রীম-বাজারস্থ মহারাজা মনীন্দ্রচন্দ্র কলেজের অধ্যক্ষ ডাক্তার পঞ্চানন নিউজামী গত ২২শে জ্যৈষ্ঠ ৬৭ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি রাজসাহী কলেজে ১৪ বৎসর ও কলিকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজে ১৭ বৎসর রসায়ন বিভাগের অধ্যাপক ছিলেন। হুগলী জেলার হোয়া গ্রামে তাঁহার

জন্ম হয়। তিনি সুবক্তা ও লেখক ছিলেন। ১৯৪৩ সালে পাটনায় ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসে তিনি রসায়ন বিভাগের সভাপতি হইয়াছিলেন। কৃষিবিজ্ঞান প্রতিষ্ঠান হাওয়ার বিশেষ আকর্ষণ ছিল। শ্রামবাজারে গৃহ নির্মাণ করিয়া বাস করার সময় তিনি সহরতলীতে বাগান করিয়া প্রত্যহ তাহার দেখা-ওনা করিতেন।

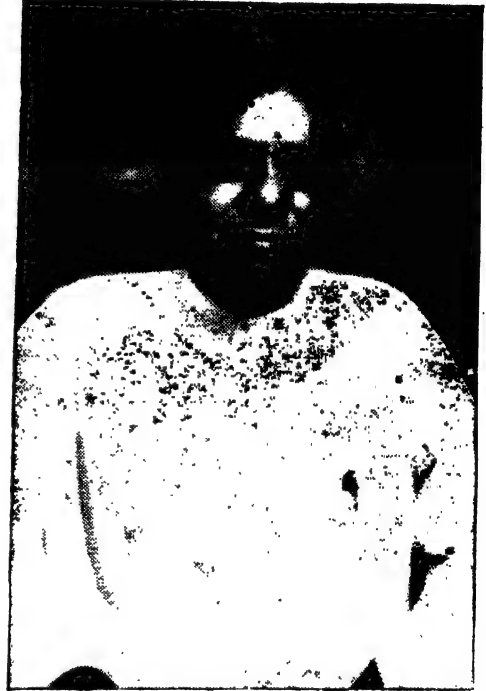
### কোরিয়া-যুদ্ধ ও ভারতবর্ষ—

এতদিন ধরিয়া ভারতবর্ষের প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত জহরলাল নেহরু বলিয়া আসিয়াছেন যে, পৃথিবীর যুদ্ধমান জাতিদের কোন দলে তিনি যোগদান করিবেন না, নিরপেক্ষ থাকিবেন। কিন্তু কোরিয়ার যুদ্ধ গত ২৫শে জুন আরম্ভ হইলেই দেখা গেল যে পণ্ডিতজী আমেরিকার দলে যোগদান করিলেন। ইহার তাৎপৰ্য্য ভারতবাসী বুঝিল না। পৃথিবীতে একচ্ছত্র প্রভু লাভের আশায় আমেরিকা যুদ্ধে নামিয়াছে। কম্যুনিষ্ট ভয়ে ভীত বৃটেন, ফ্রান্স, ডাচ প্রভৃতিও আমেরিকার দলে যোগ দিয়াছে। কিন্তু ভারতবর্ষের সহিত এই যুদ্ধের সম্পর্ক কোথায় এবং কি জন্য ভারত এই যুদ্ধে আমেরিকার পক্ষ সমর্থন করিল তাহা কোন ভারতবাসীই বুঝিতে পারে নাই। যুদ্ধ করিবেন না বলিয়া যে পণ্ডিতজী পাকিস্তানের সহিত আপোষের জন্ত এত লালায়িত, সেই পণ্ডিতজী আজ দক্ষিণ কোরিয়াবাসীর দুঃখে বিগলিত হইয়া আদর্শচ্যুত কেন হইলেন, তিনি তাঁহার বিবৃতিতে তাহা আমাদিগকে বুঝাইতে পারেন নাই। আজ যদি পৃথিবীর তৃতীয় যুদ্ধ আরম্ভ হয় ও সে জন্য ভারতে যুদ্ধের কেন্দ্র স্থাপিত হয়, তবে সে জন্য ভারতবাসী সকলের দুর্দশার দীমা থাকিবে না। পণ্ডিতজী মন্ত্রীর আসনে বসিয়া বোধ হয় সে কথা ভুলিয়া গিয়াছেন।

### গ্রাম-সংগঠন কাটচার্য্যর আদর্শ—

শ্রীপকান চোংদার কলিকাতার খ্যাতনামা ধনী ব্যবসায়ী। তাঁহার বাড়ী হাওড়া জেলার আমতা থানার অন্তর্গত বড়দা গ্রামে। তিনি তাঁহার নিজ গ্রাম ও পার্শ্ববর্তী গ্রামে অনেকগুলি জনহিতকর প্রতিষ্ঠান গঠন করিয়া গ্রামীয় অধিবাসীদের বিশেষভাবে উপকৃত করিয়াছেন। তাঁহার অর্থসাহায্যে ঐ অঞ্চলে কয়েকটি বনিয়াদি বিদ্যালয়, মেডিকেল বিদ্যালয় ও মধ্য ইংরাজি বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে।

ঐ সকল বিদ্যালয়ে বহু ছাত্র-ছাত্রী বিনা বেতনে শিক্ষা লাভ করে। তাহা ছাড়া তিনি ঐ অঞ্চলের কয়েকটি উচ্চ ইংরাজি বিদ্যালয়ের পরিচালক সমিতিরও সমস্ত থাকিয়া সেই সকল বিদ্যালয়ের উন্নতির ব্যবস্থা করিতেছেন। তিনি তাঁহার নিজ গ্রাম বড়দায় এবং বড়দার কয়েক মাইল দূরে অবস্থিত রসপুর গ্রামে দাতব্য চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠা



শ্রীপকান চোংদার

করিয়াছেন। আমতায়া 'রামসদয় কলেজ' তাঁহার সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি। গ্রামের মধ্যে দামোদর নদের তীরে কলেজ স্থাপন করিয়া তিনি ঐ অঞ্চলে উচ্চ শিক্ষা বিস্তারের যে সাহায্য করিয়াছেন, তাহা অসাধারণ। ঐ কলেজের সংলগ্ন ছাত্রাবাসে থাকিয়া বহু ছাত্র অতি অল্প ব্যয়ে শিক্ষা লাভ করিবার সুযোগ পাইয়াছে। পকাননবাবুর এই গ্রাম-সেবার আদর্শ দেশের সর্বত্র অনুকরণ হওয়ার যোগ্য।

### দেবেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য—

মেদিনীপুর ঝাড়গ্রামের দেবেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য মহাশয় সম্প্রতি ৬১ বৎসর বয়সে সহসা পরলোক গমন করিয়াছেন। তিনি ঝাড়গ্রামের রাজার ম্যানেজার ছিলেন। গত ২১ বৎসর কাল তিনি ঐ পদে নিযুক্ত

পাকিস্তান রাজ্যের সর্ববিধ উন্নতি বিধান করেন। রাজার কাকের সহিত তিনি বহু বৎসর মেদিনীপুর জেলা-বোর্ডের চেয়ারম্যান ও ৪ বৎসর মেদিনীপুর মিউনিসিপালি-টির চেয়ারম্যানের কাজ করিয়াছিলেন। তাঁহার চেষ্টায় ও রাজার অর্থে মেদিনীপুরে বিজ্ঞানাগর হল ও বীরসিংহে বিজ্ঞানাগর স্থিতি মন্দির নির্মিত হইয়াছে এবং বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে 'ঝাড়গ্রাম-রাজগ্রন্থমালা তহবিল' প্রতিষ্ঠিত হইয়া বহু গ্রন্থ প্রকাশের ব্যবস্থা হইয়াছে। ঝাড়গ্রাম রাজ্যের অর্থে মেদিনীপুরে ট্রেডিয়াম, মেট্রোনিটি হোম, হোমিওপ্যাথিক কলেজ প্রতিষ্ঠায়ও তাঁহারই কৃতিত্ব ছিল। ঝাড়গ্রামে দাতব্য চিকিৎসালয়, বালকদের উচ্চ বিদ্যালয়, বালিকাদের উচ্চ বিদ্যালয়, বাগী ভবন, কৃষি কলেজ, হিন্দুমিশন, গোড়ীয় 'মঠ', সারদা-বিদ্যাপীঠ প্রভৃতি প্রতিষ্ঠা করিয়া ঝাড়গ্রামকে তিনি নবজীবন দান করিয়াছেন।



পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়—বারাকপুর গাঙ্গীবাটে  
বৃক্ষরোপণ করিতেছেন বক্টো—ঐপ্রভাতকুমার দেব  
(পশ্চিমবঙ্গ পরীক্ষণ সমিতির সৌজন্যে)

### ঐহেমন্তকুমার বসু—

উত্তর কলিকাতার খ্যাতনামা কংগ্রেসকর্মী ও পশ্চিমবঙ্গ ব্যবস্থা পরিষদের কংগ্রেস দলের সম্পাদক ঐহেমন্তকুমার

বসু সম্প্রতি কংগ্রেসের সহিত সকল সম্পর্ক ত্যাগ করিয়াছেন। তিনি এক বিবৃতি প্রকাশ করিয়া জানাইয়াছেন যে কংগ্রেস এখন আর জনগণের প্রতিষ্ঠান নাই—কংগ্রেস তাঁহার আদর্শ—কৃষক-মজদুর-প্রজা-রাজ প্রতিষ্ঠা চাহে না। কাজেই এখন আর কংগ্রেসের সহিত একযোগে কাজ করা যায় না। মানুষ এখন অন্য ও বঙ্গের অভাবে বিপন্ন, তখন দেশের প্রধানমন্ত্রী জাঁকজমক রক্ষা করিতে তৎপর—এই বিসদৃশ ব্যাপার সমর্থন করিতে না পারিয়াই তিনি কংগ্রেস ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছেন। হেমন্তবাবু গত ৩০ বৎসর কাল একান্ত ভাবে নিষ্ঠার সহিত দেশসেবা করিয়াছেন। তাঁহার পদত্যাগে দেশবাসী মাত্রই চিন্তিত হইবেন। আশা করি, ইহার পর কংগ্রেস—নেতাদের চোখ খুলিবে ও তাঁহারা নিজেদের ঠিকপথে লইয়া যাইবার চেষ্টা করিবেন।

### পাকতুর্নীতান আন্দোলন—

ভারতের উত্তর পশ্চিম সীমান্তের নেতা খ্যাতনামা ইপিরা ককিরের নেতৃত্বে ওয়াজিরিতানে পাকতুর্নীতান প্রতিষ্ঠার আন্দোলন ক্রমেই বর্ধিত হইতেছে। ওয়াজিরী, মাহুদ, বিঠানী ও ডাওয়ার প্রভৃতি পার্শ্ব জাতিদের নেতারা এই আন্দোলন পরিচালনা করিতেছেন। সীমান্ত নেতারা এ বিষয়ে আলোচনার জন্ত কাবুলে বাইরা আফগান গভর্ন-মেণ্টের সাহায্য লাভ করিয়াছেন। সীমান্তে পাকতুর্নীতান স্থাপিত হইলে পশ্চিম-পাকিস্তান-রাজ্য রক্ষা করা কঠিন হইবে বলিয়া পশ্চিম পাকিস্তান সরকার এ বিষয়ে বুটেন ও আমেরিকার শরণ লইয়াছিলেন। বুটেন ও আমেরিকা একযোগে আফগানিস্তানকে পাকতুর্নীতান আন্দোলন সমর্থন করিতে নিবেদন করিয়াছিলেন—কিন্তু আফগানিস্তান তাহাতে সন্মত হন নাই। পাঠানদের দাবী সমর্থিত না হওয়া পর্যন্ত আফগানিস্তান পাকতুর্নীতান প্রতিষ্ঠার আন্দোলন সমর্থন করিবেন। সীমান্ত-সমস্তা সে জন্ত বর্তমানে ইজ-মার্কিন দলকে চিন্তিত করিয়া তুলিয়াছে।





শ্রীক্ষেত্রনাথ রায়



স্থানান্তর চট্টোপাধ্যায়

### টেস্ট ক্রিকেট ৪

ওয়েস্ট ইন্ডিজ : ৩২৬ ও ৪২৫\* (৬ উই: ডিক্লেয়ার্ড)

ইংলণ্ড : ১৫১ ও ২৭৪

ইংলণ্ডের বিখ্যাত লর্ডসমাঠে অনুষ্ঠিত ইংলণ্ড বনাম ওয়েস্ট ইন্ডিজের দ্বিতীয় টেস্টম্যাচে ওয়েস্ট ইন্ডিজ ৩২৬ রানে ইংলণ্ডকে পরাজিত করেছে। ইংলণ্ডের মাটিতে ওয়েস্ট ইন্ডিজ এই প্রথম টেস্ট ম্যাচে জয়ী হ'ল। ১৯২৮ সাল থেকে ইংলণ্ড বনাম ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলের মধ্যে টেস্ট ম্যাচ খেলা শুরু হয়েছে। এ টেস্ট সিরিজের আগে পর্যন্ত ৬টি টেস্ট সিরিজে উভয় দল যোগদান করেছে। ইংলণ্ড 'রাবার' পেয়েছে ৩ বার, ওয়েস্ট ইন্ডিজ ১ বার। ২টি টেস্ট সিরিজ অমীমাংসিতভাবে শেষ হয়েছে, উভয় দল সমান সংখ্যক টেস্ট ম্যাচ জয়ী হওয়ার ক্ষেত্রে। এই ৬টি টেস্ট সিরিজে মোট ২১টা টেস্ট ম্যাচ হয়। ইংলণ্ড ৮টা টেস্ট ম্যাচে জয়ী হয়; অপর দিকে ওয়েস্ট ইন্ডিজ পাঁচটায়।

আলোচ্য বৎসরের টেস্ট সিরিজের প্রথম টেস্ট খেলার ইংলণ্ড ২০২ রানে ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলকে হারিয়ে দেয়। লর্ডসের দ্বিতীয় টেস্টে প্রথম ব্যাটিং করে ওয়েস্ট ইন্ডিজ প্রথম দিনের খেলায় ৭ উইকেটে ৩২০ রান তুলে। উল্লেখযোগ্য রান, এ রে ১০৬, উইকস ৬৩, ওয়েল ৫২।

দ্বিতীয় দিনে ৩২৬ রানে ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলের প্রথম ইনিংস শেষ হয়। ইংলণ্ডের জেঙ্কিনস ১১৬ রানে ওয়েস্ট ইন্ডিজের ৫টা উইকেট পান; বেভসার পান ৩টে ৬০ রানে। খেলার দ্বিতীয় দিনে ইংলণ্ডের প্রথম ইনিংস মাত্র ১৫১ রানে শেষ হয়। রানাবীন ৪৩ ওভার বলে ২৭টা মেডেন নিয়ে ৬৬ রানে ৫টা উইকেট পান। ভ্যালেন্টাইন পান ৪টে; ৪৫ ওভার বলে ২৮টা মেডেন নিয়ে ৪৮ রান

দিয়ে। ওয়েস্ট ইন্ডিজ ইংলণ্ডকে 'কলোঅন' না করিয়ে দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা শুরু করে।

খেলার তৃতীয় দিনে খেলার নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ওয়েস্ট ইন্ডিজের ২য় ইনিংসে ৫ উইকেটে ৩৮৬ রান উঠে। উইকস ৬৩ রান করে রান আউট হ'ন। ওয়ালকট এবং গোমেজ যথাক্রমে ১১৪ এবং ৫৭ রান করে নট আউট থাকেন। ওয়েস্ট ইন্ডিজ ৫৬১ রানে অগ্রগামী থাকে। জেঙ্কিনস ৪টা উইকেট পান।

চতুর্থ দিনে ৬ উইকেটে ৪২৫ রান উঠলে ওয়েস্ট ইন্ডিজ ইনিংস ডিক্লেয়ার্ড করে। ওয়ালকট ১৬৮ রান করে নট আউট থাকেন। গোমেজ ৭০ রানে আউট হ'ন। ওয়েস্ট ইন্ডিজের থেকে ৬০০ রান পিছনে থেকে ইংলণ্ড ২য় ইনিংসের খেলা আরম্ভ করে এবং চতুর্থ দিনের নির্ধারিত সময় পর্যন্ত খেলে ইংলণ্ড ৪ উইকেটে ২১৮ রান করে। ওয়াসত্রফ ১১৪ রান করে নট আউট থাকেন। খেলা ছেঁদ করতে ইংলণ্ডের তখন ৩৮২ রান দরকার। হাতে ৬টা উইকেট।

খেলার পঞ্চম দিনে লাঙ্কের সময় ইংলণ্ডের ৯টা উইকেট পড়ে যায়। ২৭৪ রানে ইংলণ্ডের দ্বিতীয় ইনিংস শেষ হ'লে ওয়েস্ট ইন্ডিজ ৩২৬ রানে জয়ী হয়। এখানে লক্ষ্য করার বিষয়, ওয়েস্ট ইন্ডিজ প্রথম ইনিংসে যে রান তুলেছিল সেই রানের ব্যবধানে খেলায় জয়ী হয়েছে। ইংলণ্ডের ছোটো ইনিংসের রান বোঁগ করলে দেখা যায় ওয়েস্ট ইন্ডিজের দ্বিতীয় ইনিংসে ৬ উইকেটের ৪২৫ রানের সমান হয়েছে। এবারও ওয়েস্ট ইন্ডিজের রানাবীন বোলিংয়ে সাকল্যাভ করেন ৬টা উইকেট পেয়ে ৮৬ রান দিয়ে। ছোটো ইনিংস জড়িয়ে রানাবীন ১১৫ ওভার বল

দিয়ে ৭০টা মেডেন পান আর ১৫২ রান দিয়ে ১১ জন খেলোয়াড়কে আউট করেন। অপরদিকে ওয়েস্ট ইন্ডিজের ভ্যালেন্টাইন উইকেট পান ৭টা, ১১৬ ওভার বল দিয়ে ৭৫টা মেডেন নিয়ে এবং বিপক্ষ দলকে ১২৭ রান করতে দিয়ে।

### উইম্বলডন টেনিস ৪

উইম্বলডন লন্ডনে প্রতিযোগিতার ৬৪তম বাৎসরিক অর্ন্তান সস্ত্রি প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতার মধ্যে শেষ হয়ে গেল। পূর্বাণর বৎসরের মত এ বছরের প্রতিযোগিতার আমেরিকান টেনিস খেলোয়াড়রা আমেরিকার প্রাধান্ত অক্ষুণ্ণ রেখেছেন। গত বছর প্রতিযোগিতার ৫টি অর্ন্তানের মধ্যে আমেরিকা বধাক্রমে পুরুষ এবং মেয়েদের সিঙ্গেলস এবং ডবলস—এই চারটিতে জয়ী হয়। একমাত্র মিক্সড ডবলসে জয়ী হয় দক্ষিণ আফ্রিকা। এর মধ্যে মেয়েদের সিঙ্গেলস, পুরুষদের ডবলস এবং মেয়েদের ডবলসের কাইনালে আমেরিকান খেলোয়াড়রা নিজ দেশের খেলোয়াড়দের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। অর্থাৎ কাইনাল খেলাগুলো দাঁড়িয়েছিলো ‘All American Affairs.’

আলোচ্য বৎসরের প্রতিযোগিতার ৫টি অর্ন্তানের মধ্যে আমেরিকা মেয়ে ও পুরুষদের সিঙ্গেলস এবং মেয়েদের ডবলস অর্থাৎ ৩টিতে জয়ী হয়েছে। পুরুষদের ডবলসে অষ্ট্রেলিয়া জয়লাভ করেছে। মিক্সড ডবলস পেয়েছে আমেরিকা এবং দক্ষিণ আফ্রিকা।

### কাইনাল খেলার ফলাফল ৪

পুরুষদের সিঙ্গেলসে বাজ পেট্রি ৬-১, ৮-১০, ৬-২, ৬-৩ সেটে ফ্রাঙ্ক সেজম্যানকে (অষ্ট্রেলিয়া) পরাজিত করেন।

পেট্রি গত বছর ক্রেক চ্যাম্পিয়ানসীপ লাভ করেন। ইতিপূর্বে তিনি কখনও উইম্বলডন বিজয়ী হ’ন নি। ১৯৪৭ সালের সেমি-কাইনালে এবং ১৯৪৮ সালের কোয়ার্টার কাইনালে উঠেছিলেন। এবার কাইনাল খেলার শেষে বাজ পেট্রিকে দৈহিক অবসাদে একেবারে ভেঙ্গে পড়তে দেখা যায়।

মহিলাদের সিঙ্গেলসে মিস লুই ব্রাউ (আমেরিকা)

সিঙ্গেলস বিজয়িনী হয়েছেন। ইতিপূর্বে মিসেস হেলেন উইলডস দু’টি পর্যায়ক্রমে তিনবার (১৯২৭-৩০ সাল)— উইম্বলডন সিঙ্গেলস বিজয়িনী হয়েছিলেন।

মহিলাদের সিঙ্গেলসে পর্যায়ক্রমে ৫ বার (১৯৭৯-১৯২৩) জয়লাভ ক’রে উপস্থাপরি বেশী বার জয়লাভের রেকর্ড করেছেন হুজানী লেগেন।

পুরুষদের ডবলসে জন ব্রম্ উইচ এবং এড্রিয়ান কুইট (অষ্ট্রেলিয়া) ৭-৫, ৩-৬, ৬-৩, ৬-২, ৩-৬ সেটে জিওফ ব্রাউন এবং বিল সিড্‌ওয়েলকে (অষ্ট্রেলিয়া) পরাজিত করেন।

মহিলাদের ডবলসে মিস লুই ব্রাউ এবং মিসেস মার্গারেট ডিউপন্ট (আমেরিকা) ৬-৪, ৫-৭, ৬-১ সেটে মিস শার্লি ক্রাই এবং মিস ডোরিস হার্ডকে (আমেরিকা) পরাজিত করেন।

মিক্সড ডবলসে এরিক ষ্টারগেস (দঃ আফ্রিকা) এবং মিস লুইস ব্রাউ (আমেরিকা) ১১-৯, ১-৬, ৬-৪ সেটে জিওফ ব্রাউন (অষ্ট্রেলিয়া) এবং মিসেস প্যাট্রিকিয়া টডকে (আমেরিকা) পরাজিত করেন।

আমেরিকার মিস লুই ব্রাউ, মহিলাদের সিঙ্গেলস, ডবলস এবং মিক্সড ডবলস এই তিনটি বিষয়ে জয়লাভ ক’রে বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দেন। ১৯৪৮ সালেও মিস ব্রাউ তিনটি বিষয়ে জয়লাভ করেন। গত বছর করেন সিঙ্গেলস এবং ডবলসে, ডিউপন্টের সঙ্গে।

এই প্রতিযোগিতায় ভারতীয় টেনিস খেলোয়াড়গণ যোগদান করেছিলেন। ভারতীয় এক নম্বর টেনিস খেলোয়াড় এবং এশিয়ান লন্ডনে টেনিস সিঙ্গেলস বিজয়ী দিলীপ বসু প্রতিযোগিতায় ‘সিডেড’ খেলোয়াড়দের নামের ক্রম-পর্যায় তালিকায় পুরুষদের সিঙ্গেলসে পঞ্চদশ স্থান লাভ করেছিলেন। এর অর্ধ, এ বছরের পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ২০ জন টেনিস খেলোয়াড়দের মধ্যে তাঁর স্থান পঞ্চদশ। ভারতীয় এবং বিদেশী টেনিস মহল আশা করেছিলেন দিলীপ বসু প্রতিযোগিতায় বিশেষ সাফল্যলাভ করতে পারবেন। আমাদের হৃদ্যাগ্য যে, তিনি প্রতিযোগিতার মাত্র কয়েকদিন আগে ম্যালেরিয়া জ্বরে আক্রান্ত হয়ে

করেই। এ অবস্থায় তিনি যে বিশেষ কিছু করতে সক্ষম হবেন না তা আগে থেকে সকলেই অনুমান করতে পেরেছিলেন। প্রথম রাউণ্ডে দিলীপ বহু ৬-১, ১১-২, ৬-১ সেটে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাপটেন ফ্রাঙ্ক মসট্রিলিকে (জামায়িকা) পরাজিত করেন। দ্বিতীয় রাউণ্ডের খেলায় সাওলকে (নেদারল্যান্ড) প্রথম সেটে ৬-৪ গেমের পরাজিত করেন কিন্তু দ্বিতীয় সেটের খেলায় যখন তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী ৫-৪ গেমের অগ্রগামী হ'ন তখন শারীরিক দুর্বলতার জন্তে খেলা থেকে অবসর নেন। অস্তিত্ত ভারতীয় খেলোয়াড়দের মধ্যে নরেন্দ্রনাথ তৃতীয় রাউণ্ডে ৬-৪, ৮-৬, ৬-৩ সেটে ফ্রেড কোভালেভিক (আমেরিকা) কাছে পরাজিত হ'ন। জোর প্রতিযোগিতা ক'রে নরেশকুমার তৃতীয় রাউণ্ডে পরাজিত হ'ন আমেরিকান 'সিডেড' খেলোয়াড় গার্ডনার মূল্যের কাছে ৬-২, ৬-৪ এবং ১২-১০ সেটে। ডবলসে দিলীপ বহু শেষ পর্যন্ত দৈহিক দুর্বলতার জন্তে যোগদান করেন নি। একমাত্র সৌজন্তের খাতিরে তাঁর সহযোগিনী মহিলা খেলোয়াড়ের নিরাশার কথা স্মরণ ক'রে তিনি মিক্সড ডবলসে যোগদান ক'রে পরাজয় বরণ করেন।

পুরুষদের ডবলসের দ্বিতীয় রাউণ্ডে নরেশকুমার এবং নরেন্দ্রনাথ অভিজ্ঞ এবং দক্ষ খেলোয়াড় ব্রাউন এবং বিল সিড ওয়ালের (অস্ট্রেলিয়ান) কাছে পরাজিত হ'ন। মিক্সড ডবলসের চতুর্থ রাউণ্ড পর্যন্ত খেলবার যোগ্যতা লাভ করেছিলেন ভারতীয় খেলোয়াড় সুনন্ত শ্রী এবং মিসেস হারগিন। শেষ পর্যন্ত পরাজয় বরণ করলেও প্রতিদ্বন্দ্বী খেলোয়াড়দের সঙ্গে তাঁরা যে মনোবল নিয়ে খেলেছিলেন তা গবই প্রশংসনীয়।

### ৩. ডবলস লীগ ৪

ক্যালকাটা ফুটবল লীগের বিভিন্ন বিভাগের খেলা যথারীতি গড়ে। প্রথম বিভাগের খেলায় এক সময় লীগ চ্যাম্পিয়ান-শপ নিয়ে জোর প্রতিযোগিতা চলেছিল ইস্টবেঙ্গল, মোহন-বাগান এবং রাজহান এই তিন দলের মধ্যে। গত বছরের লীগ চ্যাম্পিয়ান ইস্টবেঙ্গল ক্লাব এখনও লীগের খেলায় প্রবাল্যে অবস্থায় প্রথম স্থান অধিকার ক'রে আছে। ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের থেকে ১ পয়েন্ট কম পেয়ে দ্বিতীয় স্থানে ছে মোহনবাগান। রাজহান আছে তৃতীয় স্থানে, মোহনবাগানের থেকে ৪ পয়েন্টের ব্যবধানে। এরিসাল্লের ৫ খেলা ড্র ক'রে এবং বি এন রেলদলের কাছে ২-০ গোলে হেরে গিয়ে রাজহান লীগ চ্যাম্পিয়ানলীগের পাত্রা কে অনেক নীচে নেমে গেছে। এখন মোহনবাগান ইস্টবেঙ্গল দলের মধ্যে লীগ চ্যাম্পিয়ানলীগের শেষ পদে পড়ি হবে। প্রথম বিভাগের লীগের কিরতি খেলায় ইস্টবেঙ্গল একটা মূল্যবান পয়েন্ট হারিয়েছে ক্যালকাটা

ক্যালকাটার বিপক্ষে ধারা করোয়ার্ডমলে খেলেছিলেন তাঁদের নিয়েই বি এন আর দলের বিপক্ষে কিরতি খেলায় ইস্টবেঙ্গল দল ৪-০ গোলে জিতেছিলো। লেকট ব্যাক, সেটোর হাক এবং লেকট হাক ব্যাকে যে সব খেলোয়াড় নেমেছিলেন ক্যালকাটার মত দুর্বল দলের বিপক্ষে খেলবার যোগ্যতা তাঁদের যথেষ্ট ছিল। এখানে উল্লেখ-যোগ্য, সে সময় বি এন আর দলের থেকে ক্যালকাটা অনেক পয়েন্টের নীচে ছিল। ঐ দিন খেলার শেষে ইস্টবেঙ্গল দলের একমল সমর্থক ঐ দিনের খেলোয়াড় নির্বাচন সম্পর্কে ক্লাবের কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে জোর বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। স্পোর্টিং ইউনিয়নের সঙ্গে খেলার মোহনবাগান দলেরও কবেকজন নামকরা খেলোয়াড় যোগ দেয়নি। খেলা ড্র হয়েছিলো। ঐ দু' দিনের খেলোয়াড় নির্বাচন ব্যাপারে আমরা দুই দলের ক্লাব কর্তৃপক্ষের কোন অবিবেচক জ্ঞানের পরিচয় পাই না। খেলোয়াড়রা মাহুয; যন্ত্রপাতি এবং কলকজার যেখানে নিয়মিত পূর্ব বিশ্রাম দরকার সেখানে মাহুয খেলোয়াড়দেরও যে বিশ্রাম প্রয়োজন একথা বলা বাহুল্য মাত্র। এর উপর খেলোয়াড়দের সুখ-অসুখ, খেলায় শারীরিক আঘাতের সম্ভাবনা আছে এবং একটানা খেলার দরুন দৈহিক অবসাদ আসা খুবই স্বাভাবিক। খেলোয়াড় এবং দলের স্বার্থের খাতিরে সেখানে তাদের বিশ্রাম প্রয়োজন এবং তার একমাত্র সুযোগ পাওয়া যায় দুর্বল দলের সঙ্গে খেলার দিনে। দুর্বল দলের সঙ্গে খেলার দলের নিয়মিত খেলোয়াড়দের ৩৪ জনকে বিশ্রাম দিয়ে তাদের স্থানে নতুন খেলোয়াড়দের খেলবার সুযোগ দেওয়ার একটা গঠনমূলক সাধু উদ্দেশ্য আছে। শক্তিশালী দলের বিপক্ষে এবং নামকরা খেলোয়াড়দের সঙ্গে খেলতে খেলতে নতুন খেলোয়াড়রা খেলায় অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে; তাদের খেলায় জড়তা এবং নায়বিক দুর্বলতা দূর হয়ে সাহস বৃদ্ধি পায়। বাংলা দেশের ফুটবল খেলার স্ট্যান্ডার্ড নানা কারণে নেমে গেছে। কিন্তু অধ্যাতনামা বাদামী খেলোয়াড় ধারা গঠিত কোন কোন ফুটবল দল যে অল্প ইতিবা অথবা অলিম্পিক প্রত্যাগত ফুটবল খেলোয়াড়ধারা গঠিত ফুটবলটমকে যথেষ্ট বেগ দিয়ে খেলা ড্র বা জয়লাভ করতে পারে তার প্রমাণ এবারের লীগের খেলাতেও পাওয়া গেছে। লীগের কিরতি খেলায় স্পোর্টিং ইউনিয়ন ক্লাব ১-০ গোলে মহম্মদান স্পোর্টিংকে হারিয়েছে। এ অপ্রত্যাশিতভাবে গোল দিয়ে জয়লাভ নয়, স্পোর্টিং ইউনিয়নকে রীতিমত জোর দিয়ে খেলে দু' পয়েন্ট নিতে হয়েছে। স্পোর্টিং ইউনিয়ন ২-০ গোলে ই আই রেলদলকেও পরাজিত করে। এরপর এরিসাল্ল ক্লাব লীগের তৃতীয় স্থান অধিকারী রাজহানকে লীগের কিরতি



আর ২-০ গোলে রাজহানকে হারিয়েছে। রাজহানের খেলোয়াড়দের নামের ভারত জোড়া খ্যাতির সঙ্গে এরিয়ালের খেলোয়াড়দের কি তুলনা চলে! রাজহানের এগারটা খেলোয়াড়ের মধ্যে কয়েকজন অলিম্পিক প্রত্যাগত ভারতীয় ফুটবল দলের নির্বাচিত খেলোয়াড় এবং বাকি সকলই ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থান থেকে আগত নামকরা খেলোয়াড়। কিন্তু অনেক সময় দুর্বল দলের টিমওয়ার্কের কাছে নামকরা খেলোয়াড়রাও যে শেষ পর্যন্ত দলের জয়লাভে সাহায্য করতে পারে না এরিয়াল যেমন গভাবার লীগচ্যাম্পিয়ান ইস্টবেঙ্গলের খেলায় প্রমাণ করেছে এবার তেমনি করেছে রাজহানকে হারিয়ে। পূর্বে কালীঘাট ক্লাবকে ভারতবর্ষের বিভিন্নস্থান এমন কি বার্মা যুদ্ধ থেকে খেলোয়াড় বোগাড় করতে দেখা যেত। এ কয়েক বছর কালীঘাট ক্লাব স্থায়ী বাঙ্গালী খেলোয়াড় নিয়ে ফুটবল খেলেছে। একেবারে বাঙ্গালী খেলোয়াড় নিয়ে

টিম ক'রে জর্জটেসিগ্রাক, স্পোর্টিং ইউনিয়ন, এরিয়াল এবং কালীঘাট শক্তিশালী দলের বিপক্ষে বেশ খেলেছে। লীগ চ্যাম্পিয়ানসীপ না পেলেও সেই সব দলের প্রতি আমাদের অকুণ্ঠ সমর্থন থাকবে, বারা লীগ-শীল্ড পাওয়ার উগ্র নেশার বাইর থেকে খেলোয়াড় আমদানী ক'রে জাতীয় স্তর বহি না দিবে। বাংলা দেশের তরুণ ফুটবল খেলোয়াড়রা আজ রাজনৈতিক এবং সামাজিক অব্যবহার চাপে পড়ে ক্ষয়িষ্ণু এবং বিপর্যত হলেও জাতীয় সম্মানের পরীক্ষাক্ষেত্রে তাদের উপর যে আমরা নির্ভর করতে পারি তার অনেক শুভ লক্ষণই এখনও নির্ভীক অবস্থায় স্থায়ী রয়েছে। আমরা যদি তাদের উপেক্ষা ক'রে চলি, সমগ্র জাতীয় মেরুদণ্ড ভেঙ্গে পড়তে আর বেশী দেরী থাকবে না। ঈশ্বরের কাছে আমাদের প্রার্থনা, এবং জনসাধারণের কাছে আবেদন যে, আমাদের মধ্যে শুভমুখি এবং জাতীয়তাবোধ জাগ্রত হউক।

১৪. ৭. ৫০

## নব-প্রকাশিত পুস্তকাবলী

শ্রীপৃথীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এগীত উপজ্ঞাস "পতঙ্গ"—২৪.

শিশিরকুমার আচার্য্যচৌধুরী-সম্পাদিত "বাংলা বর্ষলিপি" ( ১৩৫৭ )—২১.

ঈহবাংলাভাষ্য এগীত শিকার-কাহিনী "আসানের জঙ্গলে"—৪.

ঈশনধর দত্ত এগীত রহস্তোপজ্ঞাস "অশোক-বীপে স্বপন"—২১.

"মহাত্মজা স্বপন"—২১, "স্বভা-রহস্তে মোহন"—২১.

ঈহবীকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য-অনুদিত "ভারতের জাতি পরিচয়"—৮৭.

অমরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী এগীত নাট্য-কাব্য "রবীন্দ্র-প্রতিভা"—১১.

ঈভোলানাথ সাহা এগীত কাব্য-গ্রন্থ "বেঙ্গলা কাব্য"—২১.

বিশ্বনাথ চট্টোপাধ্যায় এগীত উপজ্ঞাস "কথা কও"—৩১.

ঈশকরকুমার ভট্টাচার্য্য এগীত "যোগিরামাধিরাজ শ্রীশ্রীবিভুজানন্দ পরমহংস"—৫.

ঈশবিন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য এগীত উপজ্ঞাস "আজিও যায় তারা"—৩.

ঈশবিনীকুমার গাল এগীত উপজ্ঞাস "শ্রাবণ ও কবর"—২১.

"কটিকার গেল স্বরে"—২৪.

বিসল কর এগীত রহস্তোপজ্ঞাস "গাসবাগী"—২১.

ঈশদীনমোহন চক্রবর্তী এগীত উপজ্ঞাস "কলির অর্জুন"—২১.

## হিজ্জ্ মাষ্টার্স ভয়েস রেকর্ড—জুন-জুলাই ১৯৫০

বৈষ্ণব কবি গোবিন্দ দাসের পদাবলীর হু'খানি মধুর কীত'ন গীতি দিয়ে N 31211 রেকর্ডে অঙ্গগায়ক কৃষ্ণচন্দ্র তাঁর 'খতিভা' পালা কীত'নটি এবার সমাপ্ত ক'রেছেন। পাঁচখানি রেকর্ডে পালাটি সম্পূর্ণ হ'লেও এতোক পানখানি স্বরংসম্পূর্ণ—শিল্পী ভাবমধুর-কণ্ঠে পানগুলি প্রাপক হ'য়ে উঠেছে। "তুমি কত দূরে কোন গহন আঁধারে" ও "কেন আঁধি হু'টি ভাকে বারে বারে" N 31212 রেকর্ডে হু'খানি আধুনিক গান পরিবেশন ক'রেছেন বাংলার জনপ্রিয় গায়ক স্বধীরলাল চক্রবর্তী। শিল্পী তরুণ বসুগোপাধ্যায় N 31213 রেকর্ডে যে হু'খানি আধুনিক গান পরিবেশন ক'রেছেন—তা ভাব, ভাবা ও প্রকাশ ভগ্নীবার নতুনস্বের দাবী করে। শ্রীমতী রমা দেবীর কণ্ঠে হু'খানি আধুনিক গান N 31214 রেকর্ডে বেশ উপভোগ্য হয়েছে। হু'খানি পরী গীতি N 31216 রেকর্ডে গেয়েছেন শিল্পী চিত্ত রায়। দেড় কোটি বর ভাঙা বাঙালির মর্মভঙ্গ্য বর্নকথা হু' হ'য়ে উঠেছে গান হু'টিতে। দিলীপ রায়ের হু'খানি ভক্তিমূলক গান N 31197 রেকর্ডে ও বিরজা সেনের হু'খানি ভাওরাইয়া গান N 31208 রেকর্ডে এবার প্রচারিত হ'য়েছে। ভারতখ্যাত ক্লারিওনেটবাদক রাজেন সরকার N 31219 রেকর্ডে হু'খানি জনপ্রিয় হিন্দী গানের স্বরকে হু' ক'রে তুলেছেন।

N 31229 শিল্পী বেহু দত্ত "হুগে হুগে বারা চির বকি" একটি গানে তাবের অভিযান ও বেদনাকে হু'টরে তুলেছেন। অভ্যাসগতও বাকিত হু'বরের প্রতি সর্ববেদনার শিল্পীর কণ্ঠ ভ'রে উঠেছে। N 31230 কুমারী বাণী ঘোষালের একক গানটি, অভ্যাসে এসিদ্ধ শিল্পী তরুণ কুমারগোপাধ্যায়ের সহকণ্ঠে "বোর গানে জাপে স্বর" হু'বর উপভোগ্য। N 31232 শিল্পী কমল মিত্র—হিন্দী বাণীচিহ্ন "বরসাত" এর হু'খানি জনপ্রিয়চিত ও জনপ্রিয় গানকে বাণীর স্বরে রূপ দিয়েছেন—গান হু'খানির মত তার স্বরের প্রকাশ অবশ্য হয়েছে। N 31233 নবীলা গায়িকার কণ্ঠে হু'খানি নবোদয় আধুনিক গান হু' হ'য়ে উঠেছে—রচনা সভারে গান হু'টি লম্বা। N 31234 প্রভাত মিত্র—গায়ক অপেক্ষাকৃত নবীন। হু'প্রসিদ্ধ গায়ক ও সঙ্গীত পরিচালক জব্বার মিসের স্বর সংযোগে লম্বা হু'খানি গান শিল্পী এই রেকর্ডে পরিবেশন করেছেন—গান হু'টি রচনা ক'রেছেন অর্ণব রায়।

সম্পাদক—শ্রীকবীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম-এ



শিল্পী—শ্রী পূর্ণচন্দ্র চন্দ্র

৫২৫৫৫ ও ৫২৫৫৫ অন্তর্ভুক্ত

ভারতীয় চিত্র: ওয়াক



### লিলাদে সামঞ্জস্য

স্বামী :—বললুম তো, চুড়ি গড়তে দিয়েছি। তবু বিশ্বাস কর না। তুমি কি ভাব আমি একজন সাধারণ প্রবন্ধক ?

স্ত্রী ( তৃতীয় পক্ষ ) :—সাধারণ !—এমন কথা আমার ভুলেও মনে আসে না।

শিল্পী—শ্রীদেবীপ্রসাদ রাহচৌধুরী



ভাঙ্গ-১৩৫৭

প্রথম খণ্ড

অষ্টত্রিংশ বর্ষ

তৃতীয় সংখ্যা

## সাহিত্যে রূপক ও প্রতীক

অধ্যাপক শ্রীঅমূল্যধন মুখোপাধ্যায় এম-এ, পি-আর-এস

হিত্য সমালোচনা প্রসঙ্গে আজকাল রূপক ও প্রতীক এই ট কথা প্রায়ই ব্যবহার করা হয়ে থাকে। কাব্যে, টকে এমন কি গল্প-উপন্যাসেও রূপক ও প্রতীকের যোগ দেখতে পাওয়া যায়। এমন কি রূপক ও প্রতীকের তি প্রবণতা সাহিত্যের অত্যন্ত প্রধান প্রবৃত্তি বলে মনে রা যেতে পারে। এ সম্বন্ধে আমাদের ধারণাটা একটু রক্ষার করে নেওয়ার জন্তেই এই প্রবন্ধের অবতারণা।

রূপকের আলোচনাই প্রথমে ধরা যাচ্ছে। এ ক্ষেত্রে ল রাখা দরকার যে সংস্কৃতে নাট্য-সাহিত্যের আলোচনা ত্রে যাকে রূপক বলা হয়েছে, আজকাল রূপক বলতে মরা তা' মনে করি না। সে ক্ষেত্রে রূপক মানে উচ্চতর গীর নাটক, তার আবার গোটা দশেক উপশ্রেণী আছে। লিদাসের 'অভিজ্ঞান শকুন্তলম্'ও রূপক, মৃচ্ছকটিকও ক। বোধকরি রঙ্গমঞ্চে আখ্যায়িকাকে নট-নটীর

সাহায্যে রূপায়িত করা হ'ত বলেই রাজা-রাজদার পৃষ্ঠ-পোষিত, নাট্যশালায় অভিনীত এবং ভরতাদি আচার্য-গণের দ্বারা উপদ্রষ্ট এই সমস্ত উচ্চ শ্রেণীর নাটককে রূপক বলা হ'ত।

সে অর্থে আজকাল রূপক কথাটা ব্যবহার করা হয়না। অলঙ্কার শাস্ত্রে যে রূপক অলঙ্কারের কথা বলা হয়েছে, যাকে ইংরেজিতে বলা হয় metaphor, তার সঙ্গেই সাহিত্যের এই প্রয়োগটির বিশেষ সম্পর্ক আছে। রূপকের আসল তাৎপর্য হ'ল বিজাতীয় দুটি বস্তুর মধ্যে একটা সাদৃশ্য লক্ষ্য করে তাদের মধ্যে অভেদের আরোপ। যখন কবি বলেন "ভূমি যে সুরের আশুন লাগিয়ে দিলে মোর প্রাণে" তখন তিনি সুর ও আশুন এই দুই বিভিন্ন বস্তুর মধ্যে একটা সাধারণ ধর্ম লক্ষ্য করেন; আশুনের ছোঁয়া লেগে যেমন স্থল পদার্থ উজ্জল হয়ে ওঠে এবং তার জড় সত্তা নষ্ট হ'য়ে

স্বরের প্রভাবেও কবির অন্তরের জড়তা তেমন করেই নষ্ট হ'য়ে যায় এবং একটা মহনীয় ভাব ও অল্পভূতি অন্তরাঙ্গাকে অধিকার করে। সাময়িক ভাবে এই কবির কাছে একটা ঘনিষ্ঠ ঐক্যের লক্ষণ বলেই গীত হয়েছে, তিনি সুর আর আঙুনকে ভিন্ন করে দেখতে চেনে না। তিনি এই দুটি বস্তুর মধ্যে অভেদের আরোপ চেনে, সুর আর আঙুন সমধর্মী হ'য়ে গেছে, আঙুনের সুরও “লাগিয়ে” দেওয়া যায়, আঙুনের মত সুরও এখানে ছড়িয়ে যায়।

বাক্যালঙ্কার হিসেবে রূপকের ব্যবহার বহু প্রচলিত। মূল সাহিত্যে আমরা রূপকের ব্যবহার দেখি তা' নয়। আমাদের সাধারণ কথাবার্তায় পর্যাপ্ত রূপকের অভ্যাস প্রয়োগ দেখতে পাওয়া যায়, আমরা না জেনেই রূপক লঙ্কার সর্বদা ব্যবহার করি। বড়লোকের টাকার গরম খেলে যখন আমাদের রাগের জ্বালা ধরে, কিংবা বাক্যাংশে যখন আমরা প্রতিপক্ষকে জর্জরিত করি, তখন আমরা অলঙ্কার শাস্ত্র বা ব্যাকরণ না পড়েই রূপকের প্রয়োগ করি। মানুষের ভাষা—এমন কি অশিক্ষিত বর্ষেরের গাথাও যে রূপক-বহুল, তা' ভাষাবিৎ মাজেই স্বীকার করেন।

তবে বাক্যালঙ্কার রূপকের কথা এখানে আমাদের মুখ্য আলোচ্য নয়। রূপক বলে বিশিষ্ট এক প্রকারের রচনা আছে, তার লক্ষণাদিই এখানে আমাদের আলোচ্য বিষয়। বস্তুতঃ রূপক সাহিত্যের অন্ততম একটি পদ্ধতি। এই পদ্ধতিতে রচনা অনেক দেশেই হয়েছে, সকালেও হয়েছে এবং একালেও হয়েছে। সাহিত্যের এই ধারাকে একটা সনাতন ধারা বলা যেতে পারে।

এই পদ্ধতিতে রূপক বলা হয়, কারণ বাক্যালঙ্কার রূপকের যা তাৎপর্য এরও তাই। অর্থাৎ এর আসল কথা হ'চ্ছে এক বস্তুতে আর এক বস্তুর অভেদ আরোপ। এবং এই আরোপের মূলে আছে সেই একই মনোভাব অর্থাৎ উভয় বস্তুর মধ্যে সাদৃশ্যের উপলব্ধি। রূপক রচনার এই উপলব্ধি কেবলমাত্র একটা বাক্য বা বাক্যাংশে সীমাবদ্ধ নয়। এই উপলব্ধিতেই সমগ্র রচনাটি বিবৃত। বাক্যালঙ্কার রূপকের পরিধি যদি ক্রমশঃ বিস্তৃত হয়, তা হলেই

যে এই জাতীয় রচনায় অল্পভূতি ও করুণার ব্যাপকতা বিশেষভাবে আবশ্যক, শুধু ক্ষণিক একটা সাদৃশ্যের বোধ যথেষ্ট নয়। বস্তুতঃ এখানে শুধু একটি বস্তুতে অপর একটি বস্তুর অভেদ সাময়িক ভাবে আরোপ করা হয় না। এখানে একটি বস্তু-জগতে অপর একটি বস্তু-জগতের অভেদ আরোপ করা হয়। এই প্রকারের রচনায় যেমন একটা সৃষ্টির ক্ষমতা আবশ্যক, তেমনই একটা গভীর অন্তর্দৃষ্টিরও প্রয়োজন। একটা ভাবের জগৎকে একটা নূতন বস্তুজগৎ সৃষ্টি করে তার সঙ্গে মিলিয়ে দিতে হবে, এই দুটো জগৎ এমন ভাবে খাপ খেয়ে যাবে যে তাদের মধ্যে আর ভেদ থাকবে না, বস্তুজগতের দিকে দৃষ্টিপাত করলেই ভাবজগৎ তার ভেতর থেকে ফুটে উঠবে। 'যেমন মাপসই আবরণের ভেতর থেকে অবয়বের সংস্থান আপনিই ফুটে ওঠে। ইংরেজিতে এরকম রচনাকে বলা হয় allegory. ভারতীয় অলঙ্কারশাস্ত্রে সাদৃশ্যরূপক বলে একটা অলঙ্কারের নাম পাওয়া যায়; সাদৃশ্যরূপক হচ্ছে রূপক অলঙ্কারের সম্ভারিত সংস্করণ। Allegory কথাটার প্রতিশব্দ হিসেবে সাদৃশ্যরূপক কথাটা কবি হেমচন্দ্র ‘আশাফানন’ কাব্যের ভূমিকার ব্যবহার করে গেছেন, সে কথাটা আমরাও ব্যবহার কর্তে পারি। তবে সংক্ষিপ্ত ও প্রচলিত বলে allegory বা allegorical অর্থে রূপক কথাটাই আমরা প্রয়োগ করব, তাতে বাক্যালঙ্কার রূপকের সঙ্গে গোলমাল হ'য়ে কোন মারাত্মক ভুল হ'বার আশঙ্কা নেই।

রূপকের সৃষ্টি কি ক'রে হ'ল? কেন লোকে রূপকের প্রয়োগ করে? কেবল কি চটক দেবার জন্তেই রূপকের ব্যবহার করা হয়? এসব প্রশ্নের উত্তর দিতে হ'লে বাগর্থ বিজ্ঞানের ইতিহাসের আশ্রয় নিতে হয়। সংক্ষেপে এটুকু বলা যেতে পারে যে, শব্দমাজেরই অর্থ একটা সীমাবদ্ধ অভিজ্ঞতার জগতের অংশ। এই সীমাবদ্ধ অভিজ্ঞতার জগৎ হ'ল আমাদের সকলের সাধারণ জগৎ। দশজন ‘গরু’ বলতে যে সব জীবকে নির্দেশ (denote) করে, বা যে সব লক্ষণ (connote) বোঝে, তারই মধ্যে ‘গরু’ শব্দের অর্থ সীমাবদ্ধ। সুতরাং মানুষের ভাষা হ'ল লৌকিক ও লোকসামান্য অভিজ্ঞতার ভাষা। কিন্তু বা' অলৌকিক, বা অলোকসামান্য, বা বিশিষ্ট বা নিতান্ত ব্যক্তিগত তাকে

(suggestion)। নেত্রবিকার যেমন ইঙ্গিত, তেমনি ভাষার বিকার বা বৈকান ভাষা বা “বিকোক্তি”, অর্থাৎ অলঙ্কৃত ভাষাও একপ্রকার ইঙ্গিত। অন্ধকে বক দেখাতে হলে আমাদের কোন রকম ইঙ্গিতের সাহায্য নেওয়া ছাড়া উপায় নেই। একমাত্র যে ইঙ্গিত তার কাছে খাটবে, সে হচ্ছে কথঞ্চিৎ সাদৃশ্যের ইঙ্গিত অর্থাৎ ‘কতকটা এই রকম’, এই বলে তাকে খানিকটা বুঝ দেওয়া যেতে পারে।

বাহকে ভূমির সমান্তরাল করে কজি ও মণিবন্ধ পরস্পরের বিপরীত দিকে বৈকিয়ে আমরা অন্ধের কাছে হাত নিয়ে আসি ও তাকে স্পর্শ করতে বলি। সেই স্পর্শ থেকে দৃশ্য-বকের মূর্তি সঙ্কে একটা অসম্পূর্ণ ধারণা অন্ধ করে নেয়। অলোকসামান্য অভিজ্ঞতা সঙ্কেও আমাদের ভাব প্রকাশ কর্তে হলে অল্পরূপ একটা প্রক্রিয়ার সাহায্য নেওয়া ছাড়া উপায় নেই। সে অভিজ্ঞতা অপরের উপলব্ধির বাইরের জিনিষ। কাজে কাজেই আমরা পরিচিত শব্দকেই নানাভাবে ভুগড়ে বৈকিয়ে এটার ঘাড়ে ওটাকে চাপিয়ে বা “আরোপ” করে আমাদের অভিজ্ঞতার সদৃশ একটা বোধ প্রোত্তার মনে আনবার চেষ্টা করি। এইজন্ত সাদৃশ্যলঙ্কারের উৎপত্তি—উপমা ইত্যাদি অলঙ্কার এই পর্যায়েই পড়ে। বিজাতীয় দুটি বস্তুর সাদৃশ্যবোধের তীব্রতার ফলে যখন অভেদ বোধ জন্মায়, তখন সৃষ্টি হয় রূপকের। এই বোধ যদি সাময়িক ও সন্ধীর্ণ হয় তবে বাক্যলঙ্কার রূপকের উৎপত্তি হয়, আর এই বোধ যদি ব্যাপক ও একটা স্থায়ীভাবে সঙ্গ্রে বিজড়িত হয়, তবে রূপক রচনার সৃষ্টি হয়।

কেবল অলোকসামান্য অভিজ্ঞতা নয়, স্মৃতি (abstract) যে কোন ভাবের প্রকাশ কর্তে গেলেই আমরা রূপকের আশ্রয় নিয়ে থাকি। ‘টাকার গরম’ বা ‘বাক্যবাণ’ প্রভৃতি রূপক যখন আমরা ব্যবহার করি, তখন আমরা একটা সুপরিচিত অর্থচ স্মৃতি (abstract) একটা অল্পভূতির কথা বলি। প্রথম প্রথম শব্দ মাত্রের কোন না কোন স্থল বস্তুকেই নির্দেশ কর্তে। সুতরাং কোন স্মৃতি অল্পভূতি প্রকাশ কর্তে হলে সাদৃশ্য বস্তুর সঙ্গ্রে তুলনা করে ইঙ্গিতে রূপকের সাহায্যে ভাব প্রকাশ করা হ’ত। তবে অনেক অল্পভূতিই সাধারণ বলে ইঙ্গিতের তাৎপর্য এখন সুবিদিত

গুণবাচক শব্দের উৎপত্তি হ’য়েছে। যেমন ‘রাগ’ কথাটা আমরা এখন একটা মানসিক ভাব নির্দেশ করার জন্য ব্যবহার করি, কিন্তু গোড়ায় একথাটার মানে ছিল ‘রঙ’। রূপক হিসেবে ব্যবহার হ’তে হ’তে এখন একথাটার তাৎপর্য স্থল বস্তু ছেড়ে স্মৃতি ভাবে পর্যাবসিত হ’য়েছে।

এই ভাবে স্থলবস্তুর গুণ অথবা কোন প্রকার স্মৃতি অল্পভূতি বা মনোভাব নির্দেশ করার জন্তে বাক্যলঙ্কার হিসেবে রূপকের উৎপত্তি হ’য়েছে, আর রূপক-রচনার উৎপত্তি হ’য়েছে অলৌকিক অভিজ্ঞতা প্রকাশ করার জন্তে। অলৌকিক অভিজ্ঞতা সোজাশুজি প্রকাশ করার ক্ষমতা মানুষের ভাষায় নেই। পার্থিব জীবনের প্রয়োজনে লোক-সামান্য পার্থিব অভিজ্ঞতা নির্দেশ করার জন্তে ভাষার সৃষ্টি হ’য়েছে। কবির কথায়—

মানুষের ভাষাটুকু অর্থ দিয়ে বদ্ধ চারিধারে,

ঘুরে মানুষের চতুর্দিকে। অবিরত রাত্রি দিন

মানবের প্রয়োজনে প্রাণ তার হয়ে আসে ক্ষীণ।

এই জন্তে অলৌকিক অভিজ্ঞতা প্রকাশের উদ্দেশ্যে

সদৃশ সাধারণ অভিজ্ঞতার নানা কথাকেই এমন ভাবে ঘুরিয়ে বৈকিয়ে পরস্পরের সঙ্গে সংযোগ বা আরোপ করে রূপকে বলা হয় যে লৌকিক থেকে অলৌকিকের দিকে একটা ইঙ্গিত তার মধ্যে ফুটে ওঠে। রূপক রচনার মূলে আছে একটা সাদৃশ্য-বোধ। অলৌকিক জগতের পদার্থ-নিচয়ের মধ্যে যে ধর্ম, গুণ বা পারস্পরিক সম্পর্ক আমরা উপলব্ধি করি, তারই সদৃশ গুণ বা ধর্ম আমাদের লৌকিক জগতের যে যে পদার্থে বর্তমান, তাই দিয়ে আমরা একটা রূপকের সৃষ্টি করি, সদৃশ ও সমধর্মী বলে এই নূতন সৃষ্টি অলৌকিক জগতের প্রতিভূ হ’য়ে দাঁড়ায় এবং তার অন্তর্নিহিত ইঙ্গিতের প্রভাবে আমাদের মন—

“যায় চলি মর্ত্যসীমা অবাধে করিয়া সন্ডরণ।”

রূপকের রচনা মানব-সাহিত্যের আদি কাল থেকেই চলে আসছে। উপনিষদের ঋষি জীবাশ্মার সহিত পরমাত্মার সম্পর্ক বুঝাবার জন্তে বলেছেন—

আ সুপর্ণা সবুজা সখায়া সমানং ব্রহ্মং পরিবব্রজাতে।

তয়োৱন্তঃ পিঙ্গলং স্বাস্থন্ত্যনন্তরন্তোংজিতাকশীতি।



‘হুই সুন্দর পক্ষী একত্র সংযুক্ত হইয়া এক বৃক্ষে বাস করিতেছে। তাহার মধ্যে একটি স্বাক্ষু পিঙ্গল আহার করিতেছে, অপরটি অনশনে থাকিয়া তাহা দেখিতেছে।’ রূপকের এটা সুন্দর উদাহরণ।

খৃষ্টান ধর্মশাস্ত্রের রূপকের ব্যবহার যথেষ্ট আছে। Song of songs রূপক হিসেবে গৃহীত ও ব্যাখ্যা করা হয়েছে। সেখানে ভগবানের সঙ্গে ভক্তের সম্পর্ক, তথা বীণথুন্ডের সঙ্গে মানবাত্মার সম্পর্ক বোঝান হয়েছে রূপক সৃষ্টি করে। এই রূপকে ভগবান বা বীণকে বলা হয়েছে প্রেমাস্পদ পুরুষ, আর ভক্ত বা মানবাত্মাকে বলা হয়েছে প্রেমাকাজিনী নারী। Song of songs ছাড়াও New testamentএ অনেক আয়গাতেই ভগবান ও ভক্তের সম্বন্ধ বর ও বধূর রূপকের দ্বারা প্রকাশ করা হ’য়েছে। বোধহয় এই রূপক রচনার প্রেরণা Bibleএ থাকার জন্তেই আগেকার দিনে সমগ্র ইউরোপেই রূপক সাহিত্য যথেষ্ট পরিমাণে রচিত হ’য়েছিল। Everyman প্রভৃতির দ্বায় রূপক নাট্য, Faerie queeneস্বরূপ দ্বায় রূপক কাব্য, Pilgrim’s Progressস্বরূপ দ্বায় রূপক কাহিনী বহু প্রচলিত হয়েছিল।

আমাদের দেশেও রূপক রচনার অসম্ভাব ছিল না। ভারতীয় সাধনার তত্ত্ব রূপকের সাহায্যেই ব্যাখ্যা করা হ’ত। বাঙলা ভাষার প্রাচীনতম কবিতা—

“কায়্য তরুণের পঞ্চ বি ডাল

বঞ্চল চীএ পইঠো কাল—”

“কার্য্য গাবড়ি ঘাণিট মন কেড়ু বাল

সদ গুরু বঅনে ধর পতবাল।”

“ভবনই গহন গম্ভীর বেগে বহি

দু আস্তে চিখিল, মাঝে ন থাহী।

ধামার্থে চাটিল সাধুগরই।

পারগামি লো অ নিভর তরই।”—ইত্যাদি

রূপক রচনা।

অপরিচিত বাউল সঙ্গীত—

খাঁচার মাঝে অচিন পাখী কম্বে আসে যায়।

ইচ্ছা করে মনোবেড়ি দিভাম তাহার পায় ॥

রূপক সঙ্গীতের একটা চমৎকার দৃষ্টান্ত। রামপ্রসাদের

“মনরে কবি কাজ জান না, এমন মানব-জমিন রইল পতিত

আবাদ কল্ল ফলতো সোনা ॥” “আয় মন, বেড়াতে যাবি। কালীকল্লতরু-তলে গিয়া চারি ফল, কুড়িয়ে খাবি” ইত্যাদি সঙ্গীতও রূপকের উদাহরণ। রবীন্দ্রনাথের “হুই পাখী”ও রূপক। গীতাঞ্জলির “এরে তরী দিল খুলে” রূপক সঙ্গীত। আধুনিক কালে রচিত “আত্মদর্শন” একটি উল্লেখযোগ্য রূপক নাট্য।

রূপক রচনার কয়েকটি লক্ষণ মনে রাখা দরকার। রূপকের মধ্যে দুটো জগতের সন্ধান থাকে। একটা লৌকিক, সেটা প্রত্যক্ষ, আর একটা অলৌকিক, সেটা পরোক্ষ। প্রত্যক্ষ লৌকিক জগৎটা অপ্রত্যক্ষ অলৌকিক জগতের—আরও শুদ্ধভাবে বলতে গেলে, অলৌকিক ভাব ও প্রত্যয়ের একটা সমাবেশের প্রতিবিম্ব। পদ্মিনীর প্রত্যক্ষ ছায়াটা আর অপ্রত্যক্ষ কায়্যটার মধ্যে একটা রূপের ও সংস্থানের সাদৃশ্য আছে। কাজেই পদ্মিনীর ছায়া দেখে তার কায়্যটার সম্বন্ধে একটা ধারণা করা যায়। অন্ততঃ ছায়াটার দিকে তাকালে কায়্য সম্বন্ধে আমাদের জিজ্ঞাসা ও কল্পনা উদ্ভূত হ’য়ে ওঠে। কিন্তু ছায়াটা অপরিচিত বাস্তব জগতেরই উপাদান দিয়ে তৈরী মনে হ’লেও ঠিক তারই একটা অংশ নয়, এরকম একটা বোধ আমাদের আছে। এটা যে কৃত্রিম, একটা পরিকল্পিত রচনা, খাঁটি বাস্তব জগতের একটা ভাঙা টুকরো নয়, এরকম বোধ সহজেই হয় এবং সঙ্গে সঙ্গেই এর অলৌকিক তাৎপর্যের দিকে মন আকৃষ্ট হয়। কখনও কখনও স্পষ্ট করেই রচনার এই রূপকত্ব গুণ উল্লেখ করা হয়; আবার কখনও এই রূপকত্বের কথা মোটেই উল্লেখ করা থাকে না। অথচ রচনার ভিতর থেকে একটা সমান্তরাল অলৌকিক জগতের অবয়ব-সংস্থান কুটে ওঠে।

( ২ )

এইবার প্রতীকের কথা। রূপক আর প্রতীক একই বলে অনেকে মনে করেন। “যার নাম চাল-ভাজা, তার নাম মুড়ি”—যার নাম রূপক সাহিত্য, তারই নাম প্রতীক সাহিত্য—এই রকম একটা ধারণা অনেকের আছে। কিন্তু প্রণিধান করে দেখলে স্পষ্টই বোঝা যাবে যে রূপক আর প্রতীক বস্তুতঃ এক নয়।

রূপকের মূলে আছে সাদৃশ্যবোধ, আর প্রতীকের মূলে

আছে সংস্পর্শবোধ। রূপকের কারবার হচ্ছে দুটি বিভিন্ন চিন্তাক্ষেত্রের অন্তর্গত দুটি বস্তু নিয়ে, প্রতীকের কারবার হচ্ছে একই চিন্তাক্ষেত্রের অন্তর্গত দুটি বস্তু নিয়ে। রূপকে লক্ষ্য করা হচ্ছে দুটি বস্তুর সমগুণতা, আর প্রতীকে লক্ষ্য করা হচ্ছে দুটি বস্তুর সহচারিতা।

উদাহরণ দিলে বস্তুযুটী স্পষ্ট হবে।

শ্রীরামচন্দ্র বনে গেছেন, সিংহাসনে তাঁর স্থানে তাঁর পাছুকা অধিষ্ঠিত। এ ক্ষেত্রে শ্রীরামচন্দ্র ও পাছুকার মধ্যে কোন সাদৃশ্য কল্পনা করা হচ্ছে না, ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শের জন্ত পাছুকা রামচন্দ্রের প্রতীক। আমাদের চিন্তাক্ষেত্রে রামচন্দ্র ও ‘তাঁহার’ পাছুকার প্রত্যয় আহুসঙ্গিক। এই ভাবে চিন্তা জগতে ক্রুশ খৃষ্টের প্রতীক, রূপক নয়; রাজমুকুট রাজার প্রতীক, রূপক নয়। ত্রিবর্ণরঞ্জিত জাতীয় পতাকা ভারতের প্রতীক—রূপক নয়। ত্রিশূল ও শালগ্রাম শিলা, মহাদেবের ও নারায়ণের প্রতীক—রূপক নয়। এইভাবে আমাদের মনে বস্তুর সঙ্গে তার প্রতীক ঘনিষ্ঠভাবে বিজড়িত। সুতরাং প্রতীক সহজেই আমাদের মনে প্রতিপাণ্ড বস্তুর প্রত্যয় আনতে পারে। বাক্যালঙ্কারের

(metonymy synecdoche) সঙ্গে প্রতীকের ভাবগড় ঐক্য আছে। প্রতীক বস্তুর প্রতিনিধি; রূপক বস্তুর প্রতিবিম্ব। রূপকের সঙ্গে বস্তুর সম্পর্ক আরোপিত; প্রতীকের সঙ্গে স্বাভাবিক। বস্তুর সঙ্গে রূপকের যোগসূত্র দড়ির বাঁধ, প্রতীকের যোগসূত্র নাড়ীর টান।

প্রতীকের ব্যবহার মানুষের জীবনে বহু বিস্তৃত। হিন্দুদের পূজা-অর্চনা প্রতীকের সাহায্যেই করা হয়ে থাকে। শিলা, ঘট ইত্যাদির মধ্যে আমরা ভগবানের সাদৃশ্য নয়, তার সংস্পর্শই কল্পনা ক’রে থাকি। অবশ্য পট বা মূর্তি ব্যবহারের মধ্যে রূপকের প্রভাবও দেখতে পাওয়া যায়। রোমান্ ক্যাথলিক খৃষ্টানদের Eucharist or mass. প্রভৃতি অমুষ্ঠানের মধ্যে প্রতীকের ব্যবহার স্পষ্ট। সেই অমুষ্ঠানের সুরা, ক্রটি প্রভৃতি নৈবেদ্য যীশুখৃষ্টের জীবনের একটা প্রধান ঘটনার স্মৃতির সঙ্গে বিজড়িত; তাই আহুসঙ্গিক ভাব ভক্তের মনে জাগিয়ে দেবার জন্তে এই সব উপকরণের ব্যবহার করা হ’য়ে থাকে। খ্রিস্টানের একগাছি কেশ বা একতড়া চিঠি আমরা সঘরে রক্ষা করি প্রতীক হিসেবেই। (ক্রমশঃ)

## ইতিহাস

### শ্রীশান্তুলীল দাশ

যুগে যুগে এল কত মহাজন জীবনের বাণী কণ্ঠে বহি’  
বিশ্ববাসীয়ে শোনালো জীবন গান ;  
সাধনা তাদের সকল হ’য়েছে শত দুঃসহ বেদনা সহি’  
দিয়ে গেল তারা অমৃতের সন্ধান।  
উচ্চ কণ্ঠে জানালো সবারে : মাটির মানুষ,  
তোমরা শোনো,  
দুঃখের মাঝে নহে জীবনের শেষ,  
মৃত্যুবিহীন আছে সে রাজ্য, যেথায় নাহিক দুঃখ কোনো,  
চির সুন্দর, চির শান্তির দেশ।  
তাদের বারতা দিগ্‌দিগন্তে প্রচারিত হ’লো অগৌরবে,  
মুখরিত হ’লো মাটির এ ধরাতল ;  
জেনে গেল তারা পরমানন্দে, মানুষের মাঝে সফল হ’বে  
দীর্ঘদিনের তাদের সাধন ফল।  
মহামানবের দুর্লভ দান আজিও মানুষ স্মরণ করে,  
তাহাদের কথা হয়নি বিস্মরণ ;  
তাদের স্মরণ চিরু বহিছে মঠ মন্দির সাড়ম্বরে  
দেশে দেশে আর দিকে দিকে অগণন।

ক্রশের প্রতীক, পাদনখকণা, অস্থি-ভস্ম, কত না আর  
মানুষ দিয়েছে সুযোগ্য সন্ধান ;  
তাদের স্মরণে প্রতিবৎসর কলরব ওঠে বন্দনার  
সাজায় যতনে অম্বষ মূল্যবান।  
কোনো ক্রটি নাই, শুধু এইটুকু : দীর্ঘ তপস্চর্যা করি’  
দিয়ে গেল তারা যে পথের সন্ধান,  
কত শতাব্দী কেটে গেল হয়, মানুষ চলেনি সেপথ ধরি’  
গ্রহণ করেনি অন্তরে সেই দান।  
মরণের পাছে আজও তাই ছোটো, মরণের মাঝে বেঁচেছে বাসা  
যুরে মরে তাই আঁধারের কারাগারে ;  
ব্যর্থ হ’য়েছে সকল সাধনা, বৃথা হেঁথা মহামানবের আসা  
ধরণী ভরেছে বেদনার হাহাকারে।  
মন্দিরে জলে শতদীপালোক, নানা উপচারে  
পূর্ণ ডালা  
শংখ, ঘণ্টা—সুবিপুল আয়োজন ;  
শুধু নাই সেধা দেবতা, পূজারী ; বৃথা ধূপ দীপ কুসুমমালা  
কে করিবে পূজা, করিবে কেবা গ্রহণ ?



একাদশ পরিচ্ছেদ

নূতন পথে

সত্য যখন অপ্রত্যাশিত ভাবে মানুষের সম্মুখে আসিয়া আবির্ভূত হয়, তখন তাহার রূপ যতই অদ্ভুত ও অচিন্তনীয় হোক, তাহাকে সত্য বলিয়া চিনিয়া লইতে বিলম্ব হয় না। পারিপার্শ্বিক পরিবেশের মধ্যে নিজেকে সহজে স্বাভাবিক রূপে প্রতিষ্ঠিত করিবার এমন একটি অসন্দ্বিগ্ন ভঙ্গী সত্যের আছে যে তাহাকে অস্বীকার করা একেবারেই অসম্ভব।

পৃথার মুখে চিত্রক যখন নিজের পরিচয় শুনিল তখন ক্ষণেকের তরেও তাহার মনে সন্দেহ বা অবিশ্বাস জন্মিল না। বরং তাহার অতীত জীবনের সমস্ত পূর্বসংযোগ, তাহার সর্বদেহে অসি-রেখাক, সমস্তই যেন এই নূতন পরিচয়ের সমর্থন করিল। কিন্তু তথাপি, চিরাত্যস্ত দর্পণে নিজের মুখ দেখিতে গিয়া কেহ যদি একটা সম্পূর্ণ অপরিচিত মুখ দেখিতে পায় তাহা হইলে সে যেমন চমকিয়া উঠে, চিত্রকও আদৌ নিজের প্রকৃত পরিচয় জানিতে পারিয়া বিশ্বয়ে বিমূঢ় হইয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু তাহা ক্ষণেকের জন্ত; পরক্ষণেই সে দৃঢ়বলে নিজেকে সঞ্চরণ করিয়া লইয়াছিল। তাহার মস্তিষ্ক রক্তে অযুত উন্নত চিন্তা ঝাঁক বাঁধিয়া প্রবেশ করিবার চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু প্রত্যাংগ-মতি যোদ্ধার সবল সতর্কতার দ্বারা সে তাহার প্রতিরোধ করিয়াছিল। সন্ধ্যাকালে বুদ্ধিব্রংশ হইলে সর্বনাশ।

উপরন্তু এই বাহু সংঘর্ষের তলে তলে তাহার মনের মধ্যে এক অদ্ভুত ব্যাপার ঘটিতে আরম্ভ করিয়াছিল। শৈশব হইতে যে বিচিত্র বাতাবরণের মধ্যে সে বর্ধিত হইয়াছে, বাঁচিয়া থাকার জৈব চেষ্টায় যে নিষ্ঠুর ঘাত-প্রতিঘাতের সম্মুখীন হইয়াছে, তাহা তাহাকে একটি বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব বা চরিত্র দান করিয়াছিল; এই চরিত্র কঠিন, স্বার্থপরায়ণ, নীতি-বিমুখ ও স্বযোগসন্ধানী—ইহা আমরা

# কালের মন্দিরা

শ্রী শরাদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

পূর্বে দেখিয়াছি। এখন নিজের প্রকৃত পরিচয় জানিবার পর তাহার নিগূঢ় অন্তরলোকে ধীরে ধীরে একটি পরিবর্তনের স্বরূপাত হইল; সে নিজেকে জানিল না যে তাহার রক্তের প্রভাব—যাহা এতদিন আত্মপরিচয়ের অভাবে স্তম্ভ ছিল—তাহা তাহার অর্জিত চরিত্রকে অলক্ষিতে নূতন করিয়া গড়িয়া তুলিতে আরম্ভ করিয়াছে।

পৃথার মৃত্যুর পরদিন প্রাতঃকালে চিত্রক যখন রাজপুরীতে কিরিয়া আসিল তখন তাহার মুখের ভাব ক্রান্ত, ঈষৎ গভীর; তাহার অন্তরে যে শীততন্দ্ৰাচ্ছন্ন বুড়ু নাগ জাগিয়া উঠিয়াছে তাহা কেহ জানিতে পারিল না। চারিদিকে সূর্যকরোজ্জ্বল পুরভূমি, চূর্ণবিলোপিত ভবনগুলি ইতস্তত শুভ্র বৃন্দ-বিশ্বের জ্বায় শোভা পাইতেছে। ইহাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া চিত্রক ভাবিতে লাগিল—আমার! আমার! এ সকলই আমার!

কিন্তু—একথা কাহাকেও বলিবার নয়। বলিলে লোকে হাসিবে, উদ্ভাদ বলিয়া ব্যঙ্গ করিবে। একজন সাক্ষী ছিল, সে মরিয়া গিয়াছে। সে যদি বাঁচিয়া থাকিত তাহাতেই বা কী হইত? তাহার কথাও কেহ বিশ্বাস করিত না, অসম্বদ্ধ প্রলাপ বলিয়া হাসিয়া উড়াইয়া দিত। কিম্বা যদি বিশ্বাস করিত, তাহা হইলে পরিস্থিতি আরও সঙ্কটাপন্ন হইয়া উঠিত; চিত্রককে বেশী দিন বাঁচিয়া থাকিতে হইত না। বরং এই ভাল। শুধু স্নগোপা জানিল। তাহাতে ক্ষতি নাই; স্নগোপা-ভগিনী শপথ করিয়াছে কাহাকেও বলিবে না। কিছুদিন নিভৃত চিন্তা করিবার অবসর পাওয়া যাইবে। তারপর—

এদিকে লক্ষণ কঞ্চকী গত রাতে ছুশ্চিন্তায় নিদ্রা যায় নাই। কিন্তু আজ প্রভাতে চিত্রক যখন পলায়নের কোনও চেষ্টা না করিয়া স্বেচ্ছায় রাজপুরীতে কিরিয়া আসিল তখন তাহার মন অনেকটা নিশ্চিন্ত হইল; তাহার মনে হইল চতুরভট্ট বৃধাই চিত্রককে সন্দেহ করিয়াছিলেন।

সে দ্বিগুণ সমাদরের সহিত চিত্রকের সেবা করিতে লাগিল।

দ্বিগ্রহের আহ্বানাদির পর চিত্রক বিশ্রামের জন্ত শয্যাশ্রয় করিলে কঞ্চুকী লক্ষণ বলিল—‘আজ আপনাকে কিছু অধিক বিমনা দেখিতেছি। চিত্তার কোনও কারণ ঘটয়াছে কি?’

চিত্রক বলিল—‘জীবন-মৃত্যুর অচিস্তনীয় সম্ভাব্যতার কথা ভাবিতেছি। পৃথা পঁচিশ বৎসর অন্ধকূপে বন্দিনী থাকিয়াও মরিল না; যেমনি মুক্তি পাইল, সেবা-যত্ন পাইল, অমনি মরিয়া গেল। বিচিত্র নয়?’

লক্ষণ বলিল—‘সত্যই বিচিত্র। মাহুষের ভাগ্যে কখন কী আছে কেহই বলিতে পারে না; আজ যে রাজা, কাল সে ভিক্ষুক। এই পঞ্চাশ বছর বয়সের মধ্যে কতই যে দেখিলাম!’ বলিয়া সে দীর্ঘশ্বাস মোচন করিল।

চিত্রক কঞ্চুকীকে কিস্তকাল নিরীক্ষণ করিয়া বলিল—‘কঞ্চুকী মহাশয়, আপনি কতকাল এই কার্য করিতেছেন?’

‘কঞ্চুকীর কার্য? তা প্রায় বিশ বছর হইল। আমার পিতা আমার পূর্বে কঞ্চুকী ছিলেন—’ লক্ষণের স্বর নিম্ন হইল—‘রাষ্ট্রবিপ্লবে তিনি হত হন। তারপর নতুন রাজবংশ প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে কয়েক বছর গেল; ক্রমে বর্তমান মহারাজ আর্ঘ্যভাবাপন্ন হইলেন। তদবধি আমি আছি।’

‘পূর্বতন রাজার কী হইল?’

‘তিনিয়াছি বর্তমান মহারাজ তাঁহাকে বধ করিয়াছিলেন।’

‘আর রাণী?’

‘রাণী বিধ ভক্ষণে দেহত্যাগ করেন। তাঁহাকে কেহ স্পর্শ করিতে পারে নাই।’

উদগত নিশ্বাস চাপিয়া চিত্রক অবহেলাভরে প্রশ্ন করিল—‘রাজপুত্রটাও নিশ্চয় মরিয়াছিল?’

‘সম্ভবত মরিয়াছিল। কিন্তু তাহার মৃতদেহ পাওয়া যায় নাই।’

চিত্রক আর অধিক প্রশ্ন করিতে সাহস করিল না, তজ্জ্বার ছলে জন্ম ত্যাগ করিয়া চক্ষু মুদ্রিত করিল।

দ্বিনটা বিরস শূন্ততার মধ্য দিয়া কাটিয়া গেল।

সন্ধ্যার প্রাক্কালে চিত্রক উত্তরীয় স্বক্ষে ফেলিয়া ভবন হইতে বাহির হইল। কঞ্চুকী আজ আর তাহার সন্

নাইবার চেষ্টা করিল না, শুধু জিজ্ঞাসা করিল—‘পুরার বাহিরে যাইবেন নাকি?’

চিত্রক বলিল—‘না, ভিতরেই একটু ঘুরিয়া বেড়াইব।’

স্বয়ং অস্ত গিয়াছে। প্রাসাদের বলভিতে কপোতগণ কলহ-কুজন করিয়া রাজির জন্ত নিজ নিজ বিশ্রামস্থল সংগ্রহ করিতেছে। ক্রমে পূর্বদিগন্ত জ্যোতির্মণ্ডিত করিয়া চন্দ্রোদয় হইল।

পুরভূমি প্রায় জনশূন্য, কদাচিত্ ছুই একজন কিঙ্কর-কিঙ্করী এক ভবন হইতে অত্র ভবনে যাতায়াত করিতেছে। চিত্রক অনায়াস-পদে ইতস্তত ভ্রমণ করিতে করিতে অবশেষে একটি শীর্ণ সোপান অতিবাহিত করিয়া প্রাকারে উঠিল।

জ্যোৎস্নাপ্রাণিত প্রাকারচক্র রৌপ্য নির্মিত অংগুলির \* ত্রায় শোভা পাইতেছে। তাহার উপর উদ্ভাস্ত চিত্তে পরিলভণ করিতে করিতে এক স্থানে আসিয়া চিত্রক সহসা ধামিয়া গেল।

অদূরে প্রাকার কুড়োর উপর একটি নারী বসিয়া আছে। জ্যোৎস্না-কুহেলির মধ্যে শুভ্রবসনা রমণীকে তুষারীভূত জ্যোৎস্নার মতই দেখাইতেছে। চিত্রকের চিনিতে বিলম্ব হইল না—কুমারী রট্টা যশোধরা।

রট্টা অত্র মনে চন্দ্রের পানে-চাহিয়া আছেন। কোন্ বহির্মুখী বৃত্তির আকর্ষণে তিনি আজ প্রাসাদ-দীর্ঘের ছাদে না গিয়া একাকিনী এই প্রাকারে আসিয়া বসিয়াছেন তাহা তিনিই জানেন, কিংবা হয়তো তিনিও জানেন না। চাঁদের পানে চাহিয়া চাহিয়া তিনি কী ভাবিতেছেন তাহাও বোধকরি তাঁহার সচেতন মনের অগোচর।

নিশ্বাস রোধ করিয়া চিত্রক ক্ষণেক দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার ললাটে ধীরে ধীরে তিলক ফুটিয়া উঠিল; তপ্ত হৃতির ত্রায় জালাময় অস্থ্যা হৃদয় বিদ্ধ করিল। ইনি রাজনন্দিনী রট্টা—এই বিস্তীর্ণ রাজ্যের অধিষ্ঠাত্রী! আর আমি—? এক ভাগ্যঘোষী অসি-জীবী সৈনিক—

অধর দংশন করিয়া চিত্রক নিঃশব্দে ফিরিয়া যাইতেছিল, পিছন হইতে মুহু কণ্ঠের আহ্বান আসিল—‘আর্থ চিত্রক-বর্মা!’

চিত্রক ফিরিল। রাজকুমারীর কাছে গিয়া বৃদ্ধ করে অভিবাদন করিল, গভীর মুখে বলিল—‘দেবদুহিতা এখানে আছেন আমি জানিতাম না। জানিলে আসিতাম না।’

রট্টা ঈষৎ হাসিলেন; বলিলেন—‘কোনও হানি হয় নাই, বরং ভালই হইয়াছে। অবরোধে একাকিনী অতিষ্ঠ হইয়াছিলাম, তাই এখানে আসিয়া বসিয়াছি। আপনিও বসুন।’

চিত্রক বসিল না; কুড়ো বসিলে রাজকুমারীর সহিত সমান আসনে বসা হয়; ভূমিতে বসিলে অত্যধিক দীনতা প্রকাশ করা হয়। সে কুড়োর উপর বাহু রাখিয়া দাঁড়াইল; বলিল—‘আপনার স্নগোপা সখী বোধ করি আজ আসিতে পারেন নাই।’

‘স্নগোপা আমাকে না দেখিয়া থাকিতে পারে না—প্রত্যহ একবার মুহূর্তের \* জ্ঞাত আসিয়াছিল। আপনার কত কথা বলিল। সারারাত্রি আগিয়া আপনি তাহার পাশে তাহাকে সাহায্য ও সাহচর্য দান করিয়াছিলেন। এমন কেহ করে না।’

‘স্নগোপা আর কিছু বলে নাই?’

রট্টা ঈষৎ বিস্ময়ে চক্ষু ফিরাইলেন—‘আর কী বলিবে?’

‘না, কিছু না—’ প্রসঙ্গান্তর উত্থাপনের জ্ঞাত চিত্রক চত্বরের পানে চাহিয়া বলিল—‘আজ বোধ হয় পৌর্ণমাসী।’

‘হাঁ।’ রট্টাও কিয়ৎকাল চাঁদের পানে চক্ষু তুলিয়া রহিলেন—‘শুনিয়াছি আর্থাবর্তের অন্ত্র আজিকার দিনে উৎসব হয়—বসন্ত ঋতুর পূজা হয়। এখানে কিছু হয় না।’

‘হয় না কেন?’

‘ঠিক জানিনা। পূর্বে বোধহয় হইত, এখন হুণ অধিকারের পর বন্ধ হইয়াছে। হুণদের মধ্যে বসন্ত উৎসবের প্রথা নাই। তবে বুদ্ধ-পূর্ণিমার দিন উৎসবের প্রথা মহারাজ পুনঃপ্রবর্তিত করিয়াছেন।’

এই সকল অলস কথাবার্তার মধ্যে চিত্রক দেখিল, রট্টা প্রাকার কুড়োর উপর এমন ভাবে বসিয়া আছেন যে তাঁহাকে একটু ঠেলিয়া দিলে কিংবা আপনা হইতে ভারকেস্ত্র বিচলিত হইলে তিনি প্রাকারের বাহিরে বিশ হাত নীচে পড়িবেন; মৃত্যু অনিবার্য। চিত্রকের বৃকের ভিতর দৃষ্ট

বাণের মতো একটা অশান্ত উদ্বেগ পাক থাইতে লাগিল। তৃতীয় ব্যক্তি এখানে নাই; রট্টা যদি পড়িয়া যান কেহ কিছু সন্দেহ করিতে পারিবে না। যে বর্ষর হুণ তাহার সর্বস্ব অপহরণ করিয়াছে, যাহার হস্তে তাহার পিতা নৃশংসভাবে হত হইয়াছিলেন, এই যুবতী তাহারই কন্যা—

চিত্রকের চোখে জ্যোৎস্নার শুভ্রতা লোহিতা হইয়া উঠিল।

রট্টার কিন্তু নিজের সঙ্কটময় অবস্থিতির প্রতি লক্ষ্য নাই; তিনি স্বচ্ছন্দে নির্ভয়ে কুড়োর উপর বসিয়া আছেন। চিত্রক সহসা যেন নিজেকে ব্যঙ্গ করিয়াই হাসিয়া উঠিল; বলিল,—‘রাজকুমারি, আপনি কুড়া হইতে নামিয়া বসুন। ওখান হইতে নিম্নে পড়িলে প্রাণহানির সম্ভাবনা।’

রট্টা একবার অবহেলা ভরে নীচের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন, বলিলেন—‘ভয় নাই, আমি পড়িব না। কিন্তু আপনি হাসিলেন কেন?’

কোন্ডে অধর দংশন করিয়া চিত্রক বলিল—‘কুমারী, আমি কোতুকবশে হাসি নাই। আপনার নির্ভীক অপরিণামদর্শিতা—কিন্তু যাক। রাজনন্দিনি, যদি ধৃষ্টতা না হয়, একটি প্রশ্ন করিতে পারি?’

‘কি প্রশ্ন?’

‘আপনি হুণ-দুহিতা। আর্থ জাতি অপেক্ষা হুণ জাতির প্রতি আপনার মনে নিশ্চয় পক্ষপাত আছে?’

কিছুক্ষণ নীরবে মনন করিয়া রট্টা ধীরে ধীরে বলিলেন,—‘আর্থ—! হুণ—! আমার মাতা আর্থ ছিলেন, পিতা হুণ। আমি তবে কোন্ জাতি? জানিনা। সম্ভবতঃ মজ্জা জাতি।’ রট্টা একটু হাসিলেন—‘আর পক্ষপাত? দূত মহাশয়, এই আর্থভূমিতে যাহারা বাস করে তাহাদের সকলের প্রতি আমার পক্ষপাত আছে। কারণ তাহাদের ছাড়া অন্য মাছুষ আমি দেখি নাই।’

‘সকলকে আপনি সমান বিশ্বাস করিতে পারেন?’

‘পারি। যে বিশ্বাসের যোগ্য সে আর্থই হোক আর হুণই হোক, বিশ্বাস করিতে পারি।’ রট্টা লঘুপদে কুড়া হইতে অবতরণ করিলেন—‘এবার আমি অন্তঃপুরে ফিরিব; নহিলে আর্থ লক্ষ্য রূপ হইবেন।’

চিত্রক বলিল—‘চলুন আমি আপনার রক্ষী হইয়া বাইতেছি।’

‘আনু—’ বলিয়া রট্টা যেন কোন গোপন কোণকে স্মরণ মুখ উদ্ভাসিত করিয়া হাসিলেন; চন্দ্রালোকে সেই হাসি ভরস্কের মতো চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল।

চিত্রক ঈষৎ সন্দ্বিধভাবে বলিল—‘হাসিলেন কেন?’

রট্টা এবার বঙ্কিম দৃষ্টিতে চটুলতা ভরিয়া তাহার পানে চাহিলেন; মুখ টিপিয়া বলিলেন—‘ও কিছু নয়। জ্বীলোকের হাসি-কান্নার কি কোনও অর্থ আছে?—চলুন।’

\* \* \*

গভীর রাত্রে রট্টা শয্যা হইতে উঠিলেন। তাঁহার শয্যার শিয়রে প্রাচীরগাত্রে একটি কুটঙ্গক\* ছিল, তন্মধ্যে একটি মণিময় ক্ষুদ্র বুদ্ধমূর্তি থাকিত। সিংহল দীপে রচিত নীলকান্তমণির অসুষ্ঠপ্রমাণ এই বুদ্ধমূর্তি মহারাজ রোষ্ট ধর্মাদিত্য কন্তাকে উপহার দিয়াছিলেন।

শয্যা হইতে উঠিয়া রট্টা একটি দীপ জালিলেন। ধ্যানাসীন বুদ্ধমূর্তির সম্মুখে দীপ রাখিয়া তিনি যুক্তকরে তদগতচিত্তে দীর্ঘকাল ঐ দিব্যমূর্তির পানে চাহিয়া রহিলেন; তাঁহার বাঙ্গুলি-পুষ্পভূগ্য অথর অল্প অল্প নড়িতে লাগিল। তাঁহার কুমারী হৃদয়ের কোন নিভৃত প্রার্থনা তথাগতের চরণে নিবেদিত হইল তাহা কেবল তথাগত জানিলেন।

তারপর দীপ নিভাইয়া রট্টা আবার শয়ন করিলেন।

\* \* \*

পরদিন অপরাহ্নে চণ্টন দুর্গ হইতে বার্তাবহ ফিরিয়া আসিল। মহারাজ রোষ্ট ধর্মাদিত্য পত্র দিয়াছেন। পত্র পাঠ করিয়া মন্ত্রী চতুরানন ভট্ট চিস্তিত মনে রট্টার কাছে গেলেন।

‘মহারাজের শরীর ভাল নয়, তিনি আরও কিছুকাল চণ্টন দুর্গে থাকিবেন। কিন্তু কন্তাকে দেখিবার জন্ত তাঁহার মন বড় উত্তলা হইয়াছে।’

রট্টা বলিলেন—‘আমি পিতার কাছে যাইব।’

চতুরানন বলিলেন—‘কিন্তু—যাওয়া উচিত কিনা ঠিক বুঝিতে পারিতেছি না।’

‘যাওয়া অস্বচিত কেন?’

ইতস্তত করিয়া চতুরানন বলিলেন—‘কিরাত লোক

ভাল নয়। সে চণ্টন দুর্গের সর্বময় কর্তা; তাহার মনে যদি কোনও কুবুদ্ধি থাকে—’

রট্টার মুখ রক্তবর্ণ হইল—‘কিরূপ কুবুদ্ধি? আপনি কি সন্দেহ করেন, কিরাত পিতাকে নিজের কবলে পাইয়া এখন ছলনা দ্বারা আমাকেও কবলে আনিতে চায়?’

‘কে বলিতে পারে? সাবধানের নাশ নাই।’

রট্টা সদর্পে বলিলেন—‘আমি বিশ্বাস করি না। মহারাজের সহিত এরূপ ধৃষ্টতা করিবে কিরাতের এত সাহস নাই। আপনি ব্যবস্থা করুন, কাল প্রাতেই আমি চণ্টন দুর্গে যাইব। পিতৃদেবকে দেখিবার জন্ত আমারও মন অস্থির হইয়াছে।’

‘উত্তম।—মহারাজ মগধের দূতকেও চণ্টন দুর্গে আহ্বান করিয়াছেন।’

রট্টার চোখের উপর অদৃশ্য আবরণ নামিয়া আসিল। তিনি ক্ষণেক নীরব থাকিয়া বলিলেন—‘ভাল। তিনিও আমার সঙ্গে যাইবেন। তাঁহাকে সংবাদ দিলাম।’

চতুর ভট্ট বলিলেন—‘সঙ্গে একদল শরীর-রক্ষীও থাকিবে।—ভাল কথা, চণ্টন দুর্গের পথ দীর্ঘ ও ক্লেশ-দায়ক; পৌছিতে দুই দিন লাগিবে। মধ্যে এক রাত্রি পাহালায় কাটাইতে হইবে। দেবছহিতার জন্ত দোলায় ব্যবস্থা করি?’

‘না, আমি অশ্বপৃষ্ঠে যাইব।’

‘দাদী কিম্বারী কেহ সঙ্গে যাইবে না?’

‘না।’

রট্টার নিকট হইতে চতুরানন চিত্রকের কাছে গেলেন। চিত্রক সমস্ত কথা শুনিয়া কিছুক্ষণ অধোমুখে বসিয়া রহিল। তাহার বক্ষে যে অদৃশ্য তুবানল জলিতেছিল তাহা সহসা লেলিহ শিখায় আলোড়িত হইয়া উঠিল; কিন্তু সে মনের ভাব গোপন করিয়া উদাস নিম্পৃহ স্বরে বলিল—‘আমি এখন আপনাদের অধীন; যাহাই বলিবেন তাহাই করিব।’

পর দিবস প্রভাতে সর্বাঙ্গের সঙ্গে সঙ্গে রট্টা এবং চিত্রক অশ্বারোহণে রাজপুরী হইতে বাহির হইল। এক সেনানী পাঁচজন সশস্ত্র আরোহী লইয়া সঙ্গে চলিল।

কপোতকূট নগর তখন জাগিয়া উঠিয়াছে। পথে পথে গৃহ ও বিপনীর দ্বার খুলিয়াছে, নাগরিকগণ ইতস্তত



যাতায়াত করিতেছে; নাগরিকারা কলসী কক্ষে জল ভরিতে যাইতেছে; কেহবা পূজার অর্ঘ্য লইয়া দেবায়তন অভিমুখে চলিয়াছে। পথের উপর বালকবৃন্দ দল বাঁধিয়া ক্রীড়া করিতেছে। বৈদেহক স্বল্পে পণ্য লইয়া হাঁকিতেছে—অয়ে লাজা—!

পুরুষবেশা রট্টা যখন অশুকুর ধ্বনিতে চারিদিক সচকিত করিয়া রক্ষীসহ রাজপথ দিয়া চলিলেন, তখন জনগণ সকলে পথপার্শ্বে দাঁড়াইয়া সগর্বে উৎফুল্ল নেত্রে দেখিল।

পণ্য পাটকের ভিতর দিয়া বাইবার সময় রট্টা দেখিলেন, চতুপথের উপর একটা কিস্ত-কিমাকার মানুষকে ঘিরিয়া ভিড় জমিয়াছে। লোকটা রোমশ কক্ষকেশ মূলকায়; অঙ্গে বজ্রাদি আছে কিনা ভিড়ের মধ্যে বুঝা যায় না। সে উচ্চকণ্ঠে সকলকে কী একটা কথা বলিতেছে; শুনিয়া সকলে হাসিতেছে ও রঙ্গ ভাষা সাধিতেছে।

রট্টা অশ্বের রশ্মি সংযত করিয়া একজন পথচারীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ‘ও কে? কী বলিতেছে?’

পথচারী রাজকন্টার সন্মুখনে কৃতার্থ হইয়া হাস্তমুখে বলিল—‘ও একটা গড্ডল—বলিতেছে নাকি ও কোথাকার রাজদূত!’

চিত্রক একবার দৃষ্টিপাত করিয়াই চিনিয়াছিল—শিশেখর! সে আর সেদিকে মুখ ফিরাইল না।

রট্টা আবার অশ্বচালনা করিলেন। ক্রমে তাঁহার আগরের উত্তর দ্বারে উপস্থিত হইলেন।

এইখানে শিশেখরের কথা শেষ করা যাক। সেইদিন সন্ধ্যাকালে নগরের কোটপাল মন্ত্রী চতুর ভট্টের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন; বলিলেন—‘একটা বিকৃতবুদ্ধি বিদেশী নগরে প্রবেশ করিয়াছে। সে বলে সে মগধের রাজদূত; কোনও এক তত্ত্ব নাকি তাহার সর্বস্ব কাড়িয়া তাহাকে দিগম্বর করিয়া মৃগয়া কাননে ছাড়িয়া দিয়াছিল।—লোকটা লতাপাতা দিয়া কোনও ক্রমে লজ্জা নিবারণ করিয়াছে।’

চতুরানন ক্র কুণ্ঠিত করিয়া শুনিলেন।

‘তারপর?’

‘নগররক্ষীরা তাহাকে আমার কাছে ধরিয়া আনিয়াছিল। দেখিলাম, লোকটার বুদ্ধিব্রংশ হইয়াছে। কখনও এক কথা বলে, কখনও অন্য কথা বলে, কখনও বুদ্ধদাক্ষ হইয়া ক্রন্দন করে। তাহাকে লইয়া কি করিব বুঝিতে না পারিয়া কোর্ত ঘরে বদ্ধ করিয়া রাখিয়াছি।’

চতুর ভট্ট বলিলেন,—‘বেশ করিয়াছ। গর্তদাসটা একদিন আগে আসিতে পারিল না! এখন আর উপায় নাই। আপাতত কিছুদিন লক্ষ্মিকা ভরণ করুক, তারপর দেখা যাইবে।’

অতঃপর এ কাহিনীর সহিত শিশেখরের আর কোনও সম্বন্ধ নাই। শুধু এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে এই আধ্যাত্মিকা শেষ হইবার পূর্বেই সে মুক্তি পাইয়াছিল এবং ভবিষ্যতে আর কখনও দেশ পর্যটনে বাহির হইবে না প্রতিজ্ঞা করিয়া স্বদেশে ফিরিয়া গিয়াছিল। (ক্রমশঃ)

## সিংহলে কলিঙ্গ উপনিবেশ

শ্রীজনরঞ্জন রায়

পাণীন পালিগ্রন্থ মহাবংশ হইতে জানা যায় বজ্রাধিপের ঔরসে কলিঙ্গ রাজকন্টার গর্ভে সূর্য দেবীর জন্ম হয়। তিনি যৌবনকালে উচ্ছৃঙ্খল ইয়া পড়েন এবং ছয়বেশে একটি বণিকদলে মিশিয়া মগধের দিকে লায়ন করেন। লালের (রাঢ়ের?) জঙ্গলে একটি সিংহ (বিহারের সিংহ উপাধিক বস্ত্রদহ্য?) তাঁহাদের আক্রমণ করে। সঙ্গীরা সর্বস্ব হারিয়া পলাইয়া যায়, সূর্য পলাইতে পারেন না। সিংহ তাঁহাকে নিজ হায় লইয়া যায়। সিংহের ঔরসে তাঁহার পুত্র সিংহবাহর ও কস্তা সিংহবীলীর জন্ম হয়। এই সিংহবাহর রাঢ়ের অধিপতি হন। সিংহবাহর জ্যেষ্ঠপুত্র বিজয়-সিংহ ও মধ্যম পুত্র হুমিত্র। বিজয় তাঁহার

পিতার অবাধ্য ও প্রজাপীড়ক হইয়া উঠেন। তাঁহার সঙ্গীগণও যন্ত্র প্রকৃতির লোক ছিল। সেজন্য প্রজারা তৃতীয়বার অভিযোগ করিলে সিংহবাহর আদেশ দেন যে, বিজয় ও তাঁহার সঙ্গীদের অর্দ্ধেক মাথা মুড়াইয়া সাগরে ফেলিয়া দেওয়া হোক। এই ভাবে বিজয় ও তাঁহার অনুচরদের সাগর যাত্রা আরম্ভ হইল। তাঁহাদের সঙ্গে অন্য দুইখানি নৌকার তাঁহাদের স্ত্রী-পুত্রগণও দেশছাড়া হইলেন। নাগবাণী আসিয়া পুত্রগণের নৌকা লাগিল, মহেন্দ্র নামক স্থানে আসিয়া স্ত্রীগণের নৌকা লাগিল এবং সূর্যারকপত্তনে সপারিষদ বিজয়ের নৌকা লাগিল। বিজয়কে কিন্তু সূর্যারকপত্তনে টিকিতে দিল না। সেখান হইতে

বিভাজিত হইয়া তিনি তাম্রপর্ণীতে আসিয়া নামিলেন। সেখানে আসিয়া বিজয় দেখিলেন কুবেরী নামক যক্ষিণী সেখানকার রাণী। এই যক্ষিণীকে বশীভূত করিয়া তিনি তাম্রপর্ণীর অধীশ্বর হন। সিংহবাহুর বংশ বলিয়া বিজয়কে সীহল (সিংহল) বলা হইত। বিজয় যেদিন তাম্রপর্ণীতে নামেন সেই দিনই (৫৩৩ খ্রীঃ পূর্বাব্দে) বুদ্ধদেবের নির্বাণ লাভ হয়। বিজয় পাণ্ড্য দেশের রাজার নিকট তাঁহার কন্যাকে বিবাহ করিবার প্রস্তাব জানান। পাণ্ড্যরাজ সম্মত হইয়া তাঁহার কন্যার সহিত বহু নরনারীকে তাম্রপর্ণীতে পাঠাইয়া দেন। কিন্তু বুদ্ধ বয়সেও বিজয় কোন সম্মান লাভ করিতে পারেন না। সেজন্য তিনি নিজের ভ্রাতা হুমিত্রকে আসিয়া রাজ্যভার লইতে বলেন। হুমিত্র তখন রাঢ়ের রাজা। এজন্য হুমিত্র নিজ পুত্র পাণ্ডুবাসদেবকে সিংহলে পাঠান। কিন্তু পাণ্ডুবাসদেব সিংহলে পৌঁছবার পূর্বে ৬৮ বৎসর রাজ্য করিয়া (৫০৫ খ্রীঃ পূর্বাব্দে) বিজয় সিংহ তখন মারা গিয়াছিলেন। পাণ্ডুবাসদেব সিংহলে গিয়া জ্যেষ্ঠতাতের সিংহাসনে অভিষিক্ত হইলেন।

এখানে আমরা দেখিতে পাইলাম, সেই আড়াই হাজার বৎসর পূর্বে তাম্রপর্ণীতে কি করিয়া বিজয় সিংহ আসিলেন। আর দেখিলাম, কি করিয়া ভারতের প্রথম উপনিবেশকারীর বংশপরিচয়ে দেশের নাম বদলাইয়া সিংহল হইল। তখন যক্ষগণের বাসভূমি ছিল সে দেশ। যক্ষরা সম্ভব মূল (Mongolian) জাতির লোক। তাহাদের বংশধররা ভারতেরও আদিবাসী। বঙ্গোপসাগরের দ্বীপপুঞ্জে তাঁহার ছড়াইয়া পড়েন। বাঙলা দেশের পূর্বাংশে বর্দা পর্যন্ত সর্বত্র স্ত্রী-প্রাধান্য ছিল, এখনও কিছুটা আছে। চিত্রাঙ্গদার বিবরণে তাহা জানা যায়। কাজেই সিংহলে তখন মেয়ে-রাজা ছিল শুনিয়া বিচित्र জ্ঞান করার কিছুই নাই। কিন্তু বিজয়সিংহ ভারতীয় রমণীকেই বিবাহ করেন। তিনি সিংহলের পরপারে পাণ্ড্য দেশের রাজকুমারীর পাণি-গ্রহণ করেন। পাণ্ড্য দেশকেই ক্ষত্রিয়নাসী উপনিবেশ স্থান বলা হয়। হানট দক্ষিণ ভারতের উপকূলে। ইহার পূর্বসীমা সমুদ্র। কিন্তু মহাভারতে সিংহলের নাম আছে। মহাবংশ অপেক্ষা মহাভারত প্রাচীন। মহাভারতকে বিশ্বাস করিলে বৌদ্ধ বিবরণ মতো সিংহলের নামকরণের কাহিনী প্রভৃতি সবই মিথ্যা প্রতিপন্ন হয়। এখন যে মহাভারত আমরা পাই তাহাতে ‘সিংহল’ নামটি এক্ষিপ্ত হইয়াছে মনে করা বাইতে পারে। শুণ্ডগুণে পুরাণ সকল পুনর্লিখিত হওয়ার সময়, বহু পুরাণে বহু কথা এক্ষিপ্ত হইয়াছে ইহা বিশেষজ্ঞগণ বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন। মহাভারতে সিংহল নামটি আসা ইহার অন্ততম নিদর্শন বলা বাইতে পারে। মহাভারত অভিযাত্রার বৌদ্ধ-বিরোধী। এই বৌদ্ধ বিবরণটি নষ্টাৎ করিয়া দিবার জন্য প্রয়াস করা হইয়াছে মনে করার হেতু আছে। ভারতের বৌদ্ধ ধারার অভিভাবক্য করিয়াছে এক সময় সিংহল। সেই সিংহলকে হুনজরে দেখিতেন না নিম্নরাজ্য ধারার বাহক মহাভারতের গৌরববর্ধনকারী-গণ। বর্ণাশ্রমলোপকারী বৌদ্ধ নিধনে দেবতারও আসেন, কাব্যগ্রন্থও আসে। মহাভারত গ্রন্থ একখানি মহাকাব্য। তাহাতে বৌদ্ধ-বিষয়ের কথা দেখিয়া ইহাও মনে করিবার হেতু আছে যে, তাহার

রচনাকাল ভারতে বৌদ্ধ প্রাধান্তের পরে। বিজয়সিংহ যে সময়ে তাম্রপর্ণী দ্বীপে গেলেন, তখন সেবামাত্র বুদ্ধদেব দেহত্যাগ করিয়াছেন। স্মরণ্য বৌদ্ধযুগের শুরুতেই তিনি বান। তখন ঘোটেই বৌদ্ধ প্রাবল্য আরম্ভ হয় নাই। মহাভারতে অবল বৌদ্ধ শিক্ষা থাকায় তাহা প্রমাণ করে যে, বিজয়সিংহের পূর্বে তাহা নিশ্চয় লেখা হয় নাই। অব্যবহিত পরেও নয়, বরং অনেক পরে।

সাম্প্রতিক উড়িষ্কার ইতিহাসে বিজয় সিংহকে উৎকলবাসী বলিয়া দাবী করা হইতেছে (Glimpses of Kalinga History by Prof. Manmothonath Daso of Balasore College)। পূর্বে বাঙালী ঐতিহাসিকগণ বিজয় সিংহকে বাঙালী বলিয়াছেন।

উড়িষ্কার এই ঐতিহাসিক বলিতেছেন—এই লাল (বালাড) নামক স্থান, যেখানে বিজয় সিংহের পিতামহী সিংহ কর্তৃক অপহৃত হন, তাহা বঙ্গ ও মগধের মধ্যে। স্মরণ্য তাহা উৎকলের কোন স্থান। কারণ বঙ্গ ও বিহারের মধ্যপথেই উৎকল প্রদেশ। কিন্তু উক্ত ঐতিহাসিক ঐ সিংহকে উৎকলবাসী বলিতেছেন না! বলিতেছেন—তিনি বিহার প্রদেশবাসী সিংহ-উপাধিধারী কোন লোক। আমরা এই ঐতিহাসিকের দেশপ্রিয়তার প্রশংসা করিলেও ঐতিহাসিকের সত্যপ্রিয়তার অভাব দেখিয়া দুঃখিত হইতেছি।—কিন্তু দিক দিয়া দেখিতে গেলে লাল—রাঢ় না হইয়া উৎকলের কোন স্থান হইলে, সেখানকার জঙ্গলে উৎকলবাসীই থাকিলে, সেখানে কোন বিহারী আসিবে কেন? আমরা বেশ বুঝিতেছি উক্ত ঐতিহাসিক বিভ্রাটে পড়িয়াছেন এই সিংহকে দেখিয়া। এই সিংহ যে পশুরাজ নয়, মানুষ সিংহ, অর্থাৎ সিংহ উপাধিধারী কোন লোক, তাহা তাঁহার মতো আমরাও স্বীকার করিতেছি। তবে এই উড়িষ্কার ঐতিহাসিক এই সিংহ মহাশয়কে বিহারী বলিলেন কেন? তাহার প্রধান কারণ উড়িষ্কার লোকের সিংহ উপাধি ছিল না, এখনও নাই। সিংহ উপাধিটি বিহারীদের প্রায় একচেটিয়া। এই বিহারী সিংহের ওরসে যে সিংহবাহ হইলেন, তাঁহাকে বরং বাঙালী, উড়িষ্কার ও বিহারী মিশ্রজাত বলা উচিত। তাঁহার পুত্রের দেহেও এই তিন দেশের রক্ত ছিল। স্মরণ্য উড়িষ্কার ঐতিহাসিক কোন মতেই সিংহবাহকে উৎকলবাসী বলিতে পারেন না। এইরূপ সিদ্ধান্ত করিতে তিনি বহু ঐতিহাসিক তথ্য ভ্রমড়াইয়াছেন, বহু কথা চোকা গিলিয়া বলিয়াছেন। সিংহবাহ দ্বারা সিংহপুর নামক শহরটি স্থাপিত হওয়ার কথা ইতিহাসে পাওয়া যায়। শহরটি কোথায় ছিল তাহা জানা গিয়াছে, উক্ত ঐতিহাসিক বলিতেছেন। তাঁহার মতে গঙ্গাবংশের তাম্রপর্ণাসনে লিখিত সিংহপুর ও সিংহপথ (হাঠীপথের উৎকর্ণ স্থান) অভিন্ন। এই অনুমান কতদূর ভ্রমাবহ বলা যায় না।

এতকাল বাঙালী ঐতিহাসিক ও কবিগণ বিজয় সিংহকে বাঙালী বলিয়া গৌরব অশ্রুত করিয়াছেন। তাহারাও সিংহপুর কোথায় তাহা অজান্তভাবে প্রমাণ করিতে পারিয়াছেন মনে হয় না। অন্ততঃ এখন তাঁহাদের দাবী সম্বন্ধের স্মৃতি তাহা করা প্রয়োজন। কারণ

উড়িষ্যা সিংহবাহকে তাঁহাদের দেশের লোক বলিয়া টানাটানি শুরু করিয়াছেন।

বাঙালীরা সিঙ্গুরকে প্রাচীন সিংহপুর বলিয়া থাকেন। হুগলী জেলার তারকেশ্বরের রেলপথে শেওড়াফুলীর পরে তৃতীয় স্টেশন এই সিঙ্গুর। ধর্মমঙ্গল গ্রন্থে (অজয় চকুর কাহিনীতে) লাউসেন প্রসঙ্গে ইহার উল্লেখ আছে। পালরাজ্যে লাউসেন একজন বড় সেনাপতি। তিনিই কামরূপ জয় করেন।

গঙ্গাবংশের পূর্ব পরিচয় আমাদের আলোচ্য বিষয়ে সাহায্য করে না। অনন্তকুক-চোর-গঙ্গা উৎকলের প্রথম গঙ্গাবংশীয় রাজা (১১৩২ খ্রী:)। কেশরী বংশের অবসানে তাঁহার শক্তি বিস্তারের বিবরণ পাওয়া যায়। ১০৩৪ খ্রী: গঙ্গাবংশের অবসান হয়। কিছুদিন পূর্বে উড়িষ্যার ইতিহাস নামক আর একখানি পুস্তক হইতে জানিতে পারা গিয়াছে চোরগঙ্গার আদিপুরুষ দক্ষিণ রাঢ়ের লোক ছিলেন। (History of Orissa by B. C. Muzumdar)।

দক্ষিণ রাঢ় বলিতে হুগলী ও হাওড়া জেলাকে বুঝায়। উত্তর রাঢ় বলিতে (দামোদর, অজয় ও গঙ্গার মধ্যবর্তী অঞ্চলে) বর্ধমান, মুর্শিদাবাদ ও বীরভূম জেলার কতটাকে বুঝায়। গঙ্গাবংশীয়েরা উৎকল দখল করিলে দক্ষিণ রাঢ় পর্যন্ত উৎকলের অন্তর্ভুক্ত হয়। অন্তত: চোরগঙ্গার সময় তাহাই ছিল, তা' তিনি দক্ষিণ রাঢ়ের লোক হউন বা না-হউন। এইরূপে উৎকলের ও রাঢ়ের সংস্কৃতি ১২শ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে চৈতন্তদেবের তথায় অবস্থানকাল (১৬শ শতাব্দীর মধ্যভাগ) পর্যন্ত প্রায় অব্যাহতভাবে নিঃশব্দে হুবিধা পাইয়াছিল। প্রায় বলিলাম এইজন্য যে মুসলমান-ভীতি আরও হইয়াছিল বখতিয়ার খিলজির নবদ্বীপ বিজয়ের (১১৯৯ খ্রী:) পর হইতে। বখতিয়ার মগধ জয়ের পর নবদ্বীপে আসেন ১৭জন অশ্বারোহী লইয়া ইহা অবশ্য মিথ্যা ইতিহাস। এখানে তাহা লইয়া বিশদ আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক হইবে। সামান্যভাবে কিছু বলিব। মুসলমান ঐতিহাসিকের এই বিবরণ বিলাতী ঐতিহাসিকরা সেদিনও কিছু সমর্থন করিয়াছেন। প্রথম প্রমাণিত হইয়াছে অন্ধকূপ-হত্যার মতো ইহা অসত্য কথা। মুসলমান ঐতিহাসিকের রায় লছমনিয়া, রাজা লক্ষণ সেন নহেন। রাজা লক্ষণ সেন নবদ্বীপের পতনের হয়তো পঞ্চাশ বছর পূর্বেই দৈহত্যাগ করেন। রায় লছমনিয়া সেন বংশের একজন সামন্ত রাজা ছিলেন অমুমান করা হইতেছে। সেন রাজাদের আসল রাজধানী তখন লক্ষণাবতী (গোড়) অথবা বিক্রমপুরে ছিল। যাহা হোক দক্ষিণ রাঢ় অঞ্চল পাঠানরা খ্রী: ১৪শ শতাব্দী পর্যন্ত জয় করিতে পারে নাই। রাজনৈতিক দিক দিয়া রাঢ় উড়িষ্যার অধীন ছিল। কতলু খাঁ উড়িষ্যা বিজয় করিলে (খ্রী: ১৬শ শতাব্দীতে) তথায় পাঠান রাজত্ব স্থাপিত হয়।—প্রসঙ্গ হইতে দূরে চলিয়া আসিয়াছি জানিয়াও এইটুকু বলা প্রয়োজন মনে করিতেছি যে, পাঠান আসার মূলে সেন রাজাদের ব্রাহ্মণ প্রচারের নব আন্দোলন (Neo Brahminical revival) সম্পূর্ণ দায়ী। তাহাতে পাল আমলের ধর্মিক (ধর্মিক)

শ্রেণীকে সমাজে অধঃপতিত করা হইল। সমুদ্রযাত্রা প্রভৃতি বন্ধ করিয়া জাতিকে অর্থশূন্য করা হইল। অর্থহীনতার জাতির মেরুদণ্ড ভাঙ্গিল। পাঠানরা তাই বাধা পায় নাই, বিদ্রোহী সমাজ বরং তাহাকে বরণ করিয়াই আনিল।

আমরা বলিয়াছি যে, বাঙলাদেশে পাঠান রাজত্বকালেও উড়িষ্যার সীমারেখা হাওড়া জেলার ভাগীরথী তীর এবং হুগলী জেলার কিয়দংশ (আরামবাগ) পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। স্মরণ্য উড়িষ্যার সঙ্গে বাঙালীর যোগাযোগ, মায় ভাবার সমতা অতি দীর্ঘ দিন পর্যন্ত ছিল। মৈথিলি সমাজের ভাবার সঙ্গেও বাঙালার সমতা খ্রী: ১৫শ শতাব্দী পর্যন্ত ভাল-ভাবে ছিল। রঘুনাথ শিরোমণির মিথিলা গমনও মৈথিলি ভাষা এবং ভাবধারার সহিত বাঙালার নিকট সম্পর্ক ছিল প্রমাণ করে।

এইভাবে বিহার, উড়িষ্যা ও বাঙালার ভাষা ও কৃষ্টির সমতা থাকিলেও বিজয়সিংহকে লইয়া এই তিন প্রদেশ সমানভাবে টানাটানি করে নাই। তাঁহার বাঙালিদের বিরুদ্ধে প্রথম আঘাত আসিল উড়িষ্যা হইতে। কোমর বন্ধের-নিচে-আঘাত ভাবিয়া ইহা যেন বাঙালী ঐতিহাসিকগণ উপেক্ষা না করেন। প্রাদেশিকতা ঐতিহাসিকদের মধ্যেও সংক্রামিত হইয়াছে।

বিজয়সিংহের প্রায় ৩০০ বৎসর পরে বৌদ্ধ কলিঙ্গ প্রদেশের সঙ্গে বৌদ্ধ সিংহলের যোগাযোগ হয়।

উড়িষ্যা ও তাহার দক্ষিণ দিকের অনেকটা অংশকে তখন কলিঙ্গ বলা হইত।

অশোক (বিন্দুসারের পুত্র প্রসিদ্ধ ২য় অশোক) ২৫৮ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে হিন্দুধর্ম পরিত্যাগ করিয়া বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেন। ইহা তাঁহার উৎকল জয়ের পরের ঘটনা। তিনি নিজের পুত্র মহেন্দ্র ও কস্তা সংঘ-মিতাকে বৌদ্ধ ধর্ম প্রচার করিতে সিংহলে পাঠান। অশোকের সময়ে ভারত ও সিংহলে বিশেষ সম্ভাব স্থাপিত হয়। বৌদ্ধ ধর্মের সহিত পালি ভাষায় লিখিত বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থও সিংহলে যায়। স্মরণ্য: পালিভাষার পঠন-পাঠনও সিংহলে আরম্ভ হয়।

কলিঙ্গ দেশের পরপারেই সিংহল।

অশোকের প্রেরিত ধর্মপ্রচারকগণ সিংহলে গেলে, সিংহলরাজ তাহার বিনিময়ে অশোকের নিকট বহুপ্রকার উপঢৌকনাদি সহ নিজ অমাত্যদের পাঠান। এই সিংহলবাসীরা কিরিবার সময় অশোক, তাঁহাদের বোধিবৃক্ষের একটি শাখা প্রদান করেন। ঐ শাখাটি সিংহলরাজ অতি প্রদ্বার সহিত নিজের অমুরাধাপুরের উদ্ভানে রোপণ করেন। সিংহলে যাত্রাসভাকালে কোন বন্দর ব্যবহৃত হইয়াছে তাহা জানা যায় না। তবে তাহা বাঙালার কোন বন্দর এরূপ কেহই দাবী করেন নাই। এজন্য তাহা কলিঙ্গের কোন বন্দর এরূপ মনে করিবার যথেষ্ট কারণ আছে। বেদিনীপুরের তাম্রলিপ্ত বন্দরের খ্যাতি ছিল উত্তর ভারতে। অশোকের সময় তাম্রলিপ্ত বন্দর ছিল কিনা ঠিক বলা যায় না। তবে সেখানে একটি বিরাট অশোকস্তম্ভ ছিল। ৫ম খ্রীষ্টাব্দের প্রথম ভাগে প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ পরিব্রাজক ফাহিয়ান, তাম্রলিপ্ত বন্দর হইতে জলবানে

সিংহলে যান। ৬০৫ খ্রীঃ অপর একজন গ্রীক বৌদ্ধ পরিব্রাজক হ্যুয়েনসাং এই বন্দরে একটি বৌদ্ধ মঠ ও ২০০ হাত উচ্চ একটি অশোক স্তম্ভ দেখেন। এই বন্দর হইতে বড় বড় অর্ণবপোতে রেশমী কাপড় ও রেশম সমুদ্রপারে রপ্তানি হইত তিনি তাহারও বিবরণ দিয়াছেন। এই বন্দর হইতেই সিংহলের রাজা মেঘবর্ষের সময় (৩৫২—৩৭২ খ্রীঃ) বৌদ্ধ-ভারতের শ্রেষ্ঠ নির্মণ বুদ্ধদন্ত ভারত হইতে সিংহলে স্থানান্তরিত হয়। কলিঙ্গের রাজা বৌদ্ধ গুহাশিব যখন হিন্দুরাজা সমুদ্রগুপ্তের নিকট পরাজয় ভয়ে ভীত, তখন নিজ কন্যা হেমলতা ও জামাতা দত্তকুমারের দ্বারা তান্ত্রলিপ্ত বন্দর হইতেই বুদ্ধদন্ত সিংহল-রাজ্যের নিকট পাঠান, এইরূপ জানা যায়। কলিঙ্গরাজকন্তার সহিত নিম্শের একদল দেহরক্ষী ও পরিচারক সিংহল যাত্রা করে। তাঁহারা সকলেই সিংহলে বসতি স্থাপন করেন। কারণ তাঁহাদের প্রত্যাভর্তনের কথা কোন বৌদ্ধ গ্রন্থে নাই। সিংহলের অন্তঃতম প্রধান নগর কান্দিতে একটি মন্দির মধ্যে এই বুদ্ধ দন্তটি রক্ষিত হইতেছে। প্রতিবৎসর আগষ্ট মাসে কান্দির দন্তোৎসব আবার-মাসে পুরীর রথযাত্রা উৎসবের অনুরূপ। কান্দির উৎসব ১৪ দিন ব্যাপী চলে। ইউরোপীয়রা বলিতেছেন, কান্দির এই বুদ্ধ দন্তটি মহাশুদ্ধ নয়, তাহা কুণ্ডীর দন্ত। সিংহল ও ভারতের বিশেষজ্ঞদের এই কথা পণ্ডন করা প্রয়োজন।

এখন সমুদ্রের গতি বদলাইয়া গিয়াছে। তান্ত্রলিপ্তকে (তমলুক) আমরা রপনারায়ণ নদের তীরে দেখিতে পাইতেছি।

যথাতী কেশরীর-তান্ত্রাশাসনে (৫ম খ্রীঃ) 'লাল' জয়ের কথা আছে, উড়িষ্যার উক্ত সাম্প্রতিক ঐতিহাসিক বলেন।

একজন উৎকল দেশের রাজা শত্রু ভয়ে সিংহলে গিয়া বৌদ্ধ ভিক্ষু-জীবন যাপন করেন জানা যায়। হয়তো উত্তর হইতে রাজা হনবর্ধন অথবা দক্ষিণ হইতে চাণক্যরাজ ২য় পুলকেশীর আক্রমণ ভয়ে তিনি পলায়ন করিয়াছিলেন (৬০২ খ্রীঃ)।

সিংহলের রাজা ৭ম মহেন্দ্র একজন উৎকল কস্তার পানি গ্রহণ করেন (১০ম খ্রীঃ)। সিংহলরাজ বিজয়বাহ কলিঙ্গরাজকন্যা তিলকহুম্মরীকে বিবাহ করেন (১১শ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যভাগে)। এই সব বৈবাহিক আদানপ্রদানে সিংহলের সঙ্গে কলিঙ্গের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠতর হইয়াছিল।

উৎকলের বিক্রমবাহ সিংহলের সেনানায়ক ছিলেন (১২শ খ্রীঃ প্রথম পাদে)। তিনি রাজকারী বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। তাঁহার ইঙ্গিতেই তখন রাজকার্য চলিত।

সিংহলরাজ মহান পরাক্রমবাহ (১১৫০ খ্রীঃ) ভারতের দক্ষিণে কাবেরী নদীর উত্তরাংশেস্থিত প্রাচীন চোলরাজ্য আক্রমণ করেন। সিংহলের প্রজাদের হিতার্থে তিনি কিছু করিয়াছিলেন। রাজ্যের ঐচ্ছিক করিতে উত্তান ও প্রাসাদ সকল নির্মাণ করান। তিনি নিজ কস্তাকে উৎকল রাজপুত্র নিঃশঙ্কমলের সহিত বিবাহ দেন। উৎকলের সাম্প্রতিক ঐতিহাসিক বলেন—সিংহলের ইতিহাসে আছে যে, এই নিঃশঙ্কমল উৎকলের সিংহপুত্র (১১৫০ খ্রীঃ) জয়গ্রহণ করেন।

সিংহলের কোন ইতিহাসে তিনি ইহা পাইয়াছেন তাহা উক্ত ঐতিহাসিক বলেন নাই। সিংহপুর উৎকল মধ্যে অবস্থিত ছিল ইহা বলিবার তিনি যে বহুপ্রকার উক্তম করিয়াছেন, ইহা তাহার অন্ততম।

পরাক্রমবাহর মৃত্যুর পর তাঁহার ভাগিনেয় বিজয়বাহ এক বৎসর (১১৮৭ খ্রীঃ) সিংহলের রাজা ছিলেন। তাঁহার ইত্যাকারীকে বধ করিয়া নিঃশঙ্কমল সিংহলের রাজমুকুট ধারণ করেন। তাঁহার সময়ে (১১৮৭-১১৯৬ খ্রীঃ) সিংহলের গৌরব রবি মধ্যাহ্ন গগনে উঠে। নিঃশঙ্কমলের বহু অনুশাসন সিংহলের পৌরনাক্ষত্র নামক স্থানে পাওয়া যায়। তাহাতে তিনি সিংহলের প্রথম রাজা বিজয়সিংহের বংশধর বলিয়া নিজের পরিচয় দিয়াছেন। আত্মগৌরবচ্ছলে তিনি ইহা বলিলেও ইতিহাস তাহা স্বীকার করিতে পারে না। নিঃশঙ্ক তিনবার পাণ্ডোদেশ আক্রমণ করেন। নিঃশঙ্কের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র বীরবাহ এক রাত্রের জন্ত সিংহলের রাজা হন। সেনানায়কদের চক্রান্তে তিনি রাজদণ্ড ধারণে অক্ষম হন। কিন্তু নিঃশঙ্কের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা রাজা সাহসমল সাহস করিয়া এই সময়েও কিছুদিন মাথা তুলিয়া ঠাঁড়াইতে পারিয়াছিলেন। কিছুদিন পরে সিংহলের আদিবাসী প্রকর্মপাণ্ডা তিনবৎসর কাল সিংহলের রাজদণ্ড হস্তগত করিয়া রাখেন। ১২১৫ খ্রীঃ কলিঙ্গ দেশ হইতে মঘ নামক কোন ব্যক্তি কেবল গু 'মালব'সৈন্ত' নিয়া সিংহল আক্রমণ করেন। তিনি প্রকর্মপাণ্ডাকে অন্ধ করিয়া দিয়া সিংহলের সিংহাসন হস্তগত করেন। মঘ, গোড়া বর্ণাশ্রমী হিন্দু ছিলেন। তিনি সিংহলের বৌদ্ধাচার প্রায় উৎসাদিত করিয়া দেন। বৌদ্ধ সিংহলীরা তখন দেশ ছাড়িয়া পলায়ন করিতে থাকে। তিনি ঐ সব বৌদ্ধদের পরিত্যক্ত বাসভবন, কুবিম্বেত্রাদি নিজ অমুগামী হিন্দুদের মধ্যে বণ্টন করিয়া দেন। এই ভাবে তাঁহার আনীত শতসহস্র কেবল ও মালবাসী সিংহলের পাকা বাসিন্দাতে পরিণত হয়। তিনি দীর্ঘ একুশ বৎসরকাল সিংহলের একচ্ছত্র রাজা ছিলেন। তারপর দীর্ঘকাল সিংহলের সঙ্গে কলিঙ্গ-সম্পর্ক ছিল। বৌদ্ধগণ বলেন, বিজয়বাহকে না'কি চীনরা অপহরণ করে। তাঁহার রাণী ছুইটি নাবালক পুত্রদের নিয়া আত্মগোপন করেন। বড়কুমার পরাক্রমবাহ নাবালক হইয়া বুদ্ধদন্তের মন্দির নির্মাণ করান। মাতা হুমিত্রা দেবীর স্মরণার্থে তিনি কলখোর নিকট একটি বিরাট বিহার নির্মাণ করান। তাঁহার পালিতপুত্র সিংহলের নিকটবর্তী জাকলা বীপটি দখল করেন। তখন জাকলায় অধীশ্বর নিজেকে আর্ধ্যচক্রবর্তী ও কলিঙ্গের গঙ্গাবংশের লোক বলিতেন।

তারপর সিংহলে আসিল পর্তুগীজরা (১৫০৫-১৫ই নভেম্বর)। কলিঙ্গ তথা ভারতের সঙ্গে সিংহলের প্রত্যক্ষ সম্পর্ক নষ্ট হইল।

আমরা কিন্তু দেখিলাম খ্রীষ্টপূর্ব ৬ষ্ঠ শতক হইতে খ্রীঃ ১৫শ শতক পর্যন্ত—দীর্ঘ দুই হাজার বৎসর সিংহলে কলিঙ্গবাসীরাই প্রধানভাবে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছেন। যদিও নিঃসন্দেহে বলা যায় বাঙালী বিজয় সিং ও তাঁহার আত্মপুত্র সদলে আসিয়া সেখানে আদি

উপনিবেশ স্থাপন করেন। কিন্তু তারপর এখানে বহুদিন দলে-দলে কলিঙ্গবাসীরাই আসিয়াছেন।

বাঙালী এইভাবে তাঁহার ভাবধারা নিরা গিয়াছেন বহু স্থানে, শুধু সিংহলেই নয়। ভারতের ত্রিবাঙ্কুরে একদল লোক এখনও নিজেদের বাঙালী বলিয়া পরিচয় দেন। তাঁদের মহিলারা কপালে সিন্দুর ব্যবহার করেন। বাঙালীর মতো হনুধ্বনি দেন মাঙ্গলিক কাজে, যাহা বাঙালী মহিলার বৈশিষ্ট্য। গুজরাটের নাগর ব্রাহ্মণরা এখনও নিজেদের বাঙালী বলিয়া থাকেন। হিমাচল রাজ্যে, অর্থাৎ সিমলা ও পাঞ্জাবে এখনও বাঙালী সেন-রাজবংশের শাখা রাজত্ব করিতেছেন। যবদ্বীপ, ইন্দোনেশিয়া, শ্রীলঙ্কা ও ইন্দোনেশিয়ার বাঙালী সভ্যতার ভূরি ভূরি নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে। জাপানে (১০ম শ্রীঃ) বাঙলা অঙ্করে লেখা পুঁথি হরিউজী বৌদ্ধ মন্দিরে পাওয়া গিয়াছে। হুদুর মধ্য আমেরিকার মেক্সিকো প্রদেশে 'বাঙলো' ধরণের বাড়ি পাওয়া

গিয়াছে। চড়কগাছ, শিবলিঙ্গ প্রভৃতি পাওয়া গিয়াছে। সেখানেও মেয়েদের কপালে সিন্দুরবিন্দু দিতে দেখা গিয়াছে।—এ সমস্তই বাঙালীদের সেই সব দেশে উপনিবেশের নিদর্শন। বাঙালী ঐতিহাসিককে বিশেষভাবে এই সমস্ত আদি উপনিবেশিকের তথ্য অনুসন্ধানের তৎপর হইবার অনুরোধ জানাইতেছি।

পরিশেষে উড়িষ্যার সাম্প্রতিক ঐতিহাসিক (অধ্যাপক শ্রীমদ্রথনাথ দাস) মহাশয়ের নিকট উপকরণ ভাগের কতকংশের জন্ত আমি কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি। তিনি ভারতের এই প্রদেশের অন্ধকারাচ্ছন্ন ইতিহাসে বহু স্থানে আলোকপাত করিয়াছেন। সিংহলে গিয়া তিনি তাঁহার ইতিহাসের উপকরণ সংগ্রহ করিয়াছেন। বিলাতে বিশেষজ্ঞগণের নিকট তিনি তাঁহার সম্পাদিত ইতিহাস (Glimpses of Kalinga History) পাঠাইয়াছেন শুনিয়াছি। তাঁহার সঙ্গে কয়েক স্থানে আমাদের ভিন্ন মত হইলেও তাঁহার পরিচরমের বিশেষ প্রশংসা করিতেছি।

## কোরিয়ার যুদ্ধ

### ভাস্কর গুপ্ত

মাত্র অল্পকাল পূর্বে দক্ষিণ কোরিয়ার পার্লামেন্টে মার্কিন সেক্রেটারী অব স্টেট, মিঃ একসনের স্পেচিয়াল এ্যাসিস্ট্যান্ট জন ফষ্টার ডিউল্ফস বক্তৃতা প্রদানে বলেছিলেন : আপনারা নিঃসঙ্গ নন। আপনারা বোঝেনই নিঃসঙ্গ থাকবেন না, যতদিন আপনারা মানবের স্বাধীনতার প্রকৃষ্ট রূপ নির্ধারণে সাফল্যের সঙ্গে এগিয়ে যাবেন।

কিন্তু হায়! তিনি বোধহয় সেদিন জ্ঞানতে পারেন নি তাঁর কথাগুলি এত তাড়াতাড়ি কোথাও প্রতিক্রিয়ার রূপ নেবে। তিনি বোধহয় আজ শুধু মাত্র বিস্মিত হ'য়েছেন। কিন্তু বড় আঘাত লেগেছে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদে। সমগ্র হুদুর প্রাচ্যে এই আঘাতের প্রতিক্রিয়ার মার্কিন আধিপত্য আতঙ্কিত হতে পারে। মার্কিন স্টেট ডিপার্টমেন্টের কথা : It's almost as if they were invading a bit of America. হুদুর-প্রাচ্যে কোরিয়া আন্তর্জাতিক বৃহৎ শক্তিবর্গের কূটনৈতিক ক্ষমতা রক্ষার ক্ষেত্রে বিশেষ।

কোরিয়াকে জাপানের কবল-বৃত্ত করার পর যদি সেদিন রাশিয়া ও আমেরিকা তাদের নিজেদের ভবিষ্যৎ নির্ধারণের ভার তাদের হাতেই ছেড়ে দিতো তাহ'লে দুই কোটি কোরিয়া-অধিবাসী দেশ বিভাগের দুঃসহ বিষয়ের হাত থেকে রক্ষা পেতো। রাশিয়া ও আমেরিকা সেদিন তাদের অধিকার ত্যাগ করে নি। তারা কোরিয়া দুইভাগে ভাগ করে উত্তর ও দক্ষিণে দুটি রাষ্ট্রের প্রবর্তন করে। প্রত্যেক ভারতবাসী এই 'বিভাগ'-এর ব্যথা সহজেই অনুমান করতে পারে।—

যেন একটি মানুষকে কেটে দু'ভাগ করা হোলো—উত্তরে থাকলো শিল্প, দক্ষিণে কৃষি। দুই অংশে যে দুটি রাষ্ট্র গঠিত হোলো, তার একটি (উত্তরে) রাশিয়া প্রবর্তিত সমাজতন্ত্র, অপরটি (দক্ষিণে) মার্কিন প্রবর্তিত গণতন্ত্র। দুটি সম্পূর্ণ বিপরীত নীতির আশ্রয়-সীমার ভাগ হ'য়ে গেল একটি অখণ্ড দেশ, নির্বিরোধ একটি জাতি। আজ দুটি রাষ্ট্রে যে বিরোধের তীব্রতা প্রকাশিত হ'য়েছে তার আসল কারণ রয়েছে এই বণ্ডিত স্বার্থের অন্তরালে। দৃষ্টান্ত এটা দক্ষিণ ও উত্তর-কোরিয়ার যুদ্ধ হ'লেও বস্তুত যুদ্ধের উদ্যোক্তা একদিকে রাশিয়া, অপরদিকে আমেরিকা।

এর পূর্বে কোথাও কখনো রাশিয়া ও আমেরিকা প্রত্যক্ষভাবে পরস্পরের সঙ্গে বুলেট বিনিময় করে নি। একেজেরে এটা অনিবার্য হ'য়ে উঠেছে। শুধু তাই নয়, কোরিয়া যুদ্ধক্ষেত্রের প্রতিক্রিয়া জাপানকে বাতে স্পর্শ করতে না পারে তার জন্তও প্রস্তুতি চলেছে। জাপানের তটরেখায় আত্মরক্ষাব্যাহ রচনা করতে হয়েছে আমেরিকাকে। এই প্রয়োজন প্রতিফলিত হ'য়েছিলো গত বছর ১২ই সেপ্টেম্বর নিউ ইয়র্ক হেরল্ড ট্রিবিউন পত্রিকার : The strategic aim of United States is to turn Japan into a great Anti-Communist bastion in the pacific. বহুদিনের ঠাণ্ডা যুদ্ধ আজ উত্তপ্ত আকার ধারণ করেছে—বিস্ময়ের কিছু নাই। কিন্তু প্রশ্ন এই—এই যুদ্ধের পরিণতি কি বিশ্বযুদ্ধে রূপান্তরিত হবে?

বৃষ্টিদর্শনিক বারট্রাও রশেল বলেন—“এসিয়ার রাশিয়া তার

অধিকার ত্যাগ করবে মনে হয় না। আমার বিশ্বাস, আমরা তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের আশমিক পর্যায়ে এসেই পড়েছি।”

লেকসাকসেসে নিরাপত্তা পরিবাদের সভায় সকলেই একবাক্যে একটি লক্ষ্যের কথা উচ্চারণ করে। তারা বলে : to get the measure of the conflict and devise means to end it. ওরা নিশ্চয়ই ঠাণ্ডা যুদ্ধ জ্বিইয়ে রাখবার কথা বলে নি। উপরন্তু তারা পরোক্ষভাবে স্বীকার ক’রে নিয়েছে হুদুর এ্যাচে আমেরিকার স্বার্থকে। সেই অনুযায়ী স্বত্তি-পরিষদে গৃহীত প্রস্তাবে সম্মতি ও আমেরিকার নেতৃত্বে পরিকল্পিত আক্রমণ প্রতিহত করার এচেষ্টায় তারা তাদের সাময়িক সাহায্যদানের সদিচ্ছা প্রকাশ করেছে। আজ কোরিয়ার আক্রমণ প্রতিহত কোরে কোরিয়াকে যদি কমুনিষ্টদের কবলমুক্ত করা যায়, তাহ’লে আমেরিকা পরবর্তী পর্যায়ে এশিয়া বাদ দিলেও অন্তত কমুনিষ্টদের অধিকার সহ্য করতে পারবে কি না, এই প্রশ্নের যথাযথ উত্তরের উপরই নির্ভর করছে—কোরিয়ার যুদ্ধ বিশ্বযুদ্ধে পরিণতি লাভ করবে কি না। কিন্তু আমেরিকার মনোভাব পরবর্তী পর্যায়ে কীভাবে স্থিতি লাভ করবে, কে জানে? আমেরিকার হাউস অফ্‌ ফরেন এ্যাফেয়ার্স কমিটির বৈঠকে কথা উঠেছিলো : We got a rattlesnake... The sooner we pound his head off the better. অনেকের আশঙ্কা, কোরিয়া যুদ্ধের প্রতিক্রিয়া সহজেই ইউরোপে জার্মানিতে প্রতিফলিত হ’তে পারে। একটা ঘটনার খুব মিল দেখতে পাওয়া যাচ্ছে জার্মানিতে ও কোরিয়াতে। কোরিয়ায় কমুনিষ্টরা দেশের স্বাধীন সরকার প্রতিষ্ঠার ঞ্জুহাতে প্রচার চালাচ্ছিলো যে You Americans, leave us in peace to hold our own elections and have a freely elected Government.

অনুরূপ জার্মানিতেও সম্প্রতি এই রকম ইলেকশনের প্রচার চলছে। তারা বলে : Tommy go home. Take Adenauer and Schumacher with you, Tommy go home. Leave us Germans in peace to hold our own elections and have a freely elected Government. জানিনা এর পরের অবস্থা কি। কোরিয়ার দেখা গেছে এই উদ্দেশ্যে তিনজন কমুনিষ্ট দক্ষিণ

কোরিয়ায় প্রবেশ করে এবং দক্ষিণ কোরিয়া সরকার তাদের প্রেষ্টার করলে সেখানকার কমুনিষ্টরা আন্দোলন শুরু করে, সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয় সীমারেখার সংঘর্ষ। যদি জার্মানিতেও অনুরূপ ঘটনার অবতারণা হয় তাহ’লে আমেরিকা ও তার সহযোগী অস্ত্রাস্ত্র জাতিসমূহ নিঃসন্দেহে কোরিয়াতেই যুদ্ধের পূর্ণচ্ছেদ টানতে পারবে না। ভুল থেকে গেছে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অন্তিম ভ্রমশূন্যে। তাই আজ আগুন ঠেলে বাইরে প্রকাশিত হ’য়ে পড়েছে। তখন যুদ্ধরাস্তা বিজয়ী শক্তিবর্গ বিধে শান্তি প্রতিষ্ঠার নামে নিজদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় সচেষ্ট হ’য়েই উঠেছিলো বেশী। একটা অঞ্চল দেশকে সেই প্রয়োজনেই বিভক্ত করতে হ’য়েছে। বিশ্বায়ের কথা, সকলের সমবেত মিলিত প্রচেষ্টা এই অকৃত্রিম প্রয়োজনে সহযোগিতা করেছে। ইউ. এন. ও তারই প্রতীক হিসেবে কাজ করে এসেছে কোরিয়ায় যুদ্ধ ঘোষিত হবার পূর্বদিন পর্যন্ত। ইউ. এন. ও-র বিরুদ্ধে এ অভিযোগ মিথ্যা নয়। ইউ. এন. ও তাই অস্ত্র-শস্ত্র সৈন্য সম্ভারে ছুটে গেছে কোরিয়ায়, অধূর ভবিষ্যতে হয়তো তাকে ছুটে বেড়াতে হবে সমগ্র বিশ্বে।

ভারতও এযুদ্ধের প্রভাব এড়িয়ে যেতে পারবে না। অবশ্য ভারত সরকার তার নীতি ঘোষণা করেছেন—নিরপেক্ষ। আমার বিশ্বাস এটা অর্থহীন। কারণ যে নীতি যুদ্ধের প্রয়োজনের নীতি—সমগোষ্ঠীর, তার নিরপেক্ষতা শুধু ঘোষণার সীমাতেই টিকে থাকে। আজ যে যুদ্ধের প্রয়োজন হ’য়েছে সেটা কমুনিজম প্রতিরোধের জন্য। ভারত বরাবরই এই কমুনিজম প্রতিরোধের দৃঢ়তা প্রকাশ ক’রে এসেছে। কে জানে ভারতেও সিভিল-ওয়ার বাধিবে কি না। যুদ্ধ তো এই নীতি প্রতিষ্ঠারই ভয়াবহ অভিব্যক্তি। বারট্রাও রাসেলের কথা : On religious grounds alone, India would strongly oppose communism. মিঃ রাসেল ভারতের অন্তরের কথাই বলেছেন। এক্ষেত্রে ভারতের ঘোষিত নীতি ভারতের অন্তরকে বাদ দিয়ে চলতে পারে এ ধারণা করবার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ নাই। ঠিক ঐ কারণে ভারতের নিরপেক্ষতা ভারতীয়রা মেনে নেবে বিশ্বাস হয় না। অবশ্য ইতিহাসের গতি ইতিহাসেই তার প্রবাহ-শক্তি আহরণ করে। ভারত যাই ভাবুক, তার প্রভাবের বাইরে সে কিছুতেই যেতে পারবে না।

## চাহিদা

### শ্রীজ্যোতির্ময় সেনগুপ্ত

( ১ )

কলেজ-জীবনে বোড়শী ও হুন্দরী স্বপ্নার সাহিত্য পরিচয় হইবার সুযোগ হইয়াছিল। সে ছিল আর্টসের ছাত্রী, আমি বিজ্ঞানের। পরিচয়টা হইয়াছিল পার্কে।

পার্কে বসিয়া তাহার সহিত অনেক বিষয় আলোচনা

করিয়াছি। দেখিয়াছি, সে অগতের দুঃখে ভীষণ বিচলিত। সে বলিত, অগতের সব দুঃখ সহ্য করা যায়, কিন্তু শরীরের দুঃখ দেখাই বড় কষ্টকর। খাবার নাই তাই ক্রুদ্ধদেহ, বস্ত্র নাই তাই নগ্নদেহ এবং দেহের যন্ত্রের সামর্থ্য নাই তাই ক্রুদ্ধদেহ—এগুলি চোখে পড়িলে স্বপ্নার মুখ বেদনার মলিন



হইয়া বাইত। হঠাৎ আলোচনা করিতে করিতে এক সময়ে মুহূ হাসি হাসিয়া বলিত—“আমার অনেক টাকা থাকলে এদের খাওয়া, পরা ও চিকিৎসার একটা ব্যবস্থা করে যেতাম।”

স্বপ্নার হৃদয়ের এই বেদনা-কাতর ভাবটি আমার বড় ভাল লাগিত।

( ২ )

চাকরি-জীবনে স্বপ্নাকে বিবাহ করিবার সুযোগ হইয়াছিল। আমার চাকরি পাওয়ার জন্ত স্বপ্নাকে পঁচিশ বছর বয়স পর্যন্ত অপেক্ষা করিতে হইলেও বিবাহে আমরা সুখী হইয়াছি। আমার আয় বেশী নয়, কাজেই স্বপ্না অনেক টাকা পায় নাই। তবুও প্রথম পরিচয়ের পর দীর্ঘ নয় বৎসর কাটিয়া গেলেও আমাদের প্রেম ফিকা হয় নাই।

বিবাহের পরদিন অনেক রাতে চৈত্রের পূর্ণ চাঁদের আলোকে ছুঁজনে ছোট্ট বাগানে বেড়াইতেছি। অশ্রুতে প্রণয়কুঞ্জন চলিতেছে। সে ঘেন এক স্বপ্নাচ্ছন্ন মোগাবস্থা! কথা বলিতে বলিতে হঠাৎ সলজ্জ মুহূর্তে স্বপ্না বলিল—“টাকা থাকলে আজ কি করতাম আনো?”

—“কি?”

—“একটা প্রকাণ্ড ফুলের বাগান—ফুলে ফুলে ভরা। কৃষ্ণচূড়ার ডালে দুটো পাশাপাশি ফুলে-টাকা দোলনা।—তোমার দোলনা ফুলে যাচ্ছে উত্তরে, আমার যাচ্ছে দক্ষিণে, —মাঝখানে শুধু এক মুহূর্তের জন্ত তুমি আমি একত্র হচ্ছি। চৈত্রের হাওয়ায় উড়ে উড়ে আমার খোলা চুলের রাশি লাগছে তোমার গালে—তোমার স্বপ্ন সুগন্ধি উত্তরীয় উড়ে পড়ছে আমার চোখে-মুখে।—ঝর ঝর করে যাচ্ছে কৃষ্ণচূড়ার লাল পাপড়ি সেই দোলায় দোলায়—নির্বাক হাসিতে জ্যোৎস্নালোকে ছুঁজনে শুধু ফুলে চলছি নিশ্চল রাত্রিতে!”...

( ৩ )

ভালোবাসার জোয়ার কাটিয়া যাইবার পরে স্বপ্নাকে গৃহিণীরূপে পাওয়ার আমার সুযোগ হইয়াছিল। ( মানে, তার আগে আমরা কেউ মরিনি! ) ছোট্ট আমার ঘর; সে তাই নিয়াই আনন্দ করিয়া ফিরিত। এককোণে একটু লাউয়ের মাচান তোলা—বাগানটায় রকমারি ফুল লাগানো। চারদিক পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। ঘরের মেঝে স্বকবকে—দেয়ালে দাগ নেই।

রবিবার দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পরে খবরের কাগজ নিয়া ইজিচেয়ারে আরাম করিতেছি। স্বপ্না—মানে প্রৌঢ়া স্বপ্না—পান সাজিয়া নিজে খাইল ও আমাকে দিল। তারপর বেড়কভারে ফুল তুলিতে তুলিতে বলিল, —“টাকা থাকলে একটা ছোট্ট দোতলা বাড়ী করতাম। খাই বলো, একতলা বাড়ী কোনো কাজের নয়। গরমের দিনে দোতলার বারান্দা আর ছাদ—সত্যি চমৎকার!” তারপর একটু খামিয়া সলজ্জ হাসিয়া বলিল—“একটা রেডিও না হ’লে—খাই বলো, গ্রামোফোন আজকাল অচল।”

( ৪ )

বৃদ্ধা স্বপ্নার সঙ্গেও বাঁচিয়া থাকার সুযোগ হইয়াছিল। ভগবানের অসীম দয়া। ছুঁজনে গাঁয়ের শিব-মন্দিরে যাই। শিবরাত্রিতে সেখানে শিবপূজা করিয়া ইংরাজী-পড়া স্বপ্নার দুই চক্ষু সত্যিকার প্রশান্তিতে ভরিয়া যায়। রাস্তায় আসিতে আসিতে বলে—“টাকা থাকলে, সত্যি, সমস্ত তীর্থগুলো ছুঁজনে ঘুরে আসতুম।—এমন শান্তি আসে মনে!”

( ৫ )

জরাতুরা, গলিত-কেশ-চর্ম-দশনা স্বপ্নার সাথে আমি আজিও বাঁচিয়া আছি। স্বপ্নার গাঁটে গাঁটে বাতের প্রকোপ, বাম অঙ্গে সাময়িক অদাড়তা এবং মাঝে মাঝে স্তম্ভিত্রাশ হইতেছে। স্থানীয় ডাক্তার কবিরাজ দেখাইতে ভ্রট করি নাই। বিশেষ কিছু হয় না। তারিণী কবিরাজ বাহিরে আসিয়া বলিয়াই দিয়াছেন—“ব্যাধিটা বৃদ্ধ বয়সের—কাজেই কতটা আর হইবেক!”

ফিরিয়া স্বপ্নার শয্যা-পার্শ্বে আসিয়া বসি। বলি—“কেমন লাগছে আজ?”

পাশ ফিরিয়া বেদনা-বিকৃত মুখে স্বপ্না উত্তর দেয়—“আর কেমন!—এখন গেলে বাঁচি!...এদব হাতুড়ে ডাক্তার কবিরাজের কারবার!” তারপর খানিকক্ষণ খামিয়া বলে—“টাকা থাকলে কলকাতায় একবার বড় ডাক্তার দেখাতাম।”

টাকার অভাবে কলিকাতায় যাওয়া হয় নাই।

( ৬ )

দুই দিন পরে স্বপ্না পরলোকে যাত্রা করিয়া গিয়াছে। সেখানে টাকা আছে কিনা এবং অনেক টাকা থাকিলে কেহ কিছু করিতে চায় কিনা জানিবার সুযোগ নাই।

# রাশিফল

## জ্যোতি বাচস্পতি

### কর্কট রাশি

যদি কর্কট আপনার জন্ম-রাশি হয় অর্থাৎ চল্লিশে সময়ে আকাশে কর্কট নক্ষত্রপুঞ্জে ছিলেন সেই সময়ে যদি আপনার জন্ম হ'য়ে থাকে, তাহ'লে এই রকম ফল হবে—

### প্রকৃতি

আপনি ভাবপ্রবণ প্রকৃতির লোক। আপনার মধ্যে মনোবেগ খুব প্রবল। অধিকাংশ ক্ষেত্রে আপনি বুদ্ধি বিবেচনার চেয়ে আবেগের দ্বারা পরিচালিত হবেন বেশী।

আপনার মধ্যে সহানুভূতি প্রবল ব'লে, আপনি যেখানেই যান নিজেকে মানিয়ে নিতে পারবেন এবং সামাজিক ও সদালাপী ব'লে প্রশংসা পাবেন।

পারিবারিক আবেষ্টন ও পারিপার্শ্বিকের প্রভাব আপনার উপর খুব বেশী এবং অনেক সময় এই প্রভাব দিয়েই আপনার জীবনের গতি নিয়ন্ত্রিত হবে।

আপনার অরপশক্তি খুব প্রখর এবং অমুকরণ-স্পৃহাও আপনার মধ্যে যথেষ্ট আছে। অপরের ভাবধারা গ্রহণ ক'রে তাকে নিজের মত ক'রে নেওয়ার শক্তি আছে ব'লে অনেক সময় আপনি অপরের ভাব গ্রহণ ক'রে তা নিজের বলে প্রচার করতে পারেন। এক্ষেত্রে আপনার মধ্যে একটা আত্মপ্রত্যাহার ভাব লক্ষিত হওয়া সম্ভব।

অধিকাংশ ব্যাপারে আপনি যুক্তিতর্কের চেয়ে নিজের আবেগের দ্বারা পরিচালিত হবেন বেশী এবং প্রত্যেক বস্তুকে আপনার মনোভাবের অনুকূল যুক্তিতর্ক দিয়ে গ্রহণ বা বর্জন করতে চাইবেন। বাস্তব ক্ষেত্রে তার অসম্মতি আপনি দেবেও দেখতে চাইবেন না।

রোমাঞ্চিক ব্যাপারের দিকে আপনার একটা আকর্ষণ আছে এবং সাধারণতঃ আপনি কল্পনাশ্রিয় হবেন। অনেক সময় বাস্তব কার্যক্ষেত্রেও আপনি আপনার কাল্পনিক ধারণা নিয়ে কাজ করতে অগ্রসর হবেন, যাতে করে অনেক ক্ষেত্রেই আপনার কাজ ক্ষয়প্রযুক্ত হবে না।

আপনার মধ্যে সহানুভূতি প্রবল ব'লে অপরের সুখ-দুঃখ আপনি হৃদয় দিয়ে অনুভব করতে পারেন এবং সেইজন্য কারো উপর বিদ্বেষ প্রায়ই হারী হয় না; এমন কি খোর শত্রুকেও মার্জনা করতে আপনার আটকান না।

আপনার মধ্যে পরিবর্তনশ্রিয়তা যেমন আছে, পরিবার ও গৃহস্থালির দিকে তেমনি আকর্ষণও আছে। সেইজন্য আপনি যেমন ভ্রমণ বা

প্রবাস ভালবাসেন, তেমনি প্রবাসেও গৃহস্থ চান। এর আসল অর্থ হচ্ছে এই যে, আপনি সর্বত্র চান আপনার মনোভাবের অনুকূল পরিবেশ। প্রতিকূল ও সহানুভূতিশীল পারিপার্শ্বিক আপনার পক্ষে নিত্যন্ত গীড়াকর হ'য়ে ওঠে এবং সেখানে আপনি কোনমতেই স্থির থাকতে পারেন না।

একেবারে নিঃসঙ্গ অবস্থা আপনি মোটেই পছন্দ করেন না। সেইজন্য গৃহ হ'তে দূরে গেলেও আপনি নিজের চারপাশে একটা আত্মীয়তার গভী গ'ড়ে তুলতে চান। অপরের সঙ্গে ভাবের আদান প্রদান না হ'লে আপনার কোনমতেই সন্তুষ্টি আসে না। আপনার এই প্রকৃতির জন্ত আপনি প্রায়ই লোকশ্রিয় হ'য়ে থাকেন এবং জনসাধারণ প্রায়ই আপনার দিকে আকৃষ্ট হয়। আপনার এই সঙ্গশ্রিয়তার জন্ত, এমন কি আধ্যাত্মিক সাধনার ব্যাপারেও আপনি নির্জন সাধনের চেয়ে স্বজনসাধনের পক্ষপাতী হবেন এবং অনেকে একসঙ্গে মিলে উপাসনা, নানকীর্তন ইত্যাদি আপনার ভাল লাগবে বেশী।

কাব্য, কলা, সঙ্গীত, চিত্র, অভিনয় ইত্যাদির দিকে আপনার একটা সহজ আকর্ষণ আছে, কিন্তু সে ক্ষেত্রেও আপনি রোমাঞ্চিক ব্যাপারের দিকে আকৃষ্ট হবেন। এসব বিষয়ে আপনি আর্টের চেয়ে আপনার বৈচিত্র্য ও ভাবের প্রাবল্যই কামনা করবেন বেশী।

মোট কথা আপনার প্রকৃতির মূলসূত্র হচ্ছে ভাবপ্রবণতা। এই ভাবপ্রবণতা আপনার মধ্যে এত বেশী যে তার জন্ত আপনি যে কোন ত্যাগবীকার করতে পারবেন। যদি তা ঠিক পথে চালিত হয়, তাহ'লে একদিকে তা যেমন আপনাকে সুউচ্চ প্রতিষ্ঠা ও সম্মান দিতে পারে তেমনি বিপক্ষে গেলে আপনাকে দুর্নীতির নিম্নতম স্তরে নামিয়ে নিয়ে যেতে পারে। পারিবারিক ও সামাজিক আবেষ্টনের উপর আপনার ভবিষ্যৎ নির্ভর করবে খুব বেশী।

### অর্থভাগ্য

আর্থিক ব্যাপারে আপনি সাধারণতঃ হিসাবী ও সাবধানী লোক হবেন। অপব্যয় মোটে পছন্দ করবেন না এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে আয় ব্যয়ের খুঁটিনাটি হিসাবও রাখবেন। আপনার কাছে অর্থের বেশ একটা মূল্য আছে; তবুও এক এক সময় আবেগের দ্বারা পরিচালিত হয়ে সহসা এমন বহু ব্যয় করতে পারেন যার জন্ত পরে অজুতাপ করতে হবে। আর্থিক ব্যাপারে ও অর্থ উপার্জন সম্বন্ধে আপনার মাথায নানারূপ কল্পনা উপস্থিত হবে, কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই তা ঠিক কাজে পরিণত করা সম্ভব হবে না। প্রথম জীবনে আর্থিক ব্যাপারে

একটা বিয়সমূল অবস্থার মধ্য দিয়ে অগ্রসর হ'তে হবে। কোন কোন সময় বেহিসাবীভাবে অর্থনিয়োগ করে ক্ষতিগ্রস্তও হ'তে পারেন। চুনি কি প্রতারণার দ্বারা অর্থহানির আশঙ্কাও আছে।

### কর্মজীবন

কর্মজীবনে আপনাকে অনেক বাধাবিঘ্ন ও প্রতিদ্বন্দ্বিতার সম্মুখীন হ'তে হবে, কিন্তু ধীরভাবে অগ্রসর হ'তে পারলে আপনি তা অতিক্রম করে সাফল্য অর্জন করতে পারবেন। প্রথম বয়সে পারিবারিক বিপর্যয়ে আপনার উন্নতির কোন বিঘ্ন হ'তে পারে অথবা পারিবারিক ব্যর্থের জন্ত আপনার প্রকৃতির প্রতিকূল কাজে আত্মনিয়োগ করা প্রয়োজন হ'তে পারে। জীবনের শেষার্ধ্বে আপনার খ্যাতি ও সাফল্যের সম্ভাবনা আছে। কৃষিকর্ম, গৃহভূমি, পথ প্রকৃতি সংক্রান্ত কাজ এবং জলজ বা তরল পদার্থের কোন ব্যবসা আপনার প্রকৃতির অনুরূপ। শিল্প, কলা, সাহিত্য ইত্যাদির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট এবং জনসাধারণ সংশ্লিষ্ট সবরকম কাজে আপনি বেশ পটুত্বের পরিচয় দিতে পারবেন। জীবনের একেবারে শেষের দিকে সকল বিষয়-কর্ম পরিত্যাগ করে জনহিতকর কাজে অথবা আধ্যাত্মিকতার অমূল্যলনে আত্মনিয়োগ করতে পারেন।

### পারিবারিক

আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে আপনার বিশেষ অসন্তোষ থাকবে না বটে এবং কর্মক্ষেত্রে তাঁদের কাছ থেকে আপনি সাহায্যও পেতে পারেন, কিন্তু আত্মীয়স্বজনের জন্ত আপনাকে অনেক ব্যয় করতে হবে এবং পারিবারিক কারণে নিজের মনোমত কর্ম নির্বাচনে বিঘ্নও উপস্থিত হ'তে পারে। কোন কোন সময় পারিবারিক ব্যাপারের জন্ত আপনার কর্মহানি বা কর্মস্থানে কোনরূপ বিভ্রাট হওয়াও অসম্ভব নয়। আপনাকে মধ্যে মধ্যে পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন হ'য়ে থাকতে হবে এবং কোন সময়ে গৃহের থেকে বহু দূরে বা কোন দুর্গম স্থানে বাস করতে পারেন। কিন্তু দূরে থাকলেও পারিবারিক দায়িত্ব আপনাকে অমুসরণ করবে এবং আপনাকে পরিবার সম্বন্ধে কম-বেশী চিন্তাও করতে হবে।

স্নেহ শ্রীতির ব্যাপারে আপনার বিচিত্র অভিজ্ঞতা হবে। অনেক সময় অবস্থাগতিক আপনাকে বাধ্য হয়ে শ্রীতির পাত্র থেকে দূরে থাকতে হবে। আপনি স্বভাবতঃ স্নেহপরায়ণ হ'লেও, বিবেচনার অভাবে অনেক সময় এমন কাজ করতে পারেন যা শ্রীতির পাত্রের ভ্রূণ কষ্টের কারণ হ'য়ে দাঁড়াবে। সন্তানাদির ব্যাপারেও আপনার বিচিত্র অভিজ্ঞতা হবে। অকস্মাৎ সন্তানের সঙ্গে বিরোধ অথবা বিচ্ছেদ হওয়াও অসম্ভব নয়। শেষ বয়সে আপনি ইচ্ছা করে সন্তানাদির সংশ্রব থেকে দূরে থাকতে পারেন।

### বিবাহ

বিবাহ ও দাম্পত্য জীবন আপনার কর্মের উপর কম-বেশী প্রভাব স্থাপন করবে। আপনার বিবাহ ও দাম্পত্যজীবন সাধারণের

আলোচনার বিষয় হ'তে পারে, তা সে ভালর জন্তই হোক, আর মন্দ্রের জন্তই হোক। সাধারণতঃ আপনি শ্রীর প্রতি স্নেহশীল হবেন কিন্তু আপনার কর্মের জন্ত অনেক সময় তাঁর কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হ'য়ে থাকতে হবে। মোটের উপর আপনার শ্রী আপনার অমুগতই হবেন কিন্তু আপনার নিজের দোষে দাম্পত্যজীবনে অশান্তি সৃষ্টি হ'তে পারে। যাঁর জন্মমাস শ্রাবণ অগ্রহায়ণ মাঘ অথবা চৈত্র, কিম্বা যাঁর জন্মতিথি কৃষ্ণপক্ষের যষ্ঠী বা ত্রয়োদশী অথবা শুক্লপক্ষের চতুর্দশী বা পূর্ণিমা, এমন কারো সঙ্গে বিবাহ হ'লে আপনার দাম্পত্যজীবন বেশ সুখকর হবে।

### বন্ধুত্ব

আপনার পরিচিত পুং বিস্তৃত হবে এবং আপনার বহু বিস্তৃত অমুচর পরিচর থাকবে। আপনার অধীনস্থ ব্যক্তিদের মধ্যে আপনি অনেক ঘনিষ্ঠ বন্ধু পাবেন যাঁরা আপনার উন্নতির জন্ত যথেষ্ট চেষ্টা করবেন। বন্ধুর জন্ত কিন্তু আপনাকে কম-বেশী ঋণাটও ভোগ করতে হবে। বিশেষতঃ অধীনস্থ ব্যক্তির কোন রকম বিপদের জন্ত আপনার অনেক সময় অশান্তি বা দুঃখ উপস্থিত হবে। আপনার ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব হবে তাঁদের সঙ্গে যাঁদের জন্মমাস শ্রাবণ অগ্রহায়ণ অথবা চৈত্র এবং যাঁদের জন্মতিথি কৃষ্ণপক্ষের যষ্ঠী কি ত্রয়োদশী অথবা শুক্লপক্ষের চতুর্দশী বা পূর্ণিমা।

### স্বাস্থ্য

আপনার মধ্যে সংরক্ষণী শক্তি প্রবল, প্রতরাং আপনি চেষ্টা করলে আপনার স্বাস্থ্য ভাল রাখতে পারবেন। মধ্যে মধ্যে স্নেহাজনিত পীড়া বা উদর রোগের সম্ভাবনা হ'লেও আপনি নিজের ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগে রোগ দূর করতে পারবেন। আহার-বিহারে যত মিতাচার অবলম্বন করবেন আপনার স্বাস্থ্য তত ভাল থাকবে। মধ্যে মধ্যে উপবাস ও খাওয়ার মধ্যে তরল পদার্থের আধিক্য আপনার স্বাস্থ্যের পক্ষে অনুরূপ। জলাশয়ের নিকটে বাস, নিয়মিত শ্রম প্রভৃতিও আপনার স্বাস্থ্য-বৃদ্ধিতে সাহায্য করবে। অনেক সময় জল-চিকিৎসায়—আপনার নষ্ট স্বাস্থ্য ফিরিয়ে আনতে পারে। আপনাকে মনে রাখতে হবে যে জলই আপনার শ্রাণ।

### অত্যাশ্রয় ব্যাপার

আপনার বহু ভ্রমণ হবে। অনেক সময় কোন গোপনীয় ব্যাপারের সংশ্রবে আপনার ভ্রমণ হ'তে পারে। ভ্রমণের মধ্যে কোন দুর্গম প্রদেশে বা দূর বিদেশে আপনার জীবনও বিপন্ন হ'তে পারে, কিন্তু একটা অদৃষ্ট দৈবশক্তি আপনাকে রক্ষা ক'রে যাবে। দূর ভ্রমণে বা বিদেশে অকস্মাৎ কিছু প্রাপ্তি হওয়াও অসম্ভব নয়।

### স্মরণীয় ঘটনা

আপনার ৮, ২০, ৩২, ৪৪ এই সকল বর্ষে আপনার নিজের অথবা

পরিবারের মধ্যে কোন ছুটিনা ঘটতে পারে। ২, ৪, ১৪, ১৬, ২৬, ২৮, ৩৮, ৪০, ৫০ এই সকল বর্ষগুলিতে কোন আনন্দজনক অভিজ্ঞতা হ'তে পারে।

বর্ণ

আপনার শ্রীতি-প্রদ ও ভাগ্যবর্ধক বর্ণ হচ্ছে নীল। বিশেষতঃ ফিকে নীল, কিরোজা প্রভৃতি আপনার বিশেষ উপযোগী। দেহ-মনের অস্থায়ী অবস্থায় কিন্তু সবুজরঙের ব্যবহারে বেশী উপকার পাবেন। ঘোর লাল রঙ ব্যবহার না করাই ভাল।

রত্ন

আপনার ধারণের উপযোগী রত্ন নীলা, পাশা, কিরোজা পাথর (Turkuyge) প্রভৃতি।

যে সকল খ্যাতিমান ব্যক্তি এই রাশিতে জন্মেছেন তাঁদের জন-কয়েকের নাম—শ্রীখীরামচন্দ্র, মহাত্মা গান্ধী, লেনিন, ফন্ হিওনবার্গ, পণ্ডিত জগদ্রল্ল নোহর, এমারসন, জন্ রাবিন্স, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, অমৃতলাল বহু, ডক্টর ভাণ্ডারকর, শশধর তর্কচূড়ামণি প্রভৃতি।

## বঙ্গীয় সংস্কৃত শিক্ষা পরিষৎ

ডক্টর, শ্রীযতীন্দ্রবিমল চৌধুরী

বঙ্গীয় সরকার সংস্কৃত শিক্ষা সম্প্রসারণের নিমিত্ত যে পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন, তা' অল্প-বিস্তার সকলের সুবিদিত। কয়েক মাসের মধ্যে কলিকাতা রাজকীয় সংস্কৃত মহাবিদ্যালয়ে কয়েকজন নূতন অধ্যাপক নিযুক্ত এবং নবদ্বীপে একটি নূতন সংস্কৃত টোল সংস্থাপিত হয়েছে। ১০টি বড় টোলে মাসিক ৭৫ পঁচাত্তর টাকা এবং ৯০টি অষ্টাশ্র টোলে মাসিক ৫০ পঞ্চাশ টাকা হারে বৃত্তি প্রদান করা হয়েছে। এতদ্বিধা বাৎসরিক দশ হাজার টাকা যা' পূর্বে Imperial grant নামে চলতো—তাও এবার বৃত্তি হিসাবে ১২৫জন পণ্ডিতকে দেওয়া হয়েছে। পূর্বে পণ্ডিতমণ্ডলীকে যা' মাগ্গি-ভাতা দেওয়া হতো তার থেকে অনেক অধিকসংখ্যক পণ্ডিতমহাশয়দের মাগ্গি ভাতা দেওয়া হয়েছে। আশা করা যায় করপোরেশন এবং ডিস্ট্রিক্ট বোর্ড-সমূহও উত্তরোত্তর অধিকসংখ্যক পণ্ডিতকে সাহায্য প্রদান করবেন। সরকারের পরিকল্পনামুসারে কাঁথিতে সরকারী সংস্কৃত কলেজ স্থাপিত হলে এবং আঞ্জীবন সংস্কৃতসেবী পণ্ডিতধরদ্বারদের নিমিত্ত আঞ্জীবন-বৃত্তি গণ্ডিমেন্ট কর্তৃক প্রদত্ত হলে পণ্ডিতমণ্ডলীর ক্রেশের আরো লাঘব হবে সন্দেহ নাই। পশ্চিমবঙ্গীয় সরকারের আরো অভিমত এই যে, যদি অর্থের সংকুলান হয় প্রতি বৎসর আরো ১০টি অধিকসংখ্যক ছোট টোল এবং ২টি অধিকসংখ্যক বড় টোলে মাসিক যথাক্রমে ৫০ পঞ্চাশ টাকা ও ৭৫ পঁচাত্তর টাকা বৃত্তি প্রদান করবেন, সর্বসমেত ১৪০টি ছোট এবং ৩০টি বড় টোল বৃত্তি পেতে পারে। এই পরিকল্পনার সার্থকতা প্রার্থনা করি।

আজ পরীক্ষায় ভূগোল, ইতিহাস ও অঙ্ক এই বিষয়ত্রয়কে পাঠ্যতালিকার অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। আজ আর এই বিষয়ে কারো মতবৈধ নাই যে, পাঠ্যতালিকায় এই বিষয়সমূহের যত্নভূক্তি পণ্ডিতসমাজের প্রভূত কল্যাণপ্রসূ হবে। এই সমস্ত বিষয়ব্যপদেশে সংস্কৃতের সঙ্গে আধুনিক শিক্ষাপদ্ধতি এবং বর্তমান জগতের নিকটতর সম্পর্ক সুসংস্থাপিত হবে এবং উত্তর জীবনে আমাদের ছাত্রসমাজ এতে বিশেষ উপকৃত হবেন।

১৯৪৭ সালে বঙ্গীয় সংস্কৃত সমিতির সমাবর্তন অভিনাষণে আমি বলেছিলাম—‘আমাদের মূল লক্ষ্য বঙ্গীয় সংস্কৃত সমিতি ও সংস্কৃত কলেজের সমন্বয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন। বর্তমানে আমরা পরীক্ষা-গ্রহণ-সমিতিই মাত্র। কিন্তু আমরা চাই সংস্কৃত সাহিত্য, বিজ্ঞান, শিল্প প্রভৃতি বিষয়ে শিক্ষা বিভাগ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য পদ্ধতি অনুযায়ী ও তুলনামূলক প্রাচ্য গবেষণাদির সর্বস্বযোগসম্বলিত অপূর্ণ গবেষণা বিভাগ, গ্রন্থ প্রকাশক বিভাগ প্রভৃতি সম্বলিত একটি পূর্ণায়তন বিশ্ববিদ্যালয়।’

স্থগের বিষয় ১৯৪৮ সালের এপ্রিল মাসে বিচারপতি ডক্টর শ্রীবিজয়-কুমার মুখোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে নিম্নলিখিত হৃদীবৃন্দসহ—

(১) শ্রীমতুলচন্দ্র গুপ্ত, (২) ডক্টর শ্রীমুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, (৩) মহামহোপাধ্যায় শ্রীযোগেন্দ্রনাথ তর্ক সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ, (৪) মহামহোপাধ্যায় শ্রীদীভারাম শাস্ত্রী, (৫) মহামহোপাধ্যায় শ্রীকালীন্দ্র তর্কচাৰ্য্য, (৬) ডক্টর শ্রীমুপেন্দ্রকুমার দত্ত, (৭) ডক্টর শ্রীহৃদীকুমার দে, (৮) কবিরাজ শ্রীরামচন্দ্র মল্লিক, (৯) ডক্টর শ্রীমরেন্দ্রনাথ লাহা, (১০) পণ্ডিত শ্রীনারায়ণচন্দ্র স্মৃতিতীর্থ, (১১) ডক্টর শ্রীসত্যকড়ি মুখোপাধ্যায়, (১২) ডক্টর শ্রীস্নেহময় দত্ত, পশ্চিমবঙ্গের ডিরেক্টর অব পাব্লিক ইনস্ট্রাকশন্স, (১৩) শ্রীঅবিনাশচন্দ্র মজুমদার, (১৪) অধ্যক্ষ ডক্টর শ্রীযতীন্দ্রবিমল চৌধুরী, সম্পাদক—

যে সংস্কৃত বিভাগায়ন সমিতি গঠিত করেন, সে সমিতিও পাঁচ বৎসরের মধ্যে বঙ্গদেশে সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনই মৌলিক লক্ষ্য বলে ঘোষণা করেন।

এই সমিতির সদস্যবৃন্দের সর্বদলমতিক্রমে গৃহীত প্রস্তাবামুসারে ১৯৪৯ সালে পশ্চিমবঙ্গীয় সরকার বঙ্গীয়-সংস্কৃত-সমিতিতে বঙ্গীয় সংস্কৃত শিক্ষাপরিষৎ এই নূতন নামে অভিহিত করে বহুল সংস্কৃতায়ন কর্ম প্রচেষ্টার ত্রুটি হন। যদিও বঙ্গদেশের সমগ্র পণ্ডিতমণ্ডলী ও সংস্কৃতানুসারগিবৃন্দের লক্ষ্যভূত এই সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয় সংস্থাপনের দিক থেকে এটি যে অবশ্য স্তম্ভ হ'লো তদ্বিবির সন্দেহের অবকাশ নাই,

তথাপি অজ্ঞাপি আমরা পূর্বের মত পরীক্ষা গ্রহণ সমিতি এবং বর্তমান সরকারের নির্দেশ অনুসারে বৃত্তি বিতরণ সমিতি মাত্র। অবশ্য আমরা সর্ব্বথা এ আশা পোষণ করি যে, যে শিক্ষামন্ত্রী ও সভাপতি উক্ত বিজ্ঞানকুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রোৎসাহে অজ্ঞানদের মধ্যে বিশ্ববিজ্ঞান সংস্থাপনের হুচনা সম্ভবপর হয়েছে, তাদেরই সাহায্যবলে আমরা আমাদের অভীষ্টলাভে সমর্থ হব। এই উদ্দেশ্য সংসাধনের নিমিত্ত আমাদের মুখ্য প্রয়োজনাবলী এই—

১। একটি স্থায়ী নিজস্ব বাসভবন। বর্তমান কার্যালয়ের ভাড়টে গৃহীত প্রথমতঃ এত ক্ষত্রাকার যে তাতে আমাদের অভিলম্বিত কোন কাজই চলিতে পারে না। দ্বিতীয়তঃ এই গৃহীত বিপজ্জনক এলাকায় অবস্থিত। বিশেষতঃ পণ্ডিতমণ্ডলীর যাতায়াতের পক্ষে এ অঞ্চল বিশেষভাবে অসুবিধাজনক। সেজন্য অতি শীঘ্রই এ বাসভবন পরিবর্তন আবশ্যক।

২। একটি গবেষণা-বিভাগ সংস্থাপন।

৩। একটি গ্রন্থাগার সংস্থাপন। পূর্ববঙ্গাগত উদ্ভাস পণ্ডিত-মণ্ডলী যে সমস্ত অমূল্য পুঁথি ও গ্রন্থ নিয়ে এসেছেন, সেই সমুদয়ের সংরক্ষণ অত্যাৱশ্যক। বিশেষতঃ সরকারী বৃত্তি প্রদানপূর্বক যে ২২৫টি টোল পরিচালনা করা হচ্ছে এবং ডিস্ট্রিক্ট বোর্ড প্রভৃতি যে সমস্ত টোলের অর্থসাহায্যবিধানপূর্বক সহায়তা করছেন, বঙ্গীয় সরকারও মাগণী ভাতা প্রদানপূর্বক যে পাঁচশতাধিক টোলের সংরক্ষণে তৎপর হয়েছেন এই সমস্ত টোলের দরিত্র পণ্ডিতমণ্ডলীর সর্ববিধ পঠন পাঠনের সুযোগ-সুবিধা নিয়ন্ত্রণের নিমিত্ত সমিতির একটি কেন্দ্রীয় গ্রন্থালয় স্থাপন অচিরে প্রয়োজন। পণ্ডিতমণ্ডলী অশেষ দুঃখদারিত্য সত্ত্বেও যেসব গ্রন্থ বিরচিত করেছেন তৎসমূহের সংরক্ষণও এ গ্রন্থালয়ের অবশ্য লক্ষ্যভূত হবে।

৪। গ্রন্থ-প্রকাশ বিভাগ স্থাপন। ১৯৪৮ সালে উদ্ভাস পণ্ডিতগণ কতৃক রচিত, অনূদিত ও সম্পাদিত বহু মূল্যবান গ্রন্থ অপ্রকাশিত অবস্থায় আছে। ভদ্রভিন্ন আমাদের পরিষদের পরীক্ষার জন্ত নির্দিষ্ট পাঠ্যপুস্তকবলীর অধিকাংশই ছাপা নাই। এই জন্ত গ্রন্থপ্রকাশ বিভাগ স্থাপন অবিলম্বে অত্যাৱশ্যক। বলা বাহুল্য, এতে যে কেবল ছাত্র ও সংস্কৃতানুরাগিবৃন্দের উপকার সাধিত হইবে তা নয়, পরন্তু পরিষদের ভবিষ্যৎ আয়েরও একটি প্রকৃষ্ট পন্থা অবলম্বিত হবে নিঃসন্দেহ।

৫। পরিষদের মুখপত্ররূপে সংস্কৃত, হিন্দি, বাঙ্গালা ও ইংরাজী রচনাসংবলিত একটি গবেষণা পত্রিকা পরিচালনা। এই পত্রিকাই সমগ্র ভারতের সর্বত্র যত চতুষ্পাণী ও কেন্দ্র আছে সেইসব কেন্দ্রের ছাত্র অধ্যাপক ও হিতৈষিবৃন্দের মধ্যে একটি বিশিষ্ট সংযোগসূত্র সংস্থাপনের অসম্ভব উপায়। তদ্ব্যতীত, সমগ্র বিশ্বে সংস্কৃত জ্ঞান সম্প্রসারণের নিমিত্ত এ পত্রিকা পরিচালনা অত্যাৱশ্যক।

৬। বৃদ্ধ, অসমর্থ, অতিদুঃস্থ পণ্ডিতমণ্ডলীর নিমিত্ত একটি স্থায়ী সাহায্যভাণ্ডার সংস্থাপন। বিশেষতঃ ধারা সংস্কৃত বিদ্যালয়গুলোর নিমিত্ত প্রতিবৎসাঃ, অথচ বর্তমানে জীবিকাক্ষণের উপায়বিহীন, তাঁরা যাতে পরমুখাপেক্ষী না হয়ে সমস্যানে বাকী জীবন অতিবাহিত করতে পারেন তজ্জন্ত তাঁদের নিমিত্ত মাসিক বৃত্তি প্রদান অত্যাৱশ্যক।

৭। বিশিষ্ট বিশিষ্ট স্থানে সরকারী টোল স্থাপন। কাঁথিতে অচিরে সরকারের পরিচালিত টোল স্থাপন একান্ত বাঞ্ছনীয়।

৮। আয়ুর্কেন্দ্র, অর্থনীতি প্রভৃতি নূতন বিষয়সমূহের পরীক্ষা প্রচলন ব্যবস্থা, এবং ভূগোল, ইতিহাস, অঙ্ক, সংস্কৃত সাহিত্য ও সভ্যতার ইতিহাস বিরচনের ব্যবস্থা।

আকস্মিক বিপদে অভিজ্ঞত পূর্ববঙ্গ হইতে বিতাড়িত উদ্ভাস পণ্ডিতমণ্ডলীর দুঃখে আমরা গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করছি। তাঁদের এই বিপৎপাতে পরিষৎ কিছুতেই উদাসীন থাকতে পারে না। ১৯৪৮ সালের আগষ্ট মাসে তৎকালীন বঙ্গীয় সংস্কৃত সমিতির সম্পাদকের পরিকল্পনানুসারে পশ্চিমবঙ্গীয় সরকার উদ্ভাস পণ্ডিতগণের সাহায্যার্থ ত্রিশ হাজার টাকা তৎকালীন বঙ্গীয় সংস্কৃত এসোসিয়েশনের হস্তে প্রদানপূর্বক আমাদের সকলের কৃতজ্ঞতাপাত্র হয়েছেন। এই পরিকল্পনার একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য ছিল—পণ্ডিত মহাশয়দের সমস্যানে অর্থাক্ষণের ব্যবস্থা। অনুবাদ, পুঁথি নকল, প্রবন্ধ বিরচন, অভিধান সংকলন প্রভৃতি শ্রেয়ঃ কার্যের বিনিময়ে অর্থাক্ষণ তাঁরা করেছিলেন। এই ব্যবস্থানুসারে ১৬৫জন পণ্ডিত মাসিক ৯০ নব্বই টাকা পর্যন্ত আগষ্ট থেকে ডিসেম্বর অবধি সাহায্যলাভ করেছিলেন। দেশ বিদেশের পণ্ডিতমণ্ডলীও এই ব্যবস্থার প্রভুত প্রশংসা করেছিলেন। বর্তমানেও এরূপ ব্যবস্থার পুনঃপ্রবর্তন একান্ত আবশ্যক।

ভারতবর্ষের সর্বশ্রেষ্ঠ গৌরব সম্পদ সংস্কৃত। এই সংস্কৃতই ভারতবর্ষীয় সমস্ত ভাষার জননীরূপে সর্বজনবন্দ্য। এই সংস্কৃতেই ভারত-জননীর পূর্ণ রূপ প্রতিফলিত হয়েছে। সংস্কৃতানুগীলনে তাই ধারা দর্শন, তাঁদের আশ্রিত নিবেদন করি। সংস্কৃতের অশেষ দীপ্তি মনীষীবৃন্দের চিত্ত অমরজনপূর্বক অত্যাচ্ছ হিমাচল-গলে কিরীটদ্বারিতরূপে শোভা পাবে। শত শত প্রাজ্ঞ ও মনীষীগণের পদপ্রান্তে আজ আমি আমাদের পরম আশা ও আনন্দস্থল নবজাত এই সংস্কৃত শিক্ষাপরিষদের জন্ত তাঁদের অশেষ আশীর্বাদ ও শুভেচ্ছা প্রার্থনা করি।

হিংসায় উন্নত পৃথিবীতে ভারতবর্ষই দেখাবে মুক্তির পথ। ভারতবর্ষের শান্তি শান্তি, শ্রম ও বিশ্বমৈত্রীর অমৃতময়ী বাণী সমগ্র বিশ্বে আজ প্রচারিত হোক এবং তাঁর ধারক ও বাহক গীর্দাণবাণীর অশেষ মহিমা দিগ্দিগন্তে উদ্ভাসিত হোক।

“গায়ন্তি দেবাঃ কিল গীতকানি

ধন্যস্ত তে ভারতভূমিভাগে।

স্বর্গাপবর্গান্দমার্গভূতে

ভবন্তি ভূয়ঃ পুরুষাঃ স্বরত্নাঃ॥”

বিক্রপুরণ, ২১/১১/২১২৪

অর্থ্যাৎ “অন্ত সব দেশ ভোগভূমি, ভারতবর্ষ কর্মভূমি; তাই দেবতাদের মধ্যেও ভারতবর্ষের সম্পর্কে এই পৌরগীতি প্রচলিত আছে যে ভারতভূমি হচ্ছে স্বর্গ ও ধর্ম্যাদি অপবর্গলাভের মার্গবল্লপ। সেই ভারতভূমিতে ধারা জন্মগ্রহণ করেন তাঁরা দেবতার চেয়েও ধন্য।”

( পূর্বপ্রকাশিতের অন্তর্ভুক্তি )

রূসোর রাজনৈতিক মত তাঁহার Social Contractএ বিবৃত আছে। এই গ্রন্থে ভাবুকেরা বেশী নাই, যুক্তিতর্ক প্রচুর আছে। গ্রন্থের আরম্ভেই আছে “মানুষ জন্মিয়াছে স্বাধীন, কিন্তু সর্বত্রই সে অধীনতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ। একজন আপনাকে অস্ত্রের প্রভু বলিয়া মনে করে, কিন্তু বস্তুতঃ সে তাহাদিগের অপেক্ষাও অধিকতর পরাধীন।” স্বাধীনতাই দৃশ্যতঃ রূসোর চিন্তার লক্ষ্য হইলেও, সাম্যই তাঁহার নিকট অধিকতর মূল্যবান ছিল এবং স্বাধীনতার বিনিময়েও তিনি সাম্য-প্রতিষ্ঠার পক্ষপাতী ছিলেন।

গ্রন্থে প্রজাতন্ত্রের প্রশংসা আছে। কিন্তু প্রজাতন্ত্র বলিতে রূসো প্রাচীন গ্রাসের নগর রাষ্ট্রের মত ( City State ) ক্ষুদ্র রাষ্ট্রই বুঝিয়াছিলেন। এই সমস্ত ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের প্রত্যেক নাগরিকের পক্ষেই রাষ্ট্রশাসনের সহিত সংযুক্ত থাকি সম্ভবপর, কিন্তু বড় বড় রাষ্ট্রের অসংখ্য লোকের পক্ষে তাহা সম্ভবপর নহে। এই জন্য বড় বড় রাষ্ট্রের পক্ষে প্রজাতন্ত্র তাহার মতে উপযোগী নহে। বর্তমানে যাহাকে প্রজাতন্ত্র বলা হয়, রূসো সেই প্রতিনিধিমূলক শাসনকে ( Representative Government ) নির্বাচনমূলক অভিজাত তন্ত্র ( Elective aristocracy ) বলিয়াছেন। তাহার মতে ছোট ছোট রাষ্ট্রের পক্ষে “প্রজাতন্ত্র”ই ভাল; মধ্যম আকারের রাষ্ট্রের পক্ষে “অভিজাত তন্ত্র” এবং বৃহৎ রাষ্ট্রের পক্ষে রাজতন্ত্র উৎকৃষ্ট।

“নির্বাচনমূলক অভিজাত তন্ত্র”ই রূসোর মতে সর্বোৎকৃষ্ট। কিন্তু ইহা সকল দেশের উপযোগী নহে। যে দেশের জল বায়ু নাতিশীতোষ্ণ, যে দেশে প্রয়োজনের অতিরিক্ত জ্বা উৎপন্ন হয় না, এই শাসন কেবল সেই দেশেরই উপযোগী। কোন দেশের উৎপন্ন জ্বার পরিমাণ যদি প্রয়োজনের অতিরিক্ত হয়, তাহা হইলে তাহাদিগের অধিবাসিগণ বিলাসী হইয়া পড়ে। সমগ্র সমাজের মধ্যে বিলাসের প্রদার অপেক্ষা দেশের রাজ্যও তাহার সভাসদগণের মধ্যে তাহা সীমাবদ্ধ থাকাই মঙ্গলকর। এই মত অনুসারে পৃথিবীর বহু দেশই প্রজাতন্ত্র শাসনের উপযুক্ত নহে, যথেষ্টাচারী রাজশাসনই তাহাদের উপযোগী। ইহা সত্ত্বেও ফরাসী গণতান্ত্রিক যে এই গ্রন্থের প্রতি ভীষণ বিবেচন পোষণ করিতেন, তাহার কারণ ইহাতে প্রজাতন্ত্রের প্রশংসা ছিল এবং রাজাদিগের “ঈশ্বর দত্ত অধিকার” ( Divine Right of Kings ) ইহাতে স্পষ্টতঃ অস্বীকার করা না হইলেও, “চুক্তি” হইতে রাষ্ট্রশাসনের উৎপত্তি হইয়াছে, এই মত দ্বারা তাহা অস্বীকৃত হইয়াছে।

মানুষের যখন সৃষ্টি হইয়াছিল, তখন তাহার সমাজবদ্ধ হইয়া বাস

করিত না। প্রত্যেকেই স্বাধীন ছিল ও নিজের ইচ্ছানুসারে চলিত। কিন্তু কালক্রমে এইরূপে বিচ্ছিন্ন থাকি সম্ভব হইল না। পরস্পরে মারামারি কাটাকাটি না করিয়া পরস্পরের রক্ষার জন্য সম্মিলিত প্রচেষ্টার প্রয়োজন অনুভূত হইল। সকলের সম্মিলিত শক্তি দ্বারা প্রত্যেকের জীবন ও সম্পত্তি রক্ষা করিয়া ক্রমে প্রত্যেকের স্বাধীনতা রক্ষা করা যায়, ইহাই হইল তখনকার সমস্যা। “সামাজিক চুক্তি” দ্বারা এই সমস্যার সমাধান হইয়াছিল। এই চুক্তি অনুসারে প্রত্যেকের যাবতীয় অধিকারসহ আপনাকে সম্পূর্ণরূপে সমাজের নিকট সমর্পণ করিতে হয়; কোনও অধিকারই নিজের জন্য রাখিয়া দেওয়া চলে না। কিন্তু ইহাতে ব্যক্তির স্বাধীনতা রক্ষিত হইল কোথায়? ইহার উত্তরে রূসো বলিয়াছেন—“প্রত্যেকেই যদি সম্পূর্ণভাবে আপনাকে দান করে, তাহা হইলে সমাজের সকলের অবস্থাই সমান হইয়া যায়, সুতরাং এই অবস্থা কাহারও পক্ষে কষ্টকর করিয়া তুলিবার ইচ্ছা কাহারও মনে উদ্ভিত হয় না। যদি সম্পূর্ণরূপে আপনাকে দান না করিয়া প্রত্যেকে কতকগুলি অধিকার রাখিয়া দিত, তাহা হইলে ফল হইত এই যে রক্ষিত অধিকারসমূহ সম্বন্ধে বিবাদ উপস্থিত হইলে তাহার মীমাংসা করিবার কেহই থাকিত না। ইহার ফলে প্রত্যেকেই আপন ইচ্ছামত আপনার অধিকারের ব্যাখ্যা করিত; সমাজ-সংহতি বিনষ্ট হইয়া যাইত, নতুবা সমাজই যথেষ্টাচারী হইয়া পড়িত।” এই মতে প্রকৃত-পক্ষে ব্যক্তির কোনও অধিকারই থাকে না। সমস্ত অধিকারই রাষ্ট্রে সমর্পিত। অতএব রূসো বলিয়াছেন “যদিও সামাজিক চুক্তি দ্বারা প্রত্যেক ব্যক্তির উপর রাষ্ট্রকে পূর্ণ ক্ষমতাই প্রদত্ত হইয়াছে, তথাপি মানুষের স্বাভাবিক অধিকারও আছে। সার্বভৌম শক্তি অধীনস্থ লোকদিগকে রাষ্ট্রের পক্ষে অনাবশ্যক কোনও শৃঙ্খল দ্বারা বদ্ধ করিতে পারেন না। এরূপ করিবার ইচ্ছাই তাহার হইতে পারে না।” কিন্তু সার্বভৌম শক্তিই যখন সমাজের প্রয়োজনের বিচারকর্তা, তখন রাষ্ট্রের অত্যাচার ইহা দ্বারা প্রতিরুদ্ধ হইবার সম্ভাবনা কম।

Bertrand Russel এইভাবে সামাজিক চুক্তির ব্যাখ্যা করিয়াছেন : আমাদের প্রত্যেকে তাহার দেহ ও সমস্ত ক্ষমতা সর্বনিয়ন্তা ( General Will ) সাধারণ ইচ্ছার নিয়ন্ত্রণের অধীনে স্থাপিত করি; এবং আমাদের সম্মিলিত অবস্থায় প্রত্যেককে সমগ্রের অচ্ছেদ্য অংশ বলিয়া গ্রহণ করি।” এই সমঝি দ্বারা একটি নৈতিক সমঝি অঙ্গীর সৃষ্টি হয়। নিজের অবস্থায় এই অঙ্গিকে ‘রাষ্ট্র’ বলে; ক্রিয়মান অবস্থায় ইহার নাম Sovereign ( সর্বশক্তিমান ) এবং সদৃশ অঙ্গ সমঝির সম্পর্কে ইহার নাম শক্তি ( Power )। ‘সাধারণ ইচ্ছা’ বলিতে রূসো সমাজের



অন্তর্গত সকল ব্যক্তির স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ইচ্ছার সমষ্টি বোঝেন নাই, অথবা তাহাদের অধিকাংশের ইচ্ছা বোঝেন নাই, সকলের সমঝায়ে যে অঙ্গীরা উদ্ভব হয়, তাহার ইচ্ছাই বুঝিয়াছেন। হব্‌সের (Hobbs) মতে বহুর সমঝায়ে গঠিত সমাজ একটি পুরুষ (Person)। এই মত গ্রহণ করিলে পুরুষের সমস্ত বৈশিষ্ট্য এই অঙ্গীরা আছে। সুতরাং ইচ্ছাও আছে। কিন্তু সমঝায়ী পুরুষের এই ইচ্ছার নিদর্শন কি? সাধারণ ইচ্ছা সকল সময়েই জায়সস্ত এবং সাধারণের মঙ্গলদায়ক বলা হইয়াছে। কিন্তু “সাধারণ ইচ্ছা” ও “সকলের ইচ্ছা” এক পদার্থ নহে। প্রত্যেক ব্যক্তির রাজনৈতিক মত তাহার ব্যক্তিগত স্বার্থ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। কিন্তু প্রত্যেক “স্বার্থের”ই দুইটি অংশ আছে। একটি ব্যক্তিগত, দ্বিতীয়টি সকল ক্ষেত্রেই অভিন্ন। যদি ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির জন্য পরস্পরের মধ্যে কোনও চুক্তি না হয়, তাহা হইলে পরস্পর বিরুদ্ধ স্বার্থের কাটাকাটি হইয়া যাইবে, তাহাদের কিছুই অবশিষ্ট থাকিবে না; সকল ক্ষেত্রে অভিন্ন অংশই অবশিষ্ট থাকিবে, সেই অভিন্নাংশই “সাধারণ ইচ্ছা”। পৃথিবীর প্রত্যেক পরমাণু বিধের প্রত্যেক পরমাণুকে আকর্ষণ করে। আনাদের উপরস্থিত বায়ু আমাদেরকে উর্দ্ধ দিকে আকর্ষণ করে, পদতলস্থ মৃত্তিকা নিম্নদিকে আকর্ষণ করে। কিন্তু সেই সমস্ত বিভিন্ন “স্বার্থপর” আকর্ষণ কাটাকাটি হইয়া অকাঙ্ক্ষ্যকর হইয়া পড়ে; অবশিষ্ট বাহা থাকে, তাহা হইতে পৃথিবীর কেন্দ্রাভিমুখী আকর্ষণ উৎপন্ন হয়। পৃথিবীকে সমাজ বলিয়া গণ্য করিলে, তাহার কেন্দ্রাভিমুখী আকর্ষণকে তাহার সাধারণ ইচ্ছা বলা যায়। “সাধারণ ইচ্ছা সর্বদাই জায়সস্ত”—ইহার অর্থ এই যে—এই ইচ্ছা সকল ব্যক্তিগত স্বার্থের মধ্যে সামান্যের প্রতীক বলিয়া, ইহা দ্বারা সর্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে সমবেত স্বার্থসিদ্ধি সম্ভবপর হয়।

Sovereign-এর ইচ্ছাই “সাধারণ ইচ্ছা”। তাহা সকল সময়েই জায়সস্ত। প্রত্যেক নাগরিকের ইচ্ছা ইহার অন্তর্গত। কিন্তু সাধারণ ইচ্ছার বিরোধী তাহার ব্যক্তিগত ইচ্ছাও তাহার আছে। কেহ এই ব্যক্তিগত ইচ্ছার বশে যদি সাধারণ ইচ্ছার আদেশ পালন না করে, তাহা হইলে তাহাকে তাহা পালন করিতে বাধ্য করা প্রয়োজন। রুসো বলিয়াছেন এই বাধ্য করার অর্থ—তাহাকে “স্বাধীন” হইতে বাধ্য করা।

Bertrand Russel বলেন—“এই স্বাধীন হইতে বাধ্য করার অর্থ অত্যধিক পরিমাণে দার্শনিকতাজড়িত (very metaphysical) ! গ্যালিলিওর সময় কোপারনিকাসের মত সাধারণে গ্রহণ করে নাই। পৃথিবী যে সূর্যের চতুর্দিকে ভ্রমণ করে তাহা কেহ বিশ্বাস করিল না। তখন “সাধারণ ইচ্ছা” নিশ্চয়ই কোপারনিকাসের বিরোধী ছিল। Inquisition যখন গ্যালিলিওকে সেই মত প্রত্যাহার করিতে বলিল, তখন কি গ্যালিলিওকে স্বাধীন হইতে বাধ্য করা হইল? দুর্য্যোগ ব্যক্তিকে অপরাধের জন্য যখন কারাগারে আবদ্ধ করা হয়, তখন কি তাহাকে স্বাধীন হইতে বাধ্য করা হয়? রুসোর Romanticism দ্বারা অনুপ্রাণিত বারনগের রচিত Corsair এছে যে নৌ-দস্যু অতল নীল সমুদ্রের বক্ষে সমুদ্রেরই মত অসীম চিন্তা ও স্বাধীন জগৎ লইয়া বিচরণ

করিত, তাহাকে কারাগারে বন্দী করিয়া রাখিলে কি সে অধিকতর ‘স্বাধীন’ হইত? হেগেলও রুসোর মতই “স্বাধীনতা” শব্দের অপব্যবহার করিয়া রাষ্ট্রের আদেশ পালন করিবার অধিকারকেই স্বাধীনতা বলিয়াছেন।” এই সমালোচনা সঙ্গত বলিয়া মনে হয় না। ব্যক্তিগত স্বার্থের সংকীর্ণ গভী হইতে, স্বার্থপর ইচ্ছার আবিলতা হইতে মুক্ত হওয়াকেই রুসো স্বাধীনতা বলিয়াছেন। মজপ যখন পানাস্কির দাস হইয়া পড়ে, তখন বলপ্রয়োগ দ্বারাও তাহাকে সেই অভ্যাস হইতে মুক্ত করিলে, তাহাকে যে স্বাধীনতা লাভে সাহায্য করা হয়, তাহাতে সন্দেহ নাই।

ব্যক্তিগত সম্পত্তির উপর রুসোর আস্থা ছিল না। তিনি বলিয়াছেন, রাষ্ট্রের অন্তর্গত সকলের সম্পত্তির রাষ্ট্রই মালিক।

কিন্তু রাষ্ট্রীয় শাসনে ‘এই “সাধারণ ইচ্ছা” বাধ্যপ্রাপ্ত হয় কেন, ইহার উত্তরে রুসো রাষ্ট্রের অধীনস্থ বহু সমন্বিত মণ্ডলীর অস্তিত্বের উল্লেখ করিয়াছেন। এই সমস্ত মণ্ডলীরও স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র “সাধারণ ইচ্ছা” আছে, সেই ইচ্ছার সহিত সমগ্র সমাজের “সাধারণ ইচ্ছার” সংঘাত সম্ভবপর। এই সমস্ত নিম্নস্থ সাধারণ ইচ্ছার অস্তিত্ববশতঃ, যত লোক তত ভোট থাকে না, যত মণ্ডলী তত ভোট হইয়া দাঁড়ায়। সাধারণ ইচ্ছাকে রাষ্ট্রের শাসনে ব্যক্ত করিতে হইলে, রাষ্ট্রের মধ্যে অধীনস্থ মণ্ডলী গঠন নিষিদ্ধ করিতে হয় এবং প্রত্যেক নাগরিককে তাহার নিজের চিন্তা দ্বারা ইচ্ছা চালিত হইতে হয়। লাইকারগাস প্রতিষ্ঠিত শাসনতন্ত্রে তাহারই ব্যবস্থা ছিল। Machiavel এই মত পোষণ করিতেন বলিয়া রুসো লিপিয়াছেন।

এই মহের পরিণতি কোথায় বিবেচনা করিলে দেখা যাইবে, ইহাতে চার্লস, রাজনীতি, ট্রেড ইউনিয়ন, অথবা আর্থিক স্বার্থসমতাপ্রসূত কোনও দলেরই স্থান নাই। “সামগ্রিক রাষ্ট্রে” (Totalitarian State) স্পষ্টতঃই ইহার পরিণতি। সে রাষ্ট্রে ব্যক্তির কোনও ক্ষমতাই নাই। সর্ববিধ মণ্ডলী নিষিদ্ধ করা যে দুরূহ, তাহা হৃদয়ঙ্গম করিয়া রুসো লিখিয়াছেন, যে নিম্নস্থ মণ্ডলীগঠন নিষিদ্ধ করা সম্ভব না হয়, তাহা হইলে তাহাদের সংখ্যা যত অধিক হয়, ততই ভাল; বহুসংখ্যক মণ্ডলীর মধ্যে পরস্পরের বিরোধ বশতঃ তাহাদের কার্যকারিতার নাশ হইয়া যাইবে।

শাসনের বিষয় আলোচনা করিবার সময়, দেশের শাসন বিভাগ যে একটি স্বতন্ত্র স্বার্থ ও সাধারণ ইচ্ছাবিশিষ্ট মণ্ডলী, তাহা রুসো স্বীকার করিয়াছেন। বড় বড় রাষ্ট্রের শাসন বিভাগের ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের শাসন বিভাগ অপেক্ষা অধিকতর ক্ষমতালী হওয়া প্রয়োজন; কিন্তু এই বিভাগকে Sovereign দ্বারা সংবত করিবার প্রয়োজনও অধিক। শাসন বিভাগের প্রত্যেক কর্মচারীর তিনটি ইচ্ছা—নিজের ব্যক্তিগত, তাহার দলগত ও “সাধারণ” ইচ্ছা। ইহাদের মধ্যে বিরোধে রাষ্ট্রের সাধারণ ইচ্ছা সম্পূর্ণ কার্যকরী হইতে পারে না।” যখন কোনও লোক শাসকের পদে প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন তাহার সমস্ত পারিপার্শ্বিক অবস্থাই তাহার প্রজ্ঞা ও ধর্মজ্ঞান অপহরণের সহায়তা করে।” সুতরাং দেখা যাইতেছে

“সাধারণ ইচ্ছা সর্বসময়েই বিপুল ও অপরিবর্তনীয় হইলেও, তাহা দ্বারা অত্যাচারের প্রতিবিধান হয় না, সে সমস্তা অমীমাংসিতই রহিয়া যায়। বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে পরীক্ষা করিলে দেখা যায়, যে রাজনৈতিক সমস্যার সমাধানে রুসোর Social Contract বিশেষ কিছুই সাহায্য করে নাই।

রুসোর ধর্মমত তাহার Emile প্রবন্ধ Confession of a Savoyard Vicar শীর্ষক অধ্যায়ে বর্ণিত আছে। ঈশ্বরে তাহার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, কিন্তু এই বিশ্বাস বুদ্ধিগ্রাহ্য কোনও বুদ্ধির উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল না; হৃদয়ের অনুভূতি ছিল তাহার ভিত্তি। একবার কোনও মহিলাকে তিনি লিখিয়াছিলেন “কখনও কখনও নির্জন অধ্যয়ন কক্ষে অন্ধকারের মধ্যে, অথবা দিবালোকে হস্তদ্বারা চক্ষু আবৃত করিয়া আমার মনে হইয়াছে ঈশ্বর নাই; কিন্তু প্রভাতে যখন উদীয়মান সূর্য্য নয়নগোচর হইয়াছে, যখন তাহার আলোকে কুণ্ডলিকার আবরণ উন্মোচিত হইয়া প্রকৃতির দীপ্যমান বিচিত্র সৃষ্টি দৃষ্টিসমীপে আবির্ভূত হইয়াছে, তখনই আমার অন্তরের সমস্ত সন্দেহ নিরাকৃত হইয়াছে; আমার বিশ্বাস ফিরিয়া আসিয়াছে, আমার ভগবানকে পুনঃপ্রাপ্ত হইয়াছি। আমি তাহাকে শ্রদ্ধা করি, ভক্তি করি, তাহার সম্মুখে সঠাস্তে প্রণিপাত করি।” অল্প একজনকে লিখিয়াছিলেন “অল্প সত্যে যেমন, ঈশ্বরেও তেমনি আমার প্রবল বিশ্বাস আছে। কেননা আমার বিশ্বাস অথবা অবিশ্বাস আমার নিজের উপর নির্ভর করে না।” এক সময়ে এক ভোজে নিমন্ত্রিত ভ্রাতৃলোকদিগের মধ্যে কেহ ঈশ্বরের অস্তিত্বে সন্দেহ প্রকাশ করায় রুসো বিরক্ত হইয়া ভোজ্যপুত্র ত্যাগ করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন।

দার্শনিকদিগের যুক্তিতর্কে সন্দেহ অপগত না হইয়া বরং বুদ্ধিশ্রাণ্ড হয় দেখিয়া রুসো দার্শনিক আলোচনা বর্জন করিয়া অন্তরের আলোকের অনুসরণ করিয়াছিলেন। তিনি লিখিয়াছেন “আমি বুদ্ধিতে পারিলাম আমি আছি। আমার ইঞ্জিয়গণও আছে, বাহা দ্বারা আমি জ্ঞানলাভ করি। বাহিরের বাহা কিছু আমার ইঞ্জিয়ে আঘাত করে, তাহাকে আমি জড় বলি। দার্শনিকদিগের পরমার্থ ও প্রত্যক্ষ (Reality or appearance) সম্বন্ধীয় তর্ক-বিতর্কের কোনও মূল্য আমার নিকট নাই। আমি বিশ্বাস করি জ্ঞানবান শক্তিশালী কোনও ইচ্ছাপ্রতি কর্তৃক জগৎ শাসিত হয়। সেই শক্তিকে আমি দেখিতে পাই—“আমি অনুভব করি” বলিলেই ঠিক হয়। এই জগৎ কেহ সৃষ্টি করিয়াছে, অথবা চিরকাল বর্তমান আছে, একই অথবা বহু উৎস হইতে বাবতীয় কিছু জব্য উৎপন্ন হইয়াছে, তাহা আমি জানি না, জানিবার কোনও প্রয়োজনও আমার নাই। জড় সনাতনই হউক অথবা সৃষ্ট পদার্থ হউক, আদৌ ইহা সক্রিয় অথবা নিষ্ক্রিয় থাকিয়া থাকুক, সমগ্র জগৎ যে এক এবং একই বুদ্ধিমান পুরুষের অস্তিত্ব ঘোষণা করে, তাহা নিঃসন্দেহ। এই পুরুষকেই আমি ঈশ্বর বলি। তাহার ইচ্ছা আছে, তিনি সেই ইচ্ছা পূর্ণ করেন। তাহাতে করুণা আছে বলিয়াও আমি বিশ্বাস করি, করুণা তাহার বুদ্ধি-শক্তিও ইচ্ছার অবশ্যজ্ঞাবী বল। ইহা ভিন্ন তাহার সম্বন্ধে আমি কিছুই

জানি না। আমার ইঞ্জিয় ও বুদ্ধি উভয়ের নিকটই তিনি আপনাকে লুকায়িত রাখিয়াছেন। আমি বেশ জানি তিনি আছেন, তিনি স্বয়ং তাহাও জানি। আমার অস্তিত্ব তাহার উপর নির্ভর করে, আমার পরিজ্ঞাত প্রত্যেক জব্যই তাহার উপর নির্ভরশীল। সর্বত্র তাহার কার্যের মধ্যে আমি ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ করি, আমার অন্তরের মধ্যে তাহাকে অনুভব করি, আমার চতুর্দিকে তাহাকে দেখিতে পাই। কিন্তু যদি তাহার বিষয় চিন্তা করি, তিনি কোথায় আছেন অথবা তাহার স্বরূপ কি, যদি জানিতে চেষ্টা করি, তিনি অন্তর্হিত হন। আমার অশাস্ত চিন্ত তখন কিছুই দেখিতে পায় না।”

“প্রকৃতির মধ্যে সর্বত্র শৃঙ্খলা ও সামঞ্জস্য; কিন্তু মানব জাতির মধ্যে সর্বত্র বিশৃঙ্খলা। পৃথিবীর দিকে যখন দৃষ্টিপাত করি, তখনই “পাপ” (End) দৃষ্টিগোচর হয়।

“মানুষ স্বাধীন ইচ্ছামত কার্য্য করিতে সক্ষম। নিজের ইচ্ছানুসারে মানুষ কর্ম্ম করে; স্বাধীন ইচ্ছার বশে যাগ্ন করে, তাহা ঈশ্বরের নিয়ন্ত্রণের বহির্ভূত এবং তাহা ঈশ্বরে আরোপ করা যায় না। স্বাধীনতার অপব্যবহার করিয়া মানুষ অমঙ্গল সৃষ্টি করে, তাহা ঈশ্বরের ইচ্ছা-প্রত্ন নহে। ঈশ্বর মানুষকে পাপ করিতে বাধ্যও দেন না। ইহার কারণ এই হইতে পারে যে মানুষের মত ক্ষুদ্র জীব যে অমঙ্গলের সৃষ্টি করিতে সক্ষম, তাহার দৃষ্টিতে তাহা অতি সামান্য। ইহাও অসম্ভব নয় যে—এই অমঙ্গল রোধ করিতে হইলে ইহা অপেক্ষাও ক্ষুদ্রতর অমঙ্গল সৃষ্টি এবং মানুষের প্রকৃতি হীনতর করিতে হয়। পুণ্য ও পাপ, ভাল ও মন্দের মধ্যে মানুষ পুণ্যই বাছিয়া লইবে, পাপ বর্জন করিবে, এই অভিশ্রায়ে ঈশ্বর তাহাকে স্বাধীনতা দিয়াছেন। মানুষ যদি তাহার বৃত্তি সকলের উপযুক্ত ব্যবহার করে, তাহা হইলেই এই অভিশ্রায সিদ্ধ হয়। কিন্তু ঈশ্বর মানুষের ক্ষমতা এতই সীমাবদ্ধভাবে আবদ্ধ রাখিয়াছেন, যে স্বাধীনতার অপব্যবহার করিয়াও মানুষ প্রাকৃতিক শৃঙ্খলা বিপর্য্যস্ত করিতে পারে না। মানুষ যে পাপ করে, তাহার নিজের উপরই তাহার ফল উৎপন্ন হয়। জাগতিক শৃঙ্খলার উপর তাহার কোনও ক্রিয়া নাই।

আমাদের ক্ষমতার অপব্যবহারই আমাদের দুঃখের হেতু। প্রকৃতি হইতে যে সমস্ত অমঙ্গলের উদ্ভব হয়, আমাদের দোষেই আমাদেরিগকে তাহা ভোগ করিতে হয়। স্বর্গের ফল দুঃখকষ্ট হইতে মুক্ত হইবার উপায় মুহূর্ত্ত। প্রকৃতি কাহাকেও চিরকাল কষ্ট দিতে ইচ্ছা করে না।

অমঙ্গল-শ্রষ্টা অল্প কাহারও আমি অনুসন্ধান করি না, মানুষ নিজেই অমঙ্গলের শ্রষ্টা। জগতে সকলই মঙ্গলকর। অবিচার সেখানে নাই। সুবিচার ও মঙ্গল অবিচ্ছেদ্য সংসর্গে বদ্ধ। অসীম ক্ষমতা এবং বাবতীয় চেনন পদার্থের আত্মপ্রীতির অব্যভিচারী বল “কল্যাণ”। সর্বশক্তিমান তাহার সৃষ্ট পদার্থে অমুশ্রবিত। সৃষ্টি এবং পালন, শক্তির চিরন্তন কার্য্য। যাহার অস্তিত্ব নাই তাহার উপর শক্তির কোনও ক্রিয়া নাই। \* \* \* আপনায় ক্ষতি না করিয়া তিনি ধ্বংস অথবা ক্ষতি করিতে পারেন না। বাহা মঙ্গল, কেবল তাহা ইচ্ছা করাই তাহার পক্ষে সম্ভব। সর্বশক্তিমান বলিয়াই তিনি সর্ববয়স্কময় ও স্থায়বান।

তাহা না হইলে তাহার মধ্যে স্ব-বিরোধ উৎপন্ন হইত। যে শৃঙ্খলা-শ্রীতি হইতে শৃঙ্খলার সৃষ্টি হয় তাহাই মঙ্গল, যে শৃঙ্খলা-শ্রীতি দ্বারা শৃঙ্খলা প্রকৃষ্ট হয়—তাহাই স্থায় বিচার।

আত্মা যদি জড়পদার্থ না হয়, তাহা হইলে দেহের বিনাশের পরেও তাহার অস্তিত্ব থাকিবে অসম্ভব নয়। অস্তিত্ব যে থাকে, তাহার প্রমাণ এই যে পৃথিবীতে অধাশ্মিকের জয় ও ধার্মিকের প্রতি পীড়ন দৃষ্ট হয়। বিশ্বব্যাপী সামঞ্জস্যের মধ্যে এই বৈসাদৃশ্যের ব্যাখ্যা কোথায়? আমি বলিব জীবনের সমাপ্তিতেই সকল শেষ হয় না, সুতরাং যাহার যাহা প্রাণা, তাহা সে প্রাপ্ত হয়।” তবুও প্রশ্ন থাকিয়া যায়, ইঞ্জিয়-প্রাণ দেহের যখন বিনাশ হয়, তখন আত্মার কি হয়? যখন দেহ ও

আত্মার সংযোগ বিনষ্ট হয়, তখন একটির ধ্বংস হইলেও অস্ত্রের অস্তিত্ব থাকিবে সম্ভব। দেহ ও আত্মা স্বরূপে এতই বিভিন্ন, যে তাহাদের সংযোগ স্বভাবতঃই অস্থির। সংযোগ বিচ্ছিন্ন হইবার পরে আত্মার যে শক্তি নিষ্ক্রিয় দেহকে চালনা করিতে ব্যয়িত হইত, আত্মা তাহা পুনঃ প্রাপ্ত হয়। সুতরাং পরে আত্মার প্রকৃত জীবন আরম্ভ হয়। কিন্তু সেই জীবন কি অবিনশ্বর? তাহা আমি জানি না। সীমাবদ্ধ অসীমের ধারণা করিতে আমি অক্ষম।...কিন্তু ইহা জানি যে দেহের বিভিন্ন অংশ ব্যবহারে ক্ষয়-প্রাপ্ত হয় বলিয়াই দেহের বিনাশ হয়। কিন্তু চৈতন্যের এতাদৃশ বিনাশ সম্ভবপর নহে। এই অমুমান শাস্তিদায়ক। যখন ইহা অসঙ্গত নহে। তখন ইহা স্বীকার করায় ভয় কি। (ক্রমশঃ)

## আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ

অধ্যাপক শ্রীমণীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এ, বি-এল

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

পোর্টব্লেরার সহরটি কিম্বদন্তি, এই প্রশ্নের সংক্ষিপ্ত উত্তর দেওয়া যায় এই বলিয়া যে ইহা সমুদ্র মাধ্যমে অপেক্ষাকৃত উচ্চ কালিম্পং সহর। ইহার গাছপালা, ঘরবাড়ী, রাস্তাঘাট অধিকাংশই কালিম্পং সহরের স্থায়। কালিম্পং-এর প্রশস্ত ডাকবাংলোর স্থায় ইহার গেট হাউস, কালিম্পং সহরের বাজারের স্থায় ইহার বাজার, কালিম্পং-এর স্থায় ইহার অসংখ্য কাঠের বাড়ী। অধিকাংশ বাড়ীর ছাতই কাঠের, কতকগুলি সরকারী বাড়ীর ছাত করোগেট টিনের প্রস্তুত, উপরে লাল রঙ দেওয়া। এখানকার গাছপালা কালিম্পং-এরই মত, কালিম্পং-এর অসংখ্য পাইন গাছের পরিবর্তে এখানে অসংখ্য মারিকেল গাছ দেখা যায়। এখানকার পথ ও মাঠের উচ্চ-নীচতা কালিম্পং সহরের মতই। এখানকার চাষ-আবাদের জন্ত অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সোপানকৃষির (Terrace cultivation) যে ব্যবস্থা আছে, তাহা কালিম্পং-এর কৃষিক্ষেত্রের কথাই স্মরণ করাইয়া দেয়।

এই পোর্টব্লেরায়ই আন্দামানের একমাত্র সহর। পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে যে, ১৭৯০ খৃষ্টাব্দে Blair সাহেব এইখানেই জাহাজ হইতে অবতরণ করিয়াছিলেন। এইখানেই কুখ্যাত সেলুলার জেল গঠন করিয়া ইংরাজরাজ তাহাদের কয়েদী উপনিবেশ স্থাপন করেন। ১৯৪২ পর্যন্ত এই দ্বীপ ইংরাজের অধীনেই ছিল। ১৯৪২-এ দেখা যায় যে, এই পোর্টব্লেরায়কে কেন্দ্র করিয়া ১০০ বর্গ মাইল পরিমিত স্থানে লোকবসতি গড়িয়া উঠিয়াছিল। এই ১০০ বর্গমাইলের মধ্যে ৬০ খানি গ্রাম এবং পোর্টব্লেরার হইতে দক্ষিণ আন্দামানের নানা স্থানে ৭৫ মাইল পাকা রাস্তা তৈয়ারী হইয়াছিল। ১৯৪২ হইতে সাড়ে তিন বৎসরকাল আপানী অধিকারের সময় এবং পরেও বহু লোক উদ্ধার

হইয়া পলায়ন করে বা মারা যায়। ফলে পুরাতন ৬৩ খানি গ্রামের মধ্যে ২৫ খানি গ্রাম জনশূন্য হইয়া পড়ে। এদিকে আপানীরা যুদ্ধের জন্ত পোর্টব্লেরার সহর ও গ্রামগুলির উন্নতি সাধন করে। সহরের পাহাড়গুলিতে গভীর গর্ত করিয়া নিম্নে নানারূপ শুদাম এবং অস্ত্রাস্ত্র আশ্রয় স্থল প্রস্তুত করে। বর্তমানে সেগুলি সম্পূর্ণরূপে অগম্য হইয়া পড়িয়াছে। সমুদ্রের তীরে তীরে বড় বড় কংক্রিটের গিরাপদ আন্তানী করিয়া আপানীরা তাহার মধ্যে প্রকাণ্ড কামান স্থাপন করে। সমুদ্রের তীরবর্তী রাস্তার প্রত্যেক মোড়ে কংক্রিটের পিল্পবল ইত্যাদি আপানী কীর্তিগুলি এখনও সকলেই দেখিয়া থাকে। শুনিলাম একজন বড় মার্কিনী জেনারেল যুদ্ধের পর আন্দামান দেখিয়া বলিয়াছিলেন যে, ‘যুদ্ধ করিয়া এই দ্বীপ জয় করা অসম্ভব’ এত মন্থরভাবে ইহা সুরক্ষিত হইয়াছিল। আপানী আনোলে দক্ষিণ আন্দামানে আরও ৩০ মাইল পাকা রাস্তাও নির্মিত হয়। কাজেই পোর্টব্লেরার যে দেশের সহর, সেই দেশটির ২,১০০ বর্গমাইল এখনও বনজঙ্গল, কেবল ১০০ বর্গমাইল মাত্র লোকালয়, উহার মধ্যে ৪৮ খানি গ্রামে লোকবসতি আছে, ২৫ খানি লোকহীন পরিত্যক্ত গ্রাম, এবং ১০৫ মাইল ট্রাক রোড জাতীয় পাকারাস্তা, একটি বন্দর ও আপানীদের দ্বারা প্রস্তুত ও বর্তমানে পরিত্যক্ত একটি এরোড্রাম আছে। স্থপতিদের মতে এই বিমানক্ষেত্রে কার্যোপযোগী করিতে হইলে অন্ততঃ দুইগন্ড টাকা ইহার জন্ত সেরামতি খরচ করিতে হইবে। ১৯৪৭ সালে স্বাধীন হইবার সময় ভারত সরকার এইরূপ আন্দামানকেই পাইয়াছিলেন।

পোর্টব্লেরার সহরে একটি হাই ইংলিশ স্কুল আছে, ইহা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারা অনুমোদিত। এখানে বর্তমানে ম্যাট্রিকুলেশন পর্যন্ত পড়া হয়, ইন্টারমিডিয়েট পড়িবার আরোজন সম্প্রতি করা হইতেছে। গত বৎসর ১৫ জন ছাত্র ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিয়াছিল

তদ্ব্যতী ৭ জন মাত্র উত্তীর্ণ হইয়াছে। এ ছাড়া আন্দামানের গ্রামগুলিতে সর্বসমেত ১৪টি নিয় ও উচ্চ আইমারী স্কুল আছে। হাইস্কুলের পরিচালন করেন High School Managing Committee এবং আইমারী স্কুলগুলি পরিচালিত হয় The Education Advisory Committee র দ্বারা। আইমারী স্কুলগুলিতে সর্বসমেত প্রায় বারশত ছাত্র শিক্ষালাভ করিতেছে। পোর্টব্লোর সহরে একটি ভালো টকী সিনেমা আছে। সিনেমায় মধ্যে মধ্যে বাংলা ও ইংরাজী ছবিও দেখান হইয়া থাকে, তবে হিন্দী ছবিই অধিক হইয়া থাকে। এখানকার হাসপাতালটি সুসজ্জিত এবং হাসপাতালে উপযুক্ত চিকিৎসকও আছেন অনেক। এখানে কোন ডাক্তারকেই আইডেট প্র্যাকটিস করিতে দেওয়া হয় না। যে কোন অস্থলের জখম পোর্টব্লোরবাসীকে হাসপাতালে খাইতেই হইবে এবং হাসপাতালই বিনাব্যয়ে ঔষধ দিবে, কাজেই এখানকার বাজারে ঔষধ বিক্রয় হয় না। সহরে টেলিফোন এবং ইলেকট্রিকের সুবন্দোবস্ত আছে। কংক্রিট ও পাঁচের চণ্ডা রাস্তা, রাস্তায় ইলেকট্রিক আলো, জলের কল, ম্যানিটারী পায়খানা, ঘরে ঘরে রেডিও, গ্রামোফোন ইত্যাদি যন্ত্রের এবং ভারতের নানা প্রদেশের নানাভাষার কণ্ঠ সঙ্গীত, স্বাস্থ্যবান সুবেশ নরনারী, সাইকেল, আরোহী তরুণ বালকবাল্য সমস্ত মিলিয়া এখানকার আবহাওয়া বড় মনোরম। পোর্টব্লোরবাসীর সাক্ষ্য-বিনোদনের জন্ত officer, local born, বাঙ্গালী ইত্যাদি বিভিন্ন শ্রেণীর জন্ত বিভিন্ন ক্লাব, বুদ্ধের ভ্রমণের জন্ত সমুদ্রতীরের নির্জন রাস্তা, খেলায়াড়দের জন্ত বিখ্যাত জমিখানা ক্লাব, শিকারীদের ছুটির দিনে শিকার করিবার জন্ত সহর হইতে পাঁচ-সাত-দশ মাইল দূরে হরিণের প্রাচুর্য এ সমস্তই আছে। জঙ্গলে সুবিধা এই যে, হিংস্র জন্ত একেবারেই নাই। সহরে আরও একটি প্রকাণ্ড সুবিধা, এখানে কোন সংবাদপত্র বা কোন রাজনৈতিক পার্টির অফিস নাই। মাইক্রোফোন সংযোগে কোন নেতা অথবা চিৎকার করিয়া এখানকার আবহাওয়াকে বিধ্বস্ত করিয়া তুলেন না, বা খবরের কাগজ পড়িয়া লোকে উত্তেজিত হইবার সুবিধাও পায় না। এখানে সরকারী ছাপাখানা হইতে একপানা মাত্র শিকি ফুলফ্যাপ সাইজের দৈনিক সরকারী সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়। উহাতে পি-টি-আই ও ইউ পির টেলিগ্রামগুলি এবং স্থানীয় সরকারী কোন সংবাদ থাকিলে মাত্র সেইটুকুই ছাপা হইয়া থাকে।

পোর্টব্লোরের সমস্তই হিসাব করিয়া সরকারী পরসার গঠিত বলিয়া এখানকার ধর্ম ব্যবস্থাও সেইরূপ নিক্তি মাপিয়া করা হইয়াছিল। পূর্বে বর্ণিত 'রস' দ্বীপের গির্জা ছিল বড় সাহেবদের নিজেদের জন্ত। সেই গির্জাটির কথা বাদ দিলে এখানকার অর্থাৎ পোর্টব্লোরের গির্জা ছোট এবং সামান্য। সেইরূপেই এখানে একটি কালীমন্দির, একটি মসজিদ, একটি শিখ মন্দির, একটি প্যাগোডা সরকারী অর্থে নির্মিত আছে। ইহার উপর মুসলমানদের অর্থে আরও দুইটি মসজিদ নির্মিত হইয়াছে, হিন্দুরা একটি গোবিন্দজীর মন্দির করিয়াছেন। এখানে হিন্দু মুসলমানের সম্পর্ক

আপাতঃ দৃষ্টিতে বন্ধুত্বপূর্ণ হইলেও যতটা দেখায় ততটা নয়। পূর্ববর্তী চীফ কমিশনার মিঃ মজিদ এখানে সাম্প্রদায়িকতার বৃক্ষে ভালোভাবেই জলসেচন করিয়াছিলেন এবং ভারত বিভক্ত হইবার পর হইতে যে দেড়-বৎসরকাল তিনি ভারত সরকারের অধীনে আন্দামানের চীফ কমিশনার রূপে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন, সেই সময়ের মধ্যেই তিনি ভারতসরকারের নিযুক্ত ও কলিকাতায় অবস্থিত মুসলমান Liason officer 'রিজুতি' সাহেবের সাহায্যে আন্দামানে বহু মুসলমান আমদানী করিয়া তলে তলে এরূপ অবস্থার সৃষ্টি করিয়াছিলেন যে, আরও কিছুদিন এইরূপে চলিলে আন্দামান মুসলমান-প্রধান দ্বীপে পরিণত হইত এবং একবার মুসলমান প্রধান হইয়া পড়িলে তখন এই হুম্মর শত্রুশালন এবং নৌ ও বিমান ঘাঁটা গঠনের পক্ষে বিশেষ উপযুক্ত দ্বীপটি যে কাশ্মীরের অবস্থা প্রাপ্ত হইত বা গোলাগুলি পাকিস্তানের অশ্রুভুক্ত হইতে পারিত, এই আশঙ্কা অনেককেই করেন। যাঙ্গা হটক বর্তমানে হিন্দু মুসলমানের বান্ধিক মিলন দেখা যায়। আমরা দেপিলাম হিন্দুর দুর্গোৎসব ব্যাপারে মুসলমানগণ-আনন্দ উৎসবে যোগদান করিবার জন্ত ব্যবস্থা করিতেছে। এখানকার ইঞ্জিনিয়ার ও সরকারী Harbour Master শ্রীমিহির সাম্যালের বাংলা সংলগ্ন ভূমিতে এখানকার সর্বজনীন দুর্গোৎসবের অনুষ্ঠান হয়। শুনিলাম যে, মুসলমানগণও এই উৎসবের আনন্দপূর্ণ হিন্দুর সহিত একত্রেই যোগদান করে।

পোর্টব্লোরের বাজার অঞ্চলটি সহরের মধ্যস্থলে অবস্থিত। বাজারে অনেকগুলি দোকান আছে। কাপড়ের ও দর্জির দোকান, জুতার দোকান, বাটা কোম্পানী, মনোহারী দোকান, রুটী, বিস্কুট, লজ্জেলুসের দোকান, মুদিখানা, সোডা লেমনেডের ছোট কারখানা, বরফ কল, নানা-বিধ মাস্তাজী খাবারের দোকান, ভাতের হোটেল, পান সিগারেটের ছোট ছোট দোকান, নারিকেল, কলা, পেঁপে ইত্যাদি স্থানীয় ফল এবং আঙ্গুর, কিসমিস, আপেল ইত্যাদি আমদানী-করা ফলের দোকান, ঘড়ি, ফাউন্টেন পেন, রেডিও, গ্রামোফোন প্রভৃতির দোকান ও মেয়ামতের কারবার অনেক গুলি আছে। যুদ্ধের সময় হইতে আটা, চাউল ও চিনির বরাদ্দ ব্যবস্থা বা রেশন কার্ডের বন্দোবস্ত চলিতেছে। রাস্তার উপর এই সমস্ত দোকান এবং এই দোকানগুলির পিছনে কাঁচা বাজারের দোকান। বাজার সকাল বিকাল সব সময়েই হয়। শাক, আগু, কপি, কুমড়া ইত্যাদি সমস্তই পাওয়া যায়, তবে আলু এখানে তেমন উৎপন্ন হয় না, অধিকাংশই কলিকাতা এবং মাস্তাজী হইতে চালান আসিয়া থাকে। ডিম, কাঁকড়া এবং মাংস সর্বদাই পাওয়া যায়, এ ছাড়া সমুদ্রের নানাজাতীয় মাছও আছে। ভোজনবিলাসিরা সকালে সমুদ্রের ধারে আসিয়া জেলেনের নিকট হইতে মাছ সংগ্রহ করেন, বাজারেও টাটকা এবং শুটকী মাছ বিক্রয় হয়। পোর্টব্লোরের মাত্র ৭২ জন রেজেন্ট্রীকৃত খীবার আছে, তবে এ ছাড়াও বহু লোকেই মাছ ধরে। পোর্টব্লোরের আর একটি জিনিষ দেখিলাম, উহার ইংরাজী নাম "edible bird's nest", অর্থাৎ ভোজন-যোগ্য পাখীর বাসা। উহার সম্বন্ধে বিশদ বিবরণ এই যে, একজাতীয় সামুদ্রিক পাখী আছে যাহারা সমুদ্রের জলের ধারে পাখরের মধ্যে কোন

গভীর গর্ত পাইলে উহার ভিতর নিজেদের বাসা বাঁধে। অজ্ঞাত পাখীর জায় উহারায় খড় কুট দিয়া বাসা বাঁধে না, পরন্তু উহাদের মূখ দিয়া এক প্রকার লাল নিহত হয়, সেই লাল দিয়া উহারায় বাসা নির্মাণ করে। সেই বাসার সন্ধান পাওয়া শক্ত, তবে ঐ পাখী কোথায় উড়িয়া যাইতেছে, সমুদ্রের জেলেডিসি হইতে জেলেরা তাহা লক্ষ্য করিয়া সেইখানে গিয়া পাখরের গর্ত হইতে ঐ বাসা ভাঙ্গিয়া লইয়া আসে। প্রথমতঃ ঐ প্রকার পাখীর বাসা সংখ্যার নিত্যন্ত কম হয় বলিয়া এবং বিপজ্জনক স্থান হইতে আনিতে হয় বলিয়াও ইহার মূল্য খুবই বেশী। এরূপ একটি গোটা বাসার মূল্য ৩০০, হইতে ৪০০, টাকার মত। ইহা রবারের জায় জমাট ও নরম, ইহাকে খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া ভরি' দরে বিক্রী করা হয়। এক তোলা ওজনের পাখীর বাসার দাম ৬, হইতে ১০, টাকা পর্যন্ত হইয়া থাকে। ইহা গরম মসলার জায় অতি সামান্য পরিমাণে তরকারীর সহিত দেওয়া হয়। ইহা মৃগনাভির জায় হৃগন্ধী ও তেজস্কর এবং যুরোপীয়দের ইহা অত্যন্ত প্রিয় খাদ্য।

পোর্টব্লেরারে অনেকগুলি বিখ্যাত ব্যবসায়ী আছেন। ইহাদের নাম না করিলে এখানকার বাজারের কথা শেব হয় না। তাহাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা ধনী B. Akooji & Sons। এই কারবারের ইতিহাস পূর্বেই বলা হইয়াছে। বর্তমানে ইহার নিজস্ব জাহাজ এবং সমগ্র কার-নিকোবরের নারিকেলের একচেটিয়া ব্যবসা আছে। দ্বিতীয় ব্যবসায়ী Krishnaswamis & Sons। এই কারবার পোর্টব্লেরারগামী সমস্ত জাহাজে জাহাজের প্রয়োজনীয় মাল সরবরাহ করিয়া থাকেন। এ ছাড়া Govinda Rajula & Co, Sukram & Co, Arungar & Co, Keshola & Co ইত্যাদি কতকগুলি বড় বড় বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান আছে। ইহারাই এখানকার আমদানী রপ্তানির বাণিজ্য করিয়া থাকেন। বর্তমানে ইহার কাপড়, চাউল, আটা, আলু, পিঁয়াজ ইত্যাদি আমদানী করেন এবং কাঠ, নারিকেল, কচ্ছপের খোলা, আহারযোগ্য পাখীর বাসা ইত্যাদি রপ্তানী করেন। (এখানে ১৯৪২এর হিসাব অমুমিত হয় যে, ঐ বৎসর প্রায় ১০০০ টন চাউল এখানে উৎপন্ন হইয়াছিল এবং ১,৪৪০ টন চাউল ও ২০০ টন গম আমদানী হইয়াছিল।) পোর্টব্লেরার এই আমদানী রপ্তানী বাণিজ্য কলিকাতা ও মাদ্রাজের সহিত হইয়া থাকে। এখানকার শতকরা ৭৫ ভাগ আমদানী ও শতকরা ৯০ ভাগ রপ্তানী বাণিজ্য কলিকাতার সহিত এবং অবশিষ্ট বাণিজ্য মাদ্রাজের সহিত হইয়া থাকে। তবে এই সংখ্যাগুলি সমস্তই আনুমানিক, কারণ এই প্রসঙ্গে কোন নির্ভরযোগ্য হিসাব আন্দামানের সরকারী দপ্তরে পাওয়া যায় না। National Chamber of Commerce এর পক্ষ হইতে ঐহৃদীশ্বরজন বিশ্বাস মহাশয় আন্দামানের সংবাদ লইয়া ভারত সরকারকে যে রিপোর্ট দেন তাহার মধ্যে তিনি লিখিয়াছেন, "There is in particular no record showing the total value of exports and imports, from and to the islands, and the one fact that struck me

was the absence of any statistical literature maintained by the Administration"।

পোর্টব্লেরারের এবার্ডিনের বাজারের কিছু দূরে সেলুলার জেলের পথের ধারে এখানকার 'পাওয়ার হাউস'। পাওয়ার হাউসটি ছোট, এখানে তিনটি ডিজেল-চালিত এবং একটি পেট্রল-চালিত বিদ্যুৎ উৎপাদক জেনারেটর আছে। তিনটি ডিজলে যথাক্রমে ১০০, ৫০ এবং ৩৬ কিলোওয়াট এবং পেট্রলে ২৪ কিলোওয়াট বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদন করা হয়। সহরে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে মাত্র দুই ঘণ্টা অর্থাৎ সকাল ৮ হইতে ১০টা পর্যন্ত আলো জ্বলে না। শুধু আলো জ্বালিবার জন্ত ইলেকট্রিক লইলে বাড়ীতে মিটার থাকে না, এতি আলোর জন্ত মাসিক দু'টাকা করিয়া বিল দিতে হয়; কাজেই দিনে রাতে কেহই আলো নিভাইবার জন্ত তেমন ব্যস্ত হয় না। পোর্টব্লেরারে বৈদ্যুতিক শক্তি বৃদ্ধির জন্ত একটি পরিকল্পনা চলিতেছে। ঐ পরিকল্পনায় ৫৫০ কিলোওয়াট শক্তি উৎপাদন করিবার কথা আছে; ইহার জন্ত একটি বয়লারও বদান হইয়াছে। ঐ বয়লারের অভিনব ব্যবস্থা করা হইয়াছে যে, ইহাতে কয়লার পরিবর্তে করাত-গুড়া (Saw Dust) দিয়া কাজ চালানো হইবে। এখানকার করাত কল হইতে যে প্রচুর করাত গুড়া এতদিন নষ্ট হইত, সেই করাত-গুড়াগুলি এই ভাবে কাজে লাগাইবার ব্যবস্থা হইতেছে।

পোর্টব্লেরার সহরে তিনটি ছোট কারখানা আছে। একটি সরকারী বনবিভাগের অধীনে Saw mill বা করাত কল। ইহা 'চাখাম' ঘোপে জাহাজ ঘাটের পার্শ্বেই অবস্থিত। এই কারখানায় মাসিক ২,৪০০ টন পর্যন্ত কাট চেরাই হইতে পারে। আন্দামানের বনবিভাগ হইতে বর্তমানে মাসিক ৪,০০০ টন কাঠ কাটা হয়, তন্মধ্যে ২,৪০০ টন কাঠ 'চাখামে' চেরাই হইয়া রপ্তানী হয়, বাকী ১৬০০।১৪০০ টন কাঠ দেশলাই তৈরীর জন্ত Wimco Match Factory ক্রয় করে এবং ২০০।৩০০ টন শিমূল জাতীয় কাঠ ভ্যানেস্তা (Plywood) করিবার জন্ত চালান হইয়া যায়। কাঠের ব্যবসাই আন্দামানের প্রধান কাজ এবং সেই জন্ত সমগ্র আন্দামানই সরকারী বনবিভাগের অধীনস্থ করিয়া এখনও পর্যন্ত রাখা আছে।

দ্বিতীয় কারখানা, Wimco Match Factory। ইহা Aberdeen-এ অবস্থিত। এই প্রতিষ্ঠানটি ভারতে অবস্থিত হইলেও মূলধন এবং পরিচালনায় ইহা একরূপ বিদেশী। এই West India Match Company সরকারী বনবিভাগ হইতে পূর্বোক্তমিত ১০০০, ১৪০০ টন নরম কাঠ কিনিয়া দেশলাইয়ের কাঠি ও বাজ তৈয়ারী করিয়া ভারতবর্ষে চালান দেয়। বর্তমানে পাকিস্তান ভাগ হইয়া বাওয়ার পর ভ্যানেস্তা ও দেশলাইয়ের উপযুক্ত নরম কাঠের (soft wood) বিশেষ অভাব হইয়া পড়িতেছে। এইরূপ কাঠ পূর্বে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যাইত চট্টগ্রাম, সিরাজগঞ্জ, আদাম ও আন্দামান হইতে। বর্তমানে প্রথম দুইটি স্থান হইতে কাঠ পাওয়ার উপায় নাই, সেইজন্ত আদাম ও আন্দামানের উপরই বিশেষ করিয়া নির্ভর করিতে হইতেছে।

তৃতীয় কারখানা, সরকারী ডক্‌ইয়ার্ড ও মোটর মেরামতির প্রতিষ্ঠান। ইহা পোর্টরোয়ারের Phoenix Bay নামক সমুদ্রকূলে অবস্থিত। এখানে নৌকা তৈয়ারী হয় এবং জাহাজের অল্প স্বল্প মেরামত এবং মোটর গাড়ী ইত্যাদির যাবতীয় মেরামত কার্য হইয়া থাকে। জাপানী অধিকারের সময় এই স্থানে ১০০ ফিট লম্বা ৮০ হইতে ১০০ টনের নৌকা ও ছোট ছোট ষ্টীমলাঞ্চ পর্যন্ত প্রস্তুত হইত। এখানে দুইটি ছোট ড্রাই ডকও আছে।

জেলখানা, হাসপাতাল, পুলিশ স্টেশন, সরকারী অফিস, কাছারী (কিছুদিন পূর্বে এখানে জজকোর্ট পর্যন্ত স্থাপিত হইয়াছে এবং ডহাকে কলিকাতা হাইকোর্টের অধীনস্থ করা হইয়াছে) জাহাজী অফিস, বনবিভাগ ও পূর্ববিভাগের অফিস, পোষ্ট অফিস ও টেলিগ্রাম (পোর্টরোয়ারের টেলিগ্রামগুলি সমস্তই কিনাতারে পাঠানো হয়, মাদ্রাজ উহা গ্রহণ করিয়া টেলিগ্রাম রূপে যথাস্থানে প্রেরণ করে।) ছাড়া উপরোক্ত কয়েকটি মাত্র উল্লেখযোগ্য কর্ম প্রতিষ্ঠান বর্তমানে পোর্টরোয়ারে আছে। পোর্টরোয়ারে কুলি হইতে আরম্ভ করিয়া সর্বোচ্চ পদস্থ কর্মচারী পর্যন্ত লইয়া মোট প্রায় সাড়ে নয় হাজার ব্যক্তি নিযুক্ত আছেন। ভারতের সর্বপ্রদেশ হইতেই কর্মচারীবৃন্দ আসিয়াছেন, তবে কুলি মজুর অধিকাংশই ছোটনাগপুর হইতে আনীত। ইহার রাঁচীর অফিস হইতে সংগৃহীত হয় বলিয়া ‘রাঁচী-কুলি’ নামে অভিহিত। এই সমস্ত কুলিদের একবছরের চুক্তিতে চাকুরীতে বহাল করা হয়। পোদিন রাঁচীতে চাকুরীতে লওয়া হয় সেই দিন হইতে পুনরায় রাঁচীতে ফিরিয়া যাওয়ার দিন পর্যন্ত ইহার নিয়মিত বেতন পাইয়া থাকে। জাহাজে আসিবার ভাড়া এবং জাহাজের খাওয়ার ব্যয় সমস্তই সরকার বহন করিয়া থাকেন। আন্দামানে শ্রমিকের অভাবের জন্য এই ভাবে overseas চাকুরীর সুবিধা দিয়া ভারত হইতে শ্রমিক আমদানী করিতে হয়।

এখানে বর্তমানে শ্রমিকের মজুরীর হার এইরূপ :—

সাধারণ শ্রমিক মাসিক বেতন ১৬ + ২৫ টাকা মাগ্‌গীভাতা।  
জাহাজে মাল তোলা-নামানোর কার্যে নিযুক্ত শ্রমিক দৈনিক ২ টাকা + মধ্যাহ্নের আহার।

ঐ কাজে নিযুক্ত সর্দার (mate) দৈনিক ৩৭/০ + মধ্যাহ্নের আহার।  
জাহাজের ডকে নিযুক্ত শ্রমিকের সর্বনিম্ন দৈনিক বেতন ১০ + ২৫ টাকা মাসিক হিসাবে মাগ্‌গীভাতা।

ঐ সর্বোচ্চ দৈনিক বেতন ৮ + ২৫ টাকা মাসিক হিসাবে মাগ্‌গীভাতা।

বনবিভাগের শ্রমিকদের মাসিক বেতন ১৭ টাকা হইতে ৩০ টাকা + ২৫ টাকা মাসিক মাগ্‌গীভাতা + ৫ টাকা বনবাস ভাতা।

আন্দামানের শ্রমিকদের মধ্যে অধিকাংশই ভারতীয় শ্রমিক, কেবল ডকের কাজে নিযুক্ত শ্রমিকের প্রায় শতকরা ৯০ জন আন্দামানের Local Born হইতে সংগৃহীত। আন্দামানে একজনও বেকার নাই, উপরন্তু এখনও পর্যন্ত সেখানে বহু লোকের উপজীবিকার উপযুক্ত স্থান আছে।

এই সূত্রে উল্লেখ করা বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না যে, প্রতিমাসে এই দ্বীপ হইতে এখানকার কর্মচারী ও শ্রমিকগণ সরকারী ট্রেজারীর মাধ্যমে আড়াই লক্ষ টাকা ভারতে নিজেদের আত্মীয়বর্গের নিকট প্রেরণ করিয়া থাকেন।

এখানকার বাণিজ্য ও শিল্প সম্বন্ধে উল্লেখ করিবার সময় একটি বিষয় বিশেষ ভাবে স্মরণ করাইয়া দেওয়া প্রয়োজন যে, এখানে কোনও ব্যাঙ্কের শাখা বা কোন বীমা কোম্পানী আদৌ নাই। একমাত্র পোষ্ট অফিস সেভিংস ব্যাঙ্ক ছাড়া লোকের টাকা রাখিবার জন্য কোন স্থানই নাই। বীমা ও ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ীরা যদি এখানে কোন শাখা প্রতিষ্ঠান খোলেন, তাহা হইলে এখানকার অধিবাসী এবং যে-কোম্পানী এইরূপ শাখা খুলিবেন, তাহার উভয়েই লাভবান হইবেন সন্দেহ নাই।

(ক্রমশঃ)

## বাল্য-লীলা

### ত্রিবিধু সরস্বতী

ইন্দিরাসম স্তন্যরী সাজে নবীনা মাতার মুরতি ধরি  
ক্রন্দনরোল তুলিছে পুতনা আজো শত শিশু শোণিত হরি’।  
আজিও ভারতে তৃণাবর্তের দেখি প্রতিদিন ঘূর্ণীপাক  
উড়াইয়া দেয় সকল শান্তি রচিতা দারুণ দুর্বিপাক।  
বৎসের রূপে কংশের দূত আজিও কক্ষে হানিতে চায়,  
পাপ অঘাসুর পল্লী-বাগকে আপন কবলে টানিতে ধায়।

বকের কপট ছলনার জালে জড়াইয়া পড়ে আজিও লোক,  
বাড়াইয়া তোলে প্রতিটি দিবস মাহুঘের যত দুঃখশোক।  
তাবি তাই মনে শুনিতে পাইব আবার মধুর মুরলী গান,  
বৃন্দাবনের ধ্বংস সাধনে নিফল হবে এ অভিযান।  
ছল-খল-দল-দমন-কঠোর কুটিল মারণ মুরতি ধরি।  
জানি আমি জানি শুনিতেছি ধ্বনি আসিছে দর্পহরণ হরি।



# বিশ্বের বিখ্যাত পত্রাবলী

অধ্যাপক শ্রীমাখনলাল রায় চৌধুরী

দার্শনিক নিটশের পত্র সঙ্গীত-শাস্ত্রী ওয়গনারের নিকট

পত্রপরিচয় :

নবীন নিটশে, প্রবীণ ওয়গনার, দার্শনিক নিটশে, হুস্‌শ্রুটী ওয়গনার। নিটশের খ্যাতি তখনও জার্মান দেশে প্রথম প্রভাব রাগ রেখা। ওয়গনারের প্রতিভা তখন জার্মান সংস্কৃতি অমুপ্রাণিত। ওয়গনারকে জার্মান জাতির প্রতীক বলে সমস্ত দেশ তাঁকে শ্রদ্ধা নিবেদন করে কৃতার্থমন্ত। ত্রিশ বৎসর বয়সের পার্থক্য সত্ত্বেও নিটশে ওয়গনারের সঙ্গে ঐতিহ্যের বন্ধনে অমুরঞ্জিত। ওয়গনারের সঙ্গীতের জন্ত নিটশে শব্দ যোজনা করে শব্দ। একদা নিটশে নিবেদন করলেন, “সঙ্গীত বিরোগ দিলে মানুষের জীবন নিরর্থক। জার্মান জাতির জীবন ওয়গনারের সঙ্গীত মুখরিত।” নবীন দার্শনিকের স্তুতি প্রবীণ ওয়গনারের অহঙ্কারকে অত্যাঙ্গ করে তুলছে।

১৮৬৯ সাল। জার্মানজাতি অষ্ট্রিয়ার সাম্রাজ্যকে বিধ্বস্ত করেছে। ফরাসী সম্রাট তৃতীয় নেপোলিয়নের সঙ্গে আসন্ন যুদ্ধের জন্য জার্মান জাতি প্রস্তুত, জাতির প্রতি অঙ্গে অঙ্গে জীবনের অমুভূতি। নিটশে বাসল বিশ্ববিদ্যালয়ে শব্দশাস্ত্রের অধ্যাপক। ওয়গনার বাসলে হুস-শ্রুটিতে ধ্যানমগ্ন। ওয়গনারের গৃহে নিটশে ষষ্ঠমাসের অতিথি। ওয়গনার গুরু, নিটশে শিষ্য।

ওয়গনারের অমুপ্রেরণায় নিটশে “সঙ্গীতের প্রচ্ছদপটে বিরোগান্ত কাব্যের জন্ম” (Birth of Tragedy Out of Music) নামক গ্রন্থ রচনা আরম্ভ করলেন। এই রচনার আবেগে নিটশে তাঁর সর্বোত্তম দার্শনিক তথ্য আবিষ্কার করলেন। সে তথ্যের মূলবস্তু হল “আমি অমুভব করি যে, মানব জীবনের সর্বপ্রথম সাধনা ও সর্বোত্তম প্রেরণা কৃচ্ছ্রতম জীবন যাত্রার মধ্য দিয়ে বিকশিত হতে পারে না। সংগ্রামের অভিলাস, শান্তিলাভের অভিলাস, বিজয়ের অভিলাসের মধ্য দিয়েই মানুষের জীবনী শক্তি চরম প্রকাশ হবে।”

শিষ্য নিটশে ওয়গনারকে অভিনন্দন জানালেন, “আপনি দ্বিতীয় গ্রীক সঙ্গীত-বিশারদ এসকাইলাসের প্রতীক; আমি আপনাকে তুলনা করি ডায়োনিাসের সঙ্গে।” ওয়গনার এই স্তুতিকে ব্যক্তিগত উচ্ছ্বাস বলে গ্রহণ করেন নি বরং সমগ্রজাতির শ্রদ্ধাবলে গ্রহণ করলেন। নিটশে ছিলেন জার্মান জাতির মনোমন্ডিরের প্রবীণ-বাহক, ওয়গনার ছিলেন সেই মন্ডিরের দেবতা।

হঠাৎ একদিন ওয়গনারের সঙ্গীত আলোচনার অবকাশে নিটশে সমালোচনার পর্যায়ে উপনীত হলেন। শিষ্যের সমালোচনায় ওয়গনার ক্ষুব্ধ হলেন; তিনি চকিত হলেন। তিনি নিটশেকে করলেন পত্রাব্যাহত,

স্বকল্পিত জাতি দিলেন দেখিয়ে। বিচক্ষণ নিটশে দিলেন প্রত্যুত্তর। উত্তর প্রত্যুত্তরের পরিণতি হল দুই বছর বিচ্ছেদে।

নিটশে প্রচার করলেন, “প্রতি মানবসত্তার দুইটা রূপ আছে— পুং-রূপ ও স্ত্রী-রূপ। সঙ্গীত স্ত্রী রূপেরই বিকাশ। সঙ্গীতের মধ্যে রয়েছে মানব মনের ঔপন্যাসিক স্তরে অসংলগ্ন বাক্যবিশ্লেষণ, আদর্শগত মিথ্যার রূপান্তর, মানুষের বিবেকের লব্ধ প্রকাশ। আমি দেখেছি সঙ্গীত একটি বিরাট মানব মনকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে।”

রচনা, আলোচনা এবং সমালোচনা দুই বছর মধ্যে এমন বিচ্ছেদ সৃষ্টি করল, নিটশে ওয়গনারের সঙ্গে পথে সাক্ষাৎ হলে বাক্যালাপ পর্যন্ত করেন নি। কিন্তু রচনার মধ্য দিয়ে দুইজন মণিষীই পরস্পরকে আঘাত করে চলেছেন। ওয়গনার লিখলেন Parsifal দিলেন একেও নিটশেকে উপহার। নিটশে লিখলেন Human All-too-Human, পুস্তকের মধ্যে ছিল সঙ্গীত ও শিক্ষা সম্পর্কে তাঁর তীব্র মন্তব্য; এবং পরোক্ষে ছিল ওয়গনারের প্রতি আঘাত। নিটশে পুস্তকখানি ছদ্মনামে প্রকাশ করবেন বলে স্থির করলেন, কারণ হয়ত ওয়গনার-পন্থীগণ আঘাত পাবেন। নিটশের মন্তব্যে লিখিতদের অনেকেই ছিলেন নিটশের বন্ধু। নিটশে তাঁদের সঙ্গে বিরোধ ইচ্ছা করেন নি। কিন্তু ওয়গনারের নিকট পুস্তকের পিতৃহত্যা করার করে লিখলেন পত্র :—

পত্রাব্যাহত :—

আপনার নিকট আমি Human, All-too-Human, পুস্তকখানি পাঠিয়েছি। এর মধ্য দিয়ে আপনার ও আপনার সহধর্মিণীর নিকট এই পুস্তকের রচনার দায়িত্ব স্বীকার করছি, আমার মনের গোপন কথাগুলি প্রকাশ করলাম। আমার বিশ্বাস আছে যে আপনার হৃদয়ই আমার বিশ্বাসের পূর্ণ মর্যাদা প্রকাশ করবেন। এই পুস্তক আমারই রচনা। এই পুস্তকের মধ্য দিয়ে আমি মানুষ ও বস্তুর বিষয়ে আমার গোপনতম ধারণাগুলি সর্বপ্রথম প্রকাশ করেছি, এর মধ্য দিয়ে আমি আমার চিন্তা রাজ্যের পরিধি পূর্ণ পরিক্রমণ করেছি। এই রচনা আমার প্রাপ্ত দুঃখের দিনে আমাকে প্রচুর সাহায্য করেছে; যখন পৃথিবীর সকল বস্তু আমার নিকট রসহীন, তখন এই রচনা আমার মধ্যে রসসঞ্চার করেছে। আমি যে এই রকম একখানি পুস্তক রচনা করতে পেরেছি, তাতে মনে হয় আমি এখনো জীবন্ত।

আমি করেকটা কারণে এই পুস্তক রচনার ছদ্মনাম গ্রহণ করেছি। প্রথমত: আমার পুরাতন রচনার প্রভাবকে আমি স্মরণ করতে ইচ্ছা করি না; দ্বিতীয়ত:, আমি প্রত্যেকে বা পরোক্ষে আমার ব্যক্তিগত

মর্যাদাকে ক্ষুণ্ণ করতে প্রত্যাশী নই; সর্বশেষে আমি ইচ্ছা করি যে, বৈজ্ঞানিক আলোচনার আমার বন্ধুবান্ধব সকলেই অংশ গ্রহণ করবেন। আমার নামে পুস্তক প্রকাশিত হলে অনেকেই অগ্রিম আলোচনা করতে সংকোচ বোধ করবেন। আমার নামে পুস্তক প্রকাশিত হলে অনেকে এই পুস্তকের আলোচনা থেকে দূরে সরে যাবেন।

আমি জানি, অন্তঃঃ একজন মনীষী আছেন যিনি আমার প্রকাশিত ধারণাগুলি যথার্থ বলে বিবেচনা করবেন, কিন্তু তিনি প্রকাশ্যভাবে এই ধারণাগুলির বিরুদ্ধতা করবেন।

আমি একজন আহত সৈনিক। বহু আঘাত সহ্য করেও আমি জীবনের পথে অগ্রসর হয়েছি। আমি পূর্বের শিকরে আরোহণ করেছি, নিশান উড়িয়েছি। আমার চতুর্পার্শ্বে নানা বীজৎস দৃষ্টি নিরীক্ষণ করছি, দুঃখের অভিজ্ঞতাই আমার অধিক। আনন্দ আমার জীবনে পরোক্ষ অভিজ্ঞতা।

আপনি জানেন যে, আমি কখনো ব্যক্তিগতভাবে চিন্তা করিনি, সমষ্টিগত চিন্তাই আমার প্রধান মূলধন। আমার সমাজ ও ব্যক্তি দুইই আমাকে সমভাবে আকর্ষণ করে। আমি হৃদয় পথ অতিক্রম করেছি—হু আমি নিতান্ত নিঃসঙ্গ, আমি পশ্চাতে লক্ষ্য করে দেখিনি আমার অনুগামী সহযাত্রী কত দূরে; তাঁরা যত কি জীবিত তাও দেখবার অবসর আমার ছিল না।

পত্র পরিণাম :—

এই পত্র ওয়াগনারের হস্ত স্পর্শ করেছিল কিনা সন্দেহ। পুস্তক-প্রকাশক বলেছিলেন যে নিটশের নাম উল্লেখ না থাকলে পুস্তক বিক্রয় হবে না, নিটশে পুস্তকের বহু অংশ পরিবর্তন করেছিলেন কারণ ওয়াগনার হয়ত আহত হবেন। পুস্তকখানি নিটশে বিনা ভূমিকাতেই ওয়াগনারের নিকট পাঠিয়েছিলেন। শুধু উপরে লিখেছিলেন :—

“আমাদের মধ্যে আর কোন বন্ধনই অবশিষ্ট নেই। আমরা সাগ্রহে পরস্পরের ভাবধারায় পরিপুষ্ট হয়েছি, যদিও অনেক সময় আমাদের চিন্তা সম্পূর্ণ বিরুদ্ধপন্থ্যের ছিল।”

কিন্তু অভিমাত্রী ওয়াগনার নিজের ধারণাকে কখনো নৈর্ব্যক্তিক বলে বিবেচনা করেন নি। তিনি দাবী করতেন অকুণ্ঠ অর্থ, নিরঙ্কুশ প্রশংসা এবং স্বাধীন আহুগত্যা। কিন্তু ওয়াগনার পুস্তক পাঠ করে দেখলেন—তার মধ্যে রয়েছে প্রাক্তন শিল্পের গুরুত্বোহ; না, না, আরো বেশী, প্রিয় শিল্পের প্রতিভার আঘাত। এই পুস্তক পাঠের পরে ওয়াগনার এমন আঘাত পেলেন যে নিটশের সঙ্গে আর পুনর্মিলনের কোন অবসর রইল না।

মৃত্যুর পূর্বেদিনে (১৯০০ খৃঃ) নিটশে তার গৃহ প্রাচীরে বিলম্বিত ওয়াগনারের তৈলচিত্র নিরীক্ষণ করে মূর্ছার আবেগে বলেছিলেন, “ঐ ঐ, আমি তাঁকে যে অত্যন্ত প্রজ্ঞা করতাম, অত্যন্ত ভাবাবাসতাম।”

## ব্যাসের সর্বস্ব

শ্রী অক্ষয়কুমার দত্তগুপ্ত এম-এ

ছাত্রাবস্থায় “শকুন্তলা” পাঠকালে অধ্যাপক মহাশয়ের মুখে প্রায়ই এই শ্লোকটি শুনিত পাইতাম—

কালিদাসস্ত সর্বস্বমভিজ্ঞান শকুন্তলম্।

তত্রাপি চ চতুর্থোহঙ্করস্ত সৌকচতুষ্টিয়ম্ ॥

কালিদাসের সর্বস্ব (অর্থ বোধ করি সর্বশ্রেষ্ঠ রচনা) হইতেছে “অভিজ্ঞান শকুন্তল” (অর্থাৎ শকুন্তলা নাটক), তার মধ্যে চতুর্থ অঙ্ক, তার মধ্যে চারিটি শ্লোক।

শকুন্তলার ঠিক কোন চারিটি শ্লোক কালিদাসের “সর্বস্ব” বলিয়া গণ্য হইবার যোগ্য এ প্রশ্ন অধ্যাপক মহাশয়কে যতবার জিজ্ঞাসা করিয়াছি ততবারই এক উত্তর পাইয়াছি, “ভাল, তোমরাই বল না কোন কোন চারিটি শ্লোক এবং বার বার মতের সমর্থনে একটি ছোট খাটো রচনা লিখিয়া আমাকে দেখাও।”

বহু বৎসর পরে আজ সেই কথাটা মনে পড়াতে ভাবিতেছি,

আচ্ছা, কালিদাস হইতে বহু গুণে বড় ও বরণ্য ব্যাসদেব-সম্পর্কে যদি ঐ রকম একটা প্রশ্ন করা যায়, তাহা হইলে তার কি উত্তর হইতে পারে? যদি জনশ্রুতি নিতান্ত অমূলক না হয় তাহা হইলে ব্যাসদেব—বেদব্যাস শুধু বেদবিভাগ করেন নাই, জগতের বিপুলতম গ্রন্থ “মহাভারত”, একখানি দুইখানি নয়, আঠারখানি পুরাণ, কয়েকখানি উপপুরাণ, ধর্মশাস্ত্র, বেদান্তদর্শন (ব্রহ্মসূত্র) ইত্যাদিও রচনা করিয়াছেন। এমন কি পতঞ্জলির যোগসূত্রের ভাঙও তাঁহারই রচিত বলিয়া প্রসিদ্ধ। এই গ্রন্থগুলির প্রত্যেকেরই মর্যাদা বিপুল হইলেও ইহাদের মধ্যে অবশ্যই ইতর-বিশেষ আছে। সেইজন্য কোনখানি তাঁহার শ্রেষ্ঠ রচনা এরূপ প্রশ্ন বোধ করি নিরর্থক নয়। এরাটি আমি সমুচিত বিনয়সহকারে পাঠকবর্গকে করিতেছি।

আমার জ্ঞান অতি সামান্ত; আমি সেই জ্ঞান হইতে কেবল পাঠকবর্গের কৌতুহল উদ্দীপিত করিবার জন্য কয়েক প্রকার উত্তর নিয়ে দিতেছি। প্রশ্নের সুপরিচিত ও জানপ্রদীপ্ত উত্তরের জন্য আমি

(এবং সম্ভবতঃ এই প্রবন্ধের অনেক পাঠকও) স্থায়ী ও স্থপতিত ব্যক্তিমণ্ডলের মুখের দিকে চাহিয়া থাকিব।

একটির প্রথম অনুসন্ধানের অতি সহজ উত্তর এই যে, অধিকার-বিশেষ ও রুচিভেদে অর্থাৎ যে যেমন অধিকারী—ও যার যেমন রুচি তদুপযোগী ও তদনুরূপ গ্রন্থই শ্রেষ্ঠ। এই মতের বিপক্ষে বক্তব্য এই, এরূপ উত্তরে একটিকে এড়াইয়া যাওয়া হয় মাত্র, উহার মীমাংসা কিছুই হয় না। অধিকার ও রুচিভেদে মতভেদ অনিবার্য এবং কোনও মতই নিতান্ত নিঃসার নর ইহা চিরকাল স্বীকৃত হইয়া থাকিলেও যে দর্শনশাস্ত্রসমূহের পরস্পরের মধ্যে, এমন কি এক বেদান্ত দর্শনেরই ভেত, অবৈত, বিশিষ্টাবৈত, বৈতাবৈত ইত্যাদি ভিন্ন ভিন্ন বাদের মধ্যে এবং শৈব, শাক্ত, বৈষ্ণবাদি বিভিন্ন সাধক-সম্প্রদায়ের পরস্পরের মধ্যে স্বমতের শ্রেষ্ঠতা ও অন্ত মতের হীনতা স্থাপনের চেষ্টাও চিরকালই হইয়া আসিতেছে এবং হইতে থাকিবে। ভিন্ন ভিন্ন বাদিগণ ব্যাসদেবের গ্রন্থাবলী সম্বন্ধীয় আমার একটির উত্তর দিন, 'এই আমার আর্থনা। উত্তর ভিন্ন ভিন্ন হইবে ইহা খুবই সম্ভব। প্রামাণিক ব্যক্তিবর্গের ভিন্ন ভিন্ন মীমাংসা দ্বারাও আমাদের মত সাধারণ জিজ্ঞাস্য উপকৃত হইবেন সম্ভব নাই।

এদের অন্তর্বিধ উত্তর মধ্যে গোড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মনীষীগণ বলিতে পারেন এবং কলতঃ বলিয়াছেনও—ব্যাসের কোন গ্রন্থ তাহার সর্ব্বমুখ তাহা তিনি নিজেই সেই গ্রন্থমধ্যে অতি স্পষ্টরূপেই বলিয়া দিয়াছেন। বেদবিভাগ ও নানা পুরাণ ধর্ম্মশাস্ত্র প্রবন্ধাদি রচনার পরও চিন্তাপ্রসাদ লাভ করিতে না পারিয়াই না দেবর্ষি নারদের উপদেশে ব্যাসদেব শ্রীমদ্ভাগবত রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন? সুতরাং শ্রীমদ্ভাগবতই যে ব্যাসকৃত সকল গ্রন্থের চূড়ামণিবরূপ সে বিষয়ে আর কি সন্দেহ থাকিতে পারে? ভাগবতকে বলা হইয়াছে নিগম কল্পতরুর কল—বাহা শুকমুখ হইতে অনুভববৃত্ত হইয়া পতিত হইয়াছে। যে লোক এই কথা বলা হইয়াছে তাহার ব্যাখ্যার শ্রীধরশাস্ত্রী বলিয়াছেন, ন কেবল সর্ব্বশাস্ত্রোক্তঃ শ্রেষ্ঠত্বাৎ অন্তপ্রবণং বিধীয়তে, অপিচ সর্ব্বশাস্ত্রকল্পগমিদম্ অতঃ পরমারমণে সেবিতব্যম্। কেবল সর্ব্বশাস্ত্র হইতে শ্রেষ্ঠ বলিয়া যে ভাগবত-প্রবণ বিহিত তাহাই 'নহে, ভাগবত হইতেছে সর্ব্বশাস্ত্রের কলস্বরূপ, অতএব পরমাদরে ইহা সেব্য। ভাগবতের শেষ স্বাক্ষর শেষ অধ্যায়েও 'সর্ব্ববেদান্তসারং হি শ্রীভাগবত-মিহ' ইত্যাদি নিজের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদক করেকটা শ্লোক আছে। সেই অন্ত এককালে গোড়ীয় সম্প্রদায়ের মুখ্য আচার্য্যগণ ভাগবত ভিন্ন অন্ত শাস্ত্রের চর্চা আবশ্যক মনে করিতেন না। শ্রীমদ্ জীবগোষ্ঠীর 'বট-সম্বর্ড'-নামক পরম পাণ্ডিত্যপূর্ণ গ্রন্থ ভাগবত অবলম্বনেই রচিত, ভাগবতে প্রতিপাদিত তত্ত্বাবলীর বিশেষণে ও আবশ্যক স্থলে অধরসাধনে নিযুক্ত। ইহারই এক সম্বর্ডে তিনি প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, পুরাণের স্থান বেদের উপরে এবং পুরাণসমূহের মধ্যে ভাগবতের স্থান সকলের উপরে। গোড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের উদ্ভবের পূর্বে অবৈতবাদী, বিশিষ্টাবৈতবাদী, বৈতবাদী ও অবৈতবাদী সম্প্রদায়গণ স্ব স্ব মত

স্থাপন অন্ত গ্রন্থানুসারের ব্যাখ্যা করিতেন অর্থাৎ প্রতিগ্রন্থানুসারে পণ উপনিষদের, স্ত্রীগ্রন্থানুসারে ব্রহ্মসূত্রের এবং স্মৃতিগ্রন্থানুসারে গীতার ভাষ্য করিয়াছিলেন। আদি গোড়ীয় আচার্য্যগণ অচিন্ত্যভেদভাববাদ নামে একটি বাদের প্রতিষ্ঠা করিলেও তদনুসারে গ্রন্থানুসারের ব্যাখ্যা অর্থাৎ ভাষ্য প্রণয়ন আবশ্যক মনে করেন নাই। ভাগবতই তাহাদের ছিল প্রথম ও শেষ সম্বল। কালে উত্তরকালে জয়পুরে রামানুজী সম্প্রদায়ের সহিত বাদে আহুত হইয়া তদানীন্তন শ্রেষ্ঠ গোড়ীয় মনীষী (অতি বুদ্ধ বলিয়া জয়পুর গমনে স্বয়ং অশক্ত) বিবনাথ চক্রবর্তীর প্রতিভাবান্ শিষ্য বলদেব বিভাভূষণকে কিঞ্চিৎ অপ্রতিভ হইতে হইয়াছিল। পরে তিনিই গোড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের ঐ অপূর্ণতা দূর করেন।

ভাল, যদি ভাগবত ব্যাসের সর্ব্বমুখ হয়, তাহা হইলে পরের গ্রন্থ হইতেছে উহার কোন অংশ শ্রেষ্ঠ। এ গ্রন্থের উত্তর বোধ করি গোড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের পক্ষ হইতে হইবে—দশম স্বাক্ষর রাস-পঞ্চাধ্যায়। কেননা উহাই তাহাদের পরম প্রিয় বলিয়া—পাঠ, কথকতা ইত্যাদিতে অধিক প্রচলিত। মহাপ্রভু রায় রামানন্দকে প্রমাণ করিলেন—

প্রবণ মধ্যে জীবের কোন শ্রেষ্ঠ প্রবণ?

রামানন্দ উত্তর দিলেন—

রাধা কৃষ্ণ প্রেম কেলি কর্ণ রসায়ন।

অবশ্য ভাগবতে রাধার উল্লেখ নাই; কিন্তু গোড়ীয় বৈষ্ণবগণ মনে করেন, ভাগবতের রাসলীলার বর্ণনায় তিনি অনতিপ্রচুরভাবেই আছেন।

রাস-পঞ্চাধ্যায়ের মধ্যে কোন কয়টি শ্লোক শ্রেষ্ঠ এ বিষয়ে আর আমি অনুমানের স্পর্ধা করিলাম না। বৈষ্ণবগণ বলুন।

আবার ভাগবতের সাররূপে তথাকথিত চতুঃশ্লোকী ভাগবতের মর্যাদা ও বৈষ্ণবগণের চক্ষে বড় কম নয়। স্বয়ং মহাপ্রভু প্রকাশানন্দের সহিত বিচারকালে উহার উল্লেখ করিয়াছিলেন বলিয়া অনেক বৈষ্ণব প্রত্যহ উহা পাঠ করেন। শ্লোক চারিটি এই :

অহমেবাসমেবাগ্রে নাস্তদ্বয়ং সদসংপরম্।

পশ্চাদহং য দেতচ্চ বোধযশিস্তেত সোহস্ম্যহম্।

স্বতেহং যৎ প্রতীয়েত ন প্রতীয়েত চান্মনি।

তদ্বিত্ত্বানাম্মনৌ সারাং যথাভাসো যথা তমঃ।

যথা মহান্তি ভূতানি ভূতেষু চাবচেযু।

প্রবিশ্যন্তপ্রবিশ্যন্তি তথা তেহ নতেমহম্।

এতাবদেব জিজ্ঞাস্তং তত্ত্ব জিজ্ঞাস্তবান্জনঃ।

অম্বয় ব্যতিরেকাভ্যাং যৎ স্ত্রাৎ সর্ব্বত্র সর্ব্বদা। (২।১।৩২-৩৫)

স্বষ্টির পূর্বে আমিই ছিলাম, হূল, স্তম্ভ ও তাহাদের কারণ যে প্রধান সে সমস্ত কিছুই ছিল না। আমিও তখন কেবল ছিলামই (কোনও ক্রিয়া ছিল না)। স্বষ্টির পরে আমিই আছি, এই যে বিশ্ব তাহাও আমি,

এলয়ে যাহা অবশিষ্ট থাকিবে তাহাও আমিই। বাস্তব বস্তু না থাকিলেও  
যা কিছু অধিষ্ঠান আশ্রয় প্রতীত হয়, আবার সত্য ইহাও যাহা  
প্রতীত হয় না, তাহাই আমার মায়ী বলিয়া জানিবে। দৃষ্টান্ত বধা  
দ্বিল্পে, যথা রাহ। যেমন মহাকৃতসকল ভৌতিক বস্তুসকলের মধ্যে  
সৃষ্টির পরে অবশিষ্টও বটে, অপ্রবিশিষ্টও বটে, সেইরূপ ভূত ভৌতিক সকলের  
মধ্যে আমি আছি, আবার নাইও। আত্মতত্ত্বজিজ্ঞাসু ব্যক্তির ইহাই  
বিচার্য্য কার্য্য সকলের মধ্যে কারণরূপে অনুবৃত্ত ইহা এবং কারণবহুয়  
যে সকল ইহাতে ব্যতিরিক্তরূপে সর্ব্বনা সর্ব্বত্র বা আছে তাহাই আত্ম।

এই চারিটি শ্লোক কিন্তু দশম স্বন্ধের অন্তর্গত নয়; দ্বিতীয় স্বন্ধের  
নবম অধ্যায়ের অন্তর্গত। আর ইহাও লক্ষ্য করিবার যোগ্য যে ইহাতে  
রাসলীলার বা রাগানুগী ভক্তির নাম গন্ধও নাই।

বস্তুতঃ রাস-পঞ্চাধ্যায় আদিরসপ্রধান বলিয়া কাবাংশে অত্যন্ত  
ইহলেও সাধারণের দিক দিয়া উহার উৎকর্ষ সর্ব্ববাদিসম্মত নহে (অবশ্য  
গৌড়ীয় বৈকব সম্প্রদায় ভিন্ন)। এই মতে আদিরসের পিচ্ছিলতা ধর্ম্ম-  
সাধকের পতনেই আনুফুল্য করে; শাস্ত্ররস নিরাপদ বলিয়া সর্বাধিক  
বরণ্য। এই দিক দিয়া দেখিলে জ্ঞান ও ভক্তি উভয় প্রধান বলিয়া  
তৃতীয় স্বন্ধের অন্তর্গত কপিল-দেবহুতি সংবাদ অনেকের অধিক প্রিয়।  
আবার ভাগবতের সমস্ত শিক্ষা নয়টি এসঙ্গে বিভক্ত করিয়া—একত্র  
পুনর্বিবৃত্ত করার একাদশ স্বন্ধের অন্তর্গত নিম্ন ও নবযোগীন্দ্র সংবাদও  
ভাগবতের সারাসংশের মর্যাদা পাইবার যোগ্য বিবেচিত হইতে পারে।

ব্যাসের রচনাসমূহের মধ্যে শ্রীমদ্ভাগবতের শ্রেষ্ঠতা সন্দেহে দুইটি  
আপত্তি কল্পনা করা যাইতে পারে। প্রথমটি এই যে, শ্রীমদ্ভাগবত  
ব্যাসের রচনাই নয়। আধুনিক গবেষকগণের মতে উহা বিষ্ণু, বায়ু  
প্রভৃতি পুরাণের বহু পরে দাক্ষিণাত্যবাসী কোনও পণ্ডিতের রচিত।  
ইহার ভাষা অস্ত পুরাণের ভাষা হইতে অত্যন্ত জটিল এবং অনেকাংশে  
কৃত্রিম। এই আধুনিক মত এ প্রবন্ধে উপেক্ষা করিয়াও ইহা বলিতেই  
ইহা যে, শ্রীমদ্ভাগবত ও মহাভাগবত (দেবীপুরাণ) এই দুই গ্রন্থের  
মধ্যে কোনটি ব্যাসকৃত ভাগবত মহাপুরাণ, সে বিষয়ে প্রবল বিতর্ক বহু  
প্রাচীনকাল হইতেই চলিয়া আসিতেছে। বৈকবগণ প্রথমটির এবং শৈব ও  
শাক্তগণ দ্বিতীয়টির সমর্থক।

দ্বিতীয় আপত্তি এই যে, শ্রীমদ্ভাগবতকে গৌড়ীয় বৈকব সম্প্রদায়  
যে মর্যাদা দিয়াছেন, অস্ত বৈকব সম্প্রদায় তাহা দেন নাই। বিশেষতঃ  
রামানুজ ও মধ্যার্চ্য্য বিষ্ণুপুরাণকেই সমধিক প্রামাণিকরূপে মর্যাদা  
দান করিয়াছেন, উহা তাহাদের প্রণীত বেদান্তভাস্য হইতে অতি-  
স্পষ্টরূপেই অনুমান করা যায়।

আরও একটি মত আছে—তদনুসারে পুরাণসমূহের মধ্যে অগ্নি-  
পুরাণের বৈশিষ্ট্য সর্বাতিরিক্ত। ইহাতে একদিকে যেমন পরাবিত্তার  
সমুচিত বিবেচনা করা হইয়াছে সেইরূপ অন্যদিকে অপরাধিতারও বহু শ্রেষ্ঠ  
শাখার—বধা ছন্দঃশাস্ত্র, অলঙ্কারশাস্ত্র, ব্যাকরণ, অভিধান,  
জ্যোতিষাদিরও সম্যক সমালোচনা করা হইয়াছে—যাহা হইতে ঐ সকল  
শাস্ত্রের পরবর্ত্তী বিবেকগণ বহু সাহায্য পাইয়াছেন। এইরূপে স্বতন্ত্র

স্বতন্ত্র কারণে পদ্মপুরাণ, মার্কণ্ডেয় পুরাণাদিরও বহু গুরুপাতী পণ্ডিত  
আছেন।

এই স্থানে এরূপ অনুমানও করা যাইতে পারে যে এই প্রবন্ধের  
অনেক পাঠকই হয়ত বলিবেন, ব্যাসের সর্ব্বব অনুসন্ধানের চেষ্টায় পুরাণ  
অরণ্যের মধ্যে গিয়া দিগ্ভ্রান্ত হওয়া নিতান্তই একটা শোচনীয়  
বাণীয়ার। ব্যাস কি জগতে পুরাণকার বলিয়া প্রসিদ্ধ, না  
মহাভারত-কার বলিয়া প্রসিদ্ধ? কোন পুরাণের মর্যাদা মহাভারতের  
তুল্য? সূর্যের কাছে যেমন দীপ, তেমনি মহাভারতের কাছে এক  
একটি পুরাণ। মহাভারত সর্ব্ববিজ্ঞার খনি। “যাহা নাই—‘ভারতে’  
তাঁহা নাই ভারতে” এ কথা ত এদেশে বহুকাল হইতে স্বীকৃত। ইহা  
একাধারে ইতিহাস, পুরাণ, ধর্ম্মশাস্ত্র, দর্শনশাস্ত্র, অর্থশাস্ত্র, রাজনীতি ও  
ব্যবহারশাস্ত্র। সবদিকেই ইহার অগাধতা যুগে যুগে দেশে বিদেশে  
সকলের বিশ্বয় উৎপাদন করিতেছে। মহাভারতই ব্যাসের সর্ব্বব এ  
বিষয়ে কি আর কোনও সন্দেহ হইতে পারে? মহাভারত লিপিয়া  
চিত্রের প্রসন্নতালাভ করিতে না পারিয়া ব্যাস নিজস্ব রচনারীতি ত্যাগ  
করিয়া উৎকট জটিল ভাষায় ভাগবত-পুরাণ লিপিতে বসিয়াছিলেন—এ  
কথা সাম্প্রদায়িক গোড়ামি ভিন্ন আর কি হইতে পারে? উহা কেবল  
অন্ধ বিশ্বাসীরাই মানিবে।

ভাল, মহাভারতই যদি ব্যাসের সর্ব্বব হয়, তাহা হইলে উহার  
শ্রেষ্ঠ অংশ কোনটি? ইহার উত্তর কিন্তু সহজ নয়। কেহ হয়ত  
বলিবেন, শান্তি পর্ব্ব; কেহ বনপর্ব্ব, কেহ স্বর্গারোহণ পর্ব্ব; অধিকাংশ  
লোকে বলিতে পারেন ভীষ্ম পর্ব্ব, গীতা যাহার অন্তর্গত। এইস্থানে  
প্রশ্ন উঠিতে পারে, গীতা কি সত্যই মহাভারতের অংশ? বিদেশীয়  
পণ্ডিতগণের মধ্যে অনেকেরই গীতার মর্যাদা সম্যকরূপে মানিয়া লইয়াও  
উহা মূল মহাভারতের অন্তর্গত কিনা এ বিষয়ে সংশয় প্রকাশ  
করিয়াছেন এবং সঙ্গে সঙ্গে ঐ মতের প্রতিধ্বনিরূপে অনেক ভারতীয়  
পণ্ডিতও বলিয়াছেন ওটা প্রক্ষিপ্ত। বিচারপতি তেলাং এই বিষয়টি  
বিচার করিয়া রায় দিয়াছেন, গীতাকে মূল মহাভারতের অঙ্গ  
(integral part) বলিয়া মানিয়া লওয়ার পক্ষে স্তায়সঙ্গত কোনও  
বাধা নাই। আর একথাও এখানে বলা যাইতে পারে, পাশ্চাত্য  
পণ্ডিতগণের মধ্যেও একজন যিনি গীতাবাদী সমধিক প্রবন্ধের সঙ্গে  
পড়িয়াছেন, সেই আদর্শ পণ্ডিত Dr. Rudolf Otto গীতার মধ্যে  
আটটি স্বতন্ত্র স্তর আছে, এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াও বলিয়াছেন, কাল-  
ক্রমে এইসকল সাম্প্রদায়িক স্তর গীতার মধ্যে জমাই বাধিলেও মূল  
গীতা মহাভারতেরই অঙ্গ এবং উহার সহিত সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যযুক্ত।  
আমরা আধুনিক মত সকল এ প্রবন্ধে উপেক্ষা করিয়াই চলিমাছি।  
সুতরাং গীতার বোল আনাই মহাভারতের অন্তর্গত ইহা আমাদের  
স্বীকার্য্য।

আচ্ছা, গীতা যদি মহাভারতের সর্ব্বব বা শ্রেষ্ঠ অংশ হয়, তাহা  
হইলে পরের প্রশ্ন করা যাইতে পারে গীতার শ্রেষ্ঠ অংশ কি? অনুমান  
হইতে বলি, অনেক হয়ত বলিবেন, কেন? একাদশ সর্গ...বেথানে

অর্জুনের বিধ্বংসপূর্ণ ও তৎসম্পৃক্ত উক্তি অতি মনোরম ভাবের বর্ণিত হইয়াছে। ভক্তবাদিগণ বলিতে পারেন, কাব্যংশে একাদশ সর্গ শ্রেষ্ঠ হইলেও কাব্য গীতার সর্ব্বথ নয়—গীতার সর্ব্বথ তত্ত্ব। “কাব্যেন হস্তস্তে শাস্ত্রম্।” তত্ত্ববাদিগণের মধ্যেও ঐকমত্য আশা করা যায় না। তাঁহাদের কেহ হয়ত বলিবেন, ষাটশ সর্গ শ্রেষ্ঠ, কেহ ত্রয়োদশ, কেহ পঞ্চদশ। ভক্তগণ বলিতে পারেন এবং অনেকে বলিয়াও থাকেন জানি, গীতার সর্ব্বমনোরম অংশ নবম সর্গ এবং তাহার মধ্যেও বিশেষ করিয়া— এই পাঁচটি শ্লোক—

অপি চেৎ হুহুরাগারো ভজতে মাননস্ততাক্ ।  
সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যাস্ ব্যবসিতো হি সঃ ।  
ক্ষিপ্রং ভবতি ধর্ম্মাচ্ছা শখচ্ছান্তিঃ নিগচ্ছতি ।  
কৌন্তেয় প্রতিজ্ঞানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণততি ।  
মাংহি পার্থ ব্যাপশ্রিত্য বেহপি হ্যঃ পাপবোনয়ঃ ।  
গ্নিরো বৈশ্রা তুখা শূত্রা ত্তেপি বাস্তি পরাংগতিম্ ।  
কিং পুন ব্রাহ্মণাঃ পুণ্য ভক্তা রাজর্ষয়ন্তথা ।  
অনিত্যমহং লোকমিমং প্রাপ্য ভজয়াম্যহম্ ।  
মম্মনা ভব মন্তস্তো মদ্বাজী মাং নমস্কর ।  
মামেবৈভবসি যুক্তৈবমাত্মানং মৎপরায়ণঃ ॥

ষট্‌ষট্‌সংস্রবণ মানবের পক্ষে ইহার অধিক আশার কথা, ইহার অধিক জানিবার ও মনে রাখিবার বিষয় আর কি হইতে পারে ? আর ব্যাসদেবও কি এই অধ্যায়ের নাম রাজবিভারাজগুহযোগ দেন নাই ?

ভক্তগণ ভাবের দিক ধরিয়া চলেন, যোগীদিগের (এবং জ্ঞানীদিগেরও) তাহা তাদৃশ মনঃপূত নয়। যোগিগণের নিকট বর্ষ অধ্যায় অধিক আদরগীর বলিয়া মনে করা যাইতে পারে।

আবার, চতুঃশ্লোকী ভাগবতের স্তায় সপ্তশ্লোকী গীতাও আছে।

উহাও বহু যুগ যাবৎ অনেকের নিত্য পাঠ্য। সেইজন্য এরূপও অনুমান করা যায়, অনেকে বলিবেন সমগ্র গীতার সার উহাতে সংগৃহীত আছে বলিয়াই উহার ঐরূপ মর্যাদা। এই সাতটি শ্লোক আর এখানে উদ্ধৃত করা আবশ্যক মনে করিলাম না।\*

মহাভারত সম্বন্ধে এই পর্য্যন্ত। পুরাণের স্তায় মহাভারতকেও ব্যাসের গৌরবের চূড়া বলিয়া স্বীকার না করিতে পারেন এইরূপ বাদীও অনুমানযোগ্য। এ পক্ষ বলিতে পারেন, প্রাচীন ভারতের এই শ্রেষ্ঠ কোবিদের প্রকৃত নাম কৃকশৈপায়ন যে তাঁহার বেদব্যাস এই উপাধি দ্বারা প্রায় ঢাকা পড়িয়া গিয়াছে তাহার কারণ বেদবিভাগই তাঁহার শ্রেষ্ঠ কীর্ত্তি। বেদ অবশ্য তাঁহার রচনা নয়, কিন্তু বেদের জ্ঞানকাণ্ডের শিক্ষার সার প্রদর্শন করিবার জন্য তিনি যে বেদান্তদর্শন ব্রহ্মসূত্র নাম দিয়া প্রণয়ন করিয়াছেন, তাহাই কি এত শতাব্দী পরেও ভারতের নাম যুরোপ ও আমেরিকার শ্রেষ্ঠ মনীষিগণের কাছে চির আদরগীর করিয়া রাখে নাই ? অদ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত ও দ্বৈতাদ্বৈত—ব্রহ্মসূত্রের যে ব্যাখ্যাই বল (এবং প্রকৃতপক্ষে এই বাদগুলির মধ্যে ভেদ অতি অল্পই), বেদান্ত দর্শন বিশ্ব দর্শনের মুকুটমণি ইহা প্রায় অবিসংবাদিত সত্য। শ্রীকৃষ্ণ পর্য্যন্ত গীতার প্রমাণরূপে (১৩৪) ব্রহ্মসূত্রের উল্লেখ করিয়াছেন, অত্বে পরে কা কথা ? অতএব যদি ব্যাসের সর্ব্বথ বলিয়া তাঁহার গৌরবময়ী কৃতিসকলের মধ্যে কোনটিকে নির্দেশ করিতে হয়, তবে ব্রহ্মসূত্রই সেই কৃতি। আর ব্রহ্মসূত্রের সার হইতেছে প্রথম চারি সূত্র—“চতুঃসূত্রী” যাহার শ্রীশঙ্করাচার্য্যকৃতভাষ্য দার্শনিক মণিবার উচ্চতম সীমা বলিয়া—দেশে বিশেষে স্বীকৃত হইয়াছে।

\* শ্লোক সাতটির ঠিকানা যথাক্রমে এই : ৮।১৩, ১১।৩৬, ১৩।১৩, ৮।২, ১৫।১ ১৫।১৫, ও ১৮।৬৫

## পূর্ব আফ্রিকায় ভ্রমণ

### ব্রহ্মচারী রাজকৃষ্ণ

( পূর্বপ্রকাশিতের পর )

বুকেনীতে আমরা ( ভারত সেবাশ্রম সংঘের প্রতিনিধি, হিন্দুধর্ম্ম প্রচারের সম্মানীয় ব্রাহ্ম তিন দিন থাকবার মনস্থ করেছি। আটপনে সেপ্টেম্বর বিকালে স্থানীয় হিন্দু মহিলাদের একটা সভার সর্ব্বদম্মতিক্রমে একটা মহিলা মণ্ডল স্থাপিত হোল—বার কর্ত্তপক্ষতি স্থির হোলো—এই দুই বিশেষে ঘর সংসারে হিন্দু রীতি-নীতি আচার অনুষ্ঠান পালন কোরে চলার জন্য সর্ব্বপ্রকার প্রয়াস ও নির্দেশ দান করা। সাপ্তাহিক অধিবেশনে রামায়ণ, মহাভারত, গীতা প্রভৃতি ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ, পূজা, আরতি, ভজন কীর্ত্তনের মধ্য দিয়ে সহরে হিন্দুধর্ম্মের ভাব জাগিয়ে রাখা। সম্মান্য আমাদের শেখ বক্তৃতার আয়োজন হোয়েছে। সভার বহির্ভারতে হিন্দুদের

কী ভাবে থাকা দরকার, স্থানীয় ভারতের নাগরিকের দায়িত্ব কি—এই সব বিষয়ে বক্তৃতা কোরলেন—মিশনের সহকারী নেতা স্বামী পরমানন্দজী। বক্তৃতার পর স্থানীয় অবস্থা, আফ্রিকানদের মধ্যে কী ভাবে হিন্দু প্রচার করা যায়—সেই সব বিষয়ে বহু প্রকার আলোচনা হোল। রাত্রি প্রায় ১২টার লোকজনবিদায় বেওয়ার পর আমরা শোওয়ার ঘরে গেলাম। শেঠ অনুতলালের সঙ্গে অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত বর্ত্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে আলোচনা চললো। বাংলা ও পাঞ্জাবের দালা সেবা কার্যের জন্য তাঁর ব্যক্তিগতভাবে ২৪ হাজার শিলিং পাঠানোর রসিদ পত্র সব দেখালেন। অনুতলালের বয়স নিতান্তই অল্প। ২৮২৯ বছর হবে। কিন্তু ব্যবসারে প্রবীণ। তিনটি মিলের মালিক। অত্যন্ত অমায়িক, নিরহঙ্কারী এবং আত্মপ্রসাদালু।

রাত্রি অবসানের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের বুকেনী তাগ কোরতে হবে। এ নির্দেশ আজ সভার পরে জনৈক শ্রোতার নিকট হোতে পেরেছি। তবে সেই নির্দেশ বাধ্যতামূলক নয়। “আপনারা ভোরেই প্রস্তুত থাকবেন—আমার মোটর এসে আপনাদের নিয়ে যাবে”—এই ছিলো স্থানীয় একজন ধনী ব্যবসায়ী শ্রীযুত কুরজী ভীমজীর নির্দেশ। বুকেনী থেকে ২৪ মাইল দূরে জেগা নামে একটি গ্রাম্য সহরে তাঁর আরও একটি ব্যবসায় কেন্দ্র আছে; সেখানেও প্রায় ৩৭ টি হিন্দু পরিবারের বাস। তাই তাঁর বিশেষ ইচ্ছা সেই গ্রামেও আমাদের নিয়ে যান। অমৃতলালকে তাঁর ঘরে পাঠিয়ে দিয়ে আমরা প্রার্থনা সেরে সবে মাত্র শুয়েছি,—এমন সময় বাইরের দরজায় টুক টুক কোরে যা পড়লো। বাড়ীর মালিক অমৃতলাল শব্দবৃন্তে গিয়ে দরজা খুললেন “May I come in Sir” প্রশ্ন এলো; Of course বলে একটি ইংরেজ মহিলাকে অমৃতলাল ঘরের মধ্যে ডেকে বিলেন। এতরাতে একাধিকনী একটি ইংরাজ মহিলা কোথা থেকে এলো—কেন এসেছে সেটা জানার ইচ্ছা মনে আগলেও—সে রাতে আর সে ইচ্ছা পূরণ না কোরে শুয়ে পড়লাম। ভোরে পাঁচটার স্থান-আধিক পেয়ে নিয়ে তৈরী হোয়ে মোটরের অপেক্ষায় রইলাম। বাইরের বারান্দায় বসে আছি—এমন সময় সেই ইংরাজ মহিলাটি ঘর থেকে এসে আমার হাত ধরে বললেন—“Already I have heard from Mr. Amritlal about your mission. I am also a woman of that type. We are also preaching the ideals of Universal Brotherhood. I wish all success of your Mission. Now that India is free and it is hoped that now she will depute the Preachers of Her glorious Culture to the corners of the world.”—বলে বেশ একটা আনন্দ-প্রকাশ কোরলেন। প্রত্যুত্তরে আমিও তাঁর প্রচারের সাক্ষ্য কামনা করলাম। দুঃখ কোরে জানালেন “সমস্তভাবে আমি আপনার সঙ্গে বৈশ্বিক আলাপ আলোচনা করতে পারছি না—কারণ আমাকে ৬-৪৫ মিনিটের ট্রেনে অন্তত যেতে হবে। এই বলেই পুরনার গুজব জানিয়ে মোটরে রেল-স্টেশনের দিকে রওনা হোয়ে গেলেন। তখন বেলা প্রায় ৭-টা। প্রাতরাশের পর সেই বারান্দায় বসে আছি, হঠাৎ দেখি সেই ইংরাজ মহিলাটি ফিরে এলো। একেবারে আমার সামনে এসে বসলেন—Fortunately the train is coming a few minutes late, so I have got sometime to talk with you—এই বলে আলাপ শুরু কোরলেন। পূর্ব আফ্রিকার কোথায় কোথায় গিয়েছি, কোথায় কোথায় যাবো, আমাদের প্রার্থ্য বিষয় কি—ইত্যাদি স্নেনে নিয়ে প্রায় ২৭-২৮ মিনিটের মধ্যে চলে গেলেন। বাওয়ার সময় সম্ভব্য কোরে গেলেন—It has been proved that the Western Culture has already failed to establish peace in the world. To solve the present problems of the world the Universal ideals of India are essentially needed.” ভাবলাম-বাধীন ভারতের নাগরিকের জাতি-সংস্কারকে আফ্রিকার সংস্কারের প্রতি বশাবোধ্য সম্মান

দিতে ইংরেজেরাও আজ শিখেছে। এতদিন “কাল-আদমী” বলতে যাদের বুক খানা অহংকারে ফুলে উঠতো,—প্রভুহুলত ব্যবহারে যারা এতদিন অত্যন্ত হোরে গিয়েছিলো, তারাই আজ এত গভীর প্রেম ও প্রভাব সঙ্গে ভারতীয়দের সহিত আলাপ আলোচনা কোরছে। স্বাধীনতার মর্ম কতকটা অনুভব করলাম।

এখনই আমাদের জেগায় বাওয়ার কথা। মোটর আসতে একটু দেরী হোল। এদিকে স্কুলের ছেলেমেয়ে এবং ছোট সহরের হিন্দুরা প্রায় সকলেই এসে হাজির হোলো—আমাদের বিদায় দিতে। সমবেত স্বরে মঙ্গলমন্ত্র উচ্চারণ কোরে আমাদের পথের সমগ্র বাধা বিপত্তি সরিয়ে দিলো। মোটর আসতেই উঠে বোললাম। ড্রাইভার একজন আফ্রিকান। সহর ছেড়ে মোটর কিছুদূর আসলে ড্রাইভার তার নিজস্ব কিসোয়েলী (Kisweli) ভাষায় আমাদের সথকে গাড়ীর মালিক শ্রীকুরজী ভীমজীর সহিত আলাপ শুরু কোরলো। শ্রীযুত কুরজী আমার সঙ্গে আলাপ করার জন্য ড্রাইভারকে বলেন। কিন্তু ড্রাইভার জানালো—এই সমস্ত মহৎ ব্যক্তির সহিত তার কথা বলা সাজে না। এ কথা শুনে যখন আশাস দিয়ে উপবাচক হোয়েই আমি তার সঙ্গে কথা বোলতে শুরু কোরলাম—তখন সে হঠাৎ বার্তালাপ শুরু কোরলো। দেখলাম অশিক্ষিত হোলেও কত শিষ্টতা তার আলাপের মধ্যে—এবং ভারতের উন্নতি ও সমৃদ্ধি সথকে কত উচ্চ আশা সে রাখে। বললো—“এখন ভারত স্বাধীন হোয়েছে, এ দেশে এসে আমাদের দুঃখ কষ্ট দেখে তা থেকে মুক্ত করার চেষ্টা করবে নিশ্চয়ই। অতি দীর্ঘ ই জাহাজের ভাড়া কমিয়ে দেওয়া হবে তখন বহু ভারতীয় আমাদের দেশে আসতে পারবে এবং আমরাও ওদেশে যেতে পারবো।” তারপর আমাকে বললে—“আমাদের দুঃখ কষ্টের কথা অনুগ্রহ কোরে আপনি ভারতে প্রচার কোরবেন।” তাদের সম্পর্কে ভারতীয় নেতাদের জানাবো বোলে যখন আশাস দিলাম—তখন তার ক্ষুদ্র অন্তরটা খেল বিরাট, ও উদার হোয়ে গেলো বলে মনে হোল। যাহাদের মধ্যে কুরজী বাসা বাঁধে নাই—সরলতা যাদের হৃদয়খানা জুড়ে রয়েছে তারা রাজনৈতিক চালবাজীর কথা কী বুঝবে? যে দেশের অধিবাসী বর্তমতঃই ভারতের প্রতি এতখানি প্রজ্ঞাবান ও বিশ্বাসী হোয়ে উঠেছে, পাছে সেই ভারতবাসী কর্তৃক এই প্রজ্ঞানু জনগণের অন্তরে দেশপ্রেম জাগিয়ে দেওয়া হয় সেই আশঙ্কায় সরকারের নূতন আইনে স্বাধীন ভারতের নাগরিকের পক্ষে এদেশে আসা বা বসবাস করা একপ্রকার নিষিদ্ধ হোয়েছে—এবং পরাধীন ভারতে দুঃখ দুর্দশার জর্জরিত হোয়ে যারা ভারত বন্ধ ত্যাগ কোরে এদেশে এসে অপেক্ষাকৃত সুখে শান্তিতে বসবাস কোরছে তাদেরও এদেশ থেকে বিতাড়নের বড়স্র চলছে। কোনো ভারতীয় প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে এসে এ দেশবাসীর (native's) কল্যাণ কামনায় কোনো কর্তৃপক্ষিত নিয়ে কাজ কোরতে পারবে না তাও প্রকারান্তরে সরকার সিদ্ধান্ত কোরে নিয়েছে। এরূপ কোরলে এ দেশবাসী ভারতের জনগণ তথা রাষ্ট্রের প্রতি অসুগত হোয়ে উঠতে পারে সেই জন্য এই আফ্রিকানগণকে সরকারী থেকে বেশ সশাসনকরণ



সঙ্গে ‘রিজার্ভ’ কোরে রাখা হয়েছে। শিকার ব্যবস্থা সরকার থেকে যা করা হবে—উন্নতির প্রচেষ্টা সরকার যা করবে তাতেই সন্তুষ্ট থাকতে হবে। ভারতীয়গণের কোনো বে-সরকারী প্রতিষ্ঠান এ দেশবাসীর জন্য কিছু কোরতে পারবে না—মোটামুটি এই হোল আইন।

কথা এসঙ্গে সেই ডাইভার রাস্তার পাশের ছোট ছোট কুঁড়ে ঘর (গরীব আফ্রিকানদের বাড়ী) গুলি দেখিয়ে জিজ্ঞেস কোরতে লাগলো—এইরূপ ঘর ভারতে আছে কি না? নিজেই মন্তব্য করে বললো—নিশ্চয়ই এত গরীব লোকের বাস ভারতে নেই। নিজেই প্রশ্ন দেখায়—কেন—এই দেশে দারিদ্র্য থাকবে না। সরকার থেকে কত রকমে তাদের শোষণ করা হচ্ছে তার ইতিহাস আমাদের কাছে বলতে লাগলো—জন্ম প্রতি ১২ শিলিং কর, গোর প্রতি ২ শিলিং খাজনা, আরও কত রকমের কর যা তাদের সরকারকে দিতে হয় সে সব জানালো। ঐ প্রকার নানা হুখ-হুখের কথা শুনে শুনে আমরা আমাদের গম্ভীরমুখ জেগার পৌছলাম। মোটের আমাদের দেখেই তো লোকজন অবাক। কোথা থেকে এলো এই অভূত মানুষগুলো, মাথার পাগড়ী থেকে পায়ের জুতো পর্যন্ত গৈরিক রংএ রঞ্জিত। জেগার ইতিহাসে সম্রাসী পদার্পণ এই প্রথম এবং অধিবাসীর জীবনেও সাধু দর্শন এই প্রথম। শ্রীকুরজী ভীষজীর বাড়ীতেই আমাদের থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা হয়েছে। আমাদের জন্য নির্দিষ্ট ঘরে শ্রীসম্ভবদেবতার আসন প্রতিষ্ঠা কোরে কাপড় জামা বদলাতেই খাওয়ার ডাক পড়লো। শ্রীকুরজীর পরিবার বৃকেনীতেই ছিলো—তাই একজন আফ্রিকান পাচক পাকক্রিয়ায় সম্পন্ন করেছে। শ্রীকুরজী অত্যন্ত সন্তোষের সহিত অনুন্নয় কোরে জানালো—অতিথি সংকায়ের ক্রটিই হবে খাদ্যভব্যের অবাহুতায়। কিন্তু আশ্চর্য হ’লাম—খাওয়ার বাদ ও সৌন্দর্যের পরিপাটিতায়। যারা নিজেরা কোনো দিন এত হুম্মরভাবে পাক করে খায় না; যারা আজও কাঁচা মাংস ফলমূলদি খেয়ে জীবন ধারণ করে, তারা যে এত হুম্মর হুবাছ খাদ্য প্রস্তুত করতে পারবে তা আমাদের কেন—বোধ হয় শ্রীকুরজীরও ধারণার বাইরে ছিলো। বাই হোক খাওয়া তো বেশ তৃপ্তি সহকারেই শেষ কোরলাম। নানা রকম সংবাদ জানা বা আলাপ আলোচনার জন্য লোকজন বাইরে এসে অপেক্ষা কোরছিলো—তাই খাওয়ার পরই বাইরে এলাম। নানা রকম কথাবার্তার সঙ্গে সঙ্গে ভারতের দাঙ্গা, স্বাধীনতা সংগ্রাম, সম্ভব কর্পপদ্ধতির ইতিহাস, সম্ভব-প্রতিষ্ঠাতা আচার্য্য স্বামী প্রণবানন্দজীর জীবনী আলোচনাও হোল। প্রত্যেক স্থানেই আমাদের পেরে প্রশ্নমেই আমাদের এদেশে প্রেরক ভারত-সেবাশ্রম-সম্ভব কর্পপদ্ধতি ও প্রতিষ্ঠাতার বিষয়ে বিশেষ আগ্রহের সঙ্গে সকলে জানতে চায়। ঘটনা থানেকের মধ্যে একে একে সকলেই বিদায় নিলো। তখন ভিতরের ঘরে গিয়ে কী যেদ কাজে মনোনিবেশ করেছি এমন সময় শ্রীকুরজী একজন আফ্রিকান রাজার সঙ্গে আমাদের ঘরে প্রবেশ কোরলেন। রাজার পরিচয় দিয়ে শ্রীকুরজী বলেন—“ইনি এই জেলার রাজা, নাম মিঃ হাম্বি” (Humby)। আমাদের পরিচয় তিনি মিঃ হাম্বিকে পূর্বে

নিশ্চয়ই দিয়েছিলেন—তবু রীতি অনুযায়ী পুনরায় আমাদের সাক্ষাতে পরিচয় দিয়ে দিলেন। মিঃ হাম্বি বেশ শিক্ষিত লোক, তাই ইংরাজীতেই বার্তালাপ শুরু হলো। কয়েক মাস পূর্বে যখন আমরা জাঞ্জিবার দ্বীপের হুলতানের সহিত সাক্ষাৎ কোরে তাঁর রাজ্যের অধিবাসীদের বিষয় দোষাধার সাহায্যে আলোচনা কোরেছিলাম তখন এত বেশী আনন্দ পাইনি। কারণ তিনি ইংরাজী জানতেন না। মিঃ হাম্বি প্রথমেই তাঁদের দেশে ভারতীয় সংস্কৃতি ও সভ্যতা প্রচারের জন্য যে আমরা এসেছি তার জন্য বিশেষ ধন্যবাদ জানিয়ে বললেন—“এতদিনে যে ভারতবর্ষ আমাদের অজ্ঞানতার অন্ধকার হাতে উদ্ধার কোরে উন্নতির পথ প্রদর্শনের জন্য তার মহান সভ্যতার আলোকবর্তিকা জালিয়ে দিতে আপনারদের এদেশে প্রেরণ কোরেছেন সেজন্য আমরা আজ আনন্দিত। ভারত সরকার যে আমাদের দুঃখ দুর্দশা অনুভব কোরে তা’ লাঘবের জন্য চেষ্টা কোরতে আপনারদের পাঠিয়েছেন এবং আপনারদের আন্তরিক প্রচেষ্টার কথা গত কয়েক মাস ধরে যা শুনে আসছি তা আমার প্রজাদের জানাবো। সেই ঐকান্তিক প্রচেষ্টার জন্য আমরা দুঃখী প্রজাদের পক্ষ থেকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি আপনারদের মিশনকে।”

তার পর একে একে তাঁদের সমস্ত দুঃখ কষ্ট জানাতে জানাতে বললেন—“কী যে দুঃখকষ্টের মধ্যে আমাদের রাখা হয়েছে তা’ আপনারদিগকে জানাবার ক্ষমতাও আমাদের নেই। অজ্ঞানতার আড়াল দিয়ে আমাদের মিশনের সভ্যতার আলোক থেকে সরিয়ে রাখা হয়েছে। কত রকম কর চাপানো হয়েছে—আমাদের উপরে—” বলে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়লো। হঠাৎ জিজ্ঞেস করলেন—স্বামীজি! সভ্যতা কী এমনই জিনিষ—স্বাধীনতা কী এতই দুর্লভ যা আমাদের ভাগ্যে সেগুলো লাভকর্য্য সম্ভবপর হবে না। সেগুলো কী জগতের কতকগুলো লোকেরই করায়ত্ত থাকবে? আমাদের দেশের লোক কি তার আশ্রয় পাবে না? মিঃ হাম্বির চোখ থেকে অশ্রু গড়িয়ে পড়লো। বিম্বিত হ’লাম—প্রশ্ন শুনে। আশ্বাস দিয়ে বললাম—“ভাই, তা কখনই হোতে পারে না। আমরা যে দেশের বৃকেনীতে—যে মহান সভ্যতার আলোকরশ্মি আমাদের অন্তরকে আলোকিত কোরেছে—আমরা চাই সেই দেশের সংস্কৃতি ও সভ্যতার আদর্শ ও আলোক—বিশ্বের সকলকে সূর্য্যকিরণের মতো সমান ভাগে ভাগ কোরে দিতে। ভারত চার জগতের উচ্চ-নীচ সকলকেই তার মহান সভ্যতার উদার বৃকেনীতে নিতে;—চার তার অন্তরের অক্ষরন্ত প্রেমরাজি বিশ্বকল্যাণে বিলিয়ে দিতে। সেই আদর্শ নিয়েই আজ আমরা দেশের বাইরে এসেছি। সেই মহান সভ্যতার চিরন্তন সত্য ও উদার নীতির প্রচারই আমাদের মিশনের কার্য্যপদ্ধতি।”

তার পর মিঃ হাম্বি ভারতীয় সভ্যতার বিশ্বভ্রাতৃত্বের আদর্শ যে সমগ্র জগতে প্রচারিত হওয়া দরকার তার উপর জোর দিয়ে বলেন—“ভারতের আদর্শই একমাত্র জগতকে ধ্বংসের কবল থেকে উদ্ধার কোরতে সমর্থ। সেই আদর্শ নিয়েই যে আপনারা এই আফ্রিকা মহাদেশে এসেছেন তাতে আফ্রিকাবাসী ভারতের নিকট চিরকৃতজ্ঞ

থাকবে। আপনাদের প্রচার স্থায়ীভাবে এদেশে প্রয়োজন। এদেশের কুসংস্কারাচ্ছন্ন জনসাধারণকে উন্নত, সুসভ্য করে প্রকৃত মানুষ করে তুলতে হলে স্থায়ীভাবে আপনাদের এই নিঃস্বার্থ সেবার প্রয়োজন। যারা আজ আমাদের পরম হিতৈষী সেজে আমাদেরকে তথাকথিত উন্নতির পথ প্রদর্শনের চেষ্টা করেছে তারা যে প্রকৃতই আমাদের কল্যাণ চায় না তা' আজ সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। তাদের এই কুটকল্পজালে আজ আমরা আবদ্ধ হয়ে পড়েছি।" এইভাবে নানা প্রকার আলোচনার প্রায় একঘণ্টা অতিবাহিত হয়ে গেলো।

মিঃ হুবি গত মহাযজ্ঞের সময় আফ্রিকান সরকারের পক্ষ থেকে ভারতে অবস্থানকারী নিম্নো সৈনিকদের তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব ক্রটি অনুসন্ধানের জন্ত ভারতবর্ষে গিয়ে একটি বছর পরাধীন ভারতের বৃকে কাটান। পরাধীন ভারতে মাত্র একটা বছর কাটিয়ে ভারতের সভ্যতা ও আদর্শের যে সামান্য পরিচয় পেয়েছেন তাতেই ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রতি কী গভীর প্রেম ও আন্তরিক শ্রদ্ধা এই ভক্তলোকের। শুধু এই একজনেরই নয়, লক্ষ লক্ষ আফ্রিকান যারা জীবনে ভারতবর্ষের মাটি স্পর্শ করেনি তাদের অন্তরখানিও আজ ভারতীয় আদর্শের প্রেরণা লাভের জন্ত উৎসুক হয়ে রয়েছে।

রাত্রে সভায় হাজিরার সংখ্যা বেশ ভালই হোল। শুণে দেখলাম পরিত্রিণজন। যে সহরের জনসংখ্যা (হিন্দুর) চল্লিশ জন সেখানের সভায় পরিত্রিণজনের উপস্থিতি ভালই বৈকি। সভায় “হিন্দুধর্মের বৈশিষ্ট্য” বিষয়ে আলোচনা হোল। বক্তৃতার পরে কয়েকটি প্রশ্ন করা হোল। এদেশে কোনরকম বক্তৃতার পর বক্তাকে বক্তব্য বিষয়ে কিছু কিছু প্রশ্ন করে অবোধ্য বিষয়সমূহ জেনে নেওয়ার নিয়ম। এ নিয়ম ইউরোপের নিকট থেকে শেখা।

পরদিন বিকালে একটি সভার পর আমাদের কাহামা নামে একটি গ্রামে যাওয়ার ঠিক হোলো। রাত্রি অবসানের সঙ্গে সঙ্গে টেলিগ্রাম করে ট্রেনের “বার্থ রিজার্ভ” করা হোল। বিকালে সভার পর রওনা হয়ে আমরা বৃকেনী পৌঁছলাম। শ্রীযুত অনুভলালের বাড়ীতে নৈশ ভোজনের পর আমরা ষ্টেশনে গেলাম। বৃকেনীর ষ্টেশনমাষ্টার একজন বাঙ্গালী। তাই আতিথেয়তার আতিশয্যটুকু সহ্য কোরতেই হোল। খাওয়ার জন্ত বিশেষভাবে অমুরোধ কোরলেন—কিন্তু না খাওয়ার তাড়াতাড়ি বিছানাপত্র ঠিকঠাক করে দিয়ে শোওয়ার

ব্যবস্থা কোরে দিলেন। ট্রেন আসবে রাত বারটায়। আমাদের গন্তব্যস্থল কাহামা যেতে হোলো যে ষ্টেশনে নামতে হবে সেখানের ষ্টেশনমাষ্টারকে টেলিফোন করে রাত্রে আমাদের থাকবার ব্যবস্থা করার জন্ত এখানের ষ্টেশনমাষ্টার শ্রীযুত বাগ্‌টী বলে দিলেন। শুলাম বটে, কিন্তু ঘুম আর হোল না। ট্রেন আসার ঘণ্টা বাজলো। ডার-এস-সালাম হোতে আগত মাউন্ট-গারী মেল এসে ঠিক রাত বারটায় বৃকেনী ষ্টেশনে দাঁড়ালো। পূর্ব নির্দিষ্ট কামরার উঠে বোসলাম। ট্রেন ছাড়লো। ভীষণ অন্ধকারের বৃক চিরে আমাদের গাড়ী ছুটছে। শুধু কতকগুলো আগুনের ফুলিঙ্গ ছাড়া এই গহন অন্ধকারে আর কিছু দেখা যাচ্ছে না, তাই বাইরের দৃশ্য দেখার আশা ছেড়ে দিয়ে শুয়ে পড়লাম। রাত আড়াইটায় আমরা ইসাকা ষ্টেশনে নামলাম। ষ্টেশনমাষ্টার শিখ। নিজে এসে আমাদের কামরা থেকে নামিয়ে তাঁর বাসায় নিয়ে গেলেন। রাত্রি যাপনের ব্যবস্থা পূর্বেই কোরে রেখেছিলেন—কিন্তু অল্প সময়ের মধ্যেই কাহামা থেকে আমাদের নেওয়ার জন্ত মোটর এলো। তাই সঙ্গে সঙ্গে আমরা কাহামা অভিমুখে রওনা হলাম। ঘন জঙ্গলের মধ্য দিয়ে রাস্তা। তার উপর দারুণ অন্ধকার। শুধু মোটরের সামনের আলোয় দু'একটা নাম-না-জানা জন্তকে রাস্তার এপাশ থেকে ওপাশে চলে যেতে দেখলাম—তাছাড়া আর কিছুই দেখা গেল না। প্রায় দু'ঘণ্টা চলার পর কাহামায় পৌঁছলাম। মোটরে যাওয়ার জন্ত শীতও বেশ কোরছে। যখন আমরা কাহামায় পৌঁছলাম—তখন শুকতারটা চোখের সামনে জ্বলজ্বল কোরে জগছে; গাছে গাছে পাখীর গাঝাড়া দিতে শুরু কোরেছে। মোটরের আওয়াজে গ্রামের কুকুরগুলো চীৎকার কোরে ডেকে উঠলো। মোটরের হর্ণ শুনেই গ্রামের লোকজন এলো। হাত পা ধোয়ারও মজল দিয়ে আলো ও বিছানাপত্র ঠিকঠাক কোরে দিয়ে আমাদের ঘুমোতে বলে চলে গেলো। আমরা আর না শুয়ে নান আশিক সেরে নিলাম। ক্রমে গাঢ় অন্ধকার, ধূসর হোতে হোতে একবারে কদ' হোয়ে গেলো। বিহগকুল আহাের সন্ধানে নীড় ছেড়ে বেরিয়ে পড়লো। পূর্বের আকাণ ক্রমণঃ রক্তিম হোয়ে উঠলো। সূর্য্যদেবের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের সঙ্গে দেখা সাক্ষাত করার জন্ত অনেক লোকজনেরও আবির্ভাব ঘটলো।

(ক্রমণঃ)



# বাদশার প্রেম

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

আড়াই হাজার বছর আগেকার কথা। বাদশা কাহিসেশ-সাইরাশ বাদশার সন্তান—তখন ইরাণের সিংহাসনে মিশরের ফারাও-আমেশিসের কন্যা পরমাত্মন্দরী শুনে সেই কন্যাকে বিবাহ করবেন, স্থির করলেন। কন্যাকে তিনি চক্ষে কখনো দেখেন নি...তখনকার দিনে দেশ বিদেশে বেড়ানো সহজ ছিল না। তার উপর ইরাণ থেকে মিশরে যাওয়া...পাঁচ-ছমাসের কমে যাওয়া চলে না।

মাহবের পক্ষে এতদূর যাওয়া-আসা শক্ত হলেও মাহবের মুখে মুখে খবরাখবর আসতো সহজেই...সে খবর শুনে বিশ্বের লোক জেনে কেলেছিল, ফারাও আমেশিসের কন্যার মতো স্নন্দরী ছনিয়ার দুর্লভ।

ইরাণের বাদশা কাহিসেশ...প্রবল তাঁর প্রতাপ, প্রচুর তাঁর রাষ্ট্রার্থ...ছনিয়ার অর্ধেকটা তিনি জয় করেছেন...তিনি পাঠালেন ফারাওর কাছে দূত...প্রস্তাব জানিয়ে...তোমার কন্যাকে আমি বিবাহ করবো!

ফারাওর এক সন্তান ঐ কন্যা...কন্যা তাঁর নয়নের মণি...তাকে অদূর বিদেশে পাঠিয়ে তিনি কি করে বাঁচবেন...অতদূরে কন্যাকে পাঠানো চলে না...না-না এ বিবাহ অসম্ভব। কিন্তু আবার ভয় হয়...বাদশার যে রকম প্রতাপ, বিবাহে অমত করলে সর্বৈক বাদশা করবেন মিশর আক্রমণ...বিপদের সীমা থাকবে না তখন। উপায়?

তবে উপায় স্থির করলেন। সন্ধান করে এক কিশোরী বাদী পেলেন...সেরা রূপসী...সেই বাদীকে কন্যা-পরিচয়ে তিনি পাঠালেন ইরাণে...তাকে ফারাও-কন্যার মতো শিক্ষাদীক্ষা দিয়ে যোগ্য রত্নরূপে সাজিয়ে।...

ইতিহাসে লেখা আছে, এই বাদীকে দেখে ইরাণের বাদশা প্রমত্ত হয়ে উঠলেন...বাদীকে প্রেমসী করে বাদশার আনন্দের আর সীমা নেই...এই বাদীর প্রেমে তিনি মশগুল!...কিন্তু এ সুখ দীর্ঘ হলো না...কি করে? রহস্য প্রকাশ হয়ে গেল...বাদশা জানতে পারলেন, এ ফারাওর কন্যা নয়...এ হলো মিশরী বাদী।

বাদশা রাগে অলে উঠলেন...এমন স্পর্ধা এই বাদীর!

বাদী হয়ে বাদশাকে বাহুবদ্ধনে আবদ্ধ করেছে...বাদশা বাদীকে...এক তুচ্ছ বাদীকে বুকে নিয়ে সেই বাদীর অধরে অধর মিশিয়ে সুখ বলে বিব পান করেছেন! বাদশা ডাকলেন ষাতককে...হুতুম দিলেন...বাদীর গর্দানা!...বাদশার হুকুমে বাদীকে গর্দানা দিতে হলো...যে বাদীর হাত্তোলাস্ত্র বাদশা অমন বিভোর বিহবল—

নিখাস ফেলে বাদশা বললে—বাদীর স্পর্ধার শাস্তি হলো! এবারে ঐ হুতু ফারাও।

বাদশা এলেন দরবারে...মলিন মুখ! দরবারে উজীর, ওমরাওদের দল বসে...বড় টেবিলের উপর সরবৎ, সিরাজি, মিঠাই, ফল—

বাদশা বললেন—তোমরা শুনেছো মিশরের ফারাওয়ের স্পর্ধার কথা? এমন জঘন্য অপমান করে আমায়! আমি ইরাণের বাদশা...একটা হীন বাদীকে করেছি আমার শয্যা-সঙ্গিনী...আদরে ভালোবাসায় উপহারে অলঙ্কারে এক নীচ বাদীর মনস্তাট সাধন করেছি...

রোযে আক্রোশে বাদশার কণ্ঠ হলো ঝলিত রুদ্ধ! নিখাস ফেলে বাদশা ডাকলেন—উজীর...

উজীর সেলাম করে উঠে দাঁড়ালো।

বাদশা বললেন—আমি মিশর আক্রমণ করবো।

বিনীত ভঙ্গিতে উজীর বললে—কিন্তু জাঁহাপনা...মিশরে ফৌজ নিয়ে যেতে হলে বহু উটের প্রয়োজন...প্রথমে চাই বিশ হাজার উট সংগ্রহ...তাতে কত দীর্ঘ সময় লাগবে...বহু ব্যয়...

বাদশা তুললেন হস্তার—তাহলে এ অপমান আমাকে সয়ে থাকবে হবে? বলে—

উজীর বললে—না, জাঁহাপনা...তা নয়...আপনার হুকুম অচিরে তামিল করা হবে।

—হাঁ...লক্ষ কোটি তোষের করো...অধিনায়ক...

তোমরা জানোনা, আমার সর্বশরীর ঘৃণার বিবে অর্জরিত

...একটা হীন বাদীকে আমি বুকে নিয়েছি...তার মুখে মুখ মিলিয়ে...অসহ! অসহ!

উজীর বললে—যথার্থ জাঁহাপনা...এ কলঙ্কের কথা ইতিহাসের পাতায় লেখা থাকবে অনন্তকালের মতো। ...তাই আমি চাই এ কথাটা মোচনের কাহিনী মিশরের ফারাওয়ার রক্তে ধুয়ে মুছে দিতে...

লক্ষ ফৌজ নিয়ে বাদশা কাশিশেস্ বেরলেন মিশর অভিযানে...খবর শুনে বুদ্ধ ফারাও আমেশিস্ কাঁদতে কাঁদতে মারা গেলেন—তার ভাইপো লামেথিক ভয়ে মিশর

ছেড়ে পালিয়ে গেল, আর ফারাওর সেই রূপসী কন্যা— তার কোনো সন্ধান পাওয়া গেল না।

বাদশা কাশিশেসের মিশর অভিযান সফল হলো!

কিন্তু ষাড়া ইতিহাসের চর্চা করেন, তাঁরা বলেন, মিশরী বাদীর গদ্যনা নেননি বাদশা কাশিশেস—হারেমের এক মিনিষ্টারের হাতে দান করেছিলেন। বাই হোক, বাদশার অমন বিহ্বলতা, অত প্রেম—বাদীর পরিচয় জানবামাত্র যে ধোঁয়ার মতো উবে গিয়েছিল যে, সে সম্বন্ধে কারো মনে এতটুকু সংশয় নেই! এই জন্তই লোকে বলে—বাদশার প্রেম, তার কোনো দাম নেই!

(রূপ-লেখক মাইকেল জোশেমকোর লেখা গল্পের মর্দাখুবাদ)

## পুরীতে বিশিষ্টাষ্টম মত

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়

পুরীতে জগন্নাথদেবের মন্দিরে বিশিষ্টাষ্টম মতের যথেষ্ট প্রভাব দেখা যায়। জগন্নাথদেবের মূর্তির তিলক শ্রীবৈকব (অর্থাৎ বিশিষ্টাষ্টম মতে) রচিত হয়। মন্দিরে সিংহ দ্বার দিয়া প্রবেশ করিয়া ভিতরে প্রথমে যে লাল পাথরের দ্বার দেখা যায়, তাহার উপর শ্রীবৈকব তিলক এবং শম্ব, হৃদর্শন চক্র ও গুরুড়ের মূর্তি দেখা যায়—এ সকলই শ্রীবৈকব নিদর্শন। শ্রীবৈকব প্রভাব সর্বাপেক্ষা বেশী দেখা যায় জগন্নাথ মন্দিরের অন্তর্গত লক্ষ্মী মন্দিরে। আমি প্রথমে ইহা লক্ষ্য করি নাই। লক্ষ্মী মন্দিরে কিছুকণ বসিতে হয়, তাই বসিয়াছিলাম। একটি শ্রোতা বিধবা পাণ্ডা রমণী আমাকে চরণানুত দিল এবং শ্রীবৈকব চিত্র সকল দেখাইয়া দিল। জগন্নাথদেবের মন্দিরের দ্বার লক্ষ্মীদেবীর মন্দিরও কয়েকটি বিভিন্ন অংশে বিভক্ত। যে অংশকে মোহন বা জগমোহন বলা যায়, তাহার চারিদিকে দেয়ালের উচ্চাংশে কতকগুলি শ্রীবৈকব তিলক, হৃদর্শন চক্র, শম্ব প্রভৃতি চিত্রিত আছে। শ্রীবৈকব সম্প্রদায়ের হস্তিগণি আচার্য্যের ক্ষুদ্রাকার মূর্তি চিত্রিত আছে এবং অধিকাংশ স্থলে মূর্তির নীচে নাম লেখা আছে। প্রথম আচার্য্য শ্রীমহালক্ষ্মী—তিনিই শ্রীবৈকব মত প্রথম প্রচার করিয়াছিলেন—এজন্ত লক্ষ্মীদেবীর মন্দিরে শ্রীবৈকব চিত্রের সার্থকতা।

লক্ষ্মীনাথ সমারভাষ্য নাথবামুনমধ্যমাং।

অন্নদাচার্য্যপূর্ণাভ্যাস বন্দেগুরুপরম্পরাং।

“আমি আমাদের (শ্রীবৈকবসম্প্রদায়ের) গুরু পরম্পরাকে প্রণাম করি,—বাহাদের সর্বপ্রথম হইতেছেন শ্রীবিষ্ণু, বাহাদের মধ্যস্থলে নাথ মুন এবং বামুন্যাদ্য, এবং বাহাদের শেষে আমাদের আচার্য্য।” আচার্য্যদের যে

সকল ছোট চিত্র রহিয়াছে তাহাদের মধ্যে এই সকল নাম সম্বন্ধে পরিচিত :—অন্ডন স্বামী, তোতাজি, বামুন্যাদ্য, গোপীপূর্ণ, শঠকোপ, গোদা অম্মা (ইনি রাজকন্যা ছিলেন, শ্রীরঙ্গমের বিষ্ণুর বিগ্রহের সহিত ইহার বিবাহ হইয়াছিল), বরবর মুন, মহাপূর্ণ, শৈলপূর্ণ, পরাশর, ব্যাস, নাথমুন, মধুর কবি। এইরূপ ৩৬টি চিত্র আছে। রামানুজের চিত্রটি দ্বারের পার্শ্বেই, ইহা আর মনুষ্য আকৃতির সমান। তাহার ক্রোড়ে সম্পৎকুমার নামক বিষ্ণু বিগ্রহের চিত্র। এই বিগ্রহটি সম্বন্ধে একটি সুন্দর কাহিনী আছে। ইনি রামানুজকে স্বপ্নে দর্শন দিয়াছিলেন এবং বলিয়াছিলেন দিল্লীর বাদশাহকন্টার নিকট তিনি আছেন। বাদশাহ হিন্দু মন্দির লুণ্ঠন করিয়া সেই বিগ্রহটি লইয়া গিয়াছিলেন, বাদশাহের কন্যা বিগ্রহটি লইয়া খেলা করিতেন। রামানুজ দিল্লী গিয়া যখন বিগ্রহটি প্রার্থনা করেন তখন বিগ্রহটি স্বয়ং চলিয়া আসিয়া রামানুজের ক্রোড়ে উঠিলেন। সম্পৎকুমারের বিরহ সহ করিতে না পারিয়া বাদশাহ-কন্যা বিগ্রহের সহিত দিল্লী ত্যাগ করেন, বিগ্রহটি পাকীতে আসিতে-ছিলেন, বাদশাহকন্যাকে পাকীতে তোলা হয়, পাকীর দরজা বন্ধ থাকে, পরে যখন খোলা হয় তখন বাদশাহ কন্যাকে দেখিতে পাওয়া যায় না। ঐ কন্টার দ্বাভাগ সঙ্গে আসিয়াছিল, সে আর কিরিয়া যায় নাই, বৈকব হয়, রামানুজ বলেন “তুমি পুরী বাও, সেখানে পতিতপাবনকে দর্শন করিয়া তোমার মূর্তি হইবে।” পুরীতে জগন্নাথদেবের সিংহ দরজার চুকিয়াই জগন্নাথদেবের একটি মূর্তি আছে, তাহাকে পতিতপাবন মূর্তি বলা হয়, কারণ জগন্নাথদেবের মন্দিরে প্রবেশ করা পতিতদের শাস্তিবিহীন,

তাহারা মন্দিরের বাহিরে ঝাঁড়াইয়া জগন্নাথদেবের পতিতপাবন মূর্তি দর্শন করিয়া পুষ্প সন্ধ্যা করিতে পারে। বাদশাহের পুত্রের সমাধি পুরীতে দেখিতে পাওয়া যায়।

চারিদিকে দেওয়ালের উপর অনেকগুলি সংস্কৃত শ্লোক লেখা আছে। কতকগুলি শ্লোকে বিশিষ্টাবৈবাদের সিদ্ধান্ত হৃদয়ভাবে দেওয়া হইয়াছে। নিম্নে কয়েকটি শ্লোক দেওয়া হইল।

দূরে গুণান্তব তু সত্ত্বরজস্মাংসি  
তেন ত্রয়ী প্রথমতি ত্রয়ি নিগুণত্বম্।  
নিতাং হরে নিখিল সদ্গুণাগারং হি  
হামানন্তি পরমেশ্বরমীশ্বরগাং।

শ্লোকটি রামানুজের প্রিয় শিষ্য কুরেশ স্বামিকৃত ইহাও শ্লোকের নীচে লেখা আছে। ইহার অনুবাদ,—“হে হরি, সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণ তোমার অনেক দূরে (তুমি এই সকল গুণের বহু উর্দ্ধে)। একান্ত বেদ তোমাকে নিগুণ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। তুমি নিখিল সদ্গুণের সমুদ্র, একান্ত বেদ তোমাকে সকল ঈশ্বরের পরমেশ্বর বলিয়াছেন।” বেদে ব্রহ্মকে নিগুণ ও সগুণ উভয়ভাবে বলিয়াছেন। এই শ্লোকে তাহার সামঞ্জস্য বিধান করা হইয়াছে।

“বাসবাক্য” বলিয়া নিম্নলিখিত শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে—

সত্যং সত্যং পুনঃ সত্যং ভুজমুখ্যাপ্য চোচ্যতে।  
ন বেদোক্ত পরং শাস্ত্রং ন দেবঃ কেশবাং পরঃ।

“সত্য, সত্য, পুনঃ সত্য,—ভুজ উত্তোলন করত বলিতেছি। বেদ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ শাস্ত্র নাই, কেশব অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ দেবতা নাই।”

ব্রহ্মসংহিতা হইতে নিম্নলিখিত শ্লোক উদ্ধৃত করা হইয়াছে—

প্রথমোহনন্তরঙ্গপশ্চ দ্বিতীয়ে লক্ষ্মণগুণা।  
তৃতীয়ে বলরামশ্চ কলৌ রামানুজো মুনিঃ॥  
ঋপরাস্তে কলোরাধৌ পাবণপ্রচুরে জনে  
রামানুজেতি ভবিতা বিদুর্ধর্মপ্রবর্তকঃ।

এখানে অনন্তের বিভিন্ন অবতারের উল্লেখ আছে—“প্রথম অবতার অনন্ত, দ্বিতীয় লক্ষ্মণ, তৃতীয় বলরাম, এবং কলিতে রামানুজ মুনি। ঋপারের শেষে এবং কলির আদিতে, যখন নাস্তিকের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইবে তখন বিদুর্ধর্মপ্রবর্তক রামানুজের আবির্ভাব হইবে।”

আর একটি শ্লোক (তাহার রচনা তাহার উল্লেখ নাই) এইরূপ—

নচেন রামানুজেত্যোবা চতুরা চতুরাস্করী।

কামবহাং প্রপত্তস্তে জন্তবো হস্ত মাদৃশাঃ।

“যদি চারি অক্ষরযুক্ত ‘রামানুজ’ এই কথা না হইত, তাহা হইলে আমার জ্ঞান জীবদের কি অবস্থা হইত?”

ঈরামানুজ প্রণীত বোদার্থসংগ্রহ হইতে নিম্নলিখিত গুণটি উদ্ধৃত হইয়াছে :—

অশেষচিহ্নচিহ্নশ্চ শেখিণে শেখণারিনে।  
নির্মলামন্তকল্যাণনিধয়ে বিকবে নমঃ।

“বিষের বাবতীর চেতন ও অচেতন বস্তু বাহার অংশ যিনি শেখ শয্যাশারী, যিনি অনন্ত নির্মল কল্যাণ গুণের আধার সেই বিষ্ণুকে প্রণাম করি।”

নিম্নলিখিত শ্লোকগুলিও উদ্ধৃত আছে—

যচ্চ কিক্কিঙ্কগত্যস্মিন্ দৃশ্যতে ক্ষয়তেহপি বা।

অন্তর্বহিষ্ট তৎ সর্বং ব্যাপ্য নারায়ণঃ স্থিতঃ।

“তৈত্তিরীয় ১১ অনুবাক”

“এই জগতে যাহা কিছু দেখা যায় বা শোনা যায় সকলের অন্তঃ ও বহিঃপ্রদেশ ব্যাপ্ত করিয়া নারায়ণ অবস্থিত করিতেছেন।”

শঙ্খচক্রেরো বিদ্বান্ মালাং তুলসীজাং দধৎ স জীবমুক্তঃ (যজুর্বেদ)

“যে বিদ্বান্ দেহে শঙ্খ ও চক্রের চিহ্ন ধারণ করেন, এবং তুলসীমালা ধারণ করেন, তিনি জীবমুক্ত।”

(ইহা যজুর্বেদে আছে বলা হইয়াছে, কোথায় আছে তাহা বলা হয় নাই।)

তং হ দেবমান্ববুদ্ধিপ্রকাশং মুমুকুর্ধৈশ্বর্যমহং প্রপত্তে

(শেতাখতর অঃ ৯ মঃ ৮ ?)

“আমি মোক্ষলাভের ইচ্ছায় সেই দেবতার শরণ গ্রহণ করিতেছি, যিনি আত্মবুদ্ধির দ্বারা প্রকাশিত।”

বিকুপস্বীং ক্সাং দেবীং সাধবীং মাধবপ্রিয়াং।

বিকুপ্রিয়াং সখাং দেবীং নমাম্যচ্যুতবলভাং॥

“বিক্রপ পত্নী মাধবের প্রিয়া বিক্রপ প্রিয়া ও সখী অচ্যুতের বলভা মাধবী দেবীকে প্রণাম করি।” ইহা বোধহয় ভূদেবীর প্রণাম মন্ত্র।

রামানুজ বহু বৈকুণ্ঠের সহিত পুরী আসিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন এখানে নারদ পক্ষরাজ অনুসারে পূজা করিতে হইবে। পাণ্ডাগণ তাহাতে রাজি হইয়া নাই। তর্কে পাণ্ডাগণ হারিয়া যায়। একান্ত রাজা রামানুজকে সমর্থন করেন। পাণ্ডারা অনশন করে। রামানুজ রায়ে স্বপ্ন দেখেন যে জগন্নাথদেব তাহাকে বলিতেছেন—পাণ্ডাবগণকে পূর্বের প্রথায় পূজা করিতে দাও। সকালে উঠিয়া রামানুজ দেখেন কে তাহাকে রাত্রির মধ্যে পুরী হইতে কুর্মক্ষেত্রে লইয়া আসিয়াছে। কুর্মক্ষেত্র পুরী হইতে বহুদূরে, ওয়ালটোরার পথে আধুনিক চিকাকোল স্টেশন হইতে বাইতে হয়। রামানুজের সহিত একটি গোপাল বিগ্রহ ছিল, সেটি পুরীতে থাকিয়া যায়। জগন্নাথদেবের মন্দির হইতে স্বর্ণবারঘাট (সমুদ্র) যাইবার পথে বেণু গোপাল মঠে সেই গোপাল মূর্তি এখনও পূজিত হন। পুরীতে প্রায় কুড়িটি ঐবৈকুণ্ঠ মঠ আছে। তন্মধ্যে এমার মঠ সর্বাপেক্ষা ধনী।

জগন্নাথ মন্দিরে শঙ্করাচার্যের প্রভাব বিশেষ দেখা যায় না। মন্দিরের বাহিরে অবশ্য গোবর্দ্ধন মঠ আছে। তাহার মধ্যে একটি শিবালয়, একটি গোপাল মন্দির ও একটি শঙ্করাচার্যের মন্দির আছে। এই মঠের মধ্যে দেয়ালের উপর নিম্নলিখিত শ্লোক দুইটি দেখিলাম।

মুক্তিমিচ্ছসি চেত্তাত্ত বিবরান্ বিববৎ ত্যজ।

ক্ষমার্জব দম্যতোবং সত্যং পীযুববৎ ভজ।

“বৎস, মূর্খি ইচ্ছা কর তাহা হইলে বিবরণকল বিধেয়তার ত্যাগ করিবে এবং ক্ষমা, সরলতা, সন্তোষ ও সত্যকে অমৃতের স্থায় ভজন কর।”

নিম্নস্ত নীতিনিপুণাঃ যদি বা স্তবস্ত  
লক্ষ্মীঃ সমাধিতু গচ্ছতু বা যথেষ্টং ।  
অষ্টমস্ত মে মরণমস্ত যুগান্তরে বা  
স্তায়ান্থ পথঃ প্রবিচলন্তি পদং ন ধীরাঃ ॥

“যাঁহারা নীতিকুশল তাঁহারা নিম্নাই করুন, বা স্তব করুন, লক্ষ্মী অবস্থান করুন বা অস্ত্র চলিয়া যান, আমার অস্ত্রই মরণ হউক বা যুগান্তরে হউক,—কিছুতেই ধীর ব্যক্তিগণ স্তায় পথ হইতে একপদও বিচলিত হন না।”

শ্রীজগন্নাথ মন্দিরে বিভিন্ন মহাপুরুষদের প্রভাবের অলোচনা করিতে—

ছিলাম। সুতরাং এই প্রসঙ্গে শ্রীচৈতন্যদেবের প্রভাব ও উল্লেখ করা যায়।

শ্রীচৈতন্যদেব যে গুরুদ্ব স্তরের নিকট দাঁড়াইয়া জগন্নাথদেবের মূর্তি-দর্শন করিতেন, সেই স্তরের উপর তাঁহার শ্রীকরের অঙ্গুলির চিত্র এখনও দেখা যায়, তিনি বাহুদেব সার্বভৌমকে যে বড়ভুল মূর্তি দেখাইয়াছিলেন তাহাও মন্দির গায়ে অঙ্কিত আছে। মন্দির প্রাঙ্গণে তাঁহার পদচিহ্নের উপর একটি গুহ মন্দির-নির্মিত হইয়াছে। মন্দিরের দক্ষিণ দরজার পার্শ্বে একটি মন্দিরে শ্রীচৈতন্যদেবের মূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে এবং নিত্য পূজার ব্যবস্থা আছে। ইহা ব্যতীত রাধাকান্ত মঠে যে গভীরা গৃহে চৈতন্যদেব বাস করিতেন সেই গভীরা গৃহে তাঁহার ব্যবহৃত কঁথা ও খড়ম রক্ষিত হইয়াছে। সুতরাং শ্রীজগন্নাথদেবের মন্দিরে অস্ত্র সকল মহাপুরুষের যত প্রভাব পড়িয়াছে তদপেক্ষা শ্রীচৈতন্যদেবের প্রভাবই অধিক।

## দন্তের পরিণাম

কবিশেখর শ্রীকালিদাস রায়

রূপের দন্ত করেছে যে বারে বারে  
রোগে শোকে আর শ্বিত চর্মে অকাল জরার ভারে  
বিকৃতাক সে ছুই দিন পরে চেনা নাহি যায় ভারে ।  
কুলের দন্ত করেছে যে-জন সভাজন সাক্ষাতে,  
কস্তা তাহার একদা গভীর রাতে,  
ওনেছি গিয়েছে বর ছেড়ে চলে এক চাঁড়ালের সাথে ।

মন্ত যে ছিল জাত্যভিমান নিয়ে  
পুত্র তাহার এক পাদ্রির কস্তাকে ক’রে বিয়ে  
বাস করিতেছে খুঁটানদের পল্লীর মাঝে গিয়ে ।  
ধনের দন্ত করেছে যে বার বার,  
ছয় মাস পরে দেখেছি সহসা তিথারীর দশা তার,  
ব্যাক ফেল হ’য়ে ফেল হ’য়ে কারবার ।  
গর্ক যে-জন করিত আপন সুপুত্র জামাতার,  
দেখেছি তাহার স্বন্ধে চেপেছে বিধবা কস্তাভার,  
পুত্র তাহার যক্ষা ব্যাধিতে অস্থিচর্শসার ।  
ধানের দন্তে পথচারীদের চলিত যে চাপা দিয়ে,  
তার সে সাধের মোটরটি উলটিয়ে  
পুড়াল একদা তার মেহটাই পেট্রোল জ’লে গিয়ে ।  
মানের দস্তী ভোটের জোরে যে হয়েছিল জাঁহাবাজ,  
বার বার হেরে ভোটের সমরে পেয়ে অপমান লাজ,

মানের সঙ্গে ধনও হারিয়ে হয়েছে ককির আজ ।  
হায় মহাকাল সবার কপাল চূর্ণিছে অবিরাম,  
দেখিয়াছি নিতি দন্তের পরিণাম,  
ছুই দণ্ডই কুন্তকর্ণ জেগে করে সংগ্রাম ।  
উত্ততচূড়া উকতশির গুঁড়ায় বজ্রপানি,  
সকলেই দেখে কেউত না শেখে ; মনে মনে লয় মানি’  
রক্তমঞ্চে অভিনয় বুঝি, নয় সতর্কবাণী ।  
হায় মায়া মৃত নর,  
তুমি যে শুধুই খেলার পুতুল নিয়তির কিংকর,  
গর্ব করিতে কাঁপে না ও অন্তর ?

দন্ত যখন কর’  
আপনারে ভাবো সকলের চেয়ে বড়,  
বিধাতা তখন হাসে অলক্ষ্যে অসি করে খরতর ।  
দন্ত কি চলে উত্তত ঐ খর খড়্গের তলে  
বিষপত্র চর্কিয়া কুত্থলে ?  
বলির পত্তর দন্ত ত নাহি চলে ।  
ক্ষটিক স্তম্ভে বসিয়া তোমার দন্ত কি ভাই সাজে ?  
ঐ স্তম্ভের মাঝে  
বকোবিদারী নরসিংহ যে রাজে ।





## ভারতীয় চা ও ভারতের অর্থনীতি

ভারতবর্ষ হইতে বিদেশে যত জিনিষ রপ্তানী হয়, তদ্ব্যতীত পাটের পরই চায়ের স্থান। এই চা রপ্তানীর দ্বারা ভারত বিদেশ হইতে প্রতি বৎসর প্রভূত পরিমাণ অর্থোপার্জন করে। ভারতীয় চায়ের আন্তর্জাতিক চাহিদা বৃদ্ধির ফলে ভারতের চা-শিল্প সম্প্রসারিতও হইয়াছে যথেষ্ট এবং এখনও এই শিল্পের বহু উন্নতিসাধন সম্ভব। ১৯৪৬-৪৭ খ্রিষ্টাব্দে ভারত হইতে যে চা বিদেশে রপ্তানী হয় তাহার মূল্য ছিল ৩৪ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা। ভারত বিভাগের পর শ্রীলঙ্কায় কিছু চা বাগান ছাড়া অথবা ভারতের অধিকাংশ চা বাগান ভারতের ভাগে থাকিয়া যাওয়ার চা রপ্তানীর হিসাবে ভারতের ক্ষতি হয় নাই। গত বৎসর বা ১৯৪৯ খ্রিষ্টাব্দেও ভারত হইতে বিদেশে ৭২ কোটি টাকা মূল্যের ৪৩ কোটি ৫০ লক্ষ পাউন্ডের মত চা রপ্তানী হইয়াছে। ভারতীয় চা ডলার এলাকাতেও প্রচুর চলে। গত বৎসর চা রপ্তানী ব্যবদ ডলার এলাকা হইতে ভারতের ১১ কোটি টাকা আয় হইয়াছে। বলা বাহুল্য, এদেশে চা শিল্পের উন্নতি করিয়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আদি ডলার এলাকার চায়ের রপ্তানী বাড়াইতে পারিলে বর্তমান ডলার সঙ্কটের তীব্রতা হইতে ভারত অনেকটা মুক্তি পাইতে পারে। চা নেপার সামগ্রী, কাজেই ইহার দর সহজেই সঙ্কটন ও প্রসারণ করা যায়। সাম্প্রতিক ডলার সঙ্কটের চাপ কমান্বিত হইলে ডলার এলাকার অধিকতর ভারতীয় পণ্য রপ্তানী ও ডলার এলাকা-জাত পণ্য আমদানী বতব্বর সম্ভব নিয়ন্ত্রণ,—এই দুই পথ অবলম্বন করিতেই হইবে।

তবে বিদেশে রপ্তানীর কথা আলোচনা প্রসঙ্গে একটি বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি দেওয়া দরকার। বিদেশে এখন যেমন চায়ের সমৃদ্ধ বাজার সৃষ্টি হইয়াছে, ভারতেও ক্রমে ভারতীয় চায়ের চাহিদা সেই পর্যায়েরই বাড়িয়া গিয়াছে। এক্ষেত্রে ভারতীয় চা বাহাতে ভারতবাসী ও বিদেশী উভয়ের চাহিদা সমান হারে মিটাইতে পারে, তাহারই ব্যবস্থা কাম্য। ভারতের চা শিল্প এখনও প্রাথমিক: অসম্প্রসারিতের নিয়ন্ত্রণাধীন। পোনা যার উচ্চশ্রেণীর চা সরবরাহের ব্যাপারে ভারতীয় ক্রেতাগণ বৈষম্যমূলক ব্যবহার পাইয়া থাকেন। ভাল ভারতীয় চা চাহিদা থাকা সত্ত্বেও ভারতের বাজারে বিক্রয়ের জন্য উপস্থাপিত না হইলে তাহা নিশ্চয়ই হুণের কথা।

তাহা ছাড়া ভারতীয় চা বিদেশে যে দরে বিক্রয় হয় ভারতে (পাঠাইবার খরচ ব্যতীত) বাইবার জন্য তাহার দর অপেক্ষাকৃত সস্তা হওয়া উচিত। কিন্তু যে কারণেই হউক, ভারতীয় চা ভারতের বাজারে বেশী দরে বিক্রীত হয়। এখন এদেশে ব্যবহারযোগ্য এক পাউন্ড চায়ের দর কম

পক্ষে দু টাকা, অষ্ট্রেলিয়ায় কিন্তু সমগ্রাণীর ভারতীয় চায়ের খুচরা মূল্য ১৮০ পাই। এই দর আবার সম্প্রতি অষ্ট্রেলিয়ায় চায়ের রেশন উঠিয়া যাওয়ার হইয়াছে। রেশন ব্যবস্থা বলবৎ থাকা কালে অষ্ট্রেলিয়া সরকার আমদানী চায়ের মূল্য হারে সমতা রক্ষার জন্য যে সাবসিডি বা সরকারী সাহায্য দিতেন, এখন রেশন উঠিয়া যাওয়ার তাঁহারই সেই সাহায্য প্রদান বন্ধ করিয়া দিয়াছেন বলিয়াই চায়ের দাম একটু বাড়িয়াছে। বলা নিশ্চয়োক্ত, স্বদেশীয় চা ব্যবহার করিতে গিয়া ভারতবাসীর এইভাবে ক্ষতি খীকারে বাধ্য হওয়া অত্যন্ত অবাঞ্ছনীয় ব্যাপার। এই অন্ত্য ব্যবহার জন্ত বণ্টনকারী বা যে কেহই দায়ী হউক, ভারতসরকারের উচিত অবিলম্বে হস্তক্ষেপ করিয়া বিদেশের ও ভারতের চায়ের বাজারের মধ্যে একটা সামঞ্জস্য সাধনের চেষ্টা করা। অবশ্য ভারতীয় চায়ের রপ্তানী বাজার যাহাতে কোনক্রমেই ক্ষতিগ্রস্ত না হয়, সর্বদাই তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিতে হইবে।

## জাতীয়-করণের পর ব্রিটেনের কয়লা শিল্প

জাতীয় স্বার্থের পক্ষে ক্ষুদ্রত্বপূর্ণ শিল্পসমূহ রাষ্ট্রায়ত্ত্ব করা ব্রিটিশ সরকার নীতি হিসাবে গ্রহণ করিয়াছেন। এই নীতি অনুসারেই ১৯৪৭ খ্রিষ্টাব্দে কয়লা শিল্পের জাতীয়করণ হয়। জাতীয়করণের ফলে ব্রিটেনের কয়লা শিল্পের লক্ষণীয় সমৃদ্ধি ঘটিয়াছে। শিল্পে ব্যক্তিগত মালিকানা শিল্পপ্রসারের অনুকূল, ব্যক্তিগতভাবে মুনাকা অর্জনের সম্ভাবনা থাকিলে শিল্পপতি তাহার অর্থ ও অভিজ্ঞতা অধিকতর ফলপ্রসূরূপে কাজে লাগাইবে,—এই ধারণার একটি বদ্ধ ধারণা অনেকের আছে এবং এইরূপ ধারণা রাষ্ট্রের জাতীয়করণ নীতির বিরোধিতা করিয়া থাকে। বলা বাহুল্য, রাষ্ট্রায়ত্ত্ব ব্রিটিশ কয়লাশিল্পের উন্নতি এই ধারণার পরিবর্তনে সাহায্য করিবে। ভারতে রাষ্ট্রীয়-করণের নীতি যথাসম্ভব কার্যকরী হইবে বলিয়াই সকলে আশা করিয়াছিলেন, উপরোক্ত ধারণার বশেই এবং দেশের পণ্যভাবের বিবেচনায় কতৃপক্ষ এই পরিকল্পনা দশ বৎসরের জন্য স্থগিত হইয়াছে।

সম্প্রতি ব্রিটেনের জাতিদল কোল বোর্ড বা জাতীয় কয়লা পরিষদের ১৯৪৯ খ্রিষ্টাব্দের রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে। এই তৃতীয় বার্ষিক রিপোর্টে ব্রিটিশ কয়লা শিল্পের সর্বাঙ্গীণ উন্নতির স্পষ্ট পরিচয় আছে। খনি হইতে কয়লার উৎপাদন বৃদ্ধি, উৎপাদন ব্যয় হ্রাস, রপ্তানী বৃদ্ধি ইত্যাদি নানা দিক হইতে সাক্ষ্যলাভ করিয়া ব্রিটেনের কয়লাশিল্পে আলোচ্য বৎসরে ২৫ লক্ষ পাউন্ড মুনাফা হইয়াছে। রিপোর্টে আরও বলা হইয়াছে যে, আলোচ্য বৎসর সরকারী পরিচালনাধীনে ব্রিটিশ

করলাশিল্পে মারাত্মক দুর্ঘটনার সংখ্যা পূর্বে পূর্বে বৎসরের তুলনায় নিম্নতম হইয়াছে।

১৯৪৭ খ্রিষ্টাব্দে ব্রিটেনের খনি হইতে উত্তোলিত করলার পরিমাণ ছিল ১৮,৭২,০০,০০০ টন। ১৯৪৮ খ্রিষ্টাব্দে এই পরিমাণ ১০ লক্ষ টন এবং ১৯৪৯ খ্রিষ্টাব্দে বা আলোচ্য বৎসরে ১৪ লক্ষ টন বৃদ্ধি পাইয়াছে। সর্বসম্মত ব্রিটেনে এবং সর্বত্র বিক্রয়যোগ্য করলার পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ২১,৫০,০০,০০০ টন। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, ব্রিটেনের আর্থিক উন্নয়ন পরিকল্পনার লক্ষ্য (Economic survey target) ২১,৫০,০০,০০০ টন হইতে ২২,০০,০০,০০০ টন। ব্রিটেনের করলা শিল্পের ১৯৪৯ খ্রিষ্টাব্দে উন্নতি পর্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে, ব্রিটেনের করলাশিল্পের সহিত সংশ্লিষ্ট প্রত্যেক ব্যক্তির হিসাবে এ বৎসর ১৯৪৮ খ্রিষ্টাব্দের তুলনায় ২ হাজার করলা বেশী করলা পাওয়া গিয়াছে। ১৯৪৮ খ্রিষ্টাব্দে, অর্থাৎ যুদ্ধ শুরু হইবার আগের বৎসরে ব্রিটেনের প্রতিটি করলাখনি-প্রমিত পিছু যে পরিমাণ করলা উত্তোলিত হইয়াছিল, আলোচ্য ১৯৪৯ খ্রিষ্টাব্দের মাথাপিছু উত্তোলন (২৩ হাজার) তাহার চেয়েও বেশী।

১৯৪৮ খ্রিষ্টাব্দের তুলনায় ৩০ লক্ষ টন বাড়িয়া ১৯৪৯ খ্রিষ্টাব্দে ব্রিটেনের করলা রপ্তানীর পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ১ কোটি ১০ লক্ষ টন। এই করলা রপ্তানী দ্বারা ব্রিটেন ৫ কোটি পাউণ্ডের সমপরিমাণ বিদেশী মুদ্রা অর্জন করিয়াছে। এছাড়া ব্রিটিশ বন্দরসমূহে বিদেশী জাহাজে করলা তুলিয়া দিবার হিসাবে এবং জাহাজী বীমা প্রভৃতিতে ব্রিটেনের আরও ৩৭ লক্ষ ৫০ হাজার পাউণ্ড লাভ হইয়াছে।\*

### ভারতীয় বাণিজ্যিক নৌবহর

ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের নিজস্ব উপকূল ভাগের পরিমাণ ৩২০০ মাইলের মত। এই উপকূলভাগের বাণিজ্য ছাড়া পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের সহিত ভারতের বাণিজ্যের ব্যাপারে প্রচুর জাহাজের দরকার হয়। পণ্যবাহী নৌবহরের হিসাবে ভারতের অবস্থা এখনও শোচনীয়। যুদ্ধের পূর্বে এদিক হইতে ভারতের মধ্যমা আলোচনারই উপযুক্ত ছিল না, সম্প্রতি ভারতসরকার যথেষ্ট আগ্রহান্বিত হওয়ায় এবং সিন্ধিয়া টীম নেভিগেশন, ইন্ডিয়ান টীমসিপ কোম্পানী, ভারত লাইন ইত্যাদি ভারতীয় প্রতিষ্ঠানগুলি দায়িত্বগ্রহণে আগ্রসর হওয়ায় অবস্থার তবু কিছুটা উন্নতি হইয়াছে। ১৯৪৫ খ্রিষ্টাব্দে ভারতীয় সমুদ্রগামী জাহাজের পরিমাণ ছিল ১ লক্ষ ৫০ হাজার টনের মত, ইহা এখন পোনে চার লক্ষ টনে পৌঁছিয়াছে। এই পোনে চার লক্ষ টন জাহাজের মধ্যে ভারতের উপকূলভাগে নিযুক্ত আছে ১ লক্ষ ৯০ হাজার টন এবং বাকীটা ভারতের সহিত ইয়োরোপ, অস্ট্রেলিয়া ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্যে নিয়োজিত রহিয়াছে। এই

বহির্বাণিজ্যে নিযুক্ত ভারতীয় জাহাজের সংখ্যা বর্তমানে ২৪ খানি। ভারতে জাহাজ তৈয়ারীর উপযুক্ত ব্যবস্থা নাই, সিন্ধিয়া টীম নেভিগেশন কোম্পানীর তত্ত্বাবধানে ভিজাপাপত্তনে যে জাহাজ কারখানাটি রহিয়াছে তাহার উন্নয়নের জন্য প্রকৃত চেষ্টা চলিতেছে, কিন্তু এখনও বড় বাণিজ্যপোত নির্মাণে এ কারখানা সাক্ষ্যলাভ করে নাই। ভারত সাধারণতঃ বিদেশ হইতে জাহাজ কেনে, অনেক সময় কেনে পুরানো জাহাজ, এই সব জাহাজের কর্মক্ষমতা অপেক্ষাকৃত কম। এই জন্যই দেখা যায় ভারতের উপকূল বাণিজ্যে ১ লক্ষ ৯০ হাজার টন ভারতীয় জাহাজ যে পরিমাণ মাল ও বাতীবহন করে, তাহা ১ লক্ষ ৪৫ হাজার টন বিদেশী জাহাজের সমানও হয় না।

ভারতসরকার অঙ্গীকার হিসাবে সাহায্য করিতে আগ্রসর হওয়ায় সম্প্রতি ভারতীয় বাণিজ্যিক নৌবহরের ইতিহাসে নূতন অধ্যায়ের হুচনা হইয়াছে। এই নৌবহরের পরিমাণ আগামী পাঁচ বৎসরের মধ্যে ২০ লক্ষ টনে তোলা ভারতসরকারের ইচ্ছা। বলা নিশ্চয়োজন, সরকার প্রত্যক্ষভাবে সাহায্য না করিলে যুদ্ধোত্তর মন্বাবাজারে বেশরকারী প্রচেষ্টায় এই অগ্রগতি সম্ভব নয়। সরকারী কর্তৃপক্ষ অবস্থা উপলব্ধি করিয়াই যৌথভাবে এ বিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতায় এই ব্যবস্থা পরিচালনায় আগ্রসর হইয়াছেন।

উপস্থিত সিন্ধিয়া টীম নেভিগেশন কোম্পানীর সহিত ভারতসরকার সম্মিলিত ভাবে ইষ্টার্ন সিপিং কর্পোরেশন নামে একটি যৌথ প্রতিষ্ঠান গঠন করিয়াছেন। এইরূপ আরও কয়েকটি প্রতিষ্ঠান গঠনের পরিকল্পনা আছে। তবে ১৯৪৭ খ্রিষ্টাব্দে এই পরিকল্পনা অনুমোদিত হইলেও ইহা কার্যকরী হইতে সত্তর দুই বৎসর লাগিয়াছে এবং ঠিক যতটা সচ্ছলতার সহিত কোম্পানী প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব হইয়াছিল, তাহা বাস্তবায়িত হয় নাই। প্রস্তাব হয় যে, ইষ্টার্ন সিপিং কর্পোরেশনের মোট মূলধন হইবে দশ কোটি টাকা এবং ভারতসরকার ইহার শতকরা ৫১ ভাগ শেয়ার বা অংশ গ্রহণ করিবেন। এই প্রস্তাবে সিন্ধিয়া কোম্পানীকে শতকরা ২৬ ভাগ ছাড়া সাধারণ ভারতবাসীর মধ্যে শতকরা ২৩ ভাগ শেয়ার বন্টন করিবার কথা ছিল। বর্তমান মন্বাবাজারে দেশবাসীর নিকট শেয়ার বিক্রয়ে অহুবিধা বিবেচনা করিয়া এখন ভারতসরকার কোম্পানীর শতকরা ৭৪ ভাগ শেয়ার গ্রহণ করিতেছেন এবং সিন্ধিয়া কোম্পানী গ্রহণ করিতেছেন শতকরা ২৬ ভাগ। মূলধন ১০ কোটি টাকা থাকিলেও মাত্র ২ কোটি লাইন কোম্পানী কাজ আরম্ভ করিবে বলিয়া স্থির হইয়াছে। এধারের ভারতসরকারের বাজেটে এই উপলক্ষে ১ কোটি ৪৫ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হইয়াছে। সিন্ধিয়া টীম নেভিগেশন কোম্পানীকেই ম্যানেজিং এক্সেকিউটিভ হিসাবে ইষ্টার্ন সিপিং কর্পোরেশনের পরিচালনার ভার দেওয়া হইয়াছে এবং ভারতসরকারের ভূতপূর্ব বাণিজ্য-সচিব শ্রীযুক্ত সি এইচ ভাবা হইয়াছেন কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান। এই কর্পোরেশনের পরিচালকমণ্ডলীতে ৬ জন সরকারের প্রতিনিধি ও ৩ জন সিন্ধিয়া কোম্পানীর প্রতিনিধি থাকিবেন। এই কোম্পানীর জন্য সম্প্রতি ভারতসরকার প্রত্যেকটি ১০ হাজার টনের

\* ব্রিটেনের করলা শিল্প সম্পর্কিত তথ্যাদি সংগ্রহে ব্রিটিশ ইনকরপোরেশন সার্ভিসের প্রচারপত্র হইতে সাহায্য লওয়া হইয়াছে।

দুইখানি ক্যানাডীয় জাহাজ ক্রয় করিয়াছেন। প্রস্তাব আছে, আগামী তিন বৎসরের মধ্যে এই কোম্পানীর জাহাজের পরিমাণ ১ লক্ষ টন করা হইবে। ইষ্টার্ন সিপিং কর্পোরেশনের জাহাজগুলি বহির্বাণিজ্যে চলাচল করিবে বলিয়া স্থির হইয়াছে। উপস্থিত ইহার ভারতের সহিত সিঙ্গাপুর, মালয়, ইন্দোনেশিয়া, অস্ট্রেলিয়া, পূর্ব আফ্রিকা প্রভৃতির বাণিজ্যে অংশগ্রহণ করিবে।

দেশবাসীর নিকট উক্ত কোম্পানীর অংশ বিক্রীত হইলে পরিচালনার ব্যাপারে দেশবাসীর কিছুটা হাত থাকিত বলিয়া এই পরিকল্পনা বাতিল হওয়ার সকলেই দুঃখিত হইবেন। সিঙ্গিয়া কোম্পানীর জাহাজ ব্যবসায়

অভিজ্ঞতা প্রচুর, তাহাদের ম্যানেজিং এজেন্সিতে স্কুই হইবার কিছু নাই, কিন্তু ম্যানেজিং এজেন্সি প্রথাটিই জটিলবল বলিয়া সরকারের অংশ সম্বিত কোম্পানীর কার্যপরিচালনার ব্যাপারে সরকারী প্রতিনিধিদের সহিত সন্মত ধারণ দেশবাসীর প্রতিনিধিদের স্থান থাকিলেই ভাল হইত। আমাদের মনে হয়, জনসাধারণের নিকট পেমার বিক্রয়ের পরিকল্পনা বাতিল করিবার পূর্বে সরকারের আর একটু তথ্যসহ অগ্রসর হওয়া উচিত ছিল। যাহা হউক, উপরোক্ত কর্পোরেশন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ভারতীয় বাণিজ্যিক নৌবহরের শ্রীবৃদ্ধির সম্ভাবনায় সকলেই আনন্দিত হইবেন।

## ঋষি টলষ্টয়

### শ্রীপ্রভাত হালদার

১৮২৮ খৃষ্টাব্দে কাউন্ট লিওন নিকোলাভিচ টলষ্টয় রাশিয়ার এক ধনীর গৃহে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার জন্ম হয় তাঁহাদেরই জমিদারীর অন্তর্গত “ইয়ান্নায়া পোলিয়ানা” নামক স্থানে। তাঁহার মাতা রাশিয়ার জারের নিকট-আত্মীয় ছিলেন।

এই মনীষী ধনীর ঘরে জন্মগ্রহণ করিয়াও ‘দরিদ্রের মহামানব’ রূপে বিশ্বমানবের বেদনা আপনাত্মক অন্তরে গ্রহণ করিয়াছিলেন। আপনাত্মক হৃদয়ে দারিদ্র্য এবং নিপীড়িত মানবের মর্মান্ববেদনার অংশ গ্রহণ করিয়া জগতের মাঝে তাহাদের দুঃখ বেদনা প্রচার করিলেন।

কিশোর বয়সেই তিনি ‘কাজান’ বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন প্রতিভাবান ছাত্র ছিলেন, কিন্তু যৌবনের প্রারম্ভেই বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ অসমাপ্ত রাখিয়াই বিলাসী জীবন বাপন করিতে আরম্ভ করিলেন।

অকস্মাৎ তাঁহার জীবনের গতি পরিবর্তিত হইয়া যায়, বিলাসের জীবন তাঁহার অন্তরকে ভিত্ত করিয়া তোলে। সেই কারণে তিনি সরল অনাড়ম্বর জীবন যাপনের উদ্দেশ্যে ককেশাস পর্বতের এক নির্জন স্থানে গিয়া বাস করিতে থাকেন। এই নির্জন বাসের পূর্বে অজস্র ভোগের মধ্যে শান্তি খুঁজিয়া পান নাই বলিয়াই তিনি নির্জনে বাস করেন।

এই ককেশাস পর্বতের নির্জন প্রান্তে তাঁহারই এক

ভ্রাতা তাঁহাকে সৈনিক হইবার জন্ত প্ররোচিত করেন। অতঃপর সৈনিক বিভাগে তিনি একটি দায়িত্বপূর্ণ পদ গ্রহণ করেন। এই সৈনিক বিভাগেই তাঁহার হৃদয়ের সাহিত্যের বৃত্তিগুলি পরিপূর্ণ ভাবে প্রকাশ পায়।

এই স্থানে কাঁথের অবসরে তিনি প্রথম প্রথম গল্প লিখিতে আরম্ভ করেন ও সেই গল্পগুলি তথাকথিত সাহিত্য-সমাজে বিশেষ ভাবে আদৃত হয় এবং অল্পদিনের মধ্যেই সাহিত্যিক হিসাবে তাঁহার খ্যাতি দেশময় ছড়াইয়া পড়ে।

সৈনিক জীবন আর ভাল না লাগায় তিনি কার্য পরিত্যাগ করিয়া সেণ্ট পিটসবার্গে ফিরিয়া আসেন। এই স্থানেই তাঁহার সাহিত্যজীবনের সূত্র হয়। সেণ্ট পিটসবার্গের সাহিত্যিকরা সমাদরে তাঁহাকে তাঁহাদের সাহিত্য গোষ্ঠীর মধ্যে টানিয়া লন। এই স্থানেই টুর্গেনিভের সহিত তাঁহার প্রথম পরিচয় লাভ ঘটে। War and Peace এই সময়ে রচিত হয়।

কোন কোন সমালোচকের মতে War and Peace (1862-69) তাঁহার শ্রেষ্ঠ রচনা। তৎকালীন রাশিয়া অথবা ইহার সাহিত্যকে জানিতে হইলে সর্বপ্রথম War and Peace পড়া আবশ্যিক। কারণ এই পুস্তকে রাশিয়ার প্রকৃত রূপ-ই ফুটিয়া উঠিয়াছে।

Maurice Baring বলিয়াছেন—“For the first time is an historical novel instead of saying-

This is very likely true, or what a wonderful work of historical reconstruction! We feel that we were ourselves there, that we know those people; that they are a part of our very own past."

সৈনিক বিভাগের কার্য ত্যাগ করিবার পর তিনি সেট পিট্‌সবার্গ হইতে জার্মানী, ইটালী ও অন্যান্য দেশ ভ্রমণ করিয়া আবার সেট পিট্‌সবার্গে ফিরিয়া আসেন ও বিবাহ করিয়া আপন জমিদারির উপর দৃষ্টি রাখেন।

এই জমিদারির মধ্যে যখন তিনি বাস করিতেছিলেন তখন দরিদ্র কৃষকদের দুঃখ-দুর্দশা তাঁহার অন্তরকে আকর্ষণ করে। এই দরিদ্র কৃষকদের দুঃখ দৈন্ত্য তাঁহার অন্তরকে এতদূর বিচলিত করে যে তিনি তাহাদের দুঃখ মোচনের জন্য দৃঢ়সঙ্কল্প হইয়া তাহাদের উন্নতির জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করেন এবং ইউরোপের বিভিন্ন দেশ পরিভ্রমণ করিয়া কৃষকদের জীবনযাত্রা প্রণালী লক্ষ্য করিয়া আসেন। এই সময়ে তাঁহার অত্যন্ত শ্রেষ্ঠ উপন্যাস "Anna Karenina" রচনা করেন (1875-77.)।

১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে সেট পিট্‌সবার্গের ঘটনাকে কেন্দ্র করিয়া এই "Anna Karenina"র জন্ম হয়। পুস্তকখানির মধ্যে রাশিয়ার প্রকৃত রূপ ফুটিয়া উঠিয়াছে।

টলষ্টয় শেষ জীবনে একখানি বিরাট উপন্যাস রচনা করেন। এই পুস্তকখানির নাম "Resurrection." এই পুস্তক রচনা কালে লেখকের বয়স ছিল ৭০ বৎসর (1898)। কেহ কেহ ইহাকেই টলষ্টয়ের শ্রেষ্ঠ রচনা বলেন। টলষ্টয় আর একখানি উৎকৃষ্ট উপন্যাস রচনা করেন ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে—এই পুস্তকখানির নাম "Kreutzar Sonata."

তাঁহার অন্যান্য পুস্তকগুলি এই—"Boyhood, Childhood and Youth." "The Two Hussars." "Family Happiness." "The Cosacks." (সৈনিক জীবনের ইতিহাস লইয়া এই পুস্তক রচিত হয়) "Polikuska." "The Death of Ivan Ilych." "Holstomer." "The Story of a Horse." "Master and Men." এবং তাঁহার মৃত্যুর পর "Hadji Murad," (ইহাও কণাক সৈনিকদের লইয়া লিখিত)

প্রকাশিত হয়। তাঁহার রচিত গল্পগুলিও অতি সুন্দর; "Sevastopol." নামক পুস্তকখানির মধ্যে তাঁহার সৈনিক বৃত্তির চমৎকার রূপ ফুটিয়া উঠিয়াছে। তাঁহার ছোট গল্পের যে সংকলন আছে তাহাও অতি সুন্দর। "Twenty Three Tales." নামক গল্প সংকলনখানি তাঁহার মৃত্যুর পর পৃথিবীর অন্ততম শ্রেষ্ঠ গল্প-সংকলন হিসাবেই প্রকাশিত হয়।

টলষ্টয়ের রচনার মধ্যে "সৌন্দর্য কি?" তাহাই বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহার রচনার মধ্যে সৌন্দর্য, সরলতা এবং সত্যতার রূপ পরিষ্কার পাওয়া যায়। এই সকল ছোট গল্পের মধ্যে "বর্তমান সাহিত্যের রূপ"ই লেখক দিয়াছিলেন। সাহিত্যের প্রাথমিক পাঠ হিসাবে যদি এই গল্পগুলিকে লওয়া হয়, তাহাতেও কোনও রূপ ভুল হয় না। একথা প্রাচ্যের সকল সমালোচকই স্বীকার করেন।

১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে টলষ্টয় "Kreutzar Sonata." নামক স্মরণীয় পুস্তকখানি রচনা করেন। তাহাতে খৃষ্টধর্ম মতে বিবাহ, কৌমার্য, সত্য প্রভৃতি বিষয়গুলি অতি নিপুণতার সহিত সুন্দর ভাবে আলোচনা করেন। এই পুস্তকখানি যে কেবল মাত্র রাশিয়ার জন্য লিখিত হইয়াছিল তাহা নহে। নানা দেশের সামাজিক সমস্যা, ধর্ম প্রভৃতি বিষয় একটি ট্রেনের কয়েকজন যাত্রীর আলোচনার মধ্য দিয়া বুঝাইতে চাহিয়াছেন।

সমাজের প্রতি তাঁহার ভবিষ্যৎ বাণী এবং যাহা তিনি সমাজের নিকট দাবী করিয়াছেন তাহা অতি সুন্দর রূপ গ্রহণ করিয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে।

টলষ্টয় চিরকালই ঋষি প্রকৃতির ছিলেন। পূর্বেই বলিয়াছি তিনি নিজের দেশের নিপীড়িত মানবের মধ্য দিয়া বিশ্ব-মানবের দুঃখ, দৈন্ত্য ও বেদনার সন্ধান পাইয়াছিলেন। তাই তিনি সমস্ত ধন ঐশ্বর্য পরিত্যাগ করিয়া মানবের দুঃখ দুর্দশা মোচনের ব্রতে লেখনি ধরিয়াছিলেন। সেই কারণে আমরা দেখিতে পাই যে তাঁহার লেখনিতে দুঃখ-দৈন্ত্য ও অভাব অনটনের চিত্রই অতি সুন্দর ভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। তাঁহার অসংখ্য উপন্যাসের মধ্যে "Child hood" (1852). "Cosacks" (1862). "War and Peace" (1862-69). "Anna Karenina" (1875-77). "The Kreutzar

Sonata". "Darkness" (1886). "Resurrection" (1898) এই উপন্যাসগুলি বিশ্ব-সাহিত্যের দরবারে অতি উচ্চ আসন লাভ করিয়াছে।

১৯০৮ খৃষ্টাব্দের এক ভীষণ দুর্ঘটনায় গীতের স্রোতে সমস্ত ধন ঐশ্বর্য পরিত্যাগ করিয়া অতি দীন বেশে নিরুদ্দেশ

যাত্রা করেন। তাহার পর হইতে দুই বৎসর কোনও সংবাদ পাওয়া যায় নাই। 'অতঃপর ১৯১০ খৃষ্টাব্দে রাশিয়ার একটি সাধারণ রেলওয়ে ষ্টেশনে নিউমোনিয়া আক্রান্ত এক ভিখারীকে পাওয়া যায়। ইনিই ঋষি টলষ্টয়। এই রেলওয়ে ষ্টেশনেই তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন।

## জয়দেবের ছন্দ

শ্রীমধীভূষণ ভট্টাচার্য্য এম্-এ

জয়দেবের গীতগোবিন্দ সংস্কৃতে লেখা ষাটশ সর্গে বিভক্ত একটি গীত-কাব্য। ইহাতে ৮০টি শ্লোক ও ২৪টি গীত আছে। ইহাদের মধ্যে ৭৭টি শ্লোক বিভিন্ন বৃত্তছন্দ। একটি শ্লোক জাতিছন্দে ও অবশিষ্ট ২টি শ্লোক ও ২৪টি গীত অপভ্রংশ ছন্দে রচিত। আমরা প্রথমে জয়দেবের সংস্কৃত ছন্দ ও পরে তাহার অপভ্রংশ ছন্দ সম্বন্ধে আলোচনা করিব।

জয়দেব সংস্কৃত ছন্দ রচনায় বিশেষ বৈপ্লবের পরিচয় দিয়াছেন। গীতগোবিন্দের কয়েকটি শ্লোকে শিখরিণী, শার্দূলবিক্রীড়িত, পুষ্পিতাশ্রা, উপেলবজ্রা ও শ্রঙ্গরা—এই কয়টি সংস্কৃত ছন্দের উল্লেখ পাওয়া যায়। শ্লোকগুলি যে এই সকল ছন্দে রচিত ইহা বুঝাইবার অল্প কবি ছন্দের নাম কৌশলে শ্লোকগুলিতে ব্যবহার করিয়াছেন। ইহা হইতে বুঝা যায়, সংস্কৃত ছন্দ-শাস্ত্র তিনি যে ভালভাবে আয়ত্ত করিয়াছিলেন শুধু তাহাই নহে, ছন্দ সম্বন্ধে তিনি নিজেও যেন সচেতন থাকিতেন, সেইরূপ ছন্দের প্রতি পাঠক ও শ্রোতাদেরও মনোযোগ আকর্ষণ করিতে চাহিতেন। নিম্নলিখিত শ্লোকটিতে ছন্দের নামটি (শিখরিণী) কবি কিরূপ কৌশলে ব্যবহার করিয়াছেন, তাহা লক্ষ্য করিবার বিষয় :

হুরালোকঃ শ্লোকস্তবক-নবকালোক লতিক।

বিকাশঃ, কালারোপন-পবনোহপি ব্যয়তি।

অপি জাম্বুভূজী রপিত রমণীয়া ন মুহুঃ

প্রতিলিখিতানাং সখি শিখরিণীয়াং স্থয়তি। (২, ২০)

শার্দূলবিক্রীড়িত ছন্দ ভাবভূতির জায় জয়দেবেরও বিশেষ প্রিয় ছিল বলিয়া মনে হয়। তিনি ৭৮টি শ্লোকের মধ্যে ৩৭টিই এই ছন্দে লিখিয়াছিলেন। গীতগোবিন্দে কোন ছন্দ কতবার ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহার তালিকা দেওয়া হইল :

বৃত্তছন্দ

শার্দূলবিক্রীড়িত

বসন্তললক

৩৭

৮

ক্রান্তবিলম্বিত	১
শিখরিণী	৮
মালিনী	৩
বংশস্থ	৩
হরিণী	৮
অমুটুপ	৩
উপেলবজ্রা	২
পুষ্পিতাশ্রা	৩
শ্রঙ্গরা	১
জাতিছন্দ	
আর্য্য	১

আশ্চর্যের বিষয় মন্যাক্রান্তা ছন্দে একটি শ্লোকও নাই। অবশ্য কালিদাস মন্যাক্রান্তা ছন্দে যেরূপ উৎকর্ষের পরিচয় দিয়াছেন, তাহার পর অল্প কবির পক্ষে মন্যাক্রান্তা ব্যবহারে কুঠা হওয়া স্বাভাবিক।

জয়দেবের কয়েকটি বৃত্তছন্দের উপর অপভ্রংশ পদ্ধতির প্রভাব পড়িয়াছে। শার্দূলবিক্রীড়িত ছন্দে লেখা নিম্নলিখিত শ্লোকটি পড়িলেই ইহা বুঝা যাইবে :

বেদামুচ্ছরতে। অগস্তিবহতে। ভূগোলমুচ্ছিজতে

দৈত্যং দায়রতে বলিং ছলরতে ক্ষত্রকরং কুরুতে।

পৌলস্ত্যংরতে হলং কলরতে কার্ণণ্যমাতরতে

য়েচ্ছান্ মুচ্ছরতে দশাকৃতিকৃতে কৃকায়ভূত্যং নমঃ।

(১, ১৩,)

এখানে যতি ও মধ্যমুদ্রাসের সাহায্যে এক একটি পংক্তিকে স্পষ্টতঃ তিন ভাগে ভাগ করিয়া শার্দূলবিক্রীড়িত ছন্দে এক প্রকার তরঙ্গ বৈচিত্র্য সৃষ্টি করা হইয়াছে। এই মিতাক্ষরতা ও যতি-প্রাধান্য অপভ্রংশ এবং পরবর্তী প্রাদেশিক ভাবের বৈশিষ্ট্য। উক্ত শার্দূল-বিক্রীড়িত চরণগুলিতে বাংলা দীর্ঘ ত্রিপদীর আভাষ পাওয়া যাইতেছে।

## অপভ্রংশ ছন্দ

অবশ্য এই সকল শ্লোক অপেক্ষা গীতগোবিন্দের ২৪টি গীতই অধিক প্রসিদ্ধ। এই গীতগুলি অপভ্রংশ মাত্রাছন্দে রচিত। ইহাদিগকে চারিটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে।

## প্রথম শ্রেণী

এই শ্রেণীর ছন্দগুলি প্রাচীন জাতিছন্দের আদর্শ-অনুসারে রচিত। ২৪টি গীতের মধ্যে ১৯টিই এই জাতীয় ছন্দে লেখা হইয়াছিল। জাতিছন্দের অপর নাম মাত্রা ছন্দ। একটি পঙ্ক্তিতে ব্যবহৃত মাত্রা-সমষ্টির উপর এই ছন্দের গঠন নির্ভর করে। কিন্তু ইহার আর একটি বৈশিষ্ট্য আছে। জাতিছন্দের এক একটি চরণ চার মাত্রার 'গণ' দ্বারা বিভক্ত করা যাইতে পারে। আর্থ্যা ছন্দেই চার মাত্রার গণের সূত্রপাত হইয়াছিল, বৈতালীয় ও ঔপশ্চন্দসিক ছন্দে এই নূতন গণবিভাগ আরও স্পষ্ট। কিন্তু তখনও উচ্চারণে স্বরাধাত-পঙ্ক্তি প্রতিষ্ঠা লাভ করে নাই ও কবিতা তখন হ্রস্ব করিয়া পড়া হইত বলিয়াই বোধ হয় প্রাচীন জাতিছন্দের চার মাত্রার চলন ছন্দের গঠনকে প্রভাবিত করিতে পারে নাই। অপভ্রংশ যুগের উচ্চারণে স্বরাধাত প্রাধান্য লাভ করায় কবিতা আবৃত্তির সময় এক প্রকার ষোঁক উৎপন্ন হইয়া পঙ্ক্তিপঙ্ক্তিকে কয়েকটি ছোট ছোট অংশে বিভক্ত করিত। মিত্রাকরতা প্রবর্তিত হওয়ায় এই ষোঁক বিভাগগুলি আরও স্পষ্টতা লাভ করে। পূর্বের শার্দূলবিক্রীড়িত ছন্দের একটি উদাহরণে তাহা দেখান হইয়াছে। একপ্রকার জাতিছন্দে এই ষোঁক, মিল ও চার মাত্রার 'গণ' বিশেষ প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল। সংস্কৃত ছন্দ-শাস্ত্রে এই ছন্দ-গোষ্ঠীর নাম মাত্রাসমক ছন্দ। আবার আলোচ্য প্রথম শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত গীতগুলি এই মাত্রাসমকের আদর্শে রচিত। এই শ্রেণীর মধ্যে নানাপ্রকার ছন্দের প্যাটার্ন পাওয়া যাইতেছে। ইহাদের আবার কয়েকটি উপবিভাগ আছে :—

(ক) একপ্রকার মাত্রাসমক ছন্দের নাম পাদাকুলক। ইহাও চার মাত্রার চারিটি অংশে বিভক্ত ১৬ মাত্রার ছন্দ; তবে অস্তান্ত মাত্রাসমকের সহিত ইহার পার্থক্য এই যে, পাদাকুলকে লঘুগুরু অক্ষরের ব্যবহার সম্বন্ধে কোন বিধি-নিষেধ নাই। ইহাই বাঁটি অপভ্রংশ ছন্দ। প্রসিদ্ধ মোহনগরের শ্লোকগুলি এই ছন্দে রচিত। অনেকে ইহাকে পঙ্ক্তিকা ছন্দও বলেন। পাদাকুলকের সহিত জয়দেবের এই ছন্দের সামান্য পার্থক্য এই যে, পাদাকুলক 'চতুষ্পদী' ছন্দ বলিয়া গণ্য হয়, কিন্তু জয়দেবের ঐ জাতীয় ছন্দে দুই চরণের এক একটি স্তবক (stanza)। এই ছন্দ-রীতি পরবর্তী বাংলা ছন্দে অমু্যত হইয়াছিল। গীতগোবিন্দের ৪টি গীত (গীত সং ২, ১২, ১৪, ১৮) এই রূপ ৪+৪+৪+৪=১৬ মাত্রার বিপাদ পাদাকুলক ছন্দে রচিত। একটি দৃষ্টান্ত :—

তনবিনি। হিতমপি ॥ হারমু। দারম্।

সাঁ বহুতে কুশ তমুরিব ভারম্।

সরস বপুঁপনি মলয়জ পঙ্কম্।

পঙ্কতি বিধিব বপুঁবিশ শঙ্কম্। (গীত, ২)

(ক১) জয়দেব এইখানেই প্রাচীন শাস্ত্র-সম্মত ছন্দ পঙ্কতির নিকট হইতে বিদায় লইলেন। কারণ অবশিষ্ট সমস্ত ছন্দই কতকটা নূতন ধরণের। আমরা প্রথমে পাদাকুলক হইতে উৎপন্ন এক নূতন ছন্দের উল্লেখ করিতে পারি। প্রচলিত পাদাকুলক পঙ্ক্তির শেষে একটি মাত্রা কমাইয়া এই নূতন ছন্দ সৃষ্টি করা হইয়াছে। ইহার মাত্রা-বিভাগ—  
৪+৪+৪+৩=১৫ | ১৬ সংখ্যার গীতিটি এই ছন্দে রচিত।—

অনিল ত-। রল কুব-। লয়-নয়। নেন।

তপতি ন সা কিশলয় শরনেন ॥

শ্রীজয়দেব ভণিত বচনেন।

প্রবিশতু হরিরাপি হৃদয় মনেন ॥

(খ) এবার আমরা যে ছন্দের কথা বলিব, তাহাকে জয়দেবের বিশেষ প্রিয় ছন্দ বলা যায়, কেননা প্রথম শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত ১৯টি গীতের মধ্যে নয়টিই (গীত সং—৩, ৪, ৫, ৬, ৮, ১৭, ২০, ২২, ২৩) এই ছন্দে রচিত। ইহাও পাদাকুলকের স্তায় চার মাত্রার গণ-বিভক্ত ছন্দ। কিন্তু ইহার উত্তর চরণেই ১৬ মাত্রার পরিবর্তে ৪+৪+৪+৪+৪+৪+৪=২৮ মাত্রা পাওয়া যায়। এই ছন্দের উদাহরণ :—

(১) ফেলিক। লাকুতু। কেন চ। কাচিদ। যুং যম্। না জল কুলে।  
মঞ্জুল বঞ্জল কুঞ্জগতং বিচকর্ব্ব করণে দ্রুকে ॥

(গীত, ৪)

(২) উদ্বদ মদনমনোরথপথিক বধু জন জনিত বিলাপে।  
অলিকুল সঙ্কুল কুহুম সমুহ নিরাকুল বকুল কলাপে ॥

(গীত, ৩)

(খ ১) এই ছন্দে ১৬ মাত্রার পর প্রধান বতি-পতন হয়। কিন্তু ১১ সংখ্যক গীতের প্রতি পঙ্ক্তির দুই স্থানে (৮ ও ১৬ মাত্রার পরে) প্রধান ষোঁক পড়ায় এবং ঐ দুই স্থানে মিল ব্যবহৃত হওয়ার এই ছন্দের এক একটি পঙ্ক্তি স্পষ্টতঃ তিনভাগে বিভক্ত হইয়া পড়িতেছে। এই জাতীয় ছন্দকে বাংলা ত্রিপদীর পূর্বসূরী বলা যাইতে পারে, পূর্বের তাহার উল্লেখ করিয়াছি। দৃষ্টান্ত :—

পততি প। তত্রে ॥ বিচলিত। পত্রে ॥ শবিত। ভবদ্রপ। বাসম্।

রচরতি শরনং সচকিত মরনং পঙ্কতি তব পদানম্ ॥

মুখরমধীর ত্যজ বঙ্গীর রিপুঁবিশ কেলিষু লোলম্।

চল সখি কুঞ্জং সতিমির পুঞ্জং শীলর মীল নিচোলম্ ॥

(খ ২) ঋ-শাধা বর্ণিত ছন্দের আরও দুইটি নূতন রূপ গীত-গোবিন্দের দুইটি গীতে পাওয়া যায়। ইহার একটিতে উক্ত ১৮ মাত্রার ছন্দ-পঙ্ক্তি হইতে এক মাত্রা কমাইয়া ও পূর্ব-বর্ণিত উপায়ে প্রবল বতি-পতন ও মিলের সাহায্যে এক একটি পঙ্ক্তিকে তিনভাগে বিভক্ত করিয়া (৪+৪।৪+৪।৪+৪+৩=২৭) ছন্দ বৈচিত্র্য উৎপন্ন করা হইয়াছে। যেমন :—





উদাহরণ :-

মধুমতি । মধুকুল । কলিত রা-। বে ।

বিলস মদন রস-। সরস ভা-। বে ॥

মধুরতর শিক নিকর-নিদ্রা মুখের ॥

বিলস মদনরুচি রুচির শিখরে ॥

( গীত, ২১ )

(২) এবার যে মিশ্র ছন্দটির কথা বলিব তাহাতে জয়দেব অপূর্ণ নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়াছেন । ইহাকে ‘চতুষ্পাদ’ ছন্দ বলিয়া গণ্য করিতে চাহি, ক-খ—ক-খ—এভাবে মিত্রাকর-বিশ্ভাস করা হইয়াছে ।

১ম চরণে—৩+৩+৫=১১ মাত্রা, মিল ক

২য় চরণে—৩+৩+৩= ৯ ” ” খ

৩য় চরণে—৩+৫+২=১০ ” ” ক

৪র্থ চরণে—৪+৪+৫=১৩ ” ” খ

উদাহরণ :-

মহতি । শিশির । ময়ুখে ।

মরণ । মমুক । রোতি ।

পততি । মদন বিশি । খে ।

বিলপতি । বিকল ত । রোতি ॥ •

ধ্বনতি মধুপ সমুহে ।

অবগমপিদ্বীতি ।

মনসি বলিত বিরহে ।

নিশিনিশি রঞ্জমুপযাতি ॥

( গীত, ১০ )

এই ছন্দটির আর একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, ইহার প্রতি চরণের প্রথম ছয়টি অক্ষর লঘু এবং অবশিষ্টাংশ (১) গুরু+লঘু, (২) লঘু+গুরু+গুরু, (৩) লঘু+লঘু+গুরু এবং (৪) লঘু+লঘু+গুরু+লঘু অক্ষর দ্বারা রচিত । সুতরাং ইহাকেও অক্ষর ছন্দ বলা যাইতে পারে । বৃত্তছন্দ অনুসারে ইহার গণ-বিশ্ভাস হইবে—ন-ন-স, ন-ন-গ-ল, ন-ন-স, ন-ন-স-ল ।

জয়দেবের অপভ্রংশ ছন্দে গুরু অক্ষরের প্রয়োগ সৰ্ব্বত্র সাধারণ ভাবে দুই একটি কথা বলিব । সুম-মাত্রিক ছন্দে (অর্থাৎ চার মাত্রার ‘গণ-গণিত ছন্দে’) গুরু অক্ষর সাধারণতঃ অসুম মাত্রার ব্যবহৃত হইয়াছে । ইহাদের মধ্যে ৪, ৭, ১১, ১৫ প্রভৃতি মাত্রা অপেক্ষা ১, ৫, ৯, ১৩ প্রভৃতি মাত্রার গুরু অক্ষরের প্রয়োগই বেশী । ইহার ফলে ঐ সকল অক্ষর উচ্চারণকালে এক প্রকার তরঙ্গ-ভবের সৃষ্টি হইয়া থাকে । জয়দেবের সমস্ত অপভ্রংশ ছন্দেই শেব ‘গণে’ অন্ততঃ একটি গুরু অক্ষরের প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায় । সেজন্য পংক্তির শেষ অংশে একটি ষোড়শ অক্ষর হইয়া থাকে । অধিকাংশ বাংলা ছন্দেও এই বৈশিষ্ট্যটুকু পাওয়া যাইবে ।

জয়দেবের ছন্দ বিশ্লেষণ করিবার সময় কোন কোন গণের মাত্রা-দৈর্ঘ্য সৰ্ব্বত্র পাঠকগণের মধ্যে মতভেদ হইতে পারে । আমরা

বাহাকে ৪+৪ এইরূপ দুইটি ‘গণ’ বলিয়াছি, অনেক হয়ত কোন কোন ক্ষেত্রে উহা ৮ মাত্রার একটি ষোড়শ পড়িবেন, অথবা ঐরূপ কোন কোন গণকে ২+৬ বা অন্ত কোন ভাবে গ্রহণ করিবেন । অনেক সময় সুম মাত্রার গুরু অক্ষর ব্যবহার করিয়া আটমাত্রার এক একটি যুক্ত গণ সৃষ্টি হইয়াছে । যেমন, ধুমকেতুমিব’, ‘কনকদন্ত-রুচি’, ‘বজ্রজীবমধু’ । সুতরাং এক একটি গীতের গণবিভাগ ও গণ-দৈর্ঘ্য সম্বন্ধে আমরা যেরূপ বিধি নির্দেশ করিয়াছি, সমগ্র গীতের মধ্যে কাহারও কাহারও মতে দুই এক ক্ষেত্রে তাহার ব্যতিক্রম হইতে পারে । কিন্তু তাহাতে কিছু আসে যায় না । জয়দেবের ছন্দের প্রধান তিন শ্রেণীর চলন, অর্থাৎ চার, পাঁচ ও সাত মাত্রা সম্বন্ধে নিশ্চয়ই কোন মতভেদ হইবে না ।

‘গণ’ বিভাগ সম্বন্ধে আর একটি কথা মনে রাখিতে হইবে । জয়দেবের সময়েও ছন্দ সংস্কৃত ছন্দের স্থায় পংক্তি-নির্ভর ছিল, বাংলা ছন্দের মত পর্ক-নির্ভর হয় নাই অর্থাৎ একটি চরণে মোট কত মাত্রা ব্যবহৃত হইল তাহার উপরেই ছন্দের গঠন নির্ভর করিত। ‘গণ’ বিভাগ তখন ছন্দের গঠন-নির্ণয়ে সহায়তা করিত না । কিন্তু বিভিন্ন পর্বের বা পদের মাত্রা-দৈর্ঘ্যের উপরেও বাংলার ছন্দ-প্রকৃতি নির্ভর করে । প্রকৃত ও অপভ্রংশ ছন্দেই যে এই প্রকার যতি বিজ্ঞত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ‘গণ’ বা পর্বের সূত্রপাত হইয়াছিল, ইহা দেখাইবার জন্যই চার, পাঁচ সাত মাত্রার গণের কথা বলা হইল ।

গীতগোবিন্দে গীতগুলির রাগ ও তালের উল্লেখ দেখা যায় । ঠিক এই সকল রাগ ও তাল জয়দেবের সময় হইতেই প্রচলিত ছিল কিনা জানি না এবং সমস্ত সংস্করণই এক একটি গীতের রাগ ও তাল সম্বন্ধে একমত বলিয়াও মনে হয় না । তথাপি মিথিলা হইতে প্রকাশিত লোচন কবি কৃত ‘রাগ তরঙ্গিনী’তে এই সকল রাগ রাগিণীকেই ছন্দের নাম বলিয়া গণ্য করার চেষ্টা হইয়াছে । রাগ ও তাল অনুযায়ী গীতগুলির শ্রেণী বিভাগের সহিত ছন্দ বিশ্লেষণ করিয়া আমরা যেরূপ শ্রেণী বিভাগ করিয়াছি, তাহার কোন মিল নাই । যেমন, ১০টি গীত ৪×৭=২৮ মাত্রার ছন্দে রচিত । কিন্তু এই গীতগুলি বসন্ত ও যতি, রামকিরী ও যতি, শুক্লরী ও যতি, মালব ও একতালি, কর্ণাট ও যতি শুক্লরী ও একতালি, ভৈরবী ও যতি, বসন্ত ও যতি, দেশ বরাড়ী ও রূপক এবং রামকিরী ও যতি—এই সকল রাগ ও তালে গীত হইবার কথা । সুতরাং রাগ-রাগিণীর এমন কি তালের নাম অনুসারেও জয়দেবের ছন্দের শ্রেণীবিভাগ সমর্থন করা যায় না ।

জয়দেব সংস্কৃত যুগের শিক্ষা এবং অপভ্রংশ যুগের রুচি গ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহার দুটি ছিল অনাগত নব-যুগের দিকে । সেজন্য তাহার সাহিত্যে একাধারে প্রাচীন কাব্যের প্রভাব ও অপভ্রংশের প্রাদেশিক সাহিত্যের সূচনা দেখিতে পাওয়া যায় । জয়দেবের ছন্দ আলোচনা করিয়া আমরা কবির প্রতিভার এই দিকটি দেখাইতে চেষ্টা করিলাম ।



মহাপুরুষদের আবির্ভাব ও তিরোভাব দিবস প্রত্যেক বিদ্যালয়ে পালন করা উচিত। ঐ দিবসগুলিতে মহাপুরুষদের জীবনের বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া প্রবন্ধ ও কবিতা লিখিতে ছেলেদের উৎসাহিত করা উচিত। মহাপুরুষদের জন্মস্থান, কর্মক্ষেত্র প্রভৃতি মাপের সাহায্যে শিশুদের দেখাইলে তাহারা আনন্দ পাইবে এবং দেশের ভৌগোলিক অবস্থান সম্বন্ধে জ্ঞানলাভও করিতে পারিবে। মহাপুরুষদের বাণী হইতে সার্বজনীন বিশ্বেদহীন অংশগুলি বাছিয়া শিশুদের মধ্যে বাহাদের হাতের লেখা ভাল তাহাদের দ্বারা লিখাইয়া দেওয়ার চেষ্টা উচিত। মহাপুরুষদের প্রতিকৃতি তাহাদের বিশিষ্ট কর্মক্ষেত্রের ছবি, শিক্ষক মহাশয় শিশুদের সাহায্যে আঁকিবার চেষ্টা করিবেন। মহাপুরুষদের জন্ম, কর্ম ও বাণী দেশের রাজনৈতিক ও সামাজিক সমস্যার সহিত বন্টিভাবে যুক্ত। শিশুদের বয়স ও বোধ-শক্তির অনুযায়ী করিয়া তাহাদের কাছে সাময়িক রাজনৈতিক ও সামাজিক অবস্থা বর্ণনা করা যাইতে পারে। —বাঙলার শিক্ষক

\* \* \* \*

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আই-এ ও আই, এস-সি পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হইয়াছে। এই পরীক্ষার গতবারের তুলনায় অনেক কম ছাত্রছাত্রী পাশ করিয়াছে। প্রায় ১৭ হাজার পরীক্ষার্থীর মধ্যে আই-এ পরীক্ষায় শতকরা ২৯ জন এবং আই, এস-সি পরীক্ষায় মাত্র শতকরা ৩১ জন ছাত্র ও ছাত্রী উত্তীর্ণ হইতে পারিয়াছে। অপর দিক হইতে হিসাব করিলে আই-এ পরীক্ষায় শতকরা ৭১ জন ও আই, এস-সি পরীক্ষায় শতকরা ৬৯ জন ছাত্রছাত্রী ফেল করিয়াছে। এই অত্যধিক ফেলের সংখ্যা যেমন উদ্বেগজনক, তেমনি হতাশাব্যঞ্জক। যদিও এক বিষয়ে অকৃতকার্য হইবার জন্ত ২১ শত পরীক্ষার্থী পুনরায় সেই বিষয়ে পরীক্ষা দিবার দ্বিতীয় সুযোগ পাইবে, তথাপি সে পরীক্ষায় পাশ হইলেও তাহাদের কার্যতঃ একটি বৎসর নষ্টই হইবে। যে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় শতকরা মাত্র ২৯ জন বা ৩১ জন ছাত্র পাশ হয়, সেই বিশ্ববিদ্যালয়ের এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনস্থ কলেজগুলির পক্ষে ইহা অগৌরবের বিষয়। ছাত্রগণ যথাযথভাবে পড়া-শুনা করে না বলিয়াই পরীক্ষার ফল এত খারাপ হয়—ইহাও যেমন আংশিক সত্য, অন্তর্য্যিক কলেজ কর্তৃপক্ষ যথাযথভাবে ছাত্রদিগকে পরীক্ষার জন্ত প্রস্তুত করিয়া পরীক্ষা দিতে পাঠান না, ইহাও তেমনি সত্য। —মুগ্ধানন্দ

\* \* \*

ভারতের বাইরে পৃথিবীর অন্যান্য দেশগুলিতে কোথায় কতজন ভারতবাসী আছেন এ বিষয়ে আজ সকলেই জানিতে বেশ উৎসুক। বিশেষ ভারতবাসীদের নাগরিক বলিয়া এই সব প্রবাসী ভারতীয়দের

বর্তমান দাবী ও তার নানা প্রতিক্রিয়া ইত্যাদির সহিত সকলেই কিছু কিছু পরিচিত আছে। একটি রাষ্ট্রের অধিবাসীদের প্রবাসে থাকাকালীন এই ভাবে আশুগত্যা রক্ষার বিষয়ে পশ্চিম দ্বীপপুঞ্জ (west Indies) থেকে জনৈক ভারতীয় ভারত থেকে রাষ্ট্রভাষার কিছু কিছু শিক্ষক প্রেরণের অনুরোধ জানিয়েছেন। ভারত থেকে পৃথিবীর নানা দেশে ভারতীয়দের এইভাবে ছড়িয়ে পড়া গত দেড়শ' বছর ধরে যে ভাবে চলছিল, যার ফলে কোন কোন দেশে ভারতীয়রাই এখনও কৃষি, বাণিজ্য, শিল্প ও অন্যান্য জীবিকায় শ্রেষ্ঠ স্থান দখল করিয়া আছে। এক্ষণে প্রবাসী ভারতীয় নাগরিক হিসাবে যোগদত্ত রক্ষায় তারা ভারতের রাষ্ট্রভাষায় তাদের সমস্ত সম্ভাবিতদের শিক্ষিত করে তুলতে চায়। প্রবাসী ভারতীয়দের পক্ষে অপর একটি দেশকে জন্মস্থান, কর্মস্থান ও বর্তমানে বাসস্থান বলে মুখ্যতঃ গ্রহণ করে নিয়েও কেবল আদিবাসন ভারতবাসীদের প্রতি আশুগত্যা দাবী ও ভাষার চর্চায় ভারতীয় পরিচয়টুকু কতখানি সফলদায়ক হইবে একথা রাষ্ট্রনীতিবিদদের প্রশ্নধান যোগ্য।

—সত্যাপ্রহ পত্রিকা

\* \* \*

পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান খাজ পরিদ্বিতি লইয়া পণ্ডিত লক্ষ্মীকান্ত মৈত্র যে ভাবে প্রাদেশিক তথা ভারত সরকারের সহিত আলোচনা চালাইতেছেন তাহা আমরা লক্ষ্য করিতেছি। তিনি কেন্দ্রীয় সরকারকে অবিলম্বে পশ্চিম বাংলার জম্ম ৫ লাখ টন খাজপত্র সরবরাহ করিবার জন্ত অনুরোধ জানাইয়াছেন এবং কেন্দ্রীয় খাজপত্র কমিটির চেয়ারম্যান হিসাবে কোথা হইতে বা কি ভাবে এই পরিমাণ খাজপত্র সংগ্রহ করা যাইতে পারে, তাহাও তিনি জানাইয়াছেন। আলোচনা প্রসঙ্গে পণ্ডিত মৈত্র বিশেষভাবে নদীয়া জেলার খাজ পরিদ্বিতির সংবাদ দিয়া জানাইয়াছেন যে নদীয়া জেলাতে চাউলের দর মণ করা ৪০, টাকা উঠিয়াছে। মুর্শিদাবাদ জেলা সম্বন্ধে অবহিত হইলে তিনি বলিতে পারিতেন যে এই জেলার কোনও কোনও স্থানে ৪২, টাকা মণ দরেও চাউল বিক্রয় হইয়াছে এবং ৩৫, হইতে ৪০, দরে বহু ইউনিয়নে বিক্রয় হওয়ার সংবাদও আমরা পাইয়াছি। কাজেই খাজ-সমস্যা যে কেবল নদীয়া জেলাতেই জটিল হইয়া উঠিয়াছে তাহা নহে, মুর্শিদাবাদ জেলাতেও খাজ সমস্যা ক্রমেই জটিলতর হইয়া উঠিয়াছে। —মুর্শিদাবাদ সমাচার

\* \* \*

বাঁকুড়া জেলার অধিবাসীদিগকে দুইটি গুরুতর শঙ্কার মধ্যে অবহান করিয়া জীবন যাপন করিতে হয়—একটি শঙ্কা ম্যালেরিয়া, অপরটি কুষ্ঠ। অর্থাৎ জেলাবাসীকে জলে কুমীর ও ডাঙ্গার বাঘ লইয়া প্রাণ রাখিতে প্রাণান্ত হইতে হইতেছে। বিষ্ণুপুর মহকুমা ম্যালেরিয়ার ধ্বংস হইতে চলিয়াছে, গ্রামের পর গ্রাম উজাড় হইয়া যাইতেছে, ম্যালেরিয়ার ভূগিরা

ভূগিমা গ্রামের লোক মরিয়া ভুত হইয়া বর্ণে (!) চুলুভি বাজাইতেছে। সদর মহকুমার কয়েকটি থানাতেও, এমন কি বাঁকড়া সহরেও ম্যালেরিয়ার প্রভাব বৃদ্ধি পাইয়াছে—তাহার উপর কুষ্ঠরোগ ব্যাপকভাবে প্রসার লাভ করিয়া বাইতেছে—বিশেষজ্ঞদের মতে জেলার প্রায় একলক্ষ কুষ্ঠরোগী আছে। জেলার ম্যালেরিয়ার দমনের কার্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার আরম্ভ করিয়াছেন—কিন্তু কুষ্ঠ রোগ দমনের জন্য কোন কার্যকরী পদ্ধতি অবলম্বিত হইয়াছে বলিয়া আমরা জ্ঞাত নহি।

—প্রচার

\* \* \*

...“বাহারা ভাবিয়াছিলেন, দেশ বিভাগ হইলে সাম্প্রদায়িক সমস্যার সমাধান হইয়া যাইবে, তাহারাই ভুল করিয়াছেন। দেশ বিভাগের সঙ্গে সঙ্গে শরণার্থী-সমস্যা ও কান্দীর-সমস্যার সৃষ্টি হইল। কান্দীরের ব্যাপারে যুদ্ধের সিদ্ধান্ত হইল। কিন্তু আন্তর্জাতিক জটিলতার অজুহাতে ভারত সরকার পূর্ববঙ্গ সম্পর্কে চুপ করিয়া গেলেন। আড়াই কোটি হিন্দুর জীবন ও মর্যাদার প্রসঙ্গে কেন যে অমূল্য সিদ্ধান্ত গৃহীত হইল না, তাহা আমি বুঝিতে পারি না। পণ্ডিত নেহেরু যেভাবে চলিতেছেন, তাহাতে জাতির কোনই সাহায্য হইবে না। তিনি যেন চুক্তির বিষয় পুনর্বিবেচনা করেন এবং পূর্ববঙ্গের সাজানোগোজানো সফর করিয়া আসিয়া বাঁহারা রিপোর্ট পেণ করেন, দিল্লীতে বসিয়া সেই রিপোর্ট পড়িয়া যেন তিনি মতামত নির্ধারণ না করেন।” শিলচরে নাগরিকদের সতর্কতার উত্তরে ভ্রামা প্রসাদ মুখার্জি উপরি উক্ত ভাষণ দেন।

—সমাধান

\* \* \*

টিকিট পাওয়ার অসুবিধা, টিকিটের দ্রুতল্যতা ও দুপ্রাপ্যতা, রিজাওয়াল ও কুলির জুলুম প্রভৃতি এড়াইবার জন্য অনেক কলিকাতা-যাত্রী এখন বড় বড় নৌকাযোগে যাইতেছেন। ইহাতে টীমার কোম্পানীর উপর চাপ কমিতেছে। অন্তর্থা যে হারে লোক যাইতেছে, তাহাতে ২৩ মাসেও ভিড় কমিত না—বানরীপাড়া, গৈলা, বহুরকাঠী, ভোলা, চরচন্দ্রমোহন, লালমোহন ইত্যাদি হইতে হাজারে হাজারে লোক নৌকা আশ্রয় করিতেছে! ইহাতে অধিকসংখ্যক জালিয়া, বাড়ে, কুমার, ভাতি প্রভৃতি যাইতেছে—আবার যরণীরকাসিনিবাসী বরিশালের কবিরাজ শ্রীযুক্ত উমারচরণ দাপগুপ্ত শ্রেণীর লোকও এই নৌকায় যাইতেছে।

—বরিশাল হিঠেবী

\* \* \*

বিগত বিষয়্যাপী মহাযুদ্ধে ব্যবসা বাণিজ্য ক্ষেত্রে ইংলণ্ডের সবচেয়ে বড় দুইটি প্রতিদ্বন্দ্বী দেশ—জার্মানী ও জাপানের একসঙ্গে পতনের ফলে ইংলণ্ডের খুব সুবিধা হইয়াছিল। কিন্তু জাপান এবং পশ্চিম জার্মানীর একাংশের শাসক হিসাবে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র এক্ষেত্রে আর এই দুইটি দেশকে শিল্প ব্যবসার ক্ষেত্রে হইতে দূরে রাখা সমীচীন মনে করিতেছেন না। কারণ শিল্প ব্যবসা না থাকার

দরশন উত্তর দেশেরই জনসাধারণের মধ্যে দুঃখদুর্দশা ও বেকার-সমস্যা প্রবল হইয়াছে এবং উহার ফলে উহার কমিউনিষ্ট মতবাদের প্রতি বৃদ্ধি পড়িবে এমন আশঙ্কা হইয়াছে। ফলে সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের শাসকগণ জাপানকে অধিকতর পরিমাণে সাইকেল ও বস্ত্র প্রস্তুত করিয়া তাহা বিদেশে রপ্তানীর সুযোগ দিয়াছেন। পশ্চিম জার্মানীর আমেরিকান অধিকৃত অঞ্চলেও কলকজা অধিকতর পরিমাণে প্রস্তুত করিয়া তাহা বিদেশে রপ্তানী করিবার সুযোগ দেওয়া হইয়াছে। উহার ফলে ইংলণ্ডের সুযোগ সুবিধা বিনষ্ট হইবার উপক্রম হইয়াছে। কারণ বস্ত্র, সাইকেল ইত্যাদির ব্যাপারে জাপানের সহিত এবং কলকজার ব্যাপারে জার্মানীর সহিত প্রতিযোগিতায় দণ্ডায়মান থাকা ইংলণ্ডের সাধারণতঃ নহে। কাজেই এই ব্যাপার লইয়া ইংলণ্ডের সহিত আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের একটা মনোমালিঙ্গের সৃষ্টি হইবার উপক্রম হইয়াছে।

—আর্থিক জগৎ

\* \* \*

সম্প্রতি যে সকল ভ্রমণকারী শরণার্থী এবং ব্যবসায়ী চীন পরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছে তাহাদের নিকট হইতে প্রাপ্ত বিবরণে জানা যায় যে চীনের ক্রমবর্ধমান দুরবস্থা রোধ করিবার জন্য চীনা কমিউনিষ্টগণ যে ‘পরীক্ষা’ আরম্ভ করে তাহা ব্যর্থ হইয়াছে, বরং অনেক ক্ষেত্রে দুরবস্থাকে আরও বাড়াইয়া তুলিয়াছে।

হংকং-এর জনৈক দলভাগী বিশিষ্ট চীনা কমিউনিষ্টের কথায় প্রকাশ যে লেনিনের ‘গ্রাম সংগঠনের’ মতবাদ অনুসরণ করিবার প্রতিশ্রুতি দিয়া মাও-সে-তুং চীনের অধিবাসীদের সমর্থন লাভ করিয়াছেন। এই মতবাদ কৃষকদের দুঃখদুর্দশা ক্রমশঃ দূর করিবার উপর জোর দিয়া থাকে। প্রকাশ ট্যালিনের কথায় মাও সে প্রতিশ্রুতি উড়াইয়া দিয়া উহার পরিবর্তে লেনিনের অপর মতবাদ ‘সহর সংগঠনের’ নীতি গ্রহণ করেন। উহাতে মাতৃভূমি রক্ষার জন্য শিল্পসমৃদ্ধ সহরগুলিকে সাময়িক উদ্দেশ্যে হুম্বহত করিবার উপর জোর দেওয়া হইয়া থাকে। —সারথি

\* \* \*

বর্তমান জেলার জঙ্গলমহল সার্কেল পঞ্চাশটি গ্রাম লইয়া গঠিত। জেলার মধ্যে ইহা অন্ততম বৃহৎ সার্কেল। কিন্তু এ অঞ্চলে কোন ইউনিয়ন বোর্ড না থাকার গ্রামবাসীরা সকল প্রকার সুযোগ সুবিধা হইতে বঞ্চিত হইতেছে। জেলার মধ্যে একমাত্র এই সার্কেলেই কোন ইউনিয়ন বোর্ড নাই। বৃটিশ শাসনের আমল হইতে এই ব্যবস্থা চলিয়া আসিতেছে। সংবাদে জানা যায়, উক্ত অঞ্চলের অধিবাসীরা এ সম্পর্কে উচ্চতম সরকারী কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াও এখন পর্যন্ত কোন কল পান নাই। উক্ত অঞ্চলে ইউনিয়ন বোর্ড না থাকার রাতা জনস্বাস্থ্য প্রভৃতি অবহেলিত হইতেছে।

—আর্থ্য

\* \* \*

ভারত গবর্ণমেন্ট দক্ষিণ আফ্রিকার ব্যাপারে আর একটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন। সিদ্ধান্তটির মূল কথা এই যে, ভারত গবর্ণমেন্ট আর দক্ষিণ আফ্রিকা সংক্রান্ত গোলটেবিল বৈঠকে যোগ দিতে ইচ্ছা করেন না। দৃশ্যতঃ ইহা ভারত গবর্ণমেন্টের অলিচ্ছা মাত্র; কিন্তু কার্যতঃ ইহা তীব্র প্রতিবাদ। ভারতের বর্তমান গবর্ণমেন্ট একান্তভাবেই শান্তিপ্রিয় এবং উদার পররাষ্ট্রনীতির সমর্থক। পৃথিবীর সমস্ত পর-রাষ্ট্রের সহিত সতত মৈত্রীসূত্রে আবদ্ধ থাকিতে পারিলেই তাহার সন্তুষ্ট হন। তথাপি দক্ষিণ আফ্রিকার ব্যাপারে মালান গবর্ণমেন্টের সঙ্গে ভারতের কোন বোঝাপড়া কেন সম্ভব হয় নাই এবং হইতেছে না, তাহা যেমন নিরপেক্ষ বিচার-বিবেচনা তেমনি গভীর উপলব্ধির বিষয়।

—আনন্দবাজার পত্রিকা

\* \* \* \*

পশ্চিমবঙ্গে শিক্ষিত ও বুদ্ধিজীবী বেকার কর্মপ্রার্থীর সংখ্যা ভারতের সব প্রদেশ ও রাজ্যের তুলনায় সবচেয়ে বেশী। ব্রিটিশসংখ্যক বেকার বুদ্ধিজীবীর বেকারসমস্তাই পশ্চিমবঙ্গের বিশেষ সমস্তা। পশ্চিমবঙ্গের দৈন্য-পীড়িত শিক্ষিত অথচ বিত্তহীন সমাজ জীবিকার অভাবে যে সমস্তার পড়িয়াছে, তাহা বস্তুতঃ বাঙালীর সমগ্র সংস্কৃতির অগ্রগতির বিরুদ্ধে প্রতিবন্ধক হইয়া উঠিয়াছে। পশ্চিমবঙ্গের কর্মসংস্থান পরিষদ শিক্ষিতের বেকার সমস্তা সমাধানে কি প্রয়াস করিয়াছেন, তাহা আমরা জানি না। তবে সমুহভাবে যে বার্ষ হইয়াছেন, তাহা আঞ্চলিক কর্মসংস্থান পরিচালকের একটি মন্তব্যের দ্বারা প্রমাণিত হয়। “একমাত্র এপ্রিল মাসে ১২৪৫৬ জন কেরানিগিরির কাজের জন্য আবেদনকারীর মধ্যে মাত্র ত্রিশজনকে কাজ দিতে পারা গিয়াছে।” —আনন্দবাজার পত্রিকা

\* \* \* \*

পূর্ববঙ্গ সফর হইতে কলিকাতায় প্রত্যাগত ভারতের মাইনরিটি মন্ত্রী শ্রীমত চার্লসের বিবাসের বিবৃতি পশ্চিমবঙ্গের সকলেই বিশেষ আগ্রহের সহিত পাঠ করিবেন। এই আগ্রহ প্রধানতঃ পূর্ববঙ্গের বর্তমান অবস্থা জানিবার আগ্রহ ছাড়া আর কিছুই নহে। নেহরু-লিয়ার্ড চুক্তির পর দুই মাস অতীত হইয়াছে। এই দুই মাস চুক্তির কলাকল পশ্চিমবঙ্গে কি দাঁড়াইয়াছে, তাহা এই রাজ্যে অবস্থানকারী মাত্রই প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। কিন্তু পূর্ববঙ্গে কি হইয়াছে এবং হইতেছে, তাহার সংবাদ পূর্বের জ্ঞায় বিতৃপ্তভাবে প্রকাশিত হইতেছে না বলিয়াই তথাকার প্রকৃত অবস্থা জানিবার ও উপলব্ধি করিবার আগ্রহ এবং কৌতূহল এখন প্রবল হইয়াছে। মাইনরিটি মন্ত্রী শ্রীমত বিবাস সেই কৌতূহল চরিতার্থ করার চেষ্টা করিয়াছেন বটে; তবে বিবৃতির প্রায় প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত তিনি পূর্ববঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গে ভালগোল পাঁকাইরা এমনভাবে কথা বলিয়াছেন, যাহাতে তাহার মতামত উত্তর বঙ্গ সম্বন্ধে বলিয়া ভ্রম হয়। পূর্ববঙ্গ সম্পর্কে পৃথক্ ও পরিষ্কার করিয়া কোন অভিমত ভারতের মাইনরিটি মন্ত্রী এই বিবৃতিতে যেন প্রকাশ করিতে চাহেন নাই।

—আনন্দবাজার পত্রিকা

\* \* \* \*

তুলা-ব্যবসায়ী এবং মিল-মালিকদের প্রবল আন্দোলন এবং টেক্সটাইল উপদেষ্টা কমিটির সুপারিশে, তুলার মূল্য প্রতি ‘কাশি’ (৭৮৪ পাউণ্ড) দেড় শত টাকা বৃদ্ধি করিতে কেন্দ্রীয় সরকার সম্মতি দান করিয়াছেন। কেন্দ্রীয় সরকারের মুখপাত্র বলিতেছেন, তুলার মূল্যবৃদ্ধির ফলে আগামী ৬ মাসকাল কাপড়ের মূল্য কোনোপ্রকার বৃদ্ধি পাইবে না। তাহার পরে শতকরা ১০।১১ টাকা মাত্র বৃদ্ধি পাইবে। তুলার মূল্য বৃদ্ধির অর্থ-নৈতিক এবং অস্ত্রাস্ত্র গৃহ কারণের আলোচনা করিয়া লাভ নাই। কারণ সংবাদপত্রে এই সকল আলোচনার মূল্য সরকারী মহলে প্রায় শূন্য বলিলেও চলে। কিন্তু এই এসঙ্গে সরকারকে একটা কথা পরম শ্রদ্ধা এবং বিনয়ের সহিত স্মরণ করাইয়া দেওয়া কর্তব্য বলিয়া মনে করি। যুদ্ধ-উত্তর কালে, গত তিন বৎসর কংগ্রেস সরকার শাসন ক্ষমতা হাতে লইয়াছেন, এই দীর্ঘকালে তাহার আজ পর্যন্ত অত্যাব্যস্তকায় খাত্ত এবং পরিধেয় কোনো দ্রব্যের মূল্য কমাইতে পারেন নাই। বস্ত্রের মূল্য গত দুই মাস বেশ কিছু বৃদ্ধি পাইয়াছে, তুলার মূল্য বৃদ্ধির কারণে আরো বৃদ্ধি পাইবে। বস্ত্র যে ক্রমশঃ জনগণের সাধারণ বাহিরে যাইতেছে, এ-সংবাদ রাখার দায়িত্ব বা কর্তব্য বোধ হয় কাহারো নাই। ব্যবসায়ী এবং মিল-মালিকদের অতি-লাভের পরিমাণ কমাইবার সাহস কাহারো নাই। সর্বপ্রকার চাপ এবং মূল্যবৃদ্ধির গুরুভার জনগণের দুর্বল শ্রমকে আর কতকাল সহ্য হইবে বলা শক্ত। বস্ত্র-ব্যবসায় বর্তমানে লাভের পরিমাণ যেমন, তাহাতে বস্ত্র-মূল্য আরো বৃদ্ধি করিবার কোনো বুদ্ধিযুক্ত কারণ নাই। কিন্তু উপায় কি, শিশুরাষ্ট্রের কল্যাণে যুনো ব্যবসায়ী এবং মিল-মালিকদের দাবী অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে।

—দৈনিক বহুমতী

\* \* \* \*

উত্তরে হিমালয়ের পাদদেশ এবং পূর্বে ব্রহ্ম সীমান্ত যেমন সামরিক প্রায়ে গুরুতর, তেমনই যোগাযোগ, রাস্তাঘাট, সংবাদ আদান-প্রদান ইত্যাদির দিক হইতে পশ্চিমবঙ্গের সহিত ইহা অচ্ছেদ্য। ইহার মাঝখানে রহিল পূর্ব পাকিস্তান, রণ-নীতির ভাব্যর যাহাকে একটি কীলক বলা যাইতে পারে। আসামবাসীদের নিশ্চয়ই স্মরণ আছে যে, মিঃ জিন্না ও মুসলিম লীগ দীর্ঘকাল বাবং আসামের এই অভিনব ভৌগোলিক অবস্থানের জন্য উহাকে পাকিস্তানের কুক্ষীগত করিবার জন্য প্রবল আন্দোলন চালাইয়াছিলেন এবং সেই আন্দোলন ব্যর্থ হইবার মূল কারণ বাঙ্গালী হিন্দুর বিরোধিতা। মুসলিম লীগের মন হইতে আসামের বিরুদ্ধে দূরভিসন্ধির অবসান হইয়াছে একথা মনে করিবার কোন যুক্তি-সঙ্গত কারণ নাই। কেবল পাকিস্তান হইতেই আসামের বিপদ সন্ধান নয়, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার কমিউনিষ্ট আন্দোলনের সঙ্গেও আসামের ভাগ্য জড়িত। ব্রহ্মদেশ, আসাম ও পূর্ববঙ্গ সম্বন্ধে কোনও কমিউনিষ্ট পরিকল্পনার অন্তর্গত এবং ইহার সামরিক দিকটা স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল ১৯৪২-৪৩র জাপানী যুদ্ধের সময়—যখন পশ্চিমবঙ্গ ও কলিকাতা হিল আসামকে রক্ষা করিবার মূল সরবরাহ কেন্দ্র ও সামরিক ঘাঁটি। এই

সমস্ত তথ্য আমরা উল্লেখ করিলাম এজন্য যে, পশ্চিমবঙ্গ ও আসামকে পরস্পরের হাত ধরাধরি করিয়া চলিতে হইবে—বিরোধের পথ উভয়ের পক্ষে আশঙ্ক্যের পথ মাত্র। ডাঃ শ্যামাপ্রসাদের আসাম পরিভ্রমণ, আশা করি আমাদের প্রতিবেশী রাজ্যকে অধিকতর বন্ধুতা ও সহযোগিতার পথে আনয়ন করিবে।

—যুগান্তর

\* \* \*

পানাগড় মিলিটারী বেসের সন্নিকট কুন্ডুপুতুর বা কুলুপুতুর গ্রামে দ্রুতগণ কতৃক অগ্নি সংযোগের ফলে প্রায় দুই শত গৃহ ভস্মীভূত হইয়াছে। কয়েক সহস্র মণ ধাতু ও বহু কাহন খড় ও পুড়িয়াছে। আটজনের প্রাণহানি ঘটিয়াছে, ইহাদের মধ্যে পাঁচজন নারীও আছে। কিছুদিন পূর্বে মাড়ো গ্রামে অশুরাণ ঘটনা ঘটিয়াছে। গ্রামবাসীগণের ধারণা মিলিটারী বেসের সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণ ইহার সহিত জড়িত আছে। কয়েক বৎসর পূর্বে মিলিটারী বেসের লোকগণ কুলুপুতুর আক্রমণ করিয়া অগ্নি সংযোগ করিয়াছিল এবং দ্রুতগণ দল বা আদালত কতৃক দণ্ডিত হইয়াছিল। মিলিটারী বেসটি ঐ অঞ্চলের আতঙ্কের কারণ হইয়াছে। এই অঞ্চলে নিরাপত্তা রক্ষার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বন করা আবশ্যিক। আমরা কতৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

—বর্ধমানের কথা

\* \* \*

বিহার প্রাদেশিক সরকার শিক্ষা প্রসারের জন্য নূতন নূতন পরিকল্পনা গ্রহণ করিতেছেন। শিক্ষা প্রসারের জন্য, বিশেষ করিয়া বিহারের মাতৃভাষা সকলের ভ্রুটে জুড়িয়া দিবার জন্য প্রচার কার্য চালাইতেছেন। জানা গেছে ১৯৫৭ সাল হইতে পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষার মাধ্যম হইবে বিহারের মাতৃভাষা।

সম্প্রতি মানভূম জেলা বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের ত্রয়োদশ বার্ষিক অধিবেশনে এই মর্মে প্রতিবাদ করিয়া একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। প্রস্তাবে বলা হয় যে মানভূম জেলাবাসীর মাতৃভাষা বাংলা ভাষাকে হীন প্রচেষ্টার দ্বারা উচ্ছেদ ও বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিনষ্টের যে প্রচেষ্টা অস্তায়ভাবে গত কয়েক বৎসর যাবৎ এই জিলায় চলিতেছে, অবিলম্বে প্রজাতন্ত্রী ভারতের প্রথম প্রেসিডেন্ট ও ভারত সরকারের নিকট ইহাই প্রতিবিধান ও প্রতিকার করার দাবী জানাইতেছি।

—সৈনিক

বোম্বাই গভর্নমেন্ট প্রদেশের কৃষি শিক্ষা ব্যবস্থার আবুল পরিবর্তনের ব্যবস্থা করিতেছেন। প্রত্যেক জেলার জন্য একটি করিয়া কৃষি বিভাগের স্থাপন করিয়া যাঁহাতে প্রতি বৎসর অন্ততঃ ১ হাজার ছাত্র নূতন বিজ্ঞানসম্মত প্রণালীতে কৃষি শিক্ষা পাইয়া বাহির হইতে পারে ইহাই তাহাদের লক্ষ্য। বর্তমানে এই প্রদেশে মাত্র ৩টি কৃষি কলেজ ও ১৪টি কৃষি স্কুল আছে। নূতন শিক্ষা ব্যবস্থার শিক্ষাকাল দুই বৎসর হইবে এবং যাহাতে ছাত্রেরা নিজেরা স্বাধীনভাবে নিজেদের কৃষি প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিতে পারে সেইভাবে তাহাদের শিক্ষা দেওয়া হইবে।

—শিক্ষক

\* \* \*

সকলকে স্থিরচিত্তে ও ধৈর্য্য সহকারে ভাবিয়া দেখিতে বলি, স্বাধীনতা লাভের পর সকল প্রকার হুখ শান্তি পাইতে হইলে সত্যি কি আমাদের জনসাধারণের কিছুমাত্র দায়িত্ব বা কর্তব্য নাই? কেহ যদি এক বিঘা জমি লাভ করেন, বা একটা গাভী লাভ করেন, তবে সেইদিন হইতেই সেই জমিখানি আবাদ করিবার, তাহাতে সার দিয়া ভাল বীজ বপন করিবার, ফসল উৎপন্ন করিবার ও সেই জমির কর আদায় দিবার দায়িত্ব ও কর্তব্য তাহার ঘাড়ে আসিয়া পড়ে এবং সেই গাভীকে প্রতিদিন ভালভাবে খাওয়াইবার, ভালভাবে রাখিবার, স্নান করাইবার, তাহার গোয়াল প্রস্তুত করিবার ও তাহা প্রত্যাহ পরিষ্কার করিবার দায়িত্ব ও কর্তব্য তাহার ঘাড়ে আসিয়া পড়ে। এই কর্তব্য ও দায়িত্বগুলি যদি তিনি পালন না করেন তবে তিনি সেই জমির ফসল পাইবার বা গাভীর দুগ্ধ পাইবার আশা করিতে পারেন না, বরং অল্পদিনেই সেই জমি বাকী করের দারে নীলাম হইবার এবং গাভীটা খাত্তাভাবে মারা যাওয়ার মধ্যেই সম্ভাবনা হয়। কিন্তু এতবড় মহামূল্যবান ভারতবর্ষের স্বাধীনতা লাভ করিয়া আমরা সকলে যদি মনে করি যে আমাদের কিছুমাত্র দায়িত্ব বা কর্তব্য নাই, কেবলমাত্র কংগ্রেস গভর্নমেন্টের উপরই দায়িত্ব আসিয়াছে, অতএব আমরা সকলে নিশ্চিন্তভাবেই নাকে সরিষার তেল দিয়া ঘুমাই, তাহা হইলে আমাদের হুখ শান্তি ত কোনও দিন আসিবে না, বা দুঃখ দারিদ্র্য ও অভাব কোনও দিন ঘুচিবে না, বরং এই স্বাধীনতা রক্ষা করাই সম্ভব হইবে না।

—সত্যাপ্রহ পত্রিকা





# রেয়ন

( নকল রেশম )

## শ্রীসন্তোষকুমার রায়চৌধুরী

ভারতবর্ষে রেয়ন বা নকল রেশম শিল্প সম্বন্ধে সামান্য কিছু গবেষণা চলিলেও প্রকৃত প্রস্তাবে নকল রেশম তৈয়ারীর ব্যবস্থা আজ পর্যন্ত এদেশে হয় নাই একথা নিঃসন্দেহে বলা চলে, অথচ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্বে ও প্রথমদিকে বিশ্বের রেয়ন উৎপাদনকারী দেশগুলি ছাড়া অল্পাংশ দেশগুলির মধ্যে ভারতবর্ষ সব চাইতে বেশী রেয়ন ব্যবহারকারী দেশ বলিয়া পরিগণিত হইত। ১৯৪০ সালে ভারতে রেয়ন আমদানী হয় সব চাইতে বেশী। ঐ বৎসর এদেশে রেয়ন আমদানী হয় ৩ কোটি ৪০ লক্ষ পাউণ্ড। “ইন্ডাস্ট্রিয়াল ফাইবার” নামক স্ট্যান্ডার্ডীক ১৯৪৮ সালের সংস্করণে দেখা যায় যে, ১৯৪১ সাল পর্যন্ত ভারতে রেয়নের আমদানী ছিল অব্যাহত কিন্তু ১৯৪২ সালে ঐ আমদানীর পরিমাণ ৪৮% কমিয়া যায় চারিদিককার ব্যবসা বাণিজ্যের বিশৃঙ্খলার জন্ত। ১৯৩৮ সাল হইতে ১৯৪৬ সালের মধ্যে প্রথম চারি বৎসর অর্থাৎ ১৯৩৮, ১৯৩৯, ১৯৪০ ও ১৯৪১ সালে যথাক্রমে এদেশে রেয়নের আমদানী হয় যথাক্রমে ১৫৩ লক্ষ, ২৬৩ লক্ষ, ৩৪০ লক্ষ ও ২৩৮ লক্ষ পাউণ্ড। ১৯৪২ সালে ঐ আমদানীর পরিমাণ কমিয়া দাঁড়ায় মাত্র ৯ লক্ষ পাউণ্ড, অর্থাৎ পূর্বের চারিটি বৎসরের তুলনায় মাত্র শতকরা ৩ হইতে ৫ ভাগ। ১৯৪২ সালের তুলনায় ১৯৪৩ সালে রেয়ন আমদানীর পরিমাণ আরো কমিয়া দাঁড়ায় মাত্র ১ লক্ষ পাউণ্ড। তাহার পর হইতে অবশ্য ঐ আমদানীর পরিমাণ বাড়িতে আরম্ভ করিয়াছে। ১৯৪৪, ১৯৪৫ ও ১৯৪৬ সালে রেয়ন আমদানীর পরিমাণ হয় যথাক্রমে ৮ লক্ষ, ১৬ লক্ষ ও ৩১ লক্ষ পাউণ্ড। (১) ১৯৪৮-৪৯ সালে এই আমদানীর পরিমাণ বাড়িয়া দাঁড়াইয়াছে তিন কোটি নিরানব্বই লক্ষ পাউণ্ড, যাহার মূল্য হইতেছে ১২ কোটি ৮২ লক্ষ টাকা।

শেষোক্ত বৎসরের আমদানীর হিসাব হইতে একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, যুদ্ধ পূর্বকালের চাইতেও আপাততঃ এদেশে রেয়নের ব্যবহার বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং তুলা বা রেশম-জাত বস্ত্রের মূল্য না কমিলে রেয়নের ব্যবহার আরও বহুগুণ বৃদ্ধি পাইবে। কারণ তুলা বা রেশম হইতেছে প্রকৃতির সৃষ্টি। আবহাওয়া, ভূমি, পারিপার্শ্বিকতা ও অন্যান্য পরিবেষ্টনী ব্যতিরেকে উহাদের উৎপাদন সম্ভব নয়। তাছাড়া উহাদের উৎপাদনও কতকটা সীমাবদ্ধ বলা চলিতে পারে। কিন্তু রেয়নের ক্ষেত্রে ঐ কথা প্রযোজ্য নহে। কারণ উহা সম্পূর্ণভাবে মানুষের সৃষ্টি—মানুষের বৈজ্ঞানিক কৌতুহলের উহা একটি চরম অভিব্যক্তি, হুতরাং প্রয়োজনের অনুপাতে উহার উৎপাদন বৃদ্ধি,

মূল্যের সমতা রক্ষা করা মানুষের নিজের সৃষ্টির মধ্যেই আবর্তিত হইবে। ফলে স্রষ্টার ভবিষ্যতে হয়তো এমন একদিন আসিতে পারে যখন এই রেয়ন বা নকল রেশমের মূল্য, গুণাগুণ বা প্রচারের দিক হইতেই বর্তমান তত্ত্বশিল্পকে অনেক পশ্চাতে কেলিয়া যাইবে।

১৯৪১ সালে সমগ্র পৃথিবীতে রেয়নের উৎপাদন সব চাইতে বৃদ্ধি পাইয়াছিল। ঐ বৎসর উৎপন্ন রেয়নের মোট পরিমাণ ছিল ১২৫ কোটি ৯ লক্ষ পাউণ্ড। কিন্তু ঐ সালের পর হইতেই রেয়নের উৎপাদন কমিতে থাকে এবং ১৯৪৫ সালে উৎপন্ন হয় মাত্র ৯০ কোটি পাউণ্ডের মত। অবশ্য ঐ কম উৎপাদনের মূলে ছিল জার্মান, জাপান ও ইটালির রেয়ন উৎপাদনে বাটতি। কারণ ১৯৩৮ সাল বা তৎপূর্ব ও পরবর্তী কয়েকটি বৎসরে উপরোক্ত তিনটি দেশে মোট উৎপন্ন রেয়নের পরিমাণ ছিল সমগ্র পৃথিবীর উৎপাদনের শতকরা ৬৭ ভাগ। ১৯৩৯ সালে জাপানে রেয়ন উৎপাদনের পরিমাণ যেখানে ছিল বৎসরে ২৩ কোটি ৮৫ লক্ষ পাউণ্ড, যুদ্ধ শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ১৯৪৫ সালে ঐ উৎপাদন কমিয়া হয় মাত্র ৩৮ লক্ষ পাউণ্ড। তাহার পর ১৯৪৬ সালে ঐ উৎপাদন পূর্ব বৎসরের তুলনায় ৫২ লক্ষ পাউণ্ড বৃদ্ধি পাইলেও যুদ্ধ-পূর্ব সময়ের তুলনায় যে অপ্রত্যাশিতভাবে কম একথা অবশ্য স্বীকার্য। জার্মান ও ইটালীর ক্ষেত্রে সেই একই কথা বলা চলে। ১৯৩৯ সালে যথাক্রমে জার্মান ও ইটালীতে রেয়ন উৎপন্ন হইয়াছিল ১৬ কোটি ৯৯ লক্ষ ও ১১ কোটি ৬৩ লক্ষ পাউণ্ড। আর ১৯৪৬ সালে সেইখানে উৎপন্ন হয় যথাক্রমে ১ কোটি ৮৩ লক্ষ ও সাড়ে ছয় কোটি পাউণ্ড। উপরোক্ত তিনটি দেশের শিল্পসমূহে যুদ্ধ-পরবর্তী যুগে যে কি ভাবে ভাবন ধরিয়াছে ইহা তাহারই একটা অন্ততম প্রধান দৃষ্টান্ত মাত্র।

পূর্বেরই বলিয়াছি ১৯৪১ সালে পৃথিবীতে রেয়নের উৎপাদন বৃদ্ধি পাইয়াছিল সব চাইতে বেশী। নিয়ে দশ বৎসরের যে ছকটি দেওয়া হইল তাহা হইতেই প্রত্যেকেই ইহার সত্যতা উপলব্ধি করিতে পারিবেন।

পৃথিবীর রেয়ন উৎপাদন। (২)

( কোটি পাউণ্ড )

বৎসর	উৎপন্ন রেয়ন	বৎসর	উৎপন্ন রেয়ন
১৯৩৭	১২০.০	১৯৪২	১১২.১
১৯৩৮	১০০.১	১৯৪৩	১১৪.৭
১৯৩৯	১১৫.১	১৯৪৪	১০৫.৭
১৯৪০	১১৮.২	১৯৪৫	৮৯.৫
১৯৪১	১২৫.২	১৯৪৬	১১০.০

(১) Industrial Fibre 1948.

(২) Industrial Fibre 1948.

উপরোক্ত ছকটিতে দেখা যায় যে, ১৯৪৫ সালে উৎপাদন অত্যন্ত ব্যাহত হইলেও ১৯৪৬ সালে রেজেন উৎপাদনকারী দেশসমূহ উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য কিছুটা প্রয়াস পাইয়াছিল। অবশ্য এই উৎপাদনের মূলে আছে আমেরিকা যুক্তসাম্রাজ্য ও গ্রেট-ব্রিটেনের শিল্প প্রচেষ্টা। যুদ্ধ-পূর্বকালে অল্পতম প্রধান রেজেন-উৎপাদনকারী দেশ বলিলে বুঝাইত জাপান, জাপান ও ইটালি; কিন্তু বর্তমানে যোঝায়—আমেরিকা যুক্ত-সাম্রাজ্য ও গ্রেট-ব্রিটেনকে। তাহাদের এই প্রচেষ্টা সত্যিই প্রশংসনীয়। ১৯৪৬ সালে পৃথিবীতে যে মোট ১১০ কোটি পাউণ্ড রেজেন উৎপন্ন হইয়াছিল তাহার মধ্যে ৬৭ কোটি ৭৫ পাউণ্ড উৎপন্ন হইয়াছিল আমেরিকা যুক্তসাম্রাজ্যে। ঐ বৎসর রেজেন উৎপাদনে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়াছিল গ্রেট ব্রিটেন। তাহাদের উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ১১ কোটি পাউণ্ড। ইহাদের পরই উৎপাদনের দিক হইতে নাম করা চলে ফ্রান্স ও ইটালীর। ঐ বৎসর ইহাদের রেজেন উৎপাদনের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৬ কোটি ৮১ লক্ষ ও ৬ কোটি ৫০ লক্ষ পাউণ্ড। ব্রাজিল, ক্যানাডা, জার্মানী, নেদারল্যান্ড, বেলজিয়ম ও স্পেনের উৎপাদন ছিল যথাক্রমে ২৩২ লক্ষ, ২১০ লক্ষ, ১৮৩ লক্ষ, ১৮০ লক্ষ, ১৭৫ লক্ষ ও ১৬৫ লক্ষ পাউণ্ড। আর কিছু কম বেশী এক কোটি পাউণ্ড রেজেন উৎপন্ন হইয়াছিল সুইজারল্যান্ড, আর্জেন্টিনা ও জাপানে এবং বাকী ৭ কোটি পাউণ্ডের মত রেজেন উৎপন্ন হইয়াছিল অন্যান্য দেশে। ভারতবর্ষে রেজেন একেবারেই উৎপন্ন হয় নাই, অথচ ঐ বৎসর রেজেন আমদানী হইয়াছিল ৩১ লক্ষ পাউণ্ড।

বর্তমানে এই রেজেন বা নকল রেশম শিল্পের দ্রুত বিস্তার ঘটতেছে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে। অধুনাতম বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ায় ইহার উৎপাদন বৃদ্ধি করার চেষ্টা হইতেছে এবং সেই সঙ্গে চেষ্টা হইতেছে ইহাকে অধিকতর প্রয়োজনীয় করিয়া তোলার ও সহজ লভ্য করার। বৈজ্ঞানিকগণ অনেকাংশে সফলও হইয়াছেন এবং আশা করা যায় যে তাহার আরও সফলকাম হইবেন। দামে সস্তা হইলে এবং স্থায়িত্বে ও মন্থণতার রেশমের সমতুল্য বা অধিকতর উপযোগী হইলে রেজনের প্রচার বৃদ্ধি পাইবে সত্য। কিন্তু ভারতে এই শিল্পের প্রচলন ও প্রচার না হইলে আমাদের কোন কার্যেই লাগিবে না, বরঞ্চ আমদানীকৃত রেজনের প্রাচুর্যে জাতীয় কার্যই বিপর্যস হইবে।

রেজেন উৎপাদনের প্রধান উপকরণ হইতেছে ‘সেলুলোজ’ (Cellulose)। আর ‘সেলুলোজ’ পাওয়া যায় তুলা ও কাঠ হইতে। ঐ দুইটি উপকরণেরই এদেশে অভাব নাই, অভাব আছে শুধু চেষ্টার। কাজেই আজিকার দিনে একথা মনে করা অসঙ্গত হইবে না যে, অল্প ভবিষ্যতে ভারতবর্ষও অল্পতম প্রধান রেজেন উৎপাদনকারী অঞ্চল বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে।

‘সেলুলোজ’ তৈয়ারীর জন্য সাধারণতঃ পরিত্যক্ত খুতা ও ছোট আশের অপেক্ষাকৃত অব্যবহার্য তুলা ব্যবহার করা হয়। তবে কাঠ হইতে সংগৃহীত ‘সেলুলোজ’ অপেক্ষাকৃত সস্তা দরের হয়, সেইজন্য কাঁচা মাল হিসাবে ইহার প্রয়োজনীয়তা অনেকখানি বেশী। “এই কার্যে ব্যবহৃত

তুলাকে প্রথমেই তেল, চর্বি, মোম ও অন্যান্য রঙ সৃষ্টিকারী পদার্থ হইতে মুক্ত করা হয়। পরে পরিশোধিত জ্বালানিকৈ শুক করিয়া গ্রহণযোগ্য হইলে রসায়নের সাহায্যে ‘লেই’ বা ‘মণ্ড’এ (Pulp) পরিণত করা হয় ও পরে পিচবোর্ডের মত পাত তৈয়ার করা হয় পরবর্তী কাজের সুবিধার জন্য (৪)। কাঠ হইতে ‘সেলুলোজ’ গ্রহণ করিবার পদ্ধতি একটু অল্প ধরণের। “বাছাই করা কাঠ (সাধারণতঃ ফার, হেমলক্ প্রভৃতি কাঠ) লইয়া বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় ও রসায়নের সাহায্যে সেলুলোজ পৃথকীকরণ করা হয় ও পরে একপ্রকার ‘লেই’ (Bleached Sulphite wood pulp) বাজারে ছাড়া হয়।” (৫) ইহার পরও বহুবিধ বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ায় ও রসায়নের সাহায্যে ঐ লেইকে পরিণত করা হয় একপ্রকার সুন্দর তত্ত্বতে। ঐ তত্ত্ব হইতে হয় খুতা।

বর্তমানে প্রধানতঃ চারিটি প্রক্রিয়ায় রেজেন উৎপাদিত হইয়া থাকে, চারিটি প্রক্রিয়ার মধ্যে প্রথমে আবিষ্কৃত হয় ‘নাইট্রো সেলুলোজ’ (Nitro cellulose) পদ্ধতি। তাহার পর আবিষ্কৃত হয় যথাক্রমে ‘ক্যাম্প্রামোনিয়াম’ (Cuprammonium), ‘ভিসকোস’ (Viscose) ও ‘এ্যাসেটেট’ (acetate) পদ্ধতি, এই সমস্ত পদ্ধতি আবিষ্কৃত হওয়ার মূলে আছে যে ইতিহাস, তাহা যেমনই চমকপ্রদ, তেমনি ঘটনাবল্য। এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে সেই ইতিহাস আলোচনা করা সম্ভব নয় তাই মিঃ ই. হাইলার প্রণীত ‘মানুষ্যাকতার অব আর্টিকিয়ারাল সিল্ক’ নামক পুস্তক হইতে সংগৃহীত সামান্য ইতিহাস নিম্নের ছত্র কয়টাতে দিলাম।

একথা অবশ্য প্রত্যেকেই জানেন যে অকৃত্রিম রেশম বলিতে বাহা বুঝায় তাহা হইতেছে গুটীপোকার শুক লাল। কীট বিশেষের মুখনিহত লাল শুক হইয়া সৃষ্টি করে তত্ত্ব; সেই তত্ত্ব হইতে সৃষ্টি হয় রেশমের। মানুষের মনে প্রকৃতির এই সৃষ্টি-বৈচিত্র্যই এনে দেয় নকল রেশম বা রেজনের সন্ধান। কলে প্রকৃতির সৃষ্টি বৈচিত্র্যের মতই বিচিত্র ও রোমাঞ্চকর হয়ে উঠে মানুষের সৃষ্টি রেশম বর্ণ—উজ্জ্বল ও স্থায়িত্বে। ১৬৬৫ সালে হুক্‌স্ (Hookes) তাহার ‘মাইক্রোগ্রাফিয়া’ (Micrographia) নামক গ্রন্থে এই রেজেন প্রকৃতির আভাষ দেন। তারপর মিঃ রেয়ার (Mr. Reaumar) গুটি পোকা সন্ধানীর আলোচনা প্রসঙ্গে নকল রেশম প্রকৃতির সম্ভাবনার কথা উল্লেখ করেন। এমন কি ১৭৭০ সালে করাসী দেশের মিঃ ডুবে (Dubet) কয়েকটি বৃত্ত গুটীপোকার দেহ হইতে সংগৃহীত আঁঠাল পদার্থ হইতে তত্ত্ব প্রস্তুত করিতে সক্ষম হন। অবশেষে ১৮৫৫ সালে বিলাতের আন্ডেমার (Andemars) নামক এক ব্যক্তি নাইট্রোসেলুলোজ তৈয়ারীর পদ্ধতি পেটেন্ট করিয়া লন। ১৮৮৩ সাল বা ঐ কাছাকাছি সময়ে অনেকেই নাইট্রো সেলুলোজ লইয়া কাজ আরম্ভ করেন।

(৪) ও (৫) The Manufacture of artificial silk by E. Wheeler

এবং কাউন্ট এইচ. ডি কাড্রান্ট ( Count H. De Chadranet ) ১৮৮৯ সালে প্যারিসের প্রদর্শনীতে নকল রেশম ও নকল রেশমের বোনা বস্ত্র প্রদর্শন করেন। সেই হইতে 'নাইট্রো সেলুলোজ' পদ্ধতি কাড্রান্ট পদ্ধতি নামেও প্রচলিত আছে। এই পদ্ধতিতে সাধারণতঃ হুইজারল্যাণ্ড, ফ্রান্স ও জার্মানীতে নকল রেশম তৈরী হয়।

১৮৯০ সালে এই পদ্ধতি কিছুটা পরিবর্তিত হইয়া 'কার্বোমোনিয়াম' পদ্ধতি নামে প্রচলিত হয় এবং তখন হইতেই প্রকৃত প্রস্তাবে ব্যবসায়ের জন্য নকল রেশম বা রেয়ন তৈরী হইতে থাকে। ১৮৯১ সালে কিন্তু এই নবাবিষ্কৃত পদ্ধতিও পরিবর্তিত হইয়া যায়। কতিপয় ব্যক্তি সেলুলোজ লইয়া কাজ করিতে করিতে 'কার্বন বাই সালফেট' ( Carbon bishalphite ) সহযোগে সহসা এক অভূত পন্থা আবিষ্কার করেন এবং প্রমাণ করেন যে এই পদ্ধতিই নাকি সব চাইতে সহজ পদ্ধতি। ফলে ১৯০০ সাল হইতে 'ভিস্কোস' ( Viscose ) নামে পরিচিত এই পদ্ধতিই ব্যাপকভাবে চালু লইয়া যায়। 'এ্যাসেটেট' পদ্ধতি অবশ্য প্রচলিত হইয়াছিল ১৮৬৯ সালে। কিন্তু ঐ পদ্ধতি প্রচলিত ছিল অত্যন্ত সীমাবদ্ধ স্থানে, আর বিশেষ করিয়া জার্মানীতে।

যদিও কাউন্ট কাড্রান্ট ১৮৮৯ সালে প্রথম এই ধরনের সংশ্লেষিত তত্ত্ব স্থপ্তি করেন তবুও ব্যবসায়ের কাজে এই তত্ত্ব লাগে অনেক পরে। "সস্তা কাঁচামাল হিসাবে মালবেরী ( Mulberry ) গাছের শাখা ও শুঁড়ি হইতে সংগৃহীত লেই হইতে মিঃ কাড্রান্ট প্রথম সংশ্লেষিত তত্ত্ব স্থপ্তি করেন।" (৬) তাহার পর ১৯২৪ সালের একটি হিসাবে (৭) দেখা যায় যে ঐ সময় সমগ্র পৃথিবীতে রেয়নের মধ্যে

শতকরা ৭৬ ভাগ উৎপন্ন হইত 'ভিস্কোস' পদ্ধতিতে, বাকী ২৪ ভাগের মধ্যে ১৮ ভাগ 'নাইট্রো সেলুলোজ', ৫ ভাগ 'কার্বোমোনিয়াম' আর ১ ভাগ 'এ্যাসেটেট' পদ্ধতিতে উৎপন্ন হয়। ১৯৪৬ সালের অন্ত একটা হিসাবে ( ইণ্ডাস্ট্রিয়াল কাইবার ১৯৪৮ ) দেখা যায় যে ঐ সালে 'এ্যাসেটেট' পদ্ধতিতে রেয়ন উৎপন্ন হইয়াছে মোট উৎপন্ন রেয়নের শতকরা ২০ ভাগ, বাকী ৭৭ ভাগ উৎপন্ন হইয়াছে অপর তিনটি প্রণায়।

এই স্থলে উল্লেখযোগ্য এই যে এই নবাবিষ্কৃত সংশ্লেষিত তত্ত্ব ( Synthetic fibre ) বা নকল রেশমের নাম কিন্তু রেয়ন ছিল না। "১৯২৪ সালে আমেরিকার ব্যবসায়ীদের এক সম্মেলনে এই বস্তুটির নামকরণ করা হয় রেয়ন" (৮) সেই হইতে উহার চালু আছে। বর্তমানে রেয়ন ব্যবহারকারী দেশসমূহের মধ্যে আমেরিকা যুক্তরাজ্যে মাথাপিছু রেয়ন ব্যবহারের গড় পরিমাণ হইতেছে ৫.৯ পাউণ্ড বৎসরে। হুইজারল্যাণ্ড, ক্যানাডা ও বেলজিয়মে রেয়ন ব্যবহৃত হয় বৎসরে গড়ে মাথাপিছু যথাক্রমে ৪.২ পাউণ্ড, ৩.৩ পাউণ্ড ও ৩.৩ পাউণ্ড। গ্রেট ব্রিটেন ও ফ্রান্সে ব্যবহৃত হয় মাথাপিছু ২.৪ পাউণ্ড করিয়া। ভারতবর্ষের রেয়ন ব্যবহারের পরিমাণ আপাততঃ মোটেই উল্লেখযোগ্য নহে। কিন্তু যে পরিমাণে রেয়নের আমদানী প্রতি বৎসর বৃদ্ধি পাইতেছে— তাহাতে অদূর ভবিষ্যতে রেয়ন ব্যবহারের পরিমাণের দিক হইতে উপরোক্ত দেশগুলির কোন কোন দেশকে ছাড়াইয়া গেলেও তাহাতে বিস্মিত হইবার কিছুই নাই। কারণ রেয়নের ব্যাপক প্রচারের মূলে আছে ইহার সস্তা দাম ও উজ্জল এবং দব্বার উপরে ইহা বেশ টেকসই। এই গুণগুলিই রেয়নের প্রচলনের পক্ষে যথেষ্ট।

(৬) ও (৭) The Rayon Industry by Mois H. Avran.

(৮) The Rayon Industry by Mois H. Avran.

## বিগত দিনের ভুলের ফসল আজ হোক কাটা শেষ

### শ্রীশচীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

আমাদের যত অন্ত্রার আজ দানী বাঁধি উঠিয়াছে,  
আমাদের ত্যাগ আনিয়াছে বহি শুধুই অকল্যাণ।  
প্রশ্রম পেয়ে ঘৃণা স্বাপদ হিংসার মাতিয়াছে;  
দান মুখ কেন, এতো আমাদের পিতামহদের দান।  
ক্ষয়-ক্ষতি-লাভ বত কিছু সাথে লভেছো অত্যাচার;  
তিলে তিলে বারে স্পর্ধা দিয়েছে আপোষ-বিলাসী মন।  
প্রতিকার খোঁজ কার কাছে গিয়ে ব্যর্থ ও চিংকার;—  
উত্তাপহীন ক্রীণ শোণিতে কি জাগিল না কম্পন।

দুর্ভিত রক্ত সজীব হয়েছে, করিয়াছে বিদ্রোহ,  
লোল চর্ম্মের প্রাচীর ভেদিয়া চাহিছে নিক্রমণ;  
রুধিরা রাখিতে চাহ তার পথ, বুধাই মোহ,  
গলিত মাংস গন্ধে জাগিছে কীটের আমন্ত্রণ।  
বিগত দিনের ভুলের ফসল আজ হোক কাটা শেষ,  
বন্ধ্য মাটির অঙ্গে জাগুক সৃষ্টির শিহরণ।  
মেঘ ও মন্ডার অপচয়টুকু হোক আজ নিঃশেষ;  
মাটির ক্রতির ক্ষত ঢেকে দিক শম্প-আন্তরণ।

# প্রাচ্যে শক্তি-সজ্জাত

অতুল দত্ত

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ চলিবার সময় সাম্রাজ্যবাদী জাতিগুলি ইহা উপলব্ধি করিয়াছিল যে, অতঃপর প্রাচীন সাম্রাজ্যনীতি আর চলিবে না : ঔপনিবেশিক দেশগুলিতে যে মুক্তির আকাঙ্ক্ষা এবল হইয়া উঠিয়াছে, তাহাকে বলপূর্ব্বক দমন করা অসম্ভব। পূর্বাভূত সাম্রাজ্যনীতির অন্তর্নিহিত দৌর্ব্বল্য এই সময় হুস্পষ্ট হইয়া ওঠে। দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়ায় একমাত্র ফিলিপাইন্ দ্বীপপুঞ্জ ব্যতীত সর্ব্বত্র জাপানীরা প্রথমে মুক্তিদাতা বলিয়াই অভিনন্দিত হইয়াছিল। ফিলিপাইন্সের বাটানে জেনারেল ম্যাক-আর্থারের প্রতিরোধ-প্রচেষ্টা গণসমর্থন লাভ করে এই কারণে যে, ১৯৪৬ সালে রাজনৈতিক স্বাধীনতা-প্রাপ্তির প্রতিশ্রুতি ফিলিপিনোসরা পূর্বেই পাইয়াছিল। দক্ষিণ-পূর্ব্ব-এশিয়ার অজান্তে দেশে “মুক্তিদাতা” জাপানীদের আচরণে জনসাধারণের ভুল ভাবিবার সঙ্গে সঙ্গে এবল প্রতিরোধ আন্দোলন গড়িয়া ওঠে। এই গণ-আন্দোলন গীত সাম্রাজ্যবাদকে হুপ্রতিষ্ঠিত হইতে দেয় নাই; ইহাকে দমন করিয়া প্রাচীন পদ্ধতিতে যেত সাম্রাজ্যবাদের পুনঃ প্রতিষ্ঠা যে অসম্ভব, ইহা চতুর সাম্রাজ্যবাদীরা বুঝিয়াছিল।

## যুদ্ধোত্তর প্রাচ্য—

এই কারণে যুদ্ধের পর দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়ার বিভিন্ন দেশের রাজনীতি হইতে সাম্রাজ্যবাদীদের কার্যিক অপসারণের এক পরিকল্পনা স্থির হয়। স্থানীয় পুঞ্জিপতি স্বার্থের সহিত ও দক্ষিণপন্থী রাজনীতিকদের সহিত আপোষ করিয়া স্বনিকার অন্তরালে সরিয়া যাওয়া এই পরিকল্পনার মূল কথা। পরিকল্পনা-রচয়িতারা আশা করিয়াছিলেন—ইহাতে সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থ অক্ষুণ্ণ থাকিবে, অথচ জনসাধারণের মনে এই ধারণার সঞ্চার হইবে যে, বৈদেশিক শক্তির প্রভুত্ব হইতে তাহারা মুক্ত; সর্ব্বোপরি, যে সাম্রাজ্যবাদী আদর্শ প্রাচ্য অঞ্চলে প্রসার লাভ করিতেছে, তাহার বিরুদ্ধে স্থানীয় পুঞ্জিপতি স্বার্থের ও দক্ষিণপন্থী নেতৃবৃন্দের সকল শক্তি নিয়োজিত হইতে পারিবে। বিভিন্ন সাম্রাজ্যবাদী শক্তির দূরদৃষ্টির কম-বেশী অনুযায়ী এই পরিকল্পনা অনুসৃত হয় বিভিন্নভাবে। আমেরিকা তাহার প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী ফিলিপাইন্সকে নিজের অর্থনীতির লাগপাশে আট্টে পৃষ্ঠে বাঁধিয়া নির্দিষ্ট সময়ে সেখানকার রাজনীতিকত্ব হইতে সরিয়া দাঁড়ায়। বৃটেনের শ্রমিক-গণসম্মেলন ভারতকে দুইভাগে ভাগ করিয়া দিয়া এদেশের রাজনৈতিক অধিকার প্রত্যাহার করে; ব্রহ্মদেশ হইতে সরিবার পূর্বে সে অর্থনৈতিক ও সামরিক অধিকার প্রতিষ্ঠিত রাখিবার প্রতিশ্রুতি প্রদান করে; সিংহলে তাহার নজর থাকে আরও কিছু কড়া। মালয়েও সে একটা রাজনৈতিক পৌছাবিল দিবার চেষ্টা করিয়াছিল; কিন্তু সে চেষ্টা

ব্যর্থ হইয়াছে। অনুরূপশী ওলন্দাজ সাম্রাজ্যবাদীরা ঔপনিবেশিক অধিকার শিথিল করিবার পূর্বে অত্যধিক গোম্মারতমি করিয়া তিষ্ঠতা বৃদ্ধি করিয়াছে। ফরাসী সাম্রাজ্যবাদ একবার ইন্দোচীনের জাতীয়তাবাদীদের সহিত আপোষ করিয়াছিল; কিন্তু সে আপোষকে ঔপনিবেশ শোষণের বোধ কারবারে পরিণত করা অসম্ভব বৃত্তিব্যমাত্র পুনরায় সম্মত আক্রমণ আরম্ভ করে। ইহাই মোটামুটি যুদ্ধোত্তর প্রাচ্যে যেত প্রভুত্বাধীন ঔপনিবেশগুলির চিত্র। প্রাচ্য সাম্রাজ্যবাদী জাপান যুদ্ধের পর মার্কিন ঔপনিবেশে পরিণত হয়; জাপানের অধিকৃত কোরিয়া দুইভাগে বিভক্ত হয়, ফরমোজা চলিয়া যায় চীনের অধিকারে। আর প্রাচ্যের আশা ঔপনিবেশিক দেশ—বিশাল চীন গৃহ-যুদ্ধে আলোড়িত হইতে থাকে।

যুদ্ধোত্তর প্রাচ্যে দুইটি রাজনৈতিক শক্তির প্রচণ্ড সজ্জাত দেখা দিয়াছে। এই শক্তি-সজ্জাত বিশেষভাবে মূর্ত্ত হইয়া ওঠে চীনের গৃহ-যুদ্ধে। ইহাকে কম্যুনিষ্ট শক্তির সহিত জাতীয়তাবাদী শক্তির সজ্জব বলিয়া অভিহিত করা হইয়া থাকে। কিন্তু একটু লক্ষ্য করিলেই দেখা যাইবে যে, চীনের গৃহ-যুদ্ধে এক পক্ষে ছিল যুদ্ধোত্তর সাম্রাজ্যবাদী নীতির সহযোগী শক্তি এবং অপর পক্ষে ছিল সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী প্রকৃত জাতীয়তাবাদী শক্তি। শেষোক্ত শক্তির নেতৃত্ব কম্যুনিষ্টরা করিয়াছে। কিন্তু সে নেতৃত্ব সম্ভব হইয়াছিল তাহাদের কর্তৃত্বচীতে আশা-ঔপনিবেশিক জাতির সমস্ত আশা-আকাঙ্ক্ষা প্রতিফলিত হইয়াছিল বলিয়াই। কৃষিপ্রাণ প্রাচ্যে সামন্ততান্ত্রিক ভূমি-ব্যবস্থার সংস্কার জনগণের সর্ব্বপ্রধান দাবী। চীনের কম্যুনিষ্ট নেতৃত্ব এই দাবী পূরণে প্রতিশ্রুত হইয়াছিল এবং অবহা! অনুকূল হইবামাত্র সে প্রতিশ্রুত পালন করিয়াছিল অক্ষরে অক্ষরে। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া প্রাচ্যের মানুষ পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যবাদীর বোঝা বহিয়াছে; তাহার মহুত্ব অবমানিত ও লাঞ্চিত হইরাছে পদে পদে। আজ আত্মসম্মিত করিয়া পাইবার পর রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বন্ধন হইতে পরিপূর্ণ মুক্তি তাহার অমোঘ দাবী। স্থানীয় অনুচরদের সাহায্যে সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থসিদ্ধির যুদ্ধোত্তর নীতি তাহাকে প্রত্যাহারিত করিতে পারে নাই। চীনের কম্যুনিষ্ট নেতৃত্বে এই শক্তির নিশ্চিত আবাস ছিল। এমন কি, চীনের কম্যুনিষ্ট নেতৃবৃন্দের মুক্তি-সংগ্রামের প্রতি সোভিয়েট রুশিয়ার নৈতিক সমর্থন যতই থাকুক, তাহার প্রত্যক্ষ সম্ভব এই সংগ্রামের সহিত কোথাও ছিল না। চীনের মুক্তি-সংগ্রাম যে সম্পূর্ণরূপে বৈদেশিক প্রভাবমুক্ত, এই বিষয়ে জনগণের মনে বিন্দুমাত্র সন্দেহের উদ্রেক হয় নাই। পক্ষান্তরে, তথাকথিত জাতীয় শক্তির নেতা কুয়োমিটাং দল ছিল সামন্ততান্ত্রিক প্রতিক্রিয়ার সমর্থনপুষ্ট, সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থের রক্ষক ও বৈদেশিক সামরিক শক্তির সাহায্যপ্রার্থী।

## সাম্রাজ্যবাদীর সহযোগী—

চীনে যে শক্তি আজ বিজয়ী, এ্যাচের আর এ্যাচেকটি দেশে সেই শক্তি দেশীয় ও বিদেশীয় ঐতিক্রম্যর অন্তর্ভুক্ত মিলনের বিরুদ্ধে মাথা তুলিতে চেষ্টা করিতেছে। এই শক্তিকে কম্যুনিষ্ট বলিষ্ঠ অভিহিত করিলে উহা নিশ্চিত হয় না; বরং কম্যুনিষ্টরাই উহাতে সম্মানিত হয়—এ্যাচের জনগণের অথবা নেতৃবৃন্দ যে তাহাদের, এই অশ্রুতিকর সত্য ইহাতে মানিয়া লওয়া হয়। এ্যাচের আশ্রিত গণশক্তির বিরোধিতার জন্য “গণতন্ত্র” রক্ষার নামে যাহারা পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যবাদীর সহযোগী হইয়াছে, তাহাদিগের প্রতি দৃষ্টি পাত করিলে তথাকথিত কম্যুনিষ্ট-বিরোধী অভিযানের নৈতিক দৌর্বল্য স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে। চীনে গণতন্ত্রের ধ্বংসাবাহী হন চিয়াং কাই-শেক, কোরিয়ায় সিংগ্য়ান্ রী, ইন্দোচীনে বাও-দাই, ফিলিপাইন্স-বীপপুঞ্জ কুইরিণো, ভামে বিপুল সংগ্রাম। চিয়াং কাই-শেক ও তাহার নৈতিক মেরুদণ্ডহীন সহকারীরা চীনের জনসাধারণকে রাজনীতি-ক্ষেত্রে দিয়াছিলেন দলীয় এক-নায়কত্ব, দুর্নীতিভ্রষ্ট আমলাতন্ত্র, অর্থনীতি-ক্ষেত্রে দিয়াছিলেন বৈদেশিক বার্ধেয় অসঙ্গত অধিকার; ভূম্যধিকারীর উৎপীড়ন, সাধারণ মানুষের জন্য দারিদ্র্য, অনশন, মহামারী ও অটিকিৎসা। আমেরিকার ৫ শত কোটি ডলার চিয়াং গোঙ্গীর দুর্নীতির অতল গর্ভে বিলীন হইয়াছে। কোরিয়ায় যিনি তথাকথিত পাশ্চাত্য গণতন্ত্রের ধ্বংসাবাহী, সেই সিংগ্য়ান্ রীকে মার্কিন গণতন্ত্রীরাই “দ্বিতীয় চিয়াং” বলিয়া বর্ণনা করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। ইনি কোরিয়াবাসীকে দিয়াছেন মাতৃভূমির বিধা-বিভাগ, জাপানী জমিদার ও শিল্পপতিকের দিয়াছেন নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি, আর দিয়াছেন ক্যাসিনো শাসনপদ্ধতি, জনসাধারণের অবর্ণনীয় দুর্দশা। আমেরিকার ৭ কোটি ডলার মূল্যের সমরোপকরণ এবং ৫ শত সমরবিশেষজ্ঞের দ্বারা দক্ষিণ কোরিয়ায় সমর বিভাগকে ইনি কি ভাবে গঠন করিয়াছেন, তাহার নিদারুণ পরিচয় কোরিয়ায় রণাঙ্গনে পাওয়া গিয়াছে। ইন্দোচীনের বাও-দাই দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্বে আনামের রাজধানী হিউয় রাজআসাদে প্রাচীন রাজতন্ত্রের ঐতিহাসিক সাক্ষীরূপে অবস্থান করিতেন। যুদ্ধের সময় জাপানী ভাবেদাররূপে ইনি প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন। যুদ্ধের পর হংকং ও আঙ্গর লইয়া সেখানকার এক হোটেলের বিলাসিতার পক্ষে ভূমিমা যান। পশ্চিমের গণতন্ত্রনিষ্ঠ যুদ্ধবীররা এ হেন বাও-দাইকে উদ্ধার করিয়া আনিয়াছেন এবং তাহাকে সমুদ্রে রাখিয়া লক্ষাধিক সঙ্গী যুদ্ধকারী ইন্দোচীনাদের উদ্দেশ্যে তুলিয়া ধরিয়াছেন। ফিলিপাইন্স বীপপুঞ্জ কুইরিণো বৈদেশিক বার্ধেয় বিষয় অসুচর। ইনি কতকগুলি অসঙ্গত চুক্তিতে দেশকে বৈদেশিক বার্ধেয় সহিত আবদ্ধ করিয়াছেন, বৈদেশিক বিলাসোপকরণে দেশের বাক্যের ভরিয়া দিয়াছেন; ভূমি ব্যবহার সংস্কার হয় নাই, অশিক্ষিত প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা হয় নাই। ফিলিপাইন্সের শাসন ব্যবহার ব্যাপক দুর্নীতি, সাধারণ মানুষের দুঃখ দুর্দশা সীমাহীন। ভামে পাশ্চাত্য “গণতন্ত্রের সহযোগী” হইতেছেন

সাম্রাজ্যবাদীর সহযোগীরা যিনি কথাকথিত ক্যাসিনো বিপুল সংগ্রাম।

## কোরিয়ার গৃহ-যুদ্ধের পটভূমি—

এ্যাচের আশ্রিত গণ-শক্তি চীনের রণাঙ্গনে দেশীয় ও বিদেশীয় ঐতিক্রম্যর অন্তর্ভুক্ত মিলনকে পরাহৃত করিয়াছে। বর্তমানে দুইটি শক্তির সামরিক সম্মর্ঘ্য চলিতেছে কোরিয়ায়। চীনের সামরিক সম্মর্ঘ্যে ঐতিক্রম্যশীল পক্ষের বৈদেশিক সহযোগী ছিল ববলিকার অন্তরালে; কোরিয়ায় সে-নিজে রাইফেল কাঁধে লইয়া রণক্ষেত্রে নামিয়াছে। কিন্তু গত এক মাসের যুদ্ধের গতিতে চীনের সাম্প্রতিক ইতিহাসের পুনরাবর্তনই এখানে সূচিত।

কোরিয়ার বর্তমান যুদ্ধের পটভূমি এইরূপ। এই রাজ্যটি আরম্ভে বৃটেনের সমান; ইহার মোট লোকসংখ্যা ৩ কোটি। প্রায় অর্ধ শতাব্দী কাল জাপানী সাম্রাজ্যবাদের চাকার এই দেশটি নিষ্পিষ্ট হইয়াছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শেষের দিকে সোভিয়েট রুশিয়া জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিবার পর তাহার সেনাবাহিনী মালুকুরিয়া ভেদ করিয়া কোরিয়ায় পৌঁছায় এবং জাপ-বাহিনীকে বিপর্যস্ত করে। ইহার পর জাপগণতন্ত্রমেন্ট আত্মসমর্পণ করিলে মার্কিন সেনাবাহিনী কোরিয়ায় গমন করে। তখন মিত্র শক্তির মধ্যে সাময়িকভাবে এই ব্যবস্থা হয় যে, ৩৮তম অক্ষরেখার উত্তরে সোভিয়েট বাহিনী অবস্থান করিবে এবং দক্ষিণে থাকিবে মার্কিন সেনাবাহিনী। ১৯৪৫ সালে সেপ্টেম্বর মাসে কোরিয়া এই ভাবে বিভাজিত হইয়াছিল। ইহার পর ঐ বৎসর ডিসেম্বর মাসে মক্ষোর ত্রিশক্তির সম্মেলনে স্থির হয় যে, জাপানী শাসনের কলঙ্কচিহ্নগুলি মুছিয়া ফেলিয়া অতি সত্ত্বর কোরিয়াকে স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রে পরিণত করিতে হইবে। উত্তর কোরিয়ায় জাপানী সাম্রাজ্যবাদের কলঙ্কচিহ্ন অপনোদনের ভার গ্রহণ করে সোভিয়েট রুশিয়া, দক্ষিণ কোরিয়ায় দায়িত্ব লয় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। উত্তর কোরিয়ায় সোভিয়েট কর্তৃপক্ষের উৎসাহে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের মিলনে “পিপুলস্ কমিটি” গড়িয়া ওঠে। জমিদারী প্রথার উচ্ছেদ করিয়া কৃষকদের মধ্যে বিনা মূল্যে ভূমি বণ্টন করা হয়, বৃহৎ বৃহৎ অশিক্ষিত-প্রতিষ্ঠান, ব্যাক, যোগাযোগ ব্যবস্থা প্রভৃতি রাষ্ট্রায়ত্ত্ব হয়। পক্ষান্তরে, দক্ষিণ কোরিয়ায় রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক রূপ অপরিবর্তিত থাকে। জাপানী শাসক ও শোষকের দল মার্কিন প্রভুদের মনস্তৃষ্টি করিয়া সেখানে নিরাপদ হয়। ভূমি ব্যবহার সংস্কার হয় না; অশিক্ষিতের ক্ষেত্রে পূর্বের ব্যবস্থা বলবৎ থাকে, জাপানী ও মার্কিন পুঞ্জপতিদের মিলনে উহার মালিকশ্রেণী নুতন রূপ পরিগ্রহ করে মাত্র। জাপানীদের পরিবর্তে কোরিয়ান্ ও মার্কিন ঐতিক্রম্যপন্থীদের এই বৌদ্ধ প্রভুত্বের বিরুদ্ধে দক্ষিণ কোরিয়ায় প্রবল বিক্ষোভ আরম্ভ হয়। ১৯৪৬ সালে অক্টোবর মাসে সমগ্র কোরিয়াব্যাপী ধর্মঘট ও সশস্ত্র বিদ্রোহ দেখা দেয়। উহা দমন করিবার জন্য যে হিংস্র আক্রমণ চলে, তাহাতে ৫ হাজার কোরিয়ান্ নিহত অথবা নিখোঁজ হইয়াছিল; আহত হইয়াছিল ৩ হাজার, কারাগারে নিক্ষেপ হইয়া ২৫ হাজার।

সোভিয়েট ও মার্কিন কর্তৃপক্ষের অসুস্থত নীতির বৈপরীত্যের জন্য সোভিয়েট-মার্কিন বিরোধিতা কমিটীর কাজ অচল হইয়া ওঠে। সোভিয়েট

রুশিয়া তখন কোরিয়া হইতে উত্তরপক্ষের সৈন্য অপসারণের দাবী তোলে। ১৯৪৬ সালের হিংস্র অত্যাচার সম্বন্ধে ১৯৪৭ সালে মার্চ মাসে মার্কিন সৈন্যের অপসারণের দাবীতে আবার দেশব্যাপী অভ্যুত্থান ঘটয়াছিল। সৈন্য অপসারণের প্রথমটা মার্কিন কর্তৃপক্ষের নিকট বড়ই অসুবিধাজনক। তাই, তখন তাঁহারা জাতিসংঘের মারফৎ কোরিয়ায় একটি বিশেষ কমিশন পাঠাইবার ব্যবস্থা করেন।

জাতিসংঘের কমিশন অবস্থা পধ্যবেক্ষণ করিয়া অভিমত প্রকাশ করেন যে, বর্তমানে সমগ্র কোরিয়ায় নির্বাচন সম্ভব না হইলে স্বতন্ত্ররূপী অঞ্চলে উহা সম্ভব, তত দূরে নির্বাচনের ব্যবস্থা করিয়া উপযুক্ত শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করিবার পর বৈদেশিক সৈন্য অপসারিত হইবে। কোরিয়াকে স্বাধীনভাবে বিভক্ত করিবার এই স্থপট্ট ইঙ্গিতে দেশব্যাপী প্রবল প্রতিবাদের ঝড় ওঠে। এই প্রতিবাদ অগ্রাহ্য করিয়া এবং বহু সংখ্যক লোককে কারাবদ্ধ করিয়া ১৯৪৮ সালের মে মাসে দক্ষিণ কোরিয়ায় নির্বাচনের ব্যবস্থা হয়। এই নির্বাচনে নানাবিধ দুর্নীতির কথা শুনা যায়। বাহা হউক, ইহার পরই উত্তর ও দক্ষিণ কোরিয়ার নেতারা এক সম্মেলন আহ্বান করেন। এই সম্মেলনে সমগ্র কোরিয়াব্যাপী নির্বাচনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সিগ্‌ম্যান্ রী-গর্ভমেণ্টের হিংস্রতা উপেক্ষা করিয়া দক্ষিণ অঞ্চল সহ সমগ্র কোরিয়ায় নির্বাচনের আয়োজন হইয়াছিল। এই সম্মিলিত নির্বাচনের সময় রী-গর্ভমেণ্টের অত্যাচারে ৩ শত লোক নিহত এবং প্রায় ১০ হাজার লোক গ্রেপ্তার হয়। ১৯৪৮ সালের আগষ্ট মাসে সম্মিলিত নির্বাচনে উত্তর কোরিয়ার ৩ প্রায় সমস্ত নির্বাচক এবং দক্ষিণ কোরিয়ার শতকরা ৭৭ জন নির্বাচক যোগ দিয়াছিল। এই নির্বাচনের পর ৩২টি বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি লইয়া ‘সুপ্রীম্ পিপল্‌স্ এসেমবলী’ গঠিত হয়। এই এসেমবলীতে নুতন শাসনতন্ত্র গৃহীত হইয়া “কোরিয়ান্ পিপল্‌স্ ডিমোক্রেটিক্ রিপাবলিক্” প্রতিষ্ঠা লাভ করে। এই ডিমোক্রেটিক্ রিপাবলিক্ই এখন উত্তর কোরিয়ায় প্রতিষ্ঠিত; সমগ্র কোরিয়ায় কর্তৃত্ব বিস্তার ইহার সঙ্গত দাবী। এই দাবী উত্তর ও দক্ষিণ কোরিয়ার জনসাধারণ কর্তৃক সমর্থিত। দেশীয় ও বিদেশীয় প্রতিক্রিয়ার প্রভাব হইতে মুক্তির জ্ঞান—মাতৃভূমির দ্বিধা-বিভাগ অপনোদনের জ্ঞান জাগ্রত কোরিয়াবাসীর বর্তমান সংগ্রামে উত্তর-দক্ষিণের ভেদাভেদ নাই। বর্তমানে উত্তর কোরিয়ায় কেবল সামরিক শক্তিতেই জয়লাভ করিতেছে না, তাহাদের একটানা বিজয় সম্ভব হইতেছে মুক্তিকামী দক্ষিণ কোরিয়ানদের ঐকান্তিক সহযোগিতায়। প্রতীচীর প্রচার ঢাকগুলি প্রতি সময়ে এই অপ্রীতিকর সত্যকে চাপা দিতেছে।

### পুঁজিতান্ত্রিক অর্থনীতির সঙ্কট—

প্রাচ্যের এই মুক্তি-সংগ্রামে প্রাধান্য কমুনিষ্টদের এবং ইহার নৈতিক সংযোগ মোস্তিমেট রুশিয়ার নেতৃত্বাধীন রাষ্ট্রবন্ডের সহিত। এখন মহাযুদ্ধের শেষের দিকে রুশিয়ার সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সকল

হওয়ার বাস্তবিক হইতে বেরিং সাগর পর্যন্ত বিশাল অঞ্চলের অর্থনীতি পুঁজিতান্ত্রিক বিশ্ব-অর্থনীতির আওতার বাহিরে চলিয়া গিয়াছিল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর পূর্বে ইউরোপ পুঁজিতান্ত্রিক অর্থনীতির প্রভাবমুক্ত হয়। সমগ্র এশিয়ার বিশালতম দেশ—৪০ কোটি নরনারী অধ্যুষিত চীনও সমাজতান্ত্রিক পক্ষে চলিয়া গেল। ইহার পর, প্রাচ্যের অন্যান্য দেশের মুক্তি-সংগ্রাম যদি সকল হয়, তাহা হইলে বিশ্বের পুঁজিতান্ত্রিক এলেকা আরও সঙ্কুচিত হইবে। পুঁজিতান্ত্রিক অর্থনীতি তাহার উন্নত অবস্থায় নিজ নিজ দেশের নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে আবদ্ধ থাকিতে পারে না; বিদেশের অর্থ-নীতিক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তৃতি উন্নত পুঁজিতান্ত্রিকের স্বভাববিশিষ্ট। তাই, পুঁজিতান্ত্রিক এলেকার ক্রমবর্ধমান সঙ্কোচনে পাশ্চাত্যের স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট মহল প্রমাদ গণিয়াছে। চীনের পর প্রাচ্যের আর কোথাও গণশক্তি যাহাতে ক্ষমতা হস্তগত করিতে না পারে, তাহার জ্ঞান এই মহলের এখন দৃঢ়পণ। কমুনিজম বিরোধিতার মুখোমুখি পাশ্চাত্যের সমরযন্ত্র যে ক্রমে ব্যাপকতর ও হিংস্রতরূপে প্রাচ্যে নিয়োজিত হইতেছে, তাহার মূলে রহিয়াছে পুঁজিতান্ত্রিক অর্থনীতির আত্মরক্ষার এই একান্ত প্রয়োজনীয়তা। উত্তর কোরিয়াকে আক্রমণকারী আখ্যা দিয়া জাতিসংঘে প্রভাব পাণ করানো, সেখানকার গৃহ-যুদ্ধে মার্কিন নেতৃত্বে পুঁজিতান্ত্রিক শক্তির সশস্ত্র হস্তক্ষেপ, ফরমোজার কুয়োমিটাং চক্রকে প্রতিষ্ঠিত রাখার আগ্রহ, ইন্দোচীনে মার্কিন সাহায্য প্রেরণের ব্যবস্থা, জাম-মার্কিন সামরিক চুক্তির আয়োজন প্রভৃতি সর্বের পশ্চাতেই পুঁজিতান্ত্রিক অর্থনীতির স্বার্থ রক্ষার—তাহার বাঁচিয়া থাকার প্রবল তাগিদ।

ক্রমলিনে উৎসব (!)—

কোরিয়ায় গৃহ-যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পর ভারতের প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু যে আপোষ মীমাংসার প্রস্তাব করিয়াছিলেন, তাহা অগ্রাহ্য করিয়া পশ্চিমের পুঁজিতান্ত্রিক দেশগুলি অধিকতর সমরায়োজনে মাতিয়াছে; স্বভাবতঃ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এই বিষয়ে অগ্রণী। রণ-বিকৃত ইউরোপের জনসাধারণ যুদ্ধের ঘোর বিরোধী; এমন কি মার্কিন যুক্ত রাষ্ট্রেও সাধারণ মানুষ যুদ্ধ চাহে না। তাহাবিগকে উপেক্ষা করিয়াই এই বিপুল সমরায়োজিত। যুদ্ধায়োজনের জ্ঞান, অর্থাৎ জনসাধারণের অব্যবহাধ্য পণ্য উৎপাদনের জ্ঞান ব্যর্থ করিবার মত শক্তি ইউরোপের কোনও দেশেরই আর অবশিষ্ট নাই। ইহার এখন স্বভাবতঃ অধিক পরিমাণে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি নির্ভরশীল হইবে এবং স্বদেশে জনকল্যাণমূলক কাজে অমনোযোগী হইবে। ইহার ফলে বর্তমান শাসকগোষ্ঠীর এবং সমরকামী মার্কিন যুক্ত-রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ইউরোপে প্রবল গণবিক্ষোভ অবশ্যজারী। প্রাচ্যের মুক্তি-আন্দোলন দমনের জ্ঞান পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যবাদী শক্তির দৃঢ়তা এইভাবে তাহাদের নিজেদের শিবিরের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত বৃদ্ধি করিবে। আর প্রাচ্যে পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যবাদীর বিরুদ্ধে জনসাধারণ অধিকতর সংহত ও অধিকতর নির্ভর হইয়া উঠিবে। প্রাচ্যে বিভিন্ন দেশের মুক্তি-



সংগ্রাম একটি নৈতিক যোগসূত্রে প্রাণিত হইলেও বিভিন্ন ভৌগোলিক অঞ্চলে ইহা আত্মপ্রকাশ করিতেছে বিচ্ছিন্নভাবে। এই সংগ্রামের জাতীয় রূপ অবিকৃত। এই জাতীয় মুক্তি-সংগ্রামের বিরুদ্ধে পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যবাদীদের সমরপ্রচেষ্টা যে নৈতিক সমর্থন-বিবর্জিত, তাহার জীবন্ত প্রমাণ সাম্রাজ্যবাদীদের সহচর চিয়াং, রী, বাও-দাই, কুইরিণো প্রভৃতি জীবন্ত। এই সব নৈতিক মেরুদণ্ডহীন জাতিজোহীদিগকে আশ্রয় করিয়া পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যবাদীর সামরিক শক্তি নিয়োজিত হইতেছে। কম্যুনিজম-বিরোধিতার ক্ষীণ মুখোসের অন্তরালে এই শক্তির প্রকৃত রূপ প্রাচ্যের জনসাধারণের দৃষ্টিগোচর হইতেছে। পাশ্চাত্য “গণতন্ত্রীদের” এই নৈতিক ক্ষতির গুরুত্ব বিশাল ; সামরিক ক্ষেত্রে ইহার প্রভাব সুদূরপ্রসারী। জনপ্রিয় ও সর্বতোভাবে জনসমর্থিত সেনাবাহিনীর শক্তি কিরূপ দুর্বল, তাহার পরিচয় বর্তমানে কোরিয়ার পাওয়া যাইতেছে। ইহা অপেক্ষাও উজ্জলতর দৃষ্টান্ত মালয়। এখানে তিন হাজার গোরিলাকে দমনের অস্ত্র ৬০ হাজার

সৈন্য দুই বৎসর ব্যবৎ ব্যর্থকাম হইতেছে ; বুটেনের কোটা কোটা পাউণ্ড এখানে জলের মত ব্যয় হইতেছে। কয়েকটি দেশজোহী অপদার্থকে সম্মুখে রাখিয়া পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যবাদীর সমরশক্তি যত অধিক পরিমাণে প্রাচ্যে নিয়োজিত হইবে, এখানে মুক্তিকামী জনগণের যুতাপণ দৃঢ়তা ততই বেশী প্রবল হইবে ; তাহাদের ঐকান্তিক সমর্থনে নিয়মিত সেনাবাহিনী ও গেরিলা জল অজ্ঞেয় হইয়া উঠিবে। এইভাবে কোরিয়ায়, কম্বোজায়, ইন্দোচীনে, মালয়ে, ব্রহ্মদেশে এবং পরে ফিলিপাইনসে ও শ্রামেও যদি পাশ্চাত্য শক্তিবৃন্দের সমররথের চাকা আটকাইয়া যায়, তাহা হইলে ক্রেমলিনের ঐ ব্যক্তিটি পাইপ মুখে গুলিয়া বিক্রপের হাসি হাসিবেন ; তাহার নাগাল কোরিয়ায় যেমন পাওয়া যাইতেছে না, প্রাচ্যের অন্ত কোনও অঞ্চলেও তেমন পাওয়া যাইবে না। ঐ সময়ে পশ্চিম ইউরোপের কোনও কোনও দেশে গণ-বিক্ষোভ যদি সশস্ত্র অভ্যুত্থানে পরিণত হয়, তাহা হইলে ক্রেমলিনে সেদিন হয়ত উৎসবের আয়োজন হইবে।

## প্রভাতী তারা

### শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়

বল দেখি, ফিরে এলে কতদিন পরে ?  
আমার এ ঘরে  
তোমাতে ধরিয়া রাখি ছিলনাক হেন আয়োজন  
ছিল না বাসর-সজ্জা, করিনিক কুসুম চয়ন ;  
গন্ধদীপ ছিল নাক ; মাটির প্রদীপ ছিল জ্বালা ;  
আর ছিল হৃদয়ের ডালা  
পরিপূর্ণ কামনার কূলে।  
তুমি এসেছিলে ভুলে,

ভুলে যদি গিয়ে থাক চলে  
সন্ধ্যাদীপ আজিও ত জ্বলিছে বিরলে  
আলোকিয়া শূন্য মোর ঘর ;  
বিরহ দুর্ভর  
সেও ভালো ; বেঁচে থাক শুধু মোর আশা  
মিলনের অশান্ত তিয়াসা  
তীব্র হ’তে হোক তীব্রতর,  
বিচ্ছেদ কামনা শ্রোত হোক খরতর।

জাগ্রত আঁখির আগে শূন্য পথ ধরি  
আবার যেদিন তুমি আসিবে স্মরী,  
সাজিয়া নূতন সাজে নব অভিসারে—  
সেদিন সে অন্ধকারে  
কঙ্কণে ধ্বনিয়া তুলি নবতন সুর  
একান্ত নিকট করি’ দূরাস্ত সুদূর  
ডাক দিবে পরিচিত স্বরে,—  
মনে হবে,—এলে যেন নব স্বয়ংঘরে।

সেদিন আমার ঘরে ফুলের উৎসবে  
গন্ধদীপ জ্বালি দিবে উৎসর্গের আনন্দ-গৌরবে।  
তবু জানি সে মিলন-রাত্রি অবশেষে  
মলিন আননে কণে মুহু হাসি হেসে  
নতনেত্রে চাহিবে বিদায়।  
কতকণ ধরে রাখা যায়  
প্রভাতী তারার দীপ্তি, কণহায়ী আয়ুর সমান  
এই আছে, এই নাই, পলক মেলিতে অন্তর্ধান।

# দ্বারমণ্ডল



তারামঙ্গল বন্দ্যোপাধ্যায়

(পূর্বাহ্নরুতি)

অরুণার খুব বেশী দুর্ভোগ পোহাইতে হইল না। আই-বি ইনস্পেক্টর রণদাপ্রসাদ তাহাকে অল্পেই ছাড়িয়া দিল। রণদাপ্রসাদ এই জেলাতেই সাধারণ সাব-ইনস্পেক্টর হিসাবে কাজ শুরু করিয়া আপন কৃতিত্বে এখানকার আই-বি ইনস্পেক্টর হইয়াছে। সেদিক দিয়া কৰ্ম-জীবনের গোড়ার দিকে তাঁহার খ্যাতি এবং কৃতিত্ব এস-পি-সমশের খান এবং দারোগা দরবারী শেখের খ্যাতি ও কৃতিত্ব এক খাতের জল-স্রোতের মত স্বাদে বর্ণে পলির পরিমাণে একরকমই ছিল। কিন্তু সমশের খানের মুসলীম প্রীতি এবং হিন্দু বিদ্বেষ রণদাপ্রসাদকে সংপথে বা সত্যের পথের দিকে ঠেলিয়া দিয়াছে।

প্রথমেই দরবারী রণদাকে চটাইয়া দিল—সে খানার ইনস্পেকসন রুমে অরুণাকে হাজির করিয়া বলিল—দেখুন আর কি রকম ভোল পালটেছে দেখুন!

সপ্রশ্ন ভক্তিতে রণদা দরবারীর মুখের দিকে চাহিল। দরবারীর কথাটা ঠিক তাহার মাথায় ঢোকে নাই। দরবারী অরুণাকে বলিল—এখনও তো বুড়ী হও নি তুমি—এরই মধ্যে তপস্বিনী সাজলে যে?

অরুণার মুখ লাল হইয়া উঠিল। বকাটা কোণলে ব্যবহার করিলেও—মূল প্রবাদ বাক্যে ব্যবহৃত ‘বেশা’ শব্দটা তাহার মনে পড়িয়া গেল। তবু সে কঠিন হইয়া বসিয়া রহিল। রণদাবাবুও চকিত হইয়া দরবারীর দিকে চাহিল। রণদা নিজেও কথাটা ব্যবহার করিতে পারিত, ইহার পূর্বে এ অপেক্ষাও কুৎসিত কথা সে স্বচ্ছন্দে অনর্গল ব্যবহার করিয়া আসিয়াছে। কিন্তু আজ তাহার মুখ-চোখ লাল হইয়া উঠিল। সে বলিয়া উঠিল—আঃ দরবারী! তবে জোরে ধমক দিতে সাহস হইল না। কিছুক্ষণ পরেই সমশের খাঁ আসিতেছে। মনে পড়িয়া গেল—বৎসর দুইয়েক আগে যখন জেলার ষড়যন্ত্র মামলা আবিষ্কারে

খাঁ মাতিয়া উঠিয়াছিল—সেই সময় একটা ছিঁচকে চুরিকেও সমশের স্বকোশলে ষড়যন্ত্র মামলার সঙ্গে গাঁথিয়া দিয়াছিল—সেই সময় রণদা বলিয়াছিল—এটা বাদ দিন—লোকে বলবে কি? না—না! সমশের তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া সোজা সহজ সুরে বলিয়াছিল—‘আমি দেখছি রণদাবাবু তোমাকে আবার সেই সাব-ইনস্পেক্টর-শিপেই রিভার্ট করতে হবে।’ এখন রণদাবাবু পাক-ইনস্পেক্টর—তবুও সমশের খানের মুখ মনে পড়িলে খানিকটা দমিয়া যাইতে হয়।

ওদিকে দরবারী ওইটুকু ধমকে দমিল না। সে বলিল—না আর চণ্ড আমি বরদাস্ত করতে পারি না। দেখুন না—খান কাপড় পরে—হাত শুধু ক’রে—কুখু চুলে এলোকেশী হয়ে একেবারে গৌসাই ঠাকরণ সেজেছেন। মুসলমান হয়ে কলমা পড়ে বিয়ে করে—ফের ছিঁছু হয়ে—

এবার রণদা দৃঢ় হইয়া ধমক দিল—দরবারী সাহেব ওগুলো আমাদের জিজ্ঞাসার বিষয় নয়। আপনি বাইরে যান, শুকে যা জিজ্ঞাসা করবার আমি করছি। যান—

এ-আদেশ লভন করিতে দরবারীর সাহস হইল না। দরবারী এখনও ঠিক আই-বি বিভাগের লোকও নয়। রণদার ব্যক্তিত্বও আছে।

দরবারী বাহিরে যাইতেই রণদা বলিল—কিছু মনে করবেন না। ওদের আসল রাগটা হ’ল আপনি মুসলমান ধর্ম অবলম্বন করে বিয়ে করে ফের হিন্দু হলেন কেন?—এরা—। পুলিশ বিভাগের লোক না-হইলে রণদা হয় তো আরও অনেক কথা বলিয়া ফেলিত। সমশের খাঁ এখানকার এস-পি না হইলেও বলিত। নিজেদের দলের লোক এস-পি হইলেও বলিত। প্রাণ ভরিয়া—পেট খোলসা করিয়া বলিত। আত্মদমন করিয়া কয়েক মুহূর্ত চূপ করিয়া রহিল—তারপর বলিল—কি বলব বলুন? এর

জন্মে দায়ী হচ্ছেন আপনারা। কংগ্রেস, রেগুলিউসনারী পার্টি। স্বাধীনতা—স্বাধীনতা রব তুলে হুকুম করে—আন্দোলন করে আর বোমা পিস্তল ফুটিয়ে দেশটাকে এদের হাতে তুলে দিতেন না। আপনারাই এর জন্মে দায়ী!

অরুণা বসিয়া ছিল পাথরের মত। প্রথম বয়সে—অর্থাৎ সে যখন কুমারী অবস্থায় তাহার দাদার সঙ্গে এই দলে যোগ দিয়াছিল—তখন—দুইবার তাহাকে কলিকাতার আই-বি আপিলে বাইতে হইয়াছিল। তখন সে মুখে ভুবড়ী ফুটাইয়াছিল। দু-মাস পূর্বে হইলেও সে কাটা কাটা জবাবই দিত। কিন্তু এই দু-মাসে সে একেবারে পান্টাইয়া গিয়াছে; দেখিলে মনে হয় যে—একটা কঠিন জীবন-সঙ্কট রোগে ভুগিয়া—তাহার খাটুটাই পান্টাইয়া গিয়াছে। রণদার কথার জবাবে সে এতক্ষণে কথা বলিল—আমি কংগ্রেসের মেম্বর পর্য্যন্ত নই; বোমা-পিস্তল ছুঁড়ে যারা স্বাধীনতা আনবেন—তাদের সঙ্গেও আমার কোন সংশ্লব নেই।

আজ না হইয়া অন্তদিন হইলে রণদা টেবিলে একটা কিল মারিয়া হুকুম ছাড়িয়া উঠিত। স্নাকামি, প্যাচ কবিতা উত্তর সে আদৌ সহ্য করিতে পারে না। আজ কিন্তু তাহার মেজাজ আলাদা। সে এই হিন্দুকন্ডটিকে কোন রকমে ছাড়িয়া দিতে পারিলে বাঁচে। অরুণার উত্তরে মুখ একটু বিকৃত করিয়া সে বলিল—তা জানি, আপনারা আবার কমুনিষ্ট! বলিতে বলিতে সে ক্লেপিয়া উঠিল—বলিল—আপনারা আবার জাত মানেন না, জঁখর মানেন না। হুঁ—তাইতেই এমন ভাবে মুসলমান হ'তে বাধে নি। কিন্তু—। সত্যিই তো দরবারী মিথ্যে বলে নি—আবার মরতে হিন্দু হলেন কেন?

অরুণা বলিল—এ কথার উত্তর আমি দেব না।

—দেব—না? ছয় ফুট লম্বা জোয়ান রণদা চেয়ারে মেহখানাকে শিখিল করিয়া বসিয়াছিল। সে সহসা চল্লিশ ইঞ্চি ছাতি খানাকে ফুলাইয়া—সোজা হইয়া বসিল।

ইকটা বাহির পর্য্যন্ত গিয়াছিল। দরবারী দরজার গোড়ায় আগাইয়া আসিল। পদশব্দে রণদা ঘুরিয়া তাকাইতেই বলিল—দেখছেন স্যার—ত্যাঁদড়ামী!

রণদা ঘুরিয়া অরুণাকে বলিল—আপনি তা হ'লে

অরুণা সেন? বিশ্বনাথ ভট্টাচার্যকে মুসলমান হয়ে বিয়ে করেছিলেন। ফের হিন্দু হয়ে এখন অরুণা ভট্টাচার্য হয়েছেন?

—হ্যাঁ। এ তো গোপন করি নি আমি।

—করেছেন। এখানে যখন গার্লস ইন্সকুলে কাজ নেন—তখন এ পরিচয় দেন নি। স্বামীর নাম লিখেছেন—বিশু ভট্টাচার্য।

—আমার স্বামী ওই নামই ব্যবহার করতেন। বিশ্বনাথ বলতেন না নিজেকে। আর এখানকার কেউ আমাকে কোন প্রশ্নও করেন নি। এ দেশে শুধু 'বিশু' বলে কেউ নাম লেখে না, তবুও কেউ প্রশ্ন করেন নি, 'বিশু' লিখেছেন কিন্তু পুরো নাম কি?

—হুঁ। আপনি কমুনিষ্ট?

—এ যুগে সাধারণ শিক্ষিত লোকে সবাই চায় কমুনিজম সম্মত ব্যবস্থা।

—তা—না। আপনি কমুনিষ্ট পার্টির মেম্বর?

—না। একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল অরুণা। মিথ্যা তাহাকে বলিতে হইল।

—আপনার স্বামী? বিশ্বনাথ তো মেম্বর ছিলেন?

—আপনারা আমার চেয়ে অনেক বেশী জানেন দেখছি—

—তার মানে?

—তার মানে—আপনারা যা বলেছেন, যা জেনেছেন—সে সব কথা আমি তো জানি না। তা ছাড়া, আমি তো নিজেকে কোন রাজনৈতিক দলে কখনও যোগ দিই নি। আমার দাদা অবশ্য জেল খেটেছেন, ডেটিয়া ছিলেন; তাঁর বন্ধ ছিলেন আমার স্বামী সেই হিসেবেই তাঁর সঙ্গে আমার পরিচয় হয়—সেই পরিচয় ক্রমে—

খামল অরুণা। মুখে বোধ হয় বাথল। একটু থেমেরে বললে—শেষ বিয়ে করি ছুজনে।

—হুঁ। মুসলমান হয়েছিলেন কেন? হিন্দু থেকেও তো বিয়ে করতে পারতেন। দশ বিশটাতেও তো বাধা নেই।

—ও কথার জবাব দেব না। একবার তো বলেছি।

—না দেন দরকার নেই জেনে। এখন যেতে পারেন আপনি।—না—আর একটা কথা। এখানকার দেবু

ঘোবই আপনাকে এখানে এনেছিল এ কথা কি ঠিক ?  
এবং তার সঙ্গে আপনার এত হুগতাই বা কিসের ?

—উনি আমার স্বামীর বন্ধু, আমার স্কুলের সেকেন্ড  
মিস্ট্রেস স্বর্ণের স্বামী, পাশাপাশি বাসায় থাকি। সজ্জন  
ব্যক্তি। এই পর্য্যন্ত। উনি আমাকে চাকরীর খবরটা  
দিয়েছিলেন। আমি ঠিকে লিখেছিলাম—আমার স্বামীর  
দেশে থাকতে চাই।

—আচ্ছা যান আপনি। বলিয়াই গলা নামাইয়া  
মুহূর্ত্তে তাড়াতাড়ি কি বলিতে গেল, তাও না বলিয়া একটা  
কাগজে খসখস করিয়া কি লিখিয়া—কাগজটার দিকে  
অরুণার দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। অরুণা দেখিল—রগদা  
লিখিয়াছে—“এখান থেকে পত্রপাঠ চলে যান, সমশের  
খানের হাত থেকে বাঁচা বোধ হয় অসম্ভব।” কাগজখানা  
সঙ্গে সঙ্গে হাতের মুঠায় তালগোল পাকাইয়া ছোট্ট একটি  
গোল পিণ্ডে পরিণত করিয়াও ক্ষান্ত হইল না রগদা শেষে  
সেটাকে মুখে পুরিয়া চিবাইতে শুরু করিল।

অরুণা উঠিয়া দাঁড়াইল।

—দাঁড়ান। আর একটা কথা।

অরুণা জবাব দিল না, প্রশ্নের প্রতীক্ষা করিয়া  
দাঁড়াইল।

রগদা বলিলেন—থাকবেন কোথায় ? নিজের বাসাতেই  
থাকবেন তো ?

অরুণা বলিল—হ্যাঁ।

—থাকবেন ক’ দিন ?

অরুণা সবিস্ময়ে রগদার দিকে অসঙ্কোচে তাকাইয়া  
রহিল—তারপর বলিল—আমি তো এখানে চাকরী করি—

—আপনি তো রেজিগনেশন দিয়েছেন। চার্জ  
বুঝিয়ে দিতে এসেছেন। রগদার দৃষ্টিতে ইঙ্গিত ফুটিয়া  
উঠিল—“এখান থেকে পত্রপাঠ চলে যান”।

অরুণা শূন্য দৃষ্টিতে চাহিয়া কি যেন ভাবিয়া লইল—  
যেন নিজের মনের সঙ্গে একটা বুঝাপড়া করিয়া লইল ;  
তারপর সেই শূন্য দৃষ্টি রগদাবাবুর মুখের উপর তুলিয়া  
ধীরে ধীরে একটি একটি করিয়া কয়েক শব্দ বলিয়া গেল,  
অসংলগ্ন হইল—কিন্তু সুস্পষ্ট অর্থ এবং দৃঢ়তায় তাহার সে  
উত্তর রগদাকে বিস্মিত এবং নিরুত্তর করিয়া দিল। অরুণা  
বলিল—আমি—রেজিগনেশন—উইদড় করব।

নিরুত্তর রগদার বিস্মিত দৃষ্টিতে প্রশ্ন ফুটিয়া উঠিল—  
আমি যে কথা তোমাকে লিখে জানালাম—তার পরেও  
থাকতে চাও এখানে ?

নারী না হইয়া পুরুষ হইলে—রগদা মুহূর্ত্তে উঠিয়া  
দাঁড়াইয়া গালে অন্তত প্রচণ্ড একটি চপেটাঘাত কবাইয়া  
দিত। নারী—আবার অরুণা না হইয়া—অস্ত্র কেহ  
হইলে সমশের দরবারীর সঙ্গে বিরোধটা—সুস্পষ্টরূপে হিন্দু  
মুসলমান বিরোধের ভিত্তির উপর গজাইয়া না উঠিলে রগদা  
ছাড়িত না। দাঁতে দাঁতে বধিয়া গালাগালি করিয়া টেবিল  
চাপড়াইয়া কাণ্ড বাধাইয়া তুলিত। উনিশশো সাতাশ  
আঠাশ হইতে বিপ্লবীদের দলে মেয়েরা ঢুকিতে শুরু  
করিয়াছে—আই বি বিভাগের কর্মচারী রগদাকে মেয়েদেরও  
শাস্ত্যস্তা করার অভিযান আয়ত্ত করিতে হইয়াছে, সে—  
অভিযোগ তাহার আছে। কিন্তু অরুণা মেয়েটি আজ অভিনব  
মুষ্টি লইয়া তাহার সম্মুখে দাঁড়াইয়াছে। নিরুচ্ছ্বসিত  
অথচ অনমনীয়—একটি মেয়ে। সে অবাক হইয়া অরুণার  
মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

দরবারী একখানা হুকুম নামা আনিয়া রগদার সম্মুখে  
ধরিল। পুলিশ সাহেবের সই করা—হুকুম নামা ; নিয়মিত  
ভাবে সপ্তাহে দুইদিন থানায় হাজিরা দিতে হইবে ;  
কোথাও বাইতে হইলে জানাইতে হইবে—ইত্যাদি। হুকুম-  
নামাটার অরুণার নাম বসাইয়া লইয়া আসিয়াছে দরবারী।

রগদা সেখানা নিজের হাতেই রাখিয়া দিল, বলিল—  
আচ্ছা যান আপনি। বলিয়াই আবার বলিল—চলুন—  
বাইরে আমি পৌছে দিচ্ছি।

অরুণা অগ্রসর হইল। দরজার কাছে গিয়া কিন্তু  
খমকিয়া দাঁড়াইল। দরজার একটা বাজু ধরিয়া যেন  
আত্মসম্মরণ করিতেছিল। . রগদা প্রশ্ন করিল—কি হল ?

—কিছু না। কেমন একটু—

—অসুস্থ বোধ করছেন ?

—না। ঠিক আছে। সে আবার পা বাড়াইল।

—জল খাবেন ?

—না। সে অগ্রসর হইল।

\* \* \*  
বাহিরে সুরপতি চেয়ারে বসিয়াছিল। ওদিকে  
বসিয়াছিলেন—ভায়রন। তাঁহার পাশে দেবকী সেন।

তাঁহাদের কাছেই বসিয়াছিল স্বর্ণ। গৌর দাঁড়াইয়া আছে রাস্তার উপরে। নেলো বসিয়া কাঠা দিয়া মাটির উপর একটা ছবি আঁকিতেছে।

ওদিকে বেলা গড়াইয়া আসিয়াছে। শেষ অপরাহ্নের সূর্যের আলোয় লালচে রেশ ফুটিয়া উঠিয়াছে, সেই আলো পরিপূর্ণ ভাবে পড়িল অরুণার সর্বাঙ্গে। পশ্চিমমুখী থানাটার বারান্দাটি যেমন দাওয়া উচু—তেমন প্রশস্ত।

সুরপতি চকিত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, বলিল—কি ? মিসেস ভটচাঙ্গি—?

দেবকা সেনও উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিল—সেও বলিল—কি হয়েছে ? অরুণা দেবী ?

স্বর্ণের দৃষ্টি যেন জলিতেছিল। এ কি মুখ হইয়াছে অরুণা দিদির ? সে যেন এখনি এই মুহূর্তে ভাঙিয়া মাটির উপর লুটাইয়া পড়িয়া যাইবে।

স্বায়রত্ন ধীরে ধীরে উঠিয়া দাঁড়াইলেন। শাস্ত বার্কক্য ছর্ব্বল কণ্ঠে ডাকিলেন—দিদি !

অফুটস্বরে অরুণা সবিস্ময়ে যেন প্রশ্ন করিয়া উঠিল—আপনি ? অর্থাৎ আপনিও আসিয়াছেন ? আমার জ্ঞাত ?

স্বর্ণ আসিয়া তাহার হাত ধরিল—বলিল—অরুণাদি ? ওইটুকুর মধ্যে অনেক প্রশ্ন নিহিত ছিল—এবং সেগুলি স্পষ্ট।

অরুণা পূর্ব্বের মতই ক্রান্ত কণ্ঠস্বরে বলিল—ছাড়।

—কি হয়েছে বলুন ? স্বর্ণের কণ্ঠস্বর প্রদীপ্ত, রি-এনফোর্সড কংক্রিটের ছাদের গায়ে প্রতিধ্বনিত হইয়া রণ রণ করিয়া বাজিয়া উঠিল।

রণদাবাবু বলিলেন—উনি বোধ হয় অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। গোড়া থেকেই কেমন যেন দেখাচ্ছিল। হঠাৎ—এই বেরিয়ে আসবার মুখে—এ রকম হয়ে গেলেন।

স্বর্ণ বলিল—বসুন—আপনি—বসুন।

—না, ছাড়, দাছুকে প্রণাম করব।

অরুণা গিয়া নতজাহ্নু হইয়া বসিয়া স্বায়রত্নকে প্রণাম করিল।

স্বায়রত্ন তাহার মাথায় হাত দিয়া বলিলেন—ওঠ। নিজেই তিনি হাত বাড়াইয়া দিলেন, বোধহয় অরুণাকে হাত ধরিয়া তুলিবার জ্ঞাত ! অরুণা বলিল—আমি নিজেই উঠতে পারব।

হাসিয়া স্বায়রত্ন বলিলেন—না। এ ব্যসে কাউকে ধরে তুলবার সামর্থ্য আমার নাই ভাই। আমি—। বলিয়াই অরুণার ললাট স্পর্শ করিয়া বলিলেন—ভূমি অসুস্থ ?

অরুণা ক্রান্ত ভাবেই উঠিয়া দাঁড়াইল। বলিল—না—দাছু !

সুরপতি একটু অগ্রসর হইয়া আসিল—বলিল—আপনার মুখ দেখেই বুঝা যায় মিসেস ভটচাঙ্গি।

দেবকী বলিল—আপনি বরং একটু বিশ্রাম করুন। বসুন।

স্বর্ণ বলিল—গৌর, দেখ তো, ষ্টেশনে গরুর গাড়ী আছে কিনা ?

স্বায়রত্ন অরুণার মুখের দিকে তাকাইয়া ছিলেন, বার্কক্য স্তিমিত দৃষ্টিতে অরুণাকে দেখিয়া বুঝিতে চাহিতে ছিলেন। তিনি বলিলেন—সত্যিই তো। তোমার মুখে যে—কোন ছরস্তু ক্রেশের ছাপ ফুটে উঠেছে !

—না—দাছু—না। অরুণা যেন হাঁপাইয়া উঠিয়াছে।

সে সিঁড়ি দিয়া নামিতে সুরু করিল। এখান হইতে পালাইতে পারিলে সে যেন বাচে।

—দাঁড়ান অরুণাদি, এমন ক'রে ছুটবেন না। পড়ে যাবেন।

—না। পড়ব না।

—দিদি !

অরুণা সিঁড়ির শেষ ধাপে ফিরিয়া দাঁড়াইল।

দেবকীর হাত ধরিয়া স্বায়রত্ন ধীরপদক্ষেপে সিঁড়ি নামিয়া কাছে আসিয়া বলিলেন—একটু ধীরে চল ভাই। যতক্ষণ এক সঙ্গে চলা যায়—এক সঙ্গেই যাই চল।

স্বর্ণ বলিল—বলুন অরুণাদি কি হয়েছে বলুন। সকলের সামনে এখনি বলুন। বলতে হবে আপনাকে। ঠুঁদের অসাধ্য তো কিছু নাই। বলুন !

অরুণা এবার বিচিত্র দৃষ্টিতে স্বর্ণের দিকে চাহিয়া বলিল—আজ একাদশী স্বর্ণ।

অন্ধকার রাতে অতুল্য আলোয় ভরিয়া দিয়া একটা উদ্‌গাপাত হইয়া গেল যেন। চমকিয়া উঠিল সকলেই—সঙ্গে সঙ্গে মুগ্ধ বিস্ময় ফুটিয়া উঠিল সকলের দৃষ্টিতে। শুধু স্বর্ণ বলিল—প্রশ্ন করিল—একাদশী ?

—হ্যাঁ !

—নির্জলা ?

—না। তা পারব না। প্রয়োজনও নেই।

—থান কাপড়ও পরেছেন দেখছি।

এ কথার উত্তর দিল না অরুণা। নতমুখে ক্রান্ত-  
পদক্ষেপে স্তায়রত্ন ও দেবকী সেনের সঙ্গে অগ্রসর হইল।

স্বরপতি রণদার মুখের দিকে চাহিয়া মুচকি হাসিয়া  
বলিল—মাই গড !

রণদা লম্বাটের কুঞ্চন রেখায় প্রশ্ন উত্থাপিত করিয়া  
স্থির দৃষ্টিতে অরুণাকে দেখিতেছিল। উত্তর আবিষ্কার  
করিতে চাহিতেছিল। স্বরপতির প্রশ্নে তাহার দিকে  
কিরিয়া সেও মুচকি হাসিল। সঙ্গে সঙ্গে ছই কাঁধ আগ

করিয়া হাত দুইটা উন্টাইয়া দিয়া বলিতে চাহিল—কে  
জানে বাবা !

থানার দাওয়ার উপর হইতেই দাওয়ায় ঠেসানো  
সাইকেলখানায় চাপিয়া বসিয়া প্যাডেলে চাপ দিয়া চালাইয়া  
দিয়া স্বরপতি রণদাকে বলিল—আচ্ছা। চলি এখন।  
হবে দেখা পরে।

সেও চলিল—অরুণা স্তায়রত্ন দেবকী সেন বে পথে  
গিয়াছে—সেই পথে। প্রশ্ন তার মনেও জাগিয়াছে।  
একাদশী করিয়াছে অরুণা? আবার সে আপন মনে  
মুচকি হাসিল।

থান কাপড় পড়িয়াছে—একাদশী করিয়াছে। অরুণা  
ভটচাঁজ ? (ক্রমশঃ)

## বৌদ্ধযুগে দাসত্ব

শ্রীসন্তোষকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

পুরাতালে পৃথিবীর সকল দেশে দাস প্রথার প্রচলন ছিল। শুধু যে  
ভারতবর্ষেই এই প্রথা সীমাবদ্ধ ছিল তাহা নহে, তুরস্ক, মিশর, পারস্য,  
গ্রীস, রোম, চীন প্রভৃতি দেশেও ইহা আরও কঠোরভাবে ছিল।  
নরনারীকে পশুর স্তায় বাজারে বিক্রয় করা হইত। ধনী, শিক্ষিত  
এবং গণ্যমান্য ব্যক্তির ইহাদিগকে হীন চক্ষে দেখিত। আবার  
উদারচেতা ব্যক্তির ইহাদের ভালবাসিত।

গ্রীক রাজদূত মেগাস্থিনিস যখন ভারতবর্ষে আসেন তখন এই দেশে  
দাসদাসীর অবস্থা অনেকটা নিয়মাবদ্ধ ছিল। তখন অশ্বাশ্বাশ্ব দেশে  
ইহার অত্যন্ত নির্ধাতিত হইত। গ্রাণ্ড এবং পাস্কাভা দেশের অনেক  
মণ্ডাপুরুষ এই প্রথার অশেষ নিন্দা করিয়াছেন। কোটিল্যের অর্থশাস্ত্রে  
আমরা দেখিতে পাই আর্থোরা দাসত্বের বিরোধী ছিলেন। কিন্তু  
রেজ্জেরা তাহাদের পুত্রকন্যাদের এই কাজে নিযুক্ত করিবার জন্য  
গৃহে প্রতিপালন করিয়া বাজারে বিক্রয় করিত। অত্যাচারী লোকদের  
হাত হইতে ইহাদিগকে রক্ষা করিবার জন্য কতকগুলি নিয়ম ও  
শাস্তির বিধান ছিল। ইহাদিগকে মৃতদেহ বহন, মলমূত্রাদি পরিষ্কার  
প্রভৃতি নীচ কাজে নিযুক্ত করিলে, ইহাদিগকে উলঙ্গ অবস্থায় রাখিলে,  
মিথ্যা গালাগালি করিলে, প্রহার করিলে, কোন দাসীর জোরপূর্বক  
সতীত্বনাশ করিলে, পাশবিক অত্যাচারীকে সাহায্য করিলে বিশেষ  
শাস্তির ব্যবস্থা ছিল। দাসদাসী যদি তাহার ক্রীতমূল্য প্রভুকে কিরাইয়া  
দিত তাহা হইলে সে এই বন্ধন হইতে মুক্তি পাইত। যদি কোন প্রভু  
তাহা সম্বোধে তাহাকে মুক্তিদান না করিত তাহা হইলে ঐ প্রভুকে শাস্তি  
পাইতে হইত। কোন প্রভু যদি তাহার গর্ভবতী দাসীর কোন

ব্যবস্থা না করিয়া তাহাকে অন্ত্রের নিকট বিক্রয় বা বন্ধক দিত, এই  
অজ্ঞায় কার্যের জন্য উভয়কেই শাস্তি পাইতে হইত। মুক্ত দাসদাসীকে  
যদি কেহ আবার বিক্রয় করিত বা বন্ধক দিত তাহাকেও শাস্তি  
পাইতে হইত। শাস্তির নিয়মানুসারে দাসদাসীকে ক্রীতমূল্যের সহিত  
আরও কিছু অর্থ দিতে হইত এবং রাজসরকারে দ্বিগুণ অর্থ-  
দণ্ড দিতে হইত।

যবন, কাঞ্চোজ, গাঙ্কার, সীমাস্ত্র প্রদেশ ও উত্তর পশ্চিম প্রদেশের  
সমাজে প্রভু ও ভূত্যের মধ্যে বিশেষ ব্যবধান ছিল : ইহার উল্লেখ  
নিকায় ও মহাভারতে পাওয়া যায়। বিদূরপণ্ডিত দ্ব্যাতক হইতে জানা  
যায় দাসদাসীরা চারি শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল—(১) যাহারা দাস ও  
দাসীর গর্ভজাত, (২) অর্থের বিনিময়ে যাহারা বিক্রীত হইত,  
(৩) আইন অমান্যকারীকে দাসত্ব করিতে হইত, (৪) যাহারা  
স্বইচ্ছায় দাসত্ব গ্রহণ করিত। মনুসংহিতার মতে ইহাদিগকে সাত  
ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে—(১) মুছে পরাজিত ও ধৃত বন্দিগণ,  
(২) যাহারা নিজেদের জীবিকা নির্বাহের জন্য দাসত্ব করিত,  
(৩) যাহারা গৃহে জন্মগ্রহণ করিত, (৪) যাহারা বিক্রীত হইত,  
(৫) যাহাদিগকে অপরের নিকট দান করা হইত, (৬) পুরুষানুক্রমে  
যাহারা দাসত্ব করিত, (৭) আইনানুসারে যাহারা দাসত্ব করিতে  
বাধ্য হইত।

অর্থশাস্ত্রে দশ প্রকার দাসদাসীর কথা আছে এবং নারদস্মৃতিতে  
ইহারও বেশী সংখ্যার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। বৌদ্ধ ভাষ্যে  
দাসদাসীর বিক্রয়ের উল্লেখ পাওয়া যায়। পালি অপদান গ্রন্থ হইতে



ইহাদের বিয়র অনেক কিছু জানা যায়। সাধারণতঃ পুরুষাশুক্রমে ইহাদের পুত্রকন্তারা দাসদাসীর কাজ করিত। বাড়ীতে ইহারা রন্ধন কার্য করিত, বাজার করিত, জল আনিত, ধান ভানিত, চাউল তৈয়ার করিত, ভিক্ষা দিত, খাবার সময় প্রভুকে বাতাস করিত, গোয়াল পরিষ্কার করিত, চাষের কাজ করিত, প্রভৃতি যাবতীয় গৃহস্থালী কাজ করিতে হইত। রোমের ক্রীতদাস ও ক্রীতদাসীর স্থায় ইহাদের উপর প্রভুদের সম্পূর্ণ অধিকার ছিল এবং ইহারা গৃহস্থালীর সম্পত্তির মধ্যে গণ্য হইত। বৌদ্ধ গ্রন্থে আরও দেখিতে পাই ইহাদিগকে অপরের নিকট দান করা হইত। ইহাদের নিজস্ব স্বত্বা এবং স্বাধীনতা বলিয়া কিছুই ছিল না। এমন কি বিবাহ করিতে হইলে প্রভুদের মত লইতে হইত।

যেমন একদিকে এইরূপ নিষ্ঠুর প্রভুত্বের প্রভু ছিল, আবার বৈহাঙ্গ পিতার স্থায় কতকগুলি প্রভু এই সব অন্তঃজ, নিপীড়িত ক্রীতদাস ও ক্রীতদাসীকে ভালবাসিতেন, স্নেহ করিতেন, ইহাদের দুঃখ বুঝিতেন এবং সেই দুঃখ মোচন করিবার চেষ্টা করিতেন। বিবেকবুদ্ধি সম্পন্ন প্রভুরা এই সকল দাসদাসীকে নিজেদের সংসারের স্ত্রী, পুত্র কন্তা ও আত্মীয়দের মধ্যে স্থান দিতেন। ইহাদের হৃৎ-দুঃখের কথা শুনিতেন প্রয়োজন হইলে ইহাদের হৃৎপরামর্শ গ্রহণ করিতেন। ইহাদিগকে উন্নত করিবার জন্ত নিজেদের পুত্রকন্তাদের স্থায় লেখাপড়া ও শিক্ষার্থ্য শিখাইতেন। প্রভুর হৃৎ-দুঃখে ইহারা জড়িত ছিল। প্রভুদের রন্ধনাদি করিয়া দিত, বেশ পরিধান কাজে সাহায্য করিত, গৃহ পরিষ্কার এবং নানাপ্রকার গৃহকাজ করিত। তথাপি প্রভুরা ইহাদের অপবিত্র বলিয়া ঘৃণা করিতেন না। এই অশিক্ষিত অনুরক্ত, নিম্নশ্রেণীর দাস দাসীরা বাহ্যতে সমাজে স্থান পায় সেজন্ত চেষ্টা করিতেন। মহাপ্রাণ প্রভুরা ইচ্ছা করিলে ইহাদের এই দাসত্ব বন্ধন হইতে মুক্তি দিতে পারিতেন। দানবীর শ্রেষ্ঠী অনাধিপত্যের কোন এক ক্রীতদাসীর কন্তা তর্কে ব্রাহ্মণকে পরাস্ত করিয়া মুক্তি পাইয়াছিল। অনুরক্ত সমাজের এই সকল মেয়েদের সহিত উচ্চতর সমাজের পুরুষদের বিবাহের উল্লেখ বৌদ্ধ সাহিত্যে পাওয়া যায়। কোশলের রাজা প্রসেনজিৎ মল্লিকা নামে এক ক্রীতদাসীর কন্তাকে বিবাহ করিবার পূর্বে তাহার প্রভুর অনুমতি লইয়াছিলেন।

যাহারা যুদ্ধে পরাজিত বা ধৃত হইত, বিচারে যাহাদের প্রতি যুহ্যদণ্ডের আদেশ হইত, কিংবা যাহারা ঋণগ্রস্ত হইয়া পড়িত, তাহার দাসত্ব করিতে বাধ্য হইত। আবার অনেকে স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া দাসত্ব করিত। একটি পরমাম্বলারী যুবতী রণক্ষেত্রে বন্দিনী হইয়া দাসবৃত্তি অবলম্বন করিতে বাধ্য হইয়াছিল। দাস দাসীর দুঃখ কষ্টের পরিসীমা ছিল না। অতি সামান্য দোষে ইহাদিগকে কঠিন শাস্তি পাইতে হইত। কোন এক গৃহস্থের স্ত্রীর কাছে কালী নামে একটা ক্রীতদাসী ছিল। সে সমস্ত কাজ অতি হুতাঙ্গরূপে করিত। একদিন ঘুম হইতে উঠিতে তাহার দেবী হয়, সে জন্ত গৃহকর্ত্তা তাহার উপর বড়ই বিরক্ত হন। পরদিন সে আবার দেবী করিয়া উঠিলে তিরস্কৃত হয়। তৃতীয় দিন আরও দেবী করিয়া উঠিলে গৃহকর্ত্তা রাগান্বিত হইয়া কালীকে এক্সপ প্রহার করে যে তাহার মাথাটি একেবারে ভাঙ্গিয়া যায়। ক্রীতদাসের অপেক্ষা ক্রীতদাসীর অবস্থা আরও শোচনীয় ছিল। গৃহজাত দাস-

দাসীর মধ্যে বিরতীর নাম পাওয়া যায়। দাসী সুলক্ষ্মী হইলে অপরকে উপহার স্বরূপ দান করা হইত। সুবিধা পাইলে দাস দাসীরা মনিবের অর্থ ও জিনিষ পত্র চুরি করিত। অনেকে এই অত্যাচার সহ্য করিতে না পারিয়া স্বযোগের প্রতীক্ষায় থাকিত। মুক্ত ও স্বাধীন জীবন যাপনের জন্ত, অত্যাচারী ও নিষ্ঠুর প্রভুদের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্ত, দাসত্ব বন্ধন ছিন্ন করিবার জন্ত, নিজেদের প্রাণ ঝুঁকাইবার জন্ত, ইহারা প্রভুর বাটি হইতে পলায়ন করিত।

কেবল যে রাজা ও ধনীরা ক্রীতদাস ও ক্রীতদাসী রাখিত তাহা নহে—ব্রাহ্মণেরা, শ্রমনেরা, গ্রামবাসীরা, কৃষকেরা সকলেই তাহাদের কাজের জন্ত ইহাদিগকে নিযুক্ত করিত। বৌদ্ধগ্রন্থে দেখিতে পাই অত্যাচারী লোকদিগকে রাজার আদেশে দাসত্ব করিতে হইয়াছিল। কোনও এক গ্রামের মোড়ল রাজার সম্মুখে গ্রামের লোকজনের বিরুদ্ধে মিথ্যা নিন্দা করার ফলে দাসত্ব গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছিল। এমন কি রাজসম্রাট হিংসাবশতঃ যদি অন্তায় করিতেন কিংবা অন্তায় কাজের সাহায্য করিতেন তাহা হইলে তাহাদের শাস্তি স্বরূপ দাসত্ব করিতে হইত। ইহা হইতে বেশ বুঝা যায় যে সমাজে দাসত্ব অতি ঘৃণ্য ও নীচ কাজ বলিয়া পরিগণিত হইত।

অহিংস ধর্ম্মের প্রবর্তক মহামানব বুদ্ধদেবের বাণী জনগণের হৃদয়ে এক নতুন আলোকের সন্ধান দিয়াছিল। এই হৃদয়হীন দাস প্রথা সমাজ হইতে দূরীভূত করিতে তিনি বহু চেষ্টা করিয়াছিলেন, কারণ তাঁহার ধর্ম্মের মূলমন্ত্র ছিল বিশ্বশ্রম ও বিশ্বভ্রাতৃত্ব। মানবের মুক্তিকামী বুদ্ধদেব দাসত্বকে কারা-যন্ত্রণা-ভোগ, ধর্ষণ, রোগ, এবং কষ্টকাটীর্ণ পথের সহিত তুলনা করিয়া বলিয়াছেন, ইহা অতীব কষ্টকর এবং দুঃখপ্রদ কার্য। তাঁহার অমৃত বাণী বহু অনুরক্ত দাস দাসীর চরিত্র গঠনে সহায়তা করিয়াছিল। বৌদ্ধ সংঘে ক্রীত দাস দাসীর ও ঋণগ্রহ ব্যক্তির স্থান ছিল না। তিনি উপাসকদের দাস দাসী ক্রয় ও বিক্রয় করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন। হতভাগ্য দাস দাসীদের অবস্থার উন্নতির জন্ত বুদ্ধদেব সৎ গৃহস্থকে অতি অয়োজনীয় পাঁচটি কর্তব্য প্রতিপালন করিতে উপদেশ দিয়াছিলেন—(১) শক্তি এবং সামর্থ্যানুযায়ী ইহাদিগকে কার্যে নিযুক্ত করিবে, (২) ইহাদিগকে উপযুক্ত খাদ্য এবং বেতন দিবে, (৩) পীড়িত হইলে ইহাদিগের শুশ্রূষার ব্যবস্থা করিবে। (৪) নিজেদের মৃৎরোচক ও ভাল খাদ্য হইতে ইহাদিগকে ভাগ দিবে, (৫) মধ্যে মধ্যে ইহাদিগকে ছুটি উপভোগ করিতে দিবে।

প্রাচীন ভারতে সমাজে দাসত্ব ছিল এবং দাস দাসীর সংখ্যা ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইয়াছিল, কিন্তু তাহাদের অবস্থার বিশেষ কোন উন্নতি দেখা যায় না। বহু কষ্টকর কার্য হইলেও বৌদ্ধযুগে দাসত্বের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয় নাই।

১। এই প্রবন্ধ প্রণয়ন কালে যে সমস্ত পুস্তক হইতে আমি বিশেষ সাহায্য পাইয়াছি তাহার তালিকা প্রদত্ত হইল:—বুদ্ধিষ্ট, ইতিহাস (রিথু ডেভিডস্), অর্থশাস্ত্র (শ্রাম শাস্ত্রী), এনসিয়েক্ট ইতিহাস (ম্যাক্‌ক্রিগল), মহিম নিকায়, পপকুম্বানি, বিনয় পিটক, মনুসংহিতা, অঙ্গুত্তর নিকায়, অপপান, আচারঙ্গসূত্র, ধর্ম্মপন ভাষ্য বিনয়বত্তু ভাষ্য, দীঘ নিকায়, মহাবংশ ইত্যাদি।

# চলচ্চিত্র

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়



—তেরো—

প্রায় দুহাজার লোক জড়ো হয়েছে শাহর কাছারীর সামনে।

একদল লোক যথাসাধ্য সেজে গুজে এসেছে—বেন ইদের নামাজের জমায়েৎ। আর একদল উঠে এসেছে সোজা ক্ষেত থেকে, তাদের গায়ে লাল মাটির স্বাক্ষর। খড়ি-ওড়া রুক্ষ শরীর—তেলের অভাবে জমাট বাঁধা লাল চুল; হাতে হাঁহুয়া আছে, লাঠিও আছে। ময়লা গামছায় বেঁধে চিড়ে মুড়ির নাস্তাও নিয়ে এসেছে কেউ কেউ—সঙ্গে আছে টিনের চৌকো দেশী লণ্ঠন। অনেক দূবে যেতে হবে—কত রাত হবে ফিরতে, কে জানে। আর বলা যায় না—জমায়েতের পরে হয়তো গানের ব্যংহাও থাকতে পারে—এমন আশাও কারো কারো মনে স্থান পেয়েছে। রাতটা মন্দ কাটবেনা তা হলে।

আর আছে জনকয়েক চৌকিদার। নিজেদের ভাগিবেই তারা এসে ছুটেছে। রং-অলে-বাওয়া উর্দির ওপর চকচক করছে পেতলের চাপরাশ—এই বিশেষ উপলক্ষ্যটির জন্তেই মেজে ঘষে তাদের পরিষ্কার করা হয়েছে। অনাহুতভাবেই সত্ভার শাস্তিরক্ষা করছে তারা।

—কী হচ্ছে উম্মিকে? গোলমাল করিবেন না?

—এই মিঞা, চুপ করি বৈসো ক্যানে। খামোকা ওইঠে কিম্বা ঝামেলা লাগাইলে হে?

—চিল্লাবা হয় তো এইটি নাকি উঠি যাও। ইটা তামাসা নহো, ওয়াজ হবি।

রোদে বক্বকে চাপরাশ আর গম্ভীর মুখেও তারা যথোচিত পদমর্যাদা রাখতে পারছে না। নানারকম টীকা-টিপ্পনি আসছে তাদের লক্ষ্য করে।

—ইস্, ত্যালখানা জাখো হে! যান্ দারোগা হচ্ছেন।

আর একজন চিম্টি কাটল: আইতের (রাতের) ব্যালা চোর দেখিলে বাপ বাপ করি পালাবা পথ পায় না; ওইঠে আসি মেজাজ জাখাছে।

—সিটাই কহো স্ক। কামের ব্যালায় কিছু নাই—

আইতে আসি খামোকা চিল্লাই চিল্লাই ঘুমের দকা রফা করি দেয়। ফের চৌকিদারী ট্যাকেসা না দিবা পারিলে ষটি বাটি ফ্রোক করিবা চাহে।

—এই চুপ চুপ—আট দশ জন ধমক দিয়ে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে দু হাজার লোকের দৃষ্টি ধাবিত হল একই দিকে।

একখানা পুরোনো টেবিলের আশেপাশে খানকতক চেয়ার। তার পেছনে একটা উচু বাঁশের মাথায় অর্ধ-চন্দ্রাকৃতি হরিৎ পতাকা। পৃথিবীর সর্বদেশে, সর্বকাত্রে ঐসলামিক ভ্রাতৃত্বের প্রতীক; ইদের চাঁদের চির প্রত্যাশা—একটি ধ্রুব-নক্ষত্রে সত্যধর্মের চির-ইন্দিত, গাঢ় সবুজের বর্ণলেখায় চির-তারণের প্রদীপ্ত প্রতিশ্রুতি। মোহাম্মদ রহুলের (দঃ) কদমে কদমে অহুসরণ করে দুয়ন্ত অভিযানের দ্বিগিজয়ী ঝাণ্ডা।

হাওয়ায় উড়ছে সবুজ পতাকা। শাহর কাছারী থেকে নেমে সেই পতাকার তলায় এসে আন্তে আন্তে দাঁড়ালেন পাঁচ সাত জন—আজকের অহুষ্ঠানের ধার্মা কর্ণধার। তাঁদের মধ্যে সর্বাগ্রে এসেছেন ফতেশা পাঠান—পরগে কালো আলপাকার লংকোট, আদ্রির পাজামা, মাথায় জরির কাজ-করা টুপি; বুকে সোনার চেনে বাঁধা একটা ঝড়িও সঁটে নিয়েছেন। প্রশান্ত গাম্ভীর্ষে এসে তিনি মাঝখানের চেয়ারটা দখল করলেন—আজকের সত্ভায় অনিবার্চিত হলেও অনিবার্ধ সম্ভাপতি তিনি। পেছনে পেছনে এলেন আলিমুদ্দিন মাস্টার, এস্তাজ আলী ব্যাপারী, জন দুই স্কুল-মাস্টার, খানার জমাদার শাহেব, পালনগর মসজিদের ইমাম এবং ইসমাইল। শাহ আসন নেবার সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা হাততালি দিলেন—সমবেত জনতাও আনন্দে কর-তালি দিয়ে উঠল।

বাকী সকলে কেউ কেউ চেয়ারে, কেউ কেউ সামনে পাতা দুখানি বেঞ্চিতে বসতে যাচ্ছেন, এমন সময় আকাশে মুঠি তুলে ইসমাইল চীৎকার করে উঠল: মুসলিম লীগ জিন্দাবাদ—

সহস্র সহস্র গলায় শোনা গেল আন্তরিক প্রতিধ্বনি :  
মুসলিম লীগ জিন্দাবাদ—

—পাকিস্তান—

—জিন্দাবাদ !

—কায়দে আজম—

—জিন্দাবাদ !

—এইবার বহু নব, এখনি সভার কাজ আরম্ভ হবে—  
ইসমাইল আদেশ করল। বছর বাইশ বয়েস হবে ইস-  
মাইলের। একটু কুঁজো—একটু ঢ্যাঙ। অবস্থে এলো-  
মেলো মাথার চুল; মুখে খোঁচা খোঁচা গৌফ দাড়ি।  
শার্টের আন্তিন কহুইয়ের ওপর আরো খানিকটা গোটানো  
—সংকল্পে মুঠো—করা হাত। চোখের দৃষ্টিতে একটা উগ্র  
চাঞ্চল্য—যেন যে কোনো মুহূর্তে একটা ভয়ঙ্কর কিছু করবার  
জন্ত প্রস্তুত হয়ে আছে সে।

—গোড়াতেই আমাদের উদ্দেশ্যটা একটু স্পষ্ট করে  
আপনাদের খুলে বলা যাক। ইসমাইল আরম্ভ করল :  
অবিস্মৃত হলেও এটা সত্যি যে আমাদের অনেকেই  
পাকিস্তান কথাটার মানে পর্যন্ত জানেন না। এমন কি  
আমাদের মহান নেতা কায়দে আজম জিন্নার নাম পর্যন্ত  
শোনেন নি, এমন লোকও এ সভায় আছেন।  
সুতরাং—

সুতরাং জলন্ত ভাষায় পাকিস্তানের কথা বলতে আরম্ভ  
করল ইসমাইল। আরম্ভ করল আরবের মরুভূমি থেকে  
কোরাণ আর জুলফিকারের দুনিবারের অগ্রগমনের  
ইতিহাস; আশুন-বরা ভাষায় বলে গেল, কেমন করে  
কাকেরদের রক্তে তরবারি আর বর্শা ফলককে দান করিয়ে,  
সিদ্ধ সোমনাথ-গুর্জর জয়ের ধারা বয়ে গোড়-বজের প্রত্যন্তে  
প্রত্যন্তে এল শেষ-ধর্মের প্রাণবত্তা। বর্ণনা করে গেল  
কেমন করে বাদশাহ আলমগীর সারা হিন্দুস্থানের কোরেশ-  
দের ভাঙা বিগ্রহের শিলা দিয়ে রচনা করলেন মসজিদের  
সিঁড়ি; তারপরে এল ইংরেজ—এল হিন্দুর চক্রান্ত। সে  
চক্রান্তের আজো শেষ নাই।

এই পর্যন্ত এসে ইসমাইল একবার থামল। সমস্ত সভা  
গাভীরে গম গম করছে। বলবার শক্তি আছে ইসমাইলের।  
সভা কেমন করে জমিয়ে নিতে হয় সে তা জানে।

ইসমাইল মাথার ওপর হরিৎ পতাকাটার দিকে

তাকিয়ে নিলে একবার। উড়ছে সূর্যের আলোর—উড়ছে  
একটা সগৌরব প্রদমভায়। আজাদী কি ঝাণ্ডা।

—বন্ধুগণ, মন দিয়ে আমার কথাগুলো একটু বুঝতে  
চেষ্টা করুন। মনে রাখবেন, উনিশশো ছয় সালে  
আমাদের লীগ জন্ম নেবার পরে তাকেও অনেকখানি পথ  
কেটে এগোতে হয়েছে। আমরাও একদিন হিন্দু কংগ্রেসের  
হাতে হাত মিলিয়েছিলাম। ১৯১৬ সালে লক্ষ্মী  
চুক্তিতে এক সঙ্গে আজাদীর লড়াইয়ে দাঁড়িয়েছি আমরা,  
লড়েছি খেলাফতের দিনে। সেদিন আমাদের জিন্না  
সাহেবও নিজেকে কংগ্রেসের স্বেচ্ছাসেবক বলতেন।  
তারপর স্বাধীনতার লড়াইয়ে একথাপ এগিয়ে গিয়ে যেদিন  
আমরা পুরো স্বাধীনতা চাইলাম—সেদিন—সেই ১৯২২  
সালে হিন্দু কংগ্রেসই “স্বরাজের” ভাঁওতা তুলে লড়াই  
ধামিয়ে দিলে। শুধু লড়াই থামাল না—এল হিন্দু  
মহাসভা। দেখা গেল কংগ্রেসের পথ হিন্দুর পথ—আর  
মুসলমানের যদি কোনো রাস্তা থাকে তা হলে তা এই  
মুসলিম লীগ—

একটা তিক্ত হাসি ইসমাইলের ঠোঁটের আগায় দেখা  
দিলে : কিন্তু দেশের মুসলমান তখনো জাগেনি। ১৯৩৭  
সালে যেদিন কংগ্রেসের সঙ্গে আমাদের প্রথম বোঝাপড়া,  
সেদিন আমাদের ভাইয়েরা কংগ্রেসকেই ভোট দিয়েছিল।  
নিজেদের দলাদলিতে আমরা হেরে গেলাম। কিন্তু হারতে  
পারেনা আমাদের লীগ—আলী ভাইদের আদর্শ—  
মুসলমানের সত্য। এগিয়ে এলেন কায়দে আজম জিন্না  
তার সমস্ত শক্তি দিয়ে। গড়ে তুললেন সারা ভারতের  
মুসলমানকে। আমরা বুঝলাম—হিন্দুর সঙ্গে পাশাপাশি  
থাকা আমাদের চলবে না। নতুন দেশ চাই, নতুন রাস্তা  
চাই—নতুন পথ চাই ইসলামী তমকুন বিকাশের জন্তে।  
সেই আমাদের ‘পাকিস্তান’। সেই পাকিস্তানের জন্তেই  
আপনাদের এক হতে বলছি! আশুন—দলে দলে লীগের  
মেঘার হোন—সকলে এক সঙ্গে গলা মিলিয়ে বলুন :  
পাকিস্তান জিন্দাবাদ।

—পাকিস্তান জিন্দাবাদ!—সভার মধ্যে ঝোড়ো  
হাওয়া গর্জন করল। রুমালে বর্মাক্ত মুখখানা মুছে নিয়ে  
বসতে বসতে ইসমাইল বললে, এবার মসজিদের ইমাম  
সাহেব আপনাদের ছুটার কথা বলবেন।

সত্য আবার প্রচণ্ড করতালি পড়ল।

ইমাম সাহেব একবার হাসলেন। চুম্বে নিলেন হুসর রঙ-ধরা শাদা দাড়ির গোছা। তারপর উচ্চকণ্ঠে কোরাণের একটা ‘সূরা’ আউড়ে বললেন, এর অর্থ হ’ল, বিশ্বী কাকেরের সঙ্গে পাশাপাশি কখনো মুসলমানের বাস করা চলবে না, তাকে লড়াইয়ের জন্তে সব সময় তৈরী থাকতে হবে—দরকার হলে প্রাণ দিতে হবে—

উত্তেজনার যে বারুদ ইতিমধ্যেই সঞ্চিত করে রেখেছিল ইসমাইল, তাতে আগুনের উত্তাপ সঞ্চার করে আসন নিলেন ইমাম সাহেব।

সত্য তখন মধুচক্রের মতো গুল্লন উঠেছে। ইসমাইলের শহরে বক্তৃতা সকলের কাছে স্পষ্ট হয়নি, কিন্তু ইমাম সাহেবের কথাগুলো নির্মম এবং তীক্ষ্ণ। কোথাও কোনো আড়াল নেই—নেই বিন্দুমাত্র অস্পষ্টতার আভাস।

—হাঁ, পাকিস্তান নিবা হবে হামাদের।

—কাকেরের সাথে হামরা আর নি থাকিমু।

—পাকিস্তান জান মান দিই কায়ম করিবা হবে।

—মোক্ খালি একটা কথা কহেন। পাকিস্তান হই যায় তো খুব ভালই। ‘ফের প্যাট ভরি খাবা পামু তো হামরা? সাক্ষিকি কেট, উচ্ছেদ-তো উঠি যাবে? শাহ তো ব্যাগার ধরিবে না? বকেয়া খাজনা তো মাক করি দিবে?

কথাগুলোর কোনো স্পষ্ট জবাব কেউ দেবার আগেই আবার সাড়া উঠল: এই চুপ, চুপ! মাস্টার সাহেব কহোছেন।

এবার প্রচণ্ডতম করতালি। সব চাইতে জনপ্রিয়, সর্বজনশ্রদ্ধেয় আলিমুদ্দিন মাস্টার এইবার দাঁড়িয়েছেন তাঁর বক্তব্য বলবার জন্তে। সকলের দুঃখে কষ্টে অকৃত্রিম বন্ধ। প্রয়োজনের বান্ধব। দুদিনের একনিষ্ঠ আশ্বাস।

পড়ন্ত সূর্যের আলো পড়েছে সবুজ পতাকায়—যেন একটা অপূর্ব দীপ্তি ছড়াচ্ছে তার থেকে। ‘নূর—এ—পাকিস্তান’! সে দীপ্তি পড়ছে আলিমুদ্দিনেরও প্রশস্ত মুখে। কঠিন ভাস্কর্যে গড়া একটা তাম্র পিত্তল মূর্তির মতো তাঁর দেহের রেখাগুলো অত্যন্ত স্পষ্ট আর প্রকট হয়ে উঠেছে। দাক্ষিণাত্যের মন্দিরের কোনো ছায়া-ঘন গর্ত

গৃহে দীপ-দীপিত দেবমুখের মতোই দেখাচ্ছে তাঁর মুখখানা।

তারপর কয়েকবার নিঃশব্দে নড়ে উঠল তাঁর ঠোঁট ছটি। বলবার আগে কিছু একটা যেন আউড়ে নিলেন নিজের ভেতর। একবার তাকালেন মাথার ওপরকার পতাকার দিকে। পতাকা ছাড়িয়ে আকাশের দিকে। ওই সবুজ পতাকার ওপর যে কিরণ-লেখা বিদ্যিত হয়ে পড়েছে তাকি পাকিস্তানের পূর্বাভাস না, কোনো আগামী শূন্যতার প্রতিভাস?

তারও পরে জনতার মধ্যে নামল তাঁর দৃষ্টি। একদল মানুষ। তাঁর কাছ থেকে শোনবার জন্তে অপেক্ষা করে আছে, প্রতীক্ষা করে আছে। কিন্তু একদল মানুষ? না—এক হয়ে গেছে। একটা শক্তি—একটা বিশ্বজয়ী শক্তি। যা অপ্রতিহত প্রভাবে এগিয়ে গিয়েছিল মক্কা থেকে মরোক্কো, মরোক্কো থেকে মক্কাভী। শক্তি। সহস্র ছাড়িয়ে লক্ষ—লক্ষ ছাড়িয়ে কোটি। শিখায়িত রক্তধারায়, বজ্রবাহী পেণীতে পেণীতে। The great human dynamo! Liberator of oppressed and exploited earth!

কিন্তু!

কোন্ লক্ষ্যে? সব সত্য কি বলতে পেরেছে ইসমাইল? তথ্য দিয়েছে, আবেগ দিয়েছে তার চাইতেও বেশি। কিন্তু তারপর? কোন্ পথে এগিয়ে নিয়ে যাবে এই শক্তির বজ্রাকে—এই চল-বিদ্যুতের ধারাকে? কারা নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে এই বিপুল human dynamo?

একবার নিজের আশেপাশে তাকালেন আলিমুদ্দিন। একটা উগ্র চঞ্চলতা ইসমাইলের চোখে মুখে—কোনো নিশ্চিত লক্ষ্য নেই যেন। জ্বলতে চায়—জ্বালাতে চায়। কতমা পাঠান? চমৎকার সেজেগুজে এসেছেন, গা থেকে আতরের গন্ধ বেরুচ্ছে—নির্বোধ আনন্দে ঘন ঘন পাক দিচ্ছেন কাঁকড়া বিহের লেজের মতো গৌফ জোড়ায়। ধানার জমাদার সাহেব অল্প অল্প হাসছেন, নীচু গলায় কথা কইছেন পাশের একজন স্কুল মাস্টারের সঙ্গে: হিন্দু ইন্সপেক্টরটা থাকতেই ডিগ্রেন্ড হয়ে গেলাম, বুঝলেন। যদি কোনো মুসলমান থাকত—

ঘুঘুর দ্বারে লোকটা ডিগ্রেন্ডেড্ হয়েছিল—দোব দিচ্ছে হিন্দু কর্মচারী। এরা—এই এরা হবে রাষ্ট্রের কর্ণধার। আলিমুদ্দিনের রক্ত তেতে উঠল, জালা ধরল মাথার ভেতর। কতমা পাঠান—খোদাবক্স খন্দকার—

ইসমাইল অর্ধৈর্ষ্যভাবে তাঁকে স্পর্শ করল।

—বলুন, বলুন মাস্টার সাহেব। প্রায় তিন মিনিট ধরে যে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছেন।

হাঁ—বলতে উঠে বড় বেশিক্ষণ ধীরে ভাবছেন তিনি। চমকে উঠলেন আলিমুদ্দিন। তড়িৎ তরঙ্গের স্পর্শে উচ্চকিত একটা শব্দেহের মতো নড়ে উঠলেন। তারপর :

তাইসব, আমার বন্ধু ইসমাইল সাহেব আপনাদের সব মোটামুটি খুলে বলছেন। কাজেই আমার আর নতুন কিছু বলবার নেই। পাকিস্তান এবং মুসলিম লীগের সার্থকতা সম্বন্ধে আপনাদের যে কোনো সন্দেহ নেই, আশা করি, সে কথাও আমাকে নতুন করে বলতে হবে না। শুধু একটা প্রশ্ন আমার আছে। আমরা, যারা আজ এমন করে পাকিস্তানের কথা আপনাদের বলতে এসেছি—বুকে হাত দিয়ে আমাদের বলতে হবে—সে ভার নেবার যোগ্যতা আমাদের আছে তো ?

জনতা নির্বাক হয়ে তাকিয়ে রইল। ঠিক ধরতে পারছে না। আর চেয়ারে বেঞ্চিতে ঝাঁরা বসেছিলেন, তাঁরা পরস্পরের দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে বুলিয়ে নিলেন—কোন্ পথে—কোন্ দিকে এগোতে চাইছেন মাষ্টার ?

আলিমুদ্দিন বললেন, আমি জানতে চাই—কার জন্তে পাকিস্তান ?

অস্বস্তিতে নড়ে চড়ে উঠল ইসমাইল : কেন মুসলমানের ?

—বেশ কথা। কিন্তু মনে রাখবেন, ১৯০৬ সালে লীগের জন্মদিনে সব চেয়ে বেশি খুশি হয়েছিল ইংরেজ। সেদিন সে আশা করেছিল, এই লীগের আশ্রয় নিয়েই দেশের আত্মাধীর লড়াইকে সে ডুবিয়ে দেবে।

ইসমাইল আর বসতে পারল না, ছটফট করে উঠে দাঁড়াল।

—মাস্টার সাহেব এতদিন পরে কেন তুলছেন ওসব পুরোনো কথা ? ১৯০৬ সালে যা হয়েছিল, তারপরে

অনেক বছর পার হয়ে গেছে। আজ তো মুসলমান সত্যিকারের লড়াইয়ে নেমেছে।

আলিমুদ্দিন বললেন, মানি সব মানি। কিন্তু একটা কথা আমার বলবার আছে। লর্ড মিণ্টোর আমলে যে স্বার্থপরের দল নিজেদের পেট-মোটী করবার জন্তে লীগের খাতায় নাম লিখিয়েছিল, তারা কি আজো আমাদের মধ্যে নেই ?

ইসমাইল তিক্তকরে বললে, নেই।

—আমি আপনাকে জবাব দিতে বলছি না ইসমাইল সাহেব, আপনি বলুন।—ভীত চোখে আলিমুদ্দিন ইসমাইলের দিকে তাকালেন।

মুঠো-করা হাতটাকে আরো শক্ত মুঠায় ধরে ইসমাইল বললে, আপনিই অনাবশ্যক কথা বলছেন মাস্টার সাহেব, আপনারই বসে পড়া উচিত।

সভায় একটা কলরব উঠল।

আলিমুদ্দিন সোজা শাহর দিকে তাকালেন : প্রেসিডেন্ট সাহেব, আমি কি বসে পড়ব, না আমরা বলতে দেওয়া হবে ?

সামনে যারা ছিল, তারা সমস্তরে চোঁচিয়ে উঠল : বলুন, বলুন, বলে যান আপনি।

ফতেশা বিব্রতভাবে তাকালেন এদিকে। গোঁফে পাক না দিয়ে টেনে টেনে লম্বা করতে লাগলেন সেটাকে। বললেন, না, না, আপনি বলুন। বোসো হে ইসমাইল, এখন শুঁকে বাধা দিয়েনা।

অসম্ভব মুখে বিড় বিড় করতে করতে ইসমাইল বসে পড়ল। অর্ধৈর্ষ্যভাবে তাকালো হাতের ঘড়িটার দিকে।

শরীরটাকে আরো ঝুঁ করে দাঁড়ালেন আলিমুদ্দিন। মাথার ওপর রাঙা আলোয় পতাকা ঝলমল করছে—মহিমাময় হয়ে উঠছে ‘নূর-এ-পাকিস্তান।’ এই পতাকার নিচে দাঁড়িয়ে মিথ্যে বলা যাবে না, কোনো কপটতাকে প্রশ্রয় দেওয়া যাবে না। সত্য চাই, আত্মদর্শন চাই। এখন থেকেই পরিকার করে নিতে হবে সব হিসেব নিকেশ। জেনে নিতে হবে কে দোস্ত, কে দুশমন। কে চলেছে সন্মুখের পথ কেটে, কারা পায়ের তলায় গড়ে তুলেছে নিঃশব্দ চোরাবাঁলি।

সেই ‘নূরী ঝাঙা’ ? নিচে তাঁকে মনে হতে লাগল

তাজ-পিতলের নিভুল, স্পষ্টরেখ দীপ্ত মূর্তি। তাঁকে বলতে হবে—সত্য ঘোষণাই তাঁকে করতে হবে।

আলিমুদ্দিন বললেন, আরো সোজা কথায় আমি আসব। ধরুন, এই সত্যতেই এমন লোক উপস্থিত আছেন, যাদের মতো মুসলমানের শত্রু আর কেউ নেই। তাঁদেরই আগে আমাদের চেনা দরকার।

—কারা তারা ?

চেষ্টা করেও একটা কটু প্রশ্ন এড়াতে পারলনা ইসমাইল।

—কারা তারা ?—মূর্তির চোখদুটো জলজল করে উঠল—দক্ষিণী মন্দিরের নটরাজের হীরক নেত্রের মতো। যেন দেখা দিল, অগ্নি-বর্ষণের পূর্ব-সংকেত।

আলিমুদ্দিন বললেন, যদি বলি, আমাদের এই ইমাম সাহেব—যিনি একজন হাকীম এবং বিখ্যাত আলেম, তিনি আমাদেরই সমাজের অংশ—আমাদের ভাই ধাওয়াদের মসজিদে ঢুকতে দেন না ? তা হলে কি বলতে হবে তিনি ইসলামের বন্ধু ?

—মাস্টার সাহেব !—যেন আত্ননাশ করে উঠলেন শাহ।

—হাঁ, আপনার কথাও আমি বলব।—আলিমুদ্দিনের চোখ দিয়ে এবার সত্যিই আগুন ঝরতে লাগল : প্রজাদের আপনি বেগার খাটান। গরীবের মুখের গ্রাস কেড়ে খান। অনবরত অত্যাচার করে দেশের লোককে আপনি শেষ-দফায় এনে ফেলেছেন। যে মেয়ে আপনাকে ধর্মবাণ বলে—বিহবল শুরু সভাটার ওপর রক্তচক্ষু মেলে আলিমুদ্দিন বললেন, আপনি তার সর্বাত্মক পারার বা ছড়িয়ে দিয়ে বিখ্যাসের মর্দাঙ্গা রাখেন। বলুন—আপনারাই কি নেতা ? আপনাদের হাতেই কি পাকিস্তানের ভবিষ্যৎ ?

—চুপ করুন—বসে পড়ুন—পাগলের মতো চৈতন্যে উঠল ইসমাইল।

—লোকটা কেপে গেছে—চীৎকার করলেন ইমাম সাহেব।

কতেশ্বর মুখ দিয়ে শুধু একটা অব্যক্ত ধ্বনি বেরল। এত জোরে সফ গৌফটাকে আকর্ষণ করলেন যে ছিঁড়ে যাবার উপক্রম করল সেটা।

—না, আমি বসবনা, আমি বলবই—আলিমুদ্দিনও চীৎকার করলেন এইবারে।

সত্য বিশ্বজ্বালার ঝড় বইছে। নানা কণ্ঠে নানা রকম

কোলাহল উঠছে। যেন কেপে গেল ইসমাইল। জামাটা ধরে সজোরে টান দিলে আলিমুদ্দিনের।

আলিমুদ্দিন তিন পা পেছনে হটে এলেন।

—আমি বলবই—আমি বলবই—

—না—না—

—বেশ !—স্বয়ংক্রমিক সমুচ্চতর পর্দায় তুলে শেষবার বললেন আলিমুদ্দিন : তা হলে আমি জানিয়ে যাচ্ছি, পাকিস্তানের লড়াইয়ে আজ থেকে দুশমন মুসলমানও আমার শত্রু। তাদের বিরুদ্ধেও আজ থেকে আমার লড়াই—

প্রচণ্ড ঝড়ের মধ্যে সভা থেকে একটা জলন্ত চাঁউইয়ের মতো ছুটে চলে গেলেন আলিমুদ্দিন মাস্টার।

\* \* \*

বাতাস নেই। একটা গমগমে শুমোট সন্ধ্যা বনিয়েছে ঘরের মধ্যে। দিগ্বিস্তৃত বরেন্দ্রভূমির মাঠের ওপরে হাওয়া যেখানে চব্বিশ ঘণ্টা দামাল ছেলের মতো খেলে বেড়ায়, বয়ে নিয়ে যায় মাটির গন্ধ, ঘাসের গন্ধ ; গোখরো সাপের নিখাসের সঙ্গে সঙ্গে কেয়াফুলের সৌরভ বয়ে নিয়ে যায় তালগাছের মর্মর থেকে, শুরু করে শঙ্খচিল আর গিন্নী শকুনের কান্না,—সেখানে হঠাৎ সব থমকে দাঁড়িয়েছে যেন কোন্ অদ্ভুত ভাষ্যমতীর মন্তোচ্চারণে। যেন আকাশ থেকে বনাচ্ছে কোনো দিগ্‌দিগন্তব্যাপী অশরীরীর অপছায়া—আসন্ন মৃত্যু, আসন্ন ঝড়, আসন্ন দুর্বিপাক। আলোয়-জ্বালা বরিন্দের মাঠে ঘর-পালানো রাত-চরা গোবর দল যেন আচমকা শুষ্ক পেয়ে বসে পড়েছে কোনো ঝুরি-নামা ডাইনির মতো অন্ধকার বটের ছায়ায়—তাদের সবুজ পিঙ্গল চোখে কিসের আতঙ্কিত জিজ্ঞাসা।

শাহর বৈঠকখানা ঘরেও সেই শুষ্কতা, সেই শুমোট।

ফরাসের সামনে ছোটো জোরালো লঠন। ঘরটা অতিরিক্ত আলো হয়ে আছে। সেই আলোর সঙ্গে কুয়াশার মতো জমছে বন-গন্ধী তামাকের ধোঁয়া। রাসীকৃত শুষ্কতার মধ্যে শুধু অছুরণিত হচ্ছে মশার শ্রান্তিহীন গুঞ্জন। সুখোমুখি ছজন। শাহ আর ইসমাইল।

ইসমাইল ভিক্তভাবে হাসল। তির্যক চোখে তাকালো শাহর দিকে।



১ টাকা ১৪ আনা পর্যন্ত করার অহুমতি দেওয়া আছে। কিন্তু কোন কোন স্থানে সর্বস্বার্থসাধক সমবায় সমিতিগুলি ১ টাকা ১০ আনা মণ দরে কয়লা বিক্রয় করিতেছেন। তাঁহারা যে একেবারে কোন লাভ করেন না, এ কথা বলা যায় না। কাজেই যাহারা ১ টাকা ১৪ আনা মণ দরে কয়লা বিক্রয় করে, তাহারা যে অত্যধিক মুনাফা করিয়া থাকে, সে কথা বলাই বাহুল্য মাত্র। যদি কয়লার নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা প্রত্যাহার করা হয়, তাহা হইলে হয় ত কয়লার দাম সকল স্থানেই দেড় টাকা পর্যন্ত মণে বিক্রীত হইতে পারে। সাধারণ মানুষ আজ সকল প্রয়োজনীয় দ্রব্য অত্যধিক মূল্যে ক্রয় করিতে বাইরা বিব্রত হইয়াছে। এ অবস্থায় একটি জিনিষও যদি কম মূল্যে পাওয়া যায়, তাহা কম আশা ও সুবিধার বিষয় নহে। আমরা এ বিষয়ে পশ্চিম বাংলার সরকার বা বিভাগের দৃষ্টি আকর্ষণ করি ও বিশ্বাস করি, তাঁহারা দরিদ্র জনগণের দুঃখ দূর করিবার জন্ত এ বিষয়ে অবহিত হইবেন।

### পল্লী স্বাস্থ্য কেন্দ্র ও বুনিসান্দি

বিভাগ্যলক্ষ—

ডাক্তার বিধানকেন্দ্র রায় পশ্চিম বাংলার প্রধান মন্ত্রী হইয়াই বাংলার প্রতি ইউনিয়নে একটি করিয়া সরকারী পল্লী-স্বাস্থ্য-কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা করিয়াছেন। যে সকল ইউনিয়নের অধিবাসীরা প্রথমেই এ জন্ত জমী ও অর্থ দান করিয়াছেন, সে সকল ইউনিয়নে বাকী টাকা সরকারী তহবিল হইতে দিয়া কেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছে। অবশ্য যদি ঐ সকল কেন্দ্র উপযুক্তভাবে পরিচালিত হয়, তাহা হইলে স্থানীয় জনগণের একটি অভাব দূরীভূত হইবে। কেন্দ্রে ঔষধ বিতরণ কেন্দ্র ছাড়াও আকস্মিক বিপদে চিকিৎসার জন্ত ২টি শয্যা ও প্রসূতিদের জন্ত ২টি শয্যা রাখা হইবে। তাহা ছাড়া কেন্দ্রের কর্মীরা গ্রামে গ্রামে বাইরা স্বাস্থ্য সঞ্চক্ষে প্রচার কার্য চালাইবেন ও রোগের প্রথম হইতেই রোগীর বাহাতে চিকিৎসা-ব্যবস্থা হয়, সেজন্ত চেষ্টা করিবেন। অতি দুঃখের সহিত প্রকাশ করিতে হইতেছে যে আমাদের মধ্যে দুর্নীতির অত্যধিক প্রচারের ফলে সর্বত্র সরকারী অর্থ ব্যয়িত হইলেও কেন্দ্রের গৃহগুলি ভাল করিয়া নির্মিত হয় নাই। বাহাদের উপর নূতন গৃহ-

নির্মাণের ভার দেওয়া হইয়াছিল, তাঁহারা যে কোন প্রকারে কাজ শেষ করিয়াছেন—বাড়ীগুলির ৬ মাস পরেই মেঝামেঝের প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। সরকারী স্বাস্থ্য-বিভাগ-কর্তৃপক্ষের যত্নের অভাবে কেন্দ্রগুলিতে কর্মী বাইতে বা ঔষধাদি বাইতে বিলম্ব হওয়ায় সরকারী অর্থ কি ভাবে অপব্যয়িত হইতেছে, তাহা চিন্তা করিলেও বিস্মিত হইতে হয়। অথচ সরকারী দপ্তরে পরিদর্শনকারী কর্মচারীর অভাব নাই। কেন যে এরূপ অব্যবস্থা হারী হইতেছে, তাহা আমরা ভাবিয়া পাই না। এই দুর্দিনে জনহিতকর কার্যের জন্ত লোক জমী দান করিয়াছে, টাকা করিয়া অর্থ-সংগ্রহ করিয়া দিয়াছে, কিন্তু তাহার যদি অপব্যয় হইতে দেখা যায়, তাহা অপেক্ষা দুঃখের বিষয় আর কি হইতে পারে? ঐ ভাবে নানা স্থানে নূতন বুনিসান্দি বিভাগ স্থাপিত হইতেছে। সে জন্তও উৎসাহী ব্যক্তিরা জমী দিয়াছেন—জেলা বোর্ড ও সরকারী শিক্ষা বিভাগ হইতে অর্থ দিয়া বিভাগ্যলক্ষ নির্মাণ করা হইতেছে—কিন্তু গুনা বাইতেছে, পল্লী স্বাস্থ্য-কেন্দ্রের গৃহের জায় বুনিসান্দি বিভাগের গৃহ-নির্মাণেও গলদ থাকিয়া বাইতেছে। এই সকল কার্য সম্পাদনের সময় কর্তৃপক্ষ কেন যে জনগণের সহযোগিতা ও সাহায্য গ্রহণ করেন না, তাহাও আমরা বুঝি না। বে-সরকারী কমিটিকে গৃহ-নির্মাণ কার্য তত্ত্বাবধান করিতে দিলে এইভাবে অর্থের অপব্যয় হইত না। আমরা এ বিষয়ে স্বাস্থ্য, স্বায়ত্তশাসন ও শিক্ষা বিভাগের কর্তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করি ও আশা করি, ভবিষ্যতে এই সকল অনাচার বন্ধের ব্যবস্থা অবলম্বিত হইবে।

### ডক্টর শ্রীমতী রমা চৌধুরী—

খ্যাতনামা পণ্ডিত, অধ্যাপক ডক্টর শ্রীমতী রমা চৌধুরী সম্প্রতি কলিকাতায় লেডী ব্রোবোর্স কলেজের স্থায়ী প্রিন্সিপাল নিযুক্ত হইয়াছেন। তিনি কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের এম-এ পরীক্ষার দর্শন শাস্ত্রে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করার পর বাঙালী মহিলাদের মধ্যে সর্বপ্রথম অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ডক্টর অফ্ ফিলসপি ডিগ্রী লাভ করেন। তিনি ও তাঁহার স্বামী ডক্টর শ্রীযতীন্দ্র বিমল চৌধুরী সংস্কৃত সাহিত্যের প্রচারের জন্ত ‘প্রাচ্যবাণী-মন্দির’ প্রতিষ্ঠা করিয়া বহু বিবরে গবেষণা ও গ্রন্থ প্রচার

করিতেছেন। বেঙ্গল রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটিরও তিনি সর্বপ্রথম মহিলা ফেলো। তিনি দেশনেতা স্বর্গত আনন্দ মোহন বহু মহাশয়ের পৌত্রী।

### কাশ্মীর মীমাংসার সূত্র—

গত ২১শে জুন শ্রীনগরে কাশ্মীরের প্রধানমন্ত্রী সেখ আবদুল্লাহ কাশ্মীর বিরোধ মীমাংসার দুটি প্রধান সূত্রের কথা উল্লেখ করিয়াছেন (১) সুপ্রতিষ্ঠিত গভর্নমেন্টকে রাজ্যের সমগ্র এলাকা প্রতাপ ও তথাকথিত আজাদ কাশ্মীর গভর্নমেন্টের ও তাহার সৈন্তদলের বিলোপ সাধন (২) হানাদারগণের আক্রমণের ফলে দাঙ্গাহাঙ্গামা হওয়ায় বাহারা বাস্তবতাগ করিয়াছে তাহাদের পুনর্বাসন। এই দুইটি বিষয় সকল মীমাংসার মূল সূত্র। সূত্র দুইটি পূরণে কেহ অসম্মত হইলে কাশ্মীরবাসীদিগকে মূলনীতি হইতে বিচ্যুত হইতে হইবে।—সেখ আবদুল্লাহ এই উক্তি পর কাশ্মীর মীমাংসার পথ সম্বন্ধে সকলের নিঃসন্দেহ হওয়া উচিত। এই কথা শুনার পরও রাষ্ট্রসংঘ-প্রতিনিধি মীমাংসার পথে কেন যে বাধা সৃষ্টি করিতেছেন, তাহা তিনিই জানেন। আমাদের বিশ্বাস কাশ্মীর সমস্যার সমাধান কাশ্মীরবাসীদিগকে শেষ পর্যন্ত সন্তোষ দান করিবে।

### রাষ্ট্রপুত্র সুরেন্দ্রনাথ—

গত ৬ই আগষ্ট বহু স্থানে রাষ্ট্রপুত্র সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের বার্ষিক স্মৃতি-সভা হইয়া গিয়াছে। ২৫ বৎসর পূর্বে সুরেন্দ্রনাথ পরলোকগমন করিয়াছেন—তিনি ভারতের জাতীয় আন্দোলনের জন্মদাতা, এ কথা বলিলে আদৌ অত্যাক্তি করা হয় না। কিন্তু দেশ আজ তাঁহার কথা ভুলিয়া গিয়াছে। কলিকাতা সহরে তাঁহার স্মৃতি-রক্ষার ব্যবস্থা হইয়াছে বটে, কিন্তু যে বারাকপুর সহরের গঙ্গাতীরে তিনি প্রায় ৫০ বৎসর কাল বাস করিয়াছিলেন, তথায় এখনও তাঁহার স্মৃতি-রক্ষার কোন ব্যবস্থা হয় নাই। যে স্থানে তাঁহার নব্বয় দেহ ভস্মীভূত করা হইয়াছিল, সে স্থানে একটি স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণের চেষ্টাও এখন পর্যন্ত কাণ্ডে পরিণত হয় নাই। যে গৃহে তিনি বাস করিতেন, সে গৃহ এখন ভাঙা দেওয়া আছে। ঐ গৃহটি যাহাতে সরকার কর্তৃক গৃহীত হইয়া তথায় একটি জাতীয় যাদুঘর প্রতিষ্ঠা করা হয়, সে অল্পও স্বাধীন বাংলার নেতৃবৃন্দের

সচেত হওয়া উচিত। সুরেন্দ্রনাথের প্রতিষ্ঠিত ভারত-সভার কর্তৃপক্ষের এ বিষয়ে অগ্রণী হওয়া কর্তব্য। তাঁহার পরলোকগমনের পর ২৫ বৎসর অতীত হইলেও তাঁহার কোন জীবনী এখনও প্রণীত হয় নাই। তিনি তাঁহার যে আত্মজীবন রচনা করিয়া গিয়াছেন, তাহা বহু তথ্যপূর্ণ হইলেও তাঁহাকে পূর্ণাঙ্গ জীবনী বলা যায় না। স্বর্গত জ্ঞানেন্দ্রনাথ কুমার তাঁহার জীবনী ইংরাজিতে ২ খণ্ড প্রকাশ করিয়াছিলেন—তাহাতে শুধু প্রথম জীবনের ঘটনা ও রচনাবলী প্রদত্ত হইয়াছে। ঐ অসম্পূর্ণ গ্রন্থ সম্পূর্ণ করিবার জন্য ভারত-সভা কর্তৃপক্ষের উত্তোগী হওয়া উচিত। আমরা তাঁহার স্মৃতি দিবসে তাঁহার উদ্দেশে প্রার্থনা জানাই ও সঙ্গে সঙ্গে দেশবাসীর নিকট প্রার্থনা জানাই, বর্তমান সময়ে যেন তাঁহার আদর্শ প্রচারের উপযুক্ত চেষ্টার অভাব না হয়।

### মহারাজ নন্দকুমার—

১৭৭৫ খ্রীষ্টাব্দে ৫ই আগষ্ট কলিকাতা গড়ের মাঠে ফাঁসিতলা নামক স্থানে জাল করার অপরাধে মহারাজ নন্দকুমারের ফাঁসি হইয়াছিল। সে সময়ে নন্দকুমারের বয়স ৭০ বৎসর। তিনি দরিদ্রের সন্তান ছিলেন এবং নিজ বুদ্ধি ও শক্তি দ্বারা শুধু অর্থার্জন করেন নাই, দেশের মধ্যে একজন অসাধারণ প্রভাবশালী ব্যক্তি হইয়াছিলেন। সে যুগেও তিনি বুদ্ধিতে পারিয়াছিলেন, মুসলমান শাসকদিগকে তাড়াইবার জন্য ব্রিটিশকে প্ররোচিত দেওয়া বা সাহায্য করা দেশের পক্ষে মঙ্গলজনক হইবে না। তৎকালীন ইংরাজ-প্রধান ওয়ারেন হেস্টিংস নন্দকুমারকে কোন প্রকারে বশীভূত করিতে না পারিয়া শেষ পর্যন্ত এক যড়যন্ত্র করেন ও জাল করার অভিযোগে তাঁহার বিচার হয়; বিচারপতি ইলাইজা ইম্পে ঐ সামান্য অপরাধে তাঁহার ফাঁসির আদেশ দেন। নন্দকুমার হাসি মুখে ফাঁসির মধ্যে আরোহণ করেন। যখন তাঁহার গলায় ফাঁসির দড়ি দেওয়া হয়, তখনও তিনি মালা হাতে করিয়া জপ করিতেছিলেন। মৃত্যুকালে তিনি সামান্য ভূসম্পত্তি ও নগদ ৫২ লক্ষ টাকা রাখিয়া গিয়াছিলেন। মুর্শিদাবাদ জেলায় বহরমপুর সহরের উত্তর প্রান্তে কুজবাটা নামক স্থানে তিনি একাঙা অট্টালিকা নির্মাণ করিয়া তথায় বাস করিতেন। সে গৃহ আজও বর্তমান। গত ৫ই আগষ্ট শনিবার ঐ গৃহে মহারাজা নন্দকুমারের এক স্মৃতি উৎসব হইয়াছিল। স্থানীয় নেতা শ্রীছন্দ্রপতি রায়

উৎসবে পৌরোহিত্য করেন এবং কলিকাতা হইতে শ্রীযুত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ ও শ্রীযুত কগীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় তথায় বাইরা অভিধিক্রমে সভায় যোগদান করিয়াছিলেন। মহারাজ নন্দকুমার সধকে তথ্য ইংরাজ ঐতিহাসিকদিগের লিখিত বিবরণের মধ্যেই অধিক পাওয়া যায়। তাঁহার মৃত্যুর ১০৭ বৎসর পরে বঙ্গদর্শন পত্রিকার নবম খণ্ডে আবার সংখ্যায় তাঁহার সধকে তথ্যপূর্ণ এক প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল। তখনকার দিনে লেখকের নাম ছাপা হইত না কাজেই ঐ প্রবন্ধ কাহার লেখা ৬৮ বৎসর পরে আজ আর জানিবার উপায় নাই। পণ্ডিত সত্যচরণ শাস্ত্রী লিখিত মহারাজা নন্দকুমারের একখানি জীবনী গ্রন্থ আছে। বর্তমান সময়ে তাঁহার জীবনী রচনার উপযুক্ত দিন আসিয়াছে। নূতন অবস্থায় তাঁহার জীবনী রচিত হইলে দেশবাসী নন্দকুমার সধকে সত্য কথা জানিতে পারিবে। সে দিন সভায় স্থির হইয়াছে—নন্দকুমারের বংশধর কেহ নাই—আর অর্থও তাঁহাদের নাই। কাজেই সরকার হইতে কুঞ্জবাটীর রাজবাড়ীটি দখল করিয়া লইয়া ঐ স্থানে কোন জনহিতকর প্রতিষ্ঠান গঠন করা উচিত। তাহা হইলে নন্দকুমারের স্মৃতিচিহ্ন স্বরূপ গৃহটি রক্ষিত হইবে—নচেৎ উহা সমুদ্র ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে। যে স্থানে কলিকাতায় বিডন স্কয়ার অবস্থিত, তথায় নন্দকুমারের কলিকাতার বাসগৃহ ছিল। সেখানে ও গড়ের মাঠে ফাঁসিতলায় নন্দকুমারের দুইটি স্মৃতিস্তম্ভও নির্মিত হওয়া উচিত। এ বিষয়ে আমরা দেশবাসী সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করি। যাহারা স্বাধীন বাংলায় নন্দকুমারের স্মৃতি উৎসবে উত্তোগী হইয়া সেই মহাপুরুষের আদর্শ আবার দেশবাসীকে অরণ্য করাইয়া দিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, তাঁহারা সকলের প্রশংসায় পাত্র সন্দেহ নাই।

### গোপীনাথ বড়দলই—

আসামের প্রধান মন্ত্রী গোপীনাথ বড়দলই গত ৬ই আগষ্ট শনিবার রাত্রি ২টা ৪০ মিনিটের সময় সহসা ৬০ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করিয়াছেন। তিনি শনিবারই শিলং হইতে কিরিয়া আসেন ও রাত্রি ৯টা পর্যন্ত স্ত্রী ও দুই কস্তার সহিত অভিনয় দেখিয়া আসেন। রাত্রি ১২টার দ্ব্যয়ক্রে বজ্রাণ উপস্থিত হয় ও কোন চিকিৎসায় কোন ফল হয় নাই। তাঁহার স্থানে অস্থায়ীভাবে অর্থ ও রাজস্ব মন্ত্রী

শ্রীযুত বিজুরাম মেধী প্রধান-মন্ত্রী নিযুক্ত হইয়াছেন। গোপীনাথ ১৯১৫ সালে কলিকাতার এম-এ ও বি-এল পাশ করিয়া গোঁহাটিতে আইন ব্যবসা আরম্ভ করেন। অসহযোগ আন্দোলনে এক বৎসর কারাদণ্ড ভোগ করিয়া তিনি ১৯৩৭ সালে ব্যবস্থা পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন ও ১৯৩৮ সালে প্রধান মন্ত্রী হন। ১৯৪০ সালে ১ বৎসরের জন্ত ও ১৯৪২ সালে ২ বৎসর তাঁহাকে কারাদণ্ড ভোগ করিতে হইয়াছিল। ১৯৪৬ সালে পরিষদ সদস্য হইয়া তিনি প্রধান মন্ত্রী হন। তিনি গণপরিষদেরও সদস্য হইয়াছিলেন। আসামী ভাষায় তিনি বহু পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন।

### অখিলচন্দ্র দত্ত—

বাংলার খ্যাতনামা কংগ্রেস-নেতা, কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদের ভূতপূর্ব ডেপুটি-সভাপতি অখিলচন্দ্র দত্ত মহাশয় গত ৫ই আগষ্ট শনিবার বিকালে ৮১ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন। ১৮৬৯ সালে জিপুরা জেলার ভরগাছ গ্রামে তাহার জন্ম হয় ও ১৮৯৭ সাল হইতে তিনি কুমিল্লায় ওকালতী আরম্ভ করেন। অল্প দিনের মধ্যে তিনি খ্যাতিলাভ করিয়া প্রচুর অর্থার্জনে সমর্থ হন। ১৯১৬ সালে তিনি ব্যবস্থা পরিষদের সদস্য ও ১৯১৮ সালে বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সম্মিলনের চুঁচড়া অধিবেশনের সভাপতি হন। তিনি ১৯২৩ সালে আবার ব্যবস্থা পরিষদের সদস্য হন ও ১৯২৮ সালে বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির সভাপতি হন। ১৯৩২ সালে কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদের সদস্য ও ডেপুটি সভাপতি হন। ১৯৩৭ সালে সপরিবারে তিনি ইউরোপ ভ্রমণ করিয়াছিলেন। ১৯৪৫ সাল পর্যন্ত তিনি ডেপুটি সভাপতির কাজ করেন। তিনি বহু ব্যবসা, বীমা ও ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠানের পরিচালক ছিলেন। ২ বৎসর পূর্বেই তাহার স্ত্রী-বিয়োগ হইয়াছিল।

### পরলোকে শ্রীশচন্দ্র জ্যোতির্বিদ্য—

বাংলার খ্যাতনামা জ্যোতির্বিদ ও দার্শনিক পণ্ডিত শ্রীশচন্দ্র জ্যোতির্বিদ মহাশয় গত ১৫ই আষাঢ় ৬৯ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি নবাবপেয় তারত-বিখ্যাত জ্যোতিবী বর্গত বিশ্বস্তর জ্যোতির্বিদ্যার জ্যেষ্ঠগুরু ছিলেন ও নবাবপেয় বিশ্ববিদ্যালয়ের জ্যোতিবী শাস্ত্রের প্রধান অধ্যাপক ছিলেন। তিনি বঙ্গীয় সংস্কৃত এসোসিয়েশন

সংস্কৃত সাহিত্যের সেবা করিয়া গিয়াছেন।

### পূর্ববঙ্গবাসীন্দিকে হাজারাবাদে

#### প্রেক্ষণ—

পূর্ববঙ্গ হইতে আগত ৫০ হাজার বাস্তহারাকে হায়দ্রাবাদ রাজ্যে লইয়া বাইয়া পুনর্বাসন ব্যবস্থা করা হইবে। তন্মধ্যে ৩২ হাজার লোক ঔরঙ্গাবাদ জেলার বোকারদান তালুকে স্থান লাভ করিবে। ইহার পূর্বে কোন হিন্দু বাস্তহারাকে হায়দ্রাবাদ রাজ্যে লইয়া যাওয়া হয় নাই। যুদ্ধের পূর্বে ৭ লক্ষ মুসলমান বাস্তহারার নিজাম রাজ্যে গমন করিয়াছিল—তাহারা এখন অন্তর্ভুক্ত চলিয়া গিয়াছে; পশ্চিম-বঙ্গের বাস্তহারাদের এই সুযোগ তাগ করা উচিত নহে। বাঙ্গালী বিহার, উড়িষ্যা, উত্তর প্রদেশ প্রভৃতি স্থানে স্বীয় প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। হায়দ্রাবাদে বাইলেও তাহারা বাঙ্গালীই থাকিবে—অথচ তথায় অন্ন বস্ত্রের সমস্তা থাকিবে না। তথায় বহু জমী পতিত আছে, শিল্প প্রতিষ্ঠার সুযোগও কম নাই—বাঙ্গালী সে সকল সুযোগ গ্রহণ করিয়া তথায় সুখে বাস করিতে পারিবে।

#### বাস্তহারাদেব শিক্ষার জন্ত দান—

পশ্চিমবঙ্গে পূর্বপাৰ্শ্বিক্তান হইতে যে সকল বাস্তহারার আসিয়াছে, তাহাদের শিক্ষার ব্যবস্থার জন্ত কেন্দ্রীয় সরকার পশ্চিমবঙ্গ রাষ্ট্রকে ৬৭ লক্ষ টাকা প্রদান করিবেন স্থির হইয়াছে। ঋণ হিসাবে ৫০ লক্ষ টাকা দেওয়া হইবে ও ১৭ লক্ষ টাকা পশ্চিমবঙ্গ দান হিসাবে পাইবে। গত ১৯৪৯-৫০ সালেও কেন্দ্রীয় গভর্নমেন্ট ঐ জন্ত পশ্চিমবঙ্গ রাষ্ট্রকে ২৪ লক্ষ টাকা দিয়াছিলেন—তন্মধ্যে মাত্র ১৬ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হইয়াছে। শিক্ষা-বিত্তারের জন্ত এই অর্থ বাহাতে ভালভাবে ব্যয়িত হয়, সে জন্ত সরকার ও জনসাধারণ উভয় পক্ষেরই সাবধানতার সহিত কাজ করা উচিত। অতি দুঃখের বিষয় এই যে, বাস্তহারার ছাত্রদের হস্ত প্রাপ্ত বহু অর্থ জনগণ কর্তৃক অপব্যয়ের কথা শুনা গিয়াছে। সে জন্ত সরকার পক্ষেরও বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন প্রয়োজন।

#### দেশের শান্তি সংরক্ষণ ও স্থান-ব্যবস্থা—

কলিকাতার সম্প্রতি যে নিধিল ভারত পেট্রল বিক্রেতা যিগন হইয়া গিয়াছে তাহার সভাপতিরূপে হাওড়া

মোটরের শ্রীব্রত হুশীলকুমার দে তাঁহার অভিতাক্ষে দেশের একটি বড় সমস্যার বিষয়ে দেশবাসীর ও সরকারের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছিলেন। দেশের পথ সংস্কার ও নতুন পথ নির্মাণ সমস্তা আজ সকলকে বিব্রত করিয়াছে। তাহা না হইলে গ্রামে লোকের বসতি, কৃষি ও বাণিজ্য—কোন বিষয়ই সম্ভব হইবে না। সে জন্ত পেট্রল ও মোটর গাড়ী হইতে প্রাপ্ত সকল রাজস্ব পথ নির্মাণ



শ্রী হুশীলকুমার দে

ও সংস্কার কার্যে ব্যয় করিবার জন্ত সরকারকে বিশেষ ভাবে অহরোধ জানাইয়া সম্মিলনে প্রস্তাবও গৃহীত হইয়াছে। দেশের মোটর বান চলাচল ব্যবস্থা সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন করার সম্পর্কেও সভাপতি মহাশয় তাঁহার অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। পেট্রল-বিক্রেতার আভ দেশের এই প্রয়োজনীয় সমস্যার সমাধানে সচেষ্ট হইয়াছেন দেখিয়া আমরা আনন্দিত হইলাম।

#### আশ্রয়প্রার্থীদের জমি দখল—

বাংলা সরকারের জমি-দখল বিভাগ হইতে কলিকাতার সহরতলীর বহু জমি তথাকথিত আশ্রয়প্রার্থীদের জন্ত দখল-ব্যবস্থা করা হইয়াছে। কিন্তু আশ্রয়ের বিষয় এই যে, বাহাদের জমি দখল করা হইতেছে, তাহারা আরো আশ্রয়প্রার্থী বা গৃহহারা নহেন। তাহাদের মধ্যে

অধিকাংশ লোক গত ১০।১৫ বৎসর ধরিয়া কলিকাতা সহরে বা সহরভলীতে বাস করিতেছেন—এখন সুযোগ বুঝিয়া তাহারা বহু পণ্ডিত জমি জোর করিয়া দখল করিয়া বসিয়াছেন। তাহার পর সে সকল স্থানে গৃহ-নিৰ্ম্মিত হইতে দেখিয়া সরকার ঐ সকল জমি-সরকারী আইনে দখল করিয়া দিবার চেষ্টা করিতেছেন। আমরা পূর্বেই বলিয়াছিলাম—সহরভলীতে যে সকল বাসযোগ্য জমি গত ২০ বৎসর কাল ধরিয়া ব্যবহৃত হয় নাই, সরকার যদি সে সকল জমি দখল করিয়া আশ্রয়প্রার্থীদের বিক্রয়ের ব্যবস্থা করেন, তবে তাহাতে কাহারও আপত্তি করা উচিত হইবে না। কিন্তু কার্যতঃ সরকার তাহা না করিয়া, যে সকল জমি তথাকথিত বাস্তহারারা জোর করিয়া দখল করিয়াছেন, সে ঞ্জলি দখলের ব্যবস্থা করিয়াছেন। এই নূতন ব্যবস্থার কোন যৌক্তিকতা দেখা যায় না। পূর্বে হইতে ঐ সকল জমির মূল্য নির্দ্ধারিত হইলে, বাহাদের ক্রয়ের শক্তি আছে শুধু তাহারা ঐ সকল জমিতে বাইত। বাহারা জমি জোর করিয়া দখল করিয়াছে, তাহাদের জমির দাম দিবার শক্তি আছে কি না জানা নাই। জমীর মূল্য এখনও নির্দ্ধারিত হয় নাই। যে সকল জমী জোর করিয়া দখল করা হইয়াছে, তাহার অধিকাংশই অধিক মূল্যে বিক্রীত হইবার যোগ্য। অথচ তাহার অনতিদূরে অল্প মূল্যের জমী পাওয়া বাইত—সে সকল জমীর মূল্য দেওয়াও সাধারণের পক্ষে সম্ভব হইত। সরকারী নিয়ামক ও কর্তৃচাৰীরা যদি শুধু ভাবপ্রবণ হইয়া এ বিষয়ে কর্তব্য স্থির না করেন—অবস্থা বুঝিয়া যদি তাঁহারা উপযুক্ত ব্যবস্থা করেন, তাহা হইলে কোন পক্ষেরই অভিযোগের কারণ থাকিবে না। বাহারা জোর করিয়া জমী দখল করিয়াছে, তাহাদের যদি কোনরূপ দণ্ডের ব্যবস্থা না করা হয়, তবে দেশে ঐ ভাবে আইন-অমান্ত কার্য দিন দিন বাড়িয়া যাইবে ও কোন সরকারের পক্ষেই শাসন কার্য পরিচালন করা সম্ভব হইবে না।

#### দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার সফর—

ডাঃ বা ম এক সময়ে ব্রহ্মদেশের প্রধান মন্ত্রী ছিলেন। তিনি একজন চিন্তাশীল ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত। পণ্ডিত জহরলাল নেহরু সম্প্রতি দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় সফর করার

পর ডাঃ বা ম একটি বিবৃতিতে সে বিষয়ে তাঁহার অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন—(১) নেহরু চিয়াং-কাইসেকের স্থানে এসিয়ার নেতা হইবার চেষ্টা করিতেছেন (২) দক্ষিণ পূর্ব এশিয়াবাসী ২০ লক্ষ ভারতীয় নেতাজী সুভাষ বসুর অহুগত, পণ্ডিতজী তাহাদের আহুগত লাভ করিতে গিয়াছিলেন (৩) ইন্দ-মার্কিন শক্তির হাতের গুতুল হইয়া পণ্ডিতজী সাম্যবাদের বিরুদ্ধে আক্রমণ চালাইতেছেন (৪) দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার আদিম অধিবাসীদের প্রতি পণ্ডিতজীর নজর নাই; তিনি ঐ অঞ্চলের ভারতীয়দের জন্তই দরদ প্রকাশ করিয়াছেন।—কথাগুলি বিবেচনার বিষয়। 'কোরিয়ার যুদ্ধে ভারত যোগদান করার ডাঃ বা ম মহাশয়ের উক্তি সমর্থিত হইয়াছে। সত্যই পণ্ডিতজী ভারতকে কোন পথে লইয়া চলিয়াছেন সে চিন্তা আজ সকলকে বিব্রত করিয়াছে।

#### মাদ্রাজ প্রাদেশিকতা—

শুধু পশ্চিম বাংলায় নয়, মাদ্রাজ প্রদেশেও দারুণ খাণ্ডাভাব দেখা দিয়াছে। ত্রিচিনপল্লী, কইষাটোর, উত্তর আর্কট ও মালাবার জেলায় খাণ্ডাভাব এত খারাপ যে লোক গাছের পাতা, লতাগাছ প্রভৃতি খাইতে বাধ্য হইতেছে। ঐ সকল জেলায় খাণ্ডাভাবে বহু লোক মারা যাইতেছে। এরোদ জেলাতেও খাণ্ডাভাবে বহু লোক মারা গিয়াছে। কোন প্রদেশেই চাল অধিক নাই—মাদ্রাজের লোক বেগী পরিমাণে চাল খায়—তাহাদের অল্প কোন খাণ্ড নাই। কি ভাবে দুর্ভিক্ষের কবল হইতে জনগণকে রক্ষা করা যায়, তাহার পরিকল্পনাই চলিতেছে—আর ও দিকে মুক্তার হার ক্রমশঃ বাড়িয়া চলিয়াছে।

#### সেনাবাহিনী ও বাঙ্গালী—

স্বাধীনতা লাভের পর দলে দলে বাঙ্গালী ছেলেদের সেনাবাহিনীতে যোগদান করার আহ্বান জানানো হলেও দেশে তেমন সাড়া দেখা যায় নাই। ইহার বহু কারণ বর্তমান। সত্যই বাহাতে ছেলেরা সেনাবাহিনীতে যোগদান করে, সে চেষ্টা এখনও হয় নাই। ভাল করিয়া ঐ বিষয়ে প্রচার কার্য করা হইলে সেনাবাহিনীতে যোগদানের জন্ত বাঙ্গালী যুবকের অভাব হইবে না। সে জন্ত বাংলার প্রতি সহরে সৈনিক মেলা আয়োজন করা, গ্রামাঞ্চলে ছাত্রবাহিনীর সম্মিলিত কুচ-কাওয়াজ দেখানো,

কাঁচরাপাড়ার শিক্ষাপ্রাপ্ত চাবী ছেলেদের দল বাঁধিয়া বিভিন্ন অঞ্চলে রুট-মার্চ করা প্রভৃতি বিশেষ প্রয়োজন। নানাভাবে ছবি দেখাইলে লোক সেনাবাহিনীর প্রতি আকৃষ্ট হইবে। আমরা এ সকল বিষয়ে কর্তৃপক্ষের মনোযোগ আকর্ষণ করি।

জন্ত গ্রামে ও গ্রামের লোক ঐ একই কারণে সহরে আসিতেছে। শনিবার এই আগষ্ট বহরমপুর সহরে কালো বাজারে ৬৪ টাকা মণ দরে বিক্রয় হইতেছে। ফলে বহু লোক অনাহারে দিন কাটাইতেছে। ঐ দিন সহরের লোক মিছিল করিয়া জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের বাড়ী ঘাইয়া চাল



নয়া দিল্লীর হেলী রোডে পশ্চিম  
বাংলার শ্রম-মন্ত্রী শ্রীকালীপদ  
মুখোপাধ্যায় কর্তৃক বৃক্ষরোপণ

### মুর্শিদাবাদের খাদ্য পরিস্থিতি—

মুর্শিদাবাদ জেলা ধান উৎপাদন সম্পর্কে বাড়তি জেলা বলিয়াই প্রসিদ্ধ ছিল অর্থাৎ ঐ জেলায় জেলাবাসীর প্রয়োজনের অতিরিক্ত ধান উৎপন্ন হইত। কিন্তু গত ১ বৎসরের মধ্যে কয়েক লক্ষ আশ্রয়প্রার্থী পূর্ববঙ্গ হইতে আসিয়া ঐ জেলায় বাস করায় এখন ঐ জেলাতেও দারুণ খাদ্যভাব উপস্থিত হইয়াছে। হানীর ছাত্র-কংগ্রেস হইতে ঘোষণা করা হইয়াছে—ঐ দেশকে যাঁচিতি অঞ্চল বলিয়া ঘোষণা করিয়া খাদ্য সরবরাহ ব্যবস্থা সরকারী নিয়ন্ত্রণাধীন না করিলে লোক খাদ্যভাবে মারা যাইবে; এখনও মুর্শিদাবাদ জেলায় ১ লক্ষ ২৬ হাজার বিঘা জমী পতিত আছে। বঙ্গ বিভাগের পর সকল জেলার অর্থ-নীতিক অবস্থাই পরিবর্তিত হইয়াছে—নদীয়ায় খাদ্যভাব বৃদ্ধি পাওয়ার আজ মুর্শিদাবাদ জেলাও বিপন্ন। গত ৩রা আগষ্ট বৃহস্পতিবার হইতে মুর্শিদাবাদ জেলার কোন স্থানে ধান বা চাল নাই। সহরের লোক চালের

চাহিয়াছিল—সেখানে নাকি পুলিশ জনতার উপর লাঠি চালাইয়াছে ও কাঁচুনে গ্যাস ব্যবহার করিয়াছে। অবিলম্বে জেলার সর্বত্র চাল সরবরাহের ব্যবস্থা না হইলে বহু লোক মারা যাইবে। ১৩৫০ এর দুর্ভিক্ষের সময় মুর্শিদাবাদ জেলার চাউলের মণ ২৪ টাকার অধিক হয় নাই—এবার সরকারী বণ্টন ব্যবস্থার ফ্রটির জন্তই এই দুঃবস্থা হইয়াছে। ফ্রটির জন্ত যাহারা দায়ী তাহাদেরও শাস্তি বিধান করা প্রয়োজন।

### বাকুড়া জেলা-সমস্যা—

বাকুড়া জেলার প্রতি ৫ বৎসরে একবার করিয়া দুর্ভিক্ষ হইয়া থাকে। ঐ জেলায় এখনও প্রায় ৬ লক্ষ বিঘা জমী পতিত অবস্থায় আছে। এ বৎসর বাকুড়ায় দারুণ খাদ্যভাব দেখা দিয়াছে। ঐ জেলায় অধিক পরিমাণে খাদ্য উৎপাদনের চেষ্টা খুব কমই দেখা যায়। মহাসংহিতায় আছে—যে ব্যক্তি যে ভূমিকে বনাদি কর্তন-পূর্বক কর্ণাদি দ্বারা উদ্ধার করে সে ভূমি তাহারই হইয়া থাকে। ঐ প্রথা বিলুপ্ত হওয়ার কৃষক আর কৃষির



প্রতি উৎসাহী হয় না। বাঁকুড়া জেলার চাষের জমির উন্নতি সাধন না করিলে বাঁকুড়ার এই দুর্ভিক্ষ বন্ধ করা সম্ভব হইবে না। বর্তমান বৎসরে আগামী ২১৩ মাসে কি অবস্থা উপস্থিত হইবে, তাহা চিন্তা করিয়া লোক শঙ্কিত হইতেছে।

### গ্রাম্য-ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠা—

ভারতের গ্রামে ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে কেন্দ্রীয় গভর্নমেন্ট কর্তৃক যে তদন্ত কমিটি গঠিত হইয়াছিল, সম্প্রতি তাহার রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রামে ব্যাঙ্ক না থাকায় লোক নানারূপ অসুবিধা ও কষ্ট ভোগ করে। এক সময়ে ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কে বহু জেলা ও মহকুমা সহরে সরকারী ব্যাঙ্কিং কার্য করিবার ভার দেওয়া হইয়াছিল। সে ব্যবস্থা অধিক বিস্তৃতি লাভ করে নাই। অনেক স্থানে এখনও ট্রেজারি বা সরকারী তোষাখানা হইতে টাকা আদান প্রদানের ব্যবস্থা আছে। তাহার অসুবিধা অনেক। তাহা পরিবর্তন করিয়া ব্যাঙ্কের উপর সে কাজের ভার দেওয়া হইলে লোক চেকের সাহায্যে আদান প্রদান কার্য চালাইতে পারে। পোস্টাফিসে যে সেভিংস্ ব্যাঙ্ক আছে, তাহার কার্যও প্রসারিত হওয়া প্রয়োজন। গ্রামে গ্রামে সরকারী ব্যাঙ্ক খোলা হইলে সে দিক দিয়াও সঞ্চয়কারীরা লাভবান হইবে। এ বিষয়ে দেশের সর্বত্র প্রচার ও আলোচনা প্রয়োজন। বহু বেসরকারী ছোট ছোট ব্যবসায়ী-ব্যাঙ্ক ফেল করায় লোক আজ আতঙ্কগ্রস্ত ও ক্ষতিগ্রস্ত। ভবিষ্যতে সঞ্চয় করিয়া লোক বাহাতে এই ভাবে বিপর্যাস না হয়, সে জন্তই নূতন ব্যবহার প্রয়োজন।

### কলিকাতার মাহ্ সন্নবরাহ—

একটি সংবাদে প্রকাশ যে, সরকারী কর্তৃপক্ষের চেষ্টায় যুক্তপ্রদেশের এলাহাবাদ, আগ্রা, আলিগড়, কানী, চুনার, কানপুর, লক্ষৌ, মোরাদাবাদ ও মীরাত জেলা হইতে, উড়িষ্যার বালেশ্বর, কটক, বালুগাঁ, ছত্রপুর, সুহরী, খালিকোটী ও কালুপাড়া ষাট (চিল্কা) হইতে এবং বিহারের সামাই, বাকুগি জংসন, মোকামা জংসন, পাটনা সিটি ও সিমরী-বক্তিরারপুর হইতে পশ্চিমবঙ্গে মাহ্ আমদানী করার ব্যবস্থা হইয়াছে। গত ডিসেম্বর মাস হইতে মাজাজ ও বোম্বাই হইতেও কলিকাতার মাহ্ আসিতেছে। সংবাদটি শুনিয়া সকলের আশ্বস্ত হইবার

কথা। কিন্তু কলিকাতার বাজারে এখনও মাহ্‌র সের সাড়ে ৩ টাকা, ৪ টাকা। মর জুলন্ত না হইলে আমদানীর কল বুঝা যায় না। মর জুলন্ত করার কি কোন ব্যবস্থা হইতে পারে না। শুনা যায়, একদল ব্যবসায়ী মাহ্‌র মর কমানাইতে দেন না। এ কথা কি সত্য?

### শাল-আলুর চাষ—

পশ্চিম বাংলার খান্দেরী মাননীয় প্রিন্সপ্রিন্স চন্দ্র সেন ‘লাল আলুর চাষ’ সম্বন্ধে এক প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়া ঐ বিষয়ে দেশবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন—“মিষ্টি আলুর তুলনায় আলুর দাম সব সময়েই বেশী ও সেই দামেই আলু কিনে সকলেই মিষ্টি আলুর চেয়ে অনেক বেশী পরিমাণে ব্যবহার করে থাকেন। অথচ আলুর চেয়ে মিষ্টি আলু অনেক বেশী পুষ্টিকর। এতে অবশ্য আলুর তুলনায় প্রোটিন কিছু কম থাকে, কিন্তু আলুর তুলনায় প্রায় ৬ গুণ নেহজাতীয় পদার্থ, দেড়গুণ খেতসার জাতীয় পদার্থ, ৪ গুণ ক্যালসিয়াম বা চুন, ২ গুণ খাদ্যপ্রাণ (ক) ও আড়াই গুণ খাদ্য প্রাণ (খ) আছে। কাজেই মিষ্টি আলু যে একটি পুষ্টিকর খাদ্য সে বিষয়ে সন্দেহের কিছু নেই।” আমরা দেশের সকলকে মিষ্টি আলুর চাষ করিয়া খাদ্যাতাব দূর করিতে অহুরোধ করি। এক বিঘা জমিতে ৫০০ মণ মিষ্টি আলু হয়—সার দিয়া চাষ করিলে উহা ১০০ মণও হইতে পারে। প্রদেয় সেন মহাশয়ের প্রবন্ধটি বাহাতে অধিক প্রচারিত হয়, তাহারও ব্যবস্থা হওয়া প্রয়োজন।

### কট্টোল ব্যবস্থা সমস্যা—

কেন্দ্রীয় সরকার ভারতে কট্টোল ব্যবস্থা রাখা উচিত কিনা, সে বিষয়ে পরামর্শ দানের জন্ত যে কমিটি নিযুক্ত করিয়াছিলেন সেই কমিটি কট্টোল-ব্যবস্থা রাখার বিক্ষেপিত প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু সে নির্দেশ প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জুন মাসে কাগজের উপর কট্টোল ও জুলাই মাসে পেটলের উপর কট্টোল প্রত্যাহার করা হইয়াছে। একদল অর্থনীতিকের বিশ্বাস, ধনী ব্যবসায়ীদের চাপে তাহাদের সুবিধা বিধানের জন্ত কেন্দ্রীয় সরকার এই দুইটি জিনিষের উপর কট্টোল ছাড়িয়া দিয়াছেন। এই ব্যবস্থার ফলে দেশবাসী উপকৃত না হইয়া বরং অপকৃত হইবে। কাগজের বাজার স্থিরতা লাভ

কারবার সুন্দর কাগজের ভগ্ন কচুলা চলিয়া গেল—  
ফলে কাগজ আবার ছুঁল্য ও ছুঁপ্য হইবে বলিয়াই মনে  
হয়। পেটলের দামও বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনাই অধিক।  
আমরা এ বিষয়ে বিশেষজ্ঞদের অভিমত প্রকাশ করিতে  
অগ্ররোধ করি।

## পাকিস্তানে মাইকেল স্মৃতিসভা—

পূর্বপাকিস্তানে এখনও যে সকল লোক বাস  
করিতেছেন, তাঁহাদের যে বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের প্রতি  
নিষ্ঠা কমে নাই, তাহা সম্প্রতি বশোহর সহরে, রামকৃষ্ণ



বশোহরে মাইকেল উৎসবে সমবেত সুধীবৃন্দ

## হুগলী জেলা সাহিত্য সম্মিলন—

গত ৩১শে আষাঢ় চন্দননগর অধিকাচরণ স্থিতি মন্দিরে  
শ্রীযুত হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তের সভাপতিত্বে হুগলী জেলা  
সাহিত্য সম্মিলন হইয়াছিল। তথায় ‘হুগলী জেলার  
ইতিহাস’ রচনা করার জন্য শ্রীযুত সুধীরকুমার মিত্র  
মহাশয়কে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা হইয়াছে। সুধীরবাবু  
আম্বাধারণ অধ্যবসায় ও পরিশ্রম করিয়া ঐ ইতিহাস  
রচনা করার বহু বক্তা তাঁহার কার্যের প্রশংসা করেন।  
সভার প্রবর্তক সংঘের শ্রীমতিলাল রায়, শ্রীযোগেন্দ্রকুমার  
চট্টোপাধ্যায়, শ্রীহরিহর শেঠ, শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত,  
শ্রীনরেন্দ্রনাথ বসু প্রভৃতি বক্তৃতা করেন।

আশ্রম বিদ্যালয়ে অহুষ্ঠিত মাইকেল মধুসূদন দত্তের স্মৃতি  
উৎসব হইতে বুঝা যায়। বশোহর সাহিত্য সংঘের  
উদ্যোগে উক্ত সভা হয় এবং সুসাহিত্যিক শ্রীসুধাংশুকুমার  
রায়চৌধুরী তথায় সভাপতিত্ব ও শ্রীঅবলাকান্ত মজুমদার  
উহার উদ্বোধন করেন। জনাব মোসারফ হোসেন,  
আবদুল শোভান প্রভৃতি সভার মাইকেলের প্রতিভা সম্বন্ধে  
বক্তৃতা করেন।

## জলপাইগুড়ির হুর্দশাশ্রম সাহায্য—

গত অতিবৃষ্টির কালে জলপাইগুড়ি সহর ও জেলার ৩টি  
খানার ১৪টি ইউনিয়নের লক্ষাধিক লোক দারুণ হুর্দশাগ্রস্ত  
হইয়াছে—রেলে বাতায়াত বন্ধ—সে জন্য দারুণ খাতিয়াব

ক্ষতির পরিমাণ এক কোটি টাকারও অধিক। জলপাই-পশ্চিমবঙ্গের একটি জেলা—বঙ্গোপসীমিত দুর্গতগগকে সাহায্য করা সকলেরই কর্তব্য; সে জন্য তথায় প্রতিনিধি স্থানীয় লোকদিগকে লইয়া একটি সাহায্য কমিটি গঠিত হইয়াছে—সাহায্য জলপাইগুড়িতে সেন্ট্রাল ব্যাংক অব ইণ্ডিয়াতে প্রেরণ করিলে কমিটি তাহা বিতরণের উপযুক্ত ব্যবস্থা করিবেন। জলপাইগুড়ি হইতে যাহারা আসিতেছেন, তাঁহাদের নিকট দুঃখদর্শনার কাহিনী শুনিলে স্তুতি হইতে হয়। আমাদের বিশ্বাস—বাংলার চা-শিল্পের কেন্দ্র জলপাইগুড়িকে রক্ষা করার জন্য বাঙ্গালীর উৎসাহের অভাব হইবে না।

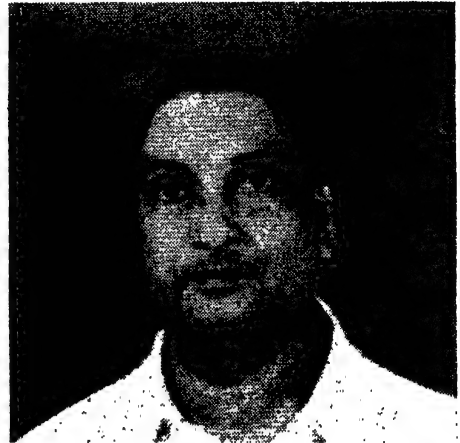


দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার পণ্ডিত জহরলাল নেহেরু  
(অভিনবনের উত্তরে বসুভারত)

### শ্রীহরেন্দ্রনাথ মজুমদার—

কলিকাতার খ্যাতনামা এডভোকেট, বসিরহাট-নিবাসী শ্রীহরেন্দ্রনাথ মজুমদার গত ১৫ই জুলাই ২৪ পরগণা জেলা স্কুল বোর্ডের সভাপতি নির্বাচিত হইয়াছেন। ১৯২৮ সালে ছাত্র-জীবনে তিনি স্নাতকোত্তর বয়স সংগ্রহে

আসেন ও তদবধি দেশে নানাবিধ জনহিতকর প্রতিষ্ঠানে মধ্য দিয়া সমাজ-সেবা করিতেছেন। ১৯৪০ সালে দুর্ভিক্ষের সময় ও ১৯৪৬ সালে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সময় তিনি নানাভাবে দুর্গতদের রক্ষা করিবার ব্যক



শ্রীহরেন্দ্রনাথ মজুমদার

করিয়াছিলেন। গত তিন বৎসর কাল তিনি কলিকাতা ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের সম্পাদকরূপেও সাফল্য সহিত কাজ করিয়াছেন। তাঁহার চেষ্ঠায় ২৪ পরগণা জেলায় প্রাথমিক ও বুনিয়াদি শিক্ষার প্রসার হউক—আমরা সর্কান্তকরণে ইহাই প্রার্থনা করি।

### ভারতে খাদ্যভাব—

গত প্রায় ১০ বৎসর ধরিয়া ভারতে দারুণ খাদ্যভা চলিতেছে এবং এখন পর্যন্ত তাহার প্রতিকারের কোনো উপায় নির্ণীত হয় নাই। অথচ আমেরিকায় বর্ষমানের অধিক খাদ্য উৎপন্ন হয় যে তাহা মনে করিলে বিস্মিত হইতে হয়। আমেরিকায় প্রচুর গম ও অন্যান্য খাদ্য শস্য উৎপাদিত আছে—তাহা মাল গাড়ীতে ভর্তি করিলে ১৭৬৭ মাইল দীর্ঘ মালগাড়ীর সারিতে পরিপূর্ণ হইবে। তথা

এত অধিক শুক ডিম কমিয়া গিয়াছে যে কটিওয়ালারা আগামী ৮ বৎসরেও তাহা খরচ করিতে পারিবে না। মাখন, দুগ্ধচূর্ণ, পনির, সয়াবিন, শুকনা ফল প্রভৃতিও ঐরূপ পরিমাণেই তথায় জমা হইয়াছে। আমেরিকা হইতে ঐ সকল জিনিষ কিনিয়া আনিবার উপযুক্ত অর্থ ভারতের নাই—কাজেই ভারতবাসীকে ঐ সংবাদ পাঠ করিয়া অনাহারে প্রাণ ত্যাগ করিতে হইবে। কিন্তু ভারত-সরকার কি এদেশে ঐভাবে খাতি প্রস্তুত করার ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে পারেন না? কবে এ বিষয়ে ভারতবাসী জন-সাধারণের তথ্য ভারত সরকারের চৈতন্য উদয় হইবে, তাহা কে জানে?



দিল্লী প্রত্যাগত নূতন কেন্দ্রীয় সচিব—শ্রীচক্রবর্তী রাজাগোপালাচারী

### শ্রীবিধুভূষণ সেনগুপ্ত—

ইউনাইটেড প্রেস অফ ইণ্ডিয়ার পরিচালক ও প্রধান সম্পাদক শ্রীবিধুভূষণ সেনগুপ্ত সম্প্রতি কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের কেলো মনোনীত হওয়ার আশ্রয় তাঁহাকে আন্তরিক অভিনন্দন জ্ঞাপন করিতেছি। ১৮৮৯ সালে পিপুরা জেলার চুণ্টা গ্রামে তাঁহার জন্ম। তিনি ১৯১৮ সালে রাষ্ট্রদূত হরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘বেঙ্গলী’ মৈত্রিক পক্ষে প্রথম সাংবাদিকের কাজ আরম্ভ করেন ও

পরে কিছুদিন ‘ইণ্ডিয়ান ডেলি নিউজ’ ও ‘সার্ভান্ট’ পক্ষে কাজ করিয়াছিলেন। ‘ক্রি প্রেস’ নামক সংবাদ সম্বন্ধেই প্রতিষ্ঠান গঠিত হইলে তিনি তাহার কলিকাতা শাখার ভার-গ্রহণ করেন ও পরে ১৯৩৩ সালে ‘ইউনাইটেড প্রেস’ প্রতিষ্ঠা করিয়া তাহাকে সর্বপ্রকারে জনপ্রিয় করিয়া তুলিয়াছেন। ভারতীয় সংবাদপত্র-সেবী-সংঘের সভাপতি ও নিখিল ভারত সংবাদপত্র সম্পাদক সম্মেলনের ষ্ট্যান্ডিং কমিটির সদস্য হিসাবে তিনি এ দেশের সাংবাদিকতার উন্নতি বিধানের জন্য সকল প্রকার চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহার এই সম্মান প্রাপ্তিতে যোগ্যের সমাদর দেখিয়া দেশবাসী সকলেই আনন্দিত হইবেন।

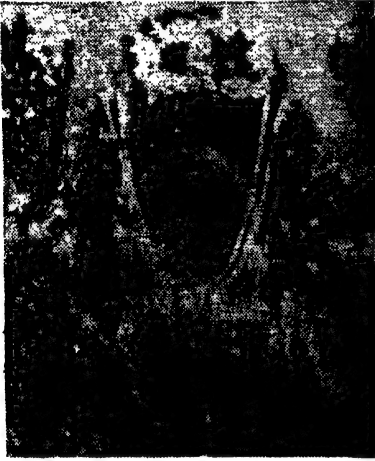


সাংবাদিক সম্মিলনে ডাক্তার শ্রীভানুপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

### বাস্তবত্যাগী সঙ্ঘটি—

৬ই জুলাই তারিখের সংবাদপত্রসমূহে প্রকাশ, গত ১লা জানুয়ারী হইতে এ পর্যন্ত ২৫ লক্ষ বাস্তবত্যাগী পূর্ব-পাকিস্তান হইতে ভারতীয় রাষ্ট্রে আগমন করিয়াছে। তন্মধ্যে ১৭ লক্ষ পশ্চিম বাংলায়, ৬ লক্ষ আসামে ও ২ লক্ষ ত্রিপুরায় গিয়াছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকার তাহাদের জন্য প্রত্যহ ৩ লক্ষ টাকা ব্যয় করিতেছেন। ১৯৫০ সালে এই বাবদ পশ্চিমবঙ্গ গভর্ণমেন্টের মোট ১২ কোটি টাকা ব্যয় হইবে বলিয়া মনে হয়। কিন্তু এই টাকা যে ঠিকভাবে ব্যয়িত হয় না, তাহা ৬ই জুলাই প্রকাশিত নেতৃবৃন্দের এক বিবৃতি হইতে বুঝা যায়। শ্রীঅরুণচন্দ্র গুহ, ডাঃ প্রতাপচন্দ্র গুহ রায়, শ্রীহরেন্দ্রচন্দ্র দাস, শ্রীঅমরকৃষ্ণ ঘোষ ও শ্রীগভীষ চন্দ্র চক্রবর্তীর স্বাক্ষরিত এক বিবৃতিতে সাহায্য ও পুনর্বাসতি

ব্যবস্থা সম্বন্ধে সরকারের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে। ঐ কার্যের জন্য বহু লোক নিযুক্ত করা হইয়াছে ও বহু টাকা ব্যয়িত হইয়াছে। কিন্তু এ বিষয়ে সরকারের কোন পরিকল্পনা না থাকায় প্রকৃত কাজ হইতেছে না। আমরা এ বিষয়ে বহুবার বহু অভিযোগ প্রকাশিত করিয়াছি, কিন্তু তাহাতে কোন ফল হয় নাই। দেশে এখনও নিঃস্বার্থ দেশ-সেবকের অভাব নাই—তাহাদের যে কেন এই কার্যে সাহায্য ও সহযোগিতার জন্য আহ্বান করা হয় না, তাহা বুঝা যায় না।



দেশবন্ধু স্মৃতি ভগ্ন—কলিকাতা

### ভারতের ৫০ কোটি টাকা ক্ষতি—

শেঠ রামকৃষ্ণ ডালমিয়া খাতনামা ব্যবসায়ী ও অর্থ-নীতিজ্ঞ পণ্ডিত। তিনি সম্প্রতি এক বিবৃতিতে প্রকাশ করিয়াছেন—পাটজাত দ্রব্য রপ্তানী সম্পর্কে ভারত সরকারের কর্তব্য-ক্রটির ফলে সম্প্রতি ভারতের ৫০ কোটি টাকা ক্ষতি হইতেছে। নির্ধারিত রপ্তানী মূল্য অপেক্ষা অধিক মূল্যে গোপনে ও বেসরকারীভাবে পাটজাত দ্রব্যাদি বিক্রয় হইয়াছে, ফলে গভর্নমেন্টের রাজস্ব খাতে ২০ কোটি টাকা ক্ষতি হইয়াছে এবং পাটজাত দ্রব্য উৎপাদনকারী কোম্পানী সমূহের অংশীদারদের ৩০ কোটি টাকা ক্ষতি হইয়াছে। এই ক্ষতির জন্য যাহারা দায়ী, তাহাদের কি শাস্তি বিধানের ব্যবস্থা হইতে পারে না। দেশে এইরূপ মুনাফা-খোরদের রাজস্ব আর কতদিন চলিবে?

### সমবায় অর্থনীতি—

কলিকাতায় সমবায় অর্থনীতি আলোচনার একটি প্রতিষ্ঠান আছে। ঐ প্রতিষ্ঠানের পক্ষ হইতে গত ৩রা আগষ্ট কলিকাতায় গ্রেট ইষ্টার্ন হোটেলে পশ্চিম কালার

নূতন সমবায় মন্ত্রী ডাঃ আর, আমেদকে এক ভোজ সভায় সর্জন করা হইয়াছিল। ভোজসভায় সমবায় মন্ত্রী বলিয়াছেন—“সমবায় নীতি সমাজকল্যাণমূলক একটি মহান ও সার্বভৌম আর্থিক ব্যবস্থা। সমবায় নীতিকে ভিত্তি করে পাশ্চাত্য দেশে আজ এক দিকে অর্থ শক্তি, অন্য দিকে ব্যক্তি-প্রাধান্যহীন লোক-করায়িত্ব আর্থিক ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে। কৃষি-শিল্প, ব্যবসা-বাণিজ্য সকল ক্ষেত্রে সমবায় অর্থনীতি বিশেষ প্রয়োজন।” আজ বাংলা দেশে সর্বত্র এই কথা সকলকে বুঝাইয়া দেওয়া প্রয়োজন। আমরা আশা করি, নূতন মন্ত্রী এ বিষয়ে প্রকৃত চেষ্টা করিয়া দেশের কল্যাণ বিধান করিবেন।

### বৈষ্ণব প্রত্নতত্ত্ব নিন্দা—

সম্প্রতি কলিকাতা কলেজ-স্কয়ারস্থ ধর্মসংস্কার সোসাইটি হল অধ্যাপক শ্রীধরেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয়ের সভাপতিত্বে রূপ সনাতন স্মৃতি সমিতির বার্ষিক অধিবেশনে এই মর্মে এক প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে—“পুরীধামে রথযাত্রা উপলক্ষে এ বৎসর উড়িষ্যা সরকার কর্তৃক প্রচারিত পুস্তিকায় মহাপ্রভু গৌরাঙ্গদেব প্রবর্তিত বৈষ্ণব ধর্মের প্রভাবে উড়িষ্যার অবনতি হইয়াছে—এইরূপ ঐতিহাসিক ও বৈষ্ণব ধর্মের মানিকর উক্তি প্রকাশিত হওয়ার এই সভা তাহার তীব্র প্রতিবাদ করিতেছে। ঐতিহাসিক প্রমাণে উড়িষ্যার ধর্ম, সংস্কৃতি, সাহিত্য ও শিল্পকলা শ্রীমন্ মহাপ্রভুর প্রেরণায় সংশোধিত বৈষ্ণবতা প্রসারের সহিত অবিচ্ছেদ্য। সমগ্র বৈষ্ণব সম্প্রদায় ঐ মন্তব্যের প্রত্যাহার দাবী করিতেছে।” —এই প্রস্তাব সম্বন্ধে মন্তব্য নিম্নরোজন। আমাদের বিশ্বাস, উড়িষ্যা সরকার নিজেদের জুল বুঝি কর্তব্য পালনে বিলম্ব করিবেন না।

### পাকিস্তানী আক্রমণ—

গত ৪ঠা আগষ্ট নয়াদিল্লীতে ভারতীয় পার্লামেন্টে পররাষ্ট্র দপ্তরের সহকারী মন্ত্রী শ্রীমন্ত কেশবকার বলিয়াছেন—গত ১লা এপ্রিলের পর হইতে এ পর্যন্ত পাকিস্তানীরা ভারতীয় সীমান্তের গ্রাম গুলিতে ৫৭ বার হানা দিয়াছে। ঐ সকল হানা সম্পর্কে পাকিস্তান সরকারের নিকট প্রতিবাদ করিয়া কোন উত্তর পাওনা যায় নাই। খবরটি চমৎকার—এক পক্ষ এইভাবে ক্রমাগত হানা দিতেছে আর এক পক্ষ দিল্লী-চুক্তি (নেহরু-লিয়াকৎ) রক্ষা করার জন্য আগ্রহী। কতদিন এই অবস্থা চলিবে? ইহার ফসল কিরূপ হইবে? সাধারণ মানুষ ইহা বুঝিতে অসমর্থ।



শ্রীক্ষেত্রনাথ রায়

হৃদয়বল্লভের চট্টোপাধ্যায়

### ফুটবল লীগ ৪

১৯৫০ সালের ক্যালকাটা ফুটবল লীগ প্রতিযোগিতার প্রথম বিভাগে ইস্টবেঙ্গল ক্লাব লীগ বিজয়ী হয়ে পর্যায়ক্রমে দু'বছর লীগ চ্যাম্পিয়ানসীপ লাভের গৌরব অর্জন করেছে। ইতিপূর্বে ১৯৪৫-৪৬ সালেও ইস্টবেঙ্গল ক্লাব পর্যায়ক্রমে দু'বার লীগ পায়। এ বছরের লীগ পাওয়ার বিশেষত্ব, তারা শেষ পর্যন্ত লীগের কোন খেলাতেই হার স্বীকার করেনি। খেলোয়াড় সংগ্রহ এবং দল গঠন ব্যাপারে ক্লাবের প্রচেষ্টা এবং দলগত সার্থ সার্থক হয়েছে। ভারতীয় ক্লাবের মধ্যে ১৯৪৮ সালে লীগে প্রথম অপরাজেয় রেকর্ড স্থাপন করে মহম্মেদান স্পোর্টিং ক্লাব। যে সময় মহম্মেদান স্পোর্টিং ক্লাব পর্যায়ক্রমে পাঁচবার লীগ চ্যাম্পিয়ান হয়ে লীগে নতুন রেকর্ড করেছে সে সময়ে তারা অপরাজেয় রেকর্ড স্থাপন করতে পারেনি। মহম্মেদান স্পোর্টিং ক্লাব এ পর্যন্ত ৮ বার লীগ পেয়েছে, গত দশ বছরের মধ্যে পেয়েছে তিনবার। এর মধ্যে ২ বার (১৯৪৬ এবং ১৯৪০) একটা ক'রে খেলায় তাদের হার হয়েছে। মহম্মেদান স্পোর্টিং লীগ বিজয়ী হয়ে সব থেকে বেশী হেরেছে পাঁচবার ১৯৩৮ সালে, যে বছর লীগে কাষ্টমস এবং মহম্মেদান স্পোর্টিংয়ের খেলায় সমান পয়েন্ট উঠে।

ইস্টবেঙ্গল ক্লাব এ পর্যন্ত লীগ পেয়েছে ৫ বার, গত দশ বছরের মধ্যে। প্রথম লীগ পায় ১৯৪২ সালে। মাত্র ১টা খেলায় হার হওয়ার জন্যে তারা তিনবার অপরাজেয় রেকর্ড করা থেকে বঞ্চিত হয়েছে। লীগ বিজয়ী হয়ে সব থেকে বেশী হেরেছে তিনবার ১৯৪৯ সালে।

মোহনবাগান এ পর্যন্ত লীগ পেয়েছে ৩ বার, গত দশ বছরের মধ্যে ২ বার। প্রথম পায় ১৯৩৯ সালে।

উপর্যুক্ত ২ বার লীগ পেয়েছে ১৯৪০-৪৪ সালে। মাত্র ১টা খেলায় হার হয়েছে ২ বার ১৯৩৯ এবং ১৯৪৩ সালে। ১৯৩৯ সালে মোহনবাগান হেরেছে ১-২ গোলে ভবানীপুরের কাছে এবং ১৯৪৩ সালে ০-১ গোলে ইস্টবেঙ্গলের কাছে।

আলোচ্য বছরের লীগের মোট খেলায় ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে কোন প্রশ্ন উঠে না যদিও কোন কোন খেলায় তারা দলের সুনাম অস্থায়ী না খেলতে পেয়ে খেলা ড্র করেছে অথবা জয়লাভ করেছে। লীগের কিরতি খেলায় মোহনবাগান, মহম্মেদান স্পোর্টিং এবং রাজহান এই তিনটি বড় দলের সঙ্গে খেলে ইস্টবেঙ্গল ক্লাব খেলা ড্র করেছে। লীগের কিরতি খেলায় তাদের মূল্যবান ১ পয়েন্ট নষ্ট হয়েছে ক্যালকাটার সঙ্গে।

এ বছরের লীগ চ্যাম্পিয়ানসীপ প্রতিযোগিতায় ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের সঙ্গে মোহনবাগান ক্লাবের খুব জোর প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলেছিল। ১৫ই জুলাই মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গল দলের কিরতি খেলায় আগে পর্যন্ত ইস্টবেঙ্গল দলের ২১টা খেলায় ৩৭ পয়েন্ট ছিল অপর দিকে মোহনবাগানের ছিল ১৯টা খেলায় ৩২ পয়েন্ট। মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গল দলের কিরতি খেলা ড্র বাওয়ার ফলে উভয়দলের খেলা এবং পয়েন্টের সঙ্গে এক ক'রে যোগ হয়। মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গলদলের কিরতি খেলায় কলাকলয়ের উপর উভয় দলের লীগ চ্যাম্পিয়ানসীপের যে ভাগ্য নির্ভর করছিল খেলাটি ড্র বাওয়ার ফলে ইস্টবেঙ্গল দলের কিছুটা সুবিধা হয়। তবে মোহনবাগানের সমস্ত আশা একেবারে নষ্ট হয় নি। কারণ উভয় দলের অনেকগুলি গুরুত্বপূর্ণ খেলা তখনও বাকি ছিল। স্পোর্টিং ইউনিয়ন



দলের সঙ্গে খেলা ডু ক'রে লীগ চ্যাম্পিয়ানসীপের পাজা থেকে মোহনবাগান শিহিরে পড়ে, ইস্টবেঙ্গল ক্লাব কিছুটা নিরাপদ স্থানে উঠে যায়। এরপর মোহনবাগান অকস্মাৎ এরিয়ালসের কাছে ১-০ গোলে হেরে যায়। প্রথম খেলার মোহনবাগান ৪-০ গোলে এরিয়ালসকে হারিয়েছিল। এই পরাজয়ের কলে ইস্টবেঙ্গল ক্লাব নাগালের বাইরে চলে যায়। লীগ চ্যাম্পিয়ানসীপের প্রসঙ্গ বাদ দিয়ে তখন মোহনবাগান ও রাজস্থানের মধ্যে কে লীগে রাণাস আপ হবে এ গবেষণা মাঠে চলতে লাগলো। উভয়ের তখন ২৪টা খেলায় সমান ৩৬ পয়েন্ট। অপর দিকে বেশী খেলে ইস্টবেঙ্গলের ৪২। রাজস্থানকে ২-০ গোলে হারিয়ে মোহনবাগান যে ২ পয়েন্টে এগিয়ে গেল পরবর্তী খেলায় ই আই রেলদলের কাছে ০-২ গোলে হেরে আবার রাজস্থানের সমান পয়েন্টে নেমে এলো। ২০শে জুলাই বৃহস্পতিবার মোহনবাগান-স্পোর্টিং ইউনিয়নের খেলা ডু যায় এবং সেই সময় থেকেই মোহনবাগানের ভাগ্য বিড়ম্বনা আরম্ভ হয়েছে। দলের খেলোয়াড়দের অসুস্থতা এবং আঘাত শেখের দিকে লেগেই আছে। ২টো হার এরিয়ালস এবং ই আই আর রেল দলের কাছে সত্যি জোড়া মহলে বিশ্বয়ের সৃষ্টি করেছে।

বাকালী খেলোয়াড় নিয়ে তৈরী স্পোর্টিং ইউনিয়ন, এরিয়ালস, কালীঘাট এবং জর্জটেলিগ্রাফের খেলার কথা গতবার বলেছি। কিরতি খেলায় উল্লেখযোগ্য ঘটনা স্পোর্টিং ইউনিয়ন ডু করেছে মোহনবাগানের সঙ্গে এবং হারিয়েছে রাজস্থানকে। লীগে তারা ৪র্থ স্থানে আছে। এরিয়ালস হারিয়েছে মোহনবাগানকে। কালীঘাট ১-০ গোলে হারিয়ে দেয় মহম্মদান স্পোর্টিংকে।

বি এন রেল দলের কাছে রাজস্থানের পরাজয় এবারের খেলার মাঠে আর এক বিশ্বয়। ক্যালকাটা গ্যারিসন ৪-১ গোলে ই আই রেল দলকে হারায় এবং ২-০ গোলে এরিয়ালসকে ক্যালকাটা ক্লাব হারিয়ে শেষ পর্যন্ত লীগের শেষ ধাপেই রইলো। ক্যালকাটা গ্যারিসন লীগের শেষের দিকে ভাঙ্গা টিম জোড়া লাগিয়ে বেশ খেলেছে। এবার লীগের কিরতি খেলায় ক্যালকাটাকে ৭-২ গোলে হারিয়ে সব থেকে বেশী গোল দিয়ে জয়লাভের কৃতিত্ব অর্জন করেছে ভবানীপুর ক্লাব। ভবানীপুরের রঞ্জিৎ সিং একাই

৫টি গোল করেন। একটি খেলার ব্যক্তিগতভাবে কোন খেলোয়াড় এত বেশী গোল এ বছর প্রথম বিভাগের লীগে করতে পারে নি।

**টেস্ট ক্রিকেট :**

**ইংলণ্ড : ওয়েস্ট ইন্ডিজ**

**ইংলণ্ড : ২২৩ ও ৪২৬**

**ওয়েস্ট ইন্ডিজ : ৫৫৮ ও ১০৩ (কোন উইকেট না হারিয়ে)**

ইংলণ্ড-ওয়েস্ট ইন্ডিজদলের তৃতীয় টেস্ট ম্যাচ খেলায় ওয়েস্ট ইন্ডিজ ১০ রাণে ইংলণ্ডকে পরাজিত করেছে। প্রথম টেস্ট ম্যাচে ইংলণ্ড জয়ী হয়। দ্বিতীয় এবং তৃতীয় টেস্ট ম্যাচে ওয়েস্ট ইন্ডিজ জয়লাভ করার তারা ২-১ ম্যাচে এগিয়ে রইলো। চতুর্থ টেস্ট ম্যাচ খেলার ফলাফলের উপরই উভয়দলের 'রাবার' করছে। চতুর্থ ম্যাচটি অন্ততঃ ড্র গেলেও ওয়েস্ট ইন্ডিজ 'রাবার' পাবে।

ইংলণ্ড টেস জিতে প্রথমে ব্যাট করে। এক ঘণ্টার খেলায় মাত্র ২৫ রাণে ৪টা উইকেট পড়ে যায়। অসুস্থতার জন্তে হাটিন এবং গিমস্রেট দলে যোগদান করতে পারেন নি। ওয়েস্ট ইন্ডিজের জোন্সের যায়গায় জনসন খেলতে নামেন। ২২৩ রাণে ইংলণ্ডের ১ম ইনিংস শেষ হয়। ডি স্ত্রাকলটন দলের সর্বোচ্চ ৪২ রাণ করেন। ইয়ার্ডলে করেন ৪১। জনসন এবং ওয়েল ৩টে করে উইকেট পান। রামাধীন এবং জ্যালেনটাইন পান ২টো ক'রে। প্রথম দিনের খেলার নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ওয়েস্ট ইন্ডিজ দল ১ উইকেটে ৭৭ রাণ করে।

খেলার দ্বিতীয় দিনের নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ওয়েস্ট ইন্ডিজ সারাদিন পিটিয়ে খেলে মাত্র ৩ উইকেটে ৪৭৯ রাণ তুলে। ওয়েল ২৩৯ রাণ এবং উইকস ১০৮ রাণ করে নট আউট থাকেন। রে এবং টলমেনয়ারের যথাক্রমে ৬৮ এবং ৪৬ রাণ উল্লেখযোগ্য। ওয়েল নট আউট ২৩৯ রাণ করায় ১৯৬৮ সালে ট্রেট ব্রীজ গ্রাউণ্ডে প্রতিষ্ঠিত এস ম্যাককবের ২৩২ রাণের রেকর্ড ভেঙ্গে যায়। ইতিপূর্বে ট্রেট ব্রীজ গ্রাউণ্ডে কোন দেশের খেলোয়াড়ই ওয়েলের সমান রাণ তুলতে পারে নি। ১৯১৯ সালে প্রতিষ্ঠিত হাটিনের ১৯৬ রাণ এতদিন ইংলণ্ডে অস্বীকৃত ইংলণ্ড-ওয়েস্ট ইন্ডিজ টেস্ট সিরিজের সর্বোচ্চ ব্যক্তিগত রাণ ছিল। ওয়েল সে রাণের

রেকর্ডও ভেঙ্গে ফেলেন। ঐ দিন ওরেল এবং উইকসের জুটিতে যে রাণ উঠলো। ওয়েস্টইন্ডিজ দলের পক্ষে যে কোন উইকেটের যে সর্বোচ্চ ২২৮ রাণের (১৯২৯ সালের এম হেডলে এবং আর হুলেন্স কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত) রেকর্ড ছিল তাও ভেঙ্গে গেল। ওরেলের খেলা দর্শকদের মুগ্ধ করে। তিনি ১টা ওভার বাউণ্ডারী করেন এবং 'চার' ১৪টা। খেলার তৃতীয় দিনে ওয়েস্টইন্ডিজ দলের পূর্ব দিনের রাণের সঙ্গে ৭৯ রাণ যোগ হ'লে পর তাদের ১ম ইনিংসের খেলা শেষ হয়ে যায়। ওরেল ২৬১ রাণ করেন। ওরেলের এই ২৬১ রাণ হ'ল ইংলণ্ডে অদ্বিতীয় ইংলণ্ড—ওয়েস্ট ইন্ডিজ টেস্ট সিরিজের উভয় দলের মধ্যে ব্যক্তিগত সর্বোচ্চ রাণ। এই রাণ তুলতে ৫ ঘণ্টা ৩৫ মিনিট সময় লাগে। রাণে ৩৫টা বাউণ্ডারী এবং ২টো ওভার বাউণ্ডারী ছিল। ৩০,০০০ হাজার দর্শক (সভারাত্ত) দাঁড়িয়ে উঠে ওরেলকে সম্ভাষণ জানায় এবং মাঠ থেকে প্যাভিলিয়ন পর্যন্ত ওরেলকে হাততালি এবং জয়-ধ্বনি দিয়ে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করেন। ওরেল তাঁর ২৬১ রাণের মাধ্যম বেডসারের ইনসুইং বল লেগে জোর পিটিয়ে মারেন। বলটা সজোরে গিয়ে ইংলণ্ডের ক্যাপটেন ইয়ার্ডলের হাতে পড়ে; ইয়ার্ডলে দ্বিতীয়বারের চেষ্টায় তবে ওরেলের বলটা হাতে ঝুগাতে পারেন। ওরেল এবং উইকসের চতুর্থ উইকেটের জুটিতে ২৮৩ রাণ উঠে। এই ২৮৩ রাণ ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলের পক্ষে যে কোন উইকেটের সর্বোচ্চ রাণ হিসাবে রেকর্ড হয়েছে। উইকস ৩ ঘণ্টা ৪০ মিনিটে ১২৯ রাণ তুলে আউট হন। মোট ১৮টা বাউণ্ডারী করেন। ওয়েস্ট ইন্ডিজদের প্রথম ইনিংসের এই ৫৫৮ রাণ ইংলণ্ডের বিপক্ষে তাদের দলের সর্বোচ্চ রাণ হিসাবে রেকর্ড হয়েছে। খেলার তৃতীয় দিনে ওয়েস্ট ইন্ডিজের সাতটা উইকেট ৮০ মিনিটের মধ্যে ৭৯ রাণে পড়ে যায়। ইংলণ্ডের বেডসার একাই ঐদিন ৩৬ রাণে ৫টা উইকেট পান।

ওয়েস্ট ইন্ডিজের থেকে ৩৩৫ রাণ পিছনে পড়ে থেকে ইংলণ্ড খেলার তৃতীয় দিনের বেলা ১টার পর দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা আরম্ভ করে। লাঙ্কের সময় খুব জোর বৃষ্টি পড়তে থাকে এবং খেলা পুনরারম্ভ হ'তে ১৫ মিনিট দেরী হয়। লাঙ্কের সময় ইংলণ্ডের কোন উইকেট না পড়ে ৮ রাণ উঠে। চা-পানের সময় বৃষ্টির জন্তে খেলা বেশ কিছুকণ

বন্ধ রেখে খেলোয়াড়রা প্যাভিলিয়নে আশ্রয় নিতে বাধ্য হন। চা-পানের সময় কোন উইকেট না পড়ে ইংলণ্ডের ৪৯ রাণ উঠে। বৃষ্টির জন্তে খেলার পীচের অবস্থা খুবই শোচনীয় হয়ে পড়ে; জনসন একবার বল দিতে গিয়ে একেবারে কুপোকাং হয়ে পড়েন এবং বাঁ কাঁধে আঘাত পান। তৃতীয় দিনের নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ইংলণ্ডের কোন উইকেট না পড়ে স্কোর বোর্ডে ৮৭ রাণ উঠতে দেখা যায়।

চতুর্থ দিনের খেলায় ইংলণ্ডের ওপনিং ব্যাটসমেন সিম্পসন এবং ওয়াসক্রফ যথাক্রমে ৯৪ এবং ১০২ রাণ করে প্রথম উইকেটের জুটিতে ২১২ রাণ করেন। ইংলণ্ড—ওয়েস্ট ইন্ডিজের টেস্ট ম্যাচে এই ২১২ রাণ (ওয়াসক্রফ ১০২ এবং সিম্পসন ৯৪) প্রথম উইকেটের রেকর্ড হয়েছে। লাঙ্কের সময় ইংলণ্ডের কোন উইকেট না পড়ে ১৬৮ রাণ উঠে। চতুর্থ দিনের নির্দিষ্ট সময়ে ইংলণ্ডের ৫ উইকেট পড়ে গিয়ে ৩৫০ রাণ উঠে। পার্কহাউস ৬৯ রাণ এবং ডিউজের নট আউট ৫৫ রাণ উল্লেখযোগ্য।

টেস্ট খেলার পঞ্চম দিনে অর্থাৎ শেষ দিনে ইংলণ্ড সময় এবং ওয়েস্ট ইন্ডিজের স্পিন বোলার রামাধীন এবং ভ্যালেনটাইনের বিপক্ষে প্রচণ্ড মনোবল নিয়ে খেলজে নামলো, হাতে পাঁচটা উইকেট। তিন হাজার দর্শক অধীর আগ্রহে ক্রিকেট খেলায় ইংলণ্ডের মান ইজ্জত রাখার খেলা দেখতে লাগলো। ৮৬ রাণে ইংলণ্ডের বাকি পাঁচটা উইকেট পড়ে গেলে ২য় ইনিংস ৪৩৬ রাণে শেষ হয়ে যায়। ডিউজ এবং ইভেন্স যথাক্রমে ৬৭ এবং ৬৩ রাণ করেন। রামাধীন খেলার শেষ দিনে ৩টে উইকেট পান; মোট ৫টা উইকেট পান ১৩৫ রাণে। এরপর ভ্যালেনটাইনের ৩টে ১৪০ রাণে। লাঙ্কের পর ওয়েস্ট ইন্ডিজের রে (৪৬) এবং টল-মেরার (৫২) ২য় ইনিংসের খেলা আরম্ভ করে জয়লাভের প্রয়োজনীয় ১০২ রাণ তুলেন। কোন উইকেট না হারিয়ে ওয়েস্ট ইন্ডিজের ২য় ইনিংসে ১০৩ রাণ উঠলে ওয়েস্ট ইন্ডিজ ১০ উইকেটে জয়ী হয়।

### জুলেন্স স্ক্রিমেন্ট কাপ ৪

রিও ডি জেনিরোর (ব্রেজিল) অদ্বিতীয় 'জুলেন্স স্ক্রিমেন্ট ওয়ালাও সোকার কাপ' প্রতিযোগিতার ফাইনালে উরুগোয়া ২-১ গোলে শক্তিশালী ব্রেজিল একাদশ দলকে হারিয়ে সারা পৃথিবীর ফুটবল ক্রীড়াঙ্গণতে বিশ্বের সাক্ষা

এনে দিয়েছে। খেলার এই ফলাফলে মাঠে উপস্থিত ২০০,০০০ লক্ষ ব্রেজিলবাসী (মর্শক সংখ্যায় হিসাবে পৃথিবীর রেকর্ড) হতবাক হয়ে পড়ে। খেলার বিবরণ বিনি রেডিও যোগে বিতরণ করছিলেন তিনিও শেষ পর্যন্ত স্পেন-সুইডেনের অপর খেলার খবরটির ফলাফল ঘোষণা করতে ভুলে গিয়েছিলেন। ব্রেজিলদলের খেলোয়াড়রা পরাজয়ে মুহমান হয়ে অবনত মস্তকে ধীরপদে মাঠ পরিত্যাগ করেন। ফ্রান্সের এম জুলেস রিমেট (বিনি এই কাপটি দান করেছেন) বিজয়ীদলকে নিম্ন হাতে কাপটি প্রদান করেন। জয়লাভের জন্তে বিজয়ী দলের খেলোয়াড়রা স্বর্ণপদক ছাড়া এক হাজার পাউণ্ড বোনাস পায়।

### ফুটবল খেলার সমস্যা ৩

খেলাধুলায় অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করা কোন দল বা ব্যক্তিগত খেলোয়াড়ের পক্ষে মস্ত বড় লাভ। খেলায় দোষ ত্রুটি আবিষ্কার করা বা অপর কোন শক্তিশালী খেলোয়াড়ের ক্রীড়ানৈপুণ্য এবং খেলার বৈশিষ্টগুলি আয়ত্ত্ব করার পক্ষে একমাত্র শ্রেষ্ঠ উপায় হ'ল খেলার জয়-পরাজয়ের চিন্তা মন থেকে দূর ক'রে প্রতিযোগিতায় যোগদান করা। জীবনে যারা অসাক্ষ্য এবং পরাজয়ের ভুঁকি নিতে সাহসী হ'ন তাঁরাই পরে সাক্ষ্য এবং প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারেন। জীবনে সাক্ষ্যলাভ যাদের লক্ষ্যবস্ত তাঁরা অসাক্ষ্য এবং পরাজয়ে হতাশ হ'ন না। পরাজয় যাদের জীবনে বিভীষিকা এবং পরাজয়কে যারা জীবনে অত্যন্ত হীনতা মনে করেন তাঁরা স্বভাবতই নিজস্ব পরমুখাপেক্ষী অথবা আত্মপ্রবঞ্চক হ'ন। বাংলা দেশের বর্তমান ফুটবল খেলার অবস্থাটা ঠিক এই পর্যায়ে দাঁড়িয়েছে। ক'লকাতার কোন কোন নামকরা ক্লাব খেলার জয়লাভ ক'রে লীগ-শীল্ড পাওয়াটা বড় মনে করে। ফলে খেলার পরাজয় দলের পক্ষে তথা সমর্থকদের পক্ষে মস্ত বড় অক্ষমতা এবং হীনতা মনে করা হয়। কোন কোন নামকরা ফুটবল ক্লাবের কর্তৃপক্ষ স্থানীয় খেলোয়াড়দের উপর আস্থা না রেখে ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আমদানী করা খেলোয়াড়দের উপর বেশী আস্থা রাখেন। তার কারণ, স্থানীয় খেলোয়াড়দের উপর নির্ভর করতে গেলে লীগ-শীল্ড খেলার অনেক বেশী ভুঁকি নিতে হয় এবং দলের পক্ষে সাক্ষ্যলাভ সমরসাপেক্ষ

ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। এদিকে স্থানীয় সমর্থকরাও পরিচালনার দলগত এবং ব্যক্তিগত প্রভাব বজায় রাখতে হলে ক্লাবের সমর্থকদের হাতে রাখা দরকার। ক্লাবের সমর্থকদল চায় লীগ-শীল্ড এবং খেলার বিবিধ রেকর্ড; দলগত নামের উগ্রতা এবং ব্যক্তিগত স্বার্থবোধ সত্য এবং সমর্থকদের মধ্যে এতখানি বেশী যে, তাঁদের মধ্যে জাতীয়তাবোধের একান্ত অভাব দেখা যায়। ফলে যে বছরের পরিচালক মণ্ডলীর ব্যবস্থাপনায় দল লীগ বা শীল্ড পায়, পরবর্তী বাৎসরিক নির্বাচনের সময় সেই দলই সভ্যগণের বিপুলভাবে সমর্থন লাভ করে। দল গঠনের এই নীতি দ্বারা ব্যক্তিগত এবং দলগত স্বার্থ অক্ষুণ্ণ রেখে দলের সত্য এবং সমর্থকদের উপর বেশী দিন প্রভাব বিস্তার করা যায় বটে কিন্তু এ নীতি জাতীয় স্বার্থের পরিপন্থী এবং আত্মপ্রবঞ্চনার সমতুল্য।

বাইরের খেলোয়াড়রা নিছক ফুটবল খেলার আকর্ষণেই কি স্বদেশ, আত্মীয় স্বজন ছেড়ে ক'লকাতার খেলতে আসেন? বর্তমান বাস্তব জগতের অর্ধ-নৈতিক পটভূমিকায় ক্লজ-রোজগারের চিন্তা উপেক্ষা ক'রে একমাত্র খেলার প্রেরণায় এমনভাবে যে কেউ নিজেই উৎসর্গ করতে পারে তা ধারণার অতীত। এগন কিছু একটা বড় আকর্ষণ আছে যার জন্তে তাঁরা নিজ দেশের ফুটবল খেলায় যোগদান করার মত পবিত্র কর্তব্যবোধ থেকেও নিজেদের দূরে সরিয়ে রেখে কর্তব্যচ্যুত হ'তে সক্ষম হ'তে পারেন না। সে আকর্ষণ গোপনীয় হলেও ক্রীড়া-মহলে অজাত নয়। ফুটবল খেলার সরস্বতী শেখ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অথবা প্রতিযোগিতার দলের পরাজয় ঘটলেই এঁদের প্রয়োজন কুরিয়ে যায়। এঁদের বেশীর ভাগ স্বদেশে ফিরে যায়। এইভাবে এঁদের তাড়াটে খেলোয়াড়দের মত না খেলিয়ে বাঙ্গালী খেলোয়াড়দের ফুটবল খেলা শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে যদি এঁদের দলভুক্ত করা হ'ত তাহলে কোন অভিযোগ থাকে না। আর পনের বছর ধরে অব্যাহত ফুটবল খেলোয়াড়দের ক'লকাতার আমদানী অব্যাহত গতিতে চলেছে কিন্তু তাঁদের খেলিয়ে দলের লীগ ও শীল্ড পাওয়া ছাড়া বাঙ্গালী জাতির কোন গঠনমূলক উদ্দেশ্য সাধিত হয়েছে কি? বাঙ্গালী খেলোয়াড়দের উপর ক্লাব কর্তৃপক্ষ আস্থা রাখতে পারেন

না কারণ অনেকগুলি ক্লাবের পক্ষে বাছা বাছা নামকরা বাঙ্গালী খেলোয়াড় পাওয়া যুক্তি অত্যাধিক তাঁরা যে সহজ পথটা আবিষ্কার করেছেন সেটা বাইর থেকে খেলোয়াড় আমদানী করে দলগঠন করা। লীগ-শীল্ড পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা মোটেই দোষনীয় নয় কিন্তু উৎকট নেশায় জাতীয় স্বার্থবলি দিয়ে বধনই জয়লাভের বাহাদুরী দেখানো হয় তখনই দোষনীয়। বাঙ্গালী খেলোয়াড়দের উপযুক্ত ফুটবল খেলা শিক্ষা দিয়ে দলে খেলানোই দেশের প্রকৃত গঠনমূলক কাজ। কোন কোন নামকরা সঙ্গত সম্পন্ন ক্লাবের প্রধান কাজ হ'ল বাহির থেকে বাছাই করা খেলোয়াড় ফাঁদ পেতে ধরে আনা, খেলোয়াড় তৈরী করা নয়। খেলোয়াড় সংগ্রহের সঙ্গে যদি খেলোয়াড়দের খেলা শিক্ষা দেওয়ার উপযুক্ত ব্যবস্থা থাকে তাহলে সমালোচনার মুখ অনেকটা বন্ধ হয়।

ইংলণ্ডে বিদেশ থেকে খেলোয়াড় আমদানী করার প্রথা চালু আছে এবং এদেশের থেকে বরং অনেক বেশী। এইতো আমাদের দেশের লালা অমর নাথ, ভিন্নু মানকড়, উমরী গড় প্রভৃতি নামকরা ক্রিকেট খেলোয়াড়রা উপযুক্ত অর্থের বিনিময়ে সেখানের বিভিন্ন দলে ক্রিকেট খেলছেন। এখানকার সঙ্গে তর্কাৎ এই, সেখানে এই খেলোয়াড় আমদানী নীতির ফলে স্থানীয় খেলোয়াড়দের খেলার যোগদানের সুবিধা থেকে বঞ্চিত করেনা এবং খেলার ষ্ট্যাণ্ডার্ড নিয়গামীও হয় না। কারণ ইংরেজ চরিত্রে অপরদিকে একটি গঠনমূলক শক্তি সদা জাগ্রত রয়েছে। বিদেশী খেলোয়াড়দের ক্রীড়ানৈপুণ্যে দর্শকেরা কেবল মুগ্ধ হয়ে চিত্ত বিনোদন করে না, এই শক্তিরই স্থানীয় দর্শকদের বিদেশী খেলোয়াড়দের কাছ থেকে বা কিছু শিকণীয় এবং অভিনবতা আনয়ন করতে অগ্রপ্রেরিত করে। নিছক খেলার সাক্ষরলাভ অথবা খেলা দেখে

চিত্ত-বিনোদনের উদ্দেশ্যে সেদেশে খেলোয়াড় আমদানী করা হয় না। এখানে খেলার মধ্যে আমরা খেলোয়াড় এবং দর্শকদের অখেলোয়াড়োচিত কাজে যে উৎসাহ এবং নির্নিপুণতাব লক্ষ্য করি তার মূলে আছে বহুদিনের পুঞ্জীভূত অবিচার এবং অসন্তোষ। এমন কি প্রধান প্রধান ফুটবল প্রতিষ্ঠানগুলি এবং আই এফ এ নিজেও দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন নয় বলেই দর্শকদের মধ্যে বিক্ষোভ দিন দিন বেড়ে চলেছে। কেবল খবরের কাগজে বিবৃতি দিয়ে অথবা কঠোর সমালোচনা এবং পুলিশের পাহারা দিয়ে খেলার মাঠের স্বাভাবিক আবহাওয়া রাখা যায় না। দর্শকদের মনে শুভবুদ্ধি উদ্বোধনের জন্তে আমাদেরও যথেষ্ট কর্তব্য আছে। ক্লাব কর্তৃপক্ষ এবং আই এফ এ-র কর্তৃকগুলি গঠনমূলক কাজের উপরই দর্শক এবং খেলোয়াড়দের যে শুভবুদ্ধি নির্ভর করছে, দুঃখের বিষয় এটা তাঁরা কেউ চিন্তা ক'রে সেইমত গঠনমূলক কাজে উৎসাহ দেখান না। আই এফ এ, বিভিন্ন ক্লাব কর্তৃপক্ষ, খেলোয়াড়, দর্শক, সংবাদ ও সাময়িক পত্রিকার সমবেত চেষ্টায় এবং পারস্পরিক সহযোগিতা ভিন্ন খেলাধুলার উদ্দেশ্যে সার্থক হতে পারে না। বাঙ্গালী জাতি আজ এক চরম জাতীয় সঙ্কটের সম্মুখীন হয়েছে। আজ আমাদের একান্ত দরকার ধৈর্য, সাহস, একতা এবং শুভবুদ্ধি। খেলার মাঠে যে উচ্ছৃঙ্খলতার তাণ্ডব নৃত্য সুরু হয়েছে তার প্রভাব আমাদের জাতীয় নৈতিক চরিত্রকে কলুষিত করে সর্বনাশের মুখে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে; এখনও যদি আমরা কর্তব্য সম্বন্ধে অবহিত না হই তাহলে আমাদের কপালে আরও অনেক ছুর্তোগ আছে। জাতই যদি এভাবে মরণের মুখে এগিয়ে যায় তাহ'লে সাহিত্য, শিল্প, সঙ্গীত, ভাল ভাল তথ্যকথা এবং লীগ-শীল্ড পাওয়ার গৌরব কাদের জন্তে?



## নব-প্রকাশিত পুস্তকাবলী

ঐশ্বরীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এণীত উপভাস “বৌদ্ধের অভিযান”—২৬।

ঐশেন্দ্রনাথ গুহরায় এণীত নাটক “ভাঙ্গন কুল”—২৭।

ঐনেন্দ্রনাথ সরকার সম্পাদিত “বর্ষ-বীপ্তি” (১৩৫৭)—৩৪।

ঐকিরণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এণীত কাব্য “Voice of Silence”—৪।

কল্যাণকুমার মুখোপাধ্যায় এণীত কাব্য “মুগের কাব্য”—১১।

নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত এণীত “এক বিধান”—৭।

ঐহরপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য এণীত “চতুঃসৌক্য ভাগবত”—২৪।

ঐহুগাংগকান্ত আচার্য্য এণীত শিকার-কাহিনী “আমাদের জঙ্গলে”—৪।

বরেন বহু এণীত “জলী তিরেংনাথ”—১।

ঐসৌরীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এণীত উপভাস “কুটিল কুল”—২১।

শরৎ-সাহিত্য ভবন প্রকাশিত “পুরুষ ও একুতি বা রতি শাস্ত্র”—১৭।

“নতুন-পাণ্ডুরা প্রিয়া বা প্রেমপত্র”—১১।

ঐহুগাংগনাথ রাহা এণীত শিশুপাঠ্য উপভাস “বিভালগরে বাঘল”—১১।

“এ টেল অব্‌ টু সিটিজ”—১১।

ঐমুগেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত সংকলিত “নীতারাম”—১১।

ঐযোগেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এণীত জীবনীগ্রন্থ “বিদ্যবী শরৎচন্দ্র বহু”—১।

কৃষ্ণগোপাল ভট্টাচার্য্য এণীত উপভাস “ভ্রমরী”—৩১।

বাবী তৈরবানন্দ এণীত মর্শন-আলোচনা “বহুরূপে সমুদ্রে তোমার”—২৪।

## এইচ-এম্-ভি বাংলা রেকর্ড—আগষ্ট ১৯৫০

N 31240—অগ্নিযুগের গুরু, সাধকশ্রেষ্ঠ ঐঅরবিন্দের চরণে অন্তরের গভীর উচ্চাস এই ঐঅরবিন্দ এণিত। লালগোলারাঙ্গ এটি রচনা করেছেন, আরুতিও নিজেই করেছেন—গীতাংশে যোগ দিয়েছেন লক্ষ্যপ্রতিষ্ঠা শিল্পী অগ্নয়য়। N 31241—যে কঠিন সংগ্রামের পর ভারতবর্ষ স্বাধীনতা লাভ করেছে, তার চেয়েও কঠিন বেদনারসিক সংগ্রামের পথে তাকে আত্মত্যাগ করতে হবে। শতাব্দীর সঞ্চিত আবর্জনাকে পুড়িয়ে ফেলতে বাইরের কেউ তাকে সাহায্য করবে না। হু-সাহিত্যিক মৃণেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় রচিত “স্বাধীনতার স্মরণে” তারই ইংলীত রয়েছে। N 31242—শিল্পী সত্য চৌধুরীর দরদী কণ্ঠে ছুঁখানি ভঙ্গন গীতি বিশেষ সময় উপযোগী হয়েছে। গান দুটি রচনা করেছেন বিজ্ঞানী কবি নজরুল। N 31243—অশোক বন্দ্যোপাধ্যায় ছুঁখানি আধুনিক গান পরিবেশন করেছেন, যার হু সংযোগ করেছেন জমশ্রিয় শিল্পী হেমন্ত মুখোপাধ্যায়। N 31244—ঐমতী কল্যাণী সমুদ্রদ্বারের “একি বেদনার হার” ও “আবেশে পরাণ কাঁপে” আধুনিক গান ছুঁখানি শিল্পীর ভাবপ্রবণ কণ্ঠের অমূল্যত্ব। N 31245—হুমায়ী মাধবী ঘোষের কণ্ঠের আধুনিক গান। N 31246—শৈলেশ রায় ও অমর দত্তের বাঁশী ও ম্যাণ্ডোলিনের যন্ত্র-গীতি জনপ্রিয় হিন্দী বাগী চিত্র ‘প্যার কি জিৎ’এর ছুঁখানি গানকে মূর্ত করে তুলেছে। N 31230—রেকর্ডে রঞ্জিত রায় ও তাঁর সম্পাদকের পাণ্ডুরা ছুঁখানি গান বিশেষ উপভোগ্য।

## বিশেষ দ্রষ্টব্য

পূজার ভারতবর্ষ—শ্রীমান দীপ্তা পূজা উপলক্ষ্যে আগামী আশ্বিন সংখ্যা

“ভারতবর্ষ” ভাদ্রের ৩য় সংখ্যাহে এবং কাণ্টিক সংখ্যা আশ্বিনের দ্বিতীয় সংখ্যাহে প্রকাশিত হইবে। বিজ্ঞাপনদাতাগণ অনুগ্রহপূর্বক এই ভাদ্রের মধ্যে আশ্বিনের এবং ২৮শে ভাদ্রের মধ্যে কাণ্টিকের বিজ্ঞাপনের কপি পাঠাইবেন। নির্দিষ্ট তারিখের মধ্যে পাঠুলিখি না পাঠিলে বিজ্ঞাপন ছাপা না হইবার সম্ভাবনা।

কার্যাব্যয়ক—ভারতবর্ষ

## পাকিস্তানস্থ গ্রাহকদের জন্য বিজ্ঞপ্তি

আমাদের পাকিস্তানস্থ গ্রাহকগণের মধ্যে বীহারী আমাদের কার্যালয়ে “ভারতবর্ষ”—এর টাকা পাঠাইতে বা জমা দিতে অনুরোধ করা যাকেন, তাঁহারা অতঃপর ইচ্ছা করিলে ঠিকানা ও গ্রাহকনম্বর উল্লেখপূর্বক The Asutosh Library, 78-6, Lyall Street, Dacca, East Pakistan—নির্দিষ্ট টাকা পাঠাইতে বা জমা দিতে পারেন। নূতন গ্রাহকগণ টাকা জমা দিবার সময় “নূতন গ্রাহক” কথাটি উল্লেখ করিবেন। ইতি— বিনীত

কার্যাব্যয়ক—ভারতবর্ষ

## সম্পাদক—ঐকরীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম-এ

২০৩/১১/১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রিট, কলিকাতা, ভারতবর্ষ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্‌ হইতে ঐগোবিন্দপদ ভট্টাচার্য্য কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত



ନିର୍ମଳୀ—ଶ୍ରୀଦେବୀ ଯମାଳ ସାମନ୍ତସିଂହାରୀ

କାମଦାସୀ ଗୋପିନୀ

ଭାରତୀୟ ଇତିହାସ ଓ ଗାଳ୍ପ





মেলা

একেবারে ভুলি দিয়া আঁকা

শিল্পী—শ্রীদেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী



আশ্বিন-১৩৫৭

প্রথম খণ্ড

অষ্টত্রিংশ বর্ষ

চতুর্থ সংখ্যা

বুদ্ধের শরণে

শ্রীস্বধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

উত্তমদেন বন্দেহং পাদপংসু বরুত্তমং  
বুদ্ধো যো খলিতো দোসো বুদ্ধো ধমতু তং মম।  
নমো বুদ্ধায় গুরুবে  
ধর্মায় তারণে  
সজ্জায় মহত্তমায় চ।

জন্মমৃত্যুর চাকায় ঘুরতে ঘুরতে মানুষ পৃথিবীতে আসে, ছক্-কাটা পরিধির ধারে ধারে জীবনের গোনা দিনগুলি কাটিয়ে দেয়। হাসি কান্না, সুখ দুঃখ, ওঠা পড়া, ভাড়া-গড়ার মধ্য দিয়ে চিরন্তনীর রথ চলে। তারই ভিতর অতিক্রমে একদিন নিত্যকালের সত্যমায়া জেগে ওঠে, যে মানুষকে মাথা বায় না, যে মানুষ অপরিমেয়, যে মানুষ অপরাহ্নের, যে মানুষের উপর বিশ্বাস হারানো পাপ, যে মানুষ জাতবিজ্ঞোহী, অনবনমিতশির, নিঃশব্দবিজ্ঞোহী, মরণকে যে মানেনা, পরাভবকে যে ভরে না—ঈশানীন,

জ্ঞানহীন, পরিপূর্ণপ্রাণ, বীৰ্যবান, যে মানুষ নিজেকে নিজেকে সৃষ্টি করেনেয়, স তহোপতপাৎ, যে মানুষ রাজির তপস্রায় বসে উদয় দিগন্তের সন্ধানে। চলোন্নি ইতিহাসের ত্রিশোতা যখনই অবরুদ্ধ হয়, পঙ্কিল হয়, জটিল জটাজালে জড়িত হয়, আবার বিচার বাহ্যাহুষ্ঠানের অচলায়তনে নির্বিষ নিবীৰ্য হয়ে ওঠে, তখনই যুগে যুগে ধর্মজীর শত পতিত অবজ্ঞাত অধ্যাতকে প্রাণের পাবন শিখায় জলন্ত করে তোলবার জন্ত আবির্ভূত হন দেবতার দীপ হাতে মহামানবরা—‘সম্ভবামি যুগে যুগে’—দিকে দিকে রোমাঞ্চ লাগে মর্ত্যধূলির বাসে বাসে—ঐ মহামানব আসে’। তাঁরা নিয়ে আসেন মুক্ত দীপ্ত দৃষ্ট জীবনের সন্ধান, মহতী আশার বাণী—কানে দেন অস্তর অশোক মন্ত্র। পৃথিবীতে দেবদত্তের মত লোকের অভাব নেই। সামান্ত পাখীও তাদের তুণীরের তীর থেকে রক্ষা পায় না। পথে বাটে

আছে জরাগ্রস্ত ও জরতীরা, কত আতুর ধঞ্জ রুগ্ন, তপ্ত, আর্ত, ক্লান্ত—দিনে দিনে মানুষ চলেছে মৃত্যুর গহবরে। কেউ সম্রাসী হয়, কেউ মরে, কেউ পালায়—কোথায় থাকে তার মান অভিমান ঐশ্বর্য রূপ যৌবন গর্ব, মানুষ পালাবে কোথায়, মার ছুটেছে পিছনে, ছুটেছে তৃষ্ণা রাক্ষসী তার লেলিহান জিহ্বা বিস্তার করে।

মহামানবের মন আর্ত হয়ে বলে—দুঃখই কি পৃথিবীর চিরন্তন সত্য, এই সমুদ্রের কি নিরোধ নেই। রাজ্য সাম্রাজ্য, অর্থ বৈভব, তৃষ্ণা তরুণী, পুত্র কলত্র, সংসার সমাজ, মান সম্মদ, সবে মনে হয় বাহ্য। পিতা শুদ্ধোধন, পত্নী যশোধরা, পুত্র রাহুল কেহই তার মনকে বাঁধতে পারে না। চৈত্রক পৃষ্ঠে এক জিহ্বামারাজির গভীরে তিনি বেরিয়ে পড়েন সত্য সন্ধানের জন্ত—বিশ্বের আর্তি তাঁকে ব্যাকুল করে। এ তপস্যা নিজের জন্ত নয়—মুক্তির জন্ত নয়, ঈশ্বর কি জানবার জন্ত নয়, আত্মার স্বরূপ কি উপলব্ধি করার জন্ত নয়, ঐশ্বর্যের জন্ত, সিদ্ধির জন্ত নয়। জন্মজন্মান্তরের চক্র বেয়ে কালান্ধ্রিপরিবেশের মধ্যে কর্মের যে জলন্ত শিখা জ্বলছে তার নির্ক্ষাণপ্রাপ্তি চাই। বাসনার, তনুহার, মোহের নির্ক্ষাণ। এ মুক্তি রবীন্দ্রনাথের ভাষায় নব্ব্বক নয়, সম্ব্বক—এ নির্ক্ষাণ নেতিবাচক নয়, ইতিবাচক—এ মুক্তি কর্মত্যাগ নয়, সাধুকর্মের মধ্যে আত্মত্যাগে, শুধু রাগদ্বৈষম্যজনে নয়, অপরিমেয় মৈত্রী সাধনায়। এ তপস্যা শুধু ‘ইহাঙ্গনে গুণতুমে শরীরং’ বলে ত্বক অস্থি মাংস মেদের উৎসর্গে নয়, এ তপস্যা সর্বোদার জন্ত—বনাক্ষকারের মাঝে আলোর জন্ত—কোথায় আলো, কোথায় আলো—দীপ জালো, দীপ জালো—আত্মদীপোভব। জ্ঞানের প্রদীপ অন্ধ তমিস্রাকে দূর করে দীপাধিতা করুক সমস্ত সত্তা। অন্তরের পূর্ণিমা ঝলমল করে বাইরের আকাশভরা পৌর্ণ-মাসীর সঙ্গে মিলে মিশে অপরূপ হবে, তাইতো পূর্ণিমাই বোধির দিন। ফুটে উঠবে অন্তরে বাহিরে আলোর শতদল। তখনই সবাইকে ডেকে বলবার দিন—শরণ লও সেই বোধির, সেই জীবন-বেদের, সেই সত্য শক্তির—আমি জেনেছি, আমি অরিহস্তা, মারকে জয় করেছি—ভয় নেই, পথ আছে—আর্য্য অষ্টমার্গ ধর্মচক্রের প্রবর্তন, নীলের অহলীন—শুধু চাই সম্যগ্ দৃষ্টি, সম্যগ্ সংকল্প, সম্যগ্ বাক্, সম্যগ্ কর্মাস্ত, সম্যগ্ জীব, সম্যগ্ ব্যায়াম, সম্যগ্

স্বাভি, সম্যগ্ সমাধি। তবেই ব্রহ্ম বিহারে ফুটে উঠবে মৈত্রী করুণা মুদ্রিতা উপেক্ষা। আসবে অপ্রমাদ অনাসক্তি।

পরিনির্বাণ শব্দায় শাস্তিতাবস্থায় শেষ মুহূর্ত্তে ভগবান্ তথাগতের শেষ অমুশাসন হলো—অথ ধো ভগবা ভিক্খু আমন্তেসি “হন্দদানি ভিক্খবে আমন্তয়ামি বো বচোধম্মা সত্ত্বারা অপ্রমাদেন সম্পাদেয়ামি”—অয়ং তথাগতসন্ পচ্চিমাবাচা—এই তাঁর শেষ বাণী অর্থাৎ সংস্কারসমূহ সব ক্ষয়শীল, অপ্রমাদের (জ্ঞান সমগ্রবৃত্ত সম্যক্ স্বাভির) সহিত সর্বকর্ম সম্পাদন করিবে। তার পূর্বে আনন্দকে সন্ধান করিয়া ভগবান বলেছিলেন যে ধর্ম ও বিনয়ই তাঁর অবর্তমানে শান্তার কার্য্য করিবে।

সারিপুত্র ভগবান বুদ্ধের প্রিয় শিষ্য। দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, শীত বর্ষা গ্রীষ্ম সহ্য করেন, ঘুরে বেড়ান গুরুর সঙ্গে, বনে জঙ্গলে, পথে, কান্তারে, লোকালয়ে, রাজসভায়। একদিন তাঁর মনে সংশয় উপস্থিত হলো—কি পেলাম, কি জানলাম গৃহত্যাগ করে, প্রজ্ঞা নিয়ে গৌতম ত কোন সমস্তারই সমাধান করিলেন না, আমার বনবাস বৃষ্টি বৃথা হলো। সারিপুত্রের মুখে বর্ষাগমের মেঘছায়া পড়িয়াছে দেখিয়া পরমকারুণিক জিজ্ঞাসা করিলেন—কি হইয়াছে সারিপুত্র। তিনি উত্তর দিলেন—প্রভু আপনি ত শুধু বলিলেন, অষ্টমার্গ অমুসরণ করো, সেগুলি ত কয়েকটি নীতিসূত্র মাত্র, অধ্যাত্ম জগতের কোন তথ্য তাতে পরিস্ফুট নয়, আত্মা কি, তাহার সহিত দেহের কি সম্বন্ধ, দেহ বিনষ্ট হইলে আত্মার কি গতি হয়, অমুপরমাণু কিসে লীন হয়, বিদেহী আত্মার অবস্থান কোথায়, ঈশ্বরের স্বরূপ কি, তিনি আছেন কি নেই, এসব কোন প্রশ্নেরই ত আপনি মীমাংসা করিলেন না—

ভগবান্ হেসে উত্তর দিলেন—দেখো একজনকে কেহ শরাহত করিয়া ভূপাতিত করিয়াছে, অপর একব্যক্তি তাহার হৃদয় হইতে সেইটি তুলিয়া ফেলিবার জন্ত অগ্রসর হইতেছে, তখন যদি শরবিদ্ধ লোকটি বলে যে—আগে উত্তর দাও এই বাণটি উত্তর পূর্ব পশ্চিম বা দক্ষিণ কোন দিক হইতে আসিয়াছে, কোন ব্যাধ বা ক্ষত্রিয় বা বৈশ্য উহা সন্ধান করিয়াছে তবে তোমাকে উহা তুলিতে দিব। তোমার প্রশ্নও সেই অবোধ ব্যক্তির মত। তোমার চিত্ত

একান্ত অশান্ত হইয়া শান্তি খুঁজিতেছিল, আমি তোমাকে শান্তিলাভের উপায়স্বরূপ এই অষ্টমার্গ দেখাইয়া দিয়াছি। এই পন্থা অহুসরণ করিলে তুমি নিজেই সত্য দর্শন করিবে, আত্মদীপ হইবে, তোমার সব প্রশ্নের মীমাংসা হইবে। তপোনির্মল চিত্ত না হইলে কোন প্রশ্নেরই সত্য উত্তর পাওয়া যায় না এবং নিজের মনেই নিজের প্রশ্নের উত্তর খুঁজিতে হয়, তা না হইলে কোন উপদেশই কার্যকরী হয় না।

ঐতিহাসিকের দৃষ্টিতে আজকের যুগের পরিভাষায় দেখিলে তখনকার সামাজিক পরিবেশে বুদ্ধদেব যে কত বড় বিপ্লব আনিয়াছিলেন তা পরিমাপ করা যায়। বাস্তবনিষ্ঠ মনের পরিচয় পাওয়া যায় বৈশেষিক দর্শন, কনাদ, সাংখ্য ও বৌদ্ধবাদে। এদের বলা হতো হেতুবাদী।

জৈমিনি: সূর্য্যতশ্চৈব নাস্তিকো নন্থ এবচ

কপিলশ্চোক্ষপাদশ্চ যড়তে হেতুবাদিনঃ।

একজন সুপরিচিত লেখক বলিয়াছেন ‘সমাজ জীবনে যাহা পাথের, বোক ধর্ম্ম তাহাই পথ—ক্ষম, মৈত্রী, করুণা, আর্থা অষ্টমার্গ, ইঞ্জির লালসারও নয়, ইঞ্জির সংহারেরও নয়, ভোগ ও ভোগের জীবননিষ্ঠ মধ্যপথই সাধারণ মানুষের সাধ্য। তাই গড়ে উঠেছিল যাহাকে বলা হইয়াছে সমগ্র-সন্ধানী সমাজ চেতনা এবং তার প্রকাশ হইয়াছিল তিনদিকে (১) এক কেন্দ্রাভিমুখী সংঘটন a centralised organisation (২) এক জনসমগ্রীয় ব্যবস্থা a socialised synthesis (৩) এক জীবন নীতির নির্দেশ a code of Ethics.’

এই জীবন-বেদকে স্বীকার করিয়া লইলে ভগবান আছেন কি নেই, এই প্রশ্ন হয় অবাস্তব। তিনি আরণ্যিকের ভ্রান্ত ছন্দোপন না মহান্ প্রভু বৈ পুরুষ অনাদি, অব্যয় ক্ষর, অক্ষর হিরণ্যগর্ভ, প্রেমের ঠাকুর—একে বিচার বুদ্ধিতে বিশ্লেষণ করবার দরকার হয় না। সত্যপথের সন্ধান পাইলে, সম্যক্ অহুতব হইলে সমস্ত প্রশ্নেরই আপনি মীমাংসা হইয়া যায়।

শান্তার পরিনির্বাণের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর শিষ্যদের মধ্যে মতভেদ হয়। একদল বাদে বলা হইত “খেরাবাদিন” তাঁরা বুদ্ধের অহুশাসনগুলি কায়মনোবাক্যে পালন করিবার

চেষ্টা করিতেন। আর এক দল হলেন ‘মহাসত্ত্বিকা’—যাঁরা নিজেদের টীকাটিপ্পনি দ্বারা বুদ্ধদেবকে করে তুললেন লোকোত্তর। দিগ্‌গিন্‌কায়ের ব্রহ্মজালসূত্রে বলা আছে যে বুদ্ধের জীবনান্তে ‘কায়সত্ত্বে’র পর, দেবতা ও মানুষ কেহই তাঁর দর্শন পাবেন না—তার তখন ‘অপ্রতিভা’ ভাবঃ non-comprehensible state, তিনি শুধু লোকোত্তর নন, অরূপাতীত, অরূপ ব্রহ্মাতীত। এদিকে গড়িয়া উঠিল ত্রিপিটক, বিনয়, সূত্র, অভিধর্ম্ম। এমন সময় ভারতের আকাশে এক পরম উজ্জল জ্যোতিষ্কের উদয় হইল—তিনি মহারাজাধিরাজ রাজচক্রবর্তী অশোক—রুদ্ররৌদ্ররসিক চণ্ডাশোক নন, কলিঙ্গবিজয়ের পর ধর্মাশোক, রাজ্যজবে বিগতস্পৃহ। গিরিগাত্রে উৎকীর্ণ রাজা প্রিয়দর্শীর অহুশাসনগুলি আজও কালের সীমানা পার হ’য়ে সাক্ষ্য দিচ্ছে মহামানবের শিক্ষার ধারা। ‘সবা যুনিষে পজা মম’ অদন্তেন অসথেন বিজয়েৎ’ ‘পোরাণ পোকিত্তি’র শিক্ষা দিলেন তিনি—ভারতের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্তের গিরিধরীশৈলমালায় ওপর থেকে এপারে। বজ্রেন—ধর্ম্মচক্রের প্রবর্তন করতে হবে, শিক্ষার, সেবার, ধর্ম্মের শরণ লও—যে ধর্ম্ম মানুষকে বাঁচিয়ে রাখে, দৃষ্টি দেয়, সৃষ্টি করে, যা মানুষকে দেয় শক্তি, প্রাণ, তেজ, বীর্য, সম্মান, মহত্ত্ব, যার জন্ত চাই সেবা, সংযম, বচগুপ্তি। ব্রাহ্মণরা গালাগালি দিলে যে তিনি মোহাত্মা, বুদ্ধদেবকে বলা হলো ‘বুঘল’, কিন্তু সত্যের জয়রথ তাতে থামলো না। কবির ভাষায় বলতে গেলে বলা যায়—‘চলে গেছ আজ তুমি মহারাজ, রাজ্য তব স্বপ্নসম গেছে টুটে’ কিন্তু আমাদের হৃদয় সিংহাসনে আজও তিনি মহারাজ। H. G. Wellsএর কথা মনে পড়ে “Amidst the tens and thousands of name of monarchs that crowd the columns of History, their majesties, graciousnesses and Serenities royal highnesses and the like, the name of Asoka shines almost alone like a Star”

এই প্রেমাভিবান শুধু চণ্ডাশোককেই ধর্মাশোক করেনি, কত উপালি উদ্ধার করলে, কতো শ্রীমতীকে, কত আনন্দকে পথ দেখালে কত চণ্ডালিনীকে, কত ব্রাহ্মণ

কত শূদ্র, কত পাণ্ডী তাণ্ডী উদ্ধার পেয়ে গেলো  
ত্রিশরণের মন্ত্র নিয়ে। ডাইনে বামে ছন্দ নামলো  
নবজনমের মাঝে, বন্দনা গিয়ে মিশলো সজীতে ভজীতে,  
রূপে অরূপে, মন্দিরে মূর্তিতে ‘ক্ৰোতন্তক্ৰোতম’।

অশোক বৈভাষ্যবাদীদের অর্থাৎ যারা সূত্রগুলিকে  
বিচার বিতর্ক করে গ্রহণ করতেন তাদেরই বেশী আদর  
করতেন। কিন্তু মূল বুদ্ধবাণীকে অবলম্বন করে নানা  
মতবাদের সৃষ্টি হতে থাকে। এলেন অর্থবোধ শূণ্যবাদী,  
নাগার্জুন লিখলেন বিভাস, ‘সিদ্ধনাগার্জুন কল্পপুটে’ হলো  
তাত্ত্বিক বৌদ্ধের সাধনার ইতিহাসের সূত্র, এলেন  
আর্যদেব, সম্রাট কনিক, মিলিন্দ, হুবির মৈত্রেয় নাথ,  
বিজ্ঞান বাদ, যোগাচারবাদ, সর্বাঙ্গিবাদ, মহাস্থববাদ,  
বজ্রযান, মহাযান, বোধিসত্ত্বযান, হীনযান, পরিমিত ত্রায়,  
মন্ত্রতায় প্রভৃতি।

আর্যদেব বলেন :

“নাহি সূর্য্য, নাহি চন্দ্র নাহি গ্রহ নক্ষত্র নিকর  
নাহি ভূগ তরুণতা নদনদী পর্ব্বত প্রান্তর  
শূণ্য শূণ্য মহাশূণ্য.....

নাহি জন্ম নাহি মৃত্যু ইহলোক নাহি পরলোক

স্বপ্ন সম শূণ্য সব মরীচিকা সম কার তরে করিতেছ

শোক

কে তোমার প্রিয়জন ? কার তরে কর অশ্রুপাত  
কে মারিল ? কে মরিল ? কে করিল কারে অজ্ঞাঘাত  
ছিন্ন হোক মোহবন্ধ সব মিথ্যাদৃষ্টি হোক তিরোহিত  
মহাবোম সমান শূণ্যতা, শঙ্কেশিব প্রপঞ্চ অতীত

( প্রবাসী জ্যৈষ্ঠ ১৩৪১ )

মিলিন্দ প্রশ্নেও এই সমস্যা—ভদ্রস্ত নাগসেন তিনিই—  
তিনি ? না অজ্ঞ কেউ ? হুবিরের উত্তর হইল—নচ সে,  
নচ অজ্ঞ ক্রোড়ি তিনিও নহেন, অজ্ঞও নহেন। প্রথম  
প্রহরে যে দীপ জ্বালানো হয় শেষ প্রহরে তার বে  
শিখা সে শিখা কি প্রথম প্রহরের প্রদীপের অষ্ট-  
সাহস্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতা শূণ্যবাদীদের বেদ বিশেষ—  
তারা নির্কারণকে করিলেন অনির্করচর্য—এমন একটা  
কিছু থাকে ব্যক্ত করা যায় না—এ শুধু নেতি নয়,  
সম্পূর্ণ ইতি বাচক। এই সব মতবাদের মহাসাগরে

হাবুডুবু খেতে লাগলেন সদ্ধর্ম্মারা—তর্ক হতে লাগলো  
নির্কারণ কার জন্ত, নিজের জন্ত না সবার জন্ত। মুক্তি-  
লাভের আশায় দেবতাদের ও শক্তির আশ্রয় গ্রহণ  
করা সমীচীন বলিয়া অনেকে মনে করিতে লাগিলেন।  
শক্তি মানেই বিভূতি, বিভূতি মানেই ক্ষমতা। কেউ  
বলেন—‘রসবন্ধঃ দদম্ব মে’ রসকে বাঁধবো—রস মানে  
পারদ না উপনিষদের রস—না শক্তির সাধনা জানিনা—  
এই শক্তি লাভের চেষ্টাতেই তাত্ত্বিকতার জন্ম। এলেন  
তারা, প্রজ্ঞাপারমিতা, হেবজ্ঞ। আচার্য্য পদ্মসম্ভব  
গেলেন তিব্বতে। তজ্জের নাম হ’লো সেখায় খগবুগ।  
গুরু সম্প্রদায় জেগে উঠলো, প্রহ্লাদানন্দ নাথ প্রভৃতি,  
দ্বীতীরাগ, যোগিনীসাধন চারিচক্রসাধন প্রভৃতি।  
কিন্তু তখনও প্রাচীন আদর্শের প্রতি ভক্তি লুপ্ত হয়  
নাই। কারম্মব্যূহ নামক মহাযানসূত্রে দেখি বোধিসত্ত্ব  
অবলোকিতেশ্বর করুণামহার্ষব রূপে চিত্রিত হইয়াছেন।  
বলা হইতেছে এমন্ ময়া ঋতম এই রকম শুনিয়াছি  
যে, একদিন ভগবান জেতবনে বিহার করিতেছিলেন  
এমন সময় এক অপূর্ব আলোকে সারা বিশ্ব উজ্জ্বলিত  
হয়ে উঠল, শিষ্যেরা সবাই জিজ্ঞাসা করিলেন—প্রভু  
এই আলো কোথা হইতে আসিতেছে—ভগবান উত্তর  
দিলেন যে বোধিসত্ত্ব অবলোকিতেশ্বর অধীচি নরকে  
অধোমুখস্বয় পাণ্ডীতাপীদের উদ্ধারের জন্ত গমন করিতে-  
ছেন। ঐ কারম্মব্যূহের দ্বিতীয় অংশে দেখি, বোধিসত্ত্ব  
মহাদেব ও উমাকে সদাক্ষরী বিজ্ঞানান করিতেছেন  
এবং মন্ত্র দিচ্ছেন ‘ওম্ মণিপদ্মে হুম্—ওম্ শূলে শূলে  
শূণ্যে স্বাহা। তাদের মতে ( The Indian Historical  
quarterly vol XXIV no 4 ) আদি বুদ্ধ ছিলেন স্বয়ম্ভু,  
তারপর এলেন অবলোকিতেশ্বর। অবলোকিতেশ্বর  
হচ্ছেন জ্ঞানের ও ধ্যানের চরম বিকাশ ( Highest  
point of meditation ) এবং তাই থেকে এলেন  
সূর্য্য চন্দ্র ব্রহ্মা নারায়ণ, সরস্বতী, তারা, প্রজ্ঞা  
প্রভৃতি। এই হতে দেখা যায় যে বুদ্ধ ক্রমশঃ  
স্বয়ম্ভু ভগবানে পরিণত হয়ে গিয়েছেন—যে দেবতাকে  
তিনি নিজে স্বীকারও করেনি, অস্বীকারও করেন নি  
—সেই পরম দেবত্ব সৃষ্টিস্থিতিরের ভাবরূপে তিনি  
প্রতিষ্ঠিত। নির্কারণের জন্ত লোকে ততটা কাতর নয়

ভক্তেরা চায় সিদ্ধি, তারা চায় শক্তি। তিব্বতে, নেপালে, কামরূপে, পূর্ববঙ্গে প্রচলিত মহাবানী বজ্রবানী বৌদ্ধতান্ত্রিকতাবাদ নিয়ে এসেছিল আচার অভিচার! ভারতবর্ষে বৌদ্ধধর্মের প্রায় শেষ ইতিহাস কিছুটা তান্ত্রিকতার মধ্যেই, কিছুটা বৈষ্ণব আগমে, কিছুটা সহজিয়া, আউলবাউল নাথদের মধ্যেই লুপ্ত হয়ে গেল।

ভগবান ভগ্নাগতের বাণী কিন্তু সেইখানেই আত্ম-গোপন করে নাই। তাঁর পুণ্য আবির্ভাবের সময় হতেই এই অমৃত মন্ত্র ভারতের ভ্রমণ, ভারতের নাবিক, ভারতের পথিক, ভিক্টু ভিক্টুণী পথে পথে দেশদেশান্তরে বহন করে নিয়ে গেছে—তারা গেছে মরুকাঙ্ক্ষার গিরিদরীসমুদ্রে লজ্বল করে গান্ধার হতে জলবিশেষ। এই বৃহত্তর মহাভারতে অমেষ প্রেমের রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল :

“পদ্মাসন রয়েছে স্থির, ভগবান বুদ্ধ সেখা সমাটীন চিরদিন  
যোন যায় শাস্তি অন্ত হারা, বাণী বার সক্রমণ সাস্তনার ধারা”  
ভারতবর্ষ বর্ষে বর্ষে সজ্জিত হইয়া শূলপল্যভল লইয়া  
রণতরী সাজাইয়া দিগ্বিজয়ে যায় নাই, সে গিয়াছিল  
কৌপীনবস্ত্র হইয়া দণ্ডকমণ্ডলু হাতে। তিব্বত, চীন,  
জাপান, ছাপময় ভারত, শ্রাম, সিংহল, চম্পা, কাছোডিয়া  
খোঁটান সর্বত্র আজও সেই পুণ্য শরণ আকাশে বাতাসে  
ওতোপ্রোতভাবে বিজড়িত। এ যাত্রা প্রেমের, এ  
যাত্রা মৈত্রীর, এ যাত্রা জপমালাধৃত গৈরিক কাষায়বজ্র-  
পরিহিত মাহুঘের, বার শেষ প্রকাশ মহাআজী—এ যে  
কতো বড় অভিযান, কতো মধুর, কতো উদার, কতো  
বিরাট, কতো মর্মস্পর্শী, তার একটি পাথুরে প্রমাণ উপস্থিত  
করিতেছি।

প্রায় আটশো বছর পূর্বে ব্রহ্মদেশে এক রাজা ছিলেন।  
তাঁর নাম ছিল রাজা অলংসিধু। তিনি পাগানে আনন্দ-  
মন্দিরে প্রস্তরফলকে পালিভাষায় যে প্রার্থনাগীতি উৎকীর্ণ  
করিয়াছিলেন তাহা আন্তরিকতায় ও ভাবসম্পদে অপূর্ণ।  
চার হাজার বছর পূর্বে প্রাচীন ইজিপ্টের সম্রাট  
ইখ্নাটোনের স্মৃতিস্তোত্র আমরা পড়িয়াছি Breaslead এর  
Dawn of Conscience নামক পুস্তকে। রাজার  
প্রার্থনা বা King's prayer বলিয়া তাহা অভিহিত।  
পৃথিবীর আর এক প্রান্তে হাজার হাজার বৎসরের

ইতিহাসকে পিছনে ফেলে এসে মধ্যযুগীয় সামন্ততান্ত্রিক  
আর এক নরপতির আকুল প্রার্থনা আজও আমাদের কর্ণে  
বাজিতেছে। বর্ম্মা রিসার্চ সোসাইটির ১৯২০ সালের  
পত্রিকায় অধ্যাপক পে মংটিন ও অধ্যাপক লুস এই  
Shwegngyi Pagoda Inscription টি স্মৃতি ও  
ঐতিহাসিকদের দৃষ্টিতে আনেন। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের  
রেজুন শাখার তৎকালীন সহসম্পাদক ত্রীযুক্ত পরেশপ্রসাদ  
মজুমদার মহাশয় “সুবর্ণভূমি” পত্রিকার মারফৎ এই  
প্রশস্তিটি আমাদের গোচরে আনেন। রাজা মন্দিরটি  
সঙ্কর্ম্মীদের দান করিয়া বলিতেছেন—

“এ দানের পুণ্যফল চাহি শুধু আমি  
সর্বজীবহিত; অন্তরে কামনা যত  
সবারি অন্তরতম এ মোর কামনা!  
যেই মহাপুণ্য আজি করিহু অর্জন  
বিনিময়ে তাঁর, এ জন্ম কি জন্মান্তরে  
নাহি চাহি কতু ব্রহ্মলোক, সুরলোক  
কিঞ্চিৎ মারলোক, যত অমর বৈভব  
হীরাযুক্তামণিময় রাজার মুকুট  
একচ্ছত্র ধরণীর রত্ন সিংহাসন—  
নহে নহে কাম্য মোর; বুদ্ধ শিষ্টপদে  
যে গৌরব তাও নাহি চাহি। আমি চাই  
সংসার নদীর বক্ষে বাঁধিবারে সেতু  
যে পথে অনন্তকাল যাবে পরপারে  
আনন্দধামের যাত্রী! সেই সেতু বেয়ে  
যাব আমি লয়ে বিশ্ববাসী জনে  
সংসার সমুদ্রে শ্রোতে ডুবিছে অতলে  
তুলে নেব সবাঁকারে—আমি চাই  
আপনি সংযত হয়ে, অসংযত জনে  
শিখাই সংঘম; সাস্তনার বাণী লভি  
আপন অন্তরে শোনাই তা জনে জনে  
সাস্তনা পায়নি যারা! অন্তর বিতরি  
ভীতজনে—আপনি জাগিয়া  
সুপ্ত জনে করি জাগরিত—শান্ত করি অন্তরের  
দাবান্নি দাহন, নিভাই পরের জ্বালা  
হিংসার ঝটিকা যত দিই ধামাইয়া।  
হৃষ্টের আদিম পাপ লোভ হিংসা মোহ



মোর চিত্ত মাঝে হোক তারা অঙ্কুরে বিনাশিত ।

রূপে রসে শব্দে আর গন্ধে পরশনে  
ইন্দ্রিয়ের সুখস্পৃহা—দূর হোক আজি ।

নরলোকে শ্রেষ্ঠ যিনি, যে মহামানব  
তাজিলেন রাজৈশ্বর্য্য যশের গৌরব

তুচ্ছ ধূলিকণাসম, ঠিক সেই মত হায়  
আমারো বাসনা তাজি যাই বহু দূরে  
ধর্ম্মের আশ্রয় আশে ত্রিরত্ন শরণে ।

আজি হতে আমি চাই ধর্ম্মের বিধান  
মানব মঙ্গল তরে—ছোট বড় সব  
যেন সম শ্রদ্ধাভরে করিগো পালন ।

দীক্ষিত ত্যাগের মন্ত্রে বোধিতব্রহ্মধা  
নিত্য করি পান । মুক্ত হোক মোর কাছে  
সূত্র অভিধর্ম্ম আর বিনয়ের দ্বার ।

মাহুঘের ব্যথা হেরি সর্ব্বশক্তি দিয়ে যেন  
করি প্রতিকার

অন্তহীন কাগসিন্দ্রু আবর্তন মাঝে  
ঘুরিতেছে গ্রহ তারা দেব নর যত  
মুক্ত করি সবাকারে হেন শক্তি চাই ।

যে প্রার্থনা সেদিনকার এই নগণ্য নরপতি করেছিলেন,  
তার ভগ্নাংশও কি আমরা আজ এই বিংশশতাব্দীর আণবিক  
বিজ্ঞানবিশেষজ্ঞ বিজ্ঞানের যুগে বলতে পারি। আমরা কি  
বলতে পারি

সর্ব্ব পাপসম অকরণং কুশলসম উপসম্পদা

সচিহ্ন পরিশোধনং এতৎ বুদ্ধাশ্রয়শাসনং

সকল প্রকার পাপবর্জন, কুশল কর্ম্মের অহুষ্ঠান, চিত্তের  
নির্ম্মলতা সাধন ইহাই বুদ্ধের অশ্রয়শাসন ।

অভিধর্ম্মে কল্যাণে পাপা চিত্তং নিবারয়ে

দম্ভং হি করাতো পুণ্ড্র এতৎ পাপশ্রিয়ং রমতী মনো

কল্যাণলাভের জন্য তোমরা অতি সতর্ক থাকবে হও, পাপ  
হইতে মনকে নিবৃত্ত করো, আলস্যের সহিত পুণ্য কর্ম্ম  
করিলে মন পাপে নিরত হইয়া থাকে

যথাগারং সূক্ষ্মং বৃট্ঠী ন সমতি বিজ্ঞাতি  
এবং সূভাবিতং চিত্তং রাগো ন সমতি বিজ্ঞাতি

যে গৃহ উত্তমরূপে আচ্ছাদিত তাহাকে ভেদ করিয়া যেমন  
বৃষ্টি প্রবেশ করিতে পারে না—যে চিত্ত সূভাবনাযুক্ত  
তাহাতেও সেইরূপ আসক্তি প্রবেশ করিতে পারে না ।

যথাপি কুচিরং পুণকং বরবন্তং আগচ্ছকং

এবং সূভাবিতা বাচা অফলা হোতি কুরবতো

যেমন সুন্দর বর্ণযুক্ত পুষ্প গন্ধহীন হইলে নিফল্য হয় তজ্রূপ  
সূভাবিত বাচ্য কার্য্যে পরিণত না হইলে নিফল্য হয় ।

অক্কেধেন জিনে কোধং

অসাধুং সাধুনা জিনে

জিনে কদরিয়ং দানেন

সচ্চেন অলিক বাদিনং

ক্রোধকে অক্রোধের দ্বারা জয় করিতে হয়, অসাধুকে  
সাধুতার দ্বারা, কৃপণকে দানের দ্বারা, মিথ্যাবাদীকে  
সত্যের দ্বারা ।

আজ এই শরণেরই কামনা করি যা আমাদের কর্ম্ম-  
বিবৃথ করিবে না, রাজসিকতায় মত্ত করিবে না,  
তামসিকতায় লিপ্ত করিবে না, সাত্তিকতায় অধিকৃত করিবে  
না । শরণ লবো সেই বাণীর—যে বাণী সকলের, যে বাণী  
পৃথিবীর, যে বাণী কাহাকেও দূরে রাখে না, বর্জন করে  
না, যে বাণীর মহাসাগরে যুক্ত হয়েছেন সব দেশের সব  
মণীষীরা, সমস্ত তুচ্ছতা ক্ষুদ্রতা নীচতার উর্দ্ধে যে বাণী,  
যেখানে কোন বিরোধ নেই, বিবাদ নেই, বিতণ্ডা নেই—  
মা মা হিংসা বলে যে মন্ত্র ভারতের গভীর সত্যের যুগে যুগে  
জাগ্রত ভগবানকে ডেকেছে সেই বুদ্ধেরই শরণ লইলাম,  
মাথা নত করি সেই ধর্ম্মের কাছে, আশ্রয় চাই সেই সজ্ঞ-  
শক্তির কাছে, সেই শরণই জয়যুক্ত হোক । রবীন্দ্রনাথের  
ভাষায় “সনাতন সত্য ভারতবর্ষের মুক্তিমন্ত্র ত শুধু ক্রীডম্  
নয়, এ মুক্তি কর্ম্মের বাসনা, জনসংঘের আঘাত ও জিগীবার  
উত্তেজনা হইতে মুক্তি”—

এ দ্বারায় জন্ম নিয়ে যে মহামানব সব মাহুঘের জগ  
সার্থক করেছিলেন আজ—

নূতন তব জন্ম লাগি

কর জাগ মহাপ্রাণ

শান্ত হে মুক্ত হে

করণাধন ধরীভল

কাতর যত প্রাণী

আন অমৃত বাণী

হে অনন্ত পুণ্য

কর কলঙ্ক শূন্য ।

## জনমত

শ্রীপৃথ্বীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

( ১ )

মোড়ের মাধায় কেঁঠঠাকুরের দোকান—

জি-টি-রোড হইতে যে রাস্তাটা এই শিল্পাঞ্চলের গ্রামে চুকিয়াছে তাহারই মোড়ে ছোট্ট দোকান। দোকানের কোন খ্যাতি নাই কিন্তু প্রাধান্য আছে। বালক বৃদ্ধ, ধনী নির্ধন সকলেই এই দোকানে বসিয়া আড্ডা দেয় এবং গলির মোড়ে বলিয়া এইখানে গ্রামের ন্যাকালিকাতার শেষ সংবাদ পাওয়া যায়—এটি গ্রামের রয়টার অফিস বলিলেও অত্যাুক্তি হয় না।

কেঁঠঠাকুরটি ক্ষুদ্রকায়, অপ্রিয় সভ্যবাদী, কিন্তু ব্যবহারে ভদ্র ও রসিক। তাঁহার সবচেয়ে বড় ক্ষমতা যে, সব রকম লোকের সহিত তিনি একই রকম নৈকট্যের সঙ্গে সর্ব বিষয়ে আলোচনা করিতে পারেন।

গ্রামের অধিবাসীদের বেশীর ভাগ চট্টকলের চাকুরিগা, না হয় কলিকাতার ডেলি-প্যাসেঞ্জার। তাঁহারা বৈকালে বা সন্ধ্যার পর আসেন এবং গ্রামস্থ নিষ্কর্মা যুবকগণ বাকী সময়ে ঠাকুরের দোকানে আড্ডা দেয়।

ঠাকুর দোকানযুক্ত পানে গাল ফুলাইয়া তর্জ্জনীর মাধায় চুণ লইয়া বসিয়া থাকেন এবং মাঝে মাঝে মিষ্ট তিক্ত কথায় নানারূপ টিপ্পনী দ্বারা হাস্যরস পরিবেশন করেন।

সুতরাং ঠাকুরের দোকানটি কেবলমাত্র রয়টার অফিস নয়, তা গ্রামের ক্লাবও বটে।

যাহারা এই ক্লাবের নিয়মিত সভ্য তাদের মধ্যে নিষ্কর্মা যুবক—বটু, বাদলা, ল্যাটা, মণি এবং গ্রামস্থ জমিদার বাবুদের বাড়ীর—ভূতো, পটলা, শচীনবাবু, সতীশবাবু ও পাঁচুবাবু প্রধান। বলা বাহুল্য ইহাদের সকলেই একবয়সী নয়, বালক হইতে প্রৌঢ় সবই আছেন।

সেদিন সকালে বটু বাদলা মণি পটলা ও শচীনবাবু বসিয়া নূতনতম সিনেমা ছবির আখ্যানভাগ, সঙ্গীত অভিনয় প্রভৃতি সম্বন্ধে গভীর ও গূঢ় গবেষণা করিতেছিল। পটলার হাতে নট-নটীগণের ছবিযুক্ত একখানি মাসিক পত্রিকা—সে

তাহা হইতে কি একটা পড়িয়া শুনাইলেঠাকুর বিশেষ স্নরে—  
হ্যাঁ-হ্যাঁ—বলিয়া উঠিলেন। কথাটা অর্থবোধক, তাই সকলে হাসিল। এই হ্যাঁ হ্যাঁ—টিপ্পনীটি ঠাকুরের অন্ততম বৈশিষ্ট্য—  
তাহা নানা অর্থে নানা ভাবে প্রায়শঃই পরিবেশিত হয়।

একটি ভদ্রলোক গেঞ্জি গায় দিয়া রাস্তার অপর পারের দোকান হইতে তেল ডাল প্রভৃতি কিনিয়া লইয়া যাইতেছিল।  
শচীনবাবু প্রশ্ন করিলেন—লোকটা কে হে ? নতুন দেখছি—  
পটলা বলিল—ঐ ত নবীনবাবুদের ভাড়াটে—রেফুজি বাঙ্গাল।

—কোন বাড়ীটা ?

—ওই ত ভিয়েন বাড়ীটা, সেইটে ৩০ টাকায় ভাড়া নিয়েছে—

—তা হ'লে শাঁসালো আছে—কি করে ?

বটু বলিল—তা জানি না, তবে ৯টা-১৫রয় রোজ ক'লকাতা যায়, আর বোধ হয় ৬টা ১৩'র আসে—

মণি বলিল—লোকটা নাকি এম-এ শুনেছি।

শচীনবাবু কহিলেন—খ্যাত, এম-এ পাশ লোকের চেহারা অমনি হয়—গেঞ্জিগায় দোকানে আসে—

ঠাকুর প্রশ্ন করিলেন—তবে চেহারা কি রকম হয়—

পটলা বলিল—সেবার হরিদাস যখন ম্যাট্রিক পাশ ক'রলে, তখন সে গ্রামে কা'রো সঙ্গে কথাই বলতো না—  
পাশ্পাশু আর পাঞ্জাবী ছাড়া ঘর থেকেই বেরত না—

মণি কহিল—তবে ত ওর মটকার জামা পরে বাজার করা উচিত—

শচীনবাবু মন্তব্য করিলেন—যতই বল ও চেহারায় এম-এ পাশ করা যায় না—বড় জোর ম্যাট্রিক—

পটলা কহিল—কিন্তু বাঙ্গাল যে !

ঠাকুর বাঙ্গাল, তিনি কহিলেন—তবে হ'তেও পারে বা—হ্যাঁ হ্যাঁ।

অর্থব্যঞ্জক হ্যাঁ হ্যাঁ শুনিয়া সকলে হাসিল—

আড্ডা চলিতে লাগিল—

ন'টার সময় দেখা গেল ঐ ভদ্রলোকই হস্ত-বস্ত্র হইয়া

ট্রেসন পানে ছুটিতেছেন। সাধারণ ধৃতি পাঞ্জাবী, কিন্তু পরিকার, চোখে চশমা। শতীনবাবু তাহার গমন লক্ষ্য করিয়া কহিলেন—এখন ত চেহারাটা মন্দ দেখাচ্ছে না—

ঠাকুর কহিলেন—মাছবের মতই ত দেখাচ্ছে—

পটলা প্রতিধ্বনি করিল—হ্যাঁ—হ্যাঁ—

ভদ্রলোক প্রসঙ্গেই নানা আলাপ আলোচনা চলিতেছিল, এমন সময় পাঁচুবাবু আসিয়া জলচৌকী দখল করিয়া বসিলেন—কহিলেন—কার কথা বলছ হে ?

পটলা বুঝাইয়া বলিল। পাঁচুবাবু কহিলেন—লোকটার সঙ্গে আলাপ হ'য়েছে ট্রেণে। উচ্চশিক্ষিত এম-এ, রেফুজি—টালিগঞ্জ যায় রোজ।

পটলার সিনেমার খোঁক আছে, টালিগঞ্জ গুনিয়াই সে কহিল—ফিলিমে কাজ করে নাকি ?

পাঁচুবাবু বলিলেন—হ্যাঁ হ্যাঁ—পথে আর এক ভদ্রলোকের সঙ্গে যে রকম আলাপ হ'ল তাতে সেই রকমই মনে হয়—

—তবে ত ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ ক'রতে হয়—

বাদলা বলিল—কি ক'রে ? বিদ্যান লোক, তার পরে হয়ত বড়লোকও—যখন ফিলিমে কাজ করে—আলাপ ক'রতে ভয় ক'রবে না ?

পটলা চিন্তিত হইয়া কহিল—তাই ত—কি করা যায়—খোপ-ছুরণ কাপড় জামা পরে যাবো—

কিছুদিন পরের কথা—

উক্ত ভদ্রলোক স্থানীয় একটা সভায় পৌরোহিত্য করিতে নিমন্ত্রিত হইলেন—এবং জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতা দিয়া কেলিলেন।

ঠাকুরের দোকানে সমবেত সকলে সেইদিন সেই প্রসঙ্গের আলাপ করিতেছিলেন। পাঁচুবাবু জলচৌকীতে উপবেশন করিয়াছিলেন, অন্তের প্রশংসা শুনিয়া মন্তব্য করিলেন—বাকালদের ঐ গুণটা আছে, ভিটে মাটি বিক্রি করেও তারা পড়ে। আমাদের মত কেরাগী হয়ে ডেলি-পাবও হ'য়ে ধরাকে সরা জ্ঞান করে না—

ঠাকুর বাকালের প্রশংসায় স্তব্ধ করিয়া কহিলেন—হ্যাঁ—হ্যাঁ—

উপস্থিত অনেকে ঠাকুরকে বাকাল বলিয়া ঠাট্টা

করিলেন, কেহ কেহ বলিলেন—ওদের আলাপ মাছ খাব যো নেই, ইলিশমাছ চারটাকা হ'য়ে গেছে—

মণি বলিল—ঠিক, ওই ভদ্রলোক রোজ ক'লকা থেকে মাছ নিয়ে আসে—

তাহার পর কথাটা অল্প প্রসঙ্গে চলিয়া গেল।

আরও কিছুদিন পরে ভদ্রলোকের সঙ্গে অনেকে পরিচিত হইলেন এবং লোকটিকে সকলে মিত্রক নিরহঙ্কার বলিয়া ধরিয়া লইল এবং আরও কিছুদিন পাঁচুরের দোকানেও তিনি মাঝে মাঝে বসিতে আর করিলেন। তখন আর কাহারও সংশয় রহিল না যে লোকটি শিক্ষিত এবং সভ্যই নিরহঙ্কার ভদ্রলোক—না তাহার বীরেনবাবু।

বীরেনবাবু মাঝে মাঝে বসিলে পাকিস্থানের কথা উঠে তিনি পাকিস্থান ত্যাগের ইতিহাস ও কারণ বর্ণনা করেন অনেকে শোনে। কেহবা প্রশ্ন করে—পাকিস্থানে এখন ত গোলমাল নেই, আপনারা খামুকা এলেন কেন ?

বীরেনবাবু হাসিয়া বলেন—সে আপনারা বুঝবেন না অর্থের চেয়ে আদর্শকে যারা বেশী ভালবাসে, তারা এমনি ভুল করে।

কেহ বোঝে কেহ বোঝে না—কেহ না বুঝিয়াই হেঁ করেিয়া হাসে। বীরেনবাবু তাহার কথা বুঝাইবার চেষ্টা করেন এবং সেটা আন্তরিকভাবেই।

আর একদিনের কথা—

শতীনবাবু শীকার করিতে গিয়া একটি ঘুঘু মারিয়াছেন সেই কথা হইতেছিল—এমনি সময় বীরেনবাবু আসিয়া বসিলেন। শীকারের গল্প চলিতে লাগিল, পাখী হইতে শৃগাল নেউল, পরিশেষে ব্যাজ শীকার।

ল্যাটা স্থানীয় একটি ব্যাজ শীকারের কাহিনী ও শীকারীর মুক্ত্য প্রসঙ্গে গল্প বলিয়া যখন শেষ করিল, তখন বীরেনবাবু কহিলেন—মাটিতে দাঁড়িয়ে শীকারীর গুলি করা ত ঠিক নয়, কোন অভিজ্ঞ লোকই তা করে না। ভদ্রলোক বোধহয় নতুন শীকারী—

—না না, তিনি বহু বাঘ মেরেছেন।

—তা হ'লে দুর্দান্ত হ'য়েছিল—নেহাত মরণ বুদ্ধি। আমি ধীর সঙ্গে প্রথম শীকার করি তিনি দু'টি উপদেশ দিবেছিলেন—একটা মাটিতে দাঁড়িয়ে গুলি না করতে

এবং আর একটি আহত বাঘের সামনে না বেতে। মাটিতে দাঁড়িয়ে গুলি করলে বিটারদের গায়ে লাগতে পারে, আর বাঘের প্রায়ই দুর্বল অঙ্গ পাওয়া যায় না।

বীরেনবাবু একটি ব্যাঘ্র শীকারের কাহিনী বলিলেন, সকলে অত্যন্ত কৌতূহলী হইয়া শুনি। শচীনবাবু কহিলেন, —খেলাধুলোও ক'রতেন?

—হ্যাঁ, কিছু কিছু করেছি সব খেলাই, তবে ফুটবল ও ভলিটাই পারতাম ভাল।

পটলা কহিল—চলুন না, কাল ভলি খেলবেন।

—এখন বয়স হ'য়েছে, তোমাদের সঙ্গে ভাল রেখে খেলা ত হবে না। আচ্ছা উঠি, রাত্রি হল। বীরেনবাবু উঠিয়া গেলেন।

পটলা বিস্মিত হইয়া বলিল—লোকটার ত সবদিকেই বেশ আছে—লেখাপড়া, খেলাধুলো।

ল্যাটা কহিল—হ্যাঁ—গুল্‌ মেরে গেল কিনা তা কি করে জানবে?

পাঁচুবাবু কহিলেন—ভদ্রলোক, তার কথা অবিশ্বাস করে গুল বলাটা ঠিক নয়—

ল্যাটা প্রতিবাদ করিল—দেখুন না, যদি ভাল খেলতে পারে, তবে কুকুরের নামে নাম দেবেন।

পটলা কহিল—হ্যাঁ, দেখে শুনে বল—আগেই এ রকম বলা ঠিক নয়।

শচীনবাবু মন্তব্য করিলেন—গ্রামে এ রকম ছ'চার জন শিক্ষিত উৎসাহী লোক থাকলে হয়ত ছেলেপুলেগুলি মাছ হ'বে—

ল্যাটা বলিল—কি করে?

—শিক্ষিত লোক, তাদের দেখে উৎসাহ পাবে—উচ্চাকাঙ্ক্ষা হবে—

পটলা কহিল—শিক্ষা, দীক্ষা পেয়ে লাভ কি—বাড়ী গাড়ী ত শিক্ষিত কারও নেই—বরং কালোবাজার-টাজার ক'রতে শিখলে কাজ হ'তো—

ঠাকুর অহুনাসিক সুরে সুর করিয়া কহিলেন—হ্যাঁ, হ্যাঁ—লেখাপড়া শিখে আর মাছ হ'ল কে?

( ২ )

প্রায় বৎসরাধিক পরের কথা—

বীরেনবাবু নিকটস্থ একটি স্থলে মাষ্টারী আরম্ভ

করিয়াছেন। পাঁকিহান হইতে বাহা আনিয়াছিলেন তাহা নিশেধিত হইয়া গিয়াছে এবং উদ্যমের সাহায্যকারী আফিসে ঘুরিয়া ঘুরিয়া বিফল-মনোরথ হইয়াছেন। উপায়ান্তর না পাইয়া উদরায়ের জন্ত মাষ্টারী লইতে হইয়াছে—টিউসনিও করিতে হয়—

ঠাকুরের দোকানে বসিবার সময় আজকাল প্রায়ই তাঁহার হয় না। রবিবার বা বন্ধের দিনে সন্ধ্যার সময় হয়ত একটু বসেন। পূর্বে তিনি আসিলে পাড়ার যুবকদল আসন ছাড়িয়া বসিতে দিত, আজকাল তাহারা উঠেও না, বসিতেও বলে না। কেহ কেহ তাহাকে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া করুণা করিয়া বলে—ব'সবেন নাকি বীরেনবাবু?

—না, না, তোমরা ব'সো।

তাহারা দ্বিতীয়বার বসিতে বলে না, বীরেনবাবুও বসেন না।

সেদিন ঠাকুরের দোকান সরগরম। বিত্তবাবুর রাঁধুনী বায়ুনটি একটু ছিটগ্রস্ত, নিষ্কর্মা যুবকগণ তাহাকে রাগাইয়া খুব আমোদ উপভোগ করিতেছে এবং হোঃ হোঃ করিয়া দোকান ও রাস্তার মোড় মুখরিত করিয়া তুলিয়াছে; ঠিক ভ্রমনি সময়ে বীরেনবাবু উপস্থিত হইলেন।

বিত্তবাবুর বায়ুনটি তিরস্কার করিতে করিতে চলিয়া গেল, কিন্তু যুবকগণের উৎসাহ তবুও কমে নাই। বীরেনবাবু একটু ক্ষীণ প্রতিবাদ করিলেন—লোকটি হয়ত মনে ব্যথা পায়—দরকার কি?

যুবকগণের মাঝে একটা ইঙ্গিত খেলিয়া গেল—অর্থ অপরিষ্কার—এখন বীরেনবাবুর পিছনেই লাগা যাক।

পটলা বলিল—আচ্ছা বীরেনবাবু, আপনার সে দিনেয়ার বই কি হ'ল?

বীরেনবাবু কহিলেন—কি জানি, মামলা মোকদ্দমা হ'য়ে কি হয়েছে—

—খোঁজই রাখেন না?

—না, প্রয়োজনও নেই, সময়ও নেই—

ল্যাটা কহিল—আচ্ছা গত বছর রোজই আপনি সেজেগুজে কলকাতা যেতেন কি ঠুঁড়িতে?

—না, না—চাকুরীর চেষ্টায় খরতাম, তা জুটল না।

তুতো প্রশ্ন করিল—আপনার ছাত্রেরা কি পাশ ক'রবে?

—কেউ ক'রবে, কেউ ক'রবে না—

—ছাত্র—ঐ শেতলা আপনার কাছে পড়ে বুঝি ?

—হ্যাঁ—

পটলা কহিল—সে ত কলেজে পড়ে, সে আবার গুর কাছে পড়বে কি ? তাকে বাগালেন কি ক'রে ?

বীরেনবাবু অবাক হইলেন। ল্যাটা কহিল—ফেল ক'রবে বলেই ত পড়ছে !

ভয়ানক একটা রসিকতা হইয়াছে এমনি ভাবে সকলে হাসিয়া উঠিয়া চলিয়া গেল। বীরেনবাবু ব্যথিত দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন। বুঝিলেন সবই, কিন্তু কিছুই বলিলেন না—

ঠাকুর পান তৈয়ারী করিতেছিলেন, তিনি বীরেনবাবুর অসহায় মুখের দিকে চাহিয়া কহিলেন—এই যে পান খান বীরেনবাবু !

বীরেনবাবু পানটী মুখে দিতে ঠাকুর বলিলেন—আপনি আশ্চর্য্য হ'চ্ছেন ?

—একটু আশ্চর্য্য হ'য়েছি—

—আমি কিন্তু হইনা। আমি জানি কিনা ?

—কি ?

ঠাকুর হাত ঘুরাইয়া কহিলেন—ওসব কিছু না— কিছু না—

আর এক দিনের কথা—

পাড়ার নির্মলের সঙ্গে বীরেনবাবু আলোচনা করিতে ছিলেন। নির্মল একটা কিছু করিতে ইচ্ছুক, বীরেনবাবু তাই বলিতেছিলেন—এখানে যখন ইলেকট্রিসিটি আছে তখন একজোড়া ঘানিতে মাসে ২০০ টাকা, এমনি কি একটা খড়-কাটা কলে মাসিক ১৫০ টাকা হ'তে পারে—

বীরেনবাবু হিসাব করিয়া জিনিষটা প্রমাণ করিতে ছিলেন, এমন সময় শতীনবাবু অকিস-ফেরৎ আসিয়া দাঁড়াইলেন। কহিলেন—ট্রেন লেট—কি হ'চ্ছে আজ বীরেনবাবু ?

ঠাকুর কহিল—বানি—খড়ের কল—

শতীনবাবু হাসিয়া কহিলেন—বেশ আছেন, অবাচিত উপদেশে বীরেনবাবুর জুড়ি নেই।

বীরেনবাবু কহিলেন—তা একটু অবাচিতই দিচ্ছি— যদি এরা কিছু করে—

—আপনি কি ক'রলেন—এত থাকতে ৫০০ টাকায় মাষ্টারী কেন করেন ?

বীরেনবাবু হাসিয়া বলিলেন—মূলধনের মধ্যে দেহ ছাড়া যে কিছু নেই আর !

শতীনবাবু এক টিপ নস্ত লইয়া চলিয়া গেলেন।

কিছুক্ষণ বাদে পাঁচুবাবু, পটলা প্রভৃতি আসিয়া উপস্থিত। গল্প চলিতে চলিতে শীকারের কথা উঠিল— পাঁচুবাবু কহিলেন—এক ফায়ারে ৬টার বেণী পাখী আমি কখনও মারিনি—তাই মেলে না—

ভূতো কহিল—কাকা সেবার এক ফায়ারে ২১টা পাখী মেরেছিল।

নানারূপ তর্ক চলিতে লাগিল—এক ফায়ারে কতপাখী মারা সম্ভব। পাঁচুবাবুর কথা ৮১০টার বেণী মরিতেই পারে না। ভূতো বলে, সে চাক্ষুষ দেখিয়াছে ২১টা মরিতে। তর্ক যখন অনেকটা জমিয়া উঠিয়াছে তখন ঠাকুর কহিল— কেন বীরেনবাবু ত বাঘ-টাঘ মেরেছেন, গুর কাছে শোনো না—

ভূতো প্রস্ত করিল—আপনার জীবনে কত বেণী মেরেছেন বলুন—

বীরেনবাবু নির্বিকারভাবে বলিলেন—৪৮টা—অবশ্য চ্যাগা অর্থাৎ ব্রাইফ—১০নং ছররায় মেরেছিলাম—

পাঁচুবাবু কহিলেন—ঐ রকমই বাঘ মেরেছেন বুঝি— একগুলিতে দশটা—

পটলা কহিল—সব গুলু—কামারের কাছে স্বেচ চুরি ? বন্দুক ছুড়েছেন ত ?

কথাটা লইয়া হাসি ব্যঙ্গ চলিয়া যখন আসর একটু ঠাণ্ডা হইল তখন বীরেনবাবু কহিলেন—আপনারা আপনাদের জ্ঞান বুদ্ধি অভিজ্ঞতা দ্বারা অন্তর্কে বিচার করেন—তার বাইরে সব মিথ্যা। কিন্তু সেটা এ দেশ নয়—আমাদের সে সব বড়বিগে কখনও কখনও এত পাখী পড়ে যে জল দেখা যায় না—তাতে চোখ বুজে গুলি করলেও ৫০টা পাখী পড়তে পারে !

—সে দেশটা কোথায় ?

—পূর্ববঙ্গে—

সকলে হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। তুতো কহিল—  
—আমাদের এখানে বিল কোথায় যে পাখী পড়বে—  
হাসিলেই ত হয় না—

পাঁচুবাবু কহিলেন—ঐ জন্তেই ত ছেলেরা আপনার  
পিছনে লাগে—

বীরেনবাবু হাসিয়া বলিলেন—কেন? বলুন ত?

—আপনি বড় ছাাবলা, ওদের সামনে এসব গুল  
কি বলতে হয়! পাঁচুবাবু বিজয় গর্বে হাসিয়া  
উঠিলেন।

বীরেনবাবু বিস্মিত হইয়া কহিলেন—ছাাবলা?

—হ্যাঁ, সকলের সঙ্গেই আপনি মেশেন—বসে গল্প  
করেন, তাতে ওরা মান্বে কেন আপনাকে—  
আপনার বয়স ও শিক্ষাদীক্ষার কথা ভেবে সংযত হয়ে  
থাকবেন—

—সকলের সঙ্গে মিশবো না কেন? প্রতিবেশী, পাড়ার  
ছেলে—না মিশলেই সেটা অজ্ঞায় ও অহঙ্কারের হবে—  
মিশতে হবে, তাদের উন্নতির চেষ্টা করতে হবে, উৎসাহ  
দিতে হবে—তাই ত উচিত জানি—

—তাই ত ফলটা দেখছেন—

বীরেনবাবু একটু উত্তেজিত হইয়া কহিলেন—সেজন্ত  
নয় পাঁচুবাবু, কারণ জানি আমি।

বীরেনবাবু উঠিয়া চটি পায় দিতেছিলেন—পাঁচু  
বলিলেন—কারণটা কি?

—ওরা—মানে ষাঁরা আমাকে অসম্মান করে, তারা  
শেখেনি কি ক'রে চলতে হয়। অর্থাৎ যতটুকু শিক্ষাপেলে  
বুঝ বা মানীর সম্মান রাখা যায় ততটুকু শিক্ষা এরা  
পায় নি—যে অন্তর থাকলে অন্তর বেদনা বোঝা যায় সে  
অন্তর তাদের নেই—

বীরেনবাবু চলিয়া গেলেন। পটুলা কহিল—বাপরে  
অহঙ্কার! তবুও যদি মাষ্টার না হ'ত!

কেষ্টঠাকুর হাত নাড়িয়া কহিল—কিছু না!

—কি?

—লোকটা কিছু না! বাড়ী নেই, গাড়ী নেই, নগদ  
টাকা নেই—কিছু না—

কি বুঝিয়া জানি না সকলে হাসিয়া উঠিল—ঠাকুর  
কহিলেন—হ্যাঁ—হ্যাঁ—

( ৩ )

বছর খানেক পরে—

বীরেনবাবুর ভাগ্যের পরিবর্তন হইয়াছে—তিনি  
কলিকাতার এক কলেজে বর্তমানে অধ্যাপক হইয়াছেন এবং  
মামলা-বিড়ম্বিত সিনেমার ছবিখানা এতদিনে কলিকাতায়  
মুক্তিলাভ করিয়া বেশ নাম করিয়াছে এবং সঙ্গে সঙ্গে  
আর একটা কাহিনীও বিক্রয় হইয়াছে। তিনি একটু  
জায়গা কিনিয়া বাড়ী করিতে আরম্ভ করিয়াছেন।  
ঠাকুরের দোকানে তাই বড় আসা হয় না—

ঠাকুরের দোকানে তেমনি আড্ডা চলিতেছে—পটুলা-  
তুতোরা আছে, তাহার সঙ্গে পাঁচুবাবু ও তাঁহার শ্রালক  
দোকানে আসীন। কি একটা বিষয়ে আলোচনা  
চলিতেছিল। হঠাৎ একখানা মোটর মোড়ের উপর  
খামিল এবং বীরেনবাবু নামিয়া আসিলেন।

দোকানের নিকটবর্তী হইয়া বীরেনবাবু কহিলেন—  
কী ঠাকুর ভাল?

—আছি একরকম। খোঁজত নেন না—

—সত্যিই সময় পাই না ভাই, পেটের দ্বারে ঘুরতে হয়  
—তবুও প্রডিউসারের গাড়ীতে এসে পৌছেছি আটটার।  
পটুলা সসম্মানে জলচৌকাটা ছাড়িয়া দিয়া কহিল—বসুন,  
বীরেনবাবু—

পাঁচুবাবু প্রতিধ্বনি করিলেন। বীরেনবাবু বসিয়া  
কহিলেন—দিন ঠাকুর, অনেকদিন আপনার হাতের পান  
খাই নি—

ঠাকুর পান দিলেন। অবাস্তর একটু কথাবার্তার  
পরে বীরেনবাবু চলিয়া গেলেন।

পাঁচুবাবু শ্রালককে উদ্দেশ করিয়া কহিলেন—  
লোকটাকে চেন?

—না। কে?

—‘পথশ্রান্ত’ দেখেছি লাইট-হাউসে?

—হ্যাঁ।

—তারই কাহিনী-কার।

শ্রালকটি বিস্মিত হইয়া বলিলেন—সত্যি?

পটুলা কহিল—শুধু তাই নয়, কলেজের প্রফেসর—  
কলকাতায়—



পাঁচুবাবু কহিলেন—বিধান—জানী—বিখ্যাত পুরুষ—  
শালকটি কহিল—অথচ এমনি দোকানে বসে গল্প  
ক'রে গেলেন—  
—হ্যাঁ।

পাঁচুবাবু কহিলেন—তাই ঠাণ্ডো। ছোকরারা কেরাণী  
হ'য়ে ধরাকে সরা জ্ঞান করে, অথচ অত বড়লোক, কিন্তু  
যেমন নিরহঙ্কার তেমনি অমায়িক—

—পটলা কহিল—সকলের সঙ্গে সমান ব্যবহার—  
আমাদের সঙ্গে পর্যাঙ্ক—

কেঁঠাকুর হাত ঘুদাইয়া কহিল—কিছু না—বা ছিল  
তাই আছে—

পাঁচুবাবু কহিলেন—তার মানে—এ রকম অমায়িক  
লোক পাওয়া যায় না—

ঠাকুর কহিল—যখন মাষ্টারী ক'রত তখন ছায়াবলা ছিল,  
সম্প্রতি সিনেমার টাকা পেয়ে অমায়িক হ'য়ে গেছে—

পটলা প্রতিবাদ করিল—না—না—

কেঁঠাকুর রমণীশ্লভ ভদ্রিতে ও সুরে, মেয়েলী কণ্ঠে  
কহিল—হ্যাঁ—হ্যাঁ—

## রাশি ফল

### জ্যোতি বাচস্পতি

#### সিংহ রাশি

যদি সিংহ আপনার জন্ম রাশি হয় অর্থাৎ যে সময় চন্দ্র আকাশে সিংহ  
নক্ষত্রপুঞ্জে ছিলেন সেই সময় যদি আপনার জন্ম হ'য়ে থাকে, তাহ'লে  
এই রকম বল হবে—

#### প্রকৃতি

আপনার মধ্যে অনুভূতি অত্যন্ত গভীর এবং আপনার সকল কাজ  
নিয়ন্ত্রিত হয় আপনার হৃদয় দিয়ে। সব রকম স্নেহশ্রীতির ব্যাপারে  
আপনার মধ্যে যথেষ্ট আন্তরিকতা প্রকাশ পায় এবং শ্রীতির পাত্রের জন্ত  
আপনি ত্যাগ স্বীকার করতেও পরাধীন হন না।

আপনার মধ্যে বিশ্বাস ও আত্মপ্রত্যয় বেশ সুপরিণত, সেইজন্ত ছোট  
বড় যে কোন জায়গাতেই হোক কর্তা, পরিচালক, নেতা অথবা দলপতি  
হ'য়ে থাকে আপনার পক্ষে অসম্ভব নয়। আপনার মধ্যে যেমন উচ্চাভি-  
লাষ বা প্রভুত্বপ্রিয়তা আছে তেমনি উদারতা ও বদান্ততারও অভাব  
নেই।

সৌন্দর্যের দিকে আপনার একটা সহজ আকর্ষণ আছে, কাজেই চিত্র  
সঙ্গীত কাব্য অভিনয় প্রভৃতি কলাবিজ্ঞানের দিকে আপনার কম-বেশী ঝোঁক  
প্রকাশ পেতে পারে। কিন্তু এই সৌন্দর্যপ্রিয়তা বিপক্ষে চালিত হ'লে,  
আপনি অতিমাত্রায় ভোগী ও বিলাসী হ'য়ে উঠতে পারেন, সে সম্বন্ধে  
সতর্ক থাকে উচিত। আহার-বিহারে, পোষাক-পরিচ্ছদে সর্বত্রই আপনার  
সৌন্দর্যপ্রিয়তা লক্ষিত হবে। হৃদয় গোবাক, আসবাব, অলঙ্কার, গহ-  
ন্যাদি ব্যবহার করতে আপনি ভালবাসেন।

আপনার মধ্যে কল্পনা খুব প্রবল এবং আদর্শের দিকে কম বেশী  
ঝোঁক আপনার মধ্যে দেখা যাবে। আদর্শকে অনেক সময় আপনি

কাজে পরিণত করতে চাইবেন। একটা আদর্শ খাড়া ক'রে, তা দিয়ে  
আপনার সকল কর্ম-নিয়ন্ত্রিত করতেও পারেন। এর জন্ত অনেক সময়  
আপনাকে নিম্ন-অপবাদের সম্মুখীন হ'তে হবে, কিন্তু তা সত্ত্বেও আপনি  
আপনার আদর্শ অনুসরণ করতে বিব্রত হবেন না।

আপনার যে মত বা ধারণা একবার আপনার হৃদয়ে দৃঢ়ভাবে অঙ্কিত  
হবে, সহস্র বাধা, বিঘ্ন, যুক্তি তর্ক কিছুতেই তা বদলাবে না। যদি  
আপনি আধ্যাত্মিকতার দিকে যান তাহ'লে আপনার ভক্তি ও বিশ্বাস  
আপনাকে সাধনার উচ্চস্তরে নিয়ে যেতে পারে।

ভাল মন্দ যাই করুন আপনি তা একান্তভাবে এবং দৃঢ় নিষ্ঠার সঙ্গে  
করে যাবেন; কাজেই আপনার হৃদয় যদি সুপথে চালিত হয়, তাহ'লে তা  
যেমন উচ্চপ্রতিষ্ঠা ও সাফল্য দেবে, অপরদিকে বিপক্ষে চালিত হ'লে  
আপনাকে তা পশুদের নিয়ন্ত্রণে নামিয়ে নিয়ে যেতে পারে। তবে  
সাধারণতঃ খোলাখুলি ব্যবহার ভালবাসেন ব'লে, গোড়াতে একটু চেষ্টা  
করলেই আপনি সহজেই নিজের ভুল বুঝতে পারবেন এবং তখন নিজের  
চরিত্র সংশোধন করা আপনার পক্ষে অসম্ভব হবে না।

#### অর্থভাগ্য

আর্থিক ব্যাপারে আপনাকে সৌভাগ্যশালী বলা চলে। দানহুত্রে  
অথবা অপ্রত্যাশিতভাবে আপনি বহু অর্থ বা সম্পত্তি পেতে পারেন। কিন্তু  
অর্থের উপর আপনার খুব বেশী মারাত্মক কখনই থাকবে না। অনেক  
সময় আপনার সঞ্চিত অর্থ কোন আকস্মিক বিপদে নষ্ট হ'তে পারে,  
কিন্তু কোন আদর্শের জন্ত আপনি অর্থ বা সম্পত্তি ত্যাগ করতে পারেন।  
তাহ'লেও অর্থের ক্লেশব অভাব আপনার না হওয়াই সম্ভব। অভাব  
হ'লেই অনেক সময় তা সঙ্গে সঙ্গেই পূর্ণ হ'য়ে থাকে।

### কর্মজীবন

কর্মক্ষেত্রে অনেক সময় দায়িত্বপূর্ণ কাজের ভার আপনার উপর এসে পড়বে এবং আপনি যদি সুযোগ অবহেলা না করেন তাহলে গুরু দায়িত্বপূর্ণ কোন কাজ থেকে যথেষ্ট খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠা অর্জন করতে পারবেন। কিন্তু নিজের অবিবেচনা বা ইচ্ছাকৃততার জন্ত অনেক সময় সুযোগ পেয়েও তা কাজে লাগাতে পারবেন না। যদিও আপনি আপনার ব্যক্তিগত গুণপণ্যের জোরে কম-বেশী খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠা অর্জন করবেন—অপরের সাহায্য না নিয়েও, তবু সাবধান থাকার উচিত, যাতে কোন ভ্রান্ত ধারণা অসুসরণ ক’রে নিজের সকল প্রতিষ্ঠা না নষ্ট করে ফেলেন। সকল কাজে আপনার সংযম ও মন্ত্রগুপ্তি একান্ত আবশ্যিক। ভাবপ্রবণতার জন্ত ও বাড়াবাড়ি করার জন্ত অনেক সময় নিশ্চিত সাফল্যেও বিঘ্ন এসে উপস্থিত হবে।

আপনার সেই সকল কাজ ভাল লাগে যাতে অপরকে আনন্দ দেওয়া যায়, যার সঙ্গে কম-বেশী গোপনীয়তা জড়িত থাকে বা যাতে কোন রকম বৈচিত্র্য বা অসাধারণত্ব থাকে। সঙ্গীত, চিত্র-অভিনয়, বহুতা প্রভৃতিতে কৃতিত্ব প্রকাশ পেতে পারে। যে সকল কাজের সঙ্গে দৃষ্টির আনন্দ জড়িত থাকে, তা সে হুল স্তরেই হোক বা সুস্থ স্তরেই হোক সেই সকল কাজের দিকে আপনার একটা সহজ আকর্ষণ থাকা সম্ভব। কাজেই কৃষি, বাগ-বাগিচার কাজ, উৎপাদন শিল্প প্রভৃতি, খাজ্রব্যের ব্যবসায়, হোটেল, রেস্টোরাঁ, বেকারি প্রভৃতির যে কোন কাজে আপনার যোগ্যতা প্রকাশ পেতে পারে। তেমনি আবার শূন্য স্তরে গ্রন্থ-কর্তৃত্ব উদ্ভাবনা প্রভৃতিতে আপনি কৃতিত্বের পরিচয় দিতে পারেন। স্পেকুলেশান, লম্বী কারবার, ব্যাংকিং প্রভৃতিতেও আপনার দক্ষতা থাকা সম্ভব। মোট কথা যে সকল কাজে পরিশ্রমের সঙ্গে কিছু আনন্দ ও পরিশ্রমের পর দীর্ঘ অবসর থাকে এবং যাতে নিজের গুণপণ্যের জন্ত বিশিষ্ট ব্যক্তিদের কাছে খ্যাতি বা প্রশংসা পাওয়া যায় সেই সব কাজ করতে পারলে আপনি বিশেষ সাফল্য লাভ করবেন সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। আপনি খ্যাতি চান বটে, কিন্তু সস্তা জনপ্রিয়তা আপনাকে ভৃগু দিতে পারে না।

### পারিবারিক

আত্মীয়-স্বজনের ব্যাপারে আপনার নানা বিচিত্র অভিজ্ঞতা হবে। সাধারণতঃ তাঁদের সঙ্গে আপনার ঐতিহ্য বন্ধন দৃঢ় হবে, কিন্তু তা সত্ত্বেও অনেক সময় তাঁদের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হ’য়ে আপনাকে দূরে থাকতে হবে। তা ছাড়া আত্মীয়-স্বজনের সংশ্রবে এমন সব অদ্ভুত ঘটনা ঘটবে যার জন্তে আপনাকে মধ্যে মধ্যে অশান্তি বা মনোকষ্ট ভোগ করতে হবে।

পারিবারিক ব্যাপারে ও গৃহস্থালীর সংশ্রবে আপনার বহু ব্যয় হবে। আপনার পৈতৃক সম্পত্তি বিভক্ত হওয়া সম্ভব এবং তা নিয়ে কম-বেশী ঝগড়া হ’তে পারে। ঝগড়া এড়ানোর জন্ত বা অন্ত কারণে আপনি সম্পত্তি বিক্রয়ও করতে পারেন।

পিতা-মাতার জন্ত আপনার কম-বেশী চিন্তা উপস্থিত হ’তে পারে, তাঁদের জন্ত আপনার কিছু আর্থিক কতি অথবা উন্নতিতে বিঘ্ন হওয়াও অসম্ভব নয়। পিতার জন্মকালে কোন রকম দুর্ঘটনা অথবা জীবন-সংশয় হওয়ার আশঙ্কা আছে।

সন্তানাদির জন্তও আপনার কম-বেশী অশান্তি ভোগ করতে হবে। সন্তান লাভে বিঘ্ন হ’তে পারে, সন্তান হ’লেও তাঁদের ব্যাপার নিয়ে কম-বেশী চিন্তা থাকবে। সন্তানের মধ্যে কারো কোন রকম দৈহিক অথবা মানসিক অসাধারণত্ব থাকতে পারে—তা ভালই হোক আর মন্দই হোক।

### বিবাহ

আপনার দাম্পত্য-জীবন সাধারণতঃ ভাল হ’লেও সে সম্বন্ধে কম-বেশী চিন্তা উপস্থিত হ’তে পারে। আপনার স্ত্রী (অথবা স্বামী) আপনার অমুগত হবেন কিন্তু আপনাকে অনেক সময় তাঁর কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হ’য়ে থাকতে হবে তা ছাড়া অনেক সময় বন্ধু বান্ধবের জন্ত অথবা বিবর-কর্মের জন্ত আপনার দাম্পত্য জীবনে বিঘ্ন উপস্থিত হ’তে পারে। আপনি যদিও আপনার স্ত্রীর (অথবা স্বামীর) প্রতি স্নেহশীল হবেন তথাপি অবস্থা গতিকে অনেক সময় তাঁর উপর আপনার কর্তব্য ঠিকভাবে পালন করতে পারবেন না এবং তাঁর জন্ত-মধ্যে মধ্যে দাম্পত্য জীবনে কিছু অশান্তি উপস্থিত হবে অথবা তা খুব বেশী গুরুতর না হওয়াই সম্ভব। যার জন্ম-নাম বৈশাখ, ভাদ্র, পৌষ অথবা ফাল্গুন, কিংবা যার জন্ম-তিথি শুক্লপক্ষের বজ্রি বা জ্যৈষ্ঠদশী অথবা কৃষ্ণপক্ষের সপ্তমী, চতুর্দশী বা অমাবস্তা এরকম কারো সঙ্গে বিবাহ হ’লে আপনার দাম্পত্য জীবন বিশেষ সুখকর হবে।

### বন্ধুত্ব

বন্ধুর সংশ্রবে আপনার বিচিত্র অভিজ্ঞতা হবে। অনেক বিচিত্র ধরণের লোকের সঙ্গে বন্ধুত্ব হওয়া সম্ভব। বন্ধু সংসর্গ অনেক সময় আপনার বিবাদ বিসম্বাদ, সম্মানহানি বা অপব্যয়ের কারণ হ’তে পারে, সে সম্বন্ধে সতর্ক থাকা উচিত। আপনি সাধারণতঃ জনপ্রিয় হবেন এবং আপনার অনেক অমুচর পরিচরও থাকবে, কিন্তু তাঁদের সাহায্য আপনার বিশেষ কোন কাজে লাগবে না। অনেকক্ষেত্রে তাঁদের দ্বারা গুপ্ত-শত্রুতা হ’তে পারে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে তাঁদের জন্ত আপনার গুরুতর কতিও হ’তে পারে। আপনি নিজে বন্ধু-বৎসল হবেন কিন্তু বন্ধুর কাছ থেকে মৌখিক সহায়ত্ব ছাড়া অন্ত কোন সাহায্য কমই পাবেন। যার জন্ম-নাম বৈশাখ, ভাদ্র, অথবা পৌষ কিংবা যার জন্ম-তিথি শুক্লপক্ষের বজ্রি কি জ্যৈষ্ঠদশী অথবা কৃষ্ণপক্ষের সপ্তমী, চতুর্দশী কি অমাবস্তা এমন কোন ব্যক্তির সঙ্গে সঙ্গে বন্ধুত্ব আপনার পক্ষে কিছু আনন্দদায়ক হবে।

### স্বাস্থ্য

আপনার জীবনীশক্তি বেশ প্রবল হবে বটে, কিন্তু কোন দীর্ঘস্থায়ী জটিল ব্যাধি সম্বন্ধে আপনার সতর্ক থাকা উচিত। আপনার এমন কোন বিচিত্র ব্যাধি হ’তে পারে বা সাধারণ চিকিৎসা দ্বারা দূর হওয়া সম্ভব নয় এবং যার জন্ত দৈব কর্ম অথবা মানসিক চিকিৎসা প্রয়োজন হবে। রক্ত

সকালনের ব্যাঘাত এবং স্নায়ু ও অস্ত্রের বৈকল্য সর্বক্ষে আপনাদের সতর্ক থাকি উচিত। আপনার দেহ ভাল রাখতে হ'লে আনন্দ একান্ত আবশ্যিক। হৃদয় ও হৃদয় খাণ্ড গ্রহণ, হৃদয় দৃশ্য দর্শন, হৃদয় সঙ্গীত-শ্রবণ প্রভৃতি আপনার নষ্ট স্বাস্থ্য ফিরিয়ে আনতে সাহায্য করবে। অস্থির অবস্থায় লাল, গোলাপী, গেরুয়া প্রভৃতি রঙের জব্যাদির ব্যবহার আপনার রোগ নিরাময়ে সাহায্য করবে। খাণ্ডে জলীয় পদার্থের বেশী ব্যবহার আপনার না করাই ভাল। উপবাস ও একটানা অতিরিক্ত পরিশ্রমও আপনার স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর।

### অত্যাচার ব্যাপার

আপনার বহু ভ্রমণ হবে। অনেক তীর্থ ভ্রমণও হ'তে পারে। কর্মোপলক্ষে ভ্রমণ বা দীর্ঘ প্রবাসও অসম্ভব নয়। কিন্তু তীর্থযাত্রা আপনার পক্ষে খুব সুবিধাজনক নয়। কেননা সমুদ্রে বা তীর্থস্থানে বিপদ-আপদের সম্ভাবনা আছে। এমন কি জীবনের আশঙ্কা পর্যন্ত উপস্থিত হ'তে পারে, কিন্তু স্থলপথে ভ্রমণে আপনার লাভ ও প্রতিষ্ঠা বৃদ্ধি হওয়া সম্ভব। তা ছাড়া কর্মোপলক্ষে আপনাকে অনেক সময় বিদেশ বাস করতে হবে।

যৌন প্রেমের ব্যাপারে আপনার মধ্যে একনিষ্ঠতার একটা আদর্শ ধারণা থাকবে। কিন্তু সে সর্বক্ষে আপনার কোনরকম বিচিত্র অভিজ্ঞতাও হওয়া সম্ভব, যাতে করে সে আদর্শে স্থির থাকি আপনার পক্ষে কঠিন হবে। যৌন প্রীতির ব্যাপারে আপনাকে কম-বেশী দুঃখ পেতেই হবে। প্রায় পাত্তীর ( বা পাত্তের ) সঙ্গে বিচ্ছেদ তাঁর মৃত্যু অথবা কোন দুর্ঘটনা আপনার মনোকষ্টের কারণ হ'তে পারে। প্রায় ব্যাপারে কোনরকম কলঙ্ক বা অপবাদ হওয়াও বিচিত্র নয়।

### স্বর্ণীয় ঘটনা

আপনার ৭, ১৯, ৩১, ৪৩, এই সকল বর্ষগুলিতে নিজের অথবা কোন আত্মীয়ের সংশ্রবে কোনরকম দুঃখজনক অভিজ্ঞতা হওয়া সম্ভব এবং ১৩, ২৫, ৩৭, ৪৯, প্রভৃতি বর্ষে কোন সুখকর ঘটনা ঘটতে পারে।

### বর্ণ

আপনার প্রীতিপ্রদ ও আনন্দবর্ধক বর্ণ হচ্ছে সব রকমের মিশ্র ও বিচিত্র রঙ। রামধনুর মত রঙ। ময়ূরকণ্ঠি রঙ, সমুদ্রের বা আকাশের মত নীল রঙও আপনার পক্ষে উপযোগী—যে সব রঙের মধ্য থেকে অস্ত্র রঙের অভা পায় বা ভিন্ন ভিন্ন রঙের সমন্বয়ে বিচিত্র যে সকল রঙ, হয় তাও আপনার পক্ষে ভাল। দেহ মনের অস্থির অবস্থায় কিন্তু লাল রঙ ব্যবহার করলে উপকার পাবেন। সবুজ রঙ বর্জন করাই ভাল।

### রত্ন

আপনার উপযোগী রত্ন বৈদ্যুত ( Cats eye ) বিশেষতঃ স্বর্ণক্ষেত্রে বৈদ্যুত। ওপ্যাল ( Opal ), চন্দ্রকান্ত মণি ( Moon stone ) প্রভৃতিও আপনার ধারণের উপযোগী।

যে সকল খ্যাতিমান ব্যক্তি এই রাশিতে জন্মেছেন তাঁদের জন-করকের নাম—শ্রীশ্রীচৈতন্য দেব, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, অক্ষয়চন্দ্র সরকার, ডবলিউ সি ব্যানার্জি, অর্দেন্দু শেখর মুস্তফি, এলিফ সঙ্গীত রচয়িতা রবার্ট গুমান, শ্রীযুত দিলীপকুমার রায়, এলিফ ব্যবসায়ী কেশোরাম পোদ্দার, ডক্টর বীণেশচন্দ্র সেন, প্রভৃতি।

## রূসো

### শ্রীতারকচন্দ্র রায়

#### ( পূর্বসূত্র )

পাপিগণের অনন্তকালস্থায়ী শান্তিতে আমার বিশ্বাস নাই। ঈশ্বরই একমাত্র নির্বিকল্প পদার্থ ( absolute ), তিনিই একমাত্র চিন্তা-বেদনা-ইচ্ছাশক্তি-বিশিষ্ট সক্রিয় পুরুষ; আমাদের চিন্তা, বেদনা ও ইচ্ছা তাঁহার নিকট হইতেই আমরা প্রাপ্ত হই। যতই তাহার অসীমত্ব চিন্তা করি, ততই তাহাকে বুঝিবার অসামর্থ্য বোধ করি। যতই কম বুঝি, ততই বেশী ভক্তি করি। নতজানু হইয়া বলি, “হে সমস্ত সত্তার সত্তা, তুমি আছ, তাই আমি আছি। তোমাতে চিন্তা স্থির রাখিয়া আমার সত্তার উৎসে আমি উপনীত হই। তোমাতে বুদ্ধি সমর্পণ করাতোই বুদ্ধির সার্থকতা। তোমার অসীম সত্তার নিমজ্জিত হইয়া আমার মন আনন্দে পূর্ণ হয়, আমার অপূর্ণতা স্থখ প্রাপ্ত হয়।”

আমাদের হৃদয়ের তলদেশে একটি বৃত্তি আছে, তাহাটারই কর্মের দোষগুণ আমরা বিচার করি। এই বৃত্তির নাম—ধর্মবিবেক ( Conscience )। এই বিবেক প্রত্যেকের অন্তরেই বর্তমান। কিন্তু অল্পসংখ্যক লোকেই তাহার আদেশ পালন করে। প্রকৃতির ভাষায় তাহার আদেশ প্রদত্ত হয়, সংসারের মধ্যে সে ভাষা আমরা ভ্রমশঃই তুলিয়া ধাই।

ঈশ্বরকে আমি ভক্তি করি, তাহার দয়ায় আমি অভিভূত, কিন্তু তাহার নিকট কিছু প্রার্থনা করি না। তাহার নিকট কি চাহিব? আমার জন্ত তিনি অগতির নিরম ভ্রম করিবেন? আমার জন্ত অপ্রাকৃতিক ব্যাপার সংঘটিত করিবেন? যে অগৎ-শৃঙ্খলার জন্ত আমি তাহাকে ভক্তি করি, আমার জন্ত সেই শৃঙ্খলা ভঙ্গ করিবার জন্ত অস্বাভাবিক

করিব? সেরূপ প্রার্থনার জন্ত শান্তি হওয়া উচিত। আমি চাই তিনি আমার জুল সংশোধন করিয়া দিন, যদি সে ভুলে আমার বিপদ হইবার সম্ভাবনা থাকে।

ধর্মের বাহ্যিক রূপ ও ধর্ম এক পদার্থ নহে। ঈশ্বর চাহেন অন্তরের সেবা। অকপট অন্তরের সেবা সর্বত্রই একরূপ।

বুদ্ধিযারা বিশ্বাস দৃঢ়ীকৃত হয়। সর্বোপেক্ষা সরল ধর্মই সর্বোৎকৃষ্ট ধর্ম। অবোধ্য ও স্ববিরোধী অনুষ্ঠানের দ্বারা ধর্মকে আচ্ছাদিত করিয়া প্রচার করিলে সন্দেহ উপস্থিত হয়। ঈশ্বর অন্ধকার ভালবাসেন না; তিনি আমাকে যে বুদ্ধি দিয়াছেন, তাহা ব্যবহার করিব না, ইহা তাহার ইচ্ছা নহে। আমার বুদ্ধি অন্ধকে সমর্পণ করিতে বলার অর্থ যিনি বুদ্ধি দিয়াছেন, তাহাকে অপমান করা।

আমি প্রত্যেক ধর্মেই মঙ্গলদায়ক বলিয়া মনে করি। মানব-জাতির দুই তৃতীয়াংশ যিহুদী, খৃষ্টান ও মুসলমান ধর্মের বাহিরে। কোটি কোটি লোক মুসা, যিশু ও মহম্মদের নামও কখনও শোনে নাই। ঈশ্বরকে যখন অন্তরের সঙ্গে পূজা করা হয়, তখন সকল পূজাই সমান। হৃদয়ের পূজাই পূজা, যিনি আন্তরিক হয়, তাহা হইলে কাহারও পূজা ঈশ্বর অগ্রাহ্য করেন না। পুণ্যবান হৃদয়ই ঈশ্বরের মন্দির। নৈতিক কর্তব্য পালন হইতে কোনো ধর্মেই অব্যাহতি দেয় না। প্রত্যেক দেশে প্রত্যেক ধর্মেই সকলের উপরে ঈশ্বরকে ভালবাসা, এবং প্রতিবাদীদিগকেও আপনাদের মত ভালবাসাই সকল কর্তব্যের সার।

যাহারা প্রকৃতির ব্যাখ্যাবাদে মনুষ্যের অন্তরে ধর্মের বীজ বপন করে, তাহাদিগের নিকট হইতে দূরে থাকিও। দম্ভভরে তাহারা মনে করে যে একমাত্র তাহারাষ্ট জ্ঞানী, এবং তাহাদের কল্পনাস্রষ্ট দুর্য্যোগ তত্ত্বকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে বলে। মানুষ যাহা যাহা শ্রদ্ধা করে, সকলই তাহার উৎপাদিত করিয়া পদদলিত ও ধ্বংস করে; চুঃখার্ত জনগণের শেব সান্দ্রনা তাহার অপহরণ করিয়া লয়; ধন-ও-ক্ষমতাশালী লোকদিগের রিপূর চরিতার্থতার পথে একমাত্র বাধা তাহার অপসারিত করিয়া ফেলে; মনুষ্যের হৃদয়ের গভীরতম প্রদেশ হইতে পাপের জন্ত অনুতাপ ও সাধুজীবনপ্রাপ্ত সমস্ত আশা উন্মূলিত করে এবং মানবজাতির উপকারী বন্ধু বলিয়া গণ্য করে। তাহারা বলে সত্য কখনও অনিষ্ট করেনা। সে কথা আমিও বিশ্বাস করি। আমি ইহাও বিশ্বাস করি, তাহারা যাহা বলে, তাহা সত্য নহে।

উচ্ছৃঙ্খল দর্শনের (Philosophy) পরিণাম নাস্তিকতা, অন্ধ ভক্তির পরিণাম ধর্মোন্মত্ততা। এই উভয়ই বর্জন কর। ধর্মের পথে দৃঢ় হইয়া থাক, দার্শনিকদিগের নিকট নির্ভয়ে বল যে তুমি ঈশ্বরে বিশ্বাস কর, যাহারা পরমতাসহিষ্ণু তাহাদিগকে সদয় ব্যবহার করিতে শিক্ষা দেও। হয়তো তোমাকে একাই পথ চলিতে হইবে; কিন্তু তোমার অন্তর্ধানী তোমার সাক্ষী থাকিবেন, তাহার নিকটে বাহিরের সাক্ষীর মূল্য কি?

Bayle প্রমাণ করিয়াছেন ধর্মোন্মত্ততা নাস্তিকতা হইতেও অনিষ্টকর। তাহা অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু একথাও সত্য, যে নিষ্ঠুর ও রক্তপিপাসু হইলেও, ধর্মোন্মত্ততা হৃদয়-আলোড়নকারী একটি প্রবল

বৃত্তি, যাহা মৃত্যুকে অবজ্ঞা করিতে শিক্ষা দেয় এবং মানুষকে বিপুল কর্মশক্তি দান করে। ইহাকে যদি যথোচিত ভাবে চালনা করা যায়, তাহা হইলে মহত্তমগুণ ইহা হইতে উৎপন্ন হইতে পারে। কিন্তু ধর্মহীনতা কি করে? ধর্মহীনতা ও তাত্ত্বিক দার্শনিক প্রবৃত্তি জীবনের শক্তি ক্ষয় করে, হীনতম স্বার্থবোধের মধ্যে হৃদয়ের প্রবল বৃত্তিদিগকে কেন্দ্রীভূত করিয়া, হীনতার পক্ষে মানবাত্মাকে নিমজ্জিত করে এবং অলঙ্ঘ্য সমাজের ভিত্তি দুর্বল করিয়া ফেলে। কেননা ব্যক্তিগত স্বার্থের মধ্যে সাধারণ অংশ এতই কম, যে তাহা বিরোধী স্বার্থাংশ দমন করিয়া রাখিতে পারে না। নাস্তিকতা হইতে যে রক্তপাত হয় না, তাহার কারণ নাস্তিকদিগের শাস্তি-প্রিয়তা নহে; যাহা মঙ্গলকর, তাহার প্রতি উদাসীন্দ্ৰ এই কারণ। অধ্যয়নকে নিজে নিরাপদে থাকিতে পারিলে, অন্তরে কি হইল না হইল, তাহা গ্রাহ্য করিবার তাহাদের প্রয়োজন নাই। তাহাদের মন্তব্যের নরহত্যা হয় না সত্য, কিন্তু জগৎ প্রতিরুদ্ধ হয়, কেন না যে নীতি দ্বারা মানুষের বংশবৃদ্ধি হয়, তাহার ধ্বংস হয়। মানুষ হইতে মানুষকে তাহার পুণ্যক করে, তাহাদের সমস্ত ভালবাসা গুঢ় স্বার্থপরতায় পরিণত হয়।

দার্শনিকদিগের উদাসীন্দ্ৰ যথেষ্টাচারী রাষ্ট্রের শান্তির সমতুল্য। এই শান্তি মৃত্যুর শান্তি। মুক্ত ইহা অপেক্ষা অধিক ধ্বংসকারী নহে।

যদিও ধর্মোন্মত্ততার অব্যবহিত ফল তথাকথিত “দার্শনিকতার” ফল অপেক্ষা অধিকতর অনিষ্টকর, ইহার পরবর্তী ফলের অনিষ্টকারিতা তাহা অপেক্ষা অনেক কম।

Profession de foi গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে রূসো ঐশ্বরিক প্রত্যাদেশের (Divine Revelation) যৌক্তিকতা প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। মানুষের বুদ্ধি প্রত্যাদেশের সত্যতা সন্দেহে কোনও মীমাংসা উপনীত হইতে অক্ষম। বাইবেলের সরলতা ও মহত্ত্বই প্রত্যাদেশের প্রকৃষ্টতম প্রমাণ। খৃষ্ট যে কেবল মানুষমাত্র ছিলেন না, তিনি যে ধর্মোন্মত্ত ও ইতর সাম্প্রদায়িকতা-দ্রষ্ট ছিলেন না, তাহার বিনয়নম্র আচরণ ও চরিত্রের বিশুদ্ধি, তাহার জ্ঞান-গভীর বচনের মাধুর্য, তাহার ব্যক্তিত্বের মহিমা এবং তাহার উপদেশের মহত্ত্ব দ্বারা তাহা প্রমাণিত হয়। সঙ্কল্পিত দার্শনিকের জীবন যাপন করিয়াছিলেন, দার্শনিকের মতই মৃত্যু বরণ করিয়াছিলেন। যিশুর জীবন ও মৃত্যু, উভয়ই ঐশ্বরিক-ভাবাপন্ন। যিশুর চরিত্রের মত মহৎ চরিত্র বাইবেল-লেখকগণ কোথায় পাইয়াছিলেন? এমন মহৎ চরিত্রহীনতার উৎস কোথায় বর্তমান ছিল? এতাদৃশ চরিত্রের সৃষ্টি ও এতাদৃশ সত্যের আবিষ্কার যিশুর বাস্তব জীবন অপেক্ষাও অদৌকিক ব্যাপার। তাহার সন্দেহে সন্দেহে যে সন্দেহের উদয় হয়, হৃদয়ের নিশ্চিন্তি দ্বারা তাহা বিদূরিত হয়।

• রূসোর মত দুর্বল-চরিত্রও যৌন বিষয়ে শিথিল-নীতি ব্যক্তির মুখে এই সকল উক্তি বিশ্বাসকর বলিয়া মনে হয়। কিন্তু রূসোর সমগ্র চরিত্রই তাহার ভাবপ্রবণতা দ্বারা সম্পূর্ণরূপে প্রভাবিত এবং তাহার বুদ্ধি ও ইচ্ছা তাহার বেদনার (feelings) বশীভূত। এই বেদনা কত প্রবল ছিল, তাহা পুরোছিত হিউমের উক্তি হইতে বুঝিতে পারা যায়। তাহার

ঈশ্বরানুরাগ, বস্তুপ্রীতি, দরিত্রের প্রতি অমুকম্পা, প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের মধ্যে আত্মবিস্মৃত নিমজ্জন প্রভৃতি যেমন তাঁহার ভাবানুভূতির ফল, আদর্শ-লিপনা প্রভৃতিও সেই উৎস হইতেই উদ্ভূত। তিনি বেদনার উপাসক ছিলেন এবং ভাবাবেগের আনন্দে মগ্ন হইয়া থাকিতে ভালবাসিতেন। বেদনার উত্তেজিত কল্পনা তাঁহার যৌন লিপ্যঙ্গার উদ্বোধন করিলেও, হৃদয়ের মহত্তম প্রবৃত্তিসমূহও তাহা দ্বারা উদ্ভূত হইত। তাঁহার ধর্ম-মত ও রাজনৈতিক মত ও এই বেদনাদ্বারা প্রভাবিত এবং তাহার সৃষ্ট সাহিত্যও বেদনার রাগে রঞ্জিত। ইয়োরোপের Romantic movement এর তিনিই সৃষ্টিকর্তা। প্রজ্ঞাবাদিগণ (Rationalist) সর্ব-বিষয়ে যুক্তিকেই বিচারের মানদণ্ডরূপে গ্রহণ করেন। কিন্তু রুসো যুক্তি অপেক্ষা হৃদয় বৃত্তিকে (feeling) প্রাধান্য দিতেন। Pascal এর মত তিনিও বলিতেন “হৃদয়ের ও যুক্তি আছে, যাহা মস্তকে বুঝিতে পারে না।” (The heart has reasons, which the head cannot understand)। ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ করিতে পূর্ববর্তী দার্শনিকগণ যেরূপ সমস্ত যুক্তি প্রয়োগ করিতেন, সে সকলই বুদ্ধির যুক্তি (intellectual arguments)। কিন্তু রুসো বুদ্ধির উপর নির্ভর না করিয়া মানুষের হৃদয়ের মধ্যে ঈশ্বরের অস্তিত্বের নিদর্শন অন্বেষণ করিয়াছিলেন, এবং তথায় ধর্মার্থ-জ্ঞান, ভক্তি, শ্রদ্ধা-মিশ্র ভয়, উন্নত জীবনের আকাঙ্ক্ষা প্রভৃতির মধ্যে ঈশ্বরের অস্তিত্বের নিশ্চিত প্রমাণ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ধর্ম, সাহিত্য, রাজনীতি ও সামাজিক ব্যাপারে বেদনাদ্বারা প্রভাবিত হওয়াই Romanticism। ভাবে বিগলিত হওয়া, দরিত্রের দুঃখে অশ্রু-বিসর্জন, বিলাস-বহুল কোলাহলপূর্ণ নাগরিক জীবনে বিতৃষ্ণা, পঞ্জীর শাস্ত্র, সন্ত, সরল জীবনে প্রীতি, সম্পদে বিরাগ, দারিত্র্যের স্তুতি প্রভৃতি Romanticism এর বিশেষত্ব। রুসোর পূর্ববর্তী লেখকদিগের মধ্যে কাহারও কাহারও রচনায় এই সকল লক্ষণ অস্বাভাবিক পরিমাণে লক্ষিত হইলেও তাঁহার হৃদয়ে এই ভাব পরিণতি লাভ করিয়াছিল।

রুসোর প্রভাব রাজনীতিতেই সীমাবদ্ধ ছিল না। জার্মান দর্শন ইহা দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হইয়াছিল। Romain Roland লিখিয়াছেন Emile পাঠ করিয়া Kant মুগ্ধ হইয়াছিলেন। তিনি লিখিয়াছেন, “এক সময় ছিল, যখন মনে করিতাম জ্ঞানই সর্বাপেক্ষা গৌরবের বস্তু। এই জ্ঞান গর্ভভরে অজ্ঞ লোকদিগকে অবজ্ঞা করিতাম। রুসো আমার চক্ষু খুলিয়া দিয়া মিথ্যা শ্রেষ্ঠত্বাভিমান ভাঙ্গিয়া দিয়াছিলেন। তাঁহার নিকটই মানুষকে সম্মান করিতে শিখিয়াছিলাম।” Social Contract এর প্রভাবও Kant এর উপর কম ছিল না। “যে স্বাধীনতা মানুষের বিশেষত্ব” তাহার ধারণা তিনি এই গ্রন্থ হইতেই পাইয়াছিলেন। \* \* \* জার্মানির Sturm and Drang আন্দোলনের নায়কগণ—Lessing ও Herder হইতে আরম্ভ করিয়া Goethe ও Schiller পর্যন্ত সকলেই—রুসোর মত গ্রহণ করিয়াছিলেন। Schiller রুসোর বন্দনা সূচক একটি গীতি কবিতাও লিখিয়াছিলেন।

রুসোর মধ্যে বিভিন্নমুখী প্রতিভার একত্র সমাবেশ হইয়াছিল। তাঁহার চিন্তাই যে কেবল বিপ্লবমুখী ছিল, তাহা নহে। তাঁহার রচনার

রীতি দ্বারা বেদনার প্রকৃতি ও বেদনা প্রকাশের ভঙ্গীতেও বিপ্লবের সৃষ্টি হইয়াছিল। ভবিষ্যতের কলারীতি (Art) তিনি রূপান্তরিত করিয়া ছিলেন। তাঁহার বাক্যগুণা অনাধারণ ছিল। এক Bossuet ব্যতীত ফ্রান্সে এক্ষেত্রে তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী কেহ ছিল না। প্রাচীন গ্রীক ও রোমান বাগ্মিতা তিনি পুনরুজ্জীবিত করিয়াছিলেন। তাঁহার কতিপয় রচনার বাক্যগুণ্য একান্তই অভিজুত হইয়া পড়িতে হয়। Demosthenes এর রচনার স্বেচ্ছা, উচ্ছৃঙ্খলিত এবং আলামন প্রবাহে তাঁহার রচনা সমৃদ্ধ। মনের নিভৃত চিন্তার রূপায়নেও তিনি সূক্ষ্ম ছিলেন। তাঁহার রচনা-কৌশলে তাঁহার চিন্তা বাহুশূণ্য হইয়া পাঠকের সম্মুখে আবির্ভূত হয়। তাঁহার Confessions পাঠকের মর্ম্ম স্পর্শ করে। তাঁহার সমস্ত দোষ-গুণের মূল, তাঁহার মানসিক ও দেহাভ্যন্তরীণ বৈশিষ্ট্য, তাঁহার আত্মমগ্নতার (Egotism) অবশ্যস্বাভাবিক ফল। সামাজিক প্রথা ও সাহিত্যিক রীতি অগ্রাহ্য করিয়া, তিনি কেবল নিজের কথাই বলিয়াছেন। তিনি সত্য “আমির” সন্ধান পাইয়াছিলেন। মনের অন্ধকার কক্ষে তিনি যে যে রেশা অঙ্কিত দেখিতে পাইয়াছিলেন, তাহারই অমুসরণ করিয়াছিলেন।.....“সহস্র সহস্রলোক যাহা দমন করিয়া রাখে, তিনি নির্লজ্জ ভাবে আপনাকে নগ্ন করিয়া তাহা প্রকাশিত করিয়াছেন। আধুনিক মানুষের মনকে তিনি মুক্তি দিয়াছেন, এবং শৃঙ্খলভঙ্গ করিয়া আপনাকে জানিতে ও প্রকাশ করিতে শিখাইয়াছেন।

“এই নূতন জগৎকে প্রকাশিত করিবার জন্ত তাহাকে নূতন বন্ধনযুক্ত ও অধিকতর নমনীয় ভাবার সৃষ্টি করিতে হইয়াছিল। তিনি লিখিয়াছেন “আমার শৈলী আমি বাছিয়া লইয়াছিলাম। তাহার একরূপতা রক্ষা করিবার চেষ্টা করি নাই। যাহা আসিয়া পড়িয়াছে, তাহাই গ্রহণ করিয়াছি এবং অসংকোচে তাহার যথেষ্ট ব্যবহার করিয়াছি। যাহা অমুভব করিয়াছি, তাহা যেমন দেখিয়াছি বিনা দ্বিধায় প্রকাশ করিয়াছি, ফলের কথা ভাবি নাই। বিগত ঘটনার এবং তজ্জাত বেদনার স্মৃতির মধ্যে অবগাহন করিয়া আমি আমার মনের অবস্থার দ্বিবিধ চিত্র অঙ্কিত করিব, একটি ঘটনার সমকালীন অবস্থা, দ্বিতীয়টি বর্ণনাকালের অবস্থা।”

হৃদয় ও ভাবাবেগের এই প্রাচুর্য্য বিশৃঙ্খলায় পর্য্যবসিত হইতে পারিত। কিন্তু রুসোর সহজাত স্বেচ্ছাবোধ তাহা হইতে দের নাই। ১৭৬০ সালে তাহার মৃত্যুকরকে তিনি লিখিয়াছিলেন “আমি প্রথমতঃ গায়ক, রচনামণ্ডলীতে স্বেচ্ছার মূল্য আমার নিকট এত অধিক, যেহুগমতার অব্যবহিত পরেই, এমন কি সত্যায়ুগতির পূর্বেও তাহার স্থান।” প্রয়োজন হইলে এই স্বেচ্ছার জন্ত আখ্যানের সত্যায়ুগতি বিসর্জন দিতেও তাহার কুষ্ঠা ছিল না। স্বেচ্ছারক্ষার জন্ত ইচ্ছাপূর্ব্বক ব্যাকরণের নিয়ম লঙ্ঘন করিয়াছেন। তাঁহার কাছে হৃদয়ের স্থান ভাবের পূর্বে। তিনি বাক্য ও বাক্যাংশগুলি প্রথমে মনের মধ্যে গাহিয়া লইতেন, তাহার পর তাহাদিগকে শব্দে প্রথিত করিতেন। তিনি যে একজন বড় গভ কবি ও কবী Romantism এর অগ্রদূত ছিলেন, তাঁহার হৃদয় ও হৃদয়রীতি, তাঁহার ভাবানুভূতি এবং তাঁহার প্রত্যয় সকলের (idea) বিষয় বিবেচনা করিলে তাহাতে সন্দেহ থাকে না। Chateaubriand এবং La-

Martine রুসো হইতেই উদ্ভূত হইয়াছিলেন। Michelet ও George sand এর মধ্যে তিনি অনুপ্রাণিত।

শিক্ষাসম্বন্ধীয় আধুনিক সকল মতই রুসোর শিশু সম্বন্ধীয় জ্ঞান ও তাহার Emile দ্বারা প্রভাবিত। জেনিভার প্রসিদ্ধতম নবশিক্ষা-প্রতিষ্ঠান রুসোর নামে প্রতিষ্ঠিত। নিজের সম্বন্ধে দুর্বল হইয়াও তিনি ধর্মবিবেক-সম্বন্ধে দৃঢ় অথচ কঠোরতাবিজিত, স্থম্পষ্ট, জ্ঞায্য চালক বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিলেন। সত্য চরিত্রোৎকর্ষ আবিষ্কারে তাহার একটি উদার সহজাত পটুতা ছিল। তাহার অমুমত চরিত্র-নীতিতে উগ্রতা অথবা অসহিষ্ণু দাঢ়্য ছিল না। তাহা পরিবেশ-নিরপেক্ষ ছিল না এবং কোনও বিশেষ ভাব অথবা বিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিতও ছিল না। তাহার মূলে ছিল গভীর সহানুভূতি এবং মানুষের দুর্বলতার প্রতি অনুকম্পা। তাহা মানুষের জ্ঞানমুগত প্রয়োজনের উপযোগী ও জীবন্ত ছিল।

“অবচেতন মনের দ্বার উদ্ঘাটিত করিয়া তিনি তাহার অবজ্ঞাত ও দমিত সম্পদ এবং libido র হস্ত সাহিত্যে প্রকাশিত করিয়াছিলেন। Freud তাহার নিকট অংশতঃ স্বামী।

“Tolstoi তাহার নিকট হইতেই যৌবনে “বজ্রাঘাত” প্রাপ্ত হইয়া-ছিলেন। যুবক Tolstoi রুসোর চিত্র সমন্বিত একটি পদক পবিত্র

মূর্তির মত প্রজ্ঞাভরে গলদেশে ধারণ করিতেন। তাহার নৈতিক পুনঃপ্রাণ এবং তাহার Iasnai Polianar বিভাগের রুসোর উপদেশ ও দৃষ্টান্তের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তিনি তাহাকে স্মরণ করিতেন। ধর্ম ও কলা, উভয়ইই তুল্যরূপে উভয়ের মধ্যে সাধু ছিল। Tolstoi লিখিয়াছেন “রুসোর রচনা আমার হৃদয় এতই স্পর্শ করে, যে আমার বিশ্বাস আমিও ঐরূপ লিখিতে পারিতাম।” সত্যই তিনি রুসোর লেখাই পুনরায় লিখিয়াছেন। তিনি বর্তমান যুগের Jean Jacques। বর্তমান যুগের চিন্তার উপর রুসোর প্রভাবের এখনও শেষ হয় নাই। যুবক জাপান এবং নব চীন তাহার শিক্ষা গ্রহণ করিয়াছে।”

ইহার পরে Romain Rolland তাহার ব্যক্তিগত কৃতজ্ঞতা ব্যক্ত করিয়া লিখিয়াছেন “যে লেমান্ হ্রদের চতুর্দিকে তাহার অন্তর অনবরত ঘুরিয়া বেড়াইত বলিয়া রুসো লিখিয়াছেন, তাহার তীরে ভ্রমণ কালে আমি অনেকবার তাহার ছায়ার (shade) সাক্ষাৎ পাইয়াছি। Ville neuve এর গৃহে বসিয়া যখন আমি এই পংক্তিগুলি লিখিতেছি, তখন বাতায়নের ভিতর দিয়া Clarens এর উপসাগর ও সান্নিধ্য আমার দৃষ্টিগোচর হইতেছে। তাহার শীর্ষদেশে বৃক্ষরাজির মধ্যে জুলির গোপালরাগরঞ্জিত স্বপ্নাতুর গৃহ দাঁড়াইয়া আছে।”

## আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ

অধ্যাপক শ্রীমণীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এ, বি-এল

নয়

আন্দামানে জাপানী-রাজ

প্রায় তিন বৎসর পূর্বে মনিপুর রাজ্যের রাজধানী ইম্ফল, নাগা পর্বতের প্রধান সহর কোহিমা এবং বর্ধা সীমান্তের কাবো উপত্যকা অঞ্চলে ভ্রমণ করিবার সুযোগ ঘটিয়াছিল। ঐ সমস্ত স্থানে যুদ্ধের মধ্যভাগে কিছুদিনের জন্ত জাপানী সৈন্য আসিয়াছিল এবং সেই সময়ে যে সমস্ত লোক তথায় বাস করিয়াছে তাহাদের অনেকেরই নিকট-হইতে একব্যাক্যে জাপানীদের স্থগাতি শুনিয়াছিলাম। জাপানীরা নিরতিশ্রম ভ্রম, পরিশ্রমী, নিরমাসুহর্তী এমন কি খাড়াভাবে মরিয়া গেলেও অপরের নিকট হইতে জোর করিয়া কিছু গ্রহণ করেনা, এইরূপ উচ্ছৃঙ্খলিত প্রশংসা শুনিয়াছিলাম। আরও মজার কথা শুনিয়াছিলাম যে, ইম্ফলের কোন লোকই বৃষ্টিতে পারে নাই যে, নেতাজী স্মৃতি বা কোন ভারতীয় এই অভিধানে ছিলেন। তাহার বলেন যে, যুদ্ধের অবসানের পর তাহার এই সমস্ত সংবাদ শুনিয়াছিলেন, কিন্তু যুদ্ধের সময় কেবলমাত্র হাফ-প্যাণ্ট ও গেঞ্জী পরা, টেন গান বা ছোট রাইফেল শোভিত জাপানী সৈনিকই তাহার দেখিরা-ছিলেন, কোন ভারতীয়কে আদৌ দেখিতে পান নাই।

জাপানী সম্বন্ধে মনিপুরের এই কাহিনীর সম্পূর্ণ বিপরীত বিবরণ শুনিলাম পোর্টব্লেরারে। পোর্টব্লেরারে ৪৩ মাস জাপানী রাজত্ব ছিল। তাহা নিদারুণ অত্যাচার, দুঃখ এবং বিভীষিকার পরিপূর্ণ। অথচ মজা এই যে, পোর্টব্লেরারের অধিবাসীরা জানিতে পারিয়াছিলেন যে, ‘চন্দ্র বোস’ (কন্টিনেন্টাল কারদার স্মৃতি চন্দ্র বোসকে S. Chandra Basu বলা হইত) এই অভিযানের নায়ক এবং ১৯৪৩-এর নভেম্বর মাসে পোর্টব্লেরারের জিমখানা প্রাউণ্ডে তাহার নেতাজীর বস্তুতাও শুনিয়াছিলেন। জাপানী-আন্দামানে বাস করিয়াছেন, এইরূপ হিন্দু বা মুসলমান বাহাকেই জাপানীদের সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিয়াছি, তাহারাই পূর্বে কথা স্মরণ করিয়া আর একবার ভয়ে শিহরিয়া উঠিয়াছিলেন।

আন্দামানে জাপানীদের রাজত্বকাল সম্বন্ধে ওখানকার স্থানীয় লোকদের নিকট যে কাহিনী সংগ্রহ করিয়াছি, তাহাই সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করিতেছি। ইহার সন, তারিখ এবং সমস্তই ওখানকার লোকের স্মৃতি হইতে গৃহীত, কোন কাণ্ডজে বা পাখুরে প্রমাণ কিছুই দেখি নাই। নিঃস্বা, নিঃস্বা প্রমুখ অনেকের নিকট হইতে অল্পে অল্পে নিম্নলিখিত ইতিহাস সংগৃহীত হইয়াছে।



১৯৪১ সালের ডিসেম্বরে জাপানীদের হাতে সিঙ্গাপুরের পতন হওয়ার মাস খানেক পর হইতেই আন্দামানে বিভীষিকা দেখা দেয় এবং ভদানীন্তন ইংরাজ রাজ তিনপানি জাহাজ ভাড়া করিয়া আন্দামানে লইয়া বাইবার চেষ্টা করেন। কিন্তু দুইখানি জাহাজ পশ্চিমধ্যে জাপানীদের দ্বারা আক্রান্ত হইয়া জলমগ্ন হয় এবং একখানি মাত্র জাহাজ পোর্টব্লেরারে আসে। ঐ শেষ জাহাজ 'S. S. Neurolia' পোর্টব্লেরারের বন্দর হইতে ১২ই মার্চ ১৯৪২ সালে ভারত অভিমুখে যাত্রা করে। ঐ জাহাজে আন্দামানের সমস্ত অন্তরী ভারতীয় অধিবাসীদের ভারতে প্রেরণ করা হয়, যেতদ্বারাও অনেকেই চলিয়া যান, কেবল আন্দামানের Local Born-রা আন্দামানেই থাকিয়া যান। উক্তপদস্থ সাহেবদের মধ্যে ভদানীন্তন চিফ কমিশনার মিঃ ওয়াটারফল্‌স্‌, তাহার সেক্রেটারী মিঃ বার্ড, এলিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার মিঃ লিওনে, আন্দামানের বেতারকেন্দ্রের অধ্যক্ষ মিঃ লেটি, জেলপানার অধ্যক্ষ মিঃ ম্যাকমিলন্‌ এবং আরও কয়েকজন পোর্টব্লেরারেই থাকিয়া যান। আন্দামানের সামগ্রিক রক্ষা বাহিনী কিছুই ছিল না, প্রকৃতপক্ষে উহা খোলা সহর (open town) হিসাবে অরক্ষিতভাবেই পড়িয়া ছিল।

১৯৪২-এর ২১শে মার্চ তারিখে সকাল বেলা হইতে পোর্টব্লেরার সহরে সরকারীভাবে জানাইয়া দেওয়া হয় যে, জাপানীরা এই স্থানে অবতরণ করিলেই তোপ দাগিয়া সকলকে জানাইয়া দেওয়া হইবে। প্রকৃতপক্ষে এই তোপের কারণ ছিল এই যে, পোর্টব্লেরারের বেতার কেন্দ্রের (Wireless Station) নীচে ডিনামাইট বসান হইয়াছিল, এবং ঠিক ছিল যে, জাপানীরা দ্বীপে অবতরণ করিলেই ঐ ডিনামাইটের দ্বারা বেতার কেন্দ্র উড়াইয়া দেওয়া হইবে এবং তাহারই শব্দে স্থানীয় অধিবাসীবর্গ জাপানীদের অবতরণ বুঝিতে পারিবে। পরদিন রাতে অর্থাৎ ২২ ও ২৩ তারিখের সংযোগ স্থলে ২০।২৫ খানি জাপানী জাহাজ হইতে জাপানীরা আন্দামানে অবতরণ করিতে আরম্ভ করে। তাহারার রন্‌ দ্বীপ, করবাইনোস্তোপ, ক্রুঙ্গাবাদ এবং মেমিওর দিক হইতে আন্দামানে অবতরণ করে এবং পূর্বে পরিকল্পনা অনুসারে সেই মধ্য রাতেই ইংরাজগণ ডিনামাইট দিয়া বেতার কেন্দ্র ধ্বংস করেন।

পরদিন, অর্থাৎ ২৩-এ মার্চ সকালে সূর্যোদয়ের পর হইতেই পোর্টব্লেরারের পথে ঘাটে জাপানীদের গমনাগমন শুরু হয়। তাহাদের আকৃতি দেখিয়া স্থানীয় লোকেরা অনেকেই গুপ্তা সৈন্য আসিয়াছে বলিয়া প্রথমে ভুল করে কিন্তু পরে বুঝিতে পারে যে গুপ্তা নয়, জাপানী। প্রথমতঃ ইহাদের সহিত কাহারও কোন বিবাদ হয় নাই, উপরন্তু স্থানীয় লোকেরা ইংরাজ রাজত্বের অবসান বুঝিয়া আনন্দিত হইয়া জাপানীদের অভিনন্দনও জানাইয়া ছিল। কিন্তু জাপানীরা খাজানাবেই হউক বা অস্ত্র যে কোন কারণেই হউক, স্থানীয় লোকের বাড়ীতে প্রবেশ করিয়া খাজানামগ্নী চাহিতে আরম্ভ করে, এমন কি জোর করিয়া জিনিসপত্র লুটপাট করিতেও শুরু করে। ইহার ফলে দুই তিন দিনের মধ্যেই জাপানীদের বিরুদ্ধে স্থানীয় লোকেরা বিরাগ হইয়া পড়ে।

জাপানী অধিকারের তৃতীয় দিবসে এবার্ডিনের স্বর্জনান লোক্যাল

বর্গ ক্লাবের সন্নিহিতে বেলা বারোটোর সময় কয়েকজন জাপানী আকবর আলি নামক এক মুসলমান লোকাল-বরনের বাড়ীতে প্রবেশ করিয়া লুণ্ঠরাজ শুরু করে এবং এই কারণে উত্তেজিত হইয়া আকবর আলির যুবক পুত্র জুলফিকর আলি তাহার নিজের বন্দুক লইয়া ইহাদের তাড়া করে। ফলে একজন জাপানী সামান্য আহত হয় এবং সকলেই লুণ্ঠ করার মতলব ছাড়িয়া দিয়া পলায়ন করে। বেলা আন্দাজ তিনটোর সময় একদল জাপানী সৈনিক অফিসার সহ ঐ পাড়ায় আসিয়া আততায়ীকে ধরিবার চেষ্টা করে, কিন্তু জুলফিকর আত্মগোপন করিয়া পলায়ন করে। তখন জাপানীরা আকবর আলির বাড়ীতে আগুন লাগাইয়া দেয়। কাঠের বাড়ীতে আগুন দেওয়ার ফলে সেই অঞ্চলের সমস্ত বাড়ীতেই আগুন লাগে এবং কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই নিকটবর্তী সমস্ত বাড়ী ভস্মীভূত হয়। এই সমস্ত গৃহের প্রায় ২৫০।৩০০ অধিবাসীকে জাপানীরা সৈন্য দ্বারা পরিরোপিত করিয়া বলে যে, আততায়ীকে বাহির করিয়া না দিলে উহাদের সকলের উপর বেশিনপান চালাইয়া সকলকেই হত্যা করা হইবে। ইহাতে জুলফিকর নিজেই আসিয়া ধরা দেয়। রাতে জাপানীরা জুলফিকরকে বন্দী করিয়া রাখে।

পরদিন সকালে Local-Born Club-এর খেলার মাঠে (এই ক্লাবের অপর নাম ছিল Browning Club এবং অধুনা ইহার নামকরণ হইয়াছে Netaji Club) জুলফিকরের বিচার আরম্ভ হয়। এই বিচার দেখিবার জন্য স্থানীয় সমস্ত লোককে সৈনিকদের দ্বারা জোর করিয়া ধরিয়া আনা হয় এবং মাঠের মাঝখানে সর্বসদমকে জুলফিকরকে একটি মাত্র ছোট আঙুরওয়ার পরাইয়া মারপিট শুরু হয়। দশজন জাপানী সৈনিক এই প্রহার আরম্ভ করে। এইরূপ প্রহারের উদ্দেশ্য অপরাধীকে দিয়া অপরাধ স্বীকার করানো। সত্য হউক, মিথ্যা হউক, প্রহারের তাড়ায় অপরাধী নিরুপায় হইয়া অপরাধ স্বীকার করিলেই তাহার প্রাণদণ্ড সাব্যস্ত হইত এবং সঙ্গে সঙ্গেই জুজুংস্থ প্রশাসীতে তাহাকে বধ করা হইত। অবশ্য জুলফিকরের অপরাধ সর্বজনবিদিত, স্মরণ্য তাহার আর স্বীকারোক্তির প্রয়োজন ছিল না, একেবারেই তাহার উপর জুজুংস্থ শুরু হইয়া গেল। মাঠের চারিদিকে তিন চারিশত স্থানীয় অধিবাসী নিরস্ত্র ভাবে দাঁড়াইয়া এই শাস্তি দেখিতেছে ও দুইশত আন্দাজ জাপানী সশস্ত্র সৈনিক এই লোকগুলিকে পাহারা দিতেছে,—দর্শকদের মধ্যে জুলফিকরের পিতা, মাতা এবং স্থানীয় অসংখ্য নারী ও শিশু সকলেই ছিলেন। কাহারও মাঠ ছাড়িয়া বাইবার হুকুম ছিল না। "Zulficar Khan was jujutsued and killed" অর্থাৎ জুলফিকরের উপর জুজুংস্থ প্রয়োগ করিয়া হত্যা করা হইয়াছিল। এই জুজুংস্থ যে কি ভয়ানক ব্যাপার তাহা বাহারা দেখিয়াছে তাহারাই বর্ণিত হইয়াছে এবং বহু লোক মাঠেই মুচ্ছিত হইয়াছিল। মুচ্ছিত ব্যক্তিদের লাগি মারিয়া জাপানী সৈনিকরা মুচ্ছা ভাসাইয়া দিত।

জুজুংস্থ প্রথম পতন হইল একজন সৈনিক অপরাধীকে কাঁধে তুলিয়া মাটিতে আছড়াইয়া ফেলিল। সঙ্গে সঙ্গে আর একজন তাহার একটি হাত ধরিয়া মুচড়াইয়া কাঁধের হাড় ভাঙ্গিয়া ফেলিল, অপর একজন

এইরূপে অপরাধীর অপর হাত ভাঙ্গিয়া দিল। অপরাধী মাটিতে পড়িয়া খানিকক্ষণ ছটকট করিল, অতঃপর পায়ের টিবিয়া নামক হাড়ের উপর বন্দুকের কুঁদা মারিয়া সৈনিকরা অপরাধীর দুইটি পায়ের হাড়ই ভাঙ্গিয়া দিল। এই পর্যন্ত করিয়া সৈনিক-জল্লাদগণ কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিল, পরে তাহাদের ‘তেইজু’ অর্থাৎ অফিসার সমবেত দর্শকদের বুঝাইয়া দিল যে, জাপানীদের বিরুদ্ধাচরণ করিলে এইরূপ অবস্থাই হইবে। অপরাধী ব্যক্তি মুখু’ অবস্থায় জল প্রার্থনা করিতে থাকিলে একজন সৈনিক মাঠ হইতে কিছু ধূলা লইয়া তাহার মুখে চোখে ছড়াইয়া দিল। হাত পা ভাঙ্গা অবস্থায় অপরাধী চোখ মুখ হইতে ধূলা সরাইয়া ফেলিতেও অক্ষম। তাহার পিতা, মাতা, ভ্রাতা, পুত্র, আত্মীয় প্রতিবেশী সকলেই কাঠের পুতুল হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে বাধ্য। মুখে কোন শব্দ করিলে জাপানী রক্ষী সৈনিক বন্দুকের কুঁদা দিয়া বা লাথি মারিয়া আঘাত করিবে। নিরুপায় দর্শকগণ এ অবস্থায় অপরাধীর দ্রুত হুই কামনা করে।

অতঃপর জাপানী জল্লাদদের অপরাধীকে ডিড়িয়া দিয়া চলিয়া গেল, কেবল কতকগুলি সৈনিক গ্রহরী রহিল। এই সময় রৌদ্র উঠিতে লাগিল। ক্রমে রৌদ্রের তেজ বাড়িয়া গেল। ধূলায়, রৌদ্রে, অসংখ্য মাছির তাড়নায় হস্তপদ ভগ্ন অবস্থায় হতভাগ্য মাটিতে পড়িয়া ছটকট করিতে থাকিল, অথচ দর্শকগণের কাহারও মাঠ ছাড়িয়া বাইবার উপায় নাই বা হতভাগ্যের নিকটেও আসিবার উপায় নাই। সকাল হইতে এইরূপে বেলা বারোটা বাজিয়া গেল। জুলক্ষিকারের চোখ দুইটি জবা ফুলের মত লাল হইয়া গিয়াছে ও গলা দিয়া কেমন একটা গোঁমানির

শব্দ ছাড়া আর কোন শব্দ নাই, হাত ও পায়ের যে স্থানে হাড়গুলি ভাঙা হইয়াছে, সেই স্থানগুলি ভীষণভাবে ফুলিয়া উঠিয়াছে, শরীরের অন্যান্য নানাহানে রক্ত জমিয়া কালো হইয়া আছে, প্রশ্বাস, বায়ু এবং সুবাস লাল ও চোখের জলে মাটি ভিজিয়া গিয়াছে, গায়ের ঘাম আর লুই শুকাইয়া গিয়াছে, এই অবস্থায় একজন সৈনিক কতকগুলি আলপিন লইয়া হতভাগ্যের নিকটে আসিয়া এক একটি আলপিন তাহার পেটে, শিরে ও অন্ত্র ও আমূল বিঁধিয়া দিতে লাগিল। এক একটি আলপিন বেঁধে, আর অসহায় অপরাধী চিংকার করিয়া নড়িয়া চড়িয়া উঠে, অনাহারে, প্রচণ্ড রৌদ্রে দাঁড়াইয়া শিশু ও নারী দর্শকেরা এই পৈশাচিক বিচার ব্যবস্থা দেখিতে বাধ্য হয়। এই শাস্তির নাম বিচার, ইহা শাস্তি বলিয়া ওদেশী ভাষায় অভিহিত হয় না। এইরূপে আরও একঘণ্টা চলার পর বেলা একটার সময় যখন জুলক্ষিকার মরিয়া গেল, তখন ইহার উপর সেই দশজন সৈনিক একত্রে বন্দুক লইয়া গুলি ফেলিল। সেইদিন অপরাহ্নে ঐ হতভাগ্যকে ঐ মাঠেই সমাধি দেওয়া হয়। জাপানী অধিকারে এই জুলক্ষিকার পানই এইরূপে প্রচলিত নিহত হয়। নেতাজী ক্লাব গ্রাউন্ডে এক সন্ধ্যায় জুলক্ষিকারের কবর আমরা দেখিয়াছি। তাহার ভাতা এই কবরটি আমাদের দেখাইয়াছিল। জুলক্ষিকারের পিতা আকবর আলি তদবধি বিকৃত মস্তিষ্ক হইয়া গিয়াছেন। বৃদ্ধ এখনও জীবিত আছেন। আমরা তাহাকে দেখিয়াছি, তবে তাহার সহিত কোন ব্যাক্যলাপ করিবার চেষ্টা করি নাই, শুনিলাম তিনিও কাহারও সহিত কোন কথাই বড় একটা বলেন না। (ক্রমঃ)

## অগ্নিস্নান

### শ্রীশৌরীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য

দুঃখীরা সব ধৈর্য্যে দাঁড়াও শৌর্য্যে আজি শির তোলা,  
আত্মতেজের দীপ্তিতে ভাই জগন্নাথের দ্বার খোলা।  
বহু তোদের পাপ হয়েছে অগ্নিতে চলু করি স্নান,  
ধৈর্য্যেরি এই সিদ্ধিতে আজ করতে হবে সর্বদান।  
মম্বিনা কেউ পাপ পুড়ে যাক দগ্ধ হয়ে হও খাঁটি,  
নিষ্পাপ হলে তার তৈজসে ফাটেবে ওরে এই মাটি।  
হাজার হাজার বর্ষেরি পাপ তাহার প্রায়শ্চিত্ত কর,  
জাতির পাপের অগ্নিনানে পূর্ণাহতির মস্তপড়।  
তবু হয়ে শুদ্ধোদন আজ উদ্ধোধনের গান গাহ,  
সর্বনাশের অগ্নিনাশে বহিতে হবে সব দাহ।  
বাস্তব আশ্রয় মুক্ত্যবরণ আজকে তোদের পুরস্কার,  
ভয় কি নারী, দুঃখোদন আজ দেখায় যদি উরসু তার।  
বাক্সেনীর তেজ দিয়ে তুই কাটিয়ে পাপের রাজ সভা,

নিঃশাসে তোর ফুটিয়ে আজি তোলা দেখি মা লালস্বা।  
সেই জবারি পাপড়ী ফেটে উঠবে হঠাৎ হুম্কারি,  
শক্তিমারের মুক্তিভয় ঐ নিকটে দিন তারি।  
নিদোষী আর নিষ্পাপীরা ধৈর্য্য ধরে’ আজ দাঁড়া,  
জাতির পাপের অগ্নিদাহে বীরের মতন রও খাড়া।  
দুর্গতদের হিসাবনিকাশ আসছে করাল রক্তচোখ।  
কুদ্রবাতার বজ্রবাত এ অশীর্ষাদের পদ্য হোক।  
আত্মতেজে শৌর্য্যে দাঁড়া সর্বনাশের বন্দনাতে,  
কুদ্র বাবাত জীবন তোদের বাজাক নবীন বন্ধনাতে।  
সর্বনাশের মুকুট পরি’ বর্ষরতায় চরণদানি’  
চলু দাঁড়াবি বজ্রপায়ে লক্ষকোট বজ্রপানি।  
অগ্নিজলুক প্রলয় শিখায় জগন্নাথের গাওরে গান,  
তুমিভাই আজ মম্ব ধ্যানে শুদ্ধিতে কর অগ্নিস্নান।

# চন্দ্রমাখণ্ড

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়



—চৌদ্দ—

দারোগা তারণ তলাপাত্র সগৌরবে আহীর পাড়ায় গিয়ে পৌছলেন।

বেশ সমারোহ করেই এসেছেন। বিশ্বাস নেই লোক-গুলোকে। ফাঁকা আকাশের রোজ আছে ওদের রক্তের মধ্যে, কেক্সিত হয়েছে অতসী কাচের আলোর মতো তীব্র-তীক্ষ্ণতায়। আছে তালগাছ বিদীর্ণ করা বজ্রের গর্জন—মূল শুদ্ধ গাছ উপড়ে নেওয়া ঘূর্ণির অমাহুষী উল্লাস। বিশ্বাস নেই—বিশ্বাস নেই!

রিভলভার নিয়েছেন, সঙ্গে ত্রিশ রাউণ্ড গুলি। এ-এস্-আই বদরুদ্দিনের সঙ্গে বন্দুক। তা ছাড়া বন্দুকধারী ছ'জন কনেষ্টবল, জন আষ্টেক চৌকীদারও।

কনেষ্টবল আর চৌকীদারদের আগেই রওনা করে দিয়েছিলেন, তারা বখন গ্রামের কাছাকাছি এসেছে, তখন সাইকেল নিয়ে তিনি আর বদরুদ্দিন এসে ধরেছেন তাদের। তারপর সম্ভবতাবে এদিকে ওদিকে তাকিয়ে এসে চুকেছেন আহীর পাড়ায়।

নিমগাছের ছায়ায় নিচে বড় একখানা আটচালা ঘর। আট দশটা মহিষ চরছে আশে পাশে। বরেন্দ্রভূমির কাঠের মহিষ। নিরীহ দুর্বল জীব নয়; বস্ত্র-মহিষের মতো বিশাল বগু—মাথার ওপর খরশুড়ে আতঙ্কজনক সম্ভাবনা।

দারোগা বললেন, ওগুলো কী?

বদরুদ্দিন বললেন, মোষ স্ত্রার।

তারণ চটে উঠলেন।

—মোষ যে তা আমিও জানি। আমি কি গোরু যে আমার মোষ চেনাতে এসেছেন? সে কথা বলছি না। মানে, ওগুলো গুঁতোয় কিনা?

বদরুদ্দিন সলিদ্ধ চোখে অতিকায় প্রাণীগুলোর দিকে তাকাতে তাকাতে বললেন—কী করে বলব স্ত্রার, আমার সঙ্গে তো ওদের আলাপ নেই।

তারণ একবার কটমট করে তাকালেন বদরুদ্দিনের দিকে।

বললেন, আলাপ থাকলে কি আর খানার এ-এস্-আই হতেন? ওইখানেই বাঁধা থাকতেন।

—কী বলছেন স্ত্রার?—বদরুদ্দিনের চোখে বিদ্রোহ দেখা দিলে।

—না, কিছু না।—তারণ সামলে নিলেন। লীগের মস্ত্রীক—কাউকে চটানো ঠিক নয়। সব ভাই-বেরাদারের দল। কখন পেছন থেকে চুকলি খেয়ে দেবে—তারপরেই ভবিষ্যতের পথটি একেবারে বন্ধ। আর কিছু না হোক, ট্রান্সফার তো নির্বাণ। দুর্বটনা হিসেবে সেটাও কম মর্যাস্তিক নয়। এটা জেলার একটা বিখ্যাত ক্রিমিঞ্চাল খানা—একদল অত্যাচারী জোতদারও আছে। স্ত্রতরাং প্রাপ্তিযোগের ব্যাপারে খানাটা অনেকের কাছেই লোভনীয়। পট করে যদি সদরেক কাছাকাছি কোথাও বদলি করে দেয়, তা হলে বসে বসে বেলপাতা শুকতে হবে।

স্ত্রতরাং তারণ মুহূর্ত হাসলেন, একটু রসিকতা করছিলেন আপনার সঙ্গে।

—ওসব রসিকতা আমার সঙ্গে করবেন না স্ত্রার, আমার ভালো লাগেনা।—হাঁড়ির মতো মুখ করে জবাব দিলেন বদরুদ্দিন।

কথা বলতে বলতে এগোচ্ছেন ছ'জনে। একটু পেছনে পেছনে আসছে চৌকীদার আর কনেষ্টবলেরা। দিন দুইয়েক আগে কী করে একটা খাসি বাগিয়েছিলেন দারোগা, সেই সম্পর্কে সরস আলোচনা চলছে তাদের মধ্যে। স্ত্রতরাং একটু দূরে থাকাই নিরাপদ।

একজন চৌকীদার বলছিল, তুমি বুঝি ভাগ পাও নাই চৌবেজী?

চৌবে জুগাভরে জবাব দিলে, হামি গোস্-উন্ খাইনা—ব্রাহ্মণ ছাছি।

—সব ব্রাহ্মণকেই চিনা আছে হে—দ্বিতীয় চৌকিদার মিটি মিটি হাসল।

চৌবে কানে আঙুল দিলে, ছিঃ ছিঃ—উ সব মত বোলো।

দ্বিতীয় কনস্টেবল বামাচরণ বাঙালি। ক্লাশ এইট পর্যন্ত বিদ্যা। একটা সুপ্রিয়রিটি কম্প্রেন্স আছে তার—। খানায় যতক্ষণ থাকে, ততক্ষণ সে এল-সি—লোকে তাকে সম্মান করে মুহুরীবাবু বলে—চৌবের মতো পাহারাওলা সাহেব বলেন। কিন্তু এই সমস্ত জরুরি ব্যাপারে তার পদমর্যাদা ধুলিস্রাং হয়ে যায়—পটি পাখড়ী এঁটে তাকেও বেরিয়ে পড়তে হয় বন্দুক কাঁধে করে। নিতান্ত অতৃপ্ত বিরক্তির সঙ্গে বেরোয় বামাচরণ—পোষাকে না হোক, অন্তত মুখের চেহারায় টেনে রাখতে চেষ্টা করে একটা গাভীর মতো। বিছিয়ে রাখতে চায় আভিজাত্যের আবরণ।

সুতরাং বামাচরণ কিছু বলল না, শুনে যেতে লাগল।

তৃতীয় চৌকিদার বললে, মিছাই খালি দারোগার দোষ দেছেন। উ জমাদারটাই কি কম ঘুঘু হে! হামার দুই দুইটা রাওয়া মোঙ্গা বেমানুম প্যাটত্ সাঙ্কাই দিলে!

—এই চুপ চুপ। শুনিবা পাবে। খামি গেইছে।

সত্যিই খেমে গেছেন তারণ। মোষগুলোর কাছাকাছি এসে পড়েছেন।

—বদরুদ্দিন মিঞা?

—বলুন স্তার।

—সামনে মোষ।

বদরুদ্দিন বললেন, দেখতেই তো পাচ্ছি স্তার। আমার চোখ আছে, একজোড়া চশমাও আছে।

—হঁ!—দারোগা গভীর হলেন : ওঁতবে নাকি?

—কিছুই বলা যায়না স্তার!—বদরুদ্দিন পরম তৃপ্তিতে হাই তুললেন একটা।

জাকৃষ্ণিত করে লক্ষ্য করতে লাগলেন তারণ। এই শূদ্র প্রাণীগুলো সম্পর্কে তিনি কিঞ্চিৎ বিধাগ্রস্ত—এমন কি প্রবল পরাক্রান্ত দারোগা হয়েও এদের সম্পর্কে তাঁর একটা ভাবাবহ বিভীষিকা। কারণ আছে। ছেলেবেলায় একবার একটা এঁড়ে গোক ঠাঁকে ওঁতিয়ে নদীমায় ফেলে দিয়েছিল—সেই থেকে তিনি জীবন্তলোকে আদৌ পছন্দ করেন না।

—তা হলে দাঁড়ান, পেছনের ওদের আসতে দিন—দারোগা বললেন।

—ওরা কা ভাববে স্তার? মোষের ভয়ে এগোতে পারছেন না আপনি?—একটা চিম্টি কাটলেন বদরুদ্দিন।

—তা বটে।—দারোগা উত্তেজনা বোধ করলেন। কাপুরুষতার এই রকম অপবাদ সহ্য করা অসম্ভব। কোমর থেকে খুলে নিলেন রিভলভার।

—ওকি স্তার, রিভলভার আবার কেন?

—তেড়ে এলে গুলি করব।

—আপনি যে হিন্দু স্তার—বদরুদ্দিন আবার হাসলেন : ধর্মে বাধবে যে।

—না, বাধবে না। গোক মারলে পাগ হয়, কিন্তু মোর মারলে কা হয়, তা শাস্ত্রে লেখা নেই—সম্পূর্ণে অগ্রসর হলেন তারণ।

কিন্তু মোষগুলো লক্ষ্যই করলনা তাঁদের। যেন লক্ষ্য করবার যোগ্য বলেই মনে করলনা। প্রথম পরিতৃপ্তিতে মাটি থেকে কী একরাশ চিবিয়ে চলল তারা।

—বাক—বিপদের সীমানা পার হয়ে একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেললেন দারোগা : একটা সমস্তা মিটল। কিন্তু যা বলছিলাম। সামনের ওই আটচালাটি কার বলুন তো? বদরুদ্দিন জবাব দিলেন, যমুনা আশীরের।

—যমুনা আশীর!—দারোগা কপাল কোঁচকালেন : যেন চেনা-চেনা ঠেকছে নামটা।

—হাঁ স্তার। দাগীর খাতায় নাম আছে।

—হঁ, বুঝেছি। কিন্তু কী জাতের?

—ডেঞ্জারাস্। পাঁচ সাতটা হাঙ্গামায় জড়িয়েছে এ পর্যন্ত। একবার একটা খুনের দায়েও পড়েছিল—কিন্তু জালে পড়েনি, ছিটকে বেরিয়ে গেছে।

—এবার আর বেরোবেনা, গলা টিপে ধরব—ভদ্রাবহ একটা মুখ করলেন তারণ তলাপাত্র : জটাধর মার্জারের ব্যাপারে ওর হাত থাকতে পারে, কী বলেন?

—কিছুই অসম্ভব নয় স্তার। চেহারা দেখলেই বুঝতে পারবেন।

তারণ আবার ধামলেন। চিন্তিত মুখে বললেন, জোরান বুঝি খুব?

—বিরাট!—এককণে বদরুদ্দিনের মুখেও চিন্তার

ছাপ পড়েছে : আকারে প্রকারে ওই মোষগুলোর মতোই হবে। আর মেজাজও প্রায় ওই রকম।

—তা হলে দাঁড়ান। ওদের আসতে দিন। যে রকম লোক বললেন, হঠাৎ যদি বাঁপিয়ে টাঁপিয়ে পড়ে, গোলমাল হতে পারে একটা। কী বলেন ?

—নিশ্চয়—এবার বদরুদ্দিনও সমর্থন জানালেন। বাগানের মোষ সম্পর্কে তারণের মতো তাঁর অহেতুক ভ্রাতৃত্বিক দুর্বলতা নেই বটে, কিন্তু যমুনা সম্পর্কে কোনো বিশ্বাস নেই তাঁরও। বিশেষ করে কিছুদিন থেকে ডিসপেন্সিয়ারী ভুগছেন—একটু শাস্তিপূর্ণ ভাবেই ঝামেলা মিটিয়ে ফেলাই পছন্দ করেন তিনি। বদরুদ্দিন একটা সঙ্গে এনেছেন বটে, কিন্তু সেটা ব্যবহার করতে না হলেই আন্তরিক সুখী হবেন।

তারণ একটা সিগারেট ধরালেন।

—বুঝলেন বদরুদ্দিন মিঞা, এরিয়াটা এমনিতে মন্দ নয়। কিন্তু এইসব লোকের জগেই বা কিছু গোলমাল। বদরুদ্দিন ‘সাদী’র একটা বয়েৎ আওড়ালেন।

—সে তো ঠিক কথা স্তার। কিন্তু ব্যাপার কী, জানেন ? গোটা কয়েক কাঁটা না থাকলে কি আর গোলাপ তোলা যায় ?

গোলাপ না হোক, গোলগাল পাকা ফল তো বটেই। কিন্তু কাঁটা বড় বেশি। মাঝে মাঝে তারণ তলাপাত্রেরও জিতেন্দ্রিয় হয়ে যেতে ইচ্ছে করে। আজ পনেরো বছর দারোগাগিরি করে অনেক পোড় খেয়েছেন—কিন্তু বুকের ধুকপুকুনি থামেনি।

চৌকিদার আর কনেষ্টবলের দলটা এসে পড়ল।

তারণ এদিক ওদিক তাকালেন।

—লোকজন কাউকে তো দেখছি না। সব গেল কোথায় ?

—কাজে-কর্মে গেছে হয়তো। মোষ চরাতেও যেতে পারে।

—হঁ ! ডাকো তো দেখি কেউ —

চৌকিদারেরা মুখিয়েই ছিল। তিন চারজন এক সঙ্গে টেচিয়ে উঠল : যমুনা—যমুনা হে—

যমুনা এলনা—দোর গোড়ায় দেখা দিলে একটা মেয়ে।

ঝুম্রি। রূপের সঙ্গে কঠিন একটা নিষ্ঠুরতা মেশানো।

রূপের কাঁকন-পর শক্ত বাহ। আলাধরা চোখ। নাগিনী।

দোরগোড়ায় পুলিশ দেখে একটা ভয়ের চমক খেল গেল তার মুখের ওপর দিয়ে।

দারোগা মেয়েটার দিকে তাকালেন—কিন্তু চোখের ওপর চোখ রেখেই নামিয়ে নিলেন মাটিতে। দৃষ্টিটা যেন স্থবল করা যাচ্ছে না। অতসী কাচ। প্রতিকলিত—কেদ্রিত সূর্যের আলো।

—কে মেয়েটা ?—মুখ ঘুরিয়ে বদরুদ্দিনকে প্রশ্ন করলেন তারণ।

জবাব দিলে বামাচরণ। অভিজ্ঞ গভীর গলায় বললে, ওর মেয়ে—ঝুম্রি। বছর খানেক আগে একটা মারামারির ব্যাপারে একেও থানায় আনতে হয়েছিল স্তার। রেকর্ড আছে।

—হঁ। বাবের বাচ্চা বাব—নিজের অজ্ঞাতেই যেন স্বীকারোক্তি করলেন দারোগা।

নির্নিমেষ জলন্ত চোখে তাকিয়ে আছে মেয়েটা—কেমন অস্বস্তি লাগতে লাগল। দারোগার হয়ে বদরুদ্দিনই প্রশ্ন করলেন—তোরা বাপ কোথায় রে ?

—শো গেয়া !

—শো গেয়া ! বামাচরণ বাঁকিয়ে উঠল : আমরা এতগুলো লোক এই ঠাটা-পড়া রোদ্দুরে দাঁড়িয়ে ঠায় পুড়ছি আর তিনি শো গেয়া। ডাক, ডাক—

—ব্যাটা য্যান্ লাটসায়েব হচ্ছে !—একজন চৌকিদার ফোড়ন কাটল। এই মহলায় রাতে তার চৌকি দিতে হয় না—তা ছাড়া সঙ্গে সশস্ত্র বাহিনীও আছে। সেই ভরসায় আরো জোরের সঙ্গে সে তার বক্তব্য পেশ করল : ডাকি উঠাও জলদি !

মেয়েটা ঘরের ভেতর চলে গেল।

প্রথম ধারালো চেহারা। রূপের সঙ্গে নিষ্ঠুর কঠিনতা একটা। চোখ দুটো অদ্ভুত জলন্ত। দারোগা অশ্রমনস্ত হয়ে গেলেন মুহূর্তের জন্তে। ইম্পাত। নাগিনী।

শশব্যস্তে যমুনা আহাির প্রবেশ করল।

—দারোগাবাবু, জমাদারবাবু ! গোড় লাগি। তা রোদে কাঁহে দাঁড়াইয়ে আছেন ? আইয়ে বৈঠিয়ে—  
বারান্দায় রাখা খাটিকা আর চৌপাইয়ের দিকে

দৃষ্টি আকর্ষণ করে সে আহবান জানাল দলটাকে। সাইকেল নামিয়ে রেখে দারোগা সাংস্কার নিয়ে বারান্দায় গিয়ে উঠলেন। তাঁদের দেহের ভারে কাঁচ কাঁচ করে একটা আর্তনাদ জাগল খাটিয়ায়।

কিন্তু উদ্দেশ্য আতিথ্য নয়, কর্তব্য। যমুনার বিশাল দেহটার দিকে ভালো করে তাকিয়ে নিয়ে একবার রিভলভারের বাঁটটা স্পর্শ করলেন দারোগা—যেন আত্ম-বিশ্বাস সঞ্চয় করে নিলেন। তারপর বার করলেন পকেট থেকে তাঁর নোটবই আর কপিয়িং পেন্সিলটা।

—তোমার নাম?

—যমুনা আহীর হজুর।

—পেশা?

—হামরা আহীর হজুর। দহি, ফীর, বী তৈয়ার করি, বেচি।

—আর কিছু করো?—দারোগা নোট বই থেকে মুখ তুললেন। সন্তর্পণে এগোতে হবে এইবার, আস্তে আস্তে ঢুকতে হবে কাজের কথায়। টোকা দিয়ে দেখা দরকার।

—আর কী করব হজুর? মহিষ-টহিষ চরাই—সরল উত্তর দিলে যমুনা আহীর।

—কিছু করো না—না?—রিভলভারের বাঁটের ওপর আলগোছে বাঁহাতটা ফেলে রেখে দারোগা বললেন, এই মারামারি, খুন জখম?

আধহাত জিত কেটে যমুনা বললে, না।

—না? থানার খাতা কিন্তু অস্ত্র রকম বলে।—দারোগা আর একটা সিগারেট ধরালেন : তা ছাড়া চেহারাও তো তেমন সুবিধে নয় বাবু। ভালোমাহুষ বলে তো মনে হয় না।

—দেখছেন না, ব্যাটার চোখ কী রকম লাল? বদরুদ্দিন দারোগাকে আর একটু আলোকদানের প্রয়াস করলেন।

—চোখের আর দোষ কী হজুর?—যমুনা আপ্যায়নের হাসি হাসল : হামি খোঁকা খোঁকা গাঁজা পী।

—গাঁজা পী?—দারোগা ভ্রুকুটি করলেন : সে গুণটা আছে তা হলে। আর হাঁক?

—নিম্নমুখে খোঁকা খোঁকা পী।

—কোনোটাই বাকী নেই স্ত্রার। একেবারে সব-অপাধিত—বদরুদ্দিন আবার সংশোধনী জুড়ে দিলেন। দারোগা অত্যন্ত বিশ্লেষণী দৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণ করতে লাগলেন যমুনাকে। না—সন্দেহ নেই। এ লোকটা জটিলরক্মে খুন যদি নাও করে থাকে, খুন করার যোগ্যতা রাখে নিশ্চয়ই।

—জটিলরক্মে সিংকে চিনতে তুমি?

একটা চকিত সতর্কতার আভা খেলে গেল যমুনার মুখের ওপর। আস্তে টোঁক গিলল একবার।

—কে জটিলরক্মে সিং?

বদরুদ্দিন খিঁচিয়ে উঠলেন : জাকামি হচ্ছে—না? জটিলরক্মে চেনো না? কুমার ভৈরবনারায়ণের বরকন্দাজ?

—কুমার সাহেবের বরকন্দাজ তো ঢের আছে হজুর! কে জটিলরক্মে সিং?

—আহা, ভাজা মাছটা উল্টে খেতে জানো না?—তারণ ভেংচি কাটলেন : একেবারে কেঁটের জীব! যে লোকটা বিলের মধ্যে খুন হয়েছে, জানো তাকে?

—না।

—এখন তো জানবেই না।—দারোগা জুর হাসি হাসলেন, আর একবার ছুঁয়ে নিলেন রিভলভারটা, ভালো করে দেখে নিলেন নিজের দলটাকে : আমিও তারণ তলাপাত্র, জানিয়ে ছাড়ব। বাক—তোমার ঘর থানাভিত্তিক করব।

—করুন হজুর।

—চুকুন বদরুদ্দিন সাহেব—ভালো করে খোঁজ খাঁজ করুন।

বদরুদ্দিন বিব্রত বোধ করলেন। এ দারোগার অগ্রায়। নিজে স্বার্থপরতার মতো নিরাপদে বসে থেকে তাঁকে ঠেলে দিচ্ছেন বাঘের গর্তের ভেতর! বিশ্বাস নেই—এ লোকগুলোকে বিন্দুমাত্র বিশ্বাস নেই। হাতের নাগালে পেলে যে কোনো সময় বাড়ির ওপর একথানা দা বসিয়ে দিতে পারে।

—আপনিও চলুন না স্ত্রার—

—আপনি গেলেই যথেষ্ট হবে—সিগারেটটার টুকর দিয়ে নিশ্চিন্তভাবে বললেন দারোগা।

বদরুদ্দিন বিপর্যয়বোধে তাকালেন এদিক ওদিক।



—বামাচরণ এসো, চৌবে, তুমি আও।

কিন্তু সার্চ করে বিশেষ কিছু পাওয়া গেল না। মিলল শুধু লোহার তার দিয়ে গাঁটে গাঁটে জড়ানো দুখানা অতিকায় লাঠি।

দারোগা বললেন, লাঠি দুটো নিয়ে চলুন! রক্ত টুকু ধুয়ে কেলেছে হয়তো। কিন্তু কেমিক্যাল অ্যানালিসিস করলে কিছু না কিছু ট্রেস পাওয়া যাবেই।

—আর লোকটা? ছেড়ে যাবেন?

—পাগল!—দারোগা এবার খাপ থেকে রিভলভারটা বের করলেন, যমুনা, তোমাকে গ্রেপ্তার করা গেল।

—গ্রেপ্তার!—যমুনা কিন্তু ভয় পেল না। অল্প একটু হাসল: কেন হজুর?

—জটায়ব সিংয়ের খুনের দায়ে। চৌবে, পাকড়ো ইস্কা।

একটা সমস্ত প্রস্তুতি পড়ে গেল। কিছু বেন আসন্ন হয়ে আসছে। কোনো দুর্ঘটনা, কোনো দুর্ঘোষ। একুনি ভয়ংকর কিছু একটা হয়ে যাবে।

কিন্তু কিছুই হল না। যমুনা আবার হাসল। নিরন্তরে হাত দুটো বাড়িয়ে দিলে চৌবের দিকে।

হাতকড়া পরালেন বদরুদ্দিন। একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে উঠে দাঁড়ালেন। মনে হল, বেন বৃকের ওপর থেকে একতাল পাখর নেমে গেছে—কেটে গেছে একটা ভয়ানক ফাঁড়া। এত সহজে এমন প্রকাণ্ড মাছুষটাকে গ্রেপ্তার করা যাবে—এ বেন কল্পনাও ছিল না।

দারোগা বললেন, চলুন বদরুদ্দিন মিঞা। এবার আর দু'চারটাকে একটু বাজিয়ে দেখা যাক। এ রকম সাসপেন্ডেড আর কে কে আছে বলুন তো?

প্রজ্ঞাবানের গভীর গলায় বামাচরণ বললে, দুখীরাংম আহীর, চুতি আহীর, গগ্গা আহীর—

—চলুন, দেখা যাক একে একে।

দারোগা উঠে দাঁড়ালেন। যমুনাকে নিয়ে নেমে এলেন দাওয়ার বাইরে।

আর ঠিক সেই মুহূর্তেই দোরগোড়ায় এসে দাঁড়ালো মুন্সি। রূপের সঙ্গে নিষ্ঠুরতা। চন্দ্রবোড়া সাপের মতো

সৌন্দর্যের সঙ্গে বিযুক্ততা; শানানো ইম্পাতের মতো দীপ্তির সঙ্গে ঘাতকের ইজিত।

মেয়ের দিকে তাকিয়ে যমুনা একটু হাসল।

—হাজতে চললাম বেটি। কবে আসব ঠিক নেই।

ভৈসাগুলোকে দেখিস।

মুন্সি কথা বলল না। শুধু অতনী কাচের মতো চোখের অগ্নিদৃষ্টি ছড়িয়ে তাকিয়ে রইল খানিকক্ষণ। তারপর—

তারপর দারোগা যেই কথেক পা এগিয়েছেন, অমনি তীব্র তীক্ষ্ণ প্রচণ্ড গলায় একটা শিসের আওয়াজ করল সে। রোদে পোড়া মাঠের ওপর দিয়ে সেটা সাইরেনের মতো দূর দূরান্তে ভেসে গেল।

আর সময়ে দারোগা দেখলেন এক মুহূর্তে মাথা তুলেছে শান্ত নিরীহ মহিষের পাল। তাদের চোখগুলোতে আদিম অরণ্যের অমার্জিত বস্ত্র হিংসা। লেজ আকাশে তুলে জুড় নিশ্বাস ফেলতে ফেলতে সাত আটটা ছুটে আসছে তাঁদের দিকে।

গুলি করবার সূযোগ পেলেন না কেউ—হয়তো সাহসও হল না। দুই লাফে বদরুদ্দিন নিমগ্নাছটার উঠে পড়লেন—তার তৎপরতা দেখলে বানরও লজ্জা পেত। চৌকিদারদের একজন সিংয়ের গুতোয় ছিটকে পড়ল—বাকী সব যে যেদিকে পারে, উদ্ধৃষ্ণাসে ছুটতে শুরু করল। তারগণ হাতের সাইকেলটা ছুঁড়ে ফেলে গোটা কয়েক লাফ মারলেন, তারপর আবিষ্কার করলেন, একটা পাকে ভরা দুর্গন্ধ ডোবার মাঝখানে গলা পর্যন্ত তলিয়ে আছেন তিনি।

আর সেই অবস্থায়, বিস্ফারিত চোখ মেলে তারগ দেখতে পেলেন—বহু দূরে বিরাঘাসের বন ভেঙে তীব্রগামী তীরের মতো একটা লোক ছুটে পালাচ্ছে। দেখতে দেখতে দৃষ্টির বাইরে সে নিঃশেষে মিলিয়ে গেল।

সে যমুনা আহীর!

কিন্তু ভৌস্ ভৌস্ করে চলন্ত পাহাড়ের মতো ওটা কি এগিয়ে আসছে এদিকে? মোষ? চক্ষের পলকে পচা ডোবার ভেতরে ডুব মারলেন তারগ তলাপাত্র।

(ক্রমশঃ)



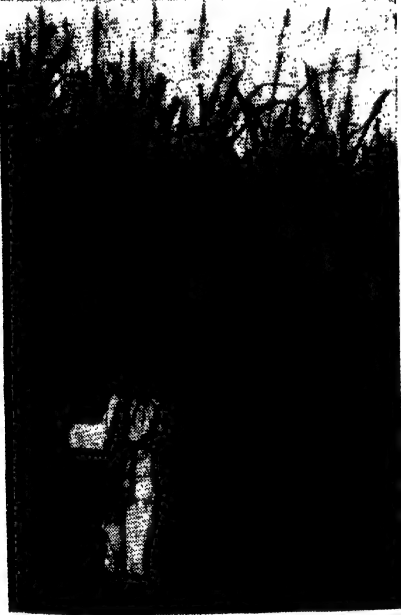
## পশ্চিম বাংলায় আখের চাষ

শ্রী অমূল্যরতন বন্দ্যোপাধ্যায় এম্-এস্-সি, ডিপ-এগ্রি (ক্যান্টাব)

পশ্চিম বাংলায় আখ চাষ হয় প্রায় ২ লক্ষ বিঘা জমিতে অর্থাৎ মোট চাষের জমির শতকরা মাত্র ০.৫৮ ভাগে ও যে পরিমাণ চিনি উৎপন্ন হয় তাহাতে বছরের ৫ মাসও চলে না। এই তুলনায় বিহারে ইহার চাষ প্রায় ১২ লক্ষ বিঘা ও উত্তর প্রদেশে ৫৫ লক্ষ বিঘা এবং ইহা তাহাদের মোট চাষের জমির শতকরা যথাক্রমে ২.১৮ ভাগ ও ৪.৮৬ ভাগ। পাক্সাবের অবস্থা মোটামুটি বিহারের মত।

আখাখের আখ-চাষ কম হওয়ার দরুন অনেকের তুল ধারণা আছে যে, পশ্চিম বাংলার আবহাওয়া আশ্রু চাষের উপযুক্ত নয়। বসন্ত: এখানকার আবহাওয়া আখ চাষের পক্ষে বিহার ও উত্তর

ভূবারপাত ও অতিরিক্ত শীতে আখের বেগুন ক্ষতি হয়, পশ্চিম বাংলায় সে আশঙ্কা নাই। এইসব কারণে এখানকার আখের বিবাগতি ফলন যেখানে ১৫০-২০০ মণ, সেখানে পূর্ব-পাক্সাবের গড় ফলন মোটামুটি ১০০ মণ এবং বিহার ও উত্তরপ্রদেশে ১০০-১৫০ মণ। এখানকার আবহাওয়ার আখের মধ্যে চিনির অনুপাতও বেশী হয়। বিহার ও উত্তর প্রদেশে চিনির কল সাধারণতঃ আখের ওজনের শতকরা ১০ ভাগের কম চিনি পাওয়া যায়; সেই তুলনায় পশ্চিম বাংলায় ১০.৮ ভাগ পাওয়া যায়। কাজেই পশ্চিম বাংলার আখের ফলন ও ১ গুণ দুই-ই ভাল হয়, অথচ এখানে বিহার বা উত্তর প্রদেশের মত আখ চাষের উন্নতির চেষ্টা ততটা হয় নাই।



পশ্চিম বাংলার আখের চাষ

প্রদেশের তুলনায় অনেক ভাল। এখানে বৃষ্টি হয় বেশী ও সেইজন্য ভরসে ছাড়াও আখ-চাষ করা সম্ভবপর হয়। এখানে আখের জমির পরিমাণ ১০ ভাগেও কম-সেতের ব্যবস্থা নাই। এই তুলনায় কম-সেতের হবিধাযুক্ত আখের জমির পরিমাণ উত্তর প্রদেশে শতকরা ৬০-৭০ ভাগ, বিহারে ৩০-৪০ ভাগ, পাক্সাবে প্রায় ৮০ ভাগ, মাদ্রাজে ২০-২৫ ভাগ এবং মহীশূর, বোম্বাই ও হায়দ্রাবাদে প্রায় ২০-১০০ ভাগ। দ্বিতীয়তঃ, পাক্সাব বা উত্তর প্রদেশের কোন কোন জায়গায়



কাটিং বাছাই

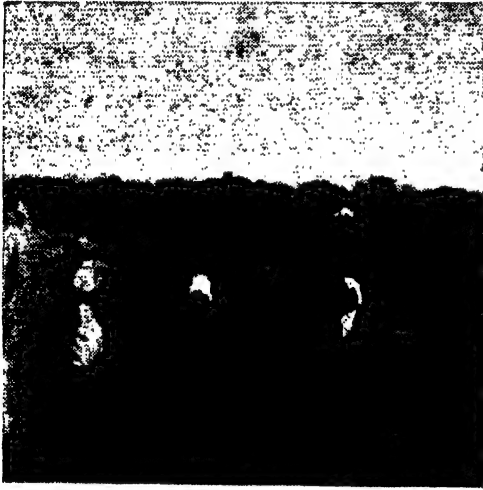
এককালে বাংলাদেশে বৃষ্টি আখ-চাষ ছিল। অনেকের মতে বাংলার পুরাতন নাম গৌড় শব্দটি 'গুড়' ও তাহার রাজধানী গৌড়-বর্ধন শব্দটি এখানকার 'পুর্নি' আখের নাম হইতে উদ্ভূত। চিনি-শিল্প সংরক্ষিত হওয়ার পূর্বে ভারতবর্ষ বর্ষ চিনির জন্য বর্ষব্যপ্তের উপর নির্ভর করিত, তখনও এখান হইতে বিদেশে চিনি রপ্তানী হইত। ইহার পর সংরক্ষণের হবিধার বধন এদেশে চিনির কল স্থাপিত হইতে লাগিল তখন হইতে অবস্থার পরিবর্তন ঘটে। বিহার বা মুক্তপ্রদেশে রেলপথের খুব হবিধা থাকায় ও সেখানে আখ একটি বিশেষ লাভজনক অর্থকরী ফল হওয়ার সেখানে চিনির কল স্থাপনের বড়টা হবিধা হইয়াছে বাংলাদেশে ততটা হবিধা হয় নাই। বাংলার পাটের মত

একটি পণ্য শস্যের ব্যাপক চাষের সুবিধা থাকায় এখানকার চাষীরা আখ চাষের প্রতি অনেকটা উদাসীন ছিল। ফলে উত্তর প্রদেশে চিনির কলের সংখ্যা যেখানে ৭০ টিরও বেশী ও বিহারে ৩০টির বেশী' সেখানে পশ্চিম বাংলার মাত্র ২টি ও তাহার মধ্যে আবার একটি অনেক দিন হইতেই বন্ধ।

এই অবস্থায় এখানকার আবহাওয়া আখ চাষের খুব অনুকূল থাকা সত্ত্বেও এখানে চিনি ও জুড়ের চাটতি রহিয়া গিয়াছে। বর্তমানে প্রধান প্রধান খাদ্য-শস্ত্র, পাট ইত্যাদির অভাব থাকায়, আখের চাষ বাড়ানোর উপায় নাই। বস্তুতঃ এই সব কারণে গত কয়েক বছরে আখ-চাষ প্রায় ১০ হাজার বিঘা কমিয়া গিয়াছে। এই অবস্থার অন্ততঃ আখ-চাষ প্রণালীর উন্নতি বিধান করিয়া বিধাএতি কলন বাড়ানোর চেষ্টা করা যাইতে পারে। এখানে অনুকূল আবহাওয়ার দরুন যদিও গড় কলন বিহার বা উত্তর প্রদেশের তুলনায়

ক্রমান্বয়ে হইতেছে। এই সব উন্নত জাতের কলন বেশী, রসে চিনির অনুপাত বেশী, রোগপ্রবণতা কম ও শক্ত হওয়ার দরুন শিমাল প্রভৃতি বস্ত্র শস্ত্রের উপরবে ও ষড়-বাতাসে ক্ষতিগ্রস্ত হয় না। ১৯৪০ সালে দেখা যায় যে, তাহার ১০ বৎসর পূর্বের তুলনায় এদেশে গড় কলন শতকরা প্রায় ২০ ভাগ বাড়িয়া গিয়াছে। উন্নত জাতের ব্যবহারই ইহার সর্বপ্রধান কারণ। এইজন্য দিন দিন উন্নত হইতে উন্নততর যে সব জাত উদ্ভাবিত হইতেছে তাহার চাষ বাড়ানর প্রতি দৃষ্টি রাখা দরকার। বর্তমানে কোয়েম্বাটোর ৪২১, ৪২৭, ৪১৯, ৩১৩ প্রভৃতি জাতগুলি পশ্চিমবাংলার পক্ষে উপযোগী।

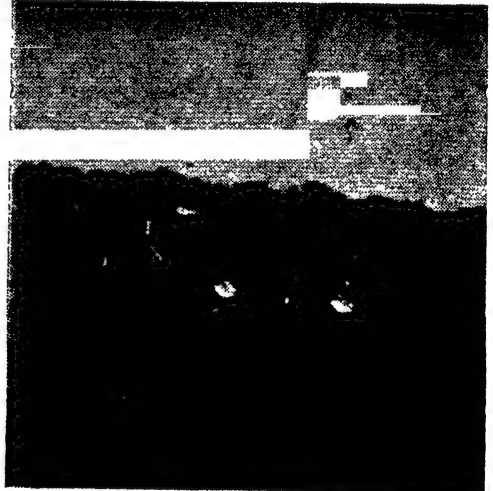
সার প্রয়োগে আখের কলন অস্বাভাবিকরূপে বৃদ্ধি পায়। পরীক্ষা দ্বারা জানা যায়, আখের পক্ষে সর্বাধিক নাইট্রোজেন দ্রবীভূত সারের প্রয়োজন বেশী। প্রতি পাউণ্ড নাইট্রোজেন প্রয়োগে সার অনুযায়ী বিধা প্রতি ১মণ হইতে ৩মণ পর্যন্ত আখের কলন বাড়ে। বিধা



কোর্টিং লাগানো

কিকিৎ বেশী, পৃথিবীর প্রধান প্রধান আখ-উৎপাদনকারী দেশের তুলনায় অনেক কম। যবদীপ বা হাওরাই ধীপে আখের বিধাএতি গড় কলন প্রায় ৫০০ মণ। পের, পোটা, রিকো ও অন্যান্য প্রায় দেশেই আখের কলন আমাদের তুলনায় বেশী। ভারতবর্ষের মধ্যেও বোম্বাই, মহীশূর, হায়দ্রাবাদ প্রভৃতি অঞ্চলের অনেক স্থানেই বিধাএতি ৪০০-৪৫০ মণ আখ পাওয়া যায়। পশ্চিম বাংলার সরকারী কৃষিক্ষেত্রে সাধারণতঃ বিধাএতি ৩০০-৩৫০ মণ আখ ফলে যেখানে আমাদের গড় কলন মাত্র ১৫০-২০০ মণ। চেষ্টা করিলে যে কলন বাড়ান যায়, ইহাই তাহার নিদর্শন। কলন বৃদ্ধির উপায় সম্বন্ধে এইবার আলোচনা করিব।

কলন বৃদ্ধির জন্য ভাল-জাতের বীজ ব্যবহার করা প্রয়োজন। পবেষণার ফলে অসংখ্য উন্নত জাতের আখ উদ্ভাবিত হইয়াছে ও



সার প্রয়োগ

প্রতি মোটারুটি ৪০ পাউন্ড নাইট্রোজেন দিলে কলন বেশ ভাল হয়। এই জন্য বিধা প্রতি ৪০-৫০ মণ গোবর বা কম্পোষ্ট, ২মণ খইল ও ১মণ এ্যামোনিয়াম সালফেট দরকার। গোবর বা দিয়া সবুজ সার দেওয়ারই ভাল। ইহা ব্যবহারেই বিধা প্রতি প্রায় ৫০ মণ আখ বেশী ফলে।

মাটিতে কলস্কটের অভাব হইলে, বিধা প্রতি ১মণ হাড়ের ওড়া দিতে হয়। লাল মাটিতে প্রতি বিঘার ১মণ চূণ দেওয়া দরকার। পটাস সার দেওয়ার প্রয়োজন হয় না; কারণ মাটিতে সাধারণতঃ যথেষ্ট থাকে তাহাই যথেষ্ট।

সার প্রয়োগের সময়েরও বিশেষ গুরুত্ব আছে। পবেষণার ফলে জানা যায়, ডগা বসাইবার ২৪ ঘণ্টা আগে গোবর, কম্পোষ্ট ও হাড়ের স্কট, ডগা বসাইবার সময়ে এবং বিজাল (tillers) বাহির হইবার

কালে এ্যামোনিয়াম সালফেট ও খইল প্রয়োগ করিলে সর্বাপেক্ষা ভাল ফল পাওয়া যায়।

### সেচ

ফলন বৃদ্ধির জন্য সেচের ব্যবস্থা বিশেষ দরকার। উপযুক্ত সেচ ছাড়া সার প্রয়োগে সম্পূর্ণ ফল পাওয়া যায় না। বর্ষার আগে জলের অভাবে আখের চারার বাড়ি ব্যাহত হইলে ফলনও কম হয়।

### চাষ পদ্ধতি

চাষ-পদ্ধতির ক্রটির জন্য ফলন কম হয়। ডগা বসাইবার সময় ও এগালী, ডগার গুণাগুণ, কসলের অন্ত্যস্ত পরিচর্যা প্রভৃতির উপর ফলন খুবই নির্ভর করে।

যে মাটিতে শীতকালে বেশ রস থাকে বা যেখানে জল-সেচের সুবিধা আছে সেখানে মাষ কাঁড়গুনে ডগা বসান উচিত। পরীক্ষার জানা যায়, কাঁড়গুনের পরে ডগা বসাইতে যত দেরী হয়, ফলনও তত কম হয়। চৈত্রের শেষের দিকে প্রতিদিনের বিলম্বে প্রায় ১০ মণ হারে ফলন কমিতে থাকে।

ডগার 'চোখ' সতেজ না হইলে প্রথম হইতেই চারা দুর্বল হইয়া পড়ে ও অন্ত্যস্ত অবস্থা অনুভব থাকে। সত্বেও ফলন যথেষ্ট কম হয়।

পরীক্ষার দেখা যায় যে, অগভীর নালীতে আখ লাগাইলে বা আখের সারি খন হইলে বিঘান কম হয় ও ইহার জন্য ফলনও যথেষ্ট কমিয়া যায়।

গাঁট হওয়া আরম্ভ করিলেই চারার গোড়ার মাটি বেওয়া দরকার। তাহাতে বিঘান ছাড়িবার সুবিধা হয়। পরীক্ষার জানা যায় যে, এই সময় সার দিলে বিঘান খুব শীঘ্র বাহির হয়। বিঘান অনেক দিন ধরিয়া বাহির হইতে থাকিলে শুষ্কের এক একটি আখ এক এক সময়ে পরিণত (matured) হয়।

আখের পাঁতা ছাড়াইয়া পরিষ্কার রাখা ও গাছ বড় হইলে তাহার ছোট ছোট বিঘান কাটিয়া কেলা দরকার। গাছ বাহাতে মাটিতে পড়িয়া না যার সেমিকে লক্ষ্য রাখা দরকার। কারণ গাছ মাটিতে পড়িয়া শাখা প্রশাখা বাহির হইলে রসের মিষ্টতা কমিয়া যায়।

আখ সময়মত কাটার উপরে শুষ্ক বা চিনির ফলন ও গুণ দুইই নির্ভর করে। অপরিণত বা অধিক পরিণত আখে চিনির ভাগ কম থাকে।

যুড়ি আখের (Ratoon) চাষ করিতে হইলে ভালরূপে সার দেওয়া ও অন্ত্যস্ত পরিচর্যা ব্যবস্থা করিতে হয়। তাহাতে ইহার

ফলন পূর্ব-কসলের তুলনায় কম হয় না। তবে ১ বৎসরের বেশী যুড়ি আখ না রাখিয়া শস্ত-পর্ধ্যায় (Rotation) করা ভাল।

### রোগ ও কীট শত্রু

রোগ ও কীট শত্রুর আক্রমণে সচরাচর শস্তকরা অন্তত ১০ ভাগ ফলন কমিয়া যায়। ধনী রোগেই (Red-rot) সর্বাপেক্ষা বেশী ক্ষতি করে। ইহাতে আখের ভিতর লাল হইয়া যায়। ইহা দমনের জন্য উন্নত জাতের ব্যবহার, বাছাই-ডগা লাগান, ক্ষেতের জল নিকাশের ব্যবস্থা, ক্ষেত পরিষ্কার রাখা ও শস্ত পর্ধ্যায় করা আবশ্যিক।

মাকরা পোকায় (Stem-borer) আক্রমণেও ভয়ানক ক্ষতি হয়। এই পোকায় শত্রু আখের এক পোকা আছে। অনেক জায়গায় তাহাদের সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া ইহা দমনের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ইহা দমনের জন্য



আখ কাটা

উন্নত জাতের ব্যবহার, আক্রমণের প্রায়ভেই পোকা ধ্বংস করা ও ক্ষেত পরিষ্কার রাখা দরকার।

ডগা ছিড়কারীও এক রকম পোকা আছে। তবে তাহাতে ক্ষতির পরিমাণ বেশী নয়। প্রথম-হইতেই ব্যবস্থা করিলে, ইহার বিস্তার হইতে পারে না।

উই পোকায় উপগ্রন্থ কসাইবার জন্য নালীর মধ্যে অধিক পরিমাণে নিম বা রেড়ির খইল দেওয়া, ২৪ ঘণ্টা কাল ডগা ফিনাইল জলে (২%) ভিজাইয়া রাখা, ডগার কাটা প্রান্তে সাবধানে আলকাতরা বা কেরোসিন লাগান, সেচের জলে আলকাতরা মিশান ইত্যাদি ব্যবস্থা করা বাইতে পারে। প্রতি বিঘায় ১২—১৩ সের হারে গ্যামেলিন ডগা বসাইবার আগে নালীর মধ্যে ছিটাইয়া দিলে উপকার পাওয়া যায়।



# ভারতীয় শিল্পসমূহে গবেষণার স্থান

শ্রীমোহিনীমোহন বিশ্বাস এম-এস-সি

মার্কিনযুক্তরাষ্ট্র একদিন কৃষিপ্রধান, অল্পদূরত আভিসমূহের মধ্যে পরিগণিত ছিল। ক্রমশঃ শিল্পোন্নয়নে মন দিয়ে, বিশেষ করে সমগ্র দেশের শিল্পক্ষেত্রে গবেষণার আবহাওয়া সৃষ্টি করে এই মহাজাতি স্বল্পকালের মধ্যেই শিল্পজগতে বিরাট প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারল এবং তার জাতীয় সম্পদ ও সমৃদ্ধি বহুগুণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হল। ১৮৮০ সালের পূর্বে মার্কিনে শিল্পস্বত্বীয় ল্যাবরেটরি বা গবেষণাগার বলে কিছুই ছিল না। উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে বিদ্যাত্ প্রভৃতি শিল্পে নতুন নতুন গবেষণা দ্বারা প্রভূত উন্নতি দেখা গেল। বেল, এডিসন, টমসন প্রভৃতি মণীবিগণ স্ব স্ব প্রতিভাবলে দেশীয় শিল্পসমূহে সুগাভীর আনয়ন করলেন এবং ঐ সকল আবিষ্কারের দ্বারা সমগ্র শিল্পজগৎ বেশ লাভবান হল।

বিগত প্রথম মহাসমরের সময় জার্মানীর শিল্পসমৃদ্ধির পরিচয় পেয়ে সমগ্র পৃথিবী বুঝতে পারল শিল্পগবেষণার অস্তাব এবং তখন বিবিধ শিল্পের কারখানাসমূহের মধ্যে অসম্ভিজিত গবেষণাগার নির্মাণের পরিকল্পনাসমূহ সর্বত্র গৃহীত হল। তখন উৎসাহ পড়ে গেল, জার্মান শিল্প-সমূহের পেটেন্ট সংগ্রহ করে আমেরিকার রসায়ন প্রভৃতি বিবিধ শিল্পের উন্নতি সাধনে মন দেওয়ার। বেল টেলিফোন ল্যাবরেটরিসমূহের গবেষণাগার এত অসম্ভিজিত ও বৃহৎ যে শিল্পোন্নয়নের জ্ঞাত গবেষণার প্রয়োজন সন্দেহে আর কোন সন্দেহই থাকতে পারে না। সেখানে প্রায় ৪,৬০০ বিজ্ঞানী গবেষণা ও পরীক্ষা কার্যে সর্বদা ব্যস্ত আছে। আলেকজান্ডার গ্রাহাম বেল যখন প্রথম টেলিফোনের আবিষ্কার করেন তখন থেকে আজ পর্যন্ত ঐ সকল গবেষণাগার দ্বারা কত মূল্যবান আবিষ্কারসমূহ সম্ভব হয়েছে তা সত্যই বিশ্বয়কর।

আমেরিকার আদর্শ ভারতীয় শিল্পপতিগণের উপর যে প্রভাব বিস্তার করেছে তার কোন সন্দেহ নেই। তবে একথা বলা অভাৱ হবে না—যে পরিমাণ অর্থ ও উৎসাহ মার্কিনযুক্তরাষ্ট্র শিল্পোন্নয়নে প্রয়োগ করেছে

তার একাংশও এখন পর্যন্ত ভারতবর্ষ পায় নি। গ্রেট-ব্রুটেনও মার্কিনযুক্তরাষ্ট্রের মত শিল্পবিস্তার গবেষণার উপযোগিতার বিষয় সম্যক উপলব্ধি করেছে এবং প্রথম মহাসমরের পর ব্রিটিশ শিল্পসমূহ প্রভূত উন্নতিসাধন করেছিল। আমেরিকা ও ইংলণ্ডের মত জাপানের শিল্প-বিস্তার বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। দুইটি পৃথিবীব্যাপী মহাসমরের মাঝখানে জাপান যে পরিমাণ শিল্পোন্নয়ন করতে সক্ষম হয়েছিল তা সত্যই বিশ্বয়কর। ১৯১৭ সালে জাপান সাম্রাজ্যের সৌভাগ্যে জাপানিজ ইনস্টিটিউট অফ ফিজিক্যাল এণ্ড কেমিক্যাল রিসার্চ স্থাপিত হয়। ১৯৩৪ সালে ঐ ইনস্টিটিউটে ৪০০ বিশেষজ্ঞ বিজ্ঞান সঞ্চায়ী গবেষণায় নিযুক্ত ছিলেন। এখান হতে প্রায় ৫০০ পেটেন্ট স্বত্ব গৃহীত হয়, যার প্রত্যেকটিই বেশ গুরুত্বপূর্ণ। মুক্তার চাব একটি বিশিষ্ট শিল্প (Stimulated pearl Industry)। মিঃ মিকিমোটো এবং টোকিও বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর কিকিচি মিংসিকুরি প্রভৃতি বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিকগণ এই বিশ্ববিখ্যাত শিল্পের প্রতিষ্ঠা করেন। এই শিল্পের প্রথম পেটেন্ট স্বত্ব গৃহীত হয় ১৮৯৬ সালে। তখন মুক্তার আকৃতি অর্ধবর্তুল অবস্থায় ছিল। সুদীর্ঘ ৪৮ বৎসরব্যাপী গবেষণা দ্বারা পূর্ণবর্তুল আকারের মুক্তাসমূহ তৈরী করা সম্ভব হল। এই বিরাট শিল্প সমুদ্রজলে নির্মিত ৯টি বৃহৎ কারখানায় বিস্তৃত আছে এবং প্রায় ৪০,০০০ একর পরিমিত স্থান এই সকল কারখানা নির্মাণ করতে প্রয়োজন হয়েছে। গবেষণা দ্বারা শিল্প কি পরিমাণ বিস্তৃতি লাভ করতে পারে ইহা তার একটি সুন্দর দৃষ্টান্ত।

ভারতীয় শিল্পসমূহের মধ্যে গবেষণার আবহাওয়া অত্যন্ত বিরল। বিভিন্ন শিল্পপ্রতিষ্ঠানের রিসার্চ ল্যাবরেটরি-সমূহ মাত্র কাঁচামাল ও তৈরীমালের বিত্তমত পরীক্ষা করেই খালাস। অনেকে এমন কি অতি পুরাতন শিল্প-প্রক্রিয়াগুলিকে দেশবিদেশের গবেষণাগার নতুন প্রক্রিয়া-সমূহের দ্বারা কিছুমাত্র উন্নত করতেও অনিচ্ছুক। হয়ত

একথা ঠিক যে সামান্য সংস্কার করতে পারলে অনেক ক্ষেত্রে উৎপন্ন মালের গুণ ও দাম বহুলাংশে বেড়ে যাবে। বাজারে একটি ঔষধ বা পণ্যদ্রব্য বেশ কাটতি দেখা যায় এবং দেশী কারখানায় প্রস্তুত বলে জনসাধারণের কাছে বেশ আদর পেয়েছে। ক্রমে ভাল ভাল বিলাতী মালের আমদানী বেড়ে গেল এবং দামও সস্তা হল। তখন পূর্বোক্ত ঔষধ বা পণ্যের কিঞ্চিৎ পরিবর্তন আবশ্যক। আধুনিক গবেষণা দ্বারা ঐ ঔষধ বা পণ্যের গুণ বাড়ান দরকার হবে, অবশ্য দামের দিকে নজর দিয়ে। জনসাধারণ যদি দেখে আগের থেকে কিছু ভাল জিনিস পাওয়া যাচ্ছে তখন বিলাতী-প্রীতি কিছু কমতে বাধ্য। কেবল স্বদেশীয়মানার দোহাই দিলেই চলবে না, দেখতে হবে সমন্বাপযোগী সংস্কারসমূহ যেনে নেওয়া হচ্ছে কিনা। পৃথিবীর সকল জাতির মধ্যে গবেষণার মনোভাব বেড়ে যাচ্ছে এবং ভারতবর্ষও তার সঙ্গে তাল রেখে চলবে।

ভারতীয় শিল্পসমূহের বর্তমান অবস্থা বর্ণনা করতে মিঃ মোরারজি দেশাইএর উক্তিটি উদ্ধৃত করা হল :—

“We in this country have not yet taken to research and experimentation to the required extent. We are only getting here in plant and machinery, what we see elsewhere, and after importing these we only learn to run them. But if we are to develop our industry, production of machinery has to go hand in hand with industrial research. Only then we will be able to work our industries successfully.”

অর্থাৎ—“আমাদের দেশে এখনও পর্যন্ত প্রয়োজনীয় গবেষণা ও পরীক্ষাকার্য্য আরম্ভ হয়নি। মাত্র বিদেশের অঙ্করণে শিল্পের আয়তন-বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন যন্ত্রপাতি আমদানী করতে সক্ষম হয়েছি এবং ঐসকল যন্ত্রের ব্যৱহার শিকার আমরা বিশেষ মনোযোগী হয়েছি। কিন্তু যদি শিল্পের যথার্থ উন্নতি সাধন করতে হয় ত শিল্পসম্বন্ধীয় গবেষণার সঙ্গে আবশ্যিক যন্ত্রপাতি নির্মাণেও মন দিতে হবে। কেবলমাত্র তখনই আমরা সাফল্যের সহিত শিল্পোন্নয়ন করতে সক্ষম হব।”

আমেরিকার ইতিহাসে দেখা যায় ঔপনিবেশিক অবস্থাকালে গ্রেট ব্রিটেন যখন শিল্প বিস্তারের জন্য আমেরিকাকে

যন্ত্রপাতি সরবরাহ করতে শৈথিল্য প্রদর্শন করে এবং ইংলণ্ডের আবিষ্কার সমূহ তার নিকট হতে গোপন করতে সক্ষম করে তখনই আমেরিকা বুঝতে পারে যে প্রকৃত শিল্পোন্নয়ন করতে হলে—গবেষণা ও যন্ত্র নির্মাণ উভয়-কার্য্যেই স্বাবলম্বী হতে হবে—পরমুখাপেক্ষী হলে চলবে না। তখন থেকে নিজ আবিষ্কার বাড়াবার চেষ্টা হল এবং তাহার শিল্পক্ষেত্রে ক্রমশঃ প্রচুর উন্নতি দেখা দিতে আরম্ভ করল।

যে কোন দেশের শিল্পগবেষণার উন্নতির পরিচয় পাওয়া যাবে তার গৃহীত পেটেন্ট সমূহের সংখ্যা গণনা করে। ১৯৩০ হতে ১৯৩৭ পর্যন্ত বিভিন্ন দেশে প্রতিবৎসর গড়ে যে সংখ্যায় পেটেন্ট মঞ্জুর করা হয়েছিল, নিয়ে তার তালিকা দেওয়া হল :—

দেশ	বাৎসরিক গৃহীত পেটেন্টের সংখ্যা।
আমেরিকা	৪৮,৬৯৭
জার্মানি	২০,৬২১
ফ্রান্স	২০,০২৫
গ্রেট ব্রিটেন ( ১৯৩০-৩৫ )	১৮,৪১৭
ইটালি	১০,৬৩৪
বেলজিয়াম	৭,৩১৫
সুইজারল্যান্ড (১৯৩০-৩৬)	৭,৩০৭
জাপান	৪,৮৪৫
চেকোস্লোভাকিয়া	৩,৬১৩
ভারতবর্ষ	৮৯৮

উক্ত পেটেন্ট তালিকায় দেখা যায় যে ভারতবর্ষ পৃথিবীর মধ্যে কেবল যে আমেরিকা জার্মানি প্রভৃতি উন্নত রাষ্ট্র-সমূহের অপেক্ষা নিম্নে স্থান পেয়েছে তা নয়—বেলজিয়াম, সুইজারল্যান্ড এবং চেকোস্লোভাকিয়া প্রভৃতি ক্ষুদ্র রাষ্ট্র-সমূহ অপেক্ষাও অনেক কম সংখ্যক পেটেন্ট গ্রহণ করতে সক্ষম হয়েছে। সুতরাং শিল্পক্ষেত্রে পৃথিবীর বিভিন্ন রাষ্ট্রগণ যে পরিমাণ ত্রীবৃদ্ধি করেছে ভারতবর্ষ বর্তমানে তাহা আশা করতে পারে না। যখন দেখা যায় যে প্রত্যেক রাষ্ট্রই পেটেন্ট-প্রথাকে বেশ আদরের চক্ষেই দেখছে, তখন ভারতবর্ষ তাহা অবহেলা করতে পারে না। সকল রাষ্ট্রের পক্ষেই শিল্পোন্নয়নের একই পথ এবং স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবে ভারতবর্ষকেও ঐ পথই অঙ্গসরণ করতে



হবে। আবার দেখা যায় যে ভারতবর্ষে গৃহীত পেটেন্ট-সমূহের মধ্যে বিদেশী শিল্পপতিগণেরই কৃতিত্ব বেশী। সুতরাং শিল্প জাতীয়করণ করবার সময় স্মরণ রাখতে হবে, যেন স্বদেশের বৈজ্ঞানিক ও শিল্পপতিগণ সর্বত্রই নিজ দেশের পেটেন্টসমূহ সংগ্রহ করতে পারে। পেটেন্ট প্রথা সম্বন্ধে দেশীয় বিশেষজ্ঞগণের আহ্বার অতীব দেখা যায়, অথচ আবার অনেককে বিদেশে পেটেন্ট সংগ্রহের জন্য আবেদন করতে দেখা যায়। ইহা কেবল যে আত্ম-প্রচার ছাড়া আর কিছু নয়, তাহা বলা বাহুল্য। ইহা জনসাধারণের উপরও খানিকটা নির্ভর করে। যেমন একই যন্ত্র যদি কোন বিলাতী কোম্পানী পেটেন্ট সংগ্রহ করে তৈরী করে ত তাহা স্বদেশে প্রস্তুত অপেক্ষা বেশী সমাদৃত হবে সন্দেহ নেই। দেশের জনসাধারণকে তাই স্বদেশের আবিষ্কারসমূহকে সর্বত্রই পৃথিবীর সমক্ষে বড় করে তুলতে হবে এবং ইহাতে যদি নিজ নিজ বিলাসিতা ও কৃতির খানিকটা ত্যাগ করতেও হয় ত তাহা বাঞ্ছনীয়। পেটেন্ট সম্বন্ধে দেশের বৈজ্ঞানিকগণের দৃষ্টিভঙ্গি সর্বত্রই বদলাতে হবে। ভারতবর্ষের পেটেন্ট প্রথা সম্বন্ধে দেওয়ান বাহাদুর কে, রামাপাই বে নিম্নোক্ত মন্তব্য করিয়াছেন তাহা বেশ সমন্বয়পোষী। “The role of the Patent system in India may be compared to the role of a hundred horse-power engine turning out one horse-power work, ninety percent of which is for the benefit of aliens.”

অর্থাৎ—“ভারতীয় পেটেন্ট-প্রথার কার্যকারিতার সহিত একটি শতঅংশশক্তিবিশিষ্ট এঞ্জিনের তুলনা করা চলে—যে এঞ্জিন মাত্র এক অংশশক্তির কাজ করে এবং তার মধ্যেও আবার শত করা নব্বই অংশ বিদেশীর হিতার্থে ব্যয়িত হয়।”

ইহা ভারতীয় বৈজ্ঞানিক এবং বিশেষজ্ঞগণের পক্ষে কলঙ্কের কথা। বর্তমানে কাউন্সিল অব সারেকটিকি এণ্ড ইণ্ডাস্ট্রিয়াল রিসার্চ পেটেন্ট প্রথার উপর মনোযোগ দিচ্ছে এবং ভারতীয় শিল্পপতি, বৈজ্ঞানিক ও বিশেষজ্ঞগণ সমবেত-ভাবে চেষ্টা করলে ভারতীয় শিল্পে ভারতীয় পেটেন্টসমূহের হান ক্রমেই উন্নত হবে।

সরকার-নিয়ন্ত্রিত এবং বেসরকারী শিল্প প্রতিষ্ঠান-সমূহে গবেষণার আবহাওয়া ইহা নীচ অনেকটা বদলে

গেছে। বর্তমানে অনেক কারখানার স্বতন্ত্র গবেষণা বিভাগ খুলতে দেখা দিয়াছে। অনেকক্ষেত্রে এই সকল গবেষণা-প্রতিষ্ঠান কেন্দ্রীয় গবেষণাগারের সহিত বিনিষ্ঠ-ভাবে যোগাযোগ রক্ষা করতে দেখা যায়। তবে একথা স্বীকার্য যে কেন্দ্রীয় গবেষণা সমিতিতে যে মুষ্টিমেয় বৈজ্ঞানিক বা বিশেষজ্ঞ উপস্থিত আছেন, তাঁদের পক্ষে সর্বভারতীয় সরকারী এবং বেসরকারী শিল্পপ্রতিষ্ঠানসমূহের এবং সর্ববিধ বৈজ্ঞানিক গবেষণা নিয়ন্ত্রিত করা অসম্ভব বলে মনে হয়। শেষোক্ত বৈজ্ঞানিক গবেষণার মধ্যে কৃষি কার্যের জন্য উপযুক্ত জমি সংস্থার, জমির উর্বরতা বৃদ্ধি, গবাদি পশুর লালনপালন, বন বিভাগ, খনিজ, ভেতজ প্রভৃতি শিল্পের উন্নতি সাধন, বিজলী-শিল্পের সরঞ্জাম সমূহ, জ্বালানি বিষয়ক গবেষণা প্রভৃতি পরিগণিত হয়। কেন্দ্রীয় সমিতির পক্ষে সকল বিষয় দেখা শক্ত, সুতরাং প্রত্যেকটি শিল্পপ্রতিষ্ঠানে এবং গবেষণাগারে গবেষণা বিষয়ের স্বাধীনতা দেওয়া দরকার। তবে একই বিষয় সকল প্রতিষ্ঠানে গবেষণা করা আবাহনীয় এবং এই জন্য কেন্দ্রীয় সমিতির সাহায্য দরকার। আর একটি কথা—শিল্পপ্রতিষ্ঠান এবং শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে আমাদের দেশে আদৌ কোন যোগাযোগ নেই। শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান-সমূহে গবেষণারত বৈজ্ঞানিক বা বিশেষজ্ঞগণ শিল্পপ্রতিষ্ঠান-সমূহের সমপর্যায়ভুক্ত বিশেষজ্ঞগণকেও অনেক সময় স্থগার চক্ষে দেখে। কেবল যে—গবেষণা বিষয়ে সংযোগিতার অভাব তা নয়—অনেক সময় অতি উচ্চশ্রেণীর গবেষণা কার্য শিল্পপ্রতিষ্ঠান হতে সম্পন্ন বলে চাপা দেবার চেষ্টা হয়। অবশ্য বর্তমানে এরূপ আবহাওয়ার অনেক উন্নতি দেখা যায়।

শিল্পপ্রতিষ্ঠানসমূহের গবেষণাগারে উৎপন্ন জ্বয়ের মান নির্ধারণ, বিভিন্ন শিল্পপ্রক্রিয়ার শিল্পজাত জ্বয়ের উন্নতি সাধন প্রভৃতি বিষয়ে আন্ত মনোযোগ দেওয়া কর্তব্য। এই সকল গবেষণা প্রতিষ্ঠানে কিছু সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনাও গৃহীত হতে পারে এবং পৃথিবীর কোন একটি নূতন সমস্যার সমাধান কার্যে এখানকার বিজ্ঞানীরাও ব্রতী হতে পারেন। এরূপ দৃষ্টান্ত পাশ্চাত্যের শিল্পপ্রতিষ্ঠান-সমূহে বিরল নয়। এই সকল গবেষণা প্রতিষ্ঠানের ত্রীভুজিক জন্ত বহুলাংশে সরকারের সুধাপেকী হতে হয় এবং

জাতীয় উন্নতির পরিকল্পনার মধ্যে শিল্প সমূহের বিস্তার-  
সাধন যখন একটি উল্লেখযোগ্য অংশ হিসাবে পরিগণিত  
করা হয়, তখন স্বভাবতঃই আশা করা যেতে  
পারে যে জাতীয় সরকার বিনা বিধায় এই সকল  
গবেষণা-প্রতিষ্ঠানের প্রতি আন্তরিক সহায়ত্ব ও  
সহযোগিতা প্রদর্শন করবেন। এই সকল গবেষণা প্রতিষ্ঠানে  
সুদক্ষ বৈজ্ঞানিক ও শিল্পীগণের বাতে সমাবেশ হয় এবং  
হুই একজন আন্তর্জাতিক মর্যাদাসম্পন্ন বিশেষজ্ঞ আমদানী  
করে বা দেশের মধ্য হতে হুই একজন খ্যাতনামা  
বিজ্ঞানীকে গবেষণার জন্য উচ্চ রেতনে নিযুক্ত করে  
প্রতিষ্ঠানের সুনাম বৃদ্ধির চেষ্টা করা প্রয়োজনীয়।  
সরকার এই সকল বিষয়ে শিল্পপ্রতিষ্ঠানসমূহকে প্রয়োজনীয়  
সাহায্য করতে পারেন। অবশ্য শিল্পপ্রতিষ্ঠানের বিশেষজ্ঞ-  
গণকে সরকারী চাকুরীভুক্ত বিজ্ঞানীদের সমপর্যায়ভুক্ত  
করে উপযুক্ত বেতন, সম্মান ও সুযোগসুবিধা  
দিতে হবে, কারণ বিজ্ঞান-সাধনার তাঁরাও জীবন উৎসর্গ  
করতে পারেন। তাঁদের মাহুষের মত বাঁচতে শিখে  
বুঝতে হবে। গবেষণার পক্ষপাতিদের কোন স্থান  
নেই এবং শিল্পসম্বন্ধীয় গবেষণার যারা আত্মনিয়োগ

করেছেন তাঁরা জনহিতকর কাজই যে করছেন তাতে  
সন্দেহ নেই। স্বর্গীয় ডাঃ উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী মহাশয়ের  
বক্তৃতা থেকে নিম্নোক্ত মূল্যবান উক্তিটি বিশেষভাবে  
উল্লেখযোগ্য :—

“In dealing with research workers there  
should be no jealousy, no distinction of  
caste or creed, no differential treatment on  
the part of those who have the privileged  
position of recommending sanction of money  
for research.”

অর্থাৎ—“গবেষণার জন্য অর্থ মঞ্জুর করবার বিশেষ  
ক্ষমতা যাদের আছে তাঁদের দেখতে হবে যেন গবেষণায়  
বিজ্ঞানীদের সহিত ব্যবহার করবার সময় কোনরূপ  
বিদ্বেষভাব, জাতিধর্ম বিচার কিংবা বৈষম্যমূলক আচরণ-এর  
প্রশ্রয় না দেওয়া হয়।

ভারতসরকারের শিল্পগবেষণা বিভাগ বিভিন্ন পরিকল্পনা-  
সমূহ গ্রহণ করেছে সুখের বিষয়, কিন্তু সরকারী ও  
বেসরকারী শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলিকে এবং সেখানকার  
বিজ্ঞানীদের এই সব পরিকল্পনার যোগ্য অংশ গ্রহণ  
করবার সুবিধা দেওয়াও সরকারের অবশ্য কর্তব্য।

## সাহিত্যে রূপক ও প্রতীক

অধ্যাপক শ্রী অমূল্যধন মুখোপাধ্যায়

(পূর্বাহ্নভূতি)

এইভাবে যে অহুত্বিকে বা সত্যকে মাহুষ ভাবার  
নাগালের মধ্যে পায় না, তাকে প্রকাশের জন্যে সাহিত্যে  
প্রতীকের ব্যবহার বহুকাল ধরেই চলে আসছে। এই  
উদ্দেশ্যে রূপকের ব্যবহারও যে চলে আসছে, সে কথা  
আগেই বলা হয়েছে। কিন্তু রূপকের দ্বারা বস্তুর ধর্ম ও  
গুণ ইত্যাদিই আমরা উপলব্ধি করতে পারি, বস্তুর স্বরূপ যেন  
নাগালের বাইরে থেকে যায়। প্রতীকের দ্বারা কিন্তু বস্তুর  
বিশেষ বিশেষ গুণ নয়, তার সত্যারই স্পর্শ যেন আমরা  
উপলব্ধি করি। রূপক সাহিত্য এক রকমের বক্তোক্তি,  
প্রতীক সাহিত্য এক ধরনের স্বভাবোক্তি। কবি বলেছেন—

“ওধু তোমার বাণী নয় গো, হে বন্ধু, হে প্রিয়,  
মাঝে মাঝে প্রাণে তোমার পরশখানি দিও।”

রূপক আমাদের কাছে নিয়ে আসে অলৌকিকের  
“বাণী,” তার নানা গুণ ও ধর্মের খবর; প্রতীক আমাদের  
প্রাণে অলৌকিকের “পরশ” এনে দেয়। এই জন্যে প্রতীক  
মাহুষের প্রাণে যে সাড়া আনতে পারে, রূপক তা পারে  
না। প্রতীকের সাহায্যে ভগবানের স্বরূপের পরিচয় দিলে,  
আমাদের মনে যে রকম স্পন্দন উৎপন্ন হয়, রূপকের  
সাহায্যে পরিচয় দিলে সে রকম স্পন্দন হয় না।

কিন্তু মাহুষের জীবনে এবং সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যে প্রতীকের  
প্রভাব ও ব্যবহার ক্রমশঃ কমে আসছে বলেই মনে হয়।

মানুষ ক্রমে ক্রমে হ'য়ে উঠেছে বুদ্ধিমান। বুদ্ধির বিশ্লেষণী ক্ষমতাই বেড়ে উঠেছে। বস্তু থেকে গুণকে বিশ্লেষণ করতে মানুষ এখন অভ্যস্ত হয়ে গেছে। সত্য এখন তার কাছে স্থল নয়, স্থল; দ্রব্য নয়—দ্রব্যগুণের সমুচ্চয়। যা অলৌকিক বা অপ্রত্যক্ষ তাকে কোন প্রতীক দিয়ে সে বুঝতে চায় না; সে চায় অপ্রত্যক্ষের সত্যের বুদ্ধিগ্রাহ্য একটা বিশ্লেষণ। সুতরাং সে প্রতীকে সন্তুষ্ট নয়, সে চায় রূপক। যা' অপ্রত্যক্ষ, তার সম্বন্ধে আমাদের অল্পত্বের বা সংস্কারের ইতিহাসের সঙ্গে বিজড়িত কোন স্থল বস্তু বধন আমাদের ভাবাবেগে তার প্রতিনিধি হ'য়ে ওঠে, তখন তাকে আমরা বলি প্রতীক। এই ভাবাবেগের ফলে নাম-ই ভগবানের প্রতিনিধি হ'য়ে ওঠে, “অপিতে অপিতে নাম” হৃদয় ভাবাবেগে “অবশ” হয়ে পড়ে, সাক্ষাৎ উপলব্ধির অল্পত্ব লক্ষণাদি—যেমন রোমাঞ্চ, পুলক, সমাধি ইত্যাদির আবেশ হয়। কিন্তু মানুষের বিশ্লেষণী মনোবৃত্তি এ পথে এখন আর যেতে চায় না। ভাবাবেগ নয়, বৈজ্ঞানিক প্রত্যয়ের দিকে তার ঝুঁকি। বৈজ্ঞানিকের প্রত্যয় মানে নানা গুণ, ধর্ম ও লক্ষণের সমুচ্চয়; তাই দিয়ে বৈজ্ঞানিকের বুদ্ধি-জগৎ রচিত। সুতরাং আধুনিক মন অপ্রত্যক্ষের পরিচয় দেয় রূপকের সাহায্যে, কারণ রূপকের ভিত্তি হ'ল সাদৃশ্য, আর সাদৃশ্যনির্ণয় মানেই হ'ল গুণের বিশ্লেষণ। এই জন্তে সাহিত্যে প্রাচীন যুগের পর ক্রমশঃ প্রতীকের প্রভাব কমে এসেছে, লেখকদের রচনায় রূপকের ব্যবহারই বেড়ে উঠেছে। বাক্যালাকার হিসেবে রূপকের ব্যবহার ত বখেই, তা ছাড়া নূতন শব্দ রচনাতেও রূপকের প্রকৃত প্রভাব দেখতে পাওয়া যায়। অপ্রত্যক্ষ ও অলৌকিক পদার্থের কথা বলতে গিয়ে লেখকেরা যদি শুক গাণিতিক ও দার্শনিক পরিভাষা ত্যাগ করে সরল ও প্রাণবন্ত সাহিত্য রচনা করতে বান, তবে তাঁরা রূপকেরই ব্যবহার প্রায়শঃ করে থাকেন।

তা ছাড়া এ কথাও সচেষ্ট সচেষ্ট স্বীকার করতে হবে যে প্রতীকের ব্যবহার জীবনে যতটা চলে, ভাষা ও সাহিত্যে ততটা চলে না। কারণ হচ্ছে যে সাহিত্য জিনিষটাই হ'ল বাস্তবের একটা অল্পকরণ, ঠিক বাস্তব নয়। সাহিত্যে জীবনের ছায়াই থাকে, তাই রূপকের ব্যবহার সেখানে বেশী। কিন্তু জীবনটা কবি-কল্পনা নয়, সাদৃশ্যের ছায়া

নিম্নে জীবন চলে না, সেখানে বাস্তবের দাবী বস্তু দিয়েই মেটাতে হয়, সুতরাং কোন প্রতীক বস্তু দিয়ে অপ্রত্যক্ষের ঠাঁকটা বুঝিয়ে দিতে হয়।

যাই হোক, অনেক কাল থেকেই সাহিত্যে প্রতীক স্থান পেয়েছে। ঋগ্বেদের পুরুষ-সূক্তে

সহস্রাণীর্বা পুরুষঃ

সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ।

স ভূমিং বিশ্বতো বৃষা-

ত্যতিষ্ঠদশাঙ্গুলম্॥

ব'লে পরম পুরুষের যে বর্ণনা আছে, তাকে আমরা প্রতীক কাব্য বলেই বিবেচনা করব; কারণ এখানে একটা অপ্রত্যক্ষ জগতের উপর একটা প্রত্যক্ষ জগতের আরোপ করা হয় নাই, সাদৃশ্যের উপর ভিত্তি ক'রে প্রত্যক্ষের ধর্ম দিয়ে অপ্রত্যক্ষের প্রকৃতির পরিচয় দেওয়া হয় নাই। অথচ প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার জগতের কয়েকটি বস্তুর সঙ্গে বিজড়িত ভাবধারার সাহায্যে একটা অপ্রত্যক্ষ বিরাট ধারণার উদ্বোধন করা হয়েছে। যে কল্পনা এখানে আমাদের মনে জেগে উঠেছে তাকে আমরা পরম সত্যের একটা উপমান বলে মনে করিনা, তাকে সেই সত্যের প্রকাশ বলেই মনে করি। সুতরাং এখানে আমরা প্রতীকই পাচ্ছি, রূপক নয়।

ইহুদীদের শাস্ত্র Old Testament এও আমরা প্রতীক রচনা পাই। Book of Ecclesiastes এ যেখানে বলা হয়েছে “Cast thy bread upon the waters : for thou shalt find it after many days” (Chap. VI) কিংবা যেখানে যৌবনের গৌরবের বর্ণনা দিতে গিয়ে বলা হয়েছে—“While the sun or the light or the moon, or the stars be not darkened, nor the clouds return after the rain” (Chap. XII) সেখানে আমরা প্রতীকের ব্যবহার দেখতে পাই। Book of Isaiahতে যেখানে বলা হয়েছে—“Every valley shall be exalted, and every mountain and hill shall be made low” (Chap. XI) কিংবা “Instead of the thorn shall come up the fir tree, and instead of the briar shall come up the myrtle tree” (Chap. LV), সে সব জায়গাতেও প্রতীকের ব্যবহার করা

হয়েছে। খৃষ্টানদের ধর্মগ্রন্থ Revelationএ প্রতীকের অল্প ব্যবহার করা হয়েছে। সেখানে ( Chap. IV ) ভগবানের সিংহাসনের যে রকম বর্ণনা আছে—And round about the throne were four and twenty seats : and upon the seats I saw four and twenty elders sitting, clothed in white raiment and they had on their heads crowns of gold. And out of the throne proceeded lightnings and thunderings and voices : and there were seven lamps of fire burning before the throne, which are the seven spirits of God”—তাতে আমরা প্রচুর প্রতীকের ব্যবহার দেখতে পাই। লক্ষ্য কর্তে হবে seven lampsর সঙ্গে seven spiritsর উপমা দেওয়া হয় নাই, seven lampsকেই seven spiritsর সঙ্গে একাত্মীভূত করা হয়েছে। অর্থাৎ এটা রূপক নয়, প্রতীক। আবার যেখানে ( Chap. XXII ) A new heaven and a new earth ও The holy city, new Jerusalemর বিবরণ দেওয়া হ’য়েছে, সেখানে অলৌকিক ও অপ্রত্যক্ষের পরিচয় দেওয়া হয়েছে নানা প্রতীকেরই সাহায্যে, উপমা বা রূপকের দ্বারা নয়।

বোধ হয় Bibleএর প্রভাবের জন্মেই মধ্যযুগে ইউরোপে প্রতীক সাহিত্য যথেষ্ট রচিত হয়েছিল। কবিকুল-চূড়ামণি Danteর মহাকাব্য—The Divine Comedy প্রতীক কাব্যের উৎকৃষ্ট উদাহরণ। নানা প্রতীকের ভিতর দিয়েই Danteর লোক-লোকান্তরব্যাপী দৃষ্টি ও অহুভূতি প্রকাশিত হয়েছিল, এবং Danteর পরিকল্পিত দেবর্ষি-সঙ্গীত-মুখর অমৃত-নিস্রন্দী রিয়াদ্রীচি-হাস্তোক্তাসিত Paradiso বা স্বর্গ প্রতীক দিয়েই তৈরি। তারই প্রভাব নানা দেশে নানা ভাবে ছড়িয়ে পড়েছিল, যেমন পড়েছিল D. G. Rossettiর রচনায়।

We two will lie, the shadow of  
That living mystic Tree  
Within whose secret growth the Dove  
Is sometimes felt to be,  
While every leaf that His plumes touch  
Saith his name audibly.

মধ্যযুগের অবসানের পর সমগ্র ইউরোপে যখন Renaissance বা নবজীবন আন্দোলনের বজা ছড়িয়ে পড়ল, তখন পারত্রিক ছেড়ে ঐহিকের দিকে, প্রতীক

ছেড়ে প্রত্যক্ষের দিকেই মানবের মন আকৃষ্ট হ’ল, সাহিত্য বাস্তব জীবন ও ইন্দ্রিয়ের জগৎ নিয়ে ব্যাপৃত হ’ল। সুতরাং প্রতীক সাহিত্যের রচনা প্রায় উঠেই গেল। তবে মাঝে মাঝে দু’একজন গূঢ়বাদী লেখকের রচনায় প্রতীকের ব্যবহার দেখা যেত। ইংল্যান্ডের প্রতীকগমীদের মধ্যে প্রধান হ’ছেন Blake. নানা জটিল প্রতীক তাঁর কাব্যের অঙ্গে অঙ্গে থচিত, তাদের তাৎপর্য্য অন্বেষণ কর্তে না পারলে Blakeর কাব্যের মর্ম গ্রহণ করা সম্ভব নয়। দুটো একটা মাত্র অপেক্ষাকৃত সরল উদাহরণ এখানে দেওয়া চলতে পারে।

Does the Eaeagle know, what is in the pit ;  
Or wilt thou go ask the Mole ?  
Can wisdom be put in a silver rod,  
Or Love in a golden bowl ?

( Motto to the Book of Thel )

এখানে silver rod ও golden bowl রূপক অলঙ্কার নয়, প্রতীক।

The eternal gates’ terrific porter lifted the  
northern bar !  
Thel enter’d in and saw the secrets of the  
land unknown.  
She saw the couches of the dead, and where  
the fibrous roots  
Of every heart on earth infixes deep its  
restless twists :  
A land of sorrows and of tears where never  
smile was seen.

( From the Book of Thel )

এ কোন দেশের কথা? এখানে রূপকের কোন আভাস নেই। প্রত্যক্ষের উপর অপ্রত্যক্ষের আরোপের কোনই প্রশ্ন উঠে না। “হৃদর্শন গূঢ় অল্পপ্রবিষ্ট গুহাহিতঃ গহ্বরেষুঃ” লোকের কথা; প্রতীক দিয়েই তার বর্ণনা করা হ’য়েছে। ( আধুনিক কালেও ইংল্যান্ডে Francis Thompson প্রতীক-কাব্য লিখেছেন; তাঁর The Hound of Heaven প্রথমটা রূপক বলে মনে হলেও আসলে যে প্রতীক-কাব্য তা’ একটু প্রশিধান ক’রে দেখলেই বোঝা যায়। যেখানে তিনি তাঁর আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতার বিবরণ দিয়েছেন, সেখানে দেখা যায় যে, জিনিষটা রূপক নয়, প্রতীকের সাহায্যে একটা সাক্ষ্য অভিজ্ঞতার বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। ( আগামী সংখ্যায় সমাপ্য )

# জাতীয় সঙ্গীত

শ্রীদিলীপকুমার রায়

বঙ্কিম বিজয়রত্ন মজুমদার যিজেন্দ্রলালকে বাংলাদেশে উপেক্ষিত কবি বলে আক্ষেপ করেছেন একাধিক পত্রিকায়। কথাটা ভাববার। তর্ক উঠতে পারে—যুগে যুগে রুচি মাহুকের বদলায় ইত্যাদি। কিন্তু শ্রীঅরবিন্দ আমাকে একটি পত্রে লিখেছিলেন : “Lesser reputations may fluctuate, but finally whatever has real value in its own kind settles itself and finds its just place in the durable judgment of the world... finally the world returns to its established verdict.” একথায় আমিও বিশ্বাস করি। তাই সাময়িক রুচিগত মতামতের তাপমান যত্নের ওঠা পড়াতে বিচলিত হওয়া অসঙ্গত মনে করি, যদিও মনে দুঃখ হয়ই যে সম্প্রতি কাগজপত্রে এ নিতান্ত অবিসংবাদিত সত্যটিও স্বীকৃত হয় নি যে জাতীয় সঙ্গীতের (national song) রচয়িতা হিসেবে যিজেন্দ্রলালের স্থান বাংলাদেশে কাকুর চেয়েই কম নয়। তবে এও জানি—পুনরুক্তি মার্জনীয়—যে কালের পরম সভায় তিনি ভারতের শুধু একজন শ্রেষ্ঠ নাট্যকার নন, একজন শ্রেষ্ঠ কবি সুরকার ও গীতিকার বলেও অস্বীকৃত হবেন। আমার স্মরণবিহার প্রথম খণ্ডে আমি তাঁর বঙ্গ আমার জননী আমার ও আমার জন্মভূমি

গান দুইটি সংস্কৃত অম্ববাদ ও স্বরলিপি প্রকাশ করেছি। দ্বিতীয় খণ্ডে প্রকাশিত হবে তাঁর ভারত আমার ও যেদিন সুনীল জলধি হইতে গান দুইটির সংস্কৃত অম্ববাদ ও স্বরলিপি। এখানে এই দুটি গান প্রকাশিত হ’ল ভারতবর্ষে—যার প্রতিষ্ঠা তিনিই করেছিলেন প্রায় চল্লিশ বৎসর আগে। আমার মনে হয় কালের দরবারে এই দুটি গান অতি আদরণীয় হ’য়ে থাকবে। সংস্কৃতে এ গানগুলি তাঁর অপূর্ব ওজস্বী সুরে যে কী অপরূপ শোনায তা এ গানগুলি ধারাই সংস্কৃতে শুনেছেন তাঁরাই সানন্দে স্বীকার করবেন। ইচ্ছা আছে গ্রামোফোন ও রেডিওয়ে এ গান দুটিও গাইব এবং আশা করি রেডিও কর্তৃপক্ষ এ-গান দুটির (তথা ধন্য ধান্ড ও বঙ্গ আমার গান দুটির) সংস্কৃত অম্ববাদ যাতে যথোচিত প্রচারিত হয় সে-শুভব্রতে ত্রুটি হবেন—আরো এই জন্তে যে সংস্কৃতে এ-শ্রেণীর জাতীয় সঙ্গীতে শুধু যে এক নব উদ্দীপনা জাগে তা-ই নয়, সংস্কৃতে গীত হ’লে সব প্রদেশের অধিবাসীরাই গাইতে পারবেন—যেজন্তে মনে হয় যে ভারতের জাতীয় সঙ্গীত সংস্কৃতেই গীত হওয়া বাঞ্ছনীয়, কোনো প্রাদেশিক ভাষায় নয়। ধার্য সংস্কৃতকে মৃত ভাষা মনে করেন তাঁদের মতামত সহজেই খণ্ডন করা যায়। কিন্তু সেটা এ-ভূমিকার উদ্দেশ্যের বহির্ভূত।

## যিজেন্দ্রলালের জাতীয় সঙ্গীত

“ভারত আমার, ভারত আমার” .....এবং ঐ সংস্কৃত অম্ববাদ

ভারত আমার, ভারত আমার, যেখানে মানব মেলিল নেত্র;  
মহিমার তুমি জন্মভূমি মা, এসিয়ার তুমি তীর্থক্ষেত্র।  
দ্বিগাছ মানবে জগজ্জননী, দর্শন উপনিষদে দীক্ষা;  
দ্বিগাছ মানবে জ্ঞান ও শিল্প, কর্ম-ভক্তি ধর্ম-শিক্ষা।  
ভারত আমার, ভারত আমার, কে বলে মা তুমি রূপার পাত্রী?  
কর্ম-জ্ঞানের তুমি মা জননী, ধর্ম-ধ্যানের তুমি মা ধাত্রী।  
ভগবদ্বীতা গাছিল স্বয়ং ভগবান যেই জাতির সঙ্গে;  
ভগবৎপ্রসে নাচিল গৌর যে দেশের ধূলি মাখিয়া অঙ্গে।

ভারতভূমে! ভারতভূমে! যজ্ঞোয়ীলন্ মানবনেত্রম্  
উৎসম্ভবে মহামহিমাং বসুন্ধরায়াম্ তীর্থক্ষেত্রম্॥  
অবনীজনি! স্বয়ং নীতা শিল্প বেদদর্শনেষু দীক্ষা।  
স্বয়ং কর্ণা ভুবনে প্রজ্ঞাভক্তিগপ্তাকামাতিতিক্ষা॥  
ভারতভূমে! ভারতভূমে! কৃপাধীনী ত্বং নৈব ধরণীম্।  
জ্ঞানকর্মধীধানধর্মদাম্ প্রণমেম ত্বাং চিরমবিষণ্ণাম্॥  
একদা যজ্ঞাগায়দ্ গীতাং স্বয়ং হি ভগবান্ ত্রিদিবশরণ্যঃ।  
যদীয় ধূলিপরিধূসরাদো ননর্ত প্রেমণা ত্রীচৈতন্যঃ॥

সন্ন্যাসী সেই রাজার পুত্র প্রচার করিল নীতির মর্ম ;  
 যাদের মধ্যে তরুণ তাপস প্রচার করিল ‘সোহং’ ধর্ম ।  
 ভারত আমার, ভারত আমার...ধর্ম-ধ্যানের তুমি মা ধাত্রী ॥  
 আর্ধ্য ঋষির অনাদি গভীর, উঠিল যেখানে বেদের স্তোত্র ;  
 নহ কি মা তুমি সে ভারত ভূমি, নহি কি আমরা তাঁদের পোত্র !  
 তাদের গরিমা-স্বতির বর্ষে, চলে বাব শির করিয়া উচ্চ,—  
 যাদের গরিমাময় এ অতীত, তারা কখনই নহে মা তুচ্ছ ।  
 ভারত আমার, ভারত আমার...ধর্ম-ধ্যানের তুমি মা ধাত্রী ॥  
 ভারত আমার, ভারত আমার, সকল মহিমা হোক খর্ব ;  
 হুঃখ কি যদি পাই মা তোমার পুত্র বলিয়া করিতে গর্ব ।  
 যদি বা বিলয় পায় এ জগৎ, লুপ্ত হয় এ মানব বংশ ।  
 যাদের মহিমাময় এ অতীত, তাদের কখনও হবে না ধ্বংস !  
 ভারত আমার, ভারত আমার...ধর্ম-ধ্যানের তুমি মা ধাত্রী ॥  
 চোখের সামনে ধরিয়া রাখিয়া অতীতের সেই মহা আদর্শ,  
 আগিব নূতন ভাবের রাজ্যে, রচিব প্রেমের ভারতবর্ষ !  
 এ দেবভূমির প্রতি তৃণ পরে আছে বিধাতার করুণাদৃষ্টি,  
 এ মহাজাতির মাথার উপর করে দেবগণ পুষ্পরূপী !  
 ভারত আমার, ভারত আমার...ধর্ম-ধ্যানের তুমি মা ধাত্রী ॥

সর্বভাগী রাজহুতো বিত্ততান নিরন্তং করুণাত্তম্ ।  
 তরুণ যতির্যত্র প্রচচার মহাস্তং গহনং সোহং-মন্ত্রম্ ॥  
 ভারতভূমে ! ভারতভূমে.....চিরমবিষণ্ণাম্ ।  
 যত্রাশ্রয়ত মুনির্বিগীতমনাদি গভীরং সামন্তোত্রম্ ।  
 ন কিং ভ্রমসি সা ভূর্ন বয়ং কিং নেহ পুরা জুহুবিম তে হোত্রম্ ॥  
 তৎস্মৃতিবর্ষাবৃত্তা চিরং বিচরেনোক্ত-কল্যাণা ধাতাঃ ।  
 প্রদীপ্তমিথমতীতং যেষাং ক্রীবা ন তে কদাপি নগপ্যাঃ ॥  
 ভারতভূমে ! ভারতভূমে !.....চিরমবিষণ্ণাম্ ॥  
 ভারতভূমে ! যদি মহিমাসৌ সনাতন স্তব ম্লান ইদানীম্ ॥  
 হুঃখং কুতো হু মা তৃগৌরবাজ্জয়েম বয়ং হি মার্যামানিম্ ॥  
 ভবেদ্বিনষ্টা যদি বসুধেয়ং লুপ্পেদ যতপি মহুস্তবংশঃ ।  
 পুরাণমেবং চরিতং যেষাং তেষাং নাস্তি কদাপি ধ্বংসঃ ॥  
 ভারতভূমে ! ভারতভূমে !.....চিরমবিষণ্ণাম্ ॥  
 নয়নানামশ্রাকং পুরতোহলক্ষ্যাদর্শো দীব্যতু নিত্যম্ ।  
 পুনঃ সৃজ্যামো নবভাবোজ্জলরাজ্যং সাস্ত্রং প্রেমবিশুদ্ধম্ ॥  
 তবেহ দেবভূবো বহতি প্রতিতৃণং বিধাতুঃ করুণাদৃষ্টিম্ ।  
 তব পুত্রাণাং শিরঃস্থ দেবগণাঃ কুর্বন্তি প্রসন্নরূপীম্ ॥  
 ভারতভূমে ! ভারতভূমে !.....চিরমবিষণ্ণাম্ ॥

### ব্রিজেন্দ্রলালের জাতীয় সমীচ

“যেদিন সুনীল জলধি হইতে”.....এবং ঐ সংস্কৃত অনুবাদ

যে দিন সুনীল জলধি হইতে উঠিলে জননী, ভারতবর্ষ !  
 উঠিল বিধে সে কি কলরব, সে কি মা ভক্তি, সে কি মা হর্ষ !  
 সেদিন তোমার প্রভায় ধরার প্রভাত হইল গভীর রাত্রি ;  
 বন্দিল সবে, “জয় মা জননি ! জগত্তারিণি ! জগদ্ধাত্রি !”  
 ধাত হইল ধরণী তোমার চরণ-কমল করিয়া স্পর্শ ;  
 গাইল, “জয় মা জগন্মোহিনি ! জগজ্জননি ! ভারতবর্ষ !”  
 সন্তঃ নান-সিদ্ধবসনা চিকুর সিদ্ধলীকরলিপ্ত !  
 ললাটে গরিমা, বিমল হান্ত্রে অমল কমল-আনন দীপ্ত ;  
 উপরে গগন ঘেরিয়া নৃত্য করিছে তপন তারকা চন্দ্র ;  
 মন্ত্র মুক্ত, চরণে ফেনিল জলধি গরজে জলদমস্ত্র ।  
 ধাত হইল ধরণী তোমার.....জগজ্জননি ! ভারতবর্ষ !”  
 গীর্থে গুহ্র ভূবার কিরীট, সাগর-উর্মি ঘেরিয়া জম্বা,  
 বক্ষে ছলিছে মুক্তার হার—পঙ্কসিদ্ধ যমুনা গঙ্গা ।  
 কখন মা তুমি ভীষণ দীপ্ত তপ্ত মরুর উবর দৃশ্যে ;  
 হাসিয়া কখন শ্রান্ত শস্ত্রে ছড়িয়ে পড়িছ নিখিল বিধে ।

ভারতমাত ভূবনশরণো ! যদা স্বমুদিতা সুনীলসিঙ্হো : ।  
 কলধ্বনিঃ কোহশ্রয়ত সান্ত্রো ভক্তিকম্পিতঃ পুলকোহনিন্দ্যঃ ॥  
 তব কৃপয়া নবরবিকরনিকটৈঃ রূপান্তরিতা গহনা রাত্রী ।  
 প্রণতাঃ সর্বৈঃ গায়নঃ “জয়তু জগজ্জননী চিরজীবনধাত্রী ॥  
 ধাতাভবত্তদা বসুধা তে চরণসরোজং বৃষাহক্লিষ্টা ।  
 বিশ্বরমা জয়তু বিশ্বধাত্রী ভারতভূমিঃ স্বর্গগরিষ্ঠা ॥  
 সন্তঃনানান্নিষিক্তবসনে ! চিকুরন্তে নিখিলীকরলিপ্তঃ ।  
 নির্মলহান্ত্রঃ কমলাননং প্রদীপ্তং তালো গরিমসমৃদ্ধঃ ॥  
 পর্থাবর্তন্তে নৃত্যন্তে ব্যোম তবারুণতারাজ্যতাঃ ।  
 মন্ত্রবিমুক্তো নিম্নে ফেনিলজলধিঃ স্তনতীব মেঘমস্ত্রাঃ ॥  
 ধাতাভবত্তদা.....স্বর্গগরিষ্ঠা ॥  
 মৌলো গুহ্রং ভূবারমুকুটং ভাস্তি জম্বয়োঃ পারাবারাঃ ।  
 গঙ্গাশতক্রময়ুনা বক্ষসি লসন্তীব তে মুক্তাহারাঃ ॥  
 কাসি ক্রুদ্বা তপ্তসৈকতা ঋজ্বাবৈক্রুদ্বা লোলা ।  
 শ্মিতাধরা বা কাসি পানকং জ্বলন্তাঃ সন্তাপিতাঃ ॥



ধন্ত হইল ধরণী তোমার.....জগজ্জননি ! ভারতবর্ষ !  
 উপরে, পবন প্রবল স্বননে শূন্তে গরজি' অবিশ্রান্ত,  
 লুটায় পড়িছে শিক কলরবে, চুপি' তোমার চরণ—প্রান্ত,  
 উপরে, জলদ হানিয়া বজ্র, করিয়া প্রলয়-সলিল-বৃষ্টি—  
 চরণে তোমার কুঞ্জ কানন কুম্মগন্ধ করিছে সৃষ্টি !  
 ধন্ত হইল ধরণী তোমার.....জগজ্জননি ! ভারতবর্ষ !  
 জননি, তোমার বক্ষে শান্তি, কণ্ঠে তোমার অভয়-উক্তি,  
 হস্তে তোমার বিতর অন্ন, চরণে তোমার বিতর মুক্তি ;  
 জননি ! তোমার সম্মান তরে কত না বেদনা কত না হর্ষ ;  
 জগৎ পালিনি ! জগত্তারিণি ! জগজ্জননি ! ভারতবর্ষ !  
 ধন্ত হইল ধরণী তোমার.....জগজ্জননি ! ভারতবর্ষ !

ধন্তাভবন্তদা.....স্বর্গগরিষ্ঠা ॥  
 উর্ধ্বে শূন্তে পবনঃ প্রবলস্বনিতো বিগর্জ্য ভূশমক্লান্তম্ ।  
 শিকরকারৈশ্চ সূতাস্তে পুণ্যং তে ত্রিচরণপ্রান্তম্ ॥  
 ক্লান্তকুলিশো জলদঃ প্রবর্ষ্য ঘোরাঃ প্রলয়ভয়ঙ্করধারাঃ ।  
 পাদান্তে তব রচয়তি কাননমালা গন্ধপ্রসূনহারাঃ ॥  
 ধন্তাভবন্তদা.....স্বর্গগরিষ্ঠা ॥  
 হৃদয়ে মাতস্তব স্মৃৎশাস্ত্রী কণ্ঠে বহসি বরাভয়তন্ত্রম্ ।  
 বিতরসি পাণিভ্যামন্নং চরণাভ্যাময়ি মধুমুক্তৈর্মদ্রম্ ।  
 অক্লোঃ পুত্রস্নেহানন্দো ব্যথা চ তে ক্ষরতো মহনীরে !  
 ধরণীপালিনি ! ধরণীমোহিনি ! ধরণীজননি ! শুভে ! বরণীরে !  
 ধন্তাভবন্তদা.....স্বর্গগরিষ্ঠা ॥

মূল বাংলা ও সুর...দ্বিজেন্দ্রলাল

সংস্কৃত অনুবাদ...দিলীপকুমার

ত্রিতাল

+	সা	-	ধা	ধা		সা	রা	সরা	গা	।	গা	-	গা	গা		গা	-	গা	-	।
	তা	-	র	ত		তু	-	মে	-		তা	-	র	ত		তু	-	মে	-	
	তা	-	র	ত		মা	-	ত	স্ব		তু	ব	ন	শ		র	-	ণ্যে	-	

র	গা	-	র	গা	দ্বা		দ্বা	-	দ্বা	পা	।	গ	দ্বা	পা	পা	পা		পা	-	পা	পা	।
য	-	ত্রো	ন	মী	-	ল	ন	মা	-	ন	ব	নে	-	ত্র	ম							
য	দা	-	ত্ব	মু	দি	তা	-	স্ব	নী	-	ল	সি	ন	ধো	:							

পা	-	দ্ব	পা	ধা		ধা	ধা	-	ধা	।	ধা	প	ধা	না	ধা		পা	-	গা	রা	।
উ	ং	স	স্ব	ত্ব	মে	-	ব	ম	হা	-	ম	হি	ম	না	ং						

না	না	-	না		না	-	না	সর্গ	।	ধ	না	রর্গ	সর্গ	-		সর্গ	-	সর্গ	-	।
ব	স্ব	ন	ধ	রা	-	য়া	ং	তী	স্ব	ধ	-	ক্ষে	-	ত্র	ম					

পা	ধা	পা	-		সর্গ	সর্গ	সর্গ	-	।	সর্গ	সর্গ	-	সর্গ		সর্গ	-	সর্গ	-	।	
অ	ব	নী	-		জ	ন	নি	-		ত্ব	যৈ	-	ব	নী	-	তা	-			

সর্গ	রর্গ	রর্গ	রর্গ		-	রর্গ	রর্গ	গর্গ	।	সর্গ	সর্গ	গর্গ	গর্গ		গর্গ	-	গর্গ	-	।
শি	ল	প	বে	-	দ	দ	স্ব	শ	নে	-	স্ব	দী	-	কা	-				

গর্গ	গর্গ	পর্গ	গর্গ		রর্গ	-	রর্গ	-	।	সর্গ	সর্গ	সর্গ	-		ধা	-	ধা	পা	।
ক	স্ব	-	ব	কী	স্ব	পা	-	জ	ব	নে	-	প্র	-	জা	-				

পা খা না না | না -১ না স'১ | খা না র'১ স'১ | স'১ -১ স'১ -১ |  
 ড ক্ তি প প - আ - ক্ষ মা - তি তি - ক্ষা -  
 স'১ -১ স'১ স'১ | স'১ -১ স'১ না | না -১ না না | খা -১ খা পা |  
 ভা র ত ভূ - মে - ভা - র ত ভূ - মে -  
 পা পা ক্ষা পা | না -১ খা -১ | পা ক্ষা পা খা | গা -১ গা -১ |  
 ক্ পা স্ব ধি গী - স্ব ং নৈ - ব ধ র - গ্যা স্ব  
 গা -১ গা র'১ | -১ র'১ র'১ -১ | স'১ -১ খা র'১ | -১ স'১ স'১ -১ |  
 জা - ন ক স্ব ম ধী - ধ্যা - ন ধ স্ব ম দা ং  
 গা গা রা -১ | গা -১ পমা -১ | গা গা রগা রা | গরা -১ সা -১ |  
 প্র গ মে - ম - আ ং চি র ম বি ষ ণ্ণা ম্

এতি স্তবক একই স্বরে গেষ

## গ্যোটে'র জীবনের এক অধ্যায়

### আশা দেবী

জোহান উলক্‌গ্যাং গ্যোটে'কে বাদ দিয়ে জার্মান জাতির কোন পরিচয় নেই। তিরিশী বছরের দীর্ঘ জীবন-চর্চায় মধ্য দিয়ে গ্যোটে অকুণ্ঠভাবে সাহিত্যের সেবা করে গেছেন। তাঁর পরিচয়ের ক্ষেত্রে শুধু জার্মান সাহিত্যেই সীমাবদ্ধ নয়। সমস্ত পৃথিবী তাঁকে কবি বলে সশ্রদ্ধ প্রণাম জানিয়েছে—তাঁর কাউন্ট জগতের অন্ততম মহাকাব্য।

তাঁর সম্পর্কে বলা হয়েছে “He lived in poems” এবং তাঁর কবিতা হলো a great confession—জীবন সম্বন্ধে স্বীকারোক্তি। গ্যোটে'র মহাকাব্য তাই মহাজীবনের বাণী।

ব্যক্তি মানুষ্য হিসেবে দীর্ঘকাল ধরে বিস্ময়জনক বহু নিন্দা ও প্রশংসা গ্যোটে'কে কুড়োতে হয়েছে। উন্নাসিক ও রুচিবাগীশ সমালোচকেরা তাঁকে তীব্র ভাষায় খিকার দিয়েছেন, ইতর জনের জিহ্বা কুৎসার হয়েছে মুখর। গ্যোটে'র বহু বিচিত্র প্রেম কীর্তিই এর কারণ। বহু নারিকার হাসি-অশ্রু মেঘ-রৌদ্রে গ্যোটে'র জীবন রসায়িত।

পৃথিবীর প্রায় সমস্ত শ্রেষ্ঠ কবিশিল্পীর সাধনার মলে

রয়েছে তাঁদের মানসীপ্রিয়তার দান। কখনো এই মানসী একটি মাত্র নারীতে রূপ পেয়েছে—মর্তের মানবীকে রূপায়িত করেছে কল্পনার স্বর্গভূতিকা—তার প্রমাণ দাঁতের চিরঅধরা বিষাক্তিচে, তার প্রমাণ পেত্রার লরা। এই অনজ্ঞা নারীতেই তাঁরা পেয়েছেন—তাঁদের কাব্যলক্ষ্যকে, তাঁদের স্বপ্ন সন্নিবাহকে।

কিন্তু এমন একদল শিল্পী আছেন—যারা চিরকুণ্ডল; কল্পরী মুগের মতো, তাঁরা নিজের অনন্ত তৃষ্ণা নিয়ে পৃথিবীময় ঘুরে বেড়ান। সূখাপাত্র হাতে যে এগিয়ে আসে, ক্ষণিকের জন্ত হস্ততো তাকে ভাল লাগতে পারে কিন্তু পরক্ষণে ক্রান্তিতে ভরে ওঠে মন। বার বার প্রপ্ত করে “এই কি চেয়েছিলাম আমি” ? তার মন বলে “এখানে নয়, এখানে নয়—তুমি যাকে চাও সে অনেকদূরে।” রবীন্দ্রনাথের ভাষায় তার অন্তর আকুলি-বিকূল করে জানায়—

“বাহা চাই তাহা ভুল করে চাই

কবিতা পদ্যে লিখিত একটি স্তবক

মহাকবি গ্যেটেও এই এদেরই একজন। সমস্ত জীবন ধরে এই খোঁজার পালাই চলেছে তাঁর। একজনের পর আর একজন এসেছে—অসীম আগ্রহে গ্যেটে হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন, ছুটে গেছেন তার দিকে ; কিন্তু যে মুহূর্তে এসে ধরা দিয়েছে সেই মুহূর্তেই গ্যেটের মনে হয়েছে সে সাধারণ, বড় বেশী সাধারণ। তার সব রহস্য জানা হয়ে গেছে। যে ছিল কল্পনার বর্ণলেখা, বাস্তবে সে সীমাবদ্ধ হয়ে গেছে একটি মাত্র নারীর দেহাধারে। সেই মুহূর্তেই আবার তিনি শুরু করেছেন নূতনের অভিযান—পুরোনো প্রেম পথে অভিযে-ধরা ধুলোর মতো আবার সেই পথেই হারিয়ে গেছে।

কৈশোরের প্রথম পর্বে, মাত্র পনেরো বছর বয়সে তাঁর জীবনে সর্বপ্রথম প্রেমের আবির্ভাব ঘটেছিল। তখন তিনি তাঁর জন্মভূমি ফ্রাঙ্কফোর্টের নানা হোটেলে এবং দরিদ্র অঞ্চলে ঘুরে বেড়াচ্ছেন মানুষের সম্পর্কে জানবার জন্তে। এইখানেই তাঁর সঙ্গে পরিচয় হয় গ্রেটচেনের (Gretchen)—যাঁর নাম তিনি তাঁর ফাউন্ট কাব্যে অমর করে রেখেছেন। সেই প্রথম প্রেমে গ্যেটে গ্রেটচেনের কাছ থেকে প্রেমের পরিবর্তে পেয়েছিলেন বেহ—পূজার পরিবর্তে অহুকাপ্প। সে অপমান তিনি ভুলতে পারেন নি। পরবর্তী জীবনে তাঁর বহুচারণার পেছনে এর কোনো অদৃশ্য প্রভাব লুকিয়ে ছিল কিনা কে জানে।

তারপর লাইপজীকে তাঁর ছাত্র জীবনে এল দ্বিতীয় নায়িকা ক্যেটচেন (Ketchen)। ভরুণ প্রাণের সমস্ত মাদকতা সেদিন উদ্ভূত হয়ে উঠেছিল এই মেয়েটিকে ঘিরে। কিন্তু সেও জোয়ারের জল—মাত্র কয়টিদিন তার কালবৃত্ত। যে প্রচণ্ডতা নিয়ে তা এসেছিল, চলে গেলোও তেমনি প্রচণ্ডবেগেই ; শুধু যাবার বেলায় কবি স্বতির মণি-মঞ্জুয়ার রেখে গেল তার বিদায়-অর্থ।

এর পরে একে একে এলো অনেকেই। লুসিন্দা, ফ্রেডরিকা, লোটি বুক, লিলি, শারলোট ফনস্টাইন। কবির জীবন পাত্র উচ্ছলিত করে মাধুরী দান করলো এরা—জুখায় ভরে দিলে। একটি মালঞ্চ থেকে আর একটি নূতন মালঞ্চে, একটি প্রেম থেকে আর একটি প্রেমে পরিক্রমা চললো কবির জীবনের শেষ দিনটি পর্যন্ত।

এদের মধ্যে শার্লট বুক বা লোটির স্থান একটু স্বতন্ত্র।

গ্যেটের জীবনে তিনি মহিমাময়ীরূপে প্রতিষ্ঠিতা—তাঁর প্রেমের রাজ্যে তিনি রবীন্দ্রনাথের ‘বিজয়িনী’। নানা নারী তাঁকে নানা ভাবে প্রার্থনা জানিয়েছে। কেউ তাঁকে পূজা করেছে, কেউ আবার তাঁকে গ্রাস করতে চেয়েছে কামনার অগ্নিজালায়। মিথ্যা সন্দেহে অন্ধ হয়ে তাই অন্ততমা প্রণয়িনী লুসিন্দা গ্যেটেকে অভিশাপ দিয়ে বলেছিলেন : ‘আমার পরে যে তোমাকে চুষন করবে চিরকাল তাকে দুঃখের দাবানলে পুড়তে হবে’ এই অভিশাপই বৃষ্টি গ্যেটের সমস্ত জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করেছে। কিন্তু এদের সকলের মাঝে লোটি বুক পাড়িয়ে আছেন মহিমাবিত্তা হয়ে—একটা উত্তাল সমুদ্রে দীপসুত্তের মতো।

পূর্ববর্তিনী নায়িকা ফ্রেডরিকার সম্পর্ক ছিল হওয়ার পরে তখন গ্যেটে গভীর মানসিক বেদনায় জর্জরিত হচ্ছেন—দুর্ঘ্যোগের রাতে ছন্নছাড়ার মত। Wanderer’s storm song গাইতে গাইতে পথ চলেছেন। এমন সময় তাঁর হৃদয় আকাশে লোটি বুকের আবির্ভাব।

ভরুণ কবি তখন ওয়েৎসলারে এসেছেন আইন-ব্যবসা সংক্রান্ত কাজ শেখবার জন্তে। Holy Roman Empire এর উচ্চ আদালত তখন এখানেই অবস্থিত ছিল। এখানে প্রায় কিছুদিন নিঃসঙ্গ কাটাবার পরে স্থানীয় একটি সাহিত্য-রসিক গোষ্ঠীর সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘটলো। তারও পরে এক গ্রাম্য নাচের মজলিসে তিনি দেখলেন শারলোট বুককে, সংক্ষেপে যার নাম লোটি বুক। এঁর সম্বন্ধে গ্যেটে বলেছেন “ইনি সেই জাতের নারী—যিনি পুরুষের প্রাণে কামনার শিখা জালান না—তার দৃষ্টিকে তৃপ্তির মাধুর্য দিয়ে ভরে দেন।”

লোটি ছিলেন গ্যেটের স্থানীয় বন্ধু কেস্টনারের বাগদত্তা পত্নী। সাধারণ গৃহস্থ ঘরের শান্ত দীপশিখার মত মেয়ে তিনি। মাতৃহীন সংসারের দশ বারোটি ভাই বোনের সেবাযত্নেই তাঁর দিন কাটতো। শিশুপ্রিয় গ্যেটে এই শিশুদের আশ্রয় করেই লোটির মনের দরজায় এসে পৌঁছলেন। কিন্তু লোটিকে তিনি চিনতে পারেন নি।

গ্যেটে আর লোটির ঘনিষ্ঠতা বাড়তে লাগলো দিনের পর দিন। ওয়েৎসলারের উপকণ্ঠে বিস্তৃত প্রান্তরে তাঁরা ঘুরে বেড়াতেন। বিকেলের শান্ত আলোয়, পরিপূর্ণ জ্যোৎস্নার উজ্জ্বল আলোয় সেই আনন্দ-বিহার মধুময় হয়ে

উঠতো। প্রতিদিন তাঁরা পরস্পরের কাছে এত অহরহ হয়ে উঠছিলেন যে মনে হতো একজনকে ছাড়া বুঝি আর একজনের আর চলবে না।

কেসত্নার ছিলেন কাজের মানুষ। চাকরী করতেন। চরিত্রের দিক থেকে ছিলেন অসামাজিক। তাঁর বাগদত্তা প্রিয়ার সঙ্গে গ্যেটের মেলা মেশাতে তিনি কোন দিনও বিন্দুমাত্র লক্ষ্য দেননি। বরং সময় সুযোগ পেলে এদের সঙ্গে যোগও দিতেন কখনও কখনও।

লোটির চরিত্র মাধুর্য, তাঁর দৈনন্দিন সাম্রাধ্য, আর গ্যেটের ভাবপ্রবণ মন—যথা নিয়মে এই ত্রিধারা মিশল এক সঙ্গে। তারপর গ্যেটে একদিন আবিষ্কার করলেন, তাঁর স্বতির পাণ্ডুলিপি থেকে কবে মুছে গেছে ক্রেডারিকার নাম। সেখানে আবার নূতনের পদ সঞ্চার হয়েছে—সে লোটিবুক্।

সহরের লোকে কানা-ঘুসাসুরু করলে। আলোচনা আরম্ভ হলো লোকের মুখে মুখে। কিন্তু কেসত্নারের আচারে ব্যবহারে বিন্দু মাত্রও পরিবর্তন দেখা দিল না বা কিছু মাত্র বৈলক্ষ্য দেখা গেল না কোথাও। ধীর প্রশান্ত মুখে তিনি শুনে যেতে লাগলেন সমস্ত কুৎসা-কাহিনী, নানা লোকের মুখে কুশ্রী অপপ্রচার।

আর একজন তেমনি নীরব হয়ে রইলেন। তিনি লোটিবুক্। গ্যেটের সমস্ত প্রাণ তখন উদ্বেল হয়ে উঠেছে। বহু নিঃসঙ্গ নিরালা মুহূর্তে তিনি আত্মপ্রকাশ করতে চেয়েছেন, লোটিকে জানাতে চেয়েছেন অন্তরের আকুলতা। কিন্তু পারেন নি—কোথায় যেন বেধেছে তাঁর। কোথা থেকে কি এসে যেন কর্তরোধ করে দিয়েছে তাঁর।

হয়তো কোনো একদিন যখন দিগন্ত-প্রসারি মাঠের ওপরে সূর্য্য তার রক্তিম আভা বিকীর্ণ করে অস্ত যাচ্ছে; যখন কমলালেবুর বনে রাঙা কলঙলো আরো রাঙা হয়ে উঠেছে সেই দিনান্তিক আলোর; আর অলিভের ঘনশ্রামল পত্রমর্শ্বরে ধ্বনিত হয়েছে কোনো দীর্ঘশ্বাস, সেই সময়ে লোটির পদপ্রান্তে বসে গ্যেটে তাঁর মনের কথা বলতে চেয়েছেন। কিন্তু কী আশ্চর্য্য—পৃথিবীর অন্ততম শ্রেষ্ঠ কবির কণ্ঠে তখন ভাবা যোগায় নি। তাকিয়ে দেখেছেন লোটির দৃষ্টি চোখে যেন ফুটে উঠেছে সন্ধ্যার নক্সার মতো বিধ্ব দীপ্তি। তার প্রত্যয় মনের সমস্ত

উদ্যমতা শাস্ত হয়ে আসে—কামনা হঠাৎ নতশির ভূজ্ঞের মতো নিবে যায়।

আসলে গ্যেটে লোটিকে যে চোখে দেখেছিলেন, লোটি সে দৃষ্টি দিয়ে তাঁকে দেখেন নি। গ্যেটের আকাঙ্ক্ষার কাছে আত্মসমর্পণ করে তিনি মহাকবিকে ছোট করতে চাননি। তিনি চেয়েছেন তাঁকে উদ্ধৃত করতে—তাঁকে প্রেরণা দিতে। তিনি গ্যেটের প্রেম-প্রার্থিনী ছিলেন না—ছিলেন তাঁর “Inspiration of better creation”

তা ছাড়া মনের দিক থেকে লোটি ছিলেন প্রধানত ‘মা’ জাতের মেয়ে—প্রিয়া জাতের নয়। নাবালাক ভাই-বোনদের মাগুণ করতে গিয়ে একটা মাতৃ স্নলভ স্নেহ স্নিগ্ধতা সঞ্চারিত হয়েছিল তাঁর মধ্যে। গ্যেটেকে তিনি সেই উদার স্নেহের মধ্যেই গ্রহণ করেছিলেন। তাই তাঁদের সাম্রাধ্য যতই ঘনিষ্ঠ হোক—পবিত্রতার এই অদৃশ্য শাসন প্রতি মুহূর্তে অহুত্ব করতেন গ্যেটে; এই অদৃশ্য প্রহরী আছে বলেই হাজার লোকাপবাদ সবেও নিশ্চিন্ত নিরুদ্বেগ ছিলেন কেসত্নার।

আত্মপ্রকাশের জন্ত গ্যেটের মন যতই আকুলি বিকুলি করুক—কেসত্নারের প্রতি লোটির প্রেম বিন্দু মাত্রও কেন্দ্রচ্যুত হয়নি। তাঁদের অন্তরের সম্পর্ক রইল অত্যান্ত—তাঁদের বিয়ের দিন একটু একটু করে এগিয়ে আসতে লাগলো।

গ্যেটের বৈধ্য যখন চরমসীমায় পৌঁচেছে, তখন একদিন তিনি জানলেন এই নিষ্ঠুর সত্যকে। তিনি জানলেন, শার্লট সাধারণ মেয়ের মতো ভাবের স্রোতে ভেসে বেড়ায় না—ক্ষণিকের উদ্যমনায় ঝট হয় না নিজের কর্তব্যবোধ থেকে। তিনি আরো জানলেন: শিল্পী হিসেবে তাঁর প্রতি লোটির সীমাহীন শ্রদ্ধা থাকলেও প্রেমের জগতে কেসত্নারের পাশে তাঁর বিন্দুমাত্র জায়গা নেই। প্রেমের অমরাবতীতে কেসত্নার যেখানে সম্রাট—সেখানে নিজের সমস্ত প্রতিভা, সমস্ত লোকরঞ্জনী-শক্তি তাঁর ব্যর্থ চেষ্টাতেই পরিণত হবে।

নারী হৃদয়কে যিনি এতকাল সহজলভ্য বলে জেনে এসেছেন—সেই গ্যেটে এবার যেন এক স্বেভার দেবারতনে এসে দাঁড়ালেন। চোখের জলধারা পোষা

এমন একটি জ্যোতির্ষ্য বিগ্রহকে—যাকে স্পর্শ করবার কোনো অধিকার নেই তাঁর ; সমস্ত পৌরুষের অভিমান তাঁর আর্তনাদ করে উঠলো, অন্তর যেন দীর্ঘ বিদীর্ণ হয়ে গেল।

পরাজিত গ্যেটের কাছে ওয়েৎস্লার যেন আশ্রয় নিয়ে উঠলো। কমলালেবুর রক্তিম পৌন্দর্যোত্তরা অলিঙ্গিত-মর্ম্মরিত দিক-প্রান্তর মনে হলো যেন মরুভূমি। তিনি অসুস্থ করলেন হতভাগিনী লুসিন্দার সেই মর্ম্মস্পর্শী অভিশাপ যেন তাঁকে তাড়া করে আসছে।

ওয়েৎস্লারে তিনি আর থাকতে পারলেন না। তারপর একদিন তিনি কেস্টনারকে একটুকরো চিঠি লিখে সকলের অজ্ঞাতে ওয়েৎস্লার থেকে বিদায় নিলেন। জানিয়ে গেলেন : “আর মুহূর্ত্তমাত্র এখানে থাকলে তিনি আর আত্মগোপন করতে পারতেন না। তাই বিদায়—অনিবার্য বিদায়—এরই কিছুদিন পরে তাঁর বেকুল অন্ততম বিখ্যাত রচনা “Werthus Leiden”—( Sorrows of weather ) এই বইটি আর কিছুই নয়—লোটির প্রতি তাঁর যে মনোভাব ও মর্ম্ম যন্ত্রণা এই গ্রন্থে তাকেই ফুটিয়ে তুলেছেন গ্যেটে। এর নায়ক “ওয়ারষ্টার”, কিন্তু নায়িকা বিবাহিতা শার্লোটে। ওয়ারষ্টার তাকে ভালবেসেছে—কিন্তু সে ভালবাসা বাসনা কামনা বর্জিত। যেমন নিষ্কলঙ্ক তেমনি পবিত্র।

লোটির পরেও জীবনে আরো নারী আবির্ভূত হয়েছে গ্যেটের। এসেছে লিলি, এসেছে ফনস্টাইন। কিন্তু তাঁরা প্রেমই পেয়েছে। পৃথিবীর অন্ততম শ্রেষ্ঠ কবির কাছে থেকে পূজা মাত্র একজনই আদায় করতে পেরেছেন—মাত্র একটি নারীই স্বমহিমায় নিজেকে অনগ্র করে রেখেছেন। লোটিবুফ্, তাই পৃথিবীর শিল্পী সাহিত্যিকদের কাছে সপ্রসূ বিশ্বস্বের বস্তু—নারীত্বের একটা উজ্জ্বল প্রকাশরূপে আমাদের সমাদরের সামগ্রী।

লোটি গ্যেটের জীবনে যে নূতন অহুভূতির দ্বার মুক্ত করে দিয়েছিলেন মহাকাব্যে, তাঁর সাহিত্যে তা স্থায়ী করে রেখেছেন তিনি। নারী প্রেমের মহত্ত্বরূপ সম্পর্কে গ্যেটের উক্তি আমরা বাংলা দেশের একজন শ্রেষ্ঠ কাব্য-সমালোচকের অগ্রবাদ থেকে উদ্ধৃত করছি ;

“বুধা গর্জন করে প্রবৃত্তির বজ্র  
কঠিনা অজিত উপকূলের সামনে  
বেলাভূমে ছড়ায় তা কবিত্বের মুক্তা  
লাভ হয় জীবনের কাজ্জিত ধন”

লোটির “অজিত বেলাভূমিতে গ্যেটের প্রবৃত্তির বজ্র সত্যি সত্যিই কবিত্বের অমর মুক্তা ছাড়িয়ে গেছে।”

## শিল্প-প্রদর্শনী

খ্রীসত্যচরণ দাস

শিল্পীরাই দেশের ও জাতির সংস্কৃতির উত্তরসাধক। এ কথাটা সত্য। প্রত্যেক সভ্যদেশের নাগরিকরাই স্বীকার করে আসছেন। স্বতরাং দেশের ভবিষ্যত গঠনে শিল্পীর দানও নগণ্য নয়। এ বিষয়ে ক’লকাতার ইন্ডিয়ান আর্ট স্কুল যে দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন তা স্বীকৃতিস্বরূপ দৃষ্টি আকর্ষণ করবে।

সম্প্রতি ইন্ডিয়ান আর্ট স্কুলে বাণিজ্য বিভাগের ছাত্রদের যে প্রদর্শনীর উদ্বোধন হ’ল তা দেখে শিল্পানুরাগী মাঝেই আশাবিত্ত হবেন, এতে সন্দেহের অবকাশ নেই। এ বিষয়ে প্রথমেই বাণিজ্য বিভাগের শিক্ষকের কথাই মনে স্থান পায়। বিভাগীয় শিক্ষক শ্রীকালীনাথ দাসের শিক্ষাধীনে যে কয়জন তরুণ শিল্পীর অঙ্কিত চিত্রের প্রদর্শনী দেখলাম তাতে মনে হয়, শিক্ষাগুরু সাধনা ও প্রচেষ্টা নিফল হয় নি। একান্ত আমরা শিক্ষক মহাশয়কে আমাদের আন্তরিক অভিনন্দন জানাই। এই প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন ভারতের অধিতায় শিল্পী শ্রীঅতুল বসু। এটা ছাত্রদের মনোবল ও সংসাহসের পরিচায়ক।

প্রদর্শনীতে বলিষ্ঠ অঙ্কনের উদাহরণ, বিশেষ করে Nature study আকৃষ্ট করে। “Nature is the Master of all Arts” এই বাণী



গভীর তীর

বে এখানকার অত্যেক শিক্ষার্থীদের অন্তরে দৃঢ় বিশ্বাস জাগিয়ে তুলেছে— তা অতিকলিত হয় তাদের অঙ্কিত প্রতি চিত্রেই। তৈল চিত্র, জলরং, কালি কলম, পেনসিল প্রভৃতি নানা মাধ্যমে আঁকা প্রায় ৩০০ ছবি প্রদর্শনীতে স্থান পেয়েছে।

উন্নত দৃষ্টিভঙ্গির কার্যের মধ্যে প্রথমই উল্লেখ করতে হয় দার্শনিক গালের নাম। তাঁর আঁকা ছবিতে বে নুতনঘের ও সংসাহসের ইঙ্গিত আমরা পেয়েছি, তাতে অদূর ভবিষ্যতে তিনি বে বাংলার শিল্পীসমাজের মুখ উন্মুল করবেন সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। তাঁর বলিষ্ঠ তুলি আমাদের মনে দাগ কেটেছে। তাঁর ছবিগুলির মধ্যে “মালাকর রমনী” (২২) “বারান্দার মধ্যে দিয়ে” (২) “অধ্যয়ন (৮২)” ও “আমার

হওয়া যায়। তাঁর অঙ্কন-পদ্ধতিতে বলিষ্ঠতার নিদর্শন আছে। Landscape ও Portrait এ দুয়েতেই তাঁর প্রতিভার পরিচয় দেখা যায়। এর আঁকা ছবিগুলির মধ্যে প্রথমই “পঞ্চবটর” (৩১) কথা মনে হয়। ছবির শান্ত পরিবেশ ভগবান রামকৃষ্ণের কথা মনে করিয়ে দেয়, কিন্তু এত আলো-ছায়ার খেলা মনোমুগ্ধকর হোলেও কিঞ্চিৎ



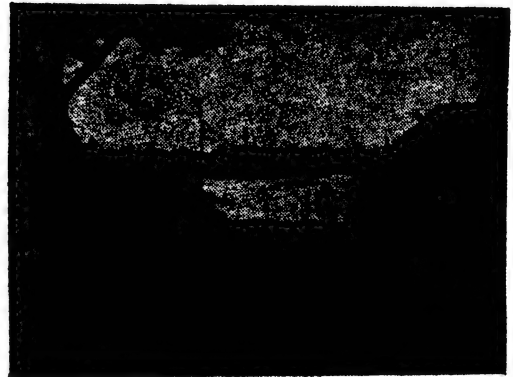
বারান্দার মধ্যে দিয়ে

বান” (৭১) উল্লেখযোগ্য। স্থলীল বৈজ্ঞানিক কয়েকখানি চিত্রও সমধিক রসসমীচ। তাঁর আঁকা “আমার গ্রাম” (৫০) চিত্রে শিল্পীর তৈল চিত্র রচনের দক্ষতা প্রকাশ পেয়েছে। জলরং এ “উচ্ছ্বাস” (২২) তে শিল্পীর নিপুণতা প্রকাশ পেলেও রসস্থিতির দিক দিয়ে ছবিটি অসম্পূর্ণ বলে মনে হয়। সত্য মুখার্জির কাজে বিশ্বাস নির্বাকচেনের বাহুল্য আছে। তাঁর কয়েকখানি কাজে নিখুঁত সৌন্দর্যের পরিচয় আছে। তৈলচিত্রে “পুরানো টপাডু” (৫৫) ও “স্বকৃতলে” (৫৫) তাঁর সৃষ্টির নিপুণতা প্রকাশসমীচ। “শিববাড়ী” (১০৮) line and wash এ ও “গ্রাম্য বাট” (১) জলরং এ তাঁর পরিচায়ক। কিন্তু তাঁর নির্বাকচেনের বাহুল্য বিধার “বীণের সোণা” (৫৮) শিল্প সৃষ্টির বিষয় বর্তীয়েছে।



মা ও হেলা

অতিরিক্ততার আভাষ আছে—। তাঁর অঙ্কিত ছবিগুলির মধ্যে “ইরা” (৬৯), “এসপ্লানেডের বোড়” (১০৬), “প্রদর্শনীতে” (১০০) ও “ছারাবনতল” (১৫৫) বিশেষভাবে উল্লেখ্য। তাঁর “লাইক ড্রইং” গুলি (২৫৮) প্রদর্শনীর সৌন্দর্য কুর করেছে।



আলো-ছারা

শিল্পক শ্রীকান্দাধ দাঁশের কাজের মধ্যে “আলো ও ছারা” (৫১) ও “চিড়িয়াখানার দৃশ্য” (৩৩) ছবি দুটি উচ্চতরের অঙ্কন পদ্ধতির



পূর্ণ প্রকাশ নেই। তাঁর অঙ্কন পদ্ধতি অনেক ছাত্রই গ্রহণ করেছে বলে মনে হয়। স্থলীল দাসের কাজগুলিও মনোমুগ্ধকর। তাঁর কাঠগোলা (৭২) নির্দ্বাণ (৫) ও অরপূর্ণা বাট (৫২) উৎকৃষ্ট শিল্পের নিদর্শন। তাঁর কমার্সিয়াল কাজগুলি অভুলনীয়। এছাড়াও পান্চাত্যভাবিত অঙ্কিত চিত্রগুলির মধ্যে গৌতম মজুমদারের “তিনটি গাছ” (১৪৮), সন্নিব মন্দির “বিভাগয়ের একাংশ” (১৪২), অমরেশ গাঙ্গুলীর মন্পতি (১২২), তুষার সেনের “মধ্যাহ্নের নীরবতা” (৭৮), ও দেবদাস ভট্টাচার্যের ধোলাঘাট (১১১) যথেষ্ট প্রশংসার দাবী রাখে। গণেশ নায়কের “কুলি

অমরেশ গাঙ্গুলীর “ভারতীয় সৌন্দর্য” (২৫) ছবির দোলায় সৌন্দর্য-মণ্ডিত।

ধেওয়ালপল্লী চিত্রণ একটাও ভাল লাগেনি। “টেলিটাইল ডিজাইনে” দীপ্তিমোখা বিশ্বাসের নামই উল্লেখযোগ্য। পরেশ চৌধুরী রোট খোদাই এক অপূর্ণপ শিল্প সৃষ্টি করেছে—এর পূর্বে এ ধরনের কাজ কোথাও দেখেছি বলে মনে হয় না। প্রাচীর পত্রে মনোহর দে, স্থলীল বৈজ, স্থবীর মৈত্র ও স্থলীল দাশ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। কমার্সিয়াল ডিজাইনে—স্থলীল দাস, স্থলীল বৈজ, শৈলেন দে, কমল সরকার ও গৌতম মজুমদার উল্লেখযোগ্য।



প্রাচীরপত্রের নক্সা

ক্যান্টিন” (৩৩) শিল্পীর দরদী মনের পরিচায়ক। স্থবীর রায়, নির্মল দত্ত, অরুণ ঘোষ ও দীনেশ সাহার উজ্জ্বল প্রশংসনীয়। তারাণব বোসের মা ও ছেলে প্রভৃতি কাজগুলিতে নতুনত্বের আভাস আছে। কিন্তু ড্রইং ও composition সম্বন্ধে আরও সচেতন হওয়া দরকার।

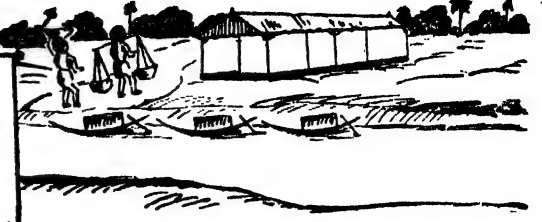
প্রাচ্য অঙ্কন পদ্ধতিতে ভারতীয় কলার ভেমন আশাষিত উৎকর্ষতা প্রদর্শনীতে লাভ করেনি—এর মধ্যে গৌতমমজুমদারের “জলকে চল” (১৬) সত্য সুখাঙ্কির “কালো মেয়ে” (১৫) সন্নিব মন্দির “রাসের পর” (১৩) ও



জলকে চল

এই প্রদর্শনী দেখে আমরা ইণ্ডিয়ান আর্ট স্কুলের ছাত্রদের যে উদ্দীপনার পরিচয় পেয়েছি তা আমাদের মনে বহু দিন জাগরুক থাকবে। আগামীবারে আরও উন্নততর শিল্প নিদর্শন দেখবার আশা রাখি। তবে সরকার যদি এই বিভাগভবনের দিকে কিকিং মনযোগী হন তবে এই তরুণ উদীয়মান শিল্পীরা ভবিষ্যতে ভারতের সংস্কৃতির গৌরব অক্ষুর রাখবে।

# দ্বারমণ্ডল



গরামঙ্গর বন্দ্যোপাধ্যায়

(পূর্বাত্ত্বতি)

ভায়রঙ্গ কোন কথা বলিলেন না অরুণাকে। নীরবে দেবকী সেনের সঙ্গে জয়তারার আশ্রমে চলিয়া গেলেন। অরুণাই কয়েকটি কথা বলিল। বলিল—কানী আমি যেতে পারি নি দাদু। মোগলসরাইয়ে নেমে আমি—।

অরুণা দেবকী সেন স্বর্ণ ও গৌরের দিকে চাহিয়াই বোধ হয় চূপ করিয়া গেল। নীরবে খানিকটা পথ হাঁটিয়া আবার বলিল—এক বেলা মনের সঙ্গে দ্বন্দ্ব করে শেষ করে গেলাম কলকাতা।

ভায়রঙ্গের শীর্ণ মুখে কীর্ণ একটুকরা হাসি ফুটিয়া উঠিল। প্রসন্নও নয়, বিষন্নও নয়, সে হাসি বিচিত্র; কি যে সে হাসির অর্থ, সে শুধু তিনিই জানেন।

গৌর বলিল—সে কথা আমি লিখেছিলাম দেবদাকে।

কথাবার্তা হইতেছিল একটি অস্বাভাবিক অবস্থার মধ্যে। সন্ধ্যার মুখে পথ চলিতে চলিতে টুকরা টুকরা কথা যেন কোন বায়ুপ্রবাহে হিম শীতের রাজ্যে শিশির বিন্দু ঝরিয়া পড়ার মত জমিয়া জমিয়া শিশির কণা বিন্দুতে পরিণত হইয়া আপনার ভারে যেন আপনি ঝরিয়া পড়িতেছিল। একটা সংকোচ যেন সমস্ত মাহুষ-জন্মের মন প্রাণকে নিস্তরঙ্গ করিয়া তুলিয়াছে। স্বর্ণ একটি কথাও বলে নাই। অন্ধকারে দেখিবার উপায় ছিল না—তাহার উপর সে মাটির দিকে মুখ নামাইয়া পথ চলিতেছিল, তাহার ভুরু দুটি কুচকাইয়া উঠিয়াছে, বোঁদন-মন্ডণ ললাটেও গোটা দুয়েক রেখা ফুটিয়া উঠিয়াছে। তাহারা চলিয়াছিল। ময়ূরাক্ষীর তীরভূমির উপর দিয়া একটা নির্জন পথ ধরিয়া। বালির উপর এতগুলি লোকের পা-ফেলার শব্দ উঠিতেছে শুধু।

আবার অরুণাই বলিল—তেবেছি আপনাকে চিঠি লিখি, কিন্তু—।

কিন্তু বলিয়াই থামিয়া গেল, বাকী কথাটুকু আপনি বাহির হইয়া আসার মত ভাব যেন হারাইয়া ফেলিয়াছে। একটি শিশির বিন্দুর খানিকটা ধসিয়া পড়িল—বাকীটা যেন পাতার প্রান্তে লাগিয়া রহিয়াছে—তুলিতেছে।

হঠাৎ স্বর্ণ এক জায়গায় দাঁড়াইয়া গেল। ডাকিল—অরুণা দি।

—এ্যা।

—আপনি কি?—আপনি কি ঠাকুর মশায়ের সঙ্গে জয়তারার আশ্রমে যাবেন?

এতক্ষণে অরুণার—শুধু অরুণাই নয় দেবকী সেন ভায়রঙ্গ এমন কি গৌরেরও খেয়াল হইল—তাহারা শিকড়িঙ্গীদের বাসার কাছে আসিয়া পড়িয়াছে। জয়তারার আশ্রমের পশ্চিক এবং বাসার লোকের পথ এইখান হইতেই ভিন্ন হইয়া গিয়াছে। পথ ভাঙিতে হইবে। অরুণা বলিল—ভায়রঙ্গকেই বলিল—আমি বাই।

এতক্ষণে ভায়রঙ্গ বলিলেন—এস। তারপর ডাকিলেন—সেন।

দেবকী আগাইয়া আসিয়া বলিল—চলুন।

সন্ধ্যার প্রারম্ভ, কিন্তু অন্ধকার ঘন গাঢ় হয় নাই। পশ্চিমের আকাশে খানিকটা মেঘ ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইয়া ছোট বড় টুকরা হইয়া ছড়াইয়াছিল—সেগুলিতে অন্তর্গত সূর্যের ছটার রেশ তখনও লাগিয়া রহিয়াছে, ধ্বনির শেষে প্রতিধ্বনির মত—আলো খানিকটা ধরিয়া রাখিয়াছে। দুটি মাহুষ পূর্বমুখে চলিয়াছে;—অরুণা দাঁড়াইয়াই রহিল। অকস্মাৎ মেঘের আলো মুছিয়া গেল, অন্ধকারটা সঙ্গে সঙ্গে গাঢ় হইয়া উঠিল;—মাহুষ দুটিকে আর দেখা গেল না।

গৌর বলিল—চলুন এইবার।

স্বর্ণ খানিকটা আগাইয়া দাঁড়াইয়া আছে, তাহার মধ্যে

একটা অধীরতা পাঠ হইয়া উঠিয়াছে। অরুণা গৌরের  
ডাকে সচেতন হইয়া বলিল—চল। স্বর্ণ কই ?

—এই যে।

—ও।

—আপনি ঠুর সঙ্গে গেলেই বোধ হয় ভাল করতেন।

—ঠুর সঙ্গে ? আশ্রমে ?

—হ্যাঁ। এখানে আপনার অনেক অসুবিধে হবে।

—অসুবিধে হবে ? বিশ্বয়ের আর অবধি রহিল না  
অরুণার। এ কি বলিতেছে স্বর্ণ ? দীর্ঘ তিন বৎসরের  
উপর সে এখানে চাকরী করিতেছে, এই বাসাই তাহার  
ঘর হইয়া উঠিয়াছে—এখানে তাহার হঠাৎ আজ  
অসুবিধা হইবে কেন ? তাই ‘অসুবিধে হবে’ কথাটা  
সবিস্ময়ে সপ্রশ্ন ভঙ্গিতে উচ্চারণ করিয়াও তাহার তৃপ্তি  
হইল না। কয়েক মুহূর্ত পরে আবার প্রশ্ন করিল—  
অসুবিধে হবে কেন ? আমার বাসায় কি কেউ রয়েছে ?

অর্থাৎ দলের কোন কর্মী কি রহিয়াছে সেখানে ?

স্বর্ণ বলিল—না। এখানকার বারা, তারাই রাম-  
সেবকের ওখানে। ঘর আপনার কেউ নাড়েনি।—  
তবে—

—তবে কি ?—

—দেখবেন। ঘরের তালায় হাত দিয়া স্বর্ণ বলিল—  
হেঁয়ালীর মতই বলিল—দেখবেন।

\* \* \*

চাপা কথাটা চাপিয়া রাখার জন্তই বিবাক্ত হইয়া  
উঠিয়াছিল। সেটা অকস্মাৎ প্রকাশিত হইয়া পড়িতেই  
তাহার ঝাঁঝের তীব্রতায় অরুণা যেন আর্জুনাদ করিয়া  
উঠিল—অন্তরে অন্তরে আর্জুনাদ করিয়া উঠিল। সেটা  
ঘটিল এইভাবে। বাড়ীতে আসিয়া সহজ সুরেই অরুণা  
বলিল—দাঁড়াও ভাই, আগে গা হাত মুখ ধুয়ে কেলি।  
বাবা—ট্রেণে যা কয়লার গুঁড়ো খেয়েছি।

সুটকেস খুলিয়া কাপড় গামছা সাবান লইয়া কুয়া-  
তলার পাশে ঘান ঘরের দিকে বাইতে বাইতেই অরুণা  
বলিল—ঠোতটা ধরিয়ে একটু চা কর ভাই স্বর্ণ।

—আপনি চা-খাবেন ? ঠোত ধরাব ?

—এলাস বলে আমি। দেয়ী হবে না আমার। তুমি  
তৈরী কর।

—কিন্তু এই সব বাসনে—আমার হাতে আপনি  
খাবেন তো ?

—কি বলছ তুমি স্বর্ণ ? অরুণা প্রচণ্ড বিস্ময়ে অভিভূত  
হইয়া উচ্চ কণ্ঠেই প্রশ্ন করিয়া উঠিল।

—আপনি যে কেঁচে গধুঘ করে বসেছেন অরুণা দি।  
ঠাকুর মশায়ের বিধবা নাত-বউ সেজেছেন নতুন ক’রে।  
খান কাপড় পরেছেন, হাত খালি করেছেন, একাদলী  
করেছেন—এর পরও আপনি—

অরুণার কাছে এমনি অক্লান্ত, এমনি অপ্রত্যাশিত  
এই প্রশ্নগুলি—এবং এই প্রশ্নগুলির প্রত্যেকটি এমনিই তীক্ষ্ণ  
সূচ্যগ্র ও জ্বালাকর কোন রসায়ন-মাধান যে অরুণা মুহূর্তে  
যেন হতচেতন হইয়া গেল। অন্তরে অন্তরে আর্জুনাদ  
করিয়া উঠিল সে, কিন্তু মুখে একটি শব্দও বাহির হইল না।

স্বর্ণ বলিল—মাথার চুলগুলি কেটে কেললেই আর  
অজহীন থাকত না—বোল আনা পুরো হয়ে যেত। তাহার  
মুখে তীব্র হাসি খেলিয়া গেল—সে বলিল—আসলে আপনারা  
ব্রাহ্মণ—বৈষ্ণব ব্রাহ্মণ এরা হলেন ধর্মজগতের অভিজাত—  
মাথার মগি, আপনারদের পক্ষে এগুলো ছাড়া শক্ত। কিন্তু  
ছি—ছি—অরুণা দি—আপনি শেষে এমনি উন্মোচন  
খাবেন এ কেউ ভাবে নি। আমি তো ভাবতেও পারি নি।

অরুণা নিজেকে সামলাইয়া লইয়া বলিল—আমি আসছি  
স্বর্ণ। স্নান ক’রে আসছি। গৌর ততক্ষণে তুই ঠোতটা  
ধরিয়ে জল চড়িয়ে রাখ না ভাই।

ইহার আগে দরবারী শেখ কথাটা কদম্ব অঙ্গীলতার  
সঙ্গে প্রকাশ করিয়াছিল। অরুণা দরবারীকে জানে—  
এবং ইংরাজের পুলিশ বিভাগের এ দিক দিয়া শিক্ষার  
কথাও তাহার কাছে অবিস্মিত নয়—তাই ও কথাটা সে  
ধরে নাই। ইহার জন্ত মনের সকল কোন্ট্রু ইংরাজের  
উপর ও ইংরাজের পুলিশের উপর পড়িয়াছে। বাহির  
হইয়া আসিয়া সে স্তায়রসকে দেখিয়া তাঁহার কাছেই  
আগাইয়া গিয়াছিল—সুরপতির মুচকি হাসি, রণদাবার  
মুচকি হাসি ; দেবকী সেনের বিস্ময়, স্বর্ণের বিচিত্র বহ-  
প্রস্নেয়প্রাণিত মুখ ও দৃষ্টি কোন দিকেই লক্ষ্য করে নাই।  
এমন কি আসিবার পথে সকলেই যে নীরব হইয়া পথ  
চলিতেছিল, তাও সে দেখাল করে নাই।

এতকালে স্বর্ণ কথাটা অতি তীব্রভাবে প্রকাশ করিয়া ফেলিল। জান সারিয়া অরুণা আসিয়া বসিয়াই বলিল—চা করিস নি গৌর? স্বর্ণ বারণ করেছে বুঝি?

—করেছি।

অরুণা চায়ের জল নামাইয়া—তাহাতে চা ফেলিয়া দিল। তারপর বলিল—চায়ের চেয়ে জলই বোধ হয় বেশী ভাল লাগবে। একগ্লাস জল ঢালিয়া লইয়া সে জলটুকু নিঃশেষে পান করিয়া বলিল—আঃ।

স্বর্ণ যেন ক্ষিপ্ত হইয়া বসিয়া আছে—সে বলিল—এ সব কি আমাকে দেখিয়ে করেছেন অরুণা-দি?

—তুমি এমন রুদ্র—তপ্ত আগুন হয়ে উঠলে কেন বল তো স্বর্ণ? বলিয়াই বলিল—ও। তোমার রাগের কারণ হ'ল আমি খান কাপড় পরেছি, হাতের চুড়ি খুলেছি—একাদশী করেছে—

স্বর্ণ মাঝপথেই বাধা দিয়া বলিল—সে আপনি ছুনিয়াকে দেখিয়ে করেছেন। লোকে তার জন্তে মুচকে মুচকে হেসেছে। দরবারী শেখের কথাও আমার কানে এসেছে। সে নিয়ে এরই মধ্যে লোকে কথা বলছে। সে নিয়ে জিজ্ঞাসা তো আপনাকে আগেই করেছি আমি। যা নিয়ে জীবন জুড় করলেন, 'বার জন্তে শপথ নিলেন, বার জন্তে বিখনাধবাবুর সঙ্গে আপনি বিয়ের প্রয়োজন অনুভব করলেন, সে সব আপনি হঠাৎ তাসিয়ে দিয়ে—এ কি করলেন? তারপর আবার একাদশী করেও আমাকে দেখিয়ে জল খেলেন—চা পাবেন; এ কি?

অনেকক্ষণ শুক্ক হইয়া বসিয়া রহিল অরুণা। তারপর দীর শান্ত কণ্ঠে বলিল—আমি একটা খুব বড় আঘাত পেয়েছি স্বর্ণ।

—জানি—

—না—জান না।

—জানি না? স্বর্ণ হাসিল।—আঘাত যে খেলেন অরুণা দি বিখণ্ড লোকের সামনে। ভায়রঙ্গমশায়কে আঘাত করতে গিয়ে—নিজে আছাড় খেয়ে পড়লেন তাঁর পায়ে।

—আ স্বর্ণ! সে নয়। সমর বোব আজ বছরখানেক ধরে আঁধারে অন্ধির ক'রে তুলেছে। তার দাবীর কাছে আমি ক্রমশ দুর্বল হয়ে পড়ছিলাম। কিন্তু—

—কিন্তু কি আছে এর মধ্যে অরুণা দি? বন্ধ স্বর্ণ বলিল—কিন্তু তো—সেই আপনি বৈদ্য ব্রাহ্মণের মেয়ে—ভায়রঙ্গ মহাশয়ের মত পুণ্যবান ব্রাহ্মণের পৌত্রক আপনি, বিধবা হয়ে আপনি কি ক'রে সমর বোবের বিয়ে করবেন?

অরুণা স্থির দৃষ্টিতে স্বর্ণের মুখের দিকে চাহিয়া বলিল—তুমি আমাকে বারবার আঘাত করতে চাচ্ছ স্বর্ণ।

স্বর্ণ বলিল—সত্য কঠোরই হয় অরুণা-দি, আর কঠোরা বা—তার সঙ্গে সংঘর্ষ হলেই আঘাত পেতে হয় অনিবার্যভাবে। আঘাত তো আমি আপনাকে দিই নি অরুণা-দি, সমর বোবের ভালবাসাকে এইভাবে অন্ধ-সংস্কারের বেশে অপমান করেছেন—তাতে আপনি নিজেই নিজেবে আঘাত করেছেন—অপমান করেছেন। আমি না।

—সমর আমাকে ভালবাসে, কিন্তু আমি যে তাহে ভালবাসি না স্বর্ণ। তার দাবী আমি মানব কি ক'রে?

—কি বলছেন আপনি? স্বর্ণ সোজা হইয়া বলিল।—শেষে আপনি মিথ্যে বলতে আরম্ভ করলেন অরুণা-দি?

—স্বর্ণ! অরুণার কণ্ঠস্বরে এবার তিরস্কার বাজির উঠিল।

—ধমক দিয়ে তো আমার মুখ বন্ধ করতে পারবেন না অরুণা-দি! হাসিয়া বলিল—কারই বা পারবেন! এ কে বিশ্বাস করবে বলুন?

—বিশ্বাস আমি কাউকে করতে বলব না স্বর্ণ। আমার বিশ্বাস—আমার অন্তরের সত্যকে আমি এতদিনে আবিষ্কার করেছি। আমি তাকে ভালবাসি না।

—আবিষ্কারটা অভিনব অরুণা-দি। আজ দু বৎসর মাসে চারখানা করে অন্তত ছিয়ানকুইখানা পত্র আপনি তাকে লিখেছেন—সেও আপনাকে লিখেছে; তার কতক আমি দেখেছি—আপনিই দেখিয়েছেন। এরপর—আবিষ্কার অভিনব।

—অভিনব বল—আপত্তি করব না, কিন্তু এ সত্য। একটু শান্ত হয়ে যদি আমার কথা শোন স্বর্ণ, তবে হয় তো বুঝতে পারবে। যে খাত খেতে লাগা দেহটা পঞ্চাশের মধ্যে স্বর্ণ, উপবাসে থেকে মাহুয সেই খাতের আলাপিত হয়ে তারই দিকে হাত বাড়ায়—অবশেষে সোঁতা

হুঁত্বপীড়িত মানুষের ক্ষুধার তাড়নার পরিচয়। সেটা তার কচির পরিচয় নয়।

—তার মানে ?

—আরও ভেঙে বলতে হবে স্বর্ণ ? আমার বয়স তো তোমার চেয়ে বেশী নয় ভাই। আমার দেহের ক্ষুধা আছে, এ কথা বলতে লজ্জা আমার নাই। দেহের ক্ষুধায় মন আমার দুর্বল হয়ে পড়ছিল—আমি সময়ের চিঠির উত্তরে চিঠি লিখে যাচ্ছিলাম। কিন্তু তাঁকেও ভুলতে পারছিলাম না। নইলে অনেক দিন আগেই সময়ের হাতে নিজেকে ফুলে দিতাম। তুমি জান না স্বর্ণ—তুমি জান না, মনের মধ্যে সে কি যুদ্ধ ! সময়কে চিঠির উত্তর লিখেছি সম্মতি দিয়ে—চিঠি লিখে উঠে মনে হয়েছে—সমস্ত বুকের ভেতরটা—আমার চরম সর্বনাশ হয়ে গেছে—এমনি হুঃখে তরে উঠেছি। অকারণে কঁদেছি। কঁদে তৃপ্তি পাই নি। রাত্রে তাকে স্বপ্ন দেখেছি। সকালে উঠে সময়কে চিঠি লিখেছি—না। চিঠি লিখে উঠে মনে হয়েছে এ দুনিয়ার সব তেতো—সব বিশ্বাস, ইচ্ছে হয়েছে সমস্ত কিছুতে আগুন ধরিয়ে দি। ইহুলে মেয়েদের অকারণে বকেছি, মেরেছি। তোমার সঙ্গে—দেবাবুর সঙ্গেও কথাস্তর হয়ে গেছে। এ সবার ভেতরের কথা জানতে না—কিন্তু আমার এই অবস্থার কথা তো তোমার জানা। কতদিন বলেছি—আপনার ঘাড়ে একটা ভূত চাপে অরুণা দি—সেটা কখনও কঁদায়, কখনও রাগায়। স্বর্ণ ভূত ওটা বটে—কিন্তু তাকে কি কোনদিন হাসাতে দেখেছ আমাকে ?

স্বর্ণ হিরদৃষ্টিতে অরুণার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। সে দৃষ্টিতে বিশ্বয় কোভ হয়তো বা ক্রোধও ফুটিয়া বাহির হইতেছিল, কিন্তু অরুণার কথার প্রতিবাদ করিবার কিছু খুঁজিয়া পাইল না। অরুণা বাহা বলিয়াছে—তাহা অন্ধরে অন্ধরে সত্য। আজ দুই বৎসর অরুণা এখানে আসিয়াছে, দুই বৎসরের মধ্যে অরুণা কোন উল্লাসে হাসিয়া উঠে নাই। কখনও ছড়াইয়াছে আগুন—যে কোন উপলক্ষ লইয়া হোক না কেন—সে যখন প্রতিবাদ করিয়াছে তখন তাহার কণ্ঠস্বরের তীব্রতায় অগ্নিশিখার প্রান্তস্পর্শ ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহার জালা ধরাইয়া দিয়াছে, তাহার মুখের কপালের রঙে আগুনের আভা ফুটিয়া উঠিয়াছে, খাস-প্রাশাসে উত্তাপ ছড়াইয়া দিয়াছে। পৃথিবীর সমস্ত কিছুর উপর যুগ ও

বিরক্তিতে পৃথিবীর কাছেই সে অসহনীয় বলিয়া মনে হইয়াছে। তাহাকে ভয় করিয়াছে। কখনও বা অরুণা এমন উদাসীন হইয়া পড়িয়াছে যে, অরুণা না কঁাদিলেও তাহাকে দেখিয়া স্বর্ণের কঁাদিতে ইচ্ছা হইয়াছে। কিন্তু এমন ঘটনা একটিও স্বর্ণ স্মরণ করিতে পারিল না যে ঘটনাটিকে উপলক্ষ করিয়া অরুণা উল্লাসে অধীর হইয়া উঠিয়াছে। এমন কি যে সময়ের কথা স্বর্ণ বলিল—সেই সময়ের উপস্থিতি উপলক্ষেও নয়। সময় এখানে করেকবারই আসিয়াছে। দলের কাজ লইয়া আসিয়াছে বটে, কিন্তু সেটাই মুখ্য—না—অরুণার সঙ্গে দেখা করার উদ্দেশ্যটাই মুখ্য—সেটা কেউই হালপ করিয়া বলিতে পারে না। অরুণা সময়ের সঙ্গে নদীর ধারে গভীর রাত্রি পর্যন্ত কাটাইয়া আসিয়াছে, ঘরে বসিয়া ঘণ্টার পর ঘণ্টা রাজনীতির চর্চা করিতে গিয়া তর্ক করিয়াছে, কতদিন রাত্রে স্বর্ণের পাশের বিছানার শুইয়া জাগিয়া রাত্রি কাটাইয়া দিয়াছে। সময় আসিলে সময় এবং দেব একটা বাসায় শুইত, স্বর্ণ ও অরুণা থাকিত একটা বাসায়। গভীর রাত্রে স্বর্ণের ঘুম ভাঙিয়া কোনদিন দেখিয়াছে অরুণা আলো জালিয়া বই লইয়া বসিয়া আছে অথবা কিছু লিখিতেছে, কোনদিন অন্ধকারে গভীর দীর্ঘ নিশ্বাস শুনিয়াছে, নিজস্বাধীনতার ‘অধীরতা’ অশান্তভাবে পাশ ফিরিয়া শুইতে দেখিয়াছে। একদিনের কথা মনে পড়িতেছে। স্বর্ণ সেদিন প্রাঙ্গ করিয়াছিল, ঘুম আসছে না অরুণা-দি ?

—নাঃ। পাশ ফিরিয়া শুইয়া হঠাৎ আবার পাশ ফিরিয়া অরুণা বলিয়াছিল—আমি আর পারছি না স্বর্ণ !

এই কিছুদিন আগেও—মাস চারেক আগে সময়কে বিদায় সম্ভাষণ জানাইবার সময় স্বর্ণ অরুণাকে বলিতে শুনিয়াছিল—মন আমি স্থির করেছি। তুমি শুধু চাকরী দেখ—তোমার আমার দুজনের চাকরী কলকাতাতে।

তখন গভীর রাত্রি। কর্ম্মীরা সাধারণত বাগরা আসা করে রাত্রেই ঘেঁ। এখান হইতে যে ব্রাঞ্চলাইনটা মাইল পঞ্চাশেক আগে চলিয়া গিয়া আবার মেন লাইনের সঙ্গে যুক্ত হইয়াছে সেই ব্রাঞ্চলাইন হইয়া খানিকটা ঘুরিয়া বাতায়ত করে। তাহাতে নজর খানিকটা কম পড়ে। সেদিন দেব ও গৌর দুজনে রাত্তার উপর দাঁড়াইয়া সময়ের

জন্ম প্রতীক্ষা করিতেছিল—সময় ও অরুণা—অরুণার বাসার দরজার মুখে দাঁড়াইয়া কথা বলিতেছিল। স্বর্ণ এবং অরুণার বাসার মাঝখানে পানীলের এপাশে দাঁড়াইয়াছিল স্বর্ণ, কথাগুলো সে স্পষ্ট শুনিয়াছিল। সময় বাড়ী হইতে বাহির হইবার মুখে অরুণা তাহাকে আবার ডাকিয়াছিল—শোন।

সময় ফিরিতেই আবার বলিয়াছিল—কিন্তু জাহ্নবীর আগের না।

—কেন? আবার জাহ্নবীর খোঁচা উঠল কেন?

—কারণ আছে বই কি! ডিসেম্বরে স্কুলের পরীক্ষা, জাহ্নবীরিতে নতুন সেসন। এ সময়ে চাকরী ছেড়ে যাওয়াটা ঠিক হবে না।

—বেশ ত' ছাড়বে না। ততদিন থাকবে।

—হ্যাঁ। এখানে থাকতে আমি—

—কি?

—ততদিন অপেক্ষা কর সময়। করতেই হবে।

স্বর্ণ এ পাশে দাঁড়াইয়া নিশ্বাস বন্ধ করিয়া শুনিতেছিল; এই কথার পরই সে দরজা বন্ধ করিবার শব্দ শুনিয়াছিল। পরদিন সকালে স্বর্ণ হাসিমুখে রসিকতা করিবার ইচ্ছা লইয়া মনে মনে অনেক কথা তৈয়ারী করিয়া লইয়া অরুণার বাসার গিয়া অরুণাকে দেখিয়া অবাক হইয়া গিয়াছিল। ঘরের মেঝের উপর অরুণা শুইয়াছিল, শুইয়াছিল নয়—পড়িয়াছিল। সবিস্ময়ে প্রশ্ন করিয়াছিল—কি হল অরুণাদি?

—মাথা ধরেছে।

—এ্যাসপ্রো থান নি কেন? পরণ্ড তো আনিয়েছেন। ওই তো টেবিলের উপর রয়েছে—

—না।

—না—নয়, উঠে খেয়ে ফেলুন। মেঝেতে শুয়েই বা কেন?

—ঠাণ্ডা ভাল লাগছে।

—অর হয় নি তো?

—না। আমার একটু ঘুমতে দাও স্বর্ণ, ঘুম হলোই সব সেরে যাবে। সে পাশ ফিরিয়া শুইয়াছিল। বাহার হুস্পষ্ট অর্ধ—তুমি যাও স্বর্ণ—তুমি যাও।

লইয়া স্বর্ণই ইস্কুল চালাইতেছিল, হঠাৎ বেলা লাগে বারোটা একটার সময় অরুণা গিয়া হাজির হইয়াছিল। বাকী দিনটা সামান্ত ছুতায় নাড়ায় বকিয়া-বকিয়া আশুন। ছড়াইয়া গোটা ইস্কুলটাকে উত্তপ্ত করিয়া তুলিয়াছিল। একটা ছোট মেয়ে বুড়া পণ্ডিতের চটের থলি হইতে ওল চুরি করিয়া তাহাতে কামড় মারিয়া এক কাণ্ড বাধাইয়া তুলিয়াছিল, সে এক কাণ্ড, সকলে হাসিয়া সারা; প্রবালের মত রঙের এমন একটি নরম সরস সামগ্রী যে আশ্বাসনে এমন মারাত্মক হইতে পারে সে কথা বেচারী ভাবিতেও পারে নাই। তাহার ফলে—কিছুক্ষণের মধ্যেই মেয়েটির ঠোঁট জিত ফুলিয়া সকলকে সন্ত্রস্ত করিয়া তুলিয়াছিল। ব্যাপারটা অর্থাৎ ওল চুরির সত্য ও তথ্যটা প্রকাশিত হইতেই পড়িয়াছিল হাসির পালা। মেয়েটাকে ডেকে চুটিতে দিয়া স্বর্ণ হাসিতে হাসিতে অপিসে অরুণাকে সংবাদটা দিতে গিয়াছিল। অরুণা কিন্তু হাসে নাই। কঠিন দৃষ্টিতে অন্তরিক্তে চাহিয়া গভীর কণ্ঠে বলিয়াছিল—পণ্ডিতমশাইকে মুখে বলে সাবধান করা গেল না। ঠিক আমি written warning দিতে চাই স্বর্ণ। কোনদিন থলির ভিতর তামাক নিয়ে আসবেন। কোনদিন মেয়েদের বলবেন—বাড়ী থেকে শাক আনতে—কোনদিন কিছু; এ আমি সহ্য করব না।

স্বর্ণ বলিয়াছিল—না—না—না। বুড়োর ওপর রাগ করবেন না। ভারী ভাল লোক।

—হয়তো ভাল লোক। কিন্তু কি ব্যাপারটা হল বলতো?

—কি হল? হাসির ব্যাপার। ‘ওল খেয়ে না ধরবে গলা’—মেয়েরা পড়েছিল—চোখে দেখলে।

অরুণা চুপ করিয়া ভাবিতে স্তব্ধ করিয়াছিল।

স্বর্ণ বলিয়াছিল—আপনি একটু হানুন অরুণাদি।

অরুণা স্বর্ণের মুখের দিকে চাহিয়াছিল স্থিরদৃষ্টিতে। বিচিত্র স্থির দৃষ্টি, মনে হয় যেন অর্থহীন, অথবা এত গভীরে সে অর্থ নিহিত যে—সে অর্থ অন্তের বোধের অগম্য।

কথাগুলো আজ মনে পড়িয়া গেল স্বর্ণের। অরুণা মিথ্যা কথা বলিতেছে না। সে কখনও হাসে নাই।



গভীর রাতে সে দেওয়ালের এ পাশে থাকিয়া কান্নার শব্দ শুনিয়াছে, সকালে উঠিয়া অরুণার চোখের কোলে কালী দেখিয়াছে—ক্ষীতি দেখিয়াছে ; মুখ ধুইলেও ও ছইটা চিহ্ন ধুইয়া যাইত না ।

অরুণা বলিল—যেদিন দাঁছ এলেন—সেদিন কঠিন আক্রোশে—তঁার অপমান করতে গেলাম । সংকল্প ক’রে রেখেছিলাম আগে থেকেই । তোমায় বা দেবুবাবুকেও বলিনি । যখন তাঁর সঙ্গে এখানে প্রথম এসেছিলাম বজাপীড়িতদের সেবা করতে—এখানকার অবস্থা দেখতে—তখন দাঁছ যে মর্শ্বাস্তিক দুঃখ পেয়েছিলেন—তাঁর নাতির গলায় পৈতে না দেখে, আমার হাত ধরে সন্মুখেই সপ্রেমে টানতে দেখে—তারই ফলে তিনি তাঁকে পরিত্যাগ করে সম্পর্ক ছিঁড়ে ফেলে চলে গেলেন কালী ! আমার মনে হয়েছিল—এত বড় অপমান আমাকে আর কেউ করে নি । উনিও কম বেদনা কম দুঃখ পান নি—সেও আমি যোল আনা টেনে নিয়েছিলাম । একবারও বিবেচনা করি নি—ঔর্যাও ছজনে—একজন পিতামহ অল্পজন পোড় । থাকগে । মাহুকের অহংকারটা তো আর কিছু নয়—নিজের অহংকেই সর্ব্ব্ব ক’রে দেখা । তাই দেখেছিলাম আর কি ।

একটু চুপ করিয়া বলিল—গৌর, তুই ভাই দুটো মিষ্টি কিনে আনবি । আর কিছু ফল । ফল মানে কলা—আর ঠাণ্ডা যদি কিছু পাস, শাঁখআলু—যাকে তোরা সববতি বলিস—পাবিনে ?

গৌর চলিয়া গেলে অরুণা আবার বলিল—প্রাটফর্মে আমার সঙ্গে সম্পর্কের কথা আর কেমন ক’রে সে সম্পর্ক হয়েছিল—মানে মুসলমান হয়ে বিয়ে করেছিলাম আমরা—কথাটা যখন বলতে গেলাম স্বর্ণ, তখন হঠাৎ আমার মনে হ’ল কি জান ? মনে হল—তিনি যেন দাঁড়িয়ে রয়েছেন তাঁর দাঁছর পাশে, চোখে তাঁর আঙনের মত দৃষ্টি । আমার ভ্রম হয়েছিল ভাই—দাঁছর পাশে দাঁড়িয়েছিলেন—তিনি—না, দাঁড়িয়েছিল অজয় ! স্বর্ণ প্রথম যখন ম্যাট্রিক পাশ করে কলকাতায় পড়তে গিয়েছিলেন তিনি, ক্লাসে—পাশাপাশি বসতেন আমার দানার সঙ্গে । ছজনের বন্ধুত্ব হল—দাদা নিয়ে গিয়েছিলেন তাঁকে আমাদের বাড়ী । তখন আমি ছোট—খুব ছোট, সাত আট বছর । তবু

তাঁর সে চেহারা আমার মনে আছে । অজয়কে দেখলাম—অবিকল সেই তিনি । আমার সব গোলমাল হয়ে গেল । মনের সত্য দেহের ক্ষুধাকে উপেক্ষা করে—নিজেকে জানিয়ে দিলে । বলে দিলে—মা যদি হতে পার—ওই অজয়ের, তবে তোমার মনের সত্য সার্থক হবে—ওতেই মিটে যাবে দেহের ক্ষুধা, শোণিত হবে অমৃত—

স্বর্ণ বাধা দিল এইবার—থাক অরুণাদি । আমায় এত সব কথা বলে লাভ কি বলুন ।

—লাভ আর কি ? এতদিন মনের কথা মনে চেপে রেখে তৃপ্তি পাই নি—শান্তি পাই নি, বলবার মত প্রবৃত্তিও ছিল না—হয়তো সাহসও ছিল না স্বর্ণ । কিন্তু আজ—

—আজ আপনার সাহস হয়েছে, প্রবৃত্তি হয়েছে, বলে আপনি তৃপ্তি পাচ্ছেন—শান্তিও পাবেন । আরও অনেক কিছু পাবেন অরুণা-দি । কিন্তু তবুও—বলব—ছি—ছি—ছি ! আপনি হেরে গেছেন । শুধু হেরে গেছেনই নয় অরুণা-দি—আপনি—কি বলছেন তা পর্য্যন্ত আপনি বুঝতে পারছেন না । অরুণা-দি আপনি বললেন—অজয়ের মা হ’লে আপনার মনের সত্য সার্থক হবে—তার সঙ্গে সঙ্গে আপনার দেহের ক্ষুধা মিটেবে, শোণিত হবে অমৃত, আরও হয়তো অনেক কিছু হবে—সে বলবার আগেই আমি বাধা দিয়েছি । অরুণা-দি সন্তান নিজে প্রসব না করলে—শোণিত অমৃত হয় না ; হলেও কিছুদিন পরেই আবার সে অমৃত—সেই শোণিতেই পরিণত হয় । আবার ক্ষুধা জাগে । আপনার মনের সত্য আপনার মন-গড়া ; মন-গড়া সত্যকে সার্থক করতে আপনি জীবন-সত্যকে মিথ্যে করে দিয়েছেন । বলিয়াই সে আর দাঁড়াইল না, চলিয়া গেল ।

অরুণা ডাকিল—স্বর্ণ । স্বর্ণ ! তাহার অধরে ক্লান্ত হাসি ফুটিয়া উঠিল ।

বাহির হইতে—স্বর্ণের কণ্ঠস্বর শোনা গেল—কে ? কে এখানে দাঁড়িয়ে ? কে ? নেনো ?

নেলোর মুহূর্ত্তর শোনা গেল—হ্যাঁ ।

—কি ? কি দরকার ?—অ—পুতুল ! পুতুল দিতে এসেছিস ?

—না । ও একজনার বরাতি জিনিষ । বড়দিদি-

মণিকে একটা কথা বলতে এসেছি। শ্রান মশাই বলে দিলেন।

—কে ?

—শ্রান মশাই। দেবকী শ্রান! কাল সকালে—  
নদীর ঘাটে ঠাকুর মশাই চানে আসবেন—দিদিমণিকে  
বলে দিলেন—পারেন যদি তো ঠাকুর মশায়ের সঙ্গে যেন  
দেখা করেন।

স্বর্ণ হাসিল। হাসির শব্দ অরুণা স্পষ্ট শুনিল।  
ইহার পর দরজা বন্ধ করার শব্দ হইল। স্বর্ণ নিজের  
বাড়ীতে ঢুকিয়া দরজা বন্ধ করিল। নেলো ঘরে ঢুকিয়া  
দাঁড়াইল। অরুণা বলিল—আমি সব শুনেছি নলিন।

নলিন—নীরবে পুতুলটি নামাইয়া দিয়া—সর্বদা একটা  
অস্বস্তিকর ভঙ্গি ফুটাইয়া বাহির হইয়া গেল। যাইতে  
যাইতেও দাঁড়াইল। সে বোধহয় আরও কিছু বলিবে।

অরুণা বলিল—আর কিছু বলছ ?

নলিন বলিল—আপনার—

—কি বল ?

—আপনি স্বর্ণদিদির কথা শুনবেন না। ও এত  
রেগেছে কেন জানেন ? ও নিজে—

বাধা দিয়া অরুণা বলিল—নলিন ! ছি !

নলিন যাহা বলিতে চায় তাহা সে বুঝিয়াছে। স্বর্ণ  
নিজে বিধবা হইয়া বিবাহ করিয়াছে বলিয়া এমন ধারা ক্রুদ্ধ  
হইয়া উঠিয়াছে !

—তুমি যাও নলিন !

নলিন চলিয়া গেল।

অরুণা আকাশের দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিল।

হয়তো খানিকটা সত্য নলিনের কথার মধ্যে আছে।

কিন্তু অরুণা তো জানে—যে সত্যকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া  
স্বর্ণ এমন জোর করিয়া কথাগুলি বলিয়া গেল—সে  
সত্যকে বিশ্বাসের ভিত্তি কত দৃঢ় ! দেবু বলিলেও স্বর্ণ  
শুনিবে না।

(ক্রমশঃ)

## শরতের অভিশাপ

শ্রীমুরেশ বিশ্বাস এম-এ, ব্যারিস্টার-এট্-ল

এখনও পাষণ গলে শরতের সোনালী আভাষ,  
পূর্ণতার প্রতীচ্ছবি আনন্দের মাধুর্য্য শোভায়  
পরম প্রশান্তি আনে প্রাণে। মনে হয় মিথ্যা সব  
বিধা হৃদয় কোলাহল জগতের নিত্য কলরব।  
এই লঘু মেঘধণ্ড স্বচ্ছ ছুটি ক্ষুদ্র ডানা মেলি'  
স্বচ্ছন্দে চলিল উড়ি, সেথা লক্ষ্মী পরি' স্বর্ণচেলি  
বদান্ত প্রসন্ন নিত্য, শাস্ত সে ওদাঘের মাঝে—  
সর্ব গ্লানি ডুবে যায়, পরিপূর্ণ মাধুর্য্য বিরাজে।  
সেই পরিত্যক্ত দেশ, জলভরা সুগভীর মেহ  
শ্বেত-রক্ত-শতদলে আমোদিত বিলপ্রান্ত গেহ,  
স্বতি পথে ওঠে জাগি। অগ্নি মোর মুগ্ধ মাতৃভূমি,  
অচ্ছেদ্য এ যোগসূত্র সে কথা কি ভুলিয়াছ তুমি ?  
ধমনীতে ধমনীতে মোর প্রতি শিরায় শিরায়  
প্রচ্ছন্ন প্রগাঢ় উষ্ণ তব রক্তধারা বয়ে যায়।  
আমি যত দূরে দূরে রহি, অদৃশ বন্ধনডোর—  
দূরান্ত প্রবাসী পাশ্বে তত কাছে টানিতেছে তোর।  
সেই ফল আকর্ষণ শরতের উদার আকাশে,  
মেঘ-শুভ্র লঘু মেঘে অনন্তের সীমান্তে আভাসে।  
মুক্ত করি' সর্ব তুচ্ছ অব্যক্ত অন্তর ব্যাখ্যানি  
অসহ ক্লিষ্ট-গর্ভ-নিহিত দলিত মর্শ্ববাণী—

দাবদাহে সর্বদেহে অন্তরের গূঢ়তম দেশ  
আলায়ে উন্মত্ত করি দহিতেছে করি ভস্মশেষ।  
জল বিল নদীখাল অকস্মাৎ সঘন বর্ষণ,  
ফুল পাখী লতাপাতা নিত্য কেন করে আকর্ষণ ?  
যুথভ্রষ্ট আশাহত আছে সেথা কটি নরনারী,  
তবু তার এত মায়া, তবু তারে ভুলিতে না পারি !  
বর্ষে শুধু একবার আমি তব নেহাঙ্কলতলে  
হৃদয় বিশ্রাম লভি, আমারে কি সেই নেহবলে,  
না ফুরাতে প্রাণের কদম্ব কানন শিহরণ  
না ভরিতে ফুলে ফুলে শ্রামায়িত শৈফালিকামন  
পাঠাইলে লিপিকথানি কাশশুভ্র লঘু মেঘভারে,  
তোমার অবোধ শিশু সে লিপিকা পড়ি' বারে বারে  
প্রাণ-বর্ষণ সাথে মিশাইছে আখিবারি তার  
রাজেন্দ্রাণী ভিখারিণী তবু তুই জননী আমার !  
হুলে হুলে ওঠে বুক, ফুলে ফুলে কাঁদি অভিমান ;  
আমারে স্বপনে হেরি দশমী-রজনী অবসানে  
আবার নূতন করি আশায় বাঁধিয়া বুকখানি  
হেমন্তে, দূরন্ত গীতে, কালশুনে ও-বন্ধে কর হানি'  
পাগলিনী যুগে যুগে আগিও শরৎ পানে চেয়ে  
তোমার হারানো ছেলে হয়ত' কিরিবে তরী বেয়ে।



বানরের অনিষ্টকর ক্ষমতা অশেষ। উহাদের উৎপাতে প্রতি বৎসর প্রভূত পরিমাণ খাদ্যশস্য বিনষ্ট হয়। হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে যে, উত্তর প্রদেশ ও পাঞ্জাবে বানরের দ্বারা প্রতি বৎসর যথাক্রমে প্রায় ২৫ কোটি টাকা ও ১০ কোটি টাকার খাদ্যশস্য বিনষ্ট হইয়াছে।

ভারতে প্রায় ৫ কোটি বানর আছে। অর্ধেকসংখ্যক বানর বনে বাস করে খরিয়া লইলেও বাকী আড়াই কোটি বানর প্রতি বৎসর সহর ও নগরীর অধিবাসীদের কোটি কোটি টাকার খাদ্য খাইয়া ফেলে অথবা বিনষ্ট করে। প্রতিটি বানর দৈনিক গড়ে ২ আউন্স পরিমাণ খাদ্যশস্য গ্রহণ করে। এই হিসাবে তাহারা প্রতি বৎসর মোট ৪ লক্ষ টন খাদ্যশস্য অর্থাৎ বর্ষমান বরাহ ব্যবস্থা অনুযায়ী এলাহাবাদ, কানপুর, ও দিল্লীর অধিবাসীদের সর্ববৎসরের খোরাকের সম-পরিমাণ খাদ্যশস্যের অপচয় করে। এদিক হইতে দেখিতে গেলে বানরদের সম্পর্কে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বনকালে কোনও নীতিবোধ, ধর্ম-বিশ্বাস ও জীবে দয়ার প্রশ্ন খাটে না।

—গণরাজ

গত ২১শে ও ২২শে জুলাই ইতালীর মিলান সহরে ইতালীর ষিওসফিক্যাল সোসাইটির বিংশ বার্ষিক অধিবেশনে পঁচিশ বৎসর বয়স্ক তরুণ ভারতীয় দার্শনিক শ্রীঅশোককুমার দত্ত যে অভিজ্ঞাষণ প্রদান করেন তাহাতে সমস্ত ইউরোপের দার্শনিক মহলে সাদা পড়িয়া গিয়াছে। ইতালীর দৈনিকপত্রিকাসমূহ শ্রীযুক্ত দত্তকে ভূয়সী প্রশংসা করিয়া লিখিয়াছেন যে, স্বামী বিবেকানন্দের পর আবার এই তরুণ দার্শনিকের নিকট হইতে বিশ্ববাসী শাশ্বত ভারতের বাণী শুনিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছে।

—বিষবার্ভা

নদীরাবাসীকে আজ অরণ্য রাখিতে হইবে যে পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারত-রাষ্ট্রকে শক্তিশালী করিয়া তুলিতে হইলে নদীরা সীমান্তের সর্বপ্রকার দেশজোহিতামূলক কার্যকলাপ পৰ্য্যুদত্ত করা চাই। নদীরা সীমান্তের বিপদ সীমান্তের অপর পাশ হইতে আসিতে পারে ইহা বাঁহারা মনে করেন তাহারা ভ্রান্ত। নদীরা সীমান্তের বিপদ নদীরা জেলার সীমান্তেই বর্ষমান, উহা হইতেছে চোরাকারবার, পরধাপহরণ, আইন ও শৃঙ্খলা লঙ্ঘন এবং ভারত রাষ্ট্রের সহিত প্রতারণা। ভারত রাষ্ট্রের বাঁহারা প্রকৃত হিতাকাঙ্ক্ষী ও নাগরিক তাঁহাদিগকে আজ অবহার প্রতিকারের জন্ত ত্রুতী হইতে হইবে। আজ নিঃসহায়ভাবে বসিয়া বসিয়া ঘটনার তরঙ্গমালা লক্ষ্য করিবার সময় নাই। সীমান্তবাসীর কঠোর চরিত্রকে আয়ত্ত করিয়া আজ হুবিধাবাদীদের চক্রান্ত ও সর্বপ্রকার কলুষ হইতে সীমান্তকে বিমুক্ত করার সময় আসিয়াছে। আজ শাপমুক্তির যে আব্বাহন আসিয়াছে

তাহা সমুদ্রতীরের আব্বাহন, গণতন্ত্রের আব্বাহন, স্বাধীন রাষ্ট্রের আব্বাহন, ইহা যেন আমরা বিস্মৃত না হই।

—সীমান্ত

বিষবিভাগ্য প্রত্যেক বিষয়ের প্রশ্নপত্র কঠিন করিতেছেন। কর্তৃপক্ষের বক্তব্য, ছেলেরা নাকি বড়ই অমনোযোগী হইতেছে। অমনোযোগী হওয়া আশ্চর্য কিছু নহে, এতো সিনেমা, এতো তারকার উদয় হইলে ছেলে কেন, ছেলের বাপ পিতামহ চৌদ্দপুরুষ পর্যন্ত অমনোযোগী হইয়া পড়িবে। বাই হউক, ছেলেরদের নৃত্তিক ক্ষীণ হওয়া আশ্চর্য নহে। দুখ ঘির কথা দূরে থাকুক, দুইবেলা পেট ভরিয়া মাছ ভাতঃ যে দেশের ছেলেরা খাইতে পায় না, তাহাদের এখনও যে কিছু বুদ্ধি-বুদ্ধি আছে ইহাই আশ্চর্য। ছাত্রদের উপর দোষারোপ না করিয়া তাহাদের পুষ্টিকর আহার, স্বাস্থ্যপ্রদ পরিবেশ, উন্নততর চিন্তার ব্যবস্থা করিলেই আবার আগুতোষ হরিনাথের আবির্ভাব হইবে।

—আর্ধ্য

সম্প্রতি চলচ্চিত্র-প্রদর্শকদের নিয়ে একটা বৈঠকী-সম্মেলন হ'য়ে গেলো। সেই সম্মেলনের উদ্বোধন করতে গিয়ে পশ্চিম বাংলার মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় বলেছেন, চলচ্চিত্র শিক্ষা-বিস্তারের অস্তুতম মাধ্যম। আজকের দিনে জনমত-শ্রষ্টা, সংবাদপত্রের চাইতেও চলচ্চিত্রের প্রভাব জনসাধারণের ওপর বেশী। সমাজ-জীবনে চলচ্চিত্রের প্রভাব অসামান্য। সমাজের পুনর্গঠনে এর অবশ্যকক রয়েছে। তিনি আরো বলেছেন, ব্যক্তিগতভাবে সেন্সরের পক্ষপাতি আমি নই।

কিন্তু তিনি একটা কথা বলেন নি, কি ক'রে বাংলা-ছবিকে সর্বত্র চালু করা যায়। দেশ-বিস্তারের ফলে আজ অনেক জায়গাতেই বাংলা ছবির প্রদর্শন নিষিদ্ধ হয়েছে। বাংলা ছবি তৈরী করার মূলে যেসব বাধা, সেইসব বাধা অতিক্রম ক'রে ছবির মালিক বাংলা ছবি তুলতে চাইবেন না। ফলে বাংলা ছবির এই ক্রম-বিলুপ্তি অনিবার্হ।

আমরা আশা করেছিলাম, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় সেইসব সমস্যা সমাধানের উপায় ব'লে দিয়ে, বাংলা ছবির ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে নির্দেশ দেনেন!

—দৈনিক

অবহার গতিকে আজ কৃষিপ্রশিক্ষক প্রকারান্তরে অভুক্ত থাকিয়া দিন কাটাইতেছে। শ্রম করিয়া তাহার যে শক্তি ক্ষয় হয় তাহা পূরণের যোগ্য পুষ্টিটুকুও সে পায় কি না সন্দেহ। দেশের সর্বত্র স্থানে তাহাদের বর্তমান অবস্থা দাসত্বের সমান। জমিহীন কৃষিমজুর তাহার জমিদারের কাছে হয়ত পকাশ বা একশত টাকা কর্ত্ত লইয়াছে। ফলে ঐ টাকা শোধ না দেওয়া পর্যন্ত সে জমিদারের কাছে বাঁধা পড়িয়া আছে অর্থাৎ এই ঋণের দ্বারা তাহাকে দাসত্বের শৃঙ্খল

চিরজীবন বহিতে হইতে পারে। হয়ত দিনে একবারমাত্র তাহাকে ফেনভাত দেওয়া হইবে, আর দীপালির ( ৮পূজার ) সময় তাহাকে কিছু দেওয়া হইবে। তাহার স্ত্রী ও ছেলেমেয়েদের তাহার মনিব বা অপর মনিবের কাছে অনুরূপ ভাবে খাটয়া ভাত কাপড় যোগাড় করিতে হইবে। যে খাজ তাহারা পায় তাহাতে পুষ্টি না থাকারই মত। তাই রোগে যুঝিবার ক্ষমতা তাহাদের শরীরে থাকে না, আর তাহাদের ছেলেমেয়েরা কঙ্কালসার হইয়া বড় হয়। এমন কুশিক্ষিত খাটয়া খুটিয়া সমগ্র জাতির জন্ত যথেষ্ট খাজ উৎপন্ন করিতে পারিবে কি ? এই সকল মজুরের অবস্থা উন্নয়নের চেষ্টা কেহ করিতে গেলে গবর্ণমেন্ট আতঙ্কগ্রস্ত হইয়া পড়েন। তাহাদের ভয়, মজুরেরা তাহাদের মৌলিক প্রয়োজন সম্পর্কে সচেতন হইলে সরকারের খাজ সংগ্রহের প্ল্যান ব্যাহত হইবে। সরকারের খাজসংগ্রহের প্ল্যানটি তবে কি উৎপাদককে বঞ্চিত করিয়া স্বচ্ছল ব্যক্তিদের খাওয়াইবার ব্যবস্থা মাত্র ? এইরূপ কর্তব্য অদূরদর্শিতা-দোষদুষ্ট। ইহাতে শেবাধি উদ্দেশ্য সিদ্ধ করা যাইবে না।

—হরিজন পত্রিকা

\* \* \*

গত ১৯৪৭-৪৮, ১৯৪৮-৪৯ ও ১৯৪৯-৫০ সনে ভারতে যথাক্রমে মোট ৪৯ হাজার ৯৭৩ একর, ৬৪ হাজার ৫৪০ একর ও ৫ লক্ষ ৭৪ হাজার ১৯ একর পতিত জমিতে চাষাবাদ করা হইয়াছে। উহা ছাড়া ট্রাস্টের প্রভুতি যন্ত্রের সাহায্যে যথাক্রমে আরও ৩৫ হাজার ৩৯৫ একর, ১ লক্ষ ৩২ হাজার ৬৬৫ একর এবং ৩ লক্ষ ৪৪ হাজার ৮৩০ একর পতিত জমি চাষ করা হইয়াছে। কেন্দ্রীয় ট্রাস্টের সংস্থা কর্তৃক যে ৩৪ হাজার একর জমিতে চাষাবাদ করা হইয়াছে তাহা উক্ত হিসাবে ধরা হয় নাই। এই সকল জমিতে আলোচ্য বৎসরে প্রায় ১২ হাজার টন খাদ্যশস্য উৎপন্ন হইয়াছে।

পূর্ববর্তী বৎসরের তুলনায় ১৯৪৯-৫০ সনে ভারতের সকল রাজ্যেই অধিক পরিমাণ পতিত জমিতে চাষাবাদ হইয়াছে। উহাদের মধ্যে আবার উত্তর প্রদেশ, বোম্বাই, বিহার, হায়দরাবাদ, ত্রিবাঙ্গুর ও কোচিনেই সর্বাধিক পরিমাণ পতিত জমিতে চাষাবাদের সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। তাহা ছাড়া, আইনের সাহায্যে আরও ৩ লক্ষ ৭২ হাজার একর পতিত জমিতে কৃষিকার্য্য হ্রাস হইয়াছে।

—পদাতিক

\* \* \*

বোম্বাই গবর্ণমেন্ট মাত্র ৬ মাস পূর্বে উক্ত প্রদেশের রাজপঞ্চমুহে পরিচালিত বাস সার্ভিসের পরিচালনভার স্বহস্তে গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইতিমধ্যেই এই কাজে উহার ৪ কোটি টাকা মূলধন বিনিয়োগ করিয়াছেন। উহার ফলে বর্তমানে গবর্ণমেন্টের পরিচালিত বাসের সংখ্যা দাঁড়াইয়াছে ১১১ এবং বর্তমানে এইসব বাসে প্রত্যহ ১ লক্ষ ৫৬ হাজার করিয়া যাত্রী চলাচল করিতেছে। বর্তমানে প্রদেশের মোটমাত্র ১২৮৪৭ মাইল রাস্তায় সরকারী বাসসমূহ চলাচল করিতেছে। এই কাজে তদারক করিবার জন্ত বোম্বাই গবর্ণমেন্ট বোম্বাই স্টেট রোড ট্রান্সপোর্ট কর্পোরেশন নামক যে প্রতিষ্ঠান গঠন করিয়াছেন তাহার শীর্ষই রাস্তাঘাটের সংস্কারের

জন্ত এক কোটি টাকা ব্যয় করিতে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। পশ্চিমবঙ্গের গবর্ণমেন্টও এই প্রদেশে বাস পরিচালনার কাজে হাত দিয়াছেন এবং উহার বোম্বাইয়ের অনেক পূর্বে এই কাজে অবতীর্ণ হইয়াছেন। কিন্তু মাত্র ৬ মাসে বোম্বাইয়ে এই কাজ যে ভাবে অগ্রসর হইয়াছে সেই তুলনায় পশ্চিমবঙ্গের সাফল্য নগণ্য।

—আর্থিক জগৎ

\* \* \*

আমরা ২৪ পরগণার শিক্ষকগণের একটি প্রধান অসুবিধার কথা শিক্ষাবিভাগীয় কর্তৃপক্ষকে জানাইয়া ইহার প্রতিকারের জন্ত অনুরোধ জানাইতেছি। ২৪ পরগণার জেলা পরিদর্শক মহাশয়ের অফিস আলীপুরে বোর্ডের অফিস হইতে বহুদূরে অবস্থিত—তাহাকে অধিকাংশ সময়ে ঐ অফিসেই থাকিতে হয়। ফলে, প্রাথমিক শিক্ষকগণ নানাপ্রকার অভাব অভিযোগের কথা জানাইতে আসিয়া তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে না পারিয়া ফিরিয়া যান। দরিদ্র শিক্ষকগণ বহুদূর হইতে প্রচুর অর্থ ব্যয় করিয়া এবং অনেক আশা লইয়া তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়া দেখা না পাইলে বড়ই হতাশ হন। পরিদর্শক মহাশয়ের অফিসটি আলীপুরেই কোন স্থানে অবস্থিত হইলে শিক্ষকমহাশয়গণেরও এ অসুবিধা হয় না, পরিদর্শক মহাশয়ও অনর্থক দুই অফিসে ছুটাছুটি করার হাত হইতে অব্যাহতি লাভ করিয়া কাজে অধিকতর মনোনিবেশ করিতে পারেন। এগারসন হাউসে স্থান সংকুলান না হইলে আলীপুরের অন্তর বাড়ীভাড়া লইয়া অফিসটি অবিলম্বে স্থানান্তরিত করা একান্ত প্রয়োজন।

—শিক্ষক

\* \* \*

বর্তমান ভারতের রাষ্ট্রকর্তৃগণ বৃক্ষরোপণের জন্ত একটা অনুষ্ঠান করিলেন। ভারতের সভ্যতা—তপোবন-নিষ্ঠ। বেদ ও উপনিষদের নাম—আরণ্যক। ব্রহ্মের কথা বলিতে গিয়া প্রাচীন বৈদিক ঋষিগণ বলিয়াছেন—এষ অশ্ব সনাতনঃ। আরও বলিয়াছেন—ইনি বৃক্ষের মত শুদ্ধ হইয়া আকাশে অবস্থান করিতেছেন—বৃক্ষ ইব দিবি তিষ্ঠত্যেক। পঞ্চবটী রচনা করা এই দেশের ধর্ম। অশ্ব প্রভৃতি বৃক্ষ প্রতিষ্ঠা করা—এদেশের পুণ্য কর্ম। তুলসী বৃক্ষ যে স্থানে থাকেনা, তাহা শ্মশান তুল্য চৈত্য-বৃক্ষ প্রদক্ষিণ করা নিত্য কর্তব্য, অতএব উঠানে আড়িনায় বিধ, নারিকেল, আম্র প্রভৃতি বৃক্ষ রোপণ করা প্রতি গৃহস্থের কর্তব্য ছিল। জল শীতল হইবে বলিয়া পুষ্করিণীর পাড়ে তালগাছ রোপিত হইত। ইংরেজ আসিল। তাহাদের সভ্যতাও আসিল। তুলসী উপড়াইয়া দিলাম, বিধ বৃক্ষ কাটিয়া ফেলিলাম, অশ্বকে পুড়াইয়া, এমন কি মলিকা হুঁই, টগর শেকলি চম্পক নির্মূল করিয়া যুরোপের লিলি, আর্কিড ক্রিসেনথিমাম্, সিজিন্দ্রাওয়ার দিয়া উঠান, অলিন্দ, বাগান সাজাইলাম। আজ আবার বনস্পতির প্রতি আকর্ষণ আসিয়াছে। কিন্তু গাছ হইতে অরণ্য হয়। অরণ্যে থাকে হিংস্র শ্বাপদ। বন রচনার সহিত আরণ্যক জীবনকে অজীকার না করিলে সমাজ সংসার অরণ্য সৃষ্ণ হইয়া

উঠিবে। তাই বলিতেছি :—বৃক্ষ রোপণের সহিত বেদ মন্ত্র পাঠ কর—যঃ বনস্পতিষু তন্মৈ দেবায় নমো নমঃ। —‘ঐ’

\* \* \*

পূর্ববঙ্গে হিন্দুজাতি আত্মসংস্কৃতি-রক্ষায় অসমর্থ, ইহার কারণ—হিন্দু সংস্কৃতি হিন্দু-জাতির প্রাণের সহিত আর সংযুক্ত নহে। হিন্দু-সংস্কৃতি-রক্ষায় প্রাণ অমুগ্ধত বলিয়াই আমরা আতঙ্কিত হইয়া পূর্ববঙ্গ হইতে অপস্থত হইতেছি। ইহাই আমাদের অবস্থা। যে কারণে জগতের অগ্ৰাণ্ড ইসলাম রাজ্য হইতে হিন্দুজাতির চিহ্ন বিলুপ্ত হইয়াছে, সেই একই কারণে ভারতের পশ্চিম পাকিস্তান হইতে হিন্দু নিশ্চিহ্ন হইয়াছে। পূর্ব পাকিস্তানেও তাহার অশ্রুতা হইবে না। জাতি-বিষেব বশতঃ এই কথা আমরা বলিতেছি না, কেন না পূর্বপাকিস্তানে প্রবর্তক সজ্জের দুই প্রধান কেন্দ্র সংস্থাপিত। প্রবর্তক সজ্জ কোথাও প্রাণভয়ে কেন্দ্র ত্যাগ করে নাই। যখন ভারতের রাষ্ট্রপুরুষেরা ইসলাম সংস্কৃতির স্থান পশ্চিম ও পূর্বপাকিস্তান নির্ণয় করিয়া দিয়াছেন, তখন ইসলাম ধর্মই এই দুই স্থানে প্রবল মুষ্টি পরিগ্রহ করিবে, ইহা অতিশয় সত্যসঙ্গত কথা। হিন্দু জাতি আত্মসংস্কৃতি লইয়া এই স্থানে থাকিতে চাহিলে, ইসলাম-রাজ্যে প্রজার অধিকারটুকু লইয়াই তাহাকে আত্মসংস্কৃতি রক্ষা করিতে হইবে, ইহাতে অসমর্থ হইলে স্থানত্যাগ অবশ্যজারী। বর্তমান অবস্থায় তাহাই হইতেছে। নিরাপদ জীবনযাত্রার জন্তই পাকিস্তান হিন্দুশূন্য হইতে বাধ্য। তারপর হিন্দু-সংস্কৃতি-রক্ষার ক্ষেত্র এই ভারতবর্ষ। কিন্তু ভারত-রাষ্ট্র ধর্ম-নিরপেক্ষ। শুধু হিন্দু-সংস্কৃতি রক্ষার সুযোগই যে এখানে পাওয়া যাইবে, তাহাই নহে। পরন্তু ইসলাম-ধর্মীদের শিক্ষা সভ্যতা ও কৃষ্টিরক্ষার সুযোগ ধর্ম-নিরপেক্ষ ভারতরাষ্ট্রে থাকিবে। হিন্দু-ভারত ধর্মহীন যদি হয়, ভারত ইসলামের ক্ষেত্র হইবে, ইহা কিছু বিচিত্র কথা নহে। পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তান হইতে মুসলমানদের দলে দলে ভারতে প্রত্যাগমন এই সঙ্কেতই প্রদান করে। পাকিস্তান ইসলামের। ভারত সর্বধর্মার। অতএব যে ধর্ম প্রবল মুষ্টি পরিগ্রহ করিবে, সেই ধর্মের আধিপত্য এই ক্ষেত্রে অসম্ভব হইবে না।

—নব সংঘ

\* \* \*

“বনস্পতিতে হাজারে একভাগ রেড-অকসাইড মিশ্রিত করিলে উহা আর যুতে ভেজাল দেওয়া চলিবে না। এই বিষয়ে বিবেচনা করিয়া দেখিবেন। বনস্পতিতে ভেজালের কথা আমিও শুনিয়াছি। সস্তা গ্যারাকিন তৈল উহাতে ভেজাল দেওয়া সম্ভব। নারিকেল তৈলে এবং অপর তৈলের সহিত ইহা ভেজাল দেওয়া হয়। উচ্চ বা নিম্নতাপে গলিবে এমন বনস্পতি ইচ্ছামত তৈয়ারী করা যায়। উচ্চ তাপে গলে এইরূপ বনস্পতি তৈয়ারী করিয়া উহা গলাইয়া উহাতে হোয়াইট অয়েল ভেজাল দেওয়া যায়। ব্যবসায়ীদের পক্ষে ইহা সহজসাধ্য। বনস্পতিতে রাসায়নিক গন্ধ দিয়া উহাকে সুগন্ধ করার আপনি আপত্তি করিয়া ঠিক করিয়াছেন। উহার ফলে যুত উৎপাদন বিনষ্ট হইবে। “বনস্পতির পক্ষে জোর প্রচার চলিতেছে। ‘যুতের চেয়ে বনস্পতি

সস্তা, তাই উহার রদ করা ঠিক নয়’—এইরূপ মন্তব্যলিখিত কাগজে এক্সপ্টরা লোকের স্বাক্ষর সংগ্রহ করিতেছে। একটি বিজ্ঞপ্তিতে বলা হইয়াছে, বনস্পতি রদ হইলে ঘিয়ের দাম তিনগুণ হইয়া যাইবে। এইরূপ মিথ্যা বিজ্ঞাপন প্রচার খাজ-মন্ত্রী দপ্তর কেমন করিয়া সহ্য করেন বুঝি না। —হরিজন পত্রিকা

\* \* \*

কংগ্রেসের হাতে দেশের শাসন ভার আসিবার পর অনেককেই অভিযোগ করিয়া থাকেন যে পুলিশের কর্তৃ-ক্ষমতা ও মর্যাদা অনেক খারাপ হইয়া গিয়াছে। ইহার কারণ লইয়া অনেককেই অনেক প্রকার গবেষণা করিয়াছেন। কিন্তু সম্প্রতি কলিকাতা পুলিশ জর্নাল এই সমস্তার মীমাংসা করিয়া দিয়াছেন। তাহার বলিয়াছেন, কম খাইয়া ও খারাপ খাইয়া পুলিশের স্বাস্থ্য ও মর্যাদা নষ্ট হইয়া গিয়াছে। পুলিশের রেশনের “চাউল ও আটা নিকৃষ্ট শ্রেণীর” না হয় হইতে পারে, কিন্তু “দী” এবং তেল স্বভাবতঃই ভেজাল” হয় কিরূপে? বাঘের ঘরে যদি ঘোঁগের বাসা হয় তাহা হইলে সাধারণের অদৃষ্টের কথা ভাবিয়া আর কি হইবে? —যুগবার্ণা

\* \* \*

জুলাই হইতে ডিসেম্বর পর্যন্ত ভারত সরকার বিদেশে ১০৪ কোটি গজ মোটা ও মাঝারি ধরণের কাপড় রপ্তানী করিতে দিবেন বলিয়া যে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন তাহার মুক্তিযুক্ততা বুঝা যাইতেছে না। ভারতের কলসমূহে গত ১৯৪৮ সালে ৪৬২ কোটি গজ কাপড় উৎপন্ন হইয়াছিল। ১৯৪৯ সালে উহা হ্রাস পাইয়া ৩৯০ কোটি ৪২ লক্ষ গজে পরিণত হয়। চলতি বৎসরের এপ্রিল পর্যন্ত ৪ মাসে কলগুলিতে ১২০ কোটি গজের কিছু বেশী কাপড় উৎপন্ন হইয়াছে। এই হিসাবে কাপড় উৎপন্ন হইলে চলতি বৎসরের শেষ পর্যন্ত দেশে ৩৬০ গজের বেশী কাপড় উৎপন্ন হইবে বলিয়া মনে হয় না। উহার মধ্যে মিহি ও অতি-মিহি ধরণের কাপড়ের পরিমাণ হইবে ১৬০ কোটি গজ এবং উহা সাধারণতঃ সহরসমূহের চাহিদ মিটাইতেই নিয়োজিত হইবে বলিয়া পল্লী অঞ্চলে এই ধরণের কাপড় হইতে কিছুই সরবরাহ হইবে না। বাকী ২০০ কোটি গজ কাপড় মোটা ও মাঝারি ধরণের। উহা হইতে গবর্ণমেন্ট পূর্বেই ১০০ কোটি গজের মত কাপড় বিদেশে রপ্তানী হইতে দিবেন বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন। এক্ষণে পুনরায় উহার আরও ১২৪ কোটি গজ কাপড় রপ্তানীর অনুমতি দিলেন। উহার ফলে ভারতে জনসাধারণের ব্যবহারোপযোগী কাপড়ের যোগান প্রয়োজনের তুলনায় অনেক কম হইয়া দাঁড়াইয়াছে এবং সঙ্গে সঙ্গে কাপড়ের একটা চোরাবাজার নূতনভাবে গড়িয়া উঠিয়াছে। গবর্ণমেন্ট অবশ্য মিলিত কাপড় আটক করিয়া এবং কাপড় বিক্রয়ের বিবিধ বিধিনিষেধবলে এই সমস্তার একটা প্রতিকার করিতে চেষ্টা করিতেছেন। কিন্তু ইতিপূর্বে কাপড় সম্পর্কে গবর্ণমেন্টের অবলম্বিত সমস্ত প্রকার কর্তৃপক্ষা ব্যর্থ বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে। বর্তমানেও যে অধিকতর হুকুম পাওয়া যাইবে তাহার ভরসা কম। এরূপ অবস্থায় গবর্ণমেন্টের পক্ষে নূতন করিয়া বিদেশে মোটা ও মাঝারি

ধরণের কাপড় রপ্তানী করিতে দেওয়া সমীচীন হয় নাই বলিয়াই আমরা মনে করি। —আর্থিক জগৎ

\* \* \*

প্রাকৃতিক দ্রুপোগ, দাঙ্গাহাঙ্গামা, অনাহার, অনশন প্রভৃতি ছাড়াও প্রতি বছর (অথবা) ভারতবর্ষে অস্থিত ভূগিরি মারা যায় প্রায় ৬২ লক্ষ লোক। তার মধ্যে ঋতুর ভূগিরি মরে ৩৬ লক্ষ, যক্ষ্মায় ৫ লক্ষ, পেটের অস্থিত ৩ লক্ষ, বসন্ত রোগে ৭৫ হাজার, কলেরায় ৫০ হাজার, মেরু ২০ হাজার। এ দেশের সর্বাপেক্ষা মারাত্মক ব্যাধি ম্যালেরিয়ার মৃত্যুর হার প্রায় সাড়ে বারো লক্ষ। ভারতের অধিবাসীর প্রায় শতকরা ৯০ জন থাকে গ্রামাঞ্চলে, অথচ সেইখানেই চিকিৎসার দারুণ অব্যবস্থা। শতকরা ১০ জন ডাক্তার মাত্র থাকে গ্রামে। এই ভয়াবহ মৃত্যু-সংখ্যার প্রতি গবর্ণমেন্টের অবহিত হওয়া কর্তব্য। —প্রবর্তক

\* \* \*

গত ৩রা আগষ্ট কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৯৫০ খৃষ্টাব্দের ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার ফল সাধারণ্যে বাহির হইয়াছে। ৩৮৩৩৫ জন

ছাত্র-ছাত্রী এই বৎসর পরীক্ষা দিয়াছিল। তাহাদিগের মধ্যে ১২৯৩৮ জন মাত্র পরীক্ষার উত্তীর্ণ হইয়াছে বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে অর্থাৎ পরীক্ষার্থীদিগের মধ্যে শতকরা মাত্র ৩৪.৩ জন এই পরীক্ষার উত্তীর্ণ হইয়াছে। সার আশুতোষের যুগের কথা ছাড়িয়া দিলেও গত বৎসরও এই পরীক্ষার শতকরা ৫০ জন ছাত্র-ছাত্রী উত্তীর্ণ হইয়াছিল। ৫০ জনের হানে হঠাৎ একেবারে ৩৪ জন হওয়ায় শুধু ছাত্রসমাজ নহে—শিক্ষক, ছাত্র, অভিভাবক, স্কুল ও কলেজ কর্তৃপক্ষ—এমন কি বিভাগসাহী সাধারণ লোকের মধ্যেও একটা বিষম চাকল্য আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। সেই চাকল্যের পরিণতি দেশের শিক্ষা বিস্তারের পরিপন্থী—কি সহায়ক হইবে তাহা এখনই বলা যতই শক্ত হউক না কেন, ইহাতে যে একটা ভীষণ মন-ভাঙ্গা নৈরাশ্রের ভাব এক সম্প্রদায় লোকের (এবং তাহাদিগের সংখ্যাই খুব বেশী) আশা, আকাঙ্ক্ষা, উৎসাহ, উত্তম একেবারে পঙ্গু করিয়া দিয়াছে তাহা একেবারে দ্রব সত্য এবং ইহার প্রতিক্রিয়াও যে অতি অল্পদিনের মধ্যেই সমগ্র দেশ ও সমাজের উপরে পরিব্যাপ্ত হইবে সে বিষয়ও কোন সন্দেহ নাই। —বিষবাক্য

## মুর্শিদাবাদের খাজপরিস্থিতি

শ্রীশোভেন্দ্রমোহন সেন

গত এই আগষ্ট মুর্শিদাবাদ জেলার প্রধান সহর বহরমপুরে প্রায় পাঁচ হাজার বুদ্ধকু নর-নারীর এক ভূখা মিছিলের সমাবেশ জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের কুটার সম্মুখে সমবেত হয় ও জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট থাকের দাবী জানাইতে গিয়া কীভাবে গ্যাস ও লাঠির দ্বারা পুলিশ কর্তৃক নিগৃহীত হয়। বহরমপুরে বুদ্ধকু নর-নারীর প্রতি পুলিশের এই দুর্ব্যবহার সমগ্র পশ্চিমবঙ্গে বিশেষ অসন্তোষ সৃষ্টি করিয়াছে এবং কলিকাতায় ইহার প্রতিবাদে সভা অনুষ্ঠিত হইয়াছে। ইহার সহিত বেশের লোকে অবগত হইয়াছে যে সমগ্র মুর্শিদাবাদ জেলার ভীষণ খাজসঙ্কট দেখা দিয়াছে।

মুর্শিদাবাদ জেলার খাজসঙ্কট কেন দেখা দিয়াছে সেই সম্বন্ধে আলোচনা করিতে হইলে সর্বপ্রথম বলিতে হয় যে, জেলায় খাজশস্ত্র বিষয়ে পশ্চিমবঙ্গ সরকার ভুল তথ্য বা পরিসংখ্যানের উপর নির্ভর করিয়া চলিয়াছেন বলিয়াই এই সঙ্কট দেখা দিয়াছে। রাজ্য সরকার প্রথমেই এই ভুল সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, মুর্শিদাবাদ জেলা খাজশস্ত্র বিষয়ে উৎকৃষ্ট অঞ্চল। পশ্চিম বঙ্গের পরিষদ সদস্য ও মুর্শিদাবাদ জেলা কংগ্রেস কমিটির সভাপতি শ্রীজামাশদ ভট্টাচার্য্য বহরমপুর হইতে প্রকাশিত জেলা কংগ্রেস কমিটির মুখপত্র সাপ্তাহিক ‘গণরাজ’ পত্রিকায় মুর্শিদাবাদের বর্তমান খাজ পরিস্থিতি সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করিয়া যে বিবৃতি গত ১৫ই জুলাই তারিখের পত্রিকায় দিয়াছেন তাহা পাঠ করিলে মুর্শিদাবাদ জেলার বর্তমান খাজ-পরিস্থিতি ও খাজ সঙ্কটের বিষয়ে সকল ঘটনা আনিতে পারা যাইবে। তিনি বলিতেছেন—“বঙ্গ বিভাগের পর হইতেই খাজ বিভাগের অন্ততন কর্মচারীদের রিপোর্ট অনুযায়ী উচ্চতর

কর্তৃপক্ষ একটি ভ্রমাত্মক ধারণা করিলেন যে মুর্শিদাবাদ জেলা বাড়তি অঞ্চল এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে স্থির করিলেন যে অন্ততঃ ৩৪ লক্ষ মণ ধান ও চাল অনায়াসেই মুর্শিদাবাদ হইতে সংগ্রহ করা সহজসাধ্য। তাহারাই সব সময়েই এই কথাটা প্রচার করিয়া থাকেন। কিন্তু তাহারাই এই সামান্য কথাটা তলাইয়া দেখেন না যে মুর্শিদাবাদ জেলার ৪টি মহকুমায় মধ্যে ৩টি মহকুমাই ঘাটতি অঞ্চল। একমাত্র কান্দী মহকুমাতেই ধান চাউল উৎকৃষ্ট থাকে। মুর্শিদাবাদ জেলার প্রায় অর্দ্ধাংশ, যাহা বাড়তি অঞ্চল বলিয়া খ্যাত তাহাতে যে ফসল উৎপন্ন হয় তাহার মধ্যে রবিশস্ত্র, পাট, নানা প্রকার শাক-সজী এবং সামান্য পরিমাণ ভাটুই ধান হয়। যে পরিমাণ ভাটুই বা আউষ ধান উৎপন্ন হয় তাহা তাহাদের প্রয়োজনের তুলনায় অকিঞ্চিৎকর, মাত্র তিন মাসের ধোরাক জোগায়, বাকী নয় মাস তাহারাই রাঢ় অঞ্চলের ধান চাউলের উপর নির্ভর করে। ১৯৪১ সালের আদমশুমারীতে মুর্শিদাবাদের লোক সংখ্যা ১৬,৪০,৫০০ জন, তন্মধ্যে ভাগীরথীর পশ্চিম কুলের লোক সংখ্যা ৮,২৭,৭৯১ হইবে। ভাগীরথীর পশ্চিম তীরে জঙ্গীপুর মহকুমার সাগরদিঘী থানা এবং লালবাগ মহকুমার নবগ্রাম থানা ব্যতীত অন্তান্ত সমস্ত থানাই ঘাটতি অঞ্চল অর্থাৎ আবশ্যিক মত ধান বা চাউল জন্মে না। সদর মহকুমার প্রায় সমস্ত অংশই ঘাটতি। যদিও এই অঞ্চলে প্রচুর ধান উৎপন্ন হয় না, তথাপি রবিশস্ত্র পাট ও অন্তান্ত ফসলে তাহারাই যে আয় করে তাহা উপরোক্ত বাড়তি অঞ্চলের তুলনায় অধিক। স্বাভাবিক অবস্থায় পূর্ব-অঞ্চল পশ্চিম অংশের উপর তাহার প্রয়োজনীয় খাজশস্ত্রের জন্ত নির্ভরশীল এবং পশ্চিম



অংশ তাহার উৎপন্ন ধাতু চাউলের বিনিময়ে পূরণ হইতে আবশ্যকীয় ডাল, তরীতরকারী প্রভৃতি পাইয়া থাকে। মুর্শিদাবাদের অর্থনৈতিক কাঠামো এইভাবে বঙ্গ বিভাগের পূর্ব পর্যন্ত ছিল, অধিকন্তু কয়েকটি সীমান্তবর্তী থানা, যথা সমসেরগঞ্জ, নৃতী, লালগোলা, ভগবানগোলা, জলসী প্রভৃতি রাজসাহী জেলার বরিন্দা অঞ্চল এবং বীরভূম জেলার নলহাটি, মুরারই প্রভৃতি থানার নিকট হইতে ধান ও চাউল ক্রয় করিত। কিন্তু বঙ্গ ব্যবচ্ছেদের পর এবং বর্তমান কনট্রোলপ্রথা চালু থাকায় উক্ত অর্থনৈতিক অবস্থার বিপর্যয় ঘটয়াছে এবং সম্ভট দেখা দিয়াছে। খাদ্যশস্য অভাবের প্রধান কারণ, এই সমস্ত অঞ্চল হইতে খাদ্যশস্য আনয়ন বন্ধ এবং ঘাটতি অঞ্চলকে বাড়তি অঞ্চল বলিয়া প্রচার করিয়া তাহা হইতে খাদ্যশস্য সংগ্রহ করিয়া জেলার বাহিরে পাঠান। মুর্শিদাবাদ জেলার মোট জমির পরিমাণ ১৩০৭০০০ একর এবং এক্ষেপে ২৪৬৮০২ একর আবাদী বা আবাদযোগ্য। ইহার মধ্যে কৃষিদ্রব্য ৩০২০০০ দোকসলি এবং ১২৬০০০ একর আবাদযোগ্য পতিত বলা যাইতে পারে। আমন ধাতু মোট ৪১২২৪৯ একর জমিতে হয় এবং আউস ২০৫০০০ একর। Flood Commission এর মতে একর প্রতি গড়পড়তা আমন ১৭ মণ এবং আউস ১৫ মণ হইয়া থাকে। এইরূপে ভাগি ধান সমেত মুর্শিদাবাদ জেলায় ১৮৮৭০০০ মণ ধাতু উৎপন্ন হয়। ১৯৪১ সালের আদমশুমারীর গণনা ধরিলে লোকসংখ্যা ১৬৪০০০০, বর্তমানে প্রাকৃতিক নিয়মে বৃদ্ধি হইয়া আরও ১৬০০০০ হইবে। বঙ্গ বিভাগের পর পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তু কম বেশী প্রায় ৫০০০০ লোক আসিয়াছে এবং গত কয়েকবারের হান্সামার পর হইতে আরও ৫০০০০ লোক আসিয়াছে। এই সমস্ত কারণে ১৯ লক্ষ লোকের অন্নসংস্থান এই জেলা হইতে করা সম্ভব; কিনা প্রথমতঃ তাহাই বিবেচনা করিতে হইবে, পরে উদ্ভূতের কথা। সরকার তরফ হইতে এমন প্রচার করা হয় যে গড়পড়তা ৭/০ মণ ধান বৎসরে একজন লোকের পক্ষে যথেষ্ট, কিন্তু Flood Commission এর report এ অনেক গবেষণার পর স্থির হইয়াছে যে প্রত্যেক ব্যক্তির রুৎসরে ২/০ মণ ধানের কম চলে না। এক্ষেপে ১২০০০০ লক্ষ লোকের জন্য ২/০ মণ হিসাবে ধরিলে ১৭১০০০০ মণ ধাতুর প্রয়োজন। যদি আমরা ৭/০ মণ হিসাবেও ধরি তাহা হইলেও ১৩৬০০০০ মণ ধাতুর প্রয়োজন। উপরোক্ত হিসাব হইতেই দেখা যাইবে যে আমাদের এখনও ৫২১৩০০ অথবা ৪৭১৩০০ মণ ধান কমপক্ষে প্রয়োজন এবং উহা বাহির হইতে আনা প্রয়োজন।” শ্রীশ্রীমাধব ভট্টাচার্য্য যে বিবৃতি দিয়াছেন তাহা পাঠ করিলেই মুর্শিদাবাদের খাদ্যপরিস্থিতির পূর্ণ বিবরণ পাওয়া যাইবে। আসি ইচ্ছা করিয়াই এই বিবৃতি উদ্ধৃত করিলাম এই কারণে—যে সরকার এই বিবৃতিতে উল্লিখিত বিষয় অস্বীকার করিতে পারিবেন না। ইহা কোনো রাজনৈতিক নেতার প্রোপাগান্ডা নহে—ইহা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কংগ্রেসী দলের একজন প্রতাবশালী পরিবন-সম্প্রদায়ের সৃষ্টিভিত্তি অভিমত। ইহা ছাড়াও উক্ত বঙ্গ যে সাম্প্রদায়িক হান্সামা ঘটনা গেল তাহার জন্য দেশের সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে যে একটি অনিশ্চিততার ভাব দেখা

দিয়াছিল তাহারই ফলে মুর্শিদাবাদের মুসলমান অধ্যুষিত এলাকাসমূহে চাষের কার্য এবারে আদৌ হয় নাই বলা যায়। তদুপরি ভারত সরকারের উৎসাহে জেলায় এবারে পাটের চাষ বেশি হইয়াছে। এই সকল কারণ ছাড়াও জেলার বহুস্থানে অতিরিক্ত বর্ষার ফলে বহু জমি কসল সমেত জলমগ্ন হইয়া গিয়াছে। ফলে জেলার বাস্তবিক অবস্থায় যে পরিমাণ ধাতু উৎপন্ন হয় তাহা হইতে পার নাই।

অথচ জেলায় খাদ্যসংগ্রহ অভিযান (Procurement drive) পুরানমুহে চলিয়াছে। খাদ্যসংগ্রহ ব্যাপারে জেলার অধিবাসীরা সরকারের সহিত প্রথম হইতেই একমত নহেন। সরকার হইতে বলা হয় যে খাদ্যসংগ্রহ করা হয় এই কারণে যে জেলার প্রয়োজনের সময় সংগৃহীত ধাতু বা চাউল বাজারে ছাড়া হইবে। কিন্তু এবারে দেখা গেল যে জেলায় যখন খাদ্যভাব চরমে উঠিয়াছে, চাউলের দর যখন স্থানে স্থানে ৫০/১৬০/ পর্যন্ত উঠিয়াছে, তখন সরকারের শুদামে আদৌ ধাতু বা চাউল নাই। ভুল পরিসংখ্যানের উপর নির্ভর করিয়া সরকার যে খাদ্যনীতি গ্রহণ করিয়াছিলেন বর্তমানের খাদ্যশঙ্কট তাহারই অবশুভাবী ফল।

বিগত দুই মাসকাল হইতে মুর্শিদাবাদের খাদ্য পরিস্থিতি এক ভয়াবহ আকার ধারণ করিয়াছে। অধিকাংশ লোকই চাউলের বর্তমান বাজার দরে চাউল ক্রয় করিতে পারিতেছে না। কিছুদিন হইতে রেশনের মাধ্যমে কিছু চাউল লোকে পাইতেছিল, কিন্তু তাহার পরিমাণও প্রয়োজনের তুলনায় অল্প। সম্প্রতি রাজ্য-সরকারের খাদ্যমন্ত্রী যে বিবৃতি দিয়াছেন তাহাতে জানা যায় যে মুর্শিদাবাদে বর্তমানে ১৮৭০০০ লোক আংশিক রেশনভুক্ত হইয়াছে। ১৯ লক্ষ লোকের মধ্যে মাত্র ১৮৭০০০ লোকের রেশন লাভ খুবই অকিঞ্চিৎকর। জেলার সর্বত্রই আজ দুর্ভিক্ষের করাল ছায়া দেখা যাইতেছে। অনাহারজনিত মৃত্যুর সংবাদও পাওয়া যাইতেছে। সরকার অবশ্য এই সকল মৃত্যু স্বীকার করিবেন না।

বর্তমানে বহরমপুরের বাজারে চাউল যাহা বিক্রয় হইতেছে তাহার দর ৪০/ টাকার উপরে। সদর মহকুমার অন্তর্গত গ্রামাঞ্চলে চাউলের দর আরও বেশি। অধিকাংশ লোকই চাউল ক্রয় করিতে অসমর্থ হইয়া ছোলা, মটর ইত্যাদি অথবা শাকসবজী খাইয়া জীবনীশক্তি বজায় রাখিবার চেষ্টা করিতেছে। গত ৫ই আগষ্ট বহরমপুর সহরে যে ভূখা মিছিল বাহির হইয়াছিল তাহা স্বতন্ত্র ভাবেই হইয়াছিল। দীর্ঘদিন ধরিয়া অর্দ্ধাহারে থাকিয়া জনচিহ্ন বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিয়াছিল। সমগ্র জেলার নরনারী খাদ্যভাবের জন্য যে অবর্ণনীয় দুর্দশাভোগ করিতেছে ও তাহার জন্য যে বেদনা তাহাদের হৃদয়ে পুঞ্জীভূত হইয়া উঠিয়াছে—এই আগষ্ট তারিখের ভূখা মিছিল তাহারই প্রকাশ মাত্র। ইহাকে রাজনৈতিক প্রোপাগান্ডা বলিয়া ইহার গুরুত্ব হ্রাস করিবার চেষ্টা করিলে মূল খাদ্যসমস্যার সমাধান তাহাতে আদৌ হইবে না।

ইহা স্বীকার না করিয়া উপায় নাই যে বর্তমানে মুর্শিদাবাদে দুর্ভিক্ষের অবস্থা বিরাজ করিতেছে। ইহার আণ্ড প্রতিবিধানের ব্যবস্থা প্রয়োজন। রাজ্য সরকার প্রেসনোট বাহির করিয়া যাহা প্রচার করেন তাহাতে জানা

যায় যে তাঁহারা মুর্শিদাবাদের খাজাভাব সম্বন্ধে সজাগ ও সচেতন হইয়াছেন। রাজ্যের অপরাপর স্থান হইতে খাজা, চাউল, গম ও আটা মুর্শিদাবাদে আনয়ন করিয়া খাজাভাব মিটাইবার চেষ্টা করা হইতেছে। ইহাতে অবশ্য অভাব কিয়ৎ পরিমাণে মিটিবে। ইহা ছাড়া সরকার হইতে আরও কয়েকটি ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন। জনসাধারণ মনে করে যে মুর্শিদাবাদে হঠাৎ যে চাউলের অভাব দেখা দিল তাহার পশ্চাতে চাউল ব্যবসায়ীদের যথেষ্ট হাত রহিয়াছে। সরকার হইতে যদি তাহাদের সম্বন্ধে কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বিত হয়, তাহা হইলে আমরা মনে করি এখনও বেশ কিছু পরিমাণ চাউল জেলার বড় বড় চাউল-ব্যবসায়ীর নিকট হইতে পাওয়া যাইতে পারে। ইহা ছাড়া, জেলার অনেক বড় বড় জমিদার বা জোতদার আছেন যাহাদের মজুত খাজা ও চাউল যে কোনো কারণেই হউক, সরকারী খাজা সংগ্রহ বিভাগ গ্রহণ করিতে পারেন

নাই। ইহাদের নিকট হইতে যে চাউল ও খাজা পাওয়া যাইবে তাহাও পরিমাণে কম হইবে না। ইহা হইল স্বল্প-মেয়াদী ব্যবস্থা। মুর্শিদাবাদের খাজা সমস্তার সমাধানের দীর্ঘমেয়াদী ব্যবস্থা হইল একমাত্র এই যে, এই জেলাকে খাটতি অঞ্চল বলিয়া সরকারকে স্বীকার করিয়া লইতে হইবে ও ভবিষ্যতে তদনুযায়ী নীতি নির্ধারণ করিতে হইবে। জেলায় যে খাজা বা চাউল সংগৃহীত হইবে, তাহা যেন কোনো কারণেই জেলার বাহিরে চালান না যায় তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। আবাদযোগ্য যে সকল জমি পতিত রহিয়াছে তাহাতে চাষের ব্যবস্থাও অবিলম্বে করিতে হইবে। ইহা যদি কার্য্যকরী হয়, তাহা হইলে মুর্শিদাবাদের খাজা পরিস্থিত স্থায়ী-ভাবে উন্নতির পথে যাইবে নতুবা চিরকাল এই ভাবে দুর্ভিক্ষের আবহাওয়া বিরাজ করিবে এবং জেলার নর-নারীবৃন্দকে ভিক্ষাভাণ্ড হাতে লইয়া অপরের করুণার উপর নির্ভর করিতে হইবে।

## তীর্থ

### শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

১

তীর্থ জাতির ধর্ম্মকেন্দ্র—

প্রাণকেন্দ্রই বটে,

সেই এনে দেয় সুধার উৎস

অধর সন্নিকটে।

দেহে মনে দেয় শক্তি অলৌকিক,

করে তেজোময় নিষ্পাপ নির্ভীক,

ধূলি রজ হয়, একই জন্মে

নূতন জন্ম ঘটে।

২

করে সে অসাড় লুপ্ত সুপ্তে

বিদ্যুৎ সঞ্চার,

দেয় লাক্ষিত সর্বহারারে

অমৃতের অধিকার।

তীর্থ করার স্বর্গের সাধে যোগ,

এক পংক্তিতে করুণামৃত ভোগ,

জুড়ায় অন্ধ আনি তরঙ্গ

হতে প্রেম পারাবার।

৩

ছুট অরাতি প্রথমই করে,

তীর্থ কলঙ্কিত,

সবল সরল জাতিরে করিতে

ভীত ও জীবন্ত।

রোধিতে জীবনী শক্তি প্রদর্শন,

হরণ করিতে সর্বশ্রেষ্ঠ ধন,

তীর্থ হারালে জানে জাতি হবে

সত্য সর্বহত।

৪

রাষ্ট্রের কাজ সর্বপ্রথমে

তীর্থ রক্ষা করা।

দেশ রক্ষার প্রথম সোপান

নষ্ট-তীর্থ গড়া।

সেনা, রণতরী, বিমান, অস্ত্রাগার,

সব চেয়ে জয়ে বেশী প্রয়োজন তার,

সেই কোবাগার, সর্বশ্রেষ্ঠ—

পরমার্থেতে ভরা।

৫

তীর্থ জাতির পরমাশ্রয়

মহালক্ষ্মীর দান,

সকল প্রেরণা, সকল সাধনা,

সব সিদ্ধির স্থান।

ভেজের খনি, সে স্পর্শমণির ভূমি,

সতী অদ্বৈতে গঠিত তা জানো তুমি,

সকল পতন দুর্গতি হতে—

সে করে পরিভ্রাণ।

৬

মধুস্তরে হুখে বিপ্লবে

জেনো জাতি জীয়ে রবে,

তীর্থ ধ্বংসে শক্তিশারা সে

নিতি অধোগতি লভে।

হারায় মহত্ত্ব ও স্বাধীনতা

ইতিহাস হতে মুছে যায় তার কথা

অপাংক্লেয় সে জীবন এবং

জগতের উৎসবে।

নাই। দূর হইতে দেখিয়াছি, অতি স্নহের পুরুষ। আর শুনিয়াছি, তিনি ভাবুক—অদৃষ্টবাদী—’

রট্টা রমণীসুলভ প্রশ্ন করিলেন—‘তাহার কয়টি মহিষী?’

চিত্রক বলিল—‘স্বন্দ্র কুমারত্বধারী, বিবাহ করেন নাই।’

রট্টা বিস্ময়িত নেত্রে বলিলেন—‘আশ্চর্য।’

চিত্রক নিজের কথা ভাবিতে ভাবিতে বলিল—‘আশ্চর্য বটে! কিন্তু এক্রূপ আশ্চর্য ঘটনা পৃথিবীতে অনেক ঘটিয়া থাকে। আমার বোদ্ধজীবনে আমি অনেক দেখিয়াছি।’

‘তবে সেই সব কাহিনী বলুন। আমি শুনিব।’

রট্টার আগ্রহ দেখিয়া চিত্রক একটু হাসিল। অজানিত ভাবে তাহার মনের তিক্ততা দূর হইতেছিল। মনের মধ্যে অনেক বিরুদ্ধ ভাবনা জন্মা হইলে মানুষ হৃদয়-ভার লাঘব করিতে চাহে, আত্মকথা বলিবার সুযোগ পাইলে সুখী হয়। চিত্রক ধীরে ধীরে নিজ জীবনের অনেক কাহিনী বলিতে লাগিল। কেবল আত্ম-পরিচয়টি গোপন করিয়া আর সব সত্য কথা বলিল। যুদ্ধের বিচিত্র অভিজ্ঞতা, নানা দেশের নানা মানুষের অদ্ভুত আচার ব্যবহার, তাহাদের বেশবাস কথাবার্তা—

এদিকে ষোড়া ছুইটি চলিয়াছে; পথেরও বিরাম নাই। উপত্যকায় ছায়াশীতল হইয়া, অধিত্যকায় রবিতপ্ত হইয়া কদাচিৎ গিরি নিরীকরির জলে অঙ্গ ডুবাইয়া পথ চলিয়াছে। কিন্তু পথের দিকে কাহারও লক্ষ্য নাই। রট্টা তন্ময় হইয়া গল্প শুনিতেছেন।

যে গল্প বলে এবং যে গল্প শোনে তাহাদের মধ্যে ক্রমশ মনোগত ঐক্য স্থাপিত হয়, দুইটি মন এক সুরে বাঁধা হইয়া যায়। চিত্রক গল্প বলিতে বলিতে কদাচিৎ সচেতন হইয়া ভাবিতেছিল—কী আশ্চর্য, মনে হইতেছে আমি একান্ত আপনার জনকে আমার জীবন কথা শুনাইতেছি! আর রট্টা—তিনি বোধহয় কিছুই ভাবিতেছিলেন না, শুধু এই জলপকের সত্তার মধ্যে নিমগ্ন হইয়া গিয়াছিলেন।

দীর্ঘকাল নানা কাহিনী বলিবার পর চিত্রক যেন চমকিয়া সজাগ হইয়া উঠিল; অপ্রতিভ ভাবে বলিল—‘আর না, নিজের কথা অনেক বলিয়াছি।’

রট্টা বলিলেন—‘আরও বলুন।’

চিত্রক হাসিল; একটু পরিহাস করিয়া বলিল—‘রাজকন্যাদের কি ক্ষুধা তৃষ্ণার বালাই নাই? ওদিকে বেলা কত হইয়াছে তাহার সংবাদ রাখেন কি?’

রট্টা চকিতে উত্থেঁ চাহিলেন। সূর্য মধ্য গগনে কখন কোন দিক দিয়া সময় কাটিয়া গিয়াছে তিনি জানিতে পারেন নাই।

রট্টা বলিলেন—‘ছি ছি, এত গল্প বলিয়া নিশ্চয় আপনার ক্ষুধার উদ্রেক হইয়াছে।’

চিত্রক বলিল—‘তা হইয়াছে। আপনার?’

রট্টা সলজ্জ হাসিলেন—‘আমারও। এতক্ষণ জানিতে পারি নাই। কিন্তু উপায় কি? সঙ্গে তো খাদ্যদ্রব্য নাই।’

‘উপায় আছে। ঐ দেখুন—’ বলিয়া চিত্রক পার্শ্বে দিকে অঙ্গুলি তুলিয়া দেখাইল।

পাশাপাশি দুই শ্রেণী পাহাড়ের মাঝখানে অপরিচয় উপত্যকা, পথটি তাহার উপর দিয়া গিয়াছে। বাম পার্শ্বে পাহাড়ে কিছু উচ্চ পাষাণগাত্রে সারি সারি কয়েক চতুষ্কোণ রক্ত দেখা যায়; পাথর কাটিয়া মানুষের বাসস্থান রচিত হইয়াছে। চিত্রকের অঙ্গুলি নির্দেশ অনুসরণ করি রট্টা দেখিলেন—একটি দেবায়তন; সম্ভবতঃ যুদ্ধের সংঘ এখানে যে মানুষ বাস করে তাহার প্রমাণ, একটি গবা হইতে পীতবর্ণ বস্ত্র লব্ধ হইয়া অলস বাতাসে ছলিতেছে।

চিত্রক বলিল—‘যখন বস্ত্র আছে তখন মানুষ অবশ্য আছে; মানুষ থাকিলেই খাদ্য থাকিবে। সুতরাং অবিলম্বে না করিয়া ঐ দিকে যাওয়াই কর্তব্য।’

রট্টা হাসিয়া সম্মতি দিলেন। কিন্তু ষোড়ার পিছনে ওঠা যাইবে না। ষোড়া দুটিকে একটি শব্দার্থে স্থানে ছাড়িয়া দিয়া উভয়ে পাহাড়ের চড়াই ধরিলেন।

স্থানটি উচ্চ হইলেও দুর্ভাগ্য নয়; উপরন্তু মনুষ্যচিহ্নিত একটি ক্ষীণ পথের কথা আছে। শিলাবন্ধুর অসমতল পর্বতগাত্র বাহিয়া চিত্রক অগ্রে চলিল; রট্টা তাহার পশ্চাতে রহিলেন।

অর্ধদণ্ড পরে উপরে উঠিয়া রট্টা দেখিলেন, সংঘই বটে পাষাণে উৎকীর্ণ কয়েকটি কক্ষ, সম্মুখে সমতল চত্বর চত্বরের মধ্যস্থলে তথাগতের শিলামূর্তি। উপত্যকা হইতে যে গবাক্ষগুলি দেখা গিয়াছিল তাহা সংঘের পশ্চাত্তাগ।

রট্টা প্রথমে বুকের ধ্যানাসীন মূর্তির সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইলেন। চিত্রকও পাশে দাঁড়াইল।

রট্টা ঘোড়হস্তে ভক্তিনম্র কণ্ঠে বলিলেন—‘নমো তস্ম ভগবতো অরহতো সম্মো সম্বুদ্ধস্ম।’ বুদ্ধকর লগাটে স্পর্শ করিয়া রট্টা চিত্রককে বলিলেন—‘আপনিও ভগবানকে প্রণাম করুন। বলুন, নমো তস্ম ভগবতো অরহতো সম্মো সম্বুদ্ধস্ম—’

রট্টার অহসরণ করিয়া চিত্রক ভগবান তথাগতকে প্রণতি জানাইল; তারপর ঈষৎ বিস্ময়ে রট্টার দিকে ফিরিয়া প্রশ্ন করিল—‘আপনি এ মন্ত্র কোথায় শিখিলেন?’

রট্টা বলিলেন—‘আমার পিতার কাছে।’

প্রাঙ্গণে এতক্ষণ অস্ত্র কেহ ছিল না; এখন প্রকোষ্ঠের ভিতর হইতে একটি পীতবেশধারী শ্রমণ বাহির হইয়া আসিলেন। মুণ্ডিত মণ্ডক, শীর্ণ কলেবর, মুখে প্রসন্ন বৈরাগ্য। সহাস্তে দুই হস্ত তুলিয়া বলিলেন—‘আরোগ্য।’

রট্টা বন্ধাজলি হইয়া বলিলেন—‘আর্থ, আমরা দুইজন ক্ষুধার্ত পাশ্চ; বুকের প্রসাদ ভিক্ষা করি।’

ভিক্ষু বলিলেন—‘রট্টা যশোধরা, বুদ্ধ তোমার প্রতি প্রসন্ন। এস, তোমরা ভিতরে এস।’

ভিক্ষু তাহাকে চিনিয়াছেন দেখিয়া রট্টার মুখ আনন্দে উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল। তিনি বলিলেন—‘আর্থ আমাদের চিনিলেন কি করিয়া? পূর্বে কি দেখিয়াছেন?’

ভিক্ষু বলিলেন—‘দেখি নাই, তোমার বেশভূষা হইতে অনুমান করিয়াছি। মহারাজ ধর্মাদিত্যের কাছে যাইতেছ?’

‘আজ্ঞা। ইনি আমার সহচর, মগধের রাজদূত।’

ভিক্ষু একবার চিত্রকের প্রতি স্মিতদৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন; কিছু বলিলেন না।

অতঃপর সংঘচ্ছায়ায় প্রবেশ করিয়া হস্তমুখ প্রক্ষালন পূর্বক পশ্চিম দুইজন একটি প্রকোষ্ঠে বসিলেন। ভিক্ষু তাহাদের জন্ত খাদ্য আনিয়া দিলেন; কিছু দ্বিদল সিদ্ধ, কিছু সিদ্ধ চিপটিক, কয়েকটি শুক জাক্কাফল ও ঝুঁরুর। ক্ষুধার সময়; উভয়ে পরম তৃপ্তির সহিত তাহাই অমৃতজ্ঞানে আহার করিতে লাগিলেন।

আহারের সঙ্গে সঙ্গে কিছু কথোপকথন হইতে লাগিল।

রট্টা জিজ্ঞাসা করিলেন—‘দেব, এখানে আপনারা কয়জন আছেন? আর কাহাকেও দেখিতেছি না।’

ভিক্ষু বলিলেন—‘আমরা চারিজন আছি। দুইজন রন্ধে জল ভরিতে গিয়াছেন। একজন পীড়িত।’

রট্টা মুখ তুলিলেন—‘পীড়িত? কী পীড়া?’

ভিক্ষু ঈষৎ হাসিলেন—‘সংসার—পীড়া। সংঘে থাকিলেও মারের হস্ত হইতে নিস্তার নাই।’

চিত্রক প্রশ্ন করিল—‘আপনারা এখানে নিঃসঙ্গ থাকেন? দিবারাত্র কি করেন?’

ভিক্ষু বলিলেন—‘সংসার ভুলিবার চেষ্টা করি।’

আগারাস্ত্রে আচমন করিয়া রট্টা আবার আসিয়া বসিলেন, বলিলেন—‘আর্থ, কিছু উপদেশ দিন।’

ভিক্ষু হাসিলেন—‘আমি আর কী উপদেশ দিব?’ সহস্র বৎসর পূর্বে শাক্যমুণির শ্রীমুখ হইতে যে বাণী নিঃসৃত হইয়াছিল তাহাই শুন।—‘মন হইতে প্রবৃত্তির উৎপত্তি; মন যদি প্রসন্ন নিষ্কলুষ থাকে, সুখ ছায়ার মতো তোমার পিছনে থাকিবে।’ \*

রট্টা প্রশ্ন করিয়া বলিলেন—‘আমি ধন্ত।’—ভিক্ষুর পদপ্রান্তে একটি স্বর্ণ দীনার রাখিয়া বলিলেন—‘সংঘের অর্ঘ্য।’

ভিক্ষু বলিলেন—‘স্বর্ণে প্রয়োজন নাই। কল্যাণি, যদি সংঘকে দান করিতে ইচ্ছা কর, এক আটক গোধূম দিও। দীর্ঘকাল আমরা গোধূম দেখি নাই। যে শ্রমণটি অমুহু তিনি গোধূমের জন্ত কিছু কাতর হইয়াছেন।’ বলিয়া মুহু হাসিলেন।

‘সম্বর পাঠাইব’—বলিয়া রট্টা গাত্রোথান করিলেন।

চিত্রক দণ্ডায়মান ছিল; সে শুক্লবস্ত্রে বলিল—‘মহাশয় আমাদেরও কিছু উপদেশ করুন।’

ভিক্ষু প্রশান্ত চক্ষু তাহার পানে তুলিয়া গভীরকণ্ঠে বলিলেন—‘শাক্যমুণির উপদেশ শ্রবণ কর: “সে আমাদের গালি দিয়াছে, আমাদের প্রহার করিয়াছে, নিঃস্ব করিয়াছে”—এই কথা যে চিন্তা করে তাহার ক্রোধ কখনও শাস্ত হয় না। বৈরতাব কেবল অবৈরতাব দ্বারা শাস্ত হয়, ইহাই চিরন্তন ধর্ম।’ \*

\* \* \* \*

হুই অখারোহী আবার চলিয়াছেন। স্বর্ধ তাঁহাদের বাসে চলিয়া পড়িয়াছে। তীর্থক অংশ তেমন তীক্ষ্ণ নয়।

উভয়ে নিজ নিজ অন্তরে নিমগ্ন; বাক্যালাপ অধিক হইতেছে না। চিত্রক গল্প বলিবার কালে রট্টার প্রতি যে ঘনিষ্ঠ অন্তরঙ্গতা অনুভব করিয়াছিল, তাহা আবার সংশয়ের কুজ্‌বাটিকায় আচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছে।

ভিক্সু যে-কথা বলিলেন তাহার অর্থ কি? বৈরভাবের পরিবর্তে অবৈরভাব পোষণ করাই স্বাভাবিক, অবৈরভাব কি করিয়া পোষণ করা যায়? ইহা ভিক্সুর ধর্ম হইতে পারে, ক্ষত্রিয়ের ধর্ম কদাচ নয়। প্রতিহিংসা ক্ষত্রিয়ের ধর্ম। শুধু তাহাই নয়, ইহা চিত্রকের প্রকৃতিগত স্বধর্ম। ইহা তাহার ধাতু।

অথচ—এত সুযোগ পাইয়াও সে রট্টার উপর প্রতিহিংসা সাধন করিতে পারিতেছে না কেন? রট্টা সুন্দরী যৌবনবতী নারী—এই জ্ঞাত? সুন্দরী নারীর মোহে সে ক্ষত্রিয়ের ধর্ম বিস্মৃত হইবে? পিতৃহত্যার প্রতিশোধ লইবে না?

সহসা মেঘাচ্ছন্ন আকাশে বিদ্যুচ্চমকের জ্বায় একটি চিন্তা চিত্রকের মনে খেলিয়া গেল। সে উচ্চকিত হইয়া বিস্ফারিত নেত্রে আকাশের চানে চাহিল। কোন্ মুহূর্ত্তার

জালে তাহার মন এতক্ষণ জড়াইয়া ছিল? এ কথা তাহার মনে উদয় হয় নাই কেন?

সে মনে মনে বলিল—আমি ক্ষত্রিয়, বৈরতা আমার স্বধর্ম; কিন্তু রট্টার সহিত বৈরতা করিব কেন? সে আমার অনিষ্ট করে নাই। তাহার পিতার অপরাধে তাহাকে দণ্ড দেওয়া ক্ষত্রিয়ধর্ম নয়! যদি প্রতিশোধ লইতে হয় তাহার পিতার উপর লইব।

দারুণ সমস্তার সমাধান হইলে হৃদয় লঘু হয়। মুহূর্ত্তে চিত্রকের অন্তরের কুজ্‌বাটিকা কাটিয়া গিয়া আনন্দের দিব্য জ্যোতি ফুটিয়া উঠিল। সে উৎফুল্ল নেত্রে রট্টার পানে চাহিয়া উচ্চকণ্ঠে হাসিয়া উঠিল।

চকিতে স্মিত নেত্র তুলিয়া রট্টা বলিলেন—‘কি হইল?’

চিত্রক বলিল—‘ভিক্সু বলিয়াছিলেন, সুখ ছায়ায় মতো আপনাদের সঙ্গে সঙ্গে থাকিবে। ঐ দেখুন সেই ছায়া!’

রট্টা ঘাড় ফিরাইয়া দেখিলেন, সঞ্চরমান অস্বাভাবিক ছায়া নাচিতে নাচিতে তাঁহার সঙ্গে চলিয়াছে।

উভয়ে একসঙ্গে হাসিয়া উঠিলেন।

চারিদিকে বিস্তীর্ণ তরঙ্গায়িত উপত্যকা। পাহাড় দূরে সরিয়া গিয়াছে। দূর হইতে তাঁহাদের হাসির গদগদ প্রতিধ্বনি ফিরিয়া আসিল। যেন মিলন মুহূর্ত্তের সলজ্জ চুপিচুপি হাসি। কানে কানে হাসি। (ক্রমশঃ)

## বিষ্ণুপুরে শিক্ষক সম্মেলন

### শ্রীপরিমল মুখোপাধ্যায়

আয়োজন চলতে লাগল—কলকাতা থেকে বিষ্ণুপুর, বিষ্ণুপুর থেকে কলকাতা। ১৯৪৭ সালে বর্ধমান সম্মেলনের পর দেশবিভাগ ও নিখিল বংগ শিক্ষক সমিতির বিভক্ত করার আয়োজনের জন্তে গত দু'বছর সাধারণ সম্মেলন হতে পারে নি। দীর্ঘ ২১৩ বছর পরে বহু-আকাজিক এই সম্মেলনের জন্তে সমগ্র শিক্ষক-সমাজ যে উদ্গ্রীব হয়ে থাকবেন, তা ত স্বাভাবিক। সেজন্তেই এবারকার আয়োজন অধিকতর উৎসাহ ও উদ্দীপনার সংগে শুরু হল। স্থানীয় আহ্বায়কমণ্ডলীর সংগে নিখিল বংগ শিক্ষক সমিতির কর্তৃপক্ষ অস্তান্ত বারের তুলনায় ঘনিষ্ঠতর হলেন।

মুদ্রপাত হয় ২৩শে এপ্রিল, যেদিন আমরা ঝাঁকুড়ায় যাই সমিতির তরক থেকে আঞ্চলিক সভা করতে। সভা শেষে জেলা শিক্ষক সমিতির (নি. ব. শিক্ষক সমিতির জেলা শাখা) সভাপতি মহাশয় ও

আমরা আগামী সম্মেলনের কথা উপস্থিত সকলকে জানাই। বিষ্ণুপুর উচ্চ বিদ্যালয় থেকে যে তিনজন শিক্ষক প্রতিনিধি আঞ্চলিক সভায় এসেছিলেন, তাঁদের অনুরোধ করা হয় ফিরে গিয়ে প্রধান শিক্ষক মণায়কে জানাতে। কিছুদিন পরেই প্রধান শিক্ষক শ্রীগোকুলচন্দ্র ঘোষ জানালেন, রাজী। প্রথমে একটু আশ্চর্যই হয়েছিলাম—এত সহজেই এমন একটা বিরাট সম্মেলনের দায়িত্ব গ্রহণ করতে রাজী হলেন কী করে? সংগে অবশ্য এ কথাও লিখেছেন, আমাদের সক্রিয় সহযোগিতা পেলে তিনি কৃতকার্য হবেন বলে আশা করেন। সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি জানালাম। তবু সংশয় রইল—মফঃসল সহর, প্রতিনিধির সংখ্যা পাঁচ শ'ও হতে পারে, হাজারও হতে পারে, এতজন লোকের থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা, এতজন লোকের

সংকুলান হতে পারে এমন একটি সম্মেলন-মণ্ডপ বা সম্মেলনের স্থান চাই ত ?

সংশয় রইল না, ২রা জুন আমি ও সমিতির ভূতপূর্ব সম্পাদক শ্রীবিনয়ভূষণ সেন গেলাম বিষ্ণুপুর পরিদর্শনে সম্মেলনের প্রাথমিক আয়োজনের জন্তে। সকালে গোকুলবাবু আমাদের নিয়ে ঘুরে ঘুরে দেখালেন সম্মেলনের স্থান। চমৎকার কাব্যিক পরিবেশ—শহরের একান্তে প্রশস্ত সিনেমা হল, বালিকা বিদ্যালয়, মধ্য ইংরেজী বিদ্যালয়, কে. জি. ইঞ্জিনিয়ারিং স্কুল, তারপর উচ্চ বিদ্যালয়ের বোর্ডিং ও উচ্চ বিদ্যালয়—বোর্ডিং ও বিদ্যালয়ের মাঝে উন্মুক্ত উদার প্রান্তরের রাবী-বন্ধন; আরও এগিয়ে চলুন—বিশাল কাকচক্ষু লালবাঁধ, তীরে রামানন্দ কলেজ, এ পাশে কলেজ হোস্টেল। লালবাঁধের ওপারে শাল-পিয়াল-মহয়ার নিবিড় ঘনিষ্ঠতা, লাল কঁাকর আর পাখরের সমতল ও উঁচু-নীচু ঢিবি। খুশি হলাম, উৎফুল্ল হলাম। ছ'সাত শ' প্রতিনিধির থাকবার মত জায়গা যথেষ্ট হবে। তা ছাড়া উচ্চ বিদ্যালয়ের হল-ঘরে ক্রাশের পার্টিশানগুলো সরিয়ে ছ'সাত শ' লোকের সভাও চলবে। রূপকথা সিনেমার অন্তত বারো শ' লোকের স্থান হতে পারবে—হুতরাং একাংশ উদ্বোধন অধিবেশন সেখানেই হবে স্থির হল, কারণ প্রতিনিধি ছাড়া শহরের অধিবাসীরাও ত এই অধিবেশনে যোগদান করবেন। ফিরবার পথে খাতনামা ব্যবসায়ী শ্রীরামনলিনী চক্রবর্তী মহাশয়ের বাড়িতে আমরা গেলাম। আলাপ-পরিচয়ে এবং সম্মেলন সম্বন্ধে আলোচনা করে বুঝলাম, গোকুলবাবু একটি টানের প্রাচীরকেই পাকড়াও করেছেন।...বিকলে উচ্চ বিদ্যালয় গৃহে শহরবাসীদের সভায় স্থানীয় অভ্যর্থনা সমিতি ও বিভিন্ন উপসমিতি গঠিত হল। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি হলেন রামানন্দ কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীরাধাগোবিন্দ রায়।

কলকাতার সমিতির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে সম্মেলন উপসমিতির ঘন ঘন সভা, সমিতির কতৃপক্ষের উদ্বোধন ও কর্মতৎপরতা, বিষ্ণুপুরের সংগে কলকাতার আঙ্গিক সংযোগ ও উপস্থাপিত প্রস্তাবত, গার্ডেনরিচ বি. এন. আর অফিসে বগি রিজার্ভ করার জন্তে ছোট্টাছুটি, ডাঃ শ্যামপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ও অধ্যাপক দেবপ্রসাদ ঘোষ মহাশয়দের বাড়িতে যাতায়াত চলতে লাগল। প্রসাদপ্রাপ্ত (।) স্বত্বিক দু'জনেরই সম্মতি আমরা পেলাম—সবল দীর্ঘকায় সাগ্নিক শ্যামপ্রসাদ উদ্বোধন করবেন, আর ক্ষুদ্রকায় কিন্তু রসিকতা ও পাণ্ডিত্যের অর্ণব দেবপ্রসাদ করবেন সভাপতিত্ব।

১৫ই জুলাই শনিবার ও ১৬ই জুলাই রবিবার সম্মেলন। ১৩ই রায়ে চার মণ পটল নিয়ে রওনা হলাম। ভারত যখন গোকুলবাবু আমার ওপর চাপান তখন তাঁকে বলেছিলাম, 'পটল না তুলিয়ে আর ছাড়বেন না দেখছি!' হেসে জবাব দিয়েছিলেন, 'তুলি ত হ'জেনেই এক সংগে এখানে তুলব!' ১৪ই সকালে গিয়েই বিদ্যালয় গৃহের পূর্বপ্রান্তে পার্টিশান দেওয়া দুটি ঘর দখল করে বসলাম। কার্ভত এই দুটি ঘর নিখিল বংগ শিক্ষক সমিতির কার্যালয় হয়ে দাঁড়াল।

যার যা কিছু দরকার, এই ঘরে এলেই পাবেন বা জানতে পারবেন! সারাদিন ধরে শিক্ষক ও ছাত্র স্বেচ্ছাসেবকদের সংগে ঘুরে ঘুরে প্রত্যেক জেলার প্রতিনিধিদের বাসস্থানের জন্তে পৃথক পৃথক ঘর ঠিক করা, প্রত্যেকটি প্রতিনিধি শিবিরে সম্মেলন সম্বন্ধে যাবতীয় জ্ঞাতব্য বিষয় নির্দেশক প্রাচীরপত্র লাগানো, প্রতিনিধিদের প্রবেশ-পত্র ও ব্যাজ প্রভৃতির বন্দোবস্ত দেখলাম। পরে আর সময় হবে না ভেবে বিকলে এক কঁাকে শহরের জটব্য স্থানগুলি দেখে নিলাম। একটি হিন্দু ও একটি মুসলমান কিশোর ছাত্র হ'ল আমাদের গাইড। দেখলাম দলবাদল, মদনমোহন মদনগোপালের ও ৮মুদ্রায় দেবীর মন্দির, শনি ঠাকুর প্রভৃতি। এই সত্যপীর ও শনি ঠাকুরের কাছে আজও হিন্দু-মুসলমানে পূজো দেয়! আর দেখলাম, দুটি হিন্দু-মুসলমান কিশোর হাত ধরাধরি করে আমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে চলেছে! প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতা ও শৌর্ধবীর্ধের ঐতিহ্যবাহী ইতিহাস-মুখর বিষ্ণুপুরকে দেখলাম।...সন্ধ্যায় ফিরে দেখলাম, প্রতিনিধিরা আসতে আরম্ভ করেছেন। আমাদের ধারণা ছিল, শনিবারের আগে প্রতিনিধিরা বড় একটা আসবেন না। যাই হোক, শনিবারের মধ্যে অধিকাংশ প্রতিনিধিই এসে গেলেন। অবশ্য রবিবারও কয়েকজন এসেছিলেন। শেব পর্যন্ত প্রতিনিধির সংখ্যা দাঁড়িয়েছিল ছয় শতেরও উপর এবং তার মধ্যে ছিলেন পূর্ববংগের প্রতিনিধি পঞ্চাশ জন ও মহিলা প্রতিনিধি পঁয়ত্রিশ জন।

১৫ই শনিবার সকাল সাড়ে সাতটা পর্যন্ত বিভিন্ন কাউন্টারে প্রতিনিধিদের পরিচয়পত্র ও সম্মেলনের চান্দা গ্রহণ করে প্রবেশপত্র, ব্যাজ, মুদ্রিত ভাষণাবলি, সম্পাদকীয় কার্যবিবরণী প্রভৃতি বিতরণ করা হল। জলযোগের পর সকাল ৮টায় কে. জি. ইঞ্জিনিয়ারিং স্কুলে হল শিল্প-প্রদর্শনীর উদ্বোধন। প্রশস্ত হলঘরের মধ্যে প্রবেশপথের দিকটা ছাড়া তিন দিকে পঁচিশ-ত্রিশটি টুল বসেছে। কলিকাতা থেকে সরকারি কর্মচারীরাও এসেছেন প্রদর্শনীর ব্যবস্থাপনা করতে। বিষ্ণুপুরের নিজস্ব শিল্প—কুটীরজাত রেশম, তসর, গরদ, শাঁখারীর শাঁখ, পিতল-কাঁসার বাসন, মালাকারের শোলার কাজ, পট ও পুতুল, প্রাচীন পুঁথি, অম্বরী তামাক, মতিচূর প্রভৃতি সব কিছুই এমন একটি চমৎকার সমন্বয় হয়েছে যে, কল্পনা-প্রবণ মন যেন থেকে থেকে 'কালিদাসের কালে' ফিরে যেতে চাইছিল। অধ্যক্ষ দেবপ্রসাদ প্রদর্শনীর উদ্বোধন করে প্রাচীন ভারতীয় শিল্পকলা, ভারতের জাতীয় শিল্প তথা কুটীর-শিল্প, ভারতীয় শিল্পকলার সংগে ভারতীয় সভ্যতার সংযোগ প্রভৃতি বিষয়ে একটি মনোজ্ঞ সংক্ষিপ্ত ভাষণ দেন।

...অতিথি-অভ্যাগত, প্রতিনিধি, স্বেচ্ছাসেবক, দাস-দাসী, পাচক-পাচিকা সমেত প্রায় এক হাজার জনকে দু'দিনে চারবার জলযোগ চারবার আহ্বারের জন্তে আটখানা করে কুপন পূর্বেই বিতরণ করা হয়েছিল। কুপন দেখিয়ে মাধ্যাহ্নিক আহ্বার সমাপ্ত করলাম। বেলা তিনটের শিক্ষা সাহিত্য ও সংস্কৃতি শাখার অধিবেশন আরম্ভ হল। বিদ্যালয়-গৃহে তিলধারণের স্থান নেই। উত্তর তোরণের অনেকখানি



পথ লতা-পাতা দিয়ে আচ্ছাদিত করে এক মনোরম পরিবেশের সৃষ্টি করা হয়েছে। উপরে প্রকাণ্ড লাল শালুতে ঝলমল করছে, 'নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সম্মেলন।' দক্ষিণায়নেও তাই। উপরন্তু সেখানে বিজয়গর্বে শূন্ত উড়ছে বিষ্ণুপুরী রেশমের জাতীয় পতাকা। সভাপতির আসন গ্রহণ করেছেন দেবপ্রসাদ। প্রবন্ধ ও কবিতা পাঠ, আবৃত্তি, বক্তৃতা, হস্ত-কৌতুক প্রভৃতি চলল। একজন শিক্ষক 'My Familiar' কবিতার অনুবাদ ও আর একজন 'B. T. র মৃদুপদ' নামে একটি সংস্কৃত-বাংলা খিচুড়ী কবিতা পাঠ করলেন। দুটিই স্বরচিত, অনাবিল হাস্তরসের মধ্যে শিক্ষক-জীবনের বাধা লুকায়িত। তবু তাঁরা পরিচয় দিলেন, এগনো হাসতে জানেন শিক্ষক সমাজ, এগনো সাহিত্য-সংস্কৃতির পালিশ আছে তাঁদের মধ্যে। পরিশেষে সভাপতি তাঁর উদাত্ত কণ্ঠে সংস্কৃতির সংকট সম্বন্ধে ভাষণ দিয়ে ভারতের লুপ্ত গৌরব ফিরিয়ে আনার জন্তে দেশমাতৃকাকে যে ভাব ও ভাষায় আহ্বান করলেন, তা বহুকাল মনে থাকিবে।

অপরূহ জলযোগ সারা হল। 'সন্ধ্যা সাঁচায় সংগীত ও বিচিত্রাশুভান। বিষ্ণুপুরী সংগীতের ঐতিহ্য আছে। ধার্যটি প্রাচীনপন্থী হলেও তার মধ্যে বনেদীয়ারনা ও ঘরোয়ানার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে। বাতেপাণ্ডু সংগীতগোষ্ঠী শ্রীগোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে ট্রেসারে করে নিয়ে আসা হল। মঞ্চের ওপর জলতরঙ্গ, তবলা, পাখোয়াজ, হারমোনিয়াম, এসজা, সেতার, তানপুরা প্রভৃতির সমাবেশ। অশ্রুত গোপেশ্বরবাবু চেয়ারে বসেই ধ্রুপদ আরম্ভ করলেন, এগনো স্থলিত গুরুগম্ভীর কণ্ঠস্বর, আওয়াজটি উদাত্ত, হয় চিড়ু খায় নি, রাগগুচ্ছ সংগীতের মুচ্ছনায় সমস্ত হৃদয়টি গমগম করতে লাগল, বিশেষ করে তাঁর হৃদয় রূপের বন্দোজটি ভালো লাগল। বিভিন্ন শিল্পীর কণ্ঠ ও যন্ত্রসংগীতে বেহাগ, ভীমপল্লবী, আড়ানা, মালকোব, কাকি-সিন্ধু প্রভৃতি সমরোপযোগী রাগের পরিবেশন মধুর হয়েছিল শিল্পীদের মধ্যে। শ্রীহরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও রমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম উল্লেখযোগ্য।

...১৬ই রবিবার সকাল ৮টার মূল সম্মেলনের উদ্বোধন। শ্রামাশ্রমদাবুর আগের দিনের কার্যসূচী ছিল বাঁকুড়া শহরে। স্তরায় আমাদের উদ্বোধন রবিবারেই করতে হয়। রূপকথা চিত্রগৃহ লোকে লোকারণ্য। সমস্ত প্রতীক্ষা সমস্ত উৎকর্ষার নিরসন করে এলেন শ্রামাশ্রমদা—সঙ্গে সাংবাদিক মাখনগাল সেন, যেক্সর পি, বর্দন ও অধ্যাপক রাধাকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়। সিনেমা-মঞ্চ বিশিষ্ট অভিভূতের পদার্পণে ধস্ত হল। উদ্বোধন সংগীতের পর দেবপ্রসাদ সভাপতির আসন গ্রহণ করলেন। তারপর বিপুল জয়ধ্বনির মধ্যে শ্রামাশ্রমদা উঠলেন উদ্বোধনী বক্তৃতা করতে। উদাত্ত কণ্ঠে তেজোদগ্ধ ভাষায় প্রায় পয়তাল্লিশ মিনিট বক্তৃতা দিলেন শ্রামাশ্রমদা। বাংলা ও বাঙালীর দুর্দিন, দেশের শিক্ষা-সমস্যা, বাস্তবহারী শিক্ষক ও ছাত্রের সমস্যা তথা অর্থসংকট এবং সব কিছুই সংগেই ওতপ্রোত রাজনীতিক গলদ সম্বন্ধে স্পষ্ট নির্ভীক দার্শনিক মতবাদ প্রকাশ করলেন। সবশেষে তিনি বললেন, শিক্ষা ও শিক্ষকের এই দুর্ভোগের দিনে সর্বপ্রথমে প্রয়োজন ঐক্যবদ্ধতার। কিন্তু তিনি জানেন, শিক্ষক-সমাজের

অভ্যন্তরীণ ঐক্যের মধ্যেও ফাটল দেখা দিয়েছে। যদি প্রয়োজন হয়, তাহলে তিনি তাঁর বখাসাধ্য সাহায্য ও মধ্যস্থতা করতে রাজী আছেন। বিপুল উল্লাসধ্বনি ও করতালি হ'ল। সকলের মন থেকেই যেন একটা বোঝা নেমে গেল। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ও মূল সভাপতির সারগর্ভ অভিবাদন এবং সম্পাদকীয় কার্যবিবরণী পাঠের পর অধিবেশন শেষ হ'ল।

আহারের পর ভিন্নমতবাদী নেতৃবর্গ রামনলিনীবাবুর বাড়িতে সমবেত হলেন। শ্রামাশ্রমদা ও দেবপ্রসাদ আমাদের মনের বত ক্রন্দ বত শ্রানি দূর করে দিলেন। ফিরে এলাম স্তম্ভ চিত্তে। চারদিকে যেন আনন্দের বান বইতে লাগল। সে এক মহামিলনের পবিত্র ক্ষণ! তিনটির সময় বিষয়-নির্বাচনী সভা আরম্ভ হল। চেংলার প্রধান শিক্ষক শৈলেনবাবু প্রস্তাব উত্থাপন করতে লাগলেন, আর হরিদাস গোস্বামী, মনোরঞ্জনবাবু, বীরেনবাবু প্রভৃতি সমর্থন করতে লাগলেন। সমস্ত প্রস্তাব নির্বিশেষে পাশ হয়ে গেল। তাঁর মধ্যে সমিতির কার্যক্ষেত্র পশ্চিমবঙ্গে সীমাবদ্ধ করা, বাস্তবহারী শিক্ষক-শিক্ষিকাদের নির্বাচন ও কলোনী, আগামী রাষ্ট্রীয় নির্বাচনে শিক্ষক-সমাজের অংশগ্রহণ উল্লেখযোগ্য। সন্ধ্যার পর কার্যনির্বাহক সভাপতি ও তিনজন সহ-সভাপতি নির্বাচনের পর সম্মেলন-পর্ব শেষ হ'ল। নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সমিতির ইতিহাসে এমন একটি হৃদয়স্থল স্বাব্যবহাঙ্গুর্ণ সম্মেলন স্মরণীয় হয়ে রইল। দেখলাম মূল সভাপতির সুযোগ্য পরিচালনা, দেখলাম স্থানীয় কর্মকর্তা এবং শিক্ষক-ছাত্র বেচ্ছাসেবকদের উত্তম ও স্থানীয় জনসাধারণের সহযোগিতা। কিন্তু মনের কোণে রেদনা রয়ে গেল একটু। এই ধরনের বিরাট সম্মেলনে যা হয়, দূরকে ও পরকে নিকট বন্ধ করে নেবার সুযোগ মিলল না, প্রত্যেকের সংগে ব্যক্তিগত আলাপ-পরিচয়ের সামাজিক দিকটা অপূর্ণই হয়ে গেল।

পরদিন সকালে বিষ্ণুপুরের মাটি ও মাহুঘের কাছ থেকে বিদায় নিলাম।

ফিরবার পথের একটু বিবরণ না দিলে এ প্রবন্ধ অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। প্রত্যেক কামরায় শিক্ষক-শিক্ষিকার সমাবেশ, এ যেন শিক্ষকের ট্রেন! খড়গপুরে চা খেতে নেমেছি, এমন সময় একটি কামরায় ধরে নিয়ে গেল। অল্প কামরা থেকে আরও দু'চারজনকে সংগ্রহ করে আনা হ'ল। গিয়ে দেখি, পাঁচজন শিক্ষিকারী ও ৮১০ জন শিক্ষক আগে থেকেই সেখানে আসার জমিয়েছেন। হেমবাবু ও বীরেনবাবুর মত ভার্যিকি প্রধান শিক্ষকও শিশুর মত সরল ও আনন্দ-চঞ্চল হয়ে উঠেছেন। কবি-গান হস্ত-কৌতুক আবৃত্তি, সংগীত চলতে লাগল, কোন কুঠী, কোন জড়তা নেই। উপস্থিত প্রত্যেককে কিছু-না-কিছু অংশ গ্রহণ করতে হবেই। মনোরঞ্জনবাবু পরবর্তী ট্রেনে নেমে অল্প কামরায় চলে গেলেন। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হ'ল ঢাকার দুটি অবিবাহিতা তরুণী শিক্ষিকারী 'কনে দেখা' হাস্তরস পরিবেশন। একজন কনে'র অংশ, আর একজন বরপক্ষের অংশ গ্রহণ করলেন। কনে'র অংশটিই প্রধান। বিশেষ অভ্যন্ত না হলে এমন অনাবিল উচ্ছাংগের হাস্তরস বিতরণ করা সম্ভব নয়। বহুকালের মধ্যে এত হাসি আর হাসি নি।

# বিশ্বের বিখ্যাত পত্রাবলী

অধ্যাপক শ্রীমাখনলাল রায়চৌধুরী শাস্ত্রী

আওরঙ্গজেবের পত্র

পত্রাহ্বাদ :—

পত্র পরিচয় :—

মৌলানা সালেহ্,

১৬৬৪ সাল; আওরঙ্গজেব দিল্লীর সিংহাসনে। দারার ছিন্নমুণ্ড মাতা তাজবিবির সমাধি পার্শ্বে প্রোথিত করা হয়েছে। মুরাদকে গোয়ালিয়র দুর্গে মিথ্যা হত্যার অপরাধে হত্যা করা হয়েছে। সুজা আরা কানের জংগলে নিরুদ্দেশ অথবা মৃত। ভ্রাতুষ্পুত্রদের “পপীয়া” (আফিওএর) বিষপান করান হয়েছে—কেহ বা মৃত, কেহ বা উদ্ভাদ—অর্ধপঙ্গু পিতা আগ্রার দুর্গে বন্দী। দিল্লীর সিংহাসন নিকটক। পৃথিবীর বিভিন্ন মুসলিম রাজ্য থেকে স্বীকৃতি ও অভিনন্দন জ্ঞাপনের জ্ঞাত রাজদূত এসেছেন। দিল্লীর উৎসব শেষ হয়ে গেছে। ইরানের রাজদূত কাবুলের পথে ইস্পাহান প্রত্যাবর্তন করেছেন। সেই সময় আওরঙ্গজেবের শৈশব-শিক্ষক মোল্লা সালেহ্‌র সঙ্গে ইরান রাজদূতের সাক্ষাৎ হল।

মোল্লা সালেহ্‌কে শাহজাহান পুরস্কার স্বরূপ কাবুলের প্রান্তদেশে কিছু জায়গীর দিয়েছিলেন। বৃদ্ধ মোল্লা সুদূর পথ অতিক্রম করে দিল্লীতে উপস্থিত; তাঁর ছাত্র রাজ-সিংহাসনে—মোল্লার উদ্দেশ্য রাজদরবারে ওমরাহপদ লাভ। আওরঙ্গজেব তাঁর পুরাতন ওস্তাদকে জানুতেন। তিনমাস পর্যন্ত সত্ৰাট আওরঙ্গজেব মোল্লা সালেহ্‌কে সাক্ষাতের অহুমতি দেন নি। তিনি দরবারের বহু ওমরাহকে দিয়ে সংবাদ দিলেন—মোল্লা সালেহ্‌ সত্ৰাটের শৈশবের শিক্ষক, সত্ৰাটের দর্শনপ্রার্থী। প্রিয় সত্ৰাট-ভগ্নী রোশন-আরার নিকট ব্যক্ত করলেন নিজের উদ্দেশ্য। আওরঙ্গজেব বিরক্ত। আওরঙ্গজেব তখন মোল্লার নিকট লিখলেন এই অপরূপ পত্র।

এই পত্র ফরাসী পর্যটক বার্নিয়ের তাঁর ভ্রমণ কাহিনীতে লিপিবদ্ধ করেছেন।

আপনি আমার দরবারে ওমরাহের পদ আকাঙ্ক্ষা করেছেন; আপনি কি সূহৃদ মনে এই কথা বিশ্বাস কর্তে পারেন যে আপনাকে আমি এই ওমরাহের পদে প্রতিষ্ঠিত করে পুরস্কৃত কর্তে পারি? আপনি আমার জন্তে কি করেছেন? আমাকে কি শিক্ষা দিয়েছেন? আপনি যদি আমাকে রাজপুত্রের উপযোগী শিক্ষা দিতেন, তবে—আপনাকে ওমরাহের পদে বরণ করে আমি কৃতার্থ হতাম। আমি বিশ্বাস করি যে শিশু যদি তার শিক্ষক দ্বারা শৈশবে সুশিক্ষিত হয় তবে ভবিষ্যতে তার পিতা আর শিক্ষকের মধ্যে সে কোন পার্থক্য বিচার করে না।

চিন্তা করে দেখুন ত’ আপনি আমাকে কি শিক্ষা দিয়েছেন? আপনি বলেছেন যে ফিরিজীস্তান (ইউরোপ) অত্যন্ত হীনস্তরের দেশ। সেখানে সর্বশ্রেষ্ঠ রাজা পৃথুগলের সেই ক্ষুদ্র দ্বীপাধিপ, তারপর ওলন্দাজরাজ—তাঁদের সঙ্ঘে আপনি কি বলেছেন? ফরাসী ও স্পেনের রাজার সঙ্ঘে বলেছেন—তারা হিন্দুস্তানের এক একটা সামন্ত রাজার মতন। আর বলেছেন যে হিন্দুস্তানের সত্ৰাট বিশ্ববিজয়ী, পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ, সর্বোত্তম নরপতি, সর্বশেষে বলেছেন যে হিন্দুস্তানের সত্ৰাটের নামে ইরান, উজবেগ, কাসগর, তুরাণ, পেগু (ব্রহ্মদেশ), চীন, মহাচীন রাজ্য আতঙ্কিত হয়ে উঠে। আপনার ভূগোলের সঙ্গে পরিচয় ছিল কি? আমাকে এই রাজ্যগুলির সঙ্ঘে নিভুল সংবাদ দেওয়া আপনার কর্তব্য ছিল—তাঁদের সামরিক শক্তি, যুদ্ধ বিদ্যা, তাঁদের ধর্ম, নীতি, সংস্কার, রাষ্ট্র-ব্যবস্থা জানলে আপনার ছাত্রের অনেক উপকার হত। এই রাজ্যগুলির নিভুল ইতিহাস, উত্থান-পতনের কাহিনী আপনার রাজকুমার ছাত্রের অবহিত হওয়ার প্রয়োজন ছিল। কোন সাম্রাজ্য কেন, কবে, কি ভুল করেছিল, কি

বিপর্যয়ের মধ্য দিয়ে, কি বিপ্লবের সন্মুখীন হয়েছিল তা' যে রাজপুত্রের অবস্থা জ্ঞাতব্য।

আমার বিশ্ববিশ্রুত পূর্বপুরুষগণ এই বিরাট হিন্দুস্তান জয় করেছিলেন, আপনি কি তাঁদের জীবন কাহিনী, তাঁদের রাজ্যজয়ের নীতি আমাকে শিক্ষা দিয়েছিলেন ?

আপনার শিক্ষার উদ্দেশ্য ছিল আমাকে আরবী অক্ষর, ভাষা, পঠন, লিখন ব্যাপারে নিপুণ করবেন। বাস্তবিক যে ভাষা আয়ত্ত কর্তে প্রায় দশ বৎসর প্রয়োজন হয়, তার জ্ঞান আমার জীবনের কত মূল্যবান সময় নষ্ট করেছেন। আপনার ধারণা ছিল যে মুসলিম শাহজাদার পক্ষে আরবী ব্যাকরণ শিক্ষা করা বা মুসলিম আইন পাঠ করাই জীবনের চরম চরিতার্থতা; অথচ সেই রাজপুত্রের পক্ষে তাঁর প্রতিবেশীর ভাষা শিক্ষার পরম প্রয়োজন আপনার ধারণার বর্হীভূত ছিল, এই সুদীর্ঘ দশ বৎসরের মধ্যে আপনার ছাত্র কত মূল্যবান গ্রন্থ অধ্যয়ন কর্তে পারতো—তা জ্ঞানেন ? একটি দানবের প্ররোচনায় এই গুরু, নীরস, সময়-সাপেক্ষ বিরক্তিকর কাজে আমাকে নিয়োজিত করেছিলেন।

আপনি শিশু মনের সঙ্গে পরিচিত নন। যৌবনে, বার্ককে মানুষ শৈশবের স্মৃতি স্থিতি বহন ক'রে কৃতার্থ হয়। শৈশবে যে উপদেশ ও শিক্ষার বীজ শিশুর মনে বপন করা হয়, তা পরবর্তীকালে তার মনকে বৃহৎ কাজের উপযুক্ত করে দেয়।

আমাদের ধর্মশাস্ত্র, সমাজ-বিজ্ঞান কি আমাদের মাতৃভাষায় শেখা সম্ভব নয় (১) ? আরবী ভাষার মধ্য দিয়েই যে শিখতে হবে তার কি সার্থকতা আছে ? মোলানা সালেহ্, আপনি আমার পিতা সম্রাট শাহজাহানকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে আপনি আমাকে দর্শন শিক্ষা দিবেন। আমার বেশ মনে পড়ে আপনি বহু বৎসর আমার সঙ্গে অন্তঃসারহীন তথ্য আলোচনা করেছেন—সে সব তথ্য মানব সমাজের কোন প্রয়োজন সাধন করে না, মানবচিন্তের তৃপ্তি সাধন করে না ; সেগুলি শুধু কল্পনা, চিন্তার বিলাস। সেই তথ্যগুলির মধ্যে একটা বস্তুর সন্ধান পেয়েছি—দর্শনের শব্দগুলি অতিশয় কষ্টবোধ্য কিন্তু অতি সহজেই বিস্মরণীয়। আপনার আলোচনার রেশ এখনো আমার মনে পড়ে এবং আমি মনে মনে

আপনাকে কল্পনা করি। তবে সেই গুরুগম্ভীর আলোচনার মধ্যে আমার মনে আছে কতকগুলি ভীষণ-শ্রবণ শব্দ—সেইগুলি মানুষকে বিভ্রান্ত করে, সন্দ্বিগ্ন করে, মানুষের চিন্তাকে পরিভ্রান্ত করে ; কিন্তু আপনার মত পাণ্ডিত্যভিমাত্রীদের অহংকারকে প্রশস্ত করে। এই বিকট ও দ্ব্যর্থবোধক শব্দাডম্বরের অন্তরালে বিশ্বের সমস্ত রহস্য আবৃত রয়েছে ভেবে আপনারা আত্ম-প্রসাদ লাভ করেন এবং আপনারা সেই শব্দগুলির অর্থ-সম্পদের অধিকারী ব'লে মানুষের নিকট প্রশংসার দাবী করেন।

আলেকজান্ডার যেমন তাঁর শিক্ষক এরিস্টটলের নিকট কৃতজ্ঞ ছিলেন তেমনি আমি আপনার নিকট কৃতজ্ঞ থাকতাম যদি আপনি আমাকে যথার্থ দর্শনের শিক্ষার দ্বারা অহুপ্রাণিত কর্তেন, যদি আপনার দর্শন আমার মনকে যুক্তিবাদী করে তুলত ; যদি সংস্কারবিহীন যুক্তি আমার চিন্তাকে বিভ্রান্ত না করত, তবে সে শিক্ষা আমার চিন্তকে ভাগ্য বিপর্যয়ে বিক্ষুব্ধ করত না ; সর্বকালে সর্ব অবস্থায় আমার মনের সমতা রক্ষা করত, সুখে আমাকে বিগতস্মৃহ করত, দুঃখে আমাকে অহুদ্বিগ্নমনা করত। আপনি আমাকে আমার আত্মদর্শনের শিক্ষা দিতে পারতেন, বস্তুর মূল সত্যের সন্ধান বলে দিতে পারতেন ; এই বিরাট বিশ্বের অসীমতা এবং তার মধ্যে যে নিয়ম শৃঙ্খলা ও অন্তর্নিহিত ঐক্য রয়েছে তা'ও বলেন নি। এই শিক্ষা যদি আমাকে দিতেন তবে আজ আপনার কোন আকাঙ্ক্ষাই অপূর্ণ থাকত না।

স্বব-স্তুতি ও খোসামোদ না করে যদি আপনার রাজকুমার ছাত্রকে আপনি প্রজার প্রতি রাজার কর্তব্য সম্বন্ধে উপদেশ দিতেন ! আপনি কি কখনো ধারণা করেন নি যে একদিন আমাকে আমার প্রাণ-রক্ষার জ্ঞান এবং সিংহাসনের জ্ঞান ভ্রাতার বিরুদ্ধে অস্ত্র চালনা কর্তে হবে ? আপনি কি আমাকে কখনো কোন দুর্গ অবরোধ কর্তে, অথবা সৈন্তবাহ রচনা কর্তে শিক্ষা দিয়েছেন ? এই সকল শিক্ষার জ্ঞান আমি অস্ত্রের নিকট কৃতজ্ঞ—আপনার নিকট নয়। আমার বাদশাহী লাভের জ্ঞান আমি আপনার নিকট ঋণী নই। আপনি বাদশাহের নিকট কিছু আকাঙ্ক্ষা করবেন না।

আপনি আপনার দেশে প্রত্যাভর্তন করুন। আপনি

কে এবং আপনায় পরিণাম জানবার জন্ত পৃথিবীর কোন মানবের প্রয়োজন নাই।

\* \* \* \*

পত্র পরিণাম :—

এই পত্রখানির মধ্যে আওরঙ্গজেবের মনের একটা নূতন পরিচয় পাওয়া যায়। আওরঙ্গজেবের মনে দুই বিপরীত চিন্তাধারা বয়ে যেত—একটি মুসলিম আওরঙ্গজেব, অন্যটি সম্রাট আওরঙ্গজেব। মুসলমানমাত্রই আরবী ভাষায় নমাজ পড়ে, পৃথিবীতে বহু মুসলমান আছে যাদের ভাষা আরবী নয় এবং যারা আরবী বুঝে না। সহজ-বোধ্য মাতৃভাষায় নমাজ পড়ার বিষয়ে ইমাম আবু হানিফা ও সুবী ওমর ঐখ্যাম ইঙ্গিত করেছিলেন। আওরঙ্গজেবও তাই করেছেন। কিন্তু মোল্লাদের বিরোধিতার ভয়ে সে বিষয়ে হস্তক্ষেপ করেন নি।

দর্শন সম্বন্ধে আওরঙ্গজেবের তীব্র কটাক্ষ বেশ

উপভোগ্য। এটা স্বাভাবিক, কারণ তাঁর রাজ্যে সঙ্গীত নিষিদ্ধ করে দেওয়া হয়েছিলো, স্তূতরাং দিল্লীর বহু সঙ্গীত-বিলাসী সঙ্গীতের মৃত্যু ঘোষণা করল। সঙ্গীতের কল্পিত মৃতদেহকে বহন করে আওরঙ্গজেবের মসজিদের পথ অতিক্রম করে চলল, আওরঙ্গজেব জিজ্ঞাসা করলেন—“আমার সাম্রাজ্যে কে এই বিরাট পুরুষ যার শব যাত্রায় অত লোক সমাগম?” উত্তর পেলেন—“জাঁহাপনা—আপনি সাম্রাজ্যে সঙ্গীত নিষিদ্ধ করেছেন, তাই দেশের লোক সঙ্গীতের মৃত্যু ঘোষণা করে সঙ্গীতকে কবর দিতে চলেছে”। আওরঙ্গজেব গম্ভীরভাবে বললেন—“বলে দেও যে কবর যেন খুব গভীর ভাবে খনন করা হয়।”

আওরঙ্গজেব মাহুষের মূল্য বুঝতেন, প্রয়োজন মত সে মূল্য দিতে কার্পণ্য করতেন না। অল্প দিকে প্রয়োজন হলে নিশ্চয়ই মাহুষের কর্তরোধ করতে পারতেন এবং করেছেন। আওরঙ্গজেবের শিক্ষার দোষ সম্বন্ধে তিনি অচেতন ছিলেন না। মোল্লা সালেহ্-এর পত্র তার অন্ততম প্রমাণ।

## কলিঙ্গ-কুমারী

শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ

১

আজ হইতে চারিশত বৎসর পূর্বের কথা। তখন উড়িষ্যার স্বাধীন নৃপতিরা রাজ্য শাসন করিতেছেন। তাঁহার শিল্পের পৃষ্ঠপোষক। যে রাজবংশ শৈব তীর্থাঙ্গের কীর্তি যখন ভুবনেশ্বরে দ্বিতীয় কালী রচনার চেষ্টায় আত্ম-প্রকাশ করিতেছিল, তখনও উড়িষ্যায় বৈষ্ণব ধর্মমত লুপ্ত হয় নাই এবং কণার্ককেন্দ্রে সূর্যমন্দিরে তাহার প্রভাব-পরিচয় প্রকাশ পাইয়াছিল। কেশরী রাজবংশকে পরাভূত করিয়া গঙ্গাবংশ উড়িষ্যায় প্রাধান্য লাভ করিয়াছিলেন। প্রায় শতবর্ষ পরে সূর্যবংশীয় কপিলেন্দ্রদেব গঙ্গাবংশীয়-দিগকে পরাভূত করিয়া সিংহাসন অধিকার করিয়াছিলেন। তখন রাজধানী সমুদ্রতীরবর্তী পুরীতে স্থানান্তরিত হইয়াছে এবং স্থানটি অগম্যথের মন্দিরের জন্ত শ্রীক্ষেত্র নামে অভিহিত হইয়াছে।

কপিলেন্দ্রদেবের পুত্র পুরুষোত্তমদেব পিতার রাজ্য পাইয়া তাহার বিস্তার-সাধনে মনোযোগী হইয়াছেন। তিনি বীর—যোদ্ধা।

তিনি নিকটবর্তী কয়টি রাজ্য অধিকার করিয়া তখন আর কোন্ রাজ্য অধিকার করিবেন, তাহাই বিবেচনা করিতে-ছিলেন। সেদিন তিনি সেই বিষয়ে পরামর্শের জন্ত বৃদ্ধ মন্ত্রী, তুঙ্গ সেনাপতি প্রভৃতিকে সভায় আহ্বান করিয়াছিলেন।

নির্দিষ্ট সময়ে রাজা মন্দিরে দেব-প্রণাম করিয়া আসিলে সভারম্ভ হইল। সভার প্রথমসূত্রে ঘোষণাস্ত্রে রাজা আসিয়া সিংহাসনে উপবিষ্ট হইলে বৈতালিক স্তম্ভি পাঠ করিল—তাহাতে রাজ্যের বর্ণনা ও রাজ্যের ভিন্ন ভিন্ন অংশে প্রজাবৃন্দের অবস্থা কীর্তিত হইল। রাজা মনোযোগ সহকারে সে বর্ণনা শুনিলেন—কোথায় কি করা প্রয়োজন বিবেচনা করিবেন।

রাজ্যের কার্য শেষ করিয়া রাজা বলিলেন, এখন স্মৃশাসিত রাজ্যে তিনি প্রজাদিগের অবস্থার উন্নতি-সাধনে মনোযোগী হইবেন।

সেনাপতি বিনীতভাবে নিবেদন করিলেন—রাজা প্রথমে যে সকল রাজ্য জয় করিবেন মনে করিয়াছিলেন, সে সকলের মধ্যে কলিঙ্গ বিজয় করা হয় নাই ; তিনি কি কলিঙ্গ-বিজয়ের বাসনা ত্যাগ করিয়াছেন ?

পুরুষোত্তমদেব চিন্তা করিতে লাগিলেন।

পার্শ্বচরদিগের মধ্য হইতে নীলকান্ত দণ্ডায়মান হইয়া কলিঙ্গের সৌন্দর্য ও ঐশ্বর্য বর্ণনা করিয়া উপবিষ্ট হইবার পূর্বে বলিলেন, কলিঙ্গরাজের পুত্র নাই, কস্তা পদ্মাবতীর অসাধারণ দেহ-লাবণ্য-খ্যাতিতে বহু রাজা আকৃষ্ট হইয়াছেন—কিন্তু রাজকস্তার বিমাতা—নিঃসন্তান বিশাখা দেবীর পরামর্শে রাজা কোন সম্বন্ধই তাঁহার বংশমর্যাদার উপযুক্ত মনে করিতেছেন না।

মন্ত্রী শুনিয়া বলিলেন, ব্রাহ্মণের গৌরব যেমন শাস্ত্রজ্ঞানে রাজার গৌরব তেমনই বীরত্বে—যে বংশে তিনি জন্মগ্রহণ করেন, তাহার জন্ত নহে।

রাজা কি ভাবিতেছিলেন।

সভাস্থ একজন বলিলেন, মহারাজা যদি কলিঙ্গ বিজয় করেন, তবে কলিঙ্গরাজের বংশ-মর্যাদাগর্ব কোথায় থাকিবে ?

নীলকান্ত বলিলেন, কলিঙ্গরাজ যদি মহারাজা পুরুষোত্তমদেবকে কস্তাদান করেন, তবে যেমন যোগ্য জামাতা লাভ করেন—তেমনই মহারাজারও বিনারক্তপাতে কলিঙ্গ বিজয় হয়। সেনাপতি ত এখনই মহারাজাকে কলিঙ্গ-বিজয়ের কথা বলিতেছিলেন।

তিনি এ বিষয়ে মন্ত্রীর মত জানিতে চাহিলেন। মন্ত্রী বলিলেন, বিষয়টি বিবেচনা করিয়া দেখা প্রয়োজন। কস্তা চাহিলে কলিঙ্গরাজ যদি সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন, তবে যুদ্ধ অনিবার্য হইবে ; কারণ সে প্রত্যাখ্যান অপমানই হইবে। স্মরণ্য যুদ্ধের আয়োজন সম্পূর্ণ করিয়া তবে সে প্রস্তাব করা সম্ভব।

সেনাপতি নিবেদন করিলেন, প্রস্তাব করা হউক বা না হউক—উড়িষ্যার সেনাবল সর্বদাই কলিঙ্গ বিজয় করিতে সমর্থ।

সেনাপতি রাজার দিকে চাহিলেন—রাজা তখনও কি ভাবিতেছিলেন।

সভার কার্য শেষ হইলে সভাভঙ্গের পূর্বে দশাবতার-বন্দনা গান রীতি। গায়িকারা ও বাদকরা পার্শ্ববর্তী কক্ষে প্রস্তুত ছিল ; আহুত হইয়া সভাগৃহে নির্দিষ্ট স্থানে আসিয়া জয়দেবকৃত মধুর গান গাহিল—

“প্রলয়পয়ধিজলে ধৃতবানসি বেদং

বিহিতবহিষ্চারিত্রমথৈদম্ ;

কেশব ধৃত মীনশরীর

জয় জগদীশ হরে ॥”...

ইত্যাদি

সঙ্গীতান্তে সভাভঙ্গ হইল।

২

কলিঙ্গের রাজ-সভায় সংবাদবাহী সংবাদ দিল, উৎকল হইতে রাজদূত আসিয়াছেন। তিনি পূর্বদিন সন্ধ্যায় উপনীত হইলে রাজ্যের প্রথাগুণারে তাঁহাকে সসন্মানে অতিথিশালায় লইয়া যাওয়া হইয়াছিল ; তিনি এখন সাক্ষাৎপ্রার্থী।

কলিঙ্গরাজ তাঁহাকে আনিতে বলিলে নালকান্ত সভাগৃহে প্রবেশ করিয়া রাজাকে প্রজ্ঞা নিবেদন করিয়া বলিলেন, তিনি যে কার্যের জন্ত প্রেরিত হইয়াছেন, তাহা প্রকাশ্য রাজসভায় প্রকাশ করা তাঁহার অভিপ্রেত নহে।

রাজা তাঁহাকে উপবিষ্ট হইতে বলিয়া রাজ্যের কার্য শেষ করিয়া সভাভঙ্গ ঘোষণা করিয়া কক্ষান্তরে গমন করিয়া উৎকল-রাজের দূতকে তথায় আহ্বান করিলেন। মন্ত্রী ও তাঁহার সহকারী পূর্বেই তথায় আহুত হইয়াছিলেন।

তথায় উপস্থিত হইয়া নীলকান্ত বলিলেন, অদ্যে, বঙ্গ, কলিঙ্গ, সৌরাষ্ট্র, মগধে উৎকল-রাজ পুরুষোত্তমদেবের নাম অবগত নহেন, এমন কেহই নাই। তাঁহার কীর্তিকিরণে উৎকল উদয়াস্ত-ভাস্কর-করসমুজ্জল গিরিশৃঙ্গের মত আলোকিত। তাঁহার রাজত্ব তালীবনশ্রাম উড়িয়ার সমুদ্রকূল হইতে দিকে দিকে প্রসারিত। তাঁহার বাহুবলে বহু রাজা তাঁহার চক্রবর্ত্ত স্বীকার করিয়াছেন। তিনি কলিঙ্গরাজ্য আক্রমণ না করিয়া রাজার সহিত সম্প্রীতিকামী—উৎকল রাজ্যের সহিত কলিঙ্গ রাজ্যের ঐতিবন্ধন বাহাতে

কখন ছিন্ন না হয়, সেই জন্ত তিনি কলিঙ্গরাজ-কস্তার পাণি সাদরে গ্রহণের প্রস্তাব প্রেরণ করিয়াছেন।

কলিঙ্গরাজ কোন উত্তর প্রদানের পূর্বেই মন্ত্রী বলিলেন, “সাদু! নীলাচলবাসী মহারাজা পুরুষোত্তমদেব তাঁহার রাজ্যে ‘চলন্তীবিষ্ণু’ বলিয়া সম্পূজিত। তিনি তাঁহার পিতার রাজ্য বিজৃত করিয়াছেন। তাঁহার কীর্তিকথা কলিঙ্গে অবিস্মৃত নাই। তাঁহার প্রেরিত প্রস্তাব যে শ্রদ্ধাসহকারে বিবেচ্য তাহাতে সন্দেহ নাই। কলিঙ্গরাজ যে তাহাই করিবেন, দূতকে তাহা বলা বাহুল্য।”

তিনি তাঁহার প্রভুর আদেশের অপেক্ষা না রাখিয়াই যে এইরূপ মত প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহা সাধারণ রীতিবিরুদ্ধ। সেই জন্ত তিনি কথা শেষ করিয়া রাজার দিকে চাহিলেন।

রাজা তখন দোলাচলচ্চিত। তিনি মন্ত্রীর উক্তির যথার্থ্য বর্ণে বর্ণে অশুভব করিতেছিলেন—কিন্তু মন্ত্রীর মতে মত প্রকাশ করিতে পারিতেছিলেন না।

প্রভুকে নির্বাক দেখিয়া মন্ত্রীর মন অগ্রসর হইল।

নিমন্ত্রণ গৃহের স্তরুতা যেন পীড়াদায়ক হইয়া উঠিতেছিল। এই সময় কলিঙ্গরাজ বলিলেন, “মন্ত্রী যথার্থ-ই বলিয়াছেন, এই প্রস্তাব শ্রদ্ধাসহকারে বিবেচ্য। উৎকল-রাজদূত রাজ্যের সম্মানিত অতিথিরূপে আজ আতিথ্য স্বীকার করুন—কস্তার বিবাহ সম্বন্ধে নানা বিষয় বিচার করিতে হয়; আগামী কল্য আমি তাঁহার প্রস্তাবের উত্তর দিব।”

কলিঙ্গরাজ কক্ষের পশ্চাতের দ্বারের আবরণবস্ত্র সরাইয়া চলিয়া যাইলেন। এদিকে মন্ত্রীর আস্থানে উপনীত এক জন রাজকর্মচারী আসিয়া উৎকলরাজদূতকে সম্মানে লইয়া যাইলেন।

মন্ত্রীর অগ্রসরভাবে লক্ষ্য করিয়া তাঁহার সহকারী তাঁহাকে বলিলেন, তিনি রাজা কিছু বলিবার পূর্বেই যে প্রস্তাব সম্বন্ধে মত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে তিনি বিস্মিত হইয়াছেন।

মন্ত্রী বলিলেন, “তাহাতেও কোন সন্দিগ্ধতা হইল না; আমার মত জানিয়াও রাজা সন্মতি দিতে পারিলেন না।”

“আপনি এ কথা কেন বলিতেছেন?”

“যে পট্টমহারাজী রাজ্যের লক্ষ্য ছিলেন—তিনি ঐ কস্তাকে রাখিয়া প্রজাদিগকেও মাতৃহীন করিয়া গিয়াছেন।

তদবধি আমি কেবল অমঙ্গলের আশঙ্কাই করিতেছি। বর্তমান মহারাজী রাজ্যের উপর প্রস্তাব বিস্তার করিয়া ক্রমে সব ক্ষমতা হস্তগত করিতেই ব্যস্ত। পাছে রাজকস্তার বিবাহ সুপাত্রের সঙ্গে হইলে জামাতা ক্ষমতা লাভ করে, সেই ভয়ে তিনি সকল বিবাহ-প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করাইতেছেন। আর বৃদ্ধ পুরোহিতের পুত্র তাঁহার হস্তে খেলিবার পুতুল মাত্র হইয়াছেন।”

“মহারাজীর অভিপ্রায় কি?”

“তিনি বুদ্ধিবিবেচনায় খর্ব্ব কাহারও সহিত রাজকস্তার বিবাহ দিয়া আপনি প্রভূত্ব করিতে চাহেন। কিন্তু মাতৃহীন পদ্মাবতীকে আমরা কত স্নেহেই পালন করিয়া আসিয়াছি!”

মন্ত্রী দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিলেন।

সহকারী বলিলেন, “তবে কি সেই জন্তই মহারাজী তাঁহার অমায়ুষ্য ভ্রাতৃপুত্রকে—”

“যে কথা মনে আছে, তাহা মুখে প্রকাশ করিও না; জানিও—হস্তের তীর আর মুখের কথা বাহির হইলে আর ফিরান যায় না; মহারাজীর বুদ্ধি অসাধারণ—তাঁহার চর সর্বত্র আছে—কোন কথা কিরূপে কখন হয়ত বা অতিরঞ্জিত হইয়া তাঁহার কর্ণগোচর হয়, তাহা কেহ বলিতে পারে না।”

৩

কলিঙ্গের মহারাজা অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। তিনি বিশ্রাম-কক্ষে উপনীত হইতে না হইতে পট্টমহারাজী আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং অত্যন্ত ব্যস্তভাবে তাঁহার কুশল প্রশ্ন করিলেন।

রাজা বলিলেন, “মহারাজী, আজ সূসংবাদ আনিয়াছি।”

মহারাজী হাস্তপ্রকৃত্ত ভাবে বলিলেন, “আপনি কবে সূসংবাদ ব্যতীত অন্য কিছু আনিয়া থাকেন? আপনার শাসনে রাজ্যের প্রজারা যে কত সুখে আছে, তাহা আমি প্রতিদিন লোকমুখে সূসংবাদ পাইয়া অবগত হই। আজ কি নূতন সূসংবাদ, রাজন?”

“উৎকলের রাজা পুরুষোত্তমদেব সংবাদ পাঠাইয়াছেন; তিনি পদ্মাবতীর পাণি প্রার্থনা করেন।”

মহারাজীর মুখ গম্ভীর হইল—যেন অকাল-জলদে মধ্যাহ্ন-রবিকরোজ্জ্বল আকাশ অন্ধকার হইল। তিনি যেন এ



সংবাদ পূর্বে শুনে নাই, এমনই ভাব দেখাইয়া বলিলেন, “এই স্তম্ভসংবাদ! পুরীরাজের কুলশীল-পরিচয় বিবেচনা করিতে হইবে; কারণ, কতকাল যেমন অপাত্রে অর্পণ করা যায় না—কুলগৌরব তেমনই ক্ষুণ্ণ করা যায় না। আমি কলিঙ্গের মহারাজার পত্নী—দেবতা আমাকে সন্তান দেন নাই, কিন্তু আমি পদ্মাবতীকে অপত্যবোধেই পালন করিতেছি, তাহাকে সংপাত্রে সমর্পণ করিয়া নিকটে রাখিতে আমার বাসনা যেমন স্বাভাবিক, যাহাতে তাহার বিবাহে কলিঙ্গরাজ-বংশের কুলগৌরব কোনরূপে ক্ষুণ্ণ না হয় সে দিকে দৃষ্টি রাখা আমার তেমনই কর্তব্য।”

“পুরীরাজের বীরত্ব-খ্যাতি অসাধারণ। তিনি বহু রাজ্য জয় করিয়াছেন, বলিয়া পাঠাইয়াছেন—কলিঙ্গ আক্রমণ না করিয়া কলিঙ্গের সহিত সম্প্রীতি রক্ষা করিতে চাহেন—কলিঙ্গ রাজকন্টার পাণি প্রার্থনা করেন।”

মহারানী যেন সহসা—স্বতাহতিপুঠি অগ্নির মত প্রদীপ্ত হইয়া উঠিলেন; বলিলেন, “তাহার প্রস্তাব চতুরের প্রস্তাব—তিনি বলে কলিঙ্গ আক্রমণ না করিয়া—কৌশলে কলিঙ্গ-রাজ্য অধিকার করিতে চাহিতেছেন—বিবাহ-প্রস্তাব ছল ব্যতীত আর কিছুই নহে।”

মহারাজা যৌন বিষয়ে মহারানীর দিকে চাহিয়া রহিলেন—তিনি যেন রঙ্গমঞ্চে অভিনয় দেখিতেছিলেন।

মহারানী বলিলেন, “পুরীরাজ কলিঙ্গের বল অবগত আছেন; কলিঙ্গ-বিজয় সাধ্যাতীত বুঝিয়া কলিঙ্গরাজ্য লাভ করিবার জন্ত এই কৌশল করিতেছেন। তিনি যদি যুদ্ধ চাহেন—আমাদিগকে যুদ্ধই দিতে হইবে—তাহার প্রস্তাবের মীমাংসা যুদ্ধক্ষেত্রেই হইবে।”

যেন অগ্নিশিখা ঘৃতাভাবে নত হইয়া কেবল আলোক ও তাপ বিকীর্ণ করিতে লাগিল এমনই ভাবে মহারানী বলিলেন, “পুরীরাজকে কতাদান কুলগৌরবসম্মত কি না, সে বিষয়ে সর্বাগ্রে কুলপুরোহিতের মত গ্রহণ প্রয়োজন।”

মহারাজা বলিলেন, “পুরোহিত মহাশয় বৃদ্ধ ও অসুস্থ—চলচ্ছক্তিহীন; তাহার নিকট উপযুক্ত লোক পাঠাইবার ব্যবস্থা করিতেছি।”

তিনি গমনের উত্তোগ করিলে মহারানী বলিলেন, “রাজকাৰ্য্যে আপনি শ্রান্ত—বিশ্রাম ও সেবাগ্রহণ করুন; আগামীকাল সে ব্যবস্থা হইবে।”

“আগামীকালই উৎকল দূতকে উত্তর দিব প্রতিশ্রুতি দিয়াছি।”

“তবে আমি পুরোহিত মহাশয়ের পুত্রকে সংবাদ দিতেছি। তিনি বিদ্বান, বিচক্ষণ এবং পিতার শাস্ত্রজ্ঞানের অধিকারী। তিনি বোধ হয় প্রাসাদেই আছেন—পদ্মাবতীকে প্রফুল্লতাগীন দেখিয়া আপনি সে দিন উৎকল প্রকাশ করিয়াছিলেন। সেইজন্ত আমি তাহার শুভ-কামনায় শাস্তিস্বতায়নের ব্যবস্থা করিয়াছি—সেই উপলক্ষে পুরোহিত-পুত্র আজ তাহা করিতে আসিয়াছেন। পদ্মাবতীই আমাদিগের স্নেহের একমাত্র অবলম্বন।”

রাজার মুখ প্রফুল্লভাব ধারণ করিল।

রাজার মতের অপেক্ষা না রাখিয়াই মহারানী দাসীকে পুরোহিত-পুত্রকে মহারাজের নিকট আসিবার জন্ত আহ্বান জানাইতে বলিলেন এবং দাসীর হস্ত হইতে ময়ূরপুচ্ছের ব্যজন লইয়া স্বয়ং মহারাজকে ব্যজন করিতে লাগিলেন।

কলিঙ্গরাজ জিজ্ঞাসা করিলেন, “পদ্মাবতী কোথায়?”

মহারানী বলিলেন, “আজ তাহার কল্যাণকামনায় শাস্তিস্বতায়নের ব্যবস্থা করিয়াছি; সেই জন্ত তাহাকে দেবতার গৃহে রাখিয়া আসিয়াছি।”

“তাহা হইলে পুরোহিত-পুত্র এখন কিরূপে আসিবেন?”

মহারানী বিব্রত হইলেন, কিন্তু তখনই বলিলেন, “তিনি স্বয়ং কার্য করিতেছেন না—পাছে কোন জট হয়, সেইজন্ত তাঁহাকে তথায় থাকিতে বলিয়া আসিয়াছি।”

অলক্ষণ পরেই দাসী আসিয়া সংবাদ দিল, পুরোহিতপুত্র আসিতেছেন এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গে সূদর্শন তরুণ ব্রাহ্মণ কক্ষে প্রবেশ করিয়া মহারাজার জয়োচ্চারণ করিলেন।

মহারাজা তাঁহাকে প্রণাম জানাইলেন এবং তিনি আশীর্বচন জ্ঞাপন করিলেন।

এদিকে মহারানী ব্যজন রাখিয়া আগন্তকের জন্ত আসন পাতিয়া দিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। তিনি উপবিষ্ট হইয়া মহারাজা কেন তাঁহাকে স্মরণ করিয়াছেন জিজ্ঞাসা করিলে মহারাজা বলিলেন, “পুরী রাজা পুরুষোত্তমদেব পদ্মাবতীর পাণি প্রার্থনা করিয়া দূত প্রেরণ করিয়াছেন। সেই বিষয়ে আমরা আপনার মত জানিতে ইচ্ছা করি—পুরীরাজকে কতাদান আমার বংশের কুলপ্রথা-সম্মত কি না?”

মহারাজী মহারাজাকে ব্যজন করিতে ভুলিয়া বাইয়া কেবল পুরোহিতের উত্তর প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। তাঁহার দৃষ্টিতে যেন বজ্রছোতক দাহিকাশক্তিপূর্ণ বিদ্যুতের দীপ্তি।

পুরোহিত-পুত্র যেন চিন্তামগ্ন হইলেন ; তাঁহার ক্র কুঞ্চিত হইল। তিনি বলিলেন, “রাজন, আমার জ্ঞান সীমাবদ্ধ—কিন্তু শিক্ষারফলে ভাগ্যবতীর অধিগত করিতে পারিয়াছি তাহাকে বলিতে পারি, এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যানযোগ্য। কবির উক্তি ‘স্মীরত্ব ছুলাদপি’, কিন্তু কলিঙ্গরাজবংশ কুলমর্যাদা সম্বন্ধে এতই সতর্ক যে, একাল পর্যন্ত উড়িষ্কারাজ পরিবারের কোন কন্তা কলিঙ্গ রাজ-প্রাসাদে স্থান লাভ করেন নাই। সেই জন্তই লোকপরম্পরায় কথিত আছে, চজ্জ কলঙ্ক আছে, তবুও কলিঙ্গরাজবংশে কোন দোষ নাই। গঙ্গাবংশীয়গণ দার্বকাল উড়িষ্কা শাসন করিয়াছেন ; তাঁহারা বঙ্গদেশ হইতে আনিয়াছিলেন—রাষ্ট্রদেশ তাঁহাদিগের পিতৃভূমি ; তাঁহাদিগের পূর্বপুরুষগণ নদীমাতৃক দেশের অধিবাসী ছিলেন ; তাঁহাদিগের নৌসামান্যতঃ পরতা অসাধারণ ছিল এবং তাঁহারা সাগরপারবর্তী স্থানে যেমন উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন, তেমনই হিমগিরির পরপারেও দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত পাঠাইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহারা মৎস্যভোজী ছিলেন কি না সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ আছে। সেই এক গুণরাশিনাশী দোষে তাঁহাদিগের সহিত কলিঙ্গরাজ পরিবারের কোনরূপ বৈবাহিক সম্বন্ধ সম্ভব হয় নাই। কিন্তু উড়িষ্কার স্বর্ষ্যবংশীয়গণের সহিত বঙ্গাগত সেই গঙ্গাবংশের রক্তের সম্মিলন হইয়াছে—তখনও স্বর্ষ্যবংশীয় রাজগণ সিংহাসন অধিকার করেন নাই। এই অবস্থায় কলিঙ্গের রাজপরিবারের সহিত উড়িষ্কার স্বর্ষ্যবংশীয় রাজার বৈবাহিক সম্বন্ধ কলিঙ্গকুলগৌরবহানিকর হইবে।”

পুরোহিত উক্তি শেষ করিয়া রাজার দিকে চাহিলেন। রাজার মুখে নৈরাশ্র ব্যাপ্ত হইয়াছে। কিন্তু রাজার পশ্চাতে দণ্ডায়মানা মহারাজীর দৃষ্টিতে আনন্দদীপ্তি—উৎকর্ষার পরিচয়ের স্থান অধিকার করিয়াছে। তিনি পুরোহিত-পুত্রের দিকে চাহিয়া প্রশংসা হাসি হাসিলেন এবং আবার রাজাকে ব্যজন করিতে লাগিলেন।

পুরারাজ রাজসভায় আসিলেন। গায়কদল বন্দনা গান করিল—

“রাজন, তব বশ-কৌমুদী ব্যাপ্ত জনসমাজে,  
প্রথর-প্রভাকর-কিরণ গৌরব তব লাজে।

সিদ্ধ তোমার বন্দনা গাহে ;

সঙ্গাগরাধরা শাসন চাহে ;

গগনে গগনে পবনে তোমার জয়-দ্রুমুভি বাজে।

পতাকা তোমার উড়ে গিরিশিখরে ;

জয়ের স্তম্ভ সাগরের তীরে ;

চুষ্ট দমনে শিষ্ট পালনে অনুরাগ তব রাজে।

প্রণতি তোমার দেবতা-চরণে

রত তুমি সদা তাঁহার স্মরণে

লক্ষী তোমায় আশীষ করেন—চিরসুন্দর রাজে।”

গান শেষ হইলে প্রাণী মন্ত্রী দণ্ডায়মান হইয়া নিবেদন করিলেন, কলিঙ্গ হইতে রাজদূত প্রত্যাগমন করিয়াছেন।

রাজা হইতে দৌবারিক পর্যন্ত সকলেই তাঁহার আনিত সংবাদের জন্য উদগ্রীব। কিন্তু মন্ত্রীর মুখ চিন্তায় অন্ধকার।

নীলকান্ত আসিয়া রাজাকে অভিবাदन করিবামাত্র মন্ত্রী বলিলেন তাঁহার নিবেদন—দৌত্যকার্যের সংবাদ রাজাজ্ঞা ব্যতীত প্রচার করা নিষিদ্ধ ; সে সংবাদ প্রথমে মহারাজা, মন্ত্রী ও সেনাপতি শুনিয়া পরে সে সম্বন্ধে কর্তব্য স্থির করিবেন।

সেনাপতি বলিলেন, “নাথু।”

মন্ত্রী যে সেনাপতিরও প্রথমে সংবাদ শুনিবার কথা বলিলেন, তাহাতে এ উহার মুখে চাহিলেন।

মহারাজা পার্শ্ববর্তী মন্ত্রণাকক্ষে গমন করিলেন এবং মন্ত্রী ও সেনাপতি তাঁহার অহসরণ করিলেন। তাঁহারা সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়া দ্বার রুদ্ধ করিলেন। রাজসভায় সকলে উদগ্রীব আগ্রহে তাঁহাদিগের প্রত্যাগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন—অপেক্ষার সময় যেন অতি দীর্ঘ মনে হইতে লাগিল।

মন্ত্রণাক্ষের দ্বার মুক্ত করিয়া পুরুষোত্তমদেব বধন সভাগৃহে প্রবেশ করিবেন, তখন তাঁহার গৌরবর্ণ মুখ

ক্রোধে রক্তাভ, তাঁহার অমূল্যসরকারী মন্ত্রী মুখ অন্ধকার, সেনাপতির মুখ হর্ষপ্রদীপ্ত। রাজা যখন সিংহাসনের পীঠে আরোহণ করিলেন, তখন তাঁহাকে অরুণকিরণোজ্জ্বল গিরিশৃঙ্গের মত দেখাইতে লাগিল। তিনি আসনে উপবিষ্ট না হইয়া দণ্ডায়মান অবস্থায় বোষণা করিলেন—কলিঙ্গরাজ পুরীরাজকে অপমানিত করিয়াছেন; তাঁহার সেই উদ্ধত অবিস্মৃতকারিতার ফল তাঁহাকে ভোগ করিতে হইবে; উৎকল কলিঙ্গের বিরুদ্ধে যুদ্ধ বোষণা করিল—উৎকল বাহিনী কলিঙ্গরাজ্য আক্রমণ করিবে—সমগ্র রাজ্যে বোষণা করা হইবে।

তাহার পরে তিনি ক্রোধকম্পিতকণ্ঠে বলিলেন, “আমি জগবন্ধুর রত্নবেদী স্পর্শ করিয়া প্রতিজ্ঞা করিতে যাইতেছি—”

তাঁহার কথা শেষ না হইতেই মন্ত্রী বলিলেন, “মহারাজ,

ক্রোধ চণ্ডাল—তাঁহার বশবর্তী হইয়া দেবতাকে সাক্ষী রাখিয়া কোন প্রতিজ্ঞা করিতে নাই। তাহাতে—”

কিন্তু রাজা সে কথায় কর্ণপাত না করিয়া তাঁহার উক্তি শেষ করিলেন—“কলিঙ্গরাজ্য জয় করিয়া তাহা উৎকল রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করিব এবং কলিঙ্গ-রাজকন্যাকে বন্দী করিতে পারিলে—তাঁহার পিতার কুলমর্যাদাজনিত ঔদ্ধত্যের প্রতিশোধে তাঁহাকে চণ্ডালে অর্পণ করিব।”

স্তম্ভিত সভার বিস্ময় অপনীত হইবার পূর্বেই রাজা অভ্যন্ত শৈথ্য্য ত্যাগ করিয়া সিংহাসনপীঠ হইতে অবতরণ করিয়া মন্দিরের অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

মন্ত্রীর মুখে বেদনার চিহ্ন সুস্পষ্ট হইয়া উঠিল।

রাজপ্রাসাদের সম্মুখস্থিত বাতমঞ্চ হইতে দামামার বাজে যুদ্ধবোষণার সংবাদ বোঝিত হইল।

( আগামীবারে সমাপ্য )

## কোরিয়া-প্রসঙ্গ

### শ্রী প্রফুল্লরঞ্জন সেনগুপ্ত এম-এ

কোরিয়া আয়তনে প্রায় ব্রিটেনেরই মতো। সেখানে ত্রিশ মিলিয়ন লোকের বসবাস। কোরিয়া উপদ্বীপটি মালুরিয়া ও জাপানের মধ্যে অবস্থিত এবং সামরিক দিক থেকে বিচার করলে এর গুরুত্বও আছে যথেষ্ট। ভারতবর্ষের মতো কোরিয়াও কৃষিপ্রধান দেশ—শতকরা ৯০ জন লোকই কৃষক। এদের জীবনধারণের মানদণ্ড ভারতেরই হৃদ্যাংগু কৃষিজীবীর মতো। শস্ত ও খনিজ সম্পদের জন্ত উত্তর কোরিয়া দক্ষিণ কোরিয়ার কাছে নির্ভরশীল। এদের কতগুলো সামাজিক আচার-ব্যবহারের সঙ্গে ভারতবর্ষের যথেষ্ট ঐক্য আছে। বিয়ের ব্যাপারে ভারতবর্ষের অমূল্যপই না বাপের ইচ্ছানুযায়ী পাত্র-পাত্রীর বিয়ের ব্যবস্থা করা হয়। বিয়ের পূর্বে স্বামী-দর্শন তাদের সৌভাগ্যে ঘটে না। বেরেদের বিয়ের পর একা একা পথ চলার স্বাধীনতা প্রায়ই থাকে না। আত্মীয়বন্ধন পরিবেষ্টিত হ'য়েই তাদের পথ চলতে হয়। কলঘাস যখন আমেরিকা আবিষ্কার করেছিলেন—তারও শতবর্ষ পূর্বে কোরিয়ার ছাপাখানার প্রচলন ছিল। কোরিয়ার জ্যোতির্বিদ পণ্ডিতগণ আকাশে তারার গতিবিধি সম্বন্ধে অবদিত ছিলেন—তাও যিশুখ্রীষ্টের আবির্ভাবের শতবর্ষ পূর্বে। বৌদ্ধ ও চৈনিক সংস্কৃতি দ্বারা কোরিয়ার সংস্কৃতি ও সভ্যতা প্রভাবান্বিত। বর্তমানে অধিকাংশ কোরিয়াবাসী খৃষ্টধর্ম অবলম্বন করেছে।

১৯১০ সালে জাপান কোরিয়া দখল করে। কলে জাপানের শোষণ নীতির অত্যাচার থেকে কোরিয়াও অব্যাহতি পায় নি। বিগত যুদ্ধের সময় নির্বাসিত কোরিয়ানরা চীনে একটি ‘প্রতিসনাল গভর্নমেন্ট’ স্থাপিত করে। ১৯৪৩ সালে কায়রো কনফারেন্সে—ব্রিটেন, চীন এবং আমেরিকা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে জাপান পরাজিত হ'লে—কোরিয়াকে স্বাধীনতা দেওয়া হ'বে। ১৯৪৫ সালে মস্কো কনফারেন্সে ঠিক করা হয় যে কোরিয়া চতুর্শক্তির তত্ত্বাবধানে থাকবে। কিন্তু জাপান পরাজিত হ'লে, রাশিয়া উত্তর কোরিয়ার ভার গ্রহণ করে এবং আমেরিকা দক্ষিণ কোরিয়ার ভার গ্রহণ করে। ৩৮ প্যারালালের উত্তরাংশ রাশিয়ার তত্ত্বাবধানে চলে যায়। যদিও এ ব্যবস্থা সাময়িক ভাবেই গ্রহণ করা হয়েছিল—কিন্তু রাশিয়া ও আমেরিকার মধ্যে একটু বিশেষের ভাব পরিস্ফুট হওয়ায়—এ সাময়িক ব্যবস্থা পাকাপাকি ভাবে আরও সুদৃঢ় হ'য়ে উঠলো। ৩৮ প্যারালাল সম্পূর্ণ কোরিয়া উপদ্বীপটিকে বিভক্ত করে—দু'টি দলে পরিণত করে কোরিয়ানদের মধ্যে একটি বিশেষের ভাব সৃষ্টি করে তুলতে। কিন্তু আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির জন্ত রাশিয়ার অন্তর্ভুক্ত উত্তর কোরিয়ার সঙ্গে আমেরিকার কর্তৃত্বলগত দক্ষিণ কোরিয়ার সংযোগ ও ঐক্য স্থাপনার বিষয় ঘটে।

ইউ, এন্ কমিশনের তত্ত্বাবধানে ১৯৪৭ সালের মে মাসে দক্ষিণ

কোরিয়ার নির্বাচনের কাজ শেষ হয়। এ নির্বাচনের কিছুদিন পূর্বে Pyongyangএ সোভিয়েট রাশিয়ার এচেস্টার 'অল কোরিয়া জয়েন্ট পলিটিক্যাল কনফারেন্স' আহ্বত হয়। এখানে সিদ্ধান্ত করা হয় যে কোনো ক্রমেই দক্ষিণ কোরিয়ার এ নির্বাচন সমগ্র কোরিয়ার জনগণ মেনে নিতে রাজী নয়। পৃথক ভাবে দক্ষিণ কোরিয়ার এ নির্বাচনের এচেস্টা ব্যর্থ করতে হ'বে। সোভিয়েট রাশিয়া প্রচারিত সংবাদে জানা যায় যে এ কনফারেন্সে মোট ৪৪ জন কোরিয়ান উত্তর ও দক্ষিণ কোরিয়া থেকে উপস্থিত ছিলেন। চীনে প্রতিষ্ঠিত কোরিয়ান এন্টিসনাল গভর্নমেন্টের কর্ণার ডাঃ কিম কুও এ কনফারেন্সে উপস্থিত ছিলেন। ১৯৪৯ সালে জুন মাসে ডাঃ কিম কু Seoulএ জনৈক লেকটেন্যান্ট দ্বারা নিহত হ'ন।

নানা গোলযোগের মধ্যেও নির্বাচন বন্ধ রইল না। দু'জন দক্ষিণপন্থী নায়ক ডাঃ সীমান রী ও কিম বিপুল ভোটাদিক্যে জয়লাভ করেন এবং "ডেমোক্রাটিক রিপাবলিক অব কোরিয়া" নামে রাষ্ট্র গঠন করেন। ১৫ই আগস্ট কোরিয়া সাধারণতন্ত্র রাজ্য বলে ঘোষিত হয় এবং কোরিয়ার মার্কিন সামরিক শাসনের অবসান ঘটে।

দক্ষিণ কোরিয়ার নির্বাচনের পূর্বে "কোরিয়ান পিপলস কমিটি" (the interim Communist-controlled Govt. in the Soviet Zone) ইতিমধ্যে সমগ্র কোরিয়ার জন্ত একটি সাধারণ শাসন-তন্ত্র গ্রহণের দাবী জানায়। ১১ই সেপ্টেম্বর Pyongyangএ "ডেমোক্রাটিক পিপলস রিপাবলিক অব কোরিয়া" ঘোষিত হয়। এ নোতুন গভর্নমেন্টও কোরিয়া থেকে আমেরিকান ও সোভিয়েট সৈন্ত-বাহিনীর অপসারণ দাবী করে।

সোভিয়েট রাশিয়া ১৯৪৮ সালের শেষার্ধ্বে তাঁদের সৈন্ত অপসারণ করেন। ১৯৪৯ সালের জুন মাসে কোরিয়া থেকে আমেরিকা তাঁদের সৈন্ত হাট্টিয়ে দেন বটে, কিন্তু দক্ষিণ কোরিয়ান সৈন্তবাহিনীকে উপদেশ দেবার জন্ত কেবল মাত্র ৫০০ শত ইউ, এন্স সামরিক অফিসার রেখে যান।

সোভিয়েট রাশিয়া এবং আমেরিকা তাদের সৈন্ত অপসারণের পালা শেষ করে দেওয়া সত্ত্বেও উত্তর ও দক্ষিণ কোরিয়ার মধ্যে ঐক্যের কোনোই আভাস পাওয়া গেল না। বরং বিভক্ত কোরিয়ার মধ্যে ব্যবধানই গড়ে উঠতে লাগলো। দিন দিনই গৃহযুদ্ধের ইঙ্গিত স্পষ্ট হয়ে উঠতে লাগলো উত্তর ও দক্ষিণ কোরিয়ার মধ্যে। উত্তর কোরিয়া মিঃ কিম ইন্ সেনএর নেতৃত্বে রাশিয়া দ্বারা পরিপুষ্ট হ'য়ে এবং দক্ষিণ কোরিয়া ডাঃ সীমান রীর নেতৃত্বে আমেরিকান দ্বারা পরিপুষ্ট হয়ে, সংঘর্ষের হুচনার সজীব হয়ে উঠলো। মিঃ কিম ইন্ সেন ৩৬ বছর বয়সে নোতুন প্রেরণায় উৎসাহিত হয়ে উত্তর কোরিয়াকে এগিয়ে নিয়ে চলছেন। মিঃ কিম পরিলা যুদ্ধে সিদ্ধান্ত এবং দেশের জনগণের কাছে যথেষ্ট প্রভা অর্জন করেছেন। এমন কি দক্ষিণ কোরিয়ার জনগণও তাঁর শক্তির ও বীরত্বের প্রশংসা করে থাকে। সহসা মুখাকুতি পরিবর্তনের কোণে তিনি হুগু। কিন্তু তাঁর প্রতিদ্বন্দী ডাঃ সীমান রী

৭৮ বছরের বৃদ্ধ। এ বার্কক্যর মধ্যেও তিনি দক্ষিণ কোরিয়ার জনপ্রিয়তা অর্জন করেছেন।

১৯৪৫ সালে জাপানের কবল থেকে মুক্তি পেয়ে কোরিয়ার অবস্থা কি দাঁড়িয়েছে সে সম্বন্ধে "ডেইলি ওয়ার্কার" কাগজে মিঃ কিম স্বয়ং যা' মন্তব্য করেছেন তা নিম্নলিখিত কথাগুলো থেকে সংক্ষেপে বোঝা যাবে।

কোরিয়াকে জাপানী কবল থেকে মুক্ত করার পর ৩৮ প্যারালাল ব্যাপী কোরিয়া দু'ভাগে বিভক্ত হয়। উত্তর কোরিয়ার অধিবাসীরা নিজের দেশকে শক্তিশালী কোরে গড়ে তোলার মনোযোগী হ'লেন। প্রজাতন্ত্র শাসনের স্বব্যবস্থায় তাঁরা শিক্ষা, কৃষি ও ভূ-সংস্কারের দিকে দৃষ্টি দিলেন। কারণ জাপানের অধীনে তাঁদের স্বীয় জাতীয় বৈশিষ্ট্য সবই লোপ পেয়েছিল। তা' ছাড়া দেশ শাসনে জন্ত উপযুক্ত কোরে তোল-বার অভিশ্রমে বড় বড় নেতাদের ভালো কোরে শিক্ষা দিয়ে গড়ে তোলা হ'লো। যাতে কোরে কোরিয়ার জন সাধারণের দুর্দশা না থেকে সেদিকে লক্ষ্য বেগে উত্তর কোরিয়া দেশ গঠনে মনোযোগী হলেন। এমন কি যুদ্ধের পরে শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলিও যথেষ্ট উন্নত হ'য়ে দাঁড়ালো। খাজ-সমস্তা সমাধানের দিক থেকে উত্তর কোরিয়াকে দক্ষিণ কোরিয়ার মুখা-পেক্ষী হ'য়েই থাকতে হ'তো—সেদিক দিয়েও উত্তর কোরিয়া অনেকটা নির্ভরশীল হ'য়ে উঠেছে। মিঃ কিম বলেন "আমরা গভর্নমেন্ট ও কৃষকদের সহযোগিতায় উত্তর কোরিয়ার খাজ-সমস্তা সমাধান করতে পেরেছি।" উত্তর কোরিয়া যে শ্রম শিল্পে, স্কুল, ক্লাব, রিডিং রুম—সবদিক দিয়েই পূর্বের চেয়ে অনেক পরিমাণে এগিয়ে গেছে—সে কথা মিঃ কিম মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেছেন। দক্ষিণ কোরিয়া সম্বন্ধে বলতে গিয়ে তিনি প্রকাশ করেছেন : "Of course the artificial division of the country hampers the development of the economy of Korea, South Korea is steadily falling into decay as a result of being enslaved and plundered by American Capital."

যাই হোক উত্তর ও দক্ষিণ কোরিয়ার মধ্যে ঐক্যবন্ধ হ'বার পরি-কল্পনা ব্যর্থ হ'য়ে দাঁড়ালো। গৃহ যুদ্ধের হুচনা হ'লো উত্তর কোরিয়ার মধ্যে। রাষ্ট্র-সভ্য এ বিবাদ মেটাবার জন্ত তৎপর হ'লেন বটে, কিন্তু সোভিয়েট রাশিয়া ইউ, এন্স কমিশনের সঙ্গে কোনো ঐতিকর সম্পর্ক রাখতে নারাজ হ'লেন। ৩৮ প্যারালাল ব্যাপী উত্তর ও দক্ষিণ কোরিয়ার সংঘর্ষ আরম্ভ হ'লো। ইতিমধ্যে রাশিয়ার সাহায্যে উত্তর কোরিয়া সামরিক শিক্ষায় দ্রুত এগিয়ে গেল। তার ফলে, উত্তর-কোরিয়া দক্ষিণ-কোরিয়াকে আক্রমণ করবার ভয় দেখাতে লাগলো। এদিকে আমেরিকা দক্ষিণ-কোরিয়াকে প্রজাতান্ত্রিক শাসন, আর্থিক উন্নতি ও স্বাবলম্বী হ'বার ব্যাপারে শিক্ষা দানে ব্যাপৃত ছিলেন। দক্ষিণ-কোরিয়াকে রাষ্ট্রনীতি ও সামরিক শিক্ষায় হৃদৃৎ কোরে গড়ে তোলবার দিকে আমেরিকার বিশেষ দৃষ্টি ছিল না। শুধু ১০০,০০০ কোরিয়ানকে সমর বিভাগ্য পারদর্শী কোরে তোলার ব্যবস্থা করা হ'য়েছিল মাত্র। কিন্তু যুদ্ধ করার মত সখল বা সামর্য তাদের ছিল না। আকাশ বাহিনী বা কোনো প্রকার আধুনিক অস্ত্রস্ত্র তাদের আদৌ ছিল না। গৃহ যুদ্ধ বন্ধন একান্ত যুদ্ধে

পরিণত হ'লো আমেরিকা তখন দক্ষিণ কোরিয়াকে সামরিক অস্ত্রশস্ত্র ও সৈন্য শক্তি দিয়ে সাহায্য করতে তৎপর হ'লেন। ২৫-এ-জুন উত্তর কোরিয়ার সৈন্যবাহিনী দক্ষিণ কোরিয়ার প্রবেশ করলো—কোরিয়ার গৃহযুদ্ধ সংগ্রামে পরিণত লাভ করলো।

উত্তর কোরিয়ার সামরিক শক্তি দক্ষিণ কোরিয়া থেকে অনেক উন্নত। উত্তর কোরিয়ার বহু যুদ্ধ পারদর্শী সৈন্তের সমাবেশ হয়েছে। রাশিয়ান ট্যাঙ্ক, নৌবহর, বখার ও আকাশ বাহিনীর সাহায্যে উত্তর কোরিয়ানরা আরও শক্তিশালী হ'য়ে গড়ে উঠেছে। রাষ্ট্রসভ্য উত্তর কোরিয়াকে দক্ষিণ কোরিয়া আক্রমণের অভিযোগে অভিযুক্ত করেছে। রাষ্ট্র সঙ্ঘের এ অভিযোগ সত্ত্বেও উত্তর কোরিয়ার মনোবৃত্তির পরিবর্তন হয়নি। উত্তর কোরিয়া তার অভিযান সমানভাবেই অগ্রসর রেখেছে। মার্কিনী পন্থাতিক সৈন্য ও আকাশ বাহিনী দক্ষিণ কোরিয়ার সাহায্যে অগ্রণী হ'য়েছে। ব্রিটেনের নৌবহরও দক্ষিণ কোরিয়ার সাহায্যে তৎপর হ'য়েছে। দক্ষিণ কোরিয়ার সৈন্য এবং মার্কিনী সৈন্য বাহিনী পাশাপাশি দাঁড়িয়ে উত্তর কোরিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ রত রয়েছে। উত্তর কোরিয়ার সৈন্য সামরিক অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহারে এবং রণকৌশলে বিশেষ পারদর্শী। যুদ্ধ বিজ্ঞায় তারা কি ক'রে এতটা দক্ষতা অর্জন করেছে—তা' একটু বিশ্ময়ের কারণ হ'য়েই দাঁড়িয়েছে। মার্কিনী সৈন্যবাহিনীর মতো সমুখ সমরে উত্তর কোরিয়ার সাহায্যে রাশিয়াকে এখনো পর্যন্ত দেখা যায় নি বটে, কিন্তু উত্তর কোরিয়ার পশ্চাতে শক্তি যোগাবার ব্যবস্থায় যে রাশিয়া লিপ্ত তা' কারো অজ্ঞাত নয়।

কোরিয়ার রাষ্ট্র সঙ্ঘের মধ্যাধি হস্তাশ্পদ হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। গত এপ্রিল মাসে রাষ্ট্র সঙ্ঘ স্থির করেছিলেন যে ৮জন বিশেষজ্ঞ দ্বারা গঠিত একটি দলকে কোরিয়ার যুদ্ধ সম্পর্কে সমস্ত তথ্য সংগ্রহ করতে পাঠানো হ'বে। ভারতবর্ষ, চীন এবং অষ্ট্রেলিয়াকে নিয়ে একটি সাব কমিটিও গঠিত হ'য়েছিল—যা'তে ক'রে বিভক্ত কোরিয়াকে ঐক্যবদ্ধ করার প্রচেষ্টা করা যেতে পারে। কিন্তু এ দ্বারা কোনো সমস্যাই সমাধান হ'লো না। এ কমিটি উত্তর কোরিয়ার সঙ্গে দক্ষিণ কোরিয়াকে একত্রিত করার প্রস্তাব নিয়ে উত্তর কোরিয়াকে অমরোহ জানাবে—এ সিদ্ধান্তই করা হ'য়েছিল। কিন্তু এ প্রস্তাবে দক্ষিণ কোরিয়া কোনো ক্রমেই রাজী হ'লো না—তারা এর বিপক্ষে দাঁড়ালো। কারণ রাষ্ট্রসভ্য কোরিয়ার দক্ষিণ কোরিয়াকেই একমাত্র অমরোহিত গভর্ণমেন্ট বলে স্বীকার করে নিয়ে ছিলেন। এখন উত্তর কোরিয়াকে একোয় বার্মা শোনাতে গেলে—তাদের মধ্যাদাই দেওয়া হ'বে।

রাষ্ট্রসভ্য ও ২৮টি রাষ্ট্র দক্ষিণ কোরিয়ার গভর্ণমেন্টকে স্বীকার করে নিয়েছে। ২১টি রাষ্ট্র দক্ষিণ কোরিয়াকে সাহায্য দানের প্রস্তাব সমর্থন করেছে। ভারতবর্ষ খণ্ডিত কোরিয়ার পক্ষপাতী নয়, তাই দক্ষিণ কোরিয়ার গভর্ণমেন্টকে একমাত্র কোরিয়ার গভর্ণমেন্ট বলে স্বীকার করে নিতে পারে নি। অবশ্য সামরিক পারদর্শী নিয়োগের পক্ষে ভারতবর্ষ ভোট দিয়েছিল, কিন্তু ভারতবর্ষ তার লোক দেওয়া জায়সঙ্গত মনে করেনি। কারণ, এতে রাশিয়ার সঙ্গে ভারতবর্ষের সম্পর্ক কটু হ'য়েই উঠবে—বিশেষ ক'রে যখন ভারতবর্ষ বর্তমানে কোনো—সংগ্রামে লিপ্ত হ'তে চায় না। অবশ্য পরে ভারতবর্ষ কোরিয়া সম্বন্ধে রাষ্ট্রসভ্যের দ্বিতীয় প্রস্তাবটি সমর্থন করেছে। কোরিয়ার ব্যতে শান্তি প্রতিষ্ঠা হয় সে বিষয়ে ভারতবর্ষ বিশেষভাবে চেষ্টা করেছে। ভারতবর্ষের এ প্রচেষ্টা কতটা সার্থক হ'বে বলা কঠিন। রাষ্ট্রসভ্য আজ দক্ষিণ কোরিয়ার সাহায্যে তৎপর হ'য়েছেন। রাষ্ট্রসভ্যের অভিমত পাওয়ার পূর্বেই—আমেরিকা যেচ্ছার দক্ষিণ কোরিয়ার মার্কিনী সৈন্তের সমাবেশ ক'রে যুদ্ধ পরিচালনার অগ্রবর্তী হ'য়েছে। আমেরিকার এ সাহায্য ও দক্ষিণ কোরিয়ার সঙ্গে

সহযোগিতা করাটা হয়তো রাষ্ট্রসভ্যের কাছে গর্হিত হওয়াই উচিত ছিল। কিন্তু সে সম্বন্ধে রাষ্ট্রসভ্য নীরব।

সাম্যবাদী ও ধনতান্ত্রিকত্বের চাপে প'ড়ে কোরিয়ার যে সূচনা হ'লো—তার পরিসমাপ্তি কোথায় কে জানে। যদি উত্তর কোরিয়া এ যুদ্ধ জয়ী হ'য়ে দাঁড়ায় তবে রাষ্ট্রসভ্যের গুচ্ছ কোনো ক্রমেই থাকবে না। রাষ্ট্রসভ্য অসহায় হ'য়ে দাঁড়াবে আর তৃতীয় মহাযুদ্ধের সূচনা ক'রে দেবে। ব্রিটিশ দার্শনিক Bertrand Russel বলেছেন : রাশিয়া যুদ্ধে লিপ্ত হ'বে আর এ তৃতীয় মহাযুদ্ধ ১০ বছর ব্যাপী চলবে। কিন্তু ব্রিটিশ সমরমন্ত্রী Ms. S. Trachey প্রকাশ করেছেন, "The knowledge that the western world will not sit by while the Communists attack Korea will greatly help to prevent the outbreak of a third world war." চার্লিস বলেছেন : "If the Communists won in Korea a third world war would be hurled upon the world." কোরিয়ার সংঘর্ষের কথা উল্লেখ করে "নিউ ইয়র্ক টাইমস্" পত্রিকা বলেছেন—যদি উত্তর কোরিয়া দক্ষিণ কোরিয়ার জয়লাভ করে তবে আমেরিকার ভবিষ্যৎ ও আমেরিকার সম্মান দু'টোই বিপদাপন্ন হ'য়ে দাঁড়াবে। তৃতীয় মহাযুদ্ধের ছায়া যে পৃথিবীর বুকে ঘনীভূত হ'য়ে উঠেছে তারও আভাস যথেষ্ট পরিমাণে দেখা যাচ্ছে। এদিকে, রাশিয়া ও অন্ত্যন্ত কমুনিষ্টরা—Western imperialistsরাই সংগ্রামের আয়োজন ব্যস্ত। শ্রীযুক্ত এম, এন, রায় বলেছেন, "Communism has been gaining popularity. It is not an enemy which can be combatted with arms, particularly when it can also be armed. The loss of Korea will threaten Japan and the entire line of U. S. Pacific Defence. Therefore the battle of Korea is pregnant with the most ominous possibilities. It would be a grim tragedy if the dreaded third world war broke out on the issue of what appears to be the popular case."

আজ পৃথিবীর সমস্ত দেশের দৃষ্টি কোরিয়ার সঙ্গে আবদ্ধ। ই উপদ্বীপটি ঘিরে যে আগুন জ্বলে উঠেছে—তা পৃথিবীর সাম্যবাদী ও ধনতান্ত্রিক দু'টি দলের মধ্যে ভবিষ্যৎ সংঘর্ষের আরও পথ নির্দেশ করে দিল। রাষ্ট্রসভ্য উত্তর কোরিয়ার আক্রমণ প্রতিরোধ করতে আজ বন্ধপরিকর। উত্তর কোরিয়ার সৈন্যবাহিনী দক্ষিণ কোরিয়ার ভেতরে বহুদূর প্রবেশ করেছে। জেনারেল ডগলাস্ ম্যাক আর্থার আমেরিকান ও দক্ষিণ কোরিয়ার সৈন্যবাহিনী পরিচালনার ভার গ্রহণ করেই মৃত্যু রইলেন না। ম্যাক আর্থারকে কোরিয়ার যুদ্ধ পরিচালনা করার জন্ত রাষ্ট্রসভ্যের পক্ষ থেকে জ্যেষ্ঠ কমান্ডারের পদে নিয়োগ করা হ'য়েছে। রাষ্ট্রসভ্যের এ ব্যবস্থায় রাশিয়া বিশেষ ক্ষুব্ধ হয়েছে। তারা এ ব্যবস্থাকে বে-আইনি বলে ঘোষণা করেছে। আমেরিকান ও দক্ষিণ কোরিয়া সৈন্যরা আজ পদে পদে পরাজয় ও গ্রানির ভার বহন ক'রে চলেছে। উত্তর কোরিয়া প্রবল প্রত্যাপে সমস্ত বাঁধা বিঘ্ন উড়ানি হ'য়ে দক্ষিণ কোরিয়া গ্রাস করতে অগ্রসর হয়েছে। রাষ্ট্রসভ্যের সাহায্য আগ্র্য ব্যর্থতায় পর্যাবসিৎ হ'তে চলেছে। দক্ষিণ কোরিয়ার পতনের ইঙ্গিত ক্রমশই যেন স্পষ্ট হ'য়ে উঠেছে। শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন : If the Communists succeed in Korea, the whole of the Asian continent will come under the Red grip which will extend by stages all over the world till Russia comes face to face with America. দক্ষিণ কোরিয়ার পতনের সঙ্গে কমুনিষ্টদের প্রত্যাব যে আরও বিস্তৃত হ'য়ে পড়বে তা' নিঃসন্দেহেই বলা চলে।



## দেশে খাদ্যভাব—

বর্তমানে দেশে যে খাদ্যভাব দেখা দিয়াছে, তাহাকে সরকার পক্ষ বাহাই বলুন না কেন, আমরা দুর্ভিক্ষ ছাড়া আর কিছুই বলিতে পারি না। তাহার কারণ অধিক পরিমাণেই দৈবহর্ষিপাক। গত কয় মাস ধরিয়া নানাস্থানে অতিবৃষ্টি হইয়াছে। দার্জিলিং জেলা বিপন্ন হইয়াছে, ফলে জলপাইগুড়ী জেলাও ভীষণ ক্ষতিগ্রস্ত। মেদিনীপুর, মুর্শিদাবাদ, বর্ধমান, হুগলী, হাওড়া ও বীরভূম জেলার স্থানে স্থানে বজ্রা হওয়ার ফলে বহু খাদ্যশস্য নষ্ট হইয়া গিয়াছে। মাদ্রাজ প্রদেশে গত কয় মাস ধরিয়া কয়েকটি জেলায় দারুণ অন্নভাব দেখা দিয়াছে। বিহার প্রদেশে ও বাংলার সম্মিলিত কয়েকটি জেলায় গত বৎসর ভাল খাদ্যশস্য উৎপন্ন হয় নাই—ফলে কয়েকটি জেলায় গত ৩৪ মাস বাবৎ অন্নভাব চলিতেছে ও সে সকল জেলা হইতে বহুলোক পশ্চিম বাংলায় চলিয়া আসিয়াছে। তাহার পর সম্প্রতি বজ্রার ফলে উত্তর বিহারে কয়টি জেলার শস্য নষ্ট হইয়া গিয়াছে। উত্তর প্রদেশেও ভীষণ বজ্রায় কয়েকটি জেলার শস্য নষ্ট হইয়া গিয়াছে। সর্বোপরি আপামে ভীষণ ভূমিকম্পের ফলে প্রায় সমগ্র আসাম আজ বিপন্ন—১৫ই আগষ্ট ভূমিকম্প আরম্ভ হইলেও ২৮শে আগষ্ট সংবাদ পাওয়া যায় যে হিমালয় পর্বত ধ্বসিয়া ক্রমে সমগ্র সমতল প্রদেশ গ্রাস করিতেছে। ঐ ১৪ দিন প্রত্যহই কয়েকবার করিয়া ভূকম্পন হইয়াছে ও বিভিন্ন দিনে বিভিন্ন সহর, গ্রাম, চা-বাগান, কৃষিক্ষেত্র প্রভৃতি ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে। তথায় দারুণ খাদ্যভাব উপস্থিত—সমগ্র রেলপথ নষ্ট হওয়ার, নদী সরিয়া যাওয়ার এবং পথ ভাঙিয়া যাওয়ার এক স্থান হইতে অল্প স্থানে যাইবার উদ্যম নাই। কোন কোন স্থানে হরত খাদ্যশস্য মজুত আছে, কিন্তু সেই মজুত খাদ্য এক স্থান হইতে অল্প স্থানে প্রেরণ প্রায় অসম্ভব। বিমান যোগে খাদ্যহীন স্থানে খাদ্য প্রেরণ করা হইতেছে—কিন্তু সে ব্যবস্থা আদৌ সন্তোষজনক হইতে পারে না। আমরা পশ্চিম বাংলার সমস্ত লইয়া

এত বিব্রত যে সে কথা চিন্তাই করিতে পারি না। পশ্চিমবঙ্গ সরকার রেশন অঞ্চলে চাউলের বরাদ্দের পরিমাণ কমাইয়া দিয়াছেন—হয়ত চাউল আরও কমাইয়া দিবেন। চাউলের পরিবর্তে গম দেওয়া হইতেছে—অষ্ট্রেলিয়া হইতে সে ক্ষত্র প্রচুর গম আনয়ন করা হইয়াছে। রেশন এলাকার বাহিরে সর্বত্র ৪০।৫০ টাকা মণ দরে চাউল বিক্রীত হইতেছে—এত অধিক দাম দিয়া চাউল ক্রয় করা কাহারও পক্ষে সম্ভব নহে। কাজেই লোক অখাদ্য খাইয়া মরিতে বসিয়াছে। অখাদ্য খাইয়া লোক উদরাময়ে প্রাণত্যাগ করিলে সরকারী কর্তৃপক্ষ তাহা দুর্ভিক্ষজনিত মৃহা বলিয়া স্বীকার করেন না—অথচ—দীর্ঘভাবে চিন্তা করিলে দেখা যায়, সে মৃহার কারণ অন্নভাব ছাড়া আর কিছুই নহে। পশ্চিমবাংলা ছাড়াও আজ ভারতে বহু প্রদেশে অন্নভাব, কাজেই বাহির হইতে চাউল আমদানী হইলেও পশ্চিমবঙ্গ তাহার মাত্র সামান্য অংশ পাইতে পারে। এ অবস্থায় সরকারের পক্ষেও চাউল সরবরাহের ব্যবস্থা করা সম্ভবপর নহে। এই সকল কথা চিন্তা করিয়া আমাদের অনাহারে মৃত্যুবরণ করা ছাড়া গতাত্তর নাই। যে সকল স্থানে গম পাওয়া যাইবে, সে সকল স্থানের লোক দুই বেলা আটা খাইয়া কোন রকমে বাঁচিয়া থাকিবে—কিন্তু বেথানে গমও মিলিবে না, সেখানে লোক গাছের পাতা ছাড়া আর কিছুই পাইবে না। গত বৎসর আলুও ভাল হয় নাই—এ বৎসর আউস ধানের ফসলও আশাশ্রয় নহে। চাষীর অভাবে তরিতরকারীও অধিক পরিমাণে উৎপন্ন হয় না—আম্বিন, কার্তিক—দুই মাসে খাদ্যের অভাবে অখাদ্য খাইয়া বহুলোক মারা যাইবে। এখন আর তাহাদের বাঁচাইবার কোন উপায় করা সম্ভব নহে। পশ্চিমবাংলার প্রতি জেলাতেই লোকসংখ্যা বাড়িয়াছে। বিশেষ করিয়া কলিকাতা, ২৪ পরগণা, নদীয়া ও মুর্শিদাবাদের অবস্থা শোচনীয়। কলিকাতা সহরের অবস্থা বর্ণনাহীন হইয়াছে। এখন পর্যন্ত প্রত্যহ কয়েক হাজার করিয়া হিন্দু পূর্ববঙ্গ হইতে কলিকাতায় আগমন



করিতেছে। ২৪ পরগণার কারখানা-বহুল অঞ্চলসমূহে অধিবাসীর সংখ্যা সর্বত্র বিপুল হইয়াছে। অস্তিত্ব স্থানেও বহু আশ্রয়প্রার্থী শিবির বা নূতন গ্রাম প্রতিষ্ঠার ফলে সর্বত্র ভীষণ খাড়াভাব। নদীয়ায় পাকিস্তানীদের আগমনে তথায় চালের মণ ৫০ টাকা—তাহাও সর্বত্র পাওয়া যায় না—মুর্শিদাবাদের বিবরণ আমরা বিস্তৃত ভাবে অন্তর্ভুক্ত প্রকাশ করিয়াছি। এ অবস্থার আমাদের কি কর্তব্য, তাহা ভাবিয়া পাই না। পশ্চিমবাংলার খাণ্ডমন্ত্রী মহাশয় এ বিষয়ে বখাসাধ্যা চেষ্টা করিয়াও বিশেষ কিছুই করিয়া উঠিতে পারেন নাই—তাহা তিনি বহুবার স্বীকার করিয়াছেন। দেশের লোক এত অধিক দুর্নীতি-পরায়ণ যে সামান্য মাত্র সুযোগ লাভ করিলেই তাহারা দুর্নীতির আশ্রয় গ্রহণ করিয়া দেশবাসীর দুঃখ বাড়াইয়া দিয়া থাকেন। এ বিষয়ে সরকারী চেষ্টা এখনও অধিক ব্যাপক হয় নাই। দুর্নীতি-নিবারণ বিভাগও হয়ত দুর্নীতিপরায়ণ—সুতরাং কে আমাদের এই দুঃখবস্থা হইতে রক্ষা করিবে ?

#### স্বাধীনতা দিবস—

১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট ভারত স্বাধীনতা লাভ করিয়াছে। তাহা তিন বৎসর পূর্ব হওয়ায় গত ১৫ই আগস্ট রাষ্ট্র পরিচালকগণ দেশের সর্বত্র স্বাধীনতা দিবস উৎসব পালন করিয়াছেন। কিন্তু এই উৎসবের সহিত দেশের জনগণের কোন সম্পর্ক ছিল না। আমরা তিন বৎসর পূর্বে স্বাধীন হইলেও বর্তমান রাষ্ট্র পরিচালকগণ নানা কারণে আমাদের কোন সুখসুবিধার ব্যবস্থা করিতে পারেন নাই, বরং আমাদের দুঃখ দুর্দ্বিধা তাহাদের অব্যবহার ফলে দিন দিন বাড়িয়া চলিয়াছে। যে মহাত্মা গান্ধীকে তাহারা জাতির জনক বলিয়া স্বীকার করেন, তাহার চিত্র রাষ্ট্রপরিচালকদের প্রতি গৃহে রক্ষিত হইয়াছে, তাহার আদর্শ কোথাও রক্ষিত হয় না। তিনি দেশকে যে ত্যাগ, সেবা ও প্রেমের আদর্শশিক্ষা দিয়া গিয়াছেন, সে আদর্শ আজ কি কেজ্রে, কি প্রদেশে কোথাও সম্মানিত হয় না। শাসন ব্যবহার ব্যয় দিন দিন বাড়িয়া বাইতেছে ও তাহার পরিবর্তে দেশবাসী জনগণের কষ্টও সমানে বাড়িয়া চলিয়াছে। জনগণ আজ পেট ভরিয়া খাইতে পায় না—পরিবার কাপড় পায় না। খাদ্য ও বস্ত্রের দাম এত অধিক যে জনগণের পক্ষে তাহা ক্রয় করা অসম্ভব। গান্ধীজি সে সাম্যবাদের

বাণী প্রচার করিয়াছিলেন, সে সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা কোথাও নাই। এখনও বৃটীশ রাজত্বের সময়ের মত ধনিক সম্প্রদায়কে তুষ্ট করিবার জন্য শ্রমিকের উপর নির্যাতন সমভাবেই চলিতেছে। ধনিকের অর্থ দরিদ্রের কল্যাণের জন্য ব্যয়ের ব্যবস্থা করিলে তবেই দেশে সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠা সম্ভব—তাহার কোন চেষ্টা দেখা যায় না। এই অবস্থায় দেশের জনগণ স্বাধীনতা দিবস উৎসবে যোগদান করে নাই। কলিকাতা সহরের লোক পর্যন্ত সে দিন উৎসবে যোগদান করে নাই—সহরতলী বা গ্রামের কথা ত বলাই বাহুল্য মাত্র। বারাকপুরে গান্ধী ঘাটে সে দিন যে উৎসব হইয়াছিল তাহাতে গভর্নর ডাঃ কাটজ, প্রধান মন্ত্রী ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায়, মন্ত্রী প্রফুল্লচন্দ্র সেন, মন্ত্রী নিকুঞ্জ বিহারী মাইতি ও মন্ত্রী হেমচন্দ্র নন্দর যোগদান করিলেও তথায় অধিক লোক সমাগম হয় নাই। অন্ত্যস্ত বহু স্থানে সরকারী ব্যয়ে থানাপিনা হইয়াছিল—কিন্তু দরিদ্র জনগণের তাগাতে কোন লাভ হয় নাই। যতদিন না দেশের জনগণের অন্ন বস্ত্রের সংস্থান হয়, যতদিন না তাহাদের শিক্ষা ও স্বাস্থ্যরক্ষা ব্যবস্থা হয়, যতদিন না লক্ষ লক্ষ গৃহহীন বেকার লোকের গৃহ ও কর্মসংস্থান হয়, ততদিন দরিদ্র জনগণ স্বাধীনতার মর্ম উপলব্ধি করিতে পারিবে না—কোন উৎসব করা ত তাহাদের নিকট বাতুলতা মাত্র।

#### শ্রী অরবিন্দ জন্মদ্বিবার্ষিক—

১৫ই আগস্ট স্বাধীনতা উৎসবের দিনে ভারতের সর্বত্র ঋষি শ্রী অরবিন্দ ঘোষ মহাশয়ের ৭৯তম জন্মদিবস উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে। শ্রী অরবিন্দ গত প্রায় ৪০ বৎসর ধরিয়া তাহার পণ্ডিত্যবাহু আশ্রমে থাকিয়া যে সাধনা করিতেছেন, তাহা মানবকল্যাণ সাধন করিবে বলিয়া লোক বিশ্বাস করে। সেজন্য ঐ দিন লোক প্রচার সহিত শ্রী অরবিন্দের জীবন ও কাব্যাবলী আলোচনা করিয়া তাহার জন্মদিবস পালন করিয়াছে। কলিকাতা নিখিল ভারত শ্রী অরবিন্দ আদর্শ মহোৎসব কমিটির পক্ষ হইতে ঐ দিন ডক্টর শ্রীমাদ্রা এমদ মুখোপাধ্যায়ের পৌরোহিত্যে এক অনুষ্ঠান হইয়াছিল ও সকালে কলিকাতা ৯২ ল্যান্সডাউন রোডে শ্রী অরবিন্দ স্মৃতি কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে। বিকালে ২৩৭ লোয়ার সার্জার রোডে ‘রজনী’ গৃহে শ্রী অরবিন্দ পাঠ মন্দিরের উদ্বোধন

সভা হইয়াছিল। শ্রীঅরবিন্দের সাধনা এই দুর্গত দেশকে রক্ষা করুক ও দেশবাসীর মনকে কলুষ মুক্ত করুক, সেদিন সকলেই এই প্রার্থনা করিয়া উৎসব সম্পন্ন করিয়াছেন।

### ডাক্তার নীলরতন সরকার—

ডাক্তার নীলরতন সরকার কলিকাতায় শুধু একজন বিশিষ্ট চিকিৎসক ছিলেন না, তিনি দেশপ্রেমিক নেতা ও খ্যাতনামা ব্যবসায়ী ছিলেন। তিনি তাহার ষোপাজিত বহু অর্থ নানাভাবে দেশের কল্যাণের জন্য ব্যয় করিয়াছিলেন। সম্প্রতি স্বাধীন বাংলা সরকার কলিকাতা ক্যাথলিক কলেজের নাম পরিবর্তন করিয়া ‘নীলরতন সরকার মেডিকেল কলেজ’ নামকরণ করিয়াছেন। নীলরতন ঐ স্কুলের ছাত্র ছিলেন ও তাহার উন্নতির জন্য আত্মবল চেষ্টিয়া গিয়াছেন। কাজেই তাহার নামের সহিত ঐ প্রতিষ্ঠানের নাম যুক্ত করায় উপযুক্ত কাজই করা হইয়াছে। ঐ ভাবে বাংলার বহু মনোবীর কথা আমরা স্মরণ করিবার ব্যবস্থা করিতে পারি। নীলরতনের দান দেশবাসীর পক্ষে বিশ্বস্ত হইবার কথা নহে। আমরা সরকারের এই কার্যে তাঁহাদিগকে অভিনন্দিত করিতেছি।

### উড়িষ্কার ভীষণ শ্রম—

আমরা মাদ্রাজ, পশ্চিমবঙ্গ, বিহার ও আসামে দৈবদুর্বিপাকের কলে অস্বাভাবের কথা অন্তর্য প্রকাশ করিলাম। গত আগষ্ট মাসের দ্বিতীয় ও তৃতীয় সপ্তাহে উড়িষ্কার মহানদী, ব্রাহ্মণী, বৈতরণী, ভার্গবী, সুবর্ণরেখা প্রভৃতি নদীর বস্তার কলে বালেশ্বর, কটক ও পুরী জেলার বহু স্থানে ধান একেবারে নষ্ট হইয়া গিয়াছে। বালেশ্বর জেলার যে সকল স্থানে খুব বেশী পরিমাণ ধান হইত, সে সকল স্থান ভাসিয়া গিয়াছে। উড়িষ্কার মন্ত্রী শ্রীরাজকৃষ্ণ কুমার ঐ সকল অঞ্চল দেখিয়া আসিয়া যে বিবৃতি প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা মর্মভঙ্গ। এ বিষয়ে কোন মন্তব্য প্রয়োজন।

### শিক্ষা ও কার্মিগারী শিক্ষা—

পশ্চিমবঙ্গে টালীগঞ্জ, গড়িয়াহাট, বাদবপুর, সুরেন্দ্র বাগজী রোড, কৃষ্ণনগর, হাওড়া হোম ও কার্দিয়াংয়ে বৃত্তি শিক্ষা কেন্দ্রে মোট ২০২৮ জন শিক্ষার্থীকে কার্মিগারী ও বৃত্তি শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। শিল্পোন্নয়ন,

উৎপাদন বৃদ্ধি ও বেকার সমস্তার সমাধান এই শিক্ষাকেন্দ্রে প্রতিষ্ঠার কারণ। মোট ২৫ হাজার প্রার্থীর মধ্যে ৭টি কেন্দ্রে ২০২৮ জন শিক্ষার্থী গ্রহণ করা হয়। প্রার্থী নির্বাচনের জন্য একটি বোর্ড গঠিত হইয়াছে। ভারত-সরকার ও পশ্চিমবঙ্গ-সরকারের যুক্ত চেষ্ঠায় এই ব্যবস্থা প্রশংসনীয়—ইহা দ্বারা প্রার্থীরা মোটর-মেকানিক, ড্রাকটসম্যান, সার্ভেয়ার, জেনারেল মেকানিক, কার্পেন্টারী প্রভৃতি কাজ শিক্ষা করিয়া জীবিকার্জন করিতে সমর্থ হইবে।

### শিল্পের উৎপাদন বৃদ্ধি—

১৯৫০ সালের জাহুয়ারী হইতে জুন এই ৬ মাসে ভারতে কয়লা, ইস্পাত, লবণ, সিমেন্ট, কাগজ, ডিজেল এঞ্জিন, বাইসাইকেল, বিদ্যুৎচালিত মোটর, ইলেক্ট্রিক ট্রান্সফরমার প্রভৃতি অত্যাবশ্যক ২৫টি শিল্পের উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্য দেখা গিয়াছে। ঐ সময়ে বৈদ্যুতিক পাখা, হারিকেন লম্পন, সালফিউরিক এসিড, কষ্টিক সোডা, সোডা এ্যাস, ব্রিচিং পাউডার, সিগারেট, প্রাইউড, লিকুইড ক্লোরিন প্রভৃতির উৎপাদনও বৃদ্ধি পাইয়াছে। ইহা আশার কথা সন্দেহ নাই। হিসাবে লবণ উৎপাদন বৃদ্ধির সংবাদ থাকিলেও দেশে লবণ দুস্পা ও দুস্কুল্য হইয়াছে। বস্ত্র উৎপাদন বৃদ্ধির সংবাদ প্রকাশিত হইলেও, বস্ত্রের মূল্য দিন দিন বাড়িয়াই চলিয়াছে। বোম্বায়ে বস্ত্র শিল্প শ্রমিক ধর্মঘটে হয়ত বস্ত্র আরও দুস্পা হইবে। দেশলাই, সাবান, পশমজাত দ্রব্য, এনামেলওয়ার প্রভৃতির উৎপাদন হ্রাস দেশের পক্ষে মঙ্গলজনক হইবে না।

### দামোদর পরিকল্পনা—

দামোদর পরিকল্পনা সমিতির অন্ততম সমস্ত শ্রীফুলন-প্রদায় বর্ষা সম্প্রতি প্রকাশ করিয়াছেন যে গত যে মাসে পর্যন্ত ঐ পরিকল্পনার মোট ৯ কোটি টাকা ব্যয়িত হইয়াছে। পরিকল্পনায় নিযুক্ত কর্মীদের প্রাদেশিকতা অহুযায়ী নিয়োগ করা হয় বলিয়া যে সংবাদ প্রচারিত হইয়াছে তাহাও ঠিক নহে। তথায় ৮১৭ বাকালী, ৩১৭ বিহারী ও ১৯৮ অল্প দেশের কর্মচারী কাজ করিতেছে। পরিকল্পনায় অর্থব্যয়ের তুলনায় দেশবাসী কিরূপ উপকৃত হইতেছে বা হইবে, সঙ্গে সঙ্গে তাহার বিবরণ প্রকাশিত হইলে দেশবাসী আশ্বস্ত হইতে পারে।

মুর্শিদাবাদে ছুর্ভিক প্রতিরোধ দিবস—  
 মুর্শিদাবাদ জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের বাড়ির  
 সম্মুখে খান্দ দাবীর সভার সমবেত  
 বুড়ু জনতার এক অংশ



মুর্শিদাবাদে ছুর্ভিক প্রতিরোধ দিবসের  
 অপর এক মর্মভঙ্গ দৃশ্য—  
 বুড়ু জনতার নেতা দিনীপ  
 সিংহকে এবং আরো অনেককে  
 পুলিশ কর্তৃক গ্রেপ্তার

### সংস্কৃত সাহিত্য পরিষদ—

কলিকাতায় সংস্কৃত সাহিত্য পরিষদ গত ৩৪ বৎসর ধরিয়া সমগ্র ভারতে সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের প্রচারের জন্য আন্দোলন চালাইয়া কার্য করিতেছেন। গত মহাযুদ্ধের পূর্বে কলিকাতা কর্পোরেশন পরিষদকে কলিকাতা শ্রামবাজার ১৬৮।১ রাস্তা দীনেজ ষ্টাটে ৫ কাঠা জমী দান করিলে তথায় গৃহ-নির্মাণের আয়োজন হয়।

সে সময় ত্রিযুত স্বতাবচ্ছ বনু গৃহ-নির্মাণের অর্থ সংগ্রহের জন্য আবেদন করিয়াছিলেন। তাহার পর মহাযুদ্ধের ফলে সে কাজ অগ্রসর হয় নাই। সম্প্রতি আবার সে কাজ আরম্ভ হইয়াছে—গৃহ সম্পূর্ণ করিতে ৫০ হাজার টাকা প্রয়োজন। আমরা দেশবাসী সকল মহাপ্রাণ ব্যক্তিকে এই কার্যে সাহায্য দান করিতে অহরোধ করি। ভাষাতত্ত্ব সংস্কৃতি রক্ষার জন্য সংস্কৃত সাহিত্য পরিষদকে পুষ্ট করা

প্রয়োজন। কলিকাতা—৭, ১২ং বর্ষণ ট্রাটে আনন্দবাজার পত্রিকার সম্পাদক শ্রীচন্দ্রলাল ভট্টাচার্যের নিকট সাহায্য পাঠাইতে হইবে—তিনি সংকৃত সাহিত্য পরিষদের সম্পাদক।

### উত্তর প্রদেশে ভীষণ বন্যা—

উত্তর প্রদেশে গঙ্গা, সরযু প্রভৃতি ৮টি নদীতে বন্যার ফলে প্রদেশের পূর্বাংশে ২০ শত গ্রাম জলপ্রাণিত হইয়াছে। বন্যায় প্রায় ৫ কোটি টাকা ক্ষতি হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। বহু ধাতুশস্ত্র নষ্ট হইয়াছে। বিপদ কখনও একা আসে না—আজ ভারতবর্ষের সর্বত্র তাই একই রকম ছুরবছা দেখা বাইতেছে।

### আসাম পতঙ্গের আবেদন—

আসামে ভূমিকম্প ও তজ্জনিত বন্যা প্রভৃতির ফলে লক্ষ লক্ষ লোক দারুণ দুর্দশাগ্রস্ত হইয়াছে। ক্ষতির পরিমাণ এখনও স্থির করা সম্ভব নহে—১৫ই আগষ্ট হইতে ভূমিকম্প আরম্ভ হইয়াছে, এখনও বন্ধ হয় নাই। বহু উচ্চস্থান নিম্ন হইয়া জলপ্রাণিত হইয়াছে, বহু নদীগর্ত উচ্চ হইয়া ডাকা জমীতে পরিণত হইয়াছে। হিমালয় পর্বতের বহু উচ্চ চূড়া ধসিয়া সমতল ভূমিতে পতিত হওয়ার সহর ও গ্রাম চাপা পড়িয়াছে। ভূনিম্ন হইতে খনিজ ধাতু নির্গত হইয়া বহু স্থান ধ্বংস করিয়াছে। এ অবস্থায় আসামের গভর্নর শ্রীজয়রামদাস মৌলভারাম এক আবেদন প্রচার করিয়া সাহায্য তহবিল খুলিয়াছেন এবং সকল সমর্থ ব্যক্তিকে ঐ তহবিলে দান করিয়া দুর্গতদের সাহায্য করিতে অতুরোধ জানাইয়াছেন। এ আবেদনে সকলেই সাড়া দিবেন বলিয়া আমরা বিশ্বাস করি।

### প্রেন্সিডেন্সী জেলের উৎসব—

শ্রীমদবিদ্য যোব ১৯০৮-৯ সালে এক বৎসরকাল কলিকাতা প্রেন্সিডেন্সি জেলের যে ঘরে বিচার্যধীন আসামী-রূপে বাস করিয়াছিলেন, গত ২২শে আগষ্ট সেই ঘরের সম্মুখে একটি মার্কেল প্রস্তরে ঐ ঘটনার কথা লিখিয়া রাখা গিয়াছে। সে দিন উৎসবে গভর্নর শ্রীকৈলাসনাথ কাটক ও মন্ত্রী শ্রীনীহারেন্দ্র দত্ত মজুমদার উদ্যোগী ছিলেন এবং শ্রীশ্রীমদবিদ্য যোবোপাধ্যায় প্রস্তরের আবরণ উন্মোচন করেন। এইভাবে জেলের ঐ ঘরটি পবিত্র করা হইয়াছে এবং উহা বর্তমানে এক তীর্থক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে। জেলের

করেদীদের কাছেও উহা স্মরণীয়ক হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

### শ্রীঅন্নবিন্দের ভবিষ্যদ্বাণী—

গত ১৫ই আগষ্ট পণ্ডিচেরী আশ্রমে শ্রীঅন্নবিন্দ তাঁহার ৭৯তম জন্ম দিবসে সংবাদপত্র প্রতিনিধিদের নিকট বোষণা করিয়াছেন যে—বর্তমানে জগতের অবস্থা অত্যন্ত শঙ্কাজনক। কোরিয়ার যুদ্ধের ফলে সমগ্র দক্ষিণ-পূর্ব-এশিয়া ও পরে ভারতবর্ষ কমুনিষ্টদের অধীন হইবে। ক্রমে সমগ্র জগৎ কমুনিষ্টদের হস্তগত হইবে। শ্রীঅন্নবিন্দেব এই ভবিষ্যদ্বাণী সকলকে চিন্তাঘটিত করিবে সন্দেহ নাই।

### বোম্বায়ে বিপুল ধর্মঘট—

বোম্বায়ে ৬২টি কাপড়ের কলের মধ্যে প্রায় সকল গুলিতেই শ্রমিক ধর্মঘট চলিতেছে। মোট শ্রমিক সংখ্যা ১ লক্ষ ১৫ হাজার—কয়েক হাজার ছাড়া সকলেই ধর্মঘটে যোগদান করিয়াছে। ৬২টি কলে প্রত্যহ ৪২ লক্ষ গজ কাপড় উৎপন্ন হইত—সমাজতন্ত্রী দল এই ধর্মঘট চালাইতেছে। ১৪ই আগষ্ট হইতে উহা চলিতেছে। বোম্বাই সরকার ঐ ধর্মঘটকে উদ্বেগবিহীন ও অবৈধ বলিয়া ঘোষণা করিয়াছে। ইহার ফল যে কিরূপ সাংবাদিক, ভাষা ভাবিনা পাওয়া যায় না। আদালত হইতে ২ মাসের বেতন বোনাস দিতে বলা হইয়াছিল—শ্রমিকগণ ৩ মাসের বেতন বোনাস দাবী করার ফলেই এই ধর্মঘট হইয়াছে।

### ধুবুলিয়ার বাস্তহারা কেস—

কলিকাতা হইতে ৭০ মাইল দূরে নদীয়া জেলার ধুবুলিয়ায় সরকারী চেষ্টায় ৫০ হাজার বাস্তহারার বাসস্থানের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। তাহার পূর্ববন্ধের বিভিন্ন জেলার অধিবাসী ছিল। সম্মুখে ২১ হাজার জীলোক ও ১০ হাজার শিশু। তথায় ৩৩০টি কৃষক পরিবার, ১৬৬৫টি ছোট-ব্যবসায়ী পরিবার, ৮৫০টি বাক্তজীবী পরিবার, ৮২৬টি মৎস্যজীবী পরিবার ও ৫৩৬টি চাকরীজীবী পরিবার স্থান পাইয়াছে। ৮৫টি পুরোহিত পরিবার, ১ শত প্রাথমিক-দ্বন্দ্ব-শিক্ষক পরিবার, ১৩টি মধ্য ইংরাজি দ্বন্দ্ব-শিক্ষক পরিবার, ৩টি উচ্চ ইংরাজি বিভাগ-শিক্ষক পরিবার ও ১৯টি দলিল-লেখক পরিবার ও তথায় আছেন। ১৫৫ জন ছাত্র, ১৬০ জন কুস্তকার, ২৩৫ জন তাঁতী, ৫৬ জন গোয়াল, ৪৪ জন দরজী, ৭ জন বুচি, ১১ জন মোটির চালক, ৪ জন

মোপা, ৭৭ জন নাগিত, ২০ জন মোদক, ১৬ জন শাঁখারী, ১০ জন মেকানিক ও ২৫ জন বিড়িওয়ালার আছেন। ঐ স্থান হইতে মালদহে ২১৩ পরিবার, আন্দামানে ৩৮ পরিবার, মেদিনীপুর গিয়ারাডোবায় ৪৩ পরিবার, নদীয়া করিমপুরে ৩২৭ পরিবার, নদীয়া তেহটে ১৪৪ পরিবার, কুচবিহারে ১০, মুর্শিদাবাদ নেহালিগাড়ায় ৬টি পরিবার, প্রেরিত হইয়াছে। সেদিন প্রধান মন্ত্রী ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায় ও বলিয়াছেন মহেশ্বর রাজ্যে ৪০ হাজার বাস্তহারা ও হারজাবাদ রাজ্যে ৫০ হাজার বাস্তহারা প্রেরণের ব্যবস্থা করিয়াছেন। বিহার ও উড়িষ্যায় ইতিমধ্যে ৩৬ হাজার বাস্তহারা প্রেরণ করা করা হইয়াছে। এইভাবে বাস্তহারা সমস্যা সমাধানের চেষ্টা হইলেও সমস্যা এত বিরাট যে ইহার সমাধান এখনও পর্যন্ত সম্ভবপর বলিয়া মনে হয় না।

#### পশ্চিমবঙ্গে কুটির শিল্প ব্যবস্থা—

পশ্চিমবঙ্গ সরকার কুটির শিল্প ও ছোটখাট শিল্প সম্পর্কে যে নীতি প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা এইরূপ—(১) উৎপাদনের উন্নততর পদ্ধতি প্রয়োগ দ্বারা নির্মাণ কোশলের উন্নতি বিধান (২) বিভিন্ন ছোটখাট শিল্পে উপযুক্ত শিক্ষা প্রদানের জন্য শিল্প ও বৃত্তিমূলক প্রতিষ্ঠান গঠন (৩) আর্থিক সাহায্যের ব্যবস্থা (৪) কুটির শিল্পজাত দ্রব্য বাজারে আনয়ন ও প্রচার সম্পর্কে সুবিধার ব্যবস্থা (৫) উৎপাদন কেন্দ্রে মূল্যবান কাঁচামাল সরবরাহ (৬) বৃহৎ বাস্তবিক শিল্পের তুলনায় প্রতিযোগিতা করিবার জন্য উৎপাদনের ব্যয় হ্রাসের ব্যবস্থা (৭) ভারত সরকারের নীতি ও কার্য সূচী অনুযায়ী প্রতিযোগিতার ক্ষেত্র সঙ্কুচিত করিবার উদ্দেশ্যে কুটির ও বৃহৎ শিল্পের মধ্যে উৎপাদনের ক্ষেত্র নির্ধারণের চেষ্টা। এ বিষয়ে কয়েকটি উপদেষ্টা কমিটিও গঠিত হইয়াছে—যথা—(১) পশ্চিমবঙ্গ কুটির শিল্প বোর্ড (২) পশ্চিমবঙ্গ হস্তচালিত তাঁত শিল্প বোর্ড (৩) পশ্চিমবঙ্গ খাদি বোর্ড ও (৪) পশ্চিমবঙ্গ রেশম শিল্প বোর্ড। শিল্প বিভাগের অধীন ৪৫টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আছে ও তাঁহারা ৭৫টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে উপযুক্ত আর্থিক সাহায্য প্রদান করেন। সরকারী শিল্প বিভাগের প্রচার-কার্য ভাল ভাবে সম্পাদিত হইলে লোক ঐ সকল শিল্পে সাহায্য লাভ করিয়া উৎসাহের সহিত কাজ আরম্ভ করিতে পারে।

#### খাদ্যাবস্থার উন্নতির শনিকল্পনা—

প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত নেহরু দিল্লীতে সকল প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী ও খাদ্যমন্ত্রীকে এক সম্মিলনে মিলিত করিয়া দেশের খাদ্যাবস্থার উন্নতি সম্বন্ধে পরিকল্পনা স্থির করিয়াছেন। গত ২০শে আগষ্ট ঐ বৈঠক শেষ হইয়াছে। সর্বত্র যাহাতে একইরূপ খাদ্যনীতি গৃহীত হয়, তদ্ব্যতীত বৈঠকে প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। প্রধানত যুদ্ধকালীন খাদ্যোৎপাদন ও খাদ্য সংগ্রহ ব্যবস্থা প্রবর্তন, কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশে একরূপ খাদ্যনীতি অমুসরণ, তৎপরতার সহিত আত্মনির্ভরশীল হইবার পরিকল্পনা অমুসরণ, বাটতি ও উদ্ভূত অঞ্চল নির্বিশেষে বিভিন্ন প্রদেশে ও রাজ্যে নিয়ন্ত্রণাধীন সর্ববিধ শস্য ব্যাপকভাবে সংগ্রহ, বিভিন্ন রাজ্যে মজুতকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর ও অমুসরণ ব্যবস্থা অবলম্বন, খাদ্য সম্পর্কিত নীতি বধ্যবধ্যভাবে কার্যে পরিণত করার ব্যবস্থা গ্রহণ, বিভিন্ন রাজ্যে খাদ্যশস্যের মূল্যের সমন্বয় সাধন ও আঞ্চলিক ভিত্তিতে চিনির কলগুলিতে ইন্ধু সরবরাহের ব্যবস্থা প্রবর্তন সম্পর্কে বৈঠকে সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে। এই বৈঠকের ফলে যদি ভারতবাসী উপযুক্ত পরিমাণে ভাল খাদ্য পায়, তবেই বৈঠক সার্থক হইয়াছে মনে করা হইবে।

#### পার্লামেন্টে খাদ্য সম্পর্কে বিল—

গত ১৪ই আগষ্ট দিল্লীতে ভারতীয় পার্লামেন্টের বর্তমান অধিবেশন শেষ হইবার পূর্বে খাদ্যমন্ত্রি শ্রীকানাইয়ালাল মুন্সীর খাদ্য বজ্র সম্পর্কিত বিল পাশ হইয়াছে। ঐ বিলে খাদ্যশস্য মজুতকারী ও খাদ্য বিক্রেতা মুনাফাখোরদের এবং বজ্র প্রভৃতি প্রয়োজনীয় দ্রব্যের ব্যবসায়ীদের অপরাধের দণ্ড কঠোর শাস্তির বিধান করা হইয়াছে। কেহ খাদ্য ও অন্তরঙ্গ প্রয়োজনীয় জিনিষ অন্যায় ভাবে মজুত করিয়া তাহার মজুত মালের মূল্যের ২০ গুণ অর্থদণ্ড করা হইবে। আইন যদি কার্যে পরিণত করিয়া দেশের দুর্নীতিপরায়ণ ব্যক্তিদের শাস্তির ব্যবস্থা হয়, তবে লোক অনাচার হইতে মুক্তিলাভ করিবে।

#### লেডী ব্রাভোর্ণ কলেজের প্রতিষ্ঠা

উৎস—

গত ৮ই তাজ শুক্রবার কলিকাতা লেডী ব্রাভোর্ণ কলেজের প্রতিষ্ঠা উৎসব হইয়াছিল। গভর্ণর ডাক্তার

কাটক্ সতাপতিষ করেন। বর্তমানে ঐ কলেজের ছাত্রী সংখ্যা ৫৪০ জন। উক্তর ত্রিমা চৌধুরী কলেজের প্রিন্সিপাল। কলেজের আই-এসসি বিভাগ সম্প্রদারণ ও বি-এসসি বিভাগের উদ্বোধন অবিলম্বে প্রয়োজন। কলেজের ছাত্রাবাসটি বড় করিলে আরও বহু ছাত্রীর স্থান হইতে পারে। গভর্ণর তাঁহার বক্তৃতায় ছাত্রীদিগকে নীতার আদর্শ অনুসরণ করিতে উপদেশ দিয়াছেন।

### বস্ত্রাঙ্গ হুগলী জেলায় ক্ষতি—

দামোদর, হারকেশ্বর ও শিলাবতী নদীতে বস্ত্রার ফলে হুগলী জেলার শতাধিক বর্গমাইল পরিমিত স্থানের ধান ও পাট নষ্ট হইয়া গিয়াছে। বহু বাসগৃহ ও গবাদি পশু নষ্ট হইয়াছে। আরামবাগ মহকুমাতঃ ৩০ হাজার বিঘা জমী প্রাবিত হওয়ায় আমন ধান ও পাট নষ্ট হইয়াছে। এ বৎসর দেশের সর্বত্র দৈবদুর্ভিক্ষপাক—কে দেশবাসীকে রক্ষা করিবে?

### পশ্চিমবঙ্গের আত্মবস্থা—

পশ্চিমবঙ্গে খাদ্যমন্ত্রী ত্রিপ্রহুসেন সেন গত ৩০শে আগষ্ট বেতাবে এক বক্তৃতায় পশ্চিমবঙ্গের খাদ্যবস্ত্রের আলোচনা করিয়াছেন। তিনি বলেন—এই বৎসরের (১৯৫০) কয়েক মাস ও আগামী বৎসরের পুরা ১২ মাস পশ্চিমবঙ্গের খাদ্যবস্ত্র দারুণ সঙ্কটজনক থাকিবে। তবে সে জন্য কেহ যেন খাদ্য মজুত না করে। ব্যবসায়ী ও কৃষকদের সাবধানতার সহিত কাজ করিতে হইবে। গত ১লা জানুয়ারী হইতে ৮ মাসে ৩০ লক্ষ বাস্তবহার্য পূর্ববঙ্গ হইতে পশ্চিমবঙ্গে আসিয়াছেন। তাহার উপর দৈবদুর্ভিক্ষপাকে বাংলার বহু খাদ্য নষ্ট হইয়াছে। তৃতীয়তঃ পাটের চাষ জড়াইবার জন্য বহু জমিতে আউস ধানের চাষ হয় নাই। এ অবস্থায় দেশবাসীকে বিশেষ দৃঢ়তার সহিত সকল দিক বিবেচনা করিয়া কাজ করিতে হইবে। অথবা খাদ্যের জন্য আন্দোলন করিলে তাহা কুফল ছাড়া স্কফল উৎপাদন করিবে না।

### লোক হাসপাতাল ও কলেজ বন্ধ—

সরকার পক্ষ হইতে ঘোষণা করা হইয়াছে আগামী ১৯৫২ সালের জুলাই মাস হইতে কলিকাতা লোক মেডিকেল কলেজ ও তাহার হাসপাতাল বন্ধ করিয়া দেওয়া হইবে।

উহাতে পশ্চিমবঙ্গ সরকার বার্ষিক সাড়ে ১২ লক্ষ টাকা কেন্দ্রীয় সরকার বার্ষিক সাড়ে ১২ লক্ষ টাকা সাহায্য দান করিতেন। লোক হাসপাতালে ৬০৭টি বেড আছে। কলেজ ও হাসপাতাল দক্ষিণ কলিকাতার অধিবাসীদের বহু উপকার সাধন করিয়া থাকে। বাংলা দেশে চিকিৎসা-ব্যবস্থা এখনও প্রয়োজনানুরূপ সম্পূর্ণতা লাভ করে নাই। কাজেই একটি চলতি হাসপাতাল বন্ধ করার সার্থকতা আমরা বুঝি না। কলিকাতায় লোকসংখ্যা বৃদ্ধির অনুপাতে আরও বহু হাসপাতাল প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন আছে। আমরা আশা করি, কর্তৃপক্ষ এ বিষয়ে গুণবিবেচনা করিয়া দেশবাসীর কল্যাণ সাধন করিবেন।

### কলিকাতার টেলিফোন ব্যবস্থা—

গত ৩১শে আগষ্ট এক সাংবাদিক সম্মিলনে কলিকাতায় টেলিফোনের অব্যবহার কারণের বিষয় আলোচিত হইয়াছিল। জানা গিয়াছে—সহরে নতুন ৩টি একস্টেঞ্জ লাইন খোলা হইবে—তাঁহাতে নতুন ৮ হাজার লাইনে কাজ হইবে—‘জোড়া-সাঁকো’তে ৩৩০ লাইন, ‘ব্যাংক’ ৪ হাজার লাইন ও রসায় এক হাজার নতুন লাইন হইবে। ‘পানিহাটা’ ও ‘চন্দননগরে’ ২টি নতুন একস্টেঞ্জ খোলা হইবে ও ‘বজ্রবজ’ একস্টেঞ্জ স্থানান্তরিত করিয়া এখানে অধিক কাজের ব্যবস্থা হইবে। হাওড়া, বড়বাজার, সাউথ ও পার্ক একস্টেঞ্জের কাজও বাহাতে ভাল হয়, তাহার ব্যবস্থা করা হইবে। বর্তমানে টেলিফোনে কথা-বলা এক অকমারির কাজ হইয়াছে—টাকা দিয়া একরূপ দুর্গতি ভোগ করা সত্যই নকারজনক। সম্বর ব্যবহার উন্নতি হইলে লোক উপকৃত হইবে।

### নুতন সঙ্গীত শিক্ষালয়—

গত ১৯শে আগষ্ট কালী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় ভবনে ‘ত্রীকলা সঙ্গীত ভারতী’ নামে একটি উচ্চ সঙ্গীত শিক্ষালয় প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে। হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের তাইস-চ্যান্সেলার পণ্ডিত গোবিন্দ মালব্য উহার উদ্বোধন করেন। কালীর মচারাজা ঐ সঙ্গীত বিদ্যালয়ের জন্য দুই লক্ষ টাকা দান করিয়াছেন। সঙ্গীত-মার্গও পণ্ডিত ওকারনাথ ঠাকুর নুতন শিক্ষালয়ের প্রিন্সিপালের কার্যভার গ্রহণ করিয়াছেন। স্বর্গত পণ্ডিত মদনমোহন মালব্যের এই ইচ্ছা এতদিনে পূর্ণ করা হইল।



ক্রমবর্দ্ধমান বেকার সমস্যা মধ্যবিত্ত বাঙ্গালীর জীবনকে  
অভিশপ্ত করিয়া তুলিতেছে। শিল্পপ্রধান শহর অকলে  
প্রায় দুই লক্ষ বেকার তালিকাভুক্ত আছে। তাহা ছাড়া  
তালিকাবহির্ভূত বেকারের সংখ্যা উহার প্রায় '৪ গুণ  
হইবে। মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকদের মধ্যেই বেকারের সংখ্যা  
অধিক। ১৮ হইতে ২২ বৎসরের কলিকাতাবাসী ৩০  
লাখার সুবক বেকার হইয়া আছে। এই সমস্যা সমাধানের  
কোন উপায় দেখা যায় না। মানুষকে কৃষিমুখী করিয়া  
গ্রামে পাঠাইবার ব্যবস্থা করিলে ইহাদের মধ্যে একদল  
বেকারের কর্ম সংস্থান হইতে পারে। ৬ শত ভদ্র সুবক  
দামোদর পরিকল্পনায় মাটি কাটার কাজ গ্রহণ করিয়াছে।  
এই বেকার সমস্যার সমাধান না হইলে দেশের অর্থনৈতিক  
জীবন কখনই উন্নত হইবে না।

### ଅନ୍ୟା ରୋଗ ଓ ତାହାର ପ୍ରତିକାର-

ডাক্তার কুমুদশঙ্কর রায় যক্ষ্মারোগে চিকিৎসায় বিশেষজ্ঞ ও যাদবপুরে যক্ষ্মা হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করিয়া যক্ষ্মা রোগীর চিকিৎসায় ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। তিনি সম্প্রতি এক বিবরণে জানাইয়াছেন—যক্ষ্মারোগে প্রতি বৎসর ৫ লক্ষ লোক মারা যায়। অনাকীর্ণ সহরে আলো-বাতাসহীন ঘরে বসবাস স্বাস্থ্যহানির অন্ততম কারণ। ভারতে যক্ষ্মারোগীর সংখ্যা ৫০ লক্ষ, কিন্তু মাত্র ৭৮ হাজার রোগীকে হাসপাতালে রাখিয়া চিকিৎসা করার ব্যবস্থা হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে ডাক্তার রায় প্রস্তাব করিয়াছেন—সহর ও সহর-তলীতে স্কুগৃহগুলি রাতিতে খালি পড়িয়া থাকে—জনবহুল বাড়ী হইতে লোকজনকে ঐ সকল স্কুপে লইয়া রাতিতে বাস করিতে দেওয়া উচিত। আমরা এ বিষয়ে জনসাধারণের ও বিশেষ করিয়া সমাজ-সেবী কন্মীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করি।

### স্বতেনকে এসিয়া ভ্যাগের অনুরোধ—

খ্যাতনামা ইংরাজ দার্শনিক বার্ট্রান্ড রাসেল অষ্ট্রেলিয়া ভ্রমণ শেষ করিয়া ২৫শে আগষ্ট সিদ্ধাপুর গমন করেন।  
তথায় তিনি বলিয়াছেন—বুটেন যেমন ভারত ত্যাগ  
করিয়াছে, তেমনিই সমগ্র এশিয়া ত্যাগ করিয়া তাহার  
চলিয়া আসা উচিত। বুদ্ধ হইলে তাহার বিচাঙ্কিত হইবে  
—ততদিন পর্যন্ত তাহাদের অপেক্ষা করা উচিত নহে।  
বুটেন এশিয়া ত্যাগ করিয়া আসিলে তাহার শুভেচ্ছা

অর্জন করা সম্ভব হইবে ও পণ্ডিত নেহরুর নেতৃত্বে এশিয়া-রাষ্ট্র-গোষ্ঠী গড়িয়া উঠিবে।—রাসেলের এই উক্তি সকলের অমুখাবন করা প্রয়োজন। এশিয়ার যদি নেহরুর নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহা হইলে হয়ত বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা হইবে।

### পশ্চিম বাংলার দাবী-

পশ্চিমবঙ্গের খাণ্ডমন্ত্রী শ্রী প্রফুল্লচন্দ্র সেন গত ২০শে আগষ্ট দিন্নোতে বাইরা- বলিয়ারছেন—আউস ফসলের জমি পাট চাবে নিয়োগ করার পশ্চিমবঙ্গের খাণ্ড ফসলের যে পরিমাণ হ্রাস পাইয়াছে, তাহা পূরণের জন্ত কেন্দ্রীয় সরকারকে অবিলম্বে ১১ হাজার টন চাউল পশ্চিমবঙ্গের জন্ত বরাদ্দ করিতে হইবে। ঐ দিন পশ্চিমবঙ্গের সচিব সচিব শ্রী হুপতি মজুমদার মহাশয় দিন্নোতে কেন্দ্রীয় গভর্ণমেন্টকে জানাইয়াছেন—১৯৪৭ সালে ভারত বিভাগের ফলে সীমান্তবর্তী জেলা সমূহে যে সমস্ত রাস্তা বা পথ নষ্ট হইয়াছে বা ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে, সে সকল স্থলে নতুন পথ নির্মাণের জন্ত ৫ কোটি টাকা পশ্চিমবঙ্গের প্রয়োজন। উহার কতক সাহায্য হিসাবে ও কতক ঋণ হিসাবে দিতে হইবে। নানা কারণে সীমান্তের পথগুলি এখনই নির্মিত হওয়া প্রয়োজন। খাণ্ড সম্বন্ধে আজ কোন কথা না বলাই ভাল। পশ্চিমবঙ্গ উপযুক্ত চাউল না পাইলে এ দেশে বহু লোক অন্নান্নাবে মারা যাইবে।

### ভারতের ডেপুটি হাই কমিশনার—

ঢাকাস্থ ভারতীয় ডেপুটি হাই কমিশনার শ্রীসত্যেন্দ্রকুমার  
বহুর কার্যকাল শেষ হওয়ায় আসামের ভূতপূর্ব অর্থসচিব  
এবং পরে সরবরাহ ও উন্নয়ন সচিব শ্রীবৈষ্ণাথ মুখোপাধ্যায়  
সেই স্থানে নিযুক্ত হইয়াছেন। ১৯০০ সালে নদীয়া  
জেলায় বৈষ্ণাথবাবুর জন্ম হয়। ১৯২৪ সালে আসামের  
রাববাহাদুর খগেন্দ্রনাথ চৌধুরীর কন্যাকে বিবাহ করিয়া  
তদবধি তিনি আসামে বাস করিতেছেন।

### কাচ ও স্থাশিল্প গবেষণাগার—

গত ২৬শে আগষ্ট কলিকাতা বাদবপুরে কেন্দ্রীয় কা  
ও মুংশিম গবেষণাগারের দ্বার উদ্‌ঘাটন উৎসব হইয়াছে।  
গভর্ণর ডক্টর কাটজ্জ উৎসবে সভাপতিত্ব করেন ও প্রধান  
মন্ত্রী ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায় উদ্বোধন করেন। বাদবপুর  
কাচ ও মুংশিমের প্রধান কেন্দ্র—কাজেই কেন্দ্রীয় সরকার

বাংলার এই গবেষণাগার প্রতিষ্ঠা করিয়া উপযুক্ত কাজই করিয়াছেন। ভারতে আর কোথাও এই ধরনের গবেষণাগার নাই—কাজেই ইহা দেশের প্রকৃত উপকার সাধনে সমর্থ হইবে বলিয়া সকলে মনে করেন।

পশ্চিমবঙ্গের ভূতপূর্ব চিক সেক্রেটারী ত্রিভুত হুম্মার সেন সর্বভারতীয় নির্বাচন কমিশনার নিযুক্ত হইয়া কাজ করিতেছেন ও সম্বর বাহাতে নির্বাচন হয় সে জন্য ব্যবস্থা করিতেছেন। পশ্চিমবাংলা হইতে প্রাদেশিক ব্যবস্থা

বাধীন ভারতের আসাম রাজ্যের সর্ব  
প্রথম প্রধান মন্ত্রী গোপীনাথ বরদলৈ  
চির নিজার মগ্ন—সরকারী ট্রাকে অন্ত্যেষ্ট  
শোকযাত্রার দৃশ্য  
ফটো—শ্রীকামাক্যাপ্রসাদ ভট্টাচার্য



### কাশ্মীর সমস্যা—

কাশ্মীরে ভারত রাষ্ট্রের সহিত পাকিস্তানের বিবাদ মিটাইবার জন্য রাষ্ট্রসভ্য হইতে যে প্রতিনিধি আসিয়াছিলেন, তিনি আপোষের কোন ব্যবস্থা করিতে না পারিয়া শেষ পর্যন্ত ফিরিয়া গিয়াছেন। এখন যুদ্ধ ব্যতীত অন্য কোন উপায়ে যে এই সমস্যার সমাধান হইতে পারে, এ কথা কেহ মনে করেন না। কাজেই ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করিয়া ভারত ও পাকিস্তান উভয় রাষ্ট্রের অধিবাসীরাই শঙ্কিত হইয়াছেন। এই সম্পর্কে পণ্ডিত জহরলাল নেহরু যে বিবৃতি প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে তিনিও শঙ্কা প্রকাশই করিয়াছেন। দেশের বর্তমান অবস্থায় কোন রাষ্ট্রের পক্ষেই যুদ্ধ ঘোষণা করা যুক্তিযুক্ত বলিয়া বিবেচিত হইবে না। অথচ পাকিস্তানী বর্ডপক্ষের জিহের কলে কাশ্মীর সমস্যার সমাধান হইল না। ভারত কুসল ভোগ করা ছাড়া পাকিস্তানের অন্য পথ নাই।

### আগামী সাধারণ নির্বাচন—

প্রাদেশিক ব্যবস্থা পরিষদ ও কেন্দ্রীয় পার্লামেন্টের সমস্ত নির্বাচন কবে হইবে তাহা এখনও স্থির হয় নাই।

পরিষদে ২৩৮ জন ও কেন্দ্রীয় পার্লামেন্টে ৩৪ জন সদস্য নির্বাচিত হইবেন। প্রাদেশিক পরিষদের আসন আরও ৫টি বৃদ্ধি করার কথা চলিতেছে। এদিকে ভোটদাতার তালিকা এখনও প্রস্তুত হয় নাই। এখন যেভাবে কাজ চলিতেছে, তাহাতে মনে হয় ১৯৫১ সালের বর্ষার পর অক্টোবর মাসে নির্বাচন হইবে। যেভাবে কাজ চলিতেছে, তাহাতে মনে হয় বর্তমান শাসকবর্গ তাড়াতাড়ি নির্বাচন করার পক্ষপাতী নহেন। যে কয়দিন নির্বাচন না হয়, সেই কয়দিনই তাঁহারা কাজ করার সুবিধা পাইবেন। এ বিষয়ে সর্বত্র আলোচন হওয়া প্রয়োজন।

### কলিকাতা কর্পোরেশনের নির্বাচন—

গত কয়েক বৎসর কাল কলিকাতা কর্পোরেশনের নির্বাচন বন্ধ আছে এবং সরকারী কর্মচারীদের দ্বারা কর্পোরেশনের কার্য পরিচালিত হইয়া আসিতেছে। আগামী ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত কর্পোরেশন সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন থাকিবে কথা আছে। কিন্তু যেভাবে আগামী সাধারণ নির্বাচনের কাজ চলিতেছে, তাহাতে পূজার ছুটির

সময়ে কাজ চালাইলেও আগামী ডিসেম্বর মাসে নির্বাচন করা সম্ভব হইবে না। কাজেই নির্বাচন মার্চ মাস পর্যন্ত পিছাইয়া যাইবে ও কর্পোরেশন আরও ৩ মাস সরকারী নিয়ন্ত্রণে রাখা প্রয়োজন হইবে। এইভাবে নির্বাচন ক্রমেই পিছাইয়া যাইতেছে। যখন আগামী ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত কর্পোরেশন সরকারী নিয়ন্ত্রণে রাখা স্থির হয়, তখনই কর্তৃপক্ষের একরূপ ব্যবস্থা করা উচিত ছিল, যেন ডিসেম্বরের মধ্যে নির্বাচন কার্য শেষ হয়। যে সকল বড় বড় সরকারী কর্মচারী বর্তমানে কর্পোরেশনের কার্য পরিচালনা করিতেছেন, ইহাই কি তাঁহাদের কর্মদক্ষতার পরিচয়?

#### কংগ্রেসের নুতন সভাপতি—

যুক্তপ্রদেশের খ্যাতনামা কংগ্রেস নেতা শ্রী পুরুষোত্তমদাস ট্যাগুন সম্প্রতি সর্কাপেক্ষা অধিক ভোট পাইয়া নাসিক কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হইয়াছেন। মোট তিনজন প্রার্থী নিম্নলিখিতরূপ ভোট পাইয়াছেন—

শ্রী ট্যাগুন—১৩০৬ ভোট

আচার্য কৃপালনী—১০২২ ভোট

শ্রী শঙ্কররাও দেও—২০২ ভোট

শ্রীযুত ট্যাগুন বাস্তহারাদের দরদী বন্ধু—তাঁহার নির্বাচনে বাস্তহারার সমস্ত সম্পর্কে কংগ্রেসের কার্য পদ্ধতি পরিবর্তনের আশা করা যায়। পণ্ডিত নেহরু আচার্য কৃপালনীকে সমর্থন করিয়াছিলেন—তাঁহার পরাজয়ে পণ্ডিত নেহরুর মন্ত্রিসভার কার্যপদ্ধতি পরিবর্তিত হইবে বলিয়া মনে হইতেছে। নাসিক কংগ্রেসের পর শ্রীযুত ট্যাগুন কংগ্রেস তথা দেশ পরিচালনের নূতন কার্যভার গ্রহণ করিবেন। বিদ্যায়ী সভাপতি ডাঃ পট্টভী সীতারামিয়ার কার্যকালে দেশবাসী কংগ্রেস সভাপতির কোনরূপ প্রভাবের বিষয় বুঝিতে পারে নাই। শ্রী ট্যাগুন শক্তিশালী লোক—আমাদের বিশ্বাস তাঁহার কার্যকালে কংগ্রেস নূতন ধারায় কার্যারম্ভ করিতে সমর্থ হইবে।

#### ভারতের নুতন লর্ড বিশপ—

রেভারেন্ড অরবিন্দনাথ মুখোপাধ্যায় গত ২রা সেপ্টেম্বর কলিকাতার সেন্ট গিলস্‌ চার্চের ভারত, পাকিস্তান, সিংহল ও ব্রহ্মের নূতন য়েটপলিটান বা লাট পাদরী নির্বাচিত হইয়াছেন। তাঁহার বয়স বর্তমানে ৫৭ বৎসর, তিনি উক্ত ৩টি দেশবাসী ৪ লক্ষ খৃষ্টানের ধর্মগুরু হইলেন। তিনি

কলিকাতার চতুর্দশ লর্ড বিশপ—তাঁহার পূর্বে আর কোন ভারতীয় এই উচ্চপদ লাভ করেন নাই। শনিবার তাঁহার কার্যভার গ্রহণের অহুষ্ঠানের পর তিনি বলিয়াছেন—নূতন ধর্মগুরু যদি সেবার দ্বারা জনগণের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে তবেই তাঁহার নির্বাচন সার্থক হইবে। তিনি সকল ধর্মগুরুকে সেই আদর্শে কাজ করিতে উপদেশ দিয়াছেন।

#### আবার রেল দুর্ঘটনা—

জসিমির নিকট ই-আই-রেল যে ভীষণ দুর্ঘটনা হইয়াছিল, সে সন্ধ্যা পাকিস্তানী গুপ্তচরদের বড়বজ্রের সংবাদ আমরা অজ্ঞ প্রদান করিয়াছি। গত ৩রা সেপ্টেম্বর পূর্বপাঞ্জাব রেলপথে দীননগর ও গুরুদাসপুর রেল ষ্টেশনের মধ্যে কাশ্মীর মেল লাইনচ্যুত হওয়ায় একটি পুলের উপর হইতে তিনখানা কামরা নীচে এক নালায় পতিত হয়—ফলে ২০ জন নিহত ও ৪৫ জন আহত হইয়াছে। ১৯৪৯—৫০ সালে এক বৎসরে ভারতে ১৬টি রেল দুর্ঘটনা হইয়াছে। রেলদুর্ঘটনার সংখ্যা দিন দিন বাড়িয়া চলিয়াছে। রেল পরিচালনের ব্যয় বৃদ্ধির সহিত উহার কার্যকারিতা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় নাই। বরং দিন দিন রেলের পরিচালনার ক্রটিই বাড়িয়া যাইতেছে। ইহার প্রতিকারের কোন ব্যবস্থার কথা শুনা যায় না। দেশ যে ক্রমে ধ্বংসের দিকে অগ্রসর হইতেছে, সে বিষয়ে সকল সন্দেহ দূর হইতেছে।

#### পশ্চিম জাপানে ঝড় ও হত্যা—

পশ্চিম জাপানে ভীষণ টাইফুন অর্থাৎ ঝড় ও বস্তার ফলে ২৫০ জন লোক নিহত এবং আড়াই লক্ষ লোক গৃহহীন হইয়াছে। গত ১৬ বৎসরের মধ্যে জাপানে একরূপ প্রভূত ক্ষতি আর হয় নাই। ১ লক্ষ ৭০ হাজার গৃহ জলে ভাসিয়া গিয়াছে—৭ শত জাহাজ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। ওসাকা কোরে ও কিয়োটোর জনবহুল স্থানগুলিই বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। পৃথিবীর সর্বত্র ধ্বংসলীলা আরম্ভ হইয়াছে দেখা যাইতেছে।

#### শ্রী আনন্দমোহন সহায়—

খ্যাতনামা দেশ সেবক শ্রী আনন্দমোহন সহায় বঙ্গ পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ ভারত গভর্নমেন্টের কমিশনার নিযুক্ত হইয়াছেন। তিনি ভাগলপুরের অধিবাসী, ১৯০৫ সালের বিপ্লববাদ আন্দোলনে কাজ করিয়া পলাতক হিসাবে তিনি ৩০ বৎসর জাপানে বাস করিয়াছিলেন। নেতাজী

স্বত্বাচর্যের আজাদ হিন্দ সরকারেরও তিনি অত্যন্ত মন্ত্রী ছিলেন। তিনি দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের পরিবারে বিবাহ করিয়াছেন। তাঁহার নিয়োগে সকলেই আনন্দিত হইবেন।

### কান্দীশ ও পূর্ববঙ্গ সমস্যা—

গত ৩রা সেপ্টেম্বর পশ্চিম বাংলায় বাঙ্গালার দিবস পালন উপলক্ষে কলিকাতা দেশবন্ধু পার্কে এক বিরাট জনসভায় ডক্টর শ্রীশ্রীমা প্রসাদ মুখোপাধ্যায় বক্তৃতা করেন। তিনি বলিয়াছেন—“কান্দীশ সম্পর্কে পাকিস্তানের সঙ্গে শত্রুতা ও পূর্ববাংলা সম্পর্কে বন্ধুত্বের নীতি যদি পণ্ডিত নেহরু অবলম্বন করেন, তাহা হইলে তিনি ভারতবর্ষকে ধ্বংসের দিকে আগাইয়া লইয়া যাইবেন। পূর্ববঙ্গে হিন্দু বিতাড়ন নীতি গ্রহণ করিয়া পাকিস্তান যুদ্ধ ঘোষণা না করিয়াই ভারতের বিরুদ্ধে যুদ্ধের পন্থা গ্রহণ করিয়াছেন। কান্দীশে তাহার আক্রমণাত্মক নীতি গ্রহণ করিয়াছে। সুতরাং পাকিস্তানের বিরুদ্ধে অর্থ নীতিক প্রতিরোধই হউক কিংবা সামরিক ব্যবস্থাই হউক, কান্দীশ ও পূর্ববঙ্গ উভয়ক্ষেত্রেই পাকিস্তানের সঙ্গে ব্যবহারে একই কুটনীতি দ্বারা পরিচালিত হওয়া পণ্ডিত নেহরুর কর্তব্য।” ডক্টর শ্রীশ্রীমা প্রসাদের এই উক্তির উপর মন্তব্য নিম্নয়োজন। কান্দীশ ও পূর্ববঙ্গ সমস্যা আমাদের ক্রমে হতাশ করিতেছে।

### বাক্সালার অবস্থা আলোচনা—

গত ৭ই আগষ্ট দিল্লীতে ভারতীয় গবর্ণমেন্টের সভায় ডক্টর শ্রীশ্রীমা প্রসাদ মুখোপাধ্যায় ৭৫ মিনিট কাল বক্তৃতা করিয়া যে ভাবে বাক্সালার প্রকৃত অবস্থার কথা প্রকাশ করিয়াছেন, তজ্জন্ত তিনি বঙ্গবাসী মাঝেরই ধন্যবাদের পাত্র। তাঁহার বক্তৃতায় যে ভাবে বাক্সালীর বর্তমান দুর্-বস্থার কথা ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহাতে পাষণ্ড গলিয়া

যায়। কিন্তু প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত জহরলাল নেহরু ডক্টর শ্রীশ্রীমা প্রসাদের এই বক্তৃতার পরও মনোভাব পরিবর্তন করা প্রয়োজন মনে করেন নাই। অধিকন্তু এমনভাবে শ্রীমা প্রসাদবাবুর বক্তৃতার সমালোচনা করিয়াছেন যে তাহাতে হস্ত সঞ্চরণ করা যায় না। একটি প্রদেশে যে সময়ে বহু লক্ষ লোক নানা দুঃখ কষ্টের মধ্যে পড়িয়া ঘৃণ্য জীবন যাপন করিতে বাধ্য হইতেছে, সে সময়ে ভারতের প্রধান মন্ত্রীর পক্ষে এইরূপ উক্তি শুধু অশোভন নহে, বান্দালীজাতির পক্ষে অসম্মানজনক বলিয়া আমরা মনে করি। পূর্ববঙ্গ হইতে আজ পশ্চিম বাংলায় ৫০ লক্ষেরও অধিক অধিবাসী চলিয়া আসিয়াছে, তাহাদের অভিযোগের অন্ত নাই। পণ্ডিতজী সামান্ত মাত্র সাহায্যের ব্যবস্থা ব্যতীত তাহাদের কোন দুঃখেরই লাভ করিতে সমর্থ হন নাই। তথাপি তিনি এই সমস্যার স্থায়ী প্রতীকার সম্বন্ধে কিছু করিবেন না। অপর পক্ষ যখন তাঁহার সহিত চুক্তি করিয়া সেই চুক্তির সর্ব নানারূপে ভঙ্গ করিতেছে, তখনও পণ্ডিতজী সেই চুক্তি কার্যকরী করার কথা চিন্তা করেন। তিনি পার্লামেন্টে যখন বলিয়াছেন—“লোক বিনিময়, সীমান্তের রদবদল বা দেশ বিভাগ রদ করার আলোচনা স্বপ্নবিলাসিতা ও অবাস্তব”—তখন তাহা শুনিয়া আমরা স্তম্ভিত হইয়াছি। ভারত সরকার বর্তমান অবস্থায় কি করিবেন, তাহা পণ্ডিতজী বলেন না, সম্ভবতঃ কোন সুনিশ্চিত পথও স্থির হয় নাই। পাকিস্তানীদের চুক্তি মান্ত করিতে তিনি বাধ্য করিবার কোন উপায় চিন্তা করেন না। তাঁহার উক্তরূপ উক্তির পর এবং মনোভাব দেখিয়া বাক্সালী নিরাশ হইয়াছে। এই নৈরাশ ও মনোবেদনা হইতে কে বাক্সালীকে রক্ষা করিবে জানি না।

## দেবী-পূজা

### শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা

১

জ্যোৎস্না-উতল নীলধরের শুভ্র-স্বপ্নময়  
আকুল-জীবন-দুঃখ-ভাঙ্গানো আলোর প্রাণন নয়।  
উষ্মি-নিধর-কিরণ-সাগরে করেছি অতীতে গান  
শরৎ-প্রভাতে সোণার আলোর গেয়েছি অনেক গান।

দেবী, ফুটেছে মানস-হৃদে

খেত-শতদল, দিয়াছি আনিয়া পুষ্পাঞ্জলি পদে।

২

আজি চারিদিকে কল-কল্লোল, প্রলয়-বচা আগে,  
কাঁপে ধর ধর ভূমি অরণ্য, ভূধরে কাঁপন লাগে।  
যা-কিছু অচল হ'ল চঞ্চল, আকাশ, জীবন, জড়,  
তুনি ঝড়ের রথ-চক্রের উদ্দাম ঘর্ষন।

দেবী, পৃথিবী উঠিছে তুলি,

হৃদয় ছিন্ন করিয়া এনেছি রক্ত-কমল তুলি।



## ক্রিকেটনাথ রায়

হৃদাংশুশেখর চট্টোপাধ্যায়

### টেস্ট ক্রিকেট ৪

ওয়েস্ট ইন্ডিজ : ৫০০

ইংলণ্ড : ৩৪৪ ও ১০০

‘ওভালে অস্থিত চতুর্থ টেস্ট ম্যাচে, ওয়েস্ট ইন্ডিজ ১ ইনিংস এবং ৫৬ রাণে ইংলণ্ডকে হারিয়ে এ বছরের ইংলণ্ড সফরে টেস্ট সিরিজের বাকী টেস্ট ম্যাচে জয়লাভের দক্ষণ ‘রাবার’ লাভ করেছে। ইংলণ্ডে অস্থিত টেস্ট খেলায় ওয়েস্ট ইন্ডিজ দল এই প্রথম ‘রাবার’ পেল। ইংলণ্ড বনাম ওয়েস্ট ইন্ডিজের প্রথম টেস্ট ম্যাচ খেলা আরম্ভ হয় ১৯২৮ সালে লর্ডসে। এ পর্যন্ত উভয় দেশের মধ্যে মোট ৭টি টেস্ট সিরিজ খেলা হয়েছে। ইংলণ্ড ওবার (১৯২৮, ১৯৩৩, ১৯৩৯) ‘রাবার’ পেয়েছে। ওয়েস্ট ইন্ডিজও পেয়েছে ৩ বার, ১৯৩৪-৩৫, ১৯৪৮ ও ১৯৫০। মাত্র একবার ১৯২৯-৩০ সালের টেস্ট সিরিজ অসমাপ্তিত থকে যায়। ঐ বছর ১ম ও ৪র্থ টেস্টে জয়। ২য় টেস্টে ইংলণ্ড এবং ৩য় টেস্টে ওয়েস্ট ইন্ডিজ জয়ী হয়। এ পর্যন্ত ইংলণ্ড-ওয়েস্ট ইন্ডিজের মধ্যে ৭টি টেস্ট সিরিজ খেলা হয়েছে। একমাত্র ১৯৪৮ সালে ওয়েস্ট ইন্ডিজ অস্থিত ৪টি টেস্ট খেলার মধ্যে ইংলণ্ড একটি টেস্ট খেলাতেও জয়লাভ করতে পারে নি। বাকি টেস্ট সিরিজের কোন না কোন খেলায় ইংলণ্ড জয়ী হয়েছে।

আলোচ্য বছরের টেস্ট সিরিজে (১৯৫০ সাল) ইংলণ্ড ১ম টেস্ট খেলায় জয়লাভ করে। বাকি ৩টি টেস্ট খেলায় ওয়েস্ট ইন্ডিজ দল পর্যায়ক্রমে জয়লাভ করে ‘রাবার’ পেয়েছে। ইংলণ্ডের আজ বড় দুর্দিন! আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ব্রিটিশ সিংহের দুর্দান্ত প্রতাপ লোপ পেয়েছে, বিরাট সাম্রাজ্য হাত ছাড়া হয়েছে, পৃথিবীর

বিরাট অঞ্চল জুড়ে ব্রিটিশ জাতির ব্যবসায়-বাণিজ্যের যে সুদূর বেড়াবাল বিস্তারিত ছিল তা আজ সংকীর্ণ হয়ে গেছে। যুদ্ধ এবং অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের দক্ষণ খেলা-খুলাতেও ব্রিটিশ জাতি তার পূর্ব প্রভু হারিয়ে ফেলেছে। ক্রিকেট ইংলণ্ডের জাতীয় খেলা। এই ক্রিকেটের টেস্ট খেলায় ওয়েস্ট ইন্ডিজের কাছে ইংলণ্ডের শোচনীয় পরাজয় কেবল ইংলণ্ডে নয় সমগ্র ক্রিকেট খেলার জগতে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা।

১২ই আগস্ট ওভালে ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলের অধিনায়ক গডার্ড টসে দিতে প্রথম ব্যাট করার সুযোগ নিলেন। প্রথম দিনের খেলার নির্দিষ্ট সময়ে ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলের ১ম ইনিংসের ৩ উইকেটে ২৯৫ রাণ উঠে। এ রে ১০৯ এবং ওরেল ১১০ রাণ করে নট আউট থাকেন।

টেস্ট খেলার দ্বিতীয় দিন ১৪ই আগস্ট ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলের ১ম ইনিংস ৫০০ রাণে শেষ হয়। উল্লেখযোগ্য রাণ ওরেল ১৩৮, রে ১০৯, গোমেজ ৭৪ এবং গডার্ড ৫৮ রাণ। ইংলণ্ডের রাইট ১৪১ রাণে ৫টা উইকেট পান। নির্দিষ্ট সময়ে কোন উইকেট না হারিয়ে ইংলণ্ডের প্রথম ইনিংসে ২৯ রাণ উঠে।

১৫ই আগস্ট, তৃতীয় দিনে ইংলণ্ডের ৩ উইকেটে ২৩৮ রাণ উঠে। ইংলণ্ডের ওপনিং ব্যাটসম্যান হাটন ১০৭ রাণ করে নট আউট থাকেন। ব্রিটিশ জাতি খেলায় বাধা পড়ে।

১৬ই আগস্ট, চতুর্থ দিনে ইংলণ্ডের ১ম ইনিংস ৩৪৪ রাণে শেষ হয়। ওপনিং ব্যাটসম্যান এল হাটন ২০২ রাণ করে শেষ পর্যন্ত নট আউট থেকে যান। ইংলণ্ডের ম্যাচে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে ১৯৩৯ সালে এল হাটন ১৯৩ রাণ

ক'রে ইংলণ্ডের পক্ষে ব্যক্তিগত সর্বোচ্চ রাণের রেকর্ড স্থাপন করেন। ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে এস হাটনের ২০২ রাণ আজ ইংলণ্ডের মাটিতে ইংলণ্ডের পক্ষে ব্যক্তিগত সর্বোচ্চ রাণ হিসাবে রেকর্ড হয়েছে। ছুঁত্যা-বশতঃ ডেনিস কম্পটন ৪৪ রাণে রাণ আউট হন। গডার্ড এবং ভ্যালেনটাইন যথাক্রমে ৪টে ক'রে উইকেট পান। ইংলণ্ডের শেষ ৬টা উইকেট ৬২ রাণে পড়ে যায়। গডার্ড ২৫ রাণে ৪টে উইকেট পান। কলো-অন ক'রে ইংলণ্ড দ্বিতীয় ইনিংসে মাত্র ১০৩ রাণ তুলেছিলো। ভ্যালেনটাইন ৬টা উইকেট পান; রামাধীন পান ৩টে। ওয়েস্ট ইন্ডিজ ১ ইনিংস এবং ৫৬ রাণে ওয়েস্ট ইন্ডিজকে পরাজিত করে।

### ইংলণ্ড : ওয়েস্ট ইন্ডিজ

	টেস্ট সিরিজ	ইংলণ্ড জয়ী	ওয়েস্ট ই: জয়ী	ড্র
ইংলণ্ড	৪	৩	১	০
ওয়েস্ট ইন্ডিজ	৩	০	২	১
মোট	৭	৩	৩	১

	টেস্ট ম্যাচ	ইংলণ্ড জয়ী	ওয়েস্ট ই: জয়ী	ড্র
ইংলণ্ড	১৩	৭	৩	৩
ওয়েস্ট ইন্ডিজ	১২	২	৫	৫
মোট	২৫	৯	৮	৮

এক ইনিংসে সর্বোচ্চ রাণ : ইংলণ্ড—৮৪৯ (১ম ইনিংস, ৪র্থ টেস্ট; কিংসটোন, ১৯২৯-৩০)

ওয়েস্ট ইন্ডিজ—৫৫৮ (১ম ইনিংস, ৩য় টেস্ট; ট্রেস্ট হাঁজ, ১৯৫০)

ইংলণ্ড ১ ইনিংসে সর্বোচ্চ রাণ (উভয় দলের মধ্যে) : ৫৫৮ (ওয়েস্ট ইন্ডিজ; ৩য় টেস্ট, ১৯৫০)

ওয়েস্ট ইন্ডিজ ১ ইনিংসে সর্বোচ্চ রাণ : ৮৪৯ (ইংলণ্ড, ১র্থ টেস্ট, ১৯২৯-৩০)

ব্যক্তিগত সর্বোচ্চ রাণ (ইংলণ্ড) : ৩২৫ (এ শ্রাও-ফ্রম; ৪র্থ টেস্ট, ১৯২৯-৩০)

ব্যক্তিগত সর্বোচ্চ রাণ (ও: ই:): ২৭০ (জর্জ ডুলে; ৪র্থ টেস্ট ১৯৩৪-৩৫)

সর্ব নিম্ন রাণ (ইংলণ্ড) : ১০৩ (২য় ইনিংস; ৪র্থ টেস্ট, ১৯৩৪-৩৫)

সর্ব নিম্ন রাণ (ও: ইন্ডিজ) : ৯৭ (প্রথম ইনিংস; ১ম টেস্ট ১৯৩৩)

একশত 'সেকুরী' :

প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেট খেলায় এ পর্যন্ত ১২ জন ক্রিকেট খেলোয়াড় একশত সংখ্যক 'সেকুরী' করার সম্মানলাভ করেছেন। ১৯৪৮ সালে স্ত্রর ডন্ ব্র্যাডম্যানের একশত সংখ্যক 'সেকুরী' করার পর ১৯৫০ সালের ৫ই আগস্ট ইংলণ্ডের ভূতপূর্ব উইকেট কিপার লেসলী এম্‌স প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেট খেলায় একশত 'সেকুরী' করেন। বীরা এই সম্মান লাভ ক'রেছেন তাঁদের নাম যথাক্রমে : (১) জ্যাক হব্‌স্ (২) প্যাটসী হেগ্‌গেন, (৩) ওয়ালী হামণ্ড (৪) ফিলিপ মীড (৫) হার্বার্ট সাটক্রিক (৬) জ্যাক উলী (৭) ডব্লু জি গ্রেস (৮) এ্যাণ্ডি শ্রাও হাম (৯) টম হেগওয়ার্ড (১০) আর্নেস্ট টিওমলি (১১) স্ত্রর ডন ব্র্যাডম্যান (১২) লেসলী এম্‌স।

### রঞ্জি ট্রফি স্ত্রয়াম :

বিখ্যাত ইডেন উডানে 'স্ত্রাশনাল ক্রিকেট ক্লাব'র উদ্যোগে গত ১৫ই আগস্ট ভারতীয় স্বাধীনতা দিবসে 'রঞ্জি ট্রফি স্ত্রয়াম'র ভিত্তি স্থাপন করেছেন মুখ্য মন্ত্রী মাননীয় শ্রীযুক্ত বিধানচন্দ্র রায়। ক্যালকাটা ক্রিকেট ক্লাবের কর্তৃপক্ষ বিগত ১২৫ বছর এই জমিটির মালিকানা স্বত্ব উপভোগ ক'রে স্ত্রাশনাল ক্রিকেট ক্লাবের কাছে প্যাভিলনসহ জমিটি বিক্রী করায় খেলোয়াড় স্ত্রলভ মনোভাবের পরিচয় দিয়ে-ছেন। কিন্তু ক্রিকেট ট্রফি স্ত্রয়াম নির্মাণের সংবাদে ক'লকাতার ক্রুটবল মাঠের দর্শকদের মনে সেই কথাই মনে পড়ছে 'কৃষ্ণায় কাতর হয়ে চাহিলাম জল, এনে দিল আধখানা পাকা বেল।' ক'লকাতার ক্রিকেট খেলার থেকে ক্রুটবল খেলা অনেক বেশী জনপ্রিয় এবং খেলার মাঠে স্থানান্তর সমস্তা আজ ক'লকাতা সহরের অন্ততম জাতীয় সমস্তার অন্তর্গত বলা তুল হবে না। দর্শকেরা যে অপরিণীম কষ্ট সহিষ্ণুতার মধ্যে ক্রুটবল খেলার মাঠে নির্দোষ আনন্দ উপভোগ করতে যায় তা জাতীয় উত্তম অপচরের সঙ্গে তুলনা করা চলে। খৈরোয়ও একটা সীমা আছে। সে সীমা অতিক্রম করতে দর্শকদের বাধ্য করলে খেলার মাঠে আজ যে স্থানান্তর নিয়ে দাখাখাখানা চলছে তা কেবল পুলিশ দিয়ে রোধ করা সহজ হবে না। খেলার



মাঠের সমাজ-বিরোধী কাজ স্বভাবতই সমাজদেহের অত্যন্ত অংশ সংক্রামক ব্যাধির দ্বারা বিস্তার লাভ করবে। টেডিয়াম নির্মাণই হ'ল খেলার মাঠে সমাজ-বিরোধী কাজের অন্ততম প্রতিরোধক ব্যবস্থা।

### ইণ্ডিয়ান লাইফ সেভিং সোসাইটি ৪

আমাদের এই নদীমাতৃক বাংলা দেশে নৌকাডুবি অথবা জলাশয়ে আকস্মিক দুর্ঘটনার পড়ে বহুলোক অসহায় প্রাণত্যাগ করে। জলমগ্ন ব্যক্তিকে জল থেকে উদ্ধার করা এক পরম পুণ্য কাজ। দেখা গেছে, জলমগ্ন ব্যক্তির অসহায় অবস্থা এবং আত্মল আবেদন মাথামুখে উদ্ধার কার্যে আকর্ষণ না ক'রে পারে না। ফলে বেলীর ভাগ লোকই জীবন উদ্ধারের প্রেরণার নিজ জীবনের বিপদের কথা ভুলে গিয়ে প্রস্তুত না হয়েই জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে। এ ধরনের উদ্ধার কার্যে উভয়ের পক্ষে যথেষ্ট বিপদ আছে। জলমগ্ন ব্যক্তির নিজ জীবন রক্ষার চেষ্টা ছাড়া অপর কোন দিকে জ্ঞান থাকে না। ফলে দেখা গেছে অনেকক্ষেত্রে জলমগ্ন ব্যক্তি উদ্ধার কর্তাকেই হাতের লাগালে পেয়ে জড়িয়ে ধরে এক সঙ্গে জলে ডুবে প্রাণ ত্যাগ করেছে। অপরের প্রাণ রক্ষার জন্য নিজ প্রাণ উৎসর্গের মধ্যে যথেষ্ট বীরত্ব এবং মহত্ব আছে সত্য। কিন্তু যেখানে কিছুটা প্রস্তুত হয়ে গেলে নিজের জীবনকে বিপন্ন না ক'রে অপরকে জীবন রক্ষা সহজ হয় সেখানে অপ্রস্তুত হয়ে জলে ঝাঁপিয়ে পড়াটা নিবৃত্তিকারই পরিচয়।

জলমগ্ন ব্যক্তিকে জল থেকে সহজে উদ্ধারের কতকগুলি কৌশল আছে। এ কৌশল জানা থাকলে কখনও জলাশয়ের পাড়ে দাঁড়িয়ে অসহায় দর্শক হিসাবে জলমগ্ন ব্যক্তির অসহায় মৃত্যু দেখতে হয় না। এই কৌশলগুলি কঠিন নয়, সহজই। কেবল শিক্ষা এবং অভ্যাসের প্রয়োজন। আমাদের সকলেরই যেমন কিছু কিছু সঁতার জেনে রাখা দরকার তেমনি সেই সঙ্গে জলমগ্ন ব্যক্তির উদ্ধারের কৌশলগুলি জানা থাকলে আমরা এই আকস্মিক দুর্ঘটনা থেকে বহু জীবন রক্ষা করতে পারি। সঁতার শিক্ষার প্রয়োজন কেবল দুর্ঘটনার হাত থেকে রক্ষার জন্যই নয়, সুস্থ এবং সুঠাম দেহ গঠনের পক্ষে সঁতার বিশেষ কার্যকরী ব্যায়াম।

এইদিক থেকে দক্ষিণ ক'লকাতা অঞ্চলের ঢাকুরিয়া লেকে অবস্থিত 'ইণ্ডিয়ান লাইফ সেভিং সোসাইটি' যথেষ্ট গঠনমূলক কাজের পরিচয় দিয়েছেন। এইরূপ প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা আরও বৃদ্ধি হওয়া উচিত। ক'লকাতার লোক-সংখ্যার এক বিরাট অংশ প্রতিদিন গঙ্গায় নান করে। এবং প্রতি বছরই গঙ্গায় নৌকাডুবি এবং জলমগ্নের বহু দুর্ঘটনা সংবাদপত্রে আমরা দেখতে পাই। এ থেকেই 'লাইফ সেভিং' শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা আমরা উপলব্ধি করতে পারি।

সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গের প্রদেশপাল ডাঃ কৈলাসনাথ কাটকুর সভাপতিত্বে 'ইণ্ডিয়ান লাইফ সেভিং সোসাইটির' ২৮তম বাৎসরিক প্রতিষ্ঠা-দিবস সাফল্যের সঙ্গে উদ্‌যাপিত হয়ে গেল। এই জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ক'লকাতার বহু শিক্ষিত বিশিষ্ট নাগরিকের যোগাযোগ আছে। এই প্রতিষ্ঠানের একটি বৃহৎ গঠনমূলক পরিকল্পনার কথা আমরা শুনেছি। এর জন্য প্রচুর জমির প্রয়োজন।

জনসাধারণ এবং সরকারের সহযোগিতার উপর এই পরিকল্পনার সাফল্য এবং প্রতিষ্ঠানের ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে। আমরা আশা করি আমাদের জাতীয় সরকার এই প্রতিষ্ঠানের জমি সংগ্রহ ব্যাপারে সহযোগিতা ক'রে প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য সার্থক করবেন।

### সন্তোষ ট্রফি ৪

ক'লকাতায় অল্পপ্রতিষ্ঠিত জাতীয় ফুটবল প্রতিযোগিতার এ বছরের ফাইনালে গত বছরের ফাইনাল বিজয়ী বাঙ্গলা প্রদেশ ১-০ গোলে গতবারের বিজিত হায়দ্রাবাদদলকে পুনরায় হারিয়ে উপর্যুপরি দু'বার 'সন্তোষ ট্রফি' বিজয়ী হয়েছে। জাতীয় ফুটবল প্রতিযোগিতায় 'সন্তোষ ট্রফি' বিজয়ের যথেষ্ট গুরুত্ব থাকা সত্ত্বেও বাঙ্গলা দেশের এ জালাতে গৌরববোধ এবং খেলায় আনন্দলাভ করেছেন এমন দর্শক অথবা ক্রীড়ামোদীর সংখ্যা খুবই কম পাওয়া যাবে এ কথা বলা অসম্ভব হবে না। খেলাধুলার একমাত্র জয়লাভই আমাদের কাছে বড় কথা অর্থাৎ জয়লাভ যে কোন ভাবেই হোক—কীক তালে গোল ক'রে অথবা জাতীয় সার্থক দল দিয়ে বাইরের খেলোয়াড় দিয়ে খেলিয়ে, তাঁরা অবিভি এ ধরনের জয়লাভে গর্ববোধ এবং আনন্দ উপভোগ ছই করতে

পারেন ; মনের এ পরিচয় নিতান্তই ব্যক্তিগত এবং স্বার্থের সঙ্গে জড়িত, জাতীয় অভ্যুদয়ের পক্ষে ঘোর অনিষ্টকর। বাংলাদেশের ফুটবল দল গঠন ব্যাপারে খেলোয়াড় মনোনিয়ন কমিটি বরং জাতীয় স্বার্থ উপেক্ষা করেছেন, তবু প্রাদেশিকতার পরিচয় দেন নি। জাতীয় স্বার্থ বলি দিয়েও তাঁরা কিছু সমালোচনার হাত থেকে রেহাই পান নি। এই উদার মনোভাবের ফাঁকি তাতে বাংলাদেশের যে ফুটবল খেলায় নিজ নাম সুপ্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য ছিল, বিভিন্ন প্রদেশে এ অভিযোগ উঠা খুব স্বাভাবিক। প্রতিযোগিতার বিভিন্নস্তরে বাংলাদেশ দলে এমন কয়েকজন বহিরাগত বাছাই ফুটবল খেলোয়াড় যোগদান ক'রেছিলেন যারা একমাত্র ফুটবল খেলার উদ্দেশ্যে ফুটবল মরসুমে ক'লকাতায় বিভিন্ন ক্লাবের পক্ষে যোগদান করেন এবং মরসুম শেষে স্বদেশে ফিরে যান বা যেতেন। অন্ত্যন্ত প্রদেশের বাছাই করা খেলোয়াড়দের সহযোগিতা ভিন্ন বাংলাদেশ জাতীয় ফুটবল প্রতিযোগিতায় কতখানি সাফল্য লাভ করতে পারতো তার অগ্নি পরীক্ষা হয় নি। 'সস্তোষ ট্রফি' প্রতিযোগিতায় যোগদানকারী কোন কোন প্রাদেশিক দলে ছ' চার জন বাংলাদেশী ফুটবল খেলোয়াড়কে খেলতে দেখা গেছে কিন্তু এই নিয়ে আত্মপ্রশংসা সমর্থনে আমরা অপর কোন দলকে কটাক্ষপাত করতে পারি না। কারণ ঐ সব বাংলাদেশী খেলোয়াড় স্থানীয় বাসিন্দা হিসাবেই প্রাদেশিক দলে মনোনীত হয়েছিলেন, বাংলাদেশ দেশ থেকে ফুটবল খেলানোর উদ্দেশ্যে তাঁদের নিয়ে গিয়ে দলভুক্ত করা হয় নি। আমাদের সঙ্গে বড় প্রভেদ এইখানেই। জাতীয় ফুটবল প্রতিযোগিতায় বাংলাদেশ দেশ আজ যে সাফল্য লাভ করেছে তার মূলে বিভিন্ন প্রদেশের বাছাই করা ফুটবল খেলোয়াড়দের সহযোগিতা রয়েছে—যে সহযোগিতা লাভ ক'রে বাংলাদেশ দেশ ঐ সব বাইরের খেলোয়াড়দের নিজ নিজ প্রাদেশিক দলে যোগদান করে থেকে বঞ্চিত করেছে।

নিজ প্রদেশের ফুটবল দলকে জাতীয় ফুটবল প্রতিযোগিতায় সহযোগিতা করা খেলোয়াড়দের পক্ষে কতখানি গরিব এবং মহত্বের পরিচয় এ কথা লিখে বলার প্রয়োজন হয়

না। কিন্তু ক'লকাতায় বিভিন্ন ক্লাবে যোগদান করার ফলে অলিম্পিক প্রত্যাগতসহ অনেক নামকরা বাইরের খেলোয়াড় নিজ নিজ প্রদেশকে তাঁদের সহযোগিতা থেকে বঞ্চিত করেছেন। ফলে ভারতীয় ফুটবল মহলে বাংলাদেশ আজ তাঁর নাম প্রতিষ্ঠা করতে যে যথেষ্ট সুবিধা পেয়েছে একথা চুই লোকের নয়। বাইরের খেলোয়াড়দের মধ্যে এই যে নৈতিক অবনতি এবং আদর্শ চ্যুতি দেখা দিয়েছে এর জন্য বাংলাদেশের ফুটবল খেলার নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষের কাছে প্রশ্ন করা অসম্ভব হবে না ; কারণ বাংলাদেশ নিজ আত্ম-মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখতে এঁদের অনেকের সহযোগিতা গ্রহণ করেছে এবং বাইরের অনেক নামকরা খেলোয়াড়দের নিজ নিজ প্রাদেশিক দলের খেলায় যোগদান থেকে বঞ্চিত করেছে। বাইরের খেলোয়াড়রা কিসের আকর্ষণে স্বদেশ, আত্মীয়-স্বজন ত্যাগ ক'রতে এবং নিজ প্রাদেশিক ফুটবল দলে সহযোগিতা না করতে উৎসাহবোধ করেন এ প্রশ্নের উত্তর লিখে বলার প্রয়োজন হয় না, খেলার মাঠে এ বছর 'Open Secrete-এ' দাঁড়িয়েছে।

বাংলালীর বহু অতীত গৌরব-গাথা আছে। বর্তমানের ভ্রান্ত নীতির ফলে শীঘ্রই বাংলাদেশের জাতীয় ষাটষত্রে আর একটি গৌরব স্তম্ভের স্থান সঙ্কুলানের ব্যবস্থা হতে চলেছে। মহা সমারোহে স্তম্ভের গায়ে গৌরব গাথার ফলকটি উৎকীর্ণ ক'রে কর্তব্য সম্পাদন করা হবে। নিকট ভবিষ্যতে আমাদের বংশধরেরা তার তলায় অবাধ বিশ্বাস দাঁড়িয়ে দেখবে—বাংলালী এককালে ফুটবল খেলার পথপ্রদর্শক ছিল। এবং ভারতীয় ফুটবল খেলার ইতিহাসে বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠত্ব একদিন প্রমাণিত হয়েছিল। কিন্তু এ সমস্তই হবে তখন তাদের কাছে অতীতের নিদর্শন। বাস্তবজীবনে এর কোন নিদর্শনই খুঁজে পাবে না। ব্যক্তিগত এবং দলগত স্বার্থবুদ্ধি এবং অবিমূঢ়কারিতার ফলে বাংলাদেশের ফুটবল খেলা যে সঙ্কটজনক অবস্থার দিকে ক্রমশঃ এগিয়ে চলেছে সেই কঠোর বাস্তব ঘটনা ঘটতে বেশী দেরী নেই যদি শুভবুদ্ধি এখনও জাগ্রত না হয়। ইহা আমাদের পক্ষে আজ গৌরব এবং আত্মপ্রশংসার কথা নয়।



## নব-প্রকাশিত পুস্তকাবলী

শ্রীঅনিলকুমার বিদ্যাস-সম্পাদিত কাব্যগ্রন্থ মহাকাব্য কালিদাসের “মলোচর”—৩০।	বিদ্যনাথ চট্টোপাধ্যায় এগীত উপভাস “শেব কোথা”—২১০, “হোটেলের রাজপুত্র জীবন-সন্ধ্যা”—১১।
তরুণ রায় এগীত উপভাস “জিজ্ঞাসা”—২১।	শ্রীনীলমণি দাশ এগীত “ব্যাম্বন ও বাহ্য”—২১
সুবোধ বহু এগীত উপভাস “ইন্দির”—২১।	শ্রীদেবদাস বোম এগীত উপভাস “গজর”—৪১
শ্রীশান্তি চৌধুরী এগীত জীবনী-গ্রন্থ “বীরাজনা ঐতিহ্যতা”—১১	কিতীশ দাগ এগীত কাব্যগ্রন্থ “পূজার কুল”—১১
শ্রীশশধর দত্ত এগীত রহস্যোপভাস “ভাগ্যাবেশে মোহন”—২১, “মোহনের বীকালতা”—২১, “অজের মোহন”—২১	শ্রীনির্মলকুমার রায় এগীত জয়ন-কাহিনী “জাগান”—৪১।
শ্রীহীরালাল দাশগুপ্ত এগীত শিকার-কাহিনী “বাঘের জঙ্গলে”—৪১।	রমাগণ চৌধুরী এগীত গল্প-গ্রন্থ “বর্ণমারীচ”—১১।
	শ্রীরেখাদেবী বন্দ্যোপাধ্যায় এগীত “বরন শির”—৩১

## বিশেষ দ্রষ্টব্য

পূজার ভারতবর্ষ—শ্রী রমণী রায় পূজা উপলক্ষে আগামী কাঙ্ক্ষিত সংখ্যা “ভারতবর্ষ” আগ্রিনের দ্বিতীয় সংখ্যাহে প্রকাশিত হইবে। বিজ্ঞাপন-দাতাগণ অনুগ্রহপূর্বক আগ্রিনের প্রথম সংখ্যাহের মধ্যেই কাঙ্ক্ষিতের বিজ্ঞাপনের কপি পাঠাইবেন। নির্দিষ্ট তারিখের মধ্যে বিজ্ঞাপনের পাণ্ডুলিপি না পাঠিলে বিজ্ঞাপন ছাপা না হইবার সম্ভাবনা।

কার্যধ্যক্ষ—ভারতবর্ষ

## পাকিস্তানস্থ গ্রাহকদের জন্য বিজ্ঞপ্তি

আমাদের পাকিস্তানস্থ গ্রাহকগণের মধ্যে যাহারা আমাদের কার্যালয়ে “ভারতবর্ষ”-এর টাকা পাঠাইতে বা জমা দিতে অসুবিধা ভোগ করিয়া থাকেন, তাহারা অতঃপর ইচ্ছা করিলে ঠিকানা ও গ্রাহকনম্বর উল্লেখপূর্বক The Asutosh Library, 78-6, Lyall Street, Dacca, East Pakistan—নিকট টাকা পাঠাইতে বা জমা দিতে পারেন। নূতন গ্রাহকগণ টাকা জমা দিবার সময় “নূতন গ্রাহক” কথাটি উল্লেখ করিবেন। ইতি— বিনীত

কার্যধ্যক্ষ—ভারতবর্ষ

## সম্পাদক—শ্রীকণীন্দ্রনাথ বুধোপাধ্যায় এম-এ





1962

1962



কাৰ্ত্তিক-১৩৫৭

প্রথম খণ্ড

অষ্টত্রিংশ বর্ষ

পঞ্চম সংখ্যা

## যুগান্তর

শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত

আজ ধীরভাবে বাহিরের বা অন্তরের জগতে দৃষ্টিপাত করলে যুগান্তরের অমুভূতি অস্বীকার করবার উপায় নাই। এ নতুন যুগ প্রবর্তনের জন্মতিথি নির্ধারণ অসম্ভব। কারণ মানব-সমাজের বহুদিনের পুঞ্জীভূত পাপ বা সাধু প্রবৃত্তির কোনো নির্দিষ্ট অশুভ বা শুভ মুহূর্তে আমূল পরিবর্তন ঘটে না। যা ধীরে ধীরে জ্ঞানভঃ বা অজ্ঞাতসারে গড়ে ওঠে, তার আংশিক ভাঙন মুহূর্তে ঘটতে পারে। সে ভগ্নস্তূপের আমূল অপসারণ সময়-সাপেক্ষ। পুরাতন ভিত্তিতে নতুন সৌধ গড়ে উঠতে পারে না—বহুদিনের অক্লান্ত পরিশ্রম ব্যতিরেকে। ভাঙনের কারণ লুকানো থাকে সঞ্চিত ভাব-ধারায় এবং নতুন যুগ-সৌধও গঠিত হয় বহুদিনের রাশী-কৃত কল্পনা এবং আদর্শের মাল-মশলায়।

নটরাজের বাঁধন-হেঁড়া ও বাঁধন-পর্য নাচের ছন্দ চিরদিন অমুভূত হয় অন্তর ও বহির্জগতে। নৃত্যের তালে তালে

পাহাড় খসে, নদী শুকায়, রাজ্যেশ্বর তিথারী হয়, অজ্ঞাত-কুল-শীল কোটি কোটি নরনারীর দণ্ড-মুণ্ডের বিধাতা হয়। নর-সমাজে ভাবের অভিব্যক্তি ও বিপ্লব ঐতিহাসিক সত্য, মানবের চির-অশান্ত প্রকৃতির বিকাশ; স্বেচ্ছাচারিতা ও বিচার-শক্তির অনিবার্য পরিণাম।

চিত্ত সহজে স্বীকার করতে চায় না যে মনন ও বিচার অতিমাত্রায় অস্ত্রের চিন্তা-কল ও প্রেরণার পরিণাম পরিগ্রহ মাত্র। আদিম যুগ হতে স্বাধীন সিদ্ধান্তের গর্ব-মুখর নবীন যুগ মহা-মানব বা প্রবল অধিনায়কের ভাব-ধারায় শাসিত। আদিম যুগেই কোনো মহাপুরুষ বুঝেছিলেন বস্ত্র-জীব বা উন্মাদ প্রকৃতির ধ্বংস-লীলার অভিযান হ'তে আত্ম-রক্ষার একমাত্র উপায় দল-বাঁধা। সমাজের বাঁধন ও সজ্ব-রক্ষার নতুন নতুন পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়ে মানুষ বিধিনিয়ম প্রবর্তন করেছে চিরদিন। কিন্তু সে সব বিধি অতীতকে



একেবারে মুছে ফেলতে পারেনি। দেহান্তরিত পথ-প্রদর্শকদের প্রদর্শিত পথ হতে পাথের সংগ্রহ ক'রে তবে অজানা পথে শুভ যাত্রা আরম্ভ করেছে প্রত্যেক নবীন যুগের প্রবর্তক।

তাই নিজের মনে মৌলিকতার গর্ব অমূল্যব করলেও যুগ-যুগান্তর মানুষ অধিনায়কের সহযোগী বা আজ্ঞাহুভর্তী। রাষ্ট্রে, সমাজে, ধর্ম-সংজ্ঞা, বাণিজ্য জগতে, শিল্পে ও সাহিত্যে এই সত্যের ক্রিয়া প্রতীয়মান। পূর্বব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ তাঁর ভাগবত-ধর্মের সারাংশ বর্ণনায় শ্রীমদ্ভাগবদ্গীতায় বলেছেন— তাঁর উপদেশ ছন্দে শ্রুত এবং বহু ঋষি গীত। যাকে নায়ক ব'লে মানি, আমরা তার আবিস্কৃত মার্গে অন্ধ হয়ে ছুটি। যাকে লোক-নায়ক শব্দ ব'লে নির্দেশ করে, উন্মাদ হ'য়ে তার জীবন-পথ কটেকাকীর্ণ করি। অথচ নায়কের পরিণত সিদ্ধান্তের হেতু বোঝবার প্রয়াস করি না। মানুষ সর্ববস্ত্র করে, অথচ নরেরই সর্প-কুটিল দংশনে মানব-জাতি জর্জরিত। ধর্ম-ধেবীর নিন্দায় ভূ-ভারত মুখরিত। কিন্তু সে নিন্দনীয় আচরণের অন্ন-বিস্তার বিকাশ অমূল্য হইয়া প্রত্যেক সামাজিক নরের জীবনে। শান্তির আদর্শ নিয়ে মানুষ যুদ্ধ বন্ধ করবার জন্ত সমর-সজ্জা করে, প্রতিদ্বন্দ্বীর ভণ্ডামীর মুখোঁস হেঁড়বার জন্ত নিজেই ভুয়ো পবিত্রতার মুখোঁস পরে।

প্রকাণ্ড মানব-বিশ্বের প্রচণ্ড-ভাব ও কর্ম-প্রবাহের প্রাবল্য আজ সকল জাতি-সম্মুখে বিস্তৃত করেছে। রাজ-নীতি ক্ষেত্রে দুটি ভিন্ন-মুখ শ্রোতের সংঘাতের পরিণামে জগত-ব্যাপী অশান্তি। মূল-শ্রোতকে আশ্রয় ক'রে বহু ছোটো বড় ঘূর্ণীচক্রে সাধারণ মানুষ নিঃসহায় ভাবে জ্বালা জ্বালা শব্দ করছে। কিন্তু আশ্রয়ের বিষয় এই যে, প্রত্যেক নর-সম্মুখ সম্মুখ ব'লে আর্তনাদ করছে, অথচ নিজের ক্ষুদ্র বা প্রবল শক্তি সেই ভাঙন-শক্তির একটি বা অপরটির সাথে মিলিয়ে দিচ্ছে। আমাদের দেশে একদল অস্ত্র-দলকে ইঙ্গ-মার্কিনী শক্তির কৃতদাস ব'লে খিকার দেয়, অথচ সে দল নিছক অন্ধ উপাসক সোভিয়েট শক্তির। কেউ বুঝে না, এই উন্মাদ তরঙ্গের মুখে বুক দিয়ে দাঁড়ালে, তার নিজেরই উচ্ছেদ অনিবার্য।

মানুষের অন্তর্দৃষ্টির সীমা বিশাল। কারণ কল্পনা মানব চিন্তার বিশেষ সম্পদ। কল্পনা-কাননের বহির্ভাগে অজানা

অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধিমূলক। বাদ-বিসম্বাদ ও অপবাদে ভ্রমের উৎপত্তি। সাধারণ ব্যক্তি-অভিরুচি ও আশা কল্পনার প্রচ্ছদ পট। সুতরাং কল্পনা-প্রসূত যে সিদ্ধান্তকে আমরা যুক্তির ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত ভাবি, তার মধ্যে ধ্বংস, হিংসা, প্রেম ও আশা বহুল পরিমাণে অযুক্তি মিশিয়ে দেয়। আমাদের ভাবের কাননে স্রব্ধের বীজের সাথে মিশিয়ে থাকে আগাছা ও বিষ-বৃক্ষের বীজ। তার ফল অনিবার্য। আশা-কানন নিরাশার জ্বলে পরিণত হয়। কর্মের অবকাশে আশেপাশে তাকিয়ে দেখি অপকর্মের ফসল, ঝোঁপে ঝোঁপে কাল কীট ও অজগর! হতাশ হয়ে বলি—

আমি নিশার স্বপন করেছি বপন বাতাসে

তাই আকাশ কুহুম করেছে চয়ন হতাশে।

ব্যক্তি-জীবনের এই নীতিসম্মুখ জীবনে সত্য। ব্যক্তি-জীবনের বিফলতা মুখ্যরূপে মাত্র একটি জীবন ব্যর্থ করে। কিন্তু সম্মুখ-জীবনের ব্যর্থতার পরিণাম মাত্র সম-যুগের সমাজ জীবনকে বিষাক্ত করে না। সে বিফলতা ভাবীকালকেও দূষিত করে। তাই সম্মুখপতি, রাষ্ট্র-নিয়ন্ত্রণ ও সমাজ-শুদ্ধির দায়িত্ব অসামান্য। অথচ নেতৃত্বের লোভ সাধারণ। মিথ্যা ভণ্ডামী ও আপাতঃমধুর বচনের বেড়াঙ্কালে জনগণের চিত্ত আহরণ ক'রে বহু লোক সংসারে অহিতের বীজ বপন করেছে, আজিও করছে। প্রাচীন ও আধুনিক ইতিহাস পুনঃ পুনঃ একথা প্রমাণ করেছে।

কিন্তু প্রকৃতপক্ষে মানুষ কি এতই দুর্বল যে আজ জগতের এই বিপ্লবী দুই শ্রোত এড়িয়ে সে আশ্রয়-রক্ষা করতে পারে না? ধীর, শাস্ত্র অধিনায়ক স্রষ্টা ভাবে নিশ্চয়ই সে শ্রোতের বাহিরে রাখতে পারে নিজের সমাজকে। দেশের লোকের পরিচুষ্টি এবং ধ্বংস শ্রোতের অপরিহার্য পরিণাম হ'তে পরিভ্রাণের উপায়ের নিশ্চয়ই সন্ধান পাওয়া যায় সুশাস্ত্র ধীরতার। সে অহিংসার নীতি হিন্দুর নিজস্ব সম্পত্তি। মাত্র আবশ্যক—কাল-শ্রোতের হিংসার খাদের মধ্যে ঝাঁপ না দেওয়া। যুগান্তর স্বীকার্য, কিন্তু কোন যুগকে বরণ করবে, তার নির্বাচন-শক্তিকে শিথিল করা না করার দায়িত্ব প্রত্যেক মানব-সম্মুখের।

আজ সারা বিশ্বের অণ্ডতরঙ্গের আঘাতে আমাদের জীবন-শ্রোত উদ্যোগগামী, অশোভন বা বিষল, এ আশ্রয় কর্তব্যের জাতি-প্রবণতা। পল্লীর বহু লোকের পাল্লী। সুতরাং

আমার পক্ষে নিষ্পাপ থাক। অসম্ভব, এ ধারণা মারাত্মক। হিংসার উন্মাদনায় বিশ্ব আলোড়নের দোহাই দিয়ে হিংস্রক বৃত্তিকে অবলম্বন করা সমাজের পক্ষে তেমনি দুর্বলতা। মহুস্বত্বের বিচারের মান আত্ম-বোধের বিশিষ্টতা সংরক্ষণে। জ্ঞানের পথে, জ্ঞানের রাজ্যে বা জনহিতকর শুভ কর্মের ক্ষেত্রে, অহুকরণ শুভ। কিন্তু বিবেক বা অন্তরাশ্রয় যে পথকে কুমারগ ব'লে নির্দেশ করে, যে কর্মকে আত্মঘাতী কুর্ম ভাবে, সে পথ ও সে কর্ম পরিবর্তনীয়। যুগ-সন্ধি এই প্রতিরোধ শক্তিকে যে জাতির প্রাণে উদ্ভূত করে, সেই জাতি বিশ্ব-বিজয়ের অধিকারী।

আজ বিজ্ঞান শ্রম-শিল্পে নতুন প্রাণ সঞ্চার করেছে। পরিশ্রম ও অধ্যবসায় ভূ-খণ্ডকে সমুচিত করেছে। পৃথিবীর কোনো অংশ অসুভাগ হ'তে দূর নয়। প্রাচীন যুগতে সভ্য মানবের সম্ভব মধ্যে পণ্য ও ভাবের কথঞ্চিৎ আদান প্রদান ছিল। ভারত, মিশর, গ্রীস, পারস্য ও চীনের মধ্যে ভাবের বিনিময় হ'য়েছিল। গ্রীক-যবন রোমকে ও যুরোপকে স্পর্শ ভাব বিতরণ করেছিল, ভারতবর্ষ বৃহত্তর ভারতে বৌদ্ধ নীতি-সুখা পৌছে দিয়েছিল। কিন্তু সে বিনিময়ের মাত্রা ছিল স্বল্প। সে কর্ম সম্পাদিত হ'ত দীর্ঘকালে। আজ চকুর পলকে মার্কিনের সমাচার পৌছয় বাঙালার পল্লীগ্রামে। সুতরাং সৃষ্টির রাংতায় মোড়া কুস্কির কুফল প্রতিরোধ করা শক্ত। আমার নিবেদন এই যে, যদি নিউ-ইয়র্কের বা ক্রেমলীনের বাণী আপনাকে বিশ্ব-বাণীর আসনে উন্নীত করতে সক্ষম হয়, দিল্লী বা কলিকাতার কথা আপনাকে যুগান্তরের উপদেশের পর্যায়ে তুলতে পারবে না কেন? আমার দেশের অহিংসার বাণী শাস্ত্রত সত্যে প্রতিষ্ঠিত। এদেশ মানুষকে জঁখর বলেছে, জীবকে বলেছে শিব—যিনি শান্ত ও সুন্দর।

প্রাচীন যুগে শিক্ষা সর্বজনীন ছিল না। আজ সভ্য যুগতে সকল শ্রেণীর অধিবাসীর ভূ-মণ্ডলের বিভিন্ন ভূ-খণ্ড সম্বন্ধে জ্ঞানের মাত্রা বৃদ্ধি পেয়েছে। পুরাকালে আন্তর্জাতিক সম্বন্ধ ছিল সীমাবদ্ধ। একজন অধিনায়ক বিশ্ব-বিজয়ের উচ্চাশায় দলবল নিয়ে অন্য দেশে অভিযান করত। সে অভিযানে দস্যুতার বিভীষিকা আতঙ্কের সৃষ্টি করত। এ যুগের আন্তর্জাতিক যুদ্ধের প্রাণালী বিজিতের পক্ষে বংশস, নিষ্ঠুর এবং অতি পাশ্চাত্যিক। চরম চরম যুদ্ধের

অবসানে নয়। বৈরিতা ও হিংসা বিজয়ী ও পরাজিতের সর্বাঙ্গে হলহল সঞ্চার করে—রণাবশেষ মাত্র নতুন সময়ের জন্ম নতুন আয়োজনের অবকাশ। যদি এ পরিণাম ভারত-বাঙ্গীকে শাস্তিপ্রিয় হ'তে শিক্ষা না দেয়, তাহ'লে বুদ্ধ ভগবান হ'তে মহাত্মা গান্ধী অবধি সবার শিক্ষা বিকল ও নিরর্থক প্রতিপন্ন হবে।

রাজনীতি ক্ষেত্রে ভারতবর্ষ শিশুরাষ্ট্র। তাই ভার অধিবাসী প্রজাতন্ত্রের সকল নীতি হৃদয়ঙ্গম করতে পারেনি। ভারতবাসীর কিন্তু একটা সুবিধা আছে। সে সুযোগে আত্মোন্নতি না করলে যুগান্তরের স্রোতে ধ্বংসের গহবরে তার সমাধি সূনিশ্চিত। সে বড় বংশের লোক, পৃথিবীর সর্বপ্রাচীন নীতির উত্তরাধিকারী। গত কয়েক শতক সে ঠেকে শিখেছে। সুতরাং আজ এই যুগান্তরের দিনে সে অন্ততঃ নিজের দেশে সত্যযুগের প্রতিষ্ঠা না করলে, মানব-জাতির ইতিহাস ভীষণ কলঙ্কিত হবে।

প্রথম শিক্ষা একতা। আজ প্রত্যেক ভারতবাসী অস্ত্র হ'তে পৃথক। রাষ্ট্র, সমাজ, সংস্কার ও ব্যক্তি-জীবন পরিচালনায় প্রত্যেকের গর্ব যে তার আদর্শ চরম ও পরম। কিন্তু এ কথা অবহেলা করবার অবকাশ নাই যে, একতা ভিন্ন কোন মানব-সম্বন্ধ কাল তিষ্ঠতে পারে না। আজ যাদের হাতে শাসন-শক্তি হয়তো তারা অদক্ষ। কর্মচারীদের মধ্যে অনেকে ইংরাজ রাজ-কর্মচারীর ওঙ্কতা, হীন-স্পর্ধা বা অভদ্রতার উত্তরাধিকারী। অথচ তাদের দক্ষতা-বর্জিত। কিন্তু এ কথা তুললে চলবে না যে তারা আমাদের স্বদেশবাসী এবং প্রজা-শক্তি প্রবল হ'লে তাদের কর্তব্য-বিমুখতা লোপ পাবে। আজ দুর্নীতি, উৎকোচ-গ্রহণ, গোপনে সাধারণের ক্ষতি ক'রে উচ্চপদস্থ বহু শক্তিমানে অর্থ সঞ্চয়ের কথা শুনি এবং প্রমাণ পাই। কিন্তু তাদের উপর অভিমান করে রাষ্ট্রের বিধি নিয়ম উপেক্ষা ও লঙ্ঘনে অনৈক্য বাড়ি। সমাজ-বিরোধী ক্রিয়-কলাপ শত্রু-জাতির হিংসানলে ইন্ধন আছতি। সকল ক্ষেত্রে একতার প্রয়োজন। সাধু-প্রকৃতি উচ্চ আদর্শের লোক একত্র হ'লে রাজ্য ভার অতি অল্পদিনে অস্ত্র হস্তে সমর্পণ করা যেতে পারে। উৎকোচ গ্রহণ যে করে আর যে উৎকোচ দান করে... উৎকোচ গ্রহণ করে... উৎকোচ দান করে...

কালোবাজারীর খরিকার তো আমরা। সুতরাং সাধু উদ্দেশ্য নিয়ে যদি সবাই এক মন হই, সজ্জবদ্ধ হই, দেশের দশা উন্নত হবে। কিন্তু গঠনের মন্ত্র উপেক্ষা করে বিচ্ছিন্নতা, ভাঙ্গন এবং হিংসা মন্ত্রের সাধনায় এ যুগসন্ধিতে আমাদের যাত্রা-পথ কোন দিকে হ'বে, তা কল্পনা করা সহজ। যদি বেঁচেও থাকি—দাসত্ব অনিবার্য।

আমরা আজ এ-দেশের মূল-মন্ত্র তুলেছি, এ-কথা অস্বীকার করবার উপায় নাই। সর্বভূতে-সমজ্ঞান, সর্বভূতে-নির্বৈর, 'সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই', আজ এ-সব সত্য জীবনের কোনো কর্ম নিয়ন্ত্রণ করে, একথা মনে হয় না। যে সব অমূল্য গ্রন্থে জীবন-রহস্য সমাধানের শাস্ত্র নীতি বর্ণিত, আজ তাদের উপর আমরা বিশ্বাস হারিয়েছি। নবীন সভ্যতার ভিত্তি—প্রত্যেকের মান, সম্পত্তি এবং দেহ সংরক্ষণের অধিকার আজ আমরা নাগরিকের দৃষ্টি ভুলিয়ে দেছি না। জগত আমি ভিন্ন দ্বিতীয় ব্যক্তির বাসস্থান এ-কথা আমরা বিশ্বাস করি না। তাই নর-হত্যা, নারী-নিগ্রহ, তৎপরতা এবং পরের অপমান সমাজকে কলুষিত করেছে। ১৯৪৬ সালের ১৫ই আগষ্ট হতে পাপ বন্ধ করবার জন্ত আমরা যে পাপ অহুষ্ঠান করেছি এবং যে কু-কর্মে আজও ব্যাপৃত, ধীর-ভাবে হিসাব করলে প্রাণ শিউরে ওঠে।

সত্ত্বের দিক হ'তে এ-সব কু-কর্ম যেমন ব্যক্তিকে দুর্বল করে তেমনি সত্ত্বকে নষ্ট করে। মানুষের প্রতি শ্রদ্ধা হ্রাস হ'লে মানুষের সমষ্টি তির্যক্ত পাবে না। এক মন্ত্রের সাধনা, প্রত্যেকের সাধারণ ইষ্টকে আপনায় ইষ্ট ভাবা, দেশ-মাতৃকাকে জননী ভেবে দেশের নর-নারীকে ভাই-বোন ভাবা—সামাজিক প্রতিষ্ঠানের প্রাণ। স্বার্থ-পর নর নিজেরও হিত সাধন করতে পারে না—পরের হিত-সাধন না

করলে। যাকে জড়-প্রকৃতি বলি তার প্রাণ-শক্তির ঐ নিয়ম। বসন্তের হিলোলে শুকনো পাতা ঝরে, তবে তরু পল্লবিত হয়।

আমি মনে করি আজ এই কালের যুগসন্ধিতে আমরা যে উচ্ছেদের পথকে গন্তব্য-পথ ভাবছি, এ-ঋণিক বিকারের ভ্রম। কেটে যাবে মেঘ, নবীন অরুণ দেখিয়ে দেবে সত্যযুগের পথ। আমাদের জাতীয় যজ্ঞ-শালায় আজ দুঃখের রক্ত-শিখা প্রজ্জ্বলিত। প্রাণে আশা রাখতে হবে—বৃথা আশা নয়, নিরাশার বিফলতার বিফল মনের জল্পনা নয়। জাগ্রত ভগবানকে আন্তরিক দুঃখ জানিয়ে, পরিজ্ঞান যাচিঞা করতে হ'বে।

আত্ম-অবিশ্বাস তার নাশ কঠিন-ঘাতে,  
পুঞ্জিত অবসাদ-ভার হান অশনি-পাতে  
ছায়া-ভয়-চকিত-মূঢ় করহ পরিজ্ঞান হে  
জাগ্রত ভগবান হে।

একতা নষ্ট হয় এমন কোনো সমাজদ্রোহী আত্মঘাতী কু-কর্মে নবীনযুগ আমাদের সত্য-যুগে পৌঁছে দেবে না। অতি-প্রাচীন বৈদিক মন্ত্রের সাধনায় শক্তি উদ্ধার করতে হবে।

সংগচ্ছধ্বং সং বদধ্বং সং বো মনাংসি জানতাম—

তোমরা সম্মিলিত হও; এক কথা বল, একমত হও।

সমানো মন্ত্র: সমিতি: সমানী সমানং মন: সহ চিন্তমেধাম্।

মন্ত্র সমান, সমিতি সমান, চিন্তা ও মন সমান।

সমানী ব আকুতি: সমানা হৃদয়ানি ব:।

সমানমন্ত্র বো মনো যথা ব: স্তসহাসতি!

তোমাদের সকল সমান হক, হৃদয় সমান হক, মন সমান হক, যাতে তোমাদের স্তম্বর সাহিত্য ( মিল ) হ'তে পারে।





# দ্বারমণ্ডল

## তারামঙ্গর বন্দ্যোপাধ্যায়

(পূর্বাত্তরতি)

মানুষের জীবনে এক এক সময় অকস্মাৎ একটা আবেগ আসে—ভূমিকম্পের মত পাহাড়ীয়া নদীতে ধসিয়া-পড়া তুষার-স্তূপ-বিগলিত জলোচ্ছ্বাসের মত; সব ভাঙিয়া চুরিয়া জীবনকে একটা নূতন রূপ দিয়া যায়। তেমন আবেগ যখন আসে তখন সে যেমন উন্মত্ত অধীর—কোন কিছু বাধা মানে না—কিছুতে লজ্জা থাকে না, ঘৃণা থাকে না, তেমনি আবার বিপরীত শাস্তি স্থির প্রসঙ্গ মূর্ত্তিতে আত্ম-প্রকাশ করে রূপান্তরিত নবজীবনে। সে তাহার জন্ত কাহাকেও দোষী করে না—নিজেকেও দোষ দেয় না। অরুণার অবস্থা সেই রূপান্তরিত অবস্থা। জীবনে তাহার প্রচণ্ড কম্পন বহিয়া গেছে। সে কম্পন কেমন করিয়া আসিল সে কথা সে জানে, কিন্তু কোথায় ছিল এত আবেগ তাহা সে কল্পনা করিতে পারে না।

স্বর্ণ বলিয়াছে, অরুণাও অস্বীকার করে না—বিশ্বনাথের মৃত্যুর পর তাহার জন্ত বেদনা বহন করিয়াও বাহিরে সে কোন দিন এ বেদনার বহিঃপ্রকাশকে বড় হইতে দেয় নাই। বৈধব্যকে জীবনের আচরণে ব্যবহারে ফুটাইয়া তুলিতে চায় নাই—দেয়ও নাই। সে বৈধব্যের প্রচলিত বিধিকে অস্ত্রায় অহেতুক বলিয়া মনে করিয়াছে। ভাবিয়াছিল—সে নিজেও ভাবিয়াছিল, তাহার অন্তরঙ্গ জনেরাও ভাবিয়াছিল—সময়ের ব্যবধানে মন স্বাভাবিকভাবে বিশ্বনাথকে বিশ্বস্তির আশ্রয়ে আবর্তিত করিয়া বিলপ্ত করিয়া দিবে। নিঃশেষিত পুষ্পকল রিক্ত গাছের জীবনে বৎসরান্তে আবার আসে যেমন নব বসন্ত—তেমনি তাহার জীবনেও আসিবে নূতন বসন্ত। তাহার জীবনে সেই নিয়মের গতিরও কোন ব্যতিক্রম ছিল না। ধীরে ধীরে আর একজনের সঙ্গে তাহার অন্তরঙ্গতাও গাঢ় হইয়া উঠিতেছিল। কয়েক মাস আগেরও সে তাহাকে বলিয়াছিল—“আর না, এর শেষ করে ফেলব এইবার। তুমি ব্যবস্থা কর।” সবই স্থির ছিল।

কল্পনাও সে অনেক করিয়াছিল। এই সামান্ত শহর ছাড়িয়া চলিয়া যাইবে, মহানগরীর প্রাসাদ-শিখরের এক কোণে খানিকটা স্থান অধিকার করিয়া নীড় বাঁধিবে—জীবনব্রতের বিপুল বিস্তৃত কর্মক্ষেত্রে নূতন আবেগে ঝাঁপাইয়া পড়িবে। শুধু সে বুঝিতে পারে নাই বিশ্বনাথকে সে কতখানি ভালবাসিত, সে তাহার জীবন কতখানি জুড়িয়া আছে।

সে দিন প্রাটফর্মের উপর প্রচণ্ড একটা আক্রোশ লইয়া স্নায়রত্নের প্রতীক্ষা করিতেছিল। তাহার হাত ধরিয়া থাকিতে দেখিয়া যে দৃষ্টিতে তিনি বিশ্বনাথের দিকে তাকাইয়াছিলেন—সে দৃষ্টি তাহার বুকে বিযুক্ত শলাকার মত বিঁধিয়াছিল। তাহার আলা সে কোন দিন ভুলিতে পারে নাই। মানুষ ভুলিতে পারে না, সচেতন ভাবে পুথিয়া না রাখিলেও তাহার অজান্তসারে মূলজ উদ্ভিদের মত অন্তরে অন্তরে বাঁচিয়া থাকে; স্মৃতিগোপন মিলিলে সে-দিন সে পাথর ফাটাইয়া আত্মপ্রকাশ করে। স্নায়রত্নের সঙ্গে প্রাটফর্মের উপর সাক্ষাতের ক্ষণটি ছিল সেই ক্ষণ। কিন্তু কি করিতে গিয়া কি করিয়া বসিল সে! কথা বলিতে বলিতে তাহার দৃষ্টি পড়িল অজয়ের মুখের উপর। সে কি হইয়া গেল! বোল সতের বৎসর বয়সের কিশোর অজয়! সে কি অজয়! বহুদিন পূর্বে অরুণার দাদা সেবার ম্যাট্রিক পাশ করিয়া কলেজে ভর্ত্তি হইয়াছে—অরুণার বয়স তখন দশ কি এগার, একদিন অরুণার দাদা এমনি—অবিকল এমনি এক কিশোরকে তাহাদের বাসায় লইয়া আসিয়াছিল। সে-দিনটি তাহার জীবনে অক্ষয় হইয়া আছে। তাহার দাদা তাহাকে বলিয়াছিল—বিতকে তুই গান শুনিরে দে।

সে বলিয়াছিল—না। দাদার উপর বিরক্ত হইয়াছিল—তাহার বন্ধ হইলেই আর কি তাহাকে গান শুনাইতে হইবে।

দাদা বলিয়াছিল—বিশুও শোনাবে তা হ'লে।

—উনি গান গাইতে পারেন ?

—গান না, সংস্কৃত কাব্য আবৃত্তি করে শোনাবে।  
সে তোর গানের চেয়ে অনেক ভাল।

সংস্কৃত কাব্য আবৃত্তি করিবে—এইটুকু ছেলে! তাহার দাদা ফাষ্ট ক্লাস অবধি সংস্কৃত লইয়া হিমসিম খাইয়াছে, অল্পস্বার বিসর্গযুক্ত ভাষাটাকে একখানা এবড়ো-খেবড়ো পাথরের মত শক্ত মনে হইত, দাদা ক্রমাগত মুখস্ত করিত—কন্মিশ্চিত কন্মিশ্চিত কন্মিশ্চিত বনোদ্দেশে বনোদ্দেশে এঁয়া—এঁয়া কন্মিশ্চিত কন্মিশ্চিত। সেই ভাষায় কাব্য আবৃত্তি করিবে এবং সেই আবৃত্তি তাহার গানের চেয়েও ভাল লাগিবে। হঠাৎ মনে হইয়াছিল, তাহার দাদা নিশ্চয়ই এই পাড়াগাঁয়ে ছেলেটিকে দিয়া হাস্যকর কিছু শুনাইবার জন্ত এমন ভণিতা করিতেছে। দাদার গভীরভাবে রসিকতা করার স্বভাব তো তাহার চেয়ে কেহ বেশী জানে না। ছোট্ট পকেট আয়না কিনিয়া আনিয়া দাদা বলে—এই অরুণা—আজ একটা বাদর পেয়েছি রে।

—বাদর! কই? কোথায়?

—আছে। আছে।

—মিথ্যে কথা!

—তোর মাথায় হাত দিয়ে বলতে পারি সত্যি কথা!

—কোথেকে কিনলে? টাকা কোথায় পেলে?

—কিনতে হয় নি, ভগবান দিয়েছেন।

—কই? দেখাও।

—চোখ বোজ। আমি নিয়ে আসি।

অরুণা চোখ বন্ধ করিবার পরই দাদা বলিত—দেখ এইবার।

চোখ খুলিয়া অরুণা দেখিত—তাহার মুখের সামনে ছোট আয়নাখানি। দাদা বলিত, বাদর নয় বাদরী। আয়নার মধ্যে দেখ। দেখ দেখ কেমন দাঁত বের করেছে।

অরুণার সর্দি হইলে দাদা হঠাৎ বলিত—ছুটো নাম বের করেছি অরুণা। তোর একটা আমার একটা। বুঝলি। এ নাম পাগটে ফেলব ঠিক করেছি।

—নাম? কি নাম?

—একটা হ'ল 'খাস' কি?' আর একটা হ'ল

—খাঃ। ওই নাম কি হবে?

—হবে। তোকে যখন—সকলকে না জানিয়ে ডাক—তুই যখন আমাকে কাউকে না জানিয়ে ডাকবি—তখন কি মজা হবে বল তো। কেউ বুঝবে না—অথচ আমার বুঝব!

—সে ভাল হবে।

—তা হ'লে কোন্ নামটা তুই নিবি বল? 'সিকনি'

—ও। আমার সর্দি হয়েছে বলে ঠাট্টা হচ্ছে!

—বেশ তো—তা হ'লে—আমার নামই 'সিকনি'।

—হাঁ। হাঁ। সিকনি—সিক-নি তুমি সিক-নি।

—তা হ'লে অভ্যেস করে নে। আগে আমি ডাকি তারপর তুই সাড়া দিবি। আমি তোর নাম ধরে ডাকব তুই আমার নাম ধরে সাড়া দিবি। আচ্ছা—এ খাস কি?

—সিকনি! না বুঝিয়াই উত্তর দিত অরুণা।

—খাস কি?

—সিকনি!

—কি বলি? কি খাস?

অরুণা এবার বুঝিয়া হাউমাউ করিয়া উঠিত।

সেই দাদা তো! অরুণা উৎসাহিত হইয়া গান গাহিয়া শুনাইয়া বলিয়াছিল—কই এইবার শুকে বল—সংস্কৃত কাব্য আবৃত্তি করতে! হাসিবার জন্ত প্রস্তুত হইতেছিল সে—মনে মনে পুরোহিত মহাশয়ের—বিড় বিড় বজ্রবজ্র মন্ত্রোচ্চার করার স্থিতি জাগিয়া উঠিতেছিল। মুখ শুঁজিয়া হাসিবার জন্ত উপড় হইয়া শুইয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু সে অবাৎ হইয়া গেল।

বিশু বলিল—রঘুবংশ থেকে আবৃত্তি করছি।

রঘুবংশ? মহাকবি কালিদাসের রঘুবংশ। এইটুকু ছেলে—। তাহার সবিস্ময় চিন্তা স্তম্ভিত হইয়া গেল পরে যুদ্ধে। এইটুকু ছেলেটি বলিল—রঘুপতি ভগবান রামচন্দ্র জনকজনন্য সীতাকে—লঙ্কার যুদ্ধ শেষে উদ্ধার ক'রে নিবে পুশ্পক-রথে আরোহণ করে ফিরছেন। বনবাসের কাল উত্তীর্ণ হয়েছে। ফিরছেন অযোধ্যাভিমুখে। রথ-পুশ্পক-রথ আকাশমার্গে উঠেছে সশব্দে। নীচে দেখে যাচ্ছে সঙ্গারগা ধরিত্রী। এখন দেখা যাচ্ছে শুধু সমুদ্র।

বিশুদ্ধতার উচ্ছ্বাসিত হয়ে তিনি প্রিয়তমা জানকীকে ডেকে বললেন—বৈদেহি! দেখ—

বলিয়া কথার শেষে ছেদ টানিয়া দিল এবং সঙ্গে সঙ্গেই আশ্রয় করিল গানের মত সুর করিয়া—প্রায় গান গাহিয়া আবৃত্তি—

“বৈদেহি! পশ্চাৎমলয়ায় বিভক্তং মৎসেতুনা ফেনিলমম্বুরাশিম।  
ছায়া পথে নৈব শরৎ প্রসন্নমাকাশমাবিস্কৃত চাক্রতাম।”

বিশ্বনাথ গান শিখিতে চেষ্টা করে নাই, কিন্তু তার কণ্ঠস্থ ছিল বড় মধুর। যেমন গভীর তেমনি মধুর স্বরভারময়। আর এই পিতামহটির শিক্ষায় হয়তো—বংশ-রক্তের স্বভাব শুণেও বটে—সংস্কৃত কবিতা এমন অপরূপ আবৃত্তি করিত যে—শ্রোতার মনেই শুধু নয়—তানপুরার গভীর সঙ্গীত ধ্বনির মত সমগ্র স্থানটিতে একটা মোহের সঞ্চার হইত। শ্রোতাদের পর শ্রোতৃ আবৃত্তি করিয়া গেল। একটানা দীর্ঘায়িত সুরধ্বনি যেন বাজিয়া বাজিয়া চলিয়াছিল। মধ্যে মধ্যে থামিয়া সহজ সুরে, কিন্তু ওই সঙ্গীতের সঙ্গে ভাষায় ভক্তিভাষ্যে আশ্চর্য্যভাবে সমতা এবং সঙ্গতি রাখিয়া শ্রোতাদের ব্যাখ্যা করিতেছিল। অরুণার মুখের দিকে চাহিয়াই সে বলিতেছিল—“ঐ দেখ—সমুদ্রের বালু-বেলাতে বিশালকায় অজগরেরা পড়ে আছে দেখ।”

“বেলা নিলায় প্রসূতা ভুজঙ্গা মহোন্মিবিস্ফুজ্জ্ব নিবিশেবাঃ।  
স্থ্যাংস্ত-সম্পর্ক-সমুদ্র রাগৈর্গব্যজপ্ত এতে মণিভিঃ ফনৈঃ ॥

অবাক হইয়া গিয়াছিল অরুণা সেদিন। হয় তো বা যুগ হইয়া থাকে সেইদিনই প্রথম ভালবাসিয়াছিল। নহিলে সেই প্রথম দর্শনের স্মৃতি তাহার মনে এমন—‘স্থ্যাংস্ত-সম্পর্ক-সমুদ্র’ সাপের মাথার মণির মত এমন উজ্জল ভাস্বর হইয়া রহিয়াছে কেন? সে তো আজ বহুদিনের কথা, দূরত্ব মাপিতে গেলে পুষ্পকরথারূঢ় রাম সীতা আর অধো-লোকের সমুদ্র বালুবেলার দূরত্বের চেয়েও বেশী। বিশ্বনাথের সঙ্গে তাহার পরিচয়ের স্মৃতি অন্তরঙ্গতার স্মৃতি ওই বিচিত্রবর্ণ অজগর দেহের মত বিস্তীর্ণ হইয়া পড়িয়া আছে—দূর হইতে ওই মণি-দীপ্তির মত ওই প্রথম পরিচয়টুকু না থাকিলে—সে পরিচয়ের আদিমন্ত খুঁজিয়াই পাওয়া যাইত না। সে দিনের স্মৃতির সঙ্গে সে দিনের বিদায়ের

কিশোর রূপও মণিময় বিগ্রহের মত অন্তরলোকে অক্ষয় দীপ্তিতে দীপ্তমান হইয়া রহিয়াছে।

সে দিন প্রাটফর্মের উপর সে স্তম্ভিত হইয়া গেল। সেই মণিময় বিগ্রহ যেন তাহার অন্তর হইতে বাহির হইয়া আসিয়া ছুটিয়া দূর হইতে দূরান্তরে চলিয়া যাইতে চাহিতেছে। বলিতেছে—না—না—না! ঠাকুর না!

প্রাটফর্মের উপর হইতে লাইনের উপর ঝাঁপ দিয়া পড়িয়া সে ছুটিয়া চলিয়া গেল।

ভূমিকম্প হইয়া গেল। প্রবল—প্রচণ্ড—সর্বধ্বংসী। বর্তমানে সকল কিছুকে ভাঙিয়া চুরিয়া ফাটাইয়া—পাহাড় মিলাইয়া গেল—সেখানে জাগিয়া উঠিল বিশাল সমুদ্র, সমুদ্রের জলে আকাশস্পর্শী জলোচ্ছ্বাস উঠিল—প্রাবিত করিয়াছিল পৃথিবী, সমুদ্রে জাগিয়া উঠিল মহাদেশ—সমতলে জাগিয়া উঠিল গিরিশৃঙ্গ; ধ্বংস করিয়া নূতন রচনা করিয়া এক অভিনয়ের আবর্তাবের সূচনা করিয়া দিল।

তাহার অন্তরাশ্রয় চীৎকার করিয়া উঠিল—সব মিথ্যা—সব ভ্রম। সে জীবনে আর কাহাকেও কখনও চাহে নাই, চায় না, চাহিতে পারে না। শুধু এই ইহাকেই চাহিয়াছিল সে। ইহাকেই সে চায়।

তাই সকল মর্যাদা সকল শিক্ষার উদ্ধৃত অহঙ্কার, এক মুহূর্তে প্রবল মাদকের আচ্ছন্নতার মত মিলাইয়া গিয়া জাগিয়া উঠিল নিদারুণ তৃষ্ণা। মনে হইল জীবন মিথ্যা—জন্ম মিথ্যা—যদি সে অজয়কে না পায়। বিশ্বনাথকে সে কত ভালবাসিত—সে সেইদিন সেই পরম মুহূর্তটিতে অল্পভব করিল। ওই ছেলেটিকে সে চায়—তাহাকে তাহার—পাইতেই হইবে। অত্যাধার ব্রত মিথ্যা—বুদ্ধি মিথ্যা—বিজ্ঞা মিথ্যা—এই পৃথিবীটাই মিথ্যা। সে অল্পভব করিল—জীবনে এমন ভালবাসা আছে—যে ভালবাসাকে কাল ক্ষয় করিতে পারে না, দেহের ক্ষুধায় তাহাকে বিসর্জন দেওয়া যায় না, বুদ্ধি জগতের সকল বিচার, সকল দিকান্তকে ভুজ্জ করিয়া দেয়—সে ভ্রান্তি নয়—সে সত্য।

এত কথা সে সেদিন বিচার করে নাই। সেদিন সে-শুধু উদ্ভ্রমের মত—অন্তরে অন্তরে ছুই হাত বাড়াইয়া জড়াইয়া ধরিয়াছিল অন্তরের সেই মণিময় বিগ্রহকে; যে

জাগিয়া উঠিল নিদারুণ তৃষ্ণা



পড়িয়াছিল—আজিকার বিপর্যয়ে-কম্পনে-ঝড়ে—সে যেন সর্বোচ্চ গিরিশৃঙ্গে—সর্বমালিন্ত মুক্ত হইয়া—দীপ্তিমান হইয়া হাসিতেছে।

স্বায়ত্ত্বকে সে নিজেই বলিয়াছিল—সে কালী বাইবে। অজয় কালীর ট্রেনে উঠিয়া চড়িয়াছে, গৌর সঙ্গে গিয়াছে, সেও বাইবে। সে তাহাকে ধরিয়া আনিবে—একান্ত আপনার করিয়া তাহাকে জড়াইয়া ধরিবে।

স্বায়ত্ত্ব আপত্তি করেন নাই। তিনি কোন কিছুতেই আপত্তি করেন না। প্রশ্ন করিলে উত্তর দেন না। কখনও কখনও বলেন—মৃত যা—অতীত যা—তা শুধু স্মৃতিই দেয় নীরবে, আপত্তি তো সে করে না। আমি তাই।

মোগলসরাইয়ের কাছাকাছি আসিয়া অরুণা অধীর অস্থির হইয়া উঠিল। তাহার হাত-পা ঘামিতে লাগিল। প্রাণ যেন হাঁপাইয়া উঠিল!

কি বলিবে সে?—

বলিবে—অকপটে বলিবে—সব কথা। বলিবে—অজয় আমি তোমার মা! কোন ধর্মে কোন নীতিতে তুমি ‘না’ বলতে পার বল?

হঠাৎ তাহার মনে প্রশ্ন আগিয়া উঠিল। অজয়ের প্রশ্ন—সে নিজেই আবিষ্কার করিল।—গর্ভে ধরার অধিকার তো তোমার নাই। তবে বল, কোন দাবী তোমার?

—তিনি যে আমাকে বিবাহ করেছিলেন। তিনিই যে আমার সব—! তাঁর অভাবে সব যে আমার শূন্য হয়ে গেছে। তুমি তাঁর পুত্র—আমার সকল শূন্যতাকে পূর্ণ করার দায়িত্ব যে তোমার।

—সে পরিচয় তো তুমি বহন করছ না! পৃথিবী তোমার শূন্য কেমন করে বিশ্বাস করব আমি? তোমার এই বেশ—ভূষা—তোমার—এই—।

আর সে ভাবিতে পারে নাই, পাগলের মত—চলন্ত ট্রেনের মধ্যেই উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিল। না—সে অজয়ের সামনে গিয়া এই মূর্তিতে দাঁড়াইতে পারিবে না! দরজা খুলিবারও চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু পারে নাই। ট্রেনের দরজায় চাবী দেওয়া ছিল। সে নিজেই দিয়াছিল। সে মুহূর্তে চাবীটার কথা মনে পড়ে নাই। নহিলে হয়তো—সাময়িক উন্নততার মধ্যে—সেদিন সে জীবনান্তই করিয়া বসিত।

মোগলসরাইয়ে নামিয়া—সে একটাবেলা নিজের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া—শেষে কলিকাতার টিকিট করিয়া—কলিকাতার বাসায় গিয়া উঠিয়াছিল।

অরুণার দিদিমা তাহার মুখ দেখিয়া শিহরিয়া বলিয়াছিলেন—এ কি?

অরুণা বলিয়াছিল—আমাকে তোমার একখানা ধান কাপড় দাও দেখি আগে। (ক্রমশঃ)

## ভগবান্ মহাবীরের পারণ

### শ্রীপূরণচাঁদ শ্যামসুখা

১

সে-কাল ও সে-সময়ের কথা।

সেই অতি পুরাতন কালে—ঝাড়াই হাজার বৎসর পূর্বে উত্তর ভারতে কোশাখী নামী এক মহানগরী ছিল।

মহানগরী কোশাখীর রাজমার্গ দিয়া এক উন্নতবপু, গৌরবর্ণ, বিশালবক্ষ, নগ্ন সন্ন্যাসী ধীর-পদ-বিক্ষেপে আহার্য ভিক্ষার জন্ত পথ-পার্শ্বস্থিত এতোক গৃহে গমন করিতেছেন এবং ভিক্ষা গ্রহণ না করিয়া রিক্তহস্তে প্রত্যাবৃত্ত হইতেছেন। তাহার বদন মণ্ডল হইতে অসীম শান্তি ও অপরিণীম করুণার জ্যোতি বিকীর্ণ হইতেছে, তপঃক্লিষ্ট শরীর হইতে তপস্তেজ উদ্ভাসিত হইতেছে। ভিক্ষা না পাওয়ার সামান্য মাত্রাও

দিনের পর দিন এই মহান্ তপস্বী কোশাখীর পথে পথে ভিক্ষার্থ পরিভ্রমণ করেন ও কোথাও ভিক্ষা গ্রহণ না করিয়া নগরীর বহির্ভাগে স্থিত উপত্যকায় গমন করিয়া শান্তচিত্তে ধ্যান করিতে থাকেন।

কে এই মহান্ তপস্বী? কেনই বা তিনি প্রতিদিন ভিক্ষার্থ আগমন করিয়া ভিক্ষা গ্রহণ না করিয়াই প্রত্যাবৃত্ত হইতেছেন?

ইনি ভ্রমণ মহাবীর। তখনও মহাবীরের সাধক জীবন অতিবাহিত হয় নাই—কেবল জ্ঞানপ্রাপ্ত হইয়া ধর্মপ্রচার করিতে আরম্ভ করেন নাই। আত্মার পূর্ণ বিকাশ করিতে কৃতসংকল্প হইয়া ঘোর তপস্যার দ্বারা কর্মক্ষম করিতে তিনি গ্রামে গ্রামে, নগরে নগরে, দেশে দেশে পর্বটন করিতেছেন।

হইল। নগরীর সমস্ত অধিবাসী আতঙ্কিত ও চিন্তিত হইয়া উঠিল। মহারাজ শতাব্দীকের পটমহিষী, অমুগম রূপবতী পদ্মগন্ধা যুগাবতীও এই বৃত্তান্ত অবগত হইয়া ঐশ্র্য ও শক্তিত হইয়া উঠিলেন। তিনি নগরীতে ঘোষণা করাইলেন যে এতোক গৃহে যেন নানাপ্রকার আহাৰ্য প্রস্তুত করিয়া গৃহকর্ত্তী তপস্বীকে ভিক্ষা প্রদান করিতে প্রস্তুত থাকে, এবং তিনি স্বয়ং রাজোগোষাঙ্গী বহু প্রকার চৰ্য্য, চোস্ত, লেহ, পের আহাৰ্য প্রস্তুত করাইয়া তপস্বীকে সহস্র পারণ করাইতে অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। কিন্তু সমস্তই বৃথা হইল। তপস্বী কোথাও আহাৰ্য গ্রহণ না করিয়াই দিনের পর দিন প্রতিনিবৃত্ত হইতে লাগিলেন।

২

অঙ্গদেশের রাজধানী চম্পা মহানগরী অতি প্রাচীন ও সমৃদ্ধিশালী। এই নগরীর সুপ্রশস্ত রাজপঞ্চমমুহ নানা প্রকার নয়ন-লোভন পণ্য-সম্ভারে পরিপূর্ণ বিপনীশ্রেণীর দ্বারা সুশোভিত হইয়া দূর-দূরান্তর হইতে ক্রেতাগণকে আকর্ষণ করিতেছে। দেশ বিদেশ হইতে আগত সার্বভাগ্যপের কলরবে চতুর্দিক মুখরিত হইয়া উঠিতেছে। এখানকার সামুদ্র-বণিকগণ নানা প্রকার পণ্যপ্রব্যাপূর্ণ বৃহৎ বৃহৎ বাণিজ্যতরী লইয়া গঙ্গা মহানদীর মধ্য দিয়া সমুদ্রের অপর পারে স্থিত নানা দেশে বাণিজ্য করিতে যাত্রারত করিতেছে। মহারাজ দধিবাহনের স্থানমনে প্রজাগণ সুখে ও নিরুদ্বেগে স্ব স্ব কার্যে রত থাকিয়া জীবন যাত্রা নির্বাহ করিতেছে।

হঠাৎ চম্পা নগরীতে সংবাদ আসিল যে কোণাখীর অধিপতি মহারাজ শতাব্দীক অগণিত সৈন্য লইয়া চম্পা আক্রমণ করিতে আসিতেছেন। নগরীর প্রবেশ দ্বার রুদ্ধ করা হইল। মহারাজ দধিবাহন বত সৈন্য সংগ্রহ করিতে পারিলেন তাহা লইয়া এই অত্যন্ত আক্রমণ প্রতিহত করিতে বহির্গত হইলেন। কিন্তু যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত হইলেন। শতাব্দীকের আদেশে চম্পার রাজসন্ত:পুর পুণ্ডিত হইল। মহারাজী ধারিণী ও রাজকন্যা বহুমতীকে কোণাখীর এক সৈনিক ধরিয়া লইয়া যাইতে উত্তত হইলে ধারিণী আত্মহত্যা করিয়া অপমান হইতে নিষ্কৃতি প্রাপ্ত হইলেন, কিন্তু সৈনিক বহুমতীকে ধরিয়া কোণাখীতে আনয়ন করিল।

৩

সৈনিক কোণাখীর চতুপথে বহুমতীকে বিক্রয় করিলে ধনাবহ শ্রেষ্ঠ তাহাকে ক্রয় করিয়া দাসীরূপে গৃহে আনয়ন করিল। কিন্তু বহুমতীর বিনয়-মন্ত্র ব্যবহার ও রূপ মাধুর্যে মুগ্ধ হইয়া শ্রেষ্ঠী তাহাকে কণ্ঠারূপে পালন করিতে লাগিল ও চম্পা নামে অভিহিত করিল। চম্পার রূপ লাভ্য ও শ্রেষ্ঠীর স্নেহ ক্রমে বৃদ্ধি পাইতে থাকিল। শ্রেষ্ঠীর ঐহাতে ঈর্ষার দগ্ধ হইয়া চম্পাকে বিনাশ করিবার সংকল্প করিল।

একদা কোন কার্ষোপলক্ষে শ্রেষ্ঠী তিন দিনের জন্ত অস্ত্র হানে গমন করিলে শ্রেষ্ঠীপত্নী এই সুযোগে চম্পার মস্তক মুণ্ডন ও পদদ্বয় শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া গৃহের সর্বনিম্নতলে পথপার্শ্বস্থিত একটা অন্ধকার ছোট কুঠরীতে আবদ্ধ করিয়া স্বয়ং পিতৃালয়ে গমন করিল।

শ্রেষ্ঠী চতুর্থ দিবসে গৃহে আগমন করিয়া স্ত্রী ও চম্পা উভয়কে দেখিতে না পাইয়া দাসীগণকে জিজ্ঞাসা করিলে স্ত্রীর পিতৃালয়ে গমন সংবাদ জানিতে পারিল, কিন্তু চম্পার সংবাদ দিতে কোন দাসীর সাহস হইল না। বহু অমুসন্ধান করিতে করিতে এক বৃদ্ধা দাসীর নিকট অবগত হইল যে চম্পা সর্বনিম্নতলের অন্ধকার কুঠরীতে আবদ্ধ। শ্রেষ্ঠী চম্পার দূরবস্থা দেখিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইল। তিন দিনের অনাহার-ত্রিষ্টা চম্পাকে আহাৰ্য দিবার ইচ্ছায় অমুসন্ধান করিয়া কেবলমাত্র দাসীগণের জন্ত প্রস্তুত মাষকলাই সিদ্ধ প্রাপ্ত হইল এবং তাহাই এক সূৰ্পে করিয়া চম্পাকে আহার করিতে প্রদান করিয়া তাহার শৃঙ্খল উন্মোচন করাইতে লৌহকারকে আনিতে গমন করিল।

৪

ভগবান্ মহাবীর আহাৰ্য ভিক্ষা করিবার জন্ত সেই দিন সেই পথ দিয়াই যাইতেছিলেন। পথপার্শ্বস্থ কুঠরী হইতে চম্পা তাহা দেখিতে পাইয়া আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল এবং তাহাকে পারণ করাইয়া স্বয়ং আহার করিবে মনে করিয়া তাহাকে মাষকলাই সিদ্ধ গ্রহণ করিতে অমুনয় করিল। মহাবীর তাহাকে দেখিয়া আহাৰ্য গ্রহণ করিতে হস্ত প্রসারিত করিলেন, কিন্তু পরক্ষণেই আবার হস্ত সংকুচিত করিয়া প্রত্যাগমন করিতে আরম্ভ করিলেন। তপস্বী আহাৰ্য গ্রহণ করিলেন না দেখিয়া চম্পা বিচলিত হইয়া উঠিল। এতদিনের নিধাতন, অপমান, দুঃখ, কষ্ট আজ তাহার হৃদয় বিদীর্ণ করিয়া বহির্গত হইতে লাগিল। সে চিৎকার করিয়া উঠিল—হে শ্রু, তুমিও কি এই অজাগীর প্রতি বিমুখ। দরবিগলিত ধারায় তাহার গণ্ডস্থল বহিয়া অশ্রুধারা পতিত হইতে লাগিল। তাহার চিৎকারে আকৃষ্ট হইয়া ভগবান্ মহাবীর তাহার প্রতি আবার দৃষ্টিপাত করিলেন এবং ধীর পদ-বিক্ষেপে তাহার নিকট উপস্থিত হইয়া তাহার হস্ত হইতে মাষকলাই সিদ্ধ গ্রহণ করিয়া দীর্ঘদিনের উপবাসের পারণ করিলেন। (১) আকাশে দেবদ্রুমুভি নিনাদিত হইল ও দেবগণ কতৃক রত্ন বর্ষিত হইল।

চকিতে এই সংবাদ চতুর্দিকে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। মহারাজী যুগাবতী এই ভাগ্যবতী দাসীকে দর্শন করিবার জন্ত শ্রেষ্ঠীর গৃহে আগমন করিলেন ও চম্পার প্রকৃত পরিচয় জামিয়া তাহাকে স্বগৃহে লইয়া গেলেন।

এই ঘটনার কিছু পরে ভগবান্ মহাবীর কেবল-জ্ঞান প্রাপ্ত হইলে চম্পা তাহার নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন ও সাধনী সংঘের অধিনায়িকা পদে অধিষ্ঠিত হন। কয়েক বৎসর শুদ্ধ সংযম পালন করিয়া সাধনী-শ্রেষ্ঠী মুক্তি প্রাপ্ত হন।

১। মহাবীর প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে—কোন রাজপত্নী তিন দিনের অনাহারে থাকিয়া শৃঙ্খলাবদ্ধ ও রোক্তমান অবস্থায় সূৰ্পের কোণে রক্ষিত মাষকলাই সিদ্ধ যতদিন পর্যন্ত প্রদান না করিবে ততদিন তিনি পারণ করিবেন না। চম্পা প্রথমে কাদিতেছিল না বলিয়া তিনি আহাৰ্য গ্রহণে উত্তত হইয়াও প্রত্যাখ্যান করেন কিন্তু পরে তাহাকে ক্রন্দন করিতে দেখিয়া ভিক্ষা গ্রহণ করেন। এইরূপ প্রতিজ্ঞাকে জৈন পুরাণে 'সংকল্প' নামে অভিহিত করা হয়।

# কবি ভারতচন্দ্র রায়-গুণাকরের জন্মস্থান

## শ্রীগোপালচন্দ্র রায়

শাসন কাজের সুবিধার জন্ত এক একটা এদেশকে যেমন আজকাল জেলা, মহকুমা প্রভৃতি ভাগে বিভক্ত দেখা যায়, আগে মুসলমান রাজত্বের আমলে এক একটা এদেশ বা সুবাস্ত তেমনি সরকার, পরগণা প্রভৃতি ভাগে বিভক্ত ছিল। তখনকার দিনে আমাদের এই বাঙ্গলা দেশে ভূরিশ্রেষ্ঠী বা ভুরহুট নামে একটি সমৃদ্ধিশালী পরগণা ছিল। ভূরি ভূরি শ্রেষ্ঠী অর্থাৎ বহু ব্যবসায়ীর এই অঞ্চলে বাস ছিল বলেই নাকি জায়গাটার নাম হয়েছিল ভূরিশ্রেষ্ঠী। এই ভূরিশ্রেষ্ঠী বা ভুরহুট পরগণার অধিকাংশটাই এখন হাওড়া জেলার আমতা থানার উত্তরাংশের অন্তর্ভুক্ত, বাকি অংশটা আমতা থানার সংলগ্ন হুগলী জেলার অন্তর্গত।

ভারতে ইংরেজ রাজত্ব আরম্ভ হওয়ার পূর্বে প্রায় চার শ বছর ধরে এক ব্রাহ্মণ রাজবংশ এই ভুরহুটে প্রবল প্রতাপের সহিত রাজত্ব করেছিলেন। মোগল সম্রাট আকবরের সময় এই বংশের একজন রাণী—রাণী ভবশঙ্করী উড়িষ্যার পাঠানদের সঙ্গে যুদ্ধ করে রাঢ় দেশ রক্ষা করেন। এইজন্ত সম্রাট আকবর রাণী ভবশঙ্করীকে “রায় বাহিনী” উপাধিতে ভূষিত করেছিলেন। ভুরহুটের এই ব্রাহ্মণ রাজবংশের যিনি প্রতিষ্ঠাতা তাঁর নাম—চতুরানন। চতুর্দশ শতাব্দীর প্রথমদিকে তিনি এই রাজ বংশের প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর রাজধানী ছিল দামোদর নদের তীরে ভবানীপুর গ্রামে। রাজা চতুরাননের কোন পুত্র-সন্তান ছিল না। তারা নামে মাত্র এক কন্যা ছিল। রাজা চতুরানন ফুলিয়া নিবানী সমানন্দ মুখোপাধ্যায়ের (কবি কুন্তিবাসের বংশের) সঙ্গে কন্যার বিয়ে দিয়েছিলেন। চতুরাননের মৃত্যুর পর তাঁর জামাতা সমানন্দের দুই পুত্র জন্মায়। তাঁদের নাম—কৃষ্ণচন্দ্র ও শ্রীমন্ত। সমানন্দের মৃত্যুর পর তাঁর রাজ্য দুই পুত্রের মধ্যে ভাগ হয়েছিল। তার কলে জ্যেষ্ঠ কৃষ্ণচন্দ্রের রাজধানী ভবানীপুরেই থাকে, আর কনিষ্ঠ শ্রীমন্ত ভবানীপুরের ৩ মাইল দূরে দামোদরের অপর পারে “পার রাধানগর” বা পেঁড়ো গ্রামে এসে রাজধানী স্থাপন করেন।

বাইরের শত্রুদের হাত থেকে রাজধানীকে রক্ষা করবার জন্ত ভবানীপুর ও পেঁড়ো উভয় রাজধানীর চারিদিকেই গড় বা খাল কাটা হয়েছিল। ভবানীপুর ও পেঁড়ো গ্রামের সেই গড় অনেকটা মজা অবস্থায় আজও বর্তমান রয়েছে। এমন কি রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র দেবনারায়ণ রাজা হয়ে ভবানীপুরে যে মণিনাথ মন্দির স্থাপন করেছিলেন, সেই মন্দির এবং মন্দিরের উপরিভাগে রাজা দেবনারায়ণের নাম ও মন্দির নির্মাণের তারিখ ১৩০৬ শকাব্দ (১৩৮৪ খৃঃ) ২১শে শ্রাবণ এখনও লেখা রয়েছে। পেঁড়ো গ্রামেও এই রাজাদের স্থাপিত কীর্তিকলাপ এখনও কিছু কিছু

রয়েছে। ভবানীপুরে রাজাদের স্থাপিত একটি বিরাট মন্দিরও ধ্বংসাবস্থায় আজও দাঁড়িয়ে রয়েছে। এইসব মন্দিরের শক্ত গাঁথুনি ও নিখুঁত কারুকার্য দেখলে স্তম্ভিত হতে হয়। এ ছাড়া ভবানীপুরের রাজধানীর সিংহদ্বার, রাজাদের আমোদ উৎসবের জন্ত যে সব নর্তকী ছিল তাদের আশ্রয়—“নর্তকীখানা”, রাজারা নদীতে যেখানে স্নান করতেন সেই “রাজার বাট”, এঁদের প্রতিষ্ঠিত পুকুর “ফুলপুকুর” ও “জলহরি”—এ সবেরও অস্তিত্ব আজও ভবানীপুর গ্রামে কিছু কিছু রয়েছে। ভবানীপুর ও পেঁড়ো ছাড়া এই ব্রাহ্মণ রাজারা রাজ্যের অন্যান্য স্থানে যে সব নগর, গ্রাম, দুর্গ, দেবমন্দির প্রভৃতি স্থাপন করেছিলেন, সেগুলো প্রায় সমস্তই কালের স্রোতে নিশ্চিহ্ন না হয়ে, আজও বর্তমান থেকে তাঁদের কীর্তিকাহিনী ঘোষণা করছে।

ভুরহুটের এই ব্রাহ্মণ রাজাদের সম্বন্ধে এসিয়াটিক সোসাইটির সম্পাদক, বিখ্যাত প্রত্নতত্ত্ববিদ মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মশায় একস্থানে লিখেছেন—“এই রাজবংশ প্রায় চারিশত বৎসর অপ্রতিহত প্রভাবে দক্ষিণ-রাঢ়ে রাজত্ব করিয়াছিলেন এবং অনেক কীর্তিকলাপও রাখিয়া গিয়াছেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে এই বংশ ধ্বংস হইয়া যায় ও এই বংশের একজন বাঙ্গালার প্রধান কবি হইয়া উঠেন। ইনিই আমাদের রায়-গুণাকর ভারতচন্দ্র রায়।”

রাজা শ্রীমন্তের বংশে অর্থাৎ পেঁড়োর রাজবংশে কবি ভারতচন্দ্রের জন্ম হয়েছিল। আনুমানিক ১৭১১ খ্রীষ্টাব্দে ভারতচন্দ্র এই পেঁড়ো গ্রামে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। ভারতচন্দ্রের জন্মস্থান এই পেঁড়ো আজও বর্তমান রয়েছে এবং তাঁর জ্যোতি বংশধরেরা রাজ্য ও জমিদারী হারালেও তাঁদের পূর্ব বংশ-মর্যাদা অনেকাংশে রক্ষা করে আজও এই গ্রামে বাস করছেন। শ্রীযুক্ত বিধুভূষণ রায় বর্তমানে এই বংশের একজন খ্যাতনামা ব্যক্তি। ভুরহুটের ব্রাহ্মণ রাজাদের একটা শাখা পেঁড়ো গ্রামে আজও বাস করলেও, মূল রাজধানী ভবানীপুরে কিন্তু আজ এঁদের কেউই নেই। অষ্টাদশ শতাব্দীতে রাজা লক্ষ্মী নারায়ণের আমলে ভবানীপুরের রাজ্য এঁদের হস্তচ্যুত হ’লে, এঁরা ভবানীপুর ত্যাগ করে পেঁড়োর ঠিক পূর্বদিকে অবস্থিত বসন্তপুর গ্রামে চলে আসেন। এই বসন্তপুরে এঁদের বংশধররা আজও বাস করছেন।

কলকাতা থেকে মাত্র ২০ মাইল দূরে হাওড়া জেলার আমতা থানার মধ্যে কবি ভারতচন্দ্রের জন্মস্থান পেঁড়ো গ্রামটি অবস্থিত। হাওড়া-আমতা লাইট রেলওয়ের মুল্লিরহাট স্টেশনে নেমে মাত্র চার মাইল পশ্চিমে গেলেই এই গ্রাম। যে কোনও সাহিত্যাসুহাগী, বিশেষ করে বীরা ভারতচন্দ্র সম্বন্ধে কিছু লিখতে যান, তাঁরা ঘটাক্রমে

সময় ও যাতায়াতে সামান্য মাত্র ১৬০ আনা রেলভাড়া খরচ করলেই কবির এই জন্মস্থানটি দেখে আসতে পারেন।

কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের বিষয় এই যে, আমাদের দেশের সাহিত্যিকরা এমন কি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদও এই পরিপ্রেক্ষিতে করতে নারাজ। অথচ তাঁরা ভারতচন্দ্রের জন্মস্থান সম্বন্ধে বলতে গিয়ে ভুল সংবাদ দিনের পর দিন পরিবেশন করছেন। এমন কি এঁরাও আবার এক এক জনে এক এক রকম কথা বলছেন। কেউ বলছেন—হুগলী জেলার পেঁড়ো বসন্তপুর গ্রামে ভারতচন্দ্র জন্মেছিলেন। কেউ বলছেন—বর্ধমান জেলার পেঁড়ো গ্রামে। আবার কেউ বলছেন—“দক্ষিণ রাঢ়ে ভূরমিট পরগণার পেঁড়ো বসন্তপুর গ্রামে।” নিয়ে এ সবের কিছু কিছু উদ্ধৃত করা গেল। প্রথমে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কথাই ধরা যাক। কেননা শিক্ষাক্ষেত্রে এর প্রভাবই সব চেয়ে বেশী।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রকাশিত প্রবেশিকা পরীক্ষার্থীদের জন্য বাঙ্গলা পাঠ্যপুস্তকে প্রতি বছরই ভারতচন্দ্রের কবিতা সংকলিত হয়। সেই উদ্ধৃত কবিতার মাধ্যমে সংক্ষেপে কবির পরিচয় আছে। সেখানে লেখা আছে—“রায় গুণাকর ভারতচন্দ্র রায় হুগলী জেলার পেঁড়ো বসন্তপুর গ্রামে ১৭১১ খ্রিষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন।”

পেঁড়ো বসন্তপুর নামে কোনও গ্রাম যে হুগলী জেলার মধ্যে নাই এবং এই পেঁড়ো বসন্তপুর যে হাওড়া জেলার মধ্যে অবস্থিত বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ তা জানেন না। ফলে না জেনে একটা ভুল সংবাদ তাঁরা ছাত্রদের শিখিয়ে যাচ্ছেন। এখানে আর একটা কথা এই যে, পেঁড়ো বসন্তপুর একটা গ্রাম নয়। পেঁড়োর ঠিক পূর্ব দিকে অবস্থিত বসন্তপুর নামক অল্প একটি গ্রাম পেঁড়োর সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে। সাধারণত একই জেলায় বা কাছাকাছি এক নামের একাধিক গ্রাম থাকলে, যাতে বুঝতে কষ্ট না হয়, সেজন্য বসন্ত গ্রামটাকে বোঝাতে গিয়ে অনেক সময় সেই গ্রামের সঙ্গে আশপাশের আর একটা গ্রামের নামও যোগ করা হয়ে থাকে। পেঁড়ো নামে কোথাও যখন আর গ্রাম নেই, তখন বসন্তপুরের উল্লেখ নিশ্চয়োজন। বরং পেঁড়োর সঙ্গে বসন্তপুর যোগ করার ছাত্ররা ভাবতে পারে যে “পেঁড়ো বসন্তপুর” একটিই গ্রাম।

ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন মশায় তাঁর “বঙ্গ-ভাষা ও সাহিত্য” গ্রন্থে ভারতচন্দ্র সম্বন্ধে লিখেছেন—“ভারতচন্দ্র রায়-গুণাকর অনুমান ১৭১২ খ্রিঃ অব্দে ভূরমিট পরগণায় হুগলীর অন্তর্গত পেঁড়ো বসন্তপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।”

পরগণা হচ্ছে জেলার অংশ। যেমন জেলার অংশ মহকুমা। অতএব ভূরমিট পরগণায় হুগলী বা হুগলী জেলা সম্ভবতঃ নাই। এখানে দীনেশবাবুর এসঙ্গে ১৯২৯ খ্রিষ্টাব্দে হাওড়া জেলার মাজু গ্রামে অস্থিত বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের ১৮শ অধিবেশনের কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। মাজু সম্মিলনের উদ্বোধনাদির অন্ততম উদ্দেশ্য ছিল, হাওড়ার শ্রেষ্ঠ কবি ভারতচন্দ্র রায়গুণাকরের স্মৃতি জাগরিত

করা। এই সম্মিলনের মূল সভাপতি বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর অনিবার্হ কারণবশত শেষ পর্যন্ত সম্মিলনে যোগদিতে না পারায় দীনেশবাবু সভাপতিত্ব করেছিলেন।

মাজুর এই সাহিত্যিক সম্মিলনে অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ছিলেন মাজুগ্রাম নিবাসী ডাঃ হুবাধচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এম, এ, দস্তুর-এস-লেভর (প্যারি) বেদান্ততীর্থ, শাস্ত্রী। তিনি তাঁর লিখিত অভিনায়ণের প্রথমেই বলেছিলেন—“সর্ব প্রথমেই হাওড়া জেলার পৌরস্বরবি রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র রায়ের নাম মনে আসে। এই মণ্ডপের পশ্চিমের বিশাল প্রান্তর দূর দিগন্তে যেখানে অশ্লষ্ট নারিকেল তালীবনের নীল রেখায় মিলাইয়া গিয়াছে ঐখানে পেঁড়ো গ্রামে ভারতচন্দ্র রায়ের পিতা নরেন্দ্রনারায়ণ রায়ের প্রাসাদ ও গড় ছিল। কবির শৈশবকাল ঐখানেই কাটিয়াছিল।” ( বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলন, ১৮শ অধিবেশন, কার্যবিবরণী : পৃ: ৩ )

সেদিন দীনেশবাবুও সভার বক্তৃতা দিতে উঠে সর্ব প্রথমেই বলেছিলেন—“মাজু হইতে বঙ্গের কবি-সম্রাট ভারতচন্দ্র রায় গুণাকরের জন্মভূমি বেনী দূরবর্তী নহে। এই স্থানে উপস্থিত হইয়া স্বতঃই তাঁহার উদ্দেশ্যে মন্তক অবনত হইতেছে।” ( ব: সা: স: ১৮শ অধিবেশন, কার্যবিবরণী পৃ: ২৯ )। এই কথার পর আরও আর ৫০টি বাক্যে দীনেশবাবু সেদিন সভায় ভারতচন্দ্রের প্রশংসা করেছিলেন।

মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মশায় অস্থতাবশতঃ সম্মিলনে উপস্থিত হতে না পারায় সম্মিলনের সাংল্যকার্য্যনা করে যে পত্র পাঠিয়েছিলেন তাতে তিনি লিখেছিলেন—“বাঙ্গলার একজন লেখকের স্মৃতি জাগরিত করিবার জন্য বাঙ্গলার হৃদয় পন্নীগ্রামে আপনারা সম্মিলিত হইয়াছেন। বাঙ্গলার যত নামী লেখক আছেন, সকলেই এখানে আসিয়াছেন...আপনাদের আগমন সার্থক হউক।” ( ব: সা: স: ১৮শ অধিবেশন, কার্যবিবরণী, পরিশিষ্ট পৃ: ৫ )

প্রাচ্যবিজ্ঞানমহর্ষি নগেন্দ্রনাথ বহু মশায়ও শারীরিক অস্থতাবশতঃ সম্মিলনে যোগ দিতে পারেন নি। তাই তিনি এক পত্রে জানিয়েছিলেন—“রায়গুণাকর ভারতচন্দ্রের জন্মভূমির নিকট নিভৃত পন্নীগ্রামে আপনারা সম্মিলনের যে আয়োজন করিয়াছেন, তাহাতে বঙ্গভাবানুরাগী সাহিত্যিক মাজুরই যোগদান বাঞ্ছনীয়।.....আমার নিতান্ত ইচ্ছা থাকিলেও এই ১৮শ সম্মিলনে যোগদান করিতে না পারিয়া এই পত্র দ্বারা আমার শুভেচ্ছা, সম্মিলনের সাফল্য ও পন্নীবাসী কর্তৃক এই সদমুষ্ঠানের জন্য আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি।” ( কার্যবিবরণী, পরিশিষ্ট পৃ: ৭ )

এ ছাড়া মাজু সম্মিলনের প্রথম দিনের অধিবেশনে নাট্যাচার্য রসরাজ অমৃতলাল বহু, কবিশেখর কালিদাস রায়, কবি প্যারিসোহন সেনগুপ্ত, নগেন্দ্রনাথ সোম কবিকৃষ্ণ প্রভৃতি তাঁদের স্ব স্ব রচিত “ভারতচন্দ্র” সম্বন্ধীয় কবিতাও পাঠ করেছিলেন।

অধিবেশনের দ্বিতীয় দিনের সকালে ২৪ জন সাহিত্যিক ও সাহিত্যানুরাগী মাজু থেকে ৩ মাইল দূরে অবস্থিত পেঁড়ো গ্রামে কবির

জন্মস্থান দেখতে যান। এঁরা গেলে কবির বংশধররা এঁদের যথাযোগ্য সমাদর করে জলযোগে পরিভূত করেন।

সম্মিলনের দ্বিতীয় দিনে বিষয়-নির্বাচনী সমিতির অধিবেশনে ভারতচন্দ্র সখদে যে প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল, তাতে বলা হয়েছিল— “যথাসম্ভব কিপ্রত্যয় সহিত ভারতচন্দ্র রায় গুণাকরের একখানি পূর্ণাঙ্গ জীবনী এবং তাঁহার সম্পূর্ণ গ্রন্থাবলীর একটি উৎকৃষ্ট সংস্করণ প্রকাশের ব্যবস্থা করা হউক।” এজন্য ঐদিন সঙ্গে সঙ্গে একটি সমিতিও গঠিত হয়েছিল এবং তাঁর সম্পাদক-সংঘে ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন, ডাঃ হুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, ডাঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার প্রভৃতি থাকেন।

বিষয়-নির্বাচন সমিতির অধিবেশনে ভারতচন্দ্র সখদে এই গৃহীত প্রস্তাব পঠিত হ'লে সঙ্গে সঙ্গেই অনেকে এই কাজের জন্য অর্থ সাহায্য করতে প্রতিশ্রুতি দেন। স্বয়ং দীনেশবাবু সেদিন সভায় ১০০ টাকা দেবেন ব'লে ঘোষণা করেন। এ ছাড়া দীনেশবাবু সেদিন মাজু সম্মিলনের উদ্যোক্তাদের আরও বলেছিলেন—আপনারা ভারতচন্দ্রের জন্মস্থানে একটি স্মৃতি-মন্দির তৈরী করবার চেষ্টা করুন, আমি সেজন্য আরও ৫০০ টাকা দোব।

অবশ্য দীনেশবাবু সব সময়েই তাঁর এই প্রতিশ্রুত টাকা দিতে প্রস্তুত ছিলেন। কিন্তু প্রকৃত চেষ্টার অভাবে ভারতচন্দ্রের পূর্ণাঙ্গ জীবনী, তাঁর সম্পূর্ণ গ্রন্থাবলীর উৎকৃষ্ট সংস্করণ প্রকাশ ও স্মৃতি-মন্দির কোনটাই হয়ে উঠেনি।

এখন আমাদের যত্নব্য এই যে, দীনেশবাবু সমস্ত জেনে এবং দেখেই এসেছিলেন যে, হাওড়া জেলার আমতা থানার মধ্যে এই “পেঁড়ো” গ্রামটি অবস্থিত। অথচ তিনি তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙ্গলা বিভাগের সর্বস্বর কর্তা হয়েও প্রবেশিকা বাঙ্গলা পুস্তকের উল্লিখিত ভুল সংশোধন করলেন না। তা ছাড়া মাজু সম্মেলনের পর তাঁর জীবিতাবস্থায় প্রকাশিত “বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের” পরবর্তী সংস্করণগুলিতেও ঐ ভুল সংশোধন করলেন না। যা ছিল তাই রেখে দিলেন।

দীনেশবাবুর পর আর একজন খ্যাতনামা পণ্ডিত ও লেখকের কথা ধরা যাক। তিনি ডাঃ হুমুয়ার সেন। হুমুয়ারবাবু “বাঙ্গলা সাহিত্যের ইতিহাস” নামে যে বইখানি লিখেছেন, তাতে ভারতচন্দ্রের জন্মস্থানের কথা লিখিতে গিয়ে তিনি আর কোন জেলায়ই উল্লেখ করেন নি। তিনি লিখেছেন—“কবির পৈতৃক নিবাস ছিল দক্ষিণরাঢ়ে ভূরশিট পরগণায় পেঁড়ো বসন্তপুর গ্রামে।”

আজকের দিনে জেলার কথা না ব'লে শুধু পরগণার উল্লেখ হুঁধোধ্য। বর্তমানে পরগণার এলেন না থাকার, কেবল পরগণার কথা বললে কেউই বুঝতে পারবে না যে জায়গাটি কোথায়। অতএব বাঙ্গলার একজন শ্রেষ্ঠ কবির কথা লিখতে গিয়ে তাঁর জন্মস্থান সখদে এরূপ উল্লেখ সসীতান হয়েছে বলে মনে হয় না।

বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ থেকে একখানি ভারতচন্দ্র-গ্রন্থাবলী প্রকাশিত হয়েছে। এই পুস্তকের ভূমিকায় ভারতচন্দ্রের জীবনীতে আবার

মধ্যে। অবশ্য এই ভারতচন্দ্র-গ্রন্থাবলীর সম্পাদকগণ তাঁদের ভূমিকায় ভারতচন্দ্রের এই জীবনী উদ্ধৃত করেছেন, সংবাদ-প্রকাশক সম্পাদক কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের লেখা “কবিবর ৬ভারতচন্দ্র রায় গুণাকরের জীবন বৃত্তান্ত” নামক গ্রন্থ থেকে।

কবি ঈশ্বর গুপ্তের লেখা এই বইটি প্রথম পুস্তকাকারে বেরিয়েছিল ১২৬২ বঙ্গাব্দের ১লা আষাঢ় (১৮৫৫ খ্রীঃ) তারিখে। অর্থাৎ ভারতচন্দ্রের মৃত্যুর প্রায় একশ বছর পরে (মৃত্যু ১৭৫২ খ্রীঃ)। সেই সময়েই ভারতচন্দ্র সখদে তথ্য সংগ্রহ করতে নাকি ঈশ্বর গুপ্তকে দশটি বছর অক্লান্ত পরিশ্রম করতে হয়েছিল। ঈশ্বর গুপ্ত তাঁর “কবিবর ৬ভারতচন্দ্র রায় গুণাকরের জীবন-বৃত্তান্ত” গ্রন্থে লিখেছেন—

“৬নরেন্দ্রনারায়ণ রায় মহাশয় জিলা বর্ধমানের অন্তঃপাতি “ভূরহট” পরগণার মধ্যস্থিত “পেঁড়ো” নামক স্থানে বাস করিতেন।...ইহার বাটার চতুর্দিকে গড়বন্দি ছিল, এ কারণ সেই স্থান “পেঁড়োর গড়” নামে আখ্যাত হইয়াছিল।

নরেন্দ্রনারায়ণ রায়ের চারি পুত্র, জ্যেষ্ঠ চতুভূজ রায়, মধ্যম অর্জুন রায়, তৃতীয় দয়্যারাম রায়, সর্ব সর্বাধিক ভারতচন্দ্র রায়।.....

এমত জনরব যে, অধিকারভুক্ত ভূমি সংক্রান্ত সীমা সখদেয় কোন এক বিবাদ হুজে নরেন্দ্রনারায়ণ রায় বর্ধমানাধিপতি মহারাজ কর্ণীচন্দ্র রায় বাহাদুরের জননী স্রীমতী মহারানী বিষ্ণুকুমারীকে কটুবাচ্য প্রয়োগ করেন.....মহারানী সেই হুঁধোধ্য শ্রবণে অত্যন্ত কোপাধিতা হইয়া “আলমচন্দ্র” ও “ক্ষেমচন্দ্র” নামক আপনার দুইজন রাজপুত্র সেনাপতিকে কহিলেন—ভূরহট অধিকার করিয়া আমার হস্তে প্রদান কর, ইহা না হইলে আমি কোন মতেই জলগ্রহণ করিব না, প্রাণ পরিত্যাগ করিব।’ এই আজ্ঞা শিরোধার্য্য করত উক্ত সেনাপতিদ্বয় দশ সহস্র সৈন্য লইয়া সেই রজনীতেই “ভবানীপুরের গড়” এবং “পেঁড়োর গড়” বল ধারা অধিকার করিয়া লইল।.....

এতদ্ব্যতীত নরেন্দ্র রায় এককালেই নিঃস্ব হইলেন, সর্বস্বই গেল, কোনরূপে কার্য্যক্ষেপে দিনপাত করিতে লাগিলেন। এই সময় ভারতচন্দ্র পলায়ন করত মণ্ডলবাট পরগণার অধীন গাজীপুরের সায়িয়া “নওরাপাড়া” গ্রামে আপনার মাতুলালয়ে বাস করত তাজপুর গ্রামে সংক্লেপসার এবং অভিশান পাঠ করিতে লাগিলেন। চতুর্দশ বৎসর বয়ঃক্রম সময়ে এই উভয় গ্রামে বিলক্ষণ নৈপুণ্য লাভ করিয়া নিজালয়ে প্রত্যাগত হইয়া ঐ মণ্ডলবাট পরগণার তাজপুরের সায়িয়া সারদা নামক গ্রামের কেশরকুলি আচাৰ্য্যদিগের একটি কন্তাকে বিবাহ করিলেন,....”

ঈশ্বর গুপ্তের লেখা থেকে এই উদ্ধৃত অংশে যে সকল গ্রামের নাম আছে—পেঁড়ো, ভবানীপুর, গাজীপুর, নওরাপাড়া, তাজপুর, সারদা—সব কটি গ্রামই আজও বর্তমান এবং এগুলি সবই হাওড়া জেলার অবস্থিত। এমন কি একই থানা—আমতা থানার মধ্যে গ্রামগুলি বর্তমান।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে—পেঁড়ো গ্রাম হাওড়া জেলার মধ্যে অবস্থিত হওয়া সত্ত্বেও এই গ্রাম সাহিত্যিকবর্ষা বর্ধমান থানা দক্ষিণী জেলায় জন্ম করছেন

মন? এর প্রধান কারণ হচ্ছে এই যে, ভারতচন্দ্রের জন্মের সময় এই পৈঁড়ো গ্রাম বর্মানেরই অন্তর্গত ছিল। তখন হাওড়া নামে কোন জেলা ছিল না। পরে পৈঁড়ো আবার বর্মান থেকে পৃথক হয়ে হুগলী জেলার অন্তর্গত হয়। তারপর শেষে হাওড়া জেলার মধ্যে আসে। এই প্রসঙ্গে এখন হাওড়া জেলা কিভাবে গঠিত হয় “Bengal District azatteers, Howrah” নামক গ্রন্থ থেকে নিয়ে সে সম্বন্ধে কিছু উদ্ধৃত করা গেল।—

“After the decennial Settlement in 1795, Hooghly, with the greater part of Howrah, was detached from Burdwan, and created a separate Magisterial charge; but no change was made in the collectorate. At that time thanas Bagnan and Amta were placed in the Hooghly jurisdiction, but Howrah city formed a part of Calcutta, its criminal cases being tried by the Magistrate and Judge of the 24 Parganas, who used to come over once a week. In 1814 thana Rajapur (now Domjur), and in 1819 thanas Kotra (now Shyampur) and Uluberia were transferred from the 24 Parganas to Hooghly. On the 1st May 1822 the Hooghly and Howrah Collectorate was entirely separated from Burdwan. In the meantime the city of Howrah had been growing steadily, and its increasing importance led to another change, the Magisterial Jurisdiction of Howrah being separated from that of Hooghly in 1843, when Mr. William Taylor was appointed Magistrate of Howrah with Jurisdiction over Howrah, Salkia, Amta, Rajapur, Uluberia, Kotra and Bagnan.”

উপরের উদ্ধৃত অংশ থেকে বেশ বোঝা গেল যে, আমতা ঝানার অন্তর্গত পৈঁড়ো গ্রাম হাওড়া জেলার অন্তর্গত হওয়ার পূর্বে যথাক্রমে মিন ও হুগলীর অন্তর্ভুক্ত ছিল। কিন্তু এখন আমাদের কথা হচ্ছে যে, হাওড়া পৃথক জেলা হওয়ার এবং পৈঁড়ো হাওড়ার মধ্যে আসা সংঘর্ষ কেউ যদি এখনও পৈঁড়ো গ্রাম বর্মান বা হুগলীর অন্তর্গত বলেন তা হ'লে আজকে তা একেবারে অর্থহীন হবে। বর্মানের উল্লেখ না করে শুধু পুরাতনের উল্লেখ করায় একটা ভুল তুলে দেওয়া হয়। পৈঁড়ো গ্রামকে বর্তমানে হাওড়া জেলার মধ্যে বসে যদি শুধু হুগলী বা বর্মানের মধ্যে বলা হয়, তা হ'লে নান্দীহর কবির জন্মস্থান খুঁজতে গিয়ে প্রাণান্ত করলেও উক্ত জেলার কোথাও এই গ্রামের সন্ধান পাবেন না।

তাছাড়া পূর্বে কি ছিল বর্তমানে তার প্রয়োজনই বা কি? সবার প্রায় সমস্ত জেলাই ত নানা সীমাপরিবর্তনের মধ্য দিয়ে আজকের রূপগুলো লাভ করেছে। আজ যদি শুধু আগের কথাই ধরা যায় তাহলে ত বাঙ্গলার অনেক খ্যাতনামা ব্যক্তিরই

জন্মস্থান নিয়ে একটা জটিলতার সৃষ্টি হবে। এখানে একটা উদাহরণ দিলেই আশা করি ব্যাপারটা বোঝা সহজ হবে। যেমন—ঈশ্বরচন্দ্র বিজ্ঞানাগর ম'শায়ের জন্মের সময় তাঁর জন্মভূমি বীরসিংহ গ্রাম ছিল হুগলী জেলার মধ্যে। তখন ঘাটাল মহকুমাটাই ছিল হুগলীর অন্তর্গত। তাই বলে কি আমরা আজও লিখব যে, হুগলী জেলার ঘাটাল মহকুমার অন্তর্গত বীরসিংহ গ্রামে বিজ্ঞানাগর ম'শায় জন্মেছিলেন। এরূপ লেখার অর্থ ত তুলে দেওয়া হয়। কেননা হুগলী জেলার আজ আর বীরসিংহ গ্রাম নেই। তাই বিজ্ঞানাগরের সময় আমরা সকলেই যেমন লিখি মেদিনীপুরের বীরসিংহ গ্রামে বিজ্ঞানাগর ম'শায় জন্মেছিলেন, তেমনি ভারতচন্দ্রের সময়ও দেখা উচিত—হাওড়া জেলার পৈঁড়ো গ্রামে ভারতচন্দ্র জন্মেছিলেন।

ভারতচন্দ্র যে বাঙ্গলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি মহাকাব্যের বিচারে তা নির্ধারিত হয়ে গেছে। ভারতচন্দ্র তাঁর অসাধারণ কাব্য প্রতিভার শুণে বাঙ্গলা সাহিত্য ক্ষেত্রে আজও তাঁর আসন অটুট রাখতে সক্ষম হয়েছেন। বাঙ্গলা কাব্য সাহিত্যের এক চরম দুর্দিনে তিনি আবির্ভূত হয়ে বাঙ্গলা কাব্যকে নানা আবিলতার হাত থেকে রক্ষা করেছিলেন। বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ হতে প্রকাশিত ভারতচন্দ্র-গ্রন্থাবলীর ভূমিকায় এই গ্রন্থাবলীর সম্পাদকগণ তাই লিখেছেন—

“১৬৭৪ শকে (খৃষ্টাব্দ ১৭৫২) ভারতচন্দ্র তাঁহার—“অন্নদা মঙ্গল” কাব্য রচনা করেন। বাংলা কাব্য-সাহিত্যের তখন অতিশয় দুর্দিন চলিতেছে। মহাজন-পদাবলী ও নানাবিধ মঙ্গল-কাব্যের অতিশয় ব্যর্থ অনুকৃতিতে এবং অল্প নানাবিধ বিকৃতিতে বঙ্গ-ভারতীর তলাকার পাক ঘুলাইয়া উঠিয়াছিল। ভারতচন্দ্র সরস বুলি এবং নিখুঁত চন্দ্রের সাহায্যে এই বিকারের প্রতিকার করিতে চাহিয়াছিলেন। তিনিই সর্বপ্রথম গ্রাম্যতা-দোষহীন সাহিত্যের উপর নাগরিক সভ্যতার প্রলেপ বুলাইয়াছিলেন। এই কারণে অনেকে তাঁহাকে পুরাতন যুগের শেষ কবি এবং আধুনিক যুগের প্রথম কবি বলিয়া থাকেন।” নিখুঁত এবং বিশুদ্ধ শব্দভাণ্ডার সাহায্যে ভারতচন্দ্র বাংলা কাব্যকে অপূর্ণ শিল্পরূপের মণ্ডিত করিতে পারিয়াছিলেন; রূপহীন কাদার তাল পাকাইয়া তিনি মনোহর মূর্তি গড়িয়াছিলেন।.....আসলে ভারতচন্দ্র শুধু “ভাবার তাজমহল”ই গড়েন নাই, যুগের উপযোগী কাব্য সৃষ্টিও করিয়াছিলেন।”

রবীন্দ্রনাথ ভারতচন্দ্রের কাব্য সম্বন্ধে বলেছেন—“রাজসভাকবি রায়গুণাকরের অন্নদামঙ্গল গান, রাজকণ্ঠে মণিমালায় মত, যেমন তাহার উজ্জলতা, তেমনি তাহার কাব্যকাব্য।”

বাঙ্গলা সাহিত্যের এহেন একজন শ্রেষ্ঠ কবির জন্মস্থানের সঠিক পরিচয় আজও না জানা আমাদের জাতীয় জীবনে একটা লজ্জার কথা। আশা করি, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ, বাঙ্গলা সাহিত্যের ইতিহাস লেখকরা এবং অন্যান্য বীর ভারতচন্দ্র সম্বন্ধে কিছু লিখতে চান, তাঁরা এখন থেকে বাঙ্গলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি ভারতচন্দ্র রায় গুণাকরের জন্মস্থানের ব্যাখ্যা বিবরণ দেন।



# কলিঙ্গ-কুমারী

শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ

৫

কলিঙ্গ রাজ্যের বৃদ্ধ মন্ত্রী তীর্থ-ভ্রমণে যাইবেন। তাঁহার যাত্রার সকল আয়োজন সম্পূর্ণ হইয়াছে। ওঙ্কারনাথ বর্তমান মহারাজার পিতার সময় হইতে মন্ত্রিত্ব করিয়া আসিতেছেন। তিনি বিশেষ সম্মানিত। তিনি বয়ো-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার সহকারীকে সুশিক্ষিত করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার তীর্থ-যাত্রার পূর্বদিন মহারাজা স্বয়ং তাঁহার গৃহে আসিয়াছিলেন—কতদিনে তিনি কিরিবেন, জিজ্ঞাসা করিয়া গিয়াছেন। রাজধানীর বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিলেন।

মধ্যাহ্নে তাঁহার গৃহিণী তাঁহাকে বলিলেন, তিনি যে সহকারীকে উৎকল রাজ্যের বৃদ্ধ-যাত্রার বিষয় জিজ্ঞাসা করিতেছিলেন, তাহার কারণ কি? মন্ত্রী বলিলেন, “আমি সংবাদ পাইয়াছি, পুরীরাজ কলিঙ্গ আক্রমণ করিবেন।”

“রাজকুমারীর পাণি-প্রার্থনার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান কি তাহার কারণ?”

“তাহাই।”

“যুদ্ধের ফল কি হইবে?”

“কলিঙ্গরাজ্যের পরাজয়।”

“সে কথা কি মহারাজাকে বলা হইয়াছে?”

“আমার যাহা কর্তব্য তাহা আমি করিয়াছি। কিন্তু মোহাবিষ্ট মহারাজার বিপরীত বুদ্ধি প্রবল হইয়াছে—আর উপায় নাই।”

“কেন?”

“সে কথার আভাস তোমাকে দিয়াছি। মহারাণী ক্ষমতাপ্রিয়তাহেতু উপযুক্ত পাত্রের রাজকুমারীকে অর্পণ করিতে চাহেন না। আমার বিশ্বাস, যদি তাঁহার সম্মত থাকিত, তবে তিনি রাজকুমারীকে বিষ প্রয়োগ করিলেও আমি বিস্মিত হইতাম না। রাজা তাঁহার দ্বারা মোহাবিষ্ট।”

“পুরীরাজকে কতদানে কি তবে সত্য সত্যই কলিঙ্গ রাজবংশের মর্যাদাহানি হইত না?”

“ব্রাহ্মণের মর্যাদা ধর্ম্মাচরণে; রাজার বংশ-মর্যাদা বীৰ্য্য-পরিচয়ে। মহারাণীর যুদ্ধের অঙ্গ—পুরোহিতপুত্র বলিয়াছেন যে, গন্ধাবংশীয়দিগের সহিত উৎকলের স্বর্ঘ্য-বংশীয়দিগের বৈবাহিক সম্বন্ধ ঘটিয়াছে, তাঁহারা বন্ধ হইতে আসিয়াছিলেন এবং বঙ্গের অধিবাসীরা মৎস্ত-ভোজী। কিন্তু আজ কোন্ অর্থা বলিতে পারেন, বহু শতাব্দীর সম্মিলনফলে তাঁহার দেহে অনাৰ্য্য রক্ত প্রবেশ করে নাই?”

“রাজ্যের আসন্ন বিপদের সময় কি এতদিন মন্ত্রিত্ব করিবার পর রাজ্যত্যাগ সম্ভব হইবে?”

“যে রাজ্য গঠনে না হইলেও রক্ষায় দীর্ঘকাল আত্ম-নিয়োগ করিয়াছি, সেই রাজ্যের ও যে রাজপরিবারের সেবা এতদিন করিয়াছি সেই রাজপরিবারের পতন যখন নিবারণ করিতে পারিলাম না, তখন তাহা দেখিবার বেদনা ভোগ করিতে চাহি না।”

“কতদিনে রাজ্য আক্রান্ত হইবার সম্ভাবনা?”

“উৎকলবাহিনীর যাত্রার আর বিলম্ব নাই।”

“কলিঙ্গবাহিনী কি শক্তিশালী নহে?”

“কলিঙ্গবাহিনী যে একদিন রাজ্যজয় করিয়াছিল, তাহার কারণ, রাজা হইতে সৈনিক সকলের সমবেত ও সম্মিলিত কার্য্য—রাজ্যের গৌরব রক্ষায় ত্যাগের আগ্রহ। সে ভাব আর নাই। আজ মহারাণীর জন্ত পুরোহিত-পুত্রও সেনাপতির কার্য্যে ক্রটির উল্লেখ করিতে সাহস করে। সেনাপতির কর্তব্যতৎপরতা কি তাহাতে ক্ষুণ্ণ হয় না?”

“এই অবস্থার প্রতীকার করা কি সম্ভব হয় নাই?”

“সম্ভব হইলে আমি তাহা করিতাম, এ বিশ্বাস কি—এতদিন স্বামীকে জানিয়াও—তোমার নাই?”

মন্ত্রীর পত্নী স্বামীকে জানিতেন। তিনি আর কোন কথা বলিলেন না।

পরিজনগণকে সঙ্গে লইয়া কলিঙ্গরাজমন্ত্রী সেই দিন তীর্থ যাত্রায় রাজধানী ত্যাগ করিয়া গমন করিলেন।

৬

উৎকলবাহিনী প্রবল বটিকার মত কলিঙ্গে প্রবেশ করিল। সে বাহিনী কালিদাসের বর্ণিত রঘুর দ্বিধিজয়-কালীন বাহিনীর মতই অগ্রসর হইল—

প্রথমে প্রতাপ তা'র, শব্দ তা'র পরে—

তা'র পরে ধূলিজাল ছাইল অধরে—

তা'র পরে চতুরঙ্গ সেনাদল চলে

গর্বিত বিজয় গর্ভে দীপ্ত নিজ বলে।

কলিঙ্গসেনা রাজ্যসীমায় সমাধিষ্ট হইয়াছিল—উৎকল-বলকে বাধা দিল। সেই সময় সেনাপতি সংবাদ পাইলেন, রাজা ধন-রত্নসহ পরিজনগণকে লইয়া রাত্রির অন্ধকারে মীণাক্ষী-মন্দিরে আশ্রয় গ্রহণ জন্ত মাতুরার অভিযুখে যাত্রা করিয়াছেন। সংবাদ সেনাদলে ব্যাপ্ত হইল—তাহাদিগের উৎসাহ-বহিতে যেন জল নিক্ষিপ্ত হইল। কলিঙ্গবাহিনী পরাভূত হইয়া পশ্চাতে আসিয়া বাধা দিবার আয়োজন করিল। প্রথম জয়ের আনন্দে উৎফুল্ল উৎকল-সেনার আক্রমণ তাহারা সহ্য করিতে পারিল না—ছত্রভঙ্গ হইয়া পলায়ন করিল। দীর্ঘপথ অতিক্রম করিয়া উৎকলবাহিনী কলিঙ্গের রাজধানীর উপকণ্ঠে আসিয়া শিবির স্থাপন করিল। তখন দিগন্ত-তপন মেঘের উপরে রক্তপ্রলেপ দিয়া অন্ধকার-রাজ্যে প্রবেশাশুধ। রাজধানী সুরক্ষিত করিবার ব্যবস্থা আছে মনে করিয়া সেনাপতি সে রাত্রিতে আর রাজধানীতে প্রবেশ-চেষ্টা করিলেন না।

রাত্রিকালেই তাঁহার চর সংবাদ আনিল, রাজধানী বিনাযুদ্ধে আত্মসমর্পণ করিয়াছে—রাজা সপরিবারে পলায়িত—প্রাসাদ শূন্য। তথাপি সেনাপতি রাজপ্রাসাদে গমনকালে আবশ্যক সতর্কতাবলম্বনে ক্রটি করিলেন না—তিনি সমস্ত অখারোহীদলের পুরোভাগে—রাজধানীর জন-শূন্যপ্রায় পথে অগ্রসর হইলেন—যে সকল অধিবাসী নগর ত্যাগ করে নাই তাহারা সেনাদলের আগমন সময় দ্বার বন্ধ করিতে লাগিল। তাহারা দরিদ্র—দরিদ্রের ভয় কোথায়? অখারোহীদিগের বর্ষার ফলকে ও উন্মুক্ত তরবারের ফলকে রবিবর জ্বলিতে লাগিল। সেনাদল যখন প্রাসাদের পূর্বসিংহদ্বারে উপনীত হইল, তখন দ্বার মুক্ত—প্রাঙ্গণ-মধ্যবর্তী পথ অতিক্রম করিয়া এক অনিন্দ্য স্থলরী তরুণী—একজনমাত্র বৃদ্ধা পরিচারিকাসহ অগ্রসর হইয়া

আসিয়া মুক্ত দ্বারের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলেন। প্রভাত-রবির আলোক যেন তাঁহাকে সৌন্দর্য্যমাত্র করিল—তাঁহার বস্ত্রের ও অলংকারের হীরকে আলোক-স্থিতির উদ্ভব করিতে লাগিল।

সেনাপতি অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া তরুণীর সম্মুখীন হইয়া বলিলেন, “আপনি কি কলিঙ্গরাজ-কুমারী? আমি বিধম সময়বিজয়ী পুরীরাজের আদেশে কলিঙ্গ বিজয়ে আসিয়াছি।”

তরুণী নতদৃষ্টি। তিনি বলিলেন, “না। আমি কলিঙ্গ-রাজের কন্যা।”

“আপনি কি মহারাজার সহিত পুরতাগ করেন নাই?”

“না। পুরীরাজের কলিঙ্গ আক্রমণ আমারই জন্ত।

প্রজার দুঃখ—অশ্বক্ষুরে ও সেনাপদে শতক্ষেত্রনাশে দুর্ভিক্ষের সম্ভাবনা—ধরণীর রক্তে রঞ্জন—এ সকল হইতে কলিঙ্গরাজ্যকে অব্যাহতি দিবার জন্ত আমি পিতার অশ্ব উপেক্ষা ও পুরবাসীদিগের অহরোধ অগ্রাহ্য করিয়া—পিতার সহিত পলায়নের অগোরব-প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিয়া বিজয়ীর নিকট বন্দী হইবার জন্ত একাকী প্রাসাদে অপেক্ষা করিতেছি। আমাকে বন্দী করুন।”

সেনাপতি প্রশংসমান দৃষ্টিতে তরুণীর দিকে চাহিয়া রহিলেন—কয় মুহূর্ত্ত তাঁহার বাক্যস্মৃতি হইল না। তাহার পরে তিনি সমস্তম্বে বলিলেন, “আপনি কলিঙ্গরাজ কন্যা। আমি আমার প্রভুর আদেশে আপনাকে বন্দী করিতেছি—ভূত্যের অপরাধ ক্ষমা করিবেন।”

পদ্মাবতী তাঁহার দুই কর সেনাপতির দিকে প্রসারিত করিয়া দিলেন।

সেনাপতি সমস্তম্বে নিবেদন করিলেন, “কলিঙ্গ-কুমারী, আপনার অঙ্গ স্পর্শ করি এমন ধৃষ্টতা আমাদের নাই—আপনাকে বন্ধন করা ত পরের কথা। আপনি প্রাসাদেই অবস্থান করুন। আমি যানবাহন সংগ্রহ করিয়া আপনাকে ও আপনার নির্দেশানুসারে পরিচারিকাদিগকে সমস্তম্বে নীলাচলে লইয়া যাইবার ব্যবস্থা করিব। আমাকে প্রাসাদ ও পুররক্ষার সকল ব্যবস্থাও করিয়া যাইতে হইবে। কারণ, প্রাসাদ শূন্য—পুর পরিত্যক্ত।”

“আপনার শিষ্টাচারের জন্ত আমি কৃতজ্ঞ”—বলিয়া কলিঙ্গকুমারী প্রাসাদান্তিমুখে গমন করিলেন।

সেনাদল মুখ্যভাবে তাঁহাকে লক্ষ্য করিতে লাগিল।  
সেনাপতি সহকারীকে বলিলেন—পুরীর রাজা পুরুষসিংহ ;  
কলিঙ্গ-কুমারী সেই সিংহের উপযুক্ত সিংহী।

৭

পুরীর প্রাসাদে রাজসভায় পুরুষোত্তমদেব সিংহাসনে  
উপবিষ্ট। তিনি অন্তমনস্ক—যেন কিছু প্রতীক্ষা করিতেছেন।  
কলিঙ্গজয়ের সংবাদমাত্র অগ্রদূতমুখে আসিয়াছে—সেনাপতি  
তখনও প্রত্যাবর্তন করেন নাই। সভার কাষ শেষ হইল—  
সভাভঙ্গের পূর্বে নর্তকীরা গান করিতেছিল—

“ললিতলবঙ্গলতাপরিণীলনকোমলমলয়সমীরে

মধুকরনিকর করখিতকোকিলকুজিতকুঞ্জকুটারে

বিরহতি হরিরিহ সরস বসন্তে ॥”

সহসা দূরে মহারাজার জয়ধ্বনি ধ্বনিত হইল এবং সেনা-  
দলের বাগধ্বনি শ্রুত হইল।

গান বন্ধ হইল। সকলেই দ্বারের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ  
করিলেন। মন্ত্রী স্থান ত্যাগ করিয়া সভাগৃহ ত্যাগ করিয়া  
যে দিক হইতে সেনাদল আসিতেছিল, সেই দিকে অগ্রসর  
হইলেন।

সেনাপতি সভায় আসিয়া রাজার অয়োচারণ করিলেন।

রাজা ব্যস্ত হইয়া সংবাদ জিজ্ঞাসা করিলে, সেনাপতি  
বলিলেন, কলিঙ্গবিজয় সম্পূর্ণ হইয়াছে—কলিঙ্গরাজ রাজ্য  
ত্যাগ করিয়া পলায়ন করিয়াছেন ; রাজার নির্দেশানুসারে  
তিনি পরাভূত ও পলায়িত শত্রুর অহসরণ করেন নাই।

রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, কলিঙ্গ-কুমারী ?

সেনাপতি নিবেদন করিলেন, “তিনি একাকিনী  
প্রাসাদে আমাদিগের আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিলেন।”

রাজা সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিলেন, “কেন ?”

তিনি বলিলেন, এ যুদ্ধ তাঁহারই জন্ত—শস্ত্র-নাশ, রক্ত-  
পাত, প্রজার ক্রন্দন এ সকল হইতে রাজ্যকে নিষ্কৃতিদান  
জন্ত তিনি বন্দী হইতে অপেক্ষা করিতেছিলেন।

সভায় প্রশংসাশুভ্রন শ্রুত হইল। রাজা যেন আশ্চ-  
বিস্মৃত হইয়া বলিলেন, “আশ্চর্য্য নারী।”—তাহার পরেই  
তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, “কলিঙ্গ-কুমারী কোথায় ?”

সেনাপতি বলিলেন, “তাঁহাকে সম্মানে আনা হইয়াছে।  
মন্ত্রী মহাশয় তাঁহাকে শিবিকা হইতে নামাইয়া মন্ত্রণাকক্ষে  
অপেক্ষা করিতেছেন।”

এই সময় মন্ত্রণাকক্ষের দ্বারাবরণ সরাইয়া মন্ত্রী সভাগৃহে  
প্রবেশ করিলেন—পশ্চাতে কলিঙ্গ-কুমারী দৃঢ়পদে আসিলেন  
—দৃষ্টি নত। তিনি রাজাকে যুক্তকরে প্রণাম করিলেই  
মন্ত্রী বলিলেন, “রাজন, কলিঙ্গ-কুমারী মানসিক উত্তেগে ও  
দীর্ঘপথাতিবাহনে শ্রান্ত, অহুমতি হইলে আমি তাঁহাকে  
আমার গৃহে পাঠাইয়া দিতে চাহি।”

রাজার দৃষ্টি তরুণীর মুখে নিবদ্ধ হইল। তিনি অন্তমনস্ক-  
ভাবে বলিলেন, “ভ্রান্ত।”

কলিঙ্গ-কুমারী নত দৃষ্টি তুলিয়া রাজার দিকে চাহিলেন  
—চারি চক্ষুর দৃষ্টি মিলিত হইল। মন্ত্রী তাহা লক্ষ্য করিলেন,  
নীলকান্তকে নির্দেশ দিলেন, যান প্রস্তুত আছে, কলিঙ্গ-  
কুমারীকে তাঁহার গৃহে লইয়া যাওয়া হউক ; তিনি সভাভঙ্গ  
হইলে যাইবেন। মহারাজা পরে যেক্রপ নির্দেশ দিবেন,  
তদনুসারে কায হইবে। পদ্মাবতী সভাগৃহ ত্যাগ করিলেন।

রাজা বলিলেন, “মন্ত্রী, কলিঙ্গ-কুমারীর সম্বন্ধে নির্দেশ  
ত আমি যুদ্ধ-বোষণার সঙ্গে সঙ্গেই দিয়াছি ; তদনুসারেই  
কায হইবে—চণ্ডালে অর্পণ—”

রাজার উক্তি শেষ না হইতেই মন্ত্রী বলিলেন, “মহারাজ,  
যে শতদল দেবচরণে বা রাজকরে শোভা পায়, তাহাকে  
চণ্ডালের করে অর্পণ করা কি অভিপ্রেত ? রাজ্যের—  
উৎকল ও কলিঙ্গ দুই রাজ্যের প্রজারা কি এই ব্যবহারে  
ব্যথিত হইবে না ?”

“কিন্তু জগবন্ধুর রত্নবেদী স্পর্শ করিয়া যে প্রতিজ্ঞা  
করিয়াছি, তাহা ভঙ্গ করা যে মহাপাপ।”

রাজা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিলেন।

মন্ত্রী আর কিছু বলিলেন না।

সভা ভঙ্গ হইল।

৮

পুরীর রাজ-মন্ত্রীর গৃহে একটি কক্ষে মন্ত্রীর কন্যা বিমলা  
ও কলিঙ্গ-কুমারী পদ্মাবতী উপবিষ্টা ছিলেন। উভয়ে প্রায়  
সমবয়সী—উভয়ে কয় মাসে সখীর ভাব বর্নিত হইয়াছিল।  
বিশেষ মন্ত্রী কলিঙ্গ-কুমারীকে কন্যার মতই মেহদানে পালন  
করিতেছিলেন এবং সে পরিবারে—কেবল সে পরিবারে  
কেন, সকলেই—তাঁহার জন্ত হৃৎখিত ছিলেন।

বিমলা সেতার লইয়া গান করিতেছিলেন—

“প্রিতকমলাকুচমণ্ডল ধৃতকুণ্ডল  
কলিতলতিবনমালা। জয় জয় দেব হরে ॥  
দিনমণিমণ্ডল ভবধণ্ডল  
মুণিজনমানসহংস। জয় জয় দেব হরে ॥  
কালীয়বিষধরগঞ্জন জনরঞ্জন  
বদ্রকুলনলিন-দিনেশ। জয় জয় দেব হরে ॥  
মধুঘুরনরকবিনাশন গরুড়াসন  
সুরকুলকেলিনিধান। জয় জয় দেব হরে ॥  
অমলকমলদললোচন ভবমোচন  
জিতুবনভবননিধান। জয় জয় দেব হরে ॥  
জনকসুতাকৃতভূষণ জিতভূষণ  
সমরসমিত দশকণ্ঠ। জয় জয় দেব হরে ॥  
অভিনবজলধরসুন্দর ধৃতমন্দর  
শ্রীমুখচন্দ্রচকোর। জয় জয় দেব হরে ॥  
তব চরণে প্রণতা বয়মিতি ভাবয়  
কুসকুণ্ডলং প্রণতেষু। জয় জয় দেব হরে ॥

সেতার রাধিয়া বিমলা উদ্দেশে হরিকে প্রণাম করিলেন।  
পদ্মাবতীও দেবতার উদ্দেশে প্রণাম করিলেন।

বিমলা পদ্মাবতীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “ভগিনী, একটি কথা জানিবার জন্য আমার কোতুলকের অন্ত নাই, কিন্তু পাছে তাহা জানাইতে তোমার কোন আপত্তি থাকে বা প্রকাশ করিতে তুমি ব্যথা পাও, সেই জন্য জিজ্ঞাসা করিতে সাহস করি না। জিজ্ঞাসা করিব কি?”

পদ্মাবতী বলিলেন, “ভগিনী, তুমি জানিতে পার না, এমন কোন গোপন কথা এই অভাগিনীর কি থাকিতে পারে? তোমাদিগের রেহের কথা কি আমি কখন ভুলিতে পারি? যে দিন আমি বন্দিনী অবস্থায় এই নগরে নীত হই, সেই দিন হইতে তোমার পিতা আমাকে কস্তার মত রেহেই রক্ষা করিয়া আসিতেছেন। তোমার মাতা—আমি যে মাতুলেহে বাল্যকালাবধি বঞ্চিত আমাকে তাহাই দিয়া ধৃত করিয়াছেন। আর তুমি—আমি কি জানি না, তুমি কেবল আমারই জন্য এই কয়মাস কাল পতিগৃহ হইতে আসিয়া পিতৃ-গৃহেই রহিয়াছ? তুমি কি জিজ্ঞাসা করিবে?”

“আমার কেবলই জানিতে কোতুলক হয়, কেন তুমি পিতার সহিত কলিঙ্গ হইতে পলায়ন কর নাই?”

“আমার জীবনের কথা বাহা জান, তাহাভেই বুঝিয়াছ,

বিমাতার শাসিত সংসারে আমার স্বথ ছিল না—মনের শাস্তি-নাশেরও সম্ভাবনা ঘটিয়াছিল; কারণ, তিনি কর্তৃক রক্ষার জন্য আমার ক্ষতি করিতে কেবল প্রস্তুতই ছিলেন না—উত্ততও হইয়াছিলেন। আর”—একটু ইতস্ততঃ করিয়া তিনি বলিলেন, “আর আমি পুরীরাজের প্রতিজ্ঞার বিবরণ অবগত ছিলাম না।”

পদ্মাবতীর চক্ষু হইতে অশ্রু—কমলদলের উপরস্থিত জল-বিন্দু যেমন বাতাসে কমল আন্দোলিত হইলে পতিত হয়—তেমনই পতিত হইল।

বিমলা সরেহে নিজ অঞ্চলে পদ্মাবতীর অশ্রু মুছাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “তুমি কি পুরীরাজকে পূর্বে দেখিয়াছিলে?”

পদ্মাবতী নতদৃষ্টি হইয়া বলিলেন, “হাঁ।”

“কোথায়?”

“গত বৎসর আমি বিমাতার সহিত গোপনে রথযাত্রার সময় পুরীতে আসিয়াছিলাম—তখন।”

“তবে কি তুমি তাঁহাকে—”

তাঁহার কথা শেষ হইতে না দিয়া পদ্মাবতী তাঁহার হস্ত ধারণ করিয়া কাতরভাবে বলিলেন, “বসন্তের বাতাসে যেমন লতার ফুল আত্মপ্রকাশ করে—তোমার দেহশক্তি জিজ্ঞাসায় তেমনই যে গোপনভাব প্রকাশ পাইয়াছে—তাহার বিষয় আর জিজ্ঞাসা করিও না—হায় নারী জন্ম!”

বিমলা বলিলেন, “বাবা ইহা জানিলে নিশ্চয়ই—”

বাধা দিয়া পদ্মাবতী বলিলেন, “একান্ত অহুরোধ, কাঁহাকেও ইহা জানাইও না। অপমানের উপর লজ্জা—ক্ষতে ক্ষারক্ষেপ। আমরা হিন্দু নারী, বাহারা মুতু্যকে বরণ করিতে ভয় করে না—সেচ্ছায় অনলে আত্মাহুতি দেয়।”

২

রথযাত্রা। মন্দির হইতে আসিয়া জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রা রথে আরোহণ করিয়া সর্বসাধারণকে দর্শন দিবে; সকলে জগন্নাথের রথের রজু আকর্ষণ করিবার সৌভাগ্য লাভ করিবে। রথে জগন্নাথকে দর্শন করিলে আর জন্ম-গ্রহণ করিতে হয় না—এই বিশ্বাসে সমগ্র হিন্দুস্থানের সকল দেশ হইতে নর-নারী এই সময় শ্রীক্ষেত্রে সমবেত হইয়া থাকেন। সমগ্র নগর জনপূর্ণ।

রথযাত্রার দিন প্রত্যহে বিমলা পদ্মাবতীকে বলিলেন—

তঁাহার পিতা-মাতার সহিত তিনিও রথে জগন্নাথকে দর্শন করিতে যাইবেন—পদ্মাবতীকেও যাইতে হইবে। প্রস্তাব শুনিয়া পদ্মাবতী বিস্মিত হইলেন; বলিলেন, তিনি রণজিতা—বন্দী; তঁাহার মুখ দেবতাকে বা মানবকে দেখাইতেও লজ্জা। কিন্তু বিমলা যখন বলিলেন, তঁাহার পিতার বিশেষ অহরোধ—পদ্মাবতী তঁাহার সহিত গমন করেন, তখন পদ্মাবতী বলিলেন—মন্ত্রী অহরোধ তঁাহার পক্ষে কত্নার নিকট পিতার আদেশ—তঁাহার যত কষ্টই কেন হউক না, তিনি সে আদেশ পালন করিবেন।

যথা সময়ে মন্দির হইতে ছড়িদার আসিয়া সংবাদ দিলে মন্ত্রীর পত্নী বিমলাকে, পদ্মাবতীকে ও আত্মীয়া প্রভৃতিকে লইয়া রথযাত্রার পথিপার্শ্বস্থ নির্দিষ্ট স্থানে গমন করিলেন। মন্ত্রী প্রথাহুসারে পূর্বেই রথযাত্রার ব্যবস্থার জ্ঞাত মন্দিরে গমন করিয়াছিলেন।

দেববিগ্রহগুলি তখন রথজয়ে স্থাপিত হইয়াছে—রথ যাত্রার জ্ঞাত প্রস্তুত। রথের রজ্জুতে দুইটি সুসজ্জিত হস্তী বদ্ধ হইয়াছে—ভক্তদল রজ্জু আকর্ষণ করিবার জ্ঞাত আগ্রহ প্রকাশ করিতেছেন। তুর্গ্যধ্বনি হইলে হস্তী অথ পদাতিকসহ শোভাযাত্রা করিয়া পুরীর রাজা আসিবেন—দেবতার নিকট মানব, দেববলের নিকট বাহুবল তুচ্ছ ইহাই দেখাইবার জ্ঞাত প্রথা—পুরীর রাজা মূল্যবান সম্ভারজনী লইয়া রথের মার্জন করিবেন। তাহার পরে রথযাত্রা আরম্ভ হইবে।

তিনবার তুর্গ্যধ্বনি হইল। শোভাযাত্রা আসিল। রাজা সুসজ্জিত হস্তী হইতে অনায়াসে অবতরণ করিলেন। ভূত্যা সম্ভারজনী আনিয়া দিল। রাজা তাহা গ্রহণ করিয়া রথের গমন-পথ মার্জন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

মন্ত্রী দ্রুত গতিতে তঁাহার পরিজনগণের জ্ঞাত নির্দিষ্ট স্থানে আসিয়া কলিঙ্গ-কুমারীর দক্ষিণ হস্ত ধারণ করিয়া—তঁাহাকে লইয়া পথের উপর উপস্থিত হইয়া রাজাকে বলিলেন, “রাজনির্দেশে আমি আপনাকে এই কত্তা প্রদান করিতেছি।”

জনতা হইতে উখিত হর্ষ-কোলাহল গগন পবন পূর্ণ করিল।

রাজা বলিলেন, “মন্ত্রী, কাহাকে কি বলিতেছেন?”

মন্ত্রী কষুকণ্ঠে বলিলেন, “আমার প্রভু বিষমসমর-বিজয়ী পুরীরাজ—স্বর্ঘ্যবংশদৌপ পুরুষোত্তমদেব জগৎজয় রত্নবেদী স্পর্শ করিয়া প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছিলেন—কলিঙ্গ-রাজের অসঙ্গত ও উদ্ধত ব্যবহারের প্রতিশোধে তিনি কলিঙ্গ বিজয় ও কলিঙ্গ-রাজকত্তাকে চণ্ডালে অর্পণ করিবেন। সেই প্রতিজ্ঞার একাধি পূর্ণ হইয়াছে—কলিঙ্গ-বিজয় হইয়াছে; দ্বিতীয়াধি পূর্ণ করিবার ভার প্রভু আমাকে দিয়াছিলেন—আজ আমি তাহা পূর্ণ করিয়া রাজাদেশ পালন করিতেছি। আমার প্রভুর আদেশ ছিল—কলিঙ্গ-কুমারীকে চণ্ডালে অর্পণ করিতে হইবে। আজ আপনি চণ্ডাল—যাঁহার রত্নবেদী স্পর্শ করিয়া রাজা প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, তঁাহারই সম্মুখে আমি আপনাকে এই কত্তা সমর্পণ করিতেছি—রাজাদেশ আপনাকে পালন করিতেই হইবে।”

রাজাকে নির্বাক দেখিয়া মন্ত্রী বলিলেন, “রাজন, আমি এই রাজবংশে মন্ত্রিত্ব করিয়া মানব-চরিত্র-জ্ঞান অর্জন করিয়াছি। আমি আপনার যেমন কলিঙ্গ-কুমারীরও তেমনই মনোভাব নথদর্পণে দেখিতেছি। যে প্রতিজ্ঞা আপনাদিগের মিলনে বাধা ছিল, তাহা আজ দূর হইয়াছে। কলিঙ্গ-কুমারী আপনার উপযুক্ত পত্নী—আপনি ইহার উপযুক্ত পতি।”

মন্ত্রী রাজার হস্ত লইয়া তাহার উপর পদ্মাবতীর হস্ত অর্পণ করিলেন। জনতা হর্ষধ্বনি করিয়া উঠিল।

মন্ত্রী বলিলেন, “রাজন ও রাজ্ঞী, জনতার—প্রজার এই হর্ষধ্বনি আজ শুভদিনে আপনাদিগের মিলনের মঙ্গলশব্দ-নিনাদ—আপনাদিগের সৌভাগ্য ঘোষণা করিতেছে।”

তিনি যুক্তকরে রথারূঢ় জগন্নাথকে প্রণাম করিলেন। সহস্র সহস্র কণ্ঠে উচ্চারিত হইল—“জয় জগন্নাথ! জয় জগন্নাথ! জয় জগন্নাথ!”



# সাহিত্যে রূপক ও প্রতীক

অধ্যাপক শ্রীঅমূল্যধন মুখোপাধ্যায় এম-এ, পি-আর-এস

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

Blakeর কাব্যের আলোচনা এসঙ্গে প্রতীকের প্রকার-ভেদ সম্বন্ধে কিছু বলা দরকার। প্রতীকের সংজ্ঞা আগেই দেওয়া হয়েছে; যে প্রত্যক্ষ বস্তু অপ্রত্যক্ষের সঙ্গে বিজড়িত, তারই সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শের জন্য তারই অংশ কিংবা মূর্ত্ত প্রকাশ বা প্রতিনিধি বলে উপলব্ধ হয়, তাকেই বলা যায় প্রতীক। প্রতীক নির্দেশক পদার্থের একটা সাক্ষাৎ প্রতীতি এনে দেয়, সেই পদার্থের স্থানে প্রতীককে বসালেই কাজ চলে যায়। প্রতীক, রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলতে গেলে, “এক দিকে ঘরের, আর একদিকে অস্তরের; তাহাকে একদিকে স্পর্শ করিতেছি, সে আর একদিকে সমস্ত আয়তের অতীত।” প্রতীকের এই সাধারণ লক্ষণ হ’লেও প্রতীক নানা প্রকারের হ’তে পারে। কতকগুলো সাধারণ বস্তুকে, যেমন ধূপ, দীপ, মাগা, লাল, সবুজ প্রভৃতি রঙকে অনেক সময় প্রতীক হিসেবে ব্যবহার করা হয়। এই সব বস্তুর সঙ্গে যে ভাবধারা জড়িত আছে, তা সর্বলোক-বিদিত। কিন্তু অনেক সময় এই সব প্রতীকে কুলিয়ে ওঠে না। ইচ্ছামত বিশেষ বিশেষ বস্তুকে বিশেষ বিশেষ ভাবের প্রতীক ভাবে ধরে নেওয়া হয়। প্রত্যেক ধর্ম্মে তাই করা হয়েছে। খৃষ্টান ধর্ম্মে কতক-গুলি প্রতীক গ্রহণ করা হয়েছে। সেই ধর্ম্মের অন্তর্ভুক্ত বিশেষ বিশেষ সম্প্রদায়ের বিভিন্ন লেখক-গোষ্ঠীর আবার বিশিষ্ট প্রতীক আছে। এই জগ্রে প্রতীক রচনার মর্ম্ম উপযুক্ত টীকা টিপনীর সাহায্য ছাড়া অনেক সময় বোঝা যায় না। Blakeএর কাব্য এ জগ্রে অনেক সময়েই হুস্তবেশ। এ ছাড়া আবার লেখক কখনও কখনও নিজের রচিত প্রতীকের সৃষ্টি করেন। তখন পাঠকের পক্ষে রচনা একেবারেই দুর্বোধ্য হয়ে উঠতে পারে, যদি না সেই প্রতীক রচনার পরিভাষা তাঁর জানা থাকে।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে ফরাসী দেশে একদল লেখক (symbolists) এই রকম ভাবে নব-কল্পিত প্রতীকের সাহায্যে কাব্য-লেখার চেষ্টা করেন। প্রাচীন প্রতীক তাঁরা গ্রহণ কর্তে পারেন নি, কারণ তাঁদের মনে প্রাচীনদের বিশ্বাস, সংস্কার বা অনুভূতি কিছুই ছিল না। অথচ প্রতীকের আবশ্যকতা তাঁরা বোধ করেছিলেন। শিল্পে বস্তুবাদের বাস্তবতা ও হুস্তপটতার বিপক্ষে এঁরা বিদ্রোহ করেন। বাস্তবের ছবি আঁকা, ভাবের উচ্ছ্বাস, কল্পনার বিলাস তাঁদের লক্ষ্য ছিল না। এঁরা চেয়েছিলেন মনের হুস্ত গূঢ় অনুভূতি ও প্রেরণাকে প্রকাশ কর্তে। পার্থিব ব্যবহারের ভাষা দিয়ে এই হুস্ত উপলব্ধির প্রকাশ করা যায় না। তাঁরা অলঙ্কারের কৃত্রিমতার জগ্রে তাও বর্জন করেছিলেন। সুতরাং ইঙ্গিতই তাঁদের ভাব প্রকাশের একমাত্র উপায় দেখে নুতন প্রতীকের সৃষ্টি করেন; বিশিষ্ট অর্থে বিশেষ বিশেষ বস্তু,

শব্দ ও ধ্বনি প্রয়োগ কর্তে আরম্ভ করেন। কিন্তু তার ফলে তাঁদের রচনা সব সময়ে সকল-সম্ভব-স্বন্দরসংবাদী হয়েছিল কিনা, অর্থাৎ কাব্যের মূখ্য উদ্দেশ্য পূর্ণ কর্তে পেরেছিল কিনা, সেটা সন্দেহের বিষয়। তবে অবশ্য গুণী লেখক তাঁর নিজস্ব প্রতীকের তাৎপৰ্য্য সম্ভব পাঠকের কাছে ফুটিয়ে তুলতে পারেন। তাঁদের প্রভাব অল্প দেশেও ছড়িয়ে পড়েছে। Yeatsর কাব্যে প্রতীকের একটা বিশিষ্ট স্থান আছে। সে সব প্রতীক প্রাচীন Irelandর কাহিনী ও সংস্কারের সহিত জড়িত। সাম্প্রতিক ইংরেজি কাব্যের অন্যতম নায়ক T. S. Eliotর ‘The Hollow Men’, ‘The Waste Land’ প্রভৃতি কবিতাতে নিম্নলিখিত অভিনব প্রতীকের প্রচুর প্রয়োগ দেখা যায়। তাঁর প্রতীক আধুনিক হুশিক্ষিত মনের সংস্কারের সহিত বিজড়িত এবং আমাদের সাহিত্যিক ইতিহাসের উপর প্রতিষ্ঠিত।

প্রাগ্য সাহিত্যে প্রতীকের ব্যবহার বহুল প্রচলিত। পারস্যদেশে কবী, হাফিজ, ওমর খৈয়াম প্রভৃতির কাব্যে প্রতীকের প্রচুর প্রয়োগ দেখা যায়। আক্ষা, সুরা, বাগিচা, গোলাপ, সাকী, বুলবুল, সরাই, পেয়লা, অবগুষ্ঠন প্রভৃতি প্রতীক বিশিষ্ট গূঢ় অর্থে তাঁদের কাব্যে ব্যবহৃত হ’য়েছে। ওমর খৈয়ামের আধুনিকীকৃত অনুবাদেও এই প্রতীক পন্থার কিছু কিছু পরিচয় পাওয়া যায়।

I tell Thee this—when starting from the Goal,  
Over the shoulders of the flaming Foal  
Of Heaven Parwin and Mushtore they flung,  
In my predestin'd plot of Dust and Soul.

এ কথা স্বীকার কর্তেই হ’বে যে সংস্কৃত সাহিত্যে উপমা, রূপক ইত্যাদির ছড়াছড়ি থাকলেও তাতে প্রতীকের ব্যবহার খুব কম। স্পষ্টবাদী ক্লাসিক্যাল মন কোন দেশেই প্রতীকের প্রতি অনুকূল নয়। কিন্তু মধ্যযুগে ভারতবর্ষে যে সমস্ত গুহ্য অধ্যাত্মজ্ঞানের চর্চা চলেছিল, তারই আনুমানিক রূপে, ধর্ম্মে, কর্ম্মে ও জীবনের নানা ক্ষেত্রে প্রতীকের ব্যবহার খুবই চলেছিল এবং সঙ্গে সঙ্গে একটা প্রতীক সাহিত্যও গড়ে উঠেছিল। বাঙলা সাহিত্যের প্রাচীনতম গ্রন্থ চর্যাপদের অনেকগুলি পদ যে প্রতীক কাব্য সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

দুলি দুহি পিটা ধরণ ন জাই।  
রূপের তেস্তলি কুতীরে খাই।  
আজ্ঞন ঘরণ হুন ভো বিআতী,  
কান্টো চোরে নিল অধরাতী।



হুয়া নিদ গেল বহুতী জাগর।

কান্টে চোরে নিল কা গই মাগজ ॥

এই জাতীয় পদকে রূপক বলা চলে না, এ সব প্রতীক কাব্য।

চর্চাপদের পরে বাঙলায় সহজিয়া প্রভৃতি নানা গুহ্য ধর্ম্মাচারের (cult) আনুষ্ঠানিক ভাবে অনেক প্রতীক কবিতা রচিত হ'য়েছিল। বাউল, ভাটিয়ালী গান, কর্ত্তাভজা-সম্প্রদায়ের গান ও এবংবিধ অস্ত্রাশ্র কাব্যে প্রতীকের ব্যবহার ছিল। কিন্তু বৈষ্ণবকাব্যে প্রতীকের ব্যবহার কম। বৈষ্ণবকাব্যে ভাবসম্পদ প্রচুর, অনুভূতি প্রগাঢ়। কিন্তু সে কাব্য “দেবতারে প্রিয় করি, প্রিয়েরে দেবতা” করে, আমাদের কুটীর প্রাঙ্গণকেই বৈকুণ্ঠ করে তোলে। বৈষ্ণব কবিতা মানবিকতায় পরিপূর্ণ, হুতরাং তাতে যে প্রতীকের আবশ্যকতা কম শুধু তাই নয়, প্রতীক অনেক পরিমাণে বৈষ্ণব কাব্যের উদ্ভিষ্ট রসের বিরোধী। বিভাগতি, চণ্ডীকাস, জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাস প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণব কবিদের বিখ্যাত পদগুলিতে—মানবিক উপাদান ও স্বাভাবিক পদ্ধতি-ই আমরা দেখতে পাই। বোধ করি এই জন্তই ঐ পদগুলি এত মনোহর ও তার আবেদন এত উদার। তবে এমন সব বৈষ্ণবপদ-ও আছে, যাতে প্রতীকের ব্যবহার আছে, যেখানে এক একটি কথা হৃদয়প্রসারী চিন্তা ও ভাবের প্রতিভূ এবং সেই সব কথা দিয়েই একটা লোকদুর্লভ রসলোকের সৃষ্টি করা হ'য়েছে। রাধাকৃষ্ণের মিলন, ঝুলন ইত্যাদি এই সব পদের বিষয় এবং মানবদুর্লভ উপলব্ধি তাহার প্রতিপাদ্য।

এই প্রসঙ্গে কাব্যে প্রতীকের ব্যবহার সম্বন্ধে দু'একটি কথা বলা দরকার। কাব্য সকল-সহৃদয়-হৃদয়-সংবাদী না হ'লে কাব্য-রচনাই ব্যর্থ হ'য়ে যায়। হুতরাং সহৃদয়কে যে মাধ্যমে আবেদন করা যায়, সেই রকম মাধ্যমই কাব্যের পক্ষে প্রশস্ত। হুতরাং প্রতীক যদি একেবারে সাক্ষাভাষার অর্থাৎ সাম্প্রদায়িক বা ব্যক্তিগত পরিভাষার বিষয় হ'য়ে দাঁড়ায়, তবে কাব্যরস সৃষ্টির পক্ষে তা' বিষ-স্বরূপ হ'তে পারে। Poetry should be simple, sensuous and passionate' (Milton) এ কথার সত্যতা সম্বন্ধে সন্দেহ নেই।

ভগ্না কবিতয়া কিং বা

ভগ্না বনিতয়া বা কিং।

পদ-বিশ্ভাস-মাত্রোণ

যয়া নাপহন্তঃ মনঃ ॥

এ কথাও সত্য। তবে এ কথাও বলতে হবে যে সহৃদয়ের কাণ্ডজ্ঞান, ভাষাজ্ঞান, রসবোধের ক্ষমতা ইত্যাদি গুণ আছে, তা যেমন কবি ধরে নিতে পারেন, তেমনি তার পক্ষে কতকগুলি প্রতীকের ইঙ্গিত বোঝা সম্ভব হবে, এটাও কবি আশা কর্ত্তে পারেন। সমস্তটা হচ্ছে প্রতীকের প্রচলিত নিয়ম। Dante'র পক্ষে প্রতীকের ব্যবহারে তাঁর কাব্যের ক্ষতি হয় নি, Blake'র হয়ত হয়েছে, কারণ Blake'এর ব্যবহৃত প্রতীকগুলি অপেক্ষাকৃত অপ্রচলিত। স্বকপোলকল্পিত প্রতীক চালাতে গেলে ফিলিস আরও বেশী হয়। তবে ভগ্নী লেখক কি ভাবে আনন্দিক

কালেও পাঠকসাধারণের জ্ঞান, অভিজ্ঞতা, সংস্কার, ঐতিহ্য, অবচেতনার সহযোগ নিয়ে প্রতীক সাহিত্য রচনায় সিক্কাম হতে পারেন, তার প্রশংসা হচ্ছে Eliot ও রবীন্দ্রনাথের রচনা।

( ৩ )

রবীন্দ্র-সাহিত্যে প্রতীকের ব্যবহার বেশী নয়। ধর্ম্ম ও ব্যবহারে তিনি সহজ হবার চেষ্টাই কর্ত্তেন—“স্বকল্পার দেবালয়ের কোণে” বসে গুহ্য পদ্ধতির “ভজন পূজন সাধন আরাধনার” যেমন কোন মূল্য তাঁর কাছে নেই, তেমনি কৃত্রিম পারিভাষিক তাৎপর্যে পরিপূর্ণ প্রতীক ব্যবহারও তাঁর কাছে অসাহিত্যিক রীতি বলে পরিগণিত হত। সাহিত্যকে তিনি সকলের সহিত মনে প্রাণে মিলনের উপায় বলেই জানতেন, সকলের কাছে শব্দের যে অর্থ অজ্ঞাত ও অপরিষ্কৃত সে অর্থ তিনি গ্রহণ কর্ত্তেন না। কাজেই কোন রকমের সাক্ষাভাষা তিনি ব্যবহার করেন নি। তিনি কাব্যরীতিতেও পৌত্তলিকতা বা প্রতীক-পূজার বিরোধী ছিলেন। তাঁর কাব্যে মানবিক রস ও স্বাভাবিক্তাবাদই প্রাধান্য পেয়েছে। তাঁর কাব্যের প্রধান উপকরণ হচ্ছে মানবহৃদয় অনুভূতি ও তীক্ষ্ণ মননশীলতা। হুতরাং প্রতীকপন্থী রচনা তাঁর কাছ থেকে আশা করা যায় না। কিন্তু মননশীলতার আভিলাষের জন্ত, বিশ্লেষণী বুদ্ধির প্রাবল্যের জন্ত তাঁর রচনায় রূপকের প্রাচুর্য স্বভাবতঃই ঘটেছিল। তাঁর গল্পে পক্ষে উপমা ও রূপক অলঙ্কারের ছড়াছড়ি আছেই; তা' ছাড়া যখনই তিনি অনির্বচনীয়ের কথা প্রকাশ কর্ত্তে গেছেন, তখনই তাঁর রচনা রূপক হয়ে দাঁড়িয়েছে। তবে সুপরিষ্কৃত সাদরূপক তিনি রচনার প্রয়াস করেন নাই, বোধ হয় যে কারণে তিনি মহাকাব্য রচনারও প্রয়াস করেন নাই। ‘কণিকের অতিথি’দের নিয়েই তিনি ব্যস্ত।

তবে কিছু কিছু প্রতীক যে তাঁর রচনায় স্থান পায় নাই এমন নয়। তাঁর প্রতীক অবশ্য মধ্যযুগের হিন্দুধর্ম্মের অন্তর্ভুক্ত নানা ধর্ম্মসম্প্রদায়ের আনুষ্ঠানিক পরিভাষা থেকে গৃহীত হয় নাই। তবে হিন্দুধর্ম্মের কয়েকটা মূল দার্শনিক তত্ত্বের সঙ্গে সম্পৃক্ত গুটিকতক প্রতীক তিনি গ্রহণ করেছেন এবং কালিদাসাদি কবির কাব্য থেকে ব্যঞ্জনাগম্য কয়েকটি বস্তু প্রতীক হিসাবে তাঁর কাব্যে ব্যবহার করেছেন। বৈষ্ণব কাব্য ও বাউল কাব্য থেকেও কিছু কিছু প্রতীক তিনি নিয়েছেন। এই সব প্রতীকের মধ্যে বীণা, বাঁশী, শঙ্খ, দীপ, মালা, বঁধু, তরী, রত্ন, নটরাজ, হনু, নৃত্য প্রভৃতি প্রতীক প্রত্যয় উল্লেখযোগ্য। তবে এ সমস্ত প্রতীকের ব্যবহার তাঁর রচনায় বিক্ষিপ্ত ভাবেই বেশীর ভাগ করা হয়েছে, সামগ্রিক ভাবে প্রতীক রচনা কম-ই দেখা যায়। তার কারণ তাঁর এই স্বকল্পিত প্রতীকগুলি দিয়ে কোন পরিভাষা তিনি রচনা কর্ত্তে পারেন নি, যেহেতু কোন বাঁধা আচার, অনুষ্ঠান, পদ্ধতির সঙ্গে তাদের সম্পর্ক নেই এবং তাঁর মানসিক ও আধ্যাত্মিক বোধের সঙ্গে এ সব প্রতীক অঙ্গাঙ্গিতে জড়িত নয়। একজন্ত নিত্য নূতন সাময়িক রূপক-সৃষ্টি-ই তিনি করে গেছেন। তা ছাড়া প্রেমের জার কাব্যেও তিনি সহজ পথের পথিক। তাঁরই কথা একটি ঘুরিয়ে নিলে দাঁড়ায়—

শুনেছি কবাকুঞ্জ অনেক বীকা গলিবুজি।

আমার কিন্তু কাব্য লেখা নিভাস্তই এ সোজাহুজি ॥

পাঠক-ও রবীন্দ্রকাব্য পড়ে বলতে পারেন—

ওদের কথায় খাঁদা লাগে

তোমার কথা আমি বুঝি।

রবীন্দ্রনাথের ‘সোনার তরী’ পর্বে প্রতীক কাব্য রচনার সূত্রপাত। ‘সোনার তরী’ ও ‘নিরুদ্দেশ যাত্রা’র তিনি নিজস্ব প্রতীক দিয়ে কবিতা লেখার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু এ পর্বে তিনি তখন আর অগ্রসর হননি। অনেক পরে গীতাঞ্জলি-বলাকার যুগে আবার তাঁর রচনার মধ্যে প্রতীক কবিতা কিছু কিছু পাই। ‘গীতাঞ্জলি’র ‘তোরা শুনি নি কি শুনি নি তার পায়ের ধ্বনি,’ ‘সীমার মাঝে অসীম তুমি বাজাও আপন হৃদয়,’ ‘গীতিমালা’র ‘দাঁড়িয়ে আছ তুমি আমার গানের ওপারে,’ ‘গীতালি’র ‘এক হাতে ওর কুপাণ আছে আর এক হাতে হার,’ ‘বলাকার’ ‘তোমার শব্দ ধূলার পড়ে, কেমন করে সহিব,’ ‘জানি আমার পায়ের শব্দ রাত্রিদিনে শুনে তুমি পাও’ প্রভৃতি অনেকগুলি রচনাকে প্রতীক কবিতা বলা যায়। তাঁর গীতিকাব্য ‘নটরাজ’ সার্থক প্রতীক রচনা। রবীন্দ্রনাথের কোন কোন গানও প্রতীক সাহিত্যের অন্তর্গত বলা যায়, যেমন ‘প্রলয় নাচন নাচলে যখন আপন ভুলে’ ‘আমি কান পেতে রই আমার আপন হৃদয়-গহন-ঘারে’ ইত্যাদি।

তবুও মোটামুটি ভাবে বলতে গেলে স্বীকার কর্ত্তেই হবে যে রবীন্দ্র-কাব্য প্রতীক সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত নয়। এই সিদ্ধান্তে হয়ত কেহ কেহ হতাশ হবেন। তবু কথাটা সত্য। রবীন্দ্রনাথের কাব্যে অলৌকিক রহস্যের অনুভূতি যথেষ্টই আছে, কিন্তু সে অনুভূতি প্রকাশ পেয়েছে বেশিটা রূপকের মধ্যে, প্রতীকের মধ্যে নয়। তা’ ছাড়া তাঁর প্রিয় কতকগুলি প্রতীকের বহল ব্যবহার তিনি করেছেন, সে সব ব্যঙ্গনা-সম্পদে গরীবান; কিন্তু সে সমস্ত প্রতীক তাঁর রূপক কবিতা ও অজ্ঞাত কাব্যের মধ্যে ইত্যন্তঃ বিক্ষিপ্ত ভাবেই আছে, বিঘ্নীভূত হয় নাই। এ কথা স্বরণ রাখতে হবে যে আধৌকিক সম্বন্ধে রহস্যঘন অনুভূতি নানা প্রকারেই প্রকাশ করা সম্ভব, তার জন্ত প্রতীকের ব্যবহার অপরিহার্য নয়। তা’ ছাড়া সমাসোক্তি (Personification) বা ভাবিকের (Vision) প্রয়োগ, কিংবা অভিনবপুরণ-রচনা (mythmaking) প্রতীক-সৃষ্টি নয়। যে কাব্যে more is meant than meets the ear তাকেই প্রতীক কাব্য বলা যায় না। যদি প্রতীক-ই মুখ্য উপকরণ না হয়, তবে কোন রচনাকে প্রতীক রচনা বলা সম্ভব নয়।

এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের তত্ত্বমূলক নাটকগুলি সম্পর্কে আলোচনা করা যেতে পারে। সেগুলি প্রতীক-নাট্য কিনা সে বিষয়ে তর্ক উঠতে পারে। আলোচনার পূর্বে একবার রূপক নাট্য ও প্রতীক নাট্যের সমজ্ঞা তাল করে বুঝে নেওয়া উচিত। রূপক নাট্যে থাকবে অপ্রত্যক্ষ তত্ত্ব-রূপের উপরে প্রত্যক্ষ একটা বস্তু-জগতের আরোপ; দু’টো বিভিন্ন বস্তু, তা’দের মধ্যে একটা সমান্তরালতা রূপক নাট্যে ধরে নিতে হবে। ঐ প্রত্যক্ষ জগৎটা রসমঞ্চ দৃশ্য, অপ্রত্যক্ষ জগৎটা নানা ইন্দ্রিয় দিয়ে

অনুমেয়। এই অপ্রত্যক্ষের দীপ্তি রসমঞ্চের উর্ধ্বস্থ লুকায়িত দীপমালায় আলোকের স্রায় বিচ্ছুরিত হয় ও পাত্র পাত্রীর দেহ, মন ও দৃশ্যপট উদ্ভাসিত ও অলৌকিক তাৎপর্যে পূর্ণ করে তোলে। ফলে প্রত্যক্ষ চরিত্র, দৃশ্য ও ঘটনা অপ্রত্যক্ষ তত্ত্বের প্রতিভাস বলে সহজেই প্রতীত হয় এবং এই প্রতীতি ব্যতিরেকে রূপক-নাট্য আমাদের কাছে সার্থক হয় না। প্রতীক নাট্যে কিন্তু দু’টো জগতের পাশাপাশি অস্তিত্ব কল্পনা করা হয় না। জগৎ একটাই; কিন্তু সে জগতের অন্তর্ভুক্ত শ্রায় সব কিছুই প্রতীক, অর্থাৎ কোন একটা ভাবের সঙ্গে বিজড়িত সঙ্কেত। এই সব প্রতীক দিয়ে একটা নূতন জগৎ আমাদের সামনে দেখানো হয়, সে জগৎ আমাদের চেনা সংসার বা বস্তু-জগৎ নয়, সেটা একটা তত্ত্বমূলক অভিনব সৃষ্টি। এখানে কোন সাদৃশ্যের পরিকল্পনা নেই, জানা অজানা দু’টো জগতের মধ্যে কোন সমান্তরালতা আরোপ করা হয় নি। প্রতীক নাট্যের যথার্থ উদাহরণ হিসেবে দক্ষিণ ভারতের কথাকলি নাটক, যবদীপের মুন্ডা-নাটক ইত্যাদির নাম করা যেতে পারে। অবশ্য এ সব নাটকে কথার চেয়ে মুন্ডা, ভদ্রী, গতি ইত্যাদি প্রধান। সাহিত্যিক প্রতীক নাট্যে তার উপাদানগুলি নূতন মূর্ত্তার স্রায় হওয়া উচিত; অর্থাৎ সেগুলি হ’বে সঙ্কেত, উপমা নয়। গানের উপকরণ হর, হরের সঙ্গতি সৃষ্টি করে অলৌকিক ভাব প্রকাশ করা যায়, কিন্তু প্রত্যেকটি হরকে যেমন কোন ভাবের রূপক বা হরসঙ্গতিকে যেমন জাগতিক ব্যাপারের রূপক বলা যায় না, প্রতীক নাট্যেও তেমনি অলৌকিক ভাব ও তত্ত্বপ্রতীক হলেও তাকে রূপকের পধ্যায়ে ফেলা যায় না।

এইভাবে নিকষণ কর্ত্তে দেখা যাবে যে রবীন্দ্রনাথের কোন নাটকই ঠিক প্রতীক নাটক নয়। তাঁর তাত্ত্বিক নাটকগুলি মোটামুটি হ’রকমের। কতকগুলো হ’চ্ছে রূপক, আর কতকগুলো হ’চ্ছে ব্যঙ্গনা-সম্পন্ন মানবিক নাটক। অবশ্য এই দুয়ের মিশ্রণ-ও অনেক জায়গায় হয়েছে। তা’ ছাড়া রূপক নাট্যকে দর্শক সাধারণের পক্ষে রচিকর ও লঘুপাক কর্ত্তার জন্তে অনেক সময় বাড়তি লঘুরসের মিশাল দেওয়া হ’য়েছে। এই খাদ-টুকু না দিলে শুধু খাঁটি রূপক দিয়ে হয়ত মনোপ্রাণী ও অভিনয়যোগ্যী মঞ্চ-সকল নাটক লেখা মুশ্কিল। তবে রূপক নাট্যের শুদ্ধ রীতি যে তিনি কখনও অনুসরণ করেন নি, এমন নয়।

দৃষ্টান্ত স্বরূপ রবীন্দ্রনাথের অবিসংবাদিতভাবে শ্রেষ্ঠ তাত্ত্বিক নাটক ‘ডাকঘরের’ কথা বলা যেতে পারে। এর প্রত্যেক চরিত্র, প্রত্যেকটি ঘটনা, এমন কি অনেক কথাবার্ত্তা পরিষ্কারভাবেই একটা তত্ত্বজগতের সমান্তরাল প্রতিচ্ছায়া। অমল, মাধবদত্ত, বৈজ্ঞ, ডাক-হরকরা, মণ্ডল, ঠাকুরদাদা, রাজবৈজ্ঞ, রাজা, হুধা প্রভৃতি চরিত্র; অমলের ব্যাধি, তার উদাস ভাব, দূরের ঘটনাধ্বনি, ডাকঘর, হুধার উপহৃত পুষ্পগুচ্ছ, সব কিছুই স্পষ্টভাবে তত্ত্ব-জগতের রূপক। তবে এই নাটকের প্রধান মাধুর্য হ’চ্ছে, শুধু তত্ত্বকথার জন্তে নয়, যে সব চরিত্র ও যে বস্তু-পরিদর্শন জগতের এখানে সৃষ্টি হয়েছে তারই নিজস্ব সৌন্দর্যের জন্ত। চরিত্র-গুলি মানবিক রসে পরিপূর্ণ ও জীবন্ত, সংলাপ ও ঘটনা-বিভাস স্বাভাবিক এবং ভাব-সমাবেশ সহৃদয়-স্বন্দর-সংবাহী। তত্ত্বের জন্তে নয়, জীবন-সত্যের

জন্মেই এই নাটকের মনোহারিত্ব। একেই শ্রেষ্ঠ শ্রেণীর রূপক বলা যেতে পারে, সমান্তরাল ভঙ্গুর কথা একেবারে ছেড়ে দিলেও এরকম রচনায় রসনিষ্পত্তির অস্থবিধা হয় না।

অপরপক্ষে ‘অরূপরতন’ বা ‘রাজা’ নাটককে নীরস রূপক নাটিক বলা যেতে পারে। এটা যে তত্ত্বকথার প্রতিচ্ছায়া সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। রবীন্দ্রনাথ নিজে এই নাটকের যে ভূমিকা লিখেছেন, তা’ থেকেই এর রূপকত্ব বেশ স্পষ্ট হ’য়ে ওঠে। এই নাটকের রাজা, স্বর্ণ, স্বদর্শনা, স্বরসমা এবং রবীন্দ্রনাথের তাত্ত্বিক নাটকে অপরিহার্য সর্ব-ঘট-বিহারী সর্বজ্ঞ ঠাকুরদাদা, সকলেই এক একটি তাত্ত্বিক প্রত্যয়ের মূর্তি : নামকরণ থেকেই চরিত্রগুলির তাত্ত্বিক স্বরূপ বেশ স্পষ্টই বুঝতে পারা যায়। নাটকের ঘটনা পারম্পর্য—স্বদর্শনার আগ্রহ ও মোহ, অগ্নিদাহ, স্বদর্শনার ভ্রান্তিমাশ ও দয়িতের সহিত মিলন—মানবজ্ঞার আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতার অতি স্পষ্ট প্রতিচ্ছায়া। এর তত্ত্বকথা জ্যামিতির প্রতিপাতের মতই বুদ্ধি-গ্রাস এবং ক.প.প. ত্রিভুজকে চ-ছ-জ ত্রিভুজের উপর যেভাবে আরোপ করা হ’য়েছে তা’তে রস-নিষ্পত্তি কিছুই নেই। রূপক বাদ দিলে ইহার চরিত্রগুলির মধ্যে প্রাণবত্তা বা ঘটনা-পারম্পর্যের মধ্যে কোন জীবন-সত্য পাওয়া যায় না। অবশ্য রবীন্দ্রনাথ অনেক স্থলে চমৎকার গান ও রসাল সংলাপ দিয়ে তত্ত্বের বটিকায় শর্করার প্রলেপ দেবার চেষ্টা করেছেন, কিন্তু তৎসঙ্গেও এই নাটকটি জ্যামিতিক প্রতিজ্ঞা ছাড়া আর কিছু হয় নি।

‘অচলায়তন’ও রূপক। তবে এখানে নাটকের পাত্রদের চরিত্র অপেক্ষাকৃত প্রাণবন্ত। ‘মহাপঞ্চক’র চরিত্রের মধ্যে বেশ সত্য আছে বলা যায়। তবে ‘পঞ্চক’ কবিরচয় একটা চায়া-মূর্তি হ’য়ে দাঁড়িয়েছে। ঘটনা-পারম্পর্যের মধ্যে নাটকীয় গুণ কিছু কিছু আছে, কিন্তু তার মধ্যে যে সত্য আছে তা’ মানবজীবনের নয়, ধর্মতত্ত্বের। এর অন্তর্নিহিত রূপককে ভারতের সামাজিক ইতিহাসের দিক থেকে কিংবা শুদ্ধ আধ্যাত্মিক দিক থেকে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে।

‘রক্তকরবী’ নাটকটি রূপক নাটক নয়, একথা রবীন্দ্রনাথ বলেছেন। কিন্তু যে ভাবে তিনি নিজেই এর তাৎপর্য নানা সময়ে বিবৃত করেছেন, তাতে এর রূপকত্ব তিনি নিজেই সপ্রমাণ করেছেন। তবে ‘ভাকবের’ পর্যায়ের উঠতে না পারলেও এখানে চরিত্রগুলির মধ্যে ব্যক্তিত্ব আছে, এবং ঘটনা-পারম্পর্যের মধ্যে অনেকটা সম্ভাব্যতা আছে। অনেকটা বলছি এই জন্মে যে, পাত্র-পাত্রীদের কথাবার্তা বেশ জীবন্ত ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যময় হ’লেও মানব-চরিত্রের মানদণ্ডে যেন কতকটা অপ্রাকৃতিক বলে মনে হয়, ঘটনাচক্রেও বহুল পরিমাণে মানব জীবনের সত্য ও আধুনিক জগতের তথ্যের অনুসরণ করা হ’য়ে থাকলেও তাকে কতকটা দুনিয়া-ছাড়া বা অসম্ভাব্য বলতে হয়। অবশ্য তাতে খুব আসে যায় না, কারণ ‘রক্তকরবী’ বস্তুতঃ রূপক, একটা তত্ত্বের প্রতিচ্ছায়া হিসেবে এই নাটক রচিত হয়েছে, মানবজীবনের প্রতিফলন হিসেবে নয়। এই নাটকে রক্তকরবী, জালের জানালা প্রভৃতি প্রতীকের ব্যবহার থাকলেও একে প্রতীক নাটা বলা চলে না। এখানে মধ্য চরিত্রগুলি প্রতীক নয়,

ঘটনাধারাতেও অলৌকিক সত্য কিছু প্রতিপন্ন হয় নাই, বরং নীতি-কথাই ফুটিয়ে তোলা হ’য়েছে। ‘মুক্তধারাও এই রকমের নাটক।

‘শারদোৎসব’ নাটককে রূপক বলে ধরার কোন আবশ্যকতা নেই। উপানন্দ, লক্ষ্মেশ্বর, সম্রাসী, ঠাকুরদাদা, বিজয়াদিত্য প্রভৃতি চরিত্রকে আমরা নানা প্রকৃতির মানুষ বলেই ধরে পারি। এর আখ্যায়িকাকে একটা সরল কাহিনী বলে গ্রহণ করা যেতে পারে। চরিত্র বা ঘটনা কোনটাকেই একটা তত্ত্বের প্রতিবিম্ব বলে নেওয়ার দরকার নেই। সমগ্র নাটকের ভেতর দিয়ে একটা আধ্যাত্মিক আদর্শের প্রচার করা হ’য়েছে এই মাত্র। এরকম নাটক রূপক নয়, কথামূলক।

‘ফাল্গুনী’-ও তাত্ত্বিক নাটক। প্রস্তাবনায় এই তত্ত্ব এক রকম স্পষ্ট ক’রেই ব্যাখ্যা করা হ’য়েছে; নাটকের কয়েকটি অঙ্কের প্রথমে হৃদ্যপাত, সন্ধান, সন্দেহ, প্রকাশ এই চারটি পরিচায়ক দিয়ে—এর তত্ত্বটার বিভিন্ন অংশের ইঙ্গিত করা হয়েছে। কিন্তু একে পুরোপুরি রূপক বা সাক্ষ-রূপক বলা কঠিন। আখ্যায়িকা বলতে তেমন কিছু এখানে নেই, কবি-মনের আবেগই যেন একটা গীতমুগুর কাকলীর নানা পর্দায় ও মুচ্ছনায় বেজে উঠেছে। চরিত্র অঙ্কনের কোন চেষ্টা করা হয়নি। কেন্দ্রীয় অনুভূতির আঙ্গিক এক একটা ভাব যেন এক একটা নামকে অবলম্বন করে সংলাপের ভেতর দিয়ে প্রকাশ পেয়েছে। এ সংলাপে মানবজীবনের দ্বন্দ্ব বা মানবচরিত্রের সংঘাত দেখান হয় নি, উপলব্ধির বিভিন্ন দিক আবেগোচ্ছ্বাস দিয়ে প্রকট করা হয়েছে। ‘ফাল্গুনী’ সম্ভবতঃ ই গীতিনাট্য। ঠিক রূপক না হ’লেও রচনা হিসেবে এটা যে শিল্পসিদ্ধ হয়েছে তার কারণ এই যে, এখানে রবীন্দ্রনাথ তত্ত্বের প্রতিরূপ হিসেবে গীত ও গীতধর্মী উচ্ছ্বাস দেওয়ার ফলে কবির উচ্ছ্বাসময় অনুভূতি ও তার প্রকাশ বেশ চমৎকার ভাবে পাণ খেয়ে গেছে।

সুতরাং বলা যেতে পারে রবীন্দ্রনাথের তাত্ত্বিক নাটকগুলির মধ্যে কতকগুলির পরিধার রূপক, কতকগুলি রূপক লক্ষণাক্রান্ত হ’লেও পুরোপুরি রূপক নয়। এই শ্রেণীভুক্ত ধরণের রচনাকে কেউ কেউ প্রতীক নাটক বলতে চান। কিন্তু সে অভিধা সমস্ত হ’বে না। অসম্পূর্ণ রূপককে প্রতীক বলা চলে না। তবে এ সব নাটককে কি বলা হবে? রূপক হিসেবে অসম্পূর্ণ হ’লেও রচনা হিসেবে এ-সব নাটককে ত অক্ষয় বা অচল বলা চলে না। তবে কি বলা হবে?

এই সমস্ত নাটক রচনায় রবীন্দ্রনাথ যে Materlinck প্রভৃতির রচনার দ্বারা প্রভাবিত হ’য়েছিলেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। Materlinckর The sightless অবশ্য রূপক, চমৎকার রসময় রূপক। কিন্তু Materlinckর The blue bird কি রকম নাটক? রূপকের অনেক লক্ষণ থাকলেও একে রূপক-নাটা বলা চলে না, কারণ এখানে কোন তত্ত্বকে ঘটনার রূপ দেওয়া হয় নি। কবিচিন্তের একটা অলৌকিক অভিজ্ঞতার কাহিনী কতকটা রূপক, কতকটা প্রতীক, কতকটা স্বভাবোক্তি, কতকটা উৎকল্লনার সহযোগে প্রকাশ করা হয়েছে। এ ধরণের নাটককে সমালোচনার আল্পা ভাষায় symbolic বলা হয়ে থাকে। কিন্তু এও কি যথার্থ প্রতীক-নাটা? তা-ও ত নয়।

সুতরাং এই সমস্ত তাত্ত্বিক নাটককে যদি আমরা সাংকেতিক বলি তা হ'লেই বোধ হয় ভাল হয়। সাংকেতিক শব্দটা রূপক বা প্রতীকের চেয়ে আরও ব্যাপক-পরিসর। যে রচনায় সংকেত আছে, যা' আমাদের মনকে প্রত্যক্ষ থেকে অপ্রত্যক্ষের দিকে নিয়ে যায়, তাকেই বলা যাবে সাংকেতিক। রূপক ও প্রতীক—দু'টোই বিশিষ্ট সংকেত। কিন্তু তা' ছাড়া আরও কত রকমের সংকেত ত হ'তে পারে। সুতরাং Materlinck ও রবীন্দ্রনাথের এই সব নাটক—যা'দের রূপক-নাট্য বা প্রতীক-নাট্য কোনটাই বলা যায় না—তা'দের মোটামুটি সাংকেতিক বলেই ছেড়ে দেওয়া যায়। তা' হ'লে সাংকেতিক নাট্যের মধ্যে Eugene O' Neill, Hauptmann ইত্যাদির কিছু কিছু রচনাও পড়ে যাবে। Yeats, Synger কোন কোন লেখাও পড়বে।

কিন্তু সাংকেতিক বলে এ সব নাটকের পরিচয় দিলেও বাস্তবিক

আমাদের কাজ শেষ হ'ল না। নানা রকমের নূতন নূতন রীতির নাটকের যথার্থ পরিচয় দেবার জন্তে আরও হুনির্দিষ্ট অভিধা খুঁজে বের কর্তে হ'বে। মানুষের মন প্রগতিশীল; তার ধর্ম, সমাজবিধান ইত্যাদির স্থায় তার সাহিত্য-রীতিও প্রগতিশীল। পুরাণো কয়েকটা বাঁধা পাতেই সাহিত্য রসের স্রোত যে চিরকাল চলবে সে কথা বলা যায় না। কবিচিত্তের স্থায় সাহিত্যও—

“যুগে যুগে এসেছে চলিয়া

অলিয়া অলিয়া

চুপে চুপে

রূপ হ'তে রূপে”।

বর্তমান যুগে রূপক-নাট্যের মান থেকে স্থলনের মধ্যে সেই রূপান্তরের ইতিহাসই পাওয়া যাচ্ছে।

## সমাধান

শ্রীসমরেশচন্দ্র রুদ্র এম-এ

(নাটিকা)

ডাক্তারখানা। রাত্রি প্রায় আগারটা। শুধু কম্পাউণ্ডার বসে কি লিখেছে; এমন সময় উসকোখুসকো চুল, এলোমেলো পোষাক, ৩৫।৩৬ বছরের এক ভদ্রলোক প্রবেশ করল।

ভদ্রলোক। হাঁ দেখুন, আপনি কি ডাক্তার?

কম্পাউণ্ডার। না আমি কম্পাউণ্ডার, আপনার কি চাই?

ভদ্রলোক। হাঁ চাই একটা জিনিস, ব্যাপারটা কিন্তু অত্যন্ত গোপনীয়। আপনার এখানে এখন কেউ এসে পড়বে না তো?

কম্পা। না, অনেক রাত হয়ে গেছে, এখন আর কেউ আসবে না।

ভদ্রলোক। কিন্তু দেখুন, ব্যাপারটা অত্যন্ত গোপনীয় এবং একটু ভয়েরও। এই দরজাটা কি বন্ধ করলে হয় না।

কম্পা। দরজাটা?

ভদ্রলোক। হাঁ, দরজাটা বন্ধই করে দিই, কি বলেন?

এগিয়ে গিয়ে দরজা বন্ধ করে দিলে

দেখুন, মনের অবস্থা আমার অত্যন্ত ধারাপ; সময় সময় মনে হয়, আমার বৃষি মাথা ধারাপ হয়ে যাবে।

কম্পা। আপনি বসুন।

ভদ্রলোক। বসছি। (বসল না) হাঁ দেখুন, আমার ব্যাপারটা শুনতে আপনার একটু সময় লাগবে। অবশ্য তার কোন চিকিৎসা নেই, সেইজন্তেই আমি এমন একটা জিনিস চাইছি যাতে সমস্ত জালা জুড়িয়ে যায়, এ জালা আমি আর সহ্য করতে পারি না। সময় সময় মনে হয়, একটা দুর্দান্ত কাণ্ড করি। কিন্তু কি জানেন, সামাজিক লজ্জা—অবশ্য বলতে পারেন, সেটা মনের নিছক দুর্বলতা—কিন্তু আপনি কি বলতে পারেন, সামাজিক লজ্জাকে গ্রাহ্য করে না, এমন লোক খুব বেশী আছে? বলুন?

কম্পা। কিন্তু ব্যাপারটা কি না জানলে—

ভদ্রলোক। হাঁ সেই কথাতেই তো আমি আসছি। কি জানেন, আর চিন্তা করতে পারি না আমি, ক্লান্ত হয়ে পড়েছি চিন্তা করতে করতে, সে চিন্তা সর্বদা এড়াতে চাইছি।

নিজের মাথার চুলের ভিতর আঙ্গুল চালাতে চালাতে

সামান্য পায়চারি করতে লাগল।

কম্পা। একটু জল খাবেন?

ভদ্রলোক। জল? (যেন সামান্য চিন্তা করে) যেন একটু।

কম্পাউণ্ডার জল এনে দিলে

(এক চুমুক জল খেয়ে) বুকে কিন্তু আমার আগুন জ্বলছে। আমার চুলগুলো সাদা হয়ে আসছে দেখেছেন এত অল্প বয়েসে? কতই আর আমার বয়েস হবে—পঁয়ত্রিশ কি ছত্রিশ। কিন্তু আমাকে কি বুড়োটে দেখাচ্ছে না? অবিশ্রাম বৃদ্ধ করতে করতে এই অবস্থা হয়েছে আমার।

কম্পা। (ইতস্তত করে) আপনার কি আবারসনের কেস?

ভদ্রলোক। কি বললেন? আবারসন? গর্তপাত? ভয়ানকভাবে আবারসন হলে অবশ্য মৃত্যু সহজেই আসে, না? (যেন নিজের সঙ্গে আলোচনা করতে করতে) জীষণ রক্তশ্রাব! হেমায়েজেই শেষ হয়ে যাবে সব। কিন্তু পুলিশ? তাছাড়া আরও কত হাঙ্গাম। (হঠাৎ যেন প্রকৃতিস্থ হয়ে স্বাভাবিকভাবে) কিন্তু আমি এ কি বলছি আপনাকে! না না, ও কেস আমার নয়। মনে কিছু করবেন না, আমি আজ সত্যিই অত্যন্ত বিচলিত, আমার মাথার ঠিক নেই, কি বলতে গিয়ে কি বলে ফেলছি।

কম্পা। তাহলে আপনার কি—

ভদ্রলোক। হাঁ সেই কথাই তো আপনাকে বলতে যাচ্ছি আমি। এমন একটা ভয়ানক অবস্থায় পড়েছি আমি, যে কিছুতেই আর নিজেকে সামলে চলতে পারছি না। কঠিন মানসিক আঘাতে নিয়ত ক্ষতিবিস্তৃত হতে হতে প্রায় শেষ হয়ে এসেছি আমি।

কম্পা। আপনার নিজের কি কোন ছুরারোগ্য অস্থখ।

ভদ্রলোক। ছুরারোগ্য অস্থখ? (যেন চিন্তা করতে করতে) ছুরারোগ্য অস্থখ? না ঠিক তা নয়, আমি যদি নিজে শক্ত হতুম, যদি মনের জোর নিয়ে দাঁড়াতুম, তাহলে হয়তো এই যন্ত্রণাদায়ক অবস্থায় এসে হাজির হতুম না। কিন্তু বরাবরই মনের দিক থেকে আমি একান্ত দুর্বল, যাকে বলে মানসিক পঙ্গু, তাই—

কম্পা। তাহলে কি আপনি আত্মহত্যা করতে চান?

ভদ্র। আত্মহত্যা? সুইসাইড?

নিজের মাথার চুল টানতে টানতে আবার পায়েচরিত করতে লাগল (যেন নিজের সঙ্গে আলোচনা করতে করতে) তাহলে

সমস্ত জালা জুড়িয়ে যায়। কিন্তু তার কি কারণ থাকতে পারে? তাছাড়া আত্মহত্যা মহাপাপ। ওদের সকলকে টেনে নিয়ে যাবে। কোর্ট আর পুলিশ। হয়তো সব হাসবে; বলবে, মানুষটা মানসিক দুর্বলতার একটা চরম দৃষ্টান্ত। কিন্তু সত্যি, একটু ওষুধে সমস্ত জালা জুড়িয়ে যায়। (আবার জোর গলায়) হাঁ দেখুন, দেবেন আমাকে—হাঁ ওই যে কি বলে—?

কম্পা। আত্মহত্যার ওষুধ?

ভদ্রলোক। (যেন আবার নিজেকে সামলে নিয়ে) কি বললেন, আত্মহত্যার ওষুধ? না না, আত্মহত্যার ওষুধ আমি নেব কেন! আমি তো এমন কিছু করিনি, তাছাড়া ভয়ানক কিছু রোগও আমার নেই। আত্মহত্যার ওষুধ আমার চাই না। তবে কি জানেন, আমি আর সহ করতে পারছি না। গেল এক বছর ধরে এই ব্যাপারটা নিয়ে দিনের পর দিন, রাত্রির পর রাত্রি চিন্তা করতে করতে প্রায় পাগল হয়ে যাবার জোগাড় হয়েছি। মানুষ এ ব্যাপার সহ করতে পারে না। কি জানেন, হয়তো আমি মানুষের দল ছাড়া, না হলে মুখ বুজে আমি এ অসহনীয় যন্ত্রণা সহ করি কেন! জানেন, মনের দিক থেকে আমি অত্যন্ত ভগ্ন।

কম্পা। তাহলে কি আপনি কাউকে হত্যা করতে চান বিষ দিয়ে?

ভদ্রলোক। (অত্যন্ত ব্যগ্র হয়ে) কি বললেন? আমি কি ঠিক স্তনলুম? আর একবার বলুন।

কম্পা। আপনি কি কাউকে বিষ খাইয়ে মারতে চান?

ভদ্রলোক। (যেন নিজের সঙ্গে) কি সহজ ব্যাপার! স্বাভাবিক মৃত্যু। খাবার জলের গেলাসে একটু ঢেলে দেওয়া—সকালবেলা আর বিছানা ত্যাগ করতে হল না। অত্যন্ত স্বাভাবিক মৃত্যু। গুরুতর পরিশ্রমের ফলে শরীর ও হার্ট অত্যন্ত দুর্বল ছিল, কাল একটু বেশী রাস্তিরে ফিরেছিল—মনে হয়, কিছু পরিমাণ মাদক দ্রব্যও খেয়েছিল। মেয়েমানুষের শরীরে কি আর এতটা সহ হয়! হার্ট অত্যন্ত দুর্বল, হঠাৎ হার্ট ফেল করেছে। পাড়ার ছেলেরা অত্যন্ত ভাল—

কম্পা। আপনি কি আপনার স্ত্রীকে—?

ভদ্রলোক। (সহজভাবে) কি বললেন? আমার স্ত্রী? হাঁ জানেন, আমার স্ত্রী অত্যন্ত গুণী এবং একজন শিল্পী। সকলেই তাঁকে চেনে, এক বছরের ভেতর ফিল্মে অত্যন্ত নাম করেছেন।

কম্পা। এমন স্ত্রীকে আপনি—

ভদ্রলোক। (যেন প্রশ্নের মানে বুঝতে না পেরে) আমি—কি?

কম্পা। আপনি—(ইতস্তত করে) বিষ খাওয়াতে—

ভদ্রলোক। (অত্যন্ত প্রকৃতিস্থভাবে) আমি তাঁকে বিষ খাওয়াব! ফেপেছেন আপনি? সেটা কি সম্ভব? মাত্র আমাদের বছর পাঁচ হল বিয়ে হয়েছে, একটি মেয়েও আছে আমাদের—আমি আমার স্ত্রীকে কখনও বিষ খাওয়াতে পারি! তবে কি জানেন, ব্যাপারটা এমন দাঁড়ায় যে বড় কষ্ট হয় আমার। আমরা অর্থাৎ আমি ও আমার মেয়ে যখন ঠুর জন্তে অপেক্ষা করে করে রোজ ঘুমিয়ে পড়ি, তখন গভীর রাত্রিতে, প্রায় দেড়টা দুটোয়, কোন কোনদিন তিনটে চারটেয়, তিনি বাড়ী করেন—(কথাটা যেন না বললেই হত এই ভাবে) একলা নয়—

আবার নিজের চুল টানতে টানতে দু তিনবার পায়চারি করল

হাঁ দেখুন, এই ভাবে রোজ বেশী রাত্তিরে দরজা খুলে দিতে হবে বলে উৎকর্ষায়—দেখতে পাচ্ছেন, মনের দিক থেকে

আমি অত্যন্ত দুর্বল, অত্যন্ত নার্ভাস—রোজই আমার ভাল ঘুম হত না, গত পাঁচ মাস যাবত আমি আর এক পলকের জন্তেও ঘুমোতে পারছি না। আমার শরীর কি হয়েছে দেখেছেন? চুলে পাক ধরে গেছে, চোখ মুখ বসে গেছে, যেন বুড়ো হয়ে গেছি, না? হাঁ দেখুন, আমার আসল দরকার কি জানেন, একটু ঘুমের ওষুধ, এমন একটা ওষুধ, যা রাত্রে খাবার পর খেয়ে শুলে অনেক গোলমাল হলেও ঘুম না ভাঙ্গে, একেবারে ভোরবেলা নিশিচেষ্টে উঠতে পারি। ঘুমের একটা ভাল ওষুধ দরকার আমার, কম্পাউণ্ডারবাবু।

কম্পা। বেশ।

ভদ্রলোক। যে দাম আপনি চাইবেন তাই আমি দেব। টাটকা এবং ভাল ওষুধ। উঃ, কত দিন আমি ঘুমোতে পারিনি। ঘুমটা আমার বিশেষ দরকার।—একটু বসব?

কম্পা। বসুন।

ভদ্রলোক। (চেয়ারে বসে) জানেন, অস্ত্র কিছু নয়, আপনাদের কাছে আমি ঘুমের ওষুধের জন্তেই এসেছিলাম, ঘুমটা আমার বিশেষ দরকার।

টেবিলের ওপর দুহাত আড়াআড়ি ভাবে রেখে তার উপর মাথা রাখল

যবনিকা

## কুমড়া ফুল

শ্রীদেবেশচন্দ্র দাশ

পূজার প্রাক্কণে মোর নাহি স্থান, স্মরিবে না কেহ  
ববে এই ক্ষীণ বস্তু স্বর্ণকাস্তি দেহ  
উত্তম কটাহে তৈলে ভারতের রসনা পূজায়  
বার্তার আলুর সাথে ভোজ্যপাত্রের এক হ'য়ে যায়।  
আমি কুমড়ার ফুল, পুষ্পপাত্রের চন্দনশোভায়  
দিতে যদি মোরে ঠাই জবা কিম্বা গাঁদার সভায়  
হ'তাম কি হতমান? শেফালীকমলে  
যে লাগণ্য যে বর্ণালী সাহিত্যের আভিজাত্য বলে  
দিয়েছ, তাহার চেয়ে মোর স্থান সুবর্ণ সজ্জায়  
কম কিসে? কমনীয় কামিনীর উন্মেষ-লজ্জায়?  
আমি মধ্যবিত্ত ফুল, মোর দেহে জাগে  
নয় আভা, রক্তে শোভে সিক্ত অম্লরাগে  
অস্তরের সোনার সম্পদ; উর্দ্ধশির উকত গোরবে।

তোরণ পার্শ্বেতে কভু ছঙ্কারি না সংঘবদ্ধ রবে,  
ছাই না প্রান্তর ভূমি তৃণাকুর সাথে  
সীমাহীন বনফুলে শরতে বর্ষাতে;  
তাই তোমাদের কবি গোলাপে ও রজনী-গন্ধারে  
প্রশস্তি করিয়া গেছে, নিত্য স্মরে কাশ গুচ্ছ হারে।  
ছাপোষা বাঙ্গালী ফুল; এ বিশ্বের পূজার প্রাক্কণে  
নাহি আজ স্থান মান, রক্তধ্বজ কিংবাকৈ রঙ্গণে  
হায় তোমাদের নভ, সুরভিত পশ্চিম বাতাস  
সুখী কমলের গন্ধে; তার পার্শ্বে ফেলি' দীর্ঘশ্বাস  
বিষাব না শরতের পূজারতিকালে,  
আভিনায় মৌন রবো নত নত ভালে;  
জাগিবে না শব্দ রবে উল্লাসে বিপুল  
শুভ্র ক্ষুদ্র কুমড়ার ফুল।



# সোপেনহর

শ্রীতারকচন্দ্র রায়

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে ইয়োরোপে বহুসংখ্যক নিরাশাবাদীর আবির্ভাব হইয়াছিল। কবিদিগের মধ্যে ইংলণ্ডে বাররণ, ফ্রান্সে দে মুসে, জার্মানীতে হে-ইন, ইতালীতে লিওপার্ডি, রুসিয়ায় পুসকিন্ এবং লারমন্টক্; সঙ্গীত রচয়িতাদিগের মধ্যে শ্বার্ট, স্কম্যান, চোপিন্ এবং বিটোভেন এবং সর্বোপরি ছুঃখবাদের মহাগ্রন্থ 'The World as will and Idea'র রচয়িতা দার্শনিক সোপেনহর এই যুগেই প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। ঠিক এই সময়ে এতগুলি নিরাশাবাদীর আবির্ভাবের কারণ কি ?

.. সোপেনহরের জন্ম হয় ১৭৮৮ সালে। ইহার পরবৎসরই ফরাসী বিপ্লব আরম্ভ হয়। এই বিপ্লবকে ইয়োরোপের বহু মনীষী সাদরে অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন। স্বাধীনতা, সাম্য ও মৈত্রীর বাণী ইয়োরোপের দলিত জনগণের মনে নূতন আশার সঞ্চার করিয়াছিল। এই বিপ্লবের সংবাদ যখন প্রথম ইংলণ্ডে উপনীত হয়, তখন ফন্স্ আনন্দে আত্মহারা হইয়া ইহাকে জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ এবং সর্বোত্তম ঘটনা বলিয়া বর্ণনা করিয়াছিলেন। বৃদ্ধ দার্শনিক ক্যান্ট অশ্রুজলকণ্ঠে বলিয়াছিলেন “প্রভু, তোমার ভৃত্যকে এখন জীবলোক হইতে প্রস্থানের অন্তিমুহুর্ত দেও। আমার চক্ষু তোমার পরিত্রাণ-কার্য প্রত্যক্ষ করিয়াছে।” মানবের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে ইয়োরোপের সর্বত্র বিশ্বাস ও আশা জাগরিত হইয়াছিল। কিন্তু সে আশা সফল হয় নাই, সে বিশ্বাস মিথ্যা প্রতিলম্ব হইয়াছিল। ফ্রান্সের বিরুদ্ধে ইয়োরোপীয় রাজসুত্রবর্গ Holy Alliance গঠন করিয়াছিলেন। সোপেনহরের যখন ২৭ বৎসর বয়স্ তখন ওয়াটালুর্ যুদ্ধক্ষেত্রে নেপোলিয়ান পরাজিত হইয়া সেটহেলেনার নির্জনস্থানে বন্দীরূপে প্রেরিত হইয়াছিলেন। যে বিরাট ইচ্ছা এই ক্ষুদ্র-বপুর্ কর্মিকানের অন্তরে রক্তরঞ্জিতরূপে পরিগ্রহ করিয়াছিল, তাহাই সোপেনহরের গ্রন্থে আংশিকভাবে প্রতিকলিত হইয়া দেবত্বে উন্নীত হইয়াছে। কিন্তু সে ইচ্ছা পূর্ণ হইয়াছিল। রাজ্যচ্যুত বুবন বংশধর ফ্রান্সের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। নির্বাসিত অভিজাত-গণ দেশে ফিরিয়া আসিতেছিল। রুস সম্রাট শান্তিকামী আদর্শ-বাদী আলেকজান্ডারের চেষ্টায় রাজসুত্রবর্গের নূতন সংঘের প্রতিষ্ঠা দ্বারা সর্বত্র প্রগতির পথ রুদ্ধ হইয়াছিল। হৃদয় সেট হেলেনা হইতে নেপোলিয়নের দুঃখ ও লাঞ্ছনার করুণ কাহিনী ভাসিয়া আসিয়া ইয়োরোপের জনগণের কর্ণে প্রবেশ করিতেছিল। দীর্ঘকালব্যাপী যুদ্ধে লক্ষ লক্ষ লোক মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিল। বহু জমি অকর্ষিত অবস্থায় পড়িয়াছিল। চাষ করিবার যথেষ্ট লোক ছিল না। প্রত্যেক দেশের উদ্ভূত অর্থ যুদ্ধে ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়াছিল। দারিদ্র্যের নয়মুর্স্তি সর্বত্র প্রত্যক্ষ হইতেছিল। ১৮০৪ সালে ফ্রান্স ও অষ্ট্রিয়া সন্ধিরক্ষণকালে

সোপেনহর পলীগ্রামের বিশৃঙ্খল ও অস্বাস্থ্যকর অবস্থা, কৃষকদিগের দারিদ্র্যকষ্ট এবং নগরের মধ্যে দুঃখ ও অশান্তির প্রাবল্য দেখিয়া মর্মান্বিত হইয়াছিলেন। ইংলণ্ডে কৃষক ও শ্রমিক সকলেই দুর্গতির শেখসীমায় উপনীত হইয়াছিল। রুসিয়ায় মস্কো ভ্রম্মে পরিণত হইয়াছিল। প্রত্যেক দেশেই গৃহপ্রত্যাগত সৈন্তগণ কর্ম্মভাবে অর্থকষ্ট ভোগ করিতেছিল।

যে বিপ্লবের সহিত ইয়োরোপের জনগণের আশা ও আকাঙ্ক্ষা জড়িত ছিল, যাহা হইতে পৃথিবীতে স্বর্ণের আবির্ভাব হইবে আশা করিয়া সকলে আনন্দে উৎফুল্ল হইয়াছিলেন, তাহার মৃত্যু সংঘটিত হইয়াছিল। অদূরবর্তী ভবিষ্যতে আশা করিবারও কিছু ছিল না। বিফল ফ্রান্সের সিংহাসনে বুবনবংশীয় যাহাকে স্থাপিত করা হইয়াছিল, সে যেমন বিপ্লব হইতে কিছুই শিক্ষালাভ করে নাই, তেমন কিছুই ভুলিয়াও যায় নাই। হঠাৎ হইয়া গেতে বলিয়াছিলেন—“জগতের এই শেষ অবস্থায় আমি যে যুবক নহি, তজ্জন্ত ঈশ্বরকে ধন্যবাদ।”

এই অবস্থায় অনেকেই ধর্ম্মে বিশ্বাস হারাইয়া ফেলিয়াছিলেন। ১৮১৮ সালে ইয়োরোপের যে অবস্থা হইয়াছিল, তাহা দেখিয়া পৃথিবীর যে একজন জ্ঞানবান মঙ্গলচিন্তাধী বিধূতা আছেন, তাহা বিশ্বাস করা কঠিন হইয়াছিল। ইহার পূর্বে অমঙ্গলের সমস্তা এমনভাবে কখনও দর্শন ও ধর্ম্মের সম্মুখে উপস্থিত হয় নাই। সকলের মনেই জ্ঞাত অথবা অজ্ঞাতসারে এই প্রশ্ন উথিত হইতেছিল—কেন এত দুঃখকষ্ট এ জগতে? কতদিন এ দুঃখকষ্ট ভোগ করিতে হইবে? ইহা কি পাপের শাস্তি? এই দুঃখকষ্ট কি মানুষের ধর্ম্মে অবিবাসের শাস্তি? এই শাস্তি দ্বারা ঈশ্বর কি মানুষকে আবার প্রাচীন বিশ্বাস, আশা ও সহৃদয়তার ফিরিয়া যাইতে আদেশ করিতেছেন? স্নেহেল, নোভালিস্, সেটোরিয়া, দে মুসে, সাদি ও ওয়ার্ডস্ ওয়ার্থ ইহাই মনে করিয়াছিলেন। তাহার আশ্রয়ে প্রাচীন ধর্ম্মে ফিরিয়া আসিয়াছিলেন। কিন্তু ইহার বিপরীত প্রতিক্রিয়ারও অভাব ছিল না। অনেকের মনে হইয়াছিল ইয়োরোপের তৎকালিক বিশৃঙ্খলায় বিশ্বের অন্তর্ভুক্তী বিশৃঙ্খলাই প্রতিকলিত। প্রকৃতপক্ষে ঐশ্বরিক ব্যবস্থা বলিয়া কিছু নাই, ঈশ্বর নামে যদি কেহ থাকেন, তাহা হইলে তিনি অন্ধ; পৃথিবীতে অমঙ্গলেরই রাজত্ব। বাররণ, হেইন্, লিওপার্ডি এবং সোপেনহর এই মতাবলম্বী।

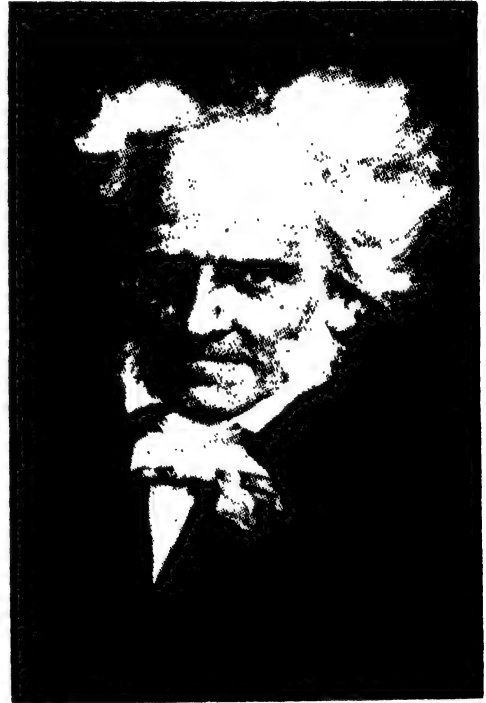
সোপেনহর লিখিয়াছেন—“চরিত্র অথবা ইচ্ছা লোকে প্রাপ্ত হয় পিতার নিকট হইতে, বুদ্ধিপ্রাপ্ত হয় মাতার নিকট।” আরথার সোপেনহরের পিতা ড্যানজিগ নগরের একজন সম্ভ্রান্ত বণিক ছিলেন। তাহার খায় ব্যবসারে বিশেষ দক্ষতা এবং চরিত্রের দৃঢ়তা ছিল। সেজা

সামবর্গে বসতি স্থাপন করেন। পিতার ইচ্ছা ছিল পুত্র বাণিজ্য ব্যবসায় অবলম্বন করেন। আরম্ভের কিছুদিন এই ব্যবসারে নিযুক্ত ছিলেন, কিন্তু অবশেষে তাহা ত্যাগ করেন। ১৮০৫ সালে পিতা আত্মহত্যা করেন। ইহার পূর্বে পিতামহী উদ্ভাদ অবস্থায় প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন। সোপেনহরের মাতা বুদ্ধিমতী ছিলেন, তাঁহার রচিত কয়েকখানা উপন্যাস বিশেষ জনপ্রিয়তা লাভ করিয়াছিল। কিন্তু তাঁহার মেজাজও রুক্ষ ছিল। দাম্পত্য জীবন তাঁহার সুখময় ছিল না। স্বামীর মৃত্যুর পরে তিনি বন্ধনহীন প্রেমলীলায় প্রবৃত্ত হইলেন এবং হামবার্গ ত্যাগ করিয়া উইমারে গিয়া বাস করিতে লাগিলেন। সোপেনহর বিষম রুগ্ন হইলেন। তাঁহার প্রেমে স্ত্রীলোক সম্বন্ধে তিনি যে মত ব্যক্ত করিয়াছেন বহু পরিমাণে তাহা তাঁহার মাতার সহিত কলহের ফল। সোপেনহরের নিকট এক পত্রে মাতা লিখিয়াছিলেন—“তোমার সঙ্গ আমার অসহ্য, তোমার সহিত একত্র বাস করা খুব কঠিন। তোমার সমস্ত সদগুণ তোমার আত্মাভিমান দ্বারা অভিভূত। অশ্রের ক্রটিদর্শনের যে সাধারণ প্রবণতা তোমার আছে, তাহা দমন করিবার অক্ষমতার জন্য তোমার সদগুণ পৃথিবীর কোনও কাজে লাগিল না।” মাতাপুত্র পৃথক বাস করিবার ব্যবস্থা হইল। স্থির হইল মাতা যখন বন্ধুদিগকে নিমন্ত্রণ করিবেন, তখন নিমন্ত্রিত অতিথির মত পুত্রও উপস্থিত হইবেন। অন্য সময়ে তাঁহার মাতার নিকট যাওয়া নিষিদ্ধ হইল। গেটের সহিত মাতার বন্ধুত্ব ছিল। একদিন তিনি মাতাকে বলিয়াছিলেন “তোমার পুত্রের খ্যাতি একদিন চারিদিকে বিস্তারিত হইবে।” ইহাতে বিপরীত ফল উৎপন্ন হইয়াছিল। মাতা নিজের খ্যাতিতে সন্তুষ্ট ছিলেন। পুত্র তাঁহার যশের প্রতিদ্বন্দ্বী হইবে, ইহা তিনি সহ্য করিতে পারেন নাই। একদিন কলহের সময়ে মাতা ঠেলা দিয়া পুত্রকে সিঁড়ির নিম্নে ফেলিয়া দেন। রুগ্ন হইয়া পুত্র তখন বলিয়াছিলেন যে, ভবিষ্যতে কেবলমাত্র তাঁহার মাতা বলিয়াই তিনি পরিচিত হইবেন। ইহার পরে মাতা আরও ২৪ বৎসর জীবিত ছিলেন। কিন্তু সোপেনহর আর তাঁহার সহিত দেখা করেন নাই। মাতার সহিত সোপেনহরের যে সম্বন্ধ ছিল তাহাও তাঁহার দুঃখবাদের একটা কারণ বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে। মাতৃস্নেহের আশ্রয় যে কখনও পায় নাই, পরন্তু মাতার হুগার পরিচর্য পাইয়াছে, সংসারে ভালোবাসা আছে, তাহা মনে করিবার তাহার কোনও কারণ নাই। ব্যয়বর্গের সহিত তাঁহার মাতার সম্বন্ধও এইরূপই ছিল।

মাতার সহিত কলহের ফলে সোপেনহরের চরিত্রে গুরুতর পরিবর্তন সংঘটিত হইয়াছিল। তিনি গভীর ও সন্দ্বিগ্ন-চিত্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। স্বাধিকারও বিশ্বাস করিতেন না। সকলকেই শত্রু বলিয়া গণ্য করিতেন। নাপিত দ্বারা ক্ষৌর্য্য করাইতেন না, পাছে সে তাঁহার শলা কাটিয়া ফেলে, এই ভয়ে। খুশপানের পাইপ তালাবদ্ধ করিয়া রাখিতেন। পিস্তলে গুলি ভরিয়া শয্যার পাশে রাখিয়া নিদ্রা যাইতেন। গোলমাল সহ্য করিতে পারিতেন না। তিনি লিখিয়াছেন, “বাহার ঈশনিক শক্তি যত বেশী, সে তত কম গোলমাল সহ্য করিতে পারে।

মৃতরাং কে কত গোলমাল সহ্য করিতে পারে, তাহা দ্বারা তাহার মানসিক শক্তির পরিমাপ করিতে পারা যায়।” নিজের মূল্য সম্বন্ধে সোপেনহরের এত অত্যুচ্চ ধারণা ছিল, যে তাহাকে একরকম মানসিক ব্যাধি (paranoia) বলিলে অত্যুক্তি হয় না।

১৮০৯ সালে সোপেনহর গটিনজেন বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট হন, সেখান হইতে বার্লিনে গমন করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি ফিক্টে, শেলিং এবং শ্লারার ম্যাকারের বক্তৃতা শুনিতে যাইতেন। নিজের নির্বাণব অবস্থায় তাঁহার তীব্র অনুভূতি ছিল। পিতা, মাতা, স্ত্রী, সন্তান—তাঁহার কেহই ছিল না। তিনি নিতান্তই একাকী ছিলেন, একজন বন্ধুও তাঁহার ছিল না। “একজন বন্ধু থাক। আর একজনও না থাক।



সোপেনহর

ইহার মধ্যে ব্যবধান অনন্ত।” তাঁহার সময়ে যে জাতীয়তা-বোধ প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল, তিনি তাহার স্পন্দন অনুভব করেন নাই। ১৮১৩ সালে ফিক্টে কর্তৃক প্রস্তাবিত হইয়া নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে সংগঠিত সৈন্যদলে যোগ দিবার কল্পনা তিনি করিয়াছিলেন এবং তৎক্ষণাৎ অস্ত্রাদিও ক্রয় করিয়াছিলেন। কিন্তু শেষে সে ইচ্ছা ত্যাগ করিয়াছিলেন। তাঁহার মনে হইয়াছিল নেপোলিয়ন অপেক্ষা দুর্বলতর চরিত্রের লোকের যে আত্ম-প্রতিষ্ঠা এবং বৃহত্তর জীবনের জন্য প্রেরণা অনুভব করে, কিন্তু প্রকাশ করে না, নেপোলিয়নে তাহাই বনীভূত এবং বন্ধনহীন আকারে প্রকাশিত হইয়াছে মাত্র।” যুদ্ধবাজার কল্পনা বর্জন করিয়া তিনি দার্শনিক প্রবন্ধ রচনার মনোনিবেশ করিলেন এবং তাঁহার প্রথম প্রবন্ধ

Four fold Root of the Principle of Sufficient Reason গ্রন্থ লিখিয়া ১৮১৩ সালে তিনি জেনা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ডিগ্রী প্রাপ্ত হইলেন। এই গ্রন্থে তিনি প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, তর্ক বিজ্ঞান, তত্ত্ব বিজ্ঞান এবং চরিত্র বিজ্ঞানের মৌলিক তত্ত্বাবলীর ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন।

সোপেনহরের প্রধান গ্রন্থ The World as Will and Idea ১৮১৯ সালে প্রকাশিত হয়। গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি প্রকাশকের নিকট পাঠাইয়া সোপেনহর লিখিয়াছিলেন—এই গ্রন্থে পুরাতন কথার পুনরুক্তি নাই। ইহাতে আছে মৌলিক চিন্তার শৃঙ্খলাবদ্ধ সমাবেশ, সহজবোধ্য ও জরুরী ও সুখমামুদিত চিন্তা। ইহার পরে ইহা হইতে একশত অল্প পৃষ্ঠকের উদ্ভব হইবে। দার্শনিক হইলেও এই উক্তি সত্য। এই গ্রন্থে দর্শনের প্রধান সমস্তাসমূহের সম্পূর্ণ সমাধান করিয়াছেন বলিয়া সোপেনহরের এমন দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, গ্রন্থ প্রকাশের বহু বৎসর পরে তিনি স্বকীয়কীল অঙ্গুরীয় (Signet ring) উপর গহবরে লক্ষ প্রদানোক্ত স্ফিংক্সের (Sphinx) মূর্তি অঙ্কিত করিবার কল্পনা করিয়াছিলেন। \*

দ্বীয় গ্রন্থ সম্বন্ধে সোপেনহরের এত উচ্চ ধারণা থাকিলেও, তাহার আদর হয় নাই। ১৬ বৎসর অবিক্রীত থাকিবার পর অধিকাংশ গ্রন্থ প্রকাশক কর্তৃক অব্যবহার্য কাগজের মূল্যে বিক্রীত হইয়াছিল। কিন্তু গ্রন্থের মূল্য সম্বন্ধে সোপেনহরের ধারণার পরিবর্তন হয় নাই। যশঃ লাভে হতাশ হইয়া তিনি যশঃ-দীর্ঘক প্রবন্ধে লিকটেন বর্গের দুইটি উক্তি উদ্ধৃত করিয়া আত্মপ্রসাদলাভ করিয়াছিলেন। উক্তি দুইটি এই—“এই প্রকার রচনা দর্পণ সদৃশ। গর্গভে ইহার দিকে চাহিলে, তাহার মধ্যে দেবদূতের প্রতিরূপ আশা করিতে পারে না।” দ্বিতীয়টি—“কোনও গ্রন্থের সহিত কোনও মস্তকের সংঘর্ষ হইতে যদি শৃঙ্গগর্ভ শব্দ নির্গত হয়, তাহা হইলে তাহা যে গ্রন্থ হইতেই নির্গত, তাহা কেহ বলিতে পারে না।” তিনি আরও লিখিয়াছেন “যতই কেহ ভবিষ্যৎ-বংশীয় দিগের সমানধর্মী হয়, ততই সে সমসাময়িকদিগের বুদ্ধির বাহিরে গিয়া পড়ে। যদি কোনও গায়ক জানিতে পারে যে তাহার শ্রোতাদিগের অধিকাংশ বধির এবং যে সামান্ত কয়েক জনের শ্রুতিশক্তি আছে, তাহার উৎকোচের বশীভূত, তাহা হইলে উচ্চকরতালি-ধ্বনিতে তাহার ভুট্ট হইবার কারণ কোথায়?”

কোনও বিশ্ববিদ্যালয়ে সোপেনহর তাহার দর্শনের ব্যাখ্যা করিবার

\* গ্রীক পুরাণে স্ফীলোকের মস্তক এবং সিংহের দেহ বিশিষ্ট Sphinx নামক এক দৈত্যের বর্ণনা আছে। এই দৈত্য Thebes নগরের অধিবাসীদিগের নিকট এক হেয়ালী বলিয়া সর্ভ করিয়াছিল যাহারা হেয়ালীর সমাধান করিতে অক্ষম হইবে তাহাদিগকে সে হত্যা করিবে। যদি কেহ ইহার প্রকৃত উত্তর দিতে সমর্থ হয় তাহা হইলে যে পরীক্ষার্থী সে উপবিষ্ট ছিল তাহা হইতে লক্ষ প্রদান করিয়া নিজে পতিত হইবে।

Oedipus হেয়ালীর প্রকৃত উত্তর দিয়াছিল এবং sphinx লক্ষ প্রদান

স্বযোগে সন্ধান করিতেছিলেন। ১৮১২ সালে তিনি বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ে Private docent নিযুক্ত হইলে এই স্বযোগ উপস্থিত হইল। হেগেল তখন বার্লিনে অধ্যাপনা করিতেছিলেন। তিনি যে সময়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা করিতেন, সোপেনহর ইচ্ছা পূর্বক আপনার বক্তৃতার জন্ত সেই সময়ই নির্দিষ্ট করিলেন, আশা করিয়াছিলেন হেগেলের বক্তৃতা না শুনিয়া ছাত্রগণ দলে দলে তাহার অধ্যাপনা-ক্ষেপে উপস্থিত হইবে। আশা ফলবতী হইল না। কেহই তাহার বক্তৃতা শুনিতে আসিল না। মনঃক্লম্ব হইয়া তিনি পদত্যাগ করিলেন এবং প্রতিশোধ লইবার জন্ত হেগেলকে ভীষণ ভাবে আক্রমণ করিয়া কয়েকটি প্রবন্ধ লিখিলেন।

১৮৩৬ সালে সোপেনহরের “On the Will in Nature” নামক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। ১৮৪১ সালে The two Ground Problems এবং ১৮৪২ সালে Parerga et Parilia-pomena দুই খণ্ডে প্রকাশিত হয়। শেষোক্ত নামের অর্থ “উপজাত ও উচ্ছিন্ন”।

বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ডিগ্রী প্রাপ্ত হইবার পর বেদান্ত-দর্শনের প্রতি সোপেনহরের মনোযোগ আকৃষ্ট হইয়াছিল। তিনি গভীর আগ্রহের সহিত পারসীক ভাষায় অনুদিত উপনিষৎ পাঠ করিয়াছিলেন। উপনিষৎ সম্বন্ধে তিনি লিখিয়াছেন “সমগ্র পৃথিবীতে সংস্কৃত মূল উপনিষৎ ভিন্ন উপনিষদের (উপনিষদের পারস্ত ভাষায় অনুবাদ) মত হিতকর ও আত্মোন্নতিকর অল্প কিছুই নাই। জীবনে আমি ইহা হইতে সান্দ্রনা প্রাপ্ত হইয়াছি, সুতরাং ইহাই আমার সান্দ্রনা হইবে।” তিনি তাহার একমাত্র সঙ্গী প্রিয় কুকুরের নাম রাখিয়া-ছিলেন “আত্মা”। এই কুকুরকে সাধারণে তাহার পুত্র (Young Schopenhauer) বলিত।

১৮৩১ সালে বার্লিনে কলেরার ভীষণ প্রকোপ হয়। হেগেল ও সোপেনহর উভয়েই বার্লিন হইতে পলায়ন করেন। কলেরার প্রকোপ প্রশমিত হইবার পূর্বেই ফিরিয়া আসিয়া হেগেল কলেরার আক্রান্ত হইয়া প্রাণত্যাগ করেন। কিন্তু সোপেনহর আর বার্লিনে ফিরিয়া আসেন নাই। জীবনের অবশিষ্ট কাল তিনি ফ্রান্সফোর্টে অতিবাহিত করিয়া-ছিলেন। তথায় দুইটি ঘর ভাড়া লইয়া তিনি ত্রিশ বৎসর বাস করিয়া ছিলেন। এক ইংরেজি হোটলে তিনি আহার করিতেন। নৈশভোজ আরম্ভ করিবার সময় প্রতিদিন তিনি পকেট হইতে একটি মুদ্রা বাহির করিয়া টেবিলের উপর রাখিতেন; খাণ্ড-পরিবেশক ভৃত্য আশা করিত, সে মুদ্রা তাহারই জন্ত, কিন্তু ভোজন-শেষে প্রত্যহই সোপেনহর সেই মুদ্রা তুলিয়া লইয়া পকেটে রাখিয়া দিতেন। মনঃক্লম্ব ভৃত্য একদিন এই অভ্যুত আচরণের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে সোপেনহর বলিয়াছিলেন “ওটা বাজির মুদ্রা। যেদিন অদূরে ভোজনরত ইংরাজ অফিসারদিগকে ঘোড়দৌড়, ঘোড়া, কুকুর ও স্ত্রীলোক ভিন্ন অল্প কোনও বিষয়ের আলোচনা করিতে শুনিব, সেদিন ঐ মুদ্রা Poor Box এর মধ্যে ফেলিয়া দিব।”

সোপেনহর আশা করিয়াছিলেন একদিন তাহার প্রতিভা স্বীকৃত

করিয়া দিবে। কিন্তু সেদিনও তাহা হইল না।

আদর হইল না। জার্মান অধ্যাপকগণ শিক্ষাব্যবসায়ের বহিঃস্থ কোনও ব্যক্তির তাহাদের রাজ্যে প্রবেশ অনধিকার-প্রবেশ বলিয়া গণ্য করিতেন। অধ্যয়ন-প্রিয় সাধারণ লোকে বাহাতে সোপেনহর অথবা তাঁহার গ্রন্থের নাম শুনিতে না পায়, তাহার জন্ত তাহারা চেষ্টার ক্রটি করেন নাই। সোপেনহর দীর্ঘকাল কালের শ্রীক্ষা করিয়াছিলেন। অবশেষে তাঁহার আশা ফলবতী হইল। ১৮৫৩ সালে ইংলণ্ডের West Minister Gazette-এ এক প্রবন্ধে সোপেনহরের গ্রন্থের স্থপাতি বাহির হইল। জার্মানগণ জানিতে পারিল তাহাদের মধ্যে এমন একজন দার্শনিক আছেন, যাহাকে সাধারণ লোকেও বুঝিতে পারে। সমগ্র ইয়োরোপে

তাঁহার নাম বিখ্যাত হইয়া পড়িল। দর্শনশাস্ত্রের সহিত বাহাদের পরিচয় ছিল না, তাহার দুর্বোধ্য ভাষা যাহারা বুঝিতে পারিত না, তাহারা দেখিল সোপেনহরের দর্শন বুঝিতে কষ্ট হয় না। তাঁহার যশঃ চারিদিকে বিস্তারিত হইয়া পড়িল। সাময়িক পত্রে তাঁহার সম্বন্ধে প্রকাশিত প্রবন্ধ সোপেনহর আগ্রহের সহিত পাঠ করিতেন। ১৮৫৮ সালে তাঁহার সমুদ্রযাত্রায় জার্মানিতে চতুর্দিক হইতে সকলে তাঁহাকে অভিনন্দন করিয়াছিল। দুই বৎসর পরে ১৮৬০ সালের ২১শে সেপ্টেম্বর তারিখে হঠাৎ তাঁহার প্রাণবিয়োগ হয়। মৃত্যুর পূর্বে তিনি ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন যেন মৃত্যুতেই তাঁহার অস্তিত্বের সম্পূর্ণ বিনাশ হয়।

## রজনী সেনের গান

শ্রীজয়দেব রায় এম-এ, বি-কম্

কবি রজনীকান্ত সেনের গান আজ আর কেহ গাহে না! রজনী সেন নামে একজন কবি ছিলেন সে কণ্ঠে দেশবাসী বোধহয় ভুলিয়া গিয়াছেন, পাঠ্যপুস্তকে স্থানপ্রাপ্ত দুই একটি গান ব্যতীত তাঁহার কোন দানই কেহ মনে রাখে নাই!

বাংলা গানের যে ধারা আধুনিক যুগ পর্য্যন্ত প্রবাহিত হইয়া আসিতেছে, তাহাতে সুসজ্জিত ( Refined ) স্বর বাধিয়াছেন পাঁচজন গীতিকবি—রবীন্দ্রনাথ, বিজয়লাল, অতুলপ্রসাদ, রজনীকান্ত এবং নজরুল। রবীন্দ্রনাথের স্বরমোহে মুগ্ধ বঙ্গবাসী আজ অশ্রু সবারই গান অবহেলা করিতেছে। রজনী সেনের গান তাহার হৃদয় স্থললিত বাণী, মধুর স্বরধ্বনি, উচ্চাঙ্গের রাগ-রাগিণী, অন্তর্নিহিত গভীর ভাব সম্বন্ধে আজ বিস্মৃতপ্রায়! ইহার জন্ত একমাত্রদারী, মনে হয়, তাঁহার শেষ জীবনের দারিদ্র্য। রজনী সেন ধনী পুত্র ছিলেন না, ব্যারিষ্টারও ছিলেন না, বিলাত যাইবার সৌভাগ্যও তাঁহার হয় নাই; হুতরাং গায়কেরা তাঁহার গানকে রক্ষা করিবার দায়িত্ব গ্রহণ করেন নাই, তাঁহার গানেরও অবদান হইয়াছে তাঁহার সঙ্গে! শ্রীযুক্ত দিলীপকুমার রায় কবির বংশধর, তিনি স্বয়ং প্রসিদ্ধ গায়ক হইয়াও কেন যে রজনী সেনের গানের প্রচারে বিরত, তাহা জানি না! আমরা এতই অলস যে, আমাদের জোর করিয়া কিছু না দিলে, আমরা গ্রহণ করিতে লজ্জা বোধ করি! রজনী সেনের গান যদি রেকর্ডে, মজলিসে, বিশেষতঃ রেডিওতে মধ্যে মধ্যে প্রচার করিবার ব্যবস্থা হয়, বাঙ্গালী তাহা হইলে নিশ্চয়ই এই দুর্ভাগ্য কবির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিবে!

রজনীকান্ত অতুলপ্রসাদের মতই গান ছাড়া আর কিছুই লেখেন নাই! কাশিমবাজারের মহারাজা মণীন্দ্রেন্দ্র নন্দী মহাশয় রজনীকান্তের শেষ জীবনে পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। কবি তাঁহার কাব্যগ্রন্থে পঞ্চমুখে

এই বদাশু ভক্তলোকের প্রশংসা করিয়াছেন! শেষ জীবন তিনি দারিদ্র্য এবং অস্বাস্থ্যের সঙ্গে সংগ্রাম করিয়াছেন।

‘অভয়া’ কাব্যগ্রন্থের ভূমিকায় বলিতেছেন—“আমি সঙ্কটাপন্ন পীড়িত, রোগশয্যাতে প্রুঢ় দেখিয়া দিবার সামর্থ্য আমার নাই, হুতরাং এই গ্রন্থে.....”

“আনন্দময়ী” কাব্যগ্রন্থের ভূমিকায় তাঁহার প্রগাঢ় ভগবৎ ভক্তি পরিষ্কৃত হইতেছে—“জগজ্জননীর পিতৃগৃহে আবির্ভাব ‘আগমনী’ এবং কৈলাসভিমুখে তিরোধান, ‘বিজয়া’ নামে অভিহিত। এই ক্ষুদ্র সঙ্গীত-পুস্তকের আশ্রয় ‘আগমনী’ ও শেষাংশ ‘বিজয়া’। পাঠকগণ পুনঃ পুনঃ শুনিয়াছেন—যে যথা মাং প্রপজ্ঞন্তে তাংস্তথৈব ভজ্যমাংস—যাহারা যে ভাবে আমার শরণাপন্ন হই, আমি সেই ভাবেই তাহাদিগকে অনুগ্রহ করি। হুতরাং সম্যক্ ও যথাবিধি একাগ্র সাধনায় যে ভগবানকে সন্তানরূপে পাওয়া যায় না, তাই বা কেমন করিয়া বলি? তিনি তো ভক্তের ঠাকুর, যে তাঁহাকে যে ভাবে পাইয়া তুষ্ট হয়, তিনি সেই ভাবেই তাহাকে দর্শন দেন; এ কথা সত্য না হইলে যে তাঁহার কল্পনাময়ত্বে, তাঁহার ভক্তবৎসলতার কলঙ্ক হয়। ধর্মজীবন ভারতবর্ষ চিরদিন এই ধারণায় কর্মক্ষেত্রে অনুপ্রাণিত ও অকুতোভয়। উৎকট-রোগ-শয্যায়, দুর্বল হস্তে এই সঙ্গীতগুলি লিখিয়াছি। আর কোনও আকর্ষণ না থাকিলেও ইহাতে জগদম্বার নাম আছে মনে করিয়া পাঠক অনাদর করিবেন না, এই বিনীত প্রার্থনা।”

রজনীকান্ত সেন কেবল ‘সাধনসঙ্গীত’ই রচনা করেন নাই, কৌতুক সঙ্গীত বা হাসির গানেও তাঁহার বিশেষ দান ছিল। রবীন্দ্রনাথের কৌতুক সঙ্গীতে বিন্দুমাত্রও হাসি নাই, সেইগুলি Light songs মাত্র। হাসির গানে বিজয়লালই সর্বশ্রেষ্ঠ; তাঁহার হাসির গানের

ড্রামা বা (Dramatic Style) হৃদয়। রজনী সেনের হাসির গান  
 যিজ্জেললালের সমশ্রেণী।

যে লোকটি চিরজীবন দুঃখভোগ করিয়া গেলেন, তিনি যে কেমন  
 করিয়া এমন কৌতুক বিতরণ করিলেন তাহা ভাবিলে আশ্চর্য্য হইতে  
 হয়। রজনী সেন লাক্ষিত কবি, তাহাই তাঁহার হাসির গানে Pony বা  
 প্লেরের ভাগই বেশি! যিজ্জেললালের বিস্ময় Fun তাঁহার  
 গানে অল্প।

শর্গীয় অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় রজনী সেনের বিশেষ বন্ধু ছিলেন।  
 রজনী সেনের গানের পরিচয়ে তিনি বলিয়াছেন—

“কাহারও বাণী গঞ্জে, কাহারও গঞ্জে, কাহারও বা সংগীতে  
 আভ্যাক্ত! রজনীকান্তের কান্তপদাবলী কেবল সংগীত। এই কথা  
 বলিবার জন্তই এই সংক্ষিপ্ত নীরস গল্পের অবতারণা।”

অপর একজন সমালোচক (সারদাচরণ মিত্র) হৃদয় ভাষায় কবির  
 গানের পরিচয় দিয়াছেন—“আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে রজনীকান্ত সুভা-  
 শ্যায় শয়ন করিয়াও হৃদয়াকাশে অনন্ত বিশ্বের প্রতিমা গড়িয়া কবিতা  
 লিখিতে সমর্থ হইয়াছেন! রোগের যাতনা, অর্থাভাবের ক্লেশ, পুত্র-  
 কলত্র নিরাশ্রয়ে ফেলিয়া ইহসংসার ত্যাগের চিন্তা কিছুতেই তাঁহার  
 কোমল হৃদয়কে ক্রিষ্ট করিতে পারে নাই। তাঁহার হৃদয় পাষণ্ডের মত  
 নহে, কিন্তু কাব্যরসে এরূপ নিমজ্জিত যে চতুর্দিকে সেই রস ভিন্ন আর  
 কিছুই নাই। রামপ্রসাদ ভাবুক ছিলেন, স্বভাব কবি ছিলেন!  
 মহাশক্তি তাঁহাকে শক্তিমান করিয়াছিলেন, বাগ্‌দেবীও সঙ্গে সঙ্গে  
 মহাশক্তির পার্শ্বে ছিলেন। কবির ‘আনন্দময়ী’ কাব্য পাঠ করিতে  
 করিতে রামপ্রসাদকে মনে পড়ে। তবে সেকালের ভাবার ও একালের  
 ভাবায় পার্থক্য আছে; কিন্তু দার্শনিক ভাবের পার্থক্য নাই, করুণ রসের  
 পার্থক্য নাই।”

রবীন্দ্রনাথ ও কান্তকবির ভগবৎ-অনুভূতির আন্তরিকতার প্রশংসা  
 করিতেন—“সিদ্ধিদাতা ত আপনার কিছুই অবশিষ্ট রাখেন নাই, সমস্তই  
 তিনি নিজের হাতে লইয়াছেন—আপনার প্রশ্ন, আপনার গান, আপনার  
 আনন্দ সমস্ত ত তাঁহাকেই অবলম্বন করিয়া রহিয়াছে—অন্ত সমস্ত  
 উপকরণ ত একেবারে তুচ্ছ হইয়া গিয়াছে। ঈশ্বর, যাহাকে রিক্ত  
 করেন, তাঁহাকে তেমনি গভীরভাবে পূর্ণ করিয়া থাকেন, আজ আপনার  
 জীবন-সঙ্গীতে তাহাই ধ্বনিত হইতেছে।”

১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে পাবনা জেলার ‘ভাদ্রাবাড়ী’ গ্রামে কবির জন্ম হয়।  
 রাজশাহী জেলা কোর্টে আইন ব্যবসা তাঁহার জীবনের উপজীবিকা  
 ছিল। ১৯১০ খৃষ্টাব্দে মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের ১২নং কটেজ  
 ক্যান্সার রোগে কবির মৃত্যু হয়।

বাংলার অধিকাংশ কবির জীবনের স্তায় রজনী সেনের জীবন ও  
 বৈচিত্র্যহীন! রবীন্দ্রনাথ তাঁহার বিশ্বজনীন এবং বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠার  
 জন্ত জীবনধারাকে নানা বিচিত্র অংশের মধ্যে প্রবাহিত করিয়াছিলেন,  
 হৃদয়ের ললিত ফ্রোড়ে সারাদিন বাঁশী বাজাইয়া তিনি ভুবনকে উপভোগ

রজনীকান্ত হৃকণ্ঠের অধিকারী এবং হৃগায়ক ছিলেন; কিন্তু তাঁহার  
 সকল গানের হৃদ তাঁহারই দেওয়া কিনা সন্দেহের বিষয়! “কল্যাণী”  
 গীতিসংগ্রহে তাঁহার নিজস্ব ভূমিকা এই সন্দেহের মূল।

“বাণীতে রাগিণী ও তাল সন্নিবিষ্ট ছিল না, একান্ত কোনও কোনও  
 সমালোচকের তীব্র লেখনী অনেক শ্লেষ উদ্‌দীর্ণ করিয়াছে। এবার  
 সঙ্গীতপ্রিয় জনসমাজের সে অমুযোগের স্থল রাখি নাই। সঙ্গীতে  
 আমার অধিকার নাই। হুতরাং সঙ্গীতজ্ঞ ব্যক্তিগণের উপদেশে  
 ও সাহায্যে তাল ও রাগিণী প্রদত্ত হইল। তথাপি তদ্বিষয়ে সঙ্গীত-  
 বিশারদদিগের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা আছে; তাঁহারা নিজ নিজ রুচি  
 অনুসারে হৃদ-সংযোগ করিতে পারেন।”

রবীন্দ্রনাথের যুগের অস্বাভাবিক কবি-হৃদকায়ের রচনার স্তায় রজনী  
 সেনের কাব্য এবং হৃদে রবীন্দ্রনাথের প্রচুর প্রভাব রহিয়াছে। এমন  
 কি তাঁহার বহু গান রবীন্দ্রনাথের রচনা বলিয়া চলিয়া আসিতেছে। এই-  
 প্রকার একটি গানের উল্লেখ করিতেছি—

মিশ্র কানেড়া—একতাল

আমি তো তোমারে চাহিনি জীবনে, তুমি অন্তাগারে চেরেছ।

আমি না ডাকিতে, হৃদয়-মাঝারে নিজে এসে দেখা দিয়েছ ॥

চির-আদরের বিনিময়ে সখা, চির অবহেলা পেয়েছ।

(আমি) দূরে ছুঁ টে যেতে, ছুঁ হাত পসারি, ধরে টেনে কোলে নিয়েছ।

‘ওপথে যে’ওনা কিরে এস’, বলে কানে কানে কত ক’য়েছ।

(আমি) তবু চলে গেছি, ফিরায়ে আনিতে পাছে পাছে ছুটে গিয়েছ ॥

(এই) চির অপরাধী পাতকীর বোঝা হাসি-মুখে তুমি ব’য়েছ।

(আমার) নিজ হাতে গড়া বিপদের মাঝে, বুকে ক’রে নিয়ে রয়েছ!

উপরের গানটি রবীন্দ্রনাথ রচিত একটি ‘ব্রহ্মসঙ্গীত’ নামে খ্যাতি অর্জন  
 করিয়াছে! তাঁহার গান এইভাবেই আমাদের হৃদয় হরণ করিয়াছে।  
 রজনীকান্তের গানের সহজ হৃদয়টি আন্তরিকতায় পূর্ণতা লাভ করিয়াছে,  
 তাহাই তাঁহার প্রকাশ সঙ্গীত হৃদ-কোশল বর্জিত, যেমন ভৈরবীতে—

তব চরণ নিয়ে, উৎসবময়ী শ্রাম-ধরণী সরসা;

উর্দ্ধে চাহ, অগণিত মণি-রঞ্জিত নভো নীলাকলা,

সৌম্য-মধুর দিব্যাজনা, শান্ত-কুশল দরশা!

প্রায় আবৃত্তিরই রূপভেদ।

রজনীকান্তের অতি প্রসিদ্ধ ‘জাতীয় সংকল্প সঙ্গীত’—

“মায়ের দেওয়া মোটা কাপড় মাথায় তুলে নেয়ে ভাই;

দীন-দুখিনী মা যে তোদের তার বেশি আর সাধ্য নাই।”

(মুলতান, গড়খেমটা)

এক সময়ে পথে পথে গাওয়া হইত!

কবির ভগবৎ-গীতিগুলির মধ্যে ‘কেন বঞ্চিত হব চরণে?’ তাহার

মিশ্র খাখাজ ; জলদ একতালী

কেন ব্যক্ত হ'ব চরণে ?

আমি কত আশা ক'রে বসে আছি, পাব জীবনে, না হয় মরণে !

আহা, তাই যদি নাহি হবে গো,—

পাতকি-তারণ তরীতে, তাপিত আতুরে তুলে না লবে গো ;—

হ'য়ে, পথের ধূলায় অন্ধ, এসে, দেখিব কি থেয়া বন্ধ ?

তবে, পারে ব'সে, “পার কর” ব'লে, পাণী কেন ডাকে দীন-শরণে ?

আমি শুনেছি, হে তৃণা-হারি !

তুমি, এনে দাও ভারে প্রেম-অমৃত তৃষিত যে চাহে বারি ;

তুমি, আপনা হইতে হও আপনার

যার কেহ নাই, তুমি আছ তার ;

এ কি, সব মিছে কথা ? ভাবিতে যে ব্যথা

বড় বাজে, প্রভু, মরমে !

রজনীকান্তের এই গানটির একদা প্রসিদ্ধি ইহার প্যারডি রচনার  
প্রয়াস হইতেই জানা যায় ! ‘প্যারডি’ কবিতার বাঙ্গা নয়, তাহার  
একপ্রকারের appreciation !

কেন ব্যক্ত হ'ব ভোজনে ?

মোরা কত আশা করে' নিজবাসা ছেড়ে

খেতে এসেছি এখানে ক'জনে ।

ওগো তাই যদি নাহি হবে গো,

এত কি গরজ তোমার বাড়ীতে ছুটিয়া এসেছি কবে গো ?

হ'য়ে সুধার আলায় অন্ধ,

এসে, দেখিব কি খাওয়া বন্ধ ?

তবে, তাড়াতাড়ি ‘পাত কর’ বলে' ডাক তব আত্মীয় স্বজনে ।

মোরা শুনেছি তোমার বাড়ী,

চাহে যদি কেউ একহাতা কিছু এনে দেয় হাঁড়ী হাঁড়ী ।

তুমি, পাবনা হইতে দধি ভারে ভার

মালদহ হতে এনেছ আচার,

একি, সব মিছে কথা ? দিওনাক ব্যথা

মোরা, খাবনাত বেশী ওজনে ।

( রসকদম্ব পৃষ্ঠা ৮ )

কবি সমসাময়িক সঙ্গীতের একজন অনুরাগী ভক্ত এবং রসিক  
শোভা ছিলেন ; রবীন্দ্রনাথ, বিজ্ঞানলাল এবং অতুলপ্রসাদের গানের  
স্বরের আনুরূপে তিনি অনেক গান রচনা করেন ! ‘কেন ব্যক্ত হ'ব  
চরণে ?’ গানটির স্বর অবলম্বনে তিনি পরে নিজেই অপর একটি গান  
রচনা করেন—এইটুকো শিল্পকের বিদায় উপলক্ষে গাওয়া হয়—

তুমি সত্য কি যাবে চলিয়া ?

পুত্রকণ্ঠা প্রিয় শিশুদলে চেতেছ আজি কি বলিয়া ?

মোরা—তাসি যে অশ্রু নীরে

তোমার গুজ্ব শুতিটুকু লয়ে বাব কি হে গৃহে কিরে ।

রবীন্দ্রনাথের বিখ্যাত ব্রহ্মসঙ্গীত—

“তোমার কথা হেথা কেহ তো বলে না,

করে শুধু মিছে কোলাহল ।

স্থধাসাগরের তীরেতে বসিয়া

পান করে শুধু হলাহল ।”

ইমন ভূপালী, একতালার রচিত স্বরে রজনী সেনের গান—

—“আমি, সকল কাজের পাই হে সময়,

তোমাতে ডাকিতে পাইনে ;

আমি, চাহি দারা-হৃত-স্বপ্ন-সন্মিলন,

তব সঙ্গস্থ চাইনে ।”

“তোমারি রাগিণী জীবন-কুঞ্জে”র স্বরে রচিত রজনী সেনের গান—

( ইমন কাওয়ালী )

“ভীতি-সঙ্কল এ ভবে, সদা তব

সাথে থাকি যেন, সাথে গো”

রবীন্দ্রনাথের—

“দাঁড়াও আমার আশির আগে ।

যেন তোমার দৃষ্টি হৃদয়ে লাগে ।”

বেহাগ ; তেওয়ারি রচিত স্বরে রজনীকান্তের গান—

—“শুনাও তোমার অমৃতবাণী,

অধমে ডাকি' চরণে আনি' ।”

অতুলপ্রসাদ সেনের জাতীয় সঙ্গীত—

“ওঠ গো ভারত লক্ষ্মী, উঠ আদি জগত জন পূজ্যা”র

‘মিশ্র’ স্বরে রচিত রজনী সেনের গান—

—আকুল কাতর কণ্ঠে, প্রভু, বিশ্ব, চরণ অভিবন্দে ।

পাপ-তাপ সব নাশি, কর প্রাবিত চির-মকরন্দে ॥

বাহিত সাধন মুক্তি, দেহ ভক্তি, ওহে অচল শরণ, স্থপসিদ্ধি !

দেবতা গো, হের শুভ চক্ষু, শান্তি নিবাস লহ তুলি বন্ধে,

মাগিছে কোটি তপন শশী, মজ্জন চির-স্বপ্ন-নীরে গো ॥

\* \* \* \*

বন্ধন মোচন কর হে, প্রভু, বার' এ চির পথ শ্রান্তি ;

কাতরে কহে গ্রহতারি “প্রভু, দেহ চরণ তলে শান্তি ;

শক্তি শতচিত শূন্তে, হতপুণ্যে, প্রভু, দিবে না কি যাচিত মোক্ষ ?

দেবতা গো.....

সম্বৎ দুঃসহ শক্তি, প্রভু, রোধ এ ঘৃণিত চক্র ;

কর হে নির্দেশ শূন্ত, যত, সঙ্কট পথ ঋজু বক্র ;

শুভিত কর হে মুহূর্ত্তে, তলে, উর্দ্ধে,

( যত ) অগণিত শশী, রবি, রক্তে ;

দেবতা গো.....

বিজ্ঞানলাল রায়ের “আমরা বিলাত কেব্বা ক' ভাই” গানটির  
স্বর বোধ হয় কবির অতি প্রিয় ছিল, তাহার এই স্বরে অনেকগুলি হাসির  
গান পাইতেছি—



(১) আমরা, মোক্তারি করি ক'জন, (২) আমাদের ব্যবসা পৌরোহিত্য, (৩) দেখ, আমরা দেওয়ানী হজুর, (৪) আমরা Dey কি Ray কি Sanyal, (৫) দেখ আমরা জজের Pleader, মিশ্র ইমন কল্যাণে “দেখ আমরা হুজি পাশ করা ডাক্তার মন্ত”

কীর্তনের নানাশ্রকার চণ্ডে রজনীকান্ত গান গাণিয়াছিলেন। আঁখর বাহুল্যে তাঁহার কীর্তন মহাজন পদাবলীর কথা স্মরণ করাইয়া দেয়—(১) এই মোহের পিঞ্জর ভেঙ্গে দিয়ে হে ( গড় খেমটা ) (২) বয়ে যাক্ হরি, শ্রেমেরি বজা ( এই ) শুক হৃদয় মাঝে ( জলদ একতালা ) (৩) আর ধরিস্ নে, মানা করিস্ নে (৪) আজি জীবন-মরণ সন্ধিরে।

‘মনোহর সাঁই’ কীর্তনের গীতিরীতিতে রচিত—(১) যেমনটি তুমি দিয়েছিলে মোরে, (২) আমি পাপনদীকুলে পাপতরুন্মূলে বাঁধিয়াছি পাপবাসা ( জলদ একতালা ), (৩) অহা কত অপরাধ ক'রেছি। আমি তোমারি চরণে (৪) তুমি হৃদয়, তাই তোমারি বিশ্ব হৃদয় শোভায় প্রভৃতি—

আঁখর বর্জিত কীর্তনের মধ্যে ভাঙা হুরে উল্লেখযোগ্য ঝাঁপতালে (১) “নাথ, ধর হাত, চল সাথ, (২) আর শুহ, গণপতি কোলে আর, (৩) বামিনী হইল তোর ( কাওয়ালি ) প্রভৃতি

বাউলের হুরে রজনী সেনের গানগুলির মধ্যে কতকগুলিতে দেহতত্ত্ব এবং বৈরাগ্যের ভাবটি এবং কয়েকটিতে দেশপ্রেম এবং কয়েকটিতে Mystic ভাব প্রকাশ পাইয়াছে। যেমন—

( ১ ) আমার ডেকে ডেকে, ফিরে গেছে মা ( গড় খেমটা ), ( ২ ) তুমি আমার অন্তঃস্থলের খবর জান, ( ৩ ) চাদে চাদে বদলে যাবে, সে রাজার এমন আইন নয় ( আড় খেমটা ), ( ৪ ) আজ যদি সে, নারাজ হ'রে রয়, ( ৫ ) ভাঙ্গা রে জীবন-তরণী ভবের সাগরে ( কাহারবা ), ( ৬ ) আঁকড়ে ধরিস্ যা কিছু, তাই ফসে যায়, ( ৭ ) আছ ত' বেশ মনের সুখে, ( ৮ ) যমের বাড়ী নাই কোনও পাঁজি, ( ৯ ) তুই লোকটা তো ভারি মন্ত, ( ১০ ) তারে ধরবি কেমন করে ?, ( ১১ ) এই দেহটার ভিতর বাহির ছাই।

রামপ্রসাদী ভাব কেবল হুরেই নয়, কান্তকবির বহু গানের বস্তুভেদে প্রকাশিত। যেমন (১) ঝাঁঝিট রাগিণীতে—

পার হলি পঞ্চাশের কোটা। আর দুদিন বাদে মম রে আমার,  
ফুল ঝ'রে যাবে, থাকবে বঁটা।

\*\*\* তোর খাওয়া পরা চের হয়েছে, এগন পারের কড়ি জোটা,  
কান্ত বলে সব ফেলে দিয়ে, তুলে নে' কঞ্চল আর লোটা।

(২) বাউলের হুরে কবি সাধকজন-হুলভ বৈরাগ্যের ভাবটি ফুটাইয়াছেন—

আর কি ভাবিস্ মাঝি বসে ?

এই বাতাসে পাল তুলে দিয়ে হাল ধরে থাক কসে।

\*\*\* মরণ-সিদ্ধি মাঝে গিয়ে পড়'বি রে নিজ কর্দমোবে।

রামপ্রসাদ সেনের সাধক জীবন এবং তাঁহার ভজনের সঙ্গে কবি রজনী সেনের জীবনের এবং সাধনার বেশ মিল আছে! রামপ্রসাদী হুরে তাঁহার গানের মধ্যে উল্লেখযোগ্য—

( ১ ) মা, আমি যেমন তোর মন্ড ছেলে, (২) আমার পাগল করবি কেবে?

যশোহরের ‘মধুকাইন’ বা মধুসূদন কিল্লরের কীর্তনের মুহূরন এবং ধীরগতি একটি বিচিত্র হুরভঙ্গী। ইহার নাম ঢপকীর্তন। রজনী সেনের এই চণ্ডে রচিত গান—

( ১ ) ধন্ত মানি মেনকাকে ( ঠেস্ কাওয়ালি ) ( ২ ) গা তোলা গা তোলা গিরিরাণি। সংস্কৃত ছন্দে উচ্চারণ ভঙ্গীর হৃদ এবং দীর্ঘ স্বর ভেদে গাহিবার নির্দেশ দেওয়া আছে তাঁহার কয়েকটি কীর্তনে—( ১ ) কনকোচ্ছল-জলদ-চুঘি মণি-মন্দির মাঝে রে এবং ( ২ ) দ্বাষিত গিরি-রাজ-নগর কি পুলক-মকরন্দে! জয়দেবের গীতগোবিন্দের ‘স্মরণলখণ্ডনং’ হুরে রচিত একটি গান আছে—

“আজি, শিখিল সব ইন্দ্রিয়, চরণ-কর নিষ্ক্রিয়,

তিমিরময় প্রাণপ্রিয় গেহ;

কে, শান্তি-স্বপ্ন দূর করি’, বজ্র করে কেশ ধরি’,

বেগভরে শূন্যে তোলে দেহ!”

রজনী সেনের দেশ-প্রেম উদ্দীপনার গানও আছে, কিন্তু কবির এমন হৃদ্যগ্য যে, সেই গানগুলিও আজ আর কেহ গাহিতে জানেন না! তাঁহার স্বদেশী গানের মধ্যে—

( ১ ) ভারতকাব্যনিকুঞ্জে,—জাগ হুমঙ্গলময়ি মা! ( ভৈরবী, কাওয়ালি )

( ২ ) সেখা আমি কি গাহিব গান ( গোবী; একতালা )

( ৩ ) জয় জয় জনমভূমি, জননি! ( মিশ্র পরজ, কাওয়ালি )

( ৪ ) আমল-শস্ত্র-ভরা ( ভৈরবী; কাওয়ালি )

( ৫ ) নমো নমো নমো জননি-বজ্র ( হুরটমল্লার )

সংকীর্তনের হুরে ছন্দে ‘হিন্দু-মুসলমান’ মিলন-গীতিটি আজ এই সাম্প্রদায়িক বিরোধের দিনে স্মরণীয়।

আয় ছুটে ভাই, হিন্দু মুসলমান!

ঐ দেখ্ ঝ'রছে মায়ের ছ'নয়ান।

আজ, এক ক'রে দে সন্তা নামাজ

মিশিয়ে দে আজ, বেদ কোরাণ।

( জাতি ধর্ম ভুলে গিয়ে রে, হিংসা বিদ্বেষ ভুলে গিয়ে রে )।

১৩১২ সালে রজনী সেন তাঁহার জন্মভূমি ‘ভাঙ্গাবাড়ী’র ( পাবনা ) নিকট এক গ্রামে শান্ত এবং বৈক্যব সম্প্রদায়ের মধ্যে তীব্র রেষারেষি এবং মনোমালিন্য লক্ষ্য করেন; কবি একটি কীর্তন গান রচনা করিয়া সেইখানে গাহিয়াছিলেন—

ভেদ বুজি ছাড় ‘হুগা’, হরি, দুই তো নয়,

এ কি রে দুই পরিচয়।

শান্ত, দে ভাই ‘হরিধ্বনি’,

বৈক্যব, বল, কালীর জয়।

যেমন, জলকে বলে কেউ বা ‘পানি’,

কেউ বা ‘বারি’, কেউ বা ‘পর’।

ভারতীয় উচ্চাঙ্গ রাগরাগিণী অবলম্বনে রচিত রজনী সেনের গানগুলি হইতে তাঁহার স্বরদক্ষতার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়! তাঁহার বিস্ময়কর রাগপ্রধান গানগুলির মধ্যে কয়েকটির উল্লেখ করিতেছি—

(১) বেহাগ; কাওয়ালি—কবে তুঁতিত এ মরু ছাড়িয়া যাইব তোমারি রসাল নন্দনে। (২) পুরবী; একতারা—তোমার, নয়নের আড়াল হতে চাই আমি, তোমারি ভবনে করি' বাস। (৩) বারোয়ারী-একতারা—তব, শান্তি-অরণ শান্ত করণ কনক কিরণ পরশে। (৪) ঘট; একতারা—নিরুপায়, সব যে যায়, আর কে ফিরায় তোমা ভিন্ন। (৫) হাথীর; কাওয়ালি—(আমি) দেখেছি জীবন ভ'রে চাহিয়া কত (৬) রাজবিজয়, তেওরা—জয় বিশ্বধারিকে! তাপবারিকে!

(৭) কেদারা-মধ্যমান—জাগাও পথিকে, ও সে ঘুমে অচেতন। বেলা যায়, বহু দূরে পাহু-নিশেতন। (৮) গৌরী-চৌতাল—আমার হ'ল না রে সাধন এত আলো বিশ্ব-মাঝে, মুক্ত করে দিলে ঢালি।

রজনী সেনের অপেক্ষাকৃত উচ্চাঙ্গের স্বরের গানের মধ্যে হুপ্রসিদ্ধ (১) পরম প্রেম স্বশ্বর জ্ঞান নয়ন নন্দন—স্বরটমজার, স্বরক'জা (সম্পূর্ণ শ্রেণীর গান, বাদী রে, সম্বাদী গা)। (২) কার কোলে ধরা লভে পরিণতি (গৌরী, একতারা)—বাদী পা, সম্বাদী গা, সম্পূর্ণ শ্রেণী, ব্যবহার—ঝা মা ক্লা দা। (৩) আমি দেখেছি জীবন ভরে চাহিয়া কত (হাথীর কাওয়ালী) সম্পূর্ণ জাতি, বিকৃত ঠাট, ধা বাদী; ব্যবহার মা, ক্লা। নীলকান্ত রায় মহাশয়ের স্বরলিপি অনুসারে এই গানটির স্বররূপ—

II না ধা না ধা | পক্ষা পা গা মা | না ধা না নর' | স' -১ -১ -১ I  
দে পে ছি জী ব. ন ভ রে চা চি যা ক. ত . . .

স' র' সা স' | ধা না পা ধা | ক্ষা পা গা রা | সা -১ -১ -১ II  
আ মা রে যা দা ও সব ই তো মা রি ম ত . . .

পা ধা পা ধনস' | স' স' স' স' নধা | ধা না ধনা স'র' | স' নস' ধনা পা I  
আ কু ল হঃ হ' যে মি ছেঃ চে যে ম. রি. ক ত. কি. যে

সা সা রা রা | গা গা ক্ষা ক্ষা | না না নধপা ধনা | ধনা স' -১ -১ I  
প দ ত লে নি ষ ফ ল যা স নাঃ না. ত. . .

রজনী সেনের সাধন-সঙ্গীতের প্রধান বৈশিষ্ট্য তাঁহার স্বাভাবিকতা! খৃষ্টীয় চার্চের আদর্শে গঠিত ব্রাহ্মসমাজের এসাদে সৃষ্ট ব্রহ্ম সঙ্গীতের ধারায় কৃত্রিম গাভীর্ঘ্যপূর্ণ পরিবেশ হইতে তাঁহার সাধন সঙ্গীত মুক্ত; তাঁহার ভজনগান হৃদয়সুত্বের স্বতন্ত্র প্রকাশ, ব্রহ্ম সঙ্গীতের জায় ফরমাইশি আর্থনা-সঙ্গীত নয়! রামপ্রসাদের পর বহুদিন পরে রজনী সেনের গানে বঙ্গবাসীর হৃদয়কুতি সহজভাবে প্রকাশ করিয়াছে!

এইবার রজনী সেনের হাসির গান সম্বন্ধে দুই একটি আলোচনা করিব! রজনী সেন এই ধারায় ষিঞ্জেললালের অমুগামী! তাঁহার কৌতুকগীতিতে কোথাও সীলতার মাত্রা ছাড়ায় নাই! এইগুলি বিস্ময়কর কৌতুকের নিদর্শন, তবে উচ্ছ্বাস বিশেষ প্রকাশ পায় নাই! তাঁহার কৌতুক গীতির মধ্যে এইগুলি রসোত্তীর্ণ—

(১) যদি, কুমড়োর মত চালে ধরে রত পানুতোরা শত শত  
আর, স'রথের মত হত মিহিদানা, বুঁদিয়া বুটের মত!

(মনোহর সাই কীর্তন)

(২) রাজা অশোকের ক'টা ছিল হাতী (পুরাতত্ত্ববিৎ)

(৩) তিনকড়ি শর্মা—আমি যাহা কিছু বলি—সব বস্তুতা।

(৪) হয় নি কি ধারণা, বুঝিতে পার না (বসন্ত বাহার)

(৫) আঃ, যা কর, বাবা, আস্তে ধীরে (কীর্তন)

(৬) আমি পার হতে চাই, ওরা আমায় দেয় না পারের কড়ি  
(মিশ্র বিভাস)

(৭) তারি সুনাম করেছে নিধিরাম (খাখাজ)

(৮) হরি বল রে মন আমার (মিশ্র খাখাজ)

তবে তাঁহার বহু হাসির গানেই প্রামাণ্য দোষ আছে।

রজনী সেন, গীতাঞ্জলির পরবর্তী যুগের কবি, রবীন্দ্রনাথের mystic সাধনার ধারা সঙ্গীতে তিনিও গ্রহণ করিয়াছিলেন! অনেকের ধারণা তাঁহার এই শ্রেণীর গানে রবীন্দ্রনাথের অপেক্ষা অধিকতর আন্তরিকতা পরিস্ফুট! তাঁহার শ্রেষ্ঠ গান দুইটির মধ্যে গীতাঞ্জলির গানের স্বর পাওয়া যায়।

তোমারি দেওয়া প্রণে, তোমারি দেওয়া দুখ (আলেয়া মিশ্র, তেওরা)

তুমি নির্দল কর, মল্ল কর দেলিম মর্ম সু'রে (তৈরবী, জলদ—একতারা)

রজনীকান্তের গান কালের এবাহে স্থায়ী হইতে পারে নাই, তাহার কারণ বরীন্দ্রনাথের গানের সর্বগ্রামী প্রতিষ্ঠা। দেশের লোক রবীন্দ্রনাথের গানের মধ্যেই রজনীকান্তের সমস্তটুকুকেই পাইয়াছে।

প্রায় এই বিদ্বত কবির কবিত্রিভার স্মৃতিরক্ষার জন্য তিনটি উপায় অবলম্বন করা হইলে ভালো হয়—

(১) তাহার সমগ্র গানের স্বরলিপি করিয়া তাহার সংরক্ষণ।

(২) তাহার অমুরাঙ্গী গায়কগণের দ্বারা তাহার গানের প্রচার।

(৩) তাহার নামে একটি সমিতি স্থাপন করিয়া তাহার হস্তে তাহার গানের সুরভার এবং দায়িত্ব অর্পণ।

তাঁহার শ্রিয় গানের দ্বারাই তাঁহাকে শ্রীমান জানাই।

স্বথের হাট কি ভেঙ্গে নিলে!

মোদের মর্মে মর্মে রইল গাথা, ( এই ) ভাঙ্গা বীণায় কি সুর মিলে।

দুঃখ দৈন্ত্য ভুলে ছিলাম ডুবে আনন্দ-সলিলে;

( ওগো ) দুদিন এসে দীনের বাসে, আধার করে আজ চলিলে।

কান্তকবির একটি গানের স্বরলিপি দিয়া নিবন্ধের উপসংহার করি—

তাঁহার সকল গানের রূপটিই এই শ্রেণীর।

( দিলীপকুমার রায়কৃত স্বরলিপি )

সা ঋ | II সঝা ভ্রমা | মা মা | পমা পমা | ভ্ররা ভ্রা | রা ভ্রা  
তু মি নি ঋ ম ল ক র মং - গ ল

মা ভ্ররভ্রা | সা ঋ | সা সঝা | ভ্রমা মা | ঋভ্রা ঋ | সা -  
ক রে ম লি ন ম ঋ ম মু ছা য়ে -

সঝা সগ্ | II সা ঋসা | পা - | দা পা | পদা মপা | পদগা পগদা  
তু মি ত ব পু - গ্য কি র গ দি য়ে

পা মা | মা - | পা গা | পগা দা | পা মাপ | মঝরা ভ্রা | রভ্রা রভ্রা  
যা ক মো র মো - চ কা লি মা ঘু চা য়ে -

মঝরা ঋসা | সা ঋ | সা সঝা | ভ্রমা ঋমা | রভ্রা ঋ | সা -  
- - ম লি ন ম ঋ ম মু ছা য়ে -

## আবির্ভাব

শ্রীমতী রঞ্জিতা কুণ্ডু এম-এ

মধুর আবেশ সোনার দেশের স্বপ্নে ভরা,

রঙীন হ'ল আজ যে আমার বহুকরা।

প্রাণের মাঝে উঠলো ভেগে কোন সে কবি

রূপে, রসে, রঙে আঁকে কতই ছবি।

যা ছিল সব এতকালের চেনা জানা,

তাদের মাঝে দেখা দিল কোন অজানা।

গোপন আমার হৃদয়পুরে সুর জেগেছে,

মনের পাতে অমুরাগের রঙ লেগেছে।

পথ হারিয়ে এলাম এ কোন অচিন দেশে,

নিখিল জগৎ দেখা যে দেয় নূতন বেশে।

# কীৰ্ত্তনপ্ৰেমী রসময় মিত্ৰ

অধ্যাপক শ্ৰীখগেন্দ্ৰনাথ মিত্ৰ এম্ এ

হিন্দুস্কুলেৰ হেডমাষ্টাৰ ক্ৰূপে রসময় মিত্ৰ যে রকম নাম  
কৰেছিলে, সে রকম নাম অল্পদিনেৰ মধ্যে আৰ কেউ  
কৰতে পাৰেন নি। হেয়াৰ স্কুলে ছিলেন ঈশানচন্দ্ৰ ঘোষ,  
হিন্দুস্কুলে রসময় মিত্ৰ। শিক্ষাজগতে দুই দিকপাল।

রসময় নাকি বাল্যকালে গান গেয়ে তাঁৰ রুপ্ত শিক্ষককে  
শিক্ষা দিৰেছিলে। নিজে শিক্ষক হয়েও তিনি কীৰ্ত্তন  
গানেৰ ভক্ত হয়েছিলে। তাঁৰ কতকগুলি সঙ্গী ছিলে,  
তাঁদেৰ নিয়ে সাধাৰণতঃ তিনি বন্ধুবান্ধবেৰ বাড়ীতে কীৰ্ত্তন  
কৰতেন—সাধাৰণ কীৰ্ত্তনোঁয়াৰই মতো। আকৃতিতে তিনি  
ছিলে বেশ দীৰ্ঘাকার, পাতলা গঠন, দাড়ি গোফ কেশ ছিল  
অবহল-বৰ্দ্ধিত। বেশবিজ্ঞাসে তিনি ছিলে অত্যন্ত সরল।

তিনি যখন দাড়িয়ে কীৰ্ত্তন গাহিতেন এবং শ্রোতাদেৰ  
মুখেৰ কাছে গিয়ে পদাবলীৰ মধুৰ ব্যাখ্যা দিতেন, তখন  
সকলেই মুগ্ধ হতো। এই ছিল তাঁৰ চৰম পুৰস্কাৰ। কীৰ্ত্তন-  
গানেৰ ভক্ত হওঁৱৰ অপৰাধে এই অসাধাৰণ যোগ্য লোক  
কখনও বিশ্ববিজ্ঞালয়েৰ পৰীক্ষক নিযুক্ত হতে পাৰেন নি।  
তিনি সরকারী চাকৰী কৰতেন; ছুট লোকে কৰ্ত্তৃপক্ষেৰ  
নিকট কীৰ্ত্তনগানেৰ জন্ত অভিযোগ কৰতেও ক্ৰটি কৰেনি।

আমি যখন প্ৰেছিডেন্সী কলেজে বদলী হয়ে এলাম,  
(১৯০৬সালে) তখন রসময়বাবু হিন্দু স্কুলেৰ হেড মাষ্টাৰ।  
তাঁৰ কীৰ্ত্তনেৰ খ্যাতি আমি পূৰ্বেই শুনেছিলাম। গেলাম  
তাঁৰ সঙ্গে একদিন দেখা কৰতে হিন্দু স্কুলে—তাঁৰ আগে  
তাকে কখনও দেখি নি। জলখাবাৰ ঘৰে তিনি উবু  
হয়ে বসে তামাক খাছিলে। আমি অল্পমানে তাঁকেই  
নমস্কাৰ কৰলাম এবং আমাৰ পৰিচয় দিলাম। তিনি বললে  
‘কি চান?’

‘আপনি খুব ভাল কীৰ্ত্তন কৰেন, শুনে আমি এসেছি।  
যখন আপনাৰ কোথাও গান হবে, তখন যদি আমায় একটু  
খবৰ দেন দয়া কৰে’—

‘ও, আপনি আমাৰ পাগলামিৰ কথা শুনেছেন।  
আচ্ছা; আচ্ছা—’ বলেই নমস্কাৰ কৰলেন। কাজেই  
আমাৰ পক্ষে বিদায় নেওয়া ছাড়া উপায় রইল না।

খবৰ মিলল না। আবার গেলাম তাঁৰ কাছে।  
এবাৰও সংক্ষেপে ‘আচ্ছা, আমাৰ মনে আছে’—বলে  
আমাকে বিদায় দিলেন।

এরও সাত আট মাস পরে আমি আবার গেলাম  
হিন্দুস্কুলে। সেদিনও তিনি জলখাবাৰ ঘৰে বসে তামাক  
খাছিলে। সেদিনও তিনি আমায় সংক্ষেপে বিদায়  
কৰবাৰ চেষ্টায় ছিলেন। কিন্তু তিনি নমস্কাৰ কৰবাৰ  
পূৰ্বেই আমি সাহস সঞ্চয় কৰে বলে ফেললাম—

‘আমায় খবৰ দিলেন না; কিন্তু আমি আপনাৰ সঙ্গে  
থাকলে আপনাৰ গানেৰ কোনও ক্ষতি হতো না—’

‘কেন? আপনি কি গান জানেন?’

আমি জোৰেৰ সঙ্গে বললাম, ‘আজ্ঞে হ্যাঁ।’

তখন আমাৰ বয়স অল্প। গলা আছে। কিন্তু সেজন্তে  
‘হ্যাঁ’ ব’লিনি। একটা অধিকাৰ আমাকে আদায় কৰতে  
হবে; কাজেই সেখানে লজ্জা কৰলে চলে না। তা  
নইলে ও রকম বাচালতা কৰা যে অশোভন, সে কথা  
আমাৰ যে জানা ছিল না তা নয়।

রসময়বাবু তখনই বললেন—

‘বেশ, আগামী রবিবাৰ দীনবন্ধু মিত্ৰেৰ বাড়ীতে ‘কুঞ্জ  
ভঙ্গ’ গান হবে—খুব ভোৰে আসতে পাৰবেন? আপনি  
ভোৰে ওঠেন ত?’

আমি বললাম ‘খুব ভোৰে উঠি নে। তবে চেষ্টা কৰলে  
উঠতে পাৰবো নিশ্চয়।’

খুব ভোৰেই মদন মিত্ৰ (এখন দীনবন্ধু) লেনে গেলাম,  
কিন্তু তাৰ পূৰ্বেই গান আৰম্ভ হয়ে গেছে। আমাকে  
ডেকে নিয়ে রসময় তাঁৰ পাশেই বসালেন। কিন্তু আমি  
আমাৰ কথা রাখতে পাৰলাম না—তাঁৰ গানে স্তব্ব দিতে  
অপারগ হলাম। তাৰ কাৰণ, মনোহরসাহী কীৰ্ত্তনেৰ  
টেকনিক তখন আমাৰ কিছুই জানা ছিল না। তাৰপৰ  
অভ্যাস না থাকলে একজনেৰ সঙ্গে আৰ একজন কীৰ্ত্তন  
গানে দোয়াৰকি দিতে পাৰে না। গান ধৰতে না-ই পাৰি,  
আনন্দ পেলাম প্রচুৰ। রসময়বাবুৰ কৰ্ত্ত যে খুব মধুৰ

ছিল, তা বলা যায় না। অন্ততঃ আমি যে সময়ে তাঁর গান শুনেছি, তখন তাঁর স্বাভাবিক কণ্ঠস্বর বিশেষ মিষ্ট ছিল না। বাল্যকালে তাঁর কণ্ঠ সম্ভবতঃ মধুর ছিল।

এই প্রসঙ্গে মনে পড়ছে, তাঁর রোগ-ভোগের কথা। সেবার কলকাতায় ব্যাপক ভাবে ইনফ্লুয়েঞ্জা হয়—বোধ হয় ১৯১৯ সালে—রসময়বাবু ডবল নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হন। জীবনের আশা ছিল না। শুনেছি আসন্ন মৃত্যুর সঙ্গে দিনের পর দিন সংগ্রাম করতে দেখে ডাঃ ব্রাউন আশ্চর্যবিস্মিত হয়ে গিয়েছিলেন। চিকিৎসা করছিলেন বোধহয় ডাঃ নলিনীরঞ্জন সেনগুপ্ত। ব্রাউন সাহেব বিস্মিত হয়ে তাঁকে বললেন—

‘এই ডবল নিউমোনিয়া রোগীর ফুসফুস এতদিন কি করে’ টিকে আছে, তাই ভাবছি’—

ডাঃ সেনগুপ্ত বলেছিলেন, ‘বোধ হয় কীর্তন করেন বলে’ তাঁর ফুসফুস এই চাপ সহ্য করতে পারছে...’

তারপর তিনি ব্রাউন সাহেবকে বুঝিয়ে দিলেন যে, কীর্তন করতে হলে দুতিন ঘণ্টা ধরে উচ্চকণ্ঠে চেঁচাতে হয়।

ব্রাউন সাহেব সব শুনে’ বললেন—‘That has saved him’ এতেই উনি বেঁচে গেলেন।’

যাহোক, রসময়ের শক্তি ছিল অসাধারণ। ঘণ্টার পর ঘণ্টা তিনি গান করে’ যেতেন, সময় কোন দিক দিয়ে চলে যেতো কেউ তার খোঁজ রাখতো না।

রসময়বাবু মহাজন-পদাবলী গান করতেন। এই সকল পদ অনেক সময়ে ব্রজবুলি ভাষায় রচিত। গায়ক যদি সেগুলি গানের মুখে ব্যাখ্যা করে’ না দেন, তা হলে অনেকের পক্ষেই অর্থ গ্রহণ করা কঠিন হয়। রসময় আখরের সাহায্যে পদের ব্যাখ্যা করতেন। এরূপ কবিত্বপূর্ণ ভাবাভুগত ব্যাখ্যা আমি আর কারও কাছে শুনিনি। এর কারণ, তাঁর বৈষ্ণব-শাস্ত্রে প্রচুর অভিজ্ঞতা ও অসাধারণ রসজ্ঞতা। তাঁর গান শুনে আমার মনে হয়েছিল যে শুধু গান শিক্ষা করলেই কীর্তন-গায়ক হওয়া যায় না। বিজ্ঞা থাকলেও হয় না। প্রচুর অধ্যয়ন ও সেই সঙ্গে ভগবৎকৃপা চাই। পূর্বে ধারা কীর্তন গান করতেন, তাঁদের মধ্যে এই দুটি গুণের ধারা অধিকারী ছিলেন, তাঁরাই বথার্থ অধিকারী বলে’ গণ্য হতেন। পণ্ডিত

অদ্বিতীয় কীর্তন-গায়ক বলে পরিগণিত হয়েছিলেন, অপরদিকে তিনি টোলে অধ্যাপকতা করতেন। অবধূত বন্দ্যোপাধ্যায়েরও পাণ্ডিত্য ছিল অসাধারণ। বঙ্গদেশের কীর্তন-গায়কদের মধ্যে একদিন তিনি শীর্ষস্থান অধিকার করেছিলেন।

রসময় বছবার আমার বাড়ীতে কীর্তন করেছেন। কক্ষটি প্রশস্ত ছিল—এত ভীড় হতো যে তিলধারণের জায়গা থাকতো না। ঘোড়াসাঁকোর বিজয় সিংহ, সার দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারী, নাটোরের মহারাজ জগদিস্রনাথ প্রভৃতি গান শুনে আসতেন। গানের মাঝে বখন রসময় আখরের পর আখর যোজনা করে’ রসস্থিতি করতেন, তখন এই সকল খ্যাতিনামা ব্যক্তি ভাবে গদগদ হয়ে তাঁর পায়ের ধূলা নিতেন।

একবার এই রকম গান হচ্ছে আমার বাড়ীতে। ঘরে লোক ধরে না, সিঁড়ির উপরে নিজ নিজ উড়ানী বিছিয়ে বহু ভদ্রলোক বসে’ গান শুনেছেন—সেখান থেকে রসময়বাবুকেও দেখা যায় না, গানের আসরও দৃষ্টিগোচর হয় না। ভক্তেরা নিবিষ্ট মনে গান শুনেছেন। এমন সময় আমার বন্ধু যামিনী কবিরাজ সিঁড়ি দিয়ে কোনও মতে উঠে’ এসে আমাদের ডাকলেন। তখন আমি রসময়বাবুর পাশে বসে’ দোয়াকি করছি। বন্ধুর ডাকে আমাদের উঠে’ যেতে হলো। যামিনী এত ভীড়ে ‘হলে’ প্রবেশ করতে রাজি হলেন না; আমি ফিরে এসে আবার গানে যোগদান করছি, এমন সময় রসময় হুঁহাতে আমার মাথা নিয়ে সজোরে মর্দন করলেন। দর্শকেরা আমার প্রতি এরূপ দণ্ডদান দেখে চমকিত হলেন। আমি বুঝলাম রসভঙ্গ করা আমার উচিত হয় নি—আমার না-উঠাই উচিত ছিল।

রসময়বাবুর সরলতা ও অমায়িক ব্যবহার আমাদের মুগ্ধ করেছিল। আমি তাঁর কাছ থেকে অনেক কিছুই শিখেছিলাম। প্রধানতঃ তাঁরই গানে আকৃষ্ট হয়ে’ আমি কীর্তন শিখতে প্রবৃত্ত হই। রসময় গান করতেন মনোহর-সাহী কীর্তন—আমি শিখতে চেষ্টা করলাম গরাগহাটী। শেষে বখন শরীরের গতিকে রসময়বাবু গান করতে বিরত হলেন, তখন তিনি প্রায়ই আমার গানে আসতেন এবং আগাগোড়া বসে’ শুনতেন।

আমি আজগৌরব বোধ করি। আমি যে তাঁর আশীর্বাদ লাভ করতে পেরেছিলাম, এ আমার জীবনের এক মূল্যবান সঞ্চয়। একটি ঘটনা থেকে তাঁর প্রীতির প্রকৃষ্ট পরিচয় পেয়েছিলাম। রাণী ভবানী স্কুলের পারি-তোষিক-সভা—ইউনিভার্সিটি ইনষ্টিটিউটে। আমি ঐ বিজ্ঞানায়ের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ভাবে সংশ্লিষ্ট। আমি সভায় যেতেই দেখি, রসময়বাবু বারান্দায় একটি চেয়ারে বসে আছেন, আমি তখন দর্জিপাড়া থেকে উঠে এসে বালিগঞ্জে বাস করছি। দেখা সাক্ষাৎ খুব কমই হয়।

আমাকে দেখে রসময় বললেন, ‘আপনি আজ এখানে আসবেন, এ আমি নিশ্চয় জানি। তাই আমি এসেছি।’

আমি তাঁর পায়ের ধূলা নিলাম। জিজ্ঞাসা করলাম, ‘শরীর কেমন আছে?’

তিনি বললেন ‘ভালই আছি।’

‘তা হলে একদিন আমার বাড়ীতে গান করুন। কি বলেন?’

রসময়বাবু সম্মত হলেন। বললেন, একটু জল পড়ুক, একটু ঠাণ্ডা হোক—’

মে মাস, সেবার খুব গরম পড়েছিল।

আমরা উভয়ে হলে প্রবেশ করলাম। তারপর তিনি যে কখন চলে গেছেন, আমি তা লক্ষ্য করি নি। বোধ হয় বেশীক্ষণ ছিলেন না। বিকাল পাঁচটায় তাঁর সঙ্গে আমার দেখা—কিন্তু ভোর পাঁচটা না বাজতেই তিনি আর ইহলোকে নেই। রোগ নেই, বস্তু নেই, পরম শান্তিতে তিনি কাউকে কিছু না বলে’ চলে গেছেন অমরলোকে। মনে হলো, সার্থক তাঁর ভজন সাধন, সার্থক তাঁর হরিনাম কীর্তন। পাশের ঘরে তাঁর পুত্র মহীমোহন ছিলেন, তিনি পর্যন্ত জানতে পারেন নি কখন রসময় তাঁর প্রিয়তমের জন্তে অভিসারে গমন করেছেন। সেদিন বার বার আমার এই কথাই মনে হয়েছে যে আমাকে শেষ দেখা দিবার জন্যই তিনি পূর্নদিন সভায় এসেছিলেন।

রসময় তাঁর একখানি আত্মজীবনী লিখেছিলেন, নাম দিয়েছিলেন ‘কুপাবৃষ্টি’। ভগবানের কৃপাই তাঁর জীবনের অবলম্বন ছিল, সেই কথাই তিনি বর্ণনা করেছেন। কিন্তু বিনয়বশতঃ গ্রন্থখানি প্রচার করেন নি। কেবল বন্ধুবান্ধবের হাতে দিয়েই তিনি তৃপ্তিলাভ করেছিলেন।

## শ্রীশ্রীরমণ মহর্ষি

শ্রীনীলিমা মজুমদার

বিগত ১৪ই এপ্রিল বেদান্ত ধর্মের মূর্ত প্রতীক ব্রহ্মজ্ঞ শ্রীশ্রীরমণ মহর্ষি মহাপ্রয়াণ করিয়াছেন। তাঁহার তিরোথানে আমরা একজন জীবন্ত ঈশ্বরজ্ঞা মহাপুরুষকে হারাইলাম।

বঙ্গদেশে জনসাধারণের নিকট তিনি বিশেষভাবে পরিচিত না হইলেও সমগ্র দাক্ষিণাত্য এবং ভারতবর্ষের অসংখ্য প্রদেশে এমন কি হৃদয় ইংলণ্ড, আমেরিকা, ফ্রান্স, হল্যান্ডে শ্রীশ্রীরমণ মহর্ষি সুপরিচিত। গত ১৩৫৪ সনের পৌষ সংখ্যায় ভারতবর্ষ পত্রিকায় লেখিকা কর্তৃক লিখিত তাঁহার সম্বন্ধে একটা প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। একাধিকবার এই তপোজ্ঞান কৌপীনধারী অরণ্যচলের স্বয়ং শান্ত সমাহিত মূর্তি দর্শন করিবার দৌভাগ্য হইয়াছিল,—তাঁহার সান্নিধ্য লাভ করিয়া নিজের জীবন-মন ধ্বংস ও কৃতার্থ করিয়াছি। আজ তাঁহার নব্বয় দেহের অবসানে, ভারাক্রান্ত হৃদয়ে প্রজ্বলিতচিত্তে তাঁহার সম্বন্ধে কিছু বলিতে ইচ্ছা করি।

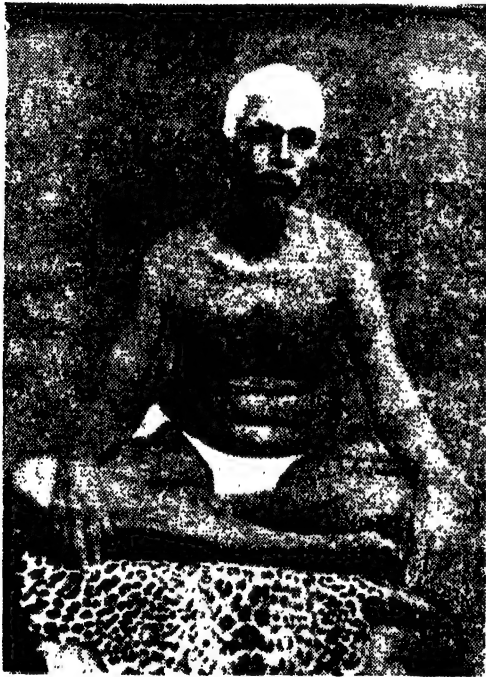
এই আত্মজ্ঞানী মহাপুরুষ ১৮৭৯ খ্রঃ ৩০শে ডিসেম্বর মাদ্রাসার নিকট

এক ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা আইনজীবী ছিলেন। পূর্বাশ্রমে তিনি বেঙ্কটরমণ নামে পরিচিত ছিলেন। শৈশবে তিনি পিতৃহীন হন। গৌরবর্ণ, সদাশাস্ত্রময় স্ত্রীমুখশ্রী এবং উদারতা ও নির্ভীকতার জন্য তিনি সকলেরই প্রিয় ছিলেন। অতি শৈশবকাল হইতেই তাঁহার মধ্যে ধর্মপ্রবণতা দেখা যায়। গৃহত্যাগ করার পূর্বে একদিন তিনি অলৌকিক ভাবে নিজস্ব সম্বা উপলব্ধি করেন। সপ্তদশ বৎসর বয়সে স্কুলে প্রথম শ্রেণীতে পাঠ্যবহুয় আধ্যাত্মিক প্রেরণায় তিনি গৃহত্যাগ করেন। ঐশিক তীর্থস্থান তিরুবরমলাই সহরের অবস্থিত জ্যোতির্লিঙ্গ অরণ্যচলের মূর্তির সম্মুখে প্রথমে ধ্যানস্থ হন। লোকালয়ে ধ্যান ধারণার বিষয় ঘটে বলিয়া পরে অরণ্যচল পর্বতে চলিয়া যান। তথায় পর্বত গুহার আশ্রয়গোপন করিয়া হৃদয়ের তপস্বীভাব প্রতী হন। মহর্ষির আত্মসাক্ষ্যকারের সন্ধান প্রথমে বাঁহারা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, শ্রীনিবাককাশ্যম পিঠে মহাপ্রয়াণ তাঁহাদের অন্ততম। পরবর্তী জীবনে তিনি তাঁহার জন্ম ভ্রমণ কর্তৃক নির্মিত অরণ্যচল



আশ্রমে বাস করিতেন। একদিনের জন্তও এই আশ্রম পরিত্যাগ করিয়া অস্ত্র কোথাও গমন করেন নাই। এই আশ্রমটি “শ্রীরমণাশ্রম” বলিয়া পরিচিত।

অষ্টমতাব্দী বৈদ্যাস্তিক হইলেও মহর্ষির মধ্যে জ্ঞান ও ভক্তিমার্গের কোন পার্থক্য ছিল না। তাঁহার ধর্মমত সহজ ও সরল। “আমি কে” এই আত্মানুসন্ধান হইতেই আত্মাপলক্তি হয়—ইহাই এক কথায় মহর্ষির তত্ত্বোপদেশ। যাঁহার যে ধর্ম যে মত তাহাতেই দৃঢ় বিশ্বাস রাখিয়া আত্মানুসন্ধান করিতে তিনি বলিতেন। কোন গুরু তাঁহার জীবনমুক্তি লাভে আবশ্যক হয় নাই। বতঃই তাঁহার মন তরঙ্গশূন্য হইয়া সচ্চিদানন্দ পরব্রহ্মে পর্যাবসিত হইয়াছিল। দীক্ষা বা মৌখিক কোন উপদেশ তিনি কাহাকেও দেন নাই, তবে কাহারও কোন জিজ্ঞাসা



শ্রীশ্রীরমণ মহর্ষি

থাকিলে যথাযথ উত্তর প্রদান করিতেন। তাঁহার কেহ মন্ত্রশিষ্য নাই—সকলেই তাঁহার ভক্ত মাত্র। দেশদেশান্তর হইতে আগত হিন্দু মুসলমান, পার্শী, জৈন, বৌদ্ধ, খৃষ্টান-ইংরেজ, আমেরিকান, বাঙ্গালী, মাদ্রাজী, গুজরাটী, মারাঠী জাতিধর্ম নির্বিশেষে, ধনী দরিদ্র নির্বিশেষে ধ্যান-নিবিষ্ট চিত্তে প্রত্যহ তাঁহার সরস্বত লাভ করিতেন। চতুর্দিকে বিরাজমান গভীর নিশ্চলতার মাঝে কখনও কখনও আত্মসমাহিত অবস্থা হইতে জাগরিত হইয়া সকলের প্রতি করুণ দৃষ্টিপাত করিতেন। দেবদুর্লভ মধুর হাসি হাসিয়া মাঝে মাঝে দু'একটি কথাবার্তাও বলিতেন। তাঁহার স করুণ দৃষ্টিপাতে মধুর হাসিতে প্রাণে অনির্বচনীয় শান্তি আসিত। তাঁহার কৃপাশ্রয় ভক্তগণ তাঁহাকে “ভগবান” বলিয়া সম্বোধন করিতেন।

মহর্ষি সকল সংস্কারের অতীত ছিলেন। তিনি জাতি বিচার করেন

নাই, সম্প্রদায় ও স্বীকার করেন নাই। জাতিধর্ম নির্বিশেষে, ধনী দরিদ্র নির্বিশেষে সকলের সহিত তিনি একত্রে প্রত্যহ আহারে বসিতেন। সকলের আহার শেষ হইলে, সবাই উঠিয়া গেলে আসন পরিত্যাগ করিতেন। নিজস্ব কোন সময় তাঁহার ছিল না। সকল সময়ই ভক্তদের সহিত অতিবাহিত করিতেন। প্রত্যহ থবরের কাগজ পড়িতেন, চিঠিপত্র সম্বন্ধে নির্দেশ দিতেন। এই বৃদ্ধ বয়সে দৈনন্দিন নিয়মের কোনও ব্যতিক্রম ছিল না। অহিংসা তাঁহার জীবনের ব্রত ছিল। জীবজন্তুর প্রতি তাঁহার এত মমতা ছিল যে ময়ূর কাঠবেড়ালি খরগোষ প্রভৃতিকে নিজের হস্তে খাবার দিতেন। জীবজন্তুরাও মহর্ষির হাত হইতে খাবার গ্রহণ করিতে স্বিধাবোধ করিত না। কখনও কখনও দেখিয়াছি, তাহার নির্ভীকচিত্তে মহর্ষির গায়ে বিচরণ করিত।

গীতায় ভগবান ঈশ্বরের বর্ণিত জীবমুক্ত মহাপুরুষের—“জিতান্ধানঃ প্রশান্তস্ত পরমাত্মা সমাহিতঃ। শীতোষ্ণঃ স্থপ দ্রুপেনু তথা মানাপমানায়ঃ ॥ জ্ঞানবিজ্ঞানতৃপ্তাত্মা কূটস্থো বিজিতেন্দ্রিয়ঃ। যুক্ত ইচ্ছাচাতে যোগী সমলোষ্ট্রশ্চকাকনঃ ॥” অবস্থা যে বর্ণে বর্ণে সত্য, মহর্ষিকে দেখিবার সুযোগ যাঁহাদের হইয়াছে তাঁহারা তাহা স্বীকার করিবেন। রাজা-মহারাজা ধনী দরিদ্র যেরূপ মুচি চণ্ডাল ত্রাক্ষণ সকলকেই মহর্ষি সমভাবে গ্রহণ করিতেন। তাঁহার প্রাণ ও পাশ্চাত্য ভক্তগণ—যাঁহারা সর্বস্ব ত্যাগ করিয়া বহুবাব্যাপী আশ্রমে বাস করিয়া তাঁহার প্রদর্শিত পথে সাধন করিতেন,—আর আমরা যাঁহারা মাঝে মাঝে তাঁহাকে দর্শন করিতে গিয়াছি, তাঁহার নিকট আমরা সবাই সমতুল্য ব্যবহার পাইতাম। তাঁহার আশ্রমের দ্বার সর্বসাধারণের জন্ত দিবারাত্র উন্মুক্ত। যে কেহ যে কোন সময়ে উপস্থিত হইলে সাদরে গৃহীত হন। ইংলণ্ডের বিখ্যাত সাংবাদিক ও সাহিত্যিক পল ব্রাটন, বিখ্যাত জার্মান মনঃ-সমীক্ষক ডাঃ জীমাব মিঃ গ্রাউড্রাক, মিঃ ফ্রেডারিক ফ্রেচার, মেজর চ্যাডউইক, মিস মারসটন, মিস ম্যালেট তাঁহার বহু পাশ্চাত্য ভক্তগণের মধ্যে অন্ততম। তাঁহারা সকলেই মহর্ষির বিষয় অবগত হইয়া তাঁহাকে দর্শন করিতে আসিয়াছিলেন, ইহাদের মধ্যে অনেকেই আর আশ্রম ত্যাগ করেন নাই। স্ত্রীর সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণ মহর্ষির জীবিত অবস্থায় সত্যই লিখিয়াছিলেন—“ঈশ্বরময় জীবনের এক জীবন্ত বিগ্রহ মনুসংস্কার মুকুরে দিব্যজীবনের একটি পরিপূর্ণ মূর্তি যে আজ আমাদের মধ্যে বিরাজ করিতেছেন ইহা আমাদের পরম নৌভাগ্য।”

এই সর্বত্যাগী মহাপুরুষ কিছুকাল যাবত রোগে ভুগিতেছিলেন। কিন্তু তাঁহার প্রশান্ত সদাহাস্তময় মুখ দেখিয়া বোঝা যাইত না যে তিনি শারীরিক কষ্ট পাইতেছেন। পূর্বের স্ত্রীর এখনও তিনি ভক্তদের সহিত অতিবাহিত করিতেন। সর্বস্বত্যাগী হইতে যেন করুণা ও জ্যোতি বিস্কুরিত হইত। প্রেমের ঠাকুর বুঝিয়াছিলেন যে আর ধরাধামে থাকিবেন না। বিগত ২৬শ ফেব্রুয়ারী তাঁহার সঙ্গে এই মরজগতে আমার শেষ দেখা। পূর্বদিন আমি ও আমার স্বামী তাঁহাকে দর্শন করিতে গিয়াছিলাম। হাসিমুখে “ভগবান” আমাদের বিদায় দিলেন। যদিও বুঝিয়াছিলাম যে বেশী দিন তিনি আর আমাদের মধ্যে থাকিবেন না, তবে এত শীঘ্র যে তাঁহাকে হারাইব ইহা কল্পনাও করি নাই।

# রাষ্ট্রগঠনে শ্রীকৃষ্ণের জীবনাদর্শ ও ভারতীয় সংস্কৃতি

শ্রীযতীন্দ্রবিমল চৌধুরী

শ্রীকৃষ্ণজন্মদিনী আমাদের জাতীয় ইতিহাসে পুণ্যতম দিবস, কারণ—

“অথ ভাষ্যপদে যাসি কৃষ্ণাষ্টম্যাং কলৌ যুগে ।

অষ্টাবিংশতিমে জাতঃ কৃষ্ণোহসৌ দেবকীপুত্রঃ ।”

মুখ্য শ্রাবণ ও গোপ ভাষ্যপদে কৃষ্ণাষ্টমী তিথিতে অষ্টাবিংশতিতম কলিযুগে জননী দেবকীর কোল উজ্জ্বল করে শ্রীকৃষ্ণ ধরাধামে অবতীর্ণ হয়েছিলেন ।

শ্রীকৃষ্ণ কৃষ্ণাষ্টমীতে জননীর অষ্টম গর্ভে জয়ন্তী যোগে জন্মগ্রহণ করেছিলেন । অষ্ট শক্তি সহ, মানবের অষ্টপাশ ছেদন যিনি করবেন, তাঁর অষ্টমী তিথিই অতিশ্রেষ্ঠ হওয়া স্বাভাবিক । কৃষ্ণাষ্টমী—যেহেতু কৃষ্ণ বর্ণের সহায়তায় তমোগুণবিশিষ্ট দৈত্যদলের পরাভব সম্ভব । পক্ষের মধ্যভাগে অষ্টমী তিথিতে তাঁর জন্ম—এতে তাঁর সমগ্র জীবনের মধ্যস্থতা সূচিত হয় । যিনি জরাসন্ধ, শিশুপাল প্রভৃতির নিহন্তা, তাঁর জয়ন্তীযোগে জন্ম কার্যতঃ সার্থক । শ্রীমদ্ভাগবত বীর মুণামৃত, তিনি মুখ্য শ্রাবণে জন্মগ্রহণ করে জগতের অশেষ কল্যাণ বা ভদ্র সাধন করবেন, সন্দেহ কি ?

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বর্ম, জ্ঞান ও ভক্তির সমন্বয়বাদ প্রচার করেছেন । তাঁর জীবনাদর্শও এই সত্যই প্রতিবিম্বিত হয়েছে চূড়ান্তভাবে । জগতের ইতিহাসে ঈদৃশ চরিত্র কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না ।

শ্রীকৃষ্ণের জীবনের মূল লক্ষ্য ছিল আত্মরিক শক্তির পরাভব সাধন করে ধর্মরাজ্যের প্রতিষ্ঠা । এই কঠোর উদ্দেশ্যসাধন অশেষ শ্রমসাপেক্ষ । উজ্জ্বলই তিনি যেন বাল্যকাল থেকে শারীরিক শক্তির চূড়ান্ত নিদর্শন প্রদর্শন করেছিলেন । অযাশ্রয়, কংসাস্ত্র প্রভৃতির বধই তার প্রমাণ । গোপবালকদের মধ্যে কেহ শারীরিক শক্তিতে তাঁর সমকক্ষ ছিল না ।

যকীর কর্মশক্তি অর্জন ভিন্ন ব্যাপার । এই উভয়বিধ শক্তিতেই শ্রীকৃষ্ণ অতুলনীয় ছিলেন ।

নিষ্কার্য কর্মের উপদেশ তিনি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় দিয়ে গেছেন—তাঁর জীবনাদর্শও তাই প্রতিকলিত হয়েছে । সমুদ্রপ্রমাণ মহাভারতের কোথাও এমন ইঙ্গিত নাই যেখানে তিনি কোনও কর্মফল কামনা করেছেন । সম্পূর্ণ নিষ্কার্য, নির্লিপ্ত ভাবেই হৃদর্শনচক্রধারী ভারতের ভাগ্যচক্র পরিচালনা করে গেছেন ।

মহাভারতের সর্বত্র শ্রীকৃষ্ণের অপূর্ব কর্মসাধনোচিত হুম্মাতিহুম্ম বৃদ্ধি হ্রস্কট । জরাসন্ধের অগণিত সৈন্তসামন্তের কাছে তাঁর ক্ষুদ্র-সংখ্যক যোদ্ধাদের পরাজয় অবশ্যজ্ঞাবী ; তাই তিনি মথুরা থেকে দ্বারকায় চলে যান এবং সেখানে রাজধানী স্থাপন করেন । রাজনীতির দিক থেকে দ্বারকায় রাজধানী স্থাপন তাঁর অশেষ বুদ্ধিবৃত্তির প্রকৃষ্টতম উদাহরণ । রৈবতক পর্বতমালা তাঁর রাজ্যের দুর্গজ্য দুর্গ ছিল এবং

যকীর রাজ্য তিনি এত স্বরক্ষিত করেছিলেন যে এমন কি, কোনও নারীও যদি এ রাজ্য রক্ষণে তৎপর হতেন, তিনিও অক্লেপে এ রাজ্য রক্ষণে সমর্থ হতেন । জরাসন্ধ বধ ও তাঁর জীবনের উদ্দেশ্যসাধনের পক্ষে অন্ততর শ্রেষ্ঠ ঘটনা । কারণ রাজনৈতিক দিক থেকে শ্রীকৃষ্ণের কাছে এটা হুম্মাতি ছিল যে যদি জরাসন্ধের কবল থেকে নিখিল ভারতের ৬৮ সংখ্যক রাজপুত্রকে তিনি মুক্ত করতে পারেন, তা' হ'লে প্রায় সমগ্র ভারতবর্ষ তাঁর মিত্রদল ভুক্ত হবেন এবং ভারতে ধর্মরাজ্য প্রতিষ্ঠা সহজসাধ্য হয়ে উঠবে । তাই তিনি জরাসন্ধ নিধনে বহুপরিকর হয়েছিলেন । মহাযুদ্ধের অবসানে ভীষ্ম মুখে রাজ্যশাসন পদ্ধতির প্রশংসানোজ্ঞাপ শ্রীকৃষ্ণের অন্ততম নির্লিপ্ততার স্ফোতক এবং চরম বুদ্ধিবৃত্তির পরিচায়ক । দেশের শাসনভার প্রদান করলেন তিনি বৃষ্ণিষ্ঠিরের হাতে ; ধর্মরাজ্যের আইনপ্রণয়নের ভার দিলেন তিনি কুরুবৃদ্ধ পিতামহ সর্বজনবন্দ্য ভীষ্মের হাতে । ভীষ্মদেব বার বার বলেছেন যে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ বিজ্ঞান খাতিয়ে মুখ্য অবস্থায় তিনি এ গুরু কার্যভার গ্রহণ করতে যীকৃত নন । কিন্তু খীর যোগিক শক্তিবলে মুমূর্ষ শরশয্যাশায়ী পিতামহকে সজীবিত করে, যকীর বুদ্ধিবৃত্তি অন্তর্নিহিত করে—তিনি এমন দেশশাসন পদ্ধতি প্রশংসা করিয়াছিলেন, যার তুলনা ইহজগতে নাই, কোনও দিন হবেও না । এর বিবৃতিভর আলোচনা আমরা শ্রীকৃষ্ণের জ্ঞানবৈভবপ্রসঙ্গে একটু পরেই করছি ।

কর্ণের হস্তে বাসবদত্ত অস্ত্র ছিল বলে শ্রীকৃষ্ণ কিছুতেই অর্জুনকে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ সময়ে অবতীর্ণ হতে দেননি ; তিনি ঘটোৎকচকেই সাক্ষাৎ সময়ে কর্ণের সম্মুখীন করিয়েছিলেন । ঘটোৎকচবধ শ্রীকৃষ্ণের সম্পূর্ণ হৃনির্দিষ্ট অপরিস্রাভ ব্যাপারমাত্র ছিল, সন্দেহ নাই । অন্তর্দিকে ভগিনী সন্ততার একমাত্র পুত্র অভিমম্বা নিধন, অর্জুনের ভ্রাতার পক্ষে যতই শোকাবহ হোক—ধর্মরাজ্য স্থাপনের পক্ষে এটা অত্যাবশ্যক বোধে তিনি অর্জুনের নিরন্তর অনুরোধ সত্ত্বেও অর্জুনকে যুদ্ধের সময় অভিমম্বার সহায়তায় অগ্রসর হতে দেননি । অন্তর্দিকে উত্তরাভিমম্বা বিনষ্ট হলে পাণ্ডব বংশ লোপ পেয়ে যাবে বলে ব্রহ্মসিরা অস্ত্রের প্রবল প্রকোপ নিরস্ত করেও তিনি ভূমিষ্ঠ পরীক্ষিতের মৃত শরীরে প্রাণসঞ্চার করেছিলেন । মহাভারত পাঠ করলে এটাই নিরন্তর হুম্মাতি হয় যে অর্জুন, ভীষ্ম, বিশেষতঃ বৃষ্ণিষ্ঠির বার বার বহুবীর বিপক্ষে চলছিলেন ; শ্রীকৃষ্ণের উপদেশাধৃত নিঃশেষে পান করে তাঁরা বৃত্ত হয়েছেন, বিজান্ত হন নি ।

দয়াপ্রদর্শন শ্রীকৃষ্ণের কর্মজীবনের মৌলিক নীতি ছিল সন্দেহ নাই, কিন্তু তিনি প্রয়োজনবোধে বজ্রবৎ কঠোর হতেন । খীর শাফুল কংসকে তিনিই নিধন করেছিলেন ; খীর পিতৃবৎহত শিশুপাতককেও

তিনি বধ করেছিলেন। অন্তিম জীবনে—যতই কঠোর হোক স্বীয় বহুবংশ রক্ষা করার চেষ্টা মাত্র তিনি করেন নি। শুধু তাই নয়—তিনি যথেষ্টই অনেককে নিধন করেছিলেন। ধর্মজ্ঞে হুঁরাপারী দুরাচার বান্ধবকে রক্ষা করে ধর্মরাজ্য নষ্ট করার অভিশ্রাব ধর্মরাজ্যসংস্থাপক শ্রীকৃষ্ণ কিছুতেই পোষণ করতে পারেন নি। কলতঃ, তাঁর নিজ বংশই তাঁর অশেষ দুঃখের কারণ ছিল; তাই তিনি এক জায়গার বলেছেন—

“দাত্তমৈবধ্বংসাদেন জগতীনাং করোম্যহং।

দোহং কিতবমাতোব দ্বয়োরাপি মহামতে।

একস্ত জয়শাংসংস্ত্যাপ্যাপরাজয়ম্।”

শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন যে বহুবংশ সম্পর্কে তাঁর অবস্থা অনেকক্ষেত্রে জ্ঞাতখেলোয়াড় পুত্রঘয়ের মাত্রার মত। ছুই পুত্রই মাতাকে খেলার পূর্বে প্রণাম করে যখন আশীর্বাদ প্রার্থনা করে—মা একজনকে বলেন তোমার বিজয় হোক, অস্ত্রকেও বলতে বাধ্য হন—তোমার পরাজয় না হোক—তাঁর অবস্থাও সেই রকম। তাই যিনি বাল্যবয়সে দ্রুপদপবন হয়ে ননী মাখন চুরি করে বানরদের খাওয়াতেন, গোবৎসের আনন্দবর্ণনের জন্ত ইন্দ্রযজ্ঞে বাধা প্রদান করেছিলেন—তিনিই স্বীয়বংশের উচ্ছেদ সময়ে কোনও প্রকার কারুণ্য প্রকাশ করেননি—এই ছিল তাঁর অমুগম জীবনের ধর্ম।

ধর্ম ও কর্মবীর যীশা, তাঁদের জীবনে অহিংসা ও সত্যের সংঘর্ষ সময়ে দেখা যায়। শ্রীকৃষ্ণ তাঁর অপূর্ব সমাধান করেছেন অর্জুনকে উপদেশ দেওয়ার প্রসঙ্গে এবং এই প্রসঙ্গে তিনি কৌশিক স্বির উপাখ্যানের অবতারণা করেছেন। অর্জুনকে সন্মোহন করে তিনি বলেছেন—

“প্রাণিনামবধস্তাত সর্বজ্ঞানানু মতো মম।

অনৃত্যং বা বদেৎচাচং ন তু হিংস্ত্যং কথংন।

এমন কি, সত্যের বিনিময়েও যিনি “অহিংসা পরমো ধর্মঃ” প্রচার করেন, তিনিই অষ্টাদশ অকৌহিলী সৈন্তসামন্ত এবং ভীষ্ম, দ্রোণ প্রভৃতি নরশাদুল দেবোপম চিরপুজ্য বীরশ্রেষ্ঠদের জীবনপাতের কারণ হয়েছিলেন প্রয়োজনবোধে—ইহাই তাঁর জীবনে আমাদের দৃষ্টি থেকে সর্বাপেক্ষা প্রাণিধানযোগ্য বিষয়, সন্দেহ নাই।

শ্রীকৃষ্ণের বুদ্ধিও শক্তি বলে স্বয়ং অর্জুনও কতদূর পরিচালিত হতেন, তা একটা ঘটনা থেকেই সহজে বোধগম্য হবে। বহুবংশ ধ্বংস হওয়ার পরে বলরাম ও শ্রীকৃষ্ণ উভয়েই যখন মরধাম পরিত্যাগ করলেন, অর্জুন কুরুমহিষীদের এবং অন্ত্যস্ত সম্রাট যদুৱমণিবৃন্দকে সঙ্গে নিয়ে হস্তিনাপুরে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন। পথে দহ্মগণ লাঠি নিয়ে তাঁদের আক্রমণ করলে। শ্রীকৃষ্ণবিহীন অর্জুন গাভীর উত্তোলন করতে পার্শ্ব সমর্থ হলেন না। দহ্মারা শ্রীকৃষ্ণের মহিষী রোহিণী, সত্যভামা, হৈমবতী, লাক্ষ্মবতী ব্যতীত অন্ত্যস্ত যদুবংশীর রমণীদের হরণ করে নিয়ে গেল অর্জুনকে পরাস্ত করে। অর্জুন আর এর পরে ধরাধামে অবস্থান করাই মুক্তিযুক্ত মনে করলেন না। শ্রীকৃষ্ণের তিরোধানের পর মহা-

এস্থানই শ্রেষ্ঠ কল্প মনে করে যুধিষ্ঠিরও ভারতভূপরিভ্রমণে প্রবৃত্ত হলেন।

যিনি স্বয়ং শ্রীমদ্ভগবদ্গীতারূপ অমৃততালির মূলপ্রস্রবণ—যা' যুগ-যুগান্তর ধরে কোটি কোটি অকৌহিলী নরনারী সমগ্র বিশ্বে অকাতরে পান করে ধন্ত হচ্ছে—তাঁর জ্ঞান বৈভবের সঞ্চকে আলোচনা সম্ভবপর নয়। শুধু শ্রীমদ্ভাগবদ্গীতা নয়, মহাভারতের অন্তর্গত যে কামগীতা, অমৃগীতা প্রভৃতি আছে, সেগুলিও অসীম অতল জ্ঞানাসুধি; যিনি জ্ঞানধরূপ, তাঁর জ্ঞানের পরিচয় দেওয়ার এচেষ্টামাত্রও বাতুলতা।

তাই এক্ষেত্রে শ্রীমদ্ভগবদ্ভূক্তিশ্রোতাদিত জ্ঞানবৈভব সঞ্চকে কিঞ্চিৎ আলোচনাই প্রাসঙ্গিক বলে মনে করি। শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং বলেছেন—ভীষ্ম-দেব প্রোক্ত রাজধর্মাতি তাঁর ধর্মরাজ্য পরিচালনার নিমিত্ত তাঁর পূর্ব অভিশ্রুত এবং তাঁর প্রদত্ত শক্তিতে প্রোক্ত। অত্যন্ত আশ্চর্যের বিষয় এই যে অতুলনীয় জ্ঞানবৈভব এই রাজধর্ম ও আপদর্শ পূর্বে বা অমুশাসন পূর্বে প্রদর্শিত হয়েছে, পরবর্তী যুগে অধম ভারতবাসী, ভাড়াটিয়া ভারতবাসী তাঁর পর্যালোচনা ও শ্রেয়ঃকল্প মনে করলো না। চাণক্যের পরে ভারতবর্ষ থেকে দণ্ডনীয়, রাজনীতি বহিষ্কৃত হয়ে গেল। যুধিষ্ঠির কর্তৃক রাজ্যপরিচালনার ভীষ্মদেব শ্রীকৃষ্ণের নির্দেশানুসারে যে বিধান দিয়ে গেছেন, তাতে বর্তমান Red Crossর কার্যাবলী, Scorched Earth Policy (রাজধর্মপর্বের ৬৯ অধ্যায় ৩৭-৪১ শ্লোক), Dunkirkর safe retreat policy (উৎপাতাশ্চ নিপাতাশ্চ হুযুক্তং হুপলায়িতম্। শত্রুগাং পালনং জ্ঞানং তথৈব ভরতর্ষভ)। প্রভৃতিও বাদ যায় নি। ধর্মরাজ্য কীদূশ হবে, তৎপ্রসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ জগৎবাসীকে জানিয়েছেন—

রাজা-প্রজার সম্পর্ক পিতাপুত্রের সম্পর্ক। পুত্র যেমন পিতৃগৃহে স্বচ্ছন্দে বিচরণ করে, ধর্মরাজ্যেও তেমনি প্রজাপুঞ্জ মনের স্বথে বিচরণ করবে। ধনদৌলত লুকিয়ে রাখার এচেষ্টা কারো থাকবে না; প্রজা-মাত্রেই স্নায়-অস্ত্রায় বিচারে সমর্থ হবে এবং উদ্ধারা রাষ্ট্রের প্রভূত উপকার সাধন করবে—

“পুত্রা ইব পিতৃগৃহে বিষয়ে যন্ত মানবাঃ।

নির্ভয়া বিচরিস্তিস্তি স রাজা রাজসত্তমঃ।

অগৃহবিভবা যন্ত পৌরা রাষ্ট্রনিবাসিনঃ।

নয়্যাপনয়বেত্তারঃ স রাজা রাজসত্তমঃ।”

রাজধর্ম, ৫৭ অধ্যায়, ৩৬-৩৮

রাষ্ট্রবাসী সকলেই ঘরের দরজা জানালা সব খুলে দিয়ে শুয়ে থাকবেন; কোনও দিক থেকে কিছুই ভয়ের কারণ থাকবে না—

“বিতৃত্য হি যথাকামং গৃহদ্বারানি শেরতে।

মমুস্তা রক্ষিতা রাজা সমস্তাদকুতোভয়াঃ।”

ঐ, ৬৮ অধ্যায়, ৩০ শ্লোক

অন্ত কথা কি—নারীরাও পুরুষবিহীন অবস্থার সর্ববিধ অলঙ্কারে বিভূষিত হয়ে নির্ভয়ে বিচরণ করে বেড়াবেন—তবে তো ধর্মরাজ্য—

“ত্রিশচাপুষ্কবা শার্গং সর্বাঙ্গকারত্ববিভাঃ ।

নির্ভরাঃ প্রতিপত্তন্তে যদি রক্ষন্তি ভূমিপাঃ ॥”

ঐ, ঐ, ৩২

ধর্মরাজ্যে চোর বলে কোনও পদার্থ থাকবে না ; চুরি হলে রাজাকে যে কোনও রকমে চুরির খন মালিকের কাছে ফিরিয়ে দেওয়ার বন্দোবস্ত করতে হবে ; যদি রাজপুত্রেরা খুঁজে ফের করতে অসমর্থ হন—তা’ হ’লে রাজাকে রাজকোষ থেকে তা’ দিতে হ’বে—

প্রত্যাহতুঃশতং স্রাজ্ঞনং চোরৈরুতং যদি ।

তৎ স্বকোশাৎ প্রদেয়ং স্রাদশস্ত্রেনোপজীবতঃ ॥

রাজধর্ম, ৭৫ অধ্যায়, ১০ শ্লোক

Orphanage, Old Age Pension, Widow Pension ব্যতীতও দুঃখীরা দুঃখমোচনার্থ সর্ববিধ উপায় ধর্মরাজ্যে উদ্ভাবনীয়—

“কৃপণানাংবৃদ্ধানাং বিধবানাঞ্চ যোগিতান্ ।

যোগক্ষেমং বৃত্তিক নিত্যমেব প্রকল্পয়েৎ ॥”

শান্তিপর্ব, ৮৬ অধ্যায়, শ্লোক ২৪

রাজ্যে কৃষক মণ্ডলীর শত্রুবীজ যাতে নষ্ট না হয়, তজ্জন্তু কড়া নজর দেয়ার দরকার এবং প্রত্যেক কৃষককে শতকরা এক টাকা হার হুদে ঋণ করতে হবে—

“কচিন্ন ভক্তং বীজজ্ঞ কণকস্তাবসীদতি ।

প্রত্যেকঞ্চ শতং বৃদ্ধা দদাত্যগমুগ্রহন্ ॥

এই ঋণের নামই অমুগ্রহ-ঋণ—বর্তমান জগতের কোনও Co-operative credit systemএর সঙ্গে তুলনীয় নয় । রাষ্ট্র কৃষির জন্ত দেবতার প্রদানের উপরে নির্ভর করবে না—জল জমিয়ে রাখতে হ’বে বড় বড় দীঘিতে—

কচিচ্ছাষ্ট্রে তড়াগানি পূর্ণাণি চ বৃহন্তি চ ।

ভাগশো বিনিবিষ্টানি ন কৃষিদেবমাতৃকা ॥

ধর্মরাজ্যে প্রজাপুঞ্জ রাজ্যে প্রসিদ্ধি হইবে না ; ভ্রমরেরা যে ভাবে গাছ থেকে মধু দোহন করে, তেমনি আমার মধুদোহনের মতই রাষ্ট্র থেকে কর উত্তোলিত হবে—(মধুদোহঃ দুহেজ্যষ্ট্রিং ভ্রমরা ইব পাদপম্—রাজধর্ম, ৮৮, ৪ শ্লোক) ।

ধর্মরাজ্যে শূত্রাশূত্রনির্বিচারে যেই জনসাধারণের উপকার সাধন করতে পারবে, অকুলে কুল দিতে পারবে সেই বরপীয়, মহনীয় হবে—

“অপারে যো ভবেৎ পারমর্শবে যঃ শ্রবো ভবেৎ ।

শূত্রোহপি বা যদি বাস্তঃ স সম্মানমর্ষতি ॥”

ধর্মরাজ্যের স্থাপনিতার লক্ষীভূত মূলনীতি থেকে রাষ্ট্র যখন দূরে সরে গেল, তখন থেকে ধীরে ধীরে দেশ অধঃপাতের শেষ সীমায় উপনীত হলো ; তাই আজ প্রায় দেড় হাজার বৎসর ধরে অখণ্ড ধর্মরাজ্য চরম হুঃখভোগ করতে বাধ্য হল । অপরমের ভাগবত কৃপার আবার ধর্মরাজ্য সংস্থাপিত হয়েছে ; তার আশীর্বাদে ধর্মরাজ্য পরিচালনাও অতি হুঃখাবে নির্বাহিত হউক ; ভাগবত করুণা ধারাসারে জগদ্বাদীর শিরোদেশে বর্ষিত হোক ; তারতজন্যের শ্রিতহাঙ্গে সমগ্র জগৎ প্রোক্ষণ

হয়ে উঠুক । শ্রীকৃষ্ণ তাঁর জগত্বিধিতে উপাসকমণ্ডলীকে এই আশীর্বাদ প্রদান করেন ।

শ্রীকৃষ্ণের ভক্তিবৈভব

শ্রীকৃষ্ণের জীবনানন্দে গীতাপ্রোক্ত ভক্তিবৈভব সম্পূর্ণ প্রতিবিম্বিত । স্বর্গাবসরে তার পর্যালোচনা সম্ভবপর নয় । বেদ-বেদান্তে পরিদৃষ্ট আশ্বারাম, আশ্বরতি, আশ্বকীড়, আশ্বমিথুন, আশ্বানন্দ ভগবান্ স্বরাট । তিনিই সমগ্র ভক্তের অধীশ্বর ; তিনি কাকেই বা ভক্তি প্রত্যাগ করবেন ?

উপসংহার

আজকের এই পবিত্রতম শ্রীকৃষ্ণ জগাঠিনী তিথিতে মহাত্মারতের পরিপ্রেক্ষিতে শ্রীকৃষ্ণোদ্ভিষ্ট আর একটি বিষয়ের পর্যালোচনা অবশ্য কর্তব্য মনে করি । সমগ্র ভারতে ভাষার এক স্থাপন নিখিল ভারতের এক হুত্র সারসংক্ষেপের দিক থেকে একান্ত কাম্য, সম্ভব নাই । দেড় সহস্র বৎসর পরে পরিলক্ষ্য নিখিল ভারতের একাহুত্র অচিরে ধ্বংস হয়ে যেতে বাধ্য—যদি ভাষার এক এবং তার মাধ্যমিকতার ভাব ও সাধনার এক সংঘটিত না হয় । ধর্মরাজ্য সংস্থাপক ও পরিচালক শ্রীকৃষ্ণ আমাদের এ বিষয়ে কি ইচ্ছিত দেন, কি উপদেশ দেন ?

এ বিষয়ে একটি প্রশ্নের সমাধান সর্বাগ্রে কর্তব্য । মত্বদেশের মাটী, শ্রীকৃষ্ণের পিতৃশ্রম কুণ্ডী, বর্তমান কাল্পাহারের গাকারী—এইরূপে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের রাজকন্তারা হস্তিনাপুরের রাজপরিবারে কোন্ ভাষায় নিজেদের দৈনন্দিন ভাবধারা প্রত্যেকে প্রত্যেকের কাছে প্রকাশ করতেন ? দৈনন্দিন জীবনযাপনাবসরে কৃত্রিমতা তো সম্ভবপর নয় । তাঁরা কি উপায়ে মনের আনন্দ, মনের দুঃখ একে অস্ত্রের কাছে প্রকাশ করতেন ? কোন্ ভাষার মাধ্যমিকতায় ? মহামুদ্রের জয়ের সহস্র সহস্র বৎসর পূর্বে যখন ফারসী প্রভৃতি ভাষার প্রবর্তন আমাদের দেশে হয়নি, যখন চীন-জুগ-পারস্যীকেরা, যখন শ্রাম, হুমাত্রা ব্যবসায় প্রভৃতির দূর-দূরান্তর স্থিত অঞ্চলবাসীরা রাজসুয়, অশ্বমেধাদি যজ্ঞোপলক্ষে হস্তিনাপুরে সমবেত হয়েছিলেন, তখন তাঁরা কোন ভাষায় নিজেদের ভাবধারা প্রকাশ করেছিলেন ? জ্যোপদী ছিলেন রক্ষণও পরিবেশন বিভাগর Head of the Department—তিনিই বা কোন্ ভাষায় নিখিল ভারতের সকলের মনোরঞ্জন করতেন ? শ্রীকৃষ্ণের ভাষা, দৈবী ভাষাই যে এ ভাষা, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই । পরবর্তী যুগে নারীদের শ্রীমুখে প্রাকৃত ভাষণ শুনে যারা দিগ্ভ্রাস্ত হন, তাঁদের বোদাদি এবং পরবর্তী যুগে ভবভূতির উত্তর রামচরিতের দিকে তাকাতে বলি—যিনি—যে ভবভূতি অকাটা সত্যপ্রিয় ছিলেন এবং সমগ্র জগতে বেদব্যাসের একমাত্র সন্যাসক যিনি, এই স্বকঠোর প্রশ্নের উত্তর প্রদান বিষয়ে সেই মহর্ষি বাস্পীকির সাক্ষ্যও আমরানিষ্ঠ-গ্রহণ করবো । সর্ব-সম্মতিক্রমে বেদব্যাস ও বাস্পীকি প্রশ্নসমসাময়িক ; তাই বাস্পীকির সাক্ষ্যও এই প্রশ্ন সমাধানে অত্যাগতক । দেখুন, হুমুমান যখন অশোক-কাননে রামচন্দ্রের কাছ থেকে সংবাদ নিয়ে সীতার দিকটো উপস্থিত

হন, তখন তিনি (হুম্মান) কি ভাবায় সীতার সঙ্গে কথা বলবেন, এই কথা ভাবছেন। তিনি গভীর চিন্তাবিষ্ট হয়ে পড়লেন এই জন্ত, যদি তিনি সংস্কৃতে কথা বলেন, তা' হলে সীতা হঠাৎ সংস্কৃত ভাবায় উক্তি শুনে তাঁকে রাবণ বলে ভুল করে ভয়প্রাপ্তা হবেন—

“যদি বাচং প্রদাতামি বিজ্ঞাতিরিব সংস্কৃতাম্।

রাবণং সম্ভবানা সা সীতা ভীতা ভবিষ্যতি।”

তা' হলে এটা নিশ্চিত হলো যে রাবণ, ভারতবর্ষের অন্ততম প্রান্তে অবস্থিত বীপের অধীশ্বর রাবণ যে সংস্কৃতে সীতার সঙ্গে কথা বলতেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। হুম্মান যে অনর্গল সংস্কৃতে কথা বলতেন বহুকালব্যাপী এবং কোনও অপভ্রংশ করতেন না, স্বয়ং রামচন্দ্র তার সাক্ষ্য দিচ্ছেন ( “ন কিঞ্চিদপশ্যদিতম্” )। তা হলে উত্তর ভারতের রাজপুত্র রামচন্দ্র—লক্ষ্মণ যখন কিঞ্চিদ্যায় গেলেন, সেখানেও সংস্কৃতে কথাবার্তা হচ্ছে; যখন রাজপুত্রী সীতা অশোককাননে লঙ্কাধীপে গেলেন, সেখানেও কথা হচ্ছে সংস্কৃতে। সেই হিসাবে সেই একই যুগে যখন নিখিল ভারতের রাজপুত্রেরা, রাজকন্যারা একত্রে হস্তিনাপুরে একত্র হয়েছিলেন, বা হস্তিনাপুরে নিখিল ভারতের রাজপুত্রীরা একত্রে দৈনন্দিন জীবনযাপন করছিলেন, তারা যে সংস্কৃতেই কথনোপকথন করতেন, সে বিষয়ে সন্দেহ কি?

কেও কেও বলবেন—সহস্র সহস্র বৎসর পূর্বে যা' সম্ভবপর ছিল, আজ তা' কি করে সম্ভবপর? ধর্মরাজ্য ধর্মরাজ্য; “জগদীদৃক্ ন তু অনীদৃক্”—স্বয়ং কুমারিল ভট্ট বলেছেন। ভাবার ঐক্য ভারতবর্ষে একমাত্র সংস্কৃতির মাধ্যমিকতাতেই সম্ভবপর। এখনও পর্যন্ত লিপিকাগ্ৰিষ্ঠ বিবর্জিত হলে নিখিল ভারতের সব ভাষা আমরা যে বুঝতে

পারি, তা' কেবল সংস্কৃতির দৌলতে। এ দিবালোকের মত স্পষ্টকট সত্য যারা বুঝতে চায় না, তারা নিভান্ত ঋষিপর, হীন ও নীচ। সংস্কৃত-বাংলা, সংস্কৃত-হিন্দী, সংস্কৃত-মারাঠী, সংস্কৃত-গুজরাতি, সংস্কৃত-তেলেগু, সংস্কৃত-কন্নড়ী, সংস্কৃত-আসামী, সংস্কৃত-উড়িয়া, সংস্কৃত-নেপালী প্রভৃতির বস্তুগত্যা পরিণতি যে একমাত্র সংস্কৃত—সাগরে সম্মেলন—এই প্রকৃষ্ট সত্য। যে দেশবাসীর বোধগম্য হচ্ছে না, তার একমাত্র কারণ—শ্রীকৃষ্ণের ধর্মরাজ্য এখনও দেশে স্পষ্টীকৃত হয়নি; দীর্ঘকালের জড়তা এখনও দেশকে আচ্ছন্ন করে আছে।

আমাদের বর্তমান ইংরাজী শিক্ষিত সমাজে একটা ধারণা আছে লোকায়ত্ত শাসন এবং তৎসংক্রান্ত আইনকানুন ভারতবর্ষে পাশ্চাত্যের দানমাত্র। যে দেশের আদর্শ হচ্ছে—প্রত্যেক বাড়ীতে রান্নার ধোঁয়া না উঠলে শাসনকর্তা নিজে অগ্নগ্রহণ করবেন না; যে রাজ্যের আদর্শ হচ্ছে মধ্যরাত্রিতে সর্বালঙ্কারভূষিতা সুলারী নারী বিনা পুরুষে নগরপথে নির্ভয়ে বিচরণ করে বেড়াতে পারবেন—ফলতঃ, সে রাজ্যের শাসক সর্বতোভাবে প্রজাপুঞ্জের দাস ও সেবক—সে দেশেই যে Kingdom of Heaven on Earth চিরবিরাজমান, বর্তমান ভারতবাসী সে সহজ সত্য ভুলে গেলে চলবে কেন? মহাভারতের শান্তিপর্ব, অনুশাসনপর্ব প্রভৃতির ২১ পৃষ্ঠাও যারা পড়ে দেখবেন, তাঁরাই দেখতে পাবেন—মহাভারত-অনুশাসিত রাজ্যপালনই প্রকৃত ধর্মমোদিত শাসন—যার তুলনা জগতে নাই, কোনও দিন হয় নি, বর্তমান হিংসার উদ্ভূত পৃথ্বী কল্পনাও যেন ঠিকমত করতে পারে না। পরের কাছে প্রার্থী হওয়ার পূর্বে আমরা যেন আমাদের প্রাচীন অমূল্য নিধিগুলির প্রতি দৃষ্টিপাত করি, স্বাধীন ভারতে ইহাই আমাদের অবশ্য কাম।

## সুন্দরের ধ্যান নেত্র

### শ্রীদেবপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়

অন্ধকারে বন্দী প্রাণ রুদ্ধ কারাগারে  
প্রভাত সূর্যের আলো এস বহির্দ্বারে,—  
মূর্তিকার সুখস্পর্শে প্রথম ক্রন্দন,  
ত্বর্ষার্ত আবেগ বেগে ক্ষুরিল জীবন।  
চতুর্দিক হ'তে আসে প্রাণবায়ু ল'য়ে  
ধ্যানমগ্ন ধূক্‌টির তপোশক্তি ব'য়ে।  
মহাশূন্তে অসীমের পথ চিনে চিনে  
নক্ষত্রের জ্যোতির্লোকে দারুণ হৃদিনে,

মাটির তিমির গর্তে অন্ধকার গিরির গুহায়,  
চলেছে মানব আত্মা মুক্তির স্পৃহায়।  
বৃগ হতে যুগান্তরে প্রজ্ঞার আলোক,  
ফেলেছে সন্ধানী দৃষ্টি বেধা অন্তর্লোকে।  
যুগে যুগে দেবলোকে অন্তর্লোকে মিলে  
তুলেছে তুমুল দ্বন্দ্ব এ মহা নিখিলে।  
দেবতা গড়েছে মাহুষ, মাহুষ দেবতা—  
সুন্দরের চক্ষে নামে ধ্যান-বিহ্বলতা।

অসীমের পথে চলে সীমার সন্ধান  
কোথায় সে জ্যোতির্ময় দেবতা না জানে।



# কালের মন্দির

শ্রী শরাদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

পাছশালা

চিত্রক ও রাজকুমারী রট্টা যখন পাছশালায় উপনীত হইলেন তখন সূর্যাস্ত হইতে আর দণ্ড দুই বাকি আছে।

দুইটি পথের সন্ধিস্থলে পাছশালাটি অবস্থিত। যে পথ চণ্টন দুর্গের সহিত কপোতকূটের সংযোগ স্থাপন করিয়াছে, এই স্থানে সেই পথ হইতে একটি শাখা বাহির হইয়া অগ্নিকোণে আর্ধাবর্তের দিকে চলিয়া গিয়াছে, দ্বিধা-ভিন্ন পথের মধ্যস্থলে প্রস্তর প্রাকারবেষ্টিত এই পাছশালা।

স্থানটি মনোরম। উত্তর ও পূর্বদিকে ঘন পর্বতের শ্রেণী; পশ্চিমদিকে বহুদূর পর্যন্ত উন্মুক্ত উপত্যকা। এই উপত্যকার মধ্য দিয়া একটি উপল-কুটীলা ক্ষুদ্র নদী বহিয়া গিয়াছে; মনে হয় পূর্বদিকের পর্বতকন্দর হইতে নির্গত এক রজতবর্ণ নাগ ঋগতিতে অন্তাচলের পানে কোন নূতন বিবরের সন্ধানে চলিয়াছে।

পাছশালাটি আয়তনে অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র হইলেও দুর্গের আকারে নির্মিত, উচ্চ পাষাণ-প্রাচীর দ্বারা পরিবেষ্টিত। জনালয় হইতে দূরে অরক্ষিত পথপার্শ্বে পাছশালা নির্মাণ করিতে হইলে বেশ দৃঢ় করিয়া নির্মাণ করিতে হয়। একে তো এ অঞ্চলে খণ্ড যুদ্ধাদি লাগিয়াই আছে, তদুপরি উত্তর-পশ্চিমের গিরিসঙ্কট মধ্যে যে সকল বস্ত্র জাতি বাস করে তাহারা বড়ই দুর্দম প্রকৃতি। তাহারা মেঘ পালনের অবকাশ-কালে দল বাঁধিয়া দস্যুতা করে। পথে অরক্ষিত যাত্রিদল পাইলে লুটপাট করে; স্রবোণ পাইলে পাছশালাকেও অব্যাহতি দেয় না। তাই দিবাতাগে পাছশালার লৌহ-কটকযুক্ত দ্বার খোলা থাকিলেও সূর্যাস্তের সঙ্গে উহা বন্ধ হইয়া যায়। তখন আর কাহারও প্রবেশাধিকার থাকে না; চিরাগত যাত্রীরা দ্বারের বাহিরে রাজি যাপন করে।

চিত্রক ও রট্টা পাছশালার তোরণমুখে উপস্থিত হইলে

পাছপাল ছুটিয়া আসিয়া ঘোড়হস্তে অভ্যর্থনা করিল—  
‘আমুন, কুমার ভট্টারিকা, আপনার পদার্পণে আমার স্থান পবিত্র হইল। —দূত মহাশয়, আপনিও স্বাগত। আমি ভাগ্যবান, তাই আজ—’ বলা বাহুল্য, পাছপাল পূর্বেই নকুল প্রমুখাৎ সংবাদ পাইয়াছিল যে ইহার আসিতেছেন।

চিত্রক ও রট্টা অশ্ব হইতে অবরোহণ করিলেন। পাছপাল ব্যস্ত হইয়া ডাকিল—‘ওরে কে আছিস—কক্ক, ডুডুডু—শীঘ্র কাষোজ্ঞ\* দুটিকে মন্দুরায় লইয়া যা, যব—শক্ত শালি-প্রিয়ঙ্গু দিয়া সেবা কর।’—

দুইজন কিস্কর আসিয়া অশ্ব দুটির বল্গা ধরিয়া ভিতরে লইয়া গেল। রট্টা জিজ্ঞাসা করিলেন—‘আমার রক্ষীরা কি চলিয়া গিয়াছে?’

পাছপাল বলিল—‘আজ্ঞা হাঁ। নকুল মহাশয়ের ইচ্ছা ছিল না; কিন্তু কুমার ভট্টারিকার আদেশ অলঙ্ঘনীয়। তাঁহারা দ্বিপ্রহরেই চলিয়া গিয়াছেন।

পাছপাল মধ্যবয়স্ক ব্যক্তি; স্থলকায় কিন্তু নিরেট। বচনবিজ্ঞাসে বেশ পটু। চিত্রক তাহাকে উত্তমরূপে নিরীক্ষণ করিয়া বলিল—‘এখানে দেবভূমিতা রাজিযাপন করিলে ভয়ের কোনও কারণ নাই?’

‘ভয়! আমার পাছশালার দ্বার বন্ধ হইলে সূর্যকিরণও সাধ্য নাই ভিতরে প্রবেশ করে।’ পাছপাল কণ্ঠস্বর হ্রস্ব করিয়া বলিল—‘তবে ভিতরে কয়েকটি পাছ আছে। তাহারা বিদেশী বণিক, পারস্তদেশ হইতে আসিতেছে; মগধে যাইবে—’

‘তাহারা কি বিশ্বাসযোগ্য নয়?’

‘বিশ্বাসের অব্যোধ্য বলিতে পারি না। ইহার বহু বৎসর ধরিয়া এই পথে গভায়াত করিতেছে। মেঘরোমের আন্তর্য্য গাভ্রাবরণ প্রভৃতি লইয়া আর্ধাবর্তের বিভিন্ন প্রান্তে

\* কাষোজ্ঞ অর্থ, শ্রেষ্ঠ অর্থ



বাণিজ্য করিয়া বেড়ায়। তবে উহার অগ্নি-উপাসক, স্নেহ। সাবধানের নাশ নাই।’

‘কিরূপ সাবধানতা অবলম্বন কর্তব্য?’

পাছপাল বলিল—‘ইনি দেবদুহিতা একথা প্রকাশ না করিলেই চলিবে। ইনি আসিতেছেন তাহা আমি ভিন্ন আর কেহ জানেনা।’

চিত্রক দেখিল পাছপাল লোকটি চতুর ও প্রত্যাৎপন্নমতি ; সে বলিল—‘ভাল।—পাছপাল, তোমার নাম কি?’

পাছপাল সবিনয়ে বলিল—‘দেবদ্বিজের কুপায় এ দাসের নাম জয়কঙ্ক। কিন্তু অর্থভাষা সকলের মুখে উচ্চারণ হয় না, কেহ কেহ জঙ্কু বলিয়া ডাকে।’

চিত্রক হাসিয়া বলিল—‘ভাল। জঙ্কু, আমাদের ভিতরে লইয়া চল। আমরা প্রান্ত হইয়াছি।’

জঙ্কু বলিল—‘আম্বন মহাভাগ, আম্বন দেবি—। আপনাদের জন্ত শ্রেষ্ঠ দুটি কক্ষ সজ্জিত করিয়া রাখিয়াছি। এদিকে স্নিগ্ধ অন্নদীপ্ত প্রস্তুত আছে, অন্নমতি হইলেই—’

চিত্রক ও রট্টা প্রাকারের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন। সূর্য তখনও অন্তাচল স্পর্শ করে নাই, কিন্তু জঙ্কুর আদেশে ছইজন দ্বারী দ্বার বন্ধ করিয়া ইন্দ্রকীলক আঁটিয়া দিল। কাল সূর্যোদয় পর্যন্ত আর কেহ প্রবেশ করিতে পারিবে না।

রট্টা পূর্বে কখনও পাছপালা দেখেন নাই, তিনি পরম কৌতূহলের সহিত চারিদিকে দৃষ্টি ফিরাইয়া দেখিতে দেখিতে চলিলেন। প্রাচীর দ্বারা পরিবৃত স্থানটি চতুষ্কোণ ; তিনিই প্রাচীরের গায়ে সারি সারি প্রকোষ্ঠ ; প্রকোষ্ঠগুলির সম্মুখে একটানা অপ্রশস্ত অলিন্দ। মধ্যস্থলে শিলাপট্টাবৃত স্থপরিসর উন্মুক্ত অঙ্গন। অঙ্গনের কেন্দ্রস্থলে চক্রাকৃতি বৃহৎ জলকুণ্ড।

অঙ্গনের এক কোণে কয়েকটি উষ্ট্র ও গর্দভ রহিয়াছে ; তাহারা পারসিক বণিকদের পণ্যবাহক। পারসিকেরা বর্ণকটেই আস্তরণ বিছাইয়া বসিয়া আছে এবং নিজেদের মধ্যে রহস্তালাপ করিতেছে। তাহাদের মুখমণ্ডল অশ্রু-মণ্ডিত ; বর্ণ পক-দাড়িষের স্রাব ; চক্ষু ও কেশ ঘনকৃষ্ণ।

রট্টা যখন চিত্রক ও জঙ্কুর সহিত তাহাদের নিকট দিয়া চলিয়া গেলেন তখন তাহারা একবার চক্ষু তুলিয়া দেখিল, তারপর আবার পরস্পর বাক্যালাপ করিতে লাগিল। ইহারা নিতান্তই নিরীহ বণিক, ছদ্মবেশী

দস্যু তত্ত্ব নয় ; কিন্তু চিত্রকের মন সন্দেহ হইয়া উঠিল। নারী লইয়া পথ চলা যে কিরূপ উদ্বেগজনক কাজ এ অভিজ্ঞতা পূর্বে তাহার ছিল না।

চিত্রক নিম্নস্বরে জঙ্কুকে প্রশ্ন করিল—‘ইহারা কয়জন?’

জঙ্কু বলিল,—‘পাঁচজন।’

‘সঙ্গে অস্ত্রশস্ত্র আছে?’

‘আছে। অস্ত্র না লইয়া এদেশে কেহ পথ চলে না।’

‘তোমার ভৃত্য অহুচর কয়জন?’

‘আমরা পুরুষ আট জন আছি।’

‘দ্বীলোকও আছে নাকি?’

জঙ্কু প্রাঙ্গণের বিপরীত প্রান্তে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিল—‘আমাদের চারিজন অন্তঃপুরিকা আছে।’

চিত্রক অনেকটা আশ্বস্ত হইল।

অঙ্গনের অত্র প্রান্তে চারিজন নারী বসিয়া গৃহকর্ম করিতেছিল। রট্টা সেখানে গিয়া স্নিগ্ধমুখে দাঁড়াইয়া দেখিতে লাগিলেন। চত্বরের কিয়দংশ পরিষ্কৃত করিয়া নারীগণ নৈশ ভোজনের আয়োজন করিতেছে। একজন বর্ষরা ঘুরাইয়া গোধুম চূর্ণ করিতেছে ; নবচূর্ণিত গোধুম হইতে রোটিকা প্রস্তুত হইবে। দ্বিতীয়া শাক বাছিতেছে ; তৃতীয়া প্রস্তর উদ্বললে স্নগন্ধি বেশার \* কুটন করিতেছে ; চতুর্থী মেঘমাংস ছুরিকা দিয়া কাটিয়া কাটিয়া পৃথক করিয়া রাখিতেছে। তাহারা মাঝে মাঝে সঙ্গম কৌতূহল-পূর্ণ চক্ষু তুলিয়া এই পুরুষবেশিনী স্ত্রীকে দেখিল, কিন্তু তাহাদের ক্ষিপ্ত নিপুণ হস্তের কার্য শিথিল হইল না।

রট্টা কিছুক্ষণ ইহাদের মন্থণ কর্মদক্ষতা নিরীক্ষণ করিলেন। তারপর একটি ক্ষুদ্র নিশ্বাস ফেলিয়া জঙ্কুর দিকে ফিরিলেন—‘জঙ্কু, তোমাকে একটি কাজ করিতে হইবে।’

জঙ্কু তৎক্ষণাৎ যুক্তপাণি হইল—‘আজ্ঞা করুন।’

‘কপোতকুটের পথে পর্বতের উপর একটি বৌদ্ধবিহার আছে জান কি?’

‘আজ্ঞা জানি। চিলকুট বিহার।’

‘সেখানে ভিক্ষুদের জন্ত ছই আটক উত্তম গোধুম পাঠাইতে হইবে।’



‘আজ্ঞা পাঠাইব। কলা প্রাতেই গর্দভপৃষ্ঠে গোধুম পাঠাইয়া দিব। ভিক্ষুরা সূর্যাস্তের পূর্বেই পাইবেন।’

‘ভাল। আমি মূল্য দিব।’

\* \* \*

চিত্রক ও রট্টার জন্ত যে দুইটি কক্ষ নির্দিষ্ট হইয়াছিল তাহা আকার ও আয়তনে অত্যন্ত কক্ষের মতই, কিন্তু কক্ষের কুটিমে উষ্ট্ররোমের আন্তরণ বিস্তৃত হইয়াছিল, তদুপরি কোমল শয্যা। কোণে পিস্তলের দীপদণ্ডে বর্তি জলিতেছে। রাজকুমারীর পক্ষে ইহা তুচ্ছ আয়োজন; কিন্তু দেখিয়া রট্টা প্রীত হইলেন।

অন্নদীধু সহযোগে কিছু ক্ষীরের মণ্ড ভক্ষণ করিয়া উভয়ে আপাতত ক্ষুৎপিপাসার নিবৃত্তি করিলেন। রাত্রির আগার বাকি রহিল।

আহারান্তে চিত্রক গাত্রোথান করিয়া রট্টাকে বলিল, —‘আপনি এখন কিয়ৎকাল বিশ্রাম করুন।’ বলিয়া রট্টার কক্ষের দ্বার ভেজাইয়া দিয়া বাহিরে আসিল।

আকাশে তখন নক্ষত্র ফুটিয়াছে; রাত্রি অন্ধকার, এখনও চন্দ্রোদয় হয় নাই। পাছশালার প্রাক্তনের স্থানে স্থানে অগ্নি জলিতেছে। \* ওদিকে পারসিকেরা অঙ্গার কুণ্ড প্রস্তুত করিয়া শূলা মাংস করিতেছে; দধি মাংসের বেশার-মিশ্র স্নগন্ধ ভ্রাণেন্দ্রিয়কে লুপ্ত করিয়া তুলিতেছে।

চিত্রক বলিল—‘হিঙ্গু-পলাণ্ডু-ভোজী য়েচ্ছগুলা রাঁধে ভাল। জম্বুক, রাজে আমাদের ভোজনের কি ব্যবস্থা?’

জম্বুক ভোজ্য বস্তুর দীর্ঘ তালিকা দিল। প্রথমেই মিষ্টান্ন: মধু পিষ্টক লড্ডুক ও ক্ষীর; তারপর শাক ঘৃত-তণ্ডুল মুদগ-সুপ, ময়ূর-ডিম্ব; সর্বশেষে রোটিকা পুরোডাশ ও তিন প্রকার অবদংশ সহ উখ্য মাংস শূলা মাংস ও দধি।

চিত্রক সম্ভ্রষ্ট হইয়া বলিল—‘উত্তম। দেবজুহিতার কষ্ট না হয়।—আর শুন, শূলামাংস আমি রন্ধন করিব।’

জম্বুক চক্ষু বিক্ষারিত করিল, কিন্তু তৎক্ষণাৎ সায দিয়া বলিল—‘বৈরূপ আপনার অভিক্রটি।’

চিত্রক কক্ষের সম্মুখে অঙ্গনের উপর একটা স্থান নির্দেশ করিয়া বলিল—‘এইখানে অঙ্গার চুল্লী রচনা কর।’

জম্বুকের আদেশে ভূত্যা আসিয়া অঙ্গারচুল্লী রচনায প্রবৃত্ত হইল। এই অবকাশে ইতস্তত পানচারণ করিতে

করিতে চিত্রক লক্ষ্য করিল, কক্ষশ্রেণী যেখানে শেষ হইয়াছে সেখানে একটি বংশনির্মিত নিঃশ্রেণি বক্রভাবে ছাদসংলগ্ন হইয়া রহিয়াছে। তাহার মন আবার সন্দ্বিষ্ট হইয়া উঠিল। ছাদে উঠিবার সিঁড়ি কেন? উপরে যদি কেহ লুকাইয়া থাকে? চিত্রক জম্বুককে সিঁড়ি দেখাইয়া বলিল—‘ছাদে কী আছে?’

জম্বুক বলিল—‘শুধু জালানি কাঠ আছে। আর কিছু নাই।’

চিত্রকের সন্দেহ ঘুচিল না; সে স্বচক্ষে দেখিবার জন্ত নিঃশ্রেণি বাহিয়া ছাদে উঠিয়া গেল। জম্বুককে বলিল—‘তুমিও এস।’

ছাদের উপর সত্যি জালানি কাঠ ভিন্ন আর কিছু নাই। চিত্রক নক্ষত্রালোকে ত্রিভুজা ছাদের সর্বত্র পরিভ্রমণ করিয়া নিশ্চিন্ত হইল। ছাদের উপর মন্দ মন্দ শীতল বায়ু বহিতে আরম্ভ করিয়াছিল; চারিদিক শব্দহীন, অন্ধকার; কেবল গিরিনদীর বুকে নক্ষত্র খচিত আকাশের প্রতিবিম্ব পড়িয়াছে।

চিত্রক নামিবার উপক্রম করিতেছে এমন সময় বাহিরের অন্ধকার হইতে এক উৎকট অট্ট-কোলাহল উদ্ভিত হইয়া চিত্রককে চমকিত করিয়া দিল; একদল শূগল নিকটেই কোথাও বসিয়া যাম বোষণ করিতেছে।

তাহাদের সম্মিলিত ক্রোশন ক্রমে শাস্ত হইলে চিত্রক হাসিয়া উঠিল, বলিল—‘এখানে জম্বুকের অভাব নাই দেখিতেছি।’

জম্বুক হাসিল, বলিল—‘পৃথিবীতে জম্বুকের অভাব কোথায়? তবে জম্বুকষু বড় অধিক নাই মহাশয়।’

চিত্রক বলিল—‘সেকথা সত্য। তুমি উত্তম পাছপাল।’

এই সময় পশ্চিম দিগন্তের পানে দৃষ্টি পড়িতে চিত্রক দেখিল, বহুদূরে চক্রবাল রেখার নিকট যেন পাহাড়ে আগুন লাগিয়াছে; আগুন দেখা যাইতেছে না, কেবল তাহার উৎসারিত প্রভা দিগন্তকে রঞ্জিত করিয়াছে।

জম্বুলি নির্দেশ করিয়া চিত্রক জিজ্ঞাসা করিল—‘উহা কি? পাহাড়ের জঙ্গলে কি আগুন লাগিয়াছে?’

জম্বুক বলিল—‘বোধহয় না। কয়েকদিন ধরিয়া দেখিতেছি, একই স্থানে আছে। পাহাড়ের আগুন হইলে দক্ষিণে বামে ব্যাপ্ত হইত।’

‘তবে কী ? ওদিকে কি কোনও নগর আছে ? কিন্তু নগর থাকিলেও রাত্রে এত আলো জলিবে কেন ? ইহা তো দীপোৎসবের সময় নয় ।’

‘ওদিকে নগর নাই । তবে—’

‘তবে ?’

জম্বুক বলিল—‘পাশ্চাত্যের অনেক লোক আসে যায়, অনেক কথা শুনিতে পাই । শুনিয়াছি, হুণ আবার আসিতেছে । যদি কথা সত্য হয়, আবার দেশ লণ্ডভণ্ড হইবে ।’ বলিয়া জম্বুক নিশ্বাস ফেলিল ।

চিত্রক বলিল—‘তোমার কি মনে হয় হুণেরা এখানে ছত্রাবাস ফেলিয়াছে ?’

‘জম্বুক বলিল—‘না, তাহা মনে হয় না । হুণেরা এত কাছে আসিলে লুটপাট করিত, অত্যাচার করিত । কিন্তু এদিকে হুণ দেখি নাই ।’

‘তবে কী হইতে পারে ?’

‘জনশ্রুতি শুনিয়াছি, সম্রাট স্বন্দগুপ্ত সশস্ত্র হুণের গতিরোধ করিতে আসিয়াছেন ।’

চিত্রক বিস্মিত হইয়া বলিল—‘স্বন্দগুপ্ত স্বয়ং ।’

জম্বুক বলিল—‘এইরূপ শুনিয়াছি । সত্য মিথ্যা বলিতে পারি না । কেন, আপনি কিছু জানেন না ?’

চিত্রক চকিতে আশ্বসংবরণ করিয়া বলিল—‘না, আমি কিছু জানি না । যুদ্ধ সম্ভাবনার পূর্বেই আমি পাটলিপুত্র ছাড়িয়াছি ।’

চিত্রক ও জম্বুক নীচে নামিয়া আসিল ।

ভূত্য ইতিমধ্যে অঙ্গার প্রস্তুত করিয়া শূণ্য মাংসের উপকরণাদি আনিয়া রাখিয়াছে । চিত্রক তাহা দেখিয়া প্রথমে গিয়া রট্টার রন্ধ ঘরের সম্মুখে দাঁড়াইল । কাণ পাতিয়া শুনিল কিছু কিন্তু শুনিতে পাইল না । তখন সে ঘর দ্বিগুণ ঠেলিয়া ভিতরে দৃষ্টিপাত করিল । দীপের স্নিগ্ধ আলোকে রট্টা শয্যায় শুইয়া আছেন, একটি বাহু চক্ষুর উপর তুলিয়া বোধহয় নিজাবেশ হইয়াছে । এই নিভৃত দৃশ্য দেখিয়া চিত্রকের মন এক অপূর্ব সন্মোহে পূর্ণ হইয়া উঠিল ; যুগমদ-সৌরভের স্রাব্য মাদক-মধুর রসোচ্ছ্বাসে হৃদকুস্ত কণ্ঠ পর্যন্ত ভরিয়া উঠিল । সে ধীরে ধীরে ঘর বন্ধ করিয়া দিল । মনে মনে বলিল—‘ঘুমাও, রাজকুমারী, ঘুমাও ।’

\* \* \*

চাঁদ উঠিয়াছে । কৃষ্ণ চতুর্থীর চন্দ্র পূর্বাচলের মাথায় উঠিয়া ক্লান্ত হাসি হাসিতেছে । পাশ্চাত্যের অঙ্গন শূন্য, পারসিকেরা নিজ প্রকোষ্ঠে ঘর বন্ধ করিয়াছে । অঙ্গন স্তিমিত জ্যোৎস্নায় পাণ্ডুর ।

চিত্রক রট্টার ঘরে করাঘাত করিয়া ডাকিল—‘দেবি উঠুন উঠুন, আহার প্রস্তুত ।’

ঘর খুলিয়া রট্টা হাসিমুখে সম্মুখে দাঁড়াইলেন, দ্বিগুণ জড়িত কণ্ঠে বলিলেন—‘ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম ।’—

সম্মুখেই অলিন্দে আহারের আসন হইয়াছিল, দুইটি আসন মুখোমুখি ; মধ্যে বহু কটোর এবং স্থালীতে খাদ্য সম্ভার । পাশে দুইটি দীপ জলিতেছে । উভয়ে আহারে বসিলেন ; জম্বুক দাঁড়াইয়া তত্ত্বাবধান করিতে লাগিল ।

আহারের সঙ্গে সঙ্গে দুই চারিটি কথা হইতেছে । জম্বুক মাঝে মাঝে চিত্তবিনোদনের জন্য কৌতুকজনক উপাখ্যান বলিতেছে । রাজকন্ডা হাসিতেছেন ; তাহার মুখে তৃপ্তি, চোখে নিকরবেগ প্রশান্তি । চিত্রক নিজ হৃদয় মধ্যে একটি আন্দোলন অমুভব করিতেছে, যেন সাগর-তরঙ্গে তাহার হৃদয় তুলিতেছে তুলিতেছে, উঠিতেছে নামিতেছে—

রট্টা বলিলেন—‘কাল পিতার দর্শন পাইব ভাবিয়া বড় আনন্দ হইতেছে ।’

চিত্রকের মনের উপর ছায়া পড়িল । রট্টার পিতা... তাহার সহিত চিত্রকের একটা বোঝাপড়া আছে...কিন্তু সে চিন্তা এখন নয়...

চিত্রক বলিল—‘একটা জনরব শুনিলাম ।—পরম-ভট্টারক স্বন্দগুপ্ত নাকি চতুরঙ্গ সেনা লইয়া এদেশে আসিয়াছেন ।’

রট্টা চকিত চক্ষু তুলিলেন—‘স্বন্দগুপ্ত !’

চিত্রক নির্লিপ্তস্বরে বলিল—‘হাঁ । হুণ আবার আসিতেছে, তাই মহারাজ তাহাদের গতিরোধ করিবার জন্য স্বয়ং আসিয়াছেন ।’

রট্টা কিয়ৎকাল নতমুখে রহিলেন, তারপর মুখ তুলিয়া বলিলেন—‘আপনি সম্ভবত প্রভুর সহিত মিলিত হইতে চাহেন ?’

চিত্রক বলিল—‘সে পরের কথা । আগে আপনাকে চটনজুর্গে পৌছাইয়া দিয়া তবে অন্য কাজ ।’

রট্টা তাহার মুখের উপর ছায়া নিবিড় চক্ষুহুটি স্থাপন করিয়া নিদ্রা হাঙ্গিলেন।

আহার সমাপ্ত হইলে রট্টা জম্বুককে বলিলেন—‘তোমার সেবায় আমরা তৃপ্ত হইয়াছি। অন্ন ব্যঞ্জন অতি মুখরোচক হইয়াছে। দেখ, আর্ঘ্য চিত্রক কিছুই ফেলিয়া রাখেন নাই।’

জম্বুক করতল যুক্ত করিয়া সবিনয়ে হস্ত করিল। চিত্রক মূহ হাসিয়া রট্টাকে জিজ্ঞাসা করিল—‘কোন ব্যঞ্জন সর্বাঙ্গেক্ষা মুখরোচক লাগিল?’

রট্টা বলিলেন—‘শূণ্য মাংস। এরূপ সুস্বাদু রন্ধন রাজ-পাচকও পারে না।’

চিত্রক মিটিমিটি হাসিতে লাগিল; রট্টা তাহা দেখিয়া সন্দেহ হইলেন, বলিলেন—‘শূণ্য মাংস কে রাখিয়াছে?’

জম্বুক তর্জনী দেখাইয়া বলিল—‘হিনি!’

অবাক হইয়া কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া রট্টা হাসিয়া উঠিলেন—‘আপনার তো অনেক বিজ্ঞা! এ বিজ্ঞা কোথায় শিখিলেন?’

চিত্রক বলিল—‘আমার সকল বিজ্ঞা যেখানে শিখিয়াছি সেইখানে।’

‘সে কোথায়?’

‘যুদ্ধক্ষেত্রে।’

চিত্রকের মন কল্পনায় স্বন্দগুপ্তের স্বক্কাবারের দিকে উড়িয়া গেল। ঐ যেখানে দিগন্তের কাছে আলোর আভা দেখা গিয়াছিল সেখানে ক্রোশের পর ক্রোশ বজ্র শিবির তালপত্রের ছাউনি পড়িয়াছে; শিবিরের ফাঁকে ফাঁকে সৈনিকেরা আগুন জালিয়াছে; কেহ যবচূর্ণ মাখিয়া দুই হস্তে গুল রোটিকা গড়িতেছে; কেহ ভল্লাগ্রে মাংস গ্রথিত করিয়া আগুনে শূণ্য পক করিতেছে—চীৎকার গান

বাগ্‌যুদ্ধ...নির্ভয় নিকষেগ জীবনধাত্রা...অতীত নাই, ভবিষ্যৎ নাই...আছে কেবল নিরঙ্কুশ বর্তমান।

রট্টা চিত্রকের মুখের উপর চিন্তার ক্রোড়া লক্ষ্য করিতেছিলেন, মূহ হাসিয়া বলিলেন—‘যুদ্ধক্ষেত্রেই শব্দ দেখিতেছেন?’

চিত্রক ঈষৎ চমকিয়া বলিল—‘হাঁ। আপনি কি অন্তর্ধামিনী?’

রট্টা রহস্যময় হাসিলেন। \* \* \*

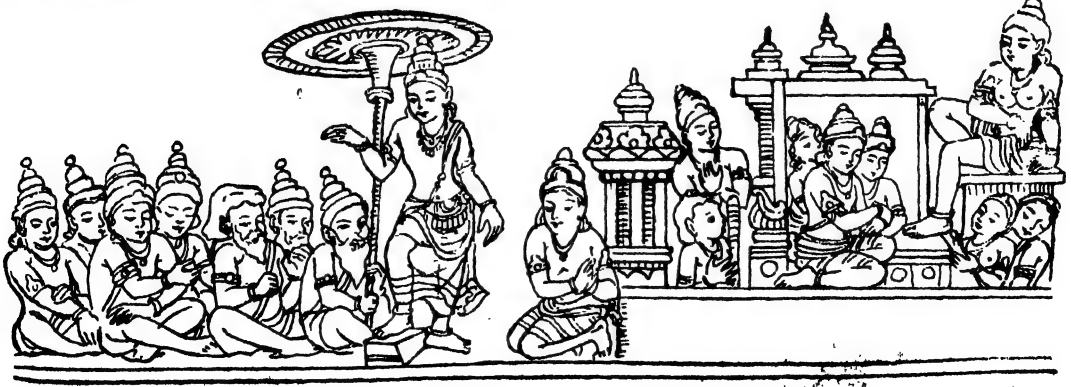
রাত্রি গভীর হইয়াছে। চন্দ্র প্রায় মধ্যাকাশে।

কুমারী রট্টা আপন কক্ষে শয্যাশ্রয়ে ঘুমাইয়া ছিলেন, একটি নিশ্বাস ফেলিয়া জাগিয়া উঠিলেন। ঘরের কোণে দীপ জলিতেছে; অলিয়া অলিয়া শিখাটি ক্রমে ক্ষুদ্র বজ্রলবণ আকার ধারণ করিয়াছে। তাহার বিন্দুপ্রমাণ আলোকে ঘরের বিশেষ কিছু দেখা যাইতেছে না। শয্যায় উঠিয়া বসিয়া রট্টা কিয়ৎকাল ঐ আলোকবিন্দুর পানে চাহিয়া রহিলেন; তারপর উঠিয়া নিঃশব্দে ঘরের অর্গল মোচন করিলেন।

দ্বার ঈষৎ বিভক্ত করিয়া দেখিলেন, তাহার কক্ষের সম্মুখে ঘরের দিকে পিছন করিয়া অলিন্দের একটি শুভে পৃষ্ঠ রাখিয়া চিত্রক বসিয়া আছে। পদদ্বয় প্রসারিত, জাহ্নব উপর যুক্ত তরবারি। তাহার উর্ধ্বোখিত মুখের উপর চাঁদের আলো পড়িয়াছে—চক্ষু স্বপ্নাতুর—

দীর্ঘকাল এক দৃষ্টিতে দেখিয়া রট্টা আবার ধীরে ধীরে দ্বার বন্ধ করিয়া দিলেন; ফিরিয়া আসিয়া অধোমুখে শয্যায় বন্ধ চাপিয়া শয়ন করিলেন। তাহার চক্ষু হইতে বিন্দু বিন্দু অশ্রু ঝরিয়া উপাধান সিক্ত করিয়া দিতে লাগিল।

(ক্রমশঃ)



# আন্দামান-নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ

অধ্যাপক শ্রীমণীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

## আন্দামানে জাপানী-রাজ

গুপ্তচর সন্নেহে জুলফিকার আলির উপর অমানুষিক পীড়ন করিয়া তাহাকে হত্যা করার প্রায় একমাস পরে ইংরাজ আমলের চিফ কমিশনারের সেক্রেটারী মিঃ বার্ডের উপর জাপানীদের সন্নেহ হয়। শ্রীপুঙ্কর বাগচি নামে আন্দামান Public Works Department-এর ইংরাজ আমলের একজন কেরাণী জাপানীদের নিকট নিজেকে সুভাষ বোসের আত্মীয় এইরূপ মিথ্যা পরিচয় দিয়া জাপানীদের সহিত ঘনিষ্ঠতা করিয়া Chief Naval Intelligence Officer-এর পদে উন্নীত হন এবং তিনিই জাপানীদের মনে এইরূপ বিশ্বাস করাইয়া দেন যে, বার্ড সাহেব গুপ্ত বোতার যন্ত্রের সাহায্যে আন্দামানের সংবাদ ইংরাজদের নিকট পৌছাইয়া দিতেছেন। এই মিথ্যা সংবাদে জাপানীরা বার্ডকে একদিন সকালে সেলুলার জেলের পার্শ্বে সমুদ্রের তীরে বিচার করিতে আরম্ভ করে। বার্ড সাহেব জানিতেন যে, জাপানীদের বাহার উপর সন্নেহ হয় তাহার নিকট হইতে অপরাধের স্বীকারোক্তি পাইবার জন্য অমানুষিক অত্যাচার করে এবং শেষ পর্যন্ত হত্যা করে, অতএব তিনি প্রথম হইতেই প্রাণের আশা ছাড়িয়া দিয়া জাপানীদের দেওয়া সমস্ত অভিযোগ স্বীকার করিয়া লন, এবং প্রার্থনা করেন যে, তাহাকে একেবারেই বন্দুকের গুলিতে বধ করা হউক। জাপানীরা কিন্তু তাহা করে নাই, স্বীকারোক্তি পাইয়া তাহার সহিত পূর্বের মতই ব্যবহার করিতে শুরু করে। সেলুলার জেলের পার্শ্বে সমুদ্রতীরে কয়েকজন জাপানী সৈনিক কেবলমাত্র আঙুরওয়ার পরিহিত বার্ডের গলার টুটি চাপিয়া কিছুক্ষণের জন্য তাহার শাসরুদ্ধ করে, তারপর পেটে ও পাঁজরায় বৃষি এবং লাথি দিয়া তাহাকে জখম করিয়া দূরে সরিয়া দাঁড়ায়। বার্ড সাহেব আন্দামানের একজন বিশেষ জনপ্রিয় অফিসার ছিলেন। এখানেও পূর্বের মতই আন্দামানের বহু নারী ও পুরুষ অধিবাসীকে জোর করিয়া ধরিয়া আনিয়া এই বিচার দেখানো হইতেছিল। বার্ড সাহেব প্রথম আঘাত সহ করিয়া মুমূর্ষু অবস্থায় কাঁপিতে কাঁপিতে একটু জল চাহিয়াছিলেন, ইহাতে একজন গ্রীলোক ভিড়ের মধ্য হইতে কিয়দূর যেন এক গ্লাস জল সংগ্রহ করিয়া বার্ডকে দিবার জন্য অগ্রসর হয়। তখন একজন জাপানী সৈনিক সেই জলের গ্লাসটি গ্রীলোকের হাত হইতে লইয়া নিজে বার্ডের নিকট গিয়া গ্লাসটি দেখাইয়া হাতে দিতে বাইবার অভিনয় করিয়া গ্লাসসম্বত জল দূরে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দেয়। বার্ডের মুখ হইতে একটি স্বাভাবিক বাহির হইয়াছিল “Oh, Jesus”। এই ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শীদের

মধ্যে একাধিক ব্যক্তি আমাকে বলিয়াছেন যে, ইহার পর তাহার মুখ দিয়া আর কোন শব্দ বাহির হয় নাই। গায়ে আলপিন ফুটান এবং বেয়নেটের দ্বারা বার্ডের দুইটি চক্ষু উপড়াইয়া দেওয়া হইয়াছিল, কিন্তু তাহাতেও তিনি কোন শব্দ করেন নাই। শেষে তরবারির দ্বারা তাহার মাথা কাটিয়া ফেলিয়া সেইখানে সেই সমুদ্রতীরেই তাহাকে পুতিয়া ফেলা হয়। ইংরাজের দ্বারা আন্দামান পুনর্দখলের পরে সেখানে একটি কবর নির্মাণ করিয়া ক্রুশচিহ্ন দেওয়া হইয়াছে এবং তাহার শ্রুতিরক্ষার জন্য নিকটবর্তী একটি স্থানের নামকরণ করা হইয়াছে “বার্ডস্ লাইন”।

ইহার পরেই জাপানীরা একজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার মিঃ লিগুসে ও তাহার পাঠান বাবুজির উপর সন্নেহ করে। খোলা মাঠে ইহাদের উপর প্রচণ্ডবেগে আঘাত করা হইতে থাকে, কিন্তু ইহার বার্ডের ব্যাপার জানিতেন বলিয়া কিছুতেই কোন অপরাধ স্বীকার করেন নাই। শেষে অর্ধমৃত অবস্থাতেও কোনরূপ স্বীকারোক্তি না পাইয়া জাপানীরা ইহাদের ছাড়িয়া দেয়। জাপানীদের জঙ্গী বিভাগের বিচার বোধ হয় এইরূপেই হইয়া থাকে। সন্নেহ হইলেই সর্বসমক্ষে প্রহার শুরু হইবে, স্বীকার করিলেই মৃত্যু, না করিলে প্রহারে অর্ধমৃত করিয়া ছাড়িয়া দিবে। এই লিগুসে সাহেব আন্দামান পুনর্দখলের পর ইংরাজের চাকুরীতে পুনরায় বহাল হইয়া পরে মাত্রাজে বদলী হন, এবং এখনও পর্যন্ত সেইখানেই আছেন। তাহার পাঠান বাবুজি কিছুদিন পূর্ব পর্যন্ত তাহার নিকটেই ছিল, পরে দেশে চলিয়া গিয়াছে।

আন্দামানের অধিবাসীদের পক্ষে দারুণ ভয়ে ভয়ে এইরূপে ১৯৪২ সাল কাটিয়া যায়। ইত্যবসরে জাপানীরা আন্দামানের সর্বত্র রাঙা আলু জাতীয় ফসলের চাষ শুরু করে, সম্পূর্ণ অজন্মা পাহাড়েও সার দিয়া ক্ষেত বানাইয়া ফেলে। তাহাদের নিয়মানুবর্তিতা, কর্মশক্তি ও উদ্ভাবনী বুদ্ধিতে এক বছরেই পোর্টব্লয়ের বেশ কিছু উন্নতি হয়। এ বিষয়ে এখানকার লোকেরা সকলেই উহাদের স্তুতিয়িত করে। তবে এক বিষয়ে উহারা নাকি ভয়ানক ছোটলোক। শুনিলাম, উহাদের উচ্চতম অফিসার অব্যবহিত নিম্নের পদস্থ অফিসারকেও সর্বসমক্ষে চড়, কিল, লাথি মারিতে দ্বিধা করে না, এবং এইরূপ মার খাইয়া সেই পদস্থ অফিসারও বিজ্রোহ করে না, নীরবেই সহ করে। ইহাই নাকি উহাদের প্রচলিত রীতি।

১৯৪২-এর শেষভাগ হইতে কে বা কাহারো আন্দামানের সংবাদ বোতারযোগে ইংরাজদের নিকট পাঠাইতে শুরু করে। জাপানীরা ইহা অবগত হয়, কিন্তু কিছুতেই অপরাধীকে ধরিতে পারে না। ১৯৪৩ সালের ২১-এ জানুয়ারী হইতে ৩০-এ মার্চের মধ্যে অনেক অসুস্থমান করিয়া উহারা একদল লোককে বন্দী করে ও ইহাদের মধ্যে সাতজনকে

পূর্ববর্তিত জুজুৎসু প্রণালীতে বধ। এই সাতজনের মধ্যে পাঁচজন ছিলেন পুলিসের কর্মচারী এবং দুইজন সাধারণ লোক। আবদুল খালেক নামক একজনকে এই ব্যাপারে বধ করা হয়। খালেকের পিতা মিঃ রৌফ এই বিষয়টি আমাদের নিকট বলিয়াছিলেন। যুদ্ধান্তে জাপানীরা পরাজিত হওয়ার পর ১৯৪৬ সালে সিঙ্গাপুরে যুদ্ধাপরাধীদের যে বিচার হয়, সেই বিচারে মিঃ রৌফ একজন সাক্ষী ছিলেন। রৌফের নিকট হইতে আমি এই প্রবন্ধের কিছু তথ্য সংগ্রহ করিয়াছি। এই রৌফের পত্নী অর্থাৎ খালেকের মাতা এবং খালেকের দশ বৎসরবয়স্ক কন্যা তাহার পিতার জুজুৎসুতে মৃত্যু স্বচক্ষে দেখিয়াছে এবং মনে রাখিয়াছে। আমার নিকট বিবরণ দিতে গিয়া ছোট যেহেটি পূর্বকথা স্মরণ করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল।

১৯৪৩ মার্চ মাসের এই ব্যাপারটিকে প্রথম গুপ্তচর বড়ঘর (First spy case) নামে অভিহিত করা হইয়াছিল। দ্বিতীয় গুপ্তচর বড়ঘরের জন্ত ধরপাকড় শুরু হয় ঐ বৎসরের ২৯ এ জুলাই হইতে। এই Second spy case-এর ধরপাকড় ১৯৪৪-এর জানুয়ারীর শেষ পর্যন্ত চলিতে থাকে। এই প্রসঙ্গে প্রায় পাঁচশত লোক বন্দী হয় এবং পাঁচশত লোককেই অমানুষিকভাবে প্রহার করা হয়। স্বীক্যোক্তি আদায় করিবার জন্ত মারপিঠ করিতে করিতে বারোজন হতভাগ্য মৃত্যুমুখে পতিত হয়; স্বীক্যোক্তি দেওয়ার ফলে ৪৫ জন লোককে হত্যা করা হয় এবং বাকী লোকেরা রেহাই পায়। এই হত্যাকাণ্ড ১৯৪৪-এর জানুয়ারী মাসের শেষ সপ্তাহে সমাপ্ত হইয়াছিল।

১৯৪৩ সালের নভেম্বর মাসে নেতাজী স্বভাবচন্দ্র এই দ্বীপে পদার্পণ করেন। আন্দামানের অধিবাসীদের উপর অনুসন্ধান ও বিচারের নামে জাপানীরা যে ভয়াবহ অত্যাচার চালাইতেছিল, সে সম্বন্ধে জাপানীরা নেতাজীকে বিশেষ কিছুই জানতে দেয় নাই। একজনের নিকট শুনিলাম যে, নেতাজী যখন এখানে আসিয়াছিলেন তখন সেই ভয়লোক দ্বিতীয় গুপ্তচর বড়ঘরের আসামী হইয়া সেলুলার জেলে বন্দী ছিলেন। তিনি বলিলেন “জেলে আমাদের কোন বিছানা বা কবল কিছুই দেওয়া হইত না, একখানি হাফপ্যান্ট পরিয়া খালি গায়ে থাকিতাম, একবারমাত্র কদম্ব আহার দিত এবং ২৪ ঘণ্টার মধ্যে একমিনিটের জন্তও ছোট cellটির বাহিরে যাইবার উপায় ছিল না। সেই ছোট cellটির এককোণে মল-মূত্র পড়িয়া থাকিত, জল ছিল না এবং খালি মেঝের খালি মাথায় শুইয়া থাকিতাম। এই অবস্থায় হঠাৎ একদিন দেখি যে সেলুলার মাথার দিয়া পরিকৃত হইল, বালুটি করিয়া জল আসিল, সেই সঙ্গে ভালো কবল, বিছানার চাদর, জামা ইত্যাদি আসিয়া গেল, ট্রের উপর সাগুনো কলাই করা বাটতে করিয়া ভালো ভালো খাদ্য ইত্যাদি দেওয়া হইল; কাগর না বুঝিয়া আমরা ভীষণ ভীত হইয়া পড়িলাম। পরে আমাদের নিকট জেলরক্ষী বলিয়া গেল যে, যে-কেহই তোমাদের নিকট আসিয়া বাহা কিছুই জিজ্ঞাসা করুক না কেন তোমরা কোন মতেই কতৃপক্ষের কোনরূপ নিন্দা করিবে না, করিলে মৃত্যুদণ্ড, আমরা ভয়ে এবং অনাহারে জড়বৎ হইয়াছিলাম, তৎক্ষণাৎ তাহাই স্বীকার করিয়া লইলাম। অতঃপর নেতাজী স্বভাব জেল পরিদর্শন করিতে আসিয়া আমাদের আহাৰ্য্য, পরিবেশ এবং শয্যা দেখিয়া বিশেষ ক্রীত হইয়া চলিয়া

গেলেন।” এই সময় নেতাজী জীমখানা প্রাউডে বক্তৃতা দেন। অত্যন্ত লোকের নিকট শুনিলাম যে, জাপানীরা নেতাজীকে এরূপে আগলাইয়া লইয়া বেড়াইয়াছিল যে, দৈনবাসী কেহই তাহার সহিত প্রাণের কথা বলিবার কোন অবকাশমাত্র পায় নাই। বক্তৃতায় তিনি বলিয়াছিলেন যে ইংরাজের পক্ষে হইয়া কোন বড়ঘর বা গুপ্তচর বৃত্তিতে যোগ দেওয়া ভীষণ অপরাধ বলিয়া গণ্য হইবে; উপরন্তু ভারতবাসীই ভারত জয় করিবে, অতএব কোন ভারতবাসী যেন বিশ্বাসঘাতকতার কাজ না করে, অর্থাৎ মনে হয় জাপানীরা তাহাকে বুঝাইয়া দিয়াছিল যে আন্দামানের লোকেরা অধিকাংশই ইংরাজের পক্ষে এবং ভারতের স্বাধীনতা যুদ্ধে আন্দামানের ভারতীয়গণ বিশ্বাসঘাতকতা করিতেছে। নেতাজী তিন দিনমাত্র এই দ্বীপে অবস্থান করিয়া এই দ্বীপকে শহীদ দ্বীপ নাম দিয়া চলিয়া গিয়াছিলেন। নেতাজী চলিয়া যাইবার পর জেলখানা হইতে সেই সমস্ত বিজ্ঞানাপত্র এবং কয়েদীদের জামা ইত্যাদি পুনরায় কাড়িয়া লওয়া হইয়াছিল।

নেতাজী চলিয়া যাইবার মাস তিনেক পরে ১৯৪৪-এর ফেব্রুয়ারী মাসে কর্ণেল লোকনাথন তিনজন সহকারী লইয়া এই দ্বীপে আসেন এবং এখানকার বেসামরিক শাসনভার গ্রহণ করেন। অতঃপর এখানকার লোকের উপর অমানুষিক অত্যাচার কিছুটা কমে, কিন্তু কিছুদিন পরেই তিনি আবার চলিয়া যান। লোকনাথনের এইখানে অবস্থিতিকালেই একদিন একখানি রসদবাহী জাপানী জাহাজ ‘রস’ দ্বীপের নিকট জলমগ্ন হয়। কিরূপে কে ইহার সংবাদ পাঠাইয়া ইংরাজের টর্পেডোর দ্বারা জাহাজখানিকে জলমগ্ন করায় তাহার কোন সঠিক প্রমাণ পাওয়া যায় নাই, কিন্তু এই ব্যাপারে তিনজন ভারতীয় জড়াইয়া পড়েন। ইহাদের নাম মিঃ ব্যানার্জী, মিঃ বুরহানুদ্দিন ও মিঃ আলি। এই তিনজনেই সমুদ্রের তীরে রক্ষীর কাজ করিতেন। লোকনাথনের উপস্থিতির জন্তই ইহাদের একটা ভয় রকমের বিচার অভিনয় হইয়াছিল এবং জুজুৎসু প্রণয় ইহাদের বধ না করিয়া ইহাদের তিনজনকে এক সঙ্গে সেলুলার জেলের ফাঁসীকাঠে ফাঁসী দেওয়া হয়। ইহারাই আজও পর্যন্ত সেলুলার জেলের ফাঁসীকাঠের শেষ বলি এবং ইহাদের কথাই ইতঃপূর্বে সেলুলার ফাঁসীমঞ্চের জেলের বর্ণনা প্রসঙ্গে উল্লেখ করিয়াছি। এই তিনজনের বিচার ব্যাপারটি Third spy case বা তৃতীয় গুপ্তচর বড়ঘর নামে অভিহিত।

ইহার পর চতুর্থ গুপ্তচর বড়ঘর। ১৯৪৪ সালের ২৯-এ আগষ্ট হইতে ১৯৪৫-এর মাঝামাঝি পর্যন্ত প্রায় পাঁচ ছয় শত ব্যক্তিকে এই ব্যাপারে আসামী প্রণীত করা হয়। এই সমস্ত লোকদের উপর পূর্বের প্রায় অত্যাচার চলিয়াছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত জাপানীদের পতন হওয়ার জন্ত এই বিচারের শেষ নিষ্পত্তি আর হয় নাই। সরকারীভাবে শত্রু সম্মুখে জাপানীদের অমানুষিক অত্যাচারপূর্বক এইখানেই শেষ; কিন্তু অস্ত্র ব্যাপারে তাহারা যে ভীষণভাবে নিধাতন ও নরহত্যা করিয়াছিল তাহার বিবরণ এখনও দেওয়া হয় নাই। আগামী সংখ্যায় সে সম্বন্ধে বাহা শুনিয়াছি তাহা প্রকাশ করিবার ইচ্ছা রহিল।

(ক্রমঃ)



### বিপর্যয়ের মুখে পশ্চিমবঙ্গ

পশ্চিমবঙ্গের খাদ্যপরিস্থিতি সম্প্রতি ভয়াবহ হইয়া উঠিয়াছে। প্রতিবেশী  
 এদেশ বিহারের সহিত পশ্চিমবঙ্গকে এখন এমন শোচনীয় খাদ্যদ্রব্যের  
 সম্মুখীন হইতে হইয়াছে যে, অবিলম্বে উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বিত না  
 হইলে ১৯৪৩ খ্রীষ্টাব্দের মহামতস্তরের পুনরাবৃত্তি হওয়াও বিচিত্র নয়।  
 মুর্শিদাবাদ জেলায় ইতিমধ্যেই অনাহারে মৃত্যুর সংবাদ পাওয়া বাইতেছে  
 এবং কোথাও কোথাও চাউলের মূল্য উঠিয়াছে মণপ্রতি ৫০ টাকা।  
 নদীয়ার অবস্থাও প্রায় অনুরূপ। পশ্চিম বাংলার সব জেলাতেই  
 অসহ্যভাবে হাহাকার পড়িয়া গিয়াছে। কলিকাতার আশপাশে  
 কোথাও এখন ৩০ টাকার কমে এক মণ চাউল মিলিতেছে না।  
 তবু রেশন এলাকার অবস্থা মন্দের ভাল, কিন্তু রেশন এলাকাই  
 এদেশের সব নয়। বিশেষ করিয়া রেশন অঞ্চলে অপেক্ষাকৃত  
 অবস্থাপন্ন ব্যক্তিরা বাস করেন, ক্রমবর্ধমান চাউলের মূল্য রেশনবিহীন  
 গ্রামাঞ্চলের অসংখ্য অধিবাসীকে গভীর হতাশাচ্ছন্ন করিয়া তুলিতেছে।  
 রেশন এলাকার দায়িত্ব অবশ্য সরকার লইয়াছেন, কিন্তু এপর্যন্ত সরকারী  
 এজেন্টদের শস্ত সংগ্রহের পরিমাণ প্রয়োজনের তুলনায় মোটেই  
 সন্তোষজনক নয়। স্বাভাবিক ভাবে এই বৎসর যেখানে ৮ লক্ষ টনের  
 কিছু বেশী খাদ্যশস্ত্রের দরকার, সেখানে জুলাই মাসের প্রথম দিক পর্যন্ত  
 এজেন্টরা ৪ লক্ষ টনও সংগ্রহ করিয়া উঠিতে পারেন নাই। বাড়তি  
 খাদ্যশস্ত্র সংগ্রহের কেন্দ্র পশ্চিম বাংলার অবস্থা সত্যি শোচনীয়। বস্তায়  
 এ বৎসর প্রায় ২ লক্ষ একর জমির ক্ষতি হইয়াছে এবং সরকারী হিসাবেই  
 মূলসমান চাবী চলিয়া যাওয়ায় মোটামুটিভাবে তিন লক্ষ ৫০ হাজার একর  
 জমিতে চাষের অনুবিধা হইয়াছে। পাটচাষ বৃদ্ধির জন্যও পশ্চিমবঙ্গের  
 খাদ্যশস্ত্র উৎপাদন কিছুটা ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। কাজেই কেলীয়  
 সরকারের সাহায্যের উপরই এখন সব কিছু নির্ভর করিতেছে। এই  
 স্থলে উল্লেখযোগ্য যে, কেলীয় সরকারও এবার খাদ্যশস্ত্রের ব্যাপারে  
 একটু বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছেন, কারণ ১৯৪১ সালে ভারতকে খাদ্যের  
 হিসাবে স্বয়ংসম্পূর্ণ করিয়া তুলিবার যে পরিকল্পনা তাঁহারাই গ্রহণ  
 করিয়াছিলেন, তদনুযায়ী তাঁহারাই এবার বাহির হইতে খাদ্যশস্ত্র  
 আমদানীর পরিমাণ গত বৎসরের ৩৯ লক্ষ টনের স্থলে ১৩ লক্ষ টনে  
 নামাইয়া আনিবার সংকল্প করেন। অবস্থা গতিকে তাঁহাদের আশা  
 এখন গভীর নৈরাশ্রে পরিণত হইতে চলিয়াছে।

খাদ্যশস্ত্রের হিসাবে পশ্চিম বাংলার নিজেরই মারাত্মক অভাব, ইহার  
 উপর এযুগে আশ্রয়প্রার্থী সমস্ত অবস্থাকে ক্রমেই আরও বাহিরে  
 টানিয়া লইয়া যাইতেছে। সরকারী হিসাবেই প্রকাশ, ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দের

পূর্বে পূর্ববঙ্গ হইতে ১২ লক্ষ ৮৯ হাজার আশ্রয়প্রার্থী পশ্চিমবঙ্গে  
 আসিয়াছিলেন, এ বৎসর অর্থাৎ ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দে আশ্রয়প্রার্থীর সংখ্যা ২৫  
 লক্ষ ২২ হাজার বাড়িয়া এখন মোট ৩৮ লক্ষের উপরে উঠিয়াছে। আমাদের  
 মনে হয় আশ্রয়প্রার্থীর প্রকৃত সংখ্যা এই সরকারী হিসাব অপেক্ষাও বেশী  
 এবং মোটামুটি ইহা ৬০ লক্ষ হইবে। এই বিপুলসংখ্যক জনতার  
 পোষণভার সরকার গ্রহণ করুন বা নাই করুন, খাদ্যের জন্য পশ্চিমবঙ্গের  
 উপর ইহার চাপ দিতেছে খুবই বেশী। গত ১৪ই আগষ্ট  
 উপরোক্ত ৬০ লক্ষ আশ্রয়প্রার্থীর মধ্যে মাত্র ২ লক্ষ ৩৪ হাজার জন  
 সরকারী আশ্রয়-শিবিরে ছিল, ইহার ভিতর ১,৫৪,৫৭৬ জন স্থান  
 পাইয়াছে পশ্চিম বাংলার বিভিন্ন আশ্রয়-শিবিরে এবং বাকী ৮০  
 হাজারের মধ্যে বিহারে ২২ হাজার, উড়িষ্যা ১৬ হাজার, আসামে ৫  
 হাজার, কাছাড় ৭ হাজার ও ত্রিপুরায় ৩০ হাজার জন স্থান লাভ  
 করিয়াছে। যাহারা এই আশ্রয়-শিবিরে স্থান লাভ করিয়াছে তাহাদের  
 অন্য যোগাইবার তবু একটা ব্যবস্থা হইয়াছে, কিন্তু যে অসংখ্য হতভাগ্য  
 নিজেদের ভাগ্যের উপর নির্ভর করিয়া এখানে সেখানে বা পথে পড়িয়া  
 আছে, তাহাদের খাদ্য আসিবে কোথা হইতে? ১৯৪১-৪০ খ্রীষ্টাব্দে  
 ভারত সরকার আশ্রয়প্রার্থীদের সাহায্যের জন্য নানাতাবে মোট ৩৬  
 কোটি ৬৪ লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়াছেন, কিন্তু এই পর্বত প্রমাণ অর্থব্যয়  
 তো সমস্তার গুরুত্ব এতটুকু কমাইতে পারে নাই। সরকারী টাকায়  
 এপর্যন্ত অস্বাভাবিক প্রাপ্তকর মত ব্যবস্থা ছাড়া বিশেষতঃ পূর্ববঙ্গের  
 আশ্রয়প্রার্থীদের ক্ষেত্রে স্থায়ীভাবে পুনর্বাসন করা সম্ভব হইয়াছে অল্প  
 ক্ষেত্রেই। পশ্চিমবঙ্গের প্রধান মন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের এক বিবৃতিতে  
 প্রকাশ, এপর্যন্ত (২২শে আগষ্ট) মোট ১০ লক্ষ শরণার্থীর পুনর্বাসন  
 সম্ভব হইয়াছে। এই দশ লক্ষ লোক নূতন পরিবেশে কতটা মানাইয়া  
 লইতে পারিবে অথবা স্থায়ীভাবে স্বাভাবিক ও জীবিকাার্জনের কতটা  
 সুযোগ পাইবে তাহাও এখনও নিশ্চিত করিয়া বলা যায় না। কাজেই  
 এ সময় দেশ যখন যুদ্ধোত্তর অর্থনৈতিক মন্ডার সম্মুখীন হইয়াছে, লক্ষ  
 লক্ষ শরণার্থীকে মানুষের মত বাঁচিবার সুযোগদান কি ভাবে সম্ভব হইবে  
 বিধাতাই জানেন। আশ্রয়প্রার্থী সমস্তাকে আর বাহিরের স্বত্বাধীন মনে  
 করিবার উপায় নাই, সব ছাড়িয়া যে ভাইবোনেরা আজ আমাদের মধ্যে  
 আসিয়াছে, আমাদের হৃৎকুণ্ডলের অঙ্গীদার রূপে তাহাদিগকে বধাশ্রম  
 বাঁচাইবার দায়িত্ব আমাদেরই। ইহারা পশ্চিমবঙ্গের বা ভারতের নাগরিক  
 এবং রাষ্ট্রের সম্পদ এই বিপুলসংখ্যক মানুষকে বাঁচাইয়া রাখার দায়িত্ব  
 রাষ্ট্র ছাড়া আর কে গ্রহণ করিবে! হুতরাং অল্প আর্থিক অবস্থার উন্নতি  
 যেভাবেই হোক, এখন পশ্চিম বাংলার খাদ্যদ্রব্যের সমাধান অবিলম্বেই



করিতে হইবে, অন্ত্যায় অনাহারে মৃত্যুর সংখ্যা দেখিতে দেখিতে ভয়ানক ভাবে বাড়িয়া যাইবে বলিয়াই আশঙ্কা হয়। ইতিমধ্যেই পশ্চিম বাংলার পল্লী অঞ্চলে এবং মহারাষ্ট্রে শরণার্থী এলাকায় অনাহারে বিধির্ণ কব্বালের ভিড় জমিতেছে। এই ক্ষেত্রে একথাও স্মরণীয় যে, এবার দ্রুতক দেখা দিলে এবং তৎক্ষণাত্ পাঠকারী ভাবে মানুষ মরিতে আরম্ভ করিলে দেশের শান্তি শৃঙ্খলা নিরাপদ রাখাও হয় তো শেষ পর্যন্ত কঠিন হইবে।

কেন্দ্রীয় সরকার পূর্ববঙ্গের আশ্রয়ার্থী সমস্যা সম্পর্কে বিলম্বে হইলেও বর্তমানে অবহিত হইয়াছেন এবং পশ্চিমবঙ্গের খাদ্যদ্রব্যের অবনতি ঘটতে না দিবার জন্ত যথাসাধ্য চেষ্টা করিবার সিদ্ধি দেখাইতেছেন। বর্তমান গুরুতর পরিস্থিতিতে কেন্দ্রীয় সরকারের এই অবহিতি মূল্যবান সন্দেহ নাই। পশ্চিমবাংলার সব সমস্যার মূল বা কেন্দ্র এখন শরণার্থী সমস্যা। কাজেই এই সমস্যার সমাধানে গত হৃদ্যভাবে আগ্রহ হওয়া যাইবে, ততই পশ্চিমবাংলার অবস্থা উন্নতি হইবে। সরকার নিজদের পরিকল্পনা অনুসারে বট্টা পারেন ভালই, তাছাড়া এই সময় তাহাদিগের বেসরকারী পরিকল্পনা বা পরামর্শও কার্যকরী করণের মনোভাব লইয়া সতর্কতার সহিত বিবেচনা করা উচিত। সম্প্রতি ডাঃ শ্রীমান্দ্রাস মুখোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে গঠিত বঙ্গীয় পুনর্বাসিত প্রতিষ্ঠান ও ডাঃ রাধাকমল মুখোপাধ্যায়ের অধিনায়কত্বে যে পুনর্বাসিত বোর্ড গঠন করেন, তাহার মোট ১৩ দফা প্রস্তাব সমন্বিত একটি পরিকল্পনা রচনা করিয়াছেন। পরিকল্পনাটি দায়িত্বশীল ব্যক্তিদের দ্বারা রচিত বলিয়া তো ইহার উপর গুরুত্ব আরোপ করা সরকারের কর্তব্য; তাছাড়া আমাদের ধারণা পরিকল্পনাটির মধ্যে শরণার্থী সমস্যা সমাধানের অন্তর্কূল অনেক বৃত্তি আছে। সবচেয়ে বড় কথা, পরিকল্পনাটিতে অর্থনৈতিক ক্ষমতার সহিত মানবতার আদর্শের যতটা সম্ভব সমন্বয় সাধনের যে চেষ্টা হইয়াছে, বর্তমান পরিস্থিতিতে সেই প্রায়দৃষ্টির মূল্যও যথেষ্ট। এই প্রসঙ্গে প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত নেহেরুর আশ্রয়ে প্রাক্তন পুনর্বাসন সচিব শ্রীমোহনলাল শাকসেনা ৫০ লক্ষ পূর্ববঙ্গীয় শরণার্থীর পুনর্বাসিত যে পরিকল্পনা রচনা করিয়াছেন, তাহাও বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

### ভারতের বহির্বাণিজ্য

১৯৪৭-৪৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত বহির্বাণিজ্য অবিরাম অন্তর্কূল থাকিবার পর গত কয়েক বৎসর ইহা ভারতের অতিকূলে যাইতেছে। অবশ্য এই অতিকূল গতি ১৯৪৭-৪৮ খ্রীষ্টাব্দেই অন্তর্মিত হয় এবং এই বৎসর ভারত হইতে রপ্তানী ও ভারতে আমদানী পণ্যের মূল্য বাক্যক্রমে ৪০০ কোটি ও ৩৯৮ কোটি ধরিয়া ভারতের উষ্ণ হয় মাত্র ৫ কোটি টাকা। ইহার পর বৎসর, অর্থাৎ ১৯৪৮-৪৯ খ্রীষ্টাব্দে ভারতের বহির্বাণিজ্যিক ঘাটতির পরিমাণ ২১৭ কোটি ৬৬ লক্ষ টাকা হাঁড়ায়। ১৯৪৯-৫০ খ্রীষ্টাব্দের অবস্থাও শোচনীয়, এই বৎসর ভারতের ঘাটতির পরিমাণ হাঁড়াইয়াছে ৯৩ কোটি টাকা। ১৯৫০-৫১ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল হইতে জুন

বা প্রথম তিন মাসের বে হিসাব পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে এই মাত্র তিন মাসেই ৩৪ কোটি টাকা ঘাটতি হইয়াছে।

এইভাবে অবিরাম বহির্বাণিজ্য ঘাটতি যে দেশের অর্থনৈতিক ভিত্তির হিসাবে মারাত্মক তাহা লইয়া আলোচনা নিম্নোক্ত। সাধারণভাবে এই বহির্বাণিজ্যের উন্নতিসাধন ভারতকে অবিলম্বে করিতেই হইবে। একজ্ঞ আমদানী নিয়ন্ত্রণ, শুক সংস্কার প্রভৃতি যে কোন ব্যবস্থার কথাই স্থিরভাবে চিন্তা করা দরকার। মৃত্যুমূল্য-হ্রাসের প্রথম দিকে ভারতীয় পণ্যের বিদেশের বাজারে যে কাটতি বাড়িয়াছিল, তাহা ব্যবসায়িকের সাময়িক আশ্রয় বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। এখন স্থায়ীভাবে অন্তর্কূল বাণিজ্যিক গতি সংরক্ষণের ব্যবস্থা দরকার। বিশেষ করিয়া খাদ্যপণ্যের ব্যাপারে ভারতের বে দৈম্য তাহার পূরণের উপরই বহির্বাণিজ্যের গতি অনেকটা নির্ভর করিতেছে। ভোগ্যপণ্য আমদানীর তুলনায় যন্ত্রপাতি আমদানীর উপর এখন জোর না দিয়া উপায় নাই, শিল্পায়ন ভারতীয় অর্থনীতির পুনর্গঠনের হিসাবে অত্যন্ত গুরুতর ব্যাপার। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ-যোগ্য যে, গত ২১৩ বৎসর যাবৎ ভারত সরকারের শিল্পনীতির আড়ম্বল্যের জন্ত শিল্পপতিগণ নিরুৎসাহ হওয়ার ভারতে শিল্পপ্রতিষ্ঠার ব্যাপারে খুবই মন্দাভাব দেখা যাইতেছে। একজ্ঞ পণ্যভাবপ্রবৃত্তি আমাদের দেশে পণ্য উৎপাদন না হওয়ায় যথেষ্ট ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে (পার্লামেন্টের সদস্য শ্রীমুক্ত মাড়গেল সম্প্রতি ইউ পির প্রতিনিধির নিকট প্রদত্ত এক বিবৃতিতে বলিয়াছেন যে, এইরূপ ক্ষতির পরিমাণ কমপক্ষে ১০ হাজার কোটি টাকা)। সরকারী শিল্পনীতিও অবিলম্বে স্থপষ্ট হওয়া চাই। বলা বাহুল্য, আনুজ্ঞাতিকতার নামে পণ্যবন্টনের যেসব ব্যবস্থা হয় বা হইবে, তাহাতে ভারতের স্থায় শিল্প অন্তর্কূল দেশের লাভবান হইবার সম্ভাবনা খুবই কম। দৃষ্টান্তরূপে ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল-অক্টোবর মাসে জেনেভায় পৃথিবীর বিভিন্ন ২৩ জাতির মধ্যে অনুষ্ঠিত পণ্যচুক্তির কথা উল্লেখ করা যায়। এই চুক্তিতে ভারত বিদেশ হইতে মোটরগাড়ী, রাসায়নিক পণ্যাদি, টাইপরাইটার, রেফ্রিজারেটর, বেতারযন্ত্র, টিনজাত খাদ্য ইত্যাদিতে বৎসরে আনুমানিক ৩১ কোটি মূল্যের পণ্য আনাইয়া যে স্থবিধা পাইবার অধিকারী হয়, তাহার বিনিময়ে তাহাকে পাটজাত দ্রব্য, চা, নানাপ্রকার মশলা, কার্পাসজাত দ্রব্য ইত্যাদিতে ৪৮ কোটি টাকা মূল্যের পণ্য বিদেশে সমান স্থবিধায় রপ্তানী করিবার প্রতিশ্রুতি দিতে হইয়াছে।

সাধারণতঃ বহির্বাণিজ্য বেসরকারী ব্যবস্থায় নিয়ন্ত্রিত হয়। ব্যবসায়ীদের ব্যক্তিগত প্রবৃত্তি ও বুদ্ধি এই বাণিজ্যের প্রকৃতি নিয়ন্ত্রণে যথেষ্ট দায়ী, কিন্তু শেষপর্যন্ত এই বহির্বাণিজ্যে ঘাটতি হইলে সরকারকেই মুন্সিলে পড়িতে হয়। বহির্বাণিজ্য রাষ্ট্রায়ত্ত্ব হইলে সরকার দেশের অর্থনীতি অনুসারে বহির্বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণের স্থবিধা পান। সরকারী স্বার্থের বা সমগ্রভাবে বৃহৎ জাতীয় স্বার্থের হিসাবে অনেকে এই ব্যবস্থাই ভাল বলিয়া মনে করেন। অবশ্য যে দেশেই



এ-শ্রেণীর পরিকল্পনা হয় ব্যবসায়ী বা শিল্পপতিশ্রেণীর লোক তাহার বিরোধিতা করিয়া থাকেন। ভারতের বহির্বাণিজ্যের ক্রমাবনতিতে উদ্বিগ্ন হইয়া যখন ভারতসরকার এই ধরনের রাষ্ট্রীয় ও বহির্বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠান গঠনের কথা চিন্তা করিতে শুরু করেন, তখন এদেশেও সেই পরিকল্পনা শিল্পপতিদের সমর্থন পায় নাই। যাহা হউক, বাণিজ্য সচিব শ্রীযুত ক্ষিতীশচন্দ্র নিয়োগী মহাশয়ের আমলে শ্রীচিন্তামণি দেশমুখের নেতৃত্বে এসম্পর্কে পরামর্শদানের জন্য একটি কমিটি নিযুক্ত হয়। সম্প্রতি দেশমুখ কমিটির রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে। রিপোর্টে সরকারের বহির্বাণিজ্যের নীতি সমর্থন করিয়া কমিটি উপস্থিত ২ কোটি (শেষপর্ধ্যন্ত ১০ কোটি) টাকা মূলধন সম্বন্ধিত একটি সরকার নিয়ন্ত্রিত বহির্বাণিজ্য পরিচালন বোর্ড গঠনের সুপারিশ করিয়াছেন। এই রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য কর্পোরেশনের ক্ষমতা

এখন অবশ্য কতকগুলি পণ্যের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ রাখা হইয়াছে, তবে ইহার কাজ সাফল্য অমুসারেই বাড়ান চলিবে। এই প্রতিষ্ঠান ভারতসরকারের পক্ষে বিদেশের সরকার বা প্রতিষ্ঠানের সহিত পণ্য আমদানীর অথবা ভারতীয় পণ্য রপ্তানীর চুক্তি করিতে পারিবে। বিশেষভাবে ভারতীয় কুটিরশিল্পজাত পণ্যের (এই পণ্যের বিদেশে চাহিদা উল্লেখযোগ্য এবং এই চাহিদা সম্প্রসারণ যোগ্য) বিদেশের বাজার সৃষ্টির ও প্রসারণের দায়িত্ব ইহার গ্রহণ করিয়াছেন। ভারতীয় বহির্বাণিজ্যের অত্যন্ত দুর্গতির দিনে এই ধরনের প্রতিষ্ঠানগঠনের নীতিগত গুরুত্ব সত্যই প্রচুর। ইহাতে অন্ততঃ ব্যবসায়ীদের অসাধুতা বা বোকামীর জন্য ভারতীয় বহির্বাণিজ্যের ঘাটতির হাত হইতে কতকটা রক্ষা পাইবার আশা আছে বলিয়া অনেকেই এই প্রতিষ্ঠান গঠিত হইবার সম্ভাবনায় আনন্দিত হইয়াছেন।

## কুমিল্লা নগরী

ডক্টর শ্রীদীনেশচন্দ্র সরকার

গুপ্তবংশীয় সম্রাট সমুদ্রগুপ্ত খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীর মধ্যভাগে রাজত্ব করিতেন। কিছুকাল পূর্বে দক্ষিণ বিহারের অন্তর্গত সুপ্রসিদ্ধ বৌদ্ধতীর্থ নালন্দাতে তাঁহার একখানি তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হইয়াছিল। এই শাসন অমুসারে গুপ্তসম্রাট জয়ভট্টধামী নামক জনৈক ব্রাহ্মণকে দুইটি গ্রাম দান করিয়াছিলেন। গ্রামদ্বয়ের মধ্যে একটির নাম ছিল পূর্ণনাগ গ্রাম; উহা কুমিল্লা বা ক্রিমিল্লা নামক বিষয় অর্থাৎ জেলার অন্তর্গত ছিল। সমুদ্রগুপ্তের নালন্দাশাসন হইতে মনে হয় যে, গুপ্তসাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত একটি জেলার নাম ছিল কুমিল্লা বা ক্রিমিল্লা। কিন্তু উহা ঠিক কোথায় অবস্থিত ছিল, পণ্ডিতেরা তাহা নির্ণয় করিতে পারেন নাই। এই প্রসঙ্গে ইহা উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, অনেকে নালন্দা শাসন খানিকে জাল বলিয়া মনে করেন। সম্ভবতঃ উহা সম্রাট সমুদ্রগুপ্তের সময়ের দুই তিন শত বৎসর পরে জাল করা হইয়াছিল। সুতরাং উহা হইতে খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে কুমিল্লা নামক জেলার অস্তিত্ব প্রমাণিত হয় কিনা, তাহা নিশ্চিত বলা কঠিন। তবে উহার সম্ভাবনা অস্বীকার করা যায় না। বিশেষতঃ, নালন্দাতে প্রাপ্ত কতিপয় প্রাচীনশীল-মোহরে কুমিল্লা বা ক্রিমিল্লা বিষয়ের উল্লেখ পাওয়া গিয়াছে। ইহা হইতে অনুমান করা যাইতে পারে যে, উহা দক্ষিণ

বিহারেরই অন্তর্গত কোন অঞ্চল-বিশেষের নাম ছিল এবং সম্ভবতঃ পাল আমলের পূর্বেই উহা একটি বিষয় বা জেলা বলিয়া গণ্য হইত।

পালবংশীয় সম্রাট দেবপাল খ্রীষ্টীয় নবম শতাব্দীতে প্রথম ভাগে রাজত্ব করিতেন। তাঁহার একখানি তাম্রশাসন মুন্সেরে আবিষ্কৃত হইয়াছিল। উহাতে দেখা যায়, সম্রাট দেবপাল কুমিল্লা বা ক্রিমিল্লা বিষয়ের অন্তর্গত মেঘিকা নামক একটি গ্রাম জনৈক ব্রাহ্মণকে দান করিয়াছিলেন। এই শাসনে উক্ত বিষয়টিকে শ্রীনগর নামক ভুক্তি বা প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত বলা হইয়াছে। যেমন নগরার্থক ‘পত্তন’ শব্দ হইতে আধুনিক পাটনা নগরীর নাম হইয়াছে, তেমনি পাটনা বাহার বর্তমান প্রতিনিধি সেই প্রাচীন পাটলিপুত্র নগরকে লোকে সাধারণতঃ নগর বা শ্রীনগর বলিত। বাৎসায়নকৃত কামসূত্রের জয়মঙ্গলা টীকায় দেখা যায়, ‘নাগরকাঃ’ এবং ‘নাগরিক্যঃ’ যথাক্রমে ‘পাটলিপুত্রিকাঃ’ ও ‘পাটলিপুত্রিক্যঃ’ রূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। সুতরাং পালসাম্রাজ্যের অন্তর্গত শ্রীনগর ভুক্তি যে পাটলিপুত্র নগরকে কেন্দ্র করিয়া দক্ষিণ বিহারের কিয়দংশে বিস্তৃত ছিল, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। পাল সম্রাটগণের শাসনাদি হইতে বর্তমান বিহার প্রদেশে অবস্থিত দুইটি ভুক্তির অস্তিত্ব

অবগত হওয়া গিয়াছে। উহাদের মধ্যে নগরভুক্তি বা শ্রীনগরভুক্তি দক্ষিণ বিহারে এবং তীরভুক্তি (আধুনিক ‘তীরহত’) উত্তর বিহারে অবস্থিত ছিল। কিন্তু এই ভুক্তি-দ্বয়ের কোনটিরই প্রকৃত সীমা নির্ধারণ করা সম্ভব হয় নাই। গয়া বিষয়, রাজগৃহ (বর্তমান ‘রাজগির’) বিষয় এবং নালন্দা বিষয় শ্রীনগরভুক্তির অন্তর্গত ছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। সম্ভবতঃ পাটলিপুত্র বা শ্রীনগর এবং মুদ্রাগিরি (মুদ্রের) ঐ ভুক্তির অন্তর্ভুক্ত অপর দুইটি বিষয়ের কেন্দ্র ছিল। কুমিল্লা বা ক্রিমিলা বিষয় উল্লিখিত বিষয়গুলির বাহিরে অবস্থিত ছিল বলিয়া মনে হয়। কিন্তু এতদিন এই বিষয়টির প্রকৃত অবস্থান নির্ণয়ের সহায়ক কোন প্রমাণই আবিষ্কৃত হয় নাই। বিষয়টির নাম কুমিল্লা বা ক্রিমিলা নামের কোন নগরী হইতে উদ্ভূত কিনা, তাহাও কেহ বলিতে পারেন নাই; কারণ ঐ নামের কোন নগরীর অস্তিত্ব এতদিন অজ্ঞাত ছিল। সূত্রে বিষয়, সম্প্রতি আমি প্রাচীন কুমিল্লা নগরীর অবস্থান নিঃসংশয়ে নির্ণয় করিতে সমর্থ হইয়াছি। আমার আবিষ্কারের ফলে কুমিল্লা বিষয়ের অবস্থানও সহজেই নির্ণীত হইয়াছে।

বিগত জাহ্নয়ারী মাসের প্রথম ভাগে আমি দক্ষিণ বিহারের অন্তর্গত মুদ্রের, পাটনা ও গয়া জিলার কতকগুলি গ্রামে শিলালিপি প্রভৃতির সন্ধান করিতে গিয়াছিলাম। প্রায় পঁচাত্তর বৎসর পূর্বে অগ্নীয় আলোগ্জাওয়ার কানিংহাম সাহেব দক্ষিণ বিহারের গ্রামসমূহে প্রাচীন লিপির সন্ধানে ভ্রমণ করিয়াছিলেন। তাঁহার অনুসন্ধানের ফল তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ রিপোর্টসমূহে বর্ণিত আছে। তিনি যে সকল লিপিসম্বন্ধে শিলামূর্ত্তি পরীক্ষা করিয়াছিলেন, তাহার অনেকগুলি এখন আর পাওয়া যায় না। কারণ উহার অনেক-মূর্ত্তি পরবর্ত্তী কালে স্থানান্তরিত হইয়াছে। কিন্তু দক্ষিণ বিহারের অগণিত প্রাচীন গ্রামে এখনও প্রতি বৎসর ভূমি কর্ষণ বা খননকালে প্রাচীন মূর্ত্তি আবিষ্কৃত হইয়া থাকে; উহার অনেক অভয় সূদৃশ মূর্ত্তি বাহিরেও চলিয়া যায়। তবু ঐ অঞ্চলে মাঝে মাঝে অনুসন্ধান কার্য চালাইলে প্রাচীন ইতিহাসের কিছু কিছু নবীন উপাদান আবিষ্কৃত হইবার সম্ভাবনা দেখা যায়। দক্ষিণ বিহারে সাধারণতঃ যে সকল শিলামূর্ত্তি আবিষ্কৃত হয়, উহা পাল আমলের এবং উহার অধিকাংশই ভগ্ন। বেশীর ভাগ মূর্ত্তিতে কোন লিপি

দেখা যায় না; কিন্তু কতকগুলি মূর্ত্তির পাদপীঠে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লেখ উৎকীর্ণ দেখা যায়। এই লিপিগুলির মধ্যেও আবার অনেকগুলির ঐতিহাসিকমূল্য সামান্য। বৌদ্ধ মূর্ত্তিতে সাধারণতঃ এই সুবিখ্যাত বৌদ্ধ মন্ত্রটি উৎকীর্ণ দেখা যায়—“যে ধর্ম্মা প্রভবান্তেষাং হেতুঃ তথাগতোহবদৎ। তেষাং চ যো নিরোধ এবংবাদী মহাশ্রমণঃ”। কতকগুলি মূর্ত্তিতে কেবল মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠাতার নাম উৎকীর্ণ থাকে। অতি অল্প-সংখ্যক মূর্ত্তিতে মূর্ত্তির প্রতিষ্ঠাহীন এবং প্রতিষ্ঠাকালের উল্লেখ পাওয়া যায়। কালের উল্লেখে কখনও বা কেবলমাত্র কোনও রাজার রাজত্বকাল, কখনও নির্দিষ্ট কোনও রাজার রাজ্য সংবৎসর এবং কদাচিৎ কোনও সুপরিচিত সালের ব্যবহার দেখা যায়। স্থানকালের উল্লেখ সংবলিত লিপি-গুলিই ঐতিহাসিকগণের নিকট অধিক মূল্যবান। গত জাহ্নয়ারী মাসে আমি মুদ্রের জেলার পশ্চিম প্রান্তে অবস্থিত কাজরা, কিউল ও লক্ষ্মীসরাই রেলওয়ে স্টেশনের নিকটবর্ত্তী কতকগুলি গ্রামে এই প্রকারের কতকগুলি মূল্যবান লিপি আবিষ্কার করিতে সমর্থ হইয়াছিলাম। কাজরা রেলওয়ে স্টেশনের নিকটবর্ত্তী উরেন নামক গ্রামে আমি কতিপয় ভৈকুকী অক্ষরে উৎকীর্ণ লিপি আবিষ্কার করি। এই লিপি পূর্বভারতের মগধ অঞ্চলের বৌদ্ধ ভিক্ষুগণের মধ্যে প্রচলিত ছিল। কিছু কাল হইল, মালদহ জেলাতেও এক-খানি ভৈকুকী লিপি পাওয়া গিয়াছে। সম্প্রতি আমি একটি প্রবন্ধে এই ভৈকুকী লিপিগুলির পাঠ আলোচনা করিয়াছি। উহা সরকারী ‘এপিগ্রাফিয়া ইণ্ডিকা’ পত্রে প্রকাশিত হইতেছে।

জাহ্নয়ারী মাসের ৯ তারিখ অপরাহ্নে আমি ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলপথের লক্ষ্মীসরাই ও মনকথা স্টেশনের মধ্যবর্ত্তী বলগুদর গ্রামে উপস্থিত হই। বলগুদর গ্রামটি ক্ষুদ্র; কিন্তু এখানে তিনটি মূল্যবান লিপি পাওয়া গেল। গ্রামের সঙ্গত নামক অঞ্চলে একটি কূপের নিকট একটি শিলা মূর্ত্তির পাদপীঠ মাত্র পড়িয়া আছে দেখিলাম। উহাতে যে লিপি উৎকীর্ণ আছে তাহার তারিখ পালবংশীয় মদন-পালের রাজত্বের অষ্টাদশবর্ষের ১১ই জ্যৈষ্ঠ এবং ১০৮৩ শকাব্দ। এই লিপিখানির ঐতিহাসিক মূল্য ইতিপূর্বে ‘ভারতবর্ষে’ ‘পাল-বংশীয় মদন পাল ও গোবিন্দ পাল’ শীর্ষক প্রবন্ধে আলোচনা করিয়াছি। কিন্তু লিপিটির সম্পর্কে আর একটি মূল্যবান

তথ্য এই যে, উহাতে মূর্তিটির কুমিলা বা ক্রিমিলা নগরীতে প্রতিষ্ঠিত হইবার বিষয় উল্লেখ আছে। বলগুদর গ্রামে আমার দ্বিতীয় আবিষ্কার ভাগলপুরবাসী জমিদার শ্রীযুক্ত দ্বিগীপ-নারায়ণ সিংহ মহাশয়ের কাছারীতে অবস্থ-রক্ষিত একটি ভগ্ন দেবীমূর্তি। ইহার অঙ্গে যে লিপিটি ক্ষোদিত আছে, তাহাতেও বলা হইয়াছে যে, উক্ত দেবীমূর্তি কুমিলা বা ক্রিমিলা নগরীতে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। ঐ গ্রামে আমার তৃতীয় আবিষ্কার বাবু কেশব সিংহের গৃহপ্রাঙ্গণে পতিত একখানি পাদপীঠ। মূর্তিটির কোন সন্ধান পাই নাই; কিন্তু পাদপীঠে উৎকীর্ণ লিপি হইতে জানা গেল যে, ঐ মূর্তি পালবংশীয় সম্রাট সুবিখ্যাত ধর্ম্য পালের রাজত্বকালে কুমিলা বা ক্রিমিলা নামক অধিষ্ঠান অর্থাৎ নগরে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। ক্ষুদ্র-পরিসর বলগুদর গ্রামে এই তিনটি লিপি পরীক্ষা করিয়া আমার সন্দেহ রহিল না যে, এতদিনে কুমিলা বিষয়ের কেন্দ্রীয় নগরীর অবস্থান জানা গেল। এই গ্রাম এবং ইহার চতুর্পার্শ্ববর্তী অঞ্চল লইয়া যে প্রাচীন

কুমিলা নগরী অবস্থিত ছিল, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। বলগুদরের পার্শ্বেই রজৌনা নামক অপর একটি গ্রাম আছে। সেখানে সংগৃহীত কতকগুলি মূর্তির মধ্যে একটিতে পালবংশীয় প্রথম শুর পালের পঞ্চম রাজ্যবর্ষের একখানি লিপি আছে। ঐ লিপি হইতে জানা যায় যে, উল্লিখিত মূর্তিটিও কুমিলাতে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। বর্তমান রজৌনা গ্রামটিও প্রাচীন কুমিলা নগরীর অন্তর্ভুক্ত ছিল কিনা, তাহা নিশ্চিত বলা যায় না। আমার মনে হয়, ঐ মূর্তিটি বলগুদর গ্রামে পাওয়াগিয়াছিল; পরে উহার রজৌনাতে স্থানান্তরিত হইয়াছে।

বলগুদর গ্রামে আবিষ্কৃত লিপিগুলি হইতে নিঃসংশয়ে জানা গেল যে, বর্তমান মুন্সের জেলার পশ্চিমাংশে আধুনিক পাটনা ও মুন্সেরের মধ্যবর্তী অঞ্চলে প্রাচীন কুমিলা বিষয় অবস্থিত ছিল। সম্ভবতঃ পূর্বদিকে মুন্সগিরি বিষয়, পশ্চিমে শ্রীনগর বিষয়, উত্তরে গঙ্গা নদী এবং দক্ষিণে রাজগৃহ ও নালন্দা বিষয় এই চতুঃসীমার মধ্যে প্রাচীন কুমিলা বিষয়ের অবস্থান অনুমান করা যাইতে পারে।

## সমাজ-সচেতন সাহিত্য

### শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়

আমাদের জীবনে আজ যে সকল সমস্যার উদ্ভব হইয়াছে সমাজ-সচেতন মানুষ হিসাবে সাহিত্যিকদের মনের উপর তাহার প্রভাব বিস্তৃত হওয়াই স্বাভাবিক। সাধারণ মন হইতে সাহিত্যিক মনের পার্থক্য এই যে, সে মনটি অধিকতর সংবেদনশীল। এই কারণেই জাতির সাহিত্যে কালের ছাপ পড়ে—যুগকে অতিক্রম করিয়া সাহিত্যিকের অনুষঙ্গবশীলতা ও ভবিষ্যৎ দৃষ্টির পটভূমিতে একাত্মীয় হৃৎস্পন্দ, আশা ও আতঙ্ক আমাদের সাহিত্যে রূপায়িত হইয়া উঠে। অমুক্রমিক ঘটনা পরম্পরার সংকলনে ইতিহাস লিপিত হইয়া থাকে কিন্তু সাহিত্যে ঘটনা উপলক্ষ মাত্র। সাহিত্যিক দেখেন মানুষকে—যে মানুষ ঘটনার সৃষ্টি করে—আর সাহিত্যিকের সৃষ্টি সেই মানুষ নিজে।

অতএব যে সমস্ত আজ মানুষকে বিচলিত ও বিধ্বস্ত করিতেছে—তাহার সমাধান কল্পে সে নির্বিচারে যে কোনও উপায় অবলম্বন করিতেছে, মনুষ্যোচিত কর্তব্যের প্রধানতম আশ্রয়ভূমি নৈতিক উদ্দেশ্য ও আদর্শ হইতে সেইজন্যই আজ মানুষ বার বার বিচ্যুত হইতেছে, এ শোচনীয় ঘটনা সাহিত্যিক মনকে অবশ্যই প্রভাবিত করিবে।

সম্প্রতি এ্যালডুস হাক্সলি “Ape and Essence” নামক যে

গল্পের বই লিখিয়াছেন তাহা নিছক গল্পেরই বই হইয়া উঠে নাই, কারণ আখ্যান বস্তু অপেক্ষা নৈতিক উদ্দেশ্যের দিকেই তিনি দৃষ্টি দিয়াছেন বেশী। ইহাকে সাময়িক পাণ্ডার বা গর্হিত কাজের তীব্র প্রতিবাদ ও স্বেচ্ছাকৃত রচনা বলা যাইতে পারে। Point Counter Point—লেখার পর হাক্সলি বহুদিন কোনও বই লিখেন নাই। তাহার পর তিনি লিখিলেন—Brave New World, After Many a Summer, Time must Have a Stop ইত্যাদি। এই সবগুলি বইতেই আমরা গল্প ভাগ অপেক্ষা নৈতিক উদ্দেশ্যের আলোচনাই দেখতে পাই বেশী।

Ape and Essence এর গল্পটি নিম্নবর্ণিত ছায়াছবির সংক্ষিপ্ত পাণ্ডুলিপির (Film Script) আকারে লেখা। সেটা যেন ঘটনাক্রমে Dustbin বা ময়লার টিনের মধ্যে পাওয়া গেল। গ্রন্থকারবর্ণিত এই পাণ্ডুলিপির লেখক ট্যালিস্ ইচ্ছা করিয়াছিলেন এখানির বিক্রয়লব্ধ অর্থ দিয়া তিনি তাহার পৌত্রীকে যুদ্ধোত্তর জার্মানির হাত হইতে বাঁচাইবেন—যে জার্মানিতে তখন করেকটুকরা চকোলেটের বদলে দুধতী মেয়েরা আত্মবিক্রম করিতে শুরু করিয়াছে। হলিউডে সেই ছায়াচিত্রের

পাণ্ডুলিপিখানি বিক্রয়ের জন্ত চেষ্টা করিবার আগেই ট্যালিসের মৃত্যু হইল। গল্পটির আখ্যান ভাগটি সংক্ষেপে এই ভাবে চণ্ডিয়াছে। লেখক কথিত তৃতীয় মহাযুদ্ধের পর বর্তমান সভ্যতার অন্তিম রহিল শুধু নিউজিল্যান্ড হইতে অনেক দূরে একটি স্থানে। এটমবোম্ব ও জীবাণু সংক্রান্ত যুদ্ধের ফলে আমেরিকায় এক নতুন মানুষের জাতি জন্মাইতে লাগিল, রক্তে তাহাদের মানসিক পঙ্কতার বিব সংক্রামিত। তাহারা “লিয়াল” অর্থাৎ অস্ত্রায় ও অশুভের দেবতা শয়তানকে পূজা করে। ইহার পর দেখা যায় বাইবেল ও মৃত্যু হইতে উপাদান সংগ্রহ করিয়া হাক্সলি আর এক নতুন পরাধর্মের রূপক খাড়া করিলেন, তাহা এই :—নিউজিল্যান্ড হইতে একদল বৈজ্ঞানিক ক্যালিফোর্নিয়ার উপকূলে উপস্থিত হইলেন প্রাচীন সভ্যতার ভগ্নাংশ অনুসন্ধান করিতে। এই বৈজ্ঞানিক দলের একজন উদ্ভিদ্ধ তত্ত্ববিদ ছিলেন, তাহার নাম ডাঃ পুল—আজীবন নিফলক চরিত্র ডাঃ পুলকে কে বা কাহারা যেন হরণ করিয়া লইয়া গেল। এই গল্পে বর্ণিত প্রাক-এটম যুগের প্রাচীন রীতি অনুসারে—নরনারী বৎসরে পাঁচ সপ্তাহ ছাড়া ইঞ্জিয় ভোগ হইতে সম্পূর্ণভাবে বিরত থাকিবার কথা। এই পাঁচ সপ্তাহের মধ্যে তাহারা দুই সপ্তাহ অবাধ ও অসংযত যৌন-সন্তোগে রত থাকিবে এমন রীতিরও প্রবর্তন তাহাতে দেখা যায়। তাহারা সকলে একটি উন্মুক্ত প্রান্তরে উপস্থিত হইবে। পুরুষ—“না” এই কথাটি লিখিত নারীর গাত্রবাস ছিঁড়িয়া ফেলিবে এবং অকথা ও অদম্য যৌন-সন্তোগে সকলে উন্মত্ত হইয়া পড়িবে। এই নির্দিষ্ট সময় ছাড়া শতকরা ১০ হইতে ১৫ জন বাহারা যৌন লালসা চরিতার্থ করিতে যাইয়া ধরা পড়িয়া যাইবে, এই গল্পে তাহাদের নাম দেওয়া হইয়াছে “Hots” অর্থাৎ যৌন-লালসা-দৃষ্ট। তাহাদের মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হইবে অথবা ইচ্ছা করিলে তাহারা পোজা পুরোহিতদের দলেও ভিড়িতে পারে। কখনও কখনও তাহারা এই বিধিনিষেধবর্জিত স্তূপের উত্তরে অবস্থিত একটি ছোট উপনিবেশে পলাইয়া যাইতে পারে। গল্পে বর্ণিত ক্যালিফোর্নিয়ায় ধ্বংস-প্রাপ্ত স্থানের খাতা উপাদান বৃদ্ধি করিবার ভার থাকে ডাঃ পুলের উপর। তিনি একদিন জনৈক যৌন-লালসা-দৃষ্টের সহিত সংগ্রহ হইয়া—উত্তরে অবস্থিত উপনিবেশে পলাইয়া যাইবার চেষ্টা করেন।

ছায়াচিত্রের এই পাণ্ডুলিপিখানির হস্তাকর গল্পভাগের জন্ত হলিউডের পক্ষে মনোনিীত হওয়া সম্ভবই হউক আর নাই হউক এবং ইহা যে এটম-উত্তর যুগের প্রতিক্রিয়ায় বিকলাঙ্গ শিশুদের জন্ম ও নিষ্ঠুরভাবে শ্রাণ হননের একখানি সম্ভাব্য চিত্র এবং সে যুগে সকল মানুষই যে বর্বর হইয়া শুধু শয়তানের পূজা করিবে—ইহা তাহারই কল্পনামাত্র—এ তক এখানে অবাস্তব। কিন্তু প্রকৃতির অকুরন্ত দানের অপব্যবহার করিয়া মানুষ যে বর্তমান সভ্যতার ধ্বংসসাধন সচেষ্ট হইয়াছে—ইহার দ্বারা এলডুস হাক্সলি সে সম্বন্ধে কয়েকটি বিশেষ প্রাণধানযোগ্য ইঙ্গিত দিয়াছেন।

আধুনিক যুগের মানুষ মনে করে প্রকৃতিকে সে জয় করিয়াছে কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সে তাহা পারে নাই—“He has merely upset the

equilibrium of nature by fouling the rivers, killing off the wild animals, destroying the forests, washing the top soil into the sea, burning up an ocean of petroleum, squandering the minerals it has taken the whole of geographical time to deposit.”

অর্থাৎ নদ নদী কলুষিত করিয়া, বন্য পশুদিগকে হত্যা করিয়া, অরণ্যের ধ্বংস সাধন করিয়া, বিদ্যেত যুক্তিকার অগ্রভাগ সমুদ্রে নিক্ষেপ করিয়া, সাগর প্রমাণ খনিজ তৈল দহন করিয়া, বহু যুগব্যাপী যে সকল খনিজ সম্পদ পৃষ্ঠীভূত হইয়াছে দুই হাতে তাহার অপব্যয় করিয়া, মানুষ কেবল প্রকৃতির ভারসাম্যকে বিপর্যস্ত করিয়াছে।

ইহারই নাম সভ্যতা? ইহারই নাম অগ্রগতি? পৃথিবীর জন-সংখ্যা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে অথচ—নিষ্কৃষ্ট কৃষিকাণ্ডের জন্ত, যুক্তিকার অবিরাম কসলের জন্ত ভূমির উর্বরতা হ্রাস পাইতেছে। একদিকে শিল্পোন্নতির অবিরাম উদ্ভগতি, অপর দিকে ভূমির উৎপাদন শক্তির শোচনীয় অধোগতি।

ইহাই ত আধুনিকের নরাধর্মের স্তরে নামাইয়া লইয়া যাইতেছে এবং পাপাসক্ত জড়বুদ্ধির ভৈরবীচক্রে আমাদের আত্মসমর্থনের হেতুও ত ইহাই। এ যুগের মানুষের অধঃপতনের মূল কারণ হইল এই—তাহার স্বক্ষে—অগ্রগতি ও জাতীয়তা নামক ভাবের ভূত চাপিয়া আছে—ইহাই লেখকের অন্তিমত এবং এ অন্তিমত তিনি ব্যক্ত করিয়াছেন তাহার গল্পে বর্ণিত পলী-যাজকের মূখ দিয়া।

বাহারা হাক্সলির বই পড়িয়াছেন তাহারাই তাহার বহু বিষয় সম্পর্কিত, উদ্বেগপূর্ণ ইঙ্গিতের সহিত পরিচিত আছেন—এখানেও তিনি প্রত্যেক বিষয়েই তাহার দার্শনিক মত ব্যক্ত করিয়াছেন এবং এক একটি অপরিচিত ব্যাখ্যা দ্বারা নিজের বক্তব্যকে পাঠকের কাছে স্পষ্ট করিয়া তুলিবার চেষ্টা করিয়াছেন। আমরা এই গল্পের মধ্যে সর্ব প্রথম দাখা পাই—প্রথম পৃষ্ঠাখানি উন্মোচন করিয়া। প্রথমেই তিনি লিখিতেছেন “It was the day of Gandhi's assassination” অর্থাৎ সেদিনটি ছিল গান্ধীহত্যার দিন। কিন্তু দেখা যায় বিষয়বিখ্যাত এই ঘটনাটির উপর কোনও ছায়াপাত না করিয়া গল্পে বর্ণিত হলিউডের মানুষটি শুধু নিজের কথাই বলিয়া যাইতেছে। হাক্সলি কোনও কাজের কলাফল অপেক্ষা তাহার পক্ষা সম্বন্ধেই অধিকতর সচেতন, স্মরণ্য তাহার শান্তিবাদী মন যে মহাত্মাজীর প্রতি অধিকতর আকৃষ্ট হইবে ইহাই স্বাভাবিক। প্রদম্যস্তরে গান্ধীজীর পক্ষায়ে শাসন পরিকল্পনাকে তিনি একমাত্র কার্যকরী পন্থা বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু গান্ধীজী সম্বন্ধে তাহার ব্যাখ্যা এ দেশের পাঠক সমাজকে নাড়া দিবে। তিনি বলিহেছেন—

Against the evil doctrine of progress Gandhi was re-actionary who believed only in people. Squalid little individuals governing themselves, village by village and worshipping the Brahman who is also Atman. But the whole story of Gandhi included an inconsistency

most a betrayal, for he got himself involved in the inhuman mass-madness of nationalism. He imagined that he could mitigate the madness and convert what was satanic in the state to something like humanity. But the saint can cure our regimented schizophrenia, not at the centre but at the periphery."

অর্থাৎ অগ্রগতি সম্বন্ধে এই যে মতবাদ তৎসম্পর্কে গান্ধীর মন ছিল প্রতিক্রিয়াশীল। তাঁর বিশ্বাস ছিল একমাত্র জনগণের উপর। সেই সকল দ্বন্দ্বী ক্ষুদ্রকার লোকগুলি পল্লীতে পল্লীতে নিজের নিজের গোষ্ঠীকে রিচালনা করে—পূজা করে ব্রহ্মের এবং এই ব্রহ্ম হইতেছে “আত্মা”। কিন্তু গান্ধীর কার্যকলাপের ইতিহাসে যে অসামঞ্জস্য আছে তাহা প্রায় বাসঘাতকার সামিল। কারণ তিনি নিজে নিয়ন্ত্রণের জনসাধারণের জাতীয়তার উন্নয়ন তাহারই মধ্যে নিমজ্জিত হইয়া গিয়াছিলেন—নিজ ভাবিয়াছিলেন সে উন্নয়নটা প্রশমিত করিবার এবং শয়তানকে জ্বরের পর্যায়ে উন্নীত করিবার শক্তি তাহার আছে। কিন্তু যিনি হিন্দু, তাহার পক্ষে কেন্দ্রে দেশ সংবদ্ধ এই উশৃঙ্খল উন্নয়নের আরোধান করা সম্ভব নহে, কেন্দ্রে নহে পরিধিতে অর্থাৎ ভিতরে নহে বাহিরে উন্নয়নটা প্রশমিত করা তাহার পক্ষে হ্রত সম্ভব হইতে পারিত।

কাজেই হাকসলির মতে বাহারা বুদ্ধিমান, ভবিষ্যৎবর্শী, বাহারা ধর্ম ও পূর্বতার প্রতি আহ্বান, তাহাদের কাছে প্রতিক্রিয়াশীল গান্ধীর রাজ্য ঘটিয়াছে। কিন্তু ঠিক তাহা নহে। বস্তুতঃ বাহারা অসম্ভব ক্ষমের প্রতিক্রিয়াশীল, বাহাদের কার্যকলাপ দুর্বোধ্য ও প্রচ্ছন্ন, এবং

বাহারা কোনও একটি বিশেষ ধর্মের নবজাগরণের জন্য সচেতন, তাহাদের হাতে গান্ধীজীর এই আপাতঃ পরাজয় ঘটিয়াছে।

তথাকথিত অগ্রগতি ও জাতীয়তার উপর হাকসলি যে দোষারোপ করিয়াছেন তাহা কিছুটা মানিয়া লইলেও আমাদের জিজ্ঞাস্য এই যে, সম্ভ্রানে শয়তানের পূজা করিয়া আজ মানুষের যে অধোগতি হইয়াছে ইহাই কি তাহার একমাত্র কারণ? আমরা কল্পনার দ্বারা এমন একটি অবস্থাকে আমাদের ব্যঙ্গ-বিদ্রোপের বিষয়বস্তু বলিয়া ধরিয়া লইতে পারি; কিন্তু আজ আমাদের সম্মুখে মানব-ইতিহাসের যে অধ্যায়টি রচিত হইতেছে—তাহার গুরুত্ব অনুসারে এই প্রকার কল্পনাকে কখনই আমরা বিশ্বাসের বা প্রশংসার চক্ষে দেখিতে পারি না। আমাদের বিশ্বাস মানুষের এই নিদারুণ দুর্গতি ও তজ্জনিত অধঃপতনের মধ্যেও মানুষ “জ্ঞানই ধর্ম” মহামতি সেক্রেটিসের এই উক্তির প্রতি প্রজ্ঞা ও বিশ্বাস রাখিয়া চলিবে এবং ভবিষ্যৎ জীবনের হিসাব নিকাশে বর্তমান মানুষের ক্ষতি অপেক্ষা লাভের অকই আমাদের আগামীকালের মানুষদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে।

জীবনের সমস্তকে যদি আমরা অর্থাৎ লেখকেরা আরও জটিল করিয়া পাঠকের চোখের সম্মুখে উপস্থিত করি তাহা হইলে আমাদের অক্ষমতাই প্রকাশ পাইবে। বাস্তবের সম্মুখান হইয়া তাহার মস্তটাই শুধু দেখিব, ভালটা বিবেচনা বুদ্ধির অতীত হইয়া থাকিবে এমন দুর্ভাগ্য যেন কোনও লেখকেরই না হয়। অন্ধকার পথে আলোর লিখাটুকু যদি ধরিতে না পারি তাহা হইলে ভীষণ অন্ধকার বলিয়া ভয় দেখাইবার কাজ আর বাহাদেরই হউক না কেন, সাহিত্যিকদের কখনই নহে।

## ইতিহাস পাঠে

শ্রীকালিদাস রায়

কি পেলাম ভারতের ইতিহাস পাঠ করি সারা,  
শুধু রাজা বাদশার শোচনীয় পরিণতি ছাড়া।  
রাজার মুকুটলে ভীতি-চিন্তা উবেগের ভার  
কুণ্ডলিত সরীসৃপ-সম করে অন্তস্তি সঞ্চার।  
চারিদিকে হিংসা-দেব অসন্তোষ বিপ্রব বিগ্রহ,  
কোথাও অলস্ত কোথা ধুমায়িত বিবাক্ত বিদ্রোহ  
সহস্র ভোগ্যের মাঝে উপবাসী, ভোগে নাই কচি,  
অজস্র স্বাচ্ছন্দ্য মাঝে নয়নের নিদ্রা বাই ঘুচি।  
নিজ শব-চ্ছায়া হেরে নূণ পানপাত্র হাতে ধরি!  
প্রতি গ্রাসে মৃত্যু গ্রাসে উঠে তার সর্বোচ্চ শিহরি।  
কেহবা শানায় ছুরি কেহ রচে মারণ তোরণ।  
সিংহাসন হিংসাসন কিংবা হয় সিংহনখাসন।  
তবু এ রাজত্ব লাগি মৃতদের অদাধ্য সাধন।  
মহম্মদ বিসজ্জিয়া হিংস্র বস্ত্র পশুত্ব বরণ।

আর সবি ভলে যাই ভারতের ইতিহাস পড়ি

কেহ করে ভ্রাতৃত্ব কেহ করে প্রভুরে সংহার।  
কেহ পুত্রকল্লদের ক্ষৌণ কণ্ঠে হেনেছে কুঠার।  
আপন পুত্রের নেত্র করিয়াছে কেহ উৎপাটন,  
পিতা পিতৃকল্লদের আলিঙ্গনে হয়েছে জীবন।  
সপ্ত-তীর্থ জলে নয় সপ্তজাতিজনের রুধিরে,  
অভিষেক লভিয়াছে মৃত্যুগানে বৈতরণী তীরে।  
ভারতের ইতিহাস শেষ করি হই অন্তমনা,  
প্রজার বেদনা নয় মর্মে বাজে রাজার বেদনা।  
কর্ণে বাজে—“আমার এ সুবিস্তৃত জনম ভূমিতে  
দীনতম কুটীরের এক কোণে দিবে না বাঁচিতে  
ইহারা কি দুই মূঠা—“অসমাপ্ত এই বাক্যখানি  
ভারতের ইতিহাসে সর্ব শ্রেষ রাজকীয় বাণী—  
জাকরাগঞ্জের এক কারাকক্ষে। বাকিটুকু তার  
ডুবায়েছে হতভাগ্য নবাবের রুধির পাথার।

# ফুলমণির গাঁয়ে

শ্রীবাণী দেবী

।ছরখানেক আগে, কাণ্ডনের প্রথম—শীতের হাওয়া পুরোপুরি যায়নি।  
গাল করে' তোর না হ'তেই ফুলমণির ভাই বাদল গোরুর গাড়ী নিয়ে  
হাজির।—“চল যেতে হবে আমাদের গাঁয়ে”—

ক'দিন থেকেই ফুলমণি আমাদের ব'ল'ছিল—“তোরা আমাদের  
গাঁয়ে চল কেনে—আমাদের কাজীপুজো হবে দেখ'বি—নেমুতো দিছি”—  
তা'র আশ্রয়স্থলযোগে আমাদেরও আগ্রহ হ'ল বাবার। আগের দিন  
গাড়ী করে' ত্রিপল, লোহার চেয়ার ইত্যাদি নিয়ে গেছে। পুজোর  
দিন মঙ্গলবার—কস্তার ফুল খোলা। সে যেতে রাজী হ'ল না।  
কাজেই আরি আর উনি যাত্রা ক'রলাম।

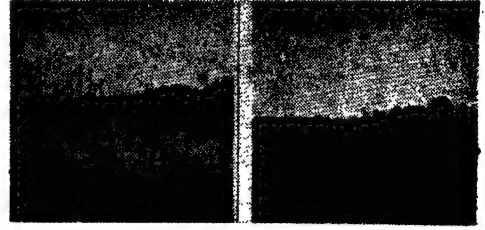


ফুলমণি

উদ্ভূত আকাশের নীচে—খোলা মাঠে—ভোরের হাওয়ার গরুর  
গাড়ীর মধ্যগতি বড়ই ভাল লাগ'ছিল—আরও ভাল লাগ'ত কস্তাটী  
মা'র থাকলে।...

পাতিশিকৈতমকে পিছনে রেখে—আমাদের গোয়ান উত্তর-পূর্বদিকে  
এ'র চ'লল। রেল লাইন পার হ'রে সাঁওতালপলী 'বনডাঙা'কে  
গি'নে কলে, আদিভ্যাপুর ককালীতলার রাস্তা ডাইনে রেখে, বামে  
গে'লাইন ধরে' সোজা উত্তরদিকে এগিরে চ'লল গাড়ী। 'কোপাই'  
নদী: যখন পার হ'লুম, ভোর হ'রে গেছে—সাঁওতালপলী 'মহিবাড়াল'-  
এ' মেরো কোপাটরীতে জল নিতে এসেছে। কী স্থান মনোরম

এতাত। দেখ-মন যেন জুড়িয়ে গেল! ঝক্‌ঝকে পরিষ্কার বালির  
উপর দিয়ে স্বল্পতোয়া কোপাই ব'রে চ'লেছে—অগমান পতিতে কি'বু'বু  
করে',—আঁকা-ধাঁকা বন্ধুর তার পথ, উ'চু নীচু অসমান তার তীর।  
তীরে কয়েকটা সোজা তালগাছ দাঁড়িয়ে—যেন তীররক্ষী সেপাই শাজী।



মহিবাড়ালের মেরো—কোপাই নদীতে জল নিচ্ছে, আর এদিকে  
ফুলমণির গাঁ—দূর থেকে দেখা যাচ্ছে

নদীর বৃকের মধ্যে দিয়ে রাস্তাটা চলে' গেছে সোজা গাঁয়ের মধ্যে।  
নদীতীরের ঐ গাঁটাই 'মহিবাড়াল'। কাঁকা মাঠের মধ্যে, বন-সমুদ্র  
গাছের খোপই জানিয়ে দেয়—এটা গ্রাম, মানুষের বসতি আছে এখানে।  
সবুজ গাছের খোপের মাঝখান থেকে একটীমাত্র তালগাছ সোজা মাথা



গাঁ চুকতেই ছুটি অশ্বখ গাছ

উ'চু করে' দাঁড়িয়ে, যেন সারা গ্রামটাকে পাহারা দিচ্ছে—দূরকে  
নিশানা দিচ্ছে।

নদীর তটতরে জল দেখে, নদীর বৃকে নেমে পড়ার লোভ সামলায়ে  
দায়—গাড়ী থেকে নেমে পড়ে' নদীর বৃকে চলে' দিয়ে সারা দেহ-প্র



বিরে বেন প্রভাতের পরম কণ্ঠী অনুভব করলাম। উনি কোটো তুললেন। নদী পার হ'য়ে, পা ধুয়ে, আবার গাড়ীতে চড়ে বসলাম। গাড়ী চ'লল 'মহিবাডাল' গ্রামের মধ্যে দিয়ে।

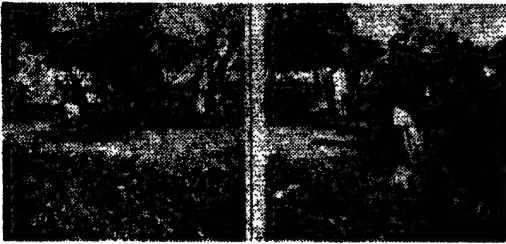
গ্রামে প্রভাতের আগরণের সাড়া প'ড়েছে—কেউ খাঁট দিচ্ছে, কেউ ঘরের খাঁপ খুলছে, কেউ খাটরা তুলে কাৎ করে রাখছে। মোরগরা ঘরের চালে—উঁচু গাছের ডালে চড়ে কঁকোরো—কোঁ—ওঁ



ফুলমণির মা, বাবা পাঁড়ু মাঝি, আর ছোট ভাই বাদল

করে তোয়ের আনান্ দিচ্ছে—ছানাপোনা নিয়ে সুপী শূণ্ডর সব বেরিয়ে প'ড়ল। মেয়েরা কলসী মাথায় করে' কেউ জল নিয়ে ফিরছে—কেউ জল আনতে চ'লল।

যারা জেগেছে বা ঘরের বা'র হ'য়েছে, তারা অধিকাংশই নারী। পুরুষরা সকলেই গ্রাম তখন ঘরের মধ্যে। দু'একজন পুরুষ আমাদের গাড়ীর শব্দ পেয়ে কৌতূহলী হ'য়ে—মুড়িমুড়ি দিয়ে বেরিয়ে একটু দেখে

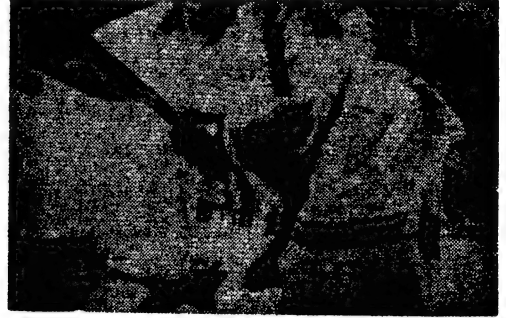


এদিকে সামিগ্রানা খাটিয়ে আমাদের বসবার স্থান হ'য়েছে, ওদিকে বাদল দলবল জুটিয়ে আমাদের খাবার আরোজন করছে

মিল। ছোট ছেলেমেয়েরা দু'একজন গাড়ীর পিছু পিছু কিছুদূর এল। ক্রমে গাড়ী গাঁ ছেড়ে এগিয়ে চ'লল।

ধানকাটা হয়ে গেছে—সেই কাঁকা ধু ধু অমীর মধ্যে দিয়ে রাত্তা—রেললাইনকে বরাবর বামে রেখে। বিপত্ত-প্রসারিত মাঠের মধ্যে দিয়ে কেতে কেতে বায়ে, রেললাইনের ওপারে তালভোড়ের 'কুঠীপাড়া'

প্রাচীনত্বের সাক্ষী দিচ্ছে—সেই সঙ্গে পরিচায় লেপানোছা বরঙালি, হুন্দর ছাওরানো খড়ের চালভুলি, আশেপাশের সজী বাগানের সঙ্গে কুলগাছগুলি গ্রামের অধিবাসীদের সাংসারিক বহুলতা, পরিচ্ছন্ন রুচি ও সৌন্দর্য্যবোধেরও পরিচয় দিচ্ছে। সহজেই মন আকৃষ্ট হয়। বাদলকে জিজ্ঞাসা ক'রলাম—“হ্যাঁরে এখানে কি কোনও সাহেব কিংবা খ্রীষ্টান সাঁওতাল থাকে?”—কুঠীপাড়া নাম এবং গ্রামটির গঠন পারিপার্শ্য দেখে, আমার কেসন মনে হ'ল—হয়তো কোনকালে কোন মিশনারী সাহেব এখানে ছিলেন কুঠী বানিয়ে, কোন খ্রীষ্টান মিশনারী



ফুলমণি রান্না করছে

আছেন। যার ফলে গ্রামটির সংস্থান এত উন্নত ধরণের। সাঁওতালরা সাধারণতঃই খুব পরিচ্ছন্ন পরিচ্ছন্ন এবং তাদের গ্রামগুলি ভারী হুন্দর হয়—কিন্তু এটা বেন একটু বিশেষ ধরণের। বাদল বলে—“না মা এক্ষণ তো কেউ সায়েব নাইকো—সে ভটৎ দিন আগে—যক্ষণ এই লাইন তোয়ের হছিল, তক্ষণ এথেনে একজন লালমুখো গোরাসারে কুঠী বানিয়ে থাকতো ; সেই তো পেখনে দুদকো থেকে সাঁওতালদেরে এনে বসালেক—নাইনে কাজ কন্বার লেগে, না, কিসের লেগে।—তা



গ্রাম পরিভ্রমণের সময় আমাদের পথ পরিদর্শক পাঁড়ু মাঝি ও আরো অনেক এবং এদিকে খাটরায় বসে রুড়ি পাকাচ্ছে পাঁড়ুয় প্রতিবেশী

পর সে সায়েব মর্যে গেল, না চল্যে গেল—কী হ'ল কে জানে—পাঁড়ো 'তালভোড়' বাবুদের ইয়োর পেল—একখ বাবুরো খালনা ল্যার।”...

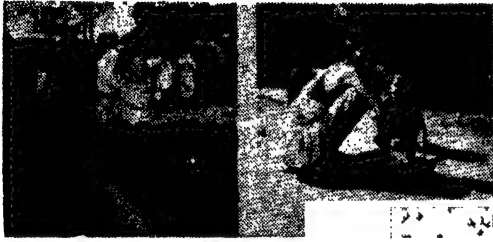
এদিকে একটু এগিয়ে ডানদিকে এক গাঁ—বেহন মোংরা—জেন্নি হতখী—টিক কুঠীপাড়ার বিপরীত। বাদলকে জিজ্ঞাসা ক'রলাম—



মোরা দেখিনি।" বাবল বলে উঠল—“উই, উটো তো ‘মলীপাড়া’ বটে—সাঁওতালপাড়া হবে কেন?—উ গাঁয়ে সব মুসহর খাকে—” আমি ব’ললাম—“ও তাই বল।” উনি বললেন—“মুসোহর সে আবার কী”—

বাবল হেসে বললে—“বাবু তু মুসহর জেনিস্ না? ব’লেই, বিজের মত মুখ করে’ ব’ললে—“মুসহর বলে তাদের, বাদে’র জমী-জীরেং গাই বলদ নাই, বর ছুরোর কপাট চৌকাট নাই, কাঁসা কাপড় থাকে না, দিনে ভিখ্ মেঙে বেড়ায়, রেতে চুরি করে।” উনি বললেন—“তা’ তোরা ভেঁকে ভেঁকে কাজে লাগাস্ না কেন? খেটে খেতে পারে না?”

বাবল ব’ললে—“উই, উ মুসহর বটে, উরা কাক কথা শুনবার লোক নয়—তা’ ছাড়া উরাদের নিতি রোগ, অর, গারে খুঁচলি খা, কে কাল দেবে? মলীপাড়ার তো দুটো কুটে মুসহর আছে, একদম হাতের পারের আঙুলখসা হ’য়ে,—ইবে একদম বাবুরো বলা ক’ করাতে কেউ কেউ বাঁশের খুড়ি কুলো বুনতে লেগেছে।”—ব’লতে ব’লতে মলীপাড়া গ্রামও পেছিয়ে প’ড়ল। বরমুখো গক বেশ জোরে চলছে।.....



আমে মেরেরা বাড়ির উঠানে ধান মেলছে ওদিকে এক মা ও ছেলে বসে ভাত খাচ্ছে

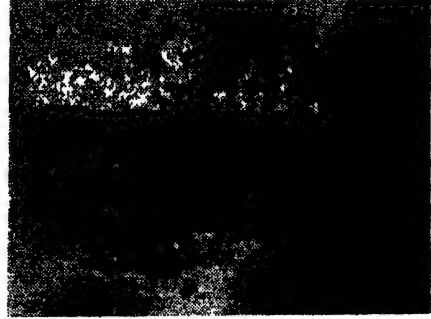
একুতির উম্মুক্ত প্রাঙ্গণ সম্পূর্ণ জনহীন। শুধু আমাদের গোয়ানখানি চলছে এগিয়ে—তিনটি মাত্র আরোহী নিয়ে—আমরা দু’জন, আর শাবাবের যানবাহনচালক একুতির শিশু বাবল। শিশুর মতই সরল হাঁসিভরা মুখ উৎসাহহীণ জরুঁ চক্চকে কালো চোখ—কালো কাকড়া চুল—নিটোল বাহ্য পরিপুষ্ট দেহ, কুচকুচে কালো বরণ এই রূপ সাঁওতাল বাবলের মনটা আনন্দের আলোর পূর্ণ।

কিছুক্ষর এগিয়ে গিয়ে বামদিকে খুব অনেকখানি দূরে বেশ বড় একটি গ্রামের চিহ্ন দৃষ্টিগোচর হ’ল। বাবল অবনি সেইদিকে অঙ্গুলী নর্ষণ করে’ চৈচিরে উঠল—“হাই, দলশীলে—”

‘দলশীলা’ গ্রামের কথা অনেকদিন থেকেই গল্প শুনেছি। বোধ হয় ‘দলশীলা’ নামটির জন্মই স্মৃতিতে রয়ে গেছে, কিছু কৌতূহলও আছে। ‘দল’ ভাষার মনের আনন্দে শুনিবে চ’লল—দলশীলার বাবুরের কথা—কাঠালাদের কথা—বাঁধানোখাট—ভাঙা বখির—পোলক ডাকার—

ছিল ওটা। এখনও তা’র বিগত-বৈজবের স্মৃতি ‘দলশীলা’ নামটির বহন করে’ চলছে—বিরিচি আরতনের মাঝে মজাপুর, ভাঙাখাট, ভগ্ন দেউলের সঙ্গে সঙ্গে।.....

বামদিকে রেললাইনের পারে একটি ছোট গ্রাম, দূরে সামনে কোপাই স্টেশন দেখা গেল। গ্রামটি দেখিয়ে বাবল ব’ললে—“হাই, শেওলপুহ গাঁ”—আমি ব’ললাম—“তা’ হ’লে তো এসে পেছি, তোদের গাঁ জেঁ পীতলপুর—আমরা তো ওখানেই বাব”—বাবল ঘাড়নেড়ে—“না তু”



একটি বাড়ির বাইরের দৃশ্য—কতকগুলো শূণ্যর গৃহস্থানীয় ডাকে উজ্জিষ্ট খেতে এসেছে

কেনে বাব—আমরা বাব শেওলপুর মাঝিপাড়া—ব’লেই গরুর মুখ কিরিয়ে পুষদিকে গাড়ী চালিয়ে দিয়ে ব’ললে—“হাই দেখ, আমাদের গাঁ শেওলপুর বটে—”

দূর থেকে উম্মুক্ত প্রাঙ্গণের মাঝে ঘন সবুজ পাত-ভব্ধি ছোট গ্রামটি যেন ছবি। উনি পাড়ীতে বসেই ফুলমণির গাঁ’র ছবি ভুলছেন। আমাদের গাড়ী দেখেই দু’ একজন এগিয়ে আসতে লাগল। কেবল সকাল হ’য়েছে। ঝিকমিকে রোদ। মেরেরা আলোর উপর দিয়ে



গ্রামের কুরো মেরেরা জল নিচ্ছে—কুরোটি কংক্রিট কমিটি থেকে করিয়ে দিয়েছে। একটি গ্রীলোক জল নিতে বাচ্ছে ঐ কুরো থেকে

লাইন করে’ বাটতে চলছে—পরিষ্কার করে’ চুল আঁচড়ানো, কোমরে লাল গামছা বাঁধা—কেউ প’রেছে শাদা বাংলা শাড়ী—কা’রও পরনে রঙীন সাঁওতালী কাপড়। ফুলমণিও রোজ এই মন মাইল রাত্তা হেঁটে

আছে। গাঁয়ের সামনে চুকবার মুখে ফুলমণিদের বাড়ী। অশু-  
পাণ্ডের তলা দিয়ে, বাঁশগাছের পাশ দিয়ে চুকেই আমড়া গাছ। আমড়া  
গাছটা ফুল ভরে' গেছে—পাশে ফুল-পাতাহীন রিক্ত কাঠচাপার গাছটি  
আসন্ন ফুলের আশায় আঁকা-বাঁকা ডালপালার হাত মেলে দিয়ে দাঁড়িয়ে  
আছে। তার পাশে আতাতলায় ঠাকুরতলা—পূজার বেদী। লম্বা  
চৌকো বেদী—সামনে অর্ধচন্দ্রাকারে সিঁড়ির ধাপের স্তম্ভ করা—দুইটি



গা ঘুরে এসে পাণ্ডের ছায়ার বসান—সামনে ছেলেরা খেলতে লাগলো  
চমৎকার করে' নিকানো গোবর দিয়ে গোল করে'। তারই সামনে  
সমান চৌকো চাঁছাছোলা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন গোবর দিয়ে নিকানো  
জায়গার সামিয়ানা খাটরে আমাদের জন্ত জায়গা হ'য়েছে। খাটরা  
পেতে—তার উপর বাড়ীর বৌএর নিজ হাতে বোনা খেজুর পাতার  
চাঁটাই বিছিয়ে, আমাদের বসবার আসন করে' রেখেছে। নতুন উত্থান  
পেতেছে—আমাদের জন্ত সেইখানেই। বাতাস উঠল—খাটরা কাৎ



ছোট ছোট ছেলে-মেয়েরা এক জায়গায় বসে জটলা করতে লাগলো

করে' তার উপর চাঁটাই আঁড়াল করে' বাতাস ঠেকিয়ে ফুলমণি  
আমাদের জন্ত রান্না চড়িয়ে দিল। বাতাস মহা উৎসাহে নুগী ছাড়তে  
লেগে গেল—আমাদের খাওয়াবে। ফুলমণির মা বাবার আমাদের  
পেয়ে আনন্দ আর ধরে মা—কী করবে—কী না করবে তেবে  
পাচ্ছে না।

এখনই ফুলমণি চা করে' দিল। চা পান করে' আমরা গা ঘুরতে  
বেরোলাম। ফুলমণির বাবা পাঁড়ুখাটি আমাদের আগে আগে পথ

বেশ হুম্বর ছায়া-শীতল গ্রাম এই শীতলপুর। এখনই ফুলমণি  
বাড়ী। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন চারিদিক—আশে পাশে ফুলতলার ছায়া  
আর শুণ্ড চ'রছে। বাড়ী চুকতে সামনেই বেশ হঠপুই সতেজ বতি  
তিনটি তালগাছ—একজায়গা থেকে উঠে—রসগ্রহণের-শিকড়টি এক  
স্থানে রেখে, বা'র পাতা মেলেতে বতটুকু জায়গার দরকার ঠিক ততটুকু  
ব্যবধান রেখে—তিনটিতে একই আলোর উদ্দেশে আকাশের দিকে  
মাথা তুলে দিয়েছে। একটা বেশ বড়ো, একটা মেজ, একটা গুঁর মত  
বেশ ছোট—যেন বাবা মা ও মেয়ে।

তালতলার বাড়ীর উঠানে ধানের 'পালুই' বাঁধা আছে, এখন  
মাড়ানো হয়নি। ঘরে চুকতে আগে ঢাকা বারান্দা, একপাশে উল্লু-  
একপাশে নুগীর সংসার, তারপর ঘরে চোকবার দরজা। মাটির খ  
পরিপাটি করে' নিকানো, হুম্বর করে' ছাওয়া। কোন জানালা নো  
একটি মাত্র দোর—ঘরের ভিতর ঘুটুটে অন্ধকার—ফুলমণি ঘরে চু



গাঁয়ের সর্দার কাঁধে করে' কালী ঠাকুর বয়ে নিয়ে আসছে, তারপর পূজো  
জায়গায় বসানো হ'য়েছে মা কালীকে। দু'পাশে সর্দার আর সর্দারগী

মেওয়ারলের ফুলুসীতে রাখা কেরোসিনের ডিবে জ্বলছে দিল। ঘরে  
ভিতর আধখানা মেজে জুড়ে ধান বাঁধা আছে—ঘড়ের দড়ী পাকি  
ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে—তাকে ওরা 'বাখার' বলে।

ফুলমণি নিজের ঘর দেখিয়ে রান্না করছে চলে' গেল—আমরা  
পাশের বাড়ী গেলাম। পাঁড়ুর প্রতিবেশী নিজের উঠানে খাটরার বসে  
দড়ী পাকাচ্ছে—তাদের চালে একাঙ লাউ। আঙিনায় বসে' মা রেখে  
ভাত খাচ্ছে। মেয়েরা পারে করে' উঠানে ধান মেলেছে। গ্রামের  
বাড়ীর উঠানেই ধান মেলা। প্রত্যেক বাড়ীর উঠানে স্বল্পের পরিষ্কার  
করে' নিকানো—আঙিনাতেই সব কাজকর্ম। বা'র বাড়ীর উঠানে  
মাঝি—সকলেই হাসিমুখে আদর আপ্যায়ন করছে—বসতে বলছে  
ছেলেমেয়েরা দলবেঁধে আমাদের ঘিরে দাঁড়িয়েছে, লড়াই করছে, খেলেছে  
—আমাদের সঙ্গে সঙ্গে ঘুরছে—প্রতিবাড়ী থেকে দুই একটা ছেলেমেয়ে  
বুড়বুড় আমাদের সঙ্গে যোগ দিয়ে দলবৃদ্ধি করছে। প্রতি বাড়ীতে  
নুগী, শুণ্ড, গরু আছে। শূকরের বাড়ীর শিঙনে থাকে, চরে' বেটে  
—'বুড়ুই আর আর আর'—করে ডাকলেই খেতে এল। কাঠের বৈঠক  
চৌকো নৌকার মত শূকরের খাবার পাত্র—গৃহ-সংলগ্ন ছোট একটা

গ্রামের একটু বাইরে কীকা জায়গার একটা পাঠশালা—‘ঐনিকেনন’ পরীউন্নয়ন কাজের কলে এর স্ট্রিট, ছোট ছেলেমেয়েরা তাতে পড়ে। গ্রামের মধ্যে একজন লেখাপড়া জানা লোক আছে—সেই পড়ার। গ্রামের সকলে তাকে পণ্ডিত বলে ডাকে। পণ্ডিতের নাম ‘ভড়’ মাঝি। এই ভড়মাঝিই বোলপুর... ঐনিকেনন বাওয়া আসা করে, যোগাযোগ খবরাখবর রাখে। পণ্ডিতের সঙ্গে আমাদের দেখা হ’ল না—সে তখন বোলপুর গেছে।

পণ্ডিতের বাড়ীর সামনে পাকা ইঁদার—জিআসা করাতে ব’ল্লে—কংগ্রেসের লোক করে’ দিয়েছে। ঐ কুরোর জলই সারা গ্রামের লোকের পানীয়। পণ্ডিতের সমস্ত বাগান বেশ বড়—ভাল কলার গাছও আছে। পণ্ডিতের বাড়ীর পিছনেই বড় গাছটার গায়ে কমানিষ্ট পার্টি থেকে বিজ্ঞাপন লটকে দিয়ে গেছে—ধর্মঘটের বাগী—“সাত ঘণ্টার বৈধী কাম ক’র না—ধর্মঘট কর, ধান তোমাদের” ইত্যাদি। জিআসা করলুম—“এটা কে টাঙাল?” বল্লে—“জেনিনে কে কখন হুলিরে’ দেয়—বোধহয় রেতে করে”—



মধ্যাহ্ন ভোজনের পর কেরার চিত্রা

গণেশমাঝি গাঁয়ের কবিরাজ। তার বাড়ী অর্থাৎ কবরজ বাড়ীর উঠোনে শিবতলা—ত্রিশূলপোতা বৈদী—সামনে বলি দেবার হাড়িকাঠ পোতা। প্রতি বাড়ীতেই পুজোর বৈদী—ঠাকুরতলা আছে—বলি দেবার জায়গা শুধু কবরজবাড়ীতেই দেখলাম। গ্রামবাসীর অস্থি শিবধে সেই জড়ী বড়ী শিকড় পাতা দেয়—চিকিৎসা করে—বাড়, কুক, মৎ, তেলপড়া, ধুলোপড়াও দেয়।

গ্রামের সর্দারের নাম ‘ভাতন’ মাঝি। সর্দারএর অবস্থা বেশ ভাল। সর্দার বেশ লম্বা জোয়ার। সর্দারগীরও বেশ জাঁকিয়েল চেহার। তা লোকজন নিয়ে কালীপ্রতিমা আনতে গেল—রেললাইনের ওপারে গেল পুর গাঁয়ে। প্রতিমা এনে বসাবে বলে উঠোনে ঠাকুরতলার একটা ছোট্ট ছুঁড়ে তৈরী ক’রেছে—কাঁচাধান, ভালপাতা দিয়ে।

গ্রামে চুকেই হুলমণির বাড়ী—গ্রামের শেষপ্রান্তে কুহুমের বাড়ী। হুলমণির বাড়ীর পরে একেবারে প্রান্তসীমার একটা বটগাছ—এইটাই গ্রামের শেষ। কুহুমের বা মেথলার ঘরের বাওয়ার কোণটালো কীসার

বাঁধা একটু লোহার তার এবং বড়ী দিয়ে—লোলুপ বৃষ্টিতে ভাঙের দিকে তাকিয়ে কুঁকুঁ করছে। চালে বেশ বড় বড় লাউ। বাড়ীর পিছনে গাঁয়ের শেষে উত্তর দিকে—ঝোপ ঝোপ ফুলগাছ—হুলমণির গন্ধবিশিষ্ট শাদা ফুল খোকা খোকা ফুটেছে। দেখতে কতকটা ‘ভাতীরা’ ফুলের মত। কতবার জন্ত ফুল ফুলে নিলুম—ওঁর কথামত দু’টো ভাল কেটে নিলুম বাড়ীতে গাছ ক’রব বলে।

কিন্তু তার পথে রাসমণির বাড়ী গেলুম। রাসমণির বাড়ী ঠাকুরতলার দুটা পাথর বসানো। পাগলমাঝির বাড়ীটা বেশ বড়—বেশ মনে হয় অবস্থা ভাল। দানীদের বাড়ীর উঠোনে বেশ পুরনো কাঁঠালগাছ ও অনর্থগাছ। গাঁ বুরে কান্ড হ’রে গাছের ছায়ার বসুলায়। ছেলেরা সামনে খেলতে লাগল। উনি সামনে কোটা তুলে চ’লেছেন। আমার ঘিরে ব’ল্লে শিশুরা—সকলেই খুব খুশী।

গ্রাম ঘুরে, কিরে এসে দেখি—ততক্ষণে হুলমণির আলুচুড়ি, বাঁধাকপির তরকারী রান্না হ’রে গেছে, দুগ্গা ছাড়িয়ে, কুটে রান্নার জন্ত প্রস্তুত। ডেক্কাতে গরমজল ব’সেছে। প্রতিটা জিনিষ হুলমণি রেখে



হুলমণির আর এক ভাই মদন এই সময় বৌএর মাথার বোকা চাপিয়ে হাট ক’রে ফিরলো। ভামিনী ছোট ভাইকে কোলে ক’রে ঝাড়িয়ে ঝাড়িয়ে দেখতে লাগলো আমাদের বাড়ীতে চলে ঢাকা দিচ্ছে। কীসার বাসনজন্মি বকু বকু ক’রছে। চারিদিক পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন।

গ্রামে দু’টা কালীপূজা হয়। একটা সর্দার ভাতন মাঝির বাড়ী—আর একটা হুলমণির বাবা পাঁড়ু মাঝির বাড়ী। সর্দারের কালী আপে এল। বাড়ীর লোকেরা মাথার কোমরে লাল গামছা বেঁধে, মাকে কীধে করে’ নিয়ে এল। সর্দার গৃহিণী হাতে চালচিহ্ন বহন করে’ আনল। উনি সর্দার সর্দারগীর ছবি তুললেন না কালীকে নিয়ে।...

হুলমণির দাদা মদন এল হাট করে—বৌএর মাথার বোকা—হুড়িতে হাটের জিনিষ, তেলের বোতল ইত্যাদি—মদন মাঝি এল খালিমাথার খালি হাত পা বেড়ে। আমাদের দেখে খুব খুশী—জিহ্নেবর

কুলমণির ঐকান্তিক নির্ভা আত্মরিক বস্ত্র রাঙ্গা হ'ল বেশ অস্বস্ত।  
খাটুর উঠে ব'ল্লাব—বখাল-ভোজনের পর।...এইবার যেতে হবে—  
একখাটা বস্ত্রারই মনে হ'চ্ছে—এদের অন্তরতরা সরল-ঐতি ততই  
নিবিড় করে' টেনে রাখছে।...

বেলা আড়াইটার পর পী থেকে রওনা হ'লুম—আর ঘেরী  
ক'রুলে আমাদের পৌছে নিরে—বাগলের কিরতে অনেক রাত হ'রে  
বাঁধে। সকলেই সন্নিবদ্ধ অনুরোধ ক'রুলে—“আজকের রাতটো  
থেকে না,—পুজো দেখে বর বাঁধি”—কিন্তু বাড়ীতে মেয়ে একা  
আছে। বাঁধন ছিঁড়ে বেরোতেই হ'ল—গায়ের অর্ধেকের উপর লোক

এসে গাড়ীর কাছে জড় হ'ল। সকলেরই মুখে এক কথা—“আবার  
আসিস্, আবার আসিস্”—তারা বেশী কথা বলে না—প্রকাশের তারা  
জানে না।...

শেষ পর্যন্ত বাড়িরে রইল কুলমণির ধোঁবাধি ভাবিবি ছোটতাইটিকে  
কোলে নিয়ে—বতকণ দেখা যায়।....

আমাদের বাড়ীর উঠোনে কুলমণির গায়ের কুল ফুটেছে—বহু  
দ্বিতির হুরতি নিরে।—দেখি, ভাবি,—আজও পরশ পাই সেই  
আত্মরিক ঐতির—শুভে পাই সেই শুভরূপ “আবার আসিস্—আবার  
আসিস্”—

## শরৎ-ত্রী

### শ্রীগোবিন্দপদ মুখোপাধ্যায়

শারদ রাতি আজি আলোতে ঝলমল  
চাঁদের হাসিখানি রূপালী ছল ছল,

শেকালী হুঁসেতে

বনানী পথে যেতে,

কাহারি মেহাশীবে হৃদয় ভরে বল  
সোনালী স্রোতে ভাসে তটিনী ঢল ঢল।  
সাহানা-গীতিহর আকাশে ভেসে চলে  
দখিন হাওয়া কানে কত কি কথা বলে

শ্রামল অঞ্চল

বাঁতাসে চঞ্চল

কাহারি দোলে বল ধানের শ্রাম ক্ষেতে  
শারদ-ত্রী সে যে কবির মানসেতে  
বনানী মুখরিত দোয়েলা-গীতি-ভানে,  
শ্রামারি মধুলীবে ছন্দো জাগো প্রাণে ;

জোনাকি ঝাঁকে ঝাঁকে

জানি না কি যে আঁকে

যেখানে আলো-ছায়া অথবা বায়ু পথে,  
শারদ-রাশী আসে আলোক জয়রণে।  
আজি এ মধুরাতে শারদ জোহনাতে  
কালিনা যত আছে মনের আভিনাতে,

সকলি মুছে থাক

কেবলি ভরে থাক,

## শারদ ইঙ্গিত

### শ্রীনীহাররঞ্জন সিংহ

হেধার হোধার নীল আকাশ

ধূসর মেঘের দল ?

আজ শরতের ছপূর বেলা

মন করে চঞ্চল।

শুভট ভরা ঘরের কোনে

রইব না সংগোপনে

বাহির হলে পল্লী পথে

নাশতে পারে জল !

ভিজার ভিজাক আকাশ তরা

ঝলুণা বরা জল।

ধূসর মেঘের দল।

মেঘের ঝাঁকে প্রথর তর

রবির কিরণ শর !

হানিছে দেহে তপন তাপে—

প্রাণ আজি জলজল !

পথের পাশে-পাথের ছায়া,

বাঁতাস বুকে বিলার মারা,—

ফুটেবে কি আজ শারদ শোভার

নিউলী শতমল !

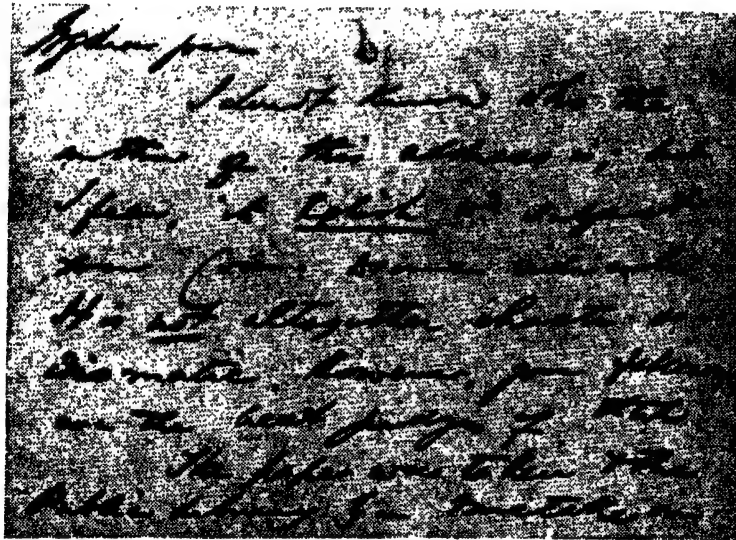
ঝরণ নানার ঝরণ আবার

## সাহিত্যিকগণের হস্তলিপি

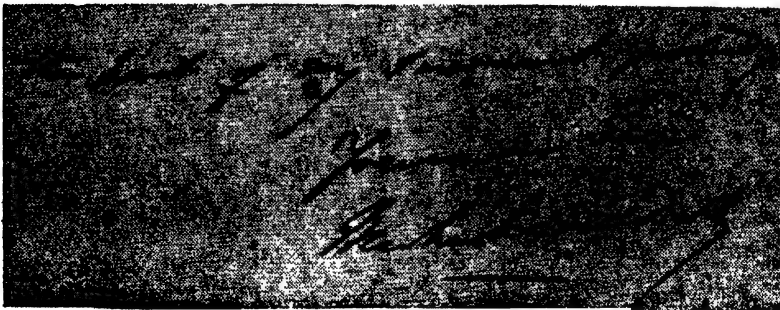
আমরা এই সঙ্গে কয়েকজন স্বর্গত প্রভাতনামা সাহিত্য-  
ব্রতী হতলিপি প্রকাশ করিলাম ।

মাইকেল মধুসূদন দত্তের একখানি ইংরাজি পত্র ( ১নং ও ২নং ) সহজেই পাঠ করা যায় । বক্তিমতায় চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের পত্র দুখানি ( ৩নং ও ৪নং ) ব্যক্তিগত হইলেও একখানির শেষে তাঁহার স্বভাবসুলভ রসিকতা আছে । নাট্যচর্চা গিরিশচন্দ্র ঘোষের ( ৫নং ) পত্রখানিও ব্যক্তিগত — প্রিয় ভক্ত ও শিষ্য অবিনাশবাবুকে লিখিত । বিজ্ঞান-লাল রায় মহাশয়ের পত্রখানি ( ৬নং ও ৭নং ) উল্লেখযোগ্য

— তাঁহার জীবনের শেষভাগে লিখিত। শেষ পত্রখানি (৮ম ও ৯ম) কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে লিখিত। পুস্তক বিক্রয় সম্বন্ধে নির্দেশ আছে। আমরা কল্পখানি পত্রই শ্রীযুত সরোজকুমার চট্টোপাধ্যায়ের সৌজন্যে পাইয়াছি—মূল পত্রগুলির কটো নইয়া তাহা হইতে ব্লক করা হইল। শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদিগের হস্তলিপি সংগ্রহ করার আশ্রয় অনেকের মধ্যেই দেখা যায়। এই সকল পত্র-লেখকের লিপি সংগ্রহ আর সম্ভব নহে—সেজন্যই এগুলি সাধারণের কাছে মনোজ্ঞ হইবে বলিয়া বিশ্বাস।



ফল্টা নং ১









# দ্রাণী



## মূলতান—তেতানা

( বাহুল্য অ্যাল )

তোমার চরণ সবে নিত্য করিছে ধ্যান  
হে মঙ্গলময় দুখ হ'তে কর আণ ।  
তব রূপের জ্যোতি মনদিশি আলো করে  
মধুর মুরলী স্বরে উঠিছে লহরী তান ॥

কথা, সুর ও স্বরলিপি—সঙ্গীতনায়ক শ্রীগোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়

না সা জ্ঞা দসা । পা পা পা পা । জ্ঞা পদা পা দনা । জ্ঞা স্বা সা - ।  
তো মা র চ র থ স বে নি . . . ত্য ক রি ছে ধা ন্

জ্ঞা দনা পনা স'স্বা । স' না দা পা । পা জ্ঞা জ্ঞা দনা । জ্ঞা স্বা সা - ॥  
হে . ম . . . জ ল ম র হু থ হ তে ক র আ ণ

জ্ঞা জ্ঞা পা না । না না - না । স' স' স' স' । স্বা স'না স' স'  
ত ব রূ - পে র জ্যো . তি দ . শ দি শি আলো . ক রে

পা না স' জ্ঞা । স'না দা পা । পা জ্ঞা জ্ঞা জ্ঞা । জ্ঞা স্বা সা - ॥  
ম ধু র ম র . লী স্ব রে উ টি ছে ল হ রী তা ন্

১। তান—

২ সনা -১ সক্ষা জ্ঞা | পা পা দনা পা | -১ ক্ষাদা পপা -১ | ক্ষা জ্ঞা -১ -১  
 জো• • মা• • • র চ র • ৭••• • • • • •

২ সক্ষা জ্ঞা পা -১ | জ্ঞক্ষ পনা -১ দপা | পা জ্ঞা -১ -১ | ক্ষা দা পা -১  
 স• • বে • নি - - - - - ত্য - - - - - ক রি ছে •

২ জ্ঞক্ষা পনা স'না দপা | ক্ষজ্ঞা ঋসা ন'সা -১ II  
 ধ্যা - - - - - - - - - - - ন্ •

২। পক্ষা জ্ঞক্ষা পনা -১ | স'জ্ঞা ঋ'স' -১ | স' ঋ' স' -১ | না দা পপা -১  
 নি• •• •• - - - - - ত্য - - - - - ক রি ছে • - - - - -

২ জ্ঞক্ষা পনা -১ -১ | দপা ক্ষজ্ঞা ঋসা -১ II  
 ধ্যা - - - - - - - - - - - ন্

৩। অন্তরার তান—‘ভব রূপের জ্যোতি’ গাহিয়া—

১। পক্ষা জ্ঞক্ষা পা না | স'জ্ঞা ঋ'স' -১  
 জ্যো- - - - - তি - - - - -

২। ন'স' জ্ঞা ঋ'স' নদা | পক্ষা জ্ঞক্ষা সনা -১  
 জ্যো - - - - - তি - - - - -

## গান

## বিশ্বনাথ চট্টোপাধ্যায়

আজি বিদায় দিনে ভীক মিনতি ধানি  
 বেন তোমারি ঘারে কহে ব্যথার বাণী ;  
 ভব নিবিড় স্থখে  
 যদি গোপন বৃকে  
 বাজে আমারি গীতি গৈয়ো নরণ মানি ।

যদি চলিতে পথে কতু মাধবি বনে  
 তুলে চমকি চাহ মোর সমাধি ক্ষণে  
 তবে দাঁড়াবে বারে  
 দিও পরশ তারে  
 নিও প্রেমের পূজা মোরে স্বপনে আনি ।

## বাঁধন

### ত্রিশস্তিপদ রাজগুরু

...সদীতজ দেবকর্ষ প্রথমে আপত্তি তোলে, কিন্তু অমিরার কথাত্তে বাধ্য হয়েই মত দিতে হয়! বহুকালের পুরোনো বংশ ওই রায়চৌধুরীদের। এ অঞ্চলের মধ্যে এককালে ওয়াই ছিল সব চেয়ে প্রতাপশালী জমিদার, ...পূর্বপুরুষের সঞ্চিত অসীম ধন সবকিছু নিঃশেষ হয়ে এসেছিল তাদের বংশ পরম্পরার উত্থলতায়... এমন কি কত নিরপরাধ নরনারীর রক্ত ওই পুরোনো ধ্বংসপ্রায় প্রাসাদের ভিত্তিমূল রক্ষণ করে দিয়েছিল তার ইয়ত্তা নাই। আজ তার চারিদিকে ছর্ভেত জঙ্গল। বাকী খাজনার—দেনার দায়ে বা কিছু ছিল আদালত হতে নীলাম হয়ে যাচ্ছে! অমিয়া কিনবে ওদের সেকালের দামী দামী আসবাব—অনেক সস্তায় পাওয়া যাবে, কেনই বা কিনবে না! ...বাধ্য হয়েই শেষে মত দিতে হয়েছে দেবকর্ষকে!

নতুন করে সংসার সাজাতে চায় অমিয়া! দেবকর্ষ শিল্পী-গুণী বাইরের জীবনেই তার আকর্ষণ বেলী, ঘরে যেটুকু সময় থাকে নিজের সাধনা নিয়ে মত্ত থাকে! ...আপন করে তাকে কাছে পাবার মত একটুও সময় অমিয়া পায় না! না পাক...তবু তার গৌরব...দেশজোড়া খ্যাতিসম্পন্ন ব্যক্তি তার স্বামী! নারীর সমস্ত কামনা বাসনাকে চেপে রেখেও সে আত্মহারা শিল্পীকে স্মৃতি করতে চায়—সেবা দিয়ে—যত্ন দিয়ে। বান্ধবীরা বলে—তুই তিলে তিলে নিজেকে নিঃশেষ করে দিচ্ছিস অমিয়া! ...

হাসে অমিয়া!

নীড় সে বেঁধেছে...নীড়কে সে স্বপ্ন দিয়ে ঘিরে রাখতে চায়!

...তাদের ঘরের সৌন্দর্য্য বেন শতগুণ বেড়ে উঠেছে। —পুরোণো মেহগুণি কাঠের বড় পালঙ্কটা শোবার ঘরেই তুলল! ...বহুকালের কত স্মৃতিজড়িত আছে ওর সঙ্গে কে জানে! কতজনের তৃপ্তি অতৃপ্তির আশা নিরাশা ওর প্রতিটি অঙ্গ-সন্ধিতে মাথান কে তার হিসাব রাখে! ...আরনা বসানো কাঠের উপর নিপুণ হাতের আকরি কাটা দেওয়াজটার দিকে চেয়ে বেন আত্মহারা হয়ে যায় অমিয়া!

অনেক সস্তায় পেয়েছে সমস্ত আসবাব! ...আজ দেবকর্ষকে চমকে দেবে সে! এক রাজের মধ্যে সারা বাড়ীটার রূপ বেন বদলে গেছে! ...

...বর্ষার রাজি! দেবকর্ষ বাইরে থেকে কিনে বাড়ীতে পা দিয়েই একটু বিশ্রিত হয়ে যায়! ...আকাশে আকাশে প্রাবণ রাজির বজ্রনাদ...বিজলীর চকিত আলোয় সারা আকাশের কালো বৃকে বেন কোন অশরীরীর আনাগোনা! ...অমিয়া এগিয়ে আসে...ছোটোখাে তার আশা—আনন্দের আলো!

...কেমন হয়েছে বাড়ীখানা বলত! মোটে দুহাজার টাকায় সব হয়ে গেছে। পালঙ্ক...ওই চীনা দেওয়াজ...! ঝাড়—

সমস্ত ঘরগুলো দেখিয়ে নিয়ে বেড়ায় অমিয়া দেবকর্ষকে! বহুকালের স্মৃতি-ভারাক্রান্ত আসবাবগুলো... অতীতকালের কোন সামন্ততান্ত্রিক যুগের এক তুচ্ছ স্বপ্নময় পরিবেশ সৃষ্টি করে তুলেছে! দেবকর্ষের অতীন্দ্রিয় মনে বেন পরশ বুলায়!

রাজি নেমে এসেছে! ঘন ঘোর রাজির তমসা গ্রাস করেছে সারা ধরিজীকে। আকাশে বর্ষণধারার জুঁক গর্জন! ...বিজলীর তীব্র ঝগক...দিক হতে দিগন্ত জুড়ে কোন স্মৃতির দশন হেনে দিয়ে যায় অতীতের ঘনতমিশ্রার বৃকে! ...

দেবকর্ষ জেগে ওঠে! ...বিছানার উপর উঠে বসে! ... অন্ধকারে অছত্তব করে ঝাড় লঠনটা তুলছে...কাঁচের ঘস! ...ঘসিতে আওয়াজ হচ্ছে ঠুং ঠাং! ...বাইরে বর্ষণ ধ্বনির মুখর সুররেশ! ...ধীরে ধীরে অস্পষ্ট একটু সুর বেন কুটে উঠছে! ...বিশ্রিত হয়ে ওঠে দেবকর্ষ! ...বেহাগের করুণ সুর যে আলাপ করে তার বাড়ীর আশে পাশে! ...চারিদিকে বর্ষার বরিষণ...প্রকাণ্ড বাগানঘেরা বাড়ীর মধ্যে কার এ সুর! ... ধীরে ধীরে বেরিয়ে আসে সে! ...

হল বারান্দা দিয়ে এগিয়ে চলে সামনে...গানের সুরটা তখনও শোনা যায়...! এ মিষ্টি কর্ণে কার আলাপ! ...

কেমন যেন সারা মনে একটা শিহরণ আগার!...এ সুর যেন তার চেনা...চেনা এ কণ্ঠস্বর!...

নীচের সিঁড়িতে কাকে দেখে যেন চমকে ওঠে দেবকঠ! বিছাতের এক ঝলক আলোর দেখে একজন নারী...এগিয়ে চলেছে...গানটা সেই গাইছে!...এ!...যায় সে সেইদিকে!...

কিন্তু ধরতে পারলেনা, তাকে! নারীমূর্তি সামনের হলঘরটার ঢুকে গেল!...পিছু পিছু সেও গেল!...কোন অশরীরী আত্মার আকর্ষণ যেন তাকে ছবীর গতিতে টেনে নিয়ে চলেছে হলের মধ্যে!...অন্ধকার ঘরখানার মধ্যে ঢুকেই কেমন যেন স্তম্ভিত হয়ে যায় দেবকঠ! কার শাড়ীর বস বস শব্দ তখনও যেন শুনতে পায় সে! অন্ধকারে দেশলাই জ্বালতেই...দেখতে পায় দূরে দাঁড়িয়ে রয়েছে একটি নারী। অশ্লীল আলোকে তার মুখের হাসিটুকু দেখতে পায়, আর দেখতে পায় তার চোখের কোণে সেই হাসিরই রেশ...

এগিয়ে যায় দেবকঠ...তাকে কিন্তু কোন সাড়া নেই!...দেশলাই নিভে এসেছে।

আবার আলো একটা...মেয়েটি তখনও সেইখানে! দেবকঠর সারা শরীরে একটা শিহরণ আগে। আকাশে বিছাতের ঝলক!...প্রতিটি স্তম্ভীতে যেন উচ্চ রক্তপ্রবাহ! এগিয়ে যায় আরো সে!...

...চমকে ওঠে...দেবকঠ!...বুঝতে পারে না কোথায় সে এসেছে!...যেন কোন এক অজানা জগতের পথে চলেছে সে!...হাত বাড়ায়...কিন্তু এ কি!...কোথায় গেল সেই নারী!...

...মস্তল শীতল স্পর্শ!...অন্ধকারে অস্বস্তি করে দেবকঠ, ...একটা ছবি!...

ললাটে ফুটে উঠেছে তার বেদবিলু!...সুরটা মিশিয়ে গেছে!...আকাশে বজ্র নির্ঘোষ!...কুটিল কণিনীর মত ঝেকে ঝেকে দেখা দেয় কালো দিগন্ত চিরে বিজলীর আভা!

...পা দুটো ধর ধর করে কাঁপছে দেবকঠের! চোখের সামনে কেমন যেন আধারের বনিকা!...দুহাত দিয়ে একটা কিছু অবলম্বন ধরে নিজেকে দাঁড় করিয়ে রাখতে চায়!...

ফুটে উঠেছে দিনের আলো। দেবকঠ বিছানার ওরে ওরে ভাবে কালকের রাজির ঘটনাটা!...ঠিক বুঝতে পারে না সে স্বপ্ন দেখছিল কিনা!...তবু মনে যেন কেমন একটা জড়তার ছায়া!...

চা নিয়ে আসে অমিয়া! এই সময়টুকু তাদের জীবনের একটা মধুর ক্ষণ...অমিয়াকে আজ আদর করে না দেবকঠ!...বিস্মিত হয়ে যায় অমিয়াও! হরত বা শরীর খারাপ!...

রোজকার সমস্ত কাজের রীতির একটা পরিবর্তন লক্ষ্য করে আজ অমিয়া! সকালে রেওয়াজ করতে বসত, আজ...আর তা করে না!...ঘরের দরজাটা বন্ধ করে একাই বসে রইল দেবকঠ!...সারা দিনে গান আর সে গায় না!...কি যেন একটা চিন্তার মগ্ন সে...দূর হতে দেখে অমিয়া।

...রাজি বনিয়ে আসে...অন্ধকার গ্রাস করে দিনের আলো!...সারা বাড়ীখানাকে ঘিরে নেমে আসে কি যেন স্বপ্নপূরীর নীরবতা...চারিদিক নীরব, নিশুঙ্ক!...নিশ্চল হয়ে বসে আছে দেবকঠ!...অমিয়ার অসহ্য হয়ে ওঠে এই শুষ্ক নির্বাক পরিবেশ!...

এক কালি চাঁদের আলো স্তিমিত পাণ্ডুর হয়ে সামনের গাছটার কাঁকে চেয়ে থাকে বাড়ীটার দিকে!...দেবকঠর মনে হয় কার যেন করুণ কাতর চাহনি। জেগে বসে থাকে সে!...এক প্রহর...দ্বিপ্রহর অতীত হয়ে যায়—কোনো সাড়া নাই! আজ কি আসবে না সেই নারী...! অমিয়া ঘনঘূমে আচ্ছন্ন? ধীরে ধীরে বার হয়ে আসে দেবকঠ!...

...আবার শিহরণ আগে আকাশের বুকে। গাছের মাথায় রাতের দিকছায়া বাতাস আনাগোনা করে যায়...নিশুঙ্ক রাজির মধ্যে আজ দেবকঠ আলাপ করে বেহাগ!...সুরের রেশটা সারা ঘরের অন্ত প্রান্তে ছড়িয়ে গেছে...হঠাৎ চোখ তুলতে সামনে দেখে সেই নারীমূর্তি! মুখে তার মুহূর্ত হাসি...দেখে যায় দেবকঠ!

—“কে তুমি?”

কোন কথা নেই, নীরবে চেয়ে থাকে মেয়েটি ব্যাকুল ব্যথা ভরা চাহনি নিয়ে!...চোখে তার ব্যাকুল আশার আলো!...

...ওকে চেনে না দেবকঠ, কে ও—কেনই বা...!

অথচ মনের মধ্যে প্রবল আলোড়ন জাগে, মনে হয় কোন অতীত এক রাতে ওকে স্বপ্ন দেখত—ওর মুখের ওই হাসি, চোখের ওই ব্যাকুল চাহনি যেন চেনা!...ও যেন আশ্রয় আশ্রয়!...সারা মনের অভল প্রদেশে ব্যাকুলভাবে হাতড়াতে থাকে দেবকর্ত!...এগিয়ে যায় তার দিকে!...মেয়েটি ব্যাকুলভাবে বলে ওঠে...“স্পর্শ করোনা আমার! শুধু দূর হতে কথা বল...”

...সবটাই যেন একটা স্বপ্ন! বলে চলেছে মেয়েটি!...

...সে বন্দী হয়ে রয়েছে ওই ছবির মধ্যে!...আর বন্দী করে রেখেছে এই দেবকর্তই! অতীতের ধ্বনিকার অন্তরালে কোন ফেলে-আসা জীবনে দেবকর্ত ছিল শিল্পী!...ছবি তুলির আঁচড়ে আনত জীবনের স্পন্দন...ওছবি তারই আঁকা!...

সারা মনের চিন্তায় ব্যাকুল কামনা ভালোবাসার সঞ্চয় দিয়ে এক ভাস্কর এঁকেছিল তার ছবি...প্রাণ প্রতিষ্ঠা হয়ে গিয়েছিল ওই মূর্তির সেই শিল্পার অন্তরের সাধনায় আজ তাই ব্যাকুল অন্তরের কামনা নিয়ে ঘুরে বেড়ায় ওর আশ্রয়...ও বন্ধন হতে ওর মুক্তি হয় নাই, বৎসর গেছে—বৃগ গেছে—এসেছে জন্মান্তর, তবুও বিদেহী আশ্রয় ওই কারাগারে বন্দী হয়ে ব্যাকুলভাবে কার পথ চেয়ে রয়েছে!

...বলে ওঠে দেবকর্ত...আমি মুক্তি দেব তোমায়!...

উত্তর দেয় আশা...এত বৎসর—জন্ম জন্মান্তর ধরে তোমাকে খুঁজেছি!...সেদিনের না-বলা কথা বলবার সময় পেয়েছি—আজ তুমি আমার ত্যাগ করে যাবে?...?

...ব্যাকুলভাবে বলে ওঠে দেবকর্ত...না না, তা হতে পারে না! অশরীরী...এজগতের মাহুষের সঙ্গে তোমার কোন যোগাযোগ থাকতে পারে না! তুমি...তুমি...আমার কেউ নও!...তোমায় আমি চিনি!...

...চলে যেতে চায় দেবকর্ত!...এ কি সে বকে চলেছে!...কই তার আশেপাশে কেউ ত নাই!...সারা শরীরে জাগে একটা চঞ্চল্য! শিরায় শিরায় চঞ্চল রক্ত-শ্রোত ক্ষতবেগে বয়ে যায়...সামনে কার যেন ব্যাকুল কাতর চাহনি মাথা হুচোখ...সিঁড়ি দিয়ে উঠে চলে সে!...

...হঠাৎ কি হয়ে যায় টের পায় না!...পাটা সিঁড়ির একটা ধাপ উপরে কেমন যেন ফসকে যায়...সিঁড়ি হতে

গড়িয়ে পড়ে যায় তার অচেতন দেহটা!...চীৎকার শুনে ছুটে আসে অমিয়া—চাকরটা বার হারে আসে! কোনরকমে দেবকর্তের অচেতন দেহটা তুলে নিয়ে যায়!

আশ্রয় আশাবাদীর নাম জানেনা এমন লোক কেউ নাই!...সারা সহরে তার নাম, দেশবিদেশ হতে আসে ধনা সম্ভ্রান্তশালী জনতা তার মুজরো শুনতে!...রূপ এবং সুর ছোটোই সমান আকর্ষণ!

...ভাস্করের সঙ্গে সঘন্য তার বহুদিনের, অসামান্য রূপ-বোঝা ওই নারী সামান্ততম একজন শিল্পাকে যে কোন আকর্ষণে ভালোবাসতে পারে, সারা সহরে এও একটা আলোচনার বিষয়!

যমুনার ধারে তাজগঞ্জের পিছনে ছোট একটা বাংলা, তাঁদের আলো লুটিয়ে পড়েছে ক্যাকুটানের অল্প বহিত বনে : ছোট ছোট বাঁশ বনের ঝোপ...মৃত কঠিন রাস্তার ধারে মাথা তুলেছে! টাঙ্গাটা এগিয়ে আসে!...দূরে ঝেঁঝাটা দেয় তাজের মিনার-মধ্যকার বিশাল ধ্বংস গম্বুজ...তাঁদের আলোয় স্বপ্নপূরীর পরিবেশ রচনা করেছে।

...ভাস্করকে পৌঁছে দিতে আসছে আশাবাদী!

মনে পড়ে আজ প্রথম যেদিন পরিচয় হয় ভাস্করের সঙ্গে। আশা সেদিন জয়পুরের মহারাজার ওখানে মুজরো করতে গেছে দরবারে। রাত্রি তখন প্রায় ত্রিপ্রহর, বেহাগ আলাপ করছে আশাবাদী...তবু দরবার...রাজা নিজের হাতে তুলে দেন আশাবাদীকে মুজোর একছড়া মালা। এক কোণে উপবিষ্ট মুগ্ধ ভাস্করের সারা মনে কোন এক সুরের মারাজাল বিস্তার করে!

সে রাতে ঘুমতে পারে না ভাস্কর,...বা সে পেয়েছে কণিকের পরশনে, তাকে ব্যর্থ হতে দিতে চায় না...তুলি আঁচড়ে...অমর করে তুলবে!

পাহাড়ে ঘেরা জয়পুর...দিগন্ত জোড়া পর্বতের মাঝে রাজকন্ডার মত একটুকরো জুন্দর এক নগরী, প্রাসাদের কুলবারান্দা দিয়ে চেয়ে থাকে উদাস দৃষ্টিতে আশাবাদী...কার ডাকে ফিরে চাইল, কে একজন দেখা করতে চায় তার সঙ্গে!

...চেয়ে থাকে তার দিকে আশাবাদী...জুন্দর জুপুন্ডর চেহারা, চোখের তারায় কোন অনাগত লোকের জ্যোতি,



ছবিখানা এগিয়ে দেয় ভাস্কর, ...বেহাগের বিপুল শাস্ত্রীয় রূপ...বর্ণ এবং ভাবের অবমিশ্রণে কোন এক মায়ালোকের সৃষ্টি করেছে, যা আশাবাদীএর আলাপেও সৃষ্টি হয় না সবসময়! বিমুক্ত দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে আশা তার দিকে!

সেই তাদের প্রথম পরিচয়ের ইতিহাস...ভাস্কর এসেছে আগ্রায়, তাজগঞ্জের নির্জন পরিবেশে...অতীত যুগের স্মৃতিভারাক্রান্ত প্রেমরাজ্য তাজমহলের সীমানার বাইরে গড়ে তুলেছে তার স্বপ্নময় পরিবেশ...শিল্পীর মনোরাজ্য!...

...রাত্রি নামে তাজগঞ্জের আকাশে...দেশবিদেশ হতে আগত দর্শকের ভিড় কমে আসে! দরজা বন্ধ হয়ে যায় সাধারণের জন্ত। একান্তে চত্বরের বৃকে সেকালের বৃদ্ধ বট অশথের গ্রহরা কোন অতীত যুগ হতে দাঁড়িয়ে রয়েছে চাঁদের আলোর স্বপ্নজাল বুনে...এমনি সময় প্রায় রোজই আসে ভাস্কর, ...আসে আশাবাদী! প্রতিটি মধ্যরাত্রে নির্জন তাজের বৃকে মর্মর স্বপ্ন দেখে কোন প্রণয়ীর...অতীতের কোন মধুযামিনীর।

...আশাবাদীএর সারা মনে জাগে কোন অমরাকুসুম সৌরভ, যমুনার জল-কল্লোল তার বেহাগের সুরে সুর মিলায়, সুর মিলায় বৃদ্ধ বনঝাউএর বৃকে রাতের দিকহারা বাতাস, যমুনার নীলধারার ওপারে হরিণ যুথের কালো চোখে জাগে স্বপ্নের নেশা।

...তোর হয়ে আসে...ভাস্কর ফিরে যায় তার শিল্পরাজ্যে...আশাবাদীএর টাঙ্গা...দেওদার শ্রেণীর গ্রহরা-ঘেরা মন্থন রাত্তা দিয়ে রাতের ডুবন্ত চাঁদের সঙ্গে কে হাতছানি দিয়ে নিয়ে যায় কেরলবাগের পানে!...

বাকীরাতটুকু কাটে ভাস্করের আকাশের পানে চেয়ে...ওমনি কোন চাঁদের মায়ায় সে বদ্ধ হয়ে গেছে যেন। সারা মনে একটা আলোড়ন, শিল্পকে সে ত্যাগই করেছে নিজের মনের এবং দেহের আকর্ষণে। মনে পড়ে আগেকার দিনগুলোর কথা, জয়পুরের দরবারের শিল্পী...ভাস্কর...মনের অক্লিস্কৃতিতে জগতের বৃকে একটা স্থায়ী ছাপ রেখে যাবার কত না দৃঢ় কল্পনা। তার মৃত্যুর পর সে বিশেষ হয়ে বাবে না—পিছনে থাকবে তার শিল্প, তাকে অমর করে তুলবে! কিন্তু কি থাকবে তার পিছনে?...

আলোয়ার মত রোজই রাতে আসে এই আকর্ষণ, সে পথ হারিয়ে কেলে।

আশাবাদীএর উছল বোবন, অপরূপ কণ্ঠমাধুর্য সারা আগ্রায় একটা আকর্ষণের বস্তু! দেশ বিদেশ হতে আসে কত অতিথি...কত সামন্ত রাজ্যের রাজকুমার—কত বড় বড় ধনী ব্যবসায়ী...আসে আর চলে যায় সমুদ্র বেলায় সংখ্যাহীন ডেউএর মত। কেউ কোন দাগই রেখে যায় না! ভাস্করকে দেখেছিল আশা কোন এক ছয়ছাড়া জীবনের সুরে যেন সুরময় একটি মাহুয...সুরের মারাজাল নিয়ে যার বেসাতি সে মহাসুরের এই সাধককে তুলতে পারে নি।

এমনি এক দিনে এল আশাবাদীএর জীবনে বরৌদার গায়ক পণ্ডিত মণিশঙ্কর, ...দীর্ঘ সৌম্য চেহারা, ঋকু বলিষ্ঠ দেহ, তেজদৃপ্ত চাহনি, সারা সুরলোকের সন্ধানে বার হয়েছে...মহাষাত্রাপথে! আগ্রায় এসেছেন তিনি আশাবাদীএর গান শুনতে।

...সমাদর করে বসাল তাকে আশাবাদী প্রশস্ত চত্বরে...এতদিন যাদের নাম শুনে এসেছিল গুণী বলে, আজ তারা অযাচিত ভাবে এসেছেন তারই গান শুনতে, সারা মন যেন তার ভরে ওঠে! মনের কোনে জাগে দর্পের ভাব...

যথারীতি গান শুরু হল বসন্তবাহার! আশাবাদী জানে তার বসন্তরাগে আসে বসন্তের পরিবেশ, সুরলোকের মায়াজালে সে সৃষ্টি করতে পারে সহস্র পারিজাতের সৌরভ...যারা সঙ্গীত এবং দেহ-পসারিণী বলে দূর হতে সরে যায়—তারা দেখে থাক তার প্রতিভার সত্যিকার কোনো স্থায়িত্ব আছে কিনা?

বৈশাখের তপ্ত বাতাসের আনাগোনা তখনও থামেনি, রক্ত গাছের বৃকে শীর্ণতার রং...আকাশের বৃকে তখনও ধূলি ঝড়ের আভাস মিলিয়ে যায়নি!...গান শুরু করেছে আশাবাদী...রাগ বসন্তের ঠাট!...মীড়, গমক, মূর্ছনা দিয়ে প্রাণবন্ত করে তুলেছে তার সুরকে, সারেরদীওলা, তবলচী আজ আশ্রয় হয়ে যায়!...বিস্তার চলেছে...

...মরা গাছের বৃক হতে সাড়া দেয় কোকিল!...সেও তুলেছে বসন্ত চলে গেছে অনেক দূরে, দূরের পরিবেশে বনের পাখী আজ অজ্ঞত্ব করে...এল বসন্ত!...

গর্ভিত জন্মের আলোয় রঞ্জিত হয়ে গান ধাঝালো আশা!...চেয়ে থাকে পণ্ডিত মণিষ্যের পানে!...কিন্তু... কই ওর মুখে কোন পরিবর্তনের চিহ্নও নাই!...মুহূর্ত হাসিতে ভরে ওঠে পণ্ডিতের মুখ...বলেন...

...সবই রয়েছে কিন্তু একটা জিনিষ নাই—তাহাজে তোমার মনের—অন্তরের স্পর্শ! পাথর আর কাঠের বর্ষণে আগুন জলে এ প্রকৃতির নিয়ম, কিন্তু পাথরের বুকে গাছ জন্মাতে পারে বাহুবের অন্তর! ..

...আশাবাদী এর মনে আঘাতই বাজে, তার গানের এমন কড়া সমালোচনা কেউ করতে সাহস করে না!... তবু অতিথি...কোন রকমে সহ্য করেই গেল। এর পর পণ্ডিতজী আলাপ স্তব্ধ করলেন! ..

শুধু হয়ে যায় বসন্তের কোকিল কাকলি—মুখর পরিবেশ কামনার আবেদনময় উচ্ছল পরিবেশ...মুছে গেল ভ্যাগের ...মহাভজ্ঞানার ঘন তমসাস্ত্র অতলে। গেয়ে চলেছেন পণ্ডিতজী, আশার মনের দর্প...অহঙ্কারের যবনিকা...পড়তে পড়তে দূর হয়ে যায়! সত্য আবিষ্কার করে সে—দর্প নিয়ে অহঙ্কার নিয়ে গাইতে বসেছিল সে, ছিল কামনার লালসাময় দর্পী রিপূর প্রভাব সারা মনে! জগৎকে সে দস্তাৎ করে কেলেছিল...কিন্তু এ সুর ব্রহ্মের শেষ নাই— সীমা নাই! অতল অন্ধকারের মতই জগতের সমস্ত হিংসা কোতকে নিঃশেষ করে আপনার নিঃস্বতাকে মনের বেনীমূলে সাকীতি সার্থকতার দেবতারূপে প্রতিষ্ঠিত করেছে। বিস্মিত দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে আশা...হারিয়ে কেলে নিজেকে!...সারা দখলমের ছাদ হতে টাঙ্গান বাড় লঠনগুলোর আলো...একে একে নিভে আসে! তমিস্রার শান্ত পরিবেশে আবৃত হয়ে যায় সারা হলটা...সুর তখনও ঘুরে বেড়ায়...পথহারা পাখীর মত!...

চমক ভালে আশাবাদীর, অন্ধকারে সুরটা তখনও ঘুরে বেড়াচ্ছে পথহারার মত, তানপুরাহাতে ধ্যানমগ্ন পণ্ডিতজী তখনও স্থির হয়ে বসে রয়েছেন।

...এতদিনের শিক্ষা-সাধনা আজ সবই তুচ্ছ বোধ হয় আশাবাদীর!...কি সে জানে! কি তার সম্পদ!...পণ্ডিতজীর পায়ের কাছে লুটিয়ে পড়ে!

...মুখ তুলে চান পণ্ডিতজী...মুখে তার হাসির নম্র আভা। বিস্ত্রিত ব্রহ্মারী সাধু আজ যেন ওর মনের

সমস্ত না বলা কথাই বুঝতে পারেন! আশাস যেন— “নিজেকে তুলে বেতে হবে তবুই আসবে সাধনার সিঁড়ি! এ বড় কঠোর পথ!...ভোগের লালসা এখানে মহাপাপ—!”

পর পর কয়েক রাজি কেটে গেল, নীরব নির্জন তাড়ের সাত দরজা পার হয়ে আসে রোজকার মতই ভাস্কর!... খেত পাথরের জাকিরি ফাঁক দিয়ে চন্দ্রের বুকে আলো ছায়ায় মায়াজাল রচনা করে আকাশের বিদ্যায়ী চাঁদ, ওপারের বদরবনসীমার কাকল-নয়না মূদী গ্রীবাঙ্কুশন হৃগিত রেখে কান পেতে শোনে কি যেন আকাশে বাতাসে—কিন্তু না—কোন সুরশ্রবণও নয়! কার বুক দীর্ঘ করে বার হয়ে আসে দীর্ঘশ্বাস। ঘুমনার কালো জলে...পাণ্ডুর চাঁদের ছায়া দোল খায়, তাড়ের উচু চন্দ্র হতে চেয়ে থাকে দিগন্তের পানে—ভাস্কর! সে আজ একা!...এ বনঝড়ের বুকে বাতাসের হাহাকার তার বুকে মাতন তোলে! চাঁদের হাসি আজ তার চোখে যেন সর্বহারার কল্পণ কাম্যসাধনা...! তাড়ের বুকে আজ দেখে না সে কোন প্রাণীর কালো চোখে অভিচারের ইসারা!...শুধু জমাট পাখাণের বুক তেদ করে কানে আসে কার কান্নার সুর!...চিরবিরহী অশ্রু জল খেঁতগুত্র পাখাণ স্তরে জমাট বেঁধে রয়েছে কত যুগ যুগান্ত ধরে।

...আশাবাদী আগেনি কদিনই!...হয়ত তুলেই গেছে দরিদ্র শিল্পীকে!...তার মনের সাগর কিনারে কত দূর সাগরের ডেউএর আনাগোনা!...কে জানে তারা ডেউএর লিখনে কোন মিলন কাব্যের অস্ত্র স্বর্গ রচনা করে গেছে!

...বাকু—দূরে সবাই...স্বষ্টির নেশার সবহারাবার ছুঃখ সে তুলে যাবে!...কিরে আসে শিল্পী নিজের ছোট বাংলোর দিকে! আকাশের চাঁদ ঢলে পড়ে! তাড়জঞ্জের স্তম্ভ-পুণ্ডীর হয় নবজাগরণ যেন কোন রূপের কাঠির পরশে! ঘুমভাঙা ভোর আসে আগ্রার আকাশে!

...পণ্ডিতজীকে আটকে কেলেছে আশাবাদী! চোখের জল আর মনের অসহায় ক্রন্দন আত্মহারী শিল্পীকে বন্দী করে কেলেছে কোন অজানা বাঁধনে। আশাবাদী সাধনা স্তব্ধ করেছে আবার। মনের লালসা কামনার সমস্ত দাবীই আজ নিঃশেষ করে দিয়ে নতুন জীবনের সন্ধানে ব্যর্থ হয়েছে সে!...এও যেন একটা নেশা!

জীবনে ভোগের অনেকই অমেছে অনেক কালির ঝাঁড়

—ত্যাগের অঙ্কের শূন্যের আজ সে দেখতে চায় কতখানি পূর্ণ করতে পারে! বিলাসিনীর কাছে এও বোধহয় একটা দুঃখ-বিলাসই। তার আছে রূপ—আছে সম্পদ আছে—স্বাক্ষর দল...দুঃখ তার বুকে বাজে না বড় কঠিন ভাবে!

দরিদ্র ভাস্কর প্রায়াক্রকার একটা পাথরের বন্দীশালার মধ্যে অম্পষ্ট আলোয় তুলির আঁচড় মেরে সৃষ্টি করে কোন মহাজীবনের ইঙ্গিত! এ জীবন-তার দারিদ্র্য, রোগ, নিঃসত্য ভরপুর!...অতল অন্ধকারের মধ্যে তার জ্যোতির্ময় ছোটো চোখ—যেন সে কোন পিঞ্জরাবদ্ধ ঈগল পাখী, স্বর্গের দিকে কপিশ আঁখিতারা মেলে চেয়ে রয়েছে, ...ডানা এবং ঠোঁট পিঞ্জরের গায়ে বারবার আঘাত করে ক্ষত-বিক্ষত রক্তাক্ত হয়ে উঠেছে।...

আজ ভাস্কর অসুস্থ করে সারা শরীরে তার ব্যাধির কয়াল গ্রাস—যার অসুস্থ্যন সে অনেক আগে হতেই করে এসেছিল! এতদিন মনের জোর ছিল—মনের জগতে ছিল সৌন্দর্যের অসুস্থ্যতি!...সারা পৃথিবীকে সে ভালোবেসেছিল, ভালোবেসেছিল তার আলোবাতাসমাখা নদী তীর, শ্রামল বনসীমা...নীল অঞ্জনঘন চাহনি পরিণত হয়েছে আজ বাস্তবের ক্রূত আঘাতে...কোন ক্রয়ের তৃতীয় নয়নের বহিঃলাভময় সর্বধ্বংসী দৃষ্টিপাতে!

...আশাবাদী নয়—জীবন হতে আশার আলো তার চলে গেছে! দেখলে আর ভাস্করকে চেনা যায় না, চোখের কোনে জমেছে কালো দাগ। অনাহারে, অত্যধিক পরিশ্রমে জীবনী শক্তিটুকু ক্ষীণ হতে ক্ষীণতর হয়ে আসে। কালো কালীর বুক হতে কোটরাগত চোখ ছোটো জলে জলজল করে কোন অনির্বাক্য দীপশিখার মত!...

রাজি নামে নীরব যমুনার কূলে, ভরা প্রাবণের যমুনা... কলকল ধারার বাঁধনহারা জলরাশি ছুটে চলেছে কোন স্রবের সন্ধানে—ভাস্কর মর্মর স্বপ্ন ধুয়ে য়েছে যায় সংখ্যা-হীন তরঙ্গের ঘাত-প্রতিঘাতে, বৃষ্টি-ধৌত বন ঝাঁট গাছের বৃকে এক কালি চাঁদের আলোর পরশ বুলিয়ে যায়...ভাস্কর দূর হতে দেখে! ওখানে যাবারও সামর্থ্য সে হারিয়ে ফেলেছে। দূর হতে অপরাজিত দিকে দূর-প্রসারি দৃষ্টি মেলে চেয়ে থাকে!...

সারা শরীরে একটা অদৃশ্য যন্ত্রণা বৃকের ভিতর হতে

ফুলে ওঠে! কি যেন একটা নোনতা আশাদ, হাত দিয়ে অসুস্থ্যব করে...অম্পষ্ট চাঁদের আলোয় দেখতে পায়... জমাট রক্ত!...

এ যেন কোন এক নতুন স্বপ্নঘেরা দেশ! বসন্তের শ্রামছায়া—ঘন তরুবাণী..., সে জগতের যাত্রা একা আশাবাদী! ভুলে যেতে চায় সে বাইরের পরিবেশ!...

পণ্ডিতজীর দিব্য দৃষ্টি...কিন্তু সন্ধান পায় ওর মনের অতলের। নতুনকে উপভোগ করবার প্রকৃতি আশাবাদী—এর আছে, কিন্তু চঞ্চলানারীর উদ্দাম উচ্ছলতাকে সে তার সাধনা দিয়ে জয় করতে পারে নি, সেদিন আবার বাস্তব জগতে ফিরে আসবে ওই নারীই তার দৈহিক কামনা—লালসার উদ্গাদনায় উদ্গাদ হয়ে উঠবেই, ...আশাবাদীশ্বর হবে সেইটাই চরম পরাজয়, তবু তাই হবে সত্য!...

...‘কাজরী’...বর্ষারূপে রসবর্ণময় কোন সুরবিভাস!...বিরহিনী নায়িকার ব্যথা জাগে হারাণ প্রিয়ার লাগি... আকাশ সীমা গ্রাস করেছে কাজল মেঘের অস্তরালে কদম-কেশরের পুলকশিহরণ চক্রবাকের বিরহ-ব্যথায় আকুল হয়ে ওঠে!...বিদ্যাতের চকিত চাহনি...ভীক নায়িকার মনের ব্যথাকোণ উজল করে তোলে!...

আলাপ করে চলেছে আশাবাদী, রাগিনীর সার্বক-রূপ হবে বিরহিণী বেদনাবোধেই!...প্রতিটি মনের অসুস্থ্য-পরমাণু হয়ে ওঠে! নিজেকে হারিয়ে ফেলে আশা!...এ কি অসুস্থ্যতি...সারা মনের স্পষ্ট কামনা লালসা আজ পরিব্যাপ্ত হয়ে পড়ে! জীবনের চাওয়া পাওয়ার হিসাব ভিড় করে দাঁড়ায় মনের পৃষ্ঠায়!...

তানপুরাটা হাত হতে নামিয়ে দেয়! সুরের রেশ স্তিমিত হয়ে গেছে, অম্পষ্ট অন্ধকারে দেখতে পায় পণ্ডিতজী ওর চোখের কামনা মদিরময় চাহনি!

উপবাসী মনের সামনে আজ বারা ভিড় করে দাঁড়ায় তাদের অনেককে চেনে—অনেককে চেনে না আশাবাদী!...মণিশক্তির প্রতিভাকে হিংসা করে আশাবাদী, ওরা আঘাত হেনেই যাবে পৃথিবীর সমস্ত কামনাকে...শ্রেষ্ঠত্বের নিরিখে উঠে যাবে সব কিছু হতে সন্তর্পণে নিজেকে দূরে রেখে! কিন্তু কেন—?

রাজির অন্ধকার নিবিড় হয়ে আসে! সারা বাড়ীটা মগ্ন

আড়ালে লুকোচুরি খেলে রাতের শিশু চাঁদ!...আশাবাদী-  
এর সারা মনে আজ বিদ্রোহের ছয়ছাড়া স্বর!...সারা  
জীবনকে অঙ্গুলি হেলনে বন্দী করে রাখতে সে চায়  
না!...তব্বীতে তার উছল রক্তশ্রোত...মনের উদ্দাম  
কামনার গতিবেগে জীবনতরী ভাসাতে চায়—যেখানে  
কূল পায়!

রাত্রি কত জানে না...মণিশঙ্করজীর চঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে  
যায়...কপোলের কাছে কার উষ্ণ নিঃশ্বাস...কার নিবিড়  
স্পর্শে চমকিত হয়ে ওঠেন পণ্ডিতজী!...সরে দাঁড়াল  
অন্ধকারের মধ্যে ছায়ায় একটা মূর্তি। মূর্তিটার দুটো  
আঁখিতারায় কাল-নাগিনীর মত লালদা-নাখা কুটিল চাহনি!  
ঘুণায়—লজ্জায় সরে দাঁড়াল আশাবাদী!

বিস্মিত হয়ে যান পণ্ডিতজী! কল্পনা করেননি তাঁর  
সত্যদর্শন এত কঠোর...এত বাস্তব হবে! ঘুণায় শিউরে  
ওঠেন তিনি!...

ছিঃ ছিঃ...তোমাকে আমি আমার পুণ্য সাধনার  
যাত্রাপথ দেখাতে এসেছিলাম! আমার গুরুদেবের অপমান  
করেছো তুমি!...নরকের কীট! সঙ্গীত জগতে...সাধনার  
পথে থাকবার কোন দাবী তোমার নাই!

রাত্রি ভোর হয়ে আসে! পাষণ্ড মূর্তির মত স্থির হয়ে  
দাঁড়িয়ে থাকে আশাবাদী!...পণ্ডিতজী চলে গেলেন শেষ  
রাত্রেই, এক মুহূর্তও তিনি থাকবেন না এ পাপপূরীতে!

আজ আশাবাদীএর জীবনে এসেছে সব-হারানার  
পালা! পণ্ডিতজীকে ভালবেসেছিল কিন্তু সাধন মার্গের  
জিতেন্দ্রিয় ব্রহ্মচারীকে সে বাঁধতে চেয়েছিল কামনার সূত্র  
দিয়ে, তাই তিনি চলে গেলেন!...আজ আশাবাদী আবার  
আগেকার জীবনকে মেনে নিতে চায়, সে বাঁচবে কি  
নিয়ে! বার হয়ে পড়ে!

বহুদিন পর আবার সেই অতিপরিচিত পথে চলে  
আশাবাদী...মনে তার আশার আলো! ভাস্করের অন্তরের  
প্রেমকে সার্থক করতে চায় সে!...

...লালমাটির বুকে হুইয়ে পড়া বাংলাটার সামনের  
গাছগুলো শুকনো হয়ে গেছে, রাত্রি শেষগ্রহর!...ছুটে  
গিয়ে ঢোকে আশাবাদী! কেউ কোথাও নাই!...ঘরের  
মধ্যে ঢুকেই থমকে দাঁড়ায় আশা! এ কোথায় সে এসেছে!  
...সারা শরীরে একটা শিহরণ...ঘন তমিস্রায়াখা অতল

অরণ্যানীর মাঝে দেখতে পায় কোন এক নারীমূর্তি!...  
খুব চেনা!

এগিয়ে যায়!

...ধীরে ধীরে আবিষ্কার করে সারা পাষণ্ড  
প্রাচীরের উপর ভাস্করের নিপুণ তুলি রচনা করেছে কোন  
গহন অরণ্যের মায়াজাল, দিনের আলো সেখানে যুগ  
যুগান্তরেও প্রবেশ করেনি...ও নারীকে চেনে সে!...  
কিন্তু বিস্মিত হয়ে যায়—আজকের আশাবাদী সে নয়!  
শিল্পীর সত্য দৃষ্টি আজকে তাকে দেখলে অস্বভাব করত  
নারী কত নীচে নামতে পারে...ও ছবি কোন পুণ্য  
প্রেমের জ্যোতির্ময়ী নারী মূর্তি! শিল্পীর কামনার বহু  
উর্দ্ধে!...জাগ্রত জীবনের মহাসত্যকে রূপায়িত করেছে  
তারই ছবির মতো ভাস্কর।

...কিন্তু ভাস্কর নাই! জীবনের শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে  
সে ওই নারীর অধরের রঙ্গীন আঁখি ফুটিয়ে রেখে গেছে,  
নিজের আঁখিতারার অনিবাণ জ্যোতি দিয়ে জ্যোতির্ময়  
করে গেছে ওর চোখ!

হ্রস্ব ব্যাধির কবলে আত্মদান করেছে ভাস্কর!  
পড়ে আছে তার চিহ্ন!...আশা যেন এ জগতে নাই! চলে  
গেছে কোন অজানা জগতে ভাস্করের সন্ধান!

\* \* \*

...দেবকণ্ঠ বিশ্বাস করতে পারে না ছায়ামূর্তির কথা!...  
সারা মনের অতল হাতড়ে যেন অস্পষ্ট আলোক শিখার  
মত মনে পড়ে তুলে-বাওয়া জীবনের কাহিনীর  
স্বর!

...“কিন্তু তারপর আশাবাদীএর কি হল?” মধুর  
হাসিতে ভরিয়ে দেয় অশরীরী অন্ধকার কক্ষতল!...

আশাবাদীর জীবনের আলো সব নিভে গেল সেই দিন,  
যেদিন অস্বভাব করল সে—গান গাইবার ক্ষমতাও তার  
একেবারে নিঃশেষ হয়ে গেছে! বোধহয় ব্রহ্মচারী  
পণ্ডিতজীর অভিশাপ তার জীবনে সত্য হয়ে ফুটেই  
উঠেছিল! চারিদিকে ঘনিয়ে আসে অন্ধকার আশার  
জীবনে, শিল্পী আশা সে জীবনের বোঝা টানবার ক্ষমতা  
হারিয়ে ফেলল!

...বর্ষার শেষ...যমুনার ওপারের কাশবনে লেগেছে  
শুভ্রতার স্পর্শ!...

...তাজের খেতমশরর বেদীমূল কার বুকের রক্তে  
রাঙ্গা হয়ে উঠল!...

আশাবাদিএর প্রাণহীন দেহটা তাজমহলের চত্বরে  
আবিকার করে কোতুল্লী জনতা...লাল রক্তের ছাপ  
গড়েছে জমাট পাথর বেদীতে, ...আশাবাদি তার জীবনের  
শেষ অধ্যায় রক্তের আখরে লিখে রেখে গেছে তাজের  
মর্মর প্রাঙ্গণে!...

অশরীরীর দুচোখ অশ্রুসজল হয়ে ওঠে, বলে চলেছে—

কিন্তু মুক্তি আমার হয়নি, তোমার প্রেমের অপমান  
করেছি...নিজের জীবনের সমস্ত কামনা তোমার সৃষ্টিকে  
ধিরে মূর্ত হয়ে রয়েছে শূন্য লোকে...মুক্তি আমার হয়  
নি! জন্মান্তর হতে তোমার গৌরব করে এসেছি!...

...চূপ করে অশরীরী! দিনের আলো কুটে ওঠে  
পূর্ণদিগন্তে...দেবকণ্ঠ বিছানায় অলসভাবে শুয়ে থাকে!...

...এ বাড়ীর আবহাওয়াটা অমিয়ার কেমন যেন  
ভালো লাগে না, দেবকণ্ঠর শরীরও ভাল নয়, সে রাত্রে  
অচেতন হয়ে যাবার পর হতে কি বেন সর্দেই চিন্তা করে  
সে! শূন্য দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে তার দিকে!...ডাক্তারও  
পরামর্শ দেন কিছু দিন চেয়ে যাবার জন্যে!

...দূরত্বের ব্যবধানে হারিয়ে ফেলে ছুজনে ছুজনকে!  
অমিয়া চলে গেছে চেয়ে দেবকণ্ঠকে নিয়ে! শূন্য  
বাড়ীটাতে প্রাণহীন আসবাবপত্রের মধ্যে রয়ে গেছে  
একটি বহু যুগের প্রতীক্ষামানা প্রাণ!...বিচ্ছেদের  
ব্যথায় প্রতিটি রাত্রে নিশীথ প্রহর কার বেহাগের সুরে  
করুণতর হয়ে ওঠে! কার আগমনের পথ চেয়ে  
থাকে সে!

...দেবকণ্ঠর অবেচন মন অজানা কোন আকর্ষণে  
ছন্দহারা হয়ে যায়! অমিয়া লক্ষ্য করে!...প্রতিটি দিনের  
প্রতিটি ব্যবহারে অনুভব করে সে—স্বামী তার আরও  
দূরে সরে গেছে!...তাদের জীবনের তারে আর মিলনের  
সুর বাজে না!...

...সারা মনে কি অস্বস্তি অনুভব করে দেবকণ্ঠ জানে  
না...আশাবাদি—আগ্রার তাজমহল—কল্লোলযুগ্মা যমুনার  
বারিধারা এসবের সঙ্গে কি তার কোনদিন কোন জন্মে  
সম্পর্ক ছিল! তবে কেন এই অশান্তি!

...আকাশের উর্ধ্বতরের অশরীরী কোন আত্ম আজ

তৃপ্তি লাভ করে!...জীবিত তার প্রিয়তম তাকে স্মরণ  
করে—তার জন্মে উদ্বেগব্যাকুল হয়ে ওঠে...এই সামান্ততম  
প্রতিদানই তৃপ্ত করে বিদেশী আত্মাকে। তার বন্ধন-  
মুক্তির বারতা আসে আকাশের বহু উর্ধ্বে তার আত্মার  
বাসন্তরে। আশাবাদি...অতীতের আলা ভুলতে পেরেছে!  
মর্ত্যালোকের মানবের সারা মন তার জন্ত ব্যথিত হয়—  
এই ত তার পরম পাওয়া! এদের আকর্ষণই তাকে  
আবার ফিরিয়ে আনবে মানুষের জগতে প্রেম-প্রীতির  
জন্মভূমিতে...তার আত্মার মুক্তি-সাধনতীর্থে।

...চলেছে আশাবাদিএর অশরীরী মুক্ত আত্মা...  
নীলাভ জ্যোতির্ময়...স্বচ্ছ আলোক স্তর...চারিদিকে  
শ্রামণ স্রবাস!...সৃষ্টির যুগিবেগ সহসা তার পথরুদ্ধ করে  
তোলে! দুর্গিবার গতিবেগ নাগিয়ে আনে নীচের দিকে  
আত্মার পুনর্জন্মের বিবর্তন পথে। পৃথিবীর বুকে কার  
একটি অন্তরের ভালোবাসা চায় সার্থকতা...সৃষ্টির  
আনন্দে আজ আত্মার জ্যোতির্ময় রূপ...নবজন্মের দিকে  
এগিয়ে আসে মহামুক্তির সাধন পথে!

...ফিরে এসেছে দেবকণ্ঠ, সারা মনের ব্যাকুলতা  
নিয়ে। ফিরে এসেছে অমিয়া—মনে তার আনন্দের আভা!  
নারীদের পূর্ণ বিকাশ মন্ডিয়ায় সে মহিমাম্বিতা!...মা হতে  
চলেছে সে!...তাদের নীচ কোন অজানা দেবশিশুর  
কলহাস্তে মুখর হয়ে উঠবে! তাকে নিয়ে জীবনের সব  
কিছু পূর্ণ হবে অমিয়ার।

রাত্রি আসে, দেবকণ্ঠ ব্যাকুলভাবে চেয়ে থাকে কার  
আশাপথ! কিন্তু সব নারব। রাত্রির নীরবতা কোনও  
সুরের রেশে ছিন্ন হয় না...নিজেই বসে আজ আলাপ  
করতে থাকে...বেহাগ রাগিণী!...জানপূরাটা সাড়া দেয়  
দীর্ঘ দিন পর!

...কিন্তু কই, কেউ আসে না!...গভীর রাত্রি, নীচে  
নেমে আসে দেবকণ্ঠ—ছবিখানা তেমনই রয়েছে।  
কিন্তু...কেন জানেনা আগেকার সে জ্যোতি বিলুপ্ত হয়ে  
গেছে!...অথরের রক্তিমাতা হয়ে এসেছে পাণ্ডুর,  
আখিতারার আভা বিলুপ্ত হয়ে গেছে!...

...সে নাই! বিদেশী আত্মা আজ মুক্তির সন্ধান  
পেয়েছে!...

দিন যায়, ...অমিয়ার সাংসারে এসেছে পূর্ণতার ছায়া! কোন অজানা দেবশক্তির কলহাস্তে মুখর হয়ে ওঠে তাদের শূন্য গৃহাদন!...

...কিন্তু একি! ...বিস্মৃত হয়ে ওঠে দেবকণ্ঠ! এ যে স্তার চেনা! কোন অতীত যুগের আশ্রয় আশ্রয়!... সেই মুখ—সেই জ্যোতিভরা চোখ—সেই হাসির আভা! —তবে কি সেই পথহারা এসেছে তাদের গৃহাদনে

দীপশিখার ভীর্ণ আলো হাতে করে? অতীতের হারাণ পথের সন্ধানে।

...আশা হারিয়ে গেছে অসীম শূন্য লোকের সৃষ্টি-রহস্যের অন্তরালে—এসেছে আলো!

মায়া তার অতি আপনজনকে ভালবাসে—স্নেহ করে—ঘিরে রাখে প্রেম স্রীতির বন্ধনে—কিন্তু কেন? এর রহস্য চির তমসাবৃতই রয়ে গেছে!

## রাশি ফল

### জ্যোতি বাচস্পতি

#### কল্পাশা

কল্পা যদি আপনার জন্মরাশি হয়, অর্থাৎ যে সময়ে চন্দ্র আকাশে কল্পা নক্ষত্রপুঞ্জ ছিলেন সেই সময়ে যদি আপনার জন্ম হ'য়ে থাকে, তাহ'লে এই রকম ফল হবে—

#### প্রকৃতি

কর্মলীলা এবং সব ব্যাপারের ব্যবহারিক উপযোগিতার দিকে লক্ষ্য—এই হচ্ছে আপনার প্রকৃতির মূল মন্ত্র। আপনার জীবনের কথা কিছু আশা আকাঙ্ক্ষা সব জড়িত থাকবে আপনার কর্মের সঙ্গে। কর্মের দ্বারা শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করার ইচ্ছা আপনার মধ্যে খুব বেশী প্রকাশ পাবে।

আপনার মধ্যে ব্যক্তিগত প্রবল এবং ইচ্ছাশক্তি বেশ দৃঢ়। বাইরে থেকে আপনার ব্যবহার ও আচরণে সামাজিকতা ও বিনয় ভাব প্রকাশ পেল, আপনি একটা দূরত্ব রক্ষা করে চলবেন, যাতে ক'রে অনেক সময় আপনাকে বুঝে ওঠা শক্ত হবে।

সব বিষয়ে সাধুতা ও সৌজাত্য ব্যবহার আপনি পছন্দ করেন বটে, কিন্তু যেখানে কূটনীতি না হ'লে কার্যসিদ্ধি অসম্ভব হ'য়ে ওঠে, সেখানে কৌশল প্রয়োগ করতেও মোটেই দ্বিধা করেন না।

নিজের সম্বন্ধে আপনার ধারণা বেশ স্পষ্ট এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে আপনার সম্বন্ধের মধ্যে কোন অস্পষ্টতা বা দোষনা ভাব নেই। ঠিক বার্ষপরি না হ'লেও আপনি কম-বেশী আত্ম-কেন্দ্রিক হবেন এবং অপরের সহযোগে কাজ করলেও নিজের বৈশিষ্ট্য বা মতবাদ ছাড়তে চাইবেন না।

আপনি বুদ্ধিমান এবং আপনার মধ্যে মানসিকতা প্রবল হওয়াই সম্ভব। অধ্যয়নের ব্যাপারে লবু সাহিত্যের চেয়ে বিজ্ঞান দর্শনের গভীর স্তর আপনাকে আকর্ষণ করে বেশী। কিন্তু শিল্পই হোক, বিজ্ঞানই হোক

আর ধনতত্ত্বই হোক, যার কোন ব্যবহারিক উপযোগিতা নাই তার মূল্য আপনার কাছে নিতান্ত কম।

আপনার কর্মধারা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আপনি গভীর চিন্তা ও বিশেষ বিবেচনা ক'রে গ্রহণ করবেন। কাজেই তার উপর আপনার একটা ঐকান্তিক নিষ্ঠা থাকবে যা সহস্র প্রতিকূল অবস্থাতেও বিচলিত হবে না।

আপনি সহজে ফ্রুস্ট হবেন না, কিন্তু কারো উপর একবার বিরাগ জন্মালে, তাও আপনার মন থেকে সহজে দূর হ'তে চাইবে না। তবে যে মুহূর্তে আপনি বুঝতে পারবেন যে বিরাগের কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ নেই, সেই মুহূর্তেই সরলভাবে নিজের ত্রুটি স্বীকার করতে প্রস্তুত হবেন না। কারো উপর ফ্রুস্ট হ'লেও হীনভাবে প্রতিশোধ নেওয়ার ইচ্ছা বা শত্রুকে অন্তরভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করার চেষ্টা আপনি কখনই করবেন না। আপনার বিরোধিতা স্তায়পথকে আশ্রয় ক'রেই অভিব্যক্ত হবে।

আপনি সাধারণতঃ সংযম ও স্তব্ধতার পক্ষপাতী হবেন। আমোদ-প্রমোদ ও ক্রীড়া-কৌতুকে শক্তি অপচয় না ক'রে তাকে দরকারী কাজের ক্ষমতায় সজ্জিত ক'রে রাখতে চাইবেন।

আপনার মধ্যে সংসার-বিরাগী, উদাসীন সন্ন্যাসীর মত মনোভাব কম-বেশী প্রকাশ পেতে পারে, কিন্তু সেক্ষেত্রেও জ্ঞান বা ভক্তির চেয়ে কর্মযোগই আপনার আদর্শ হবে।

বাক্যের দ্বারা অপরকে ক্ষমতে নিয়ে আসার যোগ্যতা আপনার যথেষ্ট পরিমাণে আছে, কিন্তু এর অপব্যবহার সম্বন্ধে সতর্ক না থাকলে আপনার বাগ্মিতা নেহাৎ বাচ্চাজুর বা বাচালতার পরিণত হ'তে পারে।

নিজের জন্মই হোক পরের জন্মই হোক, কোন না কোন কাজে মনকে ব্যাপৃত রাখা আপনার পক্ষে একান্ত আবশ্যিক। কর্মহীন অঙ্গ



জীবন আপনার পক্ষে একটা অভিশাপ। কর্মহীনতা আপনার মানসিক ও নৈতিক উন্নতির অন্তরায় তো বটেই, তা আপনার দৈনিক বাস্তব পক্ষেও হানিকর।

### অর্থভাগ্য

আর্থিক ব্যাপারে সাধারণতঃ আপনি হিসাবী ও সাবধানী হ'লেও প্রথম জীবনে অর্থ উপার্জনের ব্যাপারে কম-বেশী ঝগড়া উপস্থিত হবে। উপার্জনের জন্ত আপনাকে যথেষ্ট পরিশ্রম করতে হবে। নিজের বুদ্ধি কোশলেই হোক, সরকারী কোন বিভাগে উচ্চপদ লাভ ক'রেই হোক, অথবা দালালী ঠিকাদারী ইত্যাদি কিছা জনসাধারণের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কোন কাজের দ্বারাই হোক, জীবনের শেষার্ধ্বে আপনার আর্থিক অবস্থা সচ্ছল হ'য়ে উঠতে পারে, কিন্তু তবু এ আশঙ্কা আছে যে, আপনি দীর্ঘকাল কঠোর পরিশ্রমে যা অর্জন করবেন, নিজের বিবেচনার দোষে তা নষ্ট করে ফেলতে পারেন। উপার্জনের জন্ত আপনাকে মধ্যে মধ্যে ভ্রমণ করতে হবে, কিছা ভ্রমণের সময় উপার্জন বা প্রাপ্তি হ'তে পারে।

উত্তরাধিকার হ'তে আপনার কিছু প্রাপ্তি সম্ভব হ'তে পারে কিন্তু তা পেতে বাধাবিঘ্ন বা বিলম্ব হওয়া সম্ভব। তা নিয়ে কোন রকম নামলা মোকর্দমা হওয়াও অসম্ভব নয়।

### কর্মজীবন

কর্মজীবনে আপনাকে নিজের গুণপনা ও কর্মশক্তির উপরই নির্ভর করতে হবে বেশী। কদাচিৎ কখনও কোন বিদেশী বা ভিন্নধর্মী মুকব্বির সাহায্য পেতে পারেন কিন্তু সে সাহায্য অধিকাংশ ক্ষেত্রে হবে স্বার্থ-প্রণোদিত ও অস্থায়ী। কাজেই তার উপর নির্ভর করলে হতাশ হ'তে হবে।

যাকে বলে অস্থিরতার জন্ত যুদ্ধ, তা আপনার প্রথম জীবনে একটু হবে। কিন্তু অনেক আশান্ত্র ও ঠাণ্ডা পড়া বা কষ্টকর পরিশ্রমের পর শেষ পর্যন্ত আপনি জয়ী হবার আশা করতে পারেন। ধৈর্যের সঙ্গে অপেক্ষা করতে শেখা আপনার উচিত। এক কথা মনে রাখবেন যে, সফলতার জন্ত আপনাকে একমাত্র নিজের উপরই নির্ভর করতে হবে। বার্ষ-সিদ্ধির জন্ত অনেক সময় হরতো বাস্তব ও জীবনের পক্ষে বিপজ্জনক অবস্থার মধ্য দিয়েও অগ্রসর হ'তে হবে। কিন্তু যদি বিপদকে ভয় না করেন এবং কঠোর পরিশ্রম করতে কাতর না হন, তাহ'লে কর্মজীবনে যথেষ্ট প্রতিষ্ঠা অর্জন করতে পারবেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

আপনার সেই সব কাজ ভাল লাগবে, যাতে সাধারণকে শিক্ষা অথবা আনন্দ দেওয়া যায়। হস্তরায় সাহিত্য শিল্প বিজ্ঞান ইত্যাদির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কর্মের দিকে আপনার স্বাভাবিক আকর্ষণ দেখা যেতে পারে। সাংবাদিক সাহিত্যিক আইনজ্ঞ চিকিৎসক প্রভৃতি কাজের যোগ্যতা পাবেন আপনার আছে, তেমনি অভিনেতা সঙ্গীতজ্ঞ নাট্য-পরিচালক প্রভৃতি কাজের যোগ্যতাও আপনার মধ্যে আছে। যেখানে বহুজনের সংস্রব আছে এবং বহু ব্যক্তিকে পরিচালনা করা প্রয়োজন হয় সেই সব

কাজে আপনার যোগ্যতা প্রকাশ পাবে কিন্তু বহুজনের সংস্রবে কর্ম করলেও, আপনি সেইখানেই বেশী যোগ্যতার পরিচয় দিতে পারবেন, যেখানে সকলে আপনার শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করবে। চাকরী প্রোফেশান এবং ব্যবসা বাই-আপনি করুন, আপনার লক্ষ্য থাকবে প্রাধান্যের দিকে; কিন্তু প্রাধান্য পেতে হ'লে আপনাকে অক্লান্ত পরিশ্রম করতে হবে।

মনে রাখবেন স্বস্তারশি কর্মযোগের রাশি। যদি স্বার্থের দিকে লক্ষ্য না করে শুধু কাজের জন্তেই কাজ করে যেতে পারেন তাহ'লেই আপনি আনন্দ পাবেন বেশী।

### পারিবারিক

আত্মীয় স্বজনদের দ্বারা উপকারের চেয়ে ক্ষতির আশঙ্কাই আপনার বেশী, তা সে আত্মীয় দূরেই হোক, আর নিকটই হোক। ভ্রাতা ভগ্নী বহু হ'তে পারে কিন্তু ভ্রাতা ভগ্নীর জন্ত অর্থব্যয় বা পারিবারিক ঝগড়ার আশঙ্কা আছে। ভ্রাতা ভগ্নীর কোন গুপ্ত ব্যাপার নিয়ে বিশেষতঃ তাদের মধ্যে কারো দাম্পত্য জীবনের ব্যাপারে কোনরকম কেলেঙ্কারী বা লোকসমাজে অপবাদ হওয়াও বিচিত্র নয়। মোটকথা ভ্রাতা ভগ্নী বা আত্মীয় স্বজনদের দ্বারা আপনার পারিবারিক স্বচ্ছন্দ্যের কম-বেশী বিঘ্ন ঘটবে।

গৃহ ভূমি বা বাসস্থানের ব্যাপার নিয়ে কম-বেশী ঝগড়া আপনার পোহাতে হবে এবং মধ্যে মধ্যে গৃহ-স্থলের অভাব বিশেষভাবে অনুভব করবেন। পারিবারিক স্থানের সমস্ত উপকরণ বর্তমান থাকলেও অনেক সময় আপনার পারিবারিক স্বচ্ছন্দ্যের অভাব ঘটবে।

আপনার বহু সন্তান হওয়াই সম্ভব। সন্তানের ব্যাপারে ব্যয়বাহুল্য ঘটবে এবং সন্তানের কর্ম-জীবন বা সাক্ষ্য সম্বন্ধে কম-বেশী চিন্তা উপস্থিত হ'তে পারে। কোন জামাতা বা পুত্রবধূর উচ্চস্থান থেকে পতন, রক্তপাত, জলভয় প্রভৃতি দুর্ঘটনা ঘটায় আশঙ্কা আছে। তা ছাড়া তাদের জন্ত কোন রকম আশান্ত্র বা মনোকষ্ট হওয়াও সম্ভব।

### বিবাহ

বিবাহের ব্যাপারে আপনার কোনরকম আশান্ত্র বা অপবাদ হওয়ার আশঙ্কা আছে। আপনি স্ত্রী (বা স্বামী) সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন হ'য়ে উঠতে পারেন এবং মধ্যে মধ্যে তাঁর সঙ্গে বিচ্ছিন্ন হ'য়ে থাকিও অসম্ভব নয়। আপনার দাম্পত্য-ব্যাপার সাধারণের সমালোচনার বিষয় হ'তে পারে এবং পারিবারিক কারণে অথবা কর্মসুচির জন্ত আপনার দাম্পত্য স্থলের বিঘ্ন ঘটনা সম্ভব। যদি এমন কারো সঙ্গে আপনার বিবাহ হয় যার জন্মদাস জ্যেষ্ঠ, আধীন, অগ্রহারণ অথবা দাস, জ্ঞাতভিষি শুক্রপক্ষের প্রতিপদে অথবা কৃকপক্ষের অষ্টমী, তাহ'লে তার সঙ্গে আপনার সঙ্গে মনের মিল হবে বটে কিন্তু তৎসংস্রবও আবেষ্টনের চাপে অনেক সময় দাম্পত্য স্থলে বিঘ্ন ঘটবে।

### বন্ধুত্ব

বন্ধুত্বের ব্যাপারে আপনাকে ভাগ্যানশী বলা চলে না। অনেক লোকের সঙ্গে পরিচয় হবে, কিন্তু প্রকৃত বন্ধু পাবেন খুব কমই।

যদিই ভাগ্যক্রমে কোন বন্ধুলাভ হয়, অবস্থাগতিকে অল্পদিনের মধ্যেই তার কাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হ'তে হবে। মোট কথা বন্ধুত্বের ব্যাপারে কম-বেশী আশাভঙ্গের দুঃখ হচ্ছে আপনার অদৃষ্টলিপি। গাঁদের জন্ম-মাস জ্যৈষ্ঠ আশ্বিন বা মাঘ কিবা গাঁদের জন্মতিথি শুক্লাপ্রতিপদ কি ফুলা অষ্টমী তাঁদের সঙ্গে আপনার ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব হ'তে পারে—

আপনার অনুচর পরিচরের সংখ্যা অনেক হবে। তারা আপনার অনুগতও হবে এবং আপনার উপর তাদের একটা প্রীতির আকর্ষণও থাকবে। কিন্তু তৎসঙ্গেও তাদের জন্তু আপনাকে কম-বেশী ঝগড়া-শাণ্ডিল্য ও মনোকষ্ট ভোগ করতে হবে।

আপনার গুপ্ত শত্রু অনেক থাকবে। বিশেষতঃ ধনিক ও বণিক সম্প্রদায়ের মধ্যে এমন অনেক ব্যক্তি থাকবে যারা মুখে সৌজন্য দেবালেও ভিতরে ভিতরে আপনার ক্ষতির চেষ্টা করবে। সে রকম লোকের কথার উপর নির্ভর করে কাজ করতে গেলে অনেক সময় আপনাকে বিপর্যয় হ'তে হবে।

### স্বাস্থ্য

স্বাস্থ্যের দিকে আপনার বিশেষ লক্ষ্য রাখা উচিত। শৈশবেও বাল্যে আপনাকে অনেকবার দেহকষ্ট ভোগ করতে হবে। আপনার দেহের মধ্যে পাকস্থলী, বকুৎ, অন্ত্র এবং পায়ের নিম্নাংশ এই সকল যন্ত্রগুলি দুর্বল, হুতরাং অল্প অজীর্ণ, আনাশয় অস্বচ্ছ, অস্বচ্ছ, পায়ের ধমনী ক্ষীণ প্রভৃতি রোগ সম্বন্ধে সতর্কতা আবশ্যিক। পথ্যের দিকে আপনার বিশেষ লক্ষ্য রাখা উচিত। আপনার দেহ চায় পুষ্টিকর অথচ লঘুপাক পান্ন। বেশী তীক্ষ্ণ মশলাযুক্ত খাদ্য আপনার বর্জন করাই ভাল। আপনার দেহে ভিটামিনের অভাবজনিত গীড়া এবং দূষিত পদার্থ নিঃসরণ না হওয়ার জন্তু ব্যাধির আশঙ্কা আছে—হুতরাং লক্ষ্য রাখবেন যে খাদ্যে যেন যথেষ্ট ভিটামিন থাকে এবং জল যেম কম খাওয়া না হয়। কোন রকম মাদকদ্রব্য এবং তীক্ষ্ণ বিষ ঔষধাদি ব্যবহার না করাই ভাল। মুক্ত হাওয়ায় পদচারণা আপনার স্বাস্থ্যের পক্ষে অনুকূল। কিছু না কিছু শারীরিক পরিশ্রম এবং আহার বিহারে নিয়মানুবর্তিতা আপনার স্বাস্থ্যের পক্ষে একান্ত প্রয়োজন।

### অন্ত্যাত্ম ব্যাপার

আপনাকে মধ্যে মধ্যে ভ্রমণ করতে হবে। কোন কোন সময় নিজের অনিচ্ছা সত্ত্বেও বাধ্য হ'য়ে দূর দেশে যেতে হবে, হয়ত নিজের ভাগ্য পরীক্ষার জন্তু, হয়তো বা কারো কোনও দায়িত্বপূর্ণ বা গোপনীয় কর্মের ভার নিয়ে। সে বাই হোক ভ্রমণ আপনাকে করতে হবেই। বিদেশে বা কোন দূর দেশে কোন বিপজ্জনক কাজে আত্মনিয়োগ করার জন্তু আপনি খ্যাতি বা প্রতিষ্ঠা অর্জন করতে পাবেন।

### স্মরণীয় ঘটনা

আপনার ১২, ২৪, ৩৬, ৪৮ প্রভৃতি বর্ষগুলিতে নিজের বা কোন আত্মীয়ের সংগ্রবে কষ্টকর অভিজ্ঞতা হ'তে পারে। ৩, ৬, ১৫, ১৮, ২৭, ৩০, ৩৯, ৪১, ৫১, ৫৪ প্রভৃতি বর্ষগুলিতে কোন উল্লেখযোগ্য শুভ ঘটনা ঘটা সম্ভব।

### বর্ণ

আপনার প্রীতিপদ ও সৌভাগ্যবর্ধক বর্ণ হচ্ছে ধূসর, কমলা রঙ, মধুপঙ্গল (Brown) প্রভৃতি। তা ছাড়া পাণিগ করা ধাতুর চক্চকে রঙের মত সব রকম রঙ বিশেষ করে নিকেল, Platinum রূপা প্রভৃতির রঙ আপনার উপযোগী। দেহমনের অস্থির অবস্থায় কিন্তু বেগুনে রঙ ব্যবহারে উপকার পাবেন।

### রত্ন

আপনার ধারণের উপযোগী রত্ন গোমেদ, গোল্ড স্টোন (Gold stone) আঘার (amber) প্রভৃতি।

যে সকল প্যাঁতনামা ব্যক্তি এ রাশিতে জন্মেছেন তাঁদের জনকস্বয়ংকর নাম—থারী বিবেকানন্দ, নেতাজী সুভাষচন্দ্র, আলোকজ্যোতির দি এন্ট, সম্রাট সমুদ্র এডওয়ার্ড, সম্রাট পঞ্চম জর্জ, ম্যানন ব্রিটিশ, হরনাথ ঠাকুর, প্রসিদ্ধ সিনেমা অভিনেত্রী গ্রেটাগারো, প্রসিদ্ধ সিনেমা পরিচালক ডি ওবলিগু য়িকিট, প্রসিদ্ধ লেখক ও সিনেমা পরিচালক প্রিগ্রেমেন মিত্র, রাসবিহারী বোষ, প্রসিদ্ধ ভাষাতত্ত্ববিদ হরনাথ দে, প্রসিদ্ধ লেখক অক্ষয়কুমার দত্ত।

## আজি এই মারারাতি

### শ্রীআশুতোষ সান্যাল

আজি এই মারারাতি সকল হৃদয়  
তীব্র মাদকের মত উত্তল উদ্ভাস  
করিছে আমার! শুধু যেন মনে হয়  
রূপের পশরা নিয়ে ধরিয়াছে ফাঁদ  
অনন্ত লাবণ্যময়ী এ বিশ্ব প্রকৃতি  
ত্রিদিব স্থলিত পরি' জোছনা-অশ্রু  
নিভুতে আমা'রে পেয়ে! কত মধুস্বতি,

কত গীতি, কত প্রীতি আজি এ অন্তর  
করি' তোলে উত্থলিত বিধুর ব্যাকুল!  
হে প্রকৃতি, হে স্মারনা, হে প্রেয়সী মোর,  
চাঁদিনীর টিপ পরি, এলাইয়া চুল—  
আমা'রে ভুলাতে কেন এ প্রয়াস তোর?  
নিশি শেষে বাবে টুটে এ প্রেম-বন্ধন—  
তাই ভেবে প্রাণ মোর করিছে ক্রন্দন!

# সেই জন্তে আমরা

## নাচার্য গান্ধীপাধ্যায়



পনেরো

সভাটা বসল কিষণ সমিতির অফিসের সামনে।

এত লোক হবে আশা করা যায়নি—নগেন ডাক্তারের যোগ্যতা আছে দেখা যাচ্ছে। কখনো সাইকেলে চড়ে আবার কখনো বা সাইকেলটাকে কাঁধে চাপিয়ে চষে বেড়িয়েছে গ্রামের পর গ্রাম। পালগ্রামের সাঁওতালেরা এসেছে, এসেছে কালা-পুখরীর গুঁরাগুঁয়ের দল, আর এসেছে সাধারণ কৃষক। তাদের ভেতরে বড় কৃষাণ আছে, বর্গাদার। জোতদারেরা আসেনি—খবর দিলেও তারা আসত না।

নগেনই প্রস্তাব করল।

—আজকের এই সভায় সভাপতি হবেন কালা পুখরীর সনাতন মণ্ডল।

সনাতন হকচকিয়ে গেল। দু হাত জোড় করে বললে, ডাক্তার ভাই, আমি—

রঞ্জন বললে—আমি এই প্রস্তাব সমর্থন করি।

আশ্রয়ের আশায় দু চারবার এদিক ওদিক তাকালো সনাতন : কিন্তু আমি—

আর কিছু তাকে বলতে দেওয়া হল না। তাকে হাত ধরে বেকিতে বসিয়ে দিলে নগেন। আনন্দিত করতালির ধ্বনি উঠল চারদিকে।

—কিষণ সমিতি কি জয়—

—ইন্ কিলাব জিন্দাবাদ—

এক হাজার মানুষের গলা থেকে প্রতিশ্রুতি ছড়ালো আকাশে। এক হাজার মানুষ। এক হাজার চওড়া বুক—দু হাজার লোহায গড়া কঠিন পেশী। দু হাজার চোখে উজ্জল প্রাণের অগ্নি।

নগেন বললে, ভাই সব, অনেক দূর দূর থেকে আপনারা সবাই এসেছেন। তাই আপনারদের সকলকে একটু তাড়া-তাড়িই ছেড়ে দিতে হবে—নইলে ফিরতে রাত হয়ে যাবে। দিন কাল খারাপ, মাঠে আজকাল খুব সাপের উৎপাত

হচ্ছে। সেই জন্তে আমরা এখন সভার কাজ আরম্ভ করব। আর আজকের সভার উদ্দেশ্য আপনারদের ভালো করে বুঝিয়ে বলবেন আমাদের রঞ্জনদা।

রঞ্জন উঠে দাঁড়াল। নিজেকে কেমন বিরত, কেমন অপরাধী বলে মনে হচ্ছে। বক্তৃতা দেবার অভ্যাস তার আছে, জেল থেকে বেরবার পর কিছুদিন তাকে এখানে ওখানে বক্তৃতা দিয়ে বেড়াতেও হয়েছে। কিন্তু সে বক্তৃতা, পোষাকী, তার রূপ সাজানো-গোছানো, আলংকারিক। সেখানে যুক্তির সঙ্গে ইমোশনের মিশ্রণ, তথ্যের সঙ্গে তির্যক ব্যঙ্গের বিস্তার, ভাবার অলঙ্কারে ধ্বনির কুহক-বিস্তার। কিন্তু এতো তা নয়। হাজার মানুষের চোখ তীক্ষ্ণ উজ্জল প্রশ্ন নিয়ে তার দিকে তাকিয়ে আছে। স্পষ্ট উত্তর চায় তারা—চায় জীবন-মরণ সমস্যার অকুণ্ঠ সমালোচনা। এখানে রাজনীতির ব্যসন নয়, কথার কারু-শিল্প নয়—যুগকালের ছিন্ন জটা থেকে ক্রোধরূপী পুরুষের আগ্নেয় আবির্ভাব ঘটেছে তাদের মধ্যে : হয় পথ দেখাও, নইলে পথ থেকে সরে যাও। জন-জগন্নাথের রথযাত্রা শুরু হয়ে গেছে—দড়ি যদি টানতে না পারো, গুঁড়িয়ে যেতে হবে রথের তলায়।

অনধিকারী। অনধিকারী বই কি। এদের মন তার নয়—সে মন আরম্ভ করে নিতে হচ্ছে। কিন্তু সে কি সহজ কাজ? কত সংশয়—কত সংস্কার। মানসিক আভিজাত্য—ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের অহমিকা পথ জুড়ে দাঁড়িয়ে আছে পর্বত প্রাকারের মতো। শ্রেণীচ্যুতি! এক নিঃশ্বাসে বলবার মতো সহজ কথা, কিন্তু প্রয়োগ ক্ষেত্রে? বংশক্রমের অলঙ্কার শৃঙ্খল চিন্তাকে সন্ন্যাস গ্রন্থিলতার জড়িয়ে রাখে, শূন্যনির্ভর সংস্কৃতির অহঙ্কার বিধার পরে বিধা আনে। তবু—

তবু চেষ্টা করতেই হবে। যতটা পারি—যতখানি সম্ভব। চেষ্টায় ফাঁক না থাকে, ফাঁকি না থাকে আন্তরিকতায়। আগামী দিনের ইতিহাসের কাছে আমাদের স্বপক্ষে এই তো দলিল।

রঞ্জন বললে আপনারা সবাই জানেন, নদীর বন্যায়

কাল পুথুরি অঞ্চলের হাজার হাজার বিঘে ধানী জমি প্রতি বছর কী ভাবে বরবাদ হয়ে যায়। আর জমিদারের কিছু জলকর বাঁচাবার জন্তে নষ্ট হয় হাজার লোকের মুখের গ্রাস। তাই এবার বর্ষা নামবার আগেই বাঁধ দেওয়া হবে কাল পুথুরির দাঁড়ায়। কিন্তু তাতে জমিদারের বাধা। এই বাধা সয়ে এমন করে কিছুতেই আপনারা মরতে পারেন না। এবার ক্রমে দাঁড়াতে হবে আপনারদের—সকলে হাতে হাত মিলিয়ে বাঁধ বাঁধতে হবে। হয়তো জমিদারের লাঠিয়াল আসবে—পুলিসও আসতে পারে। কিন্তু সেই জন্তে আপনারা পিছিয়ে যাবেন কিনা সে বিচারের ভার আপনারদেরই ওপর।

—জান কবুল—উগ্র চীৎকার উঠল একটা।

—হামার অ্যাক্টা কথা বলিবার আছে—একজন দাঁড়িয়ে উঠল।

—বসি যাও হে বসি যাও। তুমি আবার খামাখা খামেলা লাগাইলেন ক্যানে হে?—

কয়েকজন তাড়া দিলে।

সভাটার ওপরে একখানা হাত বাড়িয়ে দিলে রঞ্জন।

—না, না, চুপ করুন আপনারা। সকলের কথাই শুনতে হবে আপনারদের। বলুন, কী বলবেন আপনি?

যে দাঁড়িয়েছিল, সে একজন মাঝ-বয়সী কৃষাণ। এক সময়ে অভিকায় একটা কাঠামো ছিল, হয়তো অমাত্রিক শক্তিও ছিল গায়ে। কিন্তু অর্ধাহারে আর ঋণের বোঝায় পিঠ কুঞ্জে হয়ে গেছে, চাপা চওড়া কপালের তলায় চোখ ছোটো গভীর গর্তের আড়ালে গিয়ে লুকিয়েছে। একটা শক্ত অনিশ্চয় দৃষ্টি চারদিকে বুলিয়ে নিয়ে বললে, হামি কহিতেছিহু, কাল-পুথুরিতে খামেলা হচ্ছে তো হচ্ছে। সেইটা লিয়া ওইখানকার মানসিলাই (মাছুষ-গুলোই) লড়িবে। হামরা ক্যানে ঝুটমুট ওইঠে বাই ক্যাচাঙে পড়িমু।

—ইটা একদম বাজে কথা হচ্ছে—একজন প্রতিবাদ করল ভীত গলায়।

—না, বাজে কথা নয়—রঞ্জন আবার হাত বাড়িয়ে দিলে সভার দিকে: এরকম কথা আপনারদের সকলেরই মনে উঠতে পারে, আর তা ঠাণ্ডা উচিত। সত্যিই তো, ~~আমাদের~~ জন্তে কেন আপনারা লড়তে যাবেন? কেন

আপনারা পড়তে যাবেন জমিদারের কোপে? বিশেষ করে যে কাল-পুথুরিতে আপনারদের কোনো স্বার্থই নেই? ঠিক কথা। সোজা হুজি ভাবতে গেলে এমনই মনে হওয়া উচিত। কিন্তু তাই সব, আজ দিন বদলে গেছে। আজ হুনিয়ার সব ছুঃখী মানুষকে পাশাপাশি দাঁড়াতে হবে নিজেদের পাওনা-গণ্ডা বুঝে নেবার জন্তে। যতদিন আপনারা ফারাক হয়ে ছিলেন, ততদিন আপনারদের ক্ষেতের ফসল লুটে নিয়েছে জমিদার, ঘর বাড়ি গোরু-হাল নীলামে তুলেছে মহাজন। আজ যে যেখানে আছেন যদি এক কাঠা হয়ে দাঁড়ান তা হলে দেখবেন হুদিনেই সব জুলাম্বাজী বন্ধ হয়ে গেছে। রামের স্বার্থ রাখবার জন্তে যদি রহিম দাঁড়ায়, আলিকে বাঁচাবার জন্তে যদি যহু ছুটে যায়—তা হলে সবাই বুঝতে পারবে তামাম পৃথিবীর ভুখা মানুষেরা আজ একদলে। কেউ আর তাদের ঘাঁটাতে সাহস করবে না। আজ আপনারা যদি কাল-পুথুরিতে বাঁধ দেবার জন্তে এগিয়ে যান, তা হলে কাল জয়গড়ে আপনারদের ফসল বাঁচাবার জন্তে যে কাল পুথুরির মানুষগুলোই ছুটে আসবে এ কথা কেন আপনারা বুঝতে পারছেন না?

—আলবৎ! বুঝি হামরা।

—কাল পুথুরির মানসিলার সাথ হামরা একদল।

—এক কাঠা হই হামাদের বাঁধ গড়িবা হেবে!

—কিবাণ সমিতি জিন্দাবাদ!

রঞ্জন সভার দিকে তাকালো। হাজার মানুষ নয়—ক্রোধ-সমুদ্র। তরঙ্গের পর তরঙ্গ তুলে আসছে। ভেঙে দেবে—ঙাড়িয়ে দেবে, ধ্বসিয়ে দেবে বালির বনিয়াদে গড়া শিষ্-মহলের স্বপ্নকে। সেই তরঙ্গের মুখে সে নিজেও টিকে থাকতে পারবে তো? দাঁড়িয়ে থাকতে পারবে তো তার মানসিক আভিজাত্যের খুঁটিতে? এই তরঙ্গের মুখে সেও কি এগিয়ে যেতে পারবে না, নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে ক্রোধ-বজ্রার এই বিপুল উৎক্ষেপে?

সংশয়-শক্তিত মন যেন শুক হয়ে দাঁড়ালো আচমকা থমকে দাঁড়ালো হৃৎস্পন্দন। রক্ত নাড়ীতে গুর, গুর, করে ঝোড়ো মেঘের ডাক। তারপর—তারপর?

নগেন বললে, এতেই হবে রঞ্জনদা। এবার তুমি বোসো, বাকাটা আমি শেষ করে দিই।

\* \* \* \*

জয়গড়ে নগেন ডাক্তারের ঘরে বসেছিল তিনজন।

বাইরে জ্যোৎস্না উঠেছে—শুভ্রা রাত। মহরা বনের পাতার পাতার রূপালি জরির মতো স্বকমক করছে জ্যোৎস্না—দোলা খেয়ে যাচ্ছে হাওয়ায় হাওয়ায়। টানন নদীর জলটা যেন শাদা হয়ে আছে একরাশ ছুঁয়ের মতো। একটা মোড়ার ওপর বসে সেদিকে তাকিয়ে অন্তমনস্ক হয়ে ছিল উত্তমা। রজনৈর বেশ লাগছিল শ্রামাদী স্বাস্থ্যবতী মেয়েটির এই ভঙ্গিটুকু। মাটি কোপায়, পোষ্টার লেখে, মেয়েদের জড়ো করে আনে, পুরুষের মতো উঁচু গলার চোঁচিয়ে হেসে ওঠে। মনাক্রান্তা ছন্দ নয়, ভূজঙ্গ-প্রস্রাভের গলিতবিস্তার নয়—অছটুপের মতো কঠিন ঋজুতা। তবু ছন্দ ছন্দই। তারও রেশ আছে, তারও ব্যঙ্গনা আছে, তারও কথার কথার হরিণীপুতার স্বাকার বেজে ওঠে। এই মুহূর্তে আত্মমগ্ন উত্তমাকে দেখে এই কথাই রজনৈর মনে দোলা দিয়ে বাচ্ছিল, ঝলকে উঠছিল বাইরের ঝলক-লাগা মহরা পাতার মতো।

কিন্তু গতময় নগেন এক টিপ নস্ত টানল।

—মিটিংটা কিন্তু খুব ভালো হয়েছে রজন দা।

—চমৎকার। এত ভালো হবে আশা করিনি।

—তোমার কী মনে হয়? ওই বাঁধটাকে নিয়েই একটা জোরদার লড়াই আমরা গড়ে তুলতে পারব?—উৎসুক জিজ্ঞাসুভাবে নগেন রজনৈর দিকে তাকালো, চোখ দুটো চকচক করে উঠল তার।

—তাই তো মনে হচ্ছে।

আবার এক টিপ নস্ত নিয়ে বেশ শব্দ করে টানল নগেন।

—জানো রজনদা, এই আমাদের প্রথম শক্তিপরীক্ষা। এতদিন ধরে যে সব কথা আমরা ওদের বুঝিয়েছি, যেভাবে ওদের চালাতে চেয়েছি, তা কতটা সফল হবে, এরই ওপরে তার বাচাই। যদি লড়াই জিততে পারি—জেনে রেখো এ তলাটে কাউকে আর দাঁত ধোঁটাতে হবে না। আর যদি হারি, তাতেও দমবার কিছু নেই। এক পা পিছু হটে গেলে পাণ্টা দশ পা এগিয়ে বাবার ঘোর আমরা পাব। কী বলিস উত্তমা?

বোঁর লাল চোখ মেলে উত্তমা একবার ফিরে তাকালো। কথা বললে না, তবু মাথা নেড়ে নিজের

সমর্থনটা জানিয়ে দিলে। তার মন এখানে নয়—আরো কিছু সে ভাবছে, আবিষ্ট হয়ে গেছে মহরা বন আর টানন নদীর দিকে তাকিয়ে। অছটুপের ক্রান্ত-দীপ্তির ওপর মনাক্রান্তার মেঘ নেমেছে কোথাও।

রজন বললে, কিন্তু একটা খবর শুনেছ তো? পাণ্টা নগরের শাহ কিন্তু মুসলিম-লীগ গড়বার জন্তে উঠে পড়ে লেগেছেন। মুসলমানদের সরিয়ে নেবেন তোমাদের আন্দোলন থেকে।

—মুসলিম-লীগ গড়তে চান গডুন। মুসলমানের স্বার্থের কথাও তিনি ভাবুন। কিন্তু সকলের স্বার্থ নিয়েই যেখানে লড়াই, সেখানে কতদিন তিনি মুসলমানকে আলাদা করে সরিয়ে রাখতে পারবেন? সাজা ইমান বার আছে, আজ হোক কাল হোক ছুটে সে আসবেই। তার প্রমাণ আলিমুদ্দিন মাস্টার। সেদিন সভায় কী কাণ্ড হয়ে গেছে শোনোনি বুঝি?

—শুনেছি। আলিমুদ্দিন খাটি লোক—সভ্যিকারের আজাদ পাকিস্তানের কথাই তিনি ভেবেছেন। তাই সেদিনের সভায় তিনি শাহর মুখোশ খুলে কেলেছেন। তা নিয়ে খুব গুণগোলও চলছে। কিন্তু সেইজন্তে তুমি একথা মনে কোরোনা যে তিনি তোমারই দলে এগিয়ে আসবেন। তিনি সোশ্যালিজমে বিশ্বাস করেন—এ আমার কখনো মনে হয় না।

—কী করে জানলে?—তর্ক করার উৎসাহে নগেন উদ্বীগু হয়ে উঠল : দেশের মানুষকে যিনি ভালোবাসেন; তাদের মজল যিনি করতে চান, তিনি একদিন না একদিন আমাদের সঙ্গে এক লক্ষ্যে এসে মিলবেনই। হয়তো সেদিন আমাদের সকলের আগেই তাঁকে আমরা দেখতে পাবো।

—বেশ তো, আশা করতে থাকো—রজন টিপনি কাটল।

নগেন উত্তেজনার সঙ্গে কী বলতে যাচ্ছিল, এমন সময় বাইরে থেকে ভারী গলার ডাক এল : উত্তমা!—উত্তমা আর নগেন একই সঙ্গে চমকে উঠল। মোড়া ছেড়ে দাঁড়িয়ে উঠল উত্তমা।

—নগেন নেই বাড়িতে?—আবার ডাক শোনা গেল।

—আমার সেই জ্যাঠামশাই—সেই জ্যাঠামশাই।—বিল

কিস্ করে বলেই নগেন সাড়া দিলে : আহি জ্যাঠামশাই, আসুন এ ঘরে।

একটা চটির শব্দ উঠে আসতে লাগল ঘরের দিকে। নগেন আবার চাপা গলায় বললে, সাংঘাতিক লোক। বুঝে-সুঝে কথা কোয়ো রজনদা।

রজন হাসল—জবাব দিলে না। বুঝে-সুঝে কথা! আর বাই হোক, ও জিনিসটার জন্তে তার ভাবনা নেই। দিনের পর দিন কুমার ভৈরবনারায়ণকে তার সঙ্গ দান করতে হয়। পড়ে শোনাতে হয় গীতার নিকাম কর্মযোগ—বিশ্বরূপকে এনে প্রতিষ্ঠা করতে হয় কুমার বাহাহুরের নেশার রং-লাগা চোখের সামনে; মৃত রসিকতায় হাসবার চেষ্টা করতে হয়—হাসতেও হয় কখনো কখনো। আর কিছু না হোক, কথা বলবার আঁটটাকে অন্তত তার জানতে হয়েছে।

চটির শব্দ চৌকাঠের গোড়ায় এসে পৌঁছল। জ্যোৎস্নার পরিষ্কার দেখা গেল মাল্লবটিকে। মাথায় চক চকে টাক, গায়ে বেনিয়ান। হাতে একখানা মোটা ছড়ি। মুখে কাঁচাপাকা দাড়ি—আচমকা দেখলে শ্রদ্ধা উদ্বেক করবার মতো প্রৌঢ়।

—আসুন জ্যাঠা, আসুন—নগেন ডাকল।

ভয়লোক ঘরে পা দিলেন। লষ্ঠনের আলোয় অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকালেন রজনের দিকে।

নগেন বললে, ইনি আমাদের রজনদা—রজন চট্টোপাধ্যায়। আর ইনি আমাদের জ্যাঠামশাই মৃত্যুঞ্জয় সরকার। এঁর কথা তো তোমায় আগেই বলেছি।

নমস্কার বিনিময়ের ভয়ভাটা শেষ হল। উত্তমা দাঁড়িয়ে উঠেছিল, তার পরিত্যক্ত মোড়াটার এসে আসন নিলেন মৃত্যুঞ্জয়। বেশ জাঁকিয়েই বসলেন।

কৈকিয়ৎ দেবার ভয়ভিতে একবার মৃত্যুঞ্জয় নগেনের দিকে তাকালেন : এই পথ দিয়েই যাচ্ছিলাম, ভালমন্দ তোদের একবার খবর করে যাই। তোঁর মা কোথায়?

জবাব দিলে উত্তমা : হরিসত্যায় গেছেন—কীর্তন শুনতে।

—আজ হরিসত্যায় কীর্তন আছে বুঝি? ওহো, মনেই তো ছিল না।—মৃত্যুঞ্জয় বেন অহতপ্ত হয়ে উঠলেন : বা দিনকাল পড়েছে—কিছু কি আর মনে থাকে। সংসারের

চিন্তাতেই অস্থির—বর্মকর্ম মাথায় উঠে গেছে। কী বলেন? —শেষ কথাটা তিনি রজনের দিকে নিকষ করলেন।

—তা বটে—রজন মাথা নেড়ে সায় দিলে।

আপনাকে আমি চিনি। হিজলবনের রাজবাড়িতে আপনি থাকেন—তাই না?—মৃত্যুঞ্জয় একটা জুর দৃষ্টি ফেললেন।

মুহূর্তের জন্তে রজনের মুখে একটা অবস্থির ছায়া ছলে গেল : আজ্ঞে হ্যাঁ।

—ও। মৃত্যুঞ্জয় কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন, মনে মনে যেন মিলিয়ে নিতে চাইলেন কিছু একটার যোগসল : ভালো কথা নগেন, আজ বুঝি তোদের কিবাণ সমিতির একটা সভা ছিল, না?

—ছিল যে সে তো আপনি ভালোই জানেন জ্যাঠামশাই—নগেন একটা ধারালো মন্তব্য ছুঁড়ল।

—ওহো, তাও তো বটে। বুড়ো বয়েসে আজকাল সব কিছু ভুল হতে শুরু করেছে। তা কী হল সেই মিটিঙে?

—দেশের লোকের দাবী-দাওয়া নিয়ে আলোচনা—নগেন জবাব দিলে।

—সেই কাল-পুখুরির ব্যাপারটা বুঝি?—মৃত্যুঞ্জয় আড়চোখে রজনকে লক্ষ্য করতে লাগলেন।

হঠাৎ উত্তমা হেসে উঠল। এতক্ষণ ধরে বেন বাঁধা পড়ে ছিল একটা ঝগার জল—মুক্তির উচ্ছল আনন্দে ছুটে বেরিয়ে এল হঠাৎ।

—কিছু তেবোনা দাদা। সব খবরই রাখেন জ্যাঠামশাই—তোমার চাইতে ভালোই রাখেন।

চাপ দাড়ির ভেতরে মৃত্যুঞ্জয়ের মুখ দেখা গেল না, চোখের দৃষ্টিতে কুটলনা বিন্দুমাত্র বৈলক্ষ্য। খোঁচাটা তাঁকে যেন স্পর্শও করেনি—এ সবের অনেক উর্ধ্বে তাঁর আসন।

—খবর ঠিক রাখা নয়—এগুলো হাওয়াতেই ভেদে আসে কিনা।—দাড়ির নেপথ্যে মৃত্যুঞ্জয়ের মুখ একটু প্রসারিত হল, খুব সম্ভব হাসলেন : তা ভালোই। ওদের দুঃখ অনেক দিনকার—মোটোতে পারো তো একটা মত বড় কাজই হবে। কিন্তু নগেন, কিছু মনে না করো তো একটা কথা বলি।



—বলুন না।

—বা করছ ভালোই করছ। কিন্তু দেখো, হিংসার পথ কখনো নিয়োন। ওতে কখনো কল্যাণ নেই। মহাত্মার পথ নাও, অহিংসা দিয়ে সংগ্রাম করো।

নগেন একটু হাসল : আপনি কোনো চিন্তা করবেন না জ্যাঠামশাই। ‘অহিংসা পরমো ধর্ম’ তা আমরা জানি। আমাদের ব্যাপারটা নিছক নিরামিষ—ওতে কোনো রক্তারক্তির গন্ধ নেই।

উত্তমা আবার খিল খিল করে হেসে উঠল। বরের শাস্ত আবহাওয়ার মধ্যে তার আকস্মিক হাসিটা লিক লিক করে গেল এক গোছা চাবুকের মতো।

—জানেন রজনন্দা, জ্যাঠামশাই ভারী অহিংস। উনি শুধু মাছ মাংস খাননা তাই নয়, ভুলেও কোনোদিন একটা ছারপোকা পর্যন্ত মারেন না।

আশ্চর্য সংঘম মুহূর্তের। এ আঘাতও তাঁকে স্পর্শ করল না।

ধীর শান্ত গলায় বললেন, হাঁ, অহিংসার সেবক। আপনারা ইয়ংম্যান রজনবাবু, এখনো রক্তের জোর আছে। কিন্তু জানবেন, আত্মার শক্তিতে যা হয়, হাজার বাহুবলেও তা হয় না। আর তার সবচেয়ে বড় নজীর গান্ধীজী। সারা দুনিয়া সে কথা স্বীকার করে।

হাতের লাঠিটা কুড়িয়ে নিয়ে মুহূর্তের উঠে পড়লেন।

—চললেন? নগেন জানতে চাইল।

—হাঁ, উঠি। একবার হরিসতার দিকেই বাই।

সারাদিন তো বিষয়ের চিন্তাতেই মন বিক্ষিপ্ত থাকে, ওখানে গিয়ে তবু একটু শান্তি পাব। চলি তা হলে রজনবাবু, নমস্কার। আপনার সঙ্গে আলাপ হয়ে ভারী খুসি হলাম—আবার দেখা হবে।

মুহূর্তের বিদায় নিলেন। কিছুক্ষণ ধরে তিনজনেই

কান পেতে শুনতে লাগল তাঁর বিলুপ্তমান চটির শব্দ।

—খুব অমায়িক লোক!—রজনই শুকতা ভাঙল।

—হাঁ, অত্যন্ত!—নিচের ঠোঁটটা একবার কামড়াল নগেন।

—ওঁর ওপর তোমাদের মধ্যে সন্দেহ। অত্যন্ত নিবীহ মাহুদ—বিনয়ে একেবারে লুটিয়ে আছেন—রজন আবার বললে।

—সাপও মাটিতে লুটিয়েই থাকে রজন-দা, কেবল ছোবল দেবার সুবিধের জন্তে।—উত্তমা আবার হাসল। কিন্তু উচ্ছল তীক্ষ্ণ কণ্ঠে নব। ছোয়ার ধারের মতো। একটা প্রথর হাসির রেখা বয়ে গেল তার ঠোঁটের কোণায় কোণায়।

(ক্রমশঃ)

## রায়-গুণাকর

### শ্রীঅপূর্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য

নত শিরে চিত্ত অর্থাৎ যুগ হতে যুগান্তর ঘের তব জগদীশ্বর হানে,  
এ বজ্রের ইতিহাসে রেখে গেছ বর্ণ লেখা, অনন্তের পারে গেছ তুমি ;  
ভারতীর বরপুত্র ! তোমারে প্রণাম করি যে ভারত ! স্মৃতি অমুটানে,  
জাতির জীবনতীর্থে তোমার জনকজ্যে সারথী সাধনার তুমি।  
হৃদয়ের কোণে কোণে আলো সলা জেগে থাকে অরুণামল রূপ লয়ে  
শঙ্কর মনের স্মৃতি পূর্ণতার অভিসার প্রণয়ের প্রাথমিক ছবি ;  
আলোক বর্ষের পথে যে আলোক যে আনন্দ ফুটে ওঠে নিত্যবস্তু হয়ে,  
চতুর্দিক বর্ষ চলে গেছে ; এনেছিল সেই আলো সে আনন্দ কবি !  
গগ্নীর নক্ষিত্রে তব শাস্ত্র অস্তিত্ব দেবী তীর্থযাত্রী-চিত্ত কোকনদে  
‘নতানব বিশ্বের পলে পলে সুরভিত তব গানে পরম স্মরণ।  
মনকারে উপহার অমৃতপ্রাসে ব্যঙ্গনার রসাতীর্ণ ভাবের সম্পদে’  
নখিল জগের যৌন মহাকাব্য রচিত্রায় রাজকবি রায়-গুণাকর।  
তুমি ছিলে রসার্ণব, হৃদয়ের তরঙ্গতব বহারেই বর্ণ উপকুলে,  
সংসারের সাধারার তোমারি যে রসধারা নবপ্রাণ দিল পান্থজনে।  
‘বিস্ত্র আনন্দ বস সাজারেই হিংসা তীর সত্যতার পায়পদ মূলে  
দেশের দ্বাটরে সোণা করে গেছ স্পর্শনিধি, সেই কথা পড়ে মোর মনে।

শ্রীতার রাজপথে বিজয়ের রসালোপ করে গেছ—মহে মিন্দনীর,  
যে বীজ করিয়া উগ্ধ চলে গেছ গুণাকর মহীকহে ব্যাপ্ত ভাবীকালে।  
এনেছিল লাগে করে সারথী কলবনা, কীর্ত্তি তব চির কীর্ত্তনীর,  
নবযুগ সাহিত্যের পবিত্র প্রভাটী আলো দিয়ে গেলে দিক্চক্রবালে।  
ভারতীর একতারা করে গেছ কাব্যবীণা, হুরে হুরে হুটোরেছ বাগী,  
স্বপ্নক সন্নিহা ধনি বীণার স্বরধরে মিশি সম্মোহিত করেছ স্বদেশ।  
যে ছিলোলে সত্যরূপ কালের কলোলে জাগে তারি গুহ সৌম্য চিত্রখানি  
দেখায়েছ বিশ্বমাঝে, হেরি বাহা ভুলে যায় যুগযাত্রী দুঃখ দৈন্ত ক্লেশ।  
একদা বিপদভলে তোমারে পালন করে হর্ষভরে রচিত্রা সংসার  
বর্ষক যুগরাজি পরতের বসন্তের সন্ধ্যা উবা সুহৃৎ মন্থর।  
জীবন প্রভাতে তব রূপে রসে সাজারেই বসন্তালোকে হৃদয় সত্তার  
অরণ্যের মূল পথ, বটবিশ আত্মবিশি, তৃণাতীর্ণ বিজয় প্রান্তর।  
তোমার বারতা ভারী আজিও বহন করে, কথা গাখে মনোনীলিমায়,  
কীটার ব্যথার বারা রঙীন গোলাপ হয়ে জেগে ওঠে, তাহাদের কানে,  
শুনায় নিকুতে কবি তোমার অমৃতকাব্য চন্দ্রালোকে সুহৃদ্য বায়,  
বেথার অতীত তুমি ; স্মরণ-দীপালী তব আলো পরা-হৃদি-বনপ্রাণে।

# 

## **শ্রীমতী-সাহিত্য সম্মেলন—**

বাধীন দেশে নতুন করিয়া স্বর্গত শ্রীমতীলাল রায় মহাশয়ের সাহিত্যের আলোচনা আরম্ভ হইয়াছে দেখিয়া আমরা আনন্দিত হইলাম। সম্প্রতি তাঁহার জন্মস্থান কলকাতায় স্থানীয় কলেজের অধ্যক্ষের সভাপতিত্বে এক বিশেষ-

সম্মেলন হইয়াছিল। ডক্টর শ্রীমতীপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় সভার উদ্বোধন করেন ও শ্রীমতীপ্রসাদ ঘোষ সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন। সিঁধি বিপিন-বনমালী সাধারণ পাঠাগারের উদ্যোগেও নিখিল ভারত বিশেষ সাহিত্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনের উদ্বোধন করেন সাংবাদিক শ্রীমতী-

প্রসাদ ঘোষ। ভারতের বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি এই সম্মেলনের সাফল্য কামনা করিয়া বাণী পাঠাইয়াছেন। শ্রীমতীলালমহাশয়ের জন্ম সাহিত্য সৃষ্টি করিয়াছিলেন—আজ বাংলার প্রকৃত মানবের অতাবই সর্বাপেক্ষা অমিত। এ সময়ে লোক বিশেষ-সাহিত্য পাঠ ও আলোচনা করিলে সত্যই উপকৃত হইবে। সে দিক দিয়া এই সকল সম্মিলনের প্রয়োজনীয়তা অত্যন্ত অধিক। আমরা এই সকল অর্চনায় উদ্যোক্তা-দিগকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করি।

## **নিখিল ভারত কংগ্রেস**

### **কমিটি—**

পশ্চিম বঙ্গ প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি হইতে গত ১১ই সেপ্টেম্বর ২৭ জন সদস্য নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির সদস্য নির্বাচিত হইয়াছেন—মোট ২১২ জন নির্বাচিত সদস্যের মধ্যে ২০০ জন ভোট দিয়াছিলেন। ৪৮ জন প্রার্থী ছিলেন—

হইয়াছেন—শ্রীঅতুল্য ঘোষ, শ্রীবিজয় সিং নারায়ণ, ডাক্তার প্রমুদচন্দ্র ঘোষ

শ্রীহরেন্দ্রমোহন ঘোষ, শ্রীপ্রমুদচন্দ্র সেন, জনাব আবদুল সত্তার, শ্রীনরেন্দ্রনাথ সেন, শ্রীকালীপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, শ্রীনিবন্ধবিহারী মাইতি, শ্রীশ্রীলক্ষ্মণর বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীঅজয়কুমার মুখোপাধ্যায়, শ্রীচাকর্য্য ভাণ্ডারী, শ্রীগোবিন্দ



শ্রীমতীলাল রায়

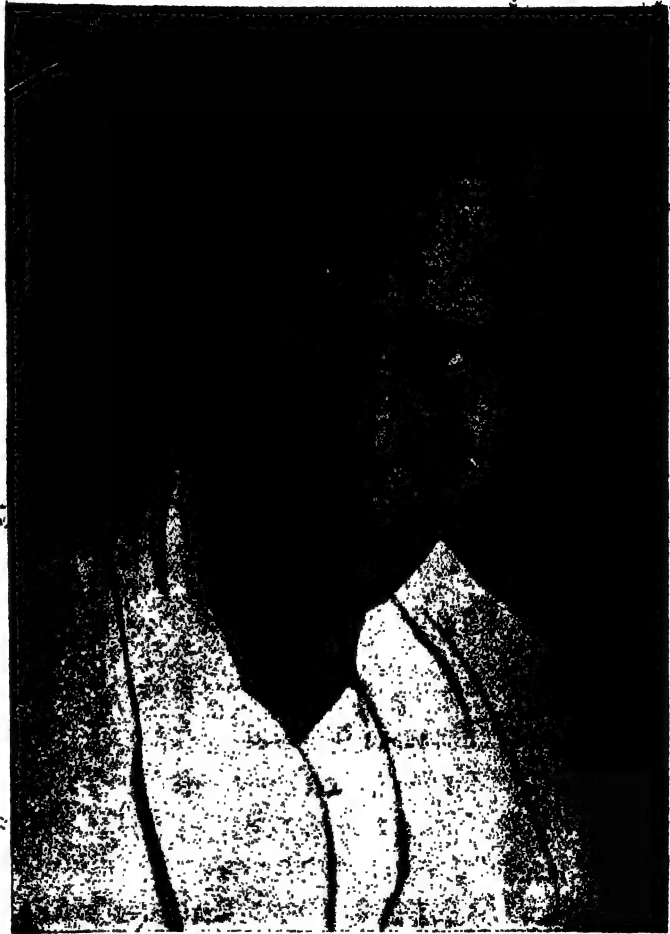
সাহিত্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। তাঁহার কবির কথা শ্রীমতী দায়া দেবী ও শ্রীঅতুল্য শ্রীমতীলাল রায় মহাশয় উদ্বোধিত ছিলেন। গত ২১শে তারিখ কলিকাতা কালীবাটে দেশবন্ধু বালিকা কলেজ ভবনেও এক বিশেষ-সাহিত্য

সিংহ, শ্রীভারত দাস বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীহর্গীপদ সিংহ, শ্রীধীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীপ্রফুল্লনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীবিপিনবিহারী গাঙ্গুলী, শ্রীশশধর বর, শ্রীজয়ভূষণ চক্রবর্তী, শ্রীচন্দ্রেন্দ্র মহাশি, শ্রীবসন্তলাল মুরারীকা, শ্রীলালবিহারি সিং, শ্রীভক্তচন্দ্র রায়, শ্রীককিরচন্দ্র রায়, ডাক্তার সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীসুবোধ মিত্র। ইহাদের মধ্যে ৩জন—কালাপদবাবু, প্রফুল্লচন্দ্র সেন ও নিরুজবাবু বর্তমানে পশ্চিম বঙ্গের মন্ত্রী। প্রফুল্ল বোব মহাশয় কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য এবং ডাক্তার সুরেশচন্দ্র ও সুরেন্দ্র-মোহন বোব পূর্বে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সভাপতি ছিলেন। এখনও বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির ১০ জন সদস্য নির্বাচিত হইন নাই—ঐহাদের নির্বাচনের পর নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির আর একজন সদস্য নির্বাচিত হইবেন।

#### শরৎচন্দ্রের জন্মবার্ষিকী—

গত ৩০শে ও ৩১শে ভাদ্র বাংলার নানাহানে অপরাহ্নের কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ৭০তম জন্মতিথি উপলক্ষে তাঁহার সাহিত্যের আলোচনা-সভা হইয়াছিল। ৩০শে এক সভায় ডক্টর শ্রীতানুপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় সভাপতিত্ব করেন ও রাষ্ট্রপাল ডক্টর কাটকু তাঁহার উদ্বোধন করেন। ডক্টর কাটকু তাঁহার ভাষণে বলেন—“শরৎচন্দ্রের লেখা গুলির মধ্য দিয়া তিনি বাংলার গ্রাম ও তাহার মরণ-প্রাণ অধিবাসীদের স্বরূপ প্রত্যক্ষ করেন। তিনি শরৎচন্দ্রের সমস্ত রচনা গিয়াছেন—তিনি যে সকল চরিত্র অঙ্কন করিয়াছেন, সেগুলি তাঁহাকে যুগ্ম করিয়াছে, কেননা চরিত্র গুলি কাল্পনিক নহে, সেগুলি প্রাপবৃত্ত। তিনি নারায়ণ ঋষি বুদ্ধি করিয়া গিয়াছেন।” শরৎ সাহিত্যের আলোচনার দলে দেশের লোকের মাহুষের প্রতি দরদ বুদ্ধি

পাইবে বলিয়া আমরা মনে করি। শরৎচন্দ্রের বঙ্গীয় স্বরূপ মাহুষ মাহুষেরই ছুঃখ, অমর্যাদা ও নির্যাতনে গলিয়া বাইত, তাই তিনি লেখনী দ্বারা সেই সকল ছুঃখ ও নির্যাতনের কাহিনী প্রকাশ করিয়াছিলেন। প্রকাশ করিয়াছিলেন বিশেষ করিয়া বাঙ্গালার নারী জন্মের গোপন কাহিনী, বা বলা বাধ্য হইতাহাস। তাঁহার চিত্রিত চরিত্রগুলি পাঠক সাধা-



শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

রণের সকলের নিকট সুপরিচিত—সেই জন্যই শরৎ সাহিত্য এ দেশে এত অধিক জনপ্রিয় হইয়াছে। শরৎসাহিত্য আলোচনা করিয়া দেশের মাহুষ বর্তমান দুর্গতি হইতে মুক্তির মন্ত্রণা লাভ করুক—কেনেই এই সকল সভাসমিতি করা সাধন।

### বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি—

গত ১২ই সেপ্টেম্বর কলিকাতায় বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির নবনির্বাচিত সদস্যগণের প্রথম সভা হইয়া গিয়াছে। এ পর্যন্ত ২১২ জন সদস্য নির্বাচিত হইয়াছেন—তন্মধ্যে ১৯২ জন সভায় উপস্থিত ছিলেন। কমিটির পূর্ব সভাপতি শ্রীমুরেশচন্দ্র মোহন ঘোষ অল্পপস্থিত থাকায় সহ-সভাপতি শ্রীবিপিনবিহারী গাঙ্গুলী সভায় সভাপতিত্ব করেন। সর্বপ্রথম শ্রীঅতুল্য ঘোষ কমিটির নূতন সভাপতি ও শ্রীবিজয় সিং নাহার সম্পাদক নির্বাচিত হইয়াছেন। শ্রীপ্রফুল্লনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীশশধর কর ও



পশ্চিমবঙ্গের কংগ্রেস-সভাপতি শ্রীঅতুল্য ঘোষ

শ্রীমুরেশচন্দ্র সেন ওজন সহ-সভাপতি এবং জনাব আবদুল সত্তার, শ্রীবিপিননাথ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীপ্রবীর জানা—ওজন সহ-সম্পাদক নির্বাচিত হইয়াছেন। শ্রীজয়কুমার মুখোপাধ্যায় কোষাধ্যক্ষ এবং নিম্নলিখিত ২১ জন কার্যকরী কমিটির সদস্য হইয়াছেন—শ্রীবিপিনবিহারী গাঙ্গুলী, শ্রীকালীপদ মুখোপাধ্যায়, শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন, শ্রীতারকদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীহুগলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীকামদাক্ষর মুখোপাধ্যায়, শ্রীনিরুজবিহারী মাইতি, শ্রীতামা প্রসাদ বর্মন, শ্রীদ্বয়ভূষণ চক্রবর্তী, শ্রীটমেশচন্দ্র মণ্ডল, শ্রীসৌরেন্দ্রনাথ মিশ্র, শ্রীহর্গাপদ সিং, শ্রীহুগল ঘোষ মৌলিক, শ্রীজগদীশ সান্ধুগোষ্ঠী, শ্রীকালীকমল বহু, শ্রীগোপিকা

বিলাস সেন, শ্রীসত্যনারায়ণ মিশ্র, শ্রীবসন্তলাল ঘুরারকা, ডাঃ সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীমুরেশচন্দ্র নাথ মজুমদার ও শ্রীসুকচন্দ্র মহান্তি। এবার নির্বাচনে কোন দলাদলি দেখা যায় নাই—ইহা আনন্দের কথা সন্দেহ নাই। নূতন কর্মীর কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানকে নূতন মর্যাদা দান করুন, ইহাই আমাদের কামনা।

### মফঃস্বলে উচ্চ শিক্ষার প্রভাব—

কলিকাতার কলেজসমূহে ছাত্রাধিক্যের প্রতীকারকল্পে গভর্ণমেন্ট মফঃস্বলে কলেজ প্রতিষ্ঠার যে পরিকল্পনা করিয়াছিলেন, তদনুসারে এবার নূতন ৭টি কলেজ স্থাপিত হইয়াছে—(১) বোলপুর কলেজ, বীরভূম (২) রায়পুর হাট কলেজ, বীরভূম (৩) বরিশা কলেজ, ২৪ পরগণা (৪) কান্দি রাজ-কলেজ, মুর্শিদাবাদ (৫) জলপাইপুর কলেজ, (৬) মণিমালা মহিলা কলেজ, আসানসোল ও (৭) দমদম মতিঝিল কলেজ, ২৪ পরগণা। খড়্গপুর ও শান্তিপুরে পূর্বেই কলেজ হইয়াছিল, সেগুলিতে নূতন আই-এসসি ক্লাস খোলার অল্পমতি দেওয়া হইয়াছে। গত কয় বৎসরে মফঃস্বলে জিয়াগঞ্জ, কাঁচি, তমলুক, মহিষাদল, কালনা, ডায়মণ্ডহারবার, কাটোয়া, বসিরহাট, নবদ্বীপ, আমতা, গোবরডাঙ্গা, নৈহাটী, আহার-বেলমা, উলুবেড়িয়া, আসানসোল, বিষ্ণুপুর, গড়বেতা প্রভৃতি বহু স্থানে কলেজ স্থাপিত হইয়াছে। সে গুলিতে বাহাতে বেশী ছাত্র যায়, কর্তৃপক্ষের সে জন্ত ব্যবস্থা করা উচিত। সহরের আবহাওয়া ভাল নহে—তাহার উপর ব্যয়ও অত্যন্ত অধিক। সে জন্ত মফঃস্বলে অল্পসংখ্যক ছাত্র লইয়া অধ্যাপনার নানা সুকল ফলিবে। যেমন নূতন ৭টি কলেজকে গভর্ণমেন্ট অর্থ সাহায্য দিবে, তেমনই মফঃস্বলস্থ অন্তর্গত কলেজগুলির ও যেন অর্থাত্তাব পূরণের ব্যবস্থা করা হয়। নূতন আবহাওয়ার ছাত্ররা যেন নূতন যুগের উপযোগী প্রেরিত মাহু বৈরাগী হয়, অধ্যাপকগণকেও আমরা সে বিদ্যায় মনোযোগী হইতে অনুরোধ করি।

### সমন্বিত নীতি প্রসার ব্যবস্থা—

পূর্বে বাংলা দেশে সমবায় নীতি প্রসারের জন্ত সমবায় সংগঠন সমিতি ছিল এবং বেসরকারী ত্যাগী কর্মীরা সে বিষয়ে কাজ করিতেন। বর্তমান সুবীরকুমার লাহিড়ী নাম এ বিষয়ে সচিব। সমগ্র পশ্চিম বঙ্গের নূতন সমবায় সমিতি

ডাঃ আর-আহমদের চেষ্টায় ঐ কার্যের জন্ত ‘সমবায় ইউনিয়ন লিমিটেড’ নামে এক প্রতিষ্ঠান গঠিত হইয়াছে। গত ৩০শে ভাদ্র শনিবার ২২নং চিত্তরঞ্জন এভিনিউর বাড়ীতে তাহার উদ্বোধন উৎসব হইয়াছিল। নূতন সমিতির সভাপতি শ্রীরথীজনাথ ঠাকুর সভায় উপস্থিত হইতে না পারিয়া এক বাণী প্রেরণ করিয়াছিলেন। সমিতির সহ-সভাপতি শ্রীসরল কুমার ঘোষ সভায় সভাপতিত্ব করেন এবং শ্রীকালীপদ ভট্টাচার্য ও শ্রীতারাপদ চৌধুরী নূতন সমিতির যুগ্ম সম্পাদক নির্বাচিত হন। সমবায়-মন্ত্রী মহাশয় সমিতির উদ্বোধন করিয়া সমিতি গঠনের প্রয়োজনীয়তার কথা সকলকে বুঝাইয়া দেন। দেশকে সমৃদ্ধি-সম্পন্ন করিয়া গঠন করিতে হইলে সমবায়ের প্রয়োজন কত অধিক তাহা বলার প্রয়োজন নাই। যে সকল কারণে এদেশে এতদিন সমবায় আন্দোলন উপযুক্ত সাফল্য লাভ করে নাই, সমিতি সে সকল কারণ সম্বন্ধে অগ্রসন্ধান করিয়া তাহা দূর করিবার চেষ্টা করিলে দেশ উপকৃত হইবে এবং সমিতি গঠনও সার্থক হইবে।

### উন্নয়ন আগমনের হিসাব—

নয়া দিল্লীর সরকারী হিসাব হইতে জানা গিয়াছে যে ১৯৫০ সালের জুলাই মাস পর্যন্ত মোট ৮২ লক্ষ ২৭ হাজার লোক পাকিস্তান হইতে ভারতবর্ষে চলিয়া আসিয়াছে। তন্মধ্যে পশ্চিম পাকিস্তান হইতে ৫০ লক্ষ ও পূর্ব পাকিস্তান হইতে ৩২ লক্ষ ২৭ হাজার লোক আসিয়াছে। পূর্ব পাকিস্তান হইতে, গত জাগুয়ারী হইতে জুলাই পর্যন্ত ৭ মাসে মোট ২৬ লক্ষ ৪১ হাজার হিন্দু ভারতে আসিয়াছিল, তন্মধ্যে ৬ লক্ষ ৭২ হাজার হিন্দু কিরিয়া গিয়াছে—এখন ১২ লক্ষ ৬৯ হাজার হিন্দু আছে। ঐ ৭ মাসে ১২ লক্ষ ৪৪ হাজার মুসলমান ভারত হইতে পাকিস্তানে চলিয়া গিয়াছিল, তন্মধ্যে ৩ লক্ষ ২১ হাজার মুসলমান ভারতে কিরিয়া আসিয়াছে। ১৯৪৯ ডিসেম্বর পর্যন্ত ১২ লক্ষ ৫৮ হাজার হিন্দু পূর্ব পাকিস্তান হইতে ভারতে আগমন করিয়াছিল। এ সকল উদ্ভাসদের লইয়া ভারত গণগণমণ্ডকে কত বিস্তৃত হইতে হইয়াছে তাহা না বলাই ভাল। পশ্চিম পাকিস্তানে আর হিন্দু প্রায় নাই বলিলেই চলে। ক্রমে পূর্ব পাকিস্তানও হিন্দুশূন্য হইবে। কিন্তু ভারতে এখনও ৪ কোটি মুসলমান বাস করিতেছেন। ভারত গণগণমণ্ডে তাঁহাদের রক্ষার

ব্যবস্থা ব্যবস্থা করিয়াছেন। পূর্ব পাকিস্তানে যদি হিন্দুদের রক্ষার কোন ব্যবস্থা না হয়, তবে দিল্লী চুক্তি কি তাহে পালিত হইবে—তাহা জন সাধারণ বুঝিতে পারে না।



আসাদের ভূ-কম্পন-বিধ্বস্ত পার্বত্য অঞ্চলে বিমান হইতে খাত নিক্ষেপ—  
এ-স্থানে গমনাগমনের সময় স্থলপথ ও জলপথ নিশ্চিহ্ন—খাতভাবে  
এ অঞ্চলের পার্বত্য অধিবাসীদের চরম অবস্থা

### কোনারক সূর্যমন্দির—

উড়িষ্যার সমুদ্রতীরে কোনারকে যে সূর্যমন্দির আছে তাহা ভারতের স্থাপত্য শিল্পের প্রধানতম নিদর্শন বলিয়া খ্যাত। প্রায় ৫০ বৎসর পূর্বে ঐ মন্দির রক্ষার ব্যবস্থা হইয়াছিল। সম্প্রতি ঐ মন্দির ক্ষত ধ্বংস প্রাপ্ত হইতেছে বলিয়া জানা গিয়াছে। সে জন্ত প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত জহরলাল নেহরুর চেষ্টায় উহা রক্ষা-ব্যবহার জন্ত একটি কমিটি গঠিত হইয়াছে। কমিটিতে অন্তান্ত সমস্তের মধ্যে উড়িষ্যার নেতা শ্রীবিষ্ণুনাথ দাস, খ্যাতনামা বৈজ্ঞানিক ডাক্তার জ্ঞানেন্দ্র ঘোষ, ভারতের খ্যাতনামা শিল্পী শ্রীবেদীপ্রসাদ রায় চৌধুরীকে লওয়া হইয়াছে। কোনারক মন্দির সম্বন্ধে ৯ম বা ১২শ শতাব্দীর

নির্মিত, ঠিক সময় এখনও স্থির হয় নাই। নির্মাণে কত অর্থ ব্যয়িত হইয়াছে, তাহা এখন আর হিসাব করা যায় না। ভারত গভর্নমেন্ট উহার রক্ষার ব্যবস্থায় মনোযোগী হওয়ার বেশবাসীর যত্নবাদভাজন হইয়াছেন। পশ্চিম ভারতে যেমন সোমনাথ মন্দির পুনর্নির্মিত হইতেছে, দক্ষিণ-পূর্ব ভারতে কোনোরকের মন্দির রক্ষারও বিশেষ প্রয়োজন আছে ইহা অনস্বীকার্য।

### শান্তির জন্ত নোবেল পুরস্কার—

রাষ্ট্রসংঘের সেবক ডাক্তার রালফ বাকে এবার শান্তির জন্ত নোবেল পুরস্কার লাভ করিয়াছেন। তিনি একজন আমেরিকান নিগ্রো ক্রীতদাসের পৌত্র। প্যালেস্টাইনে ইহুদী ও আরবদের মধ্যে তিনটি বৃদ্ধ-বিরতির ব্যবস্থা করার তিনি বিশ্ববাসীর প্রশংসা অর্জন করেন। নিগ্রোদের মধ্যে ইনিই প্রথম নোবেল পুরস্কার পাইলেন। বাকে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজনীতির অধ্যাপক। এ বৎসর নোবেল পুরস্কারের দাম ১ লক্ষ ৬৪ হাজার ৩০৩ সুইডিস ক্রোনার— তাঁহার নোবেল পুরস্কার লাভ বোগোর সমাদর বলিয়া বিবেচিত হইবে।

### রাষ্ট্রদূত কতক ব্যবস্থা—

ভারতের জনৈক রাষ্ট্রদূত পদারিসে (ক্রাল) অবস্থান কালে বহু মূল্যবান জহরতামি ক্রয় করে। পরে কোনরূপ শুদ্ধ না দিয়া সে ঐ সকল জহরত ভারতবর্ষে আনিয়া এখানে বিক্রয় করিয়াছে। রাষ্ট্রদূতগণেরও বিনা শুকে কোন বিদেশী জিনিষ ভারতে আনয়নের অধিকার নাই। ভারত গভর্নমেন্টের পুলিশ এ সংবাদ পাইয়া এ বিষয়ে নাকি তদন্ত করিয়াছে ও বিষয়টি নাকি সত্য বলিয়া রিপোর্ট দিয়াছে। এখন তাহা ধামা-চাপা দিবার চেষ্টা চলিতেছে। কয়েকজন খ্যাতনামা ব্যক্তি ছাড়া অধিকাংশ কেড়ে মন্দিরের আত্মীয় স্বজনকে রাষ্ট্রদূত পদে নিযুক্ত করা হইয়াছে। তাহাদের গুণ সম্বন্ধে কেহ কিছু জানিত না। কাজেই এইরূপ জুরাতুরির ঘটনা ঘটী অস্বাভাবিক নহে। রাষ্ট্রদূতদের এমন অনেক কাজ করিতে হয়, বাহাতে রাষ্ট্রের কোটি কোটি টাকা লাভ বা ক্ষতি হইতে পারে। সে কাজে যদি এরূপ দায়িত্বজানহীন জুরাতোরকে নিযুক্ত করা হয়, তবে সে নিয়োগ কখনই সমর্থন করা যায় না। আমাদের বিধান

পত্রাভ্যন্তরে প্রকাশিত সংবাদটির সত্যাসত্য সম্বন্ধে সরকারী বিরুদ্ধি প্রচার করিয়া কেন্দ্রীয় গভর্নমেন্ট জনগণকে সতর্ক করিবেন।

### সুভাষচন্দ্র সম্বন্ধে অদ্ভুত সংবাদ—

কোম্বাই-হইতে ‘ইণ্ডিয়া’ নামক একখানি ইংরাজি সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশিত হয়। অদ্ভুত সংবাদ প্রকাশই তাহার বিশেষত্ব। সম্প্রতি তাহাতে প্রকাশিত হইয়াছে— “নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু ১৯৩০ সালে এক অগ্নিশ্রাবণী মহিলাকে বিবাহ করিয়াছিলেন ও তাঁহাদের একটি কন্যা হয়। মাতা ও কন্যা এখন তিয়েনা সহরে বাস করেন। পণ্ডিত নেহরু তাঁহার দূত শ্রীযাবব্দ পিলাইকে তাহাদের কাছে পাঠাইয়াছিলেন এবং তাহাদের অর্থকষ্ট উপস্থিত হওয়ার তাহাদের অর্থ সাহায্যও করিয়াছেন।” সংবাদটি এক শ্রেণীর লোকের মুখরোচক হইবে। কিন্তু বাহারা সুভাষচন্দ্রকে জানেন তাঁহারা এ সংবাদ বিশ্বাস করিবেন না। তাহা হইলেও পণ্ডিত নেহরু গভর্নমেন্টের পক্ষ হইতে এ সংবাদের প্রতিবাদ হওয়া প্রয়োজন।

### নিখিল বঙ্গ সাময়িক পত্র সংঘ—

বাংলাদেশের সাপ্তাহিক, পাক্ষিক ও মাসিকপত্র সমূহের বার্ষিক সংরক্ষণের জন্ত কয়েক বৎসর পূর্বে নিখিল বঙ্গ সাময়িক পত্র সংঘ গঠিত হইয়াছে। সম্প্রতি ঐ সংঘের সদস্যগণ একটি ক্লাব গঠন করিয়াছেন এবং ক্লাবের পাক্ষিক অধিবেশনে এক এক জন বিশিষ্ট বক্তা বিভিন্ন বিষয়ে বক্তৃতা করেন। গত কয় দিনে প্রবাসীর শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা, বঙ্গশ্রী-সম্পাদক শ্রীহেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, সমবার মন্ত্রী ডাঃ আর আহমদ, প্রবীণ সাংবাদিক শ্রীহেমেন্দ্র প্রসাদ বোম্বা, খ্যাতনামা বৈজ্ঞানিক ডক্টর জ্ঞানচন্দ্র বোম্বা ও আনন্দবাজার পত্রিকা সম্পাদক শ্রীচণলাকান্ত ভট্টাচার্য বক্তৃতা করিয়াছেন। কলিকাতা হাতিবাগান বাজারের ভিতলে (৮১ কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট) রূপমঞ্চ কার্যালয়ে ক্লাবের অধিবেশন হইয়া থাকে। উক্ত সাংবাদিকগণ ক্লাবের সভার যোগদান করিয়া ও জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতা শুনিয়া লাভবান হইয়া থাকে।

### শ্রীহীরেন্দ্রকুমার নন্দী—

শ্রীহীরেন্দ্রকুমার নন্দী সম্প্রতি পশ্চিম বঙ্গের কৃষি বিভাগের ডিরেক্টর নিযুক্ত হইয়াছেন। তিনি কলিকাতা



বিশ্ববিদ্যালয় হইতে উদ্ভিদ বিভাগে এম্-এস্‌সি পাশ করিয়া কিছুদিন বিজ্ঞান কলেজে গবেষণার পর বিলাত যাত্রা করেন ও লণ্ডন হইতে পি-এচ্‌-ডি উপাধি লইয়া আসেন। কলিকাতার বঙ্গ বিজ্ঞান মন্দিরেও তিনি গবেষক ছিলেন। ১৯৩৮ সালে তিনি আসামে কৃষি বিভাগে কাজে নিযুক্ত হন ১৯৪৫ সালে উদ্ভিদ গণ্ডার্মেন্টের কৃষি বিভাগের সহকারী ডিরেক্টর হন। সম্প্রতি তিনি বাঙালা দেশে আসিয়াছেন। তিনি সুপণ্ডিত ও স্নলেখক—তাঁহার দ্বারা পশ্চিম বাংলার কৃষি বিভাগের কার্যের উন্নতি হইবে বলিয়া সকলে বিশ্বাস করেন।

### কবি-দম্পতির বিলাত-ভ্রমণ—

ভারতবর্ষের পাঠকগণ অবগত আছেন যে কবি-দম্পতি শ্রীযুত নরেন্দ্র দেব ও শ্রীমতী রাধারাণী দেবী তাঁহাদের কন্যা কুমারী নবনীতাকে সঙ্গে লইয়া ইউরোপ ভ্রমণ করিতে বাহির হইয়াছেন। শ্রীযুত নরেন্দ্র বাবু ১লা আগষ্ট তারিখে অসলো সহর হইতে এক পত্রে জানাইয়াছেন—“আমরা লণ্ডন থেকে বেরিয়ে ডোভার থেকে সমুদ্র পার হ’য়ে বেলজিয়ামে আসি। বেলজিয়ামের অষ্টেণ্ড, ব্রুজ, ব্রুজেলস, ব্রাশেলস্‌, ওয়াটারলু (যেখানে ঐতিহাসিক যুদ্ধে মহাবীর নেপোলিয়নের পরাজয় হয়েছিল) ও এটোয়ার্প হয়ে আমরা হল্যান্ডে প্রবেশ করি। সেখানে রুজেনদান, রটারডাম, হেগ ও আমস্টার্ডাম ঘুরে হ্যামলেটের দেশ ডেনমার্ক যাই। ডেনমার্ক বেড়িয়ে কোপেনহেগেন যাবার পথে আমাদের প্রায় অর্ধেক জার্মানী মাড়িয়ে যেতে হয়েছে—বেছায়েম্‌, অসনাক্রপ, ডসেলড্রফ, ব্রেমেন, হাম্বুর্গ প্রভৃতি গত যুদ্ধে অসিদ্ধ স্থানগুলির উপর দিয়ে যেতে হয়েছে। যুদ্ধের ক্ষতচিহ্ন আজও মেলায় নি। কোথাও না। লণ্ডনে, বেলজিয়ামে, হল্যান্ডে অসংখ্য ভাঙা পোড়ো বিধ্বস্ত বাড়ী জনশূন্য হয়ে রয়েছে। এখনও মেরামত হয়ে ওঠে নি। ডেনমার্কের কিছু জার্মানীর কোন আঘাত চিহ্ন দেখতে পাওয়া না। ডেনমার্ক থেকে সুইডেনে যাই। হল্যান্ড থেকে ডেনমার্ক আসবার সময় ট্রেন থেকে নামতে হয় নি। ইংল্যান্ড সমস্ত যাত্রীকে জাহাজে তুলে সমুদ্র পার করে দিয়েছে। তেবেছিলুম, ডেনমার্ক থেকে ষ্টকহলম যাবার কলি ও বুঝি তাই হবে, কিন্তু হতাশ হতে হল। আমাদের যাত্রা ট্রেন থেকে নেমে বোঁচকা ছুঁচকি ঘাড়ে করে

জাহাজে গিয়ে উঠতে হল। জাহাজ থেকে নেমে আবার মোটর বাসে উঠে ট্রেনে এলুম এবং সেখান থেকে ট্রেনে চড়ে তবে এসে ষ্টকহলমে পৌছাই। সুইডেন শেষ করে নরওয়ে এসেছি। গত সপ্তাহে উত্তর মেরু প্রদেশের নিকটস্থ নাভিকে গিয়ে ‘ছপুর রাতের স্বপ্ন ওঠা’ দেখে কাল অসলোয় এসেছি। পরন্তু বার্গেন বেড়িয়ে আবার জাহাজে উঠে নিউক্যাসেল হয়ে লণ্ডনে ফিরবো, ৭ই আগষ্ট নাগাত। এডিনবরায় এ বছর ওয়ার্লডস্‌ পি-ই-এন কংগ্রেস হবে ১৮ই



কবি নরেন্দ্র দেব

থেকে ২২শে আগষ্ট। ভারতীয় পি-ই-এনের প্রতিনিধিত্ব আমরা এই কংগ্রেসে উপস্থিত থাকবো। পি-ই-এন কংগ্রেস শেষ করে স্কটল্যান্ড ও আয়ারল্যান্ড ঘুরে আমরা যুরোপ ভ্রমণের দ্বিতীয় পর্ব শুরু করবো—অর্থাৎ ফ্রান্স, জার্মানী, অষ্ট্রিয়া, সুইজারল্যান্ড, স্পেন, পোর্টুগাল, ইতালী এবং রুমিনিয়া, যুগোস্লাভিয়া ও চেকোস্লাভিয়া হয়ে ৬পূজা সময় দেশে ফিরবো।’

লণ্ডন থেকে ২৮শে আগষ্ট নরেন্দ্রবাবু আর এক পত্র জানাইয়াছেন—



“আপনি শুনে সুখী হবেন যে এডিনবরায় অস্থিতি World’s International P. E. N. Congress এ আমরা দুজনেই ভারতের official delegate নিযুক্ত হয়ে বাই এবং সেখানে আমরা বিশেষভাবে সমাদৃত হয়েছি। সার সি, পি, রামস্বামী আরার ভারতবর্ষ থেকে বিশেষ অতিথি হিসেবে এসেছিলেন। পাকিস্তান থেকে সার সোয়াদির মেয়ে ডাঃ বেগম শায়েস্তা ইকামউল্লা ও পাকিস্তান সরকারের রাষ্ট্রনৈতিক বিভাগের সেক্রেটারী শেখ মহম্মদ ইকাম official delegate হিসাবে এসেছিলেন এবং আমাদের কবি জসিমুদ্দীন সাহেব P. E. N. এর সাধারণ সদস্য হিসাবে উপস্থিত ছিলেন। বেগম ইকামউল্লা মেয়েটি



ইন্টারন্যাশনাল পি-ই-এন কংগ্রেসে ( এডিনবরা ) কবি নরেন্দ্র দেব ও তদীয় পত্নী শ্রীমাতা রাণী দেবী

খুব ভাল। সে লণ্ডনের এম-এ, পিএচ্-ডি। চমৎকার বক্তৃতা দিলে। সাম্প্রদায়িকতার ধার দিয়েও যায় নি। মহম্মদ ইকাম সাহেব মুখ ধোলেন নি। জসিমুদ্দীন সাহেবও বক্তৃতা দিলেন, কিন্তু সাম্প্রদায়িকতা দোষদুষ্ট, অত্যন্ত খেলো বক্তৃতা। তাতে তিনি নিজেকেও সেই সঙ্গে পূঃ পাকিস্তানকেও ছোট করে ফেলেছেন।”

\* \* \* \*

“এডিনবরা থেকে আমরা Lake District এ বেড়াতে চলে যাই। অবশ্য তার আগে সারা স্কটল্যান্ড চবে বেড়িয়েছি। লেক প্রদেশে windermere থেকে Keswic পর্যন্ত ঘুরেছি মোটেরও মোটর বোটে। কবি wordsworth এর Dove cottage সমাধি দেখবার জন্য Grasmore বাই, সেখান থেকে লণ্ডনে ফিরি।”

২৫শে জুলাই ষ্টকহলমে সেখানকার সর্বাপেক্ষা অধিক জনপ্রিয় সংবাদপত্র ‘ডায়েনস নেহার’ এর প্রতিনিধি কবিদম্পতির সহিত দেখা করিয়া তাঁহার কাগজে যে বিবরণ প্রকাশ করেন, তাহার অল্পবাদ আমরা নিম্নে প্রদান করিলাম। লণ্ডনের কোন কোনও কাগজে ও P. E. N. কংগ্রেসের সংবাদের সঙ্গে কবিদম্পতির চিত্রও প্রকাশিত হইয়াছে এবং সিনেমার ‘নিউজ রীলে’র মধ্যেও P. E. N. Congress-এর ছবিতে তাঁহাদের চিত্র প্রকাশিত হইয়াছে। সার ওয়াশটার স্কটের বাড়ী দেখিবার জন্য কবিদম্পতি যখন এডিনবরা হইতে ৩৬ মাইল দূরে abbatsfud এ যান তখন সেখানে স্কটের প্রপৌত্রের মুখে তাঁহারা শুনিয়াছেন যে এডিনবরা ও গ্লাসগোর সংবাদপত্রে তাঁহাদের ছবি ও বিবরণ প্রকাশ হইয়াছে।

#### ‘ষ্টকহলম’এর পক্ষে প্রকাশিত বিবরণ

এডিনবরায় পি-ই-এন কংগ্রেসে যাবার পথে এক ভারতীয় লেখক-দম্পতি সুইডেনে এসেছেন। শ্রীমতী আকারে ছোট কিন্তু তাঁর আকৃতি কবিত্ববাহক। শ্রীযুত বেশ ভারিকি ওজনের এবং নিবিড় গুচ্ছ সমালঙ্কৃত। শ্রীমতী কবিতা লেখেন। তিনি পৃথিবীর পুরুষদের নারীর বাহিরের রূপ ও কৃত্রিম সৌন্দর্যের চেয়ে তাদের প্রতিভা ও মানসিক সৌন্দর্যের প্রতিই আকৃষ্ট হতে বলেন। শ্রীযুত দেব বাংলা ভাষায় নানা বিভাগেই লেখেন। তিনি বৈয়াকরণ, ইবসেন প্রভৃতির রচনার অল্পবাদও করেছেন।

শ্রীযুক্ত দেব ‘গভীর রাতে সূর্যোদয়’ দেখবার জন্য আগ্রহান্বিত। আমরা আশা করি, তিনি দুপুর রাতের সূর্যের উপর বাংলা ভাষায় একটি কবিতা লিখবেন। শ্রীযুত দেব যুরোপের এই প্রসিদ্ধ প্রদেশটিকে পর্যটন করছেন। শ্রীমতী কথা বলেন একটু ক্রান্ত এবং দেব মহাশয়ের আগেই বলেন। শ্রীযুত অত্যন্ত সঙ্গমের সঙ্গে তাঁর কথাগুলি শোনেন। যেন তিনি চিরদিনই এমন ভাবে অত্যন্ত। এই লেখক-দম্পতি বিবাহিত জীবনের দীর্ঘতম নাথুর্ঘ্যের ও পরস্পর সহযোগিতার অতি সুন্দর দৃষ্টান্ত স্বরূপ। এঁরা যেন ইংরাজ কবি দম্পতি শ্রীমতী এ. রাবের ও শ্রীযুত রবার্ট ব্রাউনিংয়ের ভারতীয় সংস্করণ।

শ্রীযুত দেব এ পর্যন্ত প্রায় ১৫ খানি

করেছেন—কবিতা, উপভাস, ছোট গল্প, প্রবন্ধ ইত্যাদি এবং শ্রীমতীর ৮ খানি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। সমস্তই বাংলা ভাষায় লেখা। এঁরা দুজনেই রবীন্দ্র যুগের সাহিত্যিক।

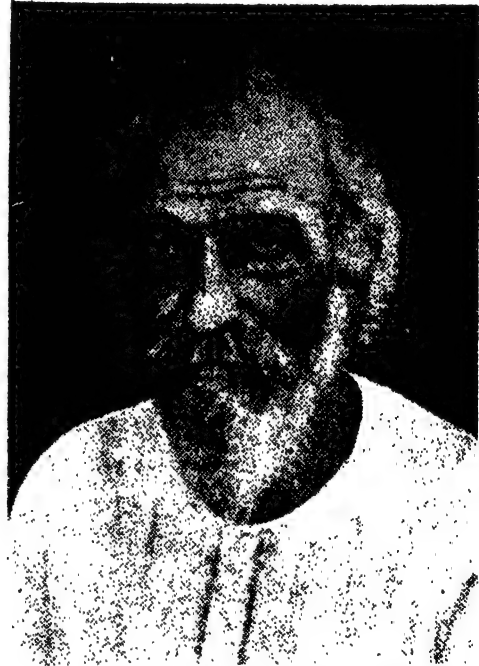
ভারতবর্ষে নানা ভাষা প্রচলিত থাকার দরুণ লেখকদের পক্ষে অগ্রসর হওয়া মুশ্কিল। এ ছাড়া সামাজিক, রাষ্ট্রিক ও অর্থনীতিক সমস্যা ও তাঁদের অগ্রগমনের পথে বাধা-স্বরূপ হয়ে দাঁড়ায়। শ্রীমতা দেব বলেন পুরুষরা যেন নারীদের প্রতি তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন করেন। তিনি চান, নারীর বাহিরের সৌন্দর্যের চেয়ে অন্তরের সাংস্কৃতিক সৌন্দর্যের প্রতি তাঁদের মনোযোগ আকৃষ্ট করতে। তিনি বলেন—মেয়েদেরও বদলাতে হবে। তাঁরা লঘু ব্যাণারে মেতে না থেকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে মনোনিবেশ করুন। পৃথিবী থেকে যুদ্ধ বন্ধ করতে ও মানব সভ্যতার উন্নতি কল্পে তাঁরা কাজ করুন। মেয়েদের মধ্যে যে মাতৃস্বরূপিনী নারী আছেন তাকে উৎসাহ করে তুলতে হবে। এই ভাবে পুরুষের মানসিক পরিবর্তনের জন্ম ও নারীর বাণীর প্রতি শ্রদ্ধাসম্পন্ন হওয়ার ফলে পৃথিবীর উন্নতি হবে, কারণ মানসিক সৌন্দর্য্য এমন এক বস্তু, যা বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে নান হয়ে যায় না, বরং আরও উজ্জ্বল হয়।

### তিস্তা নদীর জলপ্রাচীন—

কালিম্পং হইতে খবর আসিয়াছে, তিস্তার শাখা লাচেন নদীর গতিপথে ধ্বস নামায় তিন মাস ধরিয়া নদীর জল অবরুদ্ধ ছিল। ফলে গাংটকের ৪০ মাইল উত্তরে ৮ মাইল ব্যাপী স্থলে জল জমিয়া হ্রদের আকার ধারণ করিয়াছিল। গত ১৪ই সেপ্টেম্বর প্রবল বৃষ্টির ফলে এই ধ্বস নামিয়া যায় ও তিস্তার জল অভূতপূর্বভাবে গড়িয়া যায়। বহু বৃক্ষ উৎপাটিত হইয়া নদীর স্রোতে গিয়া বাইতে দেখা যায়! নদীর ধারে ধারে তৈল গাছ বাইতেছে—ঐ তৈল কোথা হইতে আসিতেছে কে জানিতে পারে না। এই সংবাদ অতীব শঙ্কাজনক—জল বৃদ্ধির ফলে সেতু নষ্ট হইবে ও জলপাইগুড়িতে বিপদ প্রাচীন হইবে। এ বৎসর দৈবদুর্ভাগ্যক আশাদের ত্রুটি প্রস্তুত করিবে কে জানে? পৃথিবী যে ধ্বংসের পথে গিয়াছে সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ কোথায়?

### শ্রী পুরুষোত্তম দাস ট্যাগোর—

কংগ্রেসের বর্তমান সভাপতি শ্রী পুরুষোত্তম দাস ট্যাগোর ১৮৮২ সালে এলাহাবাদে জন্মগ্রহণ করেন ও আইন পরীক্ষা পাশ করিয়া এলাহাবাদ হাইকোর্টে আইন ব্যবসা আরম্ভ করেন। ১৮৯৯ সালে তিনি কংগ্রেসে স্বেচ্ছাসেবকরূপে ও ১৯০৬ সালে প্রতিনিধিরূপে যোগদান করেন। ১৯১০ সাল হইতে তিনি হিন্দী সাহিত্য প্রচার আন্দোলনের সহিত সংশ্লিষ্ট হন। ১৯২১ সালে তিনি অসহযোগ করিয়া আইন ব্যবসা ত্যাগ করেন ও তদবধি কংগ্রেস ও দেশসেবার কাজ



নূতন কংগ্রেস সভাপতি শ্রী পুরুষোত্তমদাস ট্যাগোর

করিতেছেন। ১৯২৯ সালে তিনি লাল লাজপৎ রায় প্রতিষ্ঠিত লোক সেবক সমিতির সভাপতি হন। ১৯২৩ সালে তিনি বৃহৎ প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সভাপতি হইয়াছিলেন ও তাহার পর কিছুকাল লাহোরে পাঞ্জাব জাশানাল ব্যাকের সেক্রেটারী ও ম্যানেজারের কাজ করিয়াছিলেন। বহুবার তিনি কারাদণ্ড ভোগ করিয়াছেন ও ১৯৩৭ সালে বৃহৎ প্রদেশ ব্যবস্থা পরিষদের স্পীকারের কাজ করিয়াছেন। ১৯৪৮ সালে তিনি কংগ্রেস সভাপতি

নির্বাচনে প্রার্থী হইয়া পরাজিত হইয়াছিলেন। তিনি কৃত্ত মূল প্রস্তাব—

ব্যবহার করেন না, চিনি, লবণ, স্নাত, দুগ্ধ, মসলা প্রভৃতি

নাসিক কংগ্রেসে যে সকল প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে, তন্মধ্যে নিম্নলিখিত প্রস্তাবটিকেই মূল প্রস্তাব বলা হইয়াছে।



দূর হইতে গোদাবরী তীরে নাসিক

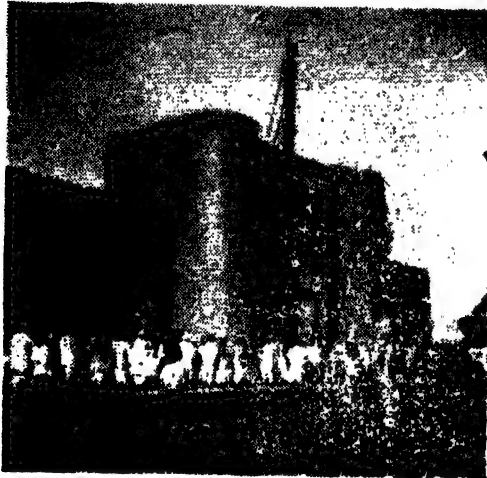
ফটো—দিলীপ দত্ত

ব্যবহার করেন না। তিনি কখনও সরু চাল খান না—  
অত্যন্ত সাধারণ পোষাক ব্যবহার করেন। উত্তর প্রদেশে



নাসিক কংগ্রেস অভিযুক্ত বেচ্ছাসেবক বাহিনী ফটো—দিলীপ দত্ত

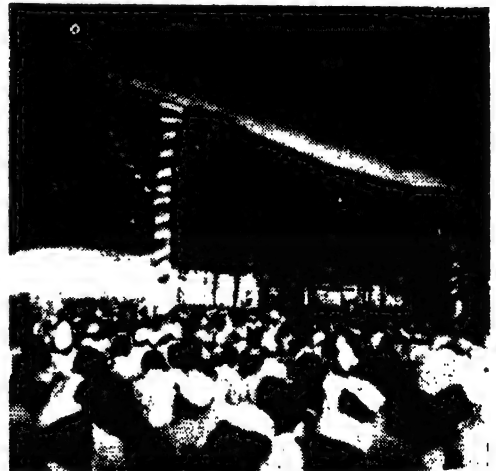
প্রস্তাবটি এইরূপ—“জাতীয়তা-বিরোধী ও প্রতিক্রিয়া-  
পন্থীরা ভারতের উন্নতির পরিপন্থী বলিয়া কংগ্রেস দেশে



নাসিকে পাকী নগরের প্রধান তোরণ

ফটো—দিলীপ দত্ত

সকলে তাঁহাকে রাজর্ষি বলে। তাঁহার নেতৃত্বে কংগ্রেস ও  
দেশের মঙ্গল হইলেই লোক তাঁহার নির্বাচন সার্থক  
মনে করিবে।



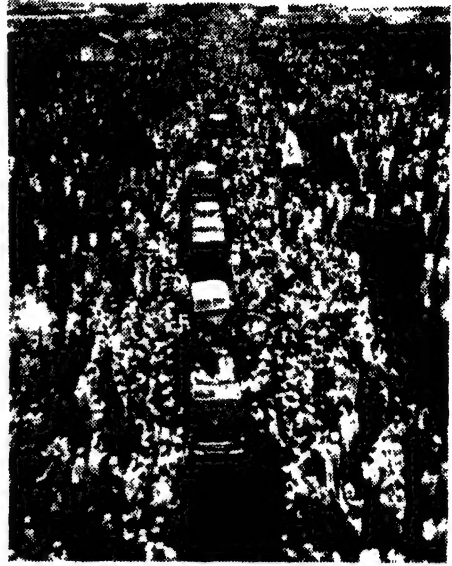
নাসিক কংগ্রেসে কূটার শিল্প-প্রদর্শনীতে দর্শকের ভিড়

ফটো—দিলীপ দত্ত

সাম্প্রদায়িক পার্থক্যবুদ্ধির অবসান ঘটাইতে চায়। ভারত ও  
পাকিস্তানের মধ্যে যে উত্তেজনা ও গুরুতর সমস্যার উদ্ভব

হইয়াছে, ভারতের মর্যাদা ও স্বার্থের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া ধৈর্য, সহিষ্ণুতা, সম্প্রতি ও দৃঢ়তার সহিত সেগুলির সমাধান প্রয়োজন এবং চেষ্টা করিলেই উহার সন্তোষজনক সমাধান সম্ভব। বুদ্ধের পথ অবলম্বন না করিয়া শাস্তিপূর্ণ উপায়ে দুই দেশের মধ্যে বর্তমান সমস্ত বিরোধের মীমাংসা করার জন্য চুক্তিবদ্ধ হইতে ভারত সরকার পাক সরকারের নিকট যে প্রস্তাব করিয়াছিলেন, কংগ্রেস তাহা সমর্থন করে। কংগ্রেস দিল্লী চুক্তিও অঙ্গমোদন করিতেছে। ভারত গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র বলিয়া সকল সম্প্রদায় ও ব্যক্তিকে সমান অধিকার ও স্বাধীনতা দিয়াছে এবং ধর্মের ব্যাপারে কোন বৈষম্যমূলক ব্যবহার করে না। অন্তএব প্রত্যেক

বর্জন সম্মিলনে এক বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলিয়াছেন—“কেবল মাত্র গোরক্ষার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া এবং প্রস্তাব গ্রহণ



গান্ধীনগর অভিমুখে প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত জহরলাল নেহরু—পথের দুই পার্শ্বে দর্শনেচ্ছু জনতা। সারিবদ্ধ মোটরগুলির প্রথম মোটরে পণ্ডিতজীকে দণ্ডায়মান অবস্থায় দেখা বাইতেছে। কটো—পান্না সেন



নাসিক কংগ্রেসের তোরণ সমীপে নূতন সভাপতির আগমন-

প্রতীক্ষার দর্শকগণ

কটো—দিলীপ দত্ত

কংগ্রেস কর্মীকে সকল রকম সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধাচরণ করিতে কংগ্রেস আহ্বান করিতেছে।” এই সমস্তা আজ ভারতকে সর্বপ্রকারে বিব্রত ও বিগল করিয়াছে। এই প্রস্তাব কি সে সমস্তা সমাধানে সাহায্য করিবে? যদি না, তবেই দেশের পক্ষে মঙ্গলের কথা। নচেৎ দেশ ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে।

কংগ্রেস সভাপতি ও গোত্রস্বাক্ষর—

কংগ্রেস সভাপতি শ্রীযুক্ত পুরুষোত্তম দাস ট্যাগুন গত ১৮ সেপ্টেম্বর নাসিকে নিখিল ভারত গোরক্ষা ও বনস্পতি



কংগ্রেস সভাপতি শ্রীপুরুষোত্তম দাস ট্যাগুন সতীক কটো—পান্না সেন

করিয়া সন্তুষ্ট থাকিলেই হইবে না, দৈনন্দিন জীবনে জনসাধারণকে তাহা গ্রহণ করিতে হইবে। চামড়ার ব্যবসার জন্য এদেশে লোক গো-হত্যা করে। চামড়া রপ্তানী বন্ধ

হইলে যদি বহুমূল্য ডগার হারাইতে হয়, আমরা তাহাতে প্রস্তুত আছি। জনসাধারণের পক্ষে চামড়ার জুতা বর্জন ও তৎপরিবর্তে রবারের বা কাপড়ের জুতা ব্যবহার করা কর্তব্য।” এই প্রসঙ্গে শ্রীযুত ট্যাণ্ডন জনসাধারণকে বনস্পতি ব্যবহার না করার জন্য অনুরোধ করেন। যদি ভাল ঘৃত বা তৈল না পাওয়া যায় তাহা হইলে



পশ্চিমবঙ্গের কংগ্রেস সভাপতি শ্রীঅতুল ঘোষ এবং দুইজন সঙ্গী  
শ্রীকালীপদ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীপ্রবুলচন্দ্র সেন কটো—পান্না সেন

কিছুই ব্যবহার না করা ভাল। শ্রীযুত ট্যাণ্ডন নিজে গত ১৯০৮ সাল হইতে চামড়ার জুতা ব্যবহার করেন না। ভারতে গোধান প্রায় লুপ্ত হইতে চলিয়াছে—এ অবস্থায় কংগ্রেস-সভাপতির মত ব্যক্তি যদি এ বিষয়ে প্রচার কার্য আরম্ভ করেন, তবে দেশের লোক পুনরায় গো-ধন রক্ষায় অগ্রসর হইতে পারে। মৃতপ্রায় জাতির নিকট যে কোন আবেদনই উপস্থিত করা হউক না কেন, তাহা তাহার কর্ণে প্রবেশ করে না।

#### শ্রীল রামদাস বাবাজী জন্মস্মৃতি—

খ্যাতনামা বৈষ্ণব ভক্ত ও কীর্তনগায়ক শ্রীল রামদাস বাবাজী মহাশয়ের নাম শুধু বাঙ্গালার বৈষ্ণব সমাজে নহে,

ভারতের সর্বত্র সুপরিচিত। তিনি শুধু নাম প্রচার করেন না; স্বর্গত রাধাশ্রমণ চরণদাস বাবাজী মহাশয়ের কৃপাপ্রাপ্ত হইয়া সকল বৈষ্ণব তীর্থ উদ্ধার ও রক্ষায় ব্রতী হইয়াছেন। তাঁহার চেষ্টায় বহু তীর্থস্থান সংস্কার করা হইয়াছে ও সংস্কৃতক্ষেত্রে বিগ্রহসেবাদির উপযুক্ত ব্যবস্থা হইয়াছে। সম্প্রতি সিঁথি বৈষ্ণব সম্মিলনীর উদ্বোধনে প্রায় এক মাস ধরিয়া কলিকাতা ও সহরতলীর নানাস্থানে রামদাস বাবাজী জন্মস্মৃতি অমুষ্ঠান পালিত হইয়াছে। সর্বত্র বাবাজী মহাশয়ের জীবন ও কাব্যাবলার কথা আলোচিত হইয়াছে ও বাঙ্গালা জনগণকে তাঁহার আদর্শ রক্ষার সহযোগিতা করিতে অনুরোধ করা হইয়াছে। বাবাজী মহাশয়ের বয়স ৭৪ বৎসর—তিনি সুদীর্ঘ কর্মময় জীবন লাভ করিয়া বাঙ্গালার বৈষ্ণব-ধর্মকে নূতন জীবন দান করুন ও তদ্বারা বাঙ্গালী জনগণ উপকৃত হউক, আমরা সর্লস্কঃকরণে তাহাই প্রার্থনা করি।

#### স্বামীজীর শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম—

স্বামী কৃপানন্দ মহারাজ বিহারে পাটনা জেলার মধ্যে প্রসিদ্ধ জৈন তীর্থক্ষেত্র রাজগীর নামক স্থানে শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম প্রতিষ্ঠা করিয়া গত ৭ বৎসর ধরিয়া বাঙ্গালী তীর্থযাত্রী ও স্বাস্থ্যাবেদীদের নানাভাবে সেবা করিতেছেন। সম্প্রতি তথায় তিনি একটি মন্দির ও তৎসংলগ্ন একটি ধর্মশালা স্থাপন করিতেছেন। সে জন্য একখণ্ড জমী সংগৃহীত হইয়াছে ও কয়েক লক্ষ ইট প্রস্তুত হইয়াছে। কলিকাতার কয়েকটি সিনেমায়ও কয়েক সহস্র টাকা সংগৃহীত হইয়াছে। আশ্রম পরিচালনের জন্য কলিকাতায় একটি কমিটি গঠন করিয়া রেজেষ্ট্রী করা হইয়াছে। বাংলার বাহিরে বাঙ্গালী পর্যটকদের নানাপ্রকার অনুবিধা ভোগ করিতে হয়। স্বামীজি তাহা দূর করার ব্যবস্থায় মনোবোদ্ধ হইয়া বাঙ্গালী জনসাধারণের ধন্যবাদের পাত্র হইয়াছেন আমাদের বিশ্বাস, ধনী ও সঙ্কল্প বাঙ্গালীরা স্বামীজি এই মহৎ কার্যে সর্বপ্রকার সাহায্য দানে বাধিত করিবেন।

#### রাষ্ট্রপুঞ্জ ও কম্যুনিষ্ট চীন—

গত ১৯শে সেপ্টেম্বর ভারতের প্রতিনিধি শ্রীনরসিং রাও রাষ্ট্রপুঞ্জের সাধারণ পরিষদে কম্যুনিষ্ট চীন সরকারের প্রতিনিধিকে রাষ্ট্রপুঞ্জে গ্রহণের দাবীর প্রস্তাব করিলে ভোটে উহা অগ্রাহ হইয়া যায়। শ্রীরাও বলেন—

সরকার এ বিষয়ে সুনিশ্চিত যে, পিপিং সরকার অদৃষ্ট ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও প্রস্তাবের পক্ষে ১৬জন ও বিপক্ষে ৩৩জন সদস্য ভোট দেন। মার্কিং পক্ষ এখনও চীনের কুও—মিংটাং পক্ষকে সমর্থন করিতেছেন। তাঁহাদের দলের এখন চীনে কোন প্রভাব নাই। সে দলের কয়েক জন সদস্যও কম্যুনিষ্ট দলে যোগদান করিয়া দেশ শাসনের ভার গ্রহণ করিয়াছেন। রাষ্ট্রপুঞ্জ কবে ধনিকতন্ত্রের প্রভাব মুক্ত হইবে কে জানে?

### সেনাবাহিনী ও বাঙ্গালী—

গত ১৮ই সেপ্টেম্বর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক হল ভারতের প্রধান সেনাপতি কে-এম-করিয়াপ্পা ছাত্রছাত্রীদের এক সভায় বক্তৃতা করেন। তিনি বলেন— ভারতীয় সেনাবাহিনীতে ভারতের সকল রাজ্যের অধিবাসীরই যোগদান করিবার সমান সুযোগ আছে—তৎসত্ত্বেও ভারতীয় সেনাবাহিনীতে বাঙ্গালার অধিবাসীদের সংখ্যা সামান্য, ইহা হতাশার কথা। তিনি আশ্বাস দিয়াছেন— যদি উপযুক্ত যোগ্যতাসহ যথাযোগ্য বাঙ্গালী তরুণ পাওয়া যায়, তবে তিনি অধিকসংখ্যক বাঙ্গালী তরুণকে ভারতীয় সেনাবাহিনীতে গ্রহণ করিবেন। ভারতীয় সেনাবাহিনীতে বাঙ্গালী গ্রহণ করিবার নীতি তিনি চালাইয়া যাইবেন। তিনি আশা করেন, বাঙ্গালী যুবকগণ তাঁহার আহ্বানে সাড়া দিয়া অধিক সংখ্যায় সেনাবাহিনীতে যোগদানার্থ আগাইয়া আসিবেন। আমাদের বিশ্বাস, ইহার পর সৈন্ত-বাহিনীতে যোগদানের জন্য বাঙ্গালী তরুণদের অভাব দেখা যাইবে না।

### বিহার হুভিক ও শ্রীজয়প্রকাশ—

সমাজতন্ত্রী নেতা শ্রীজয়প্রকাশ নারায়ণ ১৪ দিন ধরিয়া বিহারের মুন্সের, শারসা, পূর্ণিয়া, ভাগলপুর ও হারভাঙ্গা জেলায় ঘুরিয়া হুভিক ও বস্তা-বিধবস্ত স্থানসমূহ দর্শন করিয়াছেন। তাহার পর ১৫ই সেপ্টেম্বর পাটনায় এক বিবৃতি দিয়া তিনি জানাইয়াছেন—“রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকার বিহারে গত বিহারের হুভিকের কথা অস্বীকার করিয়া দিয়াছেন। আমি এ বিষয়ে নিশ্চিত যে, ব্রিটিশ রাজ আজ কার্যে থাকিত ও কংগ্রেস যদি বিরোধী দলের হুভিক থাকিত এবং প্রভূত অবস্থা যদি ইহার অর্ধেক

শোচনীয় হইত, তাহা হইলে হুভিক ঘোষণার জন্য কংগ্রেসই চাংকার করিত। আজ অবস্থা অন্তরূপ বলিয়া কংগ্রেস হুভিক ঘোষণার বিরোধী। আমি দেখিয়াছি, পূর্ণিয়া জেলার রূপালি ধানার তেলদিহা গ্রামে ৩২ জন অনশনে মারা গিয়াছে। লোক গাছের পাতা, মূল, কাঁকড়া, শামুক প্রভৃতি খাইয়া জীবন ধারণ করিতেছে।” শ্রীজয়-প্রকাশের এই বিবৃতির পরও কি বিহার-সরকার আর্ন্ত-জাণের কোন ব্যবস্থা করিবেন না। বিহারের বহু জেলা হইতে খাদ্যভাবপীড়িত দরিদ্র জনগণ দলে দলে পশ্চিম বাঙ্গলায় চলিয়া আসিতেছে—সে জন্য আজ বাংলার অবস্থাও আশঙ্কাজনক হইয়াছে।

### কাশ্মীর ও পাকিস্তান—

কাশ্মীর বিরোধ লইয়া হিন্দুস্থান ও পাকিস্তানের মধ্যে নিরাপত্তা পরিষদ যে আপোষের চেষ্টা করিতেছিল, তাহা ব্যর্থ হইয়াছে। নিরাপত্তা পরিষদ প্রেরিত প্রতিনিধি বিফল মনোরথ হইয়া ফিরিয়া গিয়াছে ও আপোষ মীমাংসার ভার উভয় রাষ্ট্রের উপর ছাড়িয়া দিবার নির্দেশ দান করিয়াছে। কিন্তু তাহার পরও কাশ্মীর সম্বন্ধে পাকিস্তানের মনোভাব লক্ষ্য করিলে বিস্মিত হইতে হয়। ১৭ই সেপ্টেম্বর গিলগিটে পাকিস্তান রাষ্ট্রপাল খাজা নাজিমুদ্দীন এক সম্বন্ধনা সভায় বলিয়াছেন—“কাশ্মীরকে মুক্ত করা প্রত্যেক পাকিস্তানী ধর্মবিশ্বাসের অঙ্গ বলিয়া মনে করে এবং পাকিস্তান প্রস্তাবের ইহা অবিচ্ছেদ্য অংশ। কাশ্মীরকে মুক্ত করিয়া পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত করিতে না পারিলে পাকিস্তান অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে।” পাকিস্তান রাষ্ট্রপালের নির্দেশ স্পষ্ট—কিন্তু ভারতের প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত নেহরু এখনও আপোষের স্বপ্ন দেখিতেছেন। ভারত রাষ্ট্রকে কঠোরতার সহিত কাশ্মীরে কর্তব্য পালন করিতে হইবে—নচেৎ ভারত রাষ্ট্রের সমূহ বিপদের সম্ভাবনা। সেনাপতি কারিয়াপ্পা সৈন্ত সংগ্রহের সময় অকুণ্ঠভাবে যদি ভারতের বিপদের কথা সকলকে বুঝাইয়া দেন—তাহা হইলে ভারতের পক্ষে কাশ্মীরকে বিপন্ন করা আরো অসম্ভব হইবে না।

### নারী সমাজ ও পণ্ডিতজী—

গত ১৯শে সেপ্টেম্বর নাসিক গান্ধীনগর হইতে ৬ মাইল দূরে এক বিরাট নারী সম্মিলনে পণ্ডিত জহরলাল



নেহক নারী-সমাজের কর্তব্য নির্দেশ করিয়া বক্তৃতা করেন। তিনি বলেন—“ভারতীয় নারীসমাজ খাচ্ছ ও অচ্ছ প্রয়োজনীয় দ্রব্যের অভাবের জন্ত যেন বিরক্তি প্রকাশ বা অভিযোগ না করেন এবং যাহা পাইবেন, তাহার দ্বারাই সংসার নির্বাহ করেন। স্বাধীন দেশের জনসাধারণের সকল দুঃখ দুর্দশা ও অসুবিধা সহ্য করিয়া স্বাধীনতার পরবর্তীকালীন সঙ্কট অতিক্রমে সরকারের সহিত সহযোগিতা করা কর্তব্য। অধিক পণ্য ও খাচ্ছ উৎপাদনের জন্ত নারীসমাজকেও কঠোর পরিশ্রম করিতে হইবে।” নারী সমাজ চেষ্টা করিলে দেশের খাচ্ছাভাব দূর করিতে পারেন। মাহুষের অভ্যাস ত্যাগ করা আদৌ কঠিন নহে। যাহা সহজে পাওয়া যায়, তাহা দ্বারাই জীবনধারণের চেষ্টা না করিয়া আমরা দুঃখাপ্য জিনিষ সংগ্রহে প্রবৃত্ত হইয়া আমাদের অভাব বৃদ্ধি করিয়া থাকি। চিনি না হইলেও চলে। কিন্তু চিনির অত্যধিক ব্যবহারের ফলে সরকারকে বিদেশ হইতে বেশী দামে চিনি আমদানী করিতে হয়। এ সকল বিষয়ে আমাদের নারী সমাজ অবহিত হইবেন কি ?

### সুন্দরবন অঞ্চলে বস্ত্রাচ্ছ ক্ষতি—

২৪ পরগণা জেলার বসিরহাট ও ডায়মণ্ড হারবার মহকুমার সুন্দরবন অঞ্চলে ভীষণবস্ত্রাচ্ছ ফলে বসিরহাটের তিন লক্ষ বিঘা জমী ও ডায়মণ্ড হারবারের দেড় লক্ষ বিঘা জমীর চাষ নষ্ট হইয়া গিয়াছে। বহু ধরবাড়ী ও গৃহপালিত পশুও ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে। এখনই জরত বাঁধ রক্ষার ব্যবস্থা না করিলে ক্ষতির পরিমাণ বহু পরিমাণে বাড়িয়া যাইবে। হাসনাবাদ ও নামখানাতে কেন্দ্র করিয়া সাহায্য কার্য আরম্ভ করা যাইতে পারে। সুন্দরবন অঞ্চলে যে চাউল উৎপন্ন হয়, তাহাতে কলিকাতাবাসীকে কয়েক মাস খাওয়া নো হয়। সুন্দরবনের চাষ নষ্ট হইলে কলিকাতা বিপন্ন হইবে। এ বিষয়ে কর্তৃপক্ষের অবিলম্বে উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করা উচিত।

### অর্থনীতিক কর্মসূচী—

নাসিক কংগ্রেসে অর্থনীতিক কর্মসূচী বিষয়ক একটি প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। তাহাতে বলা হইয়াছে—“জন-কল্যাণব্রতী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠাই কংগ্রেসের লক্ষ্য। বর্তমানে

কি ভাবে পণ্যোৎপাদন বৃদ্ধি পাইতে পারে তাহার উপায় নির্ধারণ করিতে হইবে, উৎপাদন বৃদ্ধির পথে যে সকল অন্তরায় আছে, তাহা দূর করিতে হইবে। জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান উন্নত করিতে হইবে। দেশের প্রত্যেকটি নাগরিকের কর্ম সংস্থান করিয়া দিতে হইবে। রাষ্ট্র অপরকে পোষণের কোন সুযোগ থাকিবে না। অর্থ ও সম্পদের বৈষম্য এমনভাবে হ্রাস করিয়া আনিতে হইবে, যাহাতে প্রত্যেকটি মাহুষ আত্মোন্নয়নের ও ব্যক্তিগত বিকাশের সমান সুযোগ লাভ করিতে পারে। নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিষগুলির উপর নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা বজায় রাখিতে হইবে। সমাজ স্বার্থ বিরোধী যে সকল লোক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার সুযোগ গ্রহণ করিয়া নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির চেষ্টা করিতেছে, তাহাদিগকে কঠোর শাস্তি দিতে হইবে। কয়েমী স্বার্থ যাহাতে বৃহত্তর কল্যাণের পথ হইতে জনগণকে বিচ্যুত না করিতে পারে তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখিতে হইবে।”

### কবি শ্রীকরণানিধান সম্পর্কিত—

কবি শ্রীকরণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের বয়স ৭৪ বৎসর আরম্ভ হওয়ার গত ২০শে সেপ্টেম্বর সন্ধ্যায় হাওড়া মহিলা কলেজে স্থানীয় দীনবন্ধু কলেজের ছাত্র ও মহিলা-কলেজের ছাত্র বৃন্দের উত্তোকে তাঁহাকে সম্বর্ধনা করা হইয়াছে। প্রিন্সিপাল শ্রীবিজয়কৃষ্ণ ভট্টাচার্য সভায় সভাপতিত্ব করেন এবং শ্রীদেবেশচন্দ্র দাস, শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, শ্রীবিনায়ক সাত্তাল প্রভৃতি সাহিত্যিকগণ কবির কাব্য সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। প্রবীণ কবির এই সম্বর্ধনাকারীরা দেশবাসীর ধন্যবাদের পাত্র। ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে এই মনোভাব বৃদ্ধির ফলেই দেশ উন্নতির পথে অগ্রসর লইবে। সভায় কবি তাঁহার কাব্যের প্রেরণা সম্বন্ধে বক্তৃতা করিয়াছিলেন।

### লোকগণনার কর্তব্য—

গত ২৩শে সেপ্টেম্বর আগামী আদমশুমারী বা লোকগণনা সম্বন্ধে এক সরকারী বিবৃতি প্রকাশিত হইয়াছে। ১৯৫১ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে লোকগণনা করা হইবে। ঐ সম্পর্কে পশ্চিমবঙ্গের প্রধান মন্ত্রী শ্রীবিধানচন্দ্র রায় জানাইয়াছেন—“জনগণনা জাতির মাহুষ সম্পদের হিসাব নিকাশ। দেশের জন সংখ্যা, জীবন



সংখ্যা, দেশবাসীর ধর্ম, বৃত্তি, সাহিত্য ও শিক্ষার মান প্রভৃতির হিসাব জনগণনার মাধ্যমেই সংগৃহীত হয়। ইহা হইতেই আমরা পাই—দেশের শিল্প, ব্যবসা বাণিজ্য, বাস ব্যবস্থা এবং সামাজিক ও অর্থনীতিক অবস্থার পূর্ণ ও যথাসম্ভব সঠিক বিবরণ।” তিনি জনগণকে এই কার্যে সরকারী কর্মীদের সাহায্য করিতে অনুরোধ জানাইয়াছেন। গণনা সম্পর্কে গৃহীত সকল তথ্যই গোপনে রাখা হইবে—কাজেই সকলে যেন সকল তথ্য নির্ভুলভাবে প্রদান করিয়া সরকারের এই কার্যে সাহায্য করেন।

হইতে দেখিয়া সকলেই সন্তুষ্ট হইয়াছেন। এদেশে সংবাদ-পত্রের সংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে শিক্ষিত সাংবাদিক ভৈর্য করারও প্রয়োজন হইয়াছে।

### পার্লামেন্টের সদস্য নির্বাচন—

পশ্চিমবঙ্গ হইতে নির্বাচিত ভারতীয় পার্লামেন্টের সদস্য শ্রীচন্দ্রসিংকা মহেশ্বরী, জনাব রাণীব আসান ও জনাব আবদুল হামিদ পদত্যাগ করায় যে ৩টি স্থান শূন্য হইয়াছিল গত ২৬শে সেপ্টেম্বর তথায় নূতন সদস্য নির্বাচন হইয়াছে—শ্রীচারুচন্দ্র বিশ্বাস, জনাব আজিজুল হক ও

কেন্দ্রীয় সাহায্য ও পুনর্বাসিত  
মন্ত্রী শ্রীঅজিতপ্রসাদ জৈন তাঁহার  
সাম্প্রতিক কলিকাতা সফরকালে  
কতকগুলি উদ্বাস্তু শিবির,  
মহিলাবাস ও শিশুপালন কেন্দ্র  
পরিদর্শন করেন। দেখা  
গাইতেছে একটি মহিলাবাসে  
তিনি কয়েকটির মহিলার সহিত  
কথোপকথনে রত



### বিশ্ববিদ্যালয়ে সাংবাদিকতা শিক্ষা—

বর্তমান বৎসর হইতে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে সাংবাদিকতা শিক্ষার ব্যবস্থা হইয়াছে এবং ঐ বিভাগের ব্যবস্থাপনার জন্ত আনন্দবাজার-পত্রিকা-সম্পাদক শ্রীচপলাকান্ত ত্রিচার্য্যকে সম্পাদক করিয়া একটি কমিটি গঠিত হইয়াছে। শিক্ষার জন্ত মাসিক বেতন ১৫ টাকা, ভর্তি ফি ১৫ টাকা ও পরীক্ষার ফি ৬০ টাকা স্থির হইয়াছে। শ্রীহেমেন্দ্র এম্বাদ ঘোষ, শ্রীমাধনলাল সেন, শ্রীবিধুভূষণ সেনগুপ্ত, ডাঃ ধীরেন সেন, শ্রীমুণ্ডলাকান্তি বসু প্রভৃতি অধ্যাপনা করিতে সম্মত হইয়াছেন। ২ বৎসর ধরিয়া শিক্ষাবান চলেবে। গত কয়েক বৎসর ধরিয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এখানে চেষ্টা করিতেছিলেন—এবার সে চেষ্টা ফলবতী

জনাব আবদুল সত্তার সদস্য। চারুবাবু ভারতের সংখ্যালঘু মন্ত্রী, হক সাহেব প্রাক্তন করোনার ও সান্তার সাহেব বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির অগ্রতম সহসম্পাদক।

### শরৎচন্দ্রের ‘রামের স্মৃতি’

অপরাজেয় কাহিনীকার শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ‘রামের স্মৃতি’ নামক কাহিনীটি সর্বজনপরিচিত এবং ইহার সার্থক চিত্ররূপ সম্বন্ধেও কিছু নূতন কথা বলিবার নাই। হিন্দী সব্যাকর্ষিত্রেও ‘ছোটো ভাই’ নামে এই কাহিনী যে অসামান্য সাফল্য অর্জন করিয়াছে তাহাও সর্বজন-বিদিত। কিন্তু সম্প্রতি একটি সংবাদে জানা গিয়াছে যে, পাকিস্তান কর্তৃপক্ষ পাকিস্তানে এই অপূর্ণ কাহিনীর

প্রদর্শন নাকি বন্ধ করিয়া দিয়াছেন। অবশ্য সংবাদটিতে ইহাও উল্লেখ আছে যে, যদি ছবিটির শেষের অংশ—অর্থাৎ রামকে পুনরায় ধরে কেরাইয়া আনার অংশটুকু বাদ দেওয়া যায় তাহা হইলে ঐ ছবি প্রদর্শনে কোন নিষেধাজ্ঞা থাকিবে না। সংবাদটি খুবই অদ্ভুত। কারণ ‘রামের স্মৃতি’ রাজনৈতিক কাহিনীও নয়, সাম্প্রদায়িকতার কোনরূপ সংস্পর্শও ইহাতে নাই। ইহা একটি সামাজিক চিত্র। সুতরাং ইহার উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপের এমন কি হেতু থাকিতে পারে? তবে কি ইহা দ্বারা আমরা ইহাই বুঝিব যে প্রত্যাবর্তন ব্যাপারটি কোনও ক্ষেত্রেই পাকিস্তান কর্তৃপক্ষ বরদাস্ত করিতে চান না? এবং এই ইঙ্গিতই কি ইহাতে, স্পষ্ট নয় যে, পাকিস্তান-পরিচালক কোন হিন্দুর পুনরায় পাকিস্তানে প্রত্যাবর্তন পাকিস্তান কর্তাদের অভিপ্রেত নয়? ইহাই কি তাহার রূপক অভিযুক্তি? দিল্লী চুক্তির মাধ্যমে যাঁহারা আত্মহারা এই সংবাদটির দিকে তাঁহাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

### আত্মাঙ্গী ছাত্রের কৃতিত্ব—

আমরা শুনিয়া সুখী হইলাম যে অবসরপ্রাপ্ত জেলা জজ শ্রীযুক্ত কণীন্দ্রনাথ মিত্রের পুত্র শ্রীমান কল্যাণকুমার মিত্র মাত্র ২৫ বৎসর বয়সে বোম্বাই ইউনিভারসিটি হইতে Bio-

Chemistry নামে পি-এইচ-ডি উপাধি লাভ করিয়াছেন। তাহার গবেষণার বিষয়বস্তু ছিল Fermentation Technology. ইতিপূর্বে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে কেমিস্ট্রিতে কাষ্ট ক্লাস ডিগ্রি এবং ইউনিভারসাল



শ্রীকল্যাণকুমার মিত্র

ইন্সটিটিউট অব সায়েন্স হইতে Chemical Engineering-এ Associateship ডিগ্রি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। বর্তমানে তিনি Fermentation সম্বন্ধে গভীরতর গবেষণায় নিযুক্ত আছেন।

## তোমারে প্রণাম

বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়

তুমি আছো, তুমি ছাড়া কিছু নাই আর।  
অনন্ত চৈতন্য, নবদ্বর্পণে তোমার  
র'য়েছে অগণ্য বিশ্ব। নিঃসাম শূন্যের  
সংখ্যাগণন গ্রহভাৱা হ'তে অরণ্যের  
জুড়তম পুষ্পশিঙা—সবার পিছনে  
আছে তব পরিচর্যা নিঃশব্দে গোপনে

তোমার কল্যাণ হস্ত করিছে সিঞ্চন  
সকলের মূলে প্রাণরস। চিরন্তন  
হে দেবতা, যে তোমারে দেখেছে অন্তরে -  
পেয়েছে সে চিরশান্তি। কোন হৃৎকণে  
টলাতে পারে না তারে। কোন প্রলোভনে  
লুপ্ত নহে চিত্ত তার। নিখিল ভুবনে

তুমি তার প্রিয়তম, প্রাণের আরাধ্য;  
সজ্জিত আনন্দ তুমি—তোমারে প্রণাম।



শ্রীক্ষেত্রনাথ রায়



স্থাপত্যশিল্পের চট্টোপাধ্যায়

### আই এফ এ শীল্ড ৪

১৯৫০ সালের আই এফ এ শীল্ডের ফাইনালে ইষ্ট-বেঙ্গল ক্লাব ৩-০ গোলে সান্তিসেস একাদশদলকে শোচনীয়ভাবে হারিয়ে উপর্যুপরি দু'বছর এবং মোট তিনবার একই বছরে লীগ-শীল্ড বিজয়ের গৌরব লাভ করেছে। ১৯৪৫ সালে ইষ্টবেঙ্গল ক্লাব লীগ চ্যাম্পিয়ান এবং আই এফ এ শীল্ড একত্রে প্রথম বিজয়ী হয়। ইষ্টবেঙ্গল ক্লাব ভিন্ন স্থানীয় দলের মধ্যে অপর কোন দলই এ পর্যন্ত তিনবার একই বছরে লীগ-শীল্ড বিজয়ের গৌরব অর্জন করতে সক্ষম হয়নি। ১৯৩৬ সালে ভারতীয়দলের মধ্যে প্রথম লীগ-শীল্ড বিজয়ী হয় মহম্মদান স্পোর্টিং ক্লাব। তারা দ্বিতীয়বার লীগ-শীল্ড পেয়েছে ১৯৪১ সালে। লীগ-শীল্ড খেলার ইতিহাসে একই বছরে প্রথম লীগ-শীল্ড পায় মুম্বাই ১৮৯৮ সালে। গার্ডনস এইচ এল

আই ১৯০৮-৯ সালে উপর্যুপরি দু'বছর লীগ-শীল্ড পাওয়ার প্রথম রেকর্ড করে। এ রেকর্ডের সমান করেছে একমাত্র ক্যালকাটা (১৯২২-২৩) এবং ইষ্ট-বেঙ্গল ক্লাব (১৯৪৯-৫০)। এই রেকর্ড সম্পর্কে একটা

কথা উঠা স্বাভাবিক যে, আই এফ এ শীল্ড বিজয়ী হয়েছে এমন অনেক বহিরাগত মিলিটারী দলের লীগের খেলায় যোগদানের কোন সম্ভাবনা ছিল না বলে তাদের পক্ষে এই রেকর্ড করা বা ভাঙ করা সম্ভব হয়নি। একই বছরে লীগ-শীল্ড পাওয়ার রেকর্ড স্থাপন করা স্থানীয় দলের পক্ষে সম্ভব, বহিরাগত দলের পক্ষে নয়। সুতরাং যে সব দল এই রেকর্ড করেছে তাদের নাম উল্লেখ প্রসঙ্গে বলা



লীগ-শীল্ড বিজয়ী ইষ্টবেঙ্গল ক্লাব

ফটো—জেকে-সাত্তাল

উচিত, লীগ-শীল্ড খেলার ইতিহাসে এই দলগুলি স্থানীয় দলগুলির মধ্যে একই বছরে লীগ-শীল্ড পাওয়ার গৌরব লাভ করেছে। স্থানীয় কথাটির স্পষ্ট উল্লেখ না থাকলে বহিরাগত শীল্ড বিজয়ী দলগুলির প্রতি অবিচার করা হয়।

ইষ্টবেঙ্গল ক্লাবের পর্যায়ক্রমে দু'বছর লীগ-শীল্ড জয়লাভের ফলে কলকাতায় বহিরাগত ফুটবল খেলোয়াড়দের নৈপুণ্য স্বীকৃত হয়েছে। একথা স্বীকার না করলে তাঁদের প্রতি আমাদের অদৌজ্ঞ এবং অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হবে। ইষ্টবেঙ্গল ক্লাবের খেলায় জয়লাভের প্রধান মেরুদণ্ড হ'ল আক্রমণ ভাগের পাঁচজন বাইরের খেলোয়াড়দের সুদৃঢ় অক্রমণ পদ্ধতি, ক্রিয়শীলতা, পরস্পরের মধ্যে বুঝাপড়া, সুযোগ সন্ধ্যাব্যবহারে দক্ষতা এবং সর্বোপরি দলের জয়লাভের জন্ত অদম্য আকাঙ্ক্ষা। গোল করার উপরই যেখানে খেলার ফলাফল নিষ্পত্তি হয় সেখানে আক্রমণভাগকে শক্তিশালী করাই হ'ল বিচক্ষণতার



সম্ভাব্য ট্রফি বিজয়ী বাঙ্গলা প্রদেশ ফুটো—প্রত্যন্ত বহু (ভেপো)

পরিচয়। রক্ষণভাগ যত শক্তিশালী হউক না কেন, দুর্বল আক্রমণভাগ নিয়ে হয়ত দু' একটা খেলায় দলের প্রাধান্ত বজায় রাখা যায় কিন্তু লীগের গড়পড়তার খেলায় এবং টুর্নামেন্টে দলের শেষ মুখরুক্ষা করা যায় না। আক্রমণভাগের শক্তিশালী খেলোয়াড়রা বরং বিপক্ষদলের গোল সীমানায় আক্রমণ চালিয়ে দলের দুর্বল রক্ষণ ভাগকে যথেষ্ট সহযোগিতা করতে পারে। বিপক্ষের গোল সীমানায় বেশী সময় বল রাখার অর্থই হ'ল নিজ দলের রক্ষণভাগের উপর বিপক্ষ দলের আক্রমণের চাপ

কমিয়ে দেওয়া। এই নীতিই হ'ল ফুটবল খেলায় সাফল্য লাভের মূলনীতি।

কিন্তু কার্যক্ষেত্রে অনেক দলই এই নীতির কথা ভুলে যায়। খেলায় প্রাধান্ত লাভের প্রাথমিক নীতির দিক থেকে ইষ্টবেঙ্গল ক্লাবের কোন ভুল হয়নি। দলের আক্রমণ ভাগ সত্য অলিম্পিক প্রত্যাগত তিনজন এবং অপর দু'জন মোট পাঁচজনই বাইরের নাম করা খেলোয়াড় দিয়ে খুবই শক্তিশালী করা হয়েছে। গত বছরের ব্যাক তাজমহলমতিকে এ বছরের ফুটবল মরসুমের মধ্যে অনেক চেষ্টা সত্ত্বেও পাকিস্তান থেকে আনা সম্ভব না হওয়ায় রক্ষণভাগ কলকাতার কোন কোন বিশিষ্ট ফুটবল দলের থেকে দুর্বল

হয়ে পড়ে। ফাইনালে দলের রক্ষণভাগ আগের তুলনায় আরও দুর্বল হ'ল—ব্যাংকে ঘোঁমকেশ বসু, হাফ ব্যাংকে এস রায় এবং কাইজার অসুস্থতার জন্তে খেলতে না নামায়। ফাইনাল খেলার সমস্ত কণের মধ্যে কয়েকবার এ দুর্বলতা চোখে পড়লেও বেশী সময়ই দলের আক্রমণ দলের খেলোয়াড়রা বিপক্ষের গোলে তীব্র আক্রমণ চালিয়ে নিজ দলের রক্ষণভাগকে বিপদের চাপ থেকে রক্ষা করেছেন। দলের আধিপত্য রক্ষার জন্তে অপরাধের দলের মত ইষ্টবেঙ্গল

ক্লাবও অনেক বছর ধরে বাইরের খেলোয়াড় আনিয়ে দলগঠন করেছে। বেশীর ভাগই দলে খেলেছেন মাজাজের নাম করা খেলোয়াড়রা। ১৯২৫ সালে ইষ্টবেঙ্গল ক্লাব প্রথম বিভাগের লীগে প্রথম খেলতে আসে। ১৯২৫-২৮ পর্যন্ত এই চার বছর প্রথম বিভাগে খেলে ১৯২৯ সালে দ্বিতীয় বিভাগে নেমে যায়। এই চার বছরের লীগ তালিকায় দলের স্থান এই ছিল—৪র্থ (১৯২৫), ৬ষ্ঠ (১৯২৬-২৭) এবং সর্ব স্তর নিম্নস্থান (১৯২৮)। ১৯৩১ সালে দ্বিতীয় বিভাগের লীগ চ্যাম্পিয়ান হয়ে পুনরায় ইষ্টবেঙ্গল ক্লাবকে ১৯৩২ সালে প্রথম বিভাগের

খেলায় খেলতে দেখা যায়। সেই সময় অর্থাৎ ১৯৩২ থেকে ১৯৪১ সাল এই দশ বছরের মধ্যে বাইরের খেলোয়াড় দলে নিয়েও ইষ্টবেঙ্গল ক্লাব পাঁচ বার লীগের রাণাস আপ ছাড়া অপর কিছু হ'তে পারে নি। শীল্ডের খেলায় ১৯৩৭-৩৮ সালে ৩য় রাউণ্ড পর্যন্ত উঠেছিল। ১৯৪২-১৯৪৩ সাল পর্যন্ত এই ৮ বছরের লীগ-শীল্ডের খেলায় ইষ্টবেঙ্গল ক্লাবে আগের থেকে যেমন বেশী বাইরের খেলোয়াড় যোগদান করেছে তেমন দলকে বিরাট সাফল্য লাভে সহযোগিতা ক'রেছে। এই আট বছরে লীগ পেয়েছে ৫ বার, উপযুক্তি দু'বছর লীগ পেয়েছে দু'বার, অপরাধের অবস্থায় ১ বার। লীগে রাণাস আপ হয়েছে ১ বার। শীল্ড পেয়েছে ৪ বার, ৩ বার শীল্ডের রাণাস আপ হয়েছে। ১৯৪২-১৯৪৭ সাল পর্যন্ত পর্যায়ক্রমে ৫ বার আই এফ এ শীল্ডের ফাইনালে খেলে ক্যালকাটা ফুটবল ক্লাবের ১৯০৩-১৯০৭ সালে প্রতিষ্ঠিত রেকর্ডের সমান করে। তবে এই সময়ের মধ্যে ক্যালকাটা শীল্ড পেয়েছে ৩ বার, ইষ্টবেঙ্গল ২ বার। দলের সাফল্যের দিক থেকে ১৯৪৯ সালই ইষ্টবেঙ্গল ক্লাবের কাছে স্মরণীয় বছর— একই বছরে ক্যালকাটা ফুটবল লীগ, আই এফ এ শীল্ড এবং রোভার্স কাপ পায়।

আলোচ্য বছরের শীল্ডের খেলায় অনেক শক্তিশালী দলের যোগদান করার কথা ছিল, তারা কেউ যোগদান করেনি। প্রতিবছরই এ ব্যাপার ঘটছে। ঢাক পিটিয়ে বোম্বে ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলের শক্তিশালী দল আই এফ এ শীল্ডে যোগদান করবে। কিন্তু শেষে দেখা যায় এমন সব দল আই এফ এ-র খরচায় খেলতে এসেছে যাদের ফুটবল খেলার ট্রাণ্ডার্ড এখানকার চতুর্থ বিভাগের নিম্নস্থান অধিকারী দলেরও সমান নয়। তারা অবিশিষ্ট ক'লকাতার ক্লাবগুলির কাছে অধিক সংখ্যক গোল খেয়ে স্থানীয় দলের

রেকর্ড স্থাপন করার সুযোগ দিয়ে ভারতীয় ফুটবল খেলার রাজধানী ক'লকাতার ঘেরা মাঠে ফুটবল খেলার সৌভাগ্য লাভ করে। তাদের বিপক্ষে খেলে অধিক গóলের রেকর্ড করার সুযোগ ছাড়া ক'লকাতার ক্লাবগুলি আরও একটা সুবর্ণ সুযোগ পায়, খেলোয়াড় সংগ্রহ করার। দলগত খেলার ট্রাণ্ডার্ড যতই ধারাপ হউক, প্রতিবছরই কোন না কোন দলের দু'একজন খেলোয়াড় ব্যক্তিগত ক্রীড়া নৈপুণ্য দেখিয়ে ক'লকাতার দর্শকের মুগ্ধ ক'রে যান আর অমনি ক'লকাতার ক্লাবগুলির শ্রোণ দৃষ্টি পড়ে তাঁদের উপর। ক্লাবের নামের ঐতিহ্য, নানা প্রকার সুযোগ সুবিধার চৌপ দিয়ে তাঁদের বিভিন্ন দলে টেনে আনা হয়। এই চৌপের



সম্ভাব্য ট্রফির ফাইনালে বিজ্ঞতা হায়দ্রাবাদ দল ফটো—ডি-রতন-এ্যাণ্ড কোং

চার বাঙ্গলা দেশেই নয়, সারা ভারতবর্ষ, বর্ষা জুড়ে ফেলা আছে।

ক'লকাতার বৃষ্টির মধ্যে খেলা, নাম করা দলের সমর্থকদের উচ্ছৃঙ্খলতা, দলের খেলার ফলাফল দলের সমর্থকদের মনোমত না হ'লে রেফারীকে আক্রমণ এবং স্বভাবতই রেফারীর পক্ষপাতিত্ব বাঙ্গলার বাইরের নামকরা ফুটবল দলকে ক'লকাতার মাঠে খেলতে আসতে কমই উৎসাহিত করে। এ নিয়ে বাঙ্গলার বাইরের কাগজ পত্র অভিযোগ উঠেছে। অভিযোগ অস্বীকার করা যায় না। বাঙ্গলার বিপক্ষে আরও অভিযোগ, (১) একাধিক ক্লাব

বিভিন্ন প্রদেশের নাম করা খেলোয়াড়দের আমদানী ক'রে সেখানকার খেলার ষ্ট্যাণ্ডার্ডের অবনতির কারণ ঘটাবে, (২) জাতীয় ফুটবল প্রতিযোগিতায় সেই সব খেলোয়াড় ক'লকাতার ফুটবল খেলার যোগদানের দরুণ নিজ নিজ প্রদেশের পক্ষে খেলতে পারেন না (৩) এই সুযোগে বাঙ্গলা প্রদেশ নিজেও জাতীয় ফুটবল প্রতিযোগিতায় এসব বহিরা-  
গত খেলোয়াড়দের মধ্যে একাধিক বাছাই খেলোয়াড় নিয়ে দলকে শক্তিশালী ক'রে বছর বাছাই খেলোয়াড় নিয়ে দলকে শক্তিশালী ক'রে বছর কাইনালে জয়ী হয়েছে (৪) ভারতবর্ষের ফুটবল খেলায় পেশাদারী প্রথা বে-  
আইনী কিন্তু অবাধে ক'লকাতায় বাইরের খেলোয়াড় আম-  
দানীর কলে বিভিন্ন প্রদেশে সখের খেলার মর্যাদা রক্ষা  
অসম্ভব হয়ে পড়েছে—ক'লকাতায় আধাপেশাদারী খেলার  
প্রবর্তনে। এ সমস্ত নির্জলা মিথ্যা প্রতিপন্ন করতে  
কেউ পারেন কি? বর্তমান অর্থনৈতিক সঙ্কটকালে  
খেলোয়াড়দের মধ্যে কেবল নাম এবং দর্শকদের আনন্দ  
বিতরণের প্রেরণায় কয়জন বিভ্রাট খেলোয়াড় সময় দিয়ে  
শারীরিক পরিশ্রম ক'রে উন্নত খেলার অঙ্গীলন করতে  
পারেন? ক্রমে খেলার দরুণ বাইরের খেলোয়াড়দের  
মত সুখ সুবিধা খুব কম বাঙ্গালী খেলোয়াড়ের ভাগেই  
ছুটে থাকে। বাঙ্গলাদেশের ফুটবল খেলার মান সম্মান,  
খেলার আত্মজাগ প্রভৃতি আদর্শমূলক কথা বলে বাঙ্গালী  
খেলোয়াড়দের সুখ অসুবিধার দাবীকে ঠাণ্ডা রাখা হয়।  
ফলে ভিতরে ভিতরে অসন্তোষের আগুন থেকে যায় যায়  
ফলে আজ বাঙ্গালী খেলোয়াড়রা আন্তরিকভাবে খেলা  
গ্রহণ করতে পারছেন না। এই আধাপেশাদার ফুটবল  
খেলার পরিবর্তে আমরা একাধিকবার ফুটবল খেলায়  
পেশাদারী খেলা প্রবর্তনের পক্ষে স্পষ্ট অভিমত এবং  
সুক্তি দেখিয়েছি। এ-আই-এফ-এফ-র এ ব্যাপারে  
গোড়ামির কোন অর্থ বুঝা যায় না।

আই এফ এ লীগের ৪র্থ রাউন্ডে ৮টি দলের মধ্যে  
বার্ণাপুর দলই ছিল বাইরের। একদিকের সেমি-  
কাইনালে সার্ভিসেস একাদশ দল মোহনবাগানকে ২-১  
গোলে হারিয়ে কাইনালে যায়। মোহনবাগানের সেন্টার  
ফরওয়ার্ড আহত বাবলু কুমারের স্থানে পুরোনো  
খেলোয়াড় অমল মজুমদারকে একেবারে কাইনালে খেলতে  
দেখা যায়। ফরওয়ার্ডের এ পরিবর্তনে অবিশিষ্ট কোন সুফল

হয়নি একমাত্র অমল মজুমদারের একটি গোল শোধ দেওয়া  
ছাড়া। অনভ্যস্ত স্থানে তিনি খেলতে পারেন নি এবং  
খেলার মধ্যে ছু'বার ফরওয়ার্ড খেলোয়াড়দের মধ্যে পরস্পর  
স্থান পরিবর্তনে সুফল হয়নি, বরং আরও খেলায় অবনতি  
দেখা যায়। লেকট আউটে একমাত্র দাশগুপ্তই সামগ্রিক  
দলের বুট উপেক্ষা করে খেলেছিলেন; বাকি সকলেই  
বুটের ভয়ে এতবেগী সন্ত্রস্ত ছিলেন যে, সার্ভিসেস দলের  
রক্ষণভাগ বিপক্ষের এই দুর্বলতার সুযোগে চূড়ান্তভাবে  
খেলায় আধিপত্য বিস্তার করতে পেরেছিলো। সত্তার,  
গুহ ঠাকুরতা এবং অমল মজুমদার এই তিনজনের খেলার  
পদ্ধতির মধ্যে তাঁদের ঠাণ্ডা প্রকৃতির খেলার পরিচয় পাওয়া  
যায়। এঁদের মধ্যে কেউই dashing খেলোয়াড় নন, ফলে  
তাঁদের খেলায় তীরতার ছাপ যথেষ্ট আছে। বিশেষ ক'রে  
সামগ্রিক দলের বিপক্ষে গোলে সবেগে ধাবমানেন সক্ষম  
এমন একজন সেন্টার ফরওয়ার্ড দরকার।

মোহনবাগানের সে দিনের খেলায় পরাজয়ের কারণই  
হ'ল খেলায় ভুলপদ্ধতি, অনভ্যস্ত স্থানে খেলা এবং ফরওয়ার্ড  
খেলোয়াড়দের সাহসের অভাব। খেলার সমস্ত সময়েই  
একমাত্র সেন্টার হাফ টি আও এবং দ্বিতীয়ার্দ্ধে বা কিছু রতন  
সেন বিপক্ষের বুট এবং বল প্রয়োগ উপেক্ষা ক'রে খেলেছেন।  
দলের খেলার মধ্যে জয়লাভের অদম্য উৎসাহ বা জেদ ছিল  
না। সামগ্রিক দল যে জয়হৃৎক গোলাটি করে তা বেশই  
অভাবনীয় এই কারণে যে, মোহনবাগানের গোলরক্ষকের  
পক্ষে ঐ ধরনের গোল রক্ষা করা বিশেষ দক্ষতার পরিচয়  
হ'ত না। বলটি অনেক দূর থেকে গোলের মধ্যে যায়।  
গোলরক্ষক অহেতু এগিয়ে যাওয়ার ফলে বলটি কোন  
বাধা না পেয়েই গোলে ঢুকে। ঠিক এমনি ধরনের গোল ঐ  
একই গোলরক্ষককে খেতে দেখা গেছে লীগে ইষ্টবেঙ্গলের  
সঙ্গে দ্বিতীয় খেলায়। সার্ভিসেস দল খেলার অবস্থা  
বুঝে কখনও লম্বা বল পাঠিয়ে এবং কখনও সর্ট পাশ  
ক'রে দলের খেলোয়াড়দের বিপক্ষের বাধা অথবা লম্বা  
রাখার পূর্বেই বল দিয়েছে। সময়ে সময়ে বলটি মাটিতে  
পড়বার আগেই অবধা সময় নষ্ট না ক'রে বলটিকে উপরে  
উপরে দলের খেলোয়াড়দের নিখুঁতভাবে পাশ দিতে  
দেখা যায়।

মোহনবাগানের বিপক্ষে সার্ভিসেস দলের উন্নত প্রতীক



খেলা দেখে সকলেরই ধারণা হয়েছিলো সার্ভিসেস দল ফাইনালে তার প্রতিদ্বন্দ্বী দলকে খুবই বেগ দেবে, খেলার ফলাফল যাই হ'ক না কেন।

ইষ্টবেঙ্গল ২-১ গোলে অপর দিকের সেমি-ফাইনালে স্পোর্টিং ইউনিয়নকে হারিয়ে ফাইনালে উঠে। স্পোর্টিং ইউনিয়ন মাত্র একজন ছাড়া বাকি দশজন খাটি বাঙ্গালী খেলোয়াড় নিয়ে চারজন অলিম্পিক প্রত্যাগত এবং বাকি নাম করা খেলোয়াড় দ্বারা গঠিত রাজস্থানকে হারিয়ে দেয় লীগের এবং শীল্ডের খেলায়।

ফাইনালে সার্ভিসেস দল তার স্বাভাবিক খেলা খেলতে পারে নি, বলতে কি মাঠে দাঁড়াতে পারে নি এমনই খেলায় বিবৃত হয়ে পড়েছিলো।

একদিকে সার্ভিসেস দলের সেমি-ফাইনালে উন্নত ধরনের খেলা এবং অপর দিকে ইষ্টবেঙ্গল ক্লাবের নিয়মিত নাম করা খেলোয়াড় ব্যাক বি ব্লু, হাফ ব্যাক এস রায় এবং কাইজার আহত এবং অসুস্থ হয়ে পড়ায় ইষ্টবেঙ্গল দল যে একটা জোর প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হ'ল এই দু'খ ফাইনাল খেলা সুরু হওয়ার আগে পর্যন্ত সমর্থকদের মনকে বিশেষ ক'রে পীড়া দিতে থাকে। সত্যিই একটি দলের পক্ষে নিয়মিত তিনজন শক্তিশালী খেলোয়াড় এই রকম একটা গুরুত্বপূর্ণ খেলায় না খেললে, বিশেষ ক'রে যাদের অভাব দলের পক্ষে অপূরণীয় সেখানে সমর্থক এবং সমস্ত দলটির নৈতিক দৃঢ়তা থাকা অসম্ভব ব্যাপার। খেলায় যেমন অপ্রত্যাশিত ঘটনা ঘটে এ ক্ষেত্রেও তাই হ'ল যখন ইষ্টবেঙ্গল দল বি ব্লুর স্থানে সাত বছর আগের অবসারপ্রাপ্ত খেলোয়াড় বেবী গুহাকে নিয়ে খেলতে নামলো। তখন দেখলাম সমর্থকরা আরও বেশী মুসড়ে পড়েছেন। প্রথম শ্রেণীর খেলায় অনেক দিনের অনভ্যস্ত এবং তার উপর শারীরিক বিপুলভায়ে সমবাস্ত বেবী গুহাকে আজ আই এক এ শীল্ডের ফাইনালে খেলতে নামলে কি ক'রে নৈতিক দৃঢ়তা এবং উচ্চ আশা পোষণ করা যায় বলুন! কিন্তু খেলা সুরুর সঙ্গে সঙ্গে দেখা গেল দর্শকদের থেকে ইষ্টবেঙ্গলদলের খেলোয়াড়দের মনোবল সহস্রগুণ বেশী। ইষ্টবেঙ্গলদলের আক্রমণভাগের খেলোয়াড়রা সমর্থকদের ভরসা দিলেন। তাঁদের তীব্র গতির সঙ্গে পরস্পরের বুঝাপাড়া, নিখুঁত পাস, এবং খেলায় গোল করার জিদের মুখে সার্ভিসেস দলের সেমি-ফাইনালের খেলা দর্শকদের মন থেকে তলিয়ে গেল।

খেলার বেলীরাগ সময়ই ইষ্টবেঙ্গল দলের করোয়ার্ডের খেলোয়াড়রা বিপক্ষের গোল সীমানায় বল টেনে রাখার ফলে দলের রক্ষণভাগের উপর চাপ খুবই কম পড়ে। মাঝে মাঝে ইষ্টবেঙ্গল দলের গোলের দিকে বল গেছে

কিন্তু হাফব্যাক, ব্যাক এবং গোলরক্ষক তাঁদের নিজ নিজ দায়িত্ব কৃতিত্বের সঙ্গে পালন করেছেন। বেবী গুহ একবার গোলের মুখে সবেগে ধাবমান একটা প্রচণ্ড স্টের মুখে মাথা পেতে দিয়ে বলটি প্রতিরোধ ক'রে কিছুকণের জন্য সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলেন কিন্তু কয়েকমিনিট পর এমন সহজভাবে মাঠে নেমে খেলতে থাকেন যে তাঁর খেলার উপর সমস্ত দর্শকদের আকর্ষণ পড়ে। গোলে ঘটক একবার মাথার উপরের বলে সময়মত ঘুবি মেরে এবং একবার শুয়ে পড়ে বলটি আঁকড়ে ধরে দু'টি অবধারিত গোল বাঁচান। ইষ্টবেঙ্গলের তিনটির বেশী গোল হ'ত; একবার আমেদ খাঁ ফাঁকা গোলে স্ট না ক'রে দলের খেলোয়াড়কে বলটি পাস করায় একটা অবধারিত গোলের সুযোগ নষ্ট হয়; আর একবার গোল-রক্ষককে অসহায় অবস্থায় দূরে ফেলে রেখে যখন বলটি গোলের মধ্যে বিনা বাধায় ঢুকছে সেই সময় অপ্রত্যাশিত ভাবে সার্ভিসেস দলের একজন খেলোয়াড় প্রায় গোল লাইনের উপর থেকেই বলটি বের ক'রে দেয়। সেমিন ইষ্টবেঙ্গল দলের সাফল্যের মূলে ছিল দলের প্রত্যেকটি খেলোয়াড়ের মনোবল, খেলায় জয়লাভে জিদ, সর্বোপরি আক্রমণভাগের খেলোয়াড়দের ক্রীড়াচাতুর্য। গত ৮ বছরে দলটিকে লীগ-শীল্ডের খেলায় দলগত সাফল্য প্রতিষ্ঠা করতে বাইরের খেলোয়াড়রা প্রভূত সহযোগিতা করেছেন। বিশেষ ক'রে গত দু'বছর আক্রমণভাগের পাঁচজন বাইরের খেলোয়াড় এবং রক্ষণভাগের ৩৪ জন বাইরের খেলোয়াড়দের সহযোগিতা ভিন্ন এতখানি দলগত সাফল্য অল্প সময়ে সম্ভব হ'ত না; সে কথা ইষ্টবেঙ্গল ক্লাবের কর্তৃপক্ষমহল বুঝতে পেরেছিলেন বলেই তাঁরা অধিক সংখ্যক বাইরের নামকরা বাছাই ফুটবল খেলোয়াড় সংগ্রহে উৎসাহিত হয়েছিলেন। তাঁদের সফল প্রচেষ্টায় আজ দলের সমর্থকেরা আনন্দিত হয়েছেন। যারা দলের সত্য অথবা সমর্থক নন, তাঁরাও দলের খেলোয়াড়দের ক্রীড়াচাতুর্য স্বাক্ষর করতে দ্বিধা বোধ করেন না। ইষ্টবেঙ্গল ক্লাবের এই দলগত জয়লাভের মধ্যে বাইরের নাম করা খেলোয়াড়-গণ ফুটবল খেলায় তাঁদের কৃতিত্ব এবং প্রাধান্য ক'লকাতার মাঠে সুপ্রতিষ্ঠিত ক'রে স্বদেশে ফিরে যাবেন, অনেকে এখানেই কিছুকাল থেকে যাবেন। ক'লকাতায় বাইরের খেলোয়াড়দের আগমনের পথ সহজ ক'রে তাঁরা সত্যি ভবিষ্যৎ বংশধরদের ভাগ্য উজ্জ্বল রেখে গেলেন। অজান্তে ক্লাবের বাইরের খেলোয়াড়রা দলগত সাফল্য অর্জন করতে সক্ষম হ'ননি বটে কিন্তু এর জন্য খুব বেশী দৃষ্টান্তের কারণ তাঁদের নেই; অত সহজে বাঙ্গালী জাতির চৈতন্য উদ্বৃত্ত হবে না।



## নব-প্রকাশিত পুস্তকাবলী

অমরেন্দ্র বোষ প্রণীত উপস্থাপন “দক্ষিণের বিল”—৪,  
 পরমল মুখোপাধ্যায় প্রণীত উপস্থাপন “পটভূমি”—২,  
 মধুসূদন চট্টোপাধ্যায় প্রণীত উপস্থাপন “তোমারই হউক জয়”—২৫,  
 নবকৃষ্ণ ভট্টাচার্য প্রণীত প্রথম ভাগ “ছবি ও ছড়া”—১০০,  
 দ্বিতীয় ভাগ “আজ-কাল-পরশুর গল্প”—২,  
 গণকানন চট্টোপাধ্যায় প্রণীত উপস্থাপন “ছন্দ পতন”—২,  
 শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত প্রথম ভাগ “মজার বই”—১০০,  
 চিত্রভানু প্রণীত কাব্য-গ্রন্থ “কয়েকটি কবিতা”—৫,  
 শ্রীমন্তরশ্মি রায় প্রণীত সম্পর্ক “এলীসের অবেশন”—১১,  
 বীরেন দাস প্রণীত উপস্থাপন “আরো দূর পথ”—৩,  
 ভট্টাচার্য প্রণীত উপস্থাপন “সত্যতার রাজপথে”—৩

শ্রীপকানন বোষ প্রণীত উপস্থাপন “দুই পক্ষ”—২১,  
 শ্রীকালীকঙ্কর সেনগুপ্ত প্রণীত কাব্যগ্রন্থ “দিশারী কপোত”—২,  
 হুজিতকুমার নাগ প্রকাশিত “নবজাতক”—১০,  
 শ্রীপরমল গোস্বামী প্রণীত গল্প-গ্রন্থ “মায়কে লেঙ্গে”—৪,  
 শ্রীনিবরাম চক্রবর্তী প্রণীত “আমার লেখা”—৪১,  
 “ভূত ও অদভূত”—১১,  
 শ্রীশৌরীন চৌধুরী অনুদিত উপস্থাপন “রুডিন”—৩,  
 শ্রীজগদীন্দ্র বাগচী সম্পাদিত “কমিউনিস্ট”—২৫,  
 পরশকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় অনুদিত উপস্থাপন  
 “কার্ডিনালের প্রণয়িনী”—৩১,  
 শ্রীকুমারেশ বোষ প্রণীত উপস্থাপন “ভাঙা গড়া”—২১

## এইচ-এন-ভির শারদ-অর্থ্য

এ মাসের উল্লেখযোগ্য অবদান বাংলার ছয় জন বিশিষ্ট শিল্পীর কণ্ঠে বিশ্বকবি শরৎ বন্দ্যোপাধ্যায়ের তিনখানি রেকর্ড। প্রত্যেকখানি গান রবীন্দ্রশ্রীতি-  
 খ্যাত শিল্পীর কণ্ঠে মূর্ত হয়ে উঠেছে। N 31267 রেকর্ডে পঙ্কজ মল্লিকের কণ্ঠে “আমার রাত পোহাল শারদ প্রাতেব সঙ্গে” শ্রীমতী মুখা  
 মুখোপাধ্যায়ের কণ্ঠে “ওগো শেফালী,” N 31265 রেকর্ডে হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের কণ্ঠে “আজি শরত-তপনে,” প্রভাত স্বপনের সঙ্গে শ্রীমতী  
 হুজিত বোষের কণ্ঠে “সেখের কোণে রোদ হেসেছে,” N 31266 রেকর্ডে সন্তোষ সেনগুপ্তের কণ্ঠে “কার বাগী নিশি ভোরে”র সঙ্গে শ্রীমতী  
 ইলা মিত্রের কণ্ঠে “তোমার মোহন রূপের” যে অনবদ্য প্রকাশ ভংগিমার সৃষ্টি করেছে তা সকলেরই ভাল লাগবে। কুমার শচীন দেববর্মণের  
 দু’খানি আধুনিক গান “খুলিয়া কুসুম মাজ” ও “আজো আকাশের পথ বাহি” (Phigto) শিল্পীর মমতা ভরা কণ্ঠের পূর্ণ অভিব্যক্তি। বাগী  
 চিত্রের মে-ব্যাংক শিল্পী কুমারী গীতা রায় (বম্বে) দু’খানি পরীগীতি N 31257 রেকর্ডে পরিবেশন করেছেন। শ্রীমতী হুজিত বোষের  
 শ্রীতি উদ্ধৃত কণ্ঠের “চলোবলী সাথে বাপি” ও “শুনি তিরস্কার কান্না” (N 31259) কীর্তন গীতি দু’খানি ভাবানুভূতিময় অন্ততম প্রেষ্ঠ  
 অবদান। “আমি ডেলি প্যাসেঞ্জার” ও “বো একটা চাই” N 31262 রেকর্ডে পরিবেশিত কৌতুক গীতি দু’খানি রচনা ও পরিবেশনা  
 স্তম্ভে অপূর্ণ—শিল্পী বশোদাদুলাল মণ্ডলের স্বভাবসিদ্ধ কৌতুক-কণ্ঠের পরিবেশনে রেকর্ডটি উপভোগ্য হয়েছে। শ্রীমতী হুজিতা মিত্রের  
 N 31261 রেকর্ডের দু’খানি রবীন্দ্রগীতি “কোন পেপা প্রাণ” ও “আজ ধানের খেতে” শিল্পীর গৌরবময় পরিচয়ের নিদর্শন। তরুণ  
 বন্দ্যোপাধ্যায়ের “পুজোর ছুটি” N 31258, জগন্ময় মিত্রের “তুমি তো জান না” ও “আমার দেশের” N 31265 এবং কুমারী বাগী  
 বোষালের N 31264 রেকর্ডে আধুনিক গানগুলিও ভাল হয়েছে। ‘মহল’ বাগী চিত্রের দু’খানি গানের স্বর N 31263 রেকর্ডে বেহালা চন্দ্র  
 পরিবেশন করেছেন পরিতোষ শীল, ক্রান্তিগুণেন্দের মাধ্যমে “বরসাত” বাগীচিত্রের দু’খানি জনপ্রিয় গানের মন্ত্রগীতি N 31260 রেকর্ডে  
 প্রচার করেছেন শিল্পী রাজেন সরকার। শিল্পী সত্য চৌধুরী N 31283 রেকর্ডে যে আধুনিক গান দু’টি পরিবেশন করেছেন, তাই ব্যক্তির  
 দিক থেকে, রচনায় ও স্বরে তা নূতনত্বের দাবী করেতে পারে। আজকের বাংলার আত্মনাম মূর্ত হয়ে উঠেছে শিল্পীর কণ্ঠে। শিল্পী  
 পঙ্কজ মল্লিক ও উৎপলা সেনের P 11011 রেকর্ডে দু’খানি গান—স্বপ্নকালের গান দিয়ে চিরকালকে বাঁধবার সার্থক প্রকাশ। শিল্পী  
 কৃষ্ণদেব দে (অঙ্কগায়ক) N 31267 রেকর্ডে মধুর উদাত্ত কণ্ঠে বিশ্বজননীর জাগাবার আহ্বান জানিয়েছেন। শিল্পী কুমারী মুখিকা রায়  
 N 31281 রেকর্ডে যে আধুনিক গান দু’খানি উপহার দিয়েছেন—কণ্ঠমাধুরীময় তা অনবদ্য। শিল্পী শ্রীমতী কমলা (ঝরনা) N 31279  
 রেকর্ডে বৈষ্ণব সাহিত্যের দু’টি অমূল্য রত্ন—বিজ্ঞাপতি রচিত “কি কহবের সখি” ও জ্ঞানদাস রচিত “শুন শুনহে পরাণ পিয়া” কীর্তন দু’খানি  
 হুমিষ্ট কণ্ঠের দরদস্তার অভিব্যক্তি দিয়ে প্রকাশ করেছেন। শিল্পী হরলাগর জগন্ময় মিত্র N 31280 “বাসর” ও “সমাধি”—মিলন ও বিরহ,  
 জীবন ও মৃত্যু—দিয়ে রচা দু’খানি আধুনিক গানকে মধুরতম করে পরিবেশন করেছেন। শিল্পী বেচু দত্ত N 31282 রেকর্ডে তাঁর  
 উদাত্ত কণ্ঠের স্বংকারে দু’খানি আধুনিক গানকে রূপ দিয়েছেন। শিল্পী সন্তোষ সেনগুপ্ত N 31278 তাঁর মধুর কণ্ঠে “এই পার  
 ভাঙা” ও “জীবনে যে দীপ” গান দু’খানি দিয়ে এবারের শারদ-অর্থ্য সাজিয়েছেন। শিল্পী মীনা কাপুর N 31234 “তোমার চরণ পরণ ছন্দে”  
 আর “তুমি চলে যাবে জানি” মধুরা কণ্ঠের দরদী পরিবেশনে মধুরতম হয়ে উঠেছে এই আধুনিক দু’খানি গান। আমোদকানন রায়  
 N 31285-92 আটখানি রেকর্ডে স্ববি বহুমতিলয়ের ‘চলোবলী’ উপস্থাপনের রেকর্ড-নাটক রূপ প্রকাশ করেছেন। প্রেষ্ঠ শিল্পী সমন্বয়ে নাটকটি  
 উপভোগ্য হয়েছে।

## সম্পাদক—শ্রীকলীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম-এ







অগ্রহায়ণ-১৩৫৭

প্রথম খণ্ড

অষ্টত্রিংশ বর্ষ

ষষ্ঠ সংখ্যা

## স্বদেশী গানে রবীন্দ্রনাথ

অধ্যাপক শ্রীকালিদাস নাগ

১৯০৫ সালের বঙ্গ-ভঙ্গ ও ভৎপ্রসূত 'স্বদেশী আন্দোলন' শুধু বাঙালীদের কাছে নয়, সারা ভারতের মানুষদের কাছে এক চিরন্তন প্রেরণার উৎস হয়ে আছে। এ যুগে রবীন্দ্রনাথ শুধু কবি-সাহিত্যিক ন'ন তিনি একাধারে রাষ্ট্রনৈতিক নেতা, অর্থনৈতিক ও সমাজনৈতিক মন্ত্রণার; তাঁর "স্বদেশী-সমাজ" অপূর্ব মণিবা ও মৌলিকতায় ভরা ও বঙ্গ-ভঙ্গের আগেই ১৯০৪ সালে প্রকাশিত। সে প্রবন্ধটি আজও তন্ন তন্ন করে আমাদের পড়া উচিত, কারণ মহাত্মা গান্ধীর শেষ পঞ্চায়েৎ-তন্ত্রের পূর্বাভাস তার মধ্যে পাই; যেমন, অহিংস প্রতিরোধ বা Passive Resistance দক্ষিণ আফ্রিকায় জয়যুক্ত হবার আগেই ১৯০৮ সালে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন তাঁর "প্রারম্ভিক" নাটক (বৈশাখ ১৩১৩)—অত্যাচারী রাজা প্রতাপাদিত্যের বিরুদ্ধে ধনঞ্জয় বৈরাগীর দলের সত্যগ্রহ। গণদেবতার সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয় হয় রবীন্দ্রনাথের এই যুগেই। অগণ্য জনপ্রবাহ তাঁকে মাথায় করে গর্জ্জ উঠেছে, এগিয়ে চলেছে—এটি তাঁর সূখে শোনা গল নয়, আমাদের চোখে-দেখা ঘটনা। জনসাধারণের কঠে কঠে তখন তরঙ্গিত হয়ে উঠেছিল রবীন্দ্র-সঙ্গীত। তারও বিশ বছর আগে "রবিচ্ছার"র জাপা অঙ্গ কয়েকটি স্বদেশী গান ১৯০৫-৬ সালে যেন জাতীয়

সঙ্গীতে বজা ডাকিয়েছিল। রবীন্দ্রনাথের প্রায় সমবয়সী বিজ্ঞানলাল রায় থেকে অতুলপ্রসাদ, রজনীকান্ত প্রভৃতি তরুণ হর-শিল্পীদের অথোও ডালি ভরে উঠেছিল সে যুগে, যখন শ্রীঅরবিন্দ ও তাঁর দলের বিচারের মধ্যে বন্দীরা গেয়ে উঠত দেশমাতৃকার বন্দনা গান; উল্লাসকর দণ্ডিত হয়েই আদালতের মধ্যে গেয়ে উঠেছিল—

“সার্থক জনম আমার জন্মেছি এই দেশে  
সার্থক জনম মাগো তোমায় ভালবেসে।”

রবীন্দ্রনাথের জাতীয় সঙ্গীত কত কান্দীর আসামীদের প্রাণেও প্রেরণা জুগিয়েছিল সেকথা গবেষণা করে আমাদের জানতে হয়নি। বাংলার বৃক্ যেন হোমের আগুন জ্বলে উঠেছিল পঞ্চাশ বছর আগে (যেমন আজও অগ্নি, অর্ধ শতাব্দী পরে আর এক অগ্নিচ্ছের ফলে)।

১৯০০ সালে দেখি রবীন্দ্রনাথ 'কল্পনা' ও 'কণিকা' শেষ করে নূতন ছন্দে আত্মপ্রকাশ করছেন 'কথা ও কাহিনী'তে, 'নৈবেদ্য'র আত্মোৎসর্গে (১৯০১) ও নবপণ্ড্যায় বঙ্গদর্শনে ও প্রবাসীতে তাঁর অতুলনীর গল্প রচনায়: 'আত্মপঞ্জি', 'ভারতবর্ষ' চরিত্রপূজা, লোকসাহিত্য, কঠোরোপ, রাজা-

প্রজা, সমূহ স্বদেশ, শিক্ষা (জাতীয় শিক্ষা পরিবদ), তপোবন, ভারতবর্ষের ইতিহাসের ধারা—প্রভৃতি কত অমূল্য রচনা, সর্বোপরি স্বদেশী যুগের গভ্র মহাকাব্য গোরা (১৩১৪-১৬)—যেটি মাসের পর মাস প্রবাসী থেকে কাড়াকাড়ি করে আমরা পড়েছি।

বিশেষতঃ প্রথম দশকে যেন এক নূতন রবীন্দ্রনাথ নূতন বাণী নিয়েই আবির্ভূত হলেন। অথচ “ধনাদি অতীতের” সঙ্গেও তাঁর গভীর যোগ আছে সেটি এবার বোঝাতে চেষ্টা করব, কয়েক দশক পিছু হেঁটে গিয়ে। সেখানে কোথাও দেখা পাব তাঁর অনেক ভুলে-যাওয়া সহকর্মীদের, তাঁর মণাবী দানদের, এমন কি তাঁর পিতৃদেব দেবেন্দ্রনাথ ও তাঁর অন্তরঙ্গদের। অনেক রকম আলোড়ন ও পরিবর্তন স্বীকার করেও দেখব এক বিরাট অপরিবর্তনীয় অবদান বাংলার ও বাঙালী জাতির—যার ফল ভোগ করছে আজ সারা ভারত—হয়ত সারা এশিয়া।

‘তাই রবীন্দ্রনাথের কাব্য নাটকাদির ধারা ছেড়ে স্বদেশী ভাবধারাকে অনুসরণ করে যাবো ‘জাতীয় সঙ্গীত’ পর্ষ্যায়ের গানগুলিকেই প্রধান অবলম্বন করে। রবি-বাউলের আবির্ভাব আমাদের স্বদেশী গানের তথ্য রবীন্দ্র সঙ্গীতের বিবর্তনে কম রহস্য-ভরা ইতিহাস নয়।

রবীন্দ্রনাথের জন্ম বিচিত্রকীর্তি ‘ঠাকুর পরিবারে’; রবীন্দ্র-প্রতিভার ক্ষুরে ও গঠনে সেই পরিবারটির অবদান নিয়ে অনেক দিন ধরে অনেক কিছু লেখা হয়েছে; হয়ত একটু বেশী করেই লেখা হয়েছে বলে শিল্পী রবীন্দ্রনাথ নাকি তাঁর জীবনী-লেখককে অনুযোগ করেছিলেন যে সেটা যেন তাঁর জীবনীর চেয়ে ‘ঐনুল হারকানাথ ঠাকুরের পোস্তের জীবনী’ই বেশী মনে হয় (অন্ততঃ প্রথমদিকে!) ; হয়ত কবি রবীন্দ্রনাথ সাবধান করাতে চেয়েছিলেন শুধু কুলপঞ্জী আলোড়নের বিপক্ষে! তাঁর স্বরচিত ‘ছেলেবেলা’ ও ‘জীবনস্মৃতি’ আমাদের কাছে অমূল্য উপাদান; অথচ অল্প মালমশলা সংগ্রহের কাজেও নাস্ত হবে—কারণ অনেক তার নষ্ট হয়ে গেছে ও ধাঁজ যাবে; নূতন চোখ নিয়ে কাজে নাস্তে না পারলে নূতন উপাদান বেলাও কঠিন ব্যাপার।

তাঁর জন্ম, শৈশব ও কৈশোর কাল কেটেছে দেশের এক বিষম যুগ-সঙ্কটে (১৮৫৮-১৮৭৮); প্রথম জাতীয় যুদ্ধ (mutiny) শেষ হয়েছে রক্ত-বন্যায়; ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীকে উঠিয়ে ব্রিটিশ জাতি তার পার্লামেন্ট ও সাম্রাজ্ঞী লেখাপা মারকতে (Queen's Proclamation) শাসন শুরু করেছে। এত বড় বিপ্লব কেন ও কি ভাবে হয়ে পড়ল তা বুঝতে হলে রবীন্দ্রনাথের পিতা ও পিতামহের যুগ পর্য্যন্ত দৃষ্টিপাত করতে হয়; কারণ নূতন বাংলায় স্বাধীনতার আন্দোলন মানব-স্বাধীনতার ঐক্যবদ্ধ রামমোহন রায়ের চিন্তা ও কর্মধারার সঙ্গেও যুক্ত। প্রথম সিপাহী বিদ্রোহ উত্তর পশ্চিমে নয়, ব্যারাকপুরে (১৮২৪)—সেটা ভোলা চলে না। বাহোক ১৮৫০ থেকেই তুমুল তর্ক চলছিল যে ভারত থেকে কোম্পানীর রাজ্য ওঠা উচিত। সেই সময়েই আবার বেশি অনেকের সঙ্গে Karl Marx ব্রিটিশ শোষণ-নীতির কঠোর সমালোচনা

শুরু করে দিয়েছেন। এদিকে ১৮৫১ (সেপ্টেম্বর) দেশহিতাধী সভা (The National Association) স্থাপিত হল; মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর তার প্রথম সম্পাদক ও তাঁকে সাহায্য করতে এলেন এসমুদ্রার ঠাকুর প্রভৃতি এবং Kirkpatrick নামে স্ব ২ সাহেব। এখানেও রবীন্দ্র-পিতামহ হারকানাথের নীতির অনুসরণ; অর্থাৎ ইংরাজকে হটাতে হলে ইংরেজ-সহকর্মী নিতে হবে, যেমন George Thompsonকে বিলাত থেকে এনে রামগোপাল ঘোষ প্রভৃতি কর্মীদের হারকানাথ গড়ে তুলেছিলেন। ১৮৫৪ জানুয়ারী পর্য্যন্ত অর্থাৎ দু’বছরের উপর সম্পাদকের কাজ করে দেবেন্দ্রনাথ পদত্যাগ করেন ও রাজা প্রতাপ সিংহের ভ্রাতা ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ দেশহিতাধী সভার সম্পাদক হন। তার আগেই দেবেন্দ্রনাথের প্রচেষ্টায় মাস্ত্রাজে (এবং হয়ত অন্ততঃ) National Association-এর শাখা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং রাধাকান্ত দেব, এসমুদ্রার ঠাকুর প্রভৃতি এই সভার সঙ্গে British Indian Association-এর কাজের সংযোগ রেখে চলেছিলেন। এই সভা থেকে পার্লামেন্টে ভারত-শাসন সম্পর্কে এক স্মারকলিপি (memorial) পাঠান হয়, যার লিপিকার ছিলেন হয়ত হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (পরে Hindoo Patriot-এর স্বনামধন্য সম্পাদক)। হরিশচন্দ্র ও সখাদ প্রভাকর প্রতিষ্ঠাতা ঈশ্বরচন্দ্র ও তত্ত্বাবধিনী সভার সদস্য ও দেবেন্দ্রনাথের অন্তরঙ্গ সহকর্মী ছিলেন। ১৮৫৯খৃঃ দেখি দেবেন্দ্রনাথ কেশবচন্দ্র সেনকে নিয়ে ব্রাহ্ম সমাজের কাজে আত্মনিয়োগ করেছেন। রামমোহন ও হারকানাথের মত দেবেন্দ্রনাথও বিশ্বাস করতেন যে সর্বজনীন ধর্মের ভিত্তিতে মিলিত হলে ভারত-বাসীদের পক্ষে স্বাধীনতা অর্জন করা সুগম হবে এবং ঐক্য-মন্ত্রেই স্বাধীনতার সাধনা ভারতে কল্যাণকর হবে। তাই দেবেন্দ্রনাথ সে যুগে লিখেছিলেন:—“যদি বেদান্ত প্রতিপাদ্য ব্রাহ্মধর্ম প্রচার করিতে পারি, তবে সমুদায় ভারতবর্ষের ধর্ম এক হইবে, পরস্পর বিচ্ছিন্ন ভাব চলিয়া যাইবে, সকলে ভ্রাতৃত্বাবে মিলিত হইবে। তার পূর্ব্বকার বিক্রম ও শক্তি জাগ্রত হইবে এবং অবশেষে সে স্বাধীনতা লাভ করিবে ..” (“দেবেন্দ্রনাথের আত্মজীবনী”); এই মহান উদ্দেশ্য সাধন-কল্পে তিনি Indian Mirror (আগষ্ট ১৮৬১) ও পরে National Paper প্রতিষ্ঠিত করেন।

৩রা অক্টোবর ১৮৫৬—১৫ নভেম্বর ১৮৫৮ অর্থাৎ দু’বছর মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ হিমালয়ের নানা স্থানে ধ্যানধারণার কাটিয়েছিলেন। সে যুগে তাঁর ব্রহ্মসাধনার সঙ্গে স্বাধীনতার সাধনাও মিলেছিল বলেই তাঁর পরিবারে—বিশেষ তাঁর শুণী পুত্র দ্বিজেন্দ্রনাথ (১৮৪০-১৯২৬), সত্যেন্দ্রনাথ (১৮৪২-১৯২৩), জ্যোতিরিন্দ্রনাথ (১৮৪৯-১৯২৩) ও কল্পা স্বর্গকুমারী (১৮৫৫-১৯৩২), প্রভৃতির প্রাণ ও রচনায় সেই উদার বাদনৈতিকতার গভীর পরিচয় পাই। এঁদের রচিত বহু গানে দেখি অধ্যাত্ম অমৃতত্বের সঙ্গে মিশে আছে স্বাধীনতার প্রবল আবেগ এবং দুইএর চরম সমন্বয় ও পরাকাষ্ঠা মিলবে রবীন্দ্রনাথের ব্রহ্ম সঙ্গীত ও স্বদেশী গানে।

মিউটিনের বছরেই দেখি “স্বাধীনতা হীনতার কে বাচিতে

চায় রে” গানের রচয়িতা রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের (১২০৪-৯৪) “পদ্মিনী” প্রকাশিত হ’ল। Col. Todd-এর রাজপুত কাহিনী থেকে এক নতুন ভাবস্রোত বাংলা সাহিত্যে প্রবেশ করতে শুরু হ’ল। রঙ্গলালের ‘কর্ণদেবী’ ও মধুসূদনের ‘কৃষ্ণকুমারী’ নাটক থেকে জ্যোতিরিন্দ্রের ‘সরোজিনী’ ও তাতে রবীন্দ্রনাথের ‘জলজল চিতা’ গানটি সেকালের লোকদের মনে কী উদ্দীপনা এনেছিল আমরা হয়ত খাগ্র বুঝতে পারব না। সংগ্রাম করে রক্তদানে স্বাধীনতা অর্জন করতে হবে—এ শিক্ষা সেন শিশু রবীন্দ্রনাথ সহজ আবহাওয়া থেকেই পেয়েছিলেন। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার যুগ ও তার প্রবন্ধগুলি নিয়ে আরো মৌলিক আলোচনা দরকার; রায়-প্রজাদের শুধু স্বাধীনতা কাড়া নয়—তাদের চাপের ভ্রমি ও পেটের ভাত পর্যন্ত লুট করার ফলে দেশের অবস্থা কী শোচনীয় হয়েছিল তার বর্ণনা তত্ত্ববোধিনীর লেখাতে প্রথম পাই—ও পরে সম্ভ্রবচন্দ্র ও বঙ্কিমচন্দ্র তাঁদের বঙ্গবর্ননে বাংলা দেশের কৃৎক প্রবন্ধে চাপেন। ইতিমধ্যে দীনবন্ধুর নীলদর্পণ ও মধুসূদনকৃত তার ইংরেজী অনুবাদ এবং সঙ্গে সঙ্গে Rev Long-সাহেবের জেন—এই সব ঐতিহাসিক ঘটনা বাঙ্গালীর জীবন ও সাহিত্যকে সৌখিনতার অভিগামে মূক্ত করে বিশ্বের দরবারে পাকা আসন দিতে চলেছে রবীন্দ্রনাথের পৈশবে। ১৮৭৫৭৭ সালের তাঁর প্রথম প্রকাশিত দুটি কবিতাই—‘হিন্দুমেলার উপহার’ ও Lytton দরবার-কাব্য হেমচন্দ্রের ভারত সঙ্গীত (১৮৭০) প্রভাবাধিত। হেমচন্দ্রনাথ, রাজনারায়ণ বহু ও নবগোপাল মিত্রের উৎসাহে এই হিন্দুমেলা (১৮৬৭) সে যুগের শ্রেষ্ঠ জাতীয় প্রতিষ্ঠান হয়ে উঠেছিল; সেকালের দীপ্ত বর্ণনা দোভাগ্যক্রমে লিপিবদ্ধ করেছেন রবীন্দ্রনাথ ও জ্যোতিরিন্দ্রের সহপাঠী কবিবর নবীনচন্দ্র সেন (১৮৪৭-১৯০২); ইনি এডুকেশন গেজেটে (১৮৬৬-৬৭) বঙ্গদেশী কবিতা লিখতে শুরু করেন: হেমবাবুর ভারতসঙ্গীত অবার (নবীন সেন) বঙ্গদেশ প্রেমব্যঞ্জক বহু কবিতা প্রকাশের পর প্রকাশিত হয়। তাঁর পলাশির যুদ্ধ (১৮৭৭) তরুণদের মনে খুব নাড়া দিয়েছিল। নবীনচন্দ্র ‘আমার জীবনে’ দু’একটা নিখুঁত ছবি এঁকে গেছেন রবীন্দ্রনাথের—১০ বছরের বালক কিন্তু দেখতে যেন ১৮।১৯—“বৃক্কতলায় যেন একটি পূর্ণ-মূর্ত্তি স্থাপিত হইয়াছে...তিনি পকেট হইতে একটি নোটবুক বাহির করিয়া কয়েকটি গীত গাহিলেন ও কয়েকটি কবিতা গীত-কণ্ঠে পাঠ করিলেন। মধুর কামিনী-লাঞ্ছন কণ্ঠে এবং কবিতার মাধুর্য্যে ও ক্ষুটোগ্রন্থ প্রতিভায় আমি মুগ্ধ হইলাম...অক্ষরচন্দ্র সরকার মহাশয়কে বলিলাম যে আমি নেসানাল মেলায় গিয়া একটি অপূর্ণ নবযুবকের গীত ও কবিতা শুনিয়াছি এবং আমার বিশ্বাস হইয়াছে যে তিনি একদিন একজন প্রতিভাসম্পন্ন কবি ও গায়ক হইবেন।” আবার ১৮৯০ সালে রাণাঘাটে দেখা: “কুষ্টিয়া ঘাইবার পথে একদিন প্রাতে নিমন্ত্রিত হইয়া ১০টার ট্রেনে দয়া করিয়া রাণাঘাটে আমার সঙ্গে সাক্ষাত করিতে আসিয়াছিলেন...সেই (১৮৭৬) নবযুবকের আজ পরিণত যৌবন। কি শান্ত, কি স্থান্য, কি প্রতিভাযুক্ত দীর্ঘাবয়ব! উজ্জল গৌরবর্ণ; ক্ষুটোগ্রন্থ পদ্ম-কোরকের মত দীর্ঘ মুখ। মস্তকে মধ্যভাগ-বিভক্ত

কৃষ্ণ ও সজ্জিত ব্রহ্মরুক্ম কেশশোভা, অলকা শ্রেণীতে সজ্জিত সুবর্ণ-দর্পণোজ্জল ললাট। ব্রহ্মরুক্ম শুষ্ক ও খর্ব্ব আশ্র শোভাযুক্ত মুগমণ্ডল। কৃষ্ণ পদ্মবৃক্ক দীর্ঘ ও সূক্ষ্ম চক্ষু, স্থান্য নাসিকার মার্জিত সুবর্ণের চণমা...মুখাবয়ব দেখিলে চিত্রিত খুঁটের মুগ মনে পড়ে। পরিধানে সাদা ধূতি, সাদা রেশমী পিরাণ ও রেশমী চাদর, চরণে কোমল পাত্রিকা...আমি তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিয়া গৃহে আনিলাম। আমার তখন বিজ্ঞাপতি ও চণ্ডীদাসের মিননের কবিতাটি মনে পড়িল, “দুহু উৎকর্ষিত ভেল”।

দেশপ্রীতির উদ্ভাবনা তখন দেশে কোথাও নেই। রঙ্গলালের “স্বাধীনতা-ভীততার কে বাঁচিতে চায় রে” আর তারপরে হেমচন্দ্রের “বিশ্বিত কোটি মানবের বাস” কবিতায় দেশমুক্তি-কামনার স্বর ভোরের পাপির কাকলির মত শোনা যায়। হিন্দুমেলার পরামর্শ ও আয়োজনে আমাদের বাড়ির সম্মুখে তখন উৎসাহিত, তার প্রধান কর্মকর্তা ছিলেন নবগোপাল মিত্র। এই মেলার গান ছিল মেজদীদার লেখা “জয় ভারতের জয়”, গণদাদার লেখা “লজ্জায় ভারত বশ গাইব কি করে”, বড়দাদার “মলিন মুখচন্দ্রা ভারত তোমারি।” জ্যোতিদাদা এক গুপ্ত সভা স্থাপন করেছেন একটি পোড়ো বাড়িতে—তার অধিবেশন, ঋগ্বেদের পুঁথি, মড়ার মাথার খুলি আর পেলা তলোয়ার নিয়ে তার অনুষ্ঠান, রাজনারায়ণ বহু তার পুরোহিত; সেখানে আমরা ভারত উদ্ধারের দীক্ষা পেলেম।

এই সকল আকাজ্জা উৎসাহ উত্তোষের কিছুই ঠৈনাঠেলি ভিড়ের মধ্যে নয়। শান্ত অবকাশের ভিতর দিয়ে ধীরে ধীরে এর প্রভাব আমাদের অন্তরে প্রবেশ করেছিল। রাজসরকারের কোতোয়াল, হয় তখন সহকর্মী ছিল না, নয় উদাসীন ছিল, তারা সভার সভ্যদের মাথার খুলি ভঙ্গ বা রসভঙ্গ করতে আসে নি।

“আমরা তখন তাঁহাকে একটি গান গাইতে অনুরোধ করিয়া হারমনি-ফ্রুট তাঁহার সামনে দিলাম—তিনি একটি পদ্য কিছুক্ষণ টিপিয়া ফ্রুটি মাত্র স্থির করিয়া যন্ত্র ছাড়িলেন; তাঁহার পর একটি নতুন কীর্তন গান গাহিতে লাগিলেন:—

“এস এস ফিরে এস!

বঁধু হে ফিরে এস

আমার ক্ষুধিত তৃষিত তাপিত চিত

নাথ হে! ফিরে এস”

“আমার মনে হইতে লাগিল...বংশীবিন্দিত মধুর কণ্ঠ এইবার গৃহ পূর্ণ করিয়া ছাদ ভিন্ন করিয়া আকাশ সুরিত করিতেছে। আবার যেন শিশুর কোমল অক্ষুট কণ্ঠের মত কর্ণে কোমল মধুর স্পর্শের মত অনুভূত হইতেছে। কি মধুর মুখভঙ্গী। গানের ভাবের সঙ্গে সঙ্গে যেন মুখ ও চক্ষু অভিনয় করিতেছে। গানের করুণ ভক্তিরস যেন তাঁহার অধর হইতে গোমুখী-নিঃসৃত জাহবীর পবিত্র ধারার মত প্রবাহিত হইতেছে। আমি তখন রৈবতক ও কুরুক্ষেত্রের কৃষ্ণপ্রসে বিভোর। গীত শুনিতে শুনিতে

মামি আত্মহারা হইলাম। আমার কঠোর হৃদয়ও গলিল। গানের পর ঠাঁহার কয়েকটি কবিতার আবৃত্তি করিলেন। রবিবাবু একাধারে কবি ও অভিনেতা; ঠাঁহার আবৃত্তির তুলনা নাই.....।”

১৮৭২ সালে যে রবীন্দ্রনাথ দীনবন্ধুর ‘জামাই বারিক’ লুকিয়ে পড়ছেন এবং বঙ্কিমের বঙ্গদর্শন ও অক্ষয় সরকারের ‘প্রাচীন কাব্য-সংগ্রহ’ নিয়ে মেতে আছেন তিনি ১৮৭৬ ও ১৮৯৩ সালে কবির নবীন সেনের চোখে কেমন প্রতিভাভা হয়েছিলেন তার আভাষ পাওয়া গেল। ‘সোনার তরী’র কবি তাঁর কায়মি আসন পেয়েছেন সেটি দেখে গেছেন ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র (মৃত্যু ১৮৯৪) — যিনি ১৮৮০-৮১ সালেই ভবিষ্যৎবাণী করেছিলেন রবীন্দ্রনাথের অমরত্বের। রবীন্দ্রনাথের গান অনেকেই শুনেছেন সেকালে; কিন্তু নবীন সেনের মতন দরদী ভাষায় প্রকাশ করে যেতে পারেননি তাঁদের অনুভূতি।

‘রবীন্দ্রনাথের জাতীয় সঙ্গীতের বিকাশধারা এবার অনুসরণ করা যাক। তাঁর সব চেয়ে কাঁচা কাব্য রচনা ১৩-১৮ বছর বয়সের—কবিতা—যাকে তিনি নিজে নাম দিয়েছেন “শৈশব সঙ্গীত”। সে সময়ে খাঁটি জাতীয় গান হয়ত কিছু লিখেছিলেন—রক্ষা পেয়েছে মাত্র দুটি; (১) জ্যোতিরিন্দ্রনাথের পুত্র বিক্রম নাটকের মধ্যে—খাখাজ—একতালা—( দ্বিতীয় সংস্করণে মুদ্রিত ১৮৭৪-৭৯ )

‘একহুত্রে বীথিয়াছি সহস্রটি মন  
এক কার্ণে সঁপিরাছি সহস্র জীবন’

(২) বিলাতযাত্রার ঠিক পূর্বে (মাইকেলী রীতিতে ?) জয় জয়ন্তী রাগিনীতে :

“তোমারি তরে সঁপিহু দেহ  
তোমারি তরে মা সঁপিহু প্রাণ  
তোমারি তরে এ আঁখি বরষিবে  
এ বীণা তোমারি গাহিবে গান ॥”

এই গান গেয়ে কিশোর-কবি রবীন্দ্রনাথ বিলাত যাত্রা করেন। এ গানের ভাবে ও হৃদে আমরা তাঁর দাদাদের স্বদেশী গানের অনুকরণ যেন স্পষ্ট শুনি। মধুসূদন, ব্যারিষ্টার মনোমোহন ঘোষ ও সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন ও মাইকেল জোড়াসাঁকোর দেবেল্ল-ভবনে সমাদৃত অতিথি হয়ে বহুদিন দেখা দিয়েছিলেন তার কথা জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতিতে আমরা পাই।

১৮৬৭ সালে হিন্দু মেলা প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে দেখি কবি বিজ্ঞেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর প্রসিদ্ধ স্বদেশী গান রচনা করেছেন :

“মলিন মুখ-চন্দ্রমা ভারত তোমারি  
দিবা রাত্রি ঝরিছে-লোচন বারি”

এ গান হিন্দু মেলায় যেমন পাওয়া হত তেমনি মাইকেলের মেঘনাব—যখন নাট্যরূপ পেল—তাঁর অভিনয়ের আগে ‘মলিন মুখচন্দ্রমা’ কখনও নাট্যরূপে সজ্ঞান তিলক-কায়াসাজ করে গাঁড়ায় হয়েছে। ১৮৬৮ হিন্দু

মেলায় দ্বিতীয় অধিবেশনে দেখি মেজদাদা সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর উপহার দিলেন সে যুগের শ্রেষ্ঠ স্বদেশী গান—খাখাজ-আড়াঠেকায় :

‘মিলে সবে ভারত সন্তান  
এক তান মন প্রাণ,  
গাও ভারতের যশোগান,

—এ গান হাজার হাজার মানুষের প্রাণে কী উদ্দীপনা জাগিয়েছিল তার পরিচয় পাই অমর বঙ্কিমচন্দ্রের মন্তব্যে : “এই মহাগীত ভারতের সর্বত্র গীত হউক। হিমালয়-কন্মরে প্রতিধ্বনিত হউক। গঙ্গা যমুনা সিন্ধু নর্মদা গোদাবরী তটে বৃক্ষে বৃক্ষে মর্ম্মরিত হউক ! পূর্ব-পশ্চিম সাগরের গভীর গর্জনে মল্লীভূত হউক ! এই বিংশতি কোটি ভারতবাসীর হৃদয় যন্ত্র ইহার সঙ্গে বাজিতে থাকুক”। ( বঙ্গদর্শন—চৈত্র, ১২৭৯ )।

সেই বঙ্কিমচন্দ্রই ক্রমশ বঙ্গদর্শনে কমলাকান্তের মাতৃবন্দনা রচনা করে শেষে ‘বন্দেমাতরম’ ও ‘আনন্দমঠের’ ঋষি বঙ্কিমরূপে সারা জাতিকে এক নতুন দীক্ষা দিয়েছিলেন; তার আগে কবি নবীনচন্দ্র ও হেমচন্দ্র এডুকেশন গেজেটে স্বদেশী গান ছাপতেন, যার মধ্যে ১৮৭০ সালের সর্বজন-বিদিত “ভারত সঙ্গীত” ( প্রাণ ১২৭৭ )—গানে না হোক আবৃত্তিতে—দীর্ঘ স্থান অধিকার করেছিল। রবীন্দ্রনাথ তখন ৯।১০ বছরের বালক মাত্র, তবু তাঁর কাব্য-গীতির আদি পূর্বে এই ভারত-সঙ্গীতের প্রভাব স্পষ্ট—বিশেষ তাঁর হিন্দু মেলায় কবিতায়। আরো কত ভুলে যাওয়া স্বদেশী গান যে রবীন্দ্রনাথকে অনুপ্রাণিত করেছিল তাঁর নিদর্শন পাই হিন্দু মেলা সম্পাদক গণেন্দ্রনাথ ঠাকুর ( ১৮৪১-৬৯ ) রচিত গানের মধ্যে ( বাহার—৫৭ )

“লজ্জায় ভারত গণ গাইব কি করে  
লুটিতেছে পরে এই রত্নের আকরে  
আমরা সকলে হেথা হেলা করি নিজ মাতা  
মায়ের কোলের ধন নিয়ে যায় পরে ॥

১৮৭৫-৭৬ সালের রাজনৈতিক ইতিহাস ; জাতীয়-মহাসভার জন্মের ঠিক দশ বছর আগেকার কথা। বঙ্গদর্শনের প্রথম পর্ব শেষ হয়েছে ও ভারতীয় আবির্ভাবের প্রস্তুতি-পর্ব। ঠিক এই সময়ে অতি ক্ষুদ্র আকারে এক-খানি বই ছাপা হয়েছিল যেটি অনেকের কাছে অজানা—অথচ সেটি যেন সে যুগের জাতীয় ভাবের প্রতীক : ( হবহ নকল করে নিলাম )—

“জাতীয় সঙ্গীত”—( প্রথম ভাগ ) স্বদেশাশুরাগোদ্দীপক সঙ্গীত-মালা। মূল্য ৮০ আনা ( উটে-পাতায় ) National Song Book Part I Printed by G. P. Roy & Co. 21 Bowbazar Street ( 1876 ). etc ; লেখক বা সম্পাদকের নাম না-ছাপা যে ইচ্ছাকৃত তা স্পষ্ট বোঝা যায় ; “বিজ্ঞাপন”টি উদ্ধৃত করি :—

এই “জাতীয়-সঙ্গীত” প্রচারের উদ্দেশ্য সহজেই বুঝা যাইবে।..... অনেকে এই সংগ্রহে সাহায্য করিয়াছেন ও অজ্ঞাত ঠাঁহার সংগ্রাহকের ( ! )



কৃতজ্ঞতার পাত্র। যদি এই গ্রন্থকারী অন্তত এক ব্যক্তিরও বশেষাশ্রয় উপদ্রষ্ট হইয়া সংগ্রাহক কৃতার্থ হইবেন এবং সামাজিক ও বিদ্যুৎ প্রণয়-বটিক সঙ্গীত সকল সংগ্রহ করিয়া “জাতীয়-সঙ্গীতের” অপর ভাগ প্রকাশ করিবেন। এই গ্রন্থ বিক্রয় দ্বারা কিছু লাভ হইলে তাহা কোন প্রকার জাতীয় উন্নতির নিমিত্ত ব্যয় হইবে। কলিকাতা ৬ই ফাল্গুন ১২৮২”।

“জাতীয় সঙ্গীত” বইখানিতে ১৮৭৬ সালে দেখছি অনেক পুরাতন সমগ্রা ও ভাবের সমাবেশ, নীলকরদের অত্যাচার : “নীল বানরে সোনার বাংলা” ও ‘হে নিরদয় নীলকর, গান ছুটি নীলদর্পণ নাটক থেকে স্থান পেয়েছে। তার সঙ্গে ‘মলিন মুখ চল্লিশা,। ‘মিলে সবে ভারত সন্তান’, লক্ষ্য ভারত বশ ইত্যাদি রবীন্দ্রনাথের দাদাদের গান ; হেমচন্দ্রের ‘বান্ধবের শিলা’ ( হয়ত শুধু আবৃত্তি নয় গাওয়া হত ) ‘প্রাণ কাঁদে বলিতে ভারতের বিবরণ’ প্রভৃতি হিন্দু মেলায় গীত “টি গান, ( হয় তাল নির্দেশ সম্বন্ধ ) ; গোবিন্দচন্দ্র রায়ের ‘কতকাল পরে’ ও ‘নির্মল সলিলে বহিছ সদা’ গান দুটি। তাছাড়া দেখি দ্বারিকানাথ গাঙ্গুলীর ‘না জাগিলে সব ভারত লগনা’ ও অপ্রকাশিত পর্ধ্যায়ে চারটি গান :

আছ সপ্ত শত বর্ষ নিজাগত

এখনও জাগো জাগো মা ভারত’ ইত্যাদি।

‘নীলদর্পণ’ নাটক ছাড়া আরো কিছু নাটকের ভিতর দিয়ে স্বদেশীভাব প্রচারিত হয়, তা’রও প্রমাণ পেশাম ‘ভারত মাতা, ‘ভারতে যবন’ ‘বীর-নারী’ ‘স্বরেন্দ্র বিনোদিনী’ ইত্যাদি নাটকের ভিতরকার গানগুলির উদ্ধৃতি থেকে। সব চেয়ে বিষয় লাগল আমার—যখন দেখলাম জ্যোতিরিন্দ্র-রচিত ‘সরোজিনী’ নাটকায় বালক রবীন্দ্রনাথের সংযোজিত গানের কয়েকটা কলি এই ‘জাতীয় সঙ্গীত’ পুস্তিকায় ( রাগিনী অহং একতারা ) তার উপর চাপ্রনী যথা ‘ইংরাজী স্বরে গান করিতে হয় :—

জাপ্ররে জগৎ মেলিয়ে নয়ন  
জাপ্ররে চল্লিশা জাপ্ররে গগন  
স্বর্গ হতে সব জাপ্র দেবগণ  
জলদ অক্ষরে রাখ গো লিখে।  
স্মৃতি যবন তোরাত দেখ্র  
সত্য রতন করিতে রক্ষণ  
রাজপুত সত্য আঞ্জিকে কেশম  
সঁপিছে পরাণ অনল লিখে ॥

এই অংশটি দিয়ে গান শুরু করে সম্পাদক অস্থায়ীতে কিরছেন :—

‘অল অল চিতা বিগুন বিগুন  
পরান সঁপিতে বিধবা বালা’ ইত্যাদি

৩০শে নভেম্বর ১৮৭৫ তারিখে ‘সরোজিনী’ প্রকাশিত হয় এবং তার মধ্যে ১৪ বছর বয়সের রবীন্দ্র-রচনা এই গানটি ১৮৭৬ সালের ‘জাতীয়

সঙ্গীতে’ সগৌরবে স্থান পেয়েছিল—এটি অরণীয় ঘটনা সন্দেহ নেই। তারও প্রায় দুবছর আগে পুষ্ক বিক্রম ( ১৮৭৪ ) নাটকে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ১৩ বছরের বালক কবি রবীন্দ্রনাথের গান ‘এক স্ত্রী নৈখিয়াছি’ গানটি জুড়ে দিয়েছিলেন।

১৮৮৫ সালে রবীন্দ্রনাথ তাঁর বন্ধু যোগেন্দ্রনাথ মিত্রের\* সাহচর্যে রবিচ্ছায়া নামক প্রথম গীত-সংকলিত প্রকাশ করেন ; তখন দেখি ৭৮টি মাত্র গান জাতীয় সঙ্গীত বলে চাপ্রা হইয়াছিল ; তা’র মধ্যে একটি গান আজও শোনা যায়—( রাগিনী প্রভাতী একতারা )

“একি অন্ধকার এ ভারত ভূমি  
বৃষ্টি পিতা তারে ছেড়ে গেছে ভূমি  
প্রতি পলে পলে ডুবে রসাতলে  
কে তারে উদ্ধার করিবে।”

কংগ্রেসের জন্ম-বৎসরে এগানের সার্থকতা আছে। এবপর রবীন্দ্রনাথ কতকগুলি স্বদেশী গান লেখেন, তার বৈজীত ভাগই আমরা ভুলেছি বলে অপরাধ মনে হয়। তার মধ্যে তাল ও রাগের নির্দেশ দিয়ে বেরিয়েছিল ; (১) দেশে দেশে ভ্রমি তব দুখ গান গাহিয়ে ( বাহার কাওয়ালি ) (২) কেন চেয়ে আছ গো মা ( কাফি ) (৩) আমার বোলোনা গাহিতে বোলোনা ( সিন্ধু ) (৪) আনন্দধনি জাগাও ( হাথির কেরতা )।

১২১১ ( ১৮৮৪ ) সালে ব্রহ্মোপাসনার জন্ম কবি (তখন তিনি আদি ব্রাহ্ম সমাজের সম্পাদক) লেখেন “শোন শোন আমাদের বাধা” ( মিশ্র দেশ-খাখাজ ঝাপতাল ) এবং ‘একবার তোর মা বলিয়া ডাক’ ( ঝিঝিটি ) দ্বিতীয় গানটি ১২১২ ( ১৮৮৫ ) সালে রচনা করেন, জাতীয় সঙ্গীত বলেও গাওয়া হত ; যেমন ‘জন-গণ-মন’ জাতীয় সঙ্গীতও ব্রহ্ম-সঙ্গীত বলে ১২১১ মাঘোৎসবে গাইতে শুনেছি। ১২১৩ ( ১৮৮৬ ) সালে দাদাভাই নৌরজীর নেতৃত্বে কংগ্রেসের দ্বিতীয় অধিবেশন কলকাতায় ; তার প্রথম সাড়া পাই মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সহস্রাধিক টাকা কংগ্রেস ফণ্ডে দেন—তা’ছাড়া রবীন্দ্রনাথ রচনা করেন অথুনা স্থপরিজ্ঞাত কয়েকটি জাতীয় সঙ্গীতে (১) আমরা মিলেছি আজ মায়ের ডাকে (২) আগে চল আগে চল ভাই ( বেহাগ ) ; (৩) তবু পারিনে সঁপিতে প্রাণ ( সিন্ধু ছাত্র সম্মেলনে কবি গেয়েছিলেন ) ১২১৫ ( ১৮৮৭ )। ‘আমরা মিলেছি আজ মায়ের ডাকে’ কবি নিজের ( রামপ্রসাদী স্বরে ) গেয়ে কংগ্রেস মহাসভাকে ও সাধারণ শ্রোতাদের মাতিয়ে তুলেছিলেন ; এ গান আবার ১২০৫ সালে আমাদের প্রাণে কত বড় প্রেরণা জাগিয়েছিল তা স্বদেশী যুগের লোকেরা সবাই জানেন ! ১২১২-১৩ সালেই ( ১৮৮৪-৮৬ ) আবার দেখি রবীন্দ্রনাথ মন দিয়েছেন বঙ্কিমচন্দ্রের ‘বন্দে-মাতরম্’ গানে ; সেটি নিয়ে আমি “পূর্ণিমা” পত্রিকায় আলোচনা করেছি।

বঙ্কিমচন্দ্র প্রথমে মন্নার কাওয়ালীতে গানটি নাকি গাইতেন বা গাওয়াতেন ; রবীন্দ্রনাথ হয় বদলে দেশ রাগে বন্দে মাতরম্ ( প্রথম

\* ইনি সঙ্গীতবী পত্রিকায় ( ২৭শে বৈশাখ—১২১২ ) ‘আমরা কেন অন্ধ পাইবনা’ শীর্ষক প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন।

যেটুকু এখনও কংগ্রেসে গাওয়া হয়) গেয়ে বঙ্কিমচন্দ্রকে শুনিয়েছিলেন (১৮৯৪ সালে তাঁর মৃত্যুর পূর্বে অবস্থা); তাঁর নিজের দেওয়া স্বরেই রবীন্দ্রনাথ ‘বন্দেমাতরম’ শোনান কবি নবীন সেনকে ১৮৯৩ সালে, তিনি “আমার জীবনে” নিজেই সাক্ষ্য দিয়ে গেছেন। ১৮৯১ দেখা দিল রবীন্দ্রনাথের পত্রিকা “সাধনা”; (১৮৯৩) সালে রবীন্দ্রনাথ ‘ইংরেজ ও ভারতবাদী’ প্রবন্ধ পড়েন বঙ্কিমচন্দ্রের সভাপতিত্বে। রবীন্দ্রনাথের দেওয়া দেশ রাগেই বন্দেমাতরমের প্রচার সারা দেশে হয়েছিল এবং ১৯০৩ (১৮৯৬) সালে রবীন্দ্রনাথ কলিকাতা কংগ্রেসে একক কণ্ঠে মুসলমান সভাপতি রহমতুল্লাহর সামনে “বন্দেমাতরম” শুনিয়ে সেই বিপুল জনতাকে মাতিয়েছিলেন। সেই দিনেই তাঁর গদ্যকবিতা-লিখিত কণ্ঠস্বরের উপর অত্যধিক চাপে খুব ক্ষতি হয়েছিল সে কথা কবির মূখে শুনেছি। সেই ১৯০৩ (১৮৯৬) সালেই কবি চিত্রা ও চৈতালী পর্বান্ত সব রচনা দিয়ে ‘গ্রন্থাবলী’ প্রথম প্রকাশ করেন। ১৮৭৪ সালে প্রকাশিত দাদা জ্যোতিরিন্দ্রনাথের পুরুষিক্রমে প্রথম স্বদেশীগান “এক স্ত্রীে বীধিযাছি সহস্রটি মন” ছাপা হয় এবং ২২ বছর পরে ১৮৯৬ (১৯০৩) সালে তাঁর নিজের স্বদেশী গানের সঙ্গে বঙ্কিমের বন্দেমাতরম কংগ্রেসে গাইয়েছেন—এ রবীন্দ্রনাথকে নতুন করে আজ বুঝতে খোঁটা করা উচিত। ১৮৯৮ কবি লিখেছেন “কণ্ঠ রোধ” ও সঙ্গে সঙ্গে তর্জনে।

১৯০০-১ সালে দেখি পূর্ববঙ্গে তাঁদের জমিদারী পরিদর্শনের কাজ থেকে সরে কার্জনী রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে ব্রহ্মচর্যাশ্রম গড়ে তুলতে লেগেছেন। ‘কল্পনা ও কণিকা’ শেষ করে নামছেন ‘কথা ও কাহিনী’ এবং ‘নৈবেদ্য’ রচনায়; ও সেই সঙ্গে নব পর্যায় বঙ্গদর্শনের সম্পাদনা। ১৯০১ নৈবেদ্য প্রকাশ ও কলিকাতা কংগ্রেসে গান্ধিজীর প্রথম আবির্ভাব। ১৯০২ (অগ্রহায়ণ) পত্নী বিয়োগের পর রবীন্দ্রনাথ যেন ত্যাগ ও আত্মোৎসর্গের অলস্ত মূর্তি। তাঁর সঙ্গে এসে নিলেছিলেন ব্রহ্মবাক্য উপাধ্যায়—যিনি তাঁর “Sophia” পত্রিকায় সেকালের রবীন্দ্রনাথকে “বিশ্বকবি” বলে অভিহিত করেছিলেন ও পরে “অগ্নিযুগে”র সন্ধ্যা পত্রিকা সম্পাদন করে অমরত্ব লাভ করে গেছেন। কার্জনের “বঙ্গ-ভঙ্গ” চক্রান্ত (১৯১২) ও রবীন্দ্রনাথের অপূর্ণ নেতৃত্ব সব আজ হুমুস্ট ইতিহাস। তাঁর মধ্যে দেখি ১৯০৩ সালে কবিবন্ধু মোহিতচন্দ্র সেন নয় ভাগে তাঁর “কাব্যগ্রন্থ” ছাপানেন এবং সেই সময়কার বহু গজ রচনা হিতবাহীর উপহাররূপে প্রকাশিত হল (১৯০৪)। ‘সঙ্কল’ ‘স্বদেশ’ ও ‘গান’ সে যুগে হাতে হাতে ঘরে ঘরে স্বদেশিকতা প্রচার করেছে। সেপ্টেম্বর ১৯০৫ দেখি রবীন্দ্রনাথ ‘স্বদেশ’ কবিতা ও বাউল (গান) প্রকাশ করে সারাদেশকে এমন মাতিয়েছেন যে প্রবীণ অধ্যাপক রামেন্দ্রচন্দ্র ত্রিবেদী বলেছিলেন: ‘এবার মরা গাঙে বান এসেছে’ গানটি শুনিয়া তরী ভাঙাইব কি, গঙ্গাগর্ভে ঝাঁপাইয়া পড়িতে অনেকের প্রবৃত্তি হইয়াছে’। ১৯০৪ সালে রমেশচন্দ্র দত্তের সভাপতিত্বে কবি তাঁর “স্বদেশী সমাজ” প্রবন্ধ পাঠ করেন—সে যেন স্বদেশীযুগের “বোধন”। ১৯০৫ (১৯১২) সালের মধ্যে বহু অমূল্য

জাতীয় সঙ্গীত রবীন্দ্রনাথ দেশবাসীকে উপহার দিয়েছেন, যা সমগ্রজাতি চিরদিন সকৃতজ্ঞ হৃদয়ে স্মরণ করবে। ১৯০৫ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ৮৮ বৎসর বয়সে স্বর্গারোহণ করেন এবং ঐক্য মন্ত্রের সেই একনিষ্ঠ সাধক পিতাকে স্মরণ করে রবীন্দ্রনাথ “কোন আলোতে প্রাণের প্রদীপ জালিয়ে” গানটি যে রচনা করেন সে গান মৃত্যুবরণকারী অনেক দেশ-সেবকদের প্রাণে প্রেরণা জুগিয়েছিল। দেবেন্দ্রনাথের (৬ মাঘ ১৯১৫) বার্ষিক স্মৃতি-সভায় ঐ গান দীনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মূখে শুনেছি ও দ্বিজেন্দ্রনাথ সত্যেন্দ্রনাথের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ উপাসনার পর ব্রহ্ম সঙ্গীত গাইয়েছেন ও জ্যোতিরিন্দ্রনাথ জোড়াসাঁকোর বাড়ীতে অর্গান বাজাচ্ছেন, প্রথম দেখে মনে হয়েছিল কোন যুগের মানুষ এঁরা, কত বড় জাতীয় ইতিহাসের শুভ রূপে আমাদের সামনে দাঁড়িয়েছেন। ১৯০৬ সালের কলিকাতা কংগ্রেসে দাদাভাই নৌরজীর সভাপতিত্বে বাংলার বুক থেকে উঠল প্রথম জীবন্ত বাণী “স্বরাজ”—আমাদের জন্মগত অধিকার। শিবাজী উৎসবের কবির পাশে তখন দাঁড়িয়েছেন হুদেন্দ্রনাথ, আনন্দমোহন, বালগঙ্গাধর তিলক, লালা লালপৎ রায়, বিপিনচন্দ্র পাল ও শ্রীঅরবিন্দ।\* সঙ্কট থেকে মঞ্চটে নিয়ে যাওয়ার নেতৃত্ব সেকালে রবীন্দ্রনাথ নিয়েছিলেন—তাঁর থেকেই সমগ্র জাতি পেয়েছে অফুরন্ত প্রেরণা। ‘প্রায়শ্চিত্ত’ নাটকে (১৯০৮) ধনঞ্জয় বৈরাগীর ভিতরে-তখনো অজানা গান্ধিজীর ‘অহিংস প্রতিরোধের পূর্বভাব। ১৯০৯-১০ প্রবাসী পত্রিকায় কবি ছেপেছেন “গীতাঞ্জলী” ও রাজা এবং লিখে গেছেন স্বদেশীযুগের গজ-মহাকাব্য গোরা। ১৯১১ (ডিসেম্বর) কংগ্রেসে তাঁর “জন গণ মন” প্রথম গাওয়া হয়। ১৯১১-১২ তার রূপকন্যা ডাক ঘর ও অচলায়তনের সঙ্গে ৫০ বর্ষ পূর্তির চরম নিদর্শন “জীবন স্মৃতি!”

১৯০৩ থেকে ১৯১২-১৩ (অর্থাৎ ১৮৯৬-১৯০৬) সালের মধ্যে স্বদেশী গান রচনায় রবীন্দ্রনাথ যেন যুগান্তর এনে দিয়েছিলেন; এই তথ্যটি একটু স্পষ্ট করে যাব, ছ’চারটি গানের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে। কাকি রাগে তিনি গেয়েছেন; ‘কেন চেয়ে আছি গো মা মুখপানে’; এ গানের অন্তরায় দেখি:

“তুমি দিতেছ মা যা আছে তোমারি  
স্বর্ণ শস্ত তব, জাহ্নবীর বারি  
জান ধর্ম কত পুণ্য কাহিনী—”

১৯১০ সালের মধ্যে—অর্থাৎ বঙ্গভঙ্গের আগেই—দেখি উক্ত পদের অপূর্ণ রূপান্তর ভৈরবীতে: “ওই ভুবন মনমোহিনী” ও তার সঙ্গে ‘জননী

\* জাতীয় শিক্ষা পরিষদের উদ্বোধন উপলক্ষে “জাতীয় বিদ্যালয়” ভাবপট কবি পাঠ করেন এবং সাহিত্য সম্বন্ধে চারটি বক্তৃতা দেন। ১৯০৬ জাতীয় মহাসভার প্রবন্ধ গুলি তাঁর ‘সাহিত্য সম্মেলন’মঞ্চে পাঠ করেন ও সমগ্র জাতিকে মনে করিয়ে দেন: “এই মিলনোৎসবের বন্দেমাতরম মহামন্ত্রটি বাংলা সাহিত্যেরই দান।”

ঘারে আজি ঐ 'নববৎসরে করিলাম পণ', হে ভারত আজি নবীনবর্ষে  
প্রভৃতি ২৫০০টি জাতীয় সঙ্গীত।

কলাবিৎ রবীন্দ্রনাথ জগদ্বির 'ভূবন মোহিনী' রূপ যেমন দেখেছেন, তেমনি হরের ঐশ্বর্যও দেখিয়েছেন। ইষ্ঠাৎ ১৩১২-১৩, (১৯০৫-৬) দেশ মাতৃকার অঙ্গচ্ছেদের বেদনায় "রবি-বাউল" যেন এক অভিনব হরে আকাশ বাতাসকে ভরিয়ে দিলেন : বাউলদের ভাটিয়ালি ও সারি গানের হর—যেগুলি রবীন্দ্রনাথ তাঁর পূর্ববঙ্গ ও উত্তর বঙ্গের গ্রামে গ্রামে-ঘুরে সংগ্রহ করেছিলেন। তার ফলে এমন কতকগুলি গান ও হর আমরা পেয়েছি—যা খাঁটি বাংলার প্রাণের হর—যেমন "আজ বাংলাদেশের হৃদয় হ'তে" প্রভৃতি সত্যিই অতুলনীয়, শ্রীশাস্তিদেব ঘোষ তার মধ্যে কয়েকটি মাত্র উল্লেখ করেছেন। ১৩১২-১৩ রচিত কয়েকটি গান এখানে মনে করাতে চাই :

১। আপনি অবশ তবে বল দিবি তুই কারে ?

২। নিশিদিন ভরসা রাখিস' (৩) আমার প্রাণের মানুষ (৪) আমি ভয় করব না (৫) ছি ছি চোখের জলে ভেঙাস নে আর মাটি : (৬) তোর আপন জনে ছাড়বে তোর তাবলে ভাবনা করা চলবে না। (৭) যদি তোর ভাবনা থাকে ফিরে চান (৮) আমার সোণার বাঙলা আমি তোমায় ভালবাসি (৯) মা কি তুই পরের ঘারে পাঠাবি তোর ঘরের ছেলে (১০) যে তোমায় ছাড়ি ছাড়ুক আমি তোমায় ছাড়ব না মা : (১১) যে তোরে পাগল বলে (১২) বুক বেঁধে তুই দাঁড়া দেখি (১৩) বিধির বাঁধন কাটবে তুমি এমন শক্তিমান ( ১৪ বাংলার মাটি বাংলার জল।

সর্বশেষে মনে পড়ে :

যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে

তবে একলা চলে রে—

যে গান মহাজ্ঞা গাঙ্কিকেও মতিয়ে ছিল তাই বাংলা শিখে তিনি ঐ গানে যোগ দিতেন তাঁর উপাদান সম্ভার। ২১ বছর দক্ষিণ আফ্রিকায় সংগ্রাম করে গাঙ্কিজী যখন ১৯১৫ সালে ভারতে স্বাধীভাবে নামলেন তখন সুপরিবারে তিনি শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথের আতিথ্য গ্রহণ করেন এবং তাঁকে "গুরুদেব" সম্বোধন করেন। বয়সে কবি-গুরুর চেয়ে মাত্র আট বছরের ছোট হলেও গাঙ্কিজী তাঁকে সর্বান্তঃকরণে ভক্তি করিতেন এবং রাজনৈতিক তথ্য অল্প অনেকক্ষেত্রে তাঁদের মত-ভেদ থাকলেও পরস্পরের প্রতি কী গভীর শ্রদ্ধা পোষণ করতেন তা দেখবার সৌভাগ্য হয়েছে। গাঙ্কিজীর নেতৃত্বে আমাদের স্বাধীনতার ইতিহাসধারা এক সম্পূর্ণ নূতন ষাটে হর করেছিল ; কিন্তু মহাজ্ঞাজী জানতেন সেই জাতীয় স্বাধীনতার ইতিহাসে রবীন্দ্রনাথের দান কী অসামান্য। আজ সেই দুই মহাপুরুষকেই আমরা হারিয়েছি—তবু আজ ঐ কথ্য ভেবে সান্নাধ্য মেলে যে রবীন্দ্রনাথের দেওয়া হরে "বন্দে মাতরং" গান ও তাঁর "জনগণমন" ( ১৯১১ ) ও "দেশ দেশ নন্দিত করি" ( ১৯১৫ ) প্রভৃতি জাতীয় সঙ্গীত মহাজ্ঞাজী শুনে গেছেন ও জাতীয় নবজাগরণে তাদের প্রভাব পূর্ণ মাত্রায় অনুভব করে গেছেন।

১৮৭৪ সালে রচিত "এক হুঁরে বাঁধিয়াছি সহস্রটি মন" থেকে শুরু করে শেষ পর্যন্ত যে সব স্বদেশী গান রবীন্দ্রনাথ রচনা করে গেছেন সেগুলি স্বরলিপি সমেত প্রকাশিত করা আমাদের জাতীয় দায়িত্ব বলে মনে করি ; তাই এদিকে দেশবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে এই এককে চেষ্টা করলাম। রাজ্যে-কোপে অনেক স্বদেশী গানের চরনিকা লুপ্ত হয়ে গেছে ; তবু সাময়িক পত্রিকা ভাল করে বাঁটলে অনেক অপ্রত্যাশিত নূতন উপাদান ও তথ্য প্রকাশ হবে এই আশা করে এই বিষয়ে আলোচনা তুললাম। আধুনিক স্বরলিপির প্রবর্তক জ্যোতিরিন্দ্রনাথকে প্রথমে সন্মত প্রণতি জানাই কারণ তিনিই স্বরলিপি ছাপা প্রসঙ্গে 'একহুঁরে বাঁধিয়াছি' গানটি, বালক রবীন্দ্রনাথের রচনা বলে প্রকাশ করে গেছেন ; দুই ভাই হরকার ও হরশিল্পী, তাঁদের তরুণ জীবনের প্রেরণা চলে দিয়েছেন কত গানে—বিশেষ 'স্বদেশী' সঙ্গীতে তাও ভাল আমাদের বুঝতে আমাদের চেষ্টা করা উচিত। তাঁদের প্রেরণায় ভাগিনেরী ও হরশিল্পী শ্রীমতী সরলা দেবী তাঁর "শত গান" স্বরলিপি প্রকাশ করেন ১৩০৭ সালে অর্থাৎ প্রায় ৫০ বছর আগে। ইতিমধ্যে রবীন্দ্রনাথের বিচিত্র সঙ্গীতসম্ভার কঠে কঠেই প্রাধান্য চলে এসেছে ; অল্পদৈর্ঘ্যক গানই স্বরলিপিতে উঠেছে ; তাও প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা দেবী, ইন্দ্রিয়ার দেবী ও দীনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের একান্ত চেষ্টায়। কিন্তু কবি গুরুর স্বদেশী গান শতাধিক হলেও "গীত-বিতানে" মাত্র ৪৬টি স্থান পেয়েছে, তার মধ্যে আবার প্রাচীন গানগুলি বেশীর ভাগই বাদ দেওয়া হয়েছে। 'কাব্যে উপেক্ষিত'র মত রবীন্দ্র গীতলোকে সেই উপেক্ষিতাদের জন্ত আমার মনটা কাঁদে, কারণ কবি গুরুর মুখে মধ্যে মধ্যে তাদের দু'এক কলি গাইতে শুনে মুগ্ধ হয়ে ভেবেছি,—কী অপদার্য ও অকৃতজ্ঞ আমরা যে সেই সব অমূল্য সম্পদ রক্ষা করবার উপযুক্ত ব্যবস্থা করতে আমরা পারিনি। স্বদেশীযুগে "মোমর" রেকর্ডে রবীন্দ্রনাথের নিজের হর বা আমরা শুনেছি তাও লুপ্ত হয়েছে ; আধুনিক রেকর্ডে কিছু পুরাতন গান উঠেছে সেটা আশার কথা ( হরের বাতীত্রম অবশ্য এখানেও আছে ! ) কিন্তু সর্বদেয়ে যে স্বরলিপির ভিতর দিয়ে সঙ্গীতের সংরক্ষণ-প্রণালী গড়ে উঠেছে—তাকে অনাগর করলে আমাদেরই ক্ষতি ; এবং বহু ক্ষতি যে আজ প্রায় অপূরণীয় হয়ে দাঁড়িয়েছে তাই শেষে মনে করাতে চাই ৬দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে স্মরণ করে। তাঁর শান্তিনিকেতনের বাড়ীতে সেকালে আমাদের পূরণ গানের চর্চা চলত ; ইষ্ঠাৎ পরীক্ষকের মত ভঙ্গীতে তিনি একদিন আমাদের প্রশ্ন করলেন 'রবীন্দ্রনাথের স্বদেশী গানের মধ্যে কুজ 'জোনাকি'ও মর্যাদা পেয়েছিল তা তোমরা জান কি ?' অর্ধাচীন আমরা দে ব্যসকুটের কি জবাব দেবো ? তখুনি দিহুদা কোলে এশাচ্চটা টেনে নিয়ে তাঁর সেই মিক উদাস কঠে গান ধরলেন—আমরা মুগ্ধ হয়ে শুনলাম :—

"জোনাকি ! কী হুখে ঐ ডান দ্বিট মেলেছ।

এই আঁধার মাঝে বনের মাঝে উল্লাসে প্রাণ ঢেলেছ।

তুমি নও ত হৃদ্য নও ত চল, তাই বলেই কি কম আনন্দ

তুমি আপন জীবন পূর্ণ করে আপন আলো ছেলেছ।

তোমার বা আছে তা তোমার আছে, তুমি নও গো ধন কারো কাছে

তোমার অন্তরে যে-শক্তি আছে তারি আদেশ খেলেছ ।

তুমি আধার-বান্ধন ছাড়িয়ে ওঠো, তুমি ছোট হয়ে নও গো ছোটো,

জগতে যেখানে বসে আলো, সবায় আপন করে ফেলেছ ।

এই অপূর্ণ বাড়ল হরের গানটি গীত-বিতানের স্বদেশ-বিভাগ চ্যুত হয়ে  
'বিচিত্র' বর্গের একটি কোণে স্থান পেয়েছে ! (গীত-বিতান ২ খণ্ড  
৩০৬-৭ পৃঃ) এমনি কত স্বদেশী গান রবীন্দ্র-সঙ্গীতের বিভিন্ন বিভাগে  
হরত লুকিয়ে রয়েছে ; সন্ধানী চোখ দিয়ে তাদের খুঁজে বার করতে  
হবে এবং যথাসম্ভব খাঁটি হয়ে তাদের স্বরলিপি—বাংলা ও হিন্দী  
(নাগরী) হরকে ছাপার আয়োজন করতে হবে । কারণ শুধু বাঙালী  
নয়, ভারতবাসী সারাই হয়ত একদিন দাবী জানাবে এই সব গান

শেখবার । পণ্ডিত ভীষ্মাও শাস্ত্রী নাগরী অক্ষরে 'সঙ্গীত গীতাঞ্জলী' প্রকাশ  
করেছিলেন বলে সেই অপূর্ণ গানগুলি আমি ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে কত  
অবাসলী নর-নারীর মুখে শুনে মুগ্ধ হয়েছি । তেমনি রবীন্দ্রনাথের স্বদেশী  
গান সমগ্র জাতির সম্পদ মনে করে তার বৈজ্ঞানিক প্রচারের দায়িত্ব  
আমাদের নিতেই হবে । এদিকে বিশ্ব-ভারতীর সঙ্গীত নারকেরও  
দৃষ্টি আকর্ষণ করি । এই গানগুলির ভিতর দিয়ে শুধু বাঙালী তার  
বাঙলা মায়ের অপূর্ণ মূর্তিই দেখেনি, সেই রূপ ও হর অবনীন্দ্রনাথের  
ভারতমাতা চিত্রে, অগণ্য অনবদ্য রচনার ভিতর দিয়ে মানব-স্বাধীনতারই  
যেন প্রতীক হয়ে ফুটে উঠেছে । রবীন্দ্রনাথের নবতীতম জন্মোৎসবের  
আগেই তার স্বদেশী গানের পূর্ণ সঙ্কলন ও স্বরলিপি ছাপা হবে এই  
আশায় প্রবন্ধ লিখলাম ।

## সর্বহারা

শ্রীনিহাররঞ্জন সিংহ

দুখের দিনে অশ্রু ঝরে

অসীম দুখে শুকিয়ে যায় !

শিয়র দেশে মৃত্যু বাদের

তাদের আবার কিসের ভয় ?

যাযাবরের পথের নেশা,

মাধুকরী বাদের পেঁশা,

গহন বনে তারাই পারে

ঘরের অভাব করতে জয় !

শক্তি তাদের দুঃখ দলন,

বুক ফুলিয়ে তাদের চলন,

এগিয়ে চলার উদ্দানায়

অবহেলায় দুঃখ নয় !

নূতন করে গড়বে তারা

এ সংসারের জীবন ধারা,

যারা আজি সর্ব হারা

তুচ্ছ তারা নয় কো'নয় !

## আমার কবিতা

শ্রীক্ষেত্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

আমার কবিতা আজি লিখে যাই আকাশের গায়

গৃহ-উপগ্রহ আর চন্দ্র-সূর্য্য তারার অক্ষরে ;

চিরন্তন হোয়ে থাক অন্তহীন মহাশূন্য 'পরে

আস্তর আকৃতি মোর জ্যোতিষ্কের জ্যোতির্ময়তায় ।

অতৃপ্ত আত্মার ক্ষোভ এ-দিনের মর্ম্মাস্ত-হেলায়

আলোর স্পন্দনে যেন রাত্রি-দিন কাঁদে আর্ত-স্বরে ;

নিষ্করণ বঞ্চনার সত্য যেন সবার উপরে

উদয়াস্ত জাগে বসি' নিম্পলক পুত্রশোক-প্রায় ।

আনন্দের অবসরে কোনোদিন মুহূর্তের ভুলে

বারেকের তরে যদি যুক্তকরে উর্দ্ধ মুখে চেয়ে

শুকতার তলাতলে হারাইয়া ফেলো আপনারে,—

স্রবণের সরোবর নয়নের স্নানীল অকূলে

বিকশিবে বন্ধ টুটি' : কবিতার ভীক আলো পেয়ে

তৃণাকুর-শিহরণ গুঞ্জরিতে সন্ধানি' আমারে ॥





# কালের মন্দিরা

শ্রী শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ

জৈন পরিত্রাজক

স্বর্ধোদয়ের সঙ্গে পাছশালার ঘর খুলিল।

পারসিক সার্থবাহ ইতিপূর্বেই উষ্ট্র গর্দভের পৃষ্ঠে পণ্য-ভার চাপাইয়া প্রস্তুত ছিল, তাহারা পাছশালার শুক চুকাইয়া দিয়া বাহির হইয়া পড়িল। তাহারা সারা আর্ধাবর্ত পরি-ভ্রমণ করিবে, পথপার্শ্বে আলম্বনে বিলম্ব করিলে চলিবে না।

চিত্রক রাতে ঘুমায় নাই, কিন্তু সেজন্ত তাহার শরীরে তিলমাত্র ক্লান্তিবোধ ছিল না। সে দেখিল, পাছশালা শূণ্য হইয়া গিয়াছে ; কিন্তু রট্টার কক্ষদ্বার এখনও রুদ্ধ। রাজ-কুমারীর এখনও ঘুম ভাঙে নাই। চিত্রক মনে মনে গত রাত্রির অলাক ভয় ভাবনার কথা চিন্তা করিতে করিতে প্রাচীর বেষ্টনের বাহিরে গিয়া দাঁড়াইল।

নবীন রবিকরে উপত্যকা বলমল করিতেছে, তৃণ প্রান্তে তখনও শিশিরবিন্দু শুকায় নাই। হিমাদ্র মন্ডর বায়ু শরীর পুলকিত করিতেছে। চিত্রক উৎফুল্ল নেত্রে চারিদিকে তাকাইয়া দেখিতে লাগিল। আজ তাহার চোখে প্রকৃতির রঙ বদলাইয়া গিয়াছে।

চারিদিক দেখিতে দেখিতে তাহার চোখে পড়িল, কাল রাতে যেখানে সে আঙনের প্রভা দেখিয়াছিল সেইখানে আকাশ ও দিগন্তের সঙ্গমস্থলে অনেক পক্ষী উড়িতেছে ; আর কোনও দিকে অমন ঝাঁক বাধিয়া পক্ষী উড়িতেছে না। পক্ষীগুলিকে আকাশের পটে সঞ্চরমান কক্ষবিন্দুর ভায় দেখাইতেছে।

চিত্রক অনেকক্ষণ স্থিরনেত্রে সেই দিকে চাহিয়া রহিল। এই সময় রট্টা বাহিরে আসিয়া তাহার পাশে দাঁড়াইলেন। চিত্রক সহাস্ত হৃৎতার সহিত তাঁহাকে সম্ভাষণ করিল—

‘রাতে স্থনিদ্রা হইয়াছিল ?’

রট্টা তাহার মুখ হইতে দৃষ্টি সরাইয়া নিয়ে নদীর পানে চাহিলেন, বলিলেন—‘হাঁ। আপনার ?’

চিত্রক অগ্নানবদনে বলিল—‘আমারও। খুব ঘুমাইয়াছি।’

রট্টা নদীর পানে চাহিয়া রহিলেন। আজ তাঁহার মনের ভাব অত্র প্রকার ; একটু চাপা, একটু অন্তর্মুখী। চিত্রকের মনোভাব কিন্তু সম্পূর্ণ বিপরীত। সে অন্তরে এক অপূর্ব প্রীতি-প্রগলভ উদ্দীপনা অহুভব করিতেছে ; কোনও অজ্ঞাত উপায়ে এই রাজকুমারীর উপর তাহার বেন স্বত্বপূর্ণ অধিকার জন্মিয়াছে। যাহার জন্ত আগিয়া রাত কাটাইতে হয় তাহার প্রতি সম্ভবত এইরূপ অধিকার-বোধ জন্মে।

সে জিজ্ঞাসা করিল—‘আপনি কি বাজার জন্ত প্রস্তুত ?’

রট্টা বলিলেন—‘আমি প্রস্তুত। কিন্তু হৃদয় পরে বাজা করিলেও ক্ষতি নাই’ বলিয়া গিরিকোড়স্থ নির্জন পাছ-শালাটির প্রতি সন্মুখ দৃষ্টিপাত করিলেন।

চিত্রক হাসিয়া উঠিল, বলিল—‘সত্য বলুন, এই পাছ-শালার প্রতি আপনার মমতা জন্মিয়াছে ?’

রট্টা স্মিতমুখে বলিলেন—‘তা জন্মিয়াছে।—ফিরিবার পথে আবার এখানে রাত্রিযাপন করিব।’ মনে মনে ভাবিলেন, ফিরিবার সময় সঙ্গে অনেক লোক থাকিবে... এমন রাত্রি আর হইবে কি ?

হুই একটি অত্র কথার পর চিত্রক পশ্চিম দিকে হস্ত প্রসারিত করিয়া বলিল—‘দেখুন তো, কিছু দেখিতে পাইতেছেন ?’

রট্টা চক্কর উপর করতলের অন্তরাল রাখিয়া কিছুক্ষণ দেখিলেন—‘অনেক পাখী উড়িতেছে। কী পাখী ?’

চিত্রক বলিল—‘চিল্ল শকুন—’

রট্টা চকিতে চিত্রকের পানে চাহিলেন। কিন্তু এই সময় তাঁহাদের মনোযোগ অল্প দিকে আকৃষ্ট হইল।

পাছশালার সম্মুখে ও দুই পাশে পথের তিনটি শাখা এতক্ষণ শূন্য পড়িয়া ছিল; পারসিক সার্ববাহ অনেক পূর্বেই গিরিসঙ্কটের মধ্যে অদৃশ্য হইয়া গিয়াছিল; এখন উত্তর দিক হইতে কয়েকটি মানুষ আসিতেছে দেখা গেল। তাহাদের সহিত উষ্ট্র, গর্দভ নাই, কেবল কয়েকটি মানুষ অদ্রুত বেশভূষা পরিয়া পৃষ্ঠে ঝোলা বহিয়া পদব্রজে আসিতেছে।

চিত্রক বিস্মিত হইল। প্রাতঃকালে পাছশালায় বাজী আসে না; কোথা হইতে আসিবে? নিকটে কোথাও ক্ষণালয় নাই। তবে ইহারা কে?

যাত্রিগণ আরও কাছে আসিলে চিত্রক দেখিল, ইহাদের বেশভূষাই শুধু অদ্রুত নয়, আকৃতিও অদ্রুত। ক্ষুদ্রাকৃতি দাঁড়বগুণি; মুখ বর্তলুকার, হনু উচ্চ, চক্ষু তির্যক। চিত্রক অনেক দেশ ভ্রমণ করিয়াছে, কিন্তু এরূপ আকৃতির মানুষ কখনও দেখে নাই।

পাছশালার সম্মুখে আসিয়া পথিকদল দাঁড়াইল। চারি-জন পথিক, তন্মধ্যে একজন বৃদ্ধ। মুখে অতি সামান্য গুহ্র গুহ্র আছে, দেহ কৃশ ও শ্রমসহিষ্ণু; মুখের ভাব দৃঢ়তা-ব্যঞ্জক। ইনিই এই দলের নেতা সন্দেহ নাই। চিত্রক ও রট্টা পরম কৌতূহলের সহিত ইহাদের দর্শন করিতেছিলেন, বৃদ্ধও কিছুক্ষণ তাহাদের নিরীক্ষণ করিয়া সাগ্রহে অগ্রসর হইয়া আসিলেন এবং তাঁহাদের সম্ভাষণ করিলেন।

চিত্রক ও রট্টা অবাক হইয়া চাহিয়া রহিলেন। বৃদ্ধের কর্ণধর মধুর ও মন্দ্র, কিন্তু তাঁহার ভাষা চিত্রক বুঝি-বুঝি করিয়াও বুঝিতে পারিল না। যেন পরিচিত ভাষা, অথচ উচ্চারণের বিকৃতির জন্য ধরা যাইতেছে না।

চিত্রক রট্টাকে ইশ্বকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন—‘কিছু বুঝিতে পারিলেন?’

রট্টা বলিলেন—‘না। ইহারা বোধ হয় চীনদেশীয়।’

চিত্রক তখন বৃদ্ধকে প্রশ্ন করিল—‘আপনারা কে? কি চান?’

বৃদ্ধ উত্তর দিলেন, কিন্তু এবারও চিত্রক কিছু বুঝিল না। সে মাথা চুলকাইয়া শেষে জম্বুককে ডাকিল, বলিল—‘তোমার নূতন অভিধি আসিয়াছে। ইহারা কে?’

জম্বুক নবাগতদের দেখিয়াই বলিল—‘ইহারা চৈনিক পরিব্রাজক। এইরূপ পথিক মাঝে মাঝে এই পথে আসেন।’

‘ইহাদের ভাষা তুমি বুঝিতে পার?’

‘পারি। ইহারা পালি ভাষায় কথা বলেন।’

‘ভাল। জিজ্ঞাসা কর আমাদের নিকট কী চান?’

জম্বুক বৃদ্ধকে প্রশ্ন করিল এবং তাঁহার উত্তর শুনিয়া বলিল—‘ভিক্ষু জানিতে চান ইনি রাজকন্তা রট্টা যশোধরা কিনা।’

চিত্রক সন্দেহপূর্ণ নেত্রে ভিক্ষুকে নিরীক্ষণ করিয়া বলিল—‘এ প্রশ্নের উত্তর পরে দিব, অগ্রে আমার প্রশ্নের উত্তর দিতে বল।’

অতঃপর জম্বুকের মধ্যস্থতায় ভিক্ষুর সহিত চিত্রকের নিম্নরূপ প্রশ্নোত্তর হইল।

চিত্রক : আপনি কে? কোথা হইতে আসিতেছেন?

ভিক্ষু : আমার নাম টো-ইঙ্। আমরা চীনদেশ হইতে আসিতেছি। ইহারা আমার শিষ্য।

চিত্রক : চীনদেশ কত দূর?

ভিক্ষু : দুই বৎসরের পথ।

চিত্রক : কোথায় বাইবেন?

ভিক্ষু : কুশানগর যাইব। লোকজ্যেষ্ঠ বৃদ্ধ যেখানে দেহ রক্ষা করিয়াছিলেন সেই পবিত্র স্থানে দেহরক্ষা করিব এই আশা লইয়া চলিয়াছি। এখন বৃদ্ধের ইচ্ছা।

চিত্রক : এই জন্ত এতদূর পথ আসিয়াছেন? অথ কোনও উদ্দেশ্য নাই?

ভিক্ষু : অথ কোনও উদ্দেশ্য নাই।

চিত্রক : ক্ষমা করুন। আপনারা প্রাতঃকালে এখানে আসিলেন কি করিয়া?

ভিক্ষু : আমরা অহিংসাত্মক বৌদ্ধ, অস্ত্রধারণ করা আমাদের নিষেধ। কিন্তু এ পথে দস্যু তরুর আছে; তাই আমরা রাজিকালে পথ চলি, দিবাভাগে বিশ্রাম করি। কাল রাতে চন্দ্রোদয় হইলে যাত্রা করিয়াছিলাম।

চিত্রক : কোথা হইতে যাত্রা করিয়াছিলেন?

ভিক্ষু : চণ্টন দুর্গ হইতে।

রট্টা এতক্ষণ নীরবে শুনিতেছিলেন; এখন চণ্টনদুর্গের নাম শুনিয়া সাগ্রহে অগ্রসর হইয়া আসিলেন—‘চণ্টন



হুর্গ! তবে আমার পিতার সহিত আপনার সাক্ষাৎ হইয়াছিল।’

ভিক্ষু হাসিলেন; বলিলেন—‘আমি অসুমান করিয়াছিলাম তুমিই রাজকন্যা রট্টা বশোধরা।...আমি তোমার পিতার নিকট হইতে কিছু বার্তা বহন করিয়া আনিয়াছি। ভাবিয়াছিলাম কপোতকূট যাইতে হইবে; ভালই হইল, পথেই তোমার দেখা পাইলাম। এখানে আমার কর্তব্য শেষ করিয়া নিজ কর্মে যাইব।’

রট্টা : পিতা কী বার্তা পাঠাইয়াছেন ?

ভিক্ষু : ধর্মাদিত্য তোমাকে সকলের নিকট প্রকাশ্য নয়। কিন্তু যখন দ্বিতাবীর প্রমুখ্যৎ কথা বলিতে হইতেছে তখন গোপন রাখা অসম্ভব। ভরসা করি ইহাতে ক্ষতি হইবে না।

রট্টার মুখে শব্দার ছায়া পড়িয়াছিল, তিনি ক্রীণ-কণ্ঠে বলিলেন—‘না, ক্ষতি হইবে না, আপনি বলুন।’

ভিক্ষু : ধর্মাদিত্য তোমাকে এই বার্তা পাঠাইয়াছেন—‘তুমি কদাপি চণ্টন দুর্গে আসিও না, আসিলে বোর বিপদ ঘটবে।’

রট্টা স্থির বিস্ফারিত নেত্রে ভিক্ষুর পানে চাহিয়া রহিলেন, তারপর আলিত স্বরে বলিলেন—‘বিপদ ঘটবে! কিরূপ বিপদ?’

ভিক্ষু : যাত্রার পূর্বে কণেকের জন্ত ধর্মাদিত্যের সহিত বিরলে সাক্ষাৎ হইয়াছিল। দুর্গাদিপতি কিরাত অতিশয় দুষ্ট। সে ছলনা দ্বারা তোমাকে চণ্টন দুর্গে লইয়া গিয়া বলপূর্বক বিবাহ করিতে চায়। ধর্মাদিত্যকে সে বন্দী করিয়া রাখিয়াছে।

রট্টা : পিতাকে বন্দী করিয়া রাখিয়াছে !

ভিক্ষু : কারাগারে বন্দী করে নাই। কিন্তু তাঁহার হুর্গ ত্যাগ করিবার অধিকার নাই, পত্র লিখিবারও অধিকার নাই। কপোতকূটে যে পত্র গিয়াছিল তাহা ধর্মাদিত্য খেচ্ছায় লেখেন নাই।

দীর্ঘ নীরবতার পর রট্টা চিত্রকের দিকে ফিরিলেন। তাঁহার মুখ রক্তহীন, কিন্তু চক্রে চাপা আগুন। রক্ত স্বরে বলিলেন—‘কিরাতের যে এতদূর সাধ্য হইবে তাহা যথেষ্ট তাবি নাই। এখন কর্তব্য কি?’

চিত্রক কিছুকাল নীরব থাকিয়া ভিক্ষুককে জিজ্ঞাসা করিল, ‘মহারাজ কি কোনও অহুজা দিয়াছেন?’

ভিক্ষু : না। তিনি কেবল রট্টা বশোধরাকে চণ্টন দুর্গে যাইতে নিষেধ করিয়াছেন। কিন্তু তোমাদের কর্তব্য এই দুর্জনের হস্ত হইতে ধর্মাদিত্যকে উদ্ধার করা। কিরাত মিষ্ট কথায় ধর্মাদিত্যকে মুক্তি দিবে না। তাহার কূট অভিপ্রায় ব্যর্থ হইয়াছে জানিলে সে আরও ফুৎক হইবে; হয় তো ধর্মাদিত্যের অনিষ্ট করিতে পারে—

রট্টা ব্যাকুল নেত্রে চিত্রকের পানে চাহিলেন। চিত্রক শাস্ত্রস্বরে বলিল—‘আপনি অধীর হইবেন না, বিপদের সময় বুদ্ধি স্থির রাখিতে হয়।—মহাশয়, আপনারা পঞ্চশ্রেণী পীড়িত, এখন বিশ্রাম করুন। জয়ক, .তুমি ইহাদের পরিচর্যা কর।’

\* \* \* \*

যে ব্যাপারে যুদ্ধ বিগ্রহের গন্ধ আছে তাহাতে চিত্রক কখনও বুদ্ধি ভ্রষ্ট হয় না; যুদ্ধের প্রাকালে প্রবীণ সেনাপতির তায় সে সমস্ত দায়িত্ব তার নিজ হস্তে তুলিয়া লইল।

রট্টার হাত ধরিয়া সে তাঁহাকে কক্ষে আনিয়া বসাইল। রট্টার করতল ভূষারের মত শীতল, অধর দ্বয় কম্পিত হইতেছে। নারী বাহিরে যতই পৌরুষের অভিনয় করুন, অন্তরে তিনি অবলা।

চিত্রক তাঁহার সম্মুখে বসিল এবং বীরভাবে তাঁহাকে দুই চারিটি প্রশ্ন করিয়া কিরাত ও চণ্টনদুর্গ সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য বিষয় জানিয়া লইল। রট্টাও চিত্রকের সহিত কথা কহিতে কহিতে অনেকটা আশ্বস্ত হইলেন।

এখন কর্তব্য কি এই প্রশ্নের উত্তরে চিত্রক বলিল—‘দুইটি পথ আছে। কিন্তু আপনি যদি কিরাতকে বিবাহ করিতে সন্মত থাকেন তাহা হইলে কোনও পথেরই প্রয়োজন নাই।’

রট্টা বলিলেন—‘কিরাতকে বিবাহ করার পূর্বে আমি আত্মস্বাভিনী হইব।’

চিত্রক বলিল—‘তবে দুই পথ। এক কপোতকূটে কিরাতা যাওয়া, সৈন্যদল লইয়া চণ্টনদুর্গ অবরোধ করা। যতদূর জানি সৈন্য সংগ্রহ করিতে সময় লাগিবে। চণ্টন

ছুরের ভার ক্ষুদ্র দুর্গও অন্তত পাঁচশত সৈন্তের কমে অবরোধ করা অসম্ভব।’

রট্টা প্রশ্ন করিলেন—‘দ্বিতীয় পথ কী?’

চিত্রক বলিল—‘দ্বিতীয় পথ, স্বন্দগুপ্তের নিকট সাহায্য ভিক্ষা করা।’

রট্টা উচ্চকিত হইয়া চাহিলেন—‘স্বন্দগুপ্ত সাহায্য দিবেন?’

চিত্রক বলিল—‘তিনি ক্ষত্রিয়-চূড়ামণি। তাঁহার শরণ লইলে তিনি অবশ্য সাহায্য করিবেন।’

‘তবে স্বন্দগুপ্তেরই শরণ লইব। তাঁহার নাম শুনিলে কিরাত ভয় পাইবে, বিকৃত্যতা করিতে সাহস পাইবে না।’

‘তাঁহা সম্ভব। কিন্তু স্বন্দগুপ্তের কাছে কে যাইবে?’

‘আমি যাইব। আপনি সঙ্গে থাকিবেন।’

চিত্রক ক্ষণেক মোন রহিল, তারপর বলিল—‘আপনি নায়া, লক্ষ লক্ষ সৈন্তপূর্ব স্বদ্ধাবার নারীর উপযুক্ত স্থান নয়। অবশ্য আমি সঙ্গে থাকিলে বিশেষ ভয় নাই, অভিজ্ঞান অঙ্গুরীর দেখাইয়া স্বন্ধের সমীপে পৌছিতে পারিব। কিন্তু একটি কথা আছে—’

‘কি কথা?’

‘সকল কথা বলার সময় নাই। কিন্তু আমি যে স্বন্দগুপ্তের দূত একথা তাঁহাকে বলা চলিবে না। আমি বিটক রাজ্যেরই একজন সেনানী, এই পরিচয় দিলেই হইবে। স্বন্ধ আমাদের চেনেন না, সুতরাং কোনও গোলযোগের সম্ভাবনা নাই।’

‘কিন্তু—কেন?’

‘ওকথা এখন জিজ্ঞাসা করিবেন না। আমাদের বিশ্বাস করুন, আমি বিশ্বাসঘাতকতা করিব না।’

রট্টা বলিলেন—‘আর্থ চিত্রক, আমি সম্পূর্ণ আপনার অধীন। আপনি যাহা বলিবেন তাহাই করিব।’

চিত্রক বলিল—‘আমি আপনার দাস। আপনার মঙ্গলের জন্য যাহা কর্তব্য তাহা করিব। স্বন্দগুপ্তের শরণ লওয়াই স্থির।’

‘হাঁ।’

চিত্রক উঠিয়া পাড়াইল, বলিল—‘তবে উঠুন। অবিলম্বে রাজ্য করিতে হইবে।’ ঘর পৰ্যন্ত গিয়া সে কিরিয়া পাড়াইল—‘একটি কথা। আপনি এমনভাবে বস্ত্র পরিধান

করুন যাহাতে আপনাকে কিশোর বয়স্ক পুরুষ বলিয়া মনে হয়। ইহা প্রয়োজন’ বলিয়া তাড়াতাড়ি কক্ষ হইতে বাহির হইয়া গেল।

রট্টার মুখে ধীরে ধীরে অকণাভা ফুটিয়া উঠিল। তিনি কক্ষের দ্বার বন্ধ করিয়া দিয়া নূতনভাবে বেশ-প্রসাধনে প্রবৃত্ত হইলেন।

চিত্রক বাহিরে আসিয়া দেখিল, পাশেই একটি কক্ষে জৈন ভিক্ষুগণ আশ্রয় লইয়াছেন; জম্বুক তাঁহাদের পরিচর্যায় নিযুক্ত আছে। চিত্রক তাঁহাদের নিকটে গিয়া বলিল—‘জম্বুক, ভিক্ষু মহাশয়কে আমি একটি প্রশ্ন করিতে ইচ্ছা করি—মহারাজ স্বন্দগুপ্ত সম্বন্ধে তিনি কিছু জানেন কি?’

প্রশ্ন শুনিয়া ভিক্ষু বলিলেন—‘জানি। স্বন্দগুপ্ত হুণ দলনের জন্য আসিয়াছেন। নিকটেই আছেন।’

চিত্রক : কোথায় আছেন?

ভিক্ষু : এই উপত্যকার পশ্চিমে যে পর্বতশ্রেণী আছে তাহা পার হইলে আর একটি বৃহত্তর উপত্যকা আছে; স্বন্দগুপ্ত তথায় সৈন্ত স্থাপন করিয়াছেন।

চিত্রক : একথা আপনি কিরূপে জানিলেন?

ভিক্ষু : চট্টনদুর্গে শুনিয়াছি। জনৈক সৈনিক যুগ্মায় গিয়াছিল সে দেখিয়া আসিয়াছে।

চিত্রক তখন ভিক্ষুকে সাধুবাদ করিয়া জম্বুককে আড়ালে ডাকিয়া আনি, বলিল—‘জম্বুক, আমরা স্থির করিয়াছি স্বন্দগুপ্তের শিবিরে যাইব।’

জম্বুক বলিল—‘সে ভাল কথা।’

চিত্রক বলিল—‘তোমাকে কপোতকূটে বাইতে হইবে। মজী চতুর ভট্টের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া সকল কথা তাঁহাকে বলিবে। তারপর তিনি যাহা ভাল হয় করিবেন।’

‘যথা আজ্ঞা।’

‘এখন আমাদের অশ্ব আনিতে বল। এই বেলা যাড়া করিলে সূর্যোস্তের পূর্বে স্বন্দগুপ্তের শিবিরে পৌছিতে পারিব।’

জম্বুক অশ্ব আনিতে গেল। চিত্রক কিরিয়া গিয়া রট্টার ঘরে করাঘাত করিল। রট্টা ঘর খুলিয়া নত চক্ষে সম্মুখে পাড়াইলেন।

চিত্রক দেখিল, বেশ পরিবর্তন করিয়া রট্টাকে অঙ্গরূপ

দেখাইতেছে; প্রথম যেদিন সে রট্টাকে দেখিয়াছিল সে দিনের মতই তাঁহাকে সহসা নারী বলিয়া চেনা যায় না, ভয়ের তলে রূপের আঁশ্বন চাপা পড়িয়াছে? কিন্তু মস্তকে শিরস্ত্রাণ নাই, বেণী শোভা পাইতেছে। তাহার কী হইবে?

চিত্রক নিজ কটিবন্ধ খুলিয়া রট্টার মাথায় উষ্ণীয় বাঁধিয়া দিল; উষ্ণীষের অন্তরালে বেণীবন্ধ ঢাকা পড়িল। চিত্রক বিচারকের দৃষ্টিতে রট্টার আপাদ-মস্তক নিরীক্ষণ করিয়া

গম্ভীরমুখে বলিল—‘এতক্ষেণে ছদ্মবেশ সন্তোষজনক হইয়াছে। স্বপ্নের সম্মুখে না পৌঁছানো পর্যন্ত ছদ্মবেশ আবশ্যক। বুদ্ধক্ষেত্র কিরূপ স্থান তাহা আপনি জানেন না, কিন্তু আমি জানি। তাই এই সাবধানতা।’

রট্টার চোখে জল আসিল; তিনি অবরুদ্ধ স্বরে বলিলেন—‘জীজ্ঞাসি বড় জঞ্জাল।’

চিত্রক মাথা নাড়িয়া বলিল—‘না, পুরুষ বড় জঞ্জাল

(ক্রমশঃ)

## ভারতীয় সংস্কৃতিতে দর্শনের স্থান

শ্রীসতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম-এ, পি-আর-এস, পিএচ-ডি

মানুষ ও ইতর প্রাণীর মধ্যে পার্থক্য কোথায়? অন্ত্য জীবজন্তুর মত মানুষকে ক্ষুধার অন্ন, পিপাসার জল ও রৌদ্র রুটিতে আশ্রয়স্থল খুঁজিতে হয়। জন্তুরা এসব পাইলেই সন্তুষ্ট হইতে পারে, কিন্তু মানুষ তাহা পারে না। মানুষের মধ্যে জ্ঞান-তৃষ্ণা বলিয়া একটা পিপাসা আছে। এ পিপাসা ভৌতিক জলে মিটে না। মানুষের পেটের ক্ষুধা অন্ন মিটিতে পারে, কিন্তু তাহার মানসিক ক্ষুধা পকারেও তৃপ্ত হয় না। এ ক্ষুৎপিপাসা মিটাইবার জন্ত মানুষ সব বিষয়েই জ্ঞানলাভ করিতে চায়। সে নিজে কি? তাহার স্বরূপ ও পরমার্থ কি? জীবজগৎ জড় প্রকৃতি হইতে উদ্ভূত, নাক্ষত্র বা পরমাণ্বার ইচ্ছা ও জ্ঞান প্রসূত? জন্ম ও মৃত্যু কি? জন্মের পূর্বে ও মৃত্যুর পরপারে মানবাত্মার কোন অস্তিত্ব থাকে কিনা? এ সব প্রশ্ন মানুষের মনে স্বতঃই উঠে এবং সেগুলির সন্তোষজনক মীমাংসা করিবার চেষ্টা মানুষের পক্ষে অপরিহার্য। ইহা হইতেই দর্শন শাস্ত্রের উৎপত্তি হইয়াছে। যে শাস্ত্রে এসব প্রশ্নের বিচারসদত মীমাংসা করা হয় তাহাকেই দর্শন বলে। অতএব বলিতে হয় দর্শন যতি মানুষেরই একটা অতি প্রয়োজনীয় বস্তু, উহা অনাবশ্যক কল্পনাবিলাস মাত্র নহে। আলডুস হাক্সলে (Aldous Huxley) নামে এক ম্প্রসিদ্ধ ইংরেজ লেখক তাহার এক গ্রন্থে (Ends and Means) এরূপ মন্তব্য করিয়াছেন যে ‘মানুষ তাহার জীবনে একটা দার্শনিক মত-

বাদ অনুসরণ করিয়া চলে, জীবজগৎ সম্বন্ধে একটা ধারণা লইয়া জীবনপথে অগ্রসর হয়। একথা শুধু চিন্তাশীল ব্যক্তির পক্ষেই সত্য নহে। ইহা একান্ত চিন্তাবিমুখ লোকের পক্ষেও প্রযোজ্য। ভাল হোক, মন্দ হোক—কোন একটা দার্শনিক মত অবলম্বন করিয়া মানুষের জীবনে চলিতে হয়। কোনও দার্শনিক মত না মানিয়া জীবনে চলা যায় না।’

প্রত্যেক মানুষের পক্ষে যে কথা বলা যায়, যে কোন মনুষ্য সমাজ বা মনুষ্যজাতির পক্ষেও সে কথা সমভাবে প্রযোজ্য। বিভিন্নকালে ও বিভিন্ন দেশে অনেক মনুষ্য-জাতি ও লোকসমাজের উত্থান পতন ঘটিয়াছে ও ঘটবে। এ সব জাতি ও সমাজের মধ্যে এক একটা সভ্যতা ও সংস্কৃতি গড়িয়া উঠিয়াছে এবং উহাদের পতনের সঙ্গে লুপ্তও হইয়াছে। একটি সভ্যতা ও সংস্কৃতির উৎপত্তিস্থল অনু-সন্ধান করিলে দেখিতে পাওয়া বাইবে যে উহার মূলে একটা দর্শন-মত নিহিত আছে। কোন জাতির সভ্যতা ও সংস্কৃতির মূলে আছে তাহার দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গী। যে জাতি জীব-জগৎ সম্বন্ধে যেসকল দার্শনিক মতবাদ পোষণ করেন তাহার সভ্যতা ও সংস্কৃতিও সেইভাবে গড়িয়া উঠে। একজ্ঞ কোন জাতির দর্শনকে উহার সংস্কৃতির সার বস্তু বলা যায়। কোন জাতি সভ্যতা ও সংস্কৃতির কোন তরে আছে তাহা উহার দর্শন হইতেই নির্ণয় করা যায়। ‘পাশ্চাত্য দেশের দার্শনিক জড়বাদ হইতেই তাহার বৈজ্ঞানিক সভ্যতার কিয়দংশ

পাওয়া যায়। আবার আর্থ জাতির আধ্যাত্মিক দর্শনের মধ্যেই উহার মানবিক সভ্যতার কিছু পরিচয় পাওয়া যায়। অতএব আমরা বলিতে পারি যে দর্শন কোন জাতির সংস্কৃতিতে ওতপ্রোতভাবে জড়িত আছে এবং উহাকে সম্বীভূত করিয়া রাখিয়াছে।

দর্শন ভারতীয় সংস্কৃতির মূল উৎস ও সম্বীভূত শক্তি। এই সংস্কৃতির অপর নাম আর্থ সভ্যতা ও সংস্কৃতি। যে আর্থ সংস্কৃতি ভারতবর্ষে প্রবেশ ও প্রসার লাভ করিয়াছিল তাহার মূল আধার হইল বেদ ও উপনিষদ। বেদ ও উহার অন্তর্ভুক্ত উপনিষদসমূহে আধুনিক অর্থে পূর্ণাঙ্গ দর্শনশাস্ত্র না থাকিলেও উহাদের মধ্যে যে একপ্রকার দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গী ও দার্শনিক মতবাদের বীজ নিহিত ছিল তাহা স্বীকার করা যায় না। এই বীজ কালে উৎপন্ন হইয়া ভারতীয় সংস্কৃতিরূপে মহীকূহে পরিণত হইয়াছে। উহাই আবার বেদান্ত-দর্শনরূপে চরমোৎকর্ষ লাভ করিয়াছে এবং ভারতীয় সংস্কৃতির বিভিন্ন শাখার মধ্যে অল্প বিস্তরভাবে প্রকাশমান আছে। ভারতের বেদ ও উপনিষদ তদন্তকারী দর্শন-মতগুলি জীবদেহে রক্তকণার স্যায় ভারতীয় সংস্কৃতির সর্বত্রই ও সর্বধমনিতে প্রবাহিত হইতেছে। একবার সত্যতা উপলব্ধি করিতে হইলে আমাদের ভারতীয় সংস্কৃতির প্রধান অঙ্গগুলি সম্বন্ধে আলোচনা করিতে হইবে।

কোন সংস্কৃতির কথা বলিলে আমরা প্রধানতঃ পাঁচটি বিষয় বুঝিয়া থাকি, যথা সাহিত্য ও ভাষা, বিজ্ঞান, চাক্ষু-কলা, ধর্ম ও দর্শন। সংস্কৃতির অস্তিত্ব অনেকের কথা কেহ কেহ বলিতে পারেন। কিন্তু সেগুলিকে এই পঞ্চাঙ্গেরই অন্তর্ভুক্ত করা যাইতে পারে মনে হয়। কোন সভ্যজাতির কোন কৃষ্টি বা সংস্কৃতি আছে কিনা—তাহা বলিতে গেলে উহার কোন ভাষা বা সাহিত্য আছে কিনা, কোন বিজ্ঞান সম্পদ আছে কিনা, উহা চাক্ষু-কলার সৃষ্টি ও সমাদর করে কিনা এবং উহার মধ্যে কোন ধর্ম ও দর্শন মত বিद्यমান কিনা তাহাই দেখিতে হইবে। এগুলিকে বার দিলে সংস্কৃতি বলিয়া কিছু থাকে না। যে জাতির কোন পরিষ্কৃত ও পূর্ণাঙ্গ ভাষা নাই, কোন বিজ্ঞান ও চাক্ষু-কলা নাই, কোন ধর্ম ও দর্শন নাই তাহার কোন সংস্কৃতিও নাই বলিতে হইবে। আবার যে জাতির নিজ সভ্যতা ও সংস্কৃতিতে আত্ম-বোধের ইচ্ছা আছে তাহা হইতেই বিজ্ঞানসম্বন্ধ কার্য্যকারণ নিয়মের

হইতে ভারতবাসী হিন্দু তাহার নিজ ধর্ম ও দর্শন অর্থাৎ সংস্কৃতির মূল বিষয়ে সন্দিহান হইয়াছে এবং তাহার প্রতি অনাস্থা ও অনাদরের ভাব দেখাইয়াছে সেইদিন হইতে তাহার পতন আরম্ভ হইয়াছে। সে দিন গুণিতে হয় ভারতে ইংরেজ শাসন প্রবর্তনের দিন হইতে, ভারতবাসীর রাজ-নৈতিক ও সাংস্কৃতিক দাসত্বের আরম্ভ দিবস হইতে। আজ সে দিন চলিয়া গিয়াছে। ভারতবাসীর অনেক কিছু ত্যাগ ও ক্ষতি স্বীকার করিয়া স্বাধীনতা অর্জন করিয়াছে। এখন তাহাদের নিজ ধর্ম, দর্শন ও সংস্কৃতিতে আত্ম-কিরিয়া আসিবে এবং আবার ভারতীয় সংস্কৃতির মূল প্রবাহ ভারত-বর্ষে প্রবাহিত হইয়া উহাকে শ্রীমণ্ডিত ও শক্তিশালী করিয়া তুলিবে এবং পৃথিবীর সর্বত্র ভারত-মাতাকে গৌরবের আসনে প্রতিষ্ঠিত করিবে এরূপ আশা করা যায়।

এখন ভারতীয় সংস্কৃতিতে দর্শনের স্থান কিরূপ তাহারই আলোচনা করিব। আমরা পূর্বে পঞ্চাঙ্গ সংস্কৃতির কথা বলিয়াছি। ভারতীয় সংস্কৃতিতে এই পঞ্চাঙ্গ বিद्यমান আছে। ভারতের একটা ভাষা ও সাহিত্য আছে, অন্ততঃ পূর্বে সংস্কৃত ভাষাই ভারতীয় ভাষা বলিয়া বিবেচিত হইত। প্রাচীন ভারতে বহু বিজ্ঞানেরও অভ্যুদয় হইয়াছিল। উহার একটা নিজস্ব চাক্ষু-কলাও ছিল, যদিও কালে ইসলামী ও অন্ত্র বিদেশীয় কলার সহিত তাহার সংমিশ্রণ ঘটয়াছে। তাহার পর ভারতীয় আর্থদের যে একটা ধর্ম ও দর্শন ছিল এবং এখনও আছে তাহা স্মরণীয় হইবে স্বীকার করিবেন। ইহাদের মধ্যে দর্শন ভারতীয় সংস্কৃতির প্রধান অঙ্গরূপে বিবেচিত হইবার যোগ্য। কারণ ভারতীয় দর্শনের দৃষ্টিভঙ্গী ও মূল তথ্যগুলি উহার অস্তিত্ব অঙ্গপ্রত্যঙ্গে অঙ্গ-প্রবিষ্ট ও অঙ্গরূপিত হইয়াছে।

আধ্যাত্মিকতা ভারতীয় দর্শনের চিরন্তনী দৃষ্টিভঙ্গী। বৈদিক যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া আধুনিক কাল পর্য্যন্ত ভারতীয় দার্শনিকদের স্থির বিশ্বাস এই যে জীবজগৎ, গ্রহ-নক্ষত্র এবং দেবতারাও এক অলম্বনীয় ধর্মাত্মশাসনের বশবর্তী। ঋগ্বেদে ইহাকেই ঋত বলা হইয়াছে। মীমাংসা দর্শনে যে অপূর্ব অর্থাৎ কর্মফল শক্তির উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় এবং জ্ঞান-বৈশেষিক প্রভৃতি দর্শন শাখায় যে অদৃষ্টের কথা শুনিতে পাওয়া যায় তাহা ঋগ্বেদেরই ভাবান্তর। বোধ হয় ইহা হইতেই বিজ্ঞানসম্বন্ধ কার্য্যকারণ নিয়মের

তায় কর্ম ও কর্মফল নিয়মের অলঙ্ঘনীয়তা সম্বন্ধে বিশ্বাস ভারতীয় ধর্ম ও দর্শনে দৃঢ়মূল হইয়াছে। ভারতীয় দর্শন শাখাগুলির আর কয়েকটি সমান তত্ত্ব হইতেছে—জ্ঞানান্তরবাদ, সংসারের নশ্বরতা, জীবাত্মার অমরত্ব, বন্ধন ও মুক্তির প্রয়োজন। এ ছাড়া অনেক দর্শনে ঈশ্বর, ব্রহ্ম, প্রকৃতি, পুরুষ, মায়ী, অবিভা, নামরূপ প্রভৃতি তত্ত্বের কথা আছে। আবার কোন কোন দর্শনে স্বর্গ, অপবর্গ, পুরুষার্থ, বাগবন্ত প্রভৃতির আলোচনা করা হইয়াছে। মুক্তির উপায়রূপে জীবজগতের যাবতীয় পদার্থের তত্ত্ববিচার, মনস্তত্ত্বের আলোচনা এবং যোগসাধন, কর্ম, ভক্তি ও জ্ঞানমার্গের বিশদ বিবরণ একাধিক দর্শনে পাওয়া যায়।

ভারতীয় দর্শনের প্রত্যয়রাজি, ভাবধারা ও সার্বভৌম তত্ত্বগুলি প্রাচীন ভারতের সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যকে কি ভাবে প্রভাবিত ও পরিপুষ্ট করিয়াছে তাহা সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত মাত্রেই জানেন। প্রাচীন ভারতের কাব্যে, নাটকে, ইতিহাসে, ব্যাকরণে, অলঙ্কারে অর্থাৎ ভাষা ও সাহিত্যের সর্বক্ষেত্রে ভারতীয় দার্শনিক ভাবধারার অল্পবিস্তর পরিচয় পাওয়া যায়। কালিদাস, ভবভূতি প্রভৃতি মহাকাব্যিদের রচনাবলী পাঠ করিলে একথার সত্যতা বুঝা যাইবে। এমন কি পানিনির ব্যাকরণে, পতঞ্জলির মহাভাষ্যেও দার্শনিক তথ্য সম্বলিত একাধিক স্থল পাওয়া যাইবে। পঞ্চাশতের ব্যাকরণের দার্শনিক আলোচনা হইতে পানিনি দর্শনের সৃষ্টি হইয়াছে। আধুনিক কালে ভারতীয় তায় ও দর্শন শাস্ত্র সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের অনেক রচনায় ভাব ও ভাষায় লালিত্য সম্পাদন করিয়াছে। কবিশঙ্কর রবীন্দ্রনাথের অনেক গল্প, কবিতা ও গীতিরচনার মধ্যে উপনিষদ ও বেদান্তের ভাবধারা এমন সুন্দর ও মধুরভাবে বিকশিত হইয়াছে যে ভারতীয় দর্শনের সঙ্গে কিছু পরিচয় না থাকিলে সেগুলি মনোজ্ঞ না হইয়া দুর্বোধ্য বা অবোধ্য বলিয়া মনে হইবে। অল্পরূপভাবে দেখা যায় যে বৈষ্ণবদর্শনের কোন জ্ঞান না থাকিলে বৈষ্ণব সাহিত্য বুঝা অসম্ভব হইয়া পড়ে। দর্শন যে মানুষের ভাষা ও সাহিত্যকে প্রভাবান্বিত করিবে তাহা অতি স্বাভাবিক কথা। ভাষার উৎপত্তি যে ভাবেই হউক না কেন, মানুষের মনের ভাব ও প্রত্যয় তাহার পরিবর্তন ও পরিবর্তন সাধিত করে। মনের ভাব প্রকাশ করিবার

জগতই ভাষার সৃষ্টি! অতএব দার্শনিক চিন্তা যদি মানুষের অপরিহার্য হয়, তবে তাহা প্রকাশ করিবার জন্ত ভাষা ও সাহিত্যেরও বিকাশ ঘটবে।

সকল দেশের দর্শনের ইতিহাসে দেখা যায় যে প্রথমে বিজ্ঞানগুলির পৃথক সত্তা ছিল না, উহারা দর্শনেরই অনঙ্গরূপে বিद्यমান ছিল। পাশ্চাত্যদেশের জড়বিজ্ঞানগুলি প্রথমে প্রাকৃতিক দর্শন (Natural Philosophy) নামে অভিহিত হইত। এতদিন মনোবিজ্ঞান দর্শনের অন্তর্ভুক্ত ছিল। ইদানীং ইহার পৃথক সত্তা কেহ কেহ স্বীকার করেন। ভারতীয় বিজ্ঞানগুলি প্রথমে দর্শনশাস্ত্রের মধ্যেই সম্মিলিত ছিল। জীববিজ্ঞা, রসায়ন, জ্যোতিষ প্রভৃতি বিজ্ঞানে যে সব বিষয় আলোচিত হয় তাহাদের অনেকাংশ ভারতীয় দর্শনের বিভিন্ন শাখাতে বিশেষভাবে প্রতিপাদিত হইয়াছে। স্মার প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের Hindu Chemistry (হিন্দু রসায়ন), আচার্য ব্রজেননাথ শীলের The Positive Sciences of the Ancient Hindus (প্রাচীন হিন্দুদের প্রাকৃতিক বিজ্ঞান) প্রভৃতি গ্রন্থ পাঠ করিলে দেখা যাইবে যে ভারতীয় বিজ্ঞান ও দর্শন অঙ্গাঙ্গীভাবে সম্বন্ধযুক্ত। জীববিজ্ঞা, প্রাণীবিজ্ঞা, আয়ুর্বেদ প্রভৃতি বিজ্ঞানেও দার্শনিক তত্ত্বের আলোক প্রতিফলিত হইয়াছে। এমন কি আয়ুর্বেদে একটা স্বতন্ত্র দর্শন মতের আলোচনা ও প্রতিষ্ঠা দেখিতে পাওয়া যায়। অতএব বলিতে হয়, ভারতীয় সংস্কৃতির বিজ্ঞানরূপ অঙ্গ দর্শনের যথেষ্ট প্রভাব আছে এবং তাহার সমাগ্জ্ঞান অর্জন করিতে হইলে আমাদের দর্শনশাস্ত্রে কিছু ব্যুৎপত্তি লাভ করা আবশ্যিক।

চাক্রকলা (Fine Arts) বলিতে আমরা প্রধানতঃ নৃত্য, গীত, বাগ, নাটক, আলংকার ও ভাস্কর্য্য এই ছয়টি বিষয় বুঝিয়া থাকি। কামসূত্রকার বাৎস্তায়ন চৌষট্টি কলার কথা বলিয়াছেন। ইহার মধ্যে চাক্রকলার সঙ্গে শ্রমশিল্প (Industries) ও যন্ত্রশিল্পের (mechanics) উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। শেষে উল্লিখিত দুইটি বিষয়কে সংস্কৃতির অঙ্গ হিসাবে না ধরিয়া আমরা চাক্রকলাকেই সংস্কৃতির অপরিহার্য্য অনঙ্গরূপে গণনা করিয়াছি। ভারতীয় চাক্রকলার বড়বিধ অঙ্গই দর্শনের নানাবিধ প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। বিশেষ করিয়া

দার্শনিক ভাবের আতরণ ভারতীয় সঙ্গীতের অঙ্গের শোভা বর্ধন করিয়াছে। সুপ্রাচীন বৌদ্ধ গান ও দোহার মধ্যে অনেক দার্শনিক তত্ত্ব নিহিত আছে। জয়দেব, চণ্ডীদাস, তুলসীদাস প্রভৃতি চিরস্মরণীয় কবিদের পদাবলী ও সঙ্গীতাবলীতে অনেক তত্ত্বকথা ও শাস্ত্রকথার সন্ধান পাওয়া যায়। জয়দেবের গীতগোবিন্দ, চণ্ডীদাসের গীত-চিন্তামণি ও শ্রীকৃষ্ণকীর্তন এবং তুলসীদাসের দোহাবলী তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা অনেকেরই জ্ঞানচক্ষুর উন্মেষ করিয়াছে। হরিশচীর্তন ও বাউল প্রভৃতি বৈষ্ণব সঙ্গীতে বৈষ্ণব বেদান্ত-দর্শনের অনেক তত্ত্ব স্থূললিত ছন্দে প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীমদ্ভক্ত সঙ্গীতে তত্ত্বের দার্শনিক মতবাদের আভাস পাওয়া যায়। আধুনিককালে রচিত শ্রীশ্রীকালীকীর্তনের মধ্যে অদ্বৈত-বেদান্তের তত্ত্বকথা যে তাৎপৰ্য্যে পরিচ্ছিন্ন হইয়াছে তাহা গুনিলে বিস্ময় হয়। সাধক রামপ্রসাদের সঙ্গীতে দার্শনিক শক্তিবাদের অপূৰ্ণ পরিচয় পাওয়া যায়। ভারতীয় ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গীতাবলী যে উপনিষদ ও বেদান্তের ভাবধারার গাভীর্ঘ্যে ও মাধুর্য্যে মহিমাঘিত তাহা বলা নিশ্চয়োক্ত। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীতে, বিশেষভাবে তাঁহার গীতাঞ্জলীতে শব্দের মায়াবাদমুক্ত অদ্বৈত-বেদান্তের তত্ত্ব এমনভাবে বঙ্কিত হইয়াছে যে তাহা বিশ্বমানবের শ্রদ্ধা অর্জন করিয়াছে। অতএব ভারতীয় সঙ্গীতের সারমর্ম উপলব্ধি করিতে হইলে এবং উহার রসান্বাদন করিতে গেলে দার্শনিক তত্ত্ববিষয়ে ধাণাযোগ্য জ্ঞান থাকা আবশ্যক।

ভারতীয় সংস্কৃতির ইতিহাসে ধর্ম ও দর্শন চিরকালই এক অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধে আবদ্ধ। পাক্ষাত্য সংস্কৃতির ইতিহাসে কিন্তু ধর্ম ও দর্শনের এরূপ ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক দেখা যায় না। সেখানে কখন উহার পৃথক ও স্বতন্ত্রভাবে নিজ নিজ সত্তা রক্ষা করিয়া চলিয়াছে, আবার কখন দর্শনবিরুদ্ধ সমালোচনা দ্বারা ধর্মমতকে ক্ষুণ্ণ করিয়াছে। অথবা উহার ধ্বংস সাধন করিয়াছে। ভারতীয় দর্শন শাখাগুলি ধর্ম ও

অধ্যাত্মবিচার সহায় ও পরিপোষকরূপেই বিস্তার লাভ করিয়াছে। ভারতীয় ধর্ম বলিতে মুখ্যতঃ আমরা বৈদিক বা হিন্দু ধর্মই বুঝিতে পারি। অবশ্য ভারতভূমিতে বৌদ্ধ, জৈন প্রভৃতি অবৈদিক ধর্মেরও অভ্যুত্থান হইয়াছে। কিন্তু ভারতীয় সকল ধর্মই এক বা ততোধিক দর্শন মতের উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে ও তাহাদের আত্মকূল্য লাভ করিয়াছে। মীমাংসা ও বেদান্ত দর্শনগুলিকে বৈদিক দর্শন বলা যায়, কারণ উহার বেদ বা ঋত্বির স্বতঃ প্রামাণ্য মানিয়া লইয়াই যুক্তিভর দ্বারা প্রতিবাক্যের ব্যাখ্যা ও সামঞ্জস্য বিধান করিবার চেষ্টা করিয়াছে। শ্রায়-বৈশেষিক ও সাংখ্যযোগ দর্শন এভাবে বৈদিক না হইলেও উহার স্বাধীন বিচারপদ্ধতি অবলম্বন করিয়া বৈদিক ধর্মের প্রতিষ্ঠা ও নাস্তিক মতের খণ্ডন করিয়াছে। বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মও নিজ নিজ দর্শনমতের উপর প্রতিষ্ঠিত ও প্রসারিত হইয়াছে। ইহার ফল হইয়াছে এই যে ভারতীয় ধর্ম ও দর্শন পরম্পরের মধ্যে এমন নিবিড়ভাবে অঙ্গপ্রতিষ্ঠ যে ধর্মতত্ত্ব বুঝিতে হইলে দার্শনিক তত্ত্বজ্ঞান অপরিহার্য্য ও অত্যাৱশ্যক। এমন কি কোন কোন স্থলে দর্শন ও ধর্ম প্রায় একই বস্তু হইয়া গিয়াছে। একান্ত সাংখ্য, যোগ, মীমাংসা এবং বেদান্তকে ধর্মও বলা হয় আবার দর্শনও বলা হয়। অতএব ভারতের বিভিন্ন ধর্ম সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করিতে হইলে অথবা জীবনে কোন ধর্ম পালন করিতে গেলে দার্শনিক জ্ঞান-বিচার অবশ্য কর্তব্য ও হিতকর।

এখন আমরা বেশ বুঝিতে পারি যে ভারতীয় সংস্কৃতিকে যদি রক্ষা করিতে হয় এবং উহার সর্বাদীন উন্নতি সাধন করিতে হয়, তবে ভারতীয় দর্শনের পুষ্টি ও শ্রীবৃদ্ধি করিতে হইবে। এই কর্তব্যপালনের দায়িত্ব কেবল ব্যক্তিবিশেষের নয়, উহা সমগ্র জাতির ও রাষ্ট্রের দায়িত্ব। ভারতীয় দর্শনের পুনরুত্থানে সুধীমাত্রেই সচেষ্ট হউন ইহাই কামনা করি।





# দুর্ঘটনা

শ্রীরবীন্দ্রনাথ রায়

মুহুম্ব মলয়ানিল ধোলনচাপার বৃকে শিহরণ জাগায়, দিগন্ত পূর্ণ হয় সৌরভে।

কিন্তু ঋতুবাণলের দিনে কোথায় যায় সেই সৌরভ, বরং ঋতুশাস্ত ছিন্নমূল উজান পাপড়ীচূর্ণের করুণ সমারোহে হৃদয় আকুল করিয়া তোলে।

মানুষের জীবন ও অনুরূপ, অনন্ত স্বপ্নায় উচ্ছল। পাহাড়ী নদীর বস্তার স্থায় সহসা বিপদায় নামিলে সেই দ্রবুল-ছাপান প্লাবনে আশ্রয়হারা তৃণভূচ্ছের মত এখানেও নীরবে ভাসিয়া যাইতে হয় কিম্বা ভাগ্যক্রমে প্রাণে ঝটিকা থাকিলে নিম্নরক্ত তটিনীর বৃকে নড়বড়ে পাথরের মুড়িকুটির স্থায় অসহায় ও কদম্বা জীবন টানিয়া চলিতে হয়। উভয়েই কি কুশী ও বীভৎস!

চন্দ্র সূর্যের উদয় অস্তে ব্যতিক্রম হয় না, অস্তান্ত গ্রহনক্ষত্রের বেলায় ঠিক একই নিয়ম। ক্ষণে ক্ষণে সেখানে দুর্ঘটনা ঘটে না, কিন্তু মানুষের বেলায় ঠিক উল্টো, কেহই খেচ্ছায় আইন ও শাসন মানিয়া চলিতে চাহে না বলিয়া পদে পদে হান্সামার হুট হইয়া থাকে। মানুষের এই প্রবৃত্তিকে শাশ্বত রাখিবার জন্ত প্রত্যেক সংস্থার কত আইনকানুন, কিন্তু দুর্ঘটনার অস্ত নাই।

এক উঠে, বিভিন্ন লোকে রকমারী সমাধান দেন। কিন্তু সকলেই হটকারিতা, দায়িত্বজ্ঞানহীনতা কিম্বা নিয়ম শৃঙ্খলার অবহেলা অন্ততম কারণ বলিয়া বিশ্বাস করেন। মনোবিদরা আরও কিছু বলেন, তাঁহারা মানসিক স্বস্থতার উপরে বেশ জোর দেন। তাঁহারা বলেন মানুষের চেতন-মন কাজের সক্রিয় নিয়ামক হইলেও অবচেতন মনের দায়িত্ব কম নহে। একমাত্র শিক্ষা, শাসন ও অনুশীলন অবচেতন মনের গোপন কাহিনী সংঘের কঠিন নিগড়ে আবদ্ধ রাখে বলিয়া সমাজ ও সংসার বাঁচিয়া থাকে। সর্বত্র সর্বাধিকার সত্য কথা, মনের কথা বলিতে গেলে সংসারে বাস করা সম্ভব হয় না, এমন কি লৌকিক ভদ্রতাও রক্ষা করা দুঃসাহইয়া পড়ে। গীতায় আছে,

কর্মেন্দ্রিয় ক্ষান্ত রাখে, কিন্তু মনে মনে থাকে

ধান যায় ইন্দ্রিয় বিষয়।

সমাজের জুয়ে সংযত থাকিতে হয় বলিয়া মনের অনেক গোপন বাসনা মনেই নিলয় পাইয়া থাকে। কিন্তু ব্যস্তচারী মনের চিত্ত-নিরোধের চোরাবাণিতে দুর্ঘটনা বন্ধ করা সকল সময়ে সম্ভব হয় না।

কত ধন সামগ্রী, জীবন—এমন কি দেশ ও জাতি যে এই দুর্ঘটনার উৎস হইয়া যায় কে সেই খোঁজ রাখে? ম্যালেরিয়া, মহামারী, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা মুক্তবিজ্ঞাত লাগিয়াই আছে, দুর্ঘটনাও ইহাদের চেয়ে

কম যায় না। সাম্প্রতিক ঝড়াবাতায় বিধ্বস্ত দার্জিলিং এর খবর সকলেই শুনিয়াছেন। এই সেদিন পান্সাব মেলের ব্যাপারে প্রায় একশত যাত্রীর জীবনহানি হইল, জীবনহীন হইয়াও রহিল অনুরূপ স্টাটাক্রুজ বিমান অবতরণ ভূমিতে যাত্রীসমেত ওলন্দাজ বিমানের কথা নিশ্চয়ই স্মৃতির ভারে নিশ্চিহ্ন হইয়া যায় নাই। ২৪ জুন আমেরিকান রাজনীতিক, ১০ জন সাংবাদিক এবং অস্তান্ত যাত্রীসহ ৪০ জন যাত্রীর জীবন নাশ বিশেষ উল্লেখযোগ্য দুর্ঘটন।

সম্প্রতি রেলওয়ে-সচিব আরেকবার সাহেব জানাইয়াছেন যে জমিডি দুর্ঘটনা অন্তর্ঘাতীদের কাজ। আনসারী সাহেব ঐ ট্রেনেই ছিলেন, ভাঙ্গাগাড়ী হইতে নিষ্কান্ত হইয়া ফিস্লেটে থোলা দেখিয়াই বলিয়া উঠিলেন যে উহা নিছক ‘স্ট্রাবোটাস’। ভাবিলেন না—ফিস্লেটে আলপা হওয়াটা দুর্ঘটনার কারণ—না দুর্ঘটনার ফল। ইঞ্জিন ধ্বংস হওয়ার লাইনকে লাইন যেখানে ভাঙ্গিয়া চূর্ণ হইয়া যায় সেখানে ফিস্লেটে আস্ত ও অক্ষত থাকিবে কে একথা বলিবে? তথ্য উদ্ঘাটনের চেয়ে অপরের বাড়ি দোষ চাপাইয়া দেওয়ার আত্মতৃপ্তি আছে, রেলওয়ে-সচিব কি এই সহজ পথ ধরিয়াছেন? পুরাতন লাইন বিশেষতঃ নরম মাটির উপরে অক্ষণতাকী পূর্বে বসান লাইনের উপরে নুতন ডিগ্রাইনের অতিক্রম ইঞ্জিন নিরাপদ কি? পুরাতন লাইনের ভারবহন ক্ষমতা সর্বত্র সমান আছে কি? বাড়তি গাড়ীর ওজনের সহিত ভারী ইঞ্জিনের বর্ধিত গতি-বেগ কি বিহিতা দুর্ঘটনার কারণ ছিল? কুজুক কমিটির রিপোর্টে প্যাসিফিক ইঞ্জিনের গতিবেগ সম্বন্ধে কোনও মন্তব্য ছিল কি?

পাইলটের দিওনির্যে ভুল কিম্বা অন্তর্ঘাতীদের কারসাজী, কারণ যাহাই হউক, দুর্ঘটনার শেষ নাই। যানবাহন, রাস্তার ঘাটে, কলকারখানার সর্বত্র, সামান্য ত্রুটি, ব্যক্তিবিশেষের সামান্য লোভ জনসাধারণের বিপদের কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কলিকাতা নগরীর জনবহুল রাস্তার ছবি একবার স্মরণ করুন। দুইদিক হইতে ট্রামগাড়ী যাওয়া আসা করিতেছে; হঠাৎ একথানা বাস্ জটবেগে চলন্ত ট্রামকে পশ্চাতে ফেলিয়া অগ্রগামী সামনের ট্রামের পাশে আসিয়া দাঁড়াইল। ট্রামের ‘কণ্ডাক্টর’ দেখিল তাহার প্রাপ্য যাত্রী “বাস” বেধাৎ করিয়া লইতেছে কাজেই তাহার গতিবেগ বাড়িয়া “বাস”কে কাটাইয়া যাওয়ার প্রবৃত্তি ও মৎসব অস্বাভাবিক নহে, ফলে হয়তো বাসের পাদানীর উপরে দণ্ডায়মান যাত্রী ছিটকাইয়া পড়িয়া এক বীভৎস দৃশ্য সৃষ্টি করিলেন, ভীড় জমিল, ঐ মুহূর্তেই পাশের রিক্সা-ওয়ালা কিম্বা টেলাগাড়ী সবেগে ফুটপাথ চাপিয়া উঠিল। দুই



কজন নাগরিক কিবা বাপমায়ের ছলালের বেধোরে গ্রাণ হারান হানগরী রাত্তার দুর্ঘটনা কষ্টকল্পনা নহে।

কলকারখানা অঞ্চলে বড় রাত্তার বুকের উপর দিয়া মালগাড়ী নিবার রেললাইন (সাইডিং) সর্বত্র ছড়ান আছে। পাহারার যথেষ্ট বহা সন্ধ্যাও লরী, গাড়ী ও ইঞ্জিনের দুর্ঘটনা প্রায়ই লাগিয়া আছে।

বড় বড় কলকারখানার দুর্ঘটনা প্রতিরোধ করিবার জন্ত কত বহা। চোখে চশমা, পায়ে ‘গামবুট’, পরিধানে ‘অ্যাপ্রোণ’, বিবাক্ত্যাস প্রতিহত করিবার জন্ত নাসিকায় প্যাড এবং আরও কত কি! গাটীর পক্ষে, পোষ্টারে ও বিজ্ঞাপনীর সাহায্যে দুর্ঘটনার কলাকল ত সাম্প্রতিক হইতে পারে তাহার সচিত্র বর্ণনা যত্নতত্ত্ব বিজ্ঞাপিত আছে, ভ্রাতাচ লোকে বিপদগ্রস্ত হয়। বহু দুর্ঘটনা বিলম্ব করিয়া দাচিৎ আকস্মিকতাই বিপদের মূল বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। বিধাংশ ক্ষেত্রেই অননোযোগিতা, হটকারিতা কিবা স্বার্থপরতা বিপদের কারণ বলিয়া দেখা গিয়াছে।

চকল নাগরিক-সভ্যতার অত্যধিক যানবাহন সমস্তা অনেকাংশে দুর্ঘটনার কারণ। খেরালী ড্রাইভার কিবা মাতোয়াল গাড়োয়ান যানবাহন সংক্রান্ত নিয়ম শৃঙ্খলায় যথেষ্ট অবহিত না থাকায় নিরীহ পথচারীর বিপদের কারণ হইয়া থাকে। ঠিক একই কারণে তাহাদের জেজদের ক্ষমকতি এবং জীবননাশের সংখ্যাও কম হয় না। অনেক সময় দেখা যায় অনাভিজ্ঞ কিবা অসমসাহসিক পথচারীও রক্তের জটীতে বিপদ ডাকিয়া আনে। নির্দিষ্ট ফুটপাথও না টিয়া যানবাহন চলিবার রাত্তার চলিতে গিয়া উভয়েরই ক্ষতির কারণ হয়। পথচারীর সহিত ক্ষেত্রীওয়ালার ভাড় সম্মিলিত হওয়ায় যানবাহনের সহিত ঠোকাঠুকি আর আকস্মিক ঘটনা নহে, কিন্তু এইরূপ দুর্ঘটনার দায়িত্ব পথচারীর হইলেও যানবাহনের দুর্ভাগ্যই বেশী হয়। ক্ষুদ্র জনতার ড্রাইভার নির্ধাতন কিবা গাড়ী-পোড়ান যুদ্ধোত্তর যন্ত্রের এক নতুন সমস্তা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। মানব কল্যাণের রক্ত রচিত আইন মানুসেই লঙ্ঘন করে, আর মানুষের এই ক্ষুদ্রতা প্রতিরোধ করিবার জন্ত মানুষই লড়াই করিয়া মরে। কিসাচ্ছদ্যন্ত জতঃপরম্।

প্রতিদিনের ঘটনা হইতে কয়েকটি উপাহরণ উদ্ধৃত করিয়া সমস্তান চিত্রী পরিষ্কৃত করিবার প্রয়াস প্রাসঙ্গিক মনে হয়। ব্যক্তি ও সমষ্টির ইতিহাসে দুর্ঘটনার বিশ্বত ইতিহাস কেবল কি অবিস্মিত্রিত্রুণের আকর? না, জাতীয় জীবনের আনন্দপূর্ণ শুভ মুহূর্তের সৃষ্টিও বিপদের অদ্বুত করস্পর্শে সংসাধিত হইয়া উঠিয়াছে।

. পুণ্যানন্দ মহারাজ সংসার-বিমুক্ত সন্ন্যাসী হইয়াও সংসারাসক্ত মরনারীর নিরাশ্রয় শিশুনারায়ণকে ‘মানুষ’ বানাইবার ত্রতে ত্রতী। শিশুপালদের রশদ সংগ্রহ ব্যাপারে স্থানীয় ‘পালকের’ দরবারের জন্ত ‘বাসে’ বাইতেছিলেন। গেরুয়া পোষাক ‘একদম খালি’ বাসে একটু স্থান সংগ্রহে সাহায্য করিয়াছিল। ড্রাইভারের নষ্ট সময় উদ্ধারের চেষ্টায় বেশ কিছু

অগ্রসর হইতেছিল। হঠাৎ ত্রেক চাপিয়া ধরায় ক্যাচ ক্যাচ শব্দ করিয়া সামনে গোল্ডা মারিমাগাড়ী খামিয়া গেল। যাত্রীরা হুমড়ী খাইয়া একে অপরের গায়ে ঠোকাঠুকি লাগিল। পুণ্যানন্দজী হুড়মুড় করিয়া ড্রাইভার সাহেবের খাঁচার দিকে ছিটকাইয়া হাতের বড়ো আঙ্গুলটা ভাঙ্গিয়া বসিলেন। এদিকে দেখি, আর একজন পরিচিত ভ্রাতালোক দাঁতের ব্যথায় বসিয়া পড়িয়াছেন পাশের ভ্রাতালোকের মাথা তাহার গাল ঠুকিয়া দিয়াছে। এই সকল ঘটনার যাত্রীদের একদল মারমুখে হইয়া কণ্ঠস্বরকে তাড়া করিল, কেহ কেহ হাতল না ধরিয়া ‘বাবু’ মতন দাঁড়াইবার অবিস্মৃত-কারিতায় বিক্ষুব্ধ করিয়া উঠিল।

রসিক নৈয়ায়িক হয়তো বলিবেন—ঠিকই হইয়াছে। স্বামিজী মহারাজ সংসারশ্রমকে বৃদ্ধান্ত দেপাইয়া বৃহত্তর সংসারধর্ম পালন করিতেছিলেন, তাই সংসার ঐ বৃড়োআঙ্গুলের নিকটে কিছু আঘাত করিয়া ছাড়িল—আর ঐ ভ্রাতালোক যিনি সারাজীবন দেশী বিলাতী সওদাগরী অক্ষিসে হিসাবের খাতার লাল নীল পেন্সিলের খোঁচা মারিয়া এবং দাঁত বাজাইয়া জীবন অতিবাহিত করিয়াছেন এইবার কয়েকটি দাঁতের খেসারত দিয়া পুণ্যসঞ্চয় করিলেন।

কিন্তু সত্যিই কি তাই! অহরহ প্রতিদিন রাত্তার ঘাটে চলাফেরা করিতে ঠোকাঠুকি লাগিয়াই আছে। নষ্টানীর গুরুঠাকুর হয়তো স্বপ্নে হাসিয়া “বড়ই দুঃখিত” বলিয়া সরিয়া পড়েন, কিবা গোবেচারী হইলে গদগদ হইয়া “আহা আহা” “বড় লজ্জিত” বলিয়া কিকিৎ মুখব্যাধান করেন, যেন কাটাঘায়ে রুনের ছিটা!

বিকৃতিবাবু বীমার দালাল। কথার তুবড়ী, বেশ দুপয়সা হইতেছে, বাড়ী গাড়ী সবই হইয়াছে। ছোটবড় সকল জায়গায় উঠাবসা করিতে হয়। লোকে বলে আহা কি অমায়িক ভ্রাতালোক। ব্যবসার ফিকিরে চলাফেরা করিবার মাঝে পীচালা স্বল্প রাত্তার চলার বেগ মনের গতিকে উদ্ভাস করিয়া দেয়। পিছে থাকা মিছে, পড়ে থাকা মিছে। ঝড়ের বেগে ধূলা উড়াইয়া গাড়ী ছুটয়া চলে। বড় সাধে গড়া মনের সোনালী ছবি গাড়ীর কলরবকে পিছনে কেলিয়া আগাইয়া চলে। সাচ্চা ও মেসীর খোয়াব দেখিতে দেখিতে দিনের কাজ তিনি শেষ করেন। হঠাৎ একদিন রাত্তার লাইট পোষ্টের সহিত থাকা লাগিয়া সোনালী স্বপ্ন ছুটিয়া যায়। লোকে বলিয়া উঠে কাঁচা পরসা, সোনালী নেশায় কয়দিন মেজাজ ঠিক থাকে?

জনৈক বৈজ্ঞানিক কারখানার দিনরাত কাজ করিতেন, প্রতি দিন কতশত বিশ্লেষণ, রকমফের কাজেই তাহার চিত্তবিনোদন। সংলগ্ন কাজে নিযুক্ত থাকাকালীন হঠাৎ একদিন পিপাসার্থ হইয়া ভৃত্যকে জল আনিতে বলিলেন। দুই এক পত্থ জল মুখে দেওয়ার পরেই তিনি চলিয়া পড়িলেন। পরে জানা গেল, সেই গ্রাসে কিছুক্ষণ আগে তিনিই সায়নাইড ত্রবীভূত করিয়াছিলেন। এই বেদনাদায়ক দৃশ্য বাঁহারা দেখিলেন—কিবা বাঁহারা শুনিলেন, সকলের

নিজের ভুলে জীবন দিয়া যে অজ্ঞারের প্রায়শ্চিত্ত করিলেন তাহাও কি কাহার অজানা ছিল ?

আর একজন রাসায়নিকের খবর জানি। তিনি এই সহরের এক রসায়নাগারে কাজ করিতেন। মাঝে মাঝে হঠাৎ তিনি অস্বাভাবিক আনন্দমুখর হইয়া উঠিতেন, আবার কয়েকদিন পরে দেখা বাইত তাঁহার বিষম বদন, বাক্যলাপেও অনিচ্ছুক। একদিন দেখা গেল এসিডে সমস্ত হাতটা পুড়াইয়া বসিয়াছেন, জামার সেই ধার গলিয়া গিয়াছে। ডাক্তার আসিলেন, ঔষধ ও ব্যাণ্ডেজ বাঁধিয়া দেওয়া হইলে রাসায়নিককে জিজ্ঞাসা করিলাম, ব্যাপার কি? এসিড চেঁচারে হাত ডুবায়াছিল কেন? বেগ লজ্জামিশ্রিত বস্ম হাসির সহিত বলিলেন, “দেখছিলাম দাঃ শক্তি তলায় বেশী না উপরে। সন্দেহ হইল—মস্তকে কিছু একটা গোলমাল ঘটয়াছে। নিখিল ডাক্তারকে জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিলেন, প্রত্যেক ঘটনার পিছনেই একটা কারণ থাকে। কারণ কখনও বেশ প্রত্যেক কখনও বা গৌণ মনের অবচেতন দেশে সুযোগের অপেক্ষার অদৃশ্য থাকে। ঠিক অনেকটা বোরকা-পর্যায় নারীর মতন, দৃশ্যমান অথচ অদৃশ্য। হেঁয়ালীটা স্পষ্ট করিতে বলিলে তিনি জানাইলেন যে ঐ ভক্তলোকটি সম্ভব-বিবাহিত। কম্পানীর মেসে থাকিয়া দিন গুজরাণু করেন। পত্রবিভাগজনিত বিরহও তাপে তিনি উত্তেজিত। তাই সামনে যা দেখেন তাই প্রতিরোধ করিতে চাহেন। এসিডের উত্তাপ পরীক্ষা অবচেতন মনের বিজ্ঞোহের বাহ্যিক প্রকাশ। মনোবিজ্ঞানের এই তত্ত্ব পরিষ্কার করিবার জন্য সাম্প্রতিক কয়েকটি দুর্ঘটনায় সংশ্লিষ্ট কর্মীদের স্বীকৃতি তিনি উদাহরণ-রূপে উদ্ধৃত করিলেন।

ব্যষ্টির ক্ষেত্রে দুর্ঘটনা ঘেরণ বিপদ ডাকিয়া আনে, জাতির বেলায় অমুরণ ঘটনা ইতিহাসে বিরল নহে।

পঞ্চদশের অধীশ্বর আনন্দপাল মুসলমান আক্রমণ পন্থাদপ্ত করিবার জন্য উত্তরাপথের রাজপুত্রদের মিলিত সাহায্যে ক্রমবর্ধমান আকগান শক্তিকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য সীমান্তে সৈন্য সমাবেশ করিলেন; রাজ-জ্যোতিষী গণনা করিয়া আক্রমণের সময় পিছাইয়া দিলেন। উপবৃত্ত সময়ে আক্রমণ হইল, কিন্তু শিলাবৃষ্টিতে হিন্দু সৈন্তের অধিকাংশ হতাহত হওয়ার ভারতে মুসলমান অনুপ্রবেশ সহজসাধ্য করিয়া তুলিল।

ভোগলকবংশীয় মহম্মদ-বিন-ভোগলক পাঠান-সম্রাটদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা শিক্ষিত ছিলেন। তাঁহার কল্পনা ছিল, পারস্ত ও চীন বিজয় করিয়া এসিয়ায় সর্বজনমান্য সম্রাট হইবেন। নেপালের পথে নৈবহ্রদ্যোগে তাঁহার সুশিক্ষিত সৈন্য ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়া কেবলমাত্র ভোগলকবংশের নহে, ভারতে পাঠান রাজত্বের ইতিহাস সংক্ষিপ্ত করিয়া তুলিল।

নেপোলিয়ন বোনাপার্ট দিখীজরী সম্রাট। রাশিয়ার আরের দর্পচূর্ণ করিয়া সমগ্র ইউরোপের অধীশ্বর হইবেন, ইহাই ছিল তাঁহার কামনা। যুদ্ধের পথে ওয়ার্শা অতিক্রম করিবার পরে জনশূন্য দক্ষ প্রান্তরের নিরস অভিনন্দন বিজয়ী সম্রাটের চিত্তে বেথীপাত করিতে পারে নাই। উৎস কামনা ও অসংবত লোভ তাহাকে এমনই হটকারী করিয়া

তুলিয়াছিল যে রূপজাতির সক্রিয় নীরব প্রতিরোধ তিনি অনুধাবন করিতে পারেন নাই। এই কারণে যুদ্ধের রাত্তা হইতে তাহাকে প্রত্যাবর্তন করিতে হইয়াছিল। সেই প্রত্যাবর্তনের পথে রুশ সজ্জকের আক্রমণ করায় রক্তের শীলাতুপ রচনা করিয়াছিল, পরাজয়, হতমান ও হতাশা সম্রাটের সেন্ট-হেলেনা কারাগারের সূচনা এখানেই রচিত হইয়াছিল।

বৈচিত্র্যময় প্রকৃতির চিত্র কখনও একরঙ্গা হয় না, ব্যক্তি ও জাতির জীবনে দুর্ঘটনা যেমন একদিকে দুঃখের পশরা টানিয়া আনিয়াছে, ক্ষেত্রান্তরে ঠিক তেমনই সৌভাগ্যের বরমালাও তাহাকেই রচনা করিতে হইয়াছে।

ইংলণ্ডে সবে জয়যাত্রার পতন, স্প্যানিশ আর্মীভার আঘাতে ইংরাজের সুখবর্ণ চিরকালের মতন ইংলিশ চ্যানলে সলিল সমাধি পাইত, কিন্তু দুর্ঘটনার কুলিশ কঠোর হস্তে তাহা না হইয়া ‘রুল ব্রিটানিয়া’ ‘Rule Britannia’ সপ্তসমুদ্রের তরঙ্গে তরঙ্গে ব্রিটেনের জয়গান ভাসিয়া উঠিল। বিরাট স্প্যানিশ আর্মীভা তখনই হইয়া কোথায় খড়ের মতন ভাসিয়া গেল।

ভারত আবিষ্কারের নেশায় মশগুল কলকাতা ও আবেরিগো পথ ভুলিয়া উড়েদিকে জাহাজ চালাইয়া আমেরিকার মতন বিরাট দেশ আবিষ্কৃত না হইলে বিংশ শতাব্দীর সভ্যতার নবতম অবদান ‘এটম’ বোমার ঘাটতি আজ কে পরিপূরণ করিত? পৃথিবীর ইতিহাসে ক্ষুদ্র নাগাসিকী বন্দর কি অক্ষয় মৃত্যুর কীর্ষি অর্জন করিতে সমর্থ হইত?

উড়োজাহাজের বিস্ফোরণে তাইহোকুর নগর্য হাসপাতালে নেতাজী সুভাষের অকাল জীবনাবসান না হইলে কি আজাদ হিন্দ কোজের অক্ষয় বাসনা, দিল্লীর লালকেলার চক্রশোভিত ত্রিধর্ম পতাকা উড্ডীন হইত?

আরব, তাতার ও পাঠানের ভারত আক্রমণ, সংস্কৃতির বিরাট ধ্বংস, শ্রমণ ও ব্রাহ্মণদের পাইকারী হত্যা না হইলে ভারতের প্রজা ও জ্ঞান ছায়া-নিবিড়, ধীর-শান্ত সমতল ভূমি পরিত্যাগ করিয়া তিব্বত, নেপাল, ব্রহ্ম ও জামের গহন প্রদেশে শ্রীবুদ্ধের অমর বাণী প্রচারিত হইত! তাই বলিতেছিলাম সভ্যতার ক্রমবিকাশে দুর্ঘটনা এক বিরাট জয়গা অধিকার করিয়া রহিয়াছে। হী, দুঃখ শোক আনিয়াছে অশ্রুর, সময় সময় হতাশায় বুক ভাসিয়া গিয়াছে, আবার দুর্ঘটনার কড়ি কোমল মধুর আলাপে সজীভ ও জমিয়া উঠিয়াছে।

আধুনিক সভ্যতার অন্ততম ভিত্তি, বিজ্ঞান। এখানকার কাহিনী ও তদ্রূপ। কাহারও সারাজীবনের সাধনা দুর্ঘটনার রুজ বিকাশে বিনষ্ট হইয়াছে। সভ্যজাতি সাধক মিথ্যাকে স্বীকার না করিয়া শত্রুপ্রদত্ত বিশ্ব সহ্যে তুলিয়া লইয়াছেন, তপ্ত লৌহকীলকে দণ্ডায়মান হইয়াও অসত্যকে স্বীকার করেন নাই। সফ্রেটাস, রজার বেকন, গ্যালেলিও কভজনের কথা বলিব। সমাজ সংসার আজ ইহাদের আত্মহতিতে সমৃদ্ধ হইয়াছে। আপেল ফলক হইলেই খরিয়া পড়ে। সকল বৃগে সকলেই ইহা লক্ষ্য করিয়াছেন, কিন্তু স্বাভাৱে জাতিগত পক্ষপাতের কারণে

গল, মাধ্যাকর্ষণতত্ত্ব তিনি আবিষ্কার করিলেন। সংক্ষেপে বস্তু আপন-  
ভাল। বৈজ্ঞানিক ধার্মোমিটার ভাঙ্গিয়া বসিলেন; গবেষণা পণ্ড হওয়ার  
কত না তাঁহার দুঃখ, কিন্তু ভাঙ্গা ধার্মোমিটারের পারদমার্শে পাখাগী  
মহল্যার মুক্তির স্মার রাসায়নিক রং, নীলএর জন্ম হইল। পরিভ্রান্ত  
বৈজ্ঞানিক দিনান্তে আহারে বসিয়া বাহাতেই হাত দেন তাহারই তীব্র  
মিষ্টে বিরক্ত হইয়া পত্নীকে অতিরিক্ত শর্করা ব্যবহারের জন্ত ভৎসনা  
করিতে গিয়া স্বাকারিন্ আবিষ্কার করিলেন। কাজ-পাগল আর  
একজন বৈজ্ঞানিক তৈয়ারী 'ব্রথ' ড্রয়ারে রাখিয়া কাজের বেশায় সকল  
কিছুই বিস্মৃত হইয়াছিলেন। মনে পড়িলে ড্রয়ার খুলিয়া দেখিলেন  
'ব্রথ' ছাতা পড়িয়াছে। হাতে কাজ থাকায় ডিস ঐ ভাবেই ড্রয়ারে  
পড়িয়া রহিল। কয়েকদিন পরে পুনরায় ঐ ব্রথের খেয়াল হইলে  
ডিস বাহির করিয়া দেখিলেন ছত্রাকের পচন হঠাৎ এককোণে বন্ধ  
হইয়া গিয়াছে এবং রঙেরও পরিবর্তন ঘটয়াছে, তাহার খেয়াল হইল  
ছত্রাকের পচন বন্ধ হইতেছে কেন? অনুসন্ধান করিতে গিয়া ডাঃ  
ফ্রেনিং জগদ্বিখ্যাত পেনিসিলিন আবিষ্কার করিলেন, দার্শনিকেরা এই  
জন্তই দুর্ঘটনাকে অবিস্মিত দুঃখের আকর বলিতে চাহেন না। কাজের  
পরিচর তাহার ফলে। আমাদের দেশেই কত উদাহরণ আছে, 'বেলা  
যে পড়ে এল, (সখি) জলকে চল', ভাবুকের কানে এই কথা মরমে  
পশিল, সতাই ত বেলা চলে গেল! এখনই বেরিয়ে পড়ো। লাখে  
লাখে লোক গয়র বিধুপাদপয় \* দেগিয়া ফিরিতেছে, কিন্তু অসহিষ্ণু  
নৈয়য়িক নিমাইএর কি হইল? সহিষ্ণুতার ঠাকুর গৌরান্দ্র প্রেমিক  
মহাপ্রভু মানবের কল্যাণে হরিনাম সঙ্কীর্ণনে রাস্তায় নামিয়া আসিলেন।  
জরামুতু, কেইবা না দেখিতেছে, অমর কে কোথা ভবে? প্রিয়া পত্নীর  
কোলে সম্ভোজাতপুত্র দেগিয়া রাজার ছলারের এত ভাবান্তর কেন?  
কি তিনি দেখিলেন? জগতের দুঃখের বোকা কি তাঁহাকেই পাইয়া  
বসিল? প্রেম, স্বর্দ্ধি ও বৈতরী সন্ধান আর কেইবা দিতে পারিত!  
এইরূপ কত পরিবার হঠাৎ আলোর স্বলকানীতে অশ্রুলাগে ভাসিয়া  
গিয়াছে কিন্তু ত্যাগের এই পশরাংশে জাতি ধন্ত হইয়াছে, পথ ফিরিয়া  
পাইয়াছে, সমৃদ্ধ হইয়াছে।

দীর্ঘ জীবনে বারংবার "দুঃখের আঁধার রাত্রি" কবির জীবনে  
আসিয়াছিল, মৃত্যুর এই মুখোপেক্ষে যতদিন বিশ্বাস করিয়াছিলেন  
ততদিন বিভীষিকার ছলনায় কষ্ট পাইয়াছেন, কিন্তু যেদিন হইতে  
মৃষ্টিপথের সত্য দৃষ্টি তাঁহার নিকটে সহজ ও স্বচ্ছ হইয়া আসিল মৃত্যুভয়  
চিরদিনের মত তাঁহার চিন্তা হইতে অপহৃত হইল, তিনি লিপিলেন—

শুন হতে তুলে নিলে কাঁদে শিশু ভরে

মুহুর্তে আশাস পায় গিয়ে স্তনান্তরে।

বহুবার মৃত্যুর মুখোমুখি হওয়ার রবীন্দ্রনাথএর নিকটে মৃত্যু সহজ  
এবং এত মনোজ্ঞ হইয়া উঠিয়াছিল।

এ সকলই হইল অসাধারণ ও অবিদ্যরগীর ঘটনা, সাধারণ

লোকের জীবনে দুর্ঘটনা আপাততঃ নির্দম ও করণ, এই  
কারণে প্রত্যেক দেশে দুর্ঘটনা বাহাতে আংশিক নিবারিত হয়  
তজ্জন্ত রাষ্ট্রের বহু আইন ও নিয়ম চালু আছে। সমাজও বহু  
সামাজিক আইন-কানুন খাড়া করিতে বাধ্য হইয়াছে। প্রত্যেক  
সংস্কার উদ্দেশ্য মানুষ যদি আংশিকভাবেও মানিয়া চলে, তবে  
অনেক দুর্ঘটনা আশু না ঘটতেও পারে। সহরে সাধারণতঃ লোকজন  
ও গাড়ী ঘোড়ার ভীড়। এই জন্তই এখানে রাস্তার আইন কানুন এত  
বেশী। পথচারীর সুবিধার জন্ত যানবাহনের রাস্তা আলাদা করা  
হইয়াছে। গাড়ী চালাইবার নিয়মাবলী খাড়া করা হইয়াছে। যেখানে  
ভীড় হইবার সম্ভাবনা সেখানে জনতা নিয়ন্ত্রণ করিবার জন্ত রাষ্ট্রের  
ব্যবস্থা আছে। বড় বড় সহরের চৌমাধ্যায় যেখানে গাড়ী ঘোড়া,  
পথচারী, ট্রাম ও বাসের ভীড়, সেখানে একজন সাধারণ পুলিশের  
সাক্ষতিক নির্দেশ ইত্যর ভক্ত সকলেই নির্বিকারে অনুসরণ করিতে বাধ্য  
হয়। কিন্তু এই সহজ শাসনক্রীতি মানব চরিত্রের সামাজিক সাম্য-  
প্রিয়তার এক অপূর্ণ খণ্ডচিত্র মাত্র। সাধারণ মানুষ আত্মকেন্দ্রিক  
এবং আত্মমুখপরায়ণ। এই ব্যক্তিগত স্বার্থপ্রিয়তা তাহার নিজস্ব সহজাত  
স্বভাব। সমাজে বাস কবিত হইলে সমাজের শাসন ও রাষ্ট্রের আদর্শ  
তাহাকে জয়গত দৃষ্টিভঙ্গি হইতে উদ্ধে উঠিতে সাহায্য করে। তাই  
বেথিতে পাওয়া যায় যে মানুষ সাধারণ ট্রাফিক পুলিশের অনুলী সঙ্কেতে  
ব্যক্তিগত ঐর্ষ্যা, ধন ও মান তুলিয়া নীরবে আইনামুগ হইয়া চলে সেই  
মানুষই যখন অনুভব করে যে তাহাকে কেহ দেখিতেছে না এবং যেই  
বুঝিবে যে তাহার কৃতকর্মের কৈফিয়ৎ দিঠে হইবে না তখন পথচারীকে  
'গম্যগাত্রা' করাইয়া নিশ্চিন্তে চলিয়া যায়; তবু তাহার গাড়ীর গতি প্রথ  
করিয়া হতভাগ্যের অবস্থা বুঝিবার জন্ত পিছনে ফিরিয়া চাহে না।  
এইজন্ত বহু আইন সত্ত্বেও দুর্ঘটনা একেবারে নিবারিত হওয়া সম্ভব  
নহে। আধুনিক সমাজের দায়িত্ব এই কারণেই বেশী হইয়া পড়িয়াছে।  
অনুপায় দেখিয়া সমাজ-হিতৈষীরা আইনভঙ্গকারীদের ঠেসাইবার  
দায়িত্ব রাষ্ট্রের হাতে তুলিয়া দিয়াছেন। রাষ্ট্র বহু অনুশাসন,  
ধর্মাদিকরণ এবং শাস্তিরক্ষক প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। কিন্তু কেবলমাত্র  
আইনই মানুষকে আত্মিক পরাজয় হইতে রক্ষা করিতে পারে না।  
ব্যক্তিগত স্বার্থকে 'বহুজন হিতায়' বলিদান তত্ত্বকণই সম্ভব, যতক্ষণ  
জাতির মণিকোঠায় আদর্শ থাকে অন্নান, অনির্বাণ। শিক্ষার প্রসার,  
পারম্পরিক দায়িত্ববোধ, স্পষ্ট দৃষ্টিভঙ্গি, প্রতিবাদীর প্রতি ভালবাসা ও  
জাগ্রত কর্তব্য বোধ অনেক দুর্ঘটনা নিবারণ করিতে সমর্থ হয়।

কিন্তু মানুষের অসহায়তা স্পষ্ট উপলব্ধ হয় প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের  
সময়। ভূমিকম্পে, ঝড়াবাতায় অলোচ্ছাসে কিংবা অতিবৃষ্টিতে পাহাড়  
ধসিয়া ক্ষণিকের মধ্যে সমুদ্রকৃত সত্যতার যে ধ্বংস হয় তাহার  
তুলনা নাই। এই সকল দুর্ঘটনায় হতবাক মানুষের বিলাপ "হা  
হতোম্মি" ও দৈন্ত্যতা ভাবায় প্রকাশে অসমর্থ।

বিগত বিহার ভূমিকম্পে পাকিস্তানী প্রাকৃতিক বিপর্যয়কে লোভা

সাধারণ মানুষ গাছিজীর দৃষ্টিভঙ্গি অনুসরণে অক্ষম বলিয়া তাঁহার এই মন্তব্যে সংবাদপত্রে তুঘল আলোড়ন উঠিয়াছিল। কিন্তু আধুনিক বিজ্ঞান ও দর্শন নৈসর্গিক দুর্ঘটনার আংশিক কারণ দিতে অনেকটা সক্ষম হইয়াছে। মানুষের অসংযত লোভ নৈসর্গিক বিপর্যয়এর অত্যন্ত কারণ।

প্রকৃতি ও মানুষের আজন্ম যোগাযোগ। প্রকৃতির অকুরন্ত ঐশ্বর্য মানুষকে দেয় তাহার আশ্রয় ও শক্তি। শান্ত বনানী, নদী-নালা, দিগন্তবিস্তৃত স্বাকশ, অমল্য নক্ষত্ররাজি, চন্দ্রসূর্য্যের অসীমতা এবং সমুদ্রের বিশালতা মানুষের মনে এনে দেয় স্বৈর্য্য, প্রশান্তি এবং অনির্বচনীয় উদারতা।

কিন্তু দৈবের বিপাকে এই সহজ-পাঠ যদি মানুষের মনকে চিরকাল আকৃষ্ট রাখিতে না পারে (অমল্যের সমস্তায় বাস্তব মানুষ

প্রকৃতির সহিত যোগরক্ষা রাখিতে পারে নাই) তবে সেলোভী ও অমিতব্যয়ী হইয়া উঠে। দহ্য ও তন্দ্রের স্থায় লুপ্তনে মত্ত হওয়ার তাহার মানসিক স্বৈর্য্য ও উদারতা নষ্ট হয়। শব্দক্ষেত্রের বিস্তৃতির সহিত বনানীর ধ্বংস, মণিমুক্তা ও মূল্যবান প্রস্তুতের লোভে পাহাড়-পর্ব্বতের বৃকে খাদ খুঁটি হয়। অরণ্যানী সঙ্কুচিত হওয়ার নৈসর্গিক আবহাওয়া পরিবর্তিত হয়, নদনদী শুষ্ক হইতে থাকে। মরুভূমির বিজয় কেতন সবেগে অগ্রসর হয়। জলধর অসময়ে বারিবর্ষণ করে; শুষ্ক নদনদীতে বজা নামে, ভূমিক্ষয়ে চাষের জমি অনুর্ব্বর হয়, সর্বসহা ধরিজী সর্বনাশী মূর্তি ধারণ করে।

অনন্তের যাত্রাপথে মানুষের স্থান নগণ্য, তাহার দৃষ্টিকোণ কত ক্ষুদ্র এবং সাময়িক। কাজেই প্রকৃতির সংহার মূর্তি মানুষের লোভের পরিণতি কিনা কে বলিবে?

## কবি ও কবিতা

### শ্রীগোপেন্দ্রকৃষ্ণ দত্ত

আধুনিক সমাজে “কবি ও কবিতা”র নামে বহু নিম্নার কথা শুনিতে পাওয়া যায়। কেহ কেহ বলেন ‘কবি’ অর্থে ‘পাগল’ এবং ‘কবিতা’ অর্থে ‘পাগলামো’। আবার কেহ কেহ বলিয়া থাকেন, কবি শুধু কল্পনা লইয়াই বাস্তব বাস্তবের সংঘাতে কল্পনা যে চুরমার হইয়া যায় তাহা তাঁহার জ্ঞান নাই। আবার এমন লোক ও আছেন, যিনি কবির চরিত্রে দোষারোপ করিয়া অপূর্ণ আনন্দলাভ করেন।

ঐহারা বাস্তবকে জীবনের সার করিয়াছেন তাঁহার সর্বকালে জড়বাদী ও অর্থনীতিজ্ঞানসম্পন্ন। জন্মলাভের পর তাঁহার বদ্বিত হইতে থাকেন, আর সেই সঙ্গে হিসাব করিয়া আহার করেন—হিসাব করিয়া লেখাপড়া শেখেন—হিসাব করিয়া বিবাহ করেন—হিসাব করিয়া ভালবাসেন, আর শেষে হিসাব করিয়া গোলাম সাজেন। সুতরাং ‘কবি ও কবিতা’ সম্বন্ধে মতবাদ আমিও তাঁহাদের অর্থনীতি ও জড়বাদিতার গভীর মধ্যে ফেলিয়াই বাচাই করিতে চাই।

জড়বাদিতায় বা অর্থনীতিতে প্রত্যেক বস্তুর গুণাগুণ বিচার হয় উপকারিতা (utility) লইয়া। যে জিনিষ যত উপকারী—যত কল্যাণপ্রদ সে জিনিষ ততই আবশ্যকীয়—ততই মূল্যবান। আইন, চিকিৎসা, রাজনীতি প্রভৃতি বহু বিভাগ আছে বাহাদের প্রত্যেকটি সমাজদেহের কল্যাণসাধন করিয়া থাকে। যিনি আইনজ্ঞ তিনি আইন বিভাগের বাস্তবী কার্য স্বচাঞ্চল্যে সম্পন্ন করিবার চেষ্টা করেন। কিন্তু আইন বহির্ভূত বিষয়ে তাঁহার কিছুমাত্র দক্ষতা থাকে না, যেমন রোগ নির্ণয়ের প্রয়োজন হইলে চিকিৎসককে আহ্বান করা হয়। সর্বক্ষেত্রেই

এই নিয়ম; ইহার ব্যতিক্রম ঘটে না। কিন্তু এই বিশ্বসংসারে ‘মন’ বলিয়া একটা বিভাগ আছে যাহার একমাত্র সম্রাট কবি। আইন, রাজনীতি, সমাজতত্ত্ব, বৈজ্ঞানিক সভ্য প্রভৃতি আলোচিত হয় মনের সাহায্যে। এই মন যদি না থাকে তাহা হইলে আমিহ বিলুপ্ত হয় এবং এই আমিহ বিলুপ্ত হইলে আইনজ্ঞ, রাজনীতিজ্ঞ, চিকিৎসক প্রভৃতি কাহারও ব্যক্তিত্ব থাকে না। সুতরাং মানুষ লইয়া সমাজ এবং প্রত্যেক মানুষই মনের দ্বারা জীবনের বাস্তবী বিষয় ধারণা করিয়া থাকে—চিন্তা করিয়া থাকে,—এই মনরূপ রাজ্যের একমাত্র রাজা কবি; কারণ কবি প্রেরণায় বা ভাব প্রবণতায় যে কবিতা লিখিয়া থাকে তাহা এক মন হইতে আর এক মনে—একদেশ হইতে আর এক দেশে—এক যুগ হইতে আর এক যুগে মনের সাহায্যে পরিচালিত হইয়া থাকে। শেক্সপীরর কবে তাঁহার পুস্তকাবলী লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার লেখা এক দেশ হইতে আর এক দেশে—এক যুগ হইতে আর এক যুগে চালিত হইয়া কত মনের উপর যে আধিপত্য বিস্তার করিয়াছে, করিতেছে ও করিবে তাহার ইয়ত্তা নাই। শুধু শেক্সপীরর কেন? একথা যে কোন কবির লেখা সম্বন্ধেই বলা যায়। হোমার, চসার, গেটে, ডাণ্টে, শীলার, শেলী, কীটস্, ব্রাউনিং, ওয়ার্ডসওয়ার্থ, বাশ্বিকী, কালিদাস, বিজ্ঞাপতি, চণ্ডীদাস, প্রভৃতি ইহ সংসার হইতে চলিয়া গিয়াছেন, ‘কিন্তু তাঁহাদের মনের যে চিন্তাধারা লিপিবদ্ধ হইয়া পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়া আছে, তাহা অনন্তকাল ধরিয়া দেশ হইতে দেশান্তরে—যুগ হইতে যুগান্তরে চালিত হইয়া মানব মনের উপর করিয়াছে রাজত্ব, দিয়াছে প্রেরণা, আনিয়াছে

শান্তি এবং বাহ্য করিয়াছে তাহা এখনও করিতেছে এবং চিরকাল ধরিয়া করিতে থাকিবে। তাই কবি জ্ঞানদাতা, শান্তিদাতা, লোক-শিক্ষক, ভাব-প্রকাশক, ধর্মপ্রচারক ও সমাজ সংস্কারক ; তাই কবি দেশের গৌরব, সমাজের শ্রেষ্ঠাংশ, মনুষ্যত্বের আধার, সত্যের পূজারী, জগতের মর্যাদা।

ওমার বলিয়াছেন—

“The world is Thine, from Thee it rose,  
By Thee it ebbs, by Thee it flows.”

সতাই এ বিশ্বসংসার ভগবানের ; ভগবানের দ্বারাই ইহার সৃষ্টিস্থিতি-প্রলয় প্রবাহ চলিয়া আসিতেছে। কবির সম্বন্ধে এই কথা খাটে ; কারণ কবি মন এই পৃথিবীর মধ্যে যে পৃথিবী রচনা করে তাহা এই সাধারণ মানুষের পৃথিবী হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন এবং সেই পৃথিবীর মধ্যে যে ভাড়াগড়া চলিয়া থাকে তাহাও একেবারে নূতন ধরণের। এখানে শেক্সপীয়ারের A Mid Summer Night's Dream এর কথাগুলি মনে পড়িতেছে। তিনি বলিয়াছেন—

“The Poet's eye in a fine frenzy rolling

Doth glance from heaven to earth, from earth to heaven,  
And as imagination bodies forth

The forms of things unknown, the Poet's pen  
Turns then to shapes, and gives to airy nothing  
A local habitation and a name.”

কবি ও দার্শনিকের মধ্যে এক বনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে এবং তাহারই জন্য প্রমাণীকৃত হয় উভয়েই সত্যের পূজারী বা সত্যের জ্ঞাতি। তবে প্রত্যেক কবিই দার্শনিক, কিন্তু প্রত্যেক দার্শনিক কবি নন। বাহ্য সাধারণ চক্ষু দেখা যায় না, সাধারণ কানে শোনা যায় না, সাধারণ জ্ঞানে জানা যায় না তাহাই প্রকাশিত হয় কাব্যে ও দর্শনে। উচ্চভাবপূর্ণ প্রত্যেক গান বা কবিতা দার্শনিক সত্য প্রকাশ করিয়া থাকে, আর এই দর্শনজ্ঞানলাভ হইলে মনে হয় বিশ্বশ্রুতিমধ্যস্থিত মানবজীবন যেন এক মহাকাব্য বা অনির্বচনীয় সমীচীন ; ইহার রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ-শব্দ এক প্রকার মাদকতার সৃষ্টি করিয়া চতুর্দিক আনন্দময় করিয়া তুলে, আর তাহার ফলে চক্ষু-কর্ণ নাসিকা জিহ্বা-শ্রব এক অপূর্ব প্রেমপ্রবাহে আদ্রুত হইয়া পরমাঙ্গার স্পর্শমুভূতি লাভ করে।

কেহ কেহ বলেন, কবির কবিত্ব ভাবের নেশা, কল্পনার কুহক বা অবাস্তবের ইল্লাজাল। এই “কেহ কেহ”র মতে বৈজ্ঞানিক সত্যই একমাত্র সত্য, ইহা ছাড়া আর সব মিথ্যা। এই “কেহ কেহ” ঘোষণা করেন, ইল্লিয় সাহায্যে বাহ্য অনুভূত হয় তাহাই সত্য বা বাস্তব ; এতদ্ব্যতীত সবই কল্পনা বা অসত্য। কিন্তু আমরা ইল্লিয় সাহায্যে কতটুকুই বা দেখিতে পাই ! আমাদের জ্ঞানের অধিকাংশই পুস্তক বা লোকের কথা বা জনশ্রুতির উপর নিহিত।

আল্ফ্রেডের বিবরণ এই যে, বৈজ্ঞানিক যে সত্য আবিষ্কার করিয়া অহঙ্কার করেন তাহা কল্পনা বলেই সম্বৎ হয় ; কল্পনাই সত্যের বাহক। বৈজ্ঞানিক কি অনুমান বা উপপত্তির সাহায্যে প্রাকৃতিক বিবরণাবলী

ব্যাখ্যা করেন না ? সত্য কথা বলিতে কি, এই কল্পনা ( imagination ) বা উপপত্তির ( hypothesis ) সাহায্যেই বৈজ্ঞানিক সত্যের আবিষ্কার করিতে সমর্থ হন। অধিকন্তু মানবজীবনই তো কল্পনাময় ! এই কল্পনা যদি না থাকিত তাহা হইলে বাস্তবের বাস্তবত্ববোধে মানুষের প্রেম, শ্রদ্ধা, ভক্তি, ধর্মজ্ঞান, স্বপ্ন, শান্তি প্রভৃতি বিধ্বস্ত হইয়া যাইত।

প্রাগৈতিহাসিক যুগে মানব ছিল অসভ্য ; সুতরাং মানব মনে কল্পনার নামগন্ধ ছিল না। এই কল্পনার অভাববশতঃ মানুষ কথায় কথায় অমানুষের কাজ করিয়া ফেলিত। যে কোন উপায়ে আত্মোদার পূর্ণ করাই ছিল তখন তাহাদের একমাত্র কর্তব্যকর্ম। তারপর মানুষ সভ্যতার আলোকে উদ্ভাসিত হইয়া কল্পনামুরাগী হইল এবং এই কল্পনামুরাগ হইতে উদ্ভূত হইল প্রেম, ঈর্ষা, ভক্তি, শ্রদ্ধা ও ভালবাসা। আমার মনে হয় বর্তমান যুগে প্রাগৈতিহাসিক যুগের বর্বরতা বিকশিত হইয়াছে। ইং ১৯৪৬ সালের ১৬ই আগস্ট হইতে যেন সেই বর্বর যুগের পুনরাবর্তন হইয়াছে। এখন মানুষ মানুষকে আর মানুষের চক্ষে দেখে না, কারণ মানুষের মধ্যে হইয়াছে কল্পনার অভাব। সুতরাং কল্পনাজাত ঈর্ষা বা ভক্তি না থাকায় মানুষ দৈহিক তৃপ্তির জন্য মানুষের রক্তপাত করিতেছে।

কল্পনা চিন্তাশীলতার জননী। এই চিন্তাশীলতা না থাকায় মানুষ আজ গভীরতম পাপপঙ্কে নিমজ্জিত হইয়াছে ও হইতেছে। Bertrand Russell বলেন, “A contemplative habit of mind has advantages ranging from the most trivial to the most profound.....”

But while the trivial pleasures of culture have their place as a relief from the trivial worries of practical life, the more important merits of contemplation are in relation to the greatest evils of life, death and pain and cruelty and the blind march of nations into unnecessary disaster.

কবি ঈশ্বরের সৃষ্টি, কারণ যিনি কবি তিনি জন্ম হইতেই কবি। সুতরাং কবি জন্মায় এবং কবিত্বশক্তি ঐশ্বরিক দান। আরি একস্থানে লিখিয়াছি—

“Poets are born, not made,—a fact,  
As poetry shows a divine tact.”

সতাই কবিতা কবির মনে জন্মায় ; চেষ্টা করিয়া কবিতা লেখা যায় না। একটা বীজ যেমন ভূমিতে অঙ্কুরিত হইয়া ধীরে ধীরে পাদপে পরিণত হয় সেইরূপ কোন ভাব কবির মনে উদ্ভিত হইয়া ভাবের পরিচ্ছদে কবিতায় পরিণত হয়। কবিতা ভাবের উচ্ছ্বাস ; ইচ্ছা করিলেই কবিতা রচনা করা যায় না। ইচ্ছার স্রোত ( verse ) রচনা করা বাইতে পারে কিন্তু কবিতা রচনা করা যায় না। এই জন্য Dr. Henry Stephen বলিয়াছেন, “Poetry cannot be made.”

Poetry grows in the mind just as a tree grows in the soil."

এইখানে রাজা বিক্রমাদিত্যের সভার একটি গল্প মনে পড়িল; উহা কবি কালিদাসের কবিত্বশক্তির পরিচায়ক। কালিদাস ছিলেন রাজা বিক্রমাদিত্যের সভার সর্বশ্রেষ্ঠ রত্ন বা কবি। রাজা কালিদাসকে অতিশয় ভালবাসিতেন, কারণ তিনি গুণামুরাগী ছিলেন। ইহাতে সভার একজন (বররচিত্র) ঈর্ষাপরায়ণ হইয়া উঠিলেন। বিক্রমাদিত্য এই ঈর্ষাপরায়ণতা লক্ষ্য করিলেন। রাজা বররচিত্র কবিত্বশক্তির পরীক্ষা করিবার জন্ত সন্মুখস্থ একটি শুক বৃক্ষকাণ্ডকে দেখাইয়া বলিলেন, "আপনি ঐ বৃক্ষকাণ্ডটি কবির ভাষায় বর্ণনা করুন"। বররচিত্র তখনই ঐ কাণ্ডটিকে কবিতায় এইভাবে বর্ণনা করিলেন, "শুষ্ক কাষ্ঠঃ তিষ্ঠত্যগ্রে"। রচনাটি শুনিয়াই রাজা কালিদাসকে ডাকিয়া আনিয়া কাণ্ডটিকে কবিতায় তাহাকে বর্ণনা করিতে বলিলেন। কালিদাস ক্ষণকালের জন্ত চিন্তা করিয়া বলিলেন, "নীরসঃ তরুণঃ পুরতঃ ভাতি"। রাজা তখন বররচিত্রকে আনন্দোৎফুল্ল স্বরে কহিলেন, "এখন বুঝলেন তো, কেন আমি কালিদাসকে ভালবাসি—কেন তাঁকে শ্রেষ্ঠ রত্ন ব'লে গণ্য করি!" বররচিত্র যে ন্যাক রচয়িতা এবং কালিদাস যে কবি, একথা উক্ত রচনাষর পাঠ করিলেই বুঝিতে পারা যায়। এই জন্তই বোধ হয় বিখ্যাত লেখক কারলাইল (Carlyle) বলিয়াছেন, "যিনি কবিতা রচনা করেন কেবল তিনিই কবি নহেন, যিনি কবিতা পাঠ করেন তিনিও কবি।" সত্যই কবিমন না থাকিলে কবিত্বশক্তি বা কবিতার সার উপলব্ধি করা অসম্ভব হয়।

গীতায় আছে—

"নিহি জ্ঞানেন সপুণঃ পবিত্রমিহ বিদ্বতে"—অর্থাৎ জ্ঞানের তুল্য পবিত্র এ অগতে আর কিছুই নাই; আর কবিতা সর্ব জ্ঞানের সার। তাই ইংরাজ কবি ওয়ার্ডসওয়ার্থ (Wordsworth) বলেন, "Poetry is the breath and finer spirit of all knowledge." গল্পলেখক, প্রবন্ধলেখক ও ঔপন্যাসিক যে বিষয় বহু বাক্যপ্রয়োগ দ্বারা প্রকাশ করিয়া থাকেন, কবি তাহা অল্প কথায় লিখিয়া পাঠকমনে চিত্রায়িত করিয়া দেন। মিলটন বলেন, "More is meant than meets the ear" অর্থাৎ কবি তাহার মনের ভাব কথায় গাঁথিয়া এমনভাবে প্রকাশ করেন যাহা গভীরতর অর্থবাহক; তিনি যে শব্দ ব্যবহার করেন ঐ শব্দ ঝড়ত হইয়া কর্ণে প্রবেশ করে এবং সেই সঙ্গে তাহার অন্তর্নিহিত গণ বা গূঢ় অর্থ অন্তরে অঙ্গুভূত হয়; অর্থাৎ শ্রোতা কবিতা পাঠ বা শ্রবণ করিয়া আত্মহারা হইয়া স্বতঃই বলিবেন, "কাণের ভিতর দিয়া যবে পশিল গো, আত্মুল করিল মোর প্রাণ!" এ স্থলে "জনন বধি হাম রূপ নেহারনু নয়ন না তিরপিতভেল, লাখ লাখ যুগ হিরে র রাখনু তবু হিরে জুড়ন না গেল!" (বিভাপতি),

"সবার উপরে দাত্তব সত্য তাহার উপরে নাই"

(চণ্ডীদাস)

"যা" কিছু আমার সকলি কবে নিজ হাতে তুমি তুলিয়া লবে,  
সব ছেড়ে সব পাবো তোমায়, মনে মনে মন তোমারে চায়"

(রবীন্দ্রনাথ),

"Beauty provoketh thieves sooner than gold"

(Shakespeare),

"Our sweetest songs are those that tell of saddest thought" (Shelley).

"True love is the secret sympathy, the silver link, the silken tie which heart to heart and mind to mind in body and in soul can bind" (Scott),

"যাহা চাই তাহা পাই না তো, প্রিয়, পাই শুধু দুঃখ আলা,

আপন মনের ছায়া'তলে ব'সে গাঁথি তাইগীতিমালা", ইত্যাদি .

উল্লেখযোগ্য উদ্ধৃতাংশগুলির এতোকটি কবির কথায় প্রকাশিত হইয়াছে এবং এতোকটিতেই উচ্চারিত শব্দাপেক্ষা অধিকতর ভাব বা অর্থ প্রকটিত হইয়াছে। কিন্তু কোন লেখক বা সমালোচক উহার গূঢ় অর্থ প্রকাশ করিতে বহু বাক্য প্রয়োগ করিতে বাধ্য হইবেন। "Brevity is the soul of wit"; কবির কবিত্ব এই brevity বা সংক্ষিপ্ততার উপর নির্ভর করে।

বিশ্ববিজ্ঞানের উপাধিধারী কোন অধ্যাপক একদিন আমাকে বলিয়াছিলেন, "I don't like Shelleys" (আমি শেলীর মত কবিদের পছন্দ করি না)। তাহার মুখে এই কথা শুনিয়া আমি হাসিয়া ফেলিলাম; বলিলাম, "সেইজন্তই আজ বাংলার এই দুর্দশা! মধুহৃদনকেও আপনারা পছন্দ করেন নি। রবীন্দ্রনাথকেও পছন্দ করেন নি! এখন তাঁদের পছন্দ করছেন।" শেলীর কবিতা হৃদয়ঙ্গম করিবার শক্তি থাকে চাই। বিভাবুদ্ধি না থাকিলে সাধারণতঃ কবিতা বোঝাই যায় না; বিশেষতঃ শেলীর কবিতা বুঝিতে অগাধ পাণ্ডিত্য চাই। ইয়ং (Young) সাহেব শেলীর Adonais-এর যে অংশ বুঝিতে পারেন নাই সেই অংশে খীর অজ্ঞতা স্বীকার করিয়াছেন। আমার মনে হয় কোন ভারতীয় নিজের নিবুদ্ভিতা একপাশে রাখিয়া সাধারণ পাঠককে জানাইতে পারেন না। আমার অনুমান ইউরোপীয় সমালোচকগণ হিন্দুর দর্শনশাস্ত্র ভালভাবে পড়েন নাই; সেইজন্তই তাহারা শেলীর Adonais-এর কোন কোন অংশ হুচাকরণে ব্যাখ্যা করিতে পারেন নাই।

কবির কবিতা সত্যই অনেকই (এই অনেকের মধ্যে তথাকথিত বিদ্বানও আছেন) বুঝিতে পারেন না এবং এই কারণেই কবিতা তাহাদের কাছে দুর্বোধ্য হইয়া পড়ে। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ তাই নিজের কবিতার অর্থ সৎক্বে বলিয়াছেন—

"নানাজনে সেব তাহা নানা অর্থে টানি,

তোমা পানে যায় তা'র শ্বেব অর্থখানি।"



আমাদের রবীন্দ্রনাথকে এখনে বাংলার কেহই বুঝিয়া উঠিতে পারেন নাই। ইং ১৯১৩ সালের পূর্বে আমাদের দেশে অনেক লেখক, সাহিত্যিক, সমালোচক প্রভৃতি জীবিত ছিলেন, কিন্তু তাঁহাদের কাহারও রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা বুঝিবার ক্ষমতা ছিল না বলিলে অত্যাধিক হইবে না। কেবলমাত্র কয়েকজন রবীন্দ্রনাথের লেখা ভালবাসিতেন বা পছন্দ করিতেন। আশ্চর্য্য এই যে, এত বড় বাংলা দেশে—শুধু বাংলা দেশ কেন?—সমগ্র ভারতবর্ষে এমন কাহারও বিভাবৃদ্ধি গজাইল না যে রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা অনুধাবন করিতে পারে। উপরন্তু তথাকথিত সমালোচকগণ বা শিক্ষিত সম্প্রদায় রবীন্দ্রনাথের কবিত্ব শক্তির উল্লেখ করিয়া কত যে ব্যঙ্গ, বিদ্রূপ, টিটকারী ও নাসিকাকুণ্ডন করিয়াছেন তাহার হিসাব দিতে গেলে লোকের গালাগালি কুড়াইতে হয়। যাহা হউক, বাংলা দেশ বা ভারতবর্ষের কেহ যাহাকে চিনিতে পারে নাই তাহার বিশ্বজয়ী প্রতিভা চিনাইয়া দিল পাশ্চাত্য দেশ ১৯১৩ সালে; যেদিন তিনি নোবেল পুরস্কার (Nobel Prize) লাভ করিলেন সেইদিন শুধু বাঙালী নয়—সমস্ত ভারতবাসী হৃৎকণ্ঠে গেল! তখন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাকে “ডি-লিট” উপাধি দান করিলেন—তখন সব বদেশবাসী তাঁহাকে অভিনন্দন জানাইতে গিয়া ব্যাখ্যার লজ্জার স্রিগ্ননাথ

হইয়া ফিরিয়া আসিলেন। কথার আছে “গেয়ো যোগী ভিক্ পার না।” রবীন্দ্রনাথের ভাগ্যে একবার সত্যতা পূর্ণমাত্রায় প্রমাণীকৃত হইয়াছিল। তবে দুঃখ এই যে, রবীন্দ্রনাথ যে কি—কত বড় কবি তাহা জানাইয়া দিল—বুঝাইয়া দিল—শিখাইয়া দিল ইউরোপবাসী! এ বড় লজ্জার কথা!

শ্রোতৃসমূহ রাধাকৃষ্ণ বলিয়াছেন, “To be great is not merely to be talked about, it is also to be misunderstood and Rabindranath has not escaped this fate. The many attempts made to explain him contradict each other; for, from the words of the poet men take what meanings please them.” রবীন্দ্রনাথকে লইয়া বাংলার সংবাদপত্রে যে সমস্ত ব্যঙ্গ, কটুক্তি ও নিন্দাবাদ প্রকাশিত হইয়াছিল সে সমস্ত নীরব ও নিশ্চল হইল সেইদিন, যেদিন তিনি নোবেল পুরস্কার পাইয়া বাংলা সাহিত্যকে সগৌরবে বিশ্বসাহিত্যের সভ্যমণ্ডলে উচ্চাসনে বসাইয়া দিলেন।

আসল কথা, “হৃদয়ে হৃদয় গায় কুণ্ডল চাকিয়া,  
কুজনে কুবব করে হুবব নাশিয়া।”

## স্বপ্ন

### শ্রীহরিরঞ্জন দাশগুপ্ত এম-এ

গরীব মধ্যবিত্তের ঘরে জন্মেছিল শিবনাথ।

কৃতিত্বের সঙ্গে এন্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে সে স্বপ্ন দেখেছিল—ডেপুটি হবার। তার বেশি অগ্রসর হয়নি তার কল্পনা। মকঃস্বলের ছোট্ট মহকুমায় বসে ডেপুটির চেয়ে বড় কোন সরকারী কর্মচারীর অস্তিত্ব অসম্ভব হইতে পারেনি সে। একটি মহকুমার সর্বময় কর্তা! তার চেয়ে বেশি আশা করে কে?

শিবনাথের বাবা পক্ষাঘাত রোগে আক্রান্ত হয়ে “আমিনী” চাকরী ছেড়ে দিয়ে বাড়ি ফিরে আসতে বাধ্য হলেন। ছোট ভাইদের পড়াবার আর বোনদের পোষণ করার দায়িত্ব তাকে নিতে হলো ঘাড় পেতে।

তখন তাদের শহরে রেল-কোম্পানীর নতুন আশিস ঝুলেছে—সবেমাত্র, লোক ভর্তি হচ্ছে দলে দলে। দরখাস্ত করার সঙ্গে সঙ্গেই শিবনাথের চাকরী হোল। তখনকার

দিনে পঞ্চাশটাকা মাইনে। একেবারে সাব-ডেপুটির মাইনের সমান। স্বচ্ছন্দভাবে দিন চলতে লাগলো শিবনাথের।

তার আপত্তি সবেও শিবনাথের বাবা তার বিবাহ দিলেন। শিবনাথ বখারীতি পালন করে যেতে লাগলো তার কর্তব্য। তার আশা—তার ভাইরা মাহুয হবে, তার স্বপ্ন তারা কল্পবে সফল, সবাই তাদের চিন্তে, সম্মান করবে, ভালবাসবে—পৃথিবীর কাছে না হলেও ভারতবর্ষের কাছে অন্তত তার পরিবারটি হবে সুপরিচিত। অমর হবে সে এই দুনিয়ায়, বেঁচে থাকবে তার স্মৃতি।...

তার ভাইরা লেখাপড়া শিখলো, চাকরী পেলো, টাকা রোজগার করতে লাগলো। প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে তারা সরে গেল দূরে—তাদের জীপুজ নিয়ে। ধীরে ধীরে তার সঙ্গে সকল সম্পর্ক ছিন্ন করলো তারা।



শিবনাথের মনখানি কিন্তু হতাশায় ভেঙে গেল না তবু। সে ভাবলো—তার ভাইদের সে মানুষ করেছে—সকলের কাছে বুক ফুলিয়ে দাঁড়াবার মতো শিক্ষা সে তাদের দিয়েছে, মান বেড়েছে তার পরিবারের। এই তো তার সম্মান। সুখে থাক তারা—এই আশীর্বাদই সে তাদের করলো।

তারা গেছে চলে। যাক। তার ছেলেরা বড়ো হচ্ছে। ছেলেদের সে গড়ে তুলবে মনের মতো করে। মানুষ হবে তারা, তাদের মধ্যে সে হবে অমর। কিন্তু পর্যাপ্ত অর্থ নেই তার, ছেলেদের ভালো খাবার দেবার সামর্থ্য কোথায়? তবু, তার ছেলেরা পরীক্ষা পাশ করে যাচ্ছে একটার পর একটা। পরীক্ষা যখন শেষ হবে, তখনই তারা হবে প্রতিষ্ঠিত—তার দুঃখ যাবে ঘুচে।

উচ্চশিক্ষিত হয়েও শিবনাথের ছেলেরা মনোমত চাকরী পেলোনা। কেরানীর ছেলে কি হাকিমী পেতে পারে? সে ছেলেদের কেরানীগিরি করতে দেবেনা—এই তার দৃঢ় পন। কিন্তু এ'বাজারে চাকরী কোথায় পাবে তার ছেলেরা?

বৃদ্ধ হয়েছে শিবনাথ, চুল পেকেছে, চোখের দৃষ্টি হয়েছে ঝাপসা, শক্তিহীন হয়ে পড়েছে তার দু'খানি বাহ। অবসর গ্রহণ করেছে সে। যে কটি টাকা পেয়েছিল সবই হয়েছে নিঃশেষ। দিন চলেনা আর, উপবাস, অর্থাহারে কাটে দিনগুলো। তবু সে লক্ষ্যভ্রষ্ট হবেনা। অনেক হাঁটাইটি, অনেক চেষ্টার পরও তার ছেলেদের চাকরী হলোনা কিছুতেই। প্রতিযোগিতার নামে সর্বস্থলে চলেছে আত্মীয়-পোষণ, দুর্নীতি। দেশের লোকের দুর্বৃত্তার সুযোগে নিয়োগকর্তারা করে যাচ্ছে নির্লজ্জ গ্রহসন। শিবনাথের ইচ্ছা হয়—এর বিরুদ্ধে সে আন্দোলন করে। কিন্তু কেমন করে? কে শুনবে তার কথা? স্বাধীনতা সত্যই কি তার আছে? উপায় নেই গমলোচনা করবার, উপায় নেই বাঁচবার, তবু—। মানুষের চিরন্তন অধিকার থেকে বঞ্চিত এ যুগের মানুষ। তবু—। তারা বাঁচে, তবু চায় বাঁচতে। কেউ বাঁচে সম্পদে, কেউ-বা দৈন্তে-অভাবে, কেউ-বা পরাজিত হয়—জীবন সংগ্রামে; রখে যায়...দীর্ঘশ্বাস—বাতাসের ডানায়।.....

বিশাল নগরী।

কে শোনে কার কথা, কে রাখে কার খবর? শিবনাথের অসুখ। চিকিৎসা চলেনা, ওষুধ নেই, পথ্য ই, ঠাইটুকুর অভাব মাথা জঁজবার। সপরিবারে আশ্রয়

নিয়েছে একটি ভাড়াটে বাড়িতে। গৃহহীন—আত্মীয়-স্বজন থেকে বিচ্ছিন্ন—যেন পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস।

শিবনাথের ছেলে নিশিনাথ তার বাবাকে বললে, এবার সে যেমন করে হোক একটা চাকরী নেবে বোঁগাড় করে—সামান্ত হোক, তবু—।

শিবনাথ বললে, না-না-না—তা'হলে আমি যে শাস্তিতে মরতে পারবোনা। কি আমি চেয়েছিলাম জানিস? আমি চেয়েছিলাম শুধু বাঁচবার মতো বাঁচতে। বেশি চাইনি। সে অধিকার কি আমার নেই? কেন থাকবোনা? পৃথিবীতে এসেছি—এখানে বেঁচে থাকবো। ভাবতে পারিনা, আমার সে আশা পূর্ণ হলোনা; তার আগেই আমি বিদায় নেবো পৃথিবী থেকে। আমি বাঁচবো—তোদের মধ্যে আমি থাকবো মরণধীন। তোরা হতাশ করিসনি আমার।.....

অসুখ সারবার নয় তার। শিবনাথ তবু নির্বিকার। রোগে যন্ত্রণা নেই, মনে সুধু একটিমাত্র চিন্তা—একা—নিশ্চল। তার ছেলেরা বড় হবে, তার জীবনের একমাত্র কামনা হবে সিদ্ধ।...

ডাক্তার আশা ছেড়ে দিয়েছে। ছেলেরা বসে আছে শিয়রের কাছে।

সকালের বাতাস ছুটেছে হহ করে।

টেলিগ্রাম পিয়ন এলো...নিশিনাথের নামে টেলিগ্রাম। নিশিনাথ টেলিগ্রামের খামটি খুললো তাড়াতাড়ি। দেখলো—তার নিয়োগপত্র। দিল্লীতে তার চাকরী হয়েছে—আই, এ, এস, চাকরী।

শিবনাথ তখন মৃত্যুর সঙ্গে যুদ্ধ করতে করতে অবসর হয়ে এসেছিল।

নিশিনাথ দৌড়ে গেল তার বাবার কাছে। তার কানের উপর পড়ে বললে, বাবা, আমার চাকরী হয়েছে—আই, এ, এস। এবার আপনি সেরে উঠুন—এখন আপনার বাঁচা প্রয়োজন—আপনি বাঁচুন বাবা—।

শিবনাথ অতি কষ্টে তার চোখ দুটো খুলে একবার তাকালো নিশিনাথের মুখের দিকে। হাতখানি একবার তুলে তাকে যেন চাইলে আশীর্বাদ করতে। যেন উচ্চারণ করতে চাইলো—শেষ আশীর্বাদী।

তারপর তার নিশ্বাসটুকু গেল বাতাসের সঙ্গে মিশে। শিবনাথের চোখে-মুখে ফুটে উঠেছে একটা গভীর তৃপ্তির ছাপ, তার বাঁচবার সাধ সবই যেন আজ হয়েছে সার্থক।

# রাশি ফল

## জ্যোতি বাচস্পতি

### ভুল শ্রামি

তুলা যদি আপনার জন্মরাশি হয়, অর্থাৎ যে সময় চন্দ্র আকাশে তুলা নক্ষত্রপুঞ্জে ছিলেন সেই সময় যদি আপনার জন্ম হ'য়ে থাকে, তাহ'লে এই রকম ফল হবে—

### প্রকৃতি

তুলা শব্দটি তুলানগের সংক্ষেপ; তার মানে হ'চ্ছে দাঁড়িপাল্লা বা নিক্তি। কাজেই আপনার মনের মূখ্য গতি হ'চ্ছে বিচার ও বিশ্লেষণের দিকে। আপনি নিজের ওজনে সব জিনিষ অনুভব করতে চান, ক্ষুদ্র খুঁটিনাটিকেও আপনার নজর এড়াতে দিতে চান না।

খুঁটিনাটি লক্ষ্য করার এই প্রবৃত্তির জন্ত সব জিনিষের ভিতরের চেয়ে বাইরের দিকে আপনার লক্ষ্য থাকে বেশী এবং দুটো জিনিষের মধ্যে একেবারে চেয়ে ভেদটাই আগে নজরে চেকে। আপনার মনোভাবে সংশ্লেষণের চেয়ে বিশ্লেষণের প্রভাব বেশী।

এই মনোভাবের জন্ত অনেক সময় আপনার মধ্যে সঙ্কল্পের দৃঢ়তা বা মতির স্থিরতা পাওয়া কঠিন হ'য়ে ওঠে। যে কোন বিষয়ে হোক চট্ করে মত পরিবর্তন করা আপনার পক্ষে মোটেই আশ্চর্য নয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও, যে মত বা ধারণা আপনি সাময়িকভাবে পোষণ করেন, তার উপর সেই সময়ের জন্ত প্রায়ই একটা দৃঢ় অনুরাগ বা নিষ্ঠা আপনার মধ্যে দেখতে পাওয়া যায়।

আপনার মধ্যে উদ্ভাবনী শক্তি আছে এবং হাতের কাজ, শিল্পকলা প্রভৃতির দিকে একটা আকর্ষণ এবং তাতে খানিকটা পটুত্ব থাকা সম্ভব। কিন্তু ঐকান্তিক নিষ্ঠার সঙ্গে লেগে থাকা আপনার প্রকৃতি-বিরুদ্ধ বলে আপনার পটুত্ব বা প্রতিভা অনেক সময় কোন কাজে আসে না। তবে ভাগ্যক্রমে যদি কোন উপযুক্ত সহযোগী বা অঙ্গী পান তাহ'লে আপনার গুণগণনা সার্থক হ'য়ে উঠতে পারে।

আপনার মধ্যে উচ্চাকাঙ্ক্ষা যথেষ্ট আছে। কিন্তু কোন্ পথে কীভাবে অগ্রসর হ'লে তা সফল হ'তে পারে—তা অনেক সময় ঠিক করতে পারেন না। অগ্রসর হওয়ার পথে নানা বিধা ও সংশয় মনে উঁকি মারে। অপরের সাহায্য, সহযোগিতা বা উপদেশ আপনার অগ্রগতির পক্ষে একান্ত আবশ্যিক।

আপনার সামাজিক ব্যবহার সাধারণতঃ শিষ্ট ও মধুর এবং সামাজিক আচরণের খুঁটিনাটির দিকে লক্ষ্য খুব বেশী। এমন কি পোষাক পরিচ্ছদেও এচলিত রীতিনীতির ব্যত্যয় দেখলে আপনি ক্ষুব্ধ হ'য়ে ওঠেন। কথাবার্তার অশনে-বসনে সর্বত্র আপনি চান শালীনতা ও শোভনীয়তা।

আপনি সাধারণতঃ আনন্দপ্রিয় হ'লেও, আপনার মধ্যে একটা অধীরতা আছে, যার জন্ত সামান্য ত্রুটি-বিচ্যুতিতেই অনেক সময় আপনি চট্ করে রেগে ওঠেন। কিন্তু আপনার সে রাগ কখনই স্থায়ী হয় না, খড়ের আগুনের মত তা যেমন দপ্ করে জ্বলে ওঠে, তেমনি থপ্ করে নিভেও যায়।

আপনার মধ্যে সমালোচনার সহজ শক্তি আছে, কিন্তু খুঁটিনাটির দিকে বড় বেশী লক্ষ্য বলে অনেক সময় তুচ্ছ বিষয় নিয়ে তর্ক বিতর্কে সে শক্তি অপব্যয়িত হ'তে পারে।

সামাজিক প্রবৃত্তি আপনার মধ্যে খুব প্রবল। কাজেই নিঃসঙ্গ জীবন আপনার পছন্দ নয় এবং একই ভাবে একই আবেষ্টনের মধ্যে বৈশীকণ থাকতে হ'লে আপনি দারুণ অস্বস্তি অনুভব করেন। অপরের সাহচর্য আপনার চাইই।

সহযোগিতা এবং প্রতিদ্বন্দ্বিতা এ দুয়ের কোন একটা না হ'লে আপনার প্রতিভার পূর্ণ বিকাশ হ'তে পারে না। সেইজন্ত যদি সহযোগী না পান, তাহ'লে অনেক সময় ইচ্ছা ক'রে প্রতিদ্বন্দ্বী খুঁটি করতে পারেন।

### অর্থভাগ্য

আর্থিক ব্যাপারে আপনার কোনরকম দুশ্চিন্তা উপস্থিত হ'তে পারে এবং ইতস্ততঃ করার জন্ত অনেক সময় আর্থিক উন্নতির বিষ় ঘটতে পারে। উপার্জনের জন্ত অনেক সময় অপরের সাহায্য প্রয়োজন হবে এবং উপার্জনের হ্রাস বৃদ্ধিও প্রায় ঘটবে। কিন্তু বাণ-বিদ্য বা বিলম্ব ঘটলেও শেষ পর্যন্ত আর্থিক ব্যাপারে নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে পারবেন। তা সত্ত্বেও কিন্তু আর্থিক ব্যাপার নিয়ে কম-বেশী চিন্তা বরাবরই থাকবে।

উত্তরাধিকারহুত্রে আপনার যদিই কিছু প্রাপ্তি হয়, তা রক্ষা করা কঠিন হবে। প্রাপ্য সম্পত্তি পেতে নানারকম বাধা বিঘ্ন ঘটবে এবং তা নিয়ে বিবাদ বিসম্বাদ বা মামলা মোকদ্দমা হওয়াও অসম্ভব নয়। এই বিবাদ বিসম্বাদে লাভ হওয়া দূরে থাক, কাজকর্মের ক্ষতি, অনর্থক ব্যয়, মিথ্যা অপবাদ প্রভৃতির আশঙ্কাই হবে বেশী।

### কর্মজীবন

জীবনের কোন না কোন সময়ে আপনার ব্যাতি ও প্রতিষ্ঠালাভের যথেষ্ট সুযোগ উপস্থিত হবে। কর্মজীবনে অনেক পদস্থ ও প্রতিষ্ঠাশালী বহু ও মুকুবি পেতে পারেন, বঁরা আপনার উন্নতিতে সাহায্য করবেন। দূর সম্পর্কের কোন কোন আত্মীয়ের দ্বারাও কর্মক্ষেত্রে উপকার পেতে পারেন। কর্মের ব্যাপারে অনেক বাধা বিঘ্ন ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা আপনি

বন্ধু ও মুকুন্দের সাহায্যে অতিক্রম করতে সক্ষম হবেন। কিন্তু নিজের চাকলা, অদূরদর্শিতা, সন্দেহ ও সংশয়ের জন্ত আপনার উন্নতি ও প্রতিষ্ঠার বিষয় ঘটতে পারে। কোন কোন ক্ষেত্রে পারিবারিক অবস্থা আপনার উন্নতির পথ রোধ করতে পারে এবং সহসা কর্ম-বিপর্যয় নিয়ে আসতে পারে। শেষ বয়সে বিশেষ করে এ সম্বন্ধে সতর্ক থাকা উচিত। কর্মজীবনে বন্ধু ও মুকুন্দের সাহায্য ও সহযোগিতার উপর নির্ভর করতে পারলে আপনি বেশী উন্নতি করতে পারবেন। আপনার সেই সব কাজ ভাল লাগবে, যাতে আপনার সহযোগিতা পাওয়া যায় এবং যাতে অল্প পরিশ্রমে সাফল্য হ'তে পারে। সাধারণতঃ জন-সাধারণের সম্মুখে আসবার অথবা জনপ্রিয়তা অর্জন করার সুবিধা যে সকল কাজে আছে সেই সকল কাজের দিকে আপনার ঝোঁক থাকতে পারে। যে সকল কাজে হুকুমার শিল্পের সংশ্রব আছে এবং যাতে প্রত্যাশপূর্ণতার পরিচয় দিতে হয় সে সব কাজও আপনার প্রিয় হওয়া সম্ভব। আইনজ্ঞের কাজ, শিক্ষকতা প্রভৃতিরও যোগ্যতা আপনার মধ্যে আছে। চাকরীর চেয়ে প্রেক্ষণ এবং প্রেক্ষণের চেয়ে ব্যবসা-বাণিজ্যে আপনি বেশী কৃতিত্বের পরিচয় দিতে পারবেন। সাধারণতঃ ছোট খাট কোন জায়গায় কাজ করার চেয়ে যেখানে বহু জনের সংশ্রব আছে, এমন কোন বড় জায়গায় কাজ করতে আপনার ভাল লাগবে। কাজেই ব্যবসা করলে আপনার উচিত বাজারে, গঞ্জে অথবা শহরে দোকান বা আড়ত করা। চাকরী করলে সেই সকল স্থানে চাকরী করা উচিত যেখানে বহু কর্মচারী এক সঙ্গে কাজ করে। প্রেক্ষণ করলে তা করা উচিত কোন বড় শহরে। মোট কথা বহুজনের সহযোগে কর্ম আপনার সাফল্য নিয়ে আসবে।

### পারিবারিক

ভ্রাতা ভগ্নীর সংখ্যা আপনার বেশী হওয়াই সম্ভব। আপন ভ্রাতা ভগ্নী ছাড়াও অনেক আত্মীয়ের সাহচর্য আপনাকে করতে হবে। অনেক সময় সহোদর সহোদরার চেয়ে দূর সম্পর্কীয় আত্মীয় বা আত্মীয়ার সঙ্গে বেশী সদ্ভাব ও ঘনিষ্ঠতা হ'তে পারে। মধ্যে মধ্যে আত্মীয়-সম্মেলনে আপনি যথেষ্ট আনন্দ পাবেন এবং কোন কোন আত্মীয়ের দ্বারা আর্থিক হিসাবে বা কাজ করের দিক দিয়ে উপকৃতও হ'তে পারেন। কুচিন্তার দ্বারা আপনার খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠা বৃদ্ধি হওয়াও অসম্ভব নয়।

আপনার পারিবারিক অবস্থা ঠিক এক ভাবে কখনই চলবে না। পারিবারিক আবেষ্টনে কম-বেশী পরিবর্তন প্রায়ই ঘটবে। কোন কোন সময় নিজ পরিবারের চেয়ে অপর পরিবারের সঙ্গে বেশী ঘনিষ্ঠ সংশ্রবও হ'তে পারে। আপনার করের সঙ্গে আপনার পারিবারিক জীবনের কম-বেশী সম্বন্ধ থাকবে। হয়ত করের প্রকৃতি এমন হবে যাতে আপনার পারিবারিক আবেষ্টনে বা গৃহস্থালীর ব্যাপারে ওলট-পালট এনে দেবে; কিংবা এও হ'তে পারে যে আপনার পারিবারিক অবস্থা আপনার উন্নতির জন্তই বা অনতি ও কর্মহানির কারণ হ'তে পাড়বে। শেষ বয়সে পারিবারিক আবেষ্টনে একটা বড় রকম পরিবর্তন হবে, তা সে ভালর জন্তই হোক, আর মন্দে জন্তই হোক।

সন্তান আপনার বেশী না হওয়াই সম্ভব। সন্তানদের মধ্যে কেউ কেউ আপনার বিশেষ উৎসাহ ও দৃষ্টিভঙ্গির কারণ হ'তে পাড়তে পারে।

সেই ক্ষীতির ব্যাপারে আপনার আশাভঙ্গ বা মনোকেট হ'তে পারে এবং সেই সংশ্রবে সত্যি হোক মিথ্যাই হোক, কোন রকম অপব্যয় হওয়াও বিচিত্র নয়।

নিকট কোন আত্মীয় বা মাতৃস্থানীয় কোন আত্মীয়ের গুণ্ড বা প্রকাশ্য শত্রুতায় আপনার পারিবারিক শান্তি ব্যাহত না হয় সে সম্বন্ধে সতর্ক থাকা উচিত।

### বিবাহ

দাম্পত্য ব্যাপারে আপনার আন্তরিকতা লক্ষিত হবে বটে, কিন্তু স্ত্রী (বা স্বামী) আচরণের খুঁটিনাটির দিকে বড় বেশী লক্ষ্য থাকার দরুন, দাম্পত্য জীবনে আপনি খুব সুখী হ'তে পারবেন না। বিবাহের সংশ্রবে আপনার অর্থপ্রাপ্তি বা উন্নতির সাহায্য হ'তে পারে কিন্তু স্ত্রী (বা স্বামী) সঙ্গে খুব ভালরকম বনিবনাও হওয়া কঠিন। এমন কি আপনাদের অবনিবনাও সমাজে প্রকাশ্য সমালোচনার বিষয় হ'তে পারে। অনেক সময় কর্মজীবন অথবা বন্ধুবান্ধবের সংশ্রব আপনার দাম্পত্য-জীবনে বিঘ্ন সৃষ্টি করবে। তা সত্ত্বেও আপনার যদি এমন কারো সঙ্গে বিবাহ হয় যার জন্ম মাস বৈশাখ আষাঢ় কার্তিক অথবা ফাল্গুন, কিংবা যার জন্মতিথি শুক্লপক্ষের দ্বিতীয়া বা কৃষ্ণপক্ষের নবমী, তাহ'লে কতকটা মানিয়ে চলতে পারবেন।

### বন্ধুত্ব

আপনার বন্ধুভাগ্য মোটের উপর ভাল। অনেক হিতকামী বন্ধু আপনি পাবেন যারা নানা দিক দিয়ে আপনার শ্রীবৃদ্ধিতে সাহায্য করবেন। আপনি নিজে কিছু বন্ধুত্বের ব্যাপারে ঠিক একনিষ্ঠ হ'তে পারবেন না। অনেক সময় চাকলা, অবিবাহ বা ইর্ঘ্যার বশবর্তী হ'লে এমন কিছু করে বসবেন যা বন্ধুর বিশেষ অনিষ্টের হেতু হ'লে পাড়তে পারে। আপনি নিজে অনেক সময় বন্ধু পরিবর্তন করবেন এবং এক... বন্ধু ছেড়ে অপর বন্ধুর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সংশ্রব করতে চাইবেন, কিন্তু তৎসম্বন্ধেও বন্ধুদের সদ্ভাব অনেক ক্ষেত্রেই আপনার উপর আটুট থাকবে। যাদের জন্ম মাস আষাঢ়, কার্তিক অথবা ফাল্গুন, কিংবা যাদের জন্ম-তিথি শুক্ল দ্বিতীয়া কি কৃষ্ণ নবমী, তাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব আপনার বিশেষ আনন্দের কারণ হবে।

সম্পত্তির ব্যাপার বা উত্তরাধিকারের সংশ্রবে কিংবা দেনা-পাওনা নিয়ে আপনার দু'চার জন শত্রুর সৃষ্টি হ'তে পারে, বারা আপনার প্রতিষ্ঠাহানি অথবা আর্থিক হিসাবে ক্ষতি করার চেষ্টা করবে, কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠাশালী ব্যক্তির সাহায্যে আপনি শত্রু জয় করতে সক্ষম হবেন।

## স্বাস্থ্য

দৈহিক গঠনে আপনি একটু স্পর্শকাতর হবেন। আহার বিহারের ব্যাপারে সামান্য একটু ব্যতিক্রমও আপনি সহ্য করতে পারেন না। খাওয়া হোক, বাসকটাই হোক—সবই আপনার পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও সুদৃশ্য না হ'লে আপনার দেহ স্বচ্ছন্দ থাকতে চায় না। কোন বিষয়ে বাড়াবাড়ি আপনার সহ্য হয় না। অতিরিক্ত গরম, অতিরিক্ত ঠাণ্ডা, একটানা দীর্ঘ পরিভ্রম সবই আপনার যথাসাধ্য বর্জন করা উচিত। বিশেষ করে কষ্টসাধ্য দৈহিক পরিভ্রম বা ব্যায়াম আপনার স্বাস্থ্যের পক্ষে বিশেষ হানিকর। আপনার দেহের দুর্বল অংশ হ'চ্ছে গলা, হাঁটু, মূত্রস্থলী ও অননৈশ্রিয়। তা ছাড়া চর্মরোগ বা রক্তদুষ্টির প্রবণতাও আপনার মধ্যে আছে। আপনার দেহ ভাল রাখতে হ'লে, একদিকে যেমন ঘি, মাখন প্রভৃতি চর্বিজাতীয় খাদ্য এবং ছানা, ডাল, মাছ মাংস প্রভৃতি প্রোটিন জাতীয় খাদ্যের দরকার, তেমনি আপনার খাদ্য সুবাহু ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্নও হওয়া চাই। একেবারে সাদাসিধা বা মসলা-বাক্ত খাদ্য আপনার স্বাস্থ্যের অমুকুল নয়। মধ্যে মধ্যে বলকারক (টনিক জাতীয়) ঔষধ ব্যবহার আপনার নষ্ট স্বাস্থ্য কিরিয়ে আনতে সাহায্য করবে। কিন্তু ঔষধ ব্যবহারের ব্যাপারেও বাড়াবাড়ি করা উচিত হবে না। আপনার দেহের গঠনই এমনি যে পীড়া হ'লেই দেহে সারাস্থের অভাব ঘটতে পারে, সুতরাং যৌন ব্যাপারে আপনার বিশেষ সংযত হওয়া উচিত। এ বিষয়ে অনিয়ম বা বাড়াবাড়ি হ'লে দেহ অপটু হ'য়ে উঠতে পারে।

## অন্তান্ত ব্যাপার

আপনার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভ্রমণ অনেক হ'তে পারে এবং তাতে আনন্দও পেতে পারেন—কিন্তু একটানা দীর্ঘ ভ্রমণ বা দূরদেশ যাত্রা আপনার

পক্ষে কষ্টকর হওয়াই সম্ভব। তীর্থভ্রমণ বা সমুদ্র ভ্রমণে বিপদ-আপদের আশঙ্কা আছে এবং অনেক ক্ষেত্রেই যে আশা নিয়ে বিদেশে যাবেন তা পূর্ণ হবে না। বিদেশে প্রতিষ্ঠানালী বন্ধুলাভ হ'তে পারে ঘটে এবং তাঁদের সাহায্যে কিছু আনন্দও পেতে পারেন, কিন্তু তাঁরা আপনার অতীষ্ট সিদ্ধিতে বিশেষ সাহায্য করতে পারবেন না।

## স্মরণীয় ঘটনা

আপনার ৬, ১৮, ৩০, ৪২ প্রভৃতি বর্ষগুলি নিজের অথবা পরিবারের কারো সংগ্রহে কোন দুঃখজনক অভিজ্ঞতা হ'তে পারে। ৭, ১২, ১৯, ২৪, ৩১, ৩৬, ৪৩, ৪৮ প্রভৃতি বর্ষগুলিতে কোন উল্লেখযোগ্য আনন্দলাভ সম্ভব।

## বর্ণ

আপনার প্রীতিপ্রদ ও সৌভাগ্যবর্ধক বর্ণ হচ্ছে নীল। নীল রঙের সব রকম প্রকার-ভেদই আপনি ব্যবহার করতে পারেন। কিন্তু গাঢ় নীল রঙ ব্যবহার করা আপনার পক্ষে ভাল। দেহ মনের অসুস্থ অবস্থায় কিন্তু হালকা ও চক্চকে রঙ আপনার ভাল লাগবে।

## রত্ন

আপনার ধারণের উপযোগী রত্ন হ'চ্ছে ইন্ডনীল (Blue diamond), নীলা, কিরোজ (Turquoise) প্রভৃতি। অসুস্থ অবস্থায় ওপ্যাল (Opal) ধারণ করতে পারেন।

যে সকল খ্যাতনামা ব্যক্তি এই রূপিতে জন্মেছেন তাঁদের জনকয়েকের নাম—মাইকেল মধুসূদন দত্ত, কাইজার দ্বিতীয় উইল হেল্ম, রাজা স্তার রাধাকান্ত দেব, প্রসিদ্ধ শাস্ত্রবিজ্ঞানবিদ ডাক্তার কেদারনাথ দাস, প্রসিদ্ধ দার্শনিক হীরেন্দ্রনাথ দত্ত প্রভৃতি।—

## আন্দামান-নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ

অধ্যাপক শ্রীমণীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এ, বি-এল

( পূর্বপ্রকাশিতের পর )

## আন্দামানে জাপানী-রাজ

গুণ্ডার বা অপরাধী সম্বন্ধে ব্যক্তি বা সমষ্টির উপর জাপানীরা যে অত্যাচার করিয়াছে তাহা ছাড়াও সাধারণভাবে নিরীহ নিরস্ত্র অধিবাসীদের উপর যে ব্যাপক অত্যাচার হইয়াছে তাহা কল্পনাহীন। বর্তমানে সরকারী মোটর বিভাগের ভারপ্রাপ্ত অফিসার মিঃ রাহা বলিলেন “আমরা জাপানী রাজত্বে এমন কি বন্ধুর সহিতও কথা বলিতে সাহস পাইতাম না, পাছে অস্ত্র কাহারও কোনরূপ সম্বন্ধ হয়। জাপানী অফিসারের হস্তে নিরস্ত্র চাহুরী করিয়া চুপ করিয়া ধরে বসিয়া থাকিতাম। আমরা কাপড় কিছুই আমাদের ছিল না, ভালো

পোষাক অধিকাংশই জাপানীরা তাহাদের রাজত্বের প্রথম দিকে কাড়িয়া লইয়া ছিল, বাকী যাহা ছিল তাহা তিনবৎসরে সম্পূর্ণরূপে ছিড়িয়া গিয়াছিল। পুরাতন চটের ধলে কাটরা তাহারই প্যাণ্ট এবং জামা প্রস্তুত করিয়া উহাই পরিতাম, এ-ছাড়া রেশমের নিদারুণ অভাব। এক একটি পরিবারকে সপ্তাহে এক সিগারেট টিন-পরিমিত চাউল দেওয়া হইত।” এই সমস্ত কথোপকথনের মধ্যে পকেট হইতে একটি সিগারেট টিন বাহির করিয়া আমাদের দলের ভিতর হইতে একজন ভদ্রলোক মিঃ রাহাকে একটি সিগারেট দিতে যাইলে তিনি বলিলেন “আমি সিগারেট খাওয়া ছাড়িয়া দিয়াছি। জাপানী অধিকারে একটি সিগারেটের দাম হইরাছিল দশ টাকা। টাকা করিয়া দশ টাকার একটি সিগারেট কিনিয়া আমি ও আমার ছই বন্ধু এই তিনজনে শেখ

ধূমপান করিয়াছি, উহার পর প্রতিজ্ঞা করিয়া আর সিগারেট স্পর্শ করি নাই।” তিনি বলিলেন যে খাণ্ডের অভাবে সকলেই ভগ্নবাস্তব হইয়া পড়িয়াছিল; বেরিবারি, রক্ত আমাশয় এবং নানারূপ চর্মরোগ দেখা দিয়াছিল, ইহার উপর নিম্নমিত ভাবে কাজ করিতেই হইত, নচেৎ জাপানীদের হাতে বেত খাইতে হইবে। পোর্টব্লেরারে এমন লোক নাই যে জাপানী রাজত্বে বাস করিয়া কখনও জাপানীর হাতে প্রহার লাভ করে নাই। বলিলেন, “আমরা জীবন্তে মরিয়া ছিলাম—তবে যে কোন মতে বাঁচিয়া ছিলাম সে কেবল রাঙা আঙ্গু আর নারিকেল খাইয়া, নচেৎ পোর্টব্লেরারে একজনও বাঁচিত না।” জাপানী রাজত্বের শেষভাগে ১৯৪৫-এর মাঝামাঝি জাপানীরা যখন খাজানাভাবে মরিয়া হইয়া উঠিয়াছিল, তখন লোকসংখ্যা কমান্বার জন্য উহার যে ব্যবস্থা করিয়াছিল, তাহাও উহাদের নিকট শুনিলাম। উহা এতই অমানুষিক যে শুনিলে বিশ্বাস হয় না, কিন্তু চাক্স দেখিয়াছে এবং নিজের দেহের উপর দিয়া নির্ধ্যাতন ভোগ করিয়াছে এইরূপ লোকের নিকট শোনা বলিয়াই সে কাহিনী নিয়ে দিলাম।

জাপানী রাজত্বের একেবারে শেষভাগে খাজানাভাব যখন তীব্র হইয়া দেখা দিল, তখন জাপানী অফিসারগণ পোর্টব্লেরারের সে সমস্ত লোক প্রত্যক্ষভাবে সরকারী প্রয়োজনে লাগিত না, তাহাদের একদিন বাড়ী হইতে জোর করিয়া লইয়া গিয়া সেলুলার জেলে আটক করিয়া বলিতে লাগিল যে এখানে নিদারুণ খাজানাভাব, চল তোমাদের অন্ত্র রাখিয়া আদিব সেখানে তোমরা প্রচুর খাদ্য পাইবে। লোকে কেহ তাহাদের কথা বিশ্বাস করিল, কেহ বা করিল না, কিন্তু উপায় নাই, জাপানীদের হুকুম মত কাজ করিতেই হইবে। ঐ হতভাগাদের একদিন সেলুলার জেলে আটক রাখিয়া পরদিন সন্ধ্যার পর বলপ্রয়োগে জাহাজে উঠাইতে বাধ্য করা হইল। প্রায় পাঁচ ছয় শত বৃদ্ধ, ত্রীলোক এবং শিশুতে জাহাজ ভর্তি করিয়া ১৯৪৫-এর আগষ্ট মাসের প্রথম সপ্তাহে এই জাহাজ পোর্টব্লেরার বন্দর ছাড়িয়া রওনা দিয়াছিল। দেশের লোক তখন কেহই জানিতে পারে নাই, কিন্তু এই সমস্ত লোককে হাভলক বীপের নিকট লইয়া বাইরা সমুদ্রবন্দে শেষ রাতে জোর করিয়া ফেলিয়া দেওয়া হইয়াছিল। ইহার পরেই জাপানীরা প্রচার করিল যে, যে-বীপে এই লোকগুলিকে পাঠানো হইয়াছে, সেখানে ইহার স্থবে আছে অতএব আরও অনেক লোক সেখানে পাঠানো যায়। অতঃপর জাপানীরা তাহাদের অফিস, কারখানা ও ক্ষেতের শ্রমিক এবং কর্মচারীদের টিকিট দিতে হুকুম করিল কিন্তু কর্মচারীদের স্ত্রী বা সন্তানবর্গকে টিকিট দিল না; বলিল মাত্র টিকিটধারী লোকই পোর্টব্লেরারে থাকিবে, বাকী সকলকেই সেই দূর বীপে গিয়া বাস করিতে হইবে। ১০ই আগষ্ট ১৯৪৫ সালে এইরূপে টিকিটহীন পাঁচ ছয় শত ত্রীলোক ও শিশু একত্র করিয়া জাপানীরা পুনরায় সেলুলার জেলে একত্রিত করিল এবং সন্ধ্যার সময় আর এক জাহাজ ভর্তি করিয়া শেষ রাতে রাঙ্গাকান নামক অন্য একটি বীপের নিকট লইয়া গিয়া জলে ফেলিয়া দেয়। পুনরায় ১৪ই আগষ্ট তারিখে এইরূপে আরও পাঁচ ছয় শত টিকিটহীন ত্রীলোক ও শিশু একত্র

করিয়া সেলুলার জেলে আটক করা হয়, কিন্তু সেদিন আর জাহাজ ছাড়া হয় নাই, পরদিন বিকালে সহসা তাহাদের জেল হইতে ছাড়িয়া দেওয়া হয়। শুধু যে তাহাদের জেল হইতে ছাড়িয়া দেওয়া হইল তাহাই নহে, উপরন্তু পোর্টব্লেরারবাসী প্রত্যেককেই আশ্বাসের পরিমাণ চাউল এবং চিনি জাপানী মিলিটারী গুদাম হইতে বিনামূল্যে সরবরাহ করা হইতে লাগিল। সকলেই অবাক হইয়া গেল। শেষে শোনা গেল যে, ১৫ই আগষ্ট ১৯৪৫ তারিখে জাপান মিত্রশক্তির নিকট আত্মসমর্পণ করিয়াছে। খবরটা লোকমুখে শোনা গেল এবং প্রত্যক্ষভাবে দেখা গেল যে জাপানীরা সহসা নিরস্ত্রশর ভক্ত ও সন্তুষ্ট হইয়া উঠিয়াছে।

২৩শে মার্চ ১৯৪২ হইতে ১৫ই আগষ্ট ১৯৪৫ পর্যন্ত আশ্বামানে জাপানীদের অধিকার এবং অত্যাচার অব্যাহতভাবেই চলিয়াছিল। কোনরূপ সংবাদপত্র ছিল না, কাহারও সহিত কোনরূপ বাকলাপ করিবার সাহস পর্যন্ত লোকের ছিল না, বন্দুক ও তরোয়াল দিয়া নিরস্ত্র দেশের মধ্যে বর্বরতার আঘাত গতি। বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে যে এরূপ বর্বরতা প্রচণ্ডভাবে চলিয়াছিল, সত্য পৃথিবীর সংবাদপত্র পাঠকগণ তাহার কোন আভাসমাত্রও পান নাই।

এই সাড়ে তিন বৎসরকাল সময়ের মধ্যে পোর্টব্লেরারের নাগরিক জীবন একেবারে বিপর্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিল। বাজারে কাপড়, চাউল বা ঔষধ কিছুই পাওয়া যাইত না, কোনদিন কাহাকে দিলে বা মধ্যরাত্রে গ্রেফতার করিয়া লইয়া গিয়া সর্বসমক্ষে মারধোর করিবে, গায়ে আলপিন ফুটাইয়া হত্যা করিবে তাহার কোন স্থিরতা নাই, চোখের সামনে আত্মীয়বন্ধনের লাঞ্ছনা যে কি ভয়াবহ আকার ধারণ করিবে, তাহার কোন ইয়ত্তা নাই। অথচ আত্মগোপন করিয়া পলায়নের কোন উপায়ও নাই, সমুদ্রের মধ্যবর্তী বীপ হইতে কোথায় পলাইবে? এই দুর্ভাগ্য জীবনযাপন করিয়া লোকে একরূপ মরিয়া হইয়া উঠিয়াছিল। এই কয় বৎসরের মধ্যে অনেকগুলি আত্মহত্যাও হইয়াছিল, কিন্তু কতগুলি, তাহার কোন সংখ্যাও কেহ রাখে নাই। দুইবারে কতগুলি লোককে যে সমুদ্রে ফেলা হইয়াছিল, তাহার কোন হিসাবও সঠিক পাওয়া যায় না, তবে জেলের কর্মচারীরা আশ্বাজ করে প্রতিবারে পাঁচ ছয় শত হইবে বলিয়া। ইহাদের যে জলে ফেলা হইয়াছিল, তাহার প্রমাণ এই যে ঐ সমস্ত লোকের মধ্যে কয়েকজন নিতান্ত ভাগ্যের জোরে জীবিত অবস্থায় নিকটবর্তী বীপে আসিয়া পৌঁছিয়াছিল এবং ইংরাজদের দ্বারা আশ্বামান পুনরায় অধিকৃত হওয়ার পর ইহাদের জীবিত অবস্থার উদ্ধার করাও হইয়াছিল। ইহাদের মধ্যে দুইজন পুরুষ এখনও পর্যন্ত পোর্টব্লেরারে চাকুরী করিতেছে। একজনের নাম সত্যনাগর, সে এখানকার কুলী সর্দাররূপে এখনও কাজ করে, অন্ত্রজন দেবীপ্রসাদ, সে Conservator of Forests-এর অফিসে এখনও দপ্তরী কাজ করে। এইরূপ জীবিত আরও কয়েকটি ব্যক্তিকে জাপানী রাজ্যের অবসানের পর তীরস্থূলীন, এ্যালেকজান্দ্রা, হাভলক ইত্যাদি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বীপ হইতে রতপ্রায় অবস্থার উদ্ধার ঘটে।

ইহাদের মুখ হইতেই এই সমস্ত কাহিনী প্রকাশ পাইয়াছে। এই এসঙ্গে জাপানীরা যে কিরূপ হৃদয়হীন, তাহার অস্ত্র উদাহরণও শুনিয়াছি। একটি ঘোড়ার দুইখানি পা কাটিয়া লইয়া উহাকে ব্যাণ্ডেজ করিয়া দিয়া পরদিন বাকী দুইটি পা কাটিয়া লইয়া তৃতীয় দিনে ঘোড়াটিকে পুরাপুরী কাটিয়া রক্ত করিবার কাহিনীও শুনিয়াছি। প্রথম দিনেই ঘোড়াটিকে বধ করিলে তিন চারদিন ধরিয়া পাছে পচা মাংস খাইতে হয়, সেই আশঙ্কায় অল্পে অল্পে কাটিয়া তিনদিন ধরিয়া টাটকা মাংস খাওয়ার ব্যবস্থা নাকি এইরূপেই করা হইত। কোন জাপানী সৈনিক সাংঘাতিকভাবে আহত হইলে তাহাকে গুলি করিয়া হত্যা করিবার জন্ত জাপানী ডাক্তাররাই আদেশ দিতেন, এবং অস্ত্র সহকর্মী জাপানী সৈনিক জল্লাদের ভূমিকায় নির্দিষ্টকরে সেই আদেশ পালন করিত। যন্ত্রণা দেওয়া বা হত্যা করা যেন জাপানীদের নিকট নিত্যন্ত তুচ্ছ একটা ছেলেখেলায় ব্যাপার ছিল।

১৫ই আগস্টের পর পোর্টরেনায়র সম্পূর্ণ অরাজক অবস্থায় রহিল। জাপানীরা কোন কাজই করিত না, ভালো মন্দ কোন বিষয়েই মাথা দিত না, লোক যে যাহা পারিত করিত। এইরূপে প্রায় পাঁচ ছয় সপ্তাহ অতিবাহিত হওয়ার পর ২৬-এ সেপ্টেম্বর প্রথম রেডক্রসের Mercy Ship পোর্টরেনায়রে আসিয়াছিল। এই জাহাজে যাহারা গিয়াছিলেন, তাহারা বলেন যে চট-পরিহিত, রোগগ্রস্ত, মৃতপ্রায় লোক দেখিয়া তাহাদের সত্য মানুষ বলিয়া বিশ্বাস করাই দুঃস্থ হইয়া উঠিয়াছিল। যাহা হউক, এই Mercy Ship এই ধীপে কিছু কাপড়, খাদ্য, শুঁড়া দুধ, ঔষধ ইত্যাদি আনিয়াছিল। ইহার পর ইংরাজের পূর্ণদখল কোজুই অক্টোবর তারিখে এই ধীপে প্রথম পদার্পণ করে। ৪৩ মাস জাপানী রাজত্বে লোকের দুঃখ হইয়াছিল অপরিমিত—তবে তৎসঙ্গে জাপানীদের দ্বারা পোর্টরেনায়রের ৩০ মাইল পাকা রাস্তা, একটি এরোড্রোম, ডকইয়ার্ডের কিছু উন্নতি এবং অসংখ্য শস্তক্ষেত্র গড়িয়া উঠিয়াছিল। জাপানীদের রাজত্বের নিদর্শনস্বরূপ এখনও তাহাদের পরিত্যক্ত কামান, পিলবল, পাহাড়ের নীচের আশ্রয়স্থান এবং জুদাম ঘর ইত্যাদি এখনও অবশিষ্ট আছে। সেগুলির কথা ইতিপূর্বেই গত সংখ্যায় উল্লিখিত হইয়াছে।

জাপানী অত্যাচারের শেষ পরিণামটুকুও বলা উচিত। যুদ্ধান্তে আশ্বা-মানের অত্যাচারী জাপানীগণ মিত্রশক্তির দ্বারা ধৃত হইয়াছিল। সিঙ্গাপুরে ইহাদের যুদ্ধাপরাধী হিসাবে বিচার হয়। এই বিচার আরম্ভ হইয়াছিল ১৯৪৬ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে এবং ঐ বৎসর জুলাই মাসে এই বিচার

শেষ হয়। বিচারে প্রায় ২৫১০ জনের জেল এবং ৪৫ জন জাপানীর মৃত্যুদণ্ড হইয়াছিল। এই বিচারের জন্ত আশ্বামান হইতে অনেককেই সাক্ষীরূপে সিঙ্গাপুরে গিয়াছিলেন। এ ছাড়া শ্রীমান পুন্ডর বাগচী মহাশয়ও অপরাধী সাব্যস্ত হইয়া সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন এবং এখনও তিনি ভারতের জেলে অবরুদ্ধ আছেন। এসময়ক্রে এই নৃত্তে ১৯১০-১৯২২ তারিখের পি-টি-আই-এর সংবাদটুকুও দেওয়া যায়। ঐ সংবাদে বলা হইয়াছে যে, জাপানীদের মধ্যে যুদ্ধাপরাধের জন্ত মোটের উপর পাঁচ ছয় হাজার অপরাধীকে লইয়া তিন হাজারেরও অধিক মামলা চালানো হইয়াছিল, তন্মধ্যে ১০০ মৃত্যুদণ্ড এবং ২,৫০০ কারাদণ্ড হইয়াছে এবং কতকগুলিকে ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। যুদ্ধাপরাধী বন্দী সম্বন্ধে আমাদের ধারণা ছিল যে, পরাজিত শত্রুকে বিজয়ীগণ অবধা লালিত করে, কিন্তু আশ্বামানে লোকমুখে উপরোক্ত অত্যাচার কাহিনী শুনিয়া মনে হইল যে, ঐগুলি যদি সব সত্য হয়, তাহা হইলে মানবতার দিক দিয়া এই বিচার এবং শাস্তি হওয়া সত্যই অস্বাভাবিক। অবশ্য একথা ঠিক যে, জয়ীরাও হয়ত ঐরূপ বা উহাপেক্ষাও অধিক অত্যাচার করে, কিন্তু একজন অপরাধীর শাস্তি দিবার উপযুক্ত কোন শক্তি নাই বলিয়া অপর অপরাধীর বিচার না হওয়ার মধ্যে কোন যুক্তি নাই। উপরন্তু এইরূপ বিচার এবং শাস্তির ব্যবস্থা থাকিলে পরবর্তী যুদ্ধে অত্যাচারীগণ সাবধান হইবেন, কারণ যুদ্ধ চলিবার সময় কে জরী হইবে তাহার কোন নিশ্চয়তাও থাকে না।

উপরোক্ত কাহিনীর সত্যতা সম্বন্ধে আমার ব্যক্তিগতভাবে কোন অভিজ্ঞতা নাই। বিভিন্ন লোকের নিকট হইতে শুনিয়া যাহা পাইয়াছি, তাহাই একত্রিতভাবে লিপিবদ্ধ করিলাম। কেবল এইটুকুই আমার সন্দেহ রহিয়া গেল যে, যে-জাপানীদের ভয়ভীতি ও অসামর্থ্যের স্থখ্যাতিতে পূর্বভারতের মণিপুরীরা ও নাগারা পঞ্চমুখ, সেই জাপানীরাই আশ্বামানে এত বর্বর হইয়া উঠিল কি করিয়া? হয়ত এরূপ হইতে পারে যে, আশ্বাম অভিবাসীদের উপর নেতাজীর প্রত্যক্ষ প্রভাব ছিল, কিম্বা আশ্বামানকে সম্পূর্ণরূপে লোকজনশূন্য করিয়া ও জাপানী উপনিবেশ স্থাপন করিবার জন্ত জাপানী কর্তৃপক্ষ মনস্থ করিয়াছিলেন, কিম্বা অস্ত্র কোন কারণে উভয় স্থানের ব্যবহারে এই বিপরীত পার্থক্য ঘটয়াছিল। যাহা হউক, রাজকুলকে বিশ্বাস না করিবার জন্ত ভারতীয় পণ্ডিতগণ যে উপদেশ দিয়া গিয়াছেন, সেই উপদেশ বাণী শ্রবণ করিয়া মণিপুর ও আশ্বামানের দুই বিপরীত ঘটনার কারণ বিশ্লেষণ করিবার চেষ্টা হইতে দ্বন্দ্ব থাকাই বুদ্ধমানের কাজ। (ক্রমঃ)



# লামার অভিশাপ

শ্রীজনরঞ্জন রায়

একটা বেয়াড়া জায়গার একটা ভুতুড়ে লোকের অভিশাপ।

গল্পটা কুচবিহারের...লোকে বলে ছশো বছর থেকে সেখানে চলিত আছে।

ভুটিয়ারা থাকে যেন সে রাজ্যের উপর তলায়। মাঝের তলায় থাকে একটা পাহাড়ী জাতির লোক। নিচেরতলা খাস কুচবিহার...থাকে কোচ বা রাজবংশীরা। তাদের মধ্যে মাঝের-তলার পাহাড়ী জাতের মেয়েরা খুব সুন্দরী। কে জানে এদেরই আগে কিন্নরী বলা হইত কি-না? তারা সাজগোজও করে খুব...পুরুষরাও কম বিলাসী নয়।

প্রবাদ আছে এই কুচনীপাড়াতেই শিবঠাকুরের বিলাস-রাজ্য ছিল...তা তিনি যে শিবই হোন।

দেশে থাকে ঐ তিন জাতির লোক...তাদের মধ্যে সম্ভাব নাই মোটেই।

আবার এই তিন জাতই বাঙালীদের ভারি হিংসা করে...বাঙালীদের নাম দিয়াছে 'ভাটীয়া' বা দখিনের লোক।

জয়ন্তী পাহাড় হিমালয়েরই একটা ধারা।

বর্ষায় জয়ন্তী পাহাড়ের জলপ্রপাত...দেখিলে মনে হয় স্বর্গ থেকে দেবতার বৃষ্টি সমুদ্রের মুখ খুলিয়া দিয়াছেন।

কুচবিহারের ধলনা নদীতে এই জলের চাপে এখন যেন চল্ না মিয়াছে।

নদী বাহিয়া জয়ন্তী পাহাড়ে উঠিতেছে তিন বন্ধু...ঐ তিন জাতের তিনটি লোক। টাসী ভুটিয়া, রামিয়া পাহাড়ী, আর শকর কোচ। তিন জনেরই লক্ষ্য ব্যবসা। ভোটদের দেশে তারা উঠিতেছে চাল-বোকাই ডিঙি নিয়া। ফিরিবার সময় চালের বদলে সেখান থেকে আনিবে কস্তুরী, মঞ্জিষ্ঠা, মিঠা বিষ, মোম আর মধু।

তারা যতোই উজান উঠিতেছে ততোই শীত বাড়িতেছে দারুণ...তার সঙ্গে পেট জলিতেছে হহ করিয়া। তাদের ধারণা ছিল মহাকালীর মন্দিরে যাইতে ছ'দিনের বেশি লাগিতেই পারে না...আর সেখানে গেলেই পেটভরা

প্রসাদ মিলিবে। এখন বৃষ্টি নৌকায় গেলে ঘুরিয়া-ঘুরিয়া মন্দিরে উঠিতে আরো দুই দিনের কমে হইবে না, তাই তাহারা নৌকা বাধিল একটা শক্ত বেঁটে পাহাড়ী গাছের সঙ্গে। তারপর পিঠে চালের বস্তা নিয়া উপরে উঠিতে লাগিল। দেবীর পূজারী মন্দিরে ঢুকিতে দেয় না...মালগুলো পাহাড়ের নিচে রাখিয়া যাইতে হইবে—টাসী ভুটিয়া এ কথাটা বারবার শোনাইতেছে সঙ্গীদের। সে আরও বলিল—এই ভাটীয়া লামা হেমঙ্গর ভারি পাজি লোক...ঐ উপরে মহাকালের মন্দিরের তিব্বতী লামা-বাবার শিষ্য বলিয়া হেমঙ্গরের এতো সাহস। তিব্বতী লামা যেমন ভুতুড়ে তেমনি গুণী। সবাই তাকে ভয় করে এই তল্লাটে। লম্বা-বুড়ো ঝোপ ঝোপ গোঁফ-দাড়ি...স্তল-চিঠে চামড়ার আলখাল্লা গায়ে...গলায় খট্ খট্ করিতেছে কত জানোয়ারের, কত মানুষের হাড়ের মালা।

মহাকালীর মন্দিরের নিচের পাহাড়ের আড়ালে তারা দুই তিন খেপে আনিয়া বস্তাগুলি নামাইল। আরও থাকিয়া গেল কিছুটা, কিন্তু ধৈর্য্যাহারা তাহারা ক্লেদ...চুকিয়া পড়িল মহাকালীর মন্দিরে।

গুহার মধ্যে দেবীর মাথায় পাহাড় হইতে টপ্‌টপ্‌ করিয়া জল পড়িতেছে...মিট্‌মিট্‌ করিয়া প্রদীপ জলিতেছে সেই অন্ধকারের মধ্যে...ধূপের ধোঁয়া মূহ মূহ উঠিতেছে...বড় বড় পাথরের খোরায় নৈবেদ্য সাজানো।—কোনোটায়া লাপসীর মতো ছুখের সঙ্গে যবের ছাতু ঠাণ্ডায় জমিয়া গিয়াছে। কোনোটায়া গাছের বীজ ভুস্মাতে মধুর-চিনি মাখানো নাদু। কয়েকটা আস্ত-আস্ত পাহাড়ে ফল। ক্লেদ তার ডানায় তাহারা লাফাইয়া পড়িল নৈবেদ্যগুলির উপর। পূজারী ভোগ দিয়া বাহিরে অপেক্ষা করিতেছিলেন সেখানে আগিয়া বসিয়াছিল একটি ভুটানী কুকুর। লোকগুলোকে দেখিয়া কুকুরটা চীৎকার করিয়া উঠিল, ওরিকে পূজারীও হস্তার দিয়া উঠিলেন। যাহা পারিল তাহা নিয়া একটু সরিয়া গেল তিন জনে। পূজারী ক্রোধে



অধীর হইয়া বলিতেছেন—কে ধর্মহীন অনাচারী শেবীর ভোগে বাধা দিলি? তিন বন্ধু চোখে-চোখে কি ইসারা করিল।...কুকুরটা টাসীর উপর ঝাঁপাইয়া পড়িতে চায়...তার টুঁটি ছিঁড়িয়া :দিবে। রামিয়া আর শঙ্কর দুইটা পাখরের ডেলা নিয়া কুকুরটার মাথায় এত জোরে ছুড়িয়া মারিল যে, তার মাথা ফাটিয়া ঘিলু বাহির হইয়া গেল। তারপর বাঘের মতো হেমঙ্গরের উপর লাফাইয়া পড়িল সবাই এক সঙ্গে। তাঁহাকে ধাক্কা দিয়া ফেলিয়া দিল পাহাড় থেকে। তিনি জয়ন্তীর ঘূর্ণাবর্তে পড়িয়া গেলেন। কুকুরটা মৃত্যু-বজ্রণায় চীৎকার করিতে করিতে উপরের পাহাড়ে উঠিতেছিল। সে মহাকালের মন্দিরে বাইতেছিল তার প্রভু হত্যার কথা জানাইতে ঐ তিব্বতী লামাবাবার কাছে। কিন্তু অতো দূর বাইতে পারিল না। কিছু দূর গিয়া একটা মরণ-ডাক ডাকিল। তারপর ঘুরিয়া পড়িয়া গেল।

তিব্বতী লামা মহাকালের পূজা শেষে তখন ঘণ্টের মধ্যে আকাশ-গঙ্গার জলধারা ভরিয়া নিতেছিলেন। তাহা দিয়া দেবতার মাথায় শেব অর্থা চালিয়া দিয়া যাইবেন বলিয়া। মহাকালী মন্দিরেও যেমন, মহাকাল মন্দিরেও সেইরূপ পাহাড় পথে বিন্দু বিন্দু জল ঝরিয়া পড়ে বিগ্রহের মাথার উপর সদা সর্বদা ঐ আকাশ গঙ্গা হইতে। লামার হস্তস্থিত পাত্রটি কাঁপিয়া উঠিল নিচে মহাকালী মন্দিরের কুকুরটির মরণ চিৎকারে। বিপদের সংকেত পাইয়া তিনি নিচে চাহিয়া দেখিলেন হেমঙ্গরের দেহ নদীর আবর্তে গিয়া পড়িয়াছে। সেখান হইতে দেখিতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু দেখিতে পাইলেন না কোনো আততায়ীকে। বিচিত্র ভাষায় তিনি কি সব মন্ত্র আবৃত্তি করিতে করিতে ক্রোধে লাফাইতে লাগিলেন। তাঁর কেশপাশ, হাড়ের মালা, আর চামড়ার আলখাল্লা, যেন ঝড়ের বেগে উঠিতে-পড়িতে লাগিল। তিনি অভিশাপ দিতে লাগিলেন—হেমঙ্গরের হত্যাকারী পালিয়ে গেল বটে আমার কবল থেকে, কিন্তু আমার অভিশাপ তাদের পাছু-পাছু ছুটবে...যেমন কোরে হেমঙ্গরকে তারা মারলে, তেমনি কোরেই তারা মরবে ঠিক শিয়াল-কুকুরের মতো...কল্পনা কোরতে পারেনি এমনি অস্বাভাবিকভাবে! চোখ দুইটা তাঁর জবাহুলের মতো লাল হইয়া উঠিয়াছে। সম্মুখে পাইলে ঐ আততায়ী-

গুলোকে ছিঁড়িয়া ফেলিতেন এমনভাবে দাঁত কড়মড় করিয়া বিকট ভঙ্গী করিতেছেন। তিনি মন্দির মধ্যে গিয়া তুয়ল রবে দামামা বাজাইতে লাগিলেন। পাহাড়ীরা একটা দারুণ বিপদের আশঙ্কায় সাজ-সাজ রব তুলিল। ওদিকে পলাতক সেই লোক তিনটার অন্তরাত্মা শুকাইয়া উঠিল। দিক-বিদিক জ্ঞানশূন্য হইয়া তাহারা নৌকায় আসিয়া বসিল। কোথায় পড়িয়া রহিল সেই সব চালের বোঝা, তাহা দেখিবার অবসর মিলিল না। তখন প্রাণ বাঁচানো সবার আগে...

তারা পলাইতেছে...কানে বাজিতেছে লামার অভিশাপ—মরবে তারা কুকুর-শিয়ালের মতো...কল্পনা করতে পারেনি এমনি অপমৃত্যু হবে।

তারা নৌকা ফেলিয়া দৌড়িতে লাগিল যে যাহার দেশের দিকে। সকলেই পাছু ফিরিয়া চাহিতেছে—বুঝিবা লামা আসিতেছে তাড়া করিয়া!

কয়েক মাস কাটিল, ব্যবসাদাররা আবার আপন আপন ব্যবসায় লাগিয়া গেল। টাসী ভুটিয়া আবার চাল নিয়া জয়ন্তী পাহাড়ে ব্যবসা শুরু করিল। চাল দিয়া সেখান হইতে কস্তুরী প্রভৃতি আনিয়া বেশ দুই পরসো লাভ করিতেছে। কিছুদিন পরে সে চাল কেনার কাজে রামিয়া পাহাড়ীর গ্রামে আসিয়া পড়িল। পাতলাখাওয়া গ্রামে রামিয়ার বাস ছিল। ভাষণ জঙ্গল...হাতী, গণ্ডার, বাঘেভরা গ্রামখানা। রামিয়া এই সব জন্তুর চামড়ার ব্যবসা করিত। চামড়া বিক্রী করিয়া সে হলদিবাড়ি, মাথাভাঙা প্রভৃতি স্থান হইতে চাল, পাট, তামাক নিয়া আসিত। টাসী তার নৌকাখানি তোড়সা নদীর ধারে রাখিয়া পাতলাখাওয়ায় নামিল। গ্রামের লোকরা নদী থেকে খেপলা জাল দিয়া ছোট ছোট মাছ ধরিতেছে। একটা জেলে প্রায় একমণ ওজনের একটা পুঁঠিতোড় মাছ তুলিয়াছে। টাসী খুঁজিতে খুঁজিতে রামিয়া পাহাড়ীর বাড়িতে চলিয়াছে। তার চোখে পড়িল জঙ্গল থেকে বনকুলের স্তবক হাতে বাহির হইতেছে ভ্রাম্মাচ্ছাদিত গোলাপের মতো একটি তরুণী। চোখের জলে তার বুক ভাসিয়া বাইতেছে। টাসীর কি ইচ্ছা হইল ইহাকেই জিজ্ঞাসা করিবে—বন্ধ রামিয়ার কথাটা। টাসীর প্রশ্ন শুনিয়া শোকে ভাঙিয়া পড়িল তরুণীটি। টাসীর বুঝিতে বিলম্ব হইল না যে, এই

জীলোকটিই রামিয়ার জী কুম্দি। রামিয়া তার জীর নাম এবং রূপের কথা বন্ধুদের কাছে প্রায়ই বলিত। কুম্দি রাত্তার উপরেই বসিয়া পড়িল। সে বলিতে লাগিল—সে তার স্বামীর অল্প ভিটার রোজ সকালে বনকুলের স্তবক দিতে যায়, আজও সেখানে ঘাইতেছিল। কি স্তম্ভের ঘর-দোর করিয়াছিল তার স্বামী। তার মনটি ছিল যেমন স্তম্ভের, তার রুচিও ছিল তেমনি স্তম্ভের। কুম্দি বলিল—আমরা দু'জনকে দু'জনে কতো যে ভালোবাসিতাম, কিন্তু কাল হইল একজন বাঙালী ভাটিয়া বাবু। সে এই জঙ্গলের ইজারা নিয়াছিল। সে আমাকে কত যে কুৎসিৎ ইঙ্গিত করিত। একদিন সে আমার স্বামীকে বলিল—তোকে এই জঙ্গল ছেড়ে চলে যেতে হবে তোর জীকে আমার সেবার অল্প রেখে, নইলে আলিয়ে দেবো তোর ঘরবাড়ী। আমরা ভয় খাইয়া গেলাম। গ্রামের লোকদের সব কথা বলিলাম। গ্রামের লোকরাও খুব ভয় করিত এই ভাটিয়াকে। তার বাঘ-মারা বন্দুক, আর কোমরে ঝোলানো তুজালী—যে দেখিত সেই ভয়ে তাকে পথ ছাড়িয়া দিত। এই ভাটিয়া ছোকরা-বাবুর প্রাণের ভয় ছিল না। সে বুনো হাতীর দলের ভিতর দিয়াও তার কাঠের কুলীদের নিয়া আসিত বন্দুকের আওয়াজ করিতে করিতে। একবার সে ঘন জঙ্গলে গিয়াছে, কয়দিন নিশ্চয় কিরিবে না ভাবিয়া আমার স্বামী গন্ত করিতে বাহির হইল। ঘাইবার সময় বলিয়া গেল খুব শীত্রই কিরিবে...তোমার অল্প বলিয়া গেলাম গ্রামের মোড়লকে...সে তোমার উপর নজর রাখিবে। আমি তাকে বেশি বাধা দিতেও পারিলাম না...অনেকদিন বসিয়া আছে। তোড়সা নদীতে ডিঙি ভাসাইয়া সে বলিল—অল্প কোন গ্রামে পালানো যায় তারও খোঁজ নিয়া আসিব, আর এ গ্রামে থাকি নর। চার-পাঁচ দিন না ঘাইতেই দেখিলাম সেই ভাটিয়া বাবু আমার ঘরের চারিদিকে বন্দুক ঝাড়ে নিয়া ঘুরিতেছে। গ্রামের মোড়লকেও খবর দিলাম। তারপর আর তার খোঁজ পাইলাম না সাত-আট দিন। সে যে নদীর ঘাটের জঙ্গলে ওৎ পাতিয়া বসিয়া আছে আমার স্বামীর প্রাণ নিতে তখন তাহা কে জানিত? আবার শোকে ভাটিয়া পড়িল কুম্দি। তারপর কিছু সামলাইয়া নিয়া বলিতে লাগিল—একদিন সন্ধ্যার কিছু আগে আমার স্বামী নৌকা ভিড়াইতেছে

নদীর ঘাটে, গ্রামের জীলোকদের সঙ্গে আমিও তখন নদীতে জল আনিতে গিয়াছি...দড়াম্ দড়াম্ করিয়া দুইটা গুলির আওয়াজ হইল...আমার স্বামীর বুকে পিঠে গুলি বিঁধিয়াছে। চিংকার করিয়া উঠিলাম আমরা। দেখা গেল বাঘের মতো ছুটিয়া আসিতেছে ভাটিয়া বাবু। সে তুজালী দিয়া আমার স্বামীর গলায় চোট বসাইয়া দিল। গ্রামের লোক আসিয়া জাপটাইয়া ধরিল ভাটিয়াকে। তাকে মারিতে মারিতে দেশ ছাড়া করিল...আমি অনাথ হইলাম।

কুম্দি কাঁদিয়া গড়াগড়ি দিতে লাগিল।

বন্ধু রামিয়ার পরিণাম শুনিয়া টানী ভুটিয়া খুব দমিয়া গেল। তাহার কোতুল হইল শব্দর কোচ কোথায় ও কেমন আছে তার খোঁজ নিতে হইবে। সে কুচবিহারের দিকে চলিল। শব্দরের গ্রামে অনেক খুঁজিল...শব্দরের ভাঘের সঙ্গে দেখা হইল। সে বলিল মাস দুই আগে শব্দর তুলার ব্যবসা করিতে সন্ধান নদীতে আসামের দিকে ডিঙি ভাসায়। সেখানে তার একজন আহোম বন্ধু জুটে। আহোম তাকে কামরূপ বা প্রাগজ্যোতিষপুরে তুলাইয়া লইয়া যায়। নরক রাজার রাজ্য বলিয়া ভুটিয়ায়া যেমন ভয় করে, কোচরাও তেমনি ভয় করে এই কামরূপকে। আহোমটা যে প্রতিবার কামরূপে আসে, আর হিরণ্য কামরূপিনীর কাছে হু'তিন মাস কাটাইয়া যায়, তাহা শব্দর জানিত না। আহোম শব্দরকে হিরণ্যর কাছে আনিল, হিরণ্য তত্ত্ব-মন-প্রাণ দিয়া দুই দিনেই শব্দরকে ভেড়া বানাইয়া ফেলিল। আহোম একদিন হিরণ্যকে বলিল—এইবার তুমি আমার সঙ্গে আমার দেশে চলিয়া যাইবে বলিয়াছিলে, কিন্তু দেখিতেছি তারি জমিয়া গেলে এই শব্দর কোচটাকে নিয়া! হিরণ্য বলিল—কোচটাকে মারিয়া ফেল তো...সেই তোমার সঙ্গে আমার ঘাইবার বাধা হইয়াছে। হিরণ্যর সঙ্গে আহোমের পরামর্শ হইয়া গেল—সেই রাজ্জেই শব্দরকে কামাখ্যার গুহার ফেলিয়া পাথর চাপা দিয়া মারিবে...গুহা থেকে তাকে ব্রহ্মপুত্রে ফেলিয়া দিবার তার হিরণ্যর...তারপর দু'চারদিন আহোম কোথাও গা ঢাকা দিয়া থাকিবে...শেষে দু'জনে আসামে পলাইবে। আহোম

ঠিক কথামত কাজ করিল...সেই রাতেই শররকে গুহার কেলিয়া দমবন্ধ করিয়া মারিল। তারপর হিরণ্য কি করে ভাই দেখিতে সে হিরণ্যর বাড়ির আশে-পাশে রাতে অনেক ঘোরাঘুরি করিতেছিল। হিরণ্যর বাড়িতে বাহিরের দোর বন্ধ...বাড়ির মধ্যে হাসির হররা উঠিয়াছে। তার ভারি সন্দেহ হইল। কান পাতিয়া শুনিতে লাগিল ভিতরে কাহারো কি বলিতেছে। দরজার ফাঁক দিয়া দেখিল দুইজন কামরূপীকে হিরণ্য খাওয়াইতেছে...কি চটুল তার চাহনি! কামরূপীদের সে বলিতেছে—আহোমটা তার প্রাণের বন্ধুটাকে কিতাবে খুন করিয়া গা ঢাকা দিয়াছে...তোমরা না থাকিলে লাসটাকে নদীর জলে ফেলাই হইত না...আর লোকে শেষে আমাকেই খুনের দায়ে ফেলিত...আহোমটাকে এইবার তোমরা ধরিয় ফেল, নইলে শেষে আমাকেই সে খুন করিয়া না ফেলে! এবুজন কামরূপী বলিল—কেন তোমার তো খুব ভালবাসার লোক ঐ আহোমটা, এবার আবার কোচটাকেও জুটিয়ে এনেছিল...হু'জনেরই সব কিছু তো লুটলে...আবার দুটোকেই খতম কোরতে চাও কেন? হিরণ্য বলিল—বাড়াবাড়ি করছে যে...কামরূপীদের চেনে না...বিদেশী পেলেই তো আমরা ভেড়া বানিয়ে নিই!

রামিয়ার ভায়ে তারপর বলিল—সেই আহোমটা আমাদের কাছে আসিয়া এই সব কথাই জানাইয়া গেল। হিরণ্যর ঐ রকম কথা শুনিয়া আর সে একদণ্ডও সেখানে দাঁড়ায় নাই। বনের পথে ছুটিতে ছুটিতে সে পলাইয়া আসে। সে বলিল—তোমার মামার মতো আমি অতো কাছা-আলগা ছিলাম না...বেশির ভাগ টাকা-কড়িই একটা গাছের কোটরে লুকাইয়া রাখিতাম...তাই নিয়া পলাইয়া এলাম...আসবার সময় মনে বড় দুঃখ হইল...ভাবিলাম তোমার মামার প্রাণটা নিলাম মিছামিছি একটা কুহকিনীর কথায়...কুকুরে-শিয়ালে খাইবে তার দেহটা, কোনো সঙ্গতি তো হইবে না তার...তাই তার মাথাটা কাটিয়া আনিরাছি এই বলিয়া ঐ আহোমটা মামার মাথাওড় থলেটা আমাদের দিয়া গেল। ঐ দেখুন আমরা মামার মাথাটা এখানে পুঁজিয়া সমাজ দিয়াছি।

টাসী ভুটিয়া দিয়া গেল তার দুইজন বন্ধুর এইভাবে অপমৃত্যুর খবর শুনিয়া। সে বুঝিল এইবার তার পালা...

লামার অভিশাপ কলিবেই কলিবে। রামিয়ার ভায়ে তখন বলিতেছিল—মামা এবার জয়ন্তী পাহাড় থেকে আসিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল—আর পরজীবী পাছু পাছু ঘুরিবে না...এ দোষ তার চিরদিন ছিল। কিন্তু টাসীর কানে সে সব কথা বড় একটা বাইতেছিল না। টাসী ভাবিতেছিল কোথায় সে বাইবে, কোথায় গেলে প্রাণে বাঁচিবে। সে বাইবার জন্ত উঠিল, কিন্তু রামিয়ার ভায়ে তাহাকে বলিল—যখন এদেশে এখন আসিয়া পড়িয়াছেন, তখন এখানকার শিবরাত্রির উৎসব পর্যন্ত থাকিয়া বান, এখানকার এইতো আমাদের প্রধান উৎসব। টাসী শিবরাত্রি পর্যন্ত কুচরিহারে থাকিয়া যাইতে রাজী হইল। সে কুচবিহারের শিব 'বানেশ্বরের' উদ্দেশে মানত করিল—খাসী দিয়া তোমার ভোগ দিব ঠাকুর...অপমৃত্যুর হাত হইতে আমার বাঁচাইও। রামিয়ার ভায়ের আগ্রহে সে তার কাছেই থাকিয়া গেল।

কুচবিহার বসন্তোৎসবে মাতোয়ারা। প্রথমেই মদন-মোহনের বসন্তোৎসব...দোলযাত্রা। তারপর হইবে শৈব বসন্তোৎসব শিবরাত্রি। রাজবাড়ির মদনমোহন, দোলের সময় বানেশ্বরকে নিমন্ত্রণ করিতে নিজে চলিয়াছেন চতুর্দোলে চড়িয়া। শিবের প্রতিভু রাজবাড়িতে না আসিলে মদনমোহনের দোল বসে না। যেন শিবই এখানকার আদি দেবতা, কৃষ্ণঠাকুর আগন্তক। কোচদের শিবগোত্র। দোলের উৎসব চাপা পড়িয়া যায় শিবের উৎসবে। শিবকে নিয়া হিন্দুস্থানময় অন্ত্যজদের মাতামাতি হয় এই সময়। কিন্তু কোচদের বীতংসতা সব দেশকে হার মানাইয়াছে। শিবের কাছে জীবহত্যা করে ইহার। কোন তজ্জের দোহাই দিয়া—তাহা ইহারাই বলিতে পারে। হত্যা করাও হয় না, মাথা ছেঁচিয়া মারা হয়।—সেই শিবরাত্রি আসিল।

হাজার-হাজার লোক শিবের মানসিক-করা খাসীর মাথা ঠুকিয়া আখমরা করিয়াছে...পুণ্ডলি মরণ বরণায় ছট্‌ফট্‌ করিতেছে...সেই রক্ত শিবের মাথার দিতে হইবে। পাতালের গহ্বরে শিব থাকেন। লোকে হড়াহড়ি করিতেছে আগে বাইতে। পণ্ডর পা চারিটা হাতে ঝুলানো সবারই। কানে সবাই বেহাত হইয়া আছে। হুবোণ বুঝিয়া এককল লোক খাসীগুলো কাড়িয়া নিয়া

পলাইতেছে। টাসীর খাসীটাও কে কাড়িয়া লইল। ছোট মন্দির দ্বার দিয়া ভিতরে ঢোকে কার সাঁধ্য। ওদিকে মন্দির হইতে প্রবল শব্দে বটোধ্বনি উঠিয়াছে। টাসী রাগে পাগল হইয়া গিয়াছে। সে বাহ্যকে পাইতেছে কিল-চড় মারিতেছে। তারপর সে চিংকার করিতে লাগিল—কে কোথায় আছ ভুটিয়া বন্ধুসব, এসো আমার সাহায্য করো...শিক্ষা দিতে হবে এই সব কোচদের। সত্যি একদল ভোট কুরখি ছুড়িতে লাগিল। ওদিকে কোচদের লাঠি চলিতেছে। রক্তগন্ধা বহিল। হঠাৎ রামিয়া কোচের ভায়ে হাতের লাঠি স্তব্ধ হইল। তার হাতের লাঠি খাইয়া একটা লোক তার পায়ের তলায় ধুকিতেছে। রামিয়ার ভায়ে চিংকার করিয়া বলিল—খানো...খানো সবাই একটু...শেষে আমার লাঠিতেই টাসীভুটে মরিল না'কি? টাসী একবার চোখ মেলিয়া চাহিল...তারপর সেই যে চোখ বুঁজিল, সেই শেষ।

আমরা অর্থাৎ শ্রোতার দল একবাক্যে বলিলাম—

তারপর...তারপর?...লামার শাপ দেখছি হাড়ে হাড়ে লেগে গেল সব ক'জনার।

পশ্চিম বাঙলার সঙ্গে সেদিন কুচবিহার রাজ্য মিলিয়া গেল। আমরা কয়জন বাঙালী বন্ধু ক্লাবে বসিয়া খুব আনন্দ করিতেছিলাম। আমাদের মধ্যেই একজন তখন এই গল্পটি বলিতেছিলেন।

আমরা বলিলাম—ভুটিয়ারা নিশ্চয় টাসীর দেহটা নিরাধুয়াম সহকারে সংস্কার করিল।

বক্তা বলিলেন—গুজব শোনা যায় ভুটিয়ারা মহাকাল মন্দিরে লামার কাছে টাসীর শবটো নিয়া হাজির করে। লামার রাগ পড়িয়া গেল...তিন-তিনটে লোক অপমৃত্যুতে মরিল তাঁর শাপে।

লামা সেই সময়েই বলিয়াছিলেন...দুশো বছর পরে বাঙালীরই হইবে কুচবিহার...যত সব বড় বড় লামা-দৌপতীর হেমন্তর সবাই বাঙালী...তার কুচবিহার দিয়াই তিব্বতে চীনে গিয়াছিলেন—তাঁদের পায়ের ধূলা মাখানো কুচবিহার তাঁহাদেরই হইবে।

## কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের প্রতিষ্ঠা ও জাতীয়করণ

অধ্যাপক শ্রী অনাথবন্ধু দত্ত এম-এ, এফ-আর-ই-এস, এ-আই-বি

কিলিপি

১৯৪৮ জুন মাসে গবর্নমেন্ট প্রতিষ্ঠানরূপে এক কোটি পিসো মূলধন লইয়া কিলিপি কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই ব্যাঙ্ক স্থাপনের উদ্দেশ্য হইতেছে (ক) কিলিপি রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে মুদ্রা মূল্যের সমতা রক্ষা, (খ) পিসোর আন্তর্জাতিক মুদ্রামূল্যের সমতা রক্ষা এবং বাহ্যতে পিসো অভ্যন্তর দেশের মুদ্রার সহজে পরিবর্তিত হইয়া তাহার ব্যবহা এবং (গ) দেশের উৎপাদন, আর্থিক নিয়োগ ও প্রকৃত আয় বাহ্যতে বাড়ে সেই সকল বিষয়ে সহায়তা করা। সাত জন সদস্যকে লইয়া একটি মুদ্রা সংসদ (Monetary Board) এই ব্যাঙ্ক পরিচালন করিবেন। ইহাদের মধ্যে রাষ্ট্রের অর্থসচিব (সভাপতি রূপে), কিলিপি জাতীয় ব্যাঙ্কের সভাপতি, আর্থিক উন্নয়ন সংসদের সভাপতি ও রাষ্ট্রের সভাপতি কর্তৃক মনোনীত চারি জন সভ্য থাকিবেন। বর্তমান শতাব্দীর আরম্ভ হইতেই শতকরা ১০০ ভাগ রিজার্ভ রাখিয়া কাগজী মুদ্রার সম্প্রসারণের যে কড়া ব্যবস্থা ছিল তাহাও শিথিল করিয়া বাহ্যতে অপেক্ষাকৃত কম রিজার্ভে মুদ্রা সম্প্রসারণ হইয়া করা হইয়াছে। কাগজী মুদ্রা

পরিচালন ও ব্যাঙ্কের রিজার্ভ ও অভ্যন্তর ব্যবহার সাহায্যে ব্যাঙ্ক ক্রেডিট নিয়ন্ত্রণের পূর্ণ ক্ষমতা এই কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কে দেওয়া হইয়াছে। এরূপ ভাবে এই ব্যাঙ্কটি গঠিত হইয়াছে যে সরকারী আর্থিক নীতি ও কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের পরিচালন পদ্ধতির মধ্যে পূর্ণ সহযোগ ও সমন্বয় সম্ভব হয়।

পাকিস্তান

অনেকটা ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের অনুকরণে, করাচীতে কেন্দ্রীয় আপিস করিয়া, ১৯৪৮, ১লা জুলাই হইতে ট্রেট ব্যাঙ্ক অব পাকিস্তান কার্য আরম্ভ করিয়াছে। ব্যাঙ্কের মূলধন তিন কোটি টাকা, ইহার মধ্যে শতকরা ৫১ ভাগ গবর্নমেন্ট ও ৪৯ ভাগ সাধারণ অংশীদারগণ দিয়াছেন। গবর্নমেন্ট, সিভিলিয়ানি দ্বারা তিন কোটি টাকার রিজার্ভ বোণাইয়াছে। এই ব্যাঙ্ক পাকিস্তানের মুদ্রামূল্য রক্ষা করিবে এবং দেশের জনগণের জন্য মুদ্রা ও ক্রেডিট সম্পর্কিত সকল কার্যই করিবে। প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয় সরকারের এবং অভ্যন্তর ব্যাঙ্কের ব্যাঙ্কার হইবে এই ট্রেট ব্যাঙ্ক। একটি কেন্দ্রীয় বোর্ড এই ব্যাঙ্ক পরিচালন করিবে।

—ইহাতে গবর্নর ও ডেপুটি গবর্নরকে নইরা আট জন সভ্য থাকিবে—  
সরকার মনোনীত করিবেন পাঁচ জন এবং অংশীদারগণ নির্বাচন  
করিবেন তিন জন। ইহা ব্যতীত আঞ্চলিক পরামর্শ সভার  
ব্যবহাও আছে।

#### জার্মানী (সোভিয়েট অংশ)

১৯৪৬ সনে জার্মানীর সোভিয়েট এলাকার পাঁচ বিভাগে  
পাঁচটি কাগজী মুদ্রা পরিচালন ও ক্লিরিং ব্যাঙ্ক স্থাপিত হয়।  
১৯৪৮ মে মাসে সমগ্র রুশ অধিকৃত এলাকার জন্ত কেন্দ্রীয়  
ব্যাঙ্কের কার্য চালাইবার জন্ত জার্মান ইন্স এবং ক্লিরিং  
ব্যাঙ্ক (Dentsche Emission and Girobank) স্থাপিত হয়।  
ঐ বৎসরই জুলাই মাসে এই ব্যাঙ্ককে জার্মান ব্যাঙ্ক অব ইন্ডে  
(Dentsche Notenbank) পরিবর্তিত করা হয়। ব্যাঙ্কের মূলধন  
করা হয় দশ কোটি ডটসে মার্ক (DM)—ইহার সাড়ে পাঁচ কোটি  
মার্ক সোভিয়েট সামরিক সরকার নিয়ন্ত্রিত কতগুলি সরকারী ডিপার্টমেন্ট  
সরবরাহ করিয়াছে এবং বাকি অংশ পূর্বোক্ত পাঁচটি বিভাগীয় ব্যাঙ্ক  
যোগাইয়াছে। বলা হইয়াছে যে এই কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক সর্বপ্রকারে দেশের  
আর্থিক উন্নয়নে সাহায্য করিবে এবং অন্তান্ত লেণ্ডার ব্যাঙ্ক ও জার্মানীর  
ও বিদেশের অন্তান্ত এলাকার আর্থিক বিবয়ের তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণ  
করিবে। এই কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের সাধারণ পরিচালন এবং নীতি নির্ধারণ  
করে বোর্ড অব ডাইরেক্টরস্ ও নীতি কার্যে পরিণত করে বোর্ড অব  
ম্যানেজাররা। ডাইরেক্টর বোর্ডের মোট সভ্যসংখ্যা সত্তর জন—  
আট জন গবর্নমেন্টের বিভাগীয় কর্মকর্তা—সভাপতি আর ব্যয় বিভাগের  
চেয়ারম্যান নয়। ম্যানেজার-বোর্ডের সভ্যসংখ্যা মোট পাঁচ জন—  
সভাপতি ও সহ-সভাপতি নিযুক্ত হয় জার্মান আর্থিক কমিশন কর্তৃক ও  
অপর তিন জন সভ্য ডাইরেক্টর বোর্ড মনোনীত করেন।

#### কিউবা

১৯৪৮, ৩০মে কিউবার গবর্নমেন্ট একটা আইন পাশ করিয়া  
একটি কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের (Banco Nacional de Cuba) প্রতিষ্ঠা  
করিয়াছে। এই ব্যাঙ্ক সরকারের নিকট হইতে কাগজী মুদ্রা  
পরিচালনের ভার গ্রহণ করিয়াছে এবং মুদ্রা ও ক্রেডিট-বিষয়ে যাহাতে  
সামঞ্জস্যপূর্ণ নীতি মানা হয় তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিবে। ঐ আইনেই  
কিউবার পিসো মুদ্রাকে দেশে একমাত্র আইনসম্মত টাকা বলিয়া গণ্য  
করা হইবে এইরূপ ব্যবস্থা আছে, যদিও যুক্তরাষ্ট্রের ডলার এক বৎসর  
পর্যন্ত আইনতঃ দেশের মুদ্রা বলিয়া গ্রহণীয় হইবে। কিউবার  
পিসোর বিনিময় মূল্য যুক্তরাষ্ট্রের ডলারের সমান করা হইয়াছে।  
এই কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের মূলধন পঞ্চাশ লক্ষ পিসো—গবর্নমেন্ট এই মূল-  
ধনের বেশী অংশ সরবরাহ করিয়াছে, বাকী অংশ দেশের বাণিজ্যিক  
ব্যাঙ্কের পরিচালন ভার পাঁচ জন ডাইরেক্টরের

উপর স্তম্ভ। ইহারের তিন জন (সভাপতি সহ) গবর্নমেন্ট মনোনীত  
করিবেন।

#### রুমানীয়া

১৯৪৮ সনের শেষের দিকে রুমানিয়ার জাতীয় ব্যাঙ্কের (Rumanian  
National Bank) পুনর্গঠন হয়। ইহার নূতন নাম দেওয়া হয়  
“The Bank of the Rumanian People's Republic, State  
Bank”। এই নূতন ব্যাঙ্কে মূলধন দুই শত কোটি লি (Lei) এবং  
ইহার সভাপতি সরকারী অর্থদপ্তরের মন্ত্রী। যে সকল প্রতিষ্ঠানে এই  
ব্যাঙ্ক অর্থ নিয়োগ করিবে তাহা ইহার পরিচালনাধীন হইবে।

#### বেলজিয়ম (জাতীয়করণ)

১৯৪৮ জুলাই মাসে বেলজিয়ম জাতীয় ব্যাঙ্কের মূলধন আইন দ্বারা  
বিগুণ করা হয় এবং এই নূতন অংশ (সেয়ার) শুধি গবর্নমেন্ট  
হস্তান্তরের অযোগ্য করিয়া নিজেই গ্রহণ করে। আইনের সাহায্যে  
গবর্নমেন্ট ব্যাঙ্কের কর্তৃত্ব গ্রহণ করিয়াছে। কিন্তু যোগা দ্বারা জানাইয়া  
দেওয়া হইয়াছে যে, বেলজিয়ম জাতীয় ব্যাঙ্কের স্বাধীনতা ও স্বত্বভাবে  
পরিচালন বাহাতে ব্যাহত না হয় তৎবিষয়ে সরকার যত্নবান হইবেন।

#### লেনদারল্যান্ডস্ (জাতীয়করণ)

১৯৪৮ সনের ১লা আগষ্ট হইতে লেনদার ল্যান্ডসের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক  
জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত হইয়াছে। সাধারণ অংশীদার যে এক  
কোটি ফ্লোরিং মূল্যের অংশের মালিক ছিলেন গবর্নমেন্ট তাহা নিজে  
গ্রহণ করিয়া তৎপরিবর্তে বার্ষিক ২% টাকা হ্রদের গবর্নমেন্ট  
সিকিউরিটি প্রদান করিয়াছেন। প্রতি ১০০ ফ্লোরিং সেয়ারের জন্ত  
অংশীদার ২০০ ফ্লোরিং মূল্যের গবর্নমেন্ট সিকিউরিটি পাইয়াছেন।

#### ভারতবর্ষ (জাতীয়করণ)

১৯৪৮, ৩রা সেপ্টেম্বর রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া (ট্রাঙ্ককার টু  
পাবলিক ওনারসিপ্) আইন পাশ হয়। এই আইনের বলে  
ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ১৯৪৯, ১লা জানুয়ারী হইতে সরকারী ব্যাঙ্কে  
পরিণত হয়। প্রত্যেক ১০০ টাকার অংশের জন্ত গবর্নমেন্ট  
অংশীদারকে ১১৮১/৮০ হিসাবে ক্ষতিপূরণ করেন। তবে এই টাকার  
বদলে অংশীদারগণকে প্রত্যেক ১০০ টাকার পরিবর্তে বার্ষিক তিন  
টাকা হ্রদের একখানি করিয়া গবর্নমেন্ট সিকিউরিটি দেওয়া হয় এবং  
এক শত টাকার ভগাংশ নগদে দেওয়া হয়। জাতীয় করণের পর  
ব্যাঙ্কের কার্যাবলীর বিশেষ কোন পরিবর্তন হয় নাই। তবে নূতন ব্যাঙ্ক  
আইন অনুযায়ী (ব্যাঙ্কিং কোম্পানী আইন, ১৭ই ফেব্রুয়ারী ১৯৪৯)  
ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ক্ষমতা ও দায়িত্ব খুবই বাড়িয়াছে। পরিচালন  
ব্যাপারে এখন কেন্দ্রীয় বোর্ডের গবর্নর, দুই জন ডিপুটি গবর্নর, দশ  
জন ডাইরেক্টর এবং একজন সরকারী কর্মচারী সকলেই গবর্নমেন্টে  
মনোনীত। স্থানীয় বোর্ডগুলিতেও সকল সভ্যই গবর্নমেন্ট মনোনীত  
করেন।

# যুযুৎসু কৌশল

## বীরেন্দ্রনাথ বসু

(পূর্বানুভূতি)

(১৩২নং প্যাচ)

অগরের পায়তারা দেখিয়া যদি তাহার বাঁ পায়তারা থাকে তবে বাঁ হাত দিয়া তাহার জামার ডানদিকের “কলার” ও ডান হাত দিয়া



১৩২ নং প্যাচের ১ম চিত্র

তাহার বাঁ হাতের জামাটি জোরে ধরিবার সঙ্গে সঙ্গে নিজে ডানদিকে ঘুরিয়া আসিয়া কোমরের পিছনটি তাহার কোমরে লাগাইয়া (১৩২নং



১৩২ নং প্যাচের ২য় চিত্র

প্যাচের ১ম চিত্র) জোরে সামনে ঝোক দিয়া, কোমরটি নিচু করিয়া তাহার কাঁধে চিৎ করিয়া মাটিতে ফেলিয়া বাঁ পাটি তাহার বুক চাপাইয়া

ও বাঁ হাতটি তাহার চিবুকে রাখিয়া ও তাহার বাঁ কনুইটি নিজের ডান উকর উপর চিৎ করিয়া রাখিয়া জোরে চাপ দিলে তাহাকে সহজেই মাটিতে আটকাইয়া রাখিতে পারা যাইবে। (১৩২নং প্যাচের ২য় চিত্র)

(১৩৩নং প্যাচ)

অগরের পায়তারা দেখিয়া যদি তাহার বাঁ পায়তারা থাকে তবে বাঁ হাত দিয়া তাহার জামার ডানদিকের “কলার” ও ডান হাত দিয়া



১৩৩ নং প্যাচের চিত্র

তাহার বাঁ হাতের জামাটি জোরে ধরিবার সঙ্গে সঙ্গে নিজে ডানদিকে ঘুরিয়া আসিয়া কোমরের পিছনটি তাহার কোমরে লাগাইয়া (১৩২নং প্যাচের ১ম চিত্র) জোরে সামনে ঝোক দিয়া কোমরটি নিচু করিয়া তাহাকে চিৎ করিয়া মাটিতে ফেলিয়া তাহার বাঁ কনুইটি চিৎ করিয়া



১৩২ নং প্যাচের ৩য় চিত্র (লেখা ৪২৬ পৃষ্ঠায়)

নিজের ডান পায়ের মধ্যে ঢালাইয়া দিয়া জোরে আটকাইয়া রাখিয়া চাপ দিলে ও সঙ্গে সঙ্গে বাঁ হাতটি তাহার চিবুকে জোরে চাপিয়া

রাখিয়া তাহাকে সহজেই মাটিতে আটকাইয়া রাখিতে পারা যায়।  
( ১৩৩নং প্যাচের চিত্র )

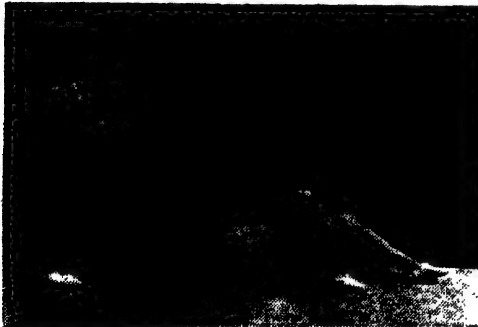
( ১৩৪নং প্যাচ )

অপরের পায়তারা দেখিয়া যদি তাহার ঝাঁ পায়তারা থাকে তবে ঝাঁ হাত দিয়া তাহার পলাটি জড়াইয়া ধরিবার সঙ্গে সঙ্গে ডান হাত



১৩৪ নং প্যাচের চিত্র

দিয়া তাহার ঝাঁ হাতের আঘাট জোরে ধরিয়া সঙ্গে সঙ্গে নিজের ডানদিকে ঘুরিয়া আসিয়া কোমরের পিছনটি তাহার কোমরে লাগাইয়া ( ১৩৫নং প্যাচের চিত্র ) জোরে সামনে ঝোক দিয়া কোমরটি নিচু করিয়া তাহাকে চিৎ করিয়া মাটিতে কেলিয়া ঝাঁ পাটি তাহার বুকে



১৩৫ নং প্যাচের ২য় চিত্র ( লেখা ৫২০ পৃষ্ঠায় )

চাপাইয়া ও ঝাঁ হাতটি তাহার চিবুকে রাখিয়া ও তাহার ঝাঁ কনুইটি নিজে ডান উরুর উপর চিৎ করিয়া রাখিয়া জোরে চাপ দিলে তাহাকে সহজেই মাটিতে আটকাইয়া রাখিতে পারা যাইবে। ( ১৩৬নং প্যাচের ২য় চিত্র )

( ১৩৫নং প্যাচ )

অপরের পায়তারা দেখিয়া যদি তাহার ঝাঁ পায়তারা থাকে তবে ঝাঁ হাত দিয়া তাহার পলাটি জড়াইয়া ধরিবার সঙ্গে সঙ্গে ডান হাত দিয়া তাহার ঝাঁ হাতের আঘাট জোরে ধরিয়া সঙ্গে সঙ্গে নিজের ডানদিকে ঘুরিয়া আসিয়া কোমরের পিছনটি তাহার কোমরে লাগাইয়া ( ১৩৬নং প্যাচের চিত্র ) জোরে সামনে ঝোক দিয়া কোমরটি নিচু করিয়া তাহাকে চিৎ করিয়া মাটিতে কেলিয়া তাহার ঝাঁ কনুইটি চিৎ করিয়া নিজের ডান পায়ের মধ্যে ঢালাইয়া দিয়া জোরে আটকাইয়া রাখিয়া চাড় দিলে ও সঙ্গে সঙ্গে ঝাঁ হাতটি তাহার চিবুকে জোরে চাপিয়া রাখিয়া তাহাকে সহজেই মাটিতে আটকাইয়া রাখিতে পারা যায়। ( ১৩৬নং প্যাচের চিত্র )

( ১৩৬নং প্যাচ )

অপরের পায়তারা দেখিয়া যদি তাহার ঝাঁ পায়তারা থাকে তবে ঝাঁ হাতটি তাহার ডান বগলের নিচু দিয়া লইয়া দিয়া তাহার অপর কাঁধটি জোরে ধরিবার সঙ্গে সঙ্গে ডান হাত দিয়া তাহার ঝাঁ হাতের



১৩৬ নং প্যাচের চিত্র

আঘাট জোরে ধরিয়া সঙ্গে সঙ্গে নিজের ডানদিকে ঘুরিয়া আসিয়া কোমরের পিছনটি তাহার কোমরে লাগাইয়া ( ১৩৬নং প্যাচের চিত্র ) জোরে সামনে ঝোক দিয়া কোমরটি নিচু করিয়া তাহাকে চিৎ করিয়া মাটিতে কেলিয়া ঝাঁ পাটি তাহার বুকে চাপাইয়া ও ঝাঁ হাতটি তাহার চিবুকে রাখিয়া ও তাহার ঝাঁ কনুইটি নিজের ডান উরুর উপর চিৎ করিয়া রাখিয়া জোরে চাপ দিলে তাহাকে সহজেই মাটিতে আটকাইয়া রাখিতে পারা যাইবে। ( ১৩৭নং প্যাচের ২য় চিত্র )

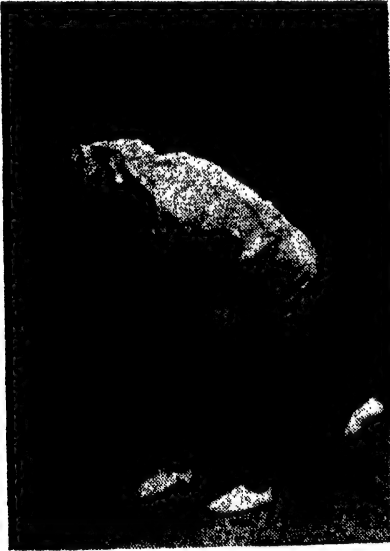


( ১৩৭নং প্যাচ )

অপরের পায়তারা দেখিয়া যদি তাহার বা পায়তারা থাকে তবে বা হাতটি তাহার ডান বগলের নিচু দিয়া লইয়া গিয়া তাহার অপর কাঁধটি জোরে ধরিবার সঙ্গে সঙ্গে ডান হাত দিয়া তাহার বা হাতের জামাটি জোরে ধরিয়া সঙ্গে সঙ্গে নিজে ডানদিকে ঘুরিয়া আসিয়া কোমরের পিছনটি তাহার কোমরে লাগাইয়া ( ১৩৬নং প্যাচের চিত্র ) জোরে সামনে ঝোক্ দিয়া কোমরটি নিচু করিয়া তাহাকে চিৎ করিয়া মাটিতে কেলিয়া তাহার বা কনুইটি চিৎ করিয়া নিজের ডান পায়ের মধ্যে ঢালাইয়া দিয়া জোরে আটকাইয়া রাখিয়া চাড় দিলে ও সঙ্গে সঙ্গে বা হাতটি চিবুকে জোরে চাপিয়া রাখিয়া তাহাকে সহজেই মাটিতে আটকাইয়া রাখিতে পারা যায়। ( ১৩৭নং প্যাচের চিত্র )

( ১৩৮নং প্যাচ )

অপরের পায়তারা দেখিয়া যদি তাহার বা পায়তারা থাকে তবে বা হাত দিয়া তাহার জামার ডানদিকের 'কলার' ও ডান হাত দিয়া



১৩৮ নং প্যাচের চিত্র

তাহার বা হাতের জামাটি জোরে ধরিবার সঙ্গে সঙ্গে নিজে ডানদিকে ঘুরিয়া আসিয়া কোমরের পিছনটি তাহার কোমরে লাগাইয়া জোরে সামনে ঝোক্ দিয়া কোমরটি নিচু করিবার সঙ্গে সঙ্গে বা পাটি হাঁটুর কাছে হইতে মুড়িয়া, তুলিয়া তাহার দুই জামুর উপর রাখিয়া ( এইরূপ করিবার সময় সমস্ত শরীরের ঢাল, বিশেষ করিয়া রাখিতে হইবে ) ( ১৩৮নং প্যাচের চিত্র ) বা পায়ের জোর দিবার সময়ে ডান হাত তাহার বা কনুইয়ের কাছে টানিয়া তাহাকে চিৎ করিয়া মাটিতে কেলিয়া বা পাটি তাহার মুখে ঢাপাইয়া ও বা হাতটি তাহার চিবুকে রাখিয়া ও তাহার বা কনুইটি নিজের ডান উরুর উপর চিৎ করিয়া

রাখিয়া জোরে চাপ দিলে তাহাকে সহজেই মাটিতে আটকাইয়া রাখিতে পারা যাইবে। ( ১৩৯নং প্যাচের ২য় চিত্র )

( ১৩৯নং প্যাচ )

অপরের পায়তারা দেখিয়া যদি তাহার বা পায়তারা থাকে তবে বা হাত দিয়া তাহার জামার ডানদিকের 'কলার' ও ডান হাত দিয়া তাহার বা হাতের জামাটি জোরে ধরিবার সঙ্গে সঙ্গে নিজে ডানদিকে ঘুরিয়া আসিয়া কোমরের পিছনটি তাহার কোমরে লাগাইয়া জোরে সামনে ঝোক্ দিয়া কোমরটি নিচু করিবার সঙ্গে সঙ্গে বা পাটি হাঁটুর কাছে হইতে মুড়িয়া, তুলিয়া তাহার দুই জামুর উপর রাখিয়া ( ১৩৯নং প্যাচের চিত্র ) বা পায়ের জোর দিবার সময়ে ডান হাত দিয়া তাহার বা কনুইয়ের কাছে টানিয়া তাহাকে চিৎ করিয়া মাটিতে কেলিয়া তাহার বা কনুইটি চিৎ করিয়া নিজের ডান পায়ের মধ্যে ঢালাইয়া দিয়া জোরে আটকাইয়া রাখিয়া চাড় দিলে ও সঙ্গে সঙ্গে বা হাতটি তাহার চিবুকে জোরে চাপিয়া রাখিয়া তাহাকে সহজেই মাটিতে আটকাইয়া রাখিতে পারা যাইবে। ( ১৩৯নং প্যাচের চিত্র )

( ১৪০নং প্যাচ )

যদি কেহ বা হাত দিয়া দুবি মারিতে আসে তৎক্ষণাৎ তাহার বা কলার বা ধারে নিজের বা বাহ দিয়া আটকাইয়া সঙ্গে সঙ্গে বা হাত



১৪০ নং প্যাচের চিত্র

দিয়া তাহার বা মুঠি ধরিয়া লইয়া বা দিকে মোড় দিয়া নামাইতে নামাইতে বা দিকে ঘুরিয়া ডান হাতটি তাহার বা মোড়ার কাছে ও ডান হাঁটুটি তুলিয়া তাহার কনুইয়ের পিছন দিকে রাখিয়া তাহার মোড়াতে কনুইয়ের ও কলার চাড় দিতে দিতে ( ১৪০ নং প্যাচের চিত্র ) ঝোক্ দিয়া মাটিতে কেলিয়া দিয়া তাহাকে আটকাইয়া রাখিতে পারা যায়।

( ১৪১ নং প্যাঁচ )

অপরের পায়তারা দেখিয়া যদি তাহার বী পায়তারা থাকে তবে  
বী হাতটি তাহার ডান বগলের নিচু দিয়া লইয়া গিয়া তাহার কাঁধটি



১৪১ নং প্যাঁচের চিত্র

জোরে ধরিবার সঙ্গে সঙ্গে ডান হাত দিয়া তাহার বী হাতের জামাটি  
জোরে ধরিয়া নিজে ডান দিকে ঘুরিয়া আসিয়া কোমরের পিছনটি তাহার



১৪২ নং প্যাঁচের ১ম চিত্র

কোমরে লাগাইয়া ( ১৩৬নং প্যাঁচের চিত্র ) জোরে সামনে ঝোক দিয়া  
কোমরটি পিছু করিবার সময় ডান হাত দিয়া তাহার বী কনুইটি টানিয়া

তাঁহাকে চিৎ করিয়া কেলিয়া দিবার সঙ্গে সঙ্গে নিজের বী কনুই দি  
তাহার বী হাতটি জড়াইয়া ধরিয়া ( এই অবস্থাতে সমস্ত শরীরটি তাহা  
বুকের উপর চাপিয়া থাকিবে ) তাহার বী হাতে মোড় লাগাই  
তাঁহাকে মাটিতে আটকাইয়া রাখিতে পারা যায় ( ১৪১ :  
প্যাঁচের চিত্র ) ।

( ১৪২ নং প্যাঁচ )

অপরের পায়তারা দেখিয়া যদি তাহার বী পায়তারা থাকে তা  
ডান হাত দিয়া তাহার ডান কব্জী ও বী হাত দিয়া তাহার ডান হাতে  
সামান্য জোরে ধরিয়া তাহার ডান হাতের পিছনটি তাহার



১৪২ নং প্যাঁচের ২য় চিত্র

দিয়া নিজে বী দিকে ঘুরিয়া আসিয়া নিচু হইয়া ডান কাঁধটি তাহার  
ডান বগলের নিচে ও কোমরটি তাহার কোমরে লাগাইবার সঙ্গে  
সঙ্গে ( ১৪২ নং প্যাঁচের ১ম চিত্র ) জোরে সামনে ঝোক দিয়া নিচু  
হইয়া পিঠের উপর দিয়া উল্টাইয়া ( ১৪২ নং প্যাঁচের ২য় চিত্র )  
তাঁহাকে কেলিয়া দিয়া ( ১৪২ নং প্যাঁচের ৩য় চিত্র ) তাড়াতাড়ি  
বী হাত দিয়া তাহার গলাটি জোরে চাপিয়া ধরিয়া ও তাহার ডান  
কনুইটি নিজের ডান উরুর উপর চিৎ করিয়া রাখিয়া তাহার কনুইয়ে  
চাপ দিয়া তাঁহাকে মাটিতে আটকাইয়া রাখা যায় । ( ১৪২ নং প্যাঁচের  
৩র্থ চিত্র ) ।



# সোপেনহরের দর্শন

শ্রীতারকচন্দ্র রায়

## (১) জগৎ-প্রত্যয়-মূল

সোপেনহরের “The world as will and idea” নামক বৃহৎ গ্রন্থে ব্যাখ্যাত দর্শনের মর্ম সংক্ষেপে নিম্নলিখিত করেছি বাক্যে প্রকাশ করা যায় :

“জগৎ ইচ্ছা-শক্তির ব্যক্ত রূপ। ইচ্ছাশক্তি অক্ষ, চৈতন্যহীন, কিন্তু মানুষরূপে অভিব্যক্ত হইবার সময়ে ইহার সহিত চৈতন্য যুক্ত হইয়াছে। ইচ্ছা জগতের মূল বলিয়া জগতের সর্বত্র স্বন্দ ও সংঘর্ষ। সেইজন্য জগৎ দুঃখময়। এই দুঃখ হইতে অব্যাহতি লাভের উপায় জ্ঞানলাভ করিয়া ইচ্ছার দাসত্ব হইতে মুক্তলাভ করা।”

সার্বিক ষ-সহস্র বৎসর পূর্বে গৌতম বুদ্ধ দুঃখের কারণ-অনুসন্ধানে বহির্গত হইয়া এই সত্যই প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তাহার “তৃষ্ণা” অথবা কামনা এবং সোপেনহরের ইচ্ছার মধ্যে বিশেষ প্রভেদ নাই। কিন্তু ইরোরাপী দর্শনে ইহা অজ্ঞাত ছিল। হয়তো ফিক্টের ক্রিয়াকলাপী নির্বিশেষ অহমের (absolute will) মধ্যে এই তত্ত্ব লুক্কায়িত ছিল। তাহা হইলেও ফিক্টের দর্শনে ইহা বিশদীকৃত হয় নাই। সোপেনহরই ইহার বিশদ ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। তথাপি বহুদিন এই দর্শনের সমাদর হয় নাই। দীর্ঘকাল ইহা অনাদৃত ও অবজ্ঞাত ছিল। ইহার কারণ কি ?

Will Durant ইহার কারণ নির্দেশ করিয়াছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকগণই এই দর্শনের আলোচনা করিতে পারিতেন। ১৮১৮ সালে জার্মান দর্শনের অগ্রতিম্বনী সন্ন্যাসী ছিলেন হেগেল। কিন্তু সোপেনহর তাহাকে আক্রমণ করিয়া গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকায় লিখিয়াছিলেন :

“দর্শন যখন রাজনৈতিক উদ্বেগসিদ্ধির জন্ত এবং জীবিকা-উপার্জননের জন্ত ব্যাকুল হয়, তখন তাহার বিষম দুদিন। প্রবাদ আছে—“প্রথমে ঝাঁট, তারপরে দর্শনচর্চা করে।” ইহার প্রতিবাদে কিছুই কি বলিবার নাই? যে সকল ভক্তলোকের ঝাঁটবিয়ার ইচ্ছা আছে, দর্শনের দ্বারা ইহা জীবিকা উপার্জন করিতে ইচ্ছুক। শ্রী ও সন্তানসহ তাহাদিগকে প্রতিপালনের ভার দর্শনের উপর। “যার নুন খাই, তার গুণ পাই”—একথা সর্বকালেই প্রচলিত আছে। দর্শন-শাস্ত্র দ্বারা অর্থোপার্জন প্রাচীন কালে সোক্রিটসদিগেরই বিশেষত্ব বলিয়া বিবেচিত হইত। কিন্তু অর্থের বিনিময়ে অত্যাশঙ্কিত কিছু পাইবার সম্ভাবনা নাই। জ্ঞান-জগতের ক্যালিবান (Caliban) হেগেলকে হুড়ি বৎসর বাধত সর্বশ্রেষ্ঠ দার্শনিক বলিয়া অভিনন্দিত হইতে বিনিময়িত হইয়াছেন, তিনি সেই যুগের অভিনন্দনের জন্ত উৎসুক হইতে

পারেন না।...সর্বযুগের অজসংখ্যক লোকই সত্যকে সত্য বলিয়া চিন্তিতে পারে। স্বতরাং তাহাদের জন্তই সত্যকে অবচলিতভাবে বিনয়ের সহিত অপেক্ষা করিতে হইবে। জীবন দগ্ধহারী; কিন্তু সত্য অদূরপ্রসারী। আমরা সত্যই বলিব।”

সোপেনহরের এই উক্তি সন্দেহ Will Durant বলিয়াছেন—“শেষের কথাগুলি মহৎ সন্দেহ নাই। কিন্তু তাহাতে (ইসক্সের গল্পের শৃংখলের) ড্রাকাকলের অল্প আবাদ আছে। প্রশংসার জন্ত সোপেনহর অপেক্ষা অধিকতর লালারিত আর কেহ ছিল না।... সোপেনহর বিনয়ের সহিত অপেক্ষা করার কথা বলিয়াছেন। কিন্তু তিনি বলিয়াছেন—“দর্শনশাস্ত্রে ক্যাটের পরে আমার পূর্বে অস্ত্র কেহ কিছু করিয়াছেন বলিয়া আমি দেখিতে পাই না। “জগৎ “ইচ্ছা”র প্রকাশ” বহুদিন যাবত দর্শনে এই সত্যেরই অনুসন্ধান চলিয়াছে, কিন্তু ইতিহাসের সহিত যাহাদের পরিচয় আছে, তাহারা পরম পাণ্ডের আবিষ্কারের মত এই সত্যের আবিষ্কারও অসম্ভব বলিয়া গণ্য করিয়াছেন। একটি মাত্র কথাই আমি বুঝাইতে চাহিয়াছি—কিন্তু তাহার জন্ত এই সমগ্র গ্রন্থের প্রয়োজন হইয়াছে।...গ্রন্থখানা দুইবার পাঠ করুন; প্রথমবার পাঠে বিশেষ ঐচ্ছিক প্রয়োজন হইবে।” ইহা হইতেই সোপেনহরের বিনয়ের পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়! এই বিনয় সন্দেহই তিনি লিখিয়াছেন—“বিনয় কাহারকে বলে? ইহা কপট বৈজ্ঞানিক প্রকাশ ভিন্ন আর কিছুই নহে। ঈর্ষ্যাপূরিত জগতে ইহা দ্বারা লোকে গুণহীনদিগের নিকট আপনার গুণ ও কৃতিত্বের জন্ত কমা প্রার্থনা করে। বিনয় গুণ বলিয়া গণ্য হওয়ার মূর্খদের সুবিধা হইয়াছে। কেননা এই গুণের অধিকারী বলিয়া গণ্য হইবার জন্ত এতোক লোককেই আপনাকে মূর্খ বলিতে হয়।”

সোপেনহর জন্ত লিখিয়াছিলেন—“আমাদের জার্মান দর্শনে “বুদ্ধির অব্যবহিত জ্ঞান” (Intellectual intuition) এবং নির্বিশেষ চিন্তা (absolute thinking) হুন্ট প্রত্যয় এবং অকপট গবেষণার স্থান অধিকার করিয়া বসিয়াছে। পাঠকে কাকি দেওয়া, তাহাকে দিশাহারা এবং হতবুদ্ধি করা এবং নানাবিধ কৌশলে তাহার চোখে মূল দেওয়া—ইহাই এখন আমাদের অবলম্বিত প্রণালী। সত্যের স্থলে ইহাই আমাদের দার্শনিকদিগের মুখ্য উদ্দেশ্য। ইহার ফলে দর্শন (যদি ইহার পরেও তাহাকে দর্শন বলা চলে) ক্রমশঃ নিম্নে নামিয়া গিয়াছে; অবশেষে হেগেল হীনতার নিরতমতরে গিয়া উপনীত হইয়াছেন। ক্যাট চিন্তার যে বাধীনতার উচ্চার করিয়াছিলেন, তাহার দাসরোধের জন্ত প্রজ্ঞার দুহিতা এবং সত্যের তাবী মাতা দর্শনকে

হেগেল আলোক ও উন্নতির শত্রু এবং প্রোটেষ্ট্যান্ট জেহুইটবিশ্বের হাতের অগ্নে পরিণত করিয়াছেন। কিন্তু এই হীন কার্য গোপন রাখিবার জন্য এবং মানুষের বুদ্ধি বিকল করিবার জন্য, দর্শনের উপর শূন্যগর্ভ বাগাড়ম্বর এবং অর্থহীন খিঁচুড়ীর বহনিকা টানিয়া দিয়াছেন। বেডলাসের বাহিরে এরূপ বাগাড়ম্বর ও খিঁচুড়ীর কথা শোনা যায় নাই।”

“জগৎ আমার প্রত্যয়”—এই বাক্য দ্বারা সোপেনহরের প্রত্যয়ের আরম্ভ হইয়াছে। কিন্তু ইহার মধ্যে নূতনত্ব ছিল না। ক্যান্ট এই কথা বলিয়া গিয়াছিলেন। বাহ্যকে বাহ্য জগৎ বলি, ইন্দ্রিয়ানুভূতি ও প্রত্যয়ের মাধ্যমে আমাদের মনে তাহার জ্ঞান হয়। বিস্তারিতভাবে সোপেনহর এই মতের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কিন্তু এখানে তাহার মৌলিক চিন্তার কোনও পরিচয় ছিল না। তাহার মৌলিক চিন্তা ছিল পুত্ৰকের শেষের দিকে। সোপেনহরের সত্য পরিচয় পাইতে যে এতদিন লাগিয়াছিল, ইহাও তাহার অন্ততম কারণ।

বিস্তারিত ভাবে সোপেনহর জড়বাদ খণ্ডন করিয়াছেন। যে জড় দ্বারা জড়বাদিগণ জগতের ব্যাখ্যা করিতে উৎসুক, সেই জড় কি? মন যদি না থাকিত, জড় থাকিত কোথায়? মনঃ দ্বারাই আমরা জড়ের জ্ঞান লাভ করি এবং জড় বলিয়া বাহার জ্ঞান লাভ করি, তাহা আমাদের ইন্দ্রিয়ানুভূতি ও প্রত্যয় ব্যতীত আর কিছু নহে। জড়বাদ প্রাণজন্মের অস্তিত্ব অস্বীকার করে, ভৌতিক এবং রাসায়নিক শক্তির দ্বারা প্রাণের কার্যের এবং জড়ের যান্ত্রিক ক্রিয়া দ্বারা ভৌতিক এবং রাসায়নিক শক্তির ব্যাখ্যা করে। কিন্তু কোনও রাসায়নিক ক্রিয়াই যান্ত্রিক নিয়ম দ্বারা ব্যাখ্যা করা যায় না। আলোক, তাপ এবং তাড়িতের ধর্মের ব্যাখ্যাও যান্ত্রিক নিয়ম দ্বারা অসম্ভব। ইহাদের ব্যাখ্যার জন্য “শক্তি”র প্রয়োজন। সত্য কি, সং পদার্থের স্বরূপ কি, তাহা জানিতে হইলে, বাহ্য আমরা অব্যবহিত ভাবে জানি, তাহা হইতেই অনুমান আরম্ভ করিতে হইবে। অব্যবহিতভাবে জানি আমরা আমাদের “স্বয়ং” কে; “বস্তুর বাহির হইতে তাহার অন্তঃস্থ স্বরূপের সাক্ষাৎ পাওয়া যায় না। বস্তুই অনুমান করা হটক না কেন, নাম ও রূপ (names & images) ভিন্ন অস্ত্রে কিছুই পাওয়া যায় না। দুর্গদ্রবেণকারী কোনও লোক দুর্গ তোরণের অনুসন্ধানে যখন দুর্গ প্রদক্ষিণ করিয়াও তোরণের সন্ধান পায় না, তখন তাহার যে অবস্থা হয়, আমাদের অবস্থাপ্রকৃতি। অত্যন্তের প্রবেশে অন্ধ হইয়া তাহারই মতো আমরা বাহিরের নক্সা অঙ্কন করি। আমরা যদি আমাদের মনের স্বরূপের সন্ধান পাই, তাহা হইলে সম্ভবতঃ বাহ্য জগতের চাৰিকটিও প্রাপ্ত হইব।”

যে প্রবন্ধ রচনা করিয়া সোপেনহর “ডাক্তার” উপাধি পাইয়াছিলেন (Four-fold Root of the sufficient Reason) তাহাতে তাহার জ্ঞানসম্বন্ধীয় সত্য ব্যাখ্যাত হইয়াছে। সোপেনহরের মতে অবতাস (appearance) এবং সংপদার্থের (noumenon) মধ্যে পার্থক্য নির্ধারণই দর্শনের সর্বশ্রেষ্ঠ দান। জগৎ যে অবতাস মাত্র তাহা

মোটো দেকার্ত লব্ধ এবং বার্কলে অস্পষ্টভাবে বৃত্তিতে পারিয়াছিলেন। ক্যান্ট তাহা প্রমাণিত করিয়াছেন। সমস্ত জগৎ জ্ঞাতার মধ্যে অবস্থিত, জ্ঞাতাই সমস্ত জগৎ ধারণ করিয়া আছে। কিন্তু ক্যান্টের মতে দুইটি ক্রটি ছিল। সোপেনহর সেই ক্রটির সংশোধনের চেষ্টা করিয়াছেন।

প্রথমতঃ—ক্যান্ট ১২টি Categoryর উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে একমাত্র কারণ Category হইতেই জ্ঞানের উৎপত্তি হয়। এই “কারণের” (Principle of ground) চারিটি রূপ :—(১) ভবনের কারণ (ground of becoming, Ratio Fiendi), (২) জ্ঞানের কারণ (Ratio cogno Sciendi), (৩) সত্তার কারণ (Ratio Essendi, ground of being), (৪) কর্মের কারণ (Ratio agendi). দ্বিতীয়তঃ—“ইচ্ছাই” স্বয়ং-সৎ-বস্তু; অস্ত্র কোনও স্বয়ং-সৎ-বস্তু নাই।

জ্ঞানের বিষয়সমূহ বিচ্ছিন্ন অবস্থায় বৃত্তির নিকট উপস্থিত হয় না—একাধিক বিষয় এক সঙ্গে উপস্থিত হয় এবং একটি অস্ত্র একটির কারণ রূপে গৃহীত হয়। যখনই কোনও পদার্থের জ্ঞান হয়, তখনই কোনও কারণের ফলরূপে তাহার জ্ঞান হয়। ইহাই কারণ তত্ত্বের প্রথমরূপ (Ratio Fiendi)। আবার কোনও বিষয়, যখন মনের সম্মুখে উপস্থিত হয়, তখন তাহা শ্রেণীভুক্ত হয়। অর্থাৎ তাহা পূর্বানুভূত বাহার বাহার সদৃশ, তাহার সহিত এক-শ্রেণীভুক্ত বলিয়া গৃহীত হয়। ইহাই কারণ-তত্ত্বের দ্বিতীয় রূপ (Ratio cogno sciendi)। ইহা হইতেই চিন্তা করিবার সামর্থ্যের উদ্ভব হয়। (৩) তৃতীয়তঃ—সত্তার কারণ (ground of being Ratio Essendi) জ্ঞানের বিষয় সকল দেশ ও কালে অবস্থিত রূপে প্রতীত হয়। (৪) চতুর্থতঃ—কর্মের কারণ (ground of action agendi Ratio)। আমাদের কর্ম চালিত হয় প্রবর্তনা (motive) দ্বারা। প্রবর্তনা হইতেই তাহার উদ্ভব হয়।

সোপেনহর বলিয়াছেন—“এই জগৎ আমার প্রত্যয়”, ইহা অপেক্ষা নিশ্চিত সত্য আর—কিছুই নাই। বাহ্য কিছুই অস্তিত্ব আছে, জ্ঞাতার জ্ঞানের বিষয়রূপেই তাহার অস্তিত্ব; জ্ঞানের সহিত সম্পর্ক-বিহীন কোনও বস্তুরই অস্তিত্ব নাই। জগৎ যে প্রত্যয় মাত্র, এই সত্য নূতন আবিষ্কার নহে। ভারতের পণ্ডিতগণ অতি প্রাচীনকালে এই সত্য উপলব্ধি করিয়াছিলেন। সার উইলিয়াম জোন্স “On the Philosophy of the Asiatics” প্রবন্ধে দেখাইয়াছেন, যে ব্যাসের বেদান্ত দর্শনে জড়ের অস্তিত্ব—জড়ের কাঠিত্ব, অভেদতা এবং স্থানবাপী রূপের অস্তিত্ব—অস্বীকৃত হয় নাই (কেননা ইহা অস্বীকার করা বাতুলতামাত্র), কিন্তু জড় সম্পর্কে সাধারণ ধারণার ভ্রান্তি প্রমাণিত হইয়াছে এবং জ্ঞানের বাহিরে জড়ের যে স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই, সত্তা এবং তাহার জ্ঞানময়তা যে অভিন্ন, তাহাই প্রমাণিত হইয়াছে। “.....প্রত্যয় যেমন এই জগতের একরূপ, তেমনি ইহার অন্তরূপ “ইচ্ছা”। এক দিক হইতে দেখিলে জগৎ প্রত্যয়রূপে প্রতীত হয়। আবার অন্য দিক হইতে ইচ্ছারূপে প্রতীত হয়। বাহ্য প্রত্যয়ও নয়, ইচ্ছাও নয়, তাহা স্বয়ংসত্তা মাত্র, আলোচ্যমাত্র।

বাহ্যী সকল বস্তু জানে কিন্তু বাহ্যাকে কেহই জানেনা—তাহা বিষয়ী (subject)। বিষয়ীই জগতের ধারক; তাহাতেই সকল অবতাসের আবির্ভাব হয়। বিষয়ীর সহিত সম্পর্ক-হীন কোনও বস্তুর অস্তিত্ব নাই, মানুষের দেহ এই বিষয়ীর বিষয়। জ্ঞানের যাবতীয় বিষয়ের মত দেহও জ্ঞানের সার্বিকরূপ দেশ ও কালের অন্তর্গত; দেশ ও কাল হইতেই বহুত্বের উদ্ভব হয়। কিন্তু বিষয়ী নিজে কখনও বিষয়ে পরিণত হয় না; কখনও বিষয়ীর জ্ঞান কেহ লাভ করিতে পারে না। দেশ ও কালের রূপ তাহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। বিষয়ীর মধ্যে বহুত্ব নাই। বহুর প্রতিযোগী একত্বও নাই।.....সুতরাং প্রত্যয়রূপী জগতের দুই অংশ; প্রথমার্দ্ধ বিষয়ী; দ্বিতীয়ার্দ্ধ বিষয়। দেশ ও কাল এই দ্বিতীয়ার্দ্ধের রূপ। এই জন্তে বহুত্বও তাহার রূপ। বিষয়ী দেশ, কাল ও বহুত্বের অতীত।.....প্রত্যেক চিন্তার এই দুই অর্ধ অবিচ্ছেদ্য। এক অর্ধ ছাড়া অল্প অর্ধ ব্যবহির।

বিষয় ও বিষয়ীর মধ্যে যে সম্বন্ধ তাহা কার্য-কারণ সম্বন্ধ নহে। বস্তুবাদ বিষয়কে বিষয়ীর কারণ বলিয়া গণ্য করে। ফিক্টের প্রত্যয়বাদে বিষয় বিষয়ীর কার্য (effect) পরিণত হইয়াছে। কিন্তু বিষয় ও বিষয়ীর মধ্যে Principle of sufficient Reason-এর (পর্যাপ্ত কারণ তত্ত্বের) কোনও সম্বন্ধই নাই এবং বস্তুবাদ ও প্রত্যয়বাদের কোনওটিকেই সত্য বলিয়া প্রমাণ করা যায় না। বিষয় ও বিষয়ীর মধ্যে যে সম্পর্ক তাহা অবিনাশ্য সম্বন্ধ (correlation)। পর্যাপ্ত কারণ তত্ত্ব বিষয়ের মধ্যেই অবস্থিত—তাহাই বিষয়ের রূপ। বিষয়ী ইহার বাহিরে অবস্থিত। বিষয়ীতে এই তত্ত্বের প্রয়োগ হইতে পারে না। সুতরাং বিষয়াকে বিষয়ের কারণ বলা যায় না এবং বিষয়কেও বিষয়ীর কারণ বলা যায় না। সন্বেহবাদ (Scepticism) বিষয়ের কারণ রূপে—যে অল্প পরার্থের কল্পনা করে, জ্ঞানের মধ্যে তাহার অস্তিত্ব নাই—জ্ঞানের বিষয় যে রূপে আবির্ভূত হয়, তাহাই তাহার প্রকৃত রূপ। দেশ ও কালে প্রকাশিত জগৎ মিথ্যা নয়, তাহা সম্পূর্ণ সত্য। কিন্তু তাহা “প্রত্যয়”—প্রত্যয়রাজির সমাবেশ—তদতিরিক্ত কোনও সত্তা তাহার নাই। “পর্যাপ্ত কারণ তত্ত্ব” এই সকল প্রত্যয়ের সংযোগসূত্র।

বিশ্বের অলীকতা হইতে জগতের বাস্তবতা সম্বন্ধে সন্বেহের উদ্ভব হইতে পারে। আমাদের সমগ্র জীবন যে স্বপ্ন নহে, তাহার প্রমাণ কি? বেদে ও পুরাণে বিশ্বের সঙ্গে জগতের জ্ঞানের উপমা দেওয়া হইয়াছে। এবং জগৎ মায়াজাল রূপে বর্ণিত হইয়াছে। মেটোও অনেক স্থলে বলিয়াছেন—মানুষ বিশ্বের মধ্যে জীবন ধারণ করে, দার্শনিক এই স্বপ্ন হইতে জাগ্রিত হইবার চেষ্টা করেন। পিণ্ডার, সফোক্লস, ও সেক্সপিয়ার জীবনকে বিশ্বের সহিত উপস্থিত করিয়াছেন। ক্যান্ট, বলিয়াছেন, বাস্তব জীবনে প্রত্যয় সকল পরস্পর কার্যাকারণ সম্বন্ধে আবদ্ধ, স্বপ্নে সে সম্বন্ধের অভাব; ইহাই উত্তরের মধ্যে পার্থক্য। কিন্তু জাগ্রত অবস্থার সহিত স্বপ্নদৃষ্ট ঘটনার সম্বন্ধ না থাকিলেও, স্বপ্নদৃষ্ট ঘটনা-বলির মধ্যে সম্বন্ধ বর্তমান থাকে; সুতরাং স্বপ্নও জাগ্রত অবস্থার মধ্যে পার্থক্য এই যে জাগ্রৎ জীবনের মধ্যে “পর্যাপ্ত কারণ তত্ত্বের সম্বন্ধ

সর্বত্র বর্তমান, কোথায়ও তাহার বিচ্ছেদ নাই, কিন্তু স্বপ্নের ঘটনাবলীর মধ্যে এই সম্বন্ধ থাকিলেও, বিভিন্ন স্বপ্নের পরস্পরের মধ্যে এই সম্বন্ধ নাই এবং জাগ্রৎ অবস্থা এবং স্বপ্নের মধ্যে এইরূপ সম্বন্ধ নাই। কিন্তু এই নিয়মানুসারে কোনও ঘটনা স্বপ্নদৃষ্ট অথবা জাগ্রৎ কালে দৃষ্ট, তাহা নির্ণয় করা অনেক সময় অসম্ভব হইয়া পড়ে; কেননা, অতীতের কোনো ঘটনার সহিত বর্তমান মুহূর্তের কার্যাকারণ সম্বন্ধ অনুসরণ করা অসম্ভব হইলেও, ঐ ঘটনাকে আমরা স্বপ্নদৃষ্ট বলিয়া গণ্য করি না, এবং বাস্তব জীবনে ঐ নিয়মানুসারে আমরা স্বপ্ন ও বাস্তবের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করি না। কোনও বিষয় প্রত্যক্ষ করিবার সময় আমরা জাগ্রিত ছিলাম কিনা, তাহার ছায়াই তাহার সত্য-মিথ্যা নির্ধারণিত হয়। হবস্ টাহার Leviathan গ্রন্থে বলিয়াছেন—আমরা যখন বস্তুর পরিবর্তন না করিয়াই অকস্মাৎ নিদ্রিত হইয়া পড়ি, তখন স্বপ্নকে সত্য বলিয়া ভুল হয়। বিশেষতঃ জাগ্রত অবস্থার যে বিষয়ের চিন্তা মনকে আচ্ছন্ন করিয়াছিল, যখন সেই বিষয়েই স্বপ্ন দেখি, তখন সে স্বপ্ন সত্য বলিয়া প্রতীত হয়। তখন যেমন নিদ্রার আগমনও জানিতে পারি না, তেমনি কখন জাগ্রিত হইলাম, তাহাও বুঝিতে পারি না। কিন্তু জাগ্রিত হইয়া যদি স্বপ্নদৃষ্ট বিষয়ের সহিত বর্তমান অবস্থার কার্যাকারণ সম্বন্ধ, অথবা উক্ত সম্বন্ধের অভাব কিছুই বোধগম্য না হয়, তাহা হইলে তাহা স্বপ্ন অথবা সত্য সে সম্বন্ধে সন্দেহ থাকিয়া যায়। ইহা হইতে জীবন ও বিশ্বের মধ্যে যে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে, তাহা স্পষ্টীকৃত হয়। সুতরাং যদিও আমাদের সমগ্র জীবনের ঘটনাবলী যে কার্যাকারণ সূত্রে গ্রথিত, তাহাতে বিভিন্ন স্বপ্নের স্থান নাই, এবং স্বপ্ন হইতে জাগ্রিত হইয়াই এই সম্বন্ধের অভাব আমরা বুঝিতে পারি, তথাপি প্রত্যেক স্বপ্নের মধ্যে সংঘটিত ঘটনাবলীও যখন পারস্পরিক সম্বন্ধে সংযুক্ত, তখন স্বপ্ন ও জাগ্রৎ জীবনের রূপ একই বলিয়া প্রতীত হয়—এবং তাহাদের স্বরূপের মধ্যে বিশেষ কোনও পার্থক্য আছে বলিয়া মনে হয় না। জীবনের সঙ্গে স্বপ্নের সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠ। উত্তরই একই গ্রন্থের বিভিন্ন পৃষ্ঠা। হয়তো জীবন এক দীর্ঘ স্বপ্ন মাত্র।

যে জগৎ আমাদের জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহার উপাদান “অবতাস”—পরস্পর সম্বন্ধে আবদ্ধ অবতাস। এই সম্বন্ধ দেশ ও কালের সম্বন্ধ, কার্যাকারণ সম্বন্ধ, সামান্য-বিশেষের সম্বন্ধ এবং প্রবর্তন ও তদুদ্ভূত কর্মের সম্বন্ধ। আমাদের জ্ঞানের মধ্যে জগতের এবিধ রূপের অতিরিক্ত কিছুই নাই। যে কারণ-সম্বন্ধ অন্তর্গত সম্বন্ধের মূল, তাহা সূত্ররূপে অবতাসিত জগৎকে ধারণ করিয়া আছে। আমাদের অহংও দেশ ও কালে অবস্থিত রূপেই জ্ঞানের বিষয় হয় এবং ইহাও সংসার অথবা অবতাসিক জগতের অন্তর্গত। কিন্তু অব্যবহিত জ্ঞান (intuitive Knowledge) এই অবতাসিক জগৎ—প্রত্যয় জগৎ ভেদ করিয়া প্রকৃত সত্তার (Ready) পৌছিতে সমর্থ হয়। এই অব্যবহিত জ্ঞানে জ্ঞাতা (Subject) অব্যবহিত ভাবে (দেশ কাল ও কারণবৎ বর্জিত ভাবে) আপনাকে ইচ্ছা—স্বরূপ বলিয়া জানিতে পারি।

# কলিকাতা ও সহরতলীতে বৈদ্যুতিক ট্রেন

শ্রীনীলিমা মজুমদার বি-এসসি

কলিকাতা ও সহরতলীতে যে বৈদ্যুতিক ট্রেন চলাচলের আয়োজন হইয়াছিল তাহা সকলেই অবগত আছেন। এই বিষয়ে স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার জন্য রেলওয়ে বোর্ড কর্তৃক “Calcutta Terminal Facilities Committee” নামে ১৯৪৭ সালে একটি কমিটি গঠিত হয়। কমিটি তাঁহাদের সিদ্ধান্ত বোর্ডকে যথাসময়ে জানাইয়াছিলেন, কিন্তু দুঃখের বিষয় আজ পর্যন্ত কমিটির সিদ্ধান্ত কার্যে পরিণত হয় নাই। এ সম্বন্ধে কোন সাড়াশব্দও শোনা যাইতেছে না। মনে হয় সরকারের চিরন্তন প্রাণমুখারী ইহাকেও “কোল্ড স্টোরেজে” রাখা হইয়াছে।

শিক্ষা, সংস্কৃতি, ব্যবসাবাণিজ্য, লোকসংখ্যা ও আরতন হিসাবে কলিকাতা ভারতবর্ষের বৃহত্তম ও শ্রেষ্ঠতম নগরী। অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় আজ পর্যন্ত এই মহানগরীতে যানবাহনাদির ব্যবস্থা লোকসংখ্যানুপাতে বড়ই শেচনীয়। যে কোন সময়ে কলিকাতার ট্রাম ও বাসের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে লোকের অবর্ণনীয় দুঃখ দুর্দশা চক্ষু পড়ে। ভারতবর্ষের বন্দরসমূহের মধ্যে কলিকাতা বন্দর সর্বাপেক্ষা বৃহৎ। যুদ্ধের পূর্বে এই বন্দরে প্রায় এক কোটি টন মাল আমদানী-রপ্তানী হইত। কলিকাতার আরতন প্রায় ২৮ বর্গমাইল। ১৯২১ সনের সেন্সাসে লোকসংখ্যা ক্রিষ্টাব্দিক এগার লক্ষ ছিল। ১৯৪১ সালের সেন্সাসে ইহা বিশ লক্ষের উপর হয়। বর্তমানে হাওড়া ও কলিকাতার লোকসংখ্যা প্রায় বাট লক্ষ। উষাস্তর আগমনে উত্তরোত্তর ইহা বৃদ্ধির দিকেই চলিয়াছে। যথালীক্স যদি কলিকাতা ও সহরতলীর মধ্যে যাতায়াতের ব্যবস্থা না হয়, তবে অচিরেই কলিকাতা বাসের অমুপদ্রুত হইয়া উঠিবে।

১৯২৫ সাল হইতে বোম্বাই সহরে এবং ১৯২৮ হইতে মাদ্রাজ সহরে বৈদ্যুতিক ট্রেন চলিতেছে। কলিকাতাতেও বৈদ্যুতিক ট্রেন চলাচলের ব্যবস্থা সম্বন্ধে অনুসন্ধানের জন্য ১৯১৪ সন হইতে ক্রমান্বয়ে একাধিক কমিটি গঠিত হইয়াছিল।—সর্বশেষের কমিটি গঠিত হয় ১৯৪৭ সালে। কিন্তু বড়ই পরিতাপের বিষয় স্থলীক্স ছত্রৈণ বৎসরকাল জল্পনা কল্পনা করিয়াও আজ পর্যন্ত ভারতবর্ষের এই বৃহত্তম নগরীতে বৈদ্যুতিক ট্রেন চলাচলের ব্যবস্থা হইয়া উঠে নাই।

ভ্রাতা পদ্মজী গিনওয়ারা চেয়ারম্যান এবং অধ্যাক্স চারজন সদস্যসহ ১৯৪৭ সনের কমিটি গঠিত হয়। সমস্তদের মধ্যে মিঃ জে. ডি. মাইকেল ও মিঃ এন. এন. মজুমদার রেলওয়ে বোর্ডের এবং মিঃ বি সরকার গন্ডিমবজ সরকারের ভরক হইতে মনোনীত হইয়াছিলেন। অপর সদস্য মিঃ এক. এইচ সার্প ছিলেন বৈদ্যুতিক-বিশেষজ্ঞ। কমিটির সেক্রেটারী ছিলেন মিঃ এস. ডি. বানজী।

ভারতবর্ষে প্রায় একশত বৎসর পূর্বে প্রথম রেলগাড়ীর চালন হয়। ১৮৫০ খৃষ্টাব্দে ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ের নির্মাণ কার্য আরম্ভ হইয়া ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে রানীগঞ্জ পর্যন্ত বিস্তৃত হয় এবং দিল্লীর সহিত ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে সংযোগ স্থাপিত হয়। ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা হইতে রাণাঘাট পর্যন্ত ইষ্ট বেঙ্গল রেলওয়ে লাইন নির্মিত হইয়াছিল। বেঙ্গল নাগপুর রেলওয়ে ১৯০০ সালে হাওড়ার আসিয়া পৌঁছায়।

কলিকাতা নগরী হুগলী নদীর পূর্বে তীরে এবং হাওড়া স্টেশনটী পশ্চিম তীরে অবস্থিত। কলিকাতা সহর ও হাওড়া স্টেশনের মধ্যে পণ্যদ্রব্য চলাচলের সুবিধার জন্য ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে হাওড়া পুলের (পুয়াতন পনটুন ব্রিজ) নির্মাণ কার্য সমাপ্ত হয়। নৈহাটির নিকট হুগলী নদীর উপর জুবিলী ব্রিজ ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে নির্মিত হয়। কিন্তু ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে খিদিরপুর ডকের নির্মাণ কার্য সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত জুবিলী ব্রিজের উপর দিয়া মাল চলাচল রীতিমত ভাবে আরম্ভ হইতে পারে নাই। ইহার পর স্থলীক্সকাল পর্যন্ত কলিকাতার যাত্রী ও মাল চলাচলের উন্নতিকল্পে কোন উল্লেখযোগ্য ব্যবস্থা হয় নাই। হুগলী নদীর উপর বালী ব্রিজ মাত্র ১৯৩২ সনে নির্মিত হয়। বর্তমান হাওড়া ব্রিজের (উইলিংডন ব্রিজ) নির্মাণ কার্য ১৯৪০ সালে সমাপ্ত হয়।

১৯৪৭এর কমিটির প্রধান বিবেচ্য বিষয় ছিল—বর্তমানে কলিকাতায় যাত্রী এবং মাল চলাচলের যে ব্যবস্থা আছে তাহা প্রয়োজন্যের পক্ষে বঞ্ছিত কিনা, তাহা না হইলে কি উপায়ে ইহার উন্নতিসাধন করা সম্ভবপর। সরকার এই কমিটিকে ইহাও নির্দেশ দিয়াছিলেন যে তাহার ধরিয়া নিতে পারেন কলিকাতা ও সহরতলীতে বৈদ্যুতিক ট্রেন চালু হইবে।

কলিকাতা রেলওয়ে স্টেশনের বিশেষ অসুবিধা এই যে, শিরালদহ এবং হাওড়া এই দুইটী প্রধান স্টেশনই সহরের ব্যবসা বাণিজ্যের কেন্দ্র ডালহৌসী স্কোয়ার ও বড়বাজার হইতে দূরে অবস্থিত। কার্যোপলক্ষে যাহারা সহরতলী হইতে কলিকাতায় আসেন, তাহাদের গন্তব্যস্থল যেখানেই থাকুক না কেন, তাহাদিগকে হয় শিরালদহ, নয় হাওড়া স্টেশনে নামিতে হয়, পরে ট্রামে কিংবা বাসে গন্তব্যস্থলে পৌঁছিতে হয়। ইহাতে অবশ্য রাস্তায়, ট্রামে ও বাসে ভীড় বৃদ্ধি পায়। এইখানে উল্লেখযোগ্য, বোম্বাই সহরের ভিক্টোরিয়া টার্মিনাস ও চার্চগেট স্টেশন ব্যবসা কেন্দ্রের অতি সন্নিকটে অবস্থিত। সুব্যবস্থায় ট্রেনের সকলতা তখনই লাভ হয়, যখন অল্প কোন যানবাহনাদির সাহায্য ব্যতিরেকে যাত্রীগণ ট্রেনেই তাহাদের য য গন্তব্যস্থলে পৌঁছিতে পারেন। এই উদ্দেশ্য বাহাতে সাধিত হয়, তদনুযায়ী কমিটি তাহাদের সিদ্ধান্ত রেলওয়ে বোর্ডকে জানাইয়াছিলেন।



কমিটির সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য সিদ্ধান্ত কলিকাতার মিউনিসিপাল সীমানার চতুর্দিকে একটা সাকুলার বৈদ্যুতিক রেলওয়ে লাইন নির্মাণ। এই সাকুলার রেলওয়ে দমদম জংসন হইতে আরম্ভ হইয়া বর্তমান ই, আই, রেলওয়ের চিংপুর ইয়ার্ডের ভিতর দিয়া বাইবে। চিংপুর ঘাট হইতে ইহা “ওভার-হেড” বেল লাইন হইয়া চলিবে। বর্তমান পোর্ট-কমিউনার-এর বেল লাইনের উপর এই “ওভার-হেড” রেল লাইনটা নির্মিত হইবে এবং খিদিরপুর ডকের ভিতরেও ওভার হেড চলিয়া মাস্কেরহাট স্টেশনে গ্রাউণ্ড লেভেলে বর্তমান ই, আই, রেলওয়ের সাউদান’ সেকশনের সহিত যুক্ত হইবে। তথা হইতে শিলালদহ হইয়া পুনরায় দমদমে মিলিত হইবে।

বর্তমানে ডায়মণ্ডহারবার, বনগাঁও, নৈহাটি, বাগেল ও বজবজ হইতে যে সকল রেলওয়ে লাইন কলিকাতায় আসিয়াছে, সেগুলিকে সাকুলার রেলওয়ের সহিত সংযুক্ত করার জন্ত কমিটি ছোট ছোট লিঙ্ক লাইন নির্মাণের প্রস্তাব দিয়াছেন। এই প্রস্তাব কার্যো পরিণত হইলে যাত্রীগণ বৃহত্তর কলিকাতার পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণ সকল দিক হইতেই আসিয়া যানবাহনাদির পরিবর্তন ব্যতিরেকে সরাসরি স্ব স্ব কর্মস্থলের অতি সন্নিকটে পৌঁছিতে পারিবেন। এই উদ্দেশ্যে কমিটি সাকুলার ট্রেনের উপর আরোও কুড়িট নতুন রেলওয়ে স্টেশন নির্মাণের প্রস্তাব দিয়াছেন। পরিকল্পনাটি কাণ্ডে পরিণত হইলে কলিকাতার বিভিন্ন অংশে মাল চলাচলেরও সুবিধা হইবে। প্রাথমিক ব্যবস্থা হিসাবে কলিকাতা হইতে ত্রিণ মাউলের মধ্যে রেলওয়ে লাইনগুলিতে বৈদ্যুতিক ট্রেন চলাচলের জন্ত কমিটি সুপারিশ করিয়াছেন। বৈদ্যুতিক শক্তিতে ট্রেন চলিলে প্রতি ঘণ্টায় ২০টা ট্রেন চলাচল করিতে পারিবে। এইরূপে প্রয়োজন মত যান বাহনাদির ব্যবস্থা থাকিলে অতি অল্পকালের মধ্যে বৃহত্তর কলিকাতা গড়িয়া উঠিবে। বর্তমানে সহরতলীতে যান-

বাহনাদির উপযুক্ত ব্যবস্থা না থাকায় জনসাধারণ অবর্ণনীয় দুঃখকষ্ট বরণ করিয়াও কলিকাতায় বাস করিতে বাধ্য হইতেছেন। ইহাতে ক্রমে ক্রমে কলিকাতার আবহাওয়া দূষিত হইয়া উঠিতেছে। প্রয়োজন মত পরিষ্কৃত জলের অভাবে বারমাস সংক্রামক ব্যাধি লাগিয়াই আছে। অথচ বৃহত্তর কলিকাতা গড়িয়া উঠিলে অধিকাংশ লোক বাস্তুভর্য পরিবেশে কলিকাতার চতুর্দিকে বসবাস করিতে পারিবেন এবং কর্মোপলক্ষে তাঁহাদের কলিকাতায় আসার কোন অসুবিধা হইবে না। স্বল্পমূল্যে বৈদ্যুতিক শক্তি মিলিলে সহরতলীতে নানাপ্রকার প্রয়োজনীয় শিল্প প্রতিষ্ঠানও স্থাপিত হইতে পারিবে।

কিছুদিন পূর্বে সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল যে পশ্চিমবঙ্গ সরকার কলিকাতার ভূগর্ভস্থ রেলওয়ে ( আন্ডার-গ্রাউণ্ড অথবা টিউব ) লাইন নির্মাণ করার প্রস্তাব করিয়াছেন এবং এজ্ঞ জ্ঞ বিশেষজ্ঞ করাসী ইন্জিনিয়ারের মত গ্রহণ করা হইতেছে। এদিকে ১৯৪৭এর কমিটি তাঁহাদের রিপোর্টে ভূগর্ভস্থ রেলওয়ে এবং ওভার-হেড রেলওয়ে সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে সকল দিক দিয়া বিবেচনা করিলে কলিকাতায় ওভার-হেড বৈদ্যুতিক রেলওয়ে স্থাপন করাই বাঞ্ছনীয়। আমরা এই তর্ক বিতর্কে যোগদান করিতে ইচ্ছুক নহি। বাহাতে অচিরে কলিকাতা নগরীতে যাত্রী এবং মাল চলাচলের অসুবিধা দূর হয়, ইহাই আমাদের কাম্য। বাহা হোক, আশা করি পশ্চিমবঙ্গ সরকার তাঁহাদের পরিকল্পনাটি কার্যো পরিণত করার পূর্বে ইহার বিস্তৃত বিবরণ জনসাধারণকে জানাইবেন এবং তাঁহাদের মতামত গ্রহণ করিবেন। কারণ কমিটির রিপোর্টে দেখা যায় যে ভূগর্ভস্থ ট্রেন নির্মাণে প্রতি মাইলে প্রায় ৪ কোটি টাকা ব্যয় হইবার সম্ভাবনা—অপর পক্ষে ২৪ কোটি টাকা ব্যয়ে প্রায় ৪০০ ফুট মাইল লাইনে বৈদ্যুতিক ট্রেনের চলাচলের ব্যবস্থা হইতে পারে।

## মহাকবি গ্যোটে'র ফাউষ্ট কাব্যে সংশ্লেষণ-প্রণালীর ঔষধ

ডক্টর শ্রীহরগোপাল বিশ্বাস

ফাউষ্ট কাব্যের নায়ক ডক্টর ফাউষ্ট ছিলেন সর্ববিজ্ঞার পারদর্শী। কাব্যের আরম্ভে তাঁর স্বগতোক্তিতেই তা জানতে পারা যায়। ফাউষ্ট বলছেন :—

Habe nun, ach ! Philosophie.

Juristerei und Medizin

Und leider ! auch Theologie

Durchaus studiert, mit heissem Bemuehn.

—হায়, আমি প্রগাঢ় অভিনিবেশ ও কঠোর শ্রমসহকারে দর্শন, ব্যবহারশাস্ত্র, ভেষজবিজ্ঞা এবং ধর্মশাস্ত্র অধ্যয়ন করেছি !

ডক্টর ফাউষ্ট ঔষধ প্রস্তুত ও তার ব্যবহার-কল সম্বন্ধে যে সম্বন্ধ

বিস্তারিত করেছেন এবং মানুষের অর্জিত জ্ঞানের সংকীর্ণ পরিধি সম্পর্কে যে হতাশার ভাব প্রকাশ করেছেন তার আলোচনা করাই এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। গ্যোটে'র অনিন্দ্যস্বন্দ্ব কবিতার হুবহু বঙ্গানুবাদের ক্ষমতার অভাবে তার ভাবার্থমাত্র এখানে উল্লেখ করা হচ্ছে।

মহাকবি গ্যোটে ছিলেন একাধারে জ্ঞান ও বিজ্ঞানের একমিষ্ট পূজারী। অনেকেরই জ্ঞানের ১৭৪৯ খৃষ্টাব্দে জার্মানির ব্রান্সকুট শহরের এক ধনাঢ্য পরিবারে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তৎকালে প্রচলিত হুকুমার কলায় উচ্চ শিক্ষালাভের সঙ্গে রসায়নশাস্ত্র এবং পদার্থবিজ্ঞানের চর্চা করতও তিনি ছাড়েন নি।

বর্ষ সম্বন্ধে একটি বিবরণও খাড়া করেছিলেন। বিজ্ঞানের ক্রমোন্নতি সম্বন্ধে আলোচ্য প্রসঙ্গে কবি যে গভীর অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় দিয়েছেন—তা সবিশেষ প্রাধান্যযোগ্য। ফলতঃ গোচরের বাণীতে জাতি জাতি যে অনুপ্রেরণা লাভ করেছিল তাঁর তুলনা মেলে না। দুর্ভাগ্যবশত অসুস্থতায় ও তৃপ্তিহীন জ্ঞানপিপাসা তিনি জাগিয়ে তুলেছিলেন এই জাতির মজ্জাতে মজ্জাতে। এই উজ্জ্বল বাণীতে উপলব্ধির জন্ত কাউট কাব্যের নিম্নলিখিত দুটি বাণী যথেষ্ট মনে করি।—

Wo fass ich dich unendliche Natur ?

—অনন্ত প্রকৃতি তোমা বুঝিব কেমনে ?

Ich wuenschte recht gelehrt zu werden

Uud moechte gern, was auf der Erden

Und in dem Himmel ist, erfassen,

Die Wissenschaft und die Natur.

—সত্যিকারের জ্ঞানী হতে আমি চাই—

এ ধরায় আর দূর মহাকাশ মাঝে

বসে রহন্ত চির-অগোচরে রাজে—

সব না জানলে আমার শান্তি নাই।

এখন মেডিসিন বা ভেতরবিজ্ঞান উপলক্ষে কাউট কাব্যে যে প্রসঙ্গ আছে তার মোটামুটি আভাস দেবার প্রয়াস পাচ্ছি। কবিগুরু কিরূপ পরিবেশের অবতারণা করে কত কৌশলে তাঁর মনোভাব ব্যক্ত করেছেন—তা শীঘ্রই আমরা দেখতে পাব।

...বসন্তকাল। এচও শীতাপগমে বৃক্ষলতা পত্রপুষ্পবস্ত্রে নব-জীবনের জয়যাত্রা শুরু করেছে। প্রকৃতি বর্ণগন্ধে বর্ণার হৃদয় ভরপুর। নির্মেষ নীল আকাশ থেকে সূর্যের সোনালি কিরণ অজস্র ধারায় ঝরে পড়ছে। শহরের কর্মকোলাহল থেকে ধনী নির্ধন, কুলি-মজুর, আবালবৃদ্ধবিনিতা বহু ঘরের দুঃসহ ক্লেশাক্ত পরিবেশ ভেড়ে বেরিয়েছে ইষ্টারের উৎসব করতে—গ্রামের পথে, মাঠে পর্বতে। গাঁয়ের চাষীরাও আজ ঘরছাড়া—খাত, পানীর, বাজ্যবস্ত্র নিয়ে খোলা জায়গায় নাচগানে মত্ত। উৎসবমুগ্ধ, আনন্দবিত্তোর হৃদয় জঙ্গম। উজ্জ্বল কাউটও বহুদিন পরে তাঁর জ্ঞানসাধনা ও গবেষণার ক্ষুদ্র রুদ্ধ কক্ষ থেকে বেরিয়ে পড়েছেন গাঁয়ের পথে—জনগণের আনন্দের এই স্বর্ণাধারায় অবগাহনার্থে—তাঁর প্রিয় শিশু ভাগ্যবানকে সঙ্গে করে। ক্রিষ্ণ অবাস্তর হ'লেও বলে রাখি যে, কবি বর্ণিত এই মাঠঘাট আমি যেন মনস্তক্ষেপে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি ; কারণ আমার সাম্প্রতিক জাতি প্রবাসে আমি অনেকদিন কবির জন্মস্থান ক্রাঙ্কফোর্ট শহরের উপকণ্ঠে বাডহোমবুর্গে ছিলাম, কিন্তু প্রত্যহ ট্রাম বা ট্যাক্সিযোগে ছোট ছোট পাহাড় ভিঙিয়ে মাঠের ভেতর দিয়ে চাষীদের গ্রাম পেরিয়ে মহাকবির পদরঞ্জিত শহরে আসতাম।

এখন আমাদের আলোচ্য বিষয়ে আবার আসা যাক।

আচার্য কাউট ভাগ্যবানকে নিয়ে উৎসবরত একদল কৃষকদের পাশ দিয়ে যেতেই তারা তাঁকে চিনতে পেরে সর্বদা জানালে এবং

সকলে তাঁকে ঘিরে দাঁড়িয়ে উৎসুকভাবে প্রশ্নোত্তরনেত্রে তাঁর দিকে চেয়ে রইল। এই সময় তাদের সুপাভবরূপ একজন বয়স্কান কৃষক উজ্জ্বল কাউটকে বলতে লাগল—“হে মহাপ্রাণ, এই আনন্দের দিনে তুমি আমাদের কাছে আসার আশা যে কতদূর খুশী হয়েছি তা একাশের ভাষা খুঁজে পাচ্ছি না। আজ আমরা যে এখানে মিলিত হয়েছি এ কেবল তোমার স্বর্গত পিতা এবং তোমার দয়াতেই সম্ভবপর হয়েছে। কারণ আমাদের গাঁয়ে যখন ভীষণ ম্রগ দেখা দেয় এবং প্রত্যহ বহুলোক মারা যেতে থাকে তখন করুণার অবতার তোমার পিতা আহাির নিজা ভুলে ঘরে ঘরে ঘুরে আমাদের ঔষধ দিয়ে যেতেন। তুমি তখন ছিলে বয়সে নবীন, কিন্তু তুমিও নিজের জীবনের মারা না করে হৃদয় নিষ্ঠার সঙ্গে প্রত্যেক রোগীকে ঔষধ খাওয়াতে, শুশ্রূষা করতে এবং সাহস দিতে। ভগবানের অশেষ দয়া যে যিনি এবং তাঁর পুত্র দেবদূতের মত উপস্থিত হয়ে সেই চরম দুঃসময়ে করালব্যাদির কবল থেকে আমাদের বাঁচবার চেষ্টায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন, ঐ ব্যাধি তাঁদের কেশাশ্রও স্পর্শ করতে পারে নি।” গ্রামবৃদ্ধের কথা শেষ হলে সকলে সমবেত ভাবে উজ্জ্বল কাউটের দীর্ঘজীবন কামনা করে জগদীশ্বরের কাছে প্রার্থনা করলে। প্রত্যুত্তরে কাউট বললেন—“ভাই সব, মানুষের একমাত্র স্বল্প পরমপিতা পরমেশ্বরই সকল কল্যাণের মূলধার। আমরা তাঁর দীন ভৃত্য হিসাবে তাঁরই অপার করুণার কণামাত্র তোমাদের কাছে পৌঁছিয়ে দিতে পেরেছি ; হুতরাং এজন্ত ধন্যবাদ আমাদের প্রাপ্য নয়—তোমরা ভগবানকেই এর জন্ত কৃতজ্ঞতা জানাও।”

এই কথা বলে প্রতিমন্মথারপূর্বক বিদায় নিয়ে শিশু উজ্জ্বল কাউট ঘুরে একটু নিয়ালার সরে গেলেন। তখন শিশু ভাগ্যবান বলতে লাগলেন—“শুভদেব, না জানি কি অনাবিল আনন্দই না আজ আপনি পেলেন—গাঁয়ের লোকদের প্রাণখোলা অভিনন্দন ও সন্তুষ্টি প্রাশস্তি লাভ করে! আপনার মত সেই ব্যক্তিই যথার্থ হুশী ও ভাগ্যবান যিনি ভগবানের দেওয়া প্রতিভা ভগবানে ঈপ্সিত মঙ্গলকার্যে নিয়োজিত করে যত্ন হন।”

উজ্জ্বল কাউট অতঃপর একটি শিলাখণ্ড লক্ষ্য করে বললেন—“অনেকটা হাঁটা হয়েছে—চল ঐ পাথরটার উপর বসে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করা যাক।” দেখানে কিছু সময় নীরবে কাটা'নার পর উজ্জ্বল কাউট বলে চললেন—“সেই ভীষণ ম্রগ যখন এ অঞ্চলের গ্রামকে গ্রাম উজাড় করছিল, সেই সময় আমি প্রায়ই এসে নির্জনে একাকী এই পাথরটার উপর বসতাম—বসে আমাদের অসহায় অবস্থার কথা কত না চিন্তা করতাম। কখনো বা উপবাসী থেকে মর্মান্তিক যাতনা নিয়ে প্রার্থনা করতাম। তখন বয়সে ছিলাম তরুণ—সেই বয়সের সহজাত সীমাহীন আশা ও অটল সরল বিশ্বাস নিয়ে, মঙ্গল চক্ষে কত না দীর্ঘাশা বলে ভগবানকে ডাকতাম—যদি তিনি আমার কাতর ক্রন্দনে সাদা দিয়ে ঐ মেগের আক্রমণ থেকে গ্রামবাসীদের রক্ষা করেন।...কাজেই আজ এরা আমার যে প্রশংসা করল, এ যে আমার কাছে বিজ্ঞপের মত ঠেকবে তাতে আর আশ্চর্য কি? আমার অন্তরদেবতাই জানেন

এদের সরল প্রাণের উজ্জল প্রশংসার কতটুকু আমার পিতার বা আমার সত্যিকারের প্রাণ্য!—আমার পিতা ছিলেন নিতান্ত স্বভাবী, আপনতোলা লোক। নিরলস ভাবে সমস্ত মন প্রাণ ঢেলে দিয়ে তিনি সর্বদাই ‘প্রকৃতির পুণ্যবৃত্ত’ (Nature's holy circle) অথবা অভিনিবেশ সহকারে পাঠ করতেন এবং একজন বা দুজন দক্ষ সহকারীর সঙ্গে তাঁর গুপ্তককে অতুত করতেন। অমুসারে আগুন এবং মূবার (crucible) সাহায্যে নানা বিরুদ্ধমণী পদার্থের সংযোগ সাধনে—যেন সিংহের সঙ্গে লিলির মিলন ঘটানোর জন্ত—ব্যাপৃত থাকতেন। এইরূপে জন্ম নিত কত নব নব ঔষধ; কিন্তু রোগীদের বাচাতে পারতাম কই সে সব ঔষধ দিয়ে? হাজার হাজার লোককে আমি বহুশ্রমে দিয়েছি এই ঔষধ—তারা গেছে মরে। এই অকলে আমাদের ঔষধই স্নেহের চেয়েও ছিল বেশী ভয়ঙ্কর। কিন্তু কেউ শুধার নি কখনো ‘কে কে এই ঔষধ খেল? আর তার মধ্যে ক’জনই বা সেয়ে উঠল?’—আর আজ আমি বঁচে রয়েছি সেই লোকান্তরিত হত-ভাগাদের শ্রিয়জনের কাছ থেকে উদ্ধৃষ্টিত প্রশংসা ও বশ্ববাদ পাবার জন্ত।”

শুধর এই মর্মবেদনা করণ, হতাশাব্যঞ্জক কথা শুনে ভাগনার বলে উঠলেন—“এত এত দুঃখ করবার কি আছে? মানুষ তার সমসাময়িক বিজ্ঞানের নির্দেশ অকুণ্ঠভাবে গ্রহণ করে সত্যতার সঙ্গে তা প্রতিপালন করা ভিন্ন আর কি করতে পারে বলুন? আপনি আপনার পিতার নিকট যা শিখেছিলেন, তা সম্পূর্ণ সরল অন্তঃকরণে প্রগাঢ় বিশ্বাসের সঙ্গেই লিখেছেন। আপনার জীবনে বিজ্ঞানের সীমারেখা আপনি যাবেন বাড়িয়ে এবং সেই বিবৃদ্ধ জ্ঞানরাজ্যের উত্তরাধিকারী আপনার পুত্র হয়ত আরো রোমাঞ্চকর আবিষ্কারের খ্যাতিলাভে ধস্ত হবেন। কিন্তু একথা ভুললে চলবে না যে—আগামী-কালের সমুদ্রত বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের হুরমা সৌখের ভিত্তিপ্রস্তর আমরাই ত গেঁথে চলছি। ভুলচুক হয় ত আমাদের হচ্ছে, কিন্তু তাই বলে হাত পা গুটিয়ে বসে থাকলে ত চলবে না। একথা যদি মেনে নেন, তবে এর জন্ত দুঃখ বা অনুশোচনা করবার কোনও কারণ আছে বলে আমি মনে করি না।”

আমরা দেখলাম, মহাকবি গোটে ডক্টর ফাউন্টের মুখ দিয়ে যে জটিল সমস্তার অবতারণা করলেন পরক্ষণেই তিনি ভাগনারের উজ্জ্বল মাধ্যমে অতি সরল স্থল্লর ভাবে সেই সমস্তার সমাধান করে দিলেন। মহাসমুদ্রের কোটি কোটি প্রবালকীটের-দেহাবশেষে গড়ে ওঠে ফুলফল-শোভিত নয়নমনোহর বীপমালা—সেইরূপ পুরুষ পরম্পরায় এইরূপ কত ফাউন্টের আজীবন একনিষ্ঠ সাধনার কলে যে আমরা বিজ্ঞানের বর্তমান অভাবনীয় উন্নতি প্রত্যক্ষ করছি—কে তার খবর রাখে? জার্মানজাতি গোটেত্রের এই মর্মবাণী মর্মে মর্মে অনুভব করার কলে স্বল্প পরিসর এক শতাব্দী সময়ের মধ্যেই তারা জ্ঞানরাজ্যের বিভিন্ন দেশ আবিষ্কার ও অধিকার করে পৃথিবীর মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ স্থিতিশীল জ্ঞান-সাম্রাজ্য স্থাপনে সমর্থ হয়েছে। এই প্রসঙ্গে সবচেয়ে আনন্দের কথা এই যে, সংশ্লেষণ সজ্ঞাত ঔষধের আবিষ্কার ও প্রস্তুতি যিনি হৃদয় বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর স্থাপন করেন, নোবেল পুরস্কার বিজয়ী সেই স্বনামধন্য পল এরলিখের সাধনার ক্ষেত্র ছিল মহাকবির জন্মভূমি, ফ্রান্সের টুলুজ।

পরিশেষে আমাদের দেশের রসায়নের তরুণ ছাত্রছাত্রী ও প্রবীণ রসায়ন-বিজ্ঞানীদের—বিশেষ করে বীরা ঔষধ শিল্পে আত্মনিয়োগ করেছেন, জনগণের ব্যাধিক্রম ও অপমৃত্যু নিবারণে ফাউন্টের যে মর্মবেদনাপীড়িত ছবি কবি এঁকেছেন—তৎপ্রতি তাঁদের সসম্মত দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। এই শাস্ত্রচর্চার আমরা যে হযোগ স্থিতি পেয়েছি এবং ভগবদ্দত্ত ক্ষমতার বতটুকু অনুশীলন ও সদ্যবহার আমাদের ক্ষুদ্র শক্তিতে সম্ভবপর হয়েছে তার সাহায্যেই সনিষ্ঠ অমলীলতার সঙ্গে নতুন নতুন ঔষধ আবিষ্কার ও প্রস্তুত করে আমাদের দুই দেশবাসিগণকে ব্যাধি ও অপমৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করবার পথিহিত ব্রত ও গুরুদায়িত্ব আমাদের উপর সত্যত স্তম্ভ, একথা যেন কখনো আমরা ভুলে না যাই। ‘অগচ্ছিতার কৃকার গোবিন্দায় নমঃ নমঃ’ বলে যে দেশের লোক শয্যাত্যাগ করেন, বর্তমান প্রবন্ধে আলোচিত গোটেত্রের এই ভাবধারার অন্তর্নিহিত আদর্শ তাঁদের অন্তর স্পর্শ করে জীবন মহিমময় করে তুলবে বলেই আমার আন্তরিক বিশ্বাস।



# গীতগোবিন্দ

রাজশেখর বসু

রবীন্দ্রনাথের কবিখ্যাতি অসীম, কিন্তু তাঁর কাব্যের সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয় প্রধানত বাঙালীরই আছে। বাংলা ভাষায় ব্যুৎপন্ন অবাঙালী বেশী নেই, যাঁরা মূল রচনা পড়ে রবীন্দ্রকাব্য পূর্ণভাবে উপভোগ করতে পারেন। বিশ্ব-সাহিত্য রূপে গণ্য হলেও রবীন্দ্রসাহিত্য সর্বভারতে ব্যাপ্ত হয় নি।

আর এক বাঙালী কবি জয়দেব প্রায় আট শ বৎসর পূর্বে আবির্ভূত হয়েছিলেন। তখন মুদ্রাযন্ত্র না থাকায় গ্রন্থের বহুপ্রচার অসম্ভব ছিল, শিক্ষিত পাঠকের সংখ্যাও অল্প ছিল, এক প্রদেশ থেকে অন্য প্রদেশে যাতায়াতও কষ্টসাধ্য ছিল। তথাপি জয়দেবের গীতগোবিন্দ কাব্য সর্ব ভারতে প্রচারিত হয়েছে, কাশ্মীর থেকে পাণ্ড্যদেশ, দ্বারকা থেকে মণিপুর—সর্বত্র তাঁর পদাবলী বহুকাল থেকে পণ্ডিত সমাজে পঠিত এবং বৈষ্ণব মন্দিরে গীত হয়ে আসছে। এই প্রসিদ্ধির কারণ, জয়দেব তৎকালীন সর্বভারতীয় সাহিত্যিক ভাষা সংস্কৃতে তাঁর কাব্য রচনা করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ যদি সেকালে জন্মাতেন এবং সংস্কৃতে লিখতেন তবে তিনি সমগ্র ভারতের অপ্রতিদ্বন্দ্বী সার্বভৌম কবি রূপে গণ্য হতেন তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু তিনি যদি এই যুগে সংস্কৃতে লিখতেন তবে বিশেষ খ্যাতি পেতেন না, কারণ অসামান্য ভারতীয় ভাষার অভ্যাসে সংস্কৃতের চর্চা এবং প্রতিপত্তি এখন কমে গেছে।

শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সাহিত্যরত্ন মহাশয়ের ‘কবি জয়দেব ও শ্রীগীতগোবিন্দ’ গ্রন্থের বর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ\* সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে। আমি এই গ্রন্থ সম্বন্ধে কিছু লিখতে আহূত হয়েছি। গীতগোবিন্দের আলোচনা দুই দিক থেকে হতে পারে, কাব্য রূপে এবং ভক্তিগ্রন্থ রূপে। দুর্ভাগ্যক্রমে এই দুই দৃষ্টির কোনওটির

অধিকারী আমি নই। অগত্যা অন্ধ বেমন হাত বুলিয়ে হস্তীদর্শন করে, আমিও তেমনি অমর্মগ্রাহী সামান্য পাঠকের স্থূল দৃষ্টিতে গীতগোবিন্দের আলোচনা করছি।

বহু বৎসর পূর্বে একটি প্রাচীন-কাব্য-সংগ্রহ গ্রন্থের সমালোচনা প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছিলেন—‘এই সকল কবিতা অনেক আধুনিক বাঙ্গালীর অকৃতিকর।...সামান্য নায়কের সঙ্গে কুলটার প্রণয় হইলে যেমন অপবিত্র অকৃতিকর এবং পাপে পঙ্কিল হয়, কৃষ্ণগীতাও তাঁহাদের বিবেচনায় তজপ।...এ সকল কবিতা অনেক সময় অশ্লীল এবং ইন্দ্রিয়ের পুষ্টিকর—অতএব ইহা সর্বথা পরিহার্য। যাঁহারা এইরূপ বিবেচনা করেন তাঁহারা নিতান্ত আশারগ্রাহী। যদি কৃষ্ণগীতার এই ব্যাখ্যা হইত তবে ভারতবর্ষে কৃষ্ণভক্তি এবং কৃষ্ণগীতি কখনও এত কাল স্থায়ী হইত না।...যিনি কবিতা লিখেন তিনি জাতীয় চরিত্রের, সামাজিক বলের এবং আত্মস্বভাবের অধীন।...প্রাচীন কবি মাত্রেই কতকগুলি দোষ গুণ আছে যাহা আধুনিক কবিতে অপ্রাপ্য। সেইগুলি তাঁহাদের সাময়িক লক্ষণ।’

বঙ্কিমচন্দ্র গীতগোবিন্দকে অশ্লীল বলেন নি, কিন্তু জানিয়েছেন যে তাঁর সমকালীন অনেকের দৃষ্টিতে এই প্রকার রচনা আপত্তিকর ছিল। প্রাচীন কবিদের যে সাময়িক লক্ষণের কথা তিনি বলেছেন, তাঁর সময়ের শিক্ষিত পাঠকসমাজের বিচারপদ্ধতিতেও সেই সাময়িক লক্ষণ দেখা যায়। রুচি কালে কালে বদলায়। যা স্বাভাবিক মহুগুণ তার সম্বন্ধে কোনও দেশের প্রাচীন কবিদের সংকোচ ছিল না। তাঁরা কাম ও প্রেমের বড় একটা পার্থক্য করতেন না। আদিরস পরিবেশনে তাঁদের অনেকে মুক্তহস্ত ছিলেন, পাঠকবর্গও তাতে দোষ ধরতেন না। কিন্তু ইংরেজী শিক্ষা এবং ভিক্টোরীয় সাহিত্যের প্রভাবে বঙ্কিমচন্দ্রের সময়ে শিক্ষিত জনের রুচি বদলে গিয়েছিল। তাঁরা ভাবতে পারতেন না যে পঞ্চাশ বাট বৎসর পরে পাশ্চাত্য রুচি এদেশের প্রাচীন রুচিকে হার মানাবে। বর্তমান কালের অনেক সুবিখ্যাত লেখক

\* কবি জয়দেব ও শ্রীগীতগোবিন্দ।—শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়। প্রকাশক—ভদ্রদাস চট্টোপাধ্যায় আণ্ড সন্স। ২২৩+১০০ পৃষ্ঠা। মূল্য চার টাকা।

লালসার বর্ণনায় কাৰ্পণ্য করেন না। আদিরস ভক্তির বাহন হতে পারে কিনা সে বিষয়ে মতভেদ থাকতে পারে, কিন্তু আধুনিক সমালোচকের দৃষ্টিতে গীতগোবিন্দে এমন কিছুই নেই বা কাব্যে বৰ্জনীয়।

বৈষ্ণবমতে শাস্ত দাস্ত সখ্য বাৎসল্য ও মধুর রসের যে-কোনটির অবলম্বনে কৃষ্ণভক্তি চরিতার্থ হতে পারে, কিন্তু মধুর বা শৃঙ্গার রসই শ্রেষ্ঠ, যাতে উপাস্ত-উপাসকের মধ্যে কামগন্ধগীন প্রণয়িসম্পর্ক হয়। চৈতন্যদেবের প্রণের উত্তরে রায় রামানন্দ কৃষ্ণসাধনার নানা ভেদ উল্লেখ করে পরিশেষে বলেছেন, ‘কান্তা ভাব সর্ব সাধ্য সার।’ চৈতন্যদেবও বলেছেন, ‘বরঃ কৈশোরকং ধ্যেয়মাগ্ধ এব পরো রসঃ’—অর্থাৎ সাধকের পক্ষে কৈশোর রূপই ধ্যানযোগ্য এবং আদিরসই পরম রস। মরমী বা মমিষ্টিক সাধকগণের ঈশ্বরোপলব্ধি কি প্রকার, তা অজ্ঞ লোকের ধারণার অতীত। কিন্তু এ বিষয়ে সন্দেহ নেই যে শুধু ভারতীয় ভক্ত নয়, বহু খ্রীষ্টীয় সন্ন্যাসী এবং স্ত্রী সাধকও প্রেমাতুরা বিরহিণী নায়িকার দৃষ্টিতে ঈশ্বরের অন্বেষণ করেছেন এবং ঈশ্বরোপলব্ধির ফলে প্রিয়সমাসমতৃষ্ণা নায়িকার তুল্যই নিজেকে কৃতার্থ জ্ঞান করেছেন।

তথাপি প্রশ্ন ওঠে, ঝুল আদিরস কি ভক্তির বাহন হতে পারে? পূর্বোক্ত প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছেন—‘প্রকৃতি ও পুরুষ সাংখ্যমতানুসারে পরস্পরে আসক্ত।...শ্রীমদভাগবত-কার এই দুইরূপ ভাব জনসাধারণের বোধগম্য করিয়া মৃত ধর্মে জীবনের সংসারের অভিপ্রায় করিলেন। মহাভারতে যে বীর ঈশ্বরবতীর বলিয়া লোকমণ্ডলে গৃহীত হইয়াছিল, তিনি তাঁহাকেই পুরুষ স্বরূপে স্বীয় কাব্যমধ্যে অবতীর্ণ করিলেন এবং স্বকপোল হইতে গোপকন্তা রাধিকাকে সৃষ্ট করিয়া প্রকৃতিস্থানীয় করিলেন।...সাংখ্যের মতে ইহাদের মিলনই জীবের দুঃখের মূল—তাই কবি এই মিলনকে স্বাভাবিক এবং অপবিদ্র করিয়া সাজাইলেন। শ্রীমদভাগবতকারের গৃঢ় তাৎপর্য, আত্মার ইতিহাস—প্রথমে প্রকৃতির সহিত সংযোগ, পরে বিয়োগ, পরে মুক্তি। জয়দেব প্রণীত কৃষ্ণচরিত্রে এই রূপক একেবারে অদৃশ্য।...আর্থজাতির জাতীয় জীবন দুর্বল হইয়া আসিয়াছে।...অস্ত্রের বজ্রনার স্থানে রাজপুত্রী সকলে নূপুর-নিষ্কণ বাজিতেছে।...গীতগোবিন্দ এই সমাজের উক্তি।...শব্দভাণ্ডারে যত স্নকুমার কুসুম আছে, সকলগুলি বাছিয়া বাছিয়া চতুর গোঁস্বামী কিশোর-কিশোরী রচিয়াছেন।...যে মহাগৌরবের জ্যোতি মহাভারত ও ভাগবতে কৃষ্ণচরিত্রের উপর নিঃসৃত

হইয়াছিল, এখানে তাহা অন্তর্হিত হইয়াছে। ইন্দ্রিয়পরতার অন্ধকার ছায়া আসিয়া প্রথরসুখত্বাতপ্ত আর্থ পাঠককে শীতল করিয়াছে।’

বঙ্কিমচন্দ্র কৃষ্ণভক্ত এবং বৈষ্ণব কাব্যের অনুরাগী ছিলেন। তিনি গীতগোবিন্দের লালিত্য এবং রচনাচাতুর্ঘ্য স্বীকার করেছেন। তাঁর একাধিক উপন্যাসে এই কাব্য থেকে উদ্ধৃতিও দিয়েছেন। কিন্তু জয়দেবের রচনায় তিনি পারমাধিক তত্ত্ব কিছুই পান নি। তাঁর আরাধ্য শূরশ্রেষ্ঠ দার্শনিক রাজনীতিজ্ঞ কৃষ্ণ গীতগোবিন্দে নেই।

শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয় সুপণ্ডিত, ভক্ত এবং বৈষ্ণব শাস্ত্রে অশেষবিৎ। তাঁর গ্রন্থের মোট পৃষ্ঠা-সংখ্যা ৩৮৪, তার মধ্যে ১৬০ পৃষ্ঠা সটীক সাহুবাদ ‘গীতগোবিন্দ কাব্য এবং অবশিষ্ট ২২৪ পৃষ্ঠা ভূমিকা। এই বৃহৎ ভূমিকায় গ্রন্থকার জয়দেবের দেশ, কাল ও চরিত্র বিবৃত করেছেন এবং বৈষ্ণব ধর্ম ও সাধনার পদ্ধতি সম্বন্ধে সবিস্তারে আলোচনা করেছেন। তিনি বহু যুক্তি এবং নানা শাস্ত্রীয় প্রমাণ দিয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিকূল মত খণ্ডন করে দেখিয়েছেন যে জয়দেবের কাব্য ভাগবতেরই অন্তর্ভুক্ত, কামগ্রহ নয়, ভক্তিগ্রহ।

আধুনিক শিক্ষিত বাঙালীর সংস্কৃতে অনুরাগ নেই, কিন্তু প্রাচীন বাঙালী কবি জয়দেবের ভারতবিখ্যাত কাব্য সম্বন্ধে অনেকের কোতুলি আছে। মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের এই বহুতথ্যসংবলিত গ্রন্থ পড়লে তাঁরা উপকৃত হবেন এবং গীতগোবিন্দ কাব্যের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে চিন্তা করবার অনেক উপাদান পাবেন। কাব্যের প্রথম যুগের তৃতীয় শ্লোকে জয়দেব তাঁর উদ্দেশ্যের ইঙ্গিত করেছেন—যদি হরিশ্চন্দ্রের মন সরস করতে চাও, যদি বিলাসকলায় কেঁতুলি থাকে, তবে জয়দেবকথিত এই মধুর কোমল কান্ত পদাবলী শোন। বোধ হয় এর তাৎপর্য—শুদ্ধচিত্ত ধার্মিক বৈষ্ণব পদাবলী-বর্ণিত বিলাসকলাকে উপাস্ত-উপাসক-মিলনের রূপক ভাবেই নেবেন এবং ভক্তিভরে হরিশ্চন্দ্রের মন সরাবেন। আর, কোতুলি সাধারণ পাঠক এতে পাবেন রাধাকৃষ্ণলীলাচ্ছলে বর্ণিত মাহুতী প্রেমলীলারই মোহন চিত্র।

যারা সংস্কৃত জানেন না তাঁরাও গ্রন্থকারের প্রাঞ্জল বাংলা অনুরাদের সাহায্যে অনায়াসে মূল শ্লোকগুলিও বুঝতে পারবেন। আশা করি, বহু যত্নে সম্পাদিত এই গ্রন্থের প্রচুর ক্রেতা ও পাঠক হবে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিক্ষাধিকার এই গ্রন্থ প্রকাশের জন্ত অর্থ সাহায্য করে প্রশংসাজনক হয়েছেন।

# দেশ বিদেশ

শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ

## বাস্তবহারা-সমস্যা—

দেশবিভাগের ফলে পঞ্জাবে ও বাঙ্গালায়—পাকিস্থানভুক্ত অংশে মুসলমানাতিরিক্ত অধিবাসীদিগের ধন, প্রাণ ও মান বিপন্ন হইয়াছে। দেশবিভাগের সর্ব হিসাবে মুসলমান নেতা মিষ্টার জিন্না অধিবাসি-বিনিময়ের যে প্রস্তাব করিয়াছিলেন, তাহা গান্ধাজীপ্রমুখ ব্যক্তিদিগের দ্বারা গৃহীত হয় নাই। তাঁহারা আশা করিয়াছিলেন, ভারতে যেমন মুসলমানগণ, পাকিস্তানে তেমনই হিন্দুরা যথাক্রমে হিন্দু ও মুসলমান অধিবাসীদিগের তুল্যাধিকার সম্ভোগ করিয়া নিরাপদে বসবাস করিতে পারিবে। কিন্তু তাঁহাদিগের সে বিশ্বাস নষ্ট হইয়া গিয়াছে। তাহার প্রধান কারণ, তাঁহারা অতীতের অভিজ্ঞতা অবজ্ঞা করিয়া-ছিলেন। দূর অতীত—ঐশ্বদেী আন্দোলনকালে প্রচারিত “লাল ইত্তাহার” প্রভৃতি; অদূর অতীত—কলিকাতায় সাম্প্রদায়িক হত্যাব্যাপারের পরে নোয়াখালী ও ত্রিপুরার ঘটনাসমূহ। কার্যকালে দেখা গেল, ভারত ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র হইলেও, পাকিস্তান আপনাকে ইসলাম রাষ্ট্র ঘোষণা করিল—সুতরাং তথায় মুসলমান ও অমুসলমান উভয়ে প্রভেদ থাকিল ও থাকিবে। পঞ্জাবে অধিবাসি-বিনিময় “করাল রূপাণ মুখে”—রক্তপাতে ও হত্যায় একরূপ সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। বাঙ্গালায় তাহা হয় নাই এবং ভারত সরকার ও পশ্চিমবঙ্গ সরকার উভয়েই পূর্ববঙ্গের হিন্দুদিগকে পশ্চিমবঙ্গে ভার—দূরহ ভার, সুতরাং অবাস্তিত বলিয়া মনে করিয়াছেন। সেইজন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রথমাবধি পূর্ববঙ্গের বাস্তুত্যাগী হিন্দু নর-নারীর পুনর্বাসতির আবশ্যক ব্যবস্থা করেন নাই এবং শেষে তাহাদিগকে আন্দামান হইতে হায়দ্রাবাদ পর্যন্ত নানা স্থানে পাঠাইয়া কোনরূপে অব্যাহতি লাভের চেষ্টা করিয়াছেন ও করিতেছেন। ফলে বাঙ্গালী জাতির একত্ব নষ্ট হইতেছে এবং বহু বাঙ্গালী বাঙ্গালার সংস্কৃতিভ্রষ্ট ও মাতৃভাষাত্যাগী হইবার সম্ভাবনা প্রবল হইতেছে। ভারত সরকার বিহারকে

যেমন উড়িষ্যাকেও তেমনই বাস্তুহারা বাঙ্গালার পুনর্বাসতির ব্যবস্থা করিতে নির্দেশ দিয়াছেন। অথচ দেখা গিয়াছে, বিহার, উড়িষ্যা ও আসাম কেহই পূর্বাধি বাঙ্গালীর প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন নহে। কাজেই তাহারা সে নির্দেশ সাগ্রহে পালন করিতে পারে নাই এবং সময় সময় প্রথম প্রদেশদ্বয়ে প্রেরিত বাঙ্গালীরা ফিরিয়া আসিয়াছে।

পূর্ববঙ্গে হিন্দু নরনারীর উপর যে অনাচার ও অত্যাচার অহুষ্ঠিত হইয়াছে, তাহার প্রতিক্রিয়া যে পশ্চিমবঙ্গে হয় নাই, এমন বলা যায় না—তবে তাহা যৎসামান্য। বিহারে যখন মুসলমানরা উৎপীড়িত হইয়াছিল, তখন পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু তাহা কলিকাতায় এবং নোয়াখালীতে ও ত্রিপুরায় হিন্দুলাহনার প্রতিক্রিয়া বলিয়া পার্লামেন্টে স্বীকার করিয়াছেন। সে যাহাই হউক, “যেন তেন প্রকারে” অবস্থার উন্নতি সাধনের উদ্দেশ্যে তিনি ভারতেরও দোষ স্বীকার করিয়া লইয়া, পাকিস্তানের সহিত সংখ্যালঘিষ্ঠদিগের সম্বন্ধে চুক্তিবদ্ধ হইয়াছেন। তিনি মনে করিয়াছেন, চুক্তির সর্ব পাকিস্তানে পালিত হইবে। কিন্তু ইতিমধ্যেই চুক্তির সর্ব পরিবর্দ্ধন করিতে হইয়াছে। চুক্তির সর্ব পালন জন্য তিনি যে মন্ত্রীকে ছয় মাসের জন্য নিযুক্ত করিয়াছিলেন, তাঁহার কার্যকাল বর্দ্ধিত করিতে হইয়াছে। সেই মন্ত্রী বাঙ্গালী—পশ্চিমবঙ্গের প্রধান-সচিব হইয়া ডক্টর বিধানচন্দ্র রায় বাহাকে সচিবসভে গ্রহণ জন্য আহ্বান করিয়াও গ্রহণ করিতে পারেন নাই—চারুচন্দ্র বিশ্বাস। তিনি পাকিস্তানের সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের স্বার্থ রক্ষার্থ নিযুক্ত মন্ত্রী ডক্টর মালেকের সহিত পূর্ববঙ্গের ও পশ্চিমবঙ্গের নানাস্থান পরিদর্শন করিয়াছেন—দিল্লীচুক্তি অহুসারে কাজ করিবার জন্য হিন্দুদিগকে প্ররোচিত করিতে চেষ্টার ক্রটি করেন নাই। কিন্তু দীর্ঘ ছয় মাসের অভিজ্ঞতাকালে তিনি বলিয়াছেন, পূর্ববঙ্গে অবস্থা এখনও “স্বাভাবিক” হয় নাই—হিন্দুদিগের পক্ষে অহুষ্ঠিত অত্যাচার সহজে বিশ্বত হওয়া সম্ভব নহে—হিন্দুর মনে এখনও আত্ম প্রতিষ্ঠিত হয়



নাই। পণ্ডিত জওহরলাল বেন “হতাশের আক্ষেপ” করিয়াছেন—এখনও পূর্ববঙ্গ হইতে প্রতিদিন সহস্র সহস্র হিন্দু নরনারী পশ্চিমবঙ্গে আসিতেছে—আস্থা এখনও “স্বাভাবিক” হয় নাই। বিশেষ যে সকল হিন্দু পূর্ববঙ্গ ত্যাগ করিয়া আসিয়াছে, তাহারা আর ফিরিয়া যাইতে চাহে না। গত সেপ্টেম্বর মাসে পশ্চিমবঙ্গ ব্যবস্থাপরিষদে প্রদেশপাল ডক্টর কাটজুও তাহাই বলিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন :—

(১) গত ১৫ই আগষ্ট ( ১৯৪৭ খৃঃ ) হইতে এ পর্যন্ত পূর্ববঙ্গ হইতে অল্পনা ৪০ লক্ষ হিন্দু চলিয়া আসিয়াছেন।

(২) যাহারা আসিয়াছেন, তাহারা পূর্ববঙ্গে ফিরিয়া যাইবেন না।

(৩) চুক্তির ফলে হিন্দুদিগের সম্বন্ধে পূর্ববঙ্গে উৎপীড়নের ভীত্বা হ্রাস হইয়াছে, উৎপীড়নের অবসান হয় নাই। যে অবস্থায় হিন্দুদিগের মনে আস্থা ফিরিতে পারে, সে অবস্থা হইয়াছে কি না, বলা দুঃসাধ্য।

পশ্চিমবঙ্গ ব্যবস্থাপরিষদে পশ্চিমবঙ্গের প্রধান মন্ত্রী বলিয়াছেন, ( সরকারী হিসাবে ) যে সকল হিন্দু পূর্ববঙ্গ ত্যাগ করিয়া আসিয়াছেন, তাহাদিগের তথায় তাক্ত সম্পত্তির মূল্য ৮৭ কোটি ৮১ লক্ষ ১৫ হাজার টাকা।

আগন্তুকদিগের সংখ্যা, তাহাদিগের ফিরিয়া যাইতে অসম্মতি ও তাহাদিগের তাক্ত সম্পত্তির মূল্য বিবেচনা করিলেই বাস্তবায়ন সমস্যার গুরুত্ব বৃদ্ধিতে আর বিলম্ব হয় না। প্রথমাবধি সমস্তা স্বীকারে সরকারের অসম্মতি ও তাহার পরে কার্যে প্রবৃত্ত হইতে বিলম্ব যে বহু লোকের অনিবার্য কষ্টভোগের কারণ হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু সে জন্ত আক্ষেপে কালক্ষেপের সময় আর নাই। এই সমস্যার সমাধান বধন করিতেই হইবে, তখন ভারত সরকারকে, পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে ও ভারত রাষ্ট্রের অধিবাসীদিগকে সমবেত ও সাগ্রহ চেষ্টায় সে কার্য সম্পন্ন করিতে হইবে।

### পদত্যাগকারী মন্ত্রীর কথা—

অস্থায়ী ও পরীক্ষামূলকভাবে ভারত সরকার কর্তৃক চারুচন্দ্র বিশ্বাসকে মন্ত্রী নিযুক্ত করিবার পূর্বে ভারত সরকারে দুইজন বাঙ্গালী মন্ত্রী ছিলেন ( অবশ্য আমরা

মিষ্টার আবুল কালাম আজাদকে বাঙ্গালী বলিতে পারি না ) —ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ও ক্ষিতীশচন্দ্র নিয়োগী। প্রধান মন্ত্রী পার্লামেন্টের মত না লইয়া পাকিস্তানের সহিত যে চুক্তি করিয়াছেন, তাহাতে ঈপ্সিত ফললাভ হইবে না—অর্থাৎ পূর্ববঙ্গে হিন্দুর বাস সম্ভব হইবে না—প্রত্যাবর্তন ত পরের কথা—এই বিশ্বাসহেতু তাহারা উভয়ে পদত্যাগ করিয়া আসিয়াছেন। পদত্যাগের কারণ ব্যক্ত করিবার সুযোগ লইয়া শ্যামাপ্রসাদ তাহার বক্তব্য পার্লামেন্টে বলিয়াছিলেন এবং তাহার পরে পশ্চিমবঙ্গে নানা স্থানে তাহা বলিয়াছেন। ক্ষিতীশচন্দ্র পার্লামেন্টে বা অন্ত্র বক্তৃতায় বক্তব্য ব্যক্ত করেন নাই বটে, কিন্তু একাধিক বিবৃতিতে চুক্তির ব্যর্থতা বিবৃত করিয়াছেন। তাহাদিগের উক্তির প্রতিবাদ ভারত সরকার করেন নাই বা করিতে পারেন নাই। তাহাদিগের যুক্তিও খণ্ডন করা হয় নাই। শ্যামাপ্রসাদ এমন কথাও বলিয়াছেন যে, চুক্তি যদি সকল হয়, তবে তিনি তাহাতে আনন্দিতই হইবেন ; কিন্তু তাহার বিশ্বাস, তাহা সফল হইবে না।

পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকারে একজন মাত্র হিন্দু মন্ত্রী ছিলেন। তিনি বাঙ্গালা—যোগেন্দ্র মণ্ডল। তিনি—ইংরেজ যাহাকে “তপশিলী সম্প্রদায়” নাম দিয়াছে, সেই সম্প্রদায়ভুক্ত। তিনি দীর্ঘ ৩ বৎসর কাল নিষ্ঠা সহকারে পাকিস্তান সরকারের মন্ত্রিত্ব করিয়াছেন। যখন বরিশালে মুসলমানদিগের দ্বারা হিন্দু নরনারীর উপর অকথ্য অত্যাচার অতৃপ্ত হইয়াছিল, তখন বরিশালের অধিবাসী যোগেন্দ্রবাবু বরিশালে উপস্থিত ছিলেন, কিন্তু সমধর্মীদিগকে রক্ষা করিতে পারেন নাই। এতদিনে তিনি পদত্যাগ করিয়াছেন। পদত্যাগপত্রে তিনি পূর্ববঙ্গে হিন্দুর প্রতি অত্যাচারের দৃষ্টান্ত—এমন কি হত্যার হিসাব পর্যন্ত দিয়া সিদ্ধান্ত জ্ঞাপন করিয়াছেন—হিন্দু মাহুষের অধিকার লইয়া পূর্ববঙ্গে বাস করিতে পারিবে না।

চুক্তি নিষ্পন্ন হইবার পূর্বে পশ্চিমবঙ্গের প্রধান-মন্ত্রী ডক্টর বিধানচন্দ্র রায়ও এই কথাই—প্রকারান্তরে—বলিয়াছিলেন। ৮ই এপ্রিল চুক্তি সম্পাদিত হয়। ৩রা এপ্রিল তিনি মিষ্টার মুকুল আমীনের বিবৃতি উপলব্ধ করিয়া বলিয়াছিলেন—

সত্য কথা এই যে, পূর্ব পাকিস্তানে মুসলমানরা



সংখ্যালব্ধি সম্প্রদায়কে তথা হইতে বিতাড়ন জন্ত সর্বদাই চেষ্টা করিয়া আসিতেছে। তাহারা সেই নীতি অমুসরণ করিবার জন্ত সর্ববিধ উপায়ই অবলম্বন করিয়াছে :— হিন্দুদিগের গৃহ অধিকার করিয়া হিন্দুদিগকে তাহাদিগের গৃহ ত্যাগে বাধ্য করা হইয়াছে, হিন্দুদিগের প্রতি দুর্ব্যবহার করা হইয়াছে, বাহারা মুসলমান নহে তাহাদিগের সম্বন্ধে মুসলমানদিগের ধারণামুযায়ী কাজ করা হইয়াছে। হিন্দুদিগকে হত্যা করা ও তাহাদিগের গৃহাদি দগ্ধ করা হইয়াছে, হিন্দুদিগের গৃহ লুপ্তি ও সম্পত্তি নষ্ট করা হইয়াছে, হিন্দুদিগকে বলপূর্বক ধর্মান্তরিত করা ও হিন্দু-নারী অপহরণ করা হইয়াছে।

অবশ্য চুক্তি সম্পাদিত হওয়ায় পশ্চিমবঙ্গের প্রধান-সচিবের পদত্যাগ না করিলে বিধানচক্র চুক্তির ব্যর্থতা প্রত্যক্ষভাবে বলিতে পারেন না। কিন্তু পূর্ববঙ্গের সরকারের একাধিক বিবৃতির প্রতিবাদে তাঁহার সরকার যে সকল বিবৃতি প্রচার করিয়াছেন, সে সকলে পরোক্ষভাবে তাহাই বলা হইয়াছে এবং পাকিস্তান সরকার যে অনুত্বাদের আশ্রয় গ্রহণ করিতে ইতস্ততঃ করেন নাই, তাহাও বলা হইয়াছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিবৃতিগুলি অবশ্য পূর্ব পাকিস্তান সরকার ভিত্তিহীন বলিয়াছেন; কিন্তু তাঁহারা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উক্তি যে সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত নহে—এমন প্রমাণ করিতে না পারায় কোন পক্ষের কথা সত্য তাহা বুঝিতে কাহারও বিলম্ব হইবার কথা নহে।

যোগেন্দ্রবাবু তাঁহার পদত্যাগ পত্রে বাহা বলিয়াছেন, সেজন্য তিনি পাকিস্তানের প্রধান মন্ত্রী—চুক্তির এক পক্ষ—মিষ্টার লিয়াকৎ আলী খাঁন হইতে আরম্ভ করিয়া বহু পাকিস্তানীর বিরাগভাজন ও আক্রমণের লক্ষ্য হইয়াছেন। আবার তাঁহার পূর্ব ব্যবহার স্মরণ করিয়া বহু হিন্দু তাঁহার আন্তরিকতার আস্থা স্থাপনে দ্বিধাবিচলিত হইতেছেন। ইহা অবশ্য অবশ্যস্বীকার্য। কিন্তু লক্ষ্য করিবার বিষয়, মুসলমান দলের বাহারা তাঁহার জন্ত বিলাপ করিতেছেন তাঁহারাও শিষ্ট ও অশিষ্টভাবে তাঁহাকে গালি দিলেও তাঁহার বিবৃতিতে প্রদত্ত সংখ্যার বা ঘটনার ভ্রম প্রদর্শন করিতে পারিতেছেন না। সে অবস্থায়—বিশেষ তিনি মন্ত্রী থাকায় তাঁহার প্রকৃত সংবাদ সংগ্রহের সুবিধা ছিল মনে করিলে—সহজেই

বিশ্বাস করিতে হয়, তাঁহার পদত্যাগের কারণ বাহাই কেন হউক না, তাঁহার বর্ণিত ঘটনা যেমন সত্য, তাঁহার প্রদত্ত হিসাব তেমনই নির্ভরযোগ্য। যদি তাহাই হয়, তবে তিনি যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, তাহা অসঙ্গত বা অজ্ঞায় বলা যায় না। তিনি এতদিন পাকিস্তান সরকারের মন্ত্রিত্ব করিয়াছেন বলিয়া তাঁহার সিদ্ধান্ত দুষ্ট হয় না—সেজন্য তিনি, ব্যক্তিগতভাবে, ক্রটির অপরাধে অপরাধী হইতে পারেন—এই পর্য্যন্ত। সুতরাং তাঁহার সিদ্ধান্ত পরীক্ষা করিয়া পাকিস্তান সম্বন্ধে আপনাদিগের অবলম্বিত ও অমুসৃত নীতির পরিবর্তন বা পরিবর্জন প্রয়োজন ও কর্তব্য কি না, তাহা ভারত সরকারকে বিশেষভাবেই বিবেচনা করিতে হইবে। কারণ, নীতি যে অভ্রান্ত হইবেই এমনও নহে এবং বাহারা ঘটনার পরিবর্তনে নীতির পরিবর্তন করিতে অস্বীকার করে, তাহারা সুবুদ্ধির পরিচয়ও দেয় না।

### উচ্চ শিক্ষার সমস্যা—

এদেশে উচ্চ শিক্ষার সংস্কারের কথা বহুদিন হইতে আলোচিত হইয়া আসিতেছে। কিন্তু যে শিক্ষা-পদ্ধতির নানা ক্রটি পরিলক্ষিত হইয়াছে, তাহার কোন উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন করা হয় নাই। এমন কি ভারতে স্বায়ত্ত-শাসন প্রবর্তিত হইবার পরে—অথাবধি—ভারতের প্রকৃত ইতিহাস রচনার জন্ত সরকার কোন সমিতি গঠিত করিয়া আবশ্যক চেষ্টাও করেন নাই। শিক্ষাদান-পদ্ধতি গতানুগতিক ভাবেই চলিয়া আসিতেছে। এমন কি চিকিৎসা-বিজ্ঞান বাহনও দেশীয় ভাষা হয় নাই; পরন্তু যে সকল বিদ্যালয়ে মাতৃভাষায় শিক্ষাদান-ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল, সরকার সে সকলের বিলোপ সাধন করিয়াছেন। তাঁহারা কলিকাতায় কলেজের সংখ্যা বর্দ্ধিত করায় কলিকাতা ব্যতীত চিকিৎসা-বিজ্ঞা শিক্ষার অল্প কেন্দ্র বাঙ্গালায় নাই।

অথচ বাঙ্গালা বিভাগের পরে কলিকাতায় উচ্চ-শিক্ষার্থীর সংখ্যা-বৃদ্ধি নিবারণ জন্ত তাঁহারা ছাত্রদিগের কতকাংশকে মফঃস্বলে রাখিবার উদ্দেশ্যে মফঃস্বলে কলেজ প্রতিষ্ঠার জন্ত কেন্দ্রী সরকারের নিকট আবেদন করায় তাঁহারা ৭০ লক্ষ টাকা ঐ কার্যের জন্ত দিয়াছেন। সে দিন পশ্চিমবঙ্গের প্রদেশপাল বলিয়াছেন, জিলায় বোংগা

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়গুলিকে মাধ্যমিক কলেজে এবং মাধ্যমিক কলেজগুলিকে অর্থ ও যন্ত্রাদি দিয়া উন্নত করিবার ব্যবস্থা করা হইতেছে—কলে কলিকাতায় উচ্চ শিক্ষাভের জন্য ছাত্রদিগের আধিক্য নিবারিত হইবে।

দুঃখের বিষয়, এই ব্যবস্থা কতকটা “গোড়ায় কাটিয়া আগায় জল” হইয়াছে। প্রথমতঃ কলিকাতার কলেজে ছাত্রসংখ্যা নির্দিষ্ট করা হয় নাই। দ্বিতীয়তঃ দেখা গিয়াছে, কলিকাতার ২টি নারী শিক্ষালয়ে—গোথলে মেমোরিয়াল ইনষ্টিটিউশনে ও ভিক্টোরিয়া কলেজে উল্লেখযোগ্য অর্থ প্রদান করা হইয়াছে। তৃতীয়তঃ কলিকাতার উপকণ্ঠে—যথা দমদম “মোতিঝিলে” ও বরিসায়—কলেজ প্রতিষ্ঠা করিয়া সেজন্য টাকা দেওয়া হইয়াছে। অথচ মফঃস্বলে প্রায় প্রত্যেক জিলার সদরে সরকারী বা বেসরকারী কলেজ আছে। কৃষ্ণনগরের ও হুগলীর সরকারী কলেজ বহুদিনের এবং বর্ধমানের রাজ-কলেজও তাহাই। তন্নিম্ন মুর্শিদাবাদে কৃষ্ণনাথ কলেজও নূতন নহে এবং তাহাও সমৃদ্ধ। মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, বীরভূম (হেতমপুর)—এই সকল স্থানে কলেজ পূর্বে হইতেই ছিল। আবার বাঙ্গালা বিভাগের ফলে বনগ্রামে, গোবরডাঙ্গায়, বসিরহাটে ও অন্য কয়টি স্থানে কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এ সকলই সরকারের নূতন নীতি গ্রহণের পূর্বের। যদি পশ্চিমবঙ্গ সরকার এইগুলিকে আবশ্যক অর্থ-সাহায্য প্রদান করিয়া—বিশেষ ছাত্রবাসের সুব্যবস্থা করিয়া এইগুলির উন্নতিসাধনে সচেষ্ট হইতেন, তবে একদিকে যেমন অনেক অল্প অর্থের প্রয়োজন হইত, অন্যদিকে তেমনই এইগুলি অধিক সংখ্যক ছাত্র আকৃষ্ট করিতে পারিত। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, সরকার যদি বসিরহাটে প্রতিষ্ঠিত কলেজের উন্নতিবিধান করিতেন, তবে আবার কয় মাইল মাত্র দূরবর্তী টাকী নগরে কলেজ প্রতিষ্ঠার সার্থকতা থাকিত না। একটু অহুসস্থান করিলেই দেখা যাইবে—সরকারের নূতন নীতিতে যে সকল নূতন কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, সে সকলে আশাহ্রুপ ছাত্র পাওয়া যায় নাই। ইহা অবশ্যস্বাবী। জলপাইগুড়ীতে যে কলেজ আছে, তাহাতে ছাত্র ও ছাত্রী অধ্যয়ন করে। কিছুদিন পূর্বে তথায় পশ্চিমবঙ্গের প্রধান-সচিবের গমনে

একটি অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটিয়াছিল—সেইজন্য কলেজ এখনও উপযুক্ত পরিমাণ সাহায্য লাভে বঞ্চিত আছে, অথচ ঐ সহরেই একটি স্বতন্ত্র কলেজ নারীদিগের জন্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং তাহাতে ছাত্রীর সংখ্যা উল্লেখের অযোগ্য হইলেও তাহাতে সরকারী সাহায্য অকুণ্ঠভাবে প্রদত্ত হইতেছে।

বিদ্যাবিস্তারে সভ্য সরকারের আগ্রহ স্বাভাবিক। কিন্তু সেই আগ্রহ যদি বিচার-বিবেচনা উপেক্ষা করে, তবে তাহাতে অভিপ্রেত ফললাভ হয় না। বিশেষ পশ্চিমবঙ্গে—কারীগরী শিক্ষার, চিকিৎসা শিক্ষার ও এঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষার প্রয়োজন আজ যে কত অধিক তাহা আর কাহাকেও বলিয়া দিতে হইবে না। যখন কেন্দ্রী সরকার পূর্ববঙ্গ হইতে আগত হিন্দুদিগের বিষয় বিবেচনা করিয়া কলিকাতার বাহিরে কলেজ প্রতিষ্ঠার জন্য ৭০ লক্ষ টাকা দিয়াছেন, তখন সে অর্থে বাহাতে বাঙ্গালীরা সর্বাপেক্ষা অধিক উপকার লাভ করিতে পারে, সে বিষয়ে অবহিত হওয়া প্রয়োজন।

কি কারণে মফঃস্বলে কলেজ থাকিলেও কলিকাতায় ছাত্রসমাবেশ এত অধিক হয়, কেন মফঃস্বল কলেজের অধ্যাপকগণ কলিকাতার কলেজে কাজ করিবার জন্য ব্যাকুলতা প্রকাশ করেন—সে সকল বিষয়ভাবে বিবেচনা করিয়া দেখিলে হয়ত অনেক কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইত না—নূতন কলেজগুলির স্থায়িত্ব সম্বন্ধে যদি সন্দেহ অনিবার্য হয়, তবে সেগুলিতে যে অর্থ প্রদত্ত হইবে তাহা অপব্যয়িত না হইলেও মিতব্যয়িতার বিরোধী হইত না।

আমরা আশা করি, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সহিত পরামর্শ করিয়া—রাজনীতিক কারণ-নিরপেক্ষ হইয়াই পশ্চিমবঙ্গ সরকার কেন্দ্রী সরকারের নিকট হইতে প্রাপ্ত ৭০ লক্ষ টাকা ব্যয় করিতেছেন ও করিবেন এবং স্থানীয় অবস্থা বিবেচনা করিয়া ও কলেজের স্থায়িত্ব-সম্ভাবনা বিচার করিয়া সাহায্যদানে অগ্রসর হইবেন। এই প্রসঙ্গে আমরা পুনর্কসতি-কেন্দ্র ও নিকটবর্তী কলেজের বিষয় বিবেচনা করার প্রয়োজন সরকারকে স্মরণ করাইয়া দিতে ইচ্ছা করি। বাহাতে পুরাতন প্রতিষ্ঠিত কলেজগুলির উন্নতি না হইয়া ক্ষতি হইতে পারে এমন ব্যবস্থা অবলম্বন করা কখনই শিক্ষাবিস্তারের সহায় হইতে পারে না।

### সাংবাদিকতা শিক্ষা—

সাংবাদিকতা শিক্ষার জন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে ব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও কি না, এই প্রশ্ন বহুদিন হইতে জিজ্ঞাসিত হইয়া আসিয়াছে। ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে আমেরিকার কোন কলেজের অধ্যক্ষ খুইং—কয়জন সম্পাদকের মত লইয়া বলেন, তাঁহারা কেহই সাংবাদিকতা শিক্ষার জন্ত স্বতন্ত্র ব্যবস্থা সমর্থন করেন না; কারণ, তাঁহাদিগের মত এই যে, সাংবাদিকের কার্য অতুলনের দ্বারা শিক্ষণীয়।

কয় বৎসর হইতে কতিপয় সাংবাদিক কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে সাংবাদিকতার পঠন-পাঠনের ব্যবস্থা করিবার জন্ত আন্দোলন করিতেছিলেন। গত ৩রা অক্টোবর হইতে বিশ্ববিদ্যালয়ে সে ব্যবস্থার আরম্ভ হইয়াছে।

যে দিন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে সাংবাদিকতা-শিক্ষাদান আরম্ভ হয়, তাহার পরদিন পশ্চিমবঙ্গের ব্যবস্থা পরিষদে প্রধান সচিব একটি প্রশ্নের উত্তরে বলেন—পশ্চিমবঙ্গ সরকার কোন সাংবাদিককে (প্রত্যক্ষভাবে) অর্থসাহায্য প্রদান করেন না; কেবল যে সকল সাংবাদিকের সরকারী বিজ্ঞাপন প্রকাশ সরকারের পক্ষে সাহায্যকর মনে করেন, সেই সকল পত্র (মূল্য দিয়া) বিজ্ঞাপন প্রকাশের ব্যবস্থা করেন। ইংরেজের শাসন-কালে সরকার একদিকে সাংবাদিকের স্বাধীন আইনের ভয় ও অপরদিকে বিজ্ঞাপনের জন্ত মূল্যদানের প্রলোভন দেখাইয়া সাংবাদিককে প্রভাবিত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে সাংবাদিকতা শিক্ষার আরম্ভ হইবার কয়দিন পরে—৭ই অক্টোবর প্রধান-সচিব ঐ ব্যবস্থার “উদ্বোধন” করেন! রাজনীতিক ব্যাপারে পদস্থ ব্যক্তিদিগকে মত প্রকাশের সুযোগ দানের জন্ত একরূপ ব্যবস্থার সুবিধা দেওয়া হয়। এক্ষেত্রে তাহাই করা হইয়াছিল কি না, বলা যায় না।

সে রাহাই হউক তাঁহার বক্তৃতায় পশ্চিমবঙ্গের প্রধান সচিব বলেন—

সাংবাদিকের স্বাধীনতা সম্বন্ধে অনেক কথাই বলা হইয়াছে। তিনি কিন্তু লক্ষ্য করিয়াছেন, কিসে সাংবাদ-

পত্রের প্রচার-বৃদ্ধি হয়, সেই দিকে লক্ষ্য রাখিয়া সময় সময় সাংবাদিক লিখিত হয়। তাহা উদ্ভাবন। সেইজন্য রাষ্ট্রের স্বার্থ বিবেচনা করিয়া তিনি মনে করিতেছেন—যে সকল সাংবাদিক কোন বিশেষ সাংবাদিকের সত্যাসত্য নির্ধারণে অধিক সময় ব্যয় করিবেন এবং প্রবন্ধ রচনায় সঠিক উত্তম প্রযুক্ত করিবেন, সরকার তাঁহাদিগকে অর্থ-সাহায্য দিবেন।

আজ পশ্চিমবঙ্গের প্রধান-সচিব প্রকাশ্যভাবে যে ব্যবস্থা করিবার কথা বলিতেছেন, গোপনে সেই ব্যবস্থার কোন কোন সাংবাদিক প্রভাবিত হইয়াছেন সন্দেহ করিয়া একদিন শরৎচন্দ্র বসু এক বক্তৃতা করিয়াছিলেন এবং তখনও সেরূপ কার্য সাংবাদিকের পক্ষে নিন্দনীয় বলিয়া বিবেচিত হইত।

আজ কি সে অবস্থার পরিবর্তন হইয়াছে যে, সাংবাদিকের পক্ষ হইতে এই উক্তির কোন প্রতিবাদ ধ্বনিত হইল না?

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলার রূপে আন্তোষ মুখোপাধ্যায় বলিয়াছিলেন—স্বাধীনতা চাহি, স্বাধীনতা ব্যতীত আমি সন্তুষ্ট হইতে পারি না। সাংবাদিক ব্যক্তিস্বাধীনতার—বিশেষ আমেরিকার রাষ্ট্রপতি রুজভেল্ট আটলান্টিক চার্টারে যে চতুর্বিধ স্বাধীনতা কাম্য বলিয়াছিলেন সে সকলের মধ্যে মত-প্রকাশ স্বাধীনতার জন্তই এত দিন সংগ্রাম করিয়া আসিয়াছেন। আজ কি ভারতের জাতীয় সরকার সাংবাদিকের সেই মনো-ভাবের পরিবর্তন সাধনে প্রচেষ্টা হইবেন—সাংবাদিকের কর্তব্যের পূত আদর্শ নষ্ট করিয়া রাষ্ট্রের স্বার্থের আদর্শই প্রবল করিতে চাহিবেন? কিন্তু রাষ্ট্রের স্বার্থ ও সচিব-সভ্যের স্বার্থ অভিন্ন না-ও হইতে পারে; কারণ, রাষ্ট্র স্থায়ী, সচিবসভ্য অস্থায়ী এবং সাংবাদিকরা রাষ্ট্রের স্বার্থ সম্বন্ধে সচিবদিগের অপেক্ষাও অবহিত হইতে পারেন।

### খান্ধাভাব—

সম্মিলিত জাতিসভার ভারত সরকারের স্থায়ী প্রতিনিধি মিষ্টার বি, এন, রাও গত ২২শে অক্টোবর আমেরিকার নিউ ইয়র্ক নগরে বক্তৃতা-প্রসঙ্গে বলিয়াছেন—

ভারতের লোকের বিশ্বাস, পৃথিবীর জনগণের অন্নভাব ও মাহুষের অযোগ্য জীবনধারণের মানই আজ শাস্তির সর্বপ্রধান শত্রু।

বোধ হয়, তাঁহার স্বদেশের অবস্থা বিবেচনা করিয়াই তিনি এই উক্তি করিয়াছিলেন। কারণ গত ৩ বৎসরেও ভারতের সরকার—জাতীয় সরকার—ভারতের অন্নভাব দূর করিতে পারেন নাই—ভারতবাসীকে খাণ্ড বিষয়ে আবলম্বী করিবার উপায় করিতে পারেন নাই। প্রতি বৎসর বিদেশ হইতে খাণ্ডোপকরণ ক্রয়ে ভারতের বহু অর্থ ব্যয়িত হইতেছে—যে অর্থ দেশবাসীর মধ্যে থাকিবার কথা, তাহা বিদেশে যাইতেছে—দেশের রক্ত শোষিত হইতেছে। অর্থাৎ ভারত সরকারের বিবোধিত “খাণ্ডোপকরণ বদ্ধিত করার” নীতি ব্যর্থ হইয়াছে। প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু প্রথমে সদর্পে বলিয়াছিলেন, যাহাই কেন হউক না ১৯৫১ খৃষ্টাব্দের পরে ভারত সরকার আর বিদেশ হইতে খাণ্ডোপকরণ আমদানী করিবেন না। কিন্তু কয় মাস যাইতে না যাইতেই ভারত সরকারের খাণ্ড-মন্ত্রীর মারফতে সে কথা প্রত্যাহার করিয়া বলিতে হইয়াছে ১৯৫১ খৃষ্টাব্দ নহে—১৯৫২ খৃষ্টাব্দের পরে ভারত সরকার আর বিদেশ হইতে খাণ্ডোপকরণ আমদানী করিবেন না।

ঠিক সেই ভাবেই পশ্চিমবঙ্গের খাণ্ড-সচিব—“আমরা বিপদ অতিক্রম করিয়াছি, আর খাণ্ডের অভাব হইবে না” বলিবার কয় মাস পরেই—গত ২৩শে অক্টোবর বলিয়াছেন—পশ্চিমবঙ্গের খাণ্ড-সঙ্কট এখনও পূর্ণমাত্রায় রহিয়াছে—পশ্চিমবঙ্গের অধিবাসীরা যেন প্রয়োজন হইলে চাউল বর্জন করিয়া গম ব্যবহার করিতে প্রস্তুত থাকেন। আমেরিকা হইতে চিনা বা কাওন জাতীয় ঘাসের বীজ কিনিয়া আনিবার পরেও এই কথা!

আর বিহারে অনাহারে মৃত্যুর সংবাদ ভারত সরকারের খাণ্ড-মন্ত্রী অস্বীকার করিয়াও এমন মুন্সিয়ানা করিতে পারেন নাই যে, মৃত্যু-সংবাদ মিথ্যা বলিয়া প্রতিপন্ন হইতে পারে। এখন বিহারে দ্রুত খাণ্ডোপকরণ প্রেরণ করা হইতেছে। যথাকালে তাহা করিলে লোক মৃত্যুমুখে পতিত হইত না।

আসামে প্রাকৃতিক দুর্ঘট্যে অন্নভাব।

রাজাগোপালাচারী সরস ও মৌলিক উক্তির জন্ত বিখ্যাত। তিনি বলিয়াছেন, যদি গরু ও ছাগল ঘাস ও পাতা খাইয়া দেহ গঠিত করিতে ও উৎকৃষ্ট দুধ দিতে পারে, তবে বিজ্ঞানের সুবিধা পাইয়াও আমরা কেন ঘাস ও পাতা আহাৰ্য্যে পরিণত করিতে পারিব না? একবার বাদ্‌লায় অন্নকষ্টের সময় ছোট লাট সার চার্লস ইলিয়ট বলিয়াছিলেন, দেশে ঘাসের মূল থাকিতে লোক অন্নকষ্ট পায় কেন? রাজাগোপালাচারী মূল হইতে ঘাস ঘাসে উঠিয়াছেন।

কিন্তু কেহই অভাবের মূল কারণ দূর করিবার উপায় করেন নাই। কিসিয়া যে উপায়ে খাণ্ডশস্ত্রের ফলন বদ্ধিত করিয়াছে, তাহা লক্ষ্য করিলে একথা কিছুতেই অস্বীকার করা যায় না যে, এদেশে খাণ্ড শস্ত্রের ফলন বৃদ্ধি করিতে অক্ষমতা অযোগ্যতার পরিচয় ব্যতীত আর কিছুই নহে।

অল্পদিন পূর্বে বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক ডক্টর জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ পরোক্ষভাবে এই কথাই বলিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন, পশ্চিমবঙ্গের কৃষি বিভাগের বার্ষিক ব্যয় ২ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা—এই টাকার বিনিময়ে দেশবাসী কি পাইতেছেন? তিনি আরও বলেন, কোন কোন প্রদেশ ভারত সরকারের নিকট হইতে অর্থ লইয়া সেচের জন্ত নলকূপ করিয়াছেন—প্রত্যেক নলকূপের জলে ভূমিতে একের স্থানে দুই ফসল ফলিতেছে; পশ্চিমবঙ্গ সরকার তাহাও করেন নাই।

এখনও অনেক আবাদযোগ্য জমী “পতিত” রহিয়াছে এবং সেচের অভাব দূর করা হয় নাই।

গত ২৪শে অক্টোবর দিল্লীতে সেচ-বোর্ডের পরিচালক-মণ্ডলীর বার্ষিক অধিবেশনে সর্দার বল্লভভাই পেটেল নদীর জল নিয়ন্ত্রিত করিয়া কৃষির উন্নতিসাধন ও শিল্প প্রতিষ্ঠার কথা বলিয়াছেন। তিনি তাঁহার বক্তৃতায় বিশেষজ্ঞদিগকে ভগীরথের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিতে বলিয়াছেন। কিন্তু সে কথায়ও নূতনত্ব নাই। কারণ ২০ বৎসরেরও অধিক কাল পূর্বে বিখ্যাত সেচ-বিশেষজ্ঞ সার উইলিয়ম উইলকিন্স কলিকাতায় আসিয়া যে বক্তৃতা করেন, তাহাতে তিনি ভগীরথের গঙ্গা আনয়ন খাত কাটিয়া জল প্রবাহ প্রবাহিত করার রূপক বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছিলেন।

কিন্তু ভারত সরকার কত দিনে ভগীরথের মত কাজ করিতে পারিবেন? সার উইলিয়ম বলিয়াছিলেন—দৃঢ়তাপূর্ণ হৃদয়মাত্র ভগীরথের সমূল ছিল। ভারত সরকারের সেই অমূল্য সম্পদ আছে কি?

পূর্বোক্ত অধিবেশনে কেন্দ্রীয় সেচ-বোর্ডের সভাপতি মিষ্টার মাথরাগী বলিয়াছেন—

কাগজে প্রায় ১শত ৬০টি সেচ পরিকল্পনা রহিয়াছে। সেগুলি কার্যে পরিণত করিতে আশুমানিক ব্যয়—এক হাজার ২শত ৭৯ কোটি টাকা—হইবে। আর ঐগুলি কার্যে পরিণত হইলে প্রায় ৯ কোটি ৩৬ লক্ষ বিঘা জমীতে সেচ করা যাইবে—ফলে ১ কোটি ৩ লক্ষ টন অধিক ফসল উৎপন্ন হইবে। আর পশ্চিম বঙ্গ, বিহার, উত্তর প্রদেশ, উড়িষ্যা, মাদ্রাজ ও বোম্বাই যেমন বন্নার উপদ্রব হইতে অব্যাহতি পাইবে তেমনই বিদ্রোহ ব্যবহারের সুযোগ পাইবে।

ইহা যে শুনিতে ভাল, তাহা বলা বাহুল্য। কিন্তু কত দিনে ও কি উপায়ে ঐ অর্থ সংগৃহীত হইবে? যেমন ধাতোপকরণে আমাদিগের পরমুখাপেক্ষিতা যুদ্ধ আরম্ভ হইলে বিষম বিপদে পরিণত হইতে বিলম্ব ঘটবে না, তেমনই দেশের লোকের দারিদ্র্য প্রশমিত না হইলে তাহাদিগের অধিক করপ্রদানের ক্ষমতা হইবে না। কেবল তাহাই নহে, লোক যত দিন পূর্ণাহার না পায়, ততদিন তাহার দৌরল্য বর্দ্ধিত হয় এবং শ্রমক্ষমতা হ্রাস পায়। সে অবস্থায় তাহার দ্বারা উৎপাদন বৃদ্ধির আশা ছরাশা ব্যতীত আর কিছুই নহে।

পশ্চিমবঙ্গের প্রধান-সচিব বিধানচন্দ্র রায় অভিজ্ঞ চিকিৎসক। তিনি প্রধান-সচিব হইবার অব্যবহিত পরেই বলিয়াছিলেন, তাঁহার মত এই যে, স্নহ মাহুষের পক্ষে দৈনিক (অন্ততঃ) ১৬ আউন্স খাদ্য প্রয়োজন। প্রায় ৩ বৎসরে কিন্তু তাঁহার সরকার সে প্রয়োজন মিটাইতে পারেন নাই! পশ্চিমবঙ্গ সরকার কলিকাতায় ভূগর্ভে রেল পথ প্রতিষ্ঠা সম্ভব কি না সেই পরীক্ষায় অনেক টাকা ব্যয় বা অপব্যয় করিয়াছেন, কিন্তু ভূমি হইতে অধিক শস্তোৎপাদনের উপায় করিতে পারেন নাই। সেদিনও পশ্চিমবঙ্গের প্রদেশপাল আক্কেপ করিয়াছেন, পশ্চিম বঙ্গের আর্থিক অবস্থা শোচনীয়। সেই অবস্থায় সরকারের

প্রথম ও প্রধান কর্তব্য—লোকের অন্নভাব দূরীকরণের উপায় অবলম্বন; না রাজধানীতে বিলাসের ব্যবস্থা করা? বিদেশী বিশেষজ্ঞদিগের পরীক্ষাফল—পশ্চিমবঙ্গে ছাত্র-দিগের মধ্যে শতকরা প্রায় ৬১ জনের দেহে যক্ষ্মার বীজ রহিয়াছে। যক্ষ্মা কি অপূর্ণাহারজাত হইতে পারে না?

আমরা পশ্চিমবঙ্গে যে অন্নভাব লক্ষ্য করিতেছি, ভারত রাষ্ট্রের প্রায় সর্বত্র তাহা বিद्यমান। নিম্নলিখ ব্যবস্থা—যদি হুঁনীতিদৃষ্ট না হয় তাহা হইলেও—এই সমস্তার সীমারেখাও স্পর্শ করিতে পারে না। অথচ অন্নভাবজনিত সমস্তার সমাধানই সর্বোপযোগী ও সর্বপ্রথম প্রয়োজন। সে কার্য পরিকল্পনার দ্বারা হইতে পারে না—পরিকল্পনা কার্যে পরিণত করা ব্যতীত উপায় নাই। সেজন্য লোকের যে সহযোগ প্রয়োজন, তাহা লাভ করিবার উপায়ও সরকারকে চিন্তা ও অবলম্বন করিতে হইবে।

### পশ্চিমবঙ্গ পরিদর্শন—

কংগ্রেসের সভাপতি পুরুষোত্তমদাস ট্যাগুন ও ভারত রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি ডক্টর রাজেন্দ্রপ্রসাদ পশ্চিমবঙ্গ পরিদর্শনে আসিয়াছিলেন। কেহই সমস্তাবল্ল পশ্চিমবঙ্গের কোন সমস্তার সমাধানে সাহায্য করেন নাই। কেহই পশ্চিম বঙ্গের আর্থিক অবস্থা বিবেচনা করিয়া অভ্যর্থনার আড়ম্বরে অর্থব্যয়ে আপত্তি করেন নাই। ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রে দুর্গোৎসবে রাজপথে তোরণ নির্মাণে আপত্তি হইলেও ইহাদিগের আগমনে তাহা নির্মাণে আপত্তি হয় নাই। সাজসজ্জায় যে অর্থ ব্যয়িত হইয়াছে, তাহা যে বাস্তবতার দিগের জন্ত শীতবস্ত্রের জন্ত ব্যয়িত হয় নাই, সে কথা বলা বাহুল্য। ডক্টর রাজেন্দ্রপ্রসাদের পরিদর্শন নিম্নমাহুগ—ইংরেজ গভর্নর-জেনারলরা এই নিয়মের প্রবর্তন করিয়া গিয়াছেন—তাহা পরিবর্তিত হয় নাই। পুরুষোত্তমদাস ট্যাগুনকে নির্বাচনে যে দল সমর্থন করিয়াছিলেন, পশ্চিম বঙ্গে কংগ্রেসের সেই দলই প্রাধান্য লাভ করিয়াছেন—সুতরাং তাঁহারাই তাঁহার জয়যাত্রার আয়োজন করিয়াছিলেন এবং তাঁহাদিগেরই ব্যবস্থায় তিনি নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিলেও জাতীয়তার জনক সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্থিতিপুত ভারত সভার সঞ্চর্দনায় ৮ মিনিটের অধিক সময় ব্যয় করিতে পারেন নাই—অস্তান্ত সঞ্চর্দনায় অনেক সময়

দেওয়া সম্ভব হইয়াছিল। সেই সকল অহুষ্ঠানের একটি—  
 হিন্দী সাংবাদিক ও কবি বালমুকুন্দ গুপ্তের স্বরণোৎসব।  
 সেই সভায় পুরুষোত্তমদাস তুলনায় সমালোচনা করিয়া মত  
 প্রকাশ করিয়াছিলেন—হিন্দী সাহিত্যই রত্ন, ভারতের  
 অজ্ঞাত ভাষার সাহিত্য কাচ মাত্র এবং রবীন্দ্রনাথের কবিতা  
 কবিরের ভাবের প্রতিধ্বনি ব্যতীত আর কিছুই নহে।  
 কিন্তু ডক্টর রাজেন্দ্রপ্রসাদ যেমন বাঙ্গালার শিক্ষালাভ  
 করিতে আসিয়াছিলেন—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র,  
 বালমুকুন্দ গুপ্ত তেমনই হিন্দী সংবাদপত্রের কাজ শিখিবার  
 জন্য বাঙ্গালায় আসিয়া বাঙ্গালী গুরুর কাছে শিক্ষালাভ  
 করিয়া গিয়াছিলেন। তখন ‘হিন্দী বঙ্গবাসী’ সমগ্র ভারতে  
 সর্বপ্রধান হিন্দী সংবাদপত্র; আর অমৃতলাল চক্রবর্তী  
 তাহার সম্পাদকরূপে সর্বত্র সমাদৃত। বালমুকুন্দ গুপ্ত যে  
 তাঁহারই সহকারী হইয়া কলিকাতায় আসিয়া সংবাদপত্রের  
 পরিচালন শিক্ষা করিয়া গিয়াছিলেন—সে কথা স্বরণ  
 করিতে পারেন, এমন বাঙ্গালী এখনও জীবিত আছেন।  
 রবীন্দ্রনাথের সঙ্ক্ষে পুরুষোত্তমদাস ট্যাণ্ডনের মতের মূল্য যে  
 অধিক নহে তাহা মনে করিলে “অপরাধ” হইবে না। কারণ  
 একথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে, এপর্যন্ত যে  
 ৩ জন ভারতীয় বিশাল বিশ্বের সভ্যদেশে ভারতীয় সংস্কৃতির  
 শ্রেষ্ঠ প্রতীপ ও প্রচার করিয়া গিয়াছেন, তাঁহারা—  
 ভারতের রাষ্ট্রদূত নহেন—সংস্কৃতি দূতরা—৩ জনই বাঙ্গালী।  
 সে ৩ জন—রাজা রামমোহন রায়, স্বামী বিবেকানন্দ,  
 রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। পুরুষোত্তমদাস ট্যাণ্ডন কংগ্রেসের  
 দলাদলির আবর্তে পড়িয়া ভারতে যে নূতন প্রাদেশিক  
 দলাদলির প্রভাব প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন, তাহা দুঃখের  
 বিষয় সন্দেহ নাই। ভারতে স্বায়ত্ত-শাসন প্রতিষ্ঠার পরে  
 কংগ্রেসের সহিত সরকারের সঙ্ঘর্ষ কি, তাহাও কেহ কেহ  
 জিজ্ঞাসা করিতেছেন। অথচ আমরা দেখিতে পাইতেছি,  
 প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর সমর্থিত প্রার্থীকে  
 পরাভূত করিয়া অন্ত দলের সমর্থিত পুরুষোত্তমদাস এবার  
 কংগ্রেসে রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হইয়াছেন—অথচ তিনি  
 পণ্ডিত জওহরলালের কংগ্রেসের পরিচালন সমিতিতে  
 যোগদানে অস্বীকৃতি অতিক্রম না করা পর্যন্ত অর্থাৎ তাঁহাকে  
 বাদ দিয়া সমিতি গঠিত করিতে সাহস করেন নাই। সে  
 বিষয়ে মিটার আবুল কালাম আজাদ প্রধান মন্ত্রীর

পদাঙ্কানুসরণ করিয়াছেন। পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেস কমিটি  
 রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্রপ্রসাদের সর্ঘস্কারও ক্রটি করেন নাই।

### তিব্বতে চীনের অভিযান—

আসামে যাইয়া ডক্টর রাজেন্দ্রপ্রসাদ রাজনৈতিক হিসাবে  
 আসামের গুরুত্ব সঙ্ক্ষে আসামবাসীদিগকে সচেতন  
 করিবার উদ্দেশ্যে বলিয়াছেন, তাহার সীমান্তে পররাষ্ট্র—  
 ব্রহ্ম, তিব্বত ও পাকিস্তান। তিব্বতের সংবাদ  
 শান্তিগোচক নহে। ইংরেজ কখন তিব্বতে চীনের অধিকার  
 অস্বীকার করেন নাই—বর্তমান ভারত সরকারও সেই মত  
 অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন। লর্ড কার্জন যখন ভারতের বড়লাট,  
 তখন তিনি তিব্বতে সেনাদল প্রেরণ করিয়াছিলেন।  
 তিনি রুশিয়াকে তিব্বতে প্রভাব বিস্তার করিতে দিবেন না  
 এবং তিব্বতের সহিত ভারতের বাণিজ্য-বিস্তারের ব্যবস্থা  
 করিবেন বলিয়া তিব্বত আক্রমণ করিয়াছিলেন। ফলে  
 ভারতের উত্তর-পূর্ব সীমান্তে অশান্তির উদ্ভব হইয়াছিল।  
 সঙ্গে সঙ্গে তিব্বতে চীনের প্রাধান্ত স্বীকৃত ও দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত  
 হইয়াছিল। এখন চীনে কম্যুনিষ্ট প্রাধান্ত প্রতিষ্ঠিত  
 হইয়াছে এবং চীন রুশিয়ার সহিত “এক নায়েতে”  
 আরোহী। চীন এখন তিব্বতের জনগণকে সাম্রাজ্যবাদীর  
 প্রভাবমুক্ত করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছে। ইহার অর্থ কি,  
 তাহা লইয়া মতভেদ থাকিতে পারে। কারণ, যদিও অক্টোবর  
 মাসের প্রথম ভাগে চীনের প্রধান মন্ত্রী চৌ-এন-লাই  
 বলিয়াছিলেন শান্তিপূর্ণ ভাবেই—অর্থাৎ বিনা অস্ত্রাঘাতে  
 তিব্বতের সমস্তার সমাধান হইবে—ইহাই চীন সরকারের  
 আশা এবং যদিও পিকিংঘাতী তিব্বতীয় দূতগণ দিল্লীতে  
 ভারত সরকারের সহিত আলোচনারত ছিলেন এবং সেই  
 জন্য ভারত সরকার চীনের তিব্বতে সেনাবল প্রেরণের  
 সংবাদে আতঙ্কিত হইয়াছেন—তথাপি চীনা সংবাদে  
 প্রকাশ—চীনের কম্যুনিষ্ট সরকারের সেনাদলকে তিব্বতে  
 প্রবেশ করিতে আদেশ দান করা হইয়াছে। যদিও  
 চীনের সহিত তিব্বতের সঙ্ঘর্ষ তাহাদিগের “পারিবারিক  
 ব্যাপার” একথা চীন সরকার বলিয়াছেন, তথাপি ভারত  
 সরকার এই ব্যাপারে—নিরপেক্ষতা প্রদর্শন করিতে  
 পারিতেছেন না।

পিকিংএ ও লাসায় কেবল ভারত সরকারেরই প্রতি-



নিধি আছেন। তথাপি ভারত সরকার যখন বেতারে সংবাদ জানিবার চেষ্টা করেন, তখন ভারত সরকার কোন উত্তর পাইবার পূর্বেই রুশিয়ার সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়, চানের কম্যুনিষ্ট বাহিনী তিব্বতে প্রবেশ করিতে আদিষ্ট হইয়াছে। শেষে পিকিংএ ভারতের রাষ্ট্র-দূত সর্দার পানিকার ঐ সংবাদ সমর্থন করেন। কোন রাষ্ট্র যদি তিব্বতকে চীন-নিরোধী কার্যের ঘাঁটিক্রমে ব্যবহার করে, তবে চীন তাহাতে আপত্তি করিলে—তাহা তাহার পক্ষে অত্যাচার হয় না; কারণ তিব্বত চীনের প্রভাবাধীন।

এ দিকে তিব্বতে এক দল যেমন দালাই লামার, আর এক দল তেনমই পঞ্চম লামাদিগের পক্ষাবলম্বী; সুতরাং অযোগ্য যেনাবল লইয়া তিব্বতের পক্ষে চীনা বাহিনীর গতিরোধ করা সম্ভব হইবে না। সেই জন্ত চীনা বাহিনী তিব্বতে প্রবেশ করিবে, এই সংবাদে তিব্বতের রাজধানীতে বিশেষ চাকল্যের ও ভীতির সঞ্চার হইয়াছে। পঞ্চম লামার বয়স ত্রয়োদশ বর্ষ মাত্র—তিনি এখন তিব্বত-চীন সীমান্তের নিকটে কম্যুনিষ্টদিগের রক্ষণাধীন। যদি কম্যুনিষ্ট বাহিনী প্রবেশ হয়, সেই ভয়ে দালাই লামা প্রধান কর্মচারীদিগকে লইয়া রাজধানী ত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহারা ব্রিটিশ সরকারের আশ্রয়লাভ করিবেন কি না, তাহা বলা যায় না।

হয় ত তিব্বতই বিশ্বযুদ্ধে ইন্ধন যোগাইয়া যুদ্ধ বিস্তারের কারণ হইবে। কারণ, বর্তমানে সাম্রাজ্যবাদ ও কম্যুনিজম পরস্পরের সহিত শক্তি-পরীক্ষার আয়োজনে ব্যস্ত।

তিব্বত সম্পর্কে “অযোগ্য” দলের উপর আস্থা স্থাপন করায় কোন কোন আমেরিকান পত্র ভারতের প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর নিন্দা করিতেছেন। অথচ আমেরিকাই তাহার প্রশংসাবাদ করিয়া আসিয়াছেন। তবে—

“বড় পীরিতি বালির বাঁধ

কণে হাতে দড়ী কণেকে চাঁদ।”

### সম্মিলিত জাতিসংঘ—

সম্মিলিত জাতিসংঘ গত বিশ্বযুদ্ধের পরে “লিগ অব নেশন্সের” চিত্তাভ্রমের উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। উভয়েরই উদ্দেশ্য—

“সহশ্র বৎসর উৎকট বিগ্রহ—

উত্তাপে ধরণী জরা,

সহশ্র বৎসর শান্তির সলিলে

শীতল হউক ধরা।”

“লিগের” উদ্দেশ্য সফল হয় নাই। তাহার প্রতিষ্ঠা-কালেই ঐতিহাসিক ওয়েল্‌স বলিয়াছিলেন—যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি যুদ্ধান্তে পৃথিবী গণতন্ত্রের জন্ত নিরাপদ করিতে আসিয়া তাহা ভগ্নাঙ্গীর জন্ত নিরাপদ করিয়া যে প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত করিলেন, তাহা বাঁচিবে কি না, সন্দেহ। নূতন প্রতিষ্ঠান সম্মিলিত জাতিসংঘ সম্বন্ধেও তাহাই বলিতে পারা যায়।

“লিগ” যুরোপের কয়টি প্রধান দেশের প্রভাবে প্রভাবিত হইয়াছিল, সম্মিলিত জাতিসংঘ আমেরিকার প্রভাব স্পষ্ট। সম্প্রতি ইহার জন্মোৎসবে পৃথিবীর নানা দেশে উৎসবগুষ্ঠান হইয়াছে। সেই উপলক্ষে আমেরিকার রাষ্ট্রপতি ট্রুম্যান বলিয়াছেন :—

“আজ যখন যুদ্ধের ভয় পৃথিবীতে ব্যাপ্ত, তখন আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে আমরা যুদ্ধ অনিবার্য মনে করি না—মনে করি, যুদ্ধ নিবারিত হইতে পারে। যুদ্ধ নিবারণে সম্মিলিত জাতিসংঘ বিবিধ কাজ করিতে পারেন :—

(১) শান্তিপূর্ণ উপায়ে আলোচনার দ্বারা বিভিন্ন জাতির মধ্যে বিবাদ-মীমাংসা।

(২) যে সকল জাতি সংঘের সদস্য তাহাদিগের সমবেত শক্তি প্রযুক্ত করিয়া আক্রমণ নিবারণ।

(৩) আক্রমণের ভয় দূর হইলে জাতিসমূহের রণ-সজ্জার ব্যয়সঙ্কোচ।”

তিনি বলিয়াছেন—সম্মিলিত জাতিসংঘকে আন্তর্জাতিক যুদ্ধ নিবারণ করিবার জন্ত মীমাংসার মত বলপ্রয়োগের জন্তও প্রস্তুত থাকিতে হইবে।

এই উক্তি জাতিসমূহকে—আপাততঃ—সমরায়োজনে ব্যাপ্ত করিবে। সে অবস্থায়—যখন কোথাও বারুদের স্তূপ থাকে তখন—তাহাতে অগ্নিফুলিঙ্গপাতে কি ঘটতে পারে, তাহা বলা যায় না। সুতরাং শান্তি যে স্থায়ী হইবেই এমন বলা সম্ভব নহে।

কোরিয়ায় তাহাই প্রতিপন্ন হইয়াছে এবং কোরিয়ার

দুই অংশে যুদ্ধে সে ভাবে—নির্বিন্দিতা পরিষদের অমুমোদনের অপেক্ষা না রাখিয়াই—আমেরিকা এক পক্ষ অবলম্বন করিয়াছে এবং পরিষদ, পরে তাহার নীতির সমর্থন করিয়াছে, তাহাতে জাতিসভের গঠন যে গণ-তান্ত্রিক নীতির অমুমোদিত তাহাও বলা যায় না।

ভারতবর্ষে সরকার ইংলণ্ড ও আমেরিকার—আংলো-আমেরিকান ব্লকের সমর্থক এবং সেই জন্ত ঐ দেশদ্বয়ে আদর লাভ করিয়াছেন—তাঁহারা ভারতের প্রধান মন্ত্রীর রাজনৈতিক বুদ্ধির প্রশংসাই করিয়া আসিয়াছেন। কিন্তু যে মুহূর্ত্তে ভারত সরকার সবে কম্যুনিষ্ট চীনের প্রতিনিধি গ্রহণের প্রস্তাব সমর্থন করিয়াছেন, সেই মুহূর্ত্তে সে প্রশংসা নিন্দায় পরিণত হইয়াছে!

প্রশংসায় পরিতুষ্ট হইয়া ভারত সরকার যখন কাশ্মীর সমস্যার সমাধান জন্ত জাতিসভের মধ্যস্থতা বাচক্ষ্য করিয়াছিলেন, তখন আর সপ্তাহকাল মধ্যে ভারত সরকারের সেনাবল অনায়াসে কাশ্মীর অধিকার করিতে পারিত। কিন্তু মধ্যস্থতা প্রার্থনা করায় কাশ্মীরের সমস্যার সমাধান হওয়া ত পরের কথা, জটিলতা-বৃদ্ধিই হইতেছে। সুতরাং জাতিসভের দ্বারা ভারত রাষ্ট্র উপকৃত হইয়াছে কি না, সন্দেহ।

আবার কোরিয়ায় আমেরিকান সেনাদলের পূর্বনির্দিষ্ট সীমা লঙ্ঘনে বিশ্বয় প্রকাশ করায় পণ্ডিত জওহরলালের রাজনৈতিক বুদ্ধির নিন্দা করা হইয়াছে। অর্থাৎ যতক্ষণ আংলো-আমেরিকান দলের কার্যাবিচারিতভাবে সমর্থন করা হয়, ততক্ষণই তাঁহাদিগের প্রশংসা লাভ করা যায়।

মিষ্টার লাই মতপ্রকাশ করিয়াছেন—“যদি সম্মিলিত জাতিসভের পতন হয়, তবে আমাদিগের ভবিষ্যতে আর কোন আশাই থাকিবে না।” তিনি আমরা বলিতে কাহাদিগকে বুঝেন, তাহা ব্যক্ত করা হয় নাই। কিন্তু আমরা পৃথিবীর ইতিহাসে উত্থান-পতনের বহু দৃষ্টান্তে অভ্যস্ত, সুতরাং এই চেষ্টা বার্থ হইলেই যে সর্বনাশ হইবে, এমন মনে করিতে পারি না।

ডক্টর রাজেন্দ্রপ্রসাদ পৃথিবীর জায় ও শান্তির অমরায়ী-মাত্রকেই সম্মিলিত জাতিসভের পতাকাভালে সমবেত হইতে আহ্বান করিয়াছেন; কারণ, তাঁহার মতে,

সম্মিলিত জাতিসভাই জাতিসমূহের মধ্যে জায় ও পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠিত করিতে পারে।

কিন্তু যতদিন দুর্বল জাতিসমূহের আত্ম-নিয়ন্ত্রণের অধিকার স্বীকৃত ও সম্মানিত না হইবে, যতদিন সাম্রাজ্যবাদ ও ধনিকবাদ অস্তিত্ব হইয়া সাম্যবাদের ভিত্তি দৃঢ় না হইবে, যতদিন আধ্যাত্মিকতা পশুবলের স্থান গ্রহণ না করিবে—ততদিন স্বার্থের সভ্যতে যুদ্ধ অনিবার্য থাকিবে। আমেরিকার বহু-বিষোষিত “মনরো নীতি”ও যে তাহাকে বিশ্বগুরুদ্বয়ে নির্লিপ্ত রাখিতে পারে নাই এবং এবার যে আমেরিকা কোরিয়ার গৃহযুদ্ধে জড়াইয়া পড়িয়াছে, তাহাতেই আমাদিগের এই বিশ্বাস দৃঢ় হইতেছে। জড়বাদ-জর্জরিত ইহকাল-সর্বত্র সভ্যতা স্বার্থের স্থানে পরার্থের প্রতিষ্ঠা করিয়া বিশ্বে শান্তির রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিতে পারে না।

### কোরিয়া ও ইন্দো-চীন—

অগ্নি যখন ভস্মাচ্ছাদিত থাকে, তখন বাতাসের ফুৎকারে তাহার আত্মপ্রকাশে বিলম্ব হয় না। জগতের দেশসমূহ যুগে শান্তির জন্ত আগ্রহ প্রকাশ করিলেও প্রকৃত স্বার্থে সামান্য আঘাতে বা কল্পিত স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হইবার আশঙ্কায় সহজেই পরস্পরের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতেছে। কোরিয়ায় ও ইন্দো-চীনে যুদ্ধের গতি সমুদ্রের তরঙ্গের মত অগ্রসর হইতেছে ও ফিরিয়া বাইতেছে। কোরিয়ার গৃহযুদ্ধে যোগ দিয়া আমেরিকা যে আঘাত করিয়াছে, তাহা প্রবল। কিন্তু সেই আঘাত করিয়াই আমেরিকা নিরস্ত হয় নাই। তাহাতেই তাহার অভিপ্রায় সঘন্থে সন্দেহের অবকাশ ঘটিতেছে। কাণ্ডাই যুদ্ধের ফলে কোরিয়ার কোন পক্ষ প্রকৃত উপকার লাভ করিবে, তাহা বুঝা যাইতেছে না। তবে কম্যুনিজমের শক্তিনাশই যে আংলো-আমেরিকান দলের উদ্দেশ্য তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যাইতেছে। হস্ত যুদ্ধের তরঙ্গ ফরগোশায়ও আপতিত হইবে। কিন্তু কম্যুনিষ্ট চীন ও কম্যুনিষ্ট কুশিয়া যে ভাবে যুদ্ধে যোগদানে বিরত রহিয়াছে, তাহাতে মনে হয়, তাহারা অপর পক্ষের বল লক্ষ্য করিয়া প্রস্তুত হইবার চেষ্টা করিতেছে। কোরব-সভায় দ্ব্যতক্রীড়াকালে পাণ্ডবগণ এইরূপ কাজই করিয়াছিলেন এবং আপনারা প্রস্তুত হইয়া যখন যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তখনই কৃষ্ণক্ষেত্রে

ফলাফল নির্ধারণ হইয়াছিল। এদিকে দক্ষিণ কোরিয়ার রাষ্ট্রপতি উত্তর কোরিয়ায় “কোরিয়ার সরকার” স্থাপনের প্রস্তাব গত ২৩শে অক্টোবর করিয়াছেন ; আর কম্যুনিষ্টরা বলিতেছেন, কোরিয়ার গণতন্ত্রের কথা কেবল পুঙ্খলিকা-প্রতিষ্ঠার চেষ্টা।

ইন্দো-চীনে ভিয়েৎমীনের সেনাবল চীনের সীমান্তে ফ্রান্সের অধিকৃত পথের শেষ ৭৫ মাইল স্থান আক্রমণ করিয়াছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। ফরাসী সামরিক কর্তারা ইহা স্বীকার করিয়াছেন।

ভিয়েৎমীনে যদি ফরাসীদিগের পরাভব ঘটে, তবে এশিয়ায় কম্যুনিষ্টরা প্রবল হইয়া উঠিবে। ইহা যেমন ফ্রান্সের, তেননই সাম্রাজ্যবাদী ধনিক-তন্ত্রী দেশ মাত্রেরই অভিপ্রেত নহে। সেই জন্যই ইন্দো-চীনে জাতীয় দলের সহিত যুদ্ধ দাৰ্ঘকালস্থায়ী হইতেছে। ফ্রান্স যে ভারতেও তাহার অধিকার ত্যাগে অনিচ্ছুক, তাহা আমরা দেখিতে পাইতেছি। এমন কি ফ্রান্স বহুমতে চন্দননগর ত্যাগ করিতে সম্মত হইলেও চন্দননগর সম্বন্ধে এখনও পরিবর্তিত ব্যবস্থা সম্পূর্ণ হয় নাই। গত ২৯শে অক্টোবরের সংবাদ—ভিয়েৎমীনের সেনাদল লায়েকোর উপকণ্ঠে উপনীত

হইয়াছে। ইন্দো-চীনের যে অংশে ধাত্তের চাব হয়—অর্থাৎ যে অংশ স্বর্ণপ্রসূ বলা যায়—তাহা ভিয়েৎমীনের দলের হস্তগত। যদি উত্তর ইন্দো-চীনে ফরাসী সীমান্তস্থ লায়েকোর দুর্গ তাহারা অধিকার করিতে পারে, তাহা হইলে সমগ্র ইন্দো-চীনে ফরাসীদিগের অবস্থা সঙ্কটজনক হইয়া উঠিতে বিলম্ব হইবে না।

এদিকে কাম্বোজের ব্যাপারের অংশে যে পৃথিবীর অন্যান্য দেশ লইবার চেষ্টা করিতেছে, তাহা—তাহাদিগের সম্বন্ধে আত্মবিশ্বাস পণ্ডিত জগদীশচন্দ্র নেহরুও শ্রীনগরে বলিয়াছেন। সেই সকল দেশ পাকিস্তানের পক্ষ সমর্থন করিতেছেন। তিনি বলিয়াছেন, দেশরক্ষার জন্য উৎকৃষ্ট ও উপযুক্ত সেনাবলের প্রয়োজন।

সুতরাং বাহারা বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য এতদিন অ্যাংলো-আমেরিকান “ব্লকের” মুখাপেক্ষী হইয়াছিলেন, বর্তমানে তাঁহারাও মতের পরিবর্তন করিতে বাধ্য হইতেছেন। যে দেশ আপনাকে রক্ষা করিতে পারে না—সে দেশ শোষণে সর্বস্বান্ত হয়। উপনিবেশ গঠনের উদ্দেশ্য তাহাই।

১৫ই কার্তিক, ১৩৫৭

## শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণায় নমঃ

বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়

হে সর্বনিয়ন্তা দেব—এক, অবিভীত,  
সর্বভূত-অন্তরাঙ্গা হে অচিন্ত্যনীয়,  
সমস্ত করিয়া পূর্ণ আছো বিত্তমান  
অনিন্তের মাঝে নিত্য সর্বস্তম্ভ মহান।  
তোমাতে যে নেহারিল হৃদয়-মন্দিরে  
পেলো সে শাস্ত শান্তি ; সন্দেহ-ভিত্তিরে

হেরিয়া সত্যের জ্যোতি হোলো নিঃসংশয়।  
আর যারা শিরোধার্য করিয়া বিষয়  
মৃগতৃষ্ণিকার পিছে ছুটিল উন্নয়ন—  
অগ্রব যা তারই মাঝে ক্ষেত্রে কামনা  
করিল মোহের বশে—সেই মূঢ়মতি  
বালকের অন্তহীন লভিল দুর্গতি ;

জড়ালো মৃত্যুরজালে ; অন্ধকার হোতে  
অন্ধকারে ভেসে গেল প্রবৃত্তির ঘোতে।





( পূর্বপ্রকাশিতের পর )

নিঃশেষিত পুষ্পফল—রিক্তপত্র পল্লব—উদ্ভিদ জগতে বৎসরে বৎসরে আসে নববসন্ত। জীবজগতে বৎসরে বৎসরে—অথবা, একটি নির্দিষ্ট সময় অন্তরে আসে জীবন বসন্ত—বসন্তের স্পর্শে নারী-পশু উত্তলা হইয়া তাহার বাসা ছাড়িয়া বাহির হয়, জ্যোৎস্নালোকিত রাত্রে অকস্মাৎ উদ্গমন হইয়া আকাশের দিকে মুখ তুলিয়া ডাক দেয়। বিচিত্র ডাক। সে ডাকের উত্তর একদিন আসে। পুরুষ-পশু সাড়া দিয়া আসিয়া সামনে দাঁড়ায়। মাহুষের জীবনেও হয় তো এমনই হয়, নব নব বসন্তের সাড়া হয় তো দেহকে নাড়া দিয়া বলে—পুরাতনকে পিছনে ফেলিয়া নূতনের সন্ধানে চল, কিন্তু মাহুষের মন তা' চায় না। বহু সহস্র বৎসরের তপশ্চায় যে মন অহরহ জীবন চাকুলোর মধ্যে স্থির হইয়া অতীত বর্তমান মিলাইয়া ভবিষ্যত রচনা করে—যে মন মরজগতের মধ্যে অমৃতকে আবিষ্কার করিয়া আশ্বাদন করিয়াছে—সে মন তা চায় না। মাহুষের সেই মন মহাকালের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া চলিয়াছে; তাহার যে ভালোবাসার ধনকে মৃত্যু হরণ করে, তাহার সকল অস্তিত্ব বিলুপ্ত করিয়া তাহাকে লয় করিতে চায়—মাহুষের মন তাহার অন্তরের অমৃতে সঞ্জীবিত করিয়া নিজের আমরণ জীবনে মৃত্যুঞ্জয় করিয়া রাখে। সে অমৃত ভালোবাসা। মাহুষের মন যাহাকে ভালোবাসিল—তাহাকে তাহার ভুলিবার উপায় নাই। দেহ তার যত জোরালো দাবী লইয়াই আসুক—এ ভালোবাসার কাছে তাহাকে মাথা হেঁট করিয়া হার মানিয়া মাটিতে মিশাইয়া যাইতে হইবে। সেই কারণেই তো যে জন মরিয়া গেলে তাহার জ্ঞান একজনও কেহ কাঁদিবার থাকে না—এ সংসারে সব চেয়ে বড় দুর্ভাগা সেই জন! মাহুষের এই মনই তো—তপস্বিনী সাবিত্রী, সে শত দুর্ধোগেও সন্মাজাগ্রত, যমের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া ভালোবাসার ধনকে—সে আপন মনের মধ্যে নূতন

তারামঙ্গর বন্দোপাধ্যায়

জীবনে বাঁচাইয়া তোলে। ভালোবাসা যেখানে নাই—সেখানকার কথা স্বতন্ত্র; কিন্তু যেখানে আছে—সেখানে—এই কথাই মহাসত্য।

—স্বর্ণকে কথাটা বলতে পারি নি, রুঢ় হবে ব'লে। আপনাকে বলছি। বলুন তো—স্বর্ণ কি আপনাকে হারিয়ে—নূতন জনকে নিয়ে আবার জীবন শুরু করতে পারবে? সে যখন বাল্যকালে বিধবা হয়ে—আপনাকে বিবাহ করেছে—তখন অন্ততঃ তার কাছে সমাজপ্রভাব—মনের বিকৃত ধর্মভয়, এ সবগুলো তো একেবারেই নাই!

কথা হইতেছিল দেবুর সঙ্গে। অরুণার এই পরিবর্তন যেন গোটা পৃথিবী সহ্য করিতে পারিতেছে না! অরুণা যেদিন আসিয়া পৌঁছিয়াছিল—সেদিন দেবু আত্মগোপন করিয়া রেল কলোনির মধ্যে লুকাইয়া ছিল; সেখানে বসিয়াই কথাটা সে শুনিয়াছিল। শুনিয়া অবধি তাহার অস্বস্তির সীমা ছিল না। দিন দুয়েক পরেই সে একদিন রাত্রে জংসন হইতে হাঁটিয়া—পরবর্তী ডাউন ষ্টেশনে গিয়া আপু ট্রেনে জংসন ষ্টেশনে প্রকাশভাবে নামিয়া বাড়ী ফিরিয়াছে। ইতিমধ্যে কয়েক জায়গায় খানাতল্লাসী হইয়া গিয়াছে, কয়েক জনকে ডাকিয়া পুলিশ অনেক জিজ্ঞাসাবাদও করিয়াছে। দেবু ষ্টেশনে নামিতেই তাহাকেও পুলিশ ডাকিয়া লইয়া গিয়াছিল। জিজ্ঞাসাবাদ করিয়াই ছাড়িয়া দিয়াছে, এস-পি সামন্তুদ্দিন তাহাকে বেশ শাসাইয়াও দিয়াছে—বলিয়াছে—তোমাকে সাবধান ক'রে দিচ্ছি। তোমার চেয়ে অনেক চতুর আমরা। খবর আমরা সবই রাখি। হঠাৎ চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিয়াছিল—পিঠের চামড়া আমি ভুলে নেব তোমার and then...; and then I shall send you to Port Blair—you understand? হাঁ!

দেবু স্থির হইয়া বসিয়াছিল—এতটুকু চঞ্চল হয় নাই।

সামন্তুদ্দিন বলিয়াছিল :—হাঁ। আর একটা কথা। Tell

that—bitch—that—woman—তোমাদের মিসেস  
ভট্টাচার্য গো, তাকে বলো—কাদা মাথলে যমে ছাড়ে না,  
ধান কাপড় পরলে—একাদশী করলে—আমি ছাড়ব না।  
দরবারী ঘাবড়েছে—আই-বি ইনস্পেক্টর ঘাবড়েছে—they  
were fools.—আমি ঘাবড়াতাম না। এর পর আমিই  
তাকে ডাকব! যত—সব!

দাঁতে-দাঁতে টিপে বলেছিল—কোন ধর্ম মানে না,  
স্ববিধের জন্ত হিন্দু থেকে মুসলমান হয়, আবার গুজ্জি ক'রে  
হিন্দু হয়—সেই মেয়ে আজ ধান প'রে বিধবা সেজে  
একাদশী করেছে! well—tell her—রথ তার জন্তে  
আসবে—Prison van.—স্বর্গে তাকে আমি পাঠাব!

যাক সে সব কথা!

দেব পুলিশ আপিস হইতে বাড়ী ফিরিয়া সর্বত্র দেখা  
করিল অরুণার সঙ্গে। দেখা করিয়া বিশ্বয়ে যেন অভিভূত  
হইয়া গেল; কৃত্রিম বিশ্বয়ে অভিভূত হওয়ার ভাণ করিল।  
অত্যাশ্চর্য সকল জিজ্ঞাসাই রূঢ় হইয়া উঠিবার সম্ভাবনা ছিল।  
যথাসাধ্য মুক্ত মন লইয়া অরুণাকে বিচার করিয়া বুঝিবার  
তাহার অভিপ্রায় ছিল। একেবারে অরুণার বাড়ীতে  
প্রবেশ করিয়া ডাকিল—অরুণা দি! মধ্যে মধ্যে সে  
অরুণাকে দিদি বলিয়া ডাকিয়া থাকে।

অরুণা তখন ঘরের মধ্যে বসিয়া নিজের জীবনের  
কথাই ভাবিতেছিল। সেই অবশি অর্থাৎ যেদিন হইতে সে  
ধান কাপড় পরিয়াছে সেইদিন হইতে তাহাকে কমজনের  
শ্রদ্ধাপূর্ণ বিশ্বিত দৃষ্টির সম্মুখীন হইতে হইল না। তাহার  
পরিচিত যে তাহাকে দেখিল সেই বিশ্বাস প্রকাশ করিল—  
তারপর বিশ্বাসের সঙ্গে শ্রদ্ধা মিশাইয়া প্রশ্ন করিল—এ কি?

তারপর কেহ হাত দিয়া মাথা হইতে পা পর্য্যন্ত  
দেখাইয়া দিয়া প্রশ্নটা করিল ইঙ্গিতে, কেহ বা দৃষ্টিতেই  
প্রশ্নটা ফুটাইয়া তুলিল, ছ-চারজন মুখ ফুটিয়াই প্রশ্নটা  
করিল—হঠাৎ এরকম বেশবাসের পরিবর্তন? একজন  
শ্রোতৃ সঙ্গীতজ্ঞ বলিয়াছেন—“একি রূপ হেরি হরি—  
ধরেছ যোগীর বেশ?”

অরুণা তাহাদের সংক্ষেপে উত্তর দিয়াছে—এই ভাল  
লাগল।

—হঠাৎ;

—হ্যাঁ—হঠাৎ। হঠাৎ এই ইচ্ছে হ'ল, এই ভাল  
লাগল?

এই উত্তর দিয়াও কিন্তু সে বারবার নিজেকে যাচাই  
করিয়া দেখিয়াছে, নিজের নিজেকে জেরা করিয়া  
আপনাকে বুঝিয়াছে :—বুঝিয়াছে—তাহার ভালবাসা  
সত্য। এ ভালবাসার নির্দেশ—দাবী লঙ্ঘন করিলে—  
জীবনে তাহার দুঃখ-অশান্তির আর অন্ত থাকিবে না;  
জলিয়া পুড়িয়া জীবনটা থাক হইয়া যাইবে। যেখানে  
ভালবাসা নাই—সেখানে ভালবাসার ভাণ করিয়া অথবা  
অসহায় ভাবে সমাজের নির্দেশে—দেহের দাবীকে  
উপেক্ষা করিলে যে অশান্তিতে মন পুড়িয়া যায়, এখানে  
মনের দাবী উপেক্ষা করিয়া নূতন জীবন দর্শনের পুঁথির  
নির্দেশে দেহের দাবীকে বড় করিতে গেলে—অশান্তি  
হইবে লক্ষ লক্ষ গুণ বেশী। আজও যতবার সে শ্রদ্ধাপূর্ণ  
প্রশ্নের সম্মুখীন হয়—ততবার সে এই উপলক্ষকে যাচাই  
করিয়া দেখে। যাচাই করিয়া দেখিতে গিয়াই—  
বিশ্বনাথের জন্ত সে কাদে, এই কান্নার চোপের জলই  
তাহার উপলক্ষকে দৃঢ় হইতে দৃঢ়তর করিয়া তোলে।  
সমস্ত সংকোচ, লজ্জা, বেদনা ধুইয়া মুছিয়া যায়, অনাবিল  
প্রসন্নতায় অরুণার অন্তর বাহির অপরূপ মাধুর্যে ভরিয়া  
উঠে। হয়ত দুইদিন স্বর্ণের শ্রদ্ধা-তীক্ষ্ণ বাকাবাণের  
সম্মুখীন হইয়া আবার নিজেকে যাচাই করিয়া দেখিল,  
একটা গোটা রাত্রি সে বিশ্বনাথের জন্ত কাদিল। কান্নার  
মধ্যেও সে নিজেকে প্রশ্ন করিল; অতি রূঢ় প্রশ্ন,—বোধ  
করি তাহার জীবনের রূঢ়তম প্রশ্ন; নিষ্ঠুর উত্তেজনায়  
মায়া মমতাহীন হইয়া সকল চক্ষু লজ্জা বিসর্জন দিয়া  
স্বর্ণই তাহাকে প্রশ্ন করিয়াছিল। বলিয়াছিল—আজ যে  
বিশ্বনাথবাবুর কিশোর রূপ মনে প'ড়ে আপনি আকুল  
হয়ে উঠেছেন—অরুণাদি সে আকুলতার মূলেও কি দেহ  
নেই আপনার? ওই যে অজয়কে আপনার করে পেতে  
চাচ্ছেন—স্বামীর বদলে ছেলের রূপে পেতে চাচ্ছেন—  
সেও কি আপনার ওই চাওয়ারই রকম-কর নয়?  
আপনি তো আমার চেয়ে অনেক পড়েছেন—অনেক  
জানেন—বলুন না—সেটার সত্য অর্থ তো আপনি  
না-জানা নন—

স্বর্ণ যেন অরুণার কণ্ঠনালীটা চাপিয়া ধরিয়া খাস-রুদ্ধ

ক'রিয়া দিয়াছিল, শুধু বাতাসই নয়—প্রসন্ন প্রভাতালোক মুছিয়া দিয়া নিশ্চিন্ত কালো অন্ধকার লেপিয়া দিয়াছিল—বিশ্বসংসারের সন্দাঁদে। সে হাত নাড়িয়া ইসারা করিয়া স্বর্ণকে বারণ করিয়াছিল—থাম স্বর্ণ, থাম।

স্বর্ণ থামে নাই। কথা শেষ করিতে বাকীও বড় কিছু ছিল না, শুধু আরও একবার উত্তরের সদর্প দাবী জানাইয়া সে থামিল—বলুন—বুকে হাত দিয়ে সত্য কথাটা বলুন শুনি! কথা শেষ করিয়া সে স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া দাঁড়াইয়া ছিল, উত্তেজনা অল্প অল্প হাঁপাইতেছিল।

অরুণা চোখ বুজিয়া কিছুক্ষণ বসিয়া থাকিয়া একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিয়াছিল, দূর অথচ শাস্ত কণ্ঠস্বরে ধীরে ধীরে বলিয়াছিল—তোমার কথা এতটুকু মিথ্যে নয় স্বর্ণ, বর্ণে বর্ণে সত্য, তাকে আমি স্বীকার করছি; আমার এ চাওয়ার মধ্যেও দোষ আছে। কিন্তু—

মধ্য পথে বাধা দিয়া অসহিষ্ণু স্বর্ণ বলিয়া উঠিয়াছিল—এর পর আর কিন্তু কিসের অরুণাদি?

আছে। আলো আর অন্ধকার প্রথরতম আর গাঢ়তম অবস্থায় এক হয়ে যায় এবং অভিন্নও বটে, কিন্তু তা বলে আলো আর অন্ধকার স্বতন্ত্র হয়ে যখন প্রকাশ পায় তখন সে ভিন্ন বস্তু। তার রূপই ভিন্ন নয়—তার স্পর্শ, তার প্রভাব, তার ক্রিয়া সব ভিন্ন। স্বর্ণ—যে কোন নারীর যে কোন পুরুষ হলেই জীবনের দাবী মেটে না। আমার স্বামীর স্থানে আর কাউকে বসিয়ে আমার দাবী মিটবে না, সেটা হবে মদ খেয়ে নেশা করে আনন্দ সন্ধান করার মত, তার ফলে দেহ-মন দুইকেই আরোগ্যের বদলে বিযাক্ত রূপ করে তুলবে। অজয়কে আমি আমার সম্ভানরূপে পেলে তবেই মিটবে আমার জীবনের দাবী। তার মাথা বুকে জড়িয়ে ধরে—তার কপালে চুঘন দিয়ে সন্দাঁদে হাত বুলিয়ে দিয়ে দেহ-মন দুয়ের কথা—স্বর্ণ আমার প্রাণ জুড়িয়ে যাবে—ভরে উঠবে। এর কদর্থ করতে চেষ্টা করো না স্বর্ণ—মূলে এর অর্থ বাই হোক—যুক্ত বৈদ্যের মত দুই ধারায় পৃথক হওয়ার পর অর্থও পৃথক হয়ে গেছে। ও দুইয়ে মেশাতে চেষ্টা করো না—এক নদী দুই শাখায় ভাগ হয়ে গেলে তখন আর এক থাকে না—দুই ধারার জলে একই গুণ থাকে না। মাটির গুণে ধারার রঙ পাণ্টায়—গুণও পাণ্টায়। যে বোটার ফুল

ফোটে সেই বোটাতেই ওই ফুল থেকে যে ফল ধরে সে দুটোর বোটা এক বলে—এক জিনিষ নয় স্বর্ণ।

একটু চুপ ক'রে একটা নিশ্বাস নিয়ে তারপর বলেছিল—এর বেশী আর আমাকে জিজ্ঞাসা করো না স্বর্ণ, উত্তর আমি আর দেব না।

স্বর্ণ তবু আবার কথা বলিতে চেষ্টা করিয়াছিল। বাধা দিয়া অরুণা বলিয়াছিল—বিচারকের আসনে বসবার চেষ্টা করো না স্বর্ণ। নিজের অধিকারের কথাটা স্মরণ রেখো। যদি কেউ তোমাকে বিচারকের পদ দেয়—বা—গায়ের জোরেই নাও—তবে একতরফা বিচার করে যা খুসী রায় দিয়ে—আমি কথা বলতে নারাজ।

স্বর্ণ আর কথা বলে নাই, নীরবেই চলিয়া গিয়াছিল; সমস্ত দিন রাত্রির মধ্যে আর অরুণার কাছে আসে নাই। অরুণা বিশ্বনাথের জন্ত কাঁদিয়াছে—আর ওই প্রশ্নই বারবার নিজেকে করিয়াছে। সে-প্রশ্নে সে অপ্রতিভ হয় নাই, লজ্জিত হয় নাই, যেমন ধীরতা ও শাস্ত সংবাদের সঙ্গে স্বর্ণকে উত্তর দিয়াছে তেমনি ভাবেই—ওই একই উত্তর বারবার দিয়াছে। বরং ধীরতা ও শাস্ত সংবাদের সঙ্গে একটি অনাবিল প্রসন্নতা তাহার মুখে একটি হাসির রেখা আঁকিয়া দিল।

দেবু আসিয়া তাহাকে ডাকিতেই সে ওই হাসি-মুখেই বাহির হইয়া আসিল। প্রসন্ন সম্ভাষণে তাহাকে আহ্বান জানাইয়া বলিল—আসুন দাদা।

দেবু তাহাকে অরুণাদি বলিয়া ডাকিলে...সে দাদা বলিয়াই সাড়া দেয়।

দেবু যথাসাধ্য কৃত্রিম বিশ্বয় প্রকাশ করিয়া কহিল—এ কি? কি ব্যাপার?

অরুণা আরও একটু বেশী হাসিল। বলিল—আমার বেশভূষা দেখে তো?

—হ্যাঁ। এ কি করেছেন? হঠাৎ—?

তাহার বিশ্বয়ের প্রকাশ শুধিকে সে যথাসাধ্য প্রসন্ন করিয়া তুলিতে চেষ্টা করিল—বুঝাইবার চেষ্টা করিল—যে—এ পরিবর্তনের ফলে তাহার বিশ্বয়ের অন্তরালে নিহক



বিশ্বয় ছাড়া আর কিছু নাই। ভাল বা মন্দ কোন ধারণাই এ বিশ্বয়ের পিছনে নাই।

অরুণা তাহার মুখের দিকে স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিল—  
হঠাৎ নয় দেবুবাবু, অনেক ভেবেছি, অনেক ভাঙাগড়া হয়ে  
গেছে আমার।

—মানে? যুহুর্ন্তে জু দুটির উপরে কুণ্ডন রেখায়  
বিরূপ মনের রূঢ়তা আত্মপ্রকাশ করিল। এটুকুকে সমস্তে  
গোপন করিবার চেষ্টা তাহার ব্যর্থ হইয়া গেল।

অরুণা হাসিল। বলিল—একটা জীবনের ভাঙাগড়ার  
কাহিনীর এক কথায় তো মানে বলা যায় না ভাই। সময়  
লাগবে। বহু। যদি সময় এখন না থাকে তবে অবসর  
করে আসবেন—আমিও বলতে চাই; হুঃখের কথাই  
হোক আর সুখের কথাই হোক—কাউকে না বলতে পেলেন  
মন হান্ধা হয় না।

দেবু বসিয়া বলিল—অবসর করতে হবে মিসেস ভট্টাচার্য,  
একটু চুপ করিয়া বসিয়া সে বলিল—আপনার বাইরের  
কচি বা আচারের পরিবর্তনের সঙ্গে মনের কতটা সম্পর্ক  
বুঝতে হবে আমাকে।

অরুণা বলিল—তার মানে আমার বিচার করবেন?  
সে হ'লে আমি আসামীর মত চুপ করেই থাকব।  
আপনি সাক্ষী সাবুদ নিয়ে যারায় দেবার দেবেন।  
রাজনৈতিক দলে কর্মী হয়ে চুকেছিলাম যখন, তখন দেশের  
জন্ত মুখ বুজে মৃত্যুবরণ করতেও প্রস্তুত হয়েছিলাম, আর  
আজ আমার নিজের জীবনের পরম বস্তুর জন্ত  
আপনার দেওয়া সাজা নেবার সময় হাজার কথা কইতে  
যাব কেন?

দেবু চকিত হইয়া অরুণার দিকে চাহিল।

অরুণা বলিল—বিচারের প্রহসনই হয়ে থাকে—রাষ্ট্র-  
নৈতিক অপরাধে—রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রিত বিচারালয়ে। রাষ্ট্রনীতি  
নিয়ে যে সব দল কাজ করে—তারাও বিচারের  
সময় ওই একই ধারায় বিচার করে। তেমনি বিচার  
করেন তো আমার কথা আপনার শুনেই বা কাজ কি—  
আমার বলেই বা লাভ কি? যা খুদী করুন গিয়ে। তবুও  
আপনি আমার স্বামীর আকর্ষণে—তারই দীক্ষায় এ দলে  
এসেছিলেন—একসময় আমিও আপনাকে হয় তো কিছু  
কিছু শিখিয়েছি, নূতন দৃষ্টিতে দেখতে সাহায্য করেছি।

তাই কটা কথা বলছি, আমার ভাঙাগড়ার মধ্যে আমি  
আমার ব্যক্তিগত জীবনের স্বরূপকে আবিষ্কার করেছি—  
নিজেকে চিনেছি, তাই বুঝতে পেরেছি যাকে একদিন  
স্বামীত্বে বরণ করেছিলাম তার অস্তিত্ব তার দেহের সঙ্গেই  
আমার জীবনে শেষ হয় নাই, তাকে ভোলা আমার পক্ষে  
অসম্ভব। 'নয়ন সম্মুখে তুমি নাই—নয়নের মাঝখানে  
নিয়েছ যে ঠাই'—। দেবুবাবু হঠাৎ বুঝলাম কথাটা।  
অজয়কে দেখে সেই সত্য হঠাৎ স্পষ্ট হয়ে উঠল।  
আজ আমি কোন পুরুষকে স্বামী হিসেবে গ্রহণ ক'রে  
ঘর বেঁধে সুখ পেতে পারি না—শান্তি পেতে পারি না;  
তাই আমার স্বামীর সন্তান—আমার সন্তান অজয়কে  
নিয়ে ঘর বাঁধবার কামনায় আকুল হয়ে উঠেছি;  
তাকে আমাকে জয় করতে হবে—তার মা হতে  
হবে। এ সজ্জা আমার বিধবা মায়ের সজ্জা। এর  
জন্তে—

দেবু মাটির দিকে চোখ রাখিয়া অরুণার কথাগুলি  
শুনতেছিল—হঠাৎ মুখ তুলিয়া বলিল—এরজন্তে—?

—এর জন্তে যে কোন মূল্য আমি দিতে প্রস্তুত  
দেবুবাবু।

—অর্থাৎ এতকালের বিশ্বাস আদর্শ দল—সব?

—হ্যাঁ। সব, সব, সব। কিন্তু—

—আবার কিন্তু কি?

—আছে কিন্তু দেবুবাবু। বিশ্বাস আদর্শ আমাকে  
ছাড়তে হবে না। ছাড়তে যেটা হবে—সেটা দল। দেবুবাবু  
নারীর হাতে ভিক্ষা নেওয়ার জন্ত চৈতন্য তাঁর ভক্তকে  
বর্জন করেছিলেন কিন্তু ভক্তের বৈষ্ণব ধর্মের বিশ্বাস—সে  
ধর্ম মতে সাধনার অধিকার কেড়ে নিতে পারেন নি।  
আমার জীবনের বিশ্বাস—আদর্শবাদ আপনারা কেড়ে  
নেবেন বা আপনাদের সঙ্গে না বনলে ছাড়তে হবে—এমন  
ধারণা করবার স্পর্ধা আপনার বা আপনাদের হ'ল  
কি ক'রে?

দেবু হাসিয়া বলিল—কিন্তু ছেলের সঙ্গে যদি বিরোধ  
হয় আদর্শ নিয়ে?

—আমি এমন মা হতে চাই দেবুজাই, যে আমার  
রক্ত সুধা হয়ে তার দেহের রক্ত হয়ে প্রবাহিত হবে,  
আমার ভাবনা আমার ভাবাই হবে তার ভাবনা-ভাবা।

বিরোধ আমার হবে না দেবুবাবু। অরুণার চোখের দৃষ্টিতে স্বপ্ন ছুটিয়া উঠিল।

দেবুবাবু একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল—  
আপনার কামনা সকল হোক অরুণা-দি। সর্বাস্তুরূপে  
আমি প্রার্থনা করছি।

অরুণা বলিল—বসুন—বসুন। আপনার মাহুকের  
মন আজও বেঁচে আছে। নইলে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলতেন  
না। স্বর্ণকে কয়েকটা কথা বলবেন। সে মারাত্মক  
উত্তেজিত হয়ে উঠেছে। তাঁকে জিজ্ঞাসা করবার ইচ্ছে  
আমার হয়েছিল—কিন্তু জিজ্ঞাসা করতে পারি নি সে  
আঘাত পাবে ব'লে। বাল্যকালে যার সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল—  
যার সঙ্গে ভালবাসা জন্মাবার—যাকে ভালবাসবার  
সময় পায় নি বলে—সকল বিয়েতেই তাই হবে? সে যে  
ধোয়ামোছা মন নিয়ে আপনাকে গ্রহণ করেছে, আপনার  
সঙ্গে ঘর বেঁধেছে—এ সবকেও কি ধুয়ে মুছে যাবে—  
আপনার দৈহিক অস্তিত্বের অন্তর্ভাবে? স্বর্ণ কি আপনাকে  
হারিয়ে নতুন জনকে নিয়ে আবার জীবন শুরু করতে  
পারবে? সে যখন বাল্যকালে বিধবা হয়ে আপনাকে  
ভালবেসে বিবাহ করেছে, তখন অন্ততঃ তার কাছে সমাজ-

প্রভাব—মনের বিকৃত ধর্মতত্ত্ব এ সবগুলো তো একেবারেই  
নাই!

—অরুণা দি!

স্বর্ণ নিজেই আসিয়া দরজার দাঁড়াইল।

দেবু শক্ত হইয়া বলিল—চল—স্বর্ণ—বাড়ী চল।

স্বর্ণ বলিল—না!

অরুণা বলিল—বল, স্বর্ণ কি বলছ বল?

—বলছি না কিছু, বাহবা দিচ্ছি। যে সব তত্ত্বকথা  
চমৎকার বক্তৃতা করে বুঝালেন এতক্ষণ তার জন্য বাহবা  
দিচ্ছি।

—চল স্বর্ণ!

—যাচ্ছি। ঝগড়া আমি করব না। শুধু একটা  
কথা শুঁকে জানিয়ে বাই। গোটা শহরটা শুঁর এই নতুন  
চং নিয়ে হেসে গড়িয়ে পড়ছে। পাটির প্রত্যেক মেঘার  
এর সঙ্গে শপথ করে বলেছে—পাটি থেকে শুঁকে বের করে  
দিতেই হবে।

—পাটি আমি ছেড়ে দিলাম দেবুবাবু। আপনি  
ওপরে জানাবেন।

( ক্রমশঃ )

## পূজার চিঠি

কুমারী নবনীতা দেব

কবি-দম্পতি শ্রীমতের দেব ও শ্রীমতী রাধারাগী দেবী  
তাঁহাদের ১২ বৎসরের কন্যা কুমারী নবনীতাকে সঙ্গে  
লইয়া ইউরোপ ভ্রমণে গিয়াছেন—এ সংবাদ ভারতবর্ষের  
পাঠকগণ অবগত আছেন। পূজার সময় কুমারী নবনীতা  
লণ্ডনে বসিয়া তাঁহার মাতুলানী শ্রীমতী প্রতিমা ঘোষকে  
একখানি এবং মাতুল-পুত্র শ্রীজীক ঘোষ ( ১০ বৎসরের )  
ও মাতুল-কন্যা কুমারী শ্রীমতী ঘোষ ( ৭ বৎসর বয়সের )কে  
একখানি পত্র লিখিয়াছেন—উভয় পত্রই কবিতায় লেখা।  
আমরা নিয়ে পত্র ২ খানি প্রকাশ করিলাম—ইহা পাঠ  
করিলে কবিদম্পতির কন্যা নবনীতারও অসাধারণ কবিত্ব  
প্রতিভার সম্ভাবনার পরিচয় পাওয়া যায়। ( তাঃ সঃ )

( ক )

শারদ পূজার পত্র পপুয়া

পাঠাই রচিত্য গীতি ;

শুরুজনে দিও প্রণাম আমার

ছোটদের দিও শ্রীতি।

এইতো প্রথম দেশ ছেড়ে ঘুরে

রহিল পূজার কালে ;

পরিণি নতন পূজার পোষাক

কুছুর কোঁটা ভালে।

নতন জুতা তো নেই পায়ে আজ

পূজার হর্ষ কই গো ?

ইংরাজী সবই, পাইনি এবার  
 পূজা বাধিকী বই গো।  
 দেশে কিরে যেতে মন যে ব্যাকুল  
 কিরিব এ মাস শেষে ;  
 ভাবি মনে আজ থাকিওঁয় যদি  
 তোমাদের কাছে দেশে।  
 মহা উৎসব—কোলাহলে বেধা  
 পূজার বাস্তবাজে,  
 মন যে আমার ছুটে চলে আজ  
 সেই বাংলার মাঝে।  
 পাড়ায় পাড়ায় পূজা মণ্ডপে  
 ছোট ছেলে মেয়ে নাচে,  
 বিজয়ার সাঁঝে মিষ্টি খাবার  
 গুরুজনদের কাছে।  
 বন্ধুরা মোর নতুন বসনে  
 সজ্জিত হয়ে আজ,  
 পূজা মণ্ডপে হাসি-কলরবে  
 করিছে কত না কাজ।  
 স্বদূর সাগর পারে বসে আমি  
 ভাবি স্বদেশের কথা,  
 বহু স্থখে আছি, তবু মনে হয়  
 কি-জানি-বি-নেই হেথা।  
 দেশের প্রতিটি পথ-ঘাট বাড়ী  
 আত্ম বন্ধু যত,  
 অভূ, খুকু আর দুষ্টুর কথা  
 মনে জাগে অবিরত।  
 হিন্দুস্থান-পার্কের মত  
 এত স্থল্লর স্থান  
 এই পৃথিবীতে আর তো কোথাও  
 গড়েননি ভগবান।  
 সুইজারল্যান্ড, প্যারিস, ইটালী,  
 অস্ট্রিয়া, জার্মানী—  
 বালিগঞ্জের কাছে, মোর কাছে  
 সব ব্যয় হার মানি।

এবারে পূজোতে কিন্তু পপুরা  
 প্রকাণ্ড চিঠি দিচ্ছ,  
 আবার লিখিব, এইবারে আসি,  
 ইতি—তোমাদের দিচ্ছ।

( খ )

অভূ সোনা! লক্ষ্মী আমার, সোনার থুকুন ভাই  
 দিদিটাকে ভুলেই গেছিস, একটু মনে নাই ?  
 দাঁওনা অতীক একটা চিঠি, নাওনা খবর নিজে  
 তাইতো মনে দুঃখ আমার, জানাই তোদের কী যে।  
 প্রত্যেক দিন সবার কাছেই, গল্প তোদের করি  
 থুকুরাগীর কথা এবং অভূর কথা স্মরি।  
 দুষ্টু বাবুর দুষ্টু পনার, খবর কিছু পাই,  
 কিন্তু তোদের হাতের লেখায়, তাহার খবর চাই।  
 এবার পূজোর ভীষণ আমার, মন কেমন যা করছে,  
 বারে বারেই চোখের পাতা ; কেবল জলে ভরছে।  
 তোমরা কি ভাই দিদির কথা, একটা বারও ভাবছ,  
 মোটর থেকে সর্বজনীন, দেখতে যখন নাবছো ?  
 পূজায় এবার জামা জুতো, সব পুরানো পরছি,  
 মায়ের কাছে বলতে গেলেই, ধমক্ হজম্ করছি।  
 এবার পূজায় ধমক ছাড়া, আর তো কিছুই পাইনি,  
 মায়ের মেজাজ গরম দেখে, বাবুর কাছেও বাইনি।  
 মা বলেছেন তিনটি বছর, পূজোর নাম না করবে,  
 এই পুরাণ জুক ও জুতা, তিনটি বছর পরবে।  
 তাই তো আমি চালাক হয়ে, লম্বা এমন হজি,  
 তিনটি মাসও আর না বাতে, এ সব জামা পরছি।  
 অনেক কথাই বলবো গিয়ে, হচ্ছে পেটে জমা,  
 পণ্ড লিখছি, এ জন্তে ভাই, করিস্ কিন্তু ক্ষমা।  
 লণ্ডন-পুলিশের হাট, কিনেছি তোয় জন্তে,  
 মা কিনেছেন বই, খেলনা, দেখেননি তা জন্তে।  
 বার্ষিক পরীক্ষার ফল, শুভ খবর দিও,  
 দিদি-ভাইএর বিজয়ারই, আলীষ, প্রীতি নিও।

ইতি—তোমাদের দিদিভাই

# জর্জ বার্নার্ড শ

## শ্রীহুবোধচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়

( ১৮৫৬-১৯৫০ )

পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মনীষী জর্জ বার্নার্ড শ গত ২২রা নবেম্বর দেহত্যাগ করেছেন। গত ২৬শে জুলাই তাঁর তিরানব্বইতম জন্ম দিবস উপলক্ষে সারা জগত তাঁকে অভিনন্দন জানিয়েছিল। গত ১১ই সেপ্টেম্বর শ বাগানে পড়ে গিয়ে আহত হন এবং হাসপাতালে ভর্তি হন। সেখান থেকে ২৫ দিন পরে গত ৪ঠা অক্টোবর তিনি গৃহে ফিরে আসেন। হাসপাতালে ভর্তি হবার সময় তিনি বলেছিলেন, “এবার যদি বাঁচি তাহলে অমর হয়ে উঠব।” কিন্তু হার! তাঁর মত মনীষীকেও আজ পৃথিবী হ’তে বিদায় নিতে হ’ল। মহাকালের হুকুমে সেই অসাধারণ প্রতিভার অল্পান শিখার দ্রুতি আজ দৃষ্টি পথ হতে অন্তর্হিত হল বটে, কিন্তু যে আলোকের দীপশিখা তিনি ছেলেছিলেন তা চিরকাল অগ্নান ও উজ্জ্বল থাকবে। তাঁর বৈশিষ্ট্য তাঁর চরিত্রে ছিল না, ছিল তাঁর হাসিতে, তাঁর ব্যঙ্গ, তাঁর বিদ্রোহ। তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব তাঁর শিক্ষায় ছিল না, ছিল বন্যশক্তির মত তাঁর বিশাল ব্যক্তিত্বে।

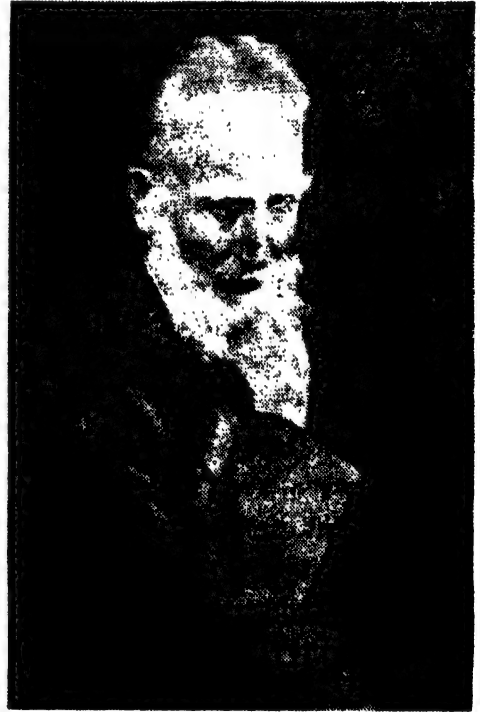
সত্যি বিচিত্র ছিল তাঁর জীবন, বিরাট ছিল তাঁর ব্যক্তিত্ব। অদ্ভুত ছিল তাঁর আচার ব্যবহার, চালচলন, অদ্ভুত ছিল তাঁর চরিত্র। পৃথিবীতে এমন অদ্ভুত মানুষ আর দ্বিতীয় জন্মান নাই। তাঁর লেখনী ছিল যেমন তীক্ষ্ণ, তেমনি রসাল তাঁর কথাবার্তা, কলম ত নয় যেন শাণিত তরবারী। কঠোর চাবুক হাতে দিয়ে ভগবান এই লোকটিকে পৃথিবীতে পাঠিয়ে ছিলেন। সেই চাবুকের কঠোর আঘাতে অমানুষের দল মানুষ হয়েছে, অস্ত্রের দল ভক্ত হয়েছে। পৃথিবীর লোক তাঁকে ভয় করেছে, শ্রদ্ধা করেছে, ভক্তি করেছে, ভালবেসেছে। তাঁর নানা অভিজ্ঞতা হতে তিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে বেদনার চেয়ে বিদ্রোহ বড়, দুঃখতার চেয়ে মহৎ বড়।

যে ক্রোধ ও হানি, তিক্ততা ও অবসাদ আজ সমাজ-জীবনে প্রবেশ করেছে, সমাজটাকে অপমৃত্যু হতে রক্ষা করার জন্য তিনি তা আকর্ষণ পান করেছিলেন। তাঁর চিন্তাধারার অজস্র দানে, তাঁর প্রতিভার অজস্র আলোকে আজ সমগ্র পৃথিবী সমৃদ্ধ ও সমৃদ্ধল হয়ে উঠেছে।

তাঁর পকাশ খানি নাটক আজ ইউরোপের বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত এবং ইউরোপ ও আমেরিকার বিভিন্ন রঙ্গালয়ে অভিনীত হয়েছে। সেই সমস্ত অভিনয় হতে তিনি দশ লক্ষ পাউণ্ডের অধিক অর্থ লাভ করেছিলেন। তাঁর ‘পিপা ম্যালিয়ান’ নামক নাটকের চিত্রায়ণের স্বর্থ বিক্রী করে তিনি পকাশ হাজার পাউণ্ড লাভ করেছিলেন।

পৃথিবীর সব চেয়ে বড় বিস্ময় যে তিনি তিরানব্বই বৎসর বয়সে তাঁর শেষ নাটক “কার কেচেড কেব্লস্” রচনা করেন। এত অধিক বয়সে আর কেউ কিছু রচনা করতে পেরেছেন তাঁর পরিচয় আমাদের জানা নেই।

তাঁর বয়স বৃদ্ধি ১৫ বৎসর তখন তাঁর পিতার সংসার অচল হয়ে ওঠে। কি-চাকরদের বিদায় দিতে হ’ল—তাঁর মা লুসিলা এলিজাবেথ সব কাজই নিজে হাতে করেন। শ স্থির করলেন—সংসারের সাহায্যের জন্য কিছু করা প্রয়োজন। তিনি বিজ্ঞালয়ে বৈদ্য দ্বিন যান নি, তবে বাড়ীতে অসাধারণ পড়েছেন। শ চাকরি করবার জন্য ডাবলিনে এক কাপড়ের দোকানে সকাল দশটায় এসে হাজির হলেন। সোজা সাহেবের কামরায় ঢুক একখানা পরিচয় পত্র দিলেন। তাঁকে এক ঘরে নিয়ে গেল—সাহেব জিজ্ঞাসা করলেন—কি পাশ করেছে?



জর্জ বার্নার্ড শ

পাশ ত কিছু করিনি।

পাশ করনি, চাকরি করতে এসেছ?

চাকরীর সঙ্গে পাশের সম্বন্ধ কি?

দরখাস্ত এনেছ?

নিয়ে আসিনি। কাগজ দিন এখন লিখে দিচ্ছি।

কাগজ নিয়ে শ খস খস করে এক দরখাস্ত লিখে দিলেন। তাঁর চাকরি হ’ল—বেতন মাসে ১৮ শিলিং অর্থাৎ সাড়ে বারো টাকা। কিন্তু দুঃখের বিষয় তাঁর পরদিন চাকরীতে গিয়ে শুনলেন—তাঁর বয়স কম—চাকরি হবে না।

ভাগ্যের এই পরিহাস শুরু হ'ল তাঁর জীবনে।

১৮৫৬ খৃষ্টাব্দের ২৬শে জুলাই আয়র্ল্যান্ডের ডাবলিন শহরের উপকণ্ঠে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম ছিল জর্জ কার শ, আর মাতার নাম ছিল লুসিন্দা এলিজাবেথ।

তাঁর তখন পাঁচ বৎসর বয়স। চাকরের সঙ্গে সন্ধ্যাকালে বেড়াতে বেরিয়েছেন। সে দিন রবিবার। গির্জার ঘণ্টা বাজছে। দলে দলে লোক গির্জার দিকে চলেছে। তিনি চাকরকে জিজ্ঞাসা করেন—এত লোক সব কোথায় যাচ্ছে?

চাকর বলে—গির্জায়।

সেখানে কি হয়?—সেখানে খুষ্টের আরাধনা হয়, ভগবানের আরাধনা হয়।

তিনি বাড়ী গিয়ে মাকে জিজ্ঞাসা করলেন—মা, আমরা গির্জায় যাই না কেন?

মা বলেন—‘বাইবেল কিনে দেব—পড়ে দেখো’। এই বলে ছেলেকে নিয়ে মা মধুর কণ্ঠে ও মধুময় ভাবায় একখানি পান করলেন—ছেলে অল্প এক জগতে চলে গেল। মা তখন বলেন—এই আমার গির্জা—এই আমার ভগবান।

যখন তাঁর ২০ বৎসর বয়স, তিনি ইংলণ্ডে এলেন। ছ বছর তিনি বেকার জীবন অতিবাহিত করেন। অনবরত লেখেন, আর সেই লেখা কাগজে পাঠান। সবই কিরে আসে। একদিন ‘ওয়ার্ন এন্ড অল’ নামক একটি মাসিক পত্রিকায় ‘খুষ্টান নাম’ নামে তাঁর একটা লেখা প্রকাশিত হ'ল। তিনি পারিশ্রমিক পেলেন পনের শিলিং। এই তাঁর প্রথম প্রবন্ধ প্রকাশিত হ'ল।

তিনি পেশা হিসেবে সাহিত্য কেন নির্বাচন করেন তাঁর কারণ তিনি বলেছেন—‘ডাক্তার বা উকিলের মত সাহিত্যিকের কারণে কাছে যেতে হয় না। দামী কোট প্যাণ্ট, হ্যাট, টাই পরকার হয় না। তাই আমি সাহিত্যের পেশা বেছে নিলাম।’

তিনি নাম করবার ক্ষমতা বৃদ্ধি করতে আরম্ভ করেন—বৎসরের পর বৎসর বৃদ্ধতার শ্রোত চর। তিনি জমিদারী প্রথার উচ্ছেদ সম্বন্ধে এক সভার বক্তৃতা করবার অনুমতি চেয়ে এক পত্র দিলেন। উত্তর এল—বারা কার্ল মার্কস পড়ে নি—তাদের বক্তৃতা করবার যোগ্যতা নেই।

তৎক্ষণাৎ ব্রিটিশ মিউজিয়ামে গিয়ে কার্ল মার্কসের ক্রাসী ভাবার লেখা সব বই পড়লেন।

১৮৭২ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডে নাট্য জগতে একটা সংস্কারের আয়োজন চলেছে। জ্যাক গ্রেণ ইণ্ডিপেন্ডেন্ট থিয়েটার নামে এক নাট্যাগার প্রতিষ্ঠা করলেন। ইংল্যান্ডের বিখ্যাত নাটক ‘যোষ্ট’ প্রথম অভিনীত হ'ল। কিন্তু তিনি চাইলেন একখানি নূতন ধরণের ইংরাজী বই অভিনয় করতে। শ এই সংবাদ পেয়ে ‘উইডোয়ার্স হাউসেস’ নামক খরচিত প্রথম নাটক গ্রেণকে পড়ে শোনালেন। নাটক স্নোবানীত

হ'ল। শ'এর জীবনে সে এক স্মরণীয় দিন। বার্পার্ড শয়ের নাম চারিদিকে প্রচারিত হ'ল। কিন্তু মাত্র দু রাত্রি অভিনয়ের পর এই নাটকের অভিনয় বন্ধ হয়ে গেল।

১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে তিনি দ্বিতীয় নাটক লিখলেন—‘দি কিলিগারার’। কিন্তু এটি অভিনীত হল না। তারপর তখনকার দিনের বিখ্যাত অভিনেত্রী জেনেট এচার্চের অনুরোধে তিনি তৃতীয় নাটক লিখলেন—‘মিসেস ও অরেনস প্রক্সেন’। কিন্তু দুর্নীতিবুলক মনে করে গবর্ণমেন্ট এই নাটকের অভিনয় বন্ধ করে দিলেন।

তার পর তিনি অনবরত একের পর এক নাটক রচনা করতে লাগলেন—‘আর্থস এন্ড দি ম্যান’, ‘ক্যাডিডা’, ‘ইউ নেভার ক্যান টেল’, ‘সিজার এন্ড ক্লিওপেট্রা’ এবং ‘ক্যাপ্টেন ব্রাস বাউন্স কনভার্সন’। বিপ্লবী নাট্যকার হিসাবে তাঁর নাম তখন ইংলণ্ডে অতিক্রম করে আমেরিকায় পৌঁছেছে। সেখানে ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে তাঁর প্রথম নাটক অভিনীত হল গবর্ণমেন্ট কর্তৃক নিষিদ্ধ নাটক ‘মিসেস ও অরেনস প্রক্সেন’।

১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে ২৬শে সেপ্টেম্বর, প্রিন্স অব ওয়েলস থিয়েটারে শ'র নাটক ‘দি ডেভিলস ডিসাইপল’ ইংলণ্ডে প্রথম অভিনীত হ'ল। আমেরিকায়ও এই নাটক অভিনীত হয়। সেখান হতে শ পান পাঁচ হাজার পাউণ্ড, আর লন্ডনের অভিনয় হতে পেলেন দশ হাজার পাউণ্ড।

শয়ের বয়স তখন ৪০ বৎসর। অবিবাহিত জীবন সংগ্রাসে এইবার তিনি জয়ী হলেন। ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে ১লা জুলাই চার্লোট নারী এক মহিলাকে শ বিবাহ করেন। পরতারিখ বৎসর চার্লোট শর জীবন-সঙ্গিনী স্বরূপ জীবিত ছিলেন। ১৯৪৩ সালে তাঁর স্ত্রীর মৃত্যু হয়।

১৯০৩ সালে শর শ্রেষ্ঠ নাটক ‘ম্যান এন্ড হুপারম্যান’ প্রকাশিত হ'ল। দু বৎসর পরে এই নাটকখানি লন্ডনের কোর্ট থিয়েটারে অভিনীত হল। তখন শ এই নাট্যাগারে নাট্যকার, নাট্যাচার্য ও প্রযোজকরূপে যোগ দেন। শ'র ঐক্সক্লসিভ স্পর্শ নাট্যাগারের পরিবেশের পরিবর্তন হ'ল। তখন হ'তে নাট্যাগার হয়ে উঠল শিল্পকলার বিজ্ঞান—প্রযোজনিকতন নয়—শিল্পের গীঠস্থান।

নিউ ইয়র্কেও এই নাটক অভিনীত হয়—সেই অভিনয় হতে শ'র আয় হয় চল্লিশ হাজার পাউণ্ড।

তার পর অভিনীত হ'ল ‘সেভর বারবারা’ এবং ‘দি ডক্টরস ডিলেমা’।

তাঁর লেখনী ছিল তীক্ষ্ণ এবং রসনা ছিল ক্ষুরধার। তিনি ছিলেন অত্যন্ত স্পষ্টবাদী।

১৯১৩ সালে ৮০ বৎসর বয়সে তাঁর জননী পৃথিবী হতে চিরবিদায় গ্রহণ করেন।

আজ পৃথিবী হতে এই শ্রেষ্ঠ প্রতিভার তিরোধান—পৃথিবীর সাহিত্য-জগতের যে ক্ষতি হল তা সহজে পূর্ণ হবার নয়।

# সেইসেইসেই

## নারায়ণ গাম্বাপাধ্যায়



—ষোলো—

কোথায় শিকার, কোথায় কী! অ্যালবার্টের হালচাল ক্রমেই কেমন সন্দেহজনক মনে হচ্ছিল ক্যাক্সর।

একদিক থেকে ভালোই যে হয়েছে—সন্দেহ নেই সে ব্যাপারে। গেমস্‌বার্ডের সন্ধানে বেরিয়ে জমিদারের জলায় ছোটো চারটে ফায়ার করলে শ্রীক কতদূরে যে গড়াত বলা শক্ত। পেটলুনপরা চেহারা আর শাদা বাপের ছেলে—এর অতিরিক্ত কতটুকু মর্যাদা তার আছে কুমার ভৈরব-নারায়ণের কাছে! নিতান্তই সাম্না-সাম্নি গেলে একখানা চেয়ার বসবার জন্তে এগিয়ে দেয়—এই যা। কিন্তু হাঁড়িতে যে তার কতখানি চাল এ আর ভালো করে কে জানে কুমার বাহাদুরের চাইতে?

অ্যালবার্টের বন্দুক ছোটো যেমন তেমনি ঝুলোনোই আছে। না আছে তার হিমালয়ান রেঞ্জ সম্বন্ধে কোনো কৌতূহল, না আছে শিকার সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র উৎসাহ। ক্যাক্স সাহেবের সন্দেহ হয় তার চাইতে বড় কিছু শিকারের সন্ধানে আছে অ্যালবার্ট।

কা সে শিকার? মার্থা হয়তো?

একটা প্রচণ্ড উত্তাপে ক্যাক্সর সমস্ত মগজটা যেন টগবগ করে ফুটে উঠতে চায়। দেশের বুকের ওপর চাবুক চালিয়ে একদিন রেশমের ব্যবসা করেছে পার্সিভ্যাল। সাহেবের সমস্ত প্রলোভনকে উপেক্ষা করে বারা তাঁতে রেশম বুনে প্রতিযোগিতা করতে চেয়েছে, রাতে মশালটী পাঠিয়ে আশুন লাগিয়েছে তাদের ঘরে। খুন-খারাপীও যে ছোটো চারটে করতে হয়নি—নিঃসন্দেহে একথা বলবার মতো জোর নেই আইন্ড ক্যাক্সর।

সে রক্ত তার মধ্যেও আছে। সেই অত্যাচারী, সেই যাকব। দারিদ্র্য আর বংশ-পরিচয়ের লজ্জায় আহত সাপের মতো সে ফণা লুটিয়ে আছে; কিন্তু দরকার মতো প্রাণঘাতী ছোবল দেবার শক্তিও যে রাখে, তার পরিচয়

অন্তত একবার সে দিয়েছেই। সেই চামড়ার মতো নীরেট অন্ধকারের কালো রাতে—

স্মৃতির গলাটা জোর করে চেপে ধরল আইন্ড। কিছুদিন থেকে এই এক ব্যাধি দেখা দিয়েছে তার। বা প্রায় ভুলতে বসেছিল—থেকে থেকে হঠাৎ আলোড়ন লাগা জলের তলা থেকে একরাশ বোলা কাদার মতো তা ওপরে উঠে আসতে চায়। বলা যায় না, এর শেষ কোথায়। শেষ পর্যন্ত একদিন হয়তো সোজা আদালতে গিয়ে দাঁড়াবে—বোবা ধরা গলায় চীৎকার করে বলতে চাইবে, হজুর, বারো বছর আগেকার এক মেয়ে ঢাকা সন্ধ্যায়—

ক্যাক্স অস্থির ভাবে উঠে বারান্দায় পারচারী করতে লাগল।

আশ্চর্য! সে কেউ নয়—সে কোথাও নেই। এই গড়ন্ত বেলার বিষম আলোর বাইরে সে অনধিকারীর মতো ঘুরে বেড়াচ্ছে। আর ঘরের ভেতর আলো-না-জ্বালা ঘন ছায়ার সুযোগে অ্যালবার্ট অত্যন্ত কাছে ঘেঁষে বসেছে মার্থার—গান শোনাচ্ছে তাকে। তবু পিয়ানো-টিয়ানো কিছুই নেই—এই যা রক্ষা।

জলসন, বীং, ক্রস্‌বি—অজুত সব নাম। যেন মায়া-লোকের কতগুলো স্বপ্ন কথা। শুনে শুনে সে বিরক্ত হয়ে উঠে এসেছে। গান তার খুব ভালো লাগে না, ভালোমন্দ বোরবার ক্ষমতাও নেই। সাঁওতালী নাচ দেখেছে, শুনেছে ঝুঝুরের সঙ্গে সঙ্গে মাদলের বাজনা, খুশি হয়েছে আঙের গভীর দেখে, ‘এন্‌কোর এন্‌কোর’ বলে উৎসাহ দিয়েছে ধামালী গানের নথ আদরিলে।

কিন্তু এ এক বিচিত্র জগতের খবর।

“Do you know the man, who came from the moo—oon—”

আবেগভরা গভীর গলায় গান ধরেছে অ্যালবার্ট! মার্থাও সুর মিলিয়েছে তার সঙ্গে। দাঁড়িয়ে পড়ল আইন্ড, মনে হল, মার্থার গলা আশ্চর্যভাবে মিশ খেয়েছে ক্যাক্সর



সঙ্গে, নিখুঁত তান বাঁধা হয়ে গেছে সৰু মোটা তারে। এ দুইয়ের মাঝখানে সে বিক্লিপ্ত। এদের মাঝখানে তার গলা কোথাও মিলবে না, সব কিছুকে বেহরো করে দেবে।

“The man from the moon—”

আলবার্ট? হয়তো তাই। মার্থার এই মাটির পৃথিবীতে যেন কোন্ চন্দ্রলোকের সংবাদ। সেখানে অন্ধকারের ছায়ার মতো ক্যারু আন্তে আন্তে সরে যাচ্ছে না তো?

একটা অনিশ্চয় আশঙ্কায় নিজের হাত কামড়ে ধরতে ইচ্ছে করছে। কিছুই বলা যায় না, বলবার মতো যুক্তিসঙ্গত কারণও নেই কিছু। অতিথি—বন্ধু! কিন্তু এ কেমন অতিথি যে এসে এই সাতদিনের মধ্যেও নড়তে চাইছে না! দিন রাত অস্ত্রের জ্বর সঙ্গে বকর বকর করে কথা কইছে? এই বা কোন্ দেশী বন্ধুদের নমুনা।

নাঃ, এবার আলবার্টের যাওয়া উচিত।

কাল একবার আভাসও দিয়েছিল।

—তোমার তো ছুটি ফুরিয়ে এলো বাটি?

মার্থা শিউরে উঠেছিল শুনে: তাই নাকি? কী সর্বনাশ?

কিন্তু বাটি অভয় দিয়েছিল, না—না, আরো দিন সাতেক হাতে আছে। তা ছাড়া, রিয়্যালি এ জায়গাটা আমার খুব ভালো লাগছে। দরকার হলে আরো এক হপ্পা না হয় বাড়িয়ে নেওয়া যাবে।

আনন্দে মার্থা হাততালি দিয়ে উঠেছিল; বাঃ, কী চমৎকার হবে তাহলে!

চমৎকার! ক্যারুর ইচ্ছে হয়েছিল একসঙ্গে দু হাতে দুটো ঘুবি ছুঁড়ে দেয়—আলবার্ট আর মার্থার মুখের ওপর। কিন্তু তবু সে প্রাণপণে আনন্দের একটা করুণ হাসি ফুটিয়ে তুলেছিল ঠোঁটের আগার: হাঁ, খুব চমৎকার হবে।

—আরো এক, সপ্তাহ! তাবতেও আমার আনন্দ হচ্ছে।

আনন্দ হচ্ছে! তাই বটে। আনন্দ হওয়ার কথাই। অ-দেখা গোল্ডার্স গ্রীণের বাতাস নিজের চারদিকে বয়ে এনেছে আলবার্ট, স্বপ্নের দেশ ইংলণ্ডের স্পর্শ করে পড়ছে তার নিখাসে নিখাসে। কিন্তু—কিন্তু! আরো এক

সপ্তাহ! আবার একটা খুন করতে হবে নাকি আইদ ক্যারুকে?

তবু শেষ চেষ্টা।

—আর দু তিন দিনের মধ্যেই খুব বর্ষা নামবে এদিকে।

আলবার্ট কোতুলী হয়ে উঠেছিল: রিয়্যালি?

—হাঁ, চারদিকে সমুদ্রের মতো জল দাঁড়াবে। এদিক ওদিক দেখতে পাওয়া যাবে না।

—বাঃ—এক্সপেন্স! সে তো দেখবার মতো জিনিস। ক্যারু নিজের ঠোঁট কামড়ে ধরেছিল।

—তখন নৌকায় করে পাড়ি দিতে হবে। তাতে প্রায়ই অ্যাক্সিডেন্ট হয়—মানে নৌকো ডুবে যায়।

—ফাইন!—আনন্দে আলবার্টের চোখ চক চক করে উঠেছিল: আমার সাতরাতে খুব ভালো লাগে। একবার আমি আধা-আধি চ্যানেল সাতরে গিয়েছিলাম।

—চ্যানেল? ইংলিশ চ্যানেল? তার অর্ধেক সাতরে গিয়েছিলে?—শ্রদ্ধায় বিষয়ে মার্থা চোখ বিস্ফারিত করেছিল।

অসহায় ক্রোধে পকেটে হাত দিয়েছিল জু সাহেব। তার পরেই আলবার্টের সামনে বিড়ি বার করলে পদ্ম-মর্যাদা থাকবেনা মনে করে, আঙুলের ডগায় গুঁড়ো গুঁড়ো করে ভেঙেছিল সেটাকে। মনে হয়েছিল ওটা বিড়ি না হয়ে মার্থার মাথাটা হলেই সে খুশি হত।

শেষ চেষ্টায় আইদ বলেছিল, তখন কিন্তু খুব সাপের উপদ্রব হয়।

—সাপ? রিয়্যালি?—আলবার্টের কোতুল ফেন অনন্ত: I am very much interested in Bengal snakes—

এর পরে বলা যেত মাত্র একটি কথা। বেরোও—বেরোও আমার বাড়ি থেকে। কিন্তু বলা কি অতই সহজ এখন? নিজেই নিজের গর্ত খুঁড়েছে। লর্ড বংশের ছেলে। ব্রেটন ক্রকশায়ার। নর্থ এলিটার অক্সফোর্ড। ক্যারুর কালো হাতের পাশে একখানা তুবার গুজ্র হাত—সে হাতে হীরের আংটি। ক্যারু উঠে দাঁড়িয়েছিল। অন্তত আর একটা চেষ্টা করা বাক। কিছুক্ষণের জন্যে অন্তত দুই সরিয়ে নেওয়া বাক মার্থার কাছ থেকে।

—চলো বাটি, একটু বেড়িয়ে আসা বাক।

—ওঃ, গ্যাডলি—অ্যালবার্ট উঠে দাঁড়াতে বাচ্ছিল,  
কিন্তু মার্খাই বাধা দিয়ে বসল।

—না, বাৰ্ট, তুমি আর একটু বোসো। বাওনা আইদ,  
তুমিই একটু ঘুরে এসো বরং। দিনরাত ঘরে বসে থেকে  
তোমাকেই কেমন ক্লান্ত লাগছে। তোমার একটু  
বেড়ানো দরকার।

বেড়ানো দরকার! দরদ কত! এতক্ষণ পরে আর  
সহ হয়নি তু সাহেবের। বারুদ-ঠাসা হাউইয়ে যেন শেষ  
আগুনের ছোয়া লেগেছে—দুর্ভিসহ ক্রোধে ছিটকে বেরিয়ে  
চলে গেছে আইদ।

বারান্দায় পায়চারী করতে করতে ক্যারু নিজের ডান  
হাতটা মুঠো করে ধরল।

দোষ তার নিজেরও আছে বই কি। তুলনা করে  
দেখলে মার্খার পাশে তাকে বিউটি এ্যাণ্ড দি বিস্ট্ ছাড়া  
কী বলা যায় আর? মিশনারী বাপের মেয়ে মার্খা, উচ্চ-  
শিক্ষিত রেভারেন্ড বিশ্বাস মেয়েকে পাশ করিয়েছিলেন  
জুনিয়ার কেথ্রিজ পর্যন্ত। আর সে?

সে তবুও তো স্বামী। তবুও তো জ্বরী ওপর তার  
আইনগত অধিকার। এতদিন সেই অধিকারের দাবীতে  
নিশ্চিন্ত হয়েছিল বলেই মার্খার কোনো কটু মন্তব্য, তার  
দারিদ্র্যের ওপর কটাক্ষ—কোনোটাই তার দুঃসহ বলে  
মনে হয়নি। অ্যালবার্ট আসবার পরেও মার্খা যদি তার  
সঙ্গে অগড়া করত, স্বভাবসিদ্ধ প্রথর ভাবায় গালিগালাজ  
করত, তা হলে মনে হত সব ঠিক আছে। চলছে নিয়ম  
মতোই—কোথাও ব্যতিক্রম হয়নি, ছন্দোপতন ঘটেনি  
কোনোখানে। কিন্তু আজ—

মার্খা আর অগড়া করেনা। অভিযোগ করতে  
ভুলে গেছে।

অবচেতনভাবে কী একটা যেন বুঝতে পারে ক্যারু।  
মনে হয় : এর চাইতে মার্খা যদি মুখর হয়ে উঠত,  
ঢের বাহনীর হত সেটা। অন্তত তু সাহেব বুঝতে পারত,  
তার সম্পর্কে একটা সজাগ চেতনা আছে মার্খার মনে।  
আর এই অত্যন্ত নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটছে। ভয় হয়ে  
গেছে মার্খা—সংঘত হয়ে উঠছে—মার্খার রগনা যেন  
সদয় হয়ে উঠছে তার ওপর। মন থেকে সরে যাচ্ছে  
বলেই কি ভূমিকা তৈরী করছে সৌজন্নের?

“On the silvery green—the man came  
down from the moon—”

সন্ধ্যা নামল। রাত্রির ছায়া পড়ল। আচক্রবাল  
মাঠের ওপর—শুধু রক্তের একটুখানি ক্রিকে রঙ, লেগে  
রইল তিন-পাহাড়ের কৃষ্ণ শুকতার। একদল বকের পাখার  
কীপ ধ্বনি মিলিয়ে এল ভাল-দিগন্তের ওপারে।

ঘরে আলো জলেছে। গানটা ধামল এতক্ষণে।  
হাসির কলধ্বনি উঠল একটা। জুতোর শব্দ পাওয়া গেল  
—হয়তো ওরা বাইরে বেরিয়ে আসছে।

এই মুহূর্তে ওদের সঙ্গে মুখোমুখি হয়ে গেলে নিজেকে  
সংঘত রাখা যাবে কিনা সন্দেহ। কী বলতে কী যে বলে  
বসবে নিজেই জানেনা। তার চাইতে নিজের কালো  
মনটা নিয়ে একটু সরে দাঁড়ানোই ভালো।

সামনের খোলা দরজা দিয়ে এদিকের অন্ধকার ঘরটার  
এসে ঢুকল ক্যারু।

কতগুলো ভাঙা জিনিসপত্র, একটা ছেঁড়া ক্যাম্প খাট।  
অন্ধকারের মধ্যে সেই ক্যাম্প খাটটাতেই রূপ করে বসে  
পড়ল আইদ।

বাইরে থেকে অ্যালবার্টের গলার আওয়াজ এল।

—আইদ তো এতক্ষণ এইখানেই ছিল।

মার্খা জবাব দিলে, তাই তো মনে হচ্ছিল।

—গেল কোথায় তা হলে?

—তাই তো!—মার্খা ডাকল : আইদ—আইদ!

তু সাহেব সাড়া দিলনা। ঠিক ইচ্ছে করেও নয়—  
সাড়া দেবার কোনো প্রয়োজন আছে বলেই যেন মনে  
হলনা তার। এত সৌজন্য, অ্যালবার্টের সামনে স্বামীর  
সম্পর্কে একটুখানি তজ্জতা বাঁচিয়ে রাখা মাত্র। কিন্তু  
সাড়া দিয়ে সে যদি সামনে গিয়েই দাঁড়াত, তা হলেই কি  
সত্যি সত্যি খুশি হতো ওরা? না—হতনা। আইদ  
ক্যারু স্পষ্ট বুঝেছে—the man from the moon আজ  
ঘুম ভাঙিয়েছে রাজকন্ডার; কোনো বীপ-দুর্গের টাওয়ারে  
বন্দিনীর জানালা দিয়ে এনেছে মুক্তির সংবাদ। সেখানে  
একটা দৈত্যের মতোই সে অনভিপ্রেত অনধিকারী।

মনে হল, মার্খা যেন এদিক ওদিক তাকিয়ে তাকে  
খুঁজে নিলে খানিকটা। তারপরে মন্তব্য করলে, কোথাও  
বেরিয়ে গেছে হয়তো। ও ওই রকম।

আলবার্ট বললে, পুয়ের চ্যাপ্।

—পুয়ের নয়, ইডিরট।—মার্থার মন্তব্য শোনা  
গেল আবার।

—ইডিরট? তা সত্যি।—বোঝা গেল, মার্থার  
সিফার্ডের সঙ্গে তার সম্বন্ধ আছে। তবু বন্ধুত্বের ষণ্টা  
একেবারে অস্বীকার করতে পারলনা আলবার্ট : হি  
ইজ্ এ ওল্ড সোল।

অন্ধকারের মধ্যে হুহাতে নিজের হাঁটু ছুটো চেপে  
ধরল জু সাহেব। কোথা থেকে দু তিনটে আরশোলা  
পড়ল গায়ের ওপর, পারের গোড়ায় ঝড়ঝড়ি দিয়ে গেল  
খুব সম্ভব একটা নেংটি ইঁহর। কিন্তু স্থির হয়ে বসে  
রইল সে। নিজেকে সম্পূর্ণ সজাগ করে—পরিপূর্ণভাবে  
উৎকর্ষ হয়ে প্রতিটি কথা সে শুনে যেতে লাগল।

মার্থা বললে, এসো, বসা যাক্।

চোরার সরাবার শব্দ এল। ওরা বসেছে তা হলে।

—তুমি কবে হোমে যাচ্ছ?—মার্থার প্রশ্ন।

—খুব সম্ভব আসছে মাসেই। ক্রকশায়ার হল থেকে  
কাকার চিঠি পেয়েছি। কী দরকারী কাজে ডেকে  
পাঠিয়েছেন।

—কাকা বুঝি তোমাকে খুব ভালোবাসেন?

—ওঃ, হি ইজ্ এ গ্র্যাণ্ড্ ওল্ড চ্যাপ। ভেরি  
জলী ম্যান। একবার চলোইনা আমাদের ওখানে।

—আমি?—মার্থার দীর্ঘশ্বাস শুনে পাওয়া গেল।

—কেন, আপত্তি কী?

—মিথ্যে ওসব বলে কেন কষ্ট দিচ্ছ বাটি? জানোই  
তো আমার অবস্থা।

—এ ভারী অস্ত্রায়!—আলবার্টের গলায় অহুযোগের  
স্বর : এখানে তোমার এভাবে নিজেকে নষ্ট করার  
কোনো মানে হয় না।

—কী করব তবে?

—You should see the other side of life also!

—আলবার্টের গলায় শব্দতানের প্রলুপ্তস্বর বেজে  
উঠল। নির্জন বারান্দার নিভৃতিতে মার্থার সান্নিধ্য তাকে  
চকল করে তুলছে।

পায়ের কাছে একটা নয়—গোটা তিনেক নেংটি  
ইঁহর ঘুর ঘুর করছে। স্ববোগ পেয়ে একদল মশা

চক্রাকারে কিরে ধরেছে তাকে। পাখর হয়ে, রসে রইল  
জু সাহেব।

—কিন্তু কী আমার আছে?—একটা কান্না-ভরা  
আকুলতা বেজে উঠল মার্থার গলায় : এই জীবনই আমার  
ভালো। এখানেই তিলে তিলে আমার মরতে হবে!

—ইম্পসিবল! কিছুতেই তা হতে পারে না!—  
আলবার্টের কণ্ঠে পুরুষের প্রতিশ্রুতি।

—কী করে আমি বাব? কী আমার যোগ্যতা?  
মার্থা কি কঁাদছে? আইড্ ক্যাক্ ভাবতে চেষ্টা করল।  
মার্থা কখনো কি কঁাদতে পারে? কেঁদেছে কি কোনো  
দিন? ক্যাক্ মনে করতে পারল না।

—আমার দিকে তাকাও মার্থা!—নিম্ন বিষন্ন স্বর  
আলবার্টের : চোখ তোলো।

—না—না।

—তাকাও, ভালো করে তাকাও। তোমাকে দেখি।

—কী দেখবার আছে আমার?

—তোমার চোখ। ব্র্যাক আইজ্। কালো চোখ  
দেখলে I feel so dreamy! মনে হয় ওই চোখের  
মধ্যে আমি ডুবে যাচ্ছি।

—বাটি, প্রীজ—বোলোনা অমন করে। আমি সহিতে  
পারছি না।

—তুমি নিজেকে জানোনা মার্থা। নিজের দিকে  
কখনো তাকিয়ে দেখোনি। জানোনা, তুমি কত সুন্দর!

—মিথ্যে। আমি কালো—আমি আগ্‌লি।

—কালো হলেই কি আগ্‌লি হয়? তুমি বাংলা  
দেশের সবুজ মাটির সৌন্দর্য। আই লাভ বেঙ্গল।  
বাংলা দেশের মেয়েদের আমার ভালো লাগে। একটা  
আশ্চর্য ছন্দ আছে তাদের। মনে হয়, গিরিক্ কবিতা।  
সেই কবিতা আমি তোমার মধ্যেও দেখেছি।

—বাটি, তুমি লর্ড বংশের ছেলে। কত তোমার  
সন্মান, কত তোমার মর্যাদা। সেখানে কে  
আমি? বাটি, ভগবানের দোহাই—তুমি আমার ওসব  
বোলোনা।

—মার্থা!

—না।

—মার্থা, শোনো।

—না—না—মার্থা এবার সত্যিই কঁাদছে।

সিমেন্টে জমানো কংক্রিটের মতো জমে গেছে ক্যারর সমস্ত পেশীগুলো। তরু হয়ে গেছে বোধস্ত্রিয়। এও ছিল মার্থার মধ্যে। ছিল চোখের জল—ছিল স্বপ্ন—ছিল এমন দুর্বলতা। কোোনোদিন সে-জগতের সন্ধান পায়নি জু সাহেব, কোোনোদিন পা বাড়াবার সুযোগ পায়নি মার্থার অন্তর-রাজ্যের এই বিচিঞ্জলোকে। যদি বিশ বছর আগেকার গোল্ডার্স গ্রীণের স্বপ্ন-মরীচিকা এমন করে তার ভেঙে না যেত, তা হলে—তা হলে কী যে ঘটতে পারত, কে বলতে পারে সে কথা!

—মার্থা, মাই লাভ—

—ও বাট—

—মাই ডার্লিং—

প্রেমের মতো যেন কবর ফুঁড়ে অভিশপ্ত ক্যারর উদের সম্মুখে এসে দাঁড়ালো। অ্যালবার্টের বাহুবন্ধনে এখনো মার্থা নিবিড়ভাবে বাঁধা, তখনো ওদের ওষ্ঠাধর এক সঙ্গে মিলিত।

নিঃশব্দে তিনজন দাঁড়িয়ে রইল কিছুক্ষণ—কিন্তু কী করতে পারত, কী করতে পারত জু সাহেব? আক্রমণ নয়, গালাগালি নয়, বিশ্বাসঘাতক বন্ধু আর অবিশ্বাসিনী স্ত্রীর প্রতি একটা কটু মন্তব্যও নয়। এ হবেই—এ অবধারিত—একথা তার চেয়ে কে আর বেশি ভালো করে জানে!

The man from the moon! ছায়ার লজ্জায় গাণনিই ছিটকে পড়ল—স্বাইন্স ক্যারর—যেমন করে একবার ফেঁড়ে গিয়েছিল একটা অব্যাহত বোড়ার পিঠ থেকে।

কিছুই বলল না, একটা অব্যক্ত ধ্বনি পর্বত উচ্চারণ করিল না। তারপর যেন কী একটা অত্যন্ত দরকারী কাজের কথা মনে পড়েছে, এমনি ভাবে অভিশপ্ত ক্ষিপ্রগতিতে নেমে গেল বাইরের অন্ধকারে।

বাড়ি ফিরল পরদিন বেলা নটায়।

উদ্ভাস রাত কাটিয়ে ফিরেছে নীচ-জাতের একটা নষ্ট মেয়ের ঘরে। তাড়ি গিলেছে কয়েক ভাঁড়। তারপর নেশায় জড়ানো চোখে টলতে টলতে ঘরে এসেছে। পাঁচ সাত বছর আগে মার্থার শাসনে এই অমূল্যবাহীতা মেয়েটার সংস্রব সে কাটিয়ে ছিল, আজ আবার নতুন করে ঝালিয়ে নিতে হল।

জানত—এ হবেই সে জানত। বিস্মিত হল না—ব্যথাও পেল না। কালো মায়ের কালো ছেলে। পার্সিভ্যাল্ তাকে সব কিছু থেকে বঞ্চিত করেছে—সম্মান থেকে, মর্যাদা থেকে; তারই সগোত্র আর একজন শাদা মানুষ মার্থাকেও নিয়ে গেল।

অভিযোগ কাউকে করতে হলে—নিজেকেই; কারো গলা যদি টিপে ধরতেই হয়, তবে তা নিজেরই মাথের।

বেতের চেয়ারটার ওপর রূপ করে শুয়ে পড়ল ক্যারর। টেবিলের ওপর নীল কাগজে লেখা একটা চিঠি চাপা দেওয়া—মার্থা তাকেই লিখে রেখে গেছে। অভ্যাস বসে তুলে নিলে ক্যারর, তারপরেই মনে হল—কী হবে পড়ে? টুকরো টুকরো করে কাগজটাকে ছিঁড়ে জানলা গলিয়ে ছুঁড়ে দিলে বাইরে।

(ক্রমশঃ)

## বার্ণার্ড শ'

### শ্রীবেণু গঙ্গোপাধ্যায়

হরিগণ অগ্রগণ্য, বয়োবৃদ্ধ ঋষি নাট্যকার  
জীবন-নাট্যের তব আজ কি গো হল অবসান?  
এলেছ মানব হয়ে, গেলে অভিমানবের বেশে  
চির সত্যে প্রতিষ্ঠিতা আপনায় মুহূর্তীন প্রাণ।

সুরধার লেখনীতে মধু ছিল মেশানেশি।  
রাজকর, লোকনিষ্ঠ, তুচ্ছ করি তোমার এষণ।

অবধানী দৃষ্টি দিয়ে গৃঢ় তত্ত্ব করেছে প্রকাশ।  
অকাতরে বিলায়েছে মুষ্টি মুষ্টি ভাব স্বর্ণ-কণা।

বিলাস করেনি স্পর্শ, সম্পদ মিল না মলিনতা।  
প্রতিষ্ঠা স্বাক্ষর রাখে শাস্ত্রের পটভূমিকায়।  
মনের ধ্বাতি তব অরাজক হয় নাই কত।  
বর্ণাঢ্য তুলিকা দিয়ে সনাতন ছবি এঁকে যায়।

তোমার বিচিঞ্জলি, ওগো সত্য-পথ-সারথিক।

তোমার জীবন ধারা বহে নাই গভীর জগতিক।

## কুমুদশঙ্কর রায়

ত্রিবিজয়রত্ন মজুমদার

হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ হৃদয়বান মানুষ বলিতে যে দুই দশ জন মাত্র লোকের পরিচয় পাওয়া যায়, সত্য: পরলোক-প্রাপ্ত কুমুদশঙ্কর ছিলেন তাদেরই একজন। যাদবপুর যক্ষ্মা আরোগ্য নিকেতন যশস্বী বিধানচন্দ্র রায় মহাশয়ের সৃষ্টি এবং তাঁহার অবিদ্যমান কীর্তি বটে, কিন্তু কুমুদশঙ্কর রায়ই মৃত্যুকণ পর্যন্ত প্রতিষ্ঠানটিকে বক্ষে ধারণ করিয়া অপরিণীত যত্নে, মাতৃসম স্নেহে লালন পালন করিয়াছেন।



কুমুদশঙ্কর রায়

যাদবপুরের হাসপাতালটির উপর ডাক্তার কুমুদশঙ্করের মমতা এতই নিবিড় ও ঘনীভূত ছিল যে, তিনি তাঁহার একমাত্র পুত্র করুণশঙ্করকে বিলাতে রাখিয়া যক্ষ্মারোগ চিকিৎসায় পারদর্শী করিয়া যাদবপুরেই সংযুক্ত করিয়া দিয়াছিলেন। একমাত্র পুত্র কাল ব্যাধি যক্ষ্মায় ডুবিয়া থাকে সে ইচ্ছা জননীর অদৌ ছিল না এবং বিধিযত বিরুদ্ধতা ও প্রাণ প্রতিবন্ধকতা করিয়াও স্বামীকে নিরন্তর করিতে তিনি পারেন নাই। হতভাগ্য প্রভাস ঘোষের

শেষ নিঃশ্বাসের উপর বিধানচন্দ্র যেদিন এই আরোগ্য নিকেতনের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, দ্বীচিদশম প্রভাসের ক্ষীণ দেহান্ত্রের উপর একখানির পর একখানি করিয়া ইষ্টক গ্রথিত করিয়াছিলেন—শিশু, যুৱক, যৌৱণ্মদ প্রভাসের অন্তিম বাসনাকে রূপান্তরিত করিতে ভিক্ষাপাত্র হস্তে অহর্নিশি দ্বার হইতে দ্বারান্তরে পরিভ্রমণ করিয়া ছিলেন—একান্ত ও অক্লান্ত শ্রম যত্নে বেসরকারী আরোগ্যশালায় আদর্শ প্রতীকানের রূপ দানে তম-মন-ধন উৎসর্গ করিয়াছিলেন, সেই দিন, সেই ক্ষণ হইতে ডাক্তার কুমুদশঙ্কর কায়ার সহিত ছায়ার মত বিরাটবটবৃক্ষসদৃশ বিধান ভায়ের পার্শ্বে সন্নিবিষ্ট ছিলেন। কলিকাতা সহরের সাধারণ মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলে প্রভাস বিলাতে ডাক্তারী পড়িতে গিয়া যক্ষ্মাক্রান্ত হইয়া দেশে ফিরিয়া আসে। বাচিবে না, জীবনের আশা নাই তথাপি বিলাতে স্মৃচিকিৎসার ব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও প্রভাস ভরসা পায় নাই; কিন্তু যদি মরিতে হয়, দেশের বায়ুতে শেষ নিঃশ্বাস ফেলিবার অদম্য আগ্রহেই স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করে। মৃত্যুকালে সামান্য কয়েক শত টাকা গুরু হস্তে দান করিয়া প্রভাস একটিমাত্র ‘অমরোথ’ করিয়াছিল; বলিয়াছিল, “আমার এই অর্থে যদি একটি যক্ষ্মারোগীর যন্ত্রণার লাঘব করিতে পারেন, তাহা হইলে পরলোকে গিয়াও আমি শান্তি পাইব।” প্রভাসের গুরুদেব—বিধানবাবু তাহার শেষ কামনা পূর্ণ করিয়াছেন। আয়ু কেহই দিতে পারে না; যম যাহাকে আহ্বান দিয়াছে, তাহাকে ধরিয় রাখিবার সাধ্য কাহারও নাই; যাদবপুর যক্ষ্মারোগীদে জীবন দিতে পারিয়াছে কিনা জানি না, তবে চিকিৎসা যাহা সম্ভব—যন্ত্রণার লাঘব এবং রোগ উপশম করিয়া নিরাশার ঘনাকারে আলোকরশ্মি বিকীরণ করিয়াছে হয়ত প্রভাসের অশান্ত আত্মা কথঞ্চিৎ শান্তিও পাইয়াছে প্রভাসের কালে যক্ষ্মাচিকিৎসা-বিজ্ঞান আজিকার মত উৎকর্ষ লাভ করে নাই, বড় কষ্ট, বড় যন্ত্রণা ঘোঁ করিয়াই প্রভাস চির বিদায় লভিয়াছিল। আজ বহু বর্ষ রোগীকে আরোগ্য লভিতে দেখিয়াও তাহার আত্মা পর সন্তোষ লাভ করিতেছে ইহা অনুভব করিতে পারি। কুমুদশঙ্করও চিরদিন যক্ষ্মারোগীর সেবা করিয়া মৃত্যুকালে পুত্রের সেই যক্ষ্মাক্রান্ত অভাগাদিগের সেবাস্তেই নিয়োজিত করি গেলেন। কুমুদের আত্মাও কি পরলোকে শান্তি লভিবে না

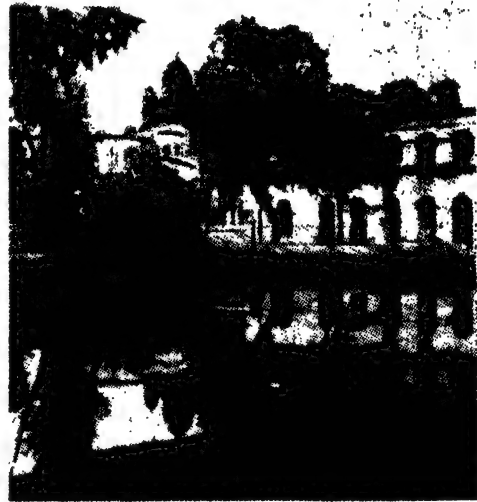


## কলিকাতার ট্যাক্স বৃদ্ধির প্রতিবাদ—

সম্প্রতি বালীগঞ্জে শ্রীযুত বিজয়বল্লভ মজুমদার মহাশয়ের সভাপতিত্বে এক জনসভায় কলিকাতা কর্পোরেশন কর্তৃক অত্যধিক ট্যাক্স বৃদ্ধির প্রতিবাদ করা হইয়াছে। গত কয় বৎসর ধরিয়া কলিকাতা কর্পোরেশন আর জন-প্রতিনিধি দ্বারা পরিচালিত নাই—উহা সরকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক চালিত হইতেছে। এ অবস্থায় ট্যাক্স বৃদ্ধির ব্যবস্থা বাগাতে আপাততঃ স্থগিত রাখিয়া নতুন নির্বাচিত কমিশনার দ্বারা গঠিত কর্পোরেশন কর্তৃক বহাল হয়, সে জন্ত সভায় প্রস্তাব গৃহীত হয়। কলিকাতা বাংলার কেন্দ্র—পশ্চিম বাংলার অধিকাংশ ট্যাক্স কলিকাতা হইতেই সংগৃহীত হয়—পশ্চিম বাংলায় যে ৬৫ কোটি টাকা আয়কর পাওয়া যায়, তাহার ৬০ কোটি টাকা শুধু কলিকাতা সহরের অধিবাসীরাই প্রদান করে। বিক্রয় করের সাড়ে ৪ কোটি টাকার মধ্যে সাড়ে তিন কোটি কলিকাতা সহরেই পাওয়া যায়। পশ্চিম বাংলার বিজলী-কর প্রায় ১ কোটি টাকা, আমোদ কর ১ কোটি টাকা, জুয়াখেলার কর ১ কোটি টাকা—সবই কলিকাতা সহরের অধিবাসীরা দিয়া থাকে। এই সকল কথা বলিয়া সভাপতি মহাশয় পশ্চিমবঙ্গ ব্যবস্থা পরিষদে কলিকাতা হইতে অধিকসংখ্যক প্রতিনিধি গ্রহণের দাবী জানাইয়াছেন। গত মহাযুদ্ধের সময় সাময়িক গাড়ী লোচলে জন্ত কলিকাতার রাস্তাসমূহের যে ক্ষতি হইয়াছিল, সেই ক্ষতিপূরণ বাবদ ৭০ লক্ষ টাকা কর্পোরেশন এখনও কেন্দ্রীয় গভর্ণমেন্টের নিকট আদায় করিতে পারেন নাই। যে ভাবে কলিকাতা কর্পোরেশন ট্যাক্স বৃদ্ধি করিয়াছেন, তাহারও কোন ফল নাই। যুদ্ধের পর যে অস্বাভাবিক ব্যবস্থা চলিতেছে, তাহাতে কর বৃদ্ধি ব্যবস্থা বলবৎ হইলে শহরবাসী নানা ভাবে বিপন্ন হইবে—এই কথাগুলি সভায় বিভিন্ন বক্তা বিবৃত করিয়াছিলেন। বর্তমান ট্যাক্স বৃদ্ধি ব্যবস্থা রদ করিবার জন্ত পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করা যে প্রয়োজন, সে কথা প্রত্যেক শহরবাসীই আজ প্রকাশ করিতেছেন।

## দক্ষিণেশ্বরে রামকৃষ্ণ মঠাধীন বাতী নিবাস—

দক্ষিণেশ্বরে রামকৃষ্ণ মহামণ্ডল গত কয়েক বৎসর ধরিয়া শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের শিক্ষাপ্রচারের জন্ত নানা ভাবে চেষ্টা করিতেছেন। সম্প্রতি তাঁহারা কালী-বাড়ীর দক্ষিণ পাশে ও বালী পুলের উত্তরে গঙ্গাতীরে একটি সুবৃহৎ বাড়ী ও পুকুরসহ তিন বিঘা ভূমী রেল-কর্তৃপক্ষের নিকট ৫২ হাজার টাকায় ক্রয় করিয়াছেন। তথায় অস্ত্রান্ত কার্যের সহিত আন্তর্জাতিক বাতী-নিবাস প্রতিষ্ঠা করা হইবে। বাড়ীটি পূর্বে স্বর্গত যত্ননাথ মল্লিকের ছিল—বালা-



দক্ষিণেশ্বরে রামকৃষ্ণ বাতীনিবাস

পুল নির্মাণের সময় উহা রেল কর্তৃপক্ষ ক্রয় করিয়াছিলেন। ভারতের ভূতপূর্ব গভর্ণর জেনারেল শ্রীচক্রবর্তী রাজা-গোপালাচারী মহাশয়ের চেষ্টায় উহা এক্ষণে রামকৃষ্ণ মহামণ্ডলের হস্তগত হইয়াছে। এই কার্যে মহামণ্ডলের পক্ষ হইতে পশ্চিমবঙ্গের রাজস্ব বিভাগের শ্রীসত্যেন্দ্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় আই-সি-এস, কলিকাতা পুলিশের শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, হাওড়া মোটর কোম্পানীর শ্রীশ্রীলকুমার দে ও দক্ষিণেশ্বরের শ্রীশ্রীলকুমার মুখোপাধ্যায়



বে অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়াছেন, তজ্জন্ত তাঁহার দেশবাসী সকলের প্রশংসার পাত্র।

### কবি কুমুদরঞ্জন সম্বন্ধে—

বর্ধমানের সাহিত্যিক সংস্থা রবিবাসরের উদ্যোগে গত ৮ই অক্টোবর সকালে বর্ধমান টাউন হলে বর্ধমান জেলার কোগ্রামনিবাসী প্রবীণ কবি শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক মহাশয়ের জন্মোৎসব সমারোহের সহিত সম্পাদিত হইয়াছে। ঐ উৎসবে শ্রীবৃন্ত তারশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় সভাপতিত্ব করেন ও শ্রীবৃন্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন। শ্রীমনোজ বসু ও

মাজেরই কৃতজ্ঞতার পাত্র। আমরা এই উপলক্ষে কবির শান্তিময় সুদীর্ঘ জীবন কামনা করি।

### আসামে নির্বাচন ব্যবস্থা—

আসাম প্রদেশ হইতে প্রাদেশিক ব্যবস্থা পরিষদের ১০৮ জন সদস্য ও কেন্দ্রীয় পরিষদের ১২ জন সদস্য নির্বাচিত হইবে। আগামী ৪ঠা এপ্রিল আসামের সর্বত্র ঐ নির্বাচনের ভোট গ্রহণ করা হইবে বলিয়া স্থির হইয়াছে। মোট ৪১ লক্ষ ভোটদাতা স্থির হইয়াছেন, তন্মধ্যে ১২ লক্ষ মহিলা। প্রাদেশিক ব্যবস্থা পরিষদের ১০৮ জন সদস্যের মধ্যে ৩২ জন পার্বত্য জেলার ও অল্পসংখ্যক সম্প্রদায়ের লোক



বর্ধমানে কবি কুমুদরঞ্জন মল্লিকের সম্বন্ধে—কবির দুই পার্শ্বে শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ, কলীপ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, তারশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়,

মনোজ বসু প্রমুখ বিশিষ্ট সাহিত্যিকগণকে দেখা বাইতেছে

শ্রীকলীপ্রনাথ মুখোপাধ্যায় উৎসবে যোগদান করিয়া ছিলেন। উৎসব উপলক্ষে কবিকে মান-পত্র এবং রোপ্য সমিতি লেখনী ও মস্যাধার উপহার দেওয়া হয়। কবি সারা জীবন গ্রামে বাস করিলেও তাঁহার কাব্যপ্রতিভা সমগ্র দেশকে সমৃদ্ধ করিয়াছে। পরিশ্রম বয়সে কবির এই সম্বন্ধে দেশবাসীর কাব্য-শ্রীতির পরিচায়ক সন্দেহ নাই। বর্ধমানের বে সকল অধিবাসীর চেষ্টায় এই উৎসব সাক্ষ্যমণ্ডিত হইয়াছে, তাহার বাঙ্গালার সাহিত্যিক

থাকিবেন। ভারত রাষ্ট্রে আসামই সর্বপ্রথম নির্বাচনে দিন স্থির করিয়াছেন—এখন অক্লান্ত সকল প্রদেশে পালা আসিবে।

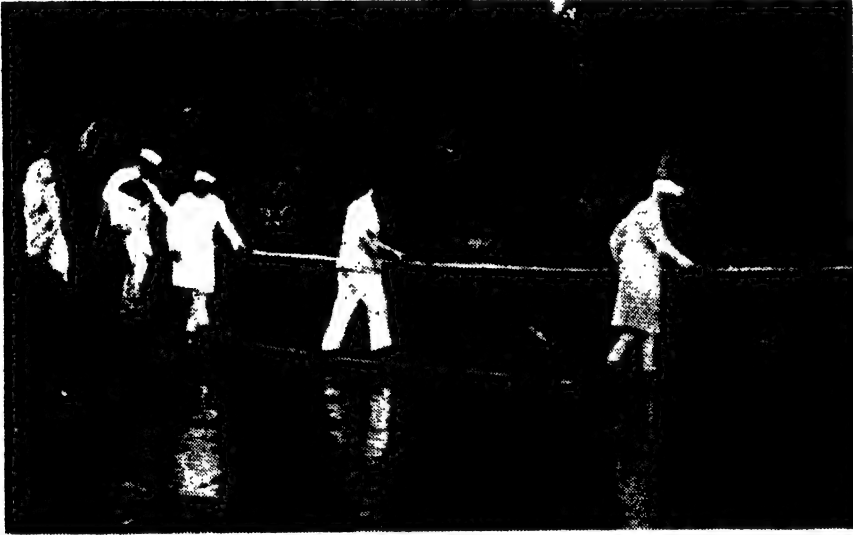
### শ্রীবিপিনবিহারী গাঙ্গুলী—

গত ৫ই নভেম্বর রবিবার খ্যাতনামা দেশনারক ব্যবস্থা পরিষদের সদস্য শ্রীবৃন্ত বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী মহাশয়ে বয়স ৬৪ বৎসর হওয়ার তাঁহার জন্মদিবসে কলিকাতা ভারত-সভা হলে প্রবর্তক সংঘের সভাপতি শ্রীমতিলাল রা

বহাশয়ের সভাপতিত্বে এক সভায় দেশবাসীর পক্ষ হইতে তাঁহাকে মানপত্র প্রদান করা হইয়াছে। ৪০ বৎসরেরও অধিক কাল ধরিয়া বিগিনবাবু যে ভাবে দেশসেবা করিতেছেন, তাহা দেশবাসী সকলের অমুকরণযোগ্য। তিনি আত্মবল দারিদ্র্য, নির্ধ্যাতন ও দুঃখকষ্টের মধ্য দিয়া কাটাইয়াছেন। আজও তাঁহার অসামান্য কর্মনিষ্ঠা ও শক্তি যে কোন বৃককে বিস্তৃত করিয়া থাকে। আমরা তাঁহার স্মরণীয়, কর্মময় জীবন কামনা করি। ঐ দিন তাঁহাকে একটি ৫ হাজার টাকার তোড়া উপহার দেওয়া হইয়াছে।

বৃকগণের উত্তমের প্রশংসা করি ও আশা করি এই চেষ্ঠা দেশবাসীর প্রকৃত উপকার করিতে সমর্থ হইবে।  
শ্রদ্ধাভাষ্যে বিভূতি বন্দ্যোপাধ্যায়

খ্যাতনামা কথাসাহিত্যিক বিভূতিভূষণ গুপ্ত ১লা নভেম্বর বৃহস্পতি রাত্রি ৮টার সময় ৫৪ বৎসর তাঁহার ঘা-বাংলা (বাংলা-আর) বাসভবনে সহসা পরলোক গমন করিয়াছেন। ৪ দিন পূর্বে সভা হইতে ফিরিবার পথে তিনি অসুস্থ হইয়া তাহার স্ত্রী, একটি ৩ বৎসরের পুত্র ও কনিষ্ঠ ভ্রাতা বর্ডম ১৩০০ সালের ৩০শে ভাদ্র ২৪পরগণার সুরতিপুরে



আমাদের ভূকম্প-বিধ্বস্ত অঞ্চল পরিদর্শনে গিয়া সদলবলে পণ্ডিত জহরলালকে একটি অস্থায়ী বাসের সঁকো অতিক্রম করিতে দেখা যাইজে পূর্বে একটি সম্ভবত লোহার পুলই এখানে ছিল। পণ্ডিতজীর সেক্রেটারী এই অস্থায়ী সঁকো অতিক্রম কালে জলে পড়িয়া যান। কটো—তারক

### ১ম ও টেকনোলজি—

আমেরিকা ২৫১ ওয়েস্ট ৯৯ স্ট্রীট, নিউইয়র্ক-২৫ হইতে একজন বাঙালী ‘বিজ্ঞান ও টেকনোলজি’ নাম দিয়া একখানি বাংলা ভাষার মাসিক পত্র প্রকাশ করিতেছেন। উহা বহু জ্ঞাতব্য তথ্যে পূর্ণ থাকে। গত জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা সম্প্রতি আমাদের হাতে আসিয়াছে—তাঁহাতে ‘সিটিবিউল রহস্য’ ‘আধুনিক পাওয়ার হাউসের গঠন পদ্ধতি’ প্রভৃতি কয়েকটি চমৎকার প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। শক্তি নিয়ন্ত্রণ, পরেশ ভট্টাচার্য প্রভৃতি ১০ জনের নাম উহাতে দেখা হইয়াছে। আমরা আমেরিকা-প্রবাসী এই

জন্ম হয়—তাঁহার পৈতৃক বাস বনগাঁর নিকটস্থ বারাকপুর গ্রামে—বনগাঁ হাই স্কুল হইতে ম্যাট্রিক করিয়া ১৯১৮ সালে রিপণ কলেজ হইতে তিনি বি-এ করেন। ২৪পরগণা হরিনাতি স্কুলে কিছুকাল শিক্ষার পর তিনি ভাগলপুরের ডেপুটি ইন্সপেক্টর ম্যানেজারের কার্য করেন। যেমন বাল্যকালে বাড়ী ৪ মাইল দূরে স্কুলে যাতায়াতের সময়, তেমনই জমিদারীতে ভ্রমণের সময় তাঁহাকে বনে জঙ্গলের মধ্য দিয়া চলিতে হইত। জমিদারীর কাজ ছাড়িয়া আসিয়া কয়েক বৎসর কলিকাতায় শিক্ষকতা করেন ও পরে

করিয়া বাইরা হানোর হাই স্কুলে শিক্ষকতা করিতেন।  
তার 'পথের পাঁচালী' প্রকাশিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে  
এক হিসাবে তাঁহার খ্যাতি ছড়াইয়া পড়ে। তাহার পর  
রিণাক, অপরাধিতা, স্মৃতিপ্রদীপ, মেঘমল্লার, যাত্রাবন্দন,  
গগন, তৃণাঙ্কুর, উষ্মধর, দেবদান, মৌরীফুল প্রভৃতি  
খানিরও অধিক গ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছেন। দেশবাসী  
তার প্রাপ্য শ্রদ্ধা সম্মান প্রদান করিয়াছিল—প্রবাসী বঙ্গ  
বিকাশ সম্মেলনের বোম্বাই অধিবেশনে ও মারাট অধিবেশনে



বিত্তভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় শিল্পী—সুনীলমাধব সেনগুপ্ত

নি সাহিত্য শাখার সভাপতি হইয়াছিলেন। তিনি  
স্বস্ত অমায়িক-প্রকৃতির আড়ম্বরহীন মানুষ ছিলেন।  
তার সহৃদয় ব্যবহার সকলকে মুগ্ধ করিত। তাঁহার  
মতে বর্তমান বাঙ্গালা সাহিত্যের যে ক্ষতি হইল, তাহা  
এই হইবার নহে। তিনি যাহা দিয়া গিয়াছেন, বাঙ্গালী  
এক তাহা পাঠ করিয়া শুধু আনন্দ লাভ করিবে না, নতুন  
ব-প্রেরণা লাভ করিয়া কৃতার্থ হইবে।

কলিকাতা জোড়াসাঁকো সিংহ পরিবারের পূর্ণচন্দ্র—

কলিকাতা জোড়াসাঁকো সিংহ পরিবারের পূর্ণচন্দ্র  
২৭ গত ২৭শে সেপ্টেম্বর পরলোকগত হইয়াছেন। তিনি

সারা জীবন সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের জন্ত আশ্রয় চেষ্টা  
করিয়া গিয়াছেন। সংস্কৃত সাহিত্যের প্রসার ও প্রচারের  
জন্ত তাঁহার গৃহে বহু সভা সমিতি অনুষ্ঠিত হইয়াছে ও সে



পূর্ণচন্দ্র সিংহ

জন্ত তিনি প্রচুর অর্থ দান করিয়াছেন। এ সময়ে তাঁহার  
মৃত্যুতে সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য এবং তাহার রক্ষকগণের  
অপূরণীয় ক্ষতি হইয়াছে।

সমাজ-সচেতন—

'নয়া সমাজ' নামক একখানি সাপ্তাহিক পত্রের  
শারদীয়া সংখ্যায় কবিশেখর ত্রীকালিদাস রায় মহাশয়ের  
একটি কবিতা প্রকাশিত হইয়াছে। আমরা কবিতাটি  
নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম। বাঙ্গালার সকল কবির দৃষ্টি এই  
কবিতার প্রতি আকৃষ্ট করি :—

মাছ বিকালে তিন টাকা সের পটোল বার আনা  
এ সব কিছুই দেখতে পায় না কাব্য তোমার কানা।  
আটার ভেজাল, চালে কাঁকর, পাই না কেরোসিন,  
কাব্য তোমার এ সমস্ত ক্যালাস উদাসীন।  
ইম্বে বাসে ভিড়ের ঠেলায় দুর্ঘটনা হয়,  
তোমার কাব্যে তার ত কোন নেইক পরিচয়।



মেজর জেনারেল ঐশ্বর্যত সিংহ রায়ের র'টিতে বাংলা বিহার এবং উড়িষ্যার সামরিক শিক্ষাকেন্দ্রে পরিদর্শন



রাঁটির সামরিক শিক্ষাকেন্দ্রের একটি দৃশ্য

সব অকসেসে যুসের দাবী, নেইক কেহ সৎ,  
কাব্য তোমার দেখাচ্ছে কি প্রতিকারের পথ ?  
ঠাকুর চাকর চার না থাকতে তিরিশ টাকার কমে  
চাষের অভাব খুচার রেশন, ববে এবং গমে।  
খুতি শাকী কিনতে গেলে বা খুশী দাম চার,  
তোমার কাব্যে পাই না খুঁজে এ সবার উপার।  
কাছেই দেখছি নও কো তুমি সমাজ-সচেতন,  
এ যুগে ও কাব্য তোমার অচল আয়তন।



বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির নবনির্বাচিত সম্পাদক  
শ্রীবিজয় সিং নাহার

### ডাক্তার কুমুদশঙ্কর দাস—

কলিকাতার খ্যাতনামা বঙ্গ-চিকিৎসক, পরহিত ব্রতী,  
কংগ্রেস-সেবক ডাক্তার কুমুদশঙ্কর দাসের অকাল মৃত্যুতে  
বাংলার যে ক্ষতি হইয়াছে তাহা পূর্ণ হইবার নহে। গত  
৩০ বৎসর কাল তিনি নিঃস্বার্থভাবে যে সেবার্কা করিয়া  
গিয়াছেন, তাহা অনন্তসাধারণ। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত  
হাসপাতাল বঙ্গ হাঙ্গামা হাসপাতালটির নাম ‘কুমুদশঙ্কর বঙ্গ-  
হাসপাতাল’ রাখার যে প্রস্তাব হইয়াছে, আমরা  
স্বীকৃতি করণে তাহা সমর্থন করি। তিনি ঐ হাসপাতালের  
প্রতিষ্ঠা ও প্রসারের জন্য জীবনের অধিকাংশ সময় ব্যয়

করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার পুত্র ককণাশঙ্কর ও কন্যা  
বাণী সেনগুপ্তা পিতার জীবনী রচনার ব্রতী হইয়াছেন।  
বাহারা কুমুদশঙ্করের জীবনের ঘটনা জানেন, তাঁহারা দয়া  
করিয়া তাহার বিবরণ কলিকাতা ১০০ ল্যান্ডাউন  
রোডে ককণাশঙ্করের নিকট প্রেরণ করিলে তাহারা  
কৃতজ্ঞ হইবেন।

### রবীন্দ্র সংস্কৃতি পরিষদ—

গত ১৫ই অক্টোবর কলিকাতা চাকুরিয়া ৯নং মহারাজা  
ঠাকুর রোডে শ্রীধীরেন্দ্রচন্দ্র মজুমদারের গৃহে রবীন্দ্র  
সংস্কৃতি পরিষদের উদ্বোধন উৎসব হইয়া গিয়াছে।  
সভার স্বামী পুরুষোত্তমানন্দ অবধূত সভাপতির আসন  
গ্রহণ করেন ও শ্রীকৃষ্ণনাথ মুখোপাধ্যায় সভার উদ্বোধন  
করেন। ঐ অকালে শ্রীধীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় পরি-  
চালিত ‘রবীন্দ্র গীতা প্রচার প্রতিষ্ঠান’ গীতা-ধর্ম  
প্রচারের যে চেষ্টা আরম্ভ করিয়াছেন, তাহা জন-  
সাধারণের উপকার সাধনে সমর্থ হইয়াছে। আমাদের  
বিশ্বাস—গীতার শিক্ষা অবলম্বন করিয়া আবার ভারতবর্ষ  
সর্বক্ষেত্রে নবজন্ম, নূতন শক্তি লাভ করিবে এবং সমগ্র  
দগতকে উচ্চতর ও সমৃদ্ধতর মানব-জীবনের আদর্শ  
দেখাইবে। এ বিষয়ে বাহারা চেষ্টা করিবেন, তাঁহারা ই  
আমাদের প্রকৃত উপকার করিবেন। রবীন্দ্র সংস্কৃতি  
পরিষদের এই বিষয়ে চেষ্টা সাকল্যমণ্ডিত হউক, স্বীকৃতি-  
করণে ইহাই কামনা করি।

### শ্রীমোহনগোপাল

গত ৪ঠা কার্তিক বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সভাপতি,  
বাংলার প্রবীণতম সাহিত্যিক বিজ্ঞানার্চ্য শ্রীমোহনগোপাল  
দাস মহাশয়ের দ্বি-নবতিতম জন্মতিথি বাঁকুড়া এডওয়ার্ড  
মেমোরিয়াল হলে সাড়ফরে অঙ্গুষ্ঠিত হইয়াছে। ২০টি  
প্রতিষ্ঠানের পক্ষ হইতে ঐ দিন তাঁহাকে মাল্য দান করা  
হয় এবং বহু কবি ও সাহিত্যিক লিখিত অভিনন্দন প্রদান  
করেন। সকলের উত্তরে বোম্বেবাসী তাঁহার বাণ্য-  
জীবনের কথা সভায় বিবৃত করিয়াছিলেন। আমরা  
বিজ্ঞানার্চ্য মহাশয়ের সুদীর্ঘ কর্মজীবন জীবন কাদনা  
করি।

বারাকপুর গান্ধীঘাটে—গান্ধীজীর  
তৈলচিত্রে পশ্চিম বঙ্গের প্রদেশপাল  
ডক্টর কাট্টু ও কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট  
শ্রী পুরুষোত্তমদাস ট্যাগোরের  
পুষ্পমালা অর্পণ



আসামে ডাঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ—আসাম  
প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির একটি  
সম্মেলন সভায় ডাঃ রাজেন্দ্র প্রসাদের  
বক্তৃতা। ডাঃ প্রসাদের পক্ষান্তে  
আসামের প্রদেশপাল শ্রী জয়রামদাস  
দৌলভরাম



### জর্জ বার্গার্ড শ'—

গত ২রা নভেম্বর ২৪ বৎসর বয়সে বর্তমান বিশ্বের প্রেষ্ঠ চিকিৎসায়ক ও সুবিখ্যাত নাট্যকার জর্জ বার্গার্ড শ' পরলোক গমন করিয়াছেন। কিছুদিন পূর্বে বাগানে ভ্রমণকালে তিনি হঠাৎ পড়িয়া যান এবং তাঁহার পায়ে প্রচণ্ড আঘাত লাগে। ফলে তাঁহাকে হাসপাতালে পাঠানো হয় এবং অস্ত্রোপচারের পরে কয়েক দিন একটু সুস্থও ছিলেন। আশা হইয়াছিল তিনি শীঘ্রই নিরাময় হইবেন। কিন্তু ২রা নভেম্বর রাতে তিনি হঠাৎ মারা যান। শ্বেদ, বিক্রপ এবং বাক্যের কথাবাতের মধ্য দিয়া সুরসিক শ' বিশ্ব-সমাজের উপর যে নূতন আলোকপাত করিয়াছেন তাঁহার সুদীর্ঘ জীবনকাল ধরিয়া—তাঁহার কিছু মৃত্যু নাই। পৃথিবীর সাহিত্য বতদিন থাকিবে ততদিন বার্গার্ড শ' মাহুষের মনে অমর হইয়া থাকিবেন।



সাময়িক পত্রিকা সংঘে নূতন মন্ত্রী ডাঃ আর আবেদ—

দুই পার্শ্বসংঘের সভাপতি ও সম্পাদক

### কেশবচন্দ্র পরিমাণ হ্রাস—

গত ৬ই নভেম্বর হইতে দুই সপ্তাহের জন্য রেশন এলাকার প্রতি সপ্তাহে ২১ ছটাকের স্থানে ১৪ ছটাক দেওয়ার ব্যবস্থা হইয়াছে—গমের পরিমাণ হ্রাস বা বৃদ্ধি করা হয় নাই। কোন মাহুষের পক্ষেই প্রতি সপ্তাহে চাউল ও গমে মোট ৩৫ ছটাক খাইয়া জীবনধারণ করা সম্ভব নহে। চাউল কম দেওয়ার কারণ হিসাবে খাদ্য মন্ত্রী শ্রীপ্রহ্লাদচন্দ্র সেন জানাইয়াছেন যে সকল রেশনহীন এলাকার চাউলের দাম মণ প্রতি ৩০ টাকার কমে পাওয়া যায় না। সে জন্য রেশন এলাকার কম চাউল

দিয়া যে চাউল বাচিলে তাহা জনপাইগুড়ী, নদীয়া, মুর্শিদাবাদ, মালদহ, কোচবিহার, পশ্চিম দিনাজপুর, দার্জিলিং ও ২৪ পরগণার প্রদান করা হইবে। অবশ্য রেশন এলাকার ১৭ টাকা ও রেশন-হীন এলাকার ৩০ টাকা মণ চাউল বিক্রয় কেহ সমর্থন করিবে না। সর্বত্র যাহাতে এক দরে চাউল বিক্রয় হয়, সেজন্য সমস্ত ব্যবস্থা সম্পূর্ণ করা প্রয়োজন। কিন্তু সেজন্য পূর্ব হইতে ব্যবস্থা করা কেন যে গভর্নমেন্টের পক্ষে সম্ভব হয় নাই, তাহা জনসাধারণ বুঝিতে পারে না। কম চাউল পাইলে ধনী লোকেরা অল্প খাদ্য অধিক মূল্যে কিনিয়া খাইতে পারে, কিন্তু দরিদ্রগণের পক্ষে অখাদ্য অর্থাৎ শাক পাতা খাওয়া ছাড়া বা অর্ধাহারে থাকা ছাড়া গত্যন্তর থাকে না।

### আসাম ও পাকিস্তান—

সম্প্রতি আসাম, পূর্ববঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গের চিক সেক্টরীগণের সম্মিলিত বৈঠকে প্রকাশ পাইয়াছে যে পূর্ব পাকিস্তান হইতে আসামে দল দল মুসলমান পাঠাইয়া আসামকে পাকিস্তানের সহিত যুক্ত করার গোপন যড়যন্ত্র চলিয়াছে। গত কয় মাস ধরিয়া দলে দলে মুসলমানগণ পাকিস্তান হইতে আসামে বাইলেও আসাম গভর্নমেন্ট সে বিষয়ে কিছুই করেন নাই—অল্প দিকে আসাম হইতে হিন্দু বাঙ্গালী তাড়াইবার জন্য তাঁহাদের ব্যবস্থার অন্ত নাই। হিন্দু-বাঙ্গালীর পক্ষে—এমন কি উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারীদের পক্ষেও আর আসামে বাস করা সম্ভব নহে। আসামের বর্তমান মন্ত্রিসভার এই কার্যের ফলে যদি আসাম একদিন পাকিস্তানের কুস্মীগত হইয়া যায়, তবে তাহাতে বিশ্বের কোন কারণ থাকিবে না। এ বিষয়ে কি কেন্দ্রীয় সরকারের কিছুই করিবার নাই?

### মুর্শিদাবাদে চাউলের দর—

মুর্শিদাবাদ জেলার চাউলের দর গত আগষ্ট মাসে খুব বাড়িয়া যাওয়ার লোকের ধারণা হইয়াছে যে ঐ জেলা হইতে গভর্নমেন্ট খাদ্য সংগ্রহ করার ঐ অঞ্চল হইয়াছে। সে সম্পর্কে গত ৩০শে আগষ্ট এক বেতার কক্ষতায় পশ্চিম বঙ্গের খাদ্য মন্ত্রী শ্রীপ্রহ্লাদচন্দ্র সেন বলিয়াছেন—“যদি এ বৎসর মুর্শিদাবাদ জেলার গভর্নমেন্ট হইতে খাদ্য ক্রয়ের ব্যবস্থা ও সঙ্গে সঙ্গে প্রয়োজনীয় স্থানে চাউল প্রেরণের

ব্যবস্থা না করা হইত। তাহা হইলে মূর্শিদাবাদ হইতে সকল ধান বা চাউল পাশে নদীয়া জেলায় বা বিহারে চলিয়া যাইত—কারণ ঐ সকল স্থানে চাউলের দাম খুব বেশী ছিল। নদীয়া ও মূর্শিদাবাদে ৭ মাস চাউলের দামের বিরূপ পার্থক্য ছিল, তাহা নিম্নের হিসাব হইতে বুঝা যাইবে।

মাস	নদীয়া	মূর্শিদাবাদ
১৯৫০	( চাউলের মণ )	
জানুয়ারী	১৯৮/০	১৭৮/০
ফেব্রুয়ারী	২০/	১৬৮/০
মার্চ	১৯৮/০	১৬৮/০
এপ্রিল	২০৮/০	১৭/
মে	২২৮/০	১৯৮/০
জুন	২৫৮/০	২২/০
জুলাই	৩১৮/০	২৬/০

মূর্শিদাবাদ জেলার খাজাবাহার খবর গভর্ণমেন্ট রাখেন। সেজন্য গত ১লা জানুয়ারী হইতে ২৯শে আগষ্ট ৮ মাসে গভর্ণমেন্ট মূর্শিদাবাদ জেলায় ১৭৮৭৩৭ মণ চাউল কিনিয়া ঐ সময়ের মধ্যে ১৫২২৪২ মণ চাউল ও ৩৪২৭০ মণ আটা জেলাকে প্রদান করিয়াছেন। যে পরিমাণ ক্রয় করা হইয়াছে, প্রদান করা হইয়াছে তাহা অপেক্ষা বেশী।” ঐ সময়ে খাজ-মন্ত্রী আশ্বাস দেন যে, পরবর্তী ৪ মাসে উপযুক্ত পরিমাণ চাউল ও গম দিয়া গভর্ণমেন্ট মূর্শিদাবাদকে রক্ষা করিবেন। আমরা আশা করি সে প্রতিশ্রুতি রক্ষিত হইয়াছে। মূর্শিদাবাদের খাজাবাহার সম্বন্ধে আলোচনা করার ফলে আমরা উপরের হিসাব প্রদান করিলাম। সরকার পক্ষ যে এ বিষয়ে একেবারে অবহিত নহেন, তাহা হিসাব দেখিলেই বুঝা যায়।

## দোলা

শ্রীদেবপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় এম-এ, বি-এল

এ ভুবনে শুধু ক্ষণতরে আসা,  
 কণিকের ভালবাসা,  
 প্রিয়া মুখ লাগি' আগে বকে বটে,  
 অতি দ্রুত আশা,  
 মনে হয় বুঝি, চিরদিন তারে,  
 বকে রাখিব ধরি'  
 মেহেরি পরদে, দুবাহ জড়ারে,  
 বলী তাহারে করি ;—  
 সহসা ঝাড়া দশানের কোণে,  
 দেখে দেয় কালোমেঘে,  
 স্থখের সে নীড় ভেঙে চূরে যায়,  
 বহে ঝড় খবংগে,  
 বকের সে ধন, পারি না রাখিতে,  
 বুকেতে অঁড়াল করি'  
 উত্তরোল বায়ু কোথা লয়ে যায়,  
 আমি শুধু, কেঁদে মরি ;

অশ্রুধারায় বিধাতা চরণে,  
 কত রূপে দিই পূজা,  
 তবু এ ভুবনে আরবার তারে,  
 বুঝা হয় মোর খোঁজা ;  
 ধার ধন তার কোলে কিরে যায়,  
 যায় ছাঁদে রাখে বেঁধে,  
 কত মধুমাংস আসে আর যায়,  
 দিন যায় মোর কেঁদে,—  
 এই ত জীবন, এই ত মরণ,  
 হাসি কান্নার ধন,  
 আগে আর যায়, কণিকে মিলায়,  
 তবু বুঝেনাত মন !  
 তবু ভালবাসি, বকেতে জড়াই,  
 আদর তাহারে করি,  
 প্রেম নিপীড়ন, সহিতে জনম,  
 আঁখি জলে তাহা স্মরি।



শ্রীক্ষেত্রনাথ রায়

হৃদাংগুশেখর চট্টোপাধ্যায়

## ভারতীয় ক্রিকেট খেলোয়াড়দের

কৃতিত্ব :

ইংলণ্ডের বিখ্যাত সেন্ট্রাল ল্যান্কাশায়ার ক্রিকেট লীগের প্রতিযোগিতার খেলার খবর ভারতীয় সংবাদপত্র-গুলিতে বিশেষ আকর্ষণের বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। পৃথিবীর ক্রিকেট ক্রীড়ামহলে সেন্ট্রাল ল্যান্কাশায়ার ক্রিকেট লীগের খেলা নানা দিক থেকেই গুরুত্বপূর্ণ। গত কয়েকবছর ভারতীয় ক্রিকেট খেলোয়াড় এবং ক্রিকেট খেলার অনুরাগিগণ সেন্ট্রাল ল্যান্কাশায়ার ক্রিকেট লীগের খেলার ফলাফলের উপর খুব বেশী আগ্রহ প্রকাশ করছেন কারণ লীগের খেলার বিভিন্ন দলের পক্ষ নিয়ে একাধিক নামকরা ভারতীয় ক্রিকেট খেলোয়াড় পেশাদার খেলোয়াড় হিসাবে খেলছেন। গত বছর বিজয় হাজারে এবং ভিন্নু মানকড় লীগের খেলায় প্রভূত খ্যাতি প্রতিষ্ঠা করে এসেছিলেন। গত বছর মানকড় লীগে সহস্রাধিক রাণ এবং শতাধিক উইকেট নিয়ে লীগে নতুন রেকর্ড স্থাপন করে ব্যক্তিগত ক্রীড়াচাতুর্ঘ্যে ভারতীয় ক্রিকেট খেলোয়াড়দের কৃতিত্ব বিদেশে প্রমাণ করে আসেন। এবার তাই আরও বেশী সংখ্যক ভারতীয় খেলোয়াড়দের সেন্ট্রাল ল্যান্কাশায়ার লীগে খেলবার নিমন্ত্রণ আসে, মোটা টাকার পারিশ্রমিকের বিনিময়ে। এ বছরে খেলতে যান বিজয় হাজারে, লালা অমর নাথ, ভিন্নু মানকড় এবং পলি উমরি গড়। এঁরা বিভিন্ন দলের হয়ে খেলেন। লীগের সমস্ত খেলার শেষে ব্যাটিং এবং বোলিংয়ের বে গড়পড়তার হিসাব তালিকা বের হয়েছিল তার বিপ্লিষ্ট স্থানগুলির অধিকাংশ ভারতীয় খেলোয়াড়রা অধিকার

করেছেন। আমাদের পক্ষে এখন খুবই আনন্দের বিষয়। ব্যাটিংয়ে ধারা মোট ৩৩০ রাণ করতে পারেন একমাত্র তাঁদের নামই তালিকাত্ত করা হয়। পলি উমরিগড় ব্যাটিংয়ে প্রথম স্থান অধিকার করেছেন। তাঁর মোট রাণ সংখ্যা ৫৯৯। বিজয় হাজারে আছেন চতুর্থ স্থানে। লালা অমরনাথ অসহ্যতার জন্য বেশী খেলায় যোগদান করতে পারেন নি সুতরাং এই প্রয়োজনীয় রাণ করা সম্ভব হয়নি বলে তালিকায় তাঁর নাম নেই। বাকি তিনজন ভারতীয় খেলোয়াড়ের নাম আছে। বোলিংয়ে ভারতীয় খেলোয়াড়রা বেশী কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। ধারা ৩২টি উইকেট পান তাঁদের নামই তালিকায় স্থান দেওয়া হয়। সেই হিসাব মত প্রথম স্থানে আছেন ভিন্নু মানকড়, দ্বিতীয় স্থানে বিজয় হাজারে চতুর্থ স্থানে লালা অমর নাথ এবং নবম স্থানে পলি উমরি গড়। কোন এক দলের বিপক্ষে ভিন্নু মানকড়ের বোলিং এভারেজ বিশেষ উল্লেখযোগ্য হয়েছিল। মানকড় ৮ ওভার বলে মাত্র ৬ রাণ দিয়ে ৭টা উইকেট পান। শেষ ৯ বলে মানকড় কোন রাণ না দিয়ে ৪ জনকে বিদায় করেন।

## কমনওয়েলথ ক্রিকেট দল ৪

ভারতীয় ক্রিকেট মনস্তম্ভে বিলেত থেকে ইংলণ্ড, অস্ট্রেলিয়া এবং ওয়েস্ট ইন্ডিজ দেশের যৌগজন খ্যাতিনামা খেলোয়াড় দ্বারা গঠিত কমনওয়েলথ ক্রিকেট দল খেলতে এসেছে। দলের খেলোয়াড়দের নামের দিক থেকে গত বছরের কমনওয়েলথ দলের থেকে এই দলটি বেশী শক্তিশালী বলেই ক্রীড়া মহলের অভিমত। আমাদের ভারতবর্ষে

কর্মপ্রাণ জনসাধারণের মধ্যে রামনাসের মাহাত্ম্য আর জনপ্রাতিভা কাল থেকেই বিস্মরণীয় হয়ে আছে। সম্প্রতি রামনাসের মাহাত্ম্য আর সারা পৃথিবীর ক্রিকেট মহলে এবং সংবাদপত্র জগতে যে কীৰ্ত্তিত হচ্ছে তার নিমিত্ত হ'লেন ওয়েস্ট ইন্ডিজের প্রবাসী ভারতীয় ক্রিকেট খেলোয়াড় রামাধীনের বোলিং সাকল্য। রামাধীনের বোলিং নিয়ে ক্রিকেট ক্রীড়াঙ্গণে হৈ চৈ পড়ে গেছে। 'রামাধীনকে আমরা দেখতে চাই'—ভারতীয় জনসাধারণের দিক থেকে এই দাবী সংবাদপত্রে প্রবল জনমত সৃষ্টি করে। সেই রামাধীন বহুকাল পর পূর্বপুরুষের দেশ ভারতবর্ষে পদার্পণ করেছেন কমনওয়েলথ ক্রিকেট দলের সঙ্গে খেলতে আসায়। এই দলে ইংলণ্ডের ১১ জন, অস্ট্রেলিয়ার ৩ জন এবং ওয়েস্ট ইন্ডিজের ২ জন খেলোয়াড় আছেন। দলের অধিনায়ক হ'লেন ইংলণ্ডের টেস্ট খেলার ভূতপূর্ব উইকেট রক্ষক লেসলী এমস। দলের ম্যানেজার হয়ে এসেছেন জর্জ ডাক ওয়ার্থ, তিনিও ইংলণ্ডের ভূতপূর্ব উইকেট রক্ষক।

নিম্নলিখিত খেলোয়াড় নিয়ে দ্বিতীয় কমনওয়েলথ দলটি গঠিত হয়েছে।

লেসলী এমস (কেস্ট ও ইংলণ্ড) ক্যাপটেন, ক্র্যাক ওরেল (বার্বাদোস ও ওয়েস্ট ইন্ডিজ)—ভাইস ক্যাপটেন, এ বার্গো ল্যাকসায়ার), ক্রস ডুগ্যাও (দঃ অস্ট্রেলিয়া এবং অস্ট্রেলিয়া), জর্জ এমেট (গ্লুস্টার্স সায়ার ও ইংলণ্ড) লরি ফিসলক (সারে ও ইংলণ্ড), হ্যারও গিঘলেট (সোমারসেট ও ইংলণ্ড), কেন গ্রিভস (নিউ সাউথ ওয়েলস ও ল্যাকসায়ার), জ্যাক আইকিন (ল্যাকসায়ার ও ইংলণ্ড), লেসলী জ্যাকসন (ডাবিসায়ার ও ইংলণ্ড), জিম ল্যাকার (সারে ও ইংলণ্ড), সনি রামাধীন (তিনিদাদ ও ওয়েস্ট ইন্ডিজ), ডিরিক শ্রাকলটন (হাম্পসায়ার ও ইংলণ্ড), আর স্পুনার (ওয়ার উইকসায়ার), জর্জ ট্রাইব (ভিক্টোরিয়া ও অস্ট্রেলিয়া) এবং ফ্রেড রিজওয়ে (কেস্ট)। এই বোলজনের মধ্যে টেস্ট খেলোয়াড় আছেন ইংলণ্ডের ৮ জন, অস্ট্রেলিয়ার ২ জন এবং ওয়েস্ট ইন্ডিজের ২ জন।

কমনওয়েলথ দলের অধিনায়ক ইংলণ্ডের ভূতপূর্ব টেস্ট ক্যাপটেন পি-টি-আই-য়ের সংবাদদাতার নিকট তাঁর দল সম্পর্কে বলেছেন—'best players in the British Commonwealth' তাঁর মতে সবদিক থেকেই এই দলটি

'well balanced' এবং বতব্বর সম্ভব শক্তিশালী বোলারদের নিয়ে দলটি গঠন করা হয়েছে। বোম্বাইয়ে 'প্রোগ্রেসিভ গ্রুপ'-এর উত্তোগে অহুস্তিত এক ভোজ সভায় লেসলী এমস বলেন, তাঁর দলে কেবল পৃথিবীর কয়েকজন 'fine batsmen'-ই আসেন নি, এসেছেন পৃথিবীর নান্দকক কয়েকজন 'fastest-scorers'। ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের সভাপতি মি: এ, এস ডি মেলোর মতে, লেসলী এমস, ওরেল, ট্রাইব, রামাধীন, ফিসলক এবং গিঘলেট হলেন 'Greatest cricketers ever'। দলের অধিনায়ক লেসলী এমস এই ভোজসভায় মন্তব্য করেছেন, 'his cricket career would be incomplete without the visit to India, the birth place of the great Rajitsinghi'।

এম সি সি দলের সঙ্গে লেসলী এমস প্রত্যেক কমনওয়েলথ দেশে গিয়ে ক্রিকেট খেলেছেন। ভারতবর্ষে এইবার তাঁর প্রথম পদার্পণ। কমনওয়েলথ দলের সব থেকে বেশী আকর্ষণের পাত্র হয়ে দাঁড়িয়েছেন, ওয়েস্ট ইন্ডিজ প্রবাসী ভারতীয় খেলোয়াড় রামাধীন। তাঁর বোলিং নিয়ে ক্রিকেট ক্রীড়া-জগতে রীতিমত চাকল্য দেখা দিয়েছে। স্পিন বোলারগণ ক্রিকেট খেলার প্রচলিত পদ্ধতি অনুসারে যে ভাবে আঙ্গুল দিয়ে বলটি ধরে বল করেন, রামাধীন হলেন তাঁর ব্যতিক্রম। এক বছর আগেও সনি রামাধীন ছিলেন ওয়েস্ট ইন্ডিজের দক্ষিণাঞ্চলের ক্লাব ক্রিকেট মহলের নিকট পরিচিত। সেখান থেকে চার মাসের মধ্যে ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলের সঙ্গে ইংলণ্ডে খেলতে এসে পৃথিবীর ক্রিকেট ক্রীড়ামহলে আন্তর্জাতিক পদমর্যাদায় অধিষ্ঠিত হয়ে সকলের, কাছে এক বিস্ময় এবং জিজ্ঞাসার জাল বিস্তার করলেন, তাঁর অসামান্য বোলিং সাকল্যে। 'লেগ-ব্রেক এবং অফ-ব্রেক' এই দুইয়েতেই তিনি সনান পারদর্শী এবং তাঁর বল সাধারণত: 'good length' বজায় রেখে চলে। ব্যাটসম্যানের উদ্দেশ্যে বল ছাড়বার সময় তাঁর 'unorthodox fingerwork' ব্যাটসম্যানকে ধাঁধার মধ্যে রাখে, কোন দিকে বল গিয়ে পড়ি পরিবর্তন করবে তা বুঝতে না দিয়ে। 'অমৃতবাজার' এবং 'বুগান্ডর পত্রিকার' নিজস্ব সংবাদদাতার সংবাদ অনুসারে প্রকাশ, রামাধীনের এতখানি বোলিং সাকল্যের সম্ভব

সহায়ক হ'ল নাকি তাঁর টুপি। তিনি টুপি মাথায় বল করেন এবং টুপিতে হাত দিয়ে উইকেট-কিপারকে তাঁর সন্দেশ পাঠান। জানি না এর মধ্যে কতখানি কৌশল আছে। তবে কৌশল যখন বলির মধ্যে থেকে বেরিয়েই পড়লে তখন দেখা বাক্ ব্যাটসম্যানরা তাঁর বল কতখানি উপেক্ষা করতে পারেন। ইংলণ্ড স্করে রামাধীন মোট ১২৯টা উইকেট পান। প্রতি উইকেট পান গড়ে ১৫ রানের কিছু বেশী রান দিয়ে। টেষ্ট ম্যাচের বোলিং এভারেজ হ'ল—৩৭৭.৫ ওভার, ১৭০ মেডেন, ৬০৪ রানে এবং ২৬টা উইকেট। ভারতবর্ষের প্রথম খেলায় প্রথম বলেই তিনি উইকেট পান, বোম্বাইয়ে অনুষ্ঠিত ক্রিকেট কন্ট্রোল একাদশের বিপক্ষে এবং মাত্র প্রথম ইনিংসে ২৩ রানে ৬টা উইকেট পান। এ পর্যন্ত ভারতবর্ষে তিনি ২৭টা উইকেট পেয়েছেন ১৩৪ ওভার বল দিয়ে, ৪৯টা মেডেন নিয়ে এবং ২১৫ রান দিয়ে।

কমনওয়েলথ দলের ভারতবর্ষে পাঁচ মাসের ক্রিকেট সফর শেষ হবে ১৯৫১ সালের ফেব্রুয়ারীর ১১ তারিখে। (৭) পাঁচটি টেষ্ট ম্যাচ হবে, (১) দিল্লী (নভেম্বর ৪-৮), (২) বোম্বাই (ডিসেম্বর ১-৫), (৩) কলিকাতা (ডিসেম্বর ৩০—৩ জানুয়ারী ১৯৫০) (৪) মাদ্রাজ (জানুয়ারী ১৯-২০) এবং (৫) কানপুর (ফেব্রুয়ারী ৮-১২)। ক'লকাতায়

৩টি খেলা হবে। ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের বিপক্ষে (ডিসেম্বর ২০-২২) এবং রাজ্যপাল একাদশের বিপক্ষে (ডিসেম্বর ২৪-২৬)।

### রোভার্স কাপ ফাইনাল ৪

১৯৫০ সালের প্রতিযোগিতার ফাইনালে হায়দ্রাবাদ পুলিশ দল ১-০ গোলে ক'লকাতার এরিয়াল দলকে হারিয়ে রোভার্স কাপ বিজয়ী হয়েছে।

এরিয়াল দল একাধিক দলের একাধিক খেলোয়াড় নিয়ে রোভার্সে যোগদান করে। বাইরে একরূপ ভাবে দল গঠন আইন সম্মত। ক'লকাতার একমাত্র মোহনবাগান দলট (১৯২৩) ১১ জন নিজ দলের বাঙ্গালী খেলোয়াড় নিয়ে ফাইনালে খেলেছে।

### দিল্লী রুথ মিলস ফুটবল ৪

দিল্লীর রুথ মিলস ফুটবল প্রতিযোগিতার দ্বিতীয় দিনের ফাইনালে ইস্টবেঙ্গল ক্লাব ২-০ গোলে ৮ম শ্রুতাই ফেলস দলকে পরাজিত করেছে। প্রথম দিনের ফাইনালে উত্তর পক্ষে দু'টি গোল হওয়ায় খেলাটি ছুঁ বার। ইস্টবেঙ্গল দল দলের নিয়মিত খেলোয়াড় ছাড়া অপর দল থেকে দু'জন খেলোয়াড় নিয়ে দলকে শক্তিশালী করে। অপর দিকে শ্রুতাই দলে ক্যালকাটা গ্যারিসনের এবং শীল্ডের সার্ভিসেস একাদশের একাধিক খেলোয়াড় যোগদান করে।

## নব-প্রকাশিত গুস্তকাবলী

- শ্রীমদভী দেবী প্রণীত ভ্রমণ-কাহিনী “শ্রীমদভী দেবী  
দাক্ষিণাত্যের তীর্থদর্শন”—৪।  
শ্রীকালীদাস ঘটক প্রণীত উপন্যাস “রহিত নারীরা”—২১।  
শ্রীপ্রভাত বসু প্রণীত মন্থা “একদম বাঁকে জানান”—২১।  
শ্রীহরিশাস নামানন্দ সম্পাদিত “বঙ্গদেশ-প্রেমিক রমাকান্ত রায়”—২১।  
ভ্রামর সেনগুপ্ত প্রণীত “কিশোর বৈজ্ঞানিক”—১৬।  
শ্রীঅম্বিনীকুমার গাল প্রণীত “ছগর গিরি-শিখর”—৩।  
দেব-সাহিত্য-কুটার প্রকাশিত শিশুদের পূজা-বার্ষিকী “উদয়ন”—৫।  
শ্রীঅটীন্দ্রকুমার প্রণীত শ্রী-ভূমিকা-বর্জিত শিশু-নাটিকা  
“প্রায়-কিশোর”—১৬।  
আশুতোষ দেব-সম্পাদিত “পকেট প্রকৃতিবোধ অভিধান”—২১।  
শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য প্রণীত নাটিকাঙ্ক—“রবি-ঠাকুর”—১১।  
শ্রীযোগেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত জীবনী-গ্রন্থ  
“মহাপুরুষ রায় আশুতোষ”—১।  
শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়-সম্পাদিত শিশু-বার্ষিকী “সারথি”—২১।

- শ্রীবিদ্যনাথ মজুমদার প্রণীত গল্প-গ্রন্থ “পাতির বিয়ে”—১।  
বজ্রেশ্বর রায় প্রণীত রহস্যোপন্যাস “কাসীর কাঁড়া”—৮।  
শ্রীনৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত জীবনী-গ্রন্থ “জননী জয়ভূমি”—২।  
শ্রীহরীন্দ্রনাথ রাহা প্রণীত উপন্যাস “ট্যালিসম্যান”—১।  
শ্রীহরীন্দ্রনাথ বোম প্রণীত শিশু-উপন্যাস “মঙ্গলগ্রহের বৈজ্ঞানিক”—১।  
শ্রীরঞ্জিত চৌধুরী প্রণীত কাব্য-গ্রন্থ “অধিবাস”—১।  
শ্রীশ্রীমহাশয় মহারাজ গণপতি দাস গোস্বামী প্রণীত “আশ্রয়”—২।  
দিলীপ দাসগুপ্ত প্রণীত কাব্য-গ্রন্থ “তিমির-ভূষা”—১০, “মধু-মিতা”—১১।  
শ্রীরাধাচরণ দাস প্রণীত “কবির বধ”—১৬।  
পৌরীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত “আবাহনী”—১।  
চন্দ্র চক্রবর্তী প্রণীত “গর্ভাধান ও গর্ভনিরঞ্জন”—২।  
শ্রীমতেশচন্দ্র ভট্টাচার্য প্রণীত কাব্য-গ্রন্থ “আলো”—৮।  
শ্রীযতীন্দ্রচন্দ্র মজুমদার প্রণীত “সিদ্ধির পথ”—১১।  
শ্রীমতেশচন্দ্রনাথ জানা প্রণীত নাটক  
“পনোর-আগষ্ট”—২।

## সম্পাদক—শ্রীকলীন্দ্রনাথ বুদ্ধোপাধ্যায় এম-এ

২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা, ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীগোবিন্দচন্দ্র ভট্টাচার্য কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত



















